# শামসুর রাহমান
# গদ্য সংগ্রহ

সম্পাদনা

গৌতম রায়



প্রকাশ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯



SHAMSUR RAHAMAN
GADYA SANGRAHA

*Edited by*
Gautam Roy

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০০০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন,
ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

মুখ্যমন্ত্রী নয়, আমার প্রিয় পাঠক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-কে

# সূচিপত্র

# ভূ মি কা

জীবনের কবি শামসুর রাহমান তাঁর আত্মজৈবনিক রচনার প্রায় সূচনাপর্বে বলছেন, "আহ্ বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত খেসারতই না দিতে হয় আমাদের, ... প্রলোভনের ফাঁদ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে, আজ পর্যন্ত অসৎ উপায় অবলম্বন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি, জীবনের বাকি দিনগুলো সততার সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারলে ধন্য মনে করবো।" জীবনী লেখা কঠিন, আত্মজীবনী লেখা আরও কঠিন। সেই কঠিনতম কাজটির গহীনে কবি যখন প্রবেশ করছেন তখন ধীরে ধীরে ব্যক্তি এবং ঘটনাপ্রবাহের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে অচিরেই তা হয়ে উঠছে 'কনফেশন্স'। কবির এই আত্মকথনের ভঙ্গি যেন চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে লেখা সেন্ট অগাস্টিনের আত্মজৈবনিক কথকতার বিংশ শতকীয় এক অনুবর্তন। শামসুরের কাম্য, 'মুক্ত চিন্তাসমৃদ্ধ, শোষণ মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজ', সেই সমাজের প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন। তাঁর এই থাকা কিন্তু কিছুটা সংশয়ী চিত্তের মধ্যেই জীবনতরী বয়ে চলা। কারণ, কবির ভাষায়; 'সেরকম সমাজের প্রতীক্ষায় আছি, জানি না দেখে যেতে পারবো কিনা। যে দাঁতাল, স্থূল সময়ে আমরা বাস করছি তার অবসান সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না, যদি কোনোদিন হয় তাহলে আমাদের লড়াই একেবারে ব্যর্থ হয়নি। একথা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো স্বীকার করবে।' এ যেন বিশ্বনাগরিক কবি অমিয় চক্রবর্তীর কথাই ধ্বনিত হয়েছে; "যাবার সময় কত দূরে জানি না, কিন্তু এই বেলা বলতে চাই ভূমিকা আমার শুধু এই। যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসী 'তলায় জ্বলুক। যদি আমার ভাগ্যে থাকে।"

শামসুর রাহমানের নির্বাচিত গদ্যের প্রারম্ভিক পর্বে 'কালের ধুলোয় লেখা' কবির আত্মকথন তাই নিছকই ব্যক্তি শামসুরের স্মৃতিকথা নয়। কবি এখানে তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিজের আত্মবিকাশের ঘটনাক্রম। ঘটনার পরতে পরতে জড়িয়ে থেকেছে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেসব ব্যক্তিত্বেরা তার চলার পথের দিনগুলিতে কান্নাহাসির দোল দিয়ে পৌষ-ফাগুনের পালা রচনা করেছেন সেইসব মানুষজনেরা এসেছেন ফিরে ফিরে। প্রথম মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যাচ্ছে, দেশকালের গণ্ডির চেতনায় উদ্দীপ্ত হচ্ছে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রবল সংগ্রাম, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ভাঙাগড়া বাংলার সামাজিক প্রেক্ষিত-কে এক আত্মঘাতী পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে — এমন একটা সময়ে পুরনো ঢাকার মাহুৎটুলির সরু গলিতে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখা শিশুটি তাঁর আত্মকথনে যেন, 'তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে'তে অতীতের বিরহী মূর্তিকে বেহাগের তানে উপলব্ধি করেছেন। 'বেহাগ' বড়ো প্রিয় রাগ ছিল রবীন্দ্রনাথের, সেই রাগের মূর্ছনায় তিনি রচনা করেছিলেন; 'চিরসখা হে ছেড়ো না ছেড়ো না মোরে'। কালের ধুলোয় লিখতে বসে গোটা আত্মকথনেই তেমন 'বেহাগ' সৃষ্টি করেছেন শামসুর। জীবনের সংকট, মুক্তির অন্বেষণ, পরিত্রাণের কাহিনি — এসব মিলিয়ে কবির আত্মকথন এখানে হয়ে উঠেছে জন বানিয়ানের 'গ্রেস এ্যাবাউন্ডিং টু দি চিফ অব সিনার্স' (রচনাকাল ১৯৬৬) -এর মতোই একটি মহৎ সৃষ্টি।

শামসুর তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বছরের শেষে কবির ছোটোভাই রফিক আর ছোটোবোন নেহা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। কবির ভাষায়; "রফিক বেঁচে গেল, কিন্তু নেহারের মৃত্যু হল এক দুপুরে। আমি স্কুলে ছিলাম। আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করেনি, ডেকেও নিয়ে যায়নি। বসন্ত যাকে দংশন করে তার লাশ বেশিক্ষণ ঘরে রাখা যায় না। বুঝি তাই তাড়াহুড়ো করে নেহারকে কবর দেওয়া হয় আজিমপুর গোরস্থানে। নেহারের মৃত্যু আমাকে খুব বিচলিত করে। শীতবিকালে স্কুল থেকে ফিরে এসে সব শুনে বুক ঠেলে উঠে আসা কান্না থামাতে পারিনি অনেকক্ষণ। নেহার দেখতে ছিল ফুটফুটে, সুন্দর। বসন্তের হিংস্র আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে একটি কলি।" এই বেদনায় ভরে ওঠা পেয়ালাই শামসুর রাহমানের কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা ছিল। এই আজিমপুরেই এখন চিরশান্তিতে শয়ান রয়েছেন বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল, এখানেই শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন শালাম বরকত, যাঁদের সমাধি-জিয়ারত করতে গেলে খুঁজে নিতে হয় সমাধি ফলক।

আত্মকথনেই গদ্যশিল্পী হিসেবে শামসুরের শৈল্পিক সত্তা তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'কালের ধুলোয় লেখা'কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের আত্মজৈবনিক সৃষ্টি 'দি প্রিলিউড'-এর সাথে একই বন্ধনীভুক্ত করে দেয়। শৈশব থেকে অভিজ্ঞতার চড়াই উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে মাহুতটুলির বাচ্চুর শামসুর রাহমান হয়ে ওঠার এই ধারাবিবরণী প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে ঠিক দুশো বছর আগে শেষ করা ওয়ার্ডসওয়ার্থের আত্মকথনের সাথে একটা আশ্চর্য মোহিনীময় সেতুবন্ধন রচনা করেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর আত্মকথনমূলক কাব্য 'দি প্রিলিউড' লেখা শেষ করেছিলেন ১৮০৫ সালে, যদিও সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এ। শামসুর বিংশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে আত্মকথন লিখতে শুরু করে তা শেষ করেছেন একবিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে এসে। এই আত্মকথনের মধ্যে সাল, তারিখ ইত্যাদির হিসেব ধরা বিষয়গুলি সেভাবে ঠাঁই পায় নি। কবিসত্তার স্বাভাবিক ছন্দেই হয়তো ওরকম সাল, তারিখ, তিথি-নক্ষত্রের ফুটনোট সম্বলিত আত্মকথন শামসুর রাহমানের কাছ থেকে পেলে পাঠক-কে তেমন একটা পরিতৃপ্তিও দিতে পারত না। কিন্তু কোনো আত্মকথন নয়, এই নির্বাচিত গদ্যসংগ্রহে কবিকৃত উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে কাব্যিক সুষমা নিয়ে শামসুর রাহমান উপস্থিত থেকেছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে আর একটি ভিন্ন আঙ্গিকের শামসুরকে উপস্থাপিত করবে। এপার বাংলার মানুষ যেহেতু কবির গদ্যসৃষ্টির সঙ্গে সেভাবে পরিচয়ের সুযোগ পাননি, তাই এই সঙ্কলন এপার বাংলার মানুষদের কাছে একটা নতুন দ্যোতনার সৃষ্টি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শামসুরের আত্মকথনে **'Courtly Love'** এসেছে তাঁর কাব্যের মতোই। সময়ের অভ্রান্ত টিপছাপ রাখতে রাখতেই একাদশ শতকের শেষদিকে কিংবা দ্বাদশ শতক জুড়ে ফরাসি দেশের চারণ কবিরা যেমন অভিজাত উন্নত প্রেমের গান গেয়ে যেতেন শামসুরের গদ্যেও পাঠক তেমনটাই পাবেন। আত্মকথনে কবি বলেছেন; "আজ গৌরীর সঙ্গে বেশি কথা হয়নি। সকালের দিকে লোকজন এলে আমার অসুবিধা হয়। ছিন্ন হয় ওর সঙ্গে যোগাযোগ। আমার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। কিন্তু হাসিমুখে অতিথিদের স্বাগত জানাই। আমাদের দেশে আগে থেকে এত্তেলা না দিয়ে চলে আসাটাই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে একধরনের অস্থিরতা নিয়ে আছি, একটা বেদনাবোধ ঘুরে ঘুরে একা একা কথা বলছে আমার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে। ওর অভিমান এবং যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করেছে গভীরভাবে।" কবির এ হেন আত্মমূর্ছনা অনুভূতিপ্রবণ পাঠককে সাহিত্যপাঠের আন্তর্জাতিক

দরবারে হাজির করে দেয়। 'গাওয়েন অ্যান্ড দি গ্রীন নাইট' ইংরাজি সাহিত্যের এই অপূর্ব রোম্যান্সকে মনে করিয়ে দেয় কিংবা চসারের 'ট্রয়লুস অ্যান্ড ক্রেসিড'কে। ফরাসি দেশের দক্ষিণভাগ থেকে একদিন যেমন এই কোর্টলি লভ ছড়িয়েছিল সে দেশের উত্তরপ্রান্ত থেকে শুরু করে ইতালি, জার্মানি এমনকি ইউরোপের উত্তর প্রান্তেও, তেমনই শামসুর পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা একে অনুসরণের প্রচেষ্টা চালালেও শামসুরের সৃষ্টিতে যে শোভনতার পরিচয় মেলে তেমনটা তাঁর সমকাল বা উত্তরকালেও অনেকক্ষেত্রেই মেলে না।

এই গদ্য সংগ্রহের প্রতিটি পৃষ্ঠাতে শামসুরের সৃষ্টির ভিতর যে ডেকোরাম দেখা যায় তা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকদের, কবিদের রচনার ভিতর একটি অনন্যতার দাবি রাখে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান কবি হোরেস তাঁর অনুপম সৃষ্টি 'আর্ট অব পোয়েট্রি'তে যে শোভনতার তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন অন্নদাশঙ্করের মতো মরমি শিল্পীর কাছে তা অনুকরণীয় হলেও জীবনশিল্পীর পথ-সংকেতকে অনেকেই কিছুটা গাজোয়ারিভাবে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। গভীরভাবে শামসুরের সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় যে, কবিতার মতো গদ্যশিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি কিন্তু কোনো সময়েই সে পথ দিয়ে হাঁটেননি। শামসুরের সামগ্রিক সৃষ্টিতে হোরেসের দিকনির্দেশের একটা আশ্চর্য সুষমাময় পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

শামসুর তাঁর জীবনেও যেমন মিলনান্তক ঘটনার সঙ্গে বিয়োগান্তক অধ্যায়ের কোনো সংযোগ ঘটান নি, সেইরকমটাই তিনি নিজের গোটা সৃষ্টিতেও কমেডির সাথে কখনো ট্রাজেডির মিশ্রণ ঘটান নি। নিজের চেতনার সুরটিকে চিরদিন যেমন তিনি খুব উঁচু তারে বেঁধে রেখেছিলেন ইশতিয়াক হোসেন কিংবা শারমিন বা নাদিম ইউসুফ — শামসুর সৃষ্ট এইসব চরিত্রগুলিরও মেজাজটা এমনই একটা উঁচু তারে বাঁধা যে ওইসব চরিত্রগুলির সংলাপের ভিতরেও তাদের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা সব সময়ে উচ্চারিত হয়েছে। এই উচ্চারণের ভিতর দিয়ে শামসুরের ধর্মনিরপেক্ষ মননের একটা অনিন্দ্যসুন্দর পরিচয় ফুটে ওঠে। 'অক্টোপাস' উপন্যাসে সেই দ্যোতনা থেকেই লেখা হচ্ছে; "ইশতিয়াক ধর্মমনস্ক নয়, নামাজ পড়ে না। রোজাও সে রাখে না, ইয়াসমিন নিয়মিত রোজা রাখে। তবে তার নামাজ পড়াটা অনিয়মিত। তার গৃহিণী শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি পাঞ্জেগানা নামাজের পসন্দ হতে পারে নি। কোনো কোনোদিন তার নামাজ কাজা হয়ে যায়। কিছুদিন লাগাতার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ইয়াসমিন, তারপর ভাঁটা পড়ে উৎসাহে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

ইশতিয়াক ধর্মমনস্ক না হলেও, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের আজান শুনতে ভালো লাগে তার। ছেলেবেলায় আরো বেশি ভালো লাগত। ইশতিয়াকের মনে পড়ে, ওর আব্বার বন্ধু জনাব আব্দুল হাকিম খুব সুন্দর আজান দিতেন। ভদ্রলোকের সুরেলা কণ্ঠস্বর আজও তার কানে বাজে। জনাব আব্দুল হাকিমের হাসিটিও ছিল মধুর। চোখদুটো নেচে উঠত হাসির ঝিলিকে, যেন চোখ দিয়ে হাসছেন তিনি। তার আব্বার বন্ধু ইশতিয়াককে চার্লস ল্যাম্বের 'টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। কৈশোরে ওই বই ছিল ওর নিত্যসঙ্গী।"

অস্ত্রে বিশ্বাস না রাখা কবির এই চেতনালোক বুঝিবা গড়ে উঠেছিল তাঁর শৈশব, কৈশোরের দিনগুলিতেই। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশির ভিতর নিজের

সৃষ্ট চরিত্র ইশতিয়াকের মতো কবি কখনও আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। এই নির্বাচিত গদ্য সংগ্রহের অন্তর্গত 'স্মৃতির শহর'-এ কবি লিখছেন, "মুহররমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগতো চকে। মাঝরাতের মিছিল, নানীর সঙ্গে যেতাম চকবাজারের একটা বাড়িতে রাত্তিরে মিছিল দেখবো বলে। নানি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্য অপেক্ষা করে ঝিমুতাম। কখন ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি তাদের রূপালী সোনালি পাখা দুলিয়ে সবচেয়ে মিষ্টি একসুরে গান গাইতে গাইতে হাজির হতেন চকের সেই বাড়িটার আঁধার ভরা বারান্দায়, টের পেতাম না।"...

গদ্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে স্বদেশ, স্বকালের রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহকে বারবার ছুঁয়ে গেছেন শামসুর। মুসলিম জাতীয়তার কফিনে পেরেক পোঁতার প্রথম পদক্ষেপ '৫২র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, '৫৪র নির্বাচন, সেই নির্বাচনে দেশভাগের মাত্র সাত বছরের মাথায় মুসলিম লিগের শোচনীয় পরাজয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা — এসবই কবিকৃত গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুরে ফিরে এসেছে। কবির চেতনায় ধ্রুব নক্ষত্রের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতিও স্ব-মহিমায় তাঁর গদ্যসাহিত্যে ভাস্বর। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবমুক্তির জন্যে কাকুতি, সাম্যের জয়গান গাওয়া কবি তাঁর সার্বিক জীবনসত্তার প্রায় প্রতিটি অভিব্যক্তিকেই নিজের বিভিন্ন সৃষ্টির ভিতরে উজাড় করে দিয়েছেন। শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেটে'র অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে 'জাঁর' (Genre) বলা হয়, আধুনিক সাহিত্যিক রীতিকে অনেকে 'ফর্ম' বলেন তাকে এক অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন পলোনিয়াসের মুখের ভাষায়, "এরা পৃথিবীর সেরা অভিনেতা। কী বিয়োগান্ত, কী মিলনান্ত, কী ঐতিহাসিক, গ্রাম্যযাত্রা বলুন, গ্রাম্যযাত্রা-কৌতুকী, ঐতিহাসিক গ্রাম্য যাত্রা, বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক, বিয়োগান্ত কৌতুকী, ঐতিহাসিক গ্রাম্যপালা, একটানা দৃশ্য বলুন কিংবা অন্তহীন কবিতা—সবকিছুতেই সমান দক্ষ এরা। সেনেকা এদের কাছে তেমন গুরুগম্ভীর নয়, প্লুটার্সও নয় হালকা। ধ্রুপদী কিংবা রোমান্টিক যেকোনো ধরনের নাটকেই এরা দড়।" — শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, "tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical-pastoral. " — এভাবেই বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে বাঙালিকে উপস্থাপিত করেছেন শামসুর। কবির এই সুবৃহৎ গদ্য সংগ্রহটিও কাব্যের মতোই 'পুনশ্চ'র কর্ণধার সন্দীপ নায়ক দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে আমায় অন্তহীনভাবে সাহায্য করে গেছেন। তাই কাব্যসংগ্রহের মতোই গদ্যসংগ্রহটিও কার্যত সন্দীপ আর আমার যৌথ সম্পাদনা। কবির পুত্রবধূ টিয়া রাহমান এই কাজে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এসবের পাশাপাশি এই কাজটি করার ক্ষেত্রে শামসুর অনুরাগী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা আমাদের শক্তি সঞ্চার করেছে। 'পুনশ্চ'র প্রত্যেকটি কর্মী, বন্ধু যেভাবে 'কঠিন, কঠোর উদ্ধত অসহায়' পরিশ্রম করে এই গ্রন্থটিকে দিনের আলোয় নিয়ে এলেন নিছক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের প্রতি কর্তব্য শেষ করা যায় না। তাঁদের জন্য রইল হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন। অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী, বাংলাপ্রেমী পাঠক সমাজের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় শামসুর রাহমানের এই নির্বাচিত গদ্যকে নিবেদিত করা হল।

ভাটপাড়া
২৩ অক্টোবর, ২০০৫

গৌতম রায়

## আমার কথা

বুদ্ধদেব বসু পঞ্চাশোর্ধ বয়সে একটি কবিতায় লিখেছেন, 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।' আমি ষাটের কোঠায় পা রেখেছি; তাই আমার পক্ষে আরো বেশি কঠিন কোনো কিছু করা। সামান্য, তুচ্ছ কোনো কাজও কষ্টসাধ্য মনে হয় আজ। সবচেয়ে মুশকিল নিজের বিষয়ে লেখা। তবু এই দুরূহ কর্মে নিয়োজিত হয়েছি নিষ্ঠাবান সম্পাদক মীজানুর রহমানের নাছোড় তাগিদে।

কী লিখবো? কীভাবে শুরু করবো? আর শুরু করবোই বা জীবনক্ষেত্রের কোন্ বিন্দু থেকে? এইসব প্রশ্ন আমাকে এই মুহূর্তে, অত্যন্ত বিব্রত করছে। কখনো নিজেকে দেখতে পাচ্ছি শৈশবের মাঠে, কখনো-বা যৌবনের জ্বলজ্বলে প্রান্তরে। নিজের অজান্তেই বুক চিরে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। চাওয়া না-চাওয়া, পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবে মেলানোর আগ্রহ নেই। দেখতে-দেখতে, চোখের পলক না পড়তেই জীবন হেমন্ত গোধূলিতে এলিয়ে পড়লো, এ-কথা ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, এতকাল পরে দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু অর্জন করিনি। কখনো কখনো বেদনাঘন মুহূর্তে প্রশ্ন করি, কেন এলাম এই পৃথিবীতে? মরতে যখন হবেই, তবে কী লাভ মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে? কিন্তু আমাদের এই গ্রহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নই। একজন পুরুষ এবং একজন নারীর কিছু উদ্বেলিত মুহূর্তের পরিণাম আমি, যে-নবজাতক আমি স্বাভাবিক জীবন-তৃষ্ণায় শোষণ করেছিলাম মাতৃস্তন্য। তারপর পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ ও পরিচর্যায়, পরিবেশের সংস্পর্শে, নিজের কাজে-অকাজে ক্রমাগত হয়ে উঠেছি আজকের এই আমি। প্রায় বুড়ো, যদিও আমার তরুণ কবিবন্ধুগণ প্রায়শ বলেন যে, আমার সত্তা থেকে নাকি তারুণ্য মুছে যায়নি আমার নড়বড়ে স্বাস্থ্য সত্ত্বেও।

আগে বলেছি, দুঃখ ছাড়া অন্যকিছু অর্জন করিনি। না, নেমক-হারামি করবো না; জীবন কিছু কিছু সুখও আমার ভাণ্ডারে তুলে দিয়েছে। অনেকের প্রীতি ও শুভেচ্ছা পেয়েছি জীবনযাত্রার পাথেয় হিসেবে। আমার প্রীতিসাধনের কেউ কেউ এত যত্নবান হয়েছেন, অনেকে আমার সংস্পর্শে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণে অকৃপণ থেকেছেন এত বেশি যে, নিজেকে তার যোগ্য মনে করতে কুণ্ঠিত হয়েছি বার বার। যা হোক, আমার শুভার্থীদের কাছে আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকবো।

বাংলা ভাষা আমার সবচেয়ে প্রিয়। ভাষা নিয়েই আমার প্রধান কাজ, যেহেতু যৌবনের উষাকালে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছি, সে তার সব রহস্য আমার কাছে উন্মোচন করেছে, এমন দাবি করবো না। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, যদি সুস্থতার প্রশ্রয় পাই, মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত থাকবো, আশা করি। আমার কবিতার বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাই, বলা যেতে পারে, অন্য যে-কোনো

ব্যাপারে আলস্য আমাকে যত বেশি দখলই করুক, কবিতা রচনায় আমি এখনো অনলস। সিদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামাই না, তা বিচারের ভার পাঠক, বোদ্ধা ও সহৃদয় সমালোচকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে স্বস্তিবোধ করতে চাই। কবিতা লেখাতেই আমার আনন্দ। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, বহু পথ হেঁটে, সময়ের বিস্তর বালি ছেনে, আজো মনে হয়, কবিতা লেখা ভালোভাবে শুরুই করিনি, এখন থেকে শুরু করবো। এ আমার কপট বিনয় নয়। কপটতা যেন আমাকে কখনো স্পর্শ না করে, এটাই সবসময় চেয়েছি। হতে পারে, কবিতা ভবিষ্যতে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে; কিন্তু তখনও আমি কবিতার অনুরক্ত পাঠক হয়ে থাকবো।

নিজেকে ব্যক্ত করার অদম্য ইচ্ছা এবং সত্যের সন্ধান একজন লেখকের প্রধান কর্তব্য। সত্য যদি তার নিজের বিরুদ্ধেও যায়, তবু সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অনুচিত। সর্বোপরি, যে কোনো মূল্যে মনুষত্ব বজায় রাখার সাধনায় অবিচল থাকা একান্ত জরুরি একজন লেখকের পক্ষে। মহৎ সাহিত্যের সাহচর্যে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কী করে ভুলি প্রাচীন কবির সেই অমোঘ পংক্তি, "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই?" সত্যের অনুরোধে বলা দরকার, জগৎ সংসারে কুটিলতা, মানসিক অন্ধত্ব, সংকীর্ণতা, কলুষতা, নোংরামি, নীচতা কখনো কখনো জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। মানুষের মুখ ম্লান করে দেয়ার লোকের অভাব নেই। বিশ্ব বিরূপ, কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যকে অগ্রাহ্য করি কী ভাবে। আছে মৃত্যু, আছে শোক; তবু বেঁচে থাকতে ভালো লাগে, কোনো কিছুরই বিনিময়ে চিরচেনা রৌদ্রছায়াময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। হয়তো এই জীবন একেবারে নিরর্থক নয। জানি না, নিজেকে সান্ত্বনাবাক্য জানাচ্ছি কিনা।

আহ্ বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত খেসারতই না দিতে হয় আমাদের। নিরিবিলি জীবন যাপন করতে চাই। পরিবারের সদস্যদের জন্যে বাসযোগ্য একটি আশ্রয়, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়ার অবকাশ, ভাইবোনদের সঙ্গে মেলামেশার অনুকূল পরিবেশ, ভালোবাসার সান্নিধ্য, কিছু বই এবং সঙ্গীতের রেকর্ড পেলে আমার আর কিছু নাহলেও চলে। অবশ্য নিয়মিত পরিচিত আহার্য এবং লজ্জা নিবারণের মতো গাত্রাবরণ থাকতেই হবে। বেঁচে থাকলে মানুষের সামনে নানা ধরনের প্রলোভন এসে হাজির হয়। প্রলোভনের ফাঁদ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে, আজ পর্যন্ত অসৎ উপায় অবলম্বন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি। জীবনের বাকি দিনগুলো সততার সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারলে ধন্য মনে করবো।

সত্যি বলতে কি, আমার মনের মতো সমাজ এদেশে গড়ে উঠেনি আজো। মুক্ত চিন্তাসমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজ আমার কাম্য। সেরকম সমাজের প্রতীক্ষায় আছি, জানি না দেখে যেতে পারবো কিনা। যে দাঁতাল, স্থূল সময়ে আমরা বাস করছি তার অবসান সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না। যদি কোনোদিন হয় তাহলে আমাদের লড়াই একেবারে ব্যর্থ হয়নি, এ-কথা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো স্বীকার করবে।

# কালের ধুলোয় লেখা



## ॥ এক ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার এগারো বছর পর ১৯২৯ সালে আমি সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম পুরনো ঢাকার মাহুৎটুলির এক সরু গলির ভিতর, আমার নানার কোঠাবাড়িতে। কোঠাবাড়ি বলে দিচ্ছে, রুপোর চামচ মুখে নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি। তা না হলেও জন্মের অব্যবহিত পরে মুখে কয়েক ফোঁটা মধু অবশ্যই দিতে পেরেছিলেন আমার নানি। আম্মার মুখে শুনেছি, জন্মলগ্নে আমি আর দশটি শিশুর মতো কান্না জুড়ে দিই নি। আমাকে কাঁদানোর জন্য ধাত্রী এবং নানিকে বেশ কোশিশ করতে হয়েছিল। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কাঁদতে হবে বলেই হয়তো সেদিন কাঁদিনি। তবে আমি কোনওকালেই ছিঁচকাঁদুনে নই। আমার নানা এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। সেই সুবাদে পেয়েছিলেন দারোগার চাকরি। আমার নানা মুন্সী আফতাব উদ্দিন আহমদ ছিলেন পরহেজগার মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, ফজরে উঠে আজান দিতেন এবং তেলাওয়াত করতেন কোরআন শরীফ। রোজা বাদ দেননি কখনও। দারোগার চাকরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ আছে জেনে সেই আমলে অমন লোভনীয় চাকরি নেননি। তার বদলে কাছারিতে সামান্য কাজ শুরু করেন। বেশি বেতন পেতেন না। যা পেতেন তা দিয়ে মোটামুটি তাঁর সংসার চলে যেত। জীবনে কখনও ধার-কর্জ করেছেন বলে শুনিনি। মাইনে পেয়ে বাড়িতে ঢোকার আগে মহল্লার বিধবাদের প্রত্যেককে কিছু পয়সা দিয়ে আসতেন। বিধবার সংখ্যা নিশ্চয় খুব বেশি ছিল না। আমার নানা ঢাকায় বাড়ি করলেও তাঁকে ঠিক এই শহরের বাসিন্দা বলা যাবে না। কারণ, তিনি জন্মেছিলেন সেকালের ঢাকা জেলার পাড়াতলী গ্রামে (বর্তমান নরসিংদীর রায়পুর থানার একটি গ্রাম)। তাঁর শৈশব এবং কৈশোর সেখানেই কেটেছিল। আমার দাদা ও নানা সহোদর দুই ভাই। দাদা বড়ো, নানা ছোটো। আমার আব্বা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী মুন্সী কলিমউদ্দিন আহমদের চতুর্থ পুত্র। দাদাকে আমি দেখি নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই। দাদা, আব্বার মুখে শুনেছি, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ ছিলেন। যদিও তিনি ইংরেজি জানতেন না, বাংলা, আরবি এবং ফারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। জমিদারের নায়েব ছিলেন। দাদার প্রতি আব্বার ভক্তি ছিল প্রগাঢ় এবং অবিচল। আব্বা তাঁর পিতাকে একজন ওয়ালীউল্লাহ্ মনে করতেন। দাদা পাড়াতলী গ্রামে শুধু মসজিদ তৈরি করে ক্ষান্ত হননি, তিনি একটি প্রাইমারি ইশ্‌কুলও স্থাপন করেন। আব্বার উদ্যোগে সেটি এখন একটি উচ্চ বিদ্যালয়। এলাকাবাসীর কাছে মুন্সি কলিমউদ্দিন আহমদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আমার নানা ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁর একটি টাইপরাইটার ছিল। কতদিন তাঁর টাইপরাইটারের আওয়াজ শুনেছি, সেই শব্দ আজও কানে বাজে। কোনওদিন সেই যন্ত্রটি ছুঁতে সাহস হয়নি, পাছে নানা রেগে যান। নানার আদর খেতেই অভ্যস্ত ছিলাম, তাঁর অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখার খায়েশ ছিল না। ছোটোখাটো মানুষ ছিলেন, কিন্তু

তাঁর ব্যক্তিত্বের আভা সম্ভ্রম জাগাত সবার মনে। নানা দুই বিয়ে করেন। তাঁর পক্ষের স্ত্রীর বড়ো মেয়ে আমার আম্মা মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুন। আব্বা তাঁর শ্বশুরের মতোই দোজবরে। ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি খুব পছন্দ করতেন, তাই পর পরই দুই কন্যাকেই তুলে দেন তাঁর হাতে। অবশ্য মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুনের পরিচয় হয় তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর। নিজের বোনের তিন পুত্রকে মানুষ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তেরো বছরের আমেনা খাতুনের ওপর, আমার জন্মের আগেই। তেরো বছরের কিশোরীর পক্ষে এরকম একটি সংসার সামলানো যে কত আয়াসসাধ্য এবং কষ্টকর তা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আম্মার মুখে আজ অব্দি কোনও নালিশ শুনিনি। হাসিমুখে দায়িত্ব পালন করে গেছেন সবসময়। নানা জানতেন তাঁর ধৈর্যশীলা, স্বল্পভাষিণী, সুশীলা কন্যা মাতৃহীন তিনটি ছেলেকে কখনও অবহেলা করবে না, কষ্ট দেবে না। নিজের গর্ভজাত সন্তানের মতোই আদর যত্ন করবে। একজন বিপত্নীকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে আম্মার মনে কোনও খেদ ছিল না। অন্তত আমার কখনও মনে হয়নি সে কথা। বড়ো হয়ে লক্ষ করেছি আব্বা ও আম্মার সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। সেই মাধুর্য ফিকে হয়ে যায়নি আব্বার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আব্বা ছিলেন প্রায় গ্রিক দেবতা জিউসের মতো। তিনি রেগে গেলে আমরা কেউ তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পেতাম না। মারধর করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। জীবনে শুধু একবার তিনি আমার কান মলে দিয়েছিলেন। আমার অপরাধ? তখন আমি বালক। মাগরেবের নামাজ পড়ছিলেন আব্বা। আমি দু'একবার তাঁর জায়নামাজের সামনে দিয়ে ছোটাছুটি করেছিলাম। আব্বা এই বেয়াদবি বরদাশত করতে না পেরে আমার কান মলে দেন জোরে। লুকাব না, ভয়ে আমি প্রস্রাব করে দিই। কখনও কখনও তাঁকে আম্মার উপর চটে যেতেও দেখেছি। কখনও কোনও গালমন্দ করতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে বিলক্ষণ তর্জন-গর্জন শুনেছি। এমনিতেই তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর, ক্রোধের সময় তা জিউসের বজ্রনিনাদের মতো শোনাত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রোধাগ্নি গলে জল। আব্বা আম্মার প্রতি তাঁর অনুরাগ বোধহয় ভাষায়? প্রকাশ করতেন না, করতেন তাঁর নম্র দৃষ্টিতে, মমতাময় আচরণে। আব্বার অনুজ আরিফুর রহমান চৌধুরী। আব্বা তাঁর এই ভাইটিকে খুব ভালোবাসতেন। দীর্ঘকাল দুই ভাই এক সঙ্গে একই বাড়িতে ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবার বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, রান্নাবান্না হত আলাদা আলাদা। পরে দুই ভাইয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় মূলত চাচার কারণে। বাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও আমাদের দুই পরিবারের সদ্ভাব অটুট ছিল, এখনও আছে। আরিফুর রহমান চৌধুরী আম্মার ছোটো বোন মোসাম্মাৎ মোমেনা খাতুনকে বিয়ে করেন। চাচার একাধিক বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তাঁকে নানা তাঁর ছোটো মেয়ের স্বামী বানাতে রাজি হন তা বহুদিন বুঝতে পারিনি। এর পেছনে ছিল দু'টি কারণ — প্রথমত, ভাইয়ের ছেলে, দ্বিতীয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের আবদার। চাচা আমার খালাম্মাকে বিয়ে করার জন্য বায়না ধরেছিলেন। আরিফুর রহমান চৌধুরি ছিলেন শৌখিন এবং বিবাহপটু মানুষ। তিনি তাঁর গায়ের ভয়েলের কুর্তার মতো ঘন ঘন বউ পালটাতেন। আমাকে খালাকে তিনি ত্যাগ করেননি, কিন্তু ভুগিয়েছেন অনেক। খালা মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। মনোভার বইতেন আড়ালে। খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট ছিল না। বাইরে

বেড়ানো, মাঝেমধ্যে সিনেমা দেখা চলত, বাইরের কারও পক্ষে বোঝা মুশকিল ছিল তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা দেয়াল খাড়া হয়ে গেছে সবার অলক্ষ্যে। মোমেনা খালা স্বামীর সেবাযত্নে কখনও কোনও কমতি হতে দেননি। স্বামীর পোশাক-আশাক গুছিয়ে রেখেছেন, পাম্প সু'র চাকচিক্য যাতে বজায় থাকে, সে দিকেও তাঁর খেয়াল ছিল সবসময়। তিনি নিজেও সাফ-সুতরো থাকতে পছন্দ করতেন। এতকাল পরেও খালাম্মার শরীর থেকে ভেসে আসা পিয়ার্স সাবানের মৃদু ঘ্রাণ পাই। নানা ভাই তাঁর বাসগৃহের লাগোয়া সাড়ে তিন কাঠা জমি তাঁর দুই কন্যার নামে সানন্দে দহজ হিসাবে লিখে দেন। জমিতে প্রথমে একতলা দালান ওঠে আব্বা ও চাচার তহবিল থেকে। আমাদের মাহুৎটুলির বাড়ির গোড়াপত্তন হয় আমার জন্মদিনে। একদা ঐ বাড়িতে ছিল একটা আম গাছ, একটি খেজুর গাছ ও একঝাড় হাস্নুহানা। দোতলা তৈরির সময় নিধন করা হয় জাম গাছ ও খেজুর গাছকে। পানির হউজের জন্য ঝাড়েবংশে নির্বংশ করা হল হাস্নুহানাগুলোকে। আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গেছিল গাছগুলোর উপর। বিশেষ করে খেজুর গাছকে ঘিরে লতিয়ে উঠত আমার বালক মনের নানা খেয়াল। পাকা গাছির মতো গাছ বেয়ে উঠতে কত না চেষ্টা করেছি ছেলেবেলায়। মাথায় ফেট্টি বেঁধে, গামছা পরে, কোমরে ছুরি ঝুলিয়ে গাছি সাজতে ভারি ভালো লাগত আমার। খেজুরের রসের প্রতি তেমন লোভ ছিল না, তবে গাছের রুক্ষ শরীর এবং পাতাগুলো আমাকে আকর্ষণ করত। গাছের পাতায় যখন ঝিলমিল করত কিংবা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ত জ্যোৎস্না তখন আনন্দ আমাকে দুলিয়ে দিত ঢেউয়ে ঢেউয়ে। ঘরের বাইরে বেরুনো নিষেধ ছিল, তাই বাড়ির চৌহদ্দিতেই কাটত সারা বেলা। খেলা করে শুয়ে বসে। নানা ভাইয়ের কোঠাবাড়ির পেছনের দিকে থাকত এক বুড়ি। সেই বুড়ির বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি পেতাম কখনও সখনও। লোকে তাকে তেলওয়ালী বুড়ি বলতে ডাকত। সর্ষের তেল বিক্রি করত বলেই তার এই খেতাব জুটেছিল। বুড়ির গায়ের রং ছিল তেজপাতার মতো। তেলের সঙ্গে সঙ্গে পিঠাও বেচত সে। খুব ভোরবেলা, নানা ভাইয়ের আজান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর বুড়ির বাড়িতে মাঝে মাঝে পিঠা কিনতে যেতাম। নানি হয়তো তেল কিনতেন তার কাছ থেকে। তেলওয়ালী বুড়ির বাড়িতে বরই গাছ ছিল। টোপা বরই খাওয়ার লোভেও সেখানে আনাগোনা চলত আমাদের অর্থাৎ ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের। বুড়ি কোনও বাধা দিত না। দয়ার শরীর ছিল ওর। বুড়ির চমৎকার একটি অভ্যাস ছিল, এরকম সচরাচর দেখা যেত না। প্রতিদিন দুপুরবেলা খাওয়ার আগে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সে দু'মুঠো খাবার রেখে দিত কাকপক্ষীর জন্য। এই রেওয়াজ জারি ছিল বুড়ির মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। বুড়ি যেদিন মারা যায়, সেদিন নিশ্চয় কাকপক্ষী নিরাশ হয়ে, বহু ডাকাডাকি করে চলে যায়। তেলওয়ালি বুড়ির মৃত্যুর পরে ওর উঠোনে আমিও আর পা রাখিনি।

বুড়ির আসল নাম ঢাকা পড়ে গেছিল তেলওয়ালীর আড়ালে। ছেলেবেলায় ওর নাম জানার কোনও আগ্রহ জাগেনি আমার মনে। ওর নামই তেলওয়ালী, তখন এমন ধারণা ছিল আমার। কোনওদিন ভুলেও সন্ধেবেলা বুড়ির বাড়ি যাইনি। কে যেন বলেছিল, ওর বাড়িতে অতিকায় এক মোরগ আসে সন্ধ্যার পর। মোরগটি মাথা নাড়ালেই নাকি ভূমিকম্প হয়। ছেলেবেলায় কত ধরনের ভয় পেয়ে বসে আমাদের, যেমন ভূতপ্রেতের

ভয়, জিনপরির ভয়। নিশিডাকের কথা শুনেও গা শিরশির করত। বুড়ির বাড়ির মোরগটি যে নিছক বানানো গল্প, সন্ধ্যার পর আমাদের বাইরে বেরুতে না দেওয়ার ফন্দি, এটা বুঝতে অবশ্য বেশি দেরি হয়নি।

## ॥ দুই ॥

কোনও কোনও বাড়ি আছে, যার কথা কখনও ভোলা যায় না। সেসব বাড়ি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়তো নয়, আলিশান কিছু নয়, তবু ওরা বারবার জেগে ওঠে স্মৃতিতে। এমনি একটি বাড়ি মাহুৎটুলির হার্নি সাহেবের একতলা দালান। আমাদের পাশের বাড়ি। যার তার সাধ্য ছিল না গেট পেরিয়ে অন্দরে ঢোকার। দু'তিনটে ডাকাবুকো কুকুর ছিল, যাদের বলা যেতে পারে সতর্ক চৌকিদার। গেটে কেউ উঁকিঝুঁকি দিলে ওরা গর্জে উঠত, বাড়ির ভেতর পা বাড়ালে দাঁত নখ বসিয়ে দিতেও কসুর করত না। হার্নি সাহেবের বাড়িটিকে আমার খুব রহস্যময় মনে হত। যেন সে বাড়ির ছাদের কার্নিশ, দরজা, জানালা, বিবর্ণ দেয়াল থেকে অনেক প্রাচীন ছায়ার ফিসফাস শোনা যায়। সেখানে পা রাখলেই আগন্তুককে আলিঙ্গন করবে নানা কাহিনি। আমি শুধু একবার প্রবেশ করেছিলাম সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের বাসভবনে, ছেলেবেলায় তাঁর নাতি ওয়াজীর সৌজন্যে। ওয়াজী আমার চেয়ে দু'এক বছরের বড়ো ছিল। কিন্তু ওকে বেশ লম্বা দেখাত। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা না হলেও চোখে পড়ার মতো উজ্জ্বল। ইংরেজিতেই কথা বলত, কিন্তু আমার যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সে জন্য ভাঙাচোরা উর্দু মিশিয়ে দিতে ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে। ইংরেজি বাক্যের মর্মোদ্ধার করার মতো ইলেম আমি তখন হাসিল করিনি। ওয়াজীর মুখ থেকে বেরিয়ে অনেক শব্দই ছিল আমার বেগানা, আন্দাজে বোঝার চেষ্টা করতাম। তবে দু'টি বালকের আন্তরিকতার পথে ভাষা কোনও অন্তরায় হতে পারে না। ওয়াজী আর আমার মধ্যে সহমর্মিতার একটি সাঁকো তৈরি হয়ে গেল। সে আমাকে ওদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অনেকবার। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস হত না, গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই ওর সঙ্গে আলাপ করতাম। আসলে ওয়াজী কথা বলত বেশি, ভালোই করত; কারণ, আমার পক্ষে আলাপ চালানো ছিল মুশকিল। ইংরেজি বুঝি না, আর ওয়াজী জানে না বাংলা। টুটাফুটা ঢাকাইয়া উর্দু বলতে পারতাম, তা দিয়েই কোনওমতে কাজ চালিয়ে নিতাম। হার্নি সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার আমার লোভ ছিল ষোলোআনা, কিন্তু যমমুখো কুকুরগুলোর ভয়ে লোভের টুঁটি চেপে ধরতাম। লোভকে বেশি আশকারা দিতে নাই, এ বলে নিজেকে প্রবোধ দিতাম। কিন্তু একদিন ওয়াজী আমার বারণ উপেক্ষা করে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। আমাকে ওয়াজীর সঙ্গে দেখে কুকুরগুলো টুঁ শব্দটি করেনি। সেদিন ওদের শান্তশিষ্ট মনে হল, যদিও ভয়ে পাখির ছানার মতো থরথর করে কাঁপছিল মনের এক কোণে। অন্ধকার ঘর, অপরিচিত পরিবেশে। সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। গাউন-পরা মহিলা, মন উতল করা ঘ্রাণ আমাকে এক অচেনা জগতে নিয়ে গেল। মিস্টার হার্নি, যাকে অনেকে টমি সাহেব বলত, খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন বলা যাবে না। তাঁর সচ্ছলতায় দারিদ্র্য ছায়া ফেলতে শুরু

করেছে, যদিও সেই ছায়া গাঢ় হতে থাকে অনেক পরে, হার্নি সাহেবের মৃত্যুকালে। শেষের দিকে তিনি বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। হাঁটতে কষ্ট হত, তবু সাত-সকালে এবং বিকেলে জারি থেকে পানি ঢালতেন ফুলের গাছের গোড়ায়। তাঁর সেবাযত্নেই সেজে উঠেছিল বাগান। হার্নি সাহেব অসুখে কাবু হয়ে শয্যা নেওয়ার পর থেকে তাঁর সাজানো বাগান সাহেবের বংশধরদের মতোই উচ্ছন্নে গেল। কুষ্ঠরোগ কব্জা করেছিল হার্নি সাহেবকে। ছেলেবেলাতেই জানতে পেরেছিলাম যে, কুষ্ঠ একটি মারাত্মক ব্যাধি। কুষ্ঠরোগীর শরীর থেকে মাংস খসে পড়ে, হাত-পা, মুখ বিকৃত হয়ে যায়। মিস্টার হার্নির এই রোগ তাঁর এক ছেলেকেও ধরেছিল।

ওয়াজী আমাকে ঘরের ভেতর দাঁড় করিয়ে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না। দারুণ অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। একটু পরে ওয়াজী হাজির হল। ওর হাতে পিরিচ, পিরিচে এক টুকরো কেক। কেকের ঘ্রাণ চমৎকার, ভোজ্যবস্তুটির স্পর্শ রসনাকে রসসিক্ত করে তুলল। আরও খাব কি-না ওয়াজী জানতে চাইল। আমি সঙ্কোচবশত বললাম, 'না। সেদিন আমার 'না' হয়তো 'নো' হয়ে গেছিল হুড়মুড়িয়ে বলে ফেলার জন্য। ওয়াজীর দেওয়া সেই কেকের স্বাদ আজও আমার জিভের ডগায় লেগে আছে সুখস্মৃতির মতো। এই ঘটনার কয়েকদিন পর ওয়াজী কোলকাতায় চলে যায় লেখাপড়ার করার উদ্দেশ্যে। আর কোনওদিন ওয়াজীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে ওর কথা প্রায়শই মনে পড়ত। যখনই হার্নি সাহেবের পুরনো বাড়িতে চোখ পড়েছে তখনই আমার দৃষ্টি ভেসে উঠেছে একটি গৌরবর্ণ বালকের মুখ এবং একজোড়া পিঙ্গল চোখ। সেই মুখে বয়সের হিংসুক আঁচড় পড়েনি, জমেনি ঝোড়ো সময়ের ধুলো।

মাহুৎটুলির আরও তিনটি বাড়ির কথা বলব। আলীজান ব্যাপারী, পাঁচকড়ি মিয়া আর আরফানের মায়ের বাড়ি। আলীজান ব্যাপারী ছিলেন রাশভারী মানুষ। দেখতে ছোটোখাটো, কিন্তু বড়ো ব্যবসায়ী। তামাক আর সাবানের কারবার ছিল তাঁর। তবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন আরমানিটোলার সিতারা মসজিদের নিষ্ঠাবান সংস্কারক হিসাবে। দূর দেশ থেকে দামি পাথর আনিয়ে তিনি মসজিদটির শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। সৌন্দর্যের দিক থেকে সিতারা মসজিদ ঢাকার মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এটি বাংলাদেশের কারেন্সি নোটে স্থান পেয়েছে। আমার ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি এই মসজিদের সঙ্গে জড়িত। এর পাথরের সৌকর্য, ভেতরের ঈষৎ শীতলতা, হৌজের রঙিন মাছের চাঞ্চল্য, আব্বার হাত ধরে জুমা ও ইদের নামাজ পড়তে যাওয়া কখনও ভোলার নয়। তখনও কোনও সুরার সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এতে সুন্দর মসজিদটিতে যাওয়ার আনন্দ পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। আলীজান ব্যাপারীর বাড়ি ছিল তেলওয়ালীর বুড়ির বাড়ির লাগোয়া। বাইরে থেকে দেখেছি, ভিতরে যাইনি কোনওদিন। আলীজান ব্যাপারীর দালান অসামান্য ছিল না, নিজের বসতবাড়ির সৌকর্যবিধানে তিনি যত্নবান ছিলেন বলে মনে হয় না। আসলে তাঁর সমগ্র সৌন্দর্য চেতনা তিনি মসজিদটিকেই অর্পণ করেন। তাঁর নিজের বাড়ির সেকালের আর দশটি বাড়ির মতোই সাধারণ। কিন্তু অসাধারণ ছিল পাঁচকড়ি মিয়ার বাড়ি। না, শানদার কিছু নয়। বরং বলা যায় হতশ্রী, পাঁজর-বেরিয়ে-আসা ছোটো বাসগৃহ। তবে জীর্ণ বাড়িটি লতাপাতা, গাছপালা দিয়ে ঢাকা। পাঁচকড়ি মিয়ার

বাড়ি থেকে সবসময় একটা বুনো ঘ্রাণ ভেসে আসত। সেই এলাকায় প্রকৃতি শুধু পাঁচকড়ি মিয়াকেই তার ঔদার্য বিলিয়ে দিয়েছিল, বলা যায়। সেই লম্বা, গৌরবর্ণ বৃদ্ধ, যাঁর একটি পা গোদাক্রান্ত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতেন কি-না জানার কোনও উপায় ছিল না। হয়তো প্রকৃতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না, হয়তো তাঁর মনোযোগ ও যত্নের অভাবের দরুন সেখানে শ্রীমতি প্রকৃতি নিজস্ব বুনো রূপ বিস্তার করতে পেরেছিলেন। আর এতেই পাঁচকড়ি মিয়ার বাড়ি পেয়ে যায় অসামান্যতা। আলীজান ব্যাপারী এবং পাঁচকড়ি মিয়ার বাড়িতে প্রবেশ না করলেও আরফানের মায়ের বাড়িতে দু'তিনবার গেছি। একবার সে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল মাদকদ্রব্যের তালাশে। কান-কানে জানাজানি হয়ে গেছল যে তাঁরা কোকেনের কারবার করতেন। আমার মামা কামারুদ্দিন আহমদ বোধহয় সে বাড়ির কোকেন সেবন করতেন মাঝে-মধ্যে। তাঁর এই মাদকাসক্তির জন্য তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে। আরফানের দুই মেয়ে — মেগী এবং মেরী। মেগীর সঙ্গে আমার এক দূরসম্পর্কের ভাইয়ের বিয়ে হয়। মেগীর ছোটো বোন মেরীর দুর্বলতা ছিল আমার চাচাতো ভাই আফজালের প্রতি। আফজাল মেরীর সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া করেছিল কি-না জানতে পারিনি। মেয়েটি যৌবনের দোরগোড়ায় পৌঁছেই মারা যায়। ওর প্রতি আমি আকৃষ্ট হইনি, কিন্তু ওর মৃত্যুতে আমার বেশ মনোকষ্ট হয়েছিল। বহুদিন ওর বব-কাট চুল, বড়ো বড়ো চোখ, চঞ্চলতা, চটপটে ভঙ্গি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আরফানের মায়ের বাড়ির আরেকজনের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তাঁর নাম ইস্রাফিল। আম্মার মুখে তাঁর কথা শুনেছি বহুবার। আম্মার ভাষায়, তিনি ছিলেন একজন কামেল ফকির। সারাদিন কুয়ো থেকে পানি তুলে কুয়োতলায় ঢালতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস। এ জন্য কেউ তাঁকে কিছু বলত না। একদিন আরফানের মায়ের ছোটোভাই শফি রাগ করে ইস্রাফিল ফকিরের গালে কষে চড় লাগিয়ে দেন। ইস্রাফিল কিছু না করে শফির উদ্দেশ্যে বলেন, 'গু খা'। এর পরের ঘটনা বিস্ময়কর। শফি গায়ে লাল কুর্তা ও পাজামা চাপিয়ে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে চিমটের মতো কিছু নিয়ে পাড়াময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং মহল্লার দুষ্ট ছেলেরা তাঁর পিছু নিল। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার ফলে তিনি বিষ্ঠা মুখে তুলে নেন। আরফানের মা ভাইয়ের এই দুর্দশা দেখে ইস্রাফিলের কাছে মাফ চাইলেন। ক্ষমা পেতে বিলম্ব হয়নি; ভদ্রমহিলা এই ফকিরের খিদমত করতেন আন্তরিকভাবে। শফি আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমার একমাত্র মামা কামারুদ্দিনের হাত দেখানো হয় ইস্রাফিল ফকিরকে। নানি জানতে চান মামার লেখাপড়া হবে কি-না। তিনি হেসে বললেন, 'লেখাপড়া শিখে কী হবে? আমি লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু দেখ আমার হাতে কত পয়সা।' কামারুদ্দিন আহমদের লেখাপড়া হয়নি। লতিফা খালা হাত দেখালেন ইস্রাফিল ফকিরকে। ফকির বললেন, 'আকাশ লাল হয়ে ভয়ংকর ঝড় উঠবে।' তিনি আর কিছু বলেননি। এর দু'তিনদিন পরই গুটিবসন্ত হল খালাম্মার, তাঁর ছেলে ও মেয়ের। অবশ্য তাঁরা সেরে ওঠেন। পরে ইস্রাফিল ফকির ইন্তেকাল করেন বসন্ত রোগে। আম্মা এখনও বলেন কোকারামের কাহিনি। কোকারামকে আমিও দেখেছি। কোকারামের পরনে থাকত হাঁটুর উপর ময়লা ধুতি। গায়ের রং কালো। উদোম গায়েই তাঁকে বেশি দেখেছি। তিনি প্রথম আসতেন নানা ভাইয়ের কাছে, পরে আব্বার

কাছে তাঁর আসা-যাওয়া। নানা এবং আব্বা দু'জনই কোকারামকে সমীহ করতেন। কোকারাম এসেই বলতেন, 'ভাত দে, ভাত দে, লাইয়ের সালুন দিয়ে ভাত দে।' লাইয়ের সালুন মানে লাউয়ের তরকারি। লক্ষ করেছি, খুব বেশি লবণ খেতেন কোকারাম। একদিন কী এক খেয়ালে আমাদের বৈঠকখানার এক কোণে কোকারাম এক গোলা নুন রেখে দেন। আরেক দিন তিনি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন বৈঠকখানার মেঝেতে। সেদিন হয়তো ঘোরে প্রস্রাব করে ফেলেন। ইশকুল থেকে ফিরে এসে আমার বড়ো ভাই, খলিলুর রাহমান, প্রস্রাবের গন্ধ পেয়ে চট করে বলে ফেললেন, 'আব্বা যে কেন পাগল-ছাগলদের জায়গা দেন বুঝি না।' কোকারাম কাউকে কিছু না বলে চলে যান। আমার বড়ো ফাই খেলে-টেলে সন্ধ্যার পর ভাত খেতে বসেন। পানি খেতে গিয়ে পড়েন বিপাকে। কিছুতেই পানি গলা দিয়ে আর নীচে নামে না, নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আব্বা সব শুনে ছুটে গেলেন কোকারামের খোঁজে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসে বড়ো ভাইকে মাফ চাইতে বললেন আব্বা। আমার বড়ো ভাই সেরে উঠলেন কিছুক্ষণ পর এবং সেদিন কোকারাম সেই যে বিদায় নিলেন ৪৬ নম্বর মাহুৎটুলি থেকে, আর কোনওদিন ফিরে আসেননি। এই ঘটনার কথা আমার মনে নেই, যদিও কোকারামকে দেখেছি কয়েকবার। এসব কথা যুক্তিনিষ্ঠ মন বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু আম্মা বানিয়ে মিথ্যা কথা বলবেন, এটাও বিশ্বাস করি না। সাধে কি হ্যামলেট বলেছিলেন, There happen more things in heaven and earth. Horatio, than are dreamt it your philosphy.

## ॥ তিন ॥

আমি মানুষ হয়েছি সাহিত্যছুট পরিবেশে। আমাদের পরিবারে সংগীত ও চিত্রকলা সম্পর্কেও কারও কোনও আগ্রহ ছিল না। তবে ছেলেবেলায় ঢাকাই সংস্কৃতির কিছু ছোঁয়া পেয়েছিলাম। বহুবার কাওয়ালি ও মেরাসীনের গান শুনেছি। মেরাসীনের গান এক ধরনের মেয়েলি গীত যা পুরনো ঢাকায় এক সময় খুব শোনা যেত। মহিলার ছটি ঘরে চল্লিশ দিন কাটানোর পর সম্পন্ন ঘরে উৎসব হত, সেই উৎসবে মেরাসীনদের ডাকা হত, তারা কিছু টাকার বিনিময়ে গান গাইত ঢোল বাজিয়ে। বিয়ে-শাদিতেও মেরাসীনদের আসর বসত। কাওয়ালির জন্যে অবশ্য কোনও উপলক্ষের প্রয়োজন হতো না। গৃহস্বামীর ইচ্ছা হলেই কাওয়ালদের আগমন ঘটত বাড়িতে। কখনও কখনও মহল্লার সবাই মিলে কাওয়ালির আয়োজন করতেন। সারারাত ধরে জমজমাট আসরে কাওয়ালি গাওয়া হত। দু'দল কাওয়ালের মধ্যে চলত প্রতিযোগিতা। উৎসাহী শ্রোতারা মত্ত হয়ে টাকা ছুঁড়ে মারতেন কাওয়ালদের দিকে। আর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মহল্লায় মহল্লায় রঙ-বেরঙের ঘুড়ি ওড়ানোর ধুম পড়ে যেত। যদিও আমি নিজে ঘুড়ি ওড়াতে পারতাম না, তবু আসমানে ঘুড়ির মেলা দেখতে ভালো লাগত। লাটাইয়ের কারিগরিতে ঘুড়ির উপরের দিকে উঠে যাওয়া, গোত্তা খাওয়া দেখে খুশি হতাম। ভোকাট্টা ঘুড়ি ধরার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠত, কিন্তু আব্বা নারাজ হবেন ভেবে লগি নিয়ে বের হইনি কখনও।

মহল্লার ছেলেদের ঘুড়ি লুট করার নেশায় আমিও মাতাল হয়ে উঠতাম মনে মনে। কাটা ঘুড়ি ধরার লোভে কোনও কোনও দুরন্ত ছেলে এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফাতে বিপত্তি বাধিয়ে বসত। কারও কারও হাত-পা ভাঙত, কেউ কেউ বেঘোরে প্রাণও হারাত।

আগেই বলেছি, আমাদের বাড়িতে কারও সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল না। ইশকুলের পাঠ্যপুস্তক, কোরান শরীফ এবং 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়া অন্য কোনও বই আমার চোখে পড়েনি। তবে নীল রঙের 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি এক ঝলক দেখেছিলাম আম্মার কাঠের হাতবাক্সে। বড়ো হয়ে 'আনোয়ারা'র খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু তার কোনও হদিস পাইনি আর। আম্মার হাতবাক্স থেকে সেটি যে কীভাবে একদিন গায়েব হয়ে গেল, সে খবর আম্মাও রাখেনি। আব্বাকে কোরান শরীফ, বাংলা পঞ্জিকা এবং খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কিছু পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় যেসব বই পড়া উচিত ছিল সেগুলো পড়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম তখন। শুধু মনে পড়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' নামের চমৎকার বইটির কথা, যা আমার শৈশবের এক প্রিয় অংশ হয়ে হয়েছে। 'হাসিখুশি'র লেখা এবং ছবি কখনও ভোলার নয়। তেড়ে আসা অজগর এবং পাকা আমের স্মৃতি এতকাল পরও আমার মনে সজীব হয়ে আছে, ছেলেবেলার মতো। হারাধনের দশটি ছেলে একে একে হারিয়ে যাওয়ার পদ্য লিখে ছন্দের মজা পাইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার আমাদের অগোচরে অঙ্কের হিসাবও শিখিয়েছিলেন।

আমার ছেলেবেলায় সিগনেট প্রেসের মতো কোনও প্রকাশনালয় ছিল না। থাকলেও যে আমার আমার তেমন কোনও ফায়দা হত, মনে হয় না। বাংলা শিশু সাহিত্যের বেশ কিছু সেরা বই প্রকাশ করে ছোটদের সামনে এক বিস্ময়কর আনন্দভোজ সাজিয়ে দিয়েছে সিগনেট প্রেস। আমি ঈর্ষা করি আজকের ছেলেমেয়েদের, যাদের কাছে সহজলভ্য সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল', 'খাই খাই', 'হযবরল', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', 'ছোটদের রামায়ণ', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'রাজকাহিনী' ইত্যাদি বই। সেকালে সিগনেট প্রেস থাকলে আমার অভিভাবকরা কি সেসব বই কিনে দিতেন আমাকে? পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত কোনও কেতাব পড়ার রেওয়াজ যেখানে ছিল গরহাজির সেখানে ছোটোদের মন-কেড়ে-নেওয়া বই উপহার পাওয়া দুরাশার শামিল। বলা যায় না, হয়তো কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে 'হাসিখুশি'র মতোই অন্য কোনও বই আমার হাতে এসে যেত। তবে না আসার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। ক্লাসের বই ছাড়া অন্য কোনও বই পড়ার তাগিদ তখন আমার মধ্যে জোরদার ছিল না। তাগিদ দুর্বার হলে নিশ্চয় আব্বা-আম্মার কাছে বইয়ের জন্যে বায়না ধরতাম। আমার একটানা আবদারের কাছে হার মেনে আম্মা নিশ্চয় একটি কি দু'টি বই আনিয়ে দিতেন আমাকে। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর, নানা বাহানায় আম্মার কাছ থেকে টাকা আদায় করে প্রচুর বই কিনেছি। আব্বার কাছে ঘেঁষতে সাহস হত না; তাই আমার আবদার মেটাতে হত আম্মাকেই। মাঝে-মধ্যে তিনি প্রশ্ন করতেন, 'এত বই কি সত্যি-সত্যি তোর খুব দরকার?' আমি লোভী বালকের মতো জবাব দিতাম, 'আম্মা,

আমার আরও বই চাই।' বইয়ের চাহিদা আজও আমার মেটেনি, কোনওদিন মিটবে বলেও মনে হয় না।

ছেলেবেলায় একা একা বাইরে বের হওয়ার হুকুম ছিল না। কেউ আমাকে বইয়ের দোকানেও নিয়ে যেত না যে নিজের পছন্দমাফিক বই কিনে দেব। যখন ইশকুলে ভর্তি হলাম সাত বছর বয়সে তখন অবশ্য এজাজাৎ পাওয়া গেল বাইরে বের হবার কোনও এসক্যর্‌ট ছাড়াই। কিন্তু তখন কোনও বইয়ের দোকানে যাওয়ার তাগিদ বোধ করিনি। ক্লাসের বইপত্র নিয়েই বলা যেতে পারে সন্তুষ্ট ছিলাম। ফলে সেই বয়সে আমার মানস যেভাবে গঠিত হওয়া উচিত ছিল, সেরকম হয়নি। একটি সীমিত গন্ডির ভেতর আটকা পড়ে রইল আমার মন। ঘরেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিতাম। জানালা দিয়ে দেখতাম পাঁচকড়ি মিয়ার গাছপালাময় পুরনো বাড়ি, খুব কাছের পুকুর এবং একজন দর্জির কর্মচাঞ্চল্য। দর্জি নিজের বাড়িতে বসে কাজ করত। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করত। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, বড়োরাও গোসল করত। সবাই নয়, কেউ কেউ। রোজ সন্ধেবেলা একজন বাতিঅলা এসে বাতি জ্বালিয়ে যেত গলির মোড়ে। তখন বিজলি বাতি আসেনি। না রাস্তায়, না আমাদের মহল্লায়। ছোটোখাটো এক লোক, মুখে গোঁফ, পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, মাথায় কাপড়ের টুপি, কাত করে পরা, টুপির কিনারা তেল চিটচিটে, কাঁধে মই। লোকটাকে মনে হত কোনও ঐন্দ্রজালিকের মতো, অন্ধকারে আলো ফোটানো যার মনোমুগ্ধকর এক খেলা। প্রায় রোজ সন্ধে হবার আগে মনে পড়ে, সেই বাতিঅলার পথ চেয়ে থাকতাম তার বাতি জ্বালানোর খেলা দেখার জন্যে। যদি কোনও কারণে সে অনুপস্থিত থাকত, আমাদের গলির কপালে একরত্তি আলোও জুটত না। গলিটা মুখ গোমড়া করে ডুবে থাকত ছমছমে অন্ধকারে। রাতে আলীজান ব্যাপারী যখন মজবুত পাম্পসুর গট গট শব্দ করে বাড়ি ফিরতেন, তখন গলির অন্ধকার আরও বেশি গাঢ় মনে হত। দেখতাম মিস্টার হার্নির বাড়ির দেয়ালের ওপারে দাঁড়ানো তুত গাছটিকে, ইংরেজ সাহেবের ফুল গাছগুলোর বাহারও আমার নজর কাড়ত। কোনও কোনও উদাস দুপুরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশে চিলের চক্কর কাটা দেখতাম, কানে ভেসে আসত চিলের ডাক। নানা খুঁটিনাটি দৃশ্য দেখেছি দু' চোখ ভরে। আস্তাবলে সহিসের অশ্বসেবা, বাখরখানির দোকানে রুটিঅলার তন্দুরে রুটি-সেঁকা, নিজাম ভিস্তির পানিভরা মশক, ঘূর্ণিঝড়ে মৃত পশুর ঢোসকা হয়ে ফুটে ওঠা পেটের মতো — এসব দৃশ্য আজও মনে গেঁথে আছে। আমার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিধ্বস্ত নীলিমা' যাঁরা পড়েছেন তাঁদের হয়তো মনে পড়বে 'শৈশবের বাতিঅলা আমাকে! কবিতাটি। এই কবিতার উৎস আমার ছেলেবেলার সেই বাতিঅলা, যার প্রতীক্ষায় থাকতাম গোধূলি বেলায়। শৈশবের স্মৃতিগুলো সম্ভবত এভাবেই চিরদিন একজন কবিকে কবিতার উপাদান যুগিয়ে চলে, কী এক আলোড়নে উঠে আসে মনের অবচেতন এলাকা থেকে। কখনও কখনও অচেতন অঞ্চলের দানও পেয়ে যান কবি।

সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম খোলা ছাদে। মাথার উপর মুক্ত আকাশ। আকাশে মেঘ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, পাখি, ঘুড়ির মওশুমে ঘুড়ি। আকাশে আবিষ্কার করতাম নানা ধরনের গাছগাছালি, রূপকথার অপরূপ রাজকন্যার মুখ, কখনও কখনও পাশাবতীর

চেহারা ফুটে উঠত, কখনও বা ঘোড়সওয়ারের ছবি আর হার্নি সাহেবের বাগানের ফুলগুলোর চাইতেও সুন্দর কত ফুল। মোট কথা, এক বিস্ময়কর আসমানি বাগিচা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। পড়ার টেবিল থেকে ছুটি পেলেই ছুটে যেতাম ছাদে। মাহুৎটুলির ছাদ আমার শৈশব, কৈশোর ও আদি যৌবনের অনেক ভাবনা, স্বপ্ন ও স্মৃতির ছাপ বহন করছে। হায়, আজ আর সেখানে যাওয়ার উপায় নেই — এ কথা ভাবতেও খারাপ লাগে। মনের ভেতর রৌদ্র-জ্যোৎস্না, গাছের সবুজ পাতা, পুকুরের ঘোলা পানি, অনেক ছায়া ছায়া মুখ, উড্ডয়ন প্রিয় পাখি ভিড় করে আসে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির ফিসফিসানি ভেসে আসে কানে।

সেকালে পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত কোনও বই পড়ি নি সত্য, কিন্তু চোখের দেখা দেখেছি অনেক। একটি কথা ভুল বলা হয়ে গেল। মীর মশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু', হ্যাঁ ঐ একটিমাত্র বই, যা ইশকুলের পাঠ্যতালিকায় ছিল না, ছেলেবেলায় পড়েছি। শুধু আমি নিজেই পড়িনি, মাঝে মাঝে আমার নানিকেও পড়ে শুনিয়েছি। আমার নানির অক্ষরজ্ঞান ছিল না। পাঠকের অবশ্য অক্ষরজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভাষাজ্ঞান তেমন প্রখর ছিল না। 'বিষাদ সিন্ধু' যে ভাষায় রচিত, তার কিছু কিছু পাঠকটি আন্দাজ করে নিত। পড়তে তার তেমন অসুবিধা হত না। ঈষৎ-শিক্ষিত পাঠকের অদম্য পাঠস্পৃহা এবং নিরক্ষর শ্রবণকারিণীর অবিচল কৌতূহল এই পাঠপর্বকে কায়েম রেখেছিল সাফল্যের সঙ্গে। আমার নানি কী করে যে অমন ধৈর্য ভরে আমার পড়া শুনতেন তা ভেবে আজও আমি বিস্ময় বোধ করি। মীর মোশাররফ হোসেনের সেই প্রায় বঙ্কিমী স্টাইলের বাংলা তাঁর বোঝার কথা নয়। কিন্তু তাঁর মুখে কখনও বুঝতে না পারার অভিব্যক্তি লক্ষ করিনি। এক ধরনের অশিক্ষিত পটুত্ব তাঁর সহায় ছিল, অনুমান করি। কিংবা এমনও হতে পারে, নানি 'বিষাদ সিন্ধু'কে কস্মিনকালেও কোনও উপন্যাস জ্ঞান করেননি, একটি ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য উপন্যাস কী বস্তু তা নাবালক পাঠক এবং বয়সিনী শ্রবণকারিণী — কারওরই বোধগম্য ছিল না। তখন আমি নিজেও বইটিকে মনে মনে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছিলাম। সেই বইয়ে লেখা সবকিছুকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। ছেলেবেলায় 'বিষাদ সিন্ধু' একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু এই কিঞ্চিৎ মলিন এবং ক্ষতময় বইটিও হঠাৎ একদিন আম্মার লুকানো 'আনোয়ারা'র মতোই লাপাত্তা হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'বিষাদ সিন্ধু' আর পড়া হয়ে ওঠেনি; এখনও সেই আবছা পাঠস্মৃতি নিয়ে আছি। বেঁচে থাকলে, হয়তো ভবিষ্যতে অন্তত আরও একবার পড়ব। আজও মনের চোখে দেখতে পাই আমি জোরে জোরে 'বিষাদ সিন্ধু'র অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যাচ্ছি আর তন্ময় হয়ে শুনছেন আমার নানি। তাঁর ধৈর্যে এতটুকু চিড় ধরছে না। তাঁর বড় বড় দু'টি চোখ তাকিয়ে রয়েছে বালক বয়সী এক পাঠকের দিকে। সত্যি বলতে কী, আমার বাল্যকাল, আমার নানি এবং মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' একাকার হয়ে গেছে।

আমি ১৯৩৬ সালে, সাত বছর বয়সে, দাখিল হই প্রাচীন পোগজ ইশকুলে ক্লাস টু'তে। তখন পোগজ ইশকুলে ক্লাস ওয়ান ছিল না। ইশকুলে ভর্তি হবার জন্যে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। দাখিলী পরীক্ষায় সফল হতে বেগ পেতে হয়নি। কলেজিয়েট কিংবা

বাড়ির কাছের আরমানিটোলা ইশকুলে আমাকে ভর্তি করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আব্বা পোগজ ইশকুলের ছাত্র ছিলেন বলেই হয়তো আমাকে সেখানে ঠাঁই নিতে হল বিদ্যার্জনের জন্য। একদা এই বিদ্যালয়ের প্রচুর নামডাক ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলির অন্যতম পোগজ ইশকুল। এর সুনাম উনিশ শতক পেরিয়ে এই শতকেও বহাল রয়েছে। আগেকার তুলনায় এর খ্যাতি এখন কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ সত্য, কিন্তু অনেক প্রবীণ ব্যক্তি আজও এই বিদ্যালয়ের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। পোগজ ইশকুল স্থাপিত হয় ১২ জুন ১৮৪৮ সালে। স্থাপন করে আরমানি জমিদার এবং ব্যবসায়ী নিকি পোগজ। নিকি পোগজ কবে ঢাকায় এসেছিলেন কিংবা তিনি কোথায় ভূমিষ্ঠ হন তা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। কেউ সেই মুশকিল আসান করে দেবেন বলেও মনে হয় না। ১৮৭০ সালে মারা যান। মারা যাবার আগে তিনি লন্ডনে পাড়ি জমান। তাঁর মৃত্যু-সাল বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন। নিকি পোগজের মৃত্যুর বছরটি দাঁড়িয়ে আছে অনুমানের উপর। এটা অনুমানের ব্যাপার হলেও তাঁর সমাজসেবামূলক কীর্তিগুলি কিন্তু অনুমানভিত্তিক নয়। নিকি পোগজের নাম ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। কিন্তু তিনি জনস্মৃতিতে বেঁচে আছেন পোগজ ইশকুলের জন্যে। তিনি শুধু এই ইশকুলের প্রতিষ্ঠাতাই নন, এর প্রথম হেডমাস্টারও বটে। ইংরেজি এবং বাংলা দু'টো ভাষাতেই দখল ছিল তাঁর। গোড়ার দিকে পোগজ ইশকুলের ক্লাস বসত তাঁর নিজের বাসায়। বেশ কিছু বছর পর বর্তমান জায়গায় পোগজ ইশকুল ঠাঁই করে নেয়। এখন একটি স্যান্ডুইচের মতো এই বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে রয়েছে জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাখারিবাজারের মাঝখানে।

ইশকুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনই নিকি পোগজের তৈলচিত্রটি দেখি। আজও সেই বিদ্যালয়ের পুরনো দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সেই ছবি। আরও একটি তৈলচিত্র রয়েছে হেডমাস্টারের ঘরে। সেটি স্বর্গত প্রসন্নকুমার সেনের। তাঁকেই পোগজ ইশকুলের হেডমাস্টার হিসাবে পাই ১৯৩৬ সালে, যখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। রাশভারি মানুষ ছিলেন তিনি, ফর্সা গায়ের রং, মুখে জাঁদরেল গোঁফ, তাঁকে দেখলেই মনে সমীহ জাগ্রত হত। তাঁকে ভয় পেতাম, তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস হত না। তিনি শুধু ক্লাস টেনের ছাত্রদের পড়াতেন, তাই তাঁর মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। আমি যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, তখন তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হি ডাইড উইথ হিজ বুটস অন', ঠিক তাই ঘটেছিল আমাদের প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেছে। না, তিনি যুদ্ধে যোগদান করেননি, বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। ইশকুলে কাজ করার কালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের ইংল্যান্ডের ইতিহাস বইয়ের লেখক শ্রী যোগেশ চন্দ্র সেন মাত্র কয়েক মাসের জন্য হেডমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন।

তারপর এলেন শ্রী মনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি শ্রী প্রসন্নকুমার সেনের চেয়ে আলাদা ছিলেন চলনে-বলনে। তাঁকে দেখলে অত ভয় পেতাম না; কারণ তাঁর ঠোঁটে কখনও কখনও হালকা হাসি খেলে যেত। তিনি খোশমেজাজী, এ কথা বলা যাবে না। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র ভট্টাচার্য মাঝেমধ্যে আমাদের পড়াতেন, যখন আমরা ক্লাস টেনের ছাত্র। তিনি

আমাদের পড়াতেন, ইংরেজি, বাংলা এবং অংক। ক্লাস নাইনে ইংরেজি পড়াতেন শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সোম। তিনি এমন চমৎকার পড়াতেন যে ব্যাকরণের মতো নীরস বিষয়ও সরস গল্প বলে মনে হত আমার কাছে। তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছি এবং এই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করেছি। হয়তো তিনি আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আজও মরেনি, কোনওদিন মরবে না। আরও একজন শিক্ষকের কথা খুব মনে পড়ে। শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার গাঙ্গুলী আমাদের 'গল্পগুচ্ছ' পড়াতেন। তাঁর হাতেই প্রথম দেখেছিলাম বার্ষিক 'শিশুসাথী'। তিনি 'শিশুসাথী'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

একজন জ্বলজ্যান্ত লেখককে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমি মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের কথা বলছি। তিনি আব্বার বন্ধু ছিলেন। আব্বা তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুটির কোনও রচনা কখনও পাঠ করেছেন বলে আমার মনে হয়নি। আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন একটি কি দুটি উপন্যাস লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন একটি উর্দু উপন্যাস। উপন্যাসটির নাম 'খুন আওর আঁসু', আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন নাম রেখেছিলেন 'রক্ত ও অশ্রু'। আজ কেউ তাঁকে মনে রেখেছেন কি-না জানি না। তিনি বাবুর বাজারে একটি প্রেসে থাকতেন। প্রেসটির নাম, যতদূর মনে পড়ে, ছিল 'দ্য মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস'। কবি ও ছন্দশাস্ত্রী আবদুল কাদিরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর কাছে শুনেছি, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন 'শিখা' পত্রিকাটির সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন যক্ষ্মারোগে মারা যান।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের সঙ্গে বিনয়কুমার গাঙ্গুলীর আরেকটি জায়গায় মিল ছিল। তাঁরা দু'জনই বড়ো বেশি পান খেতেন। প্রায় সারাক্ষণই তাঁদের মুখের ভেতর পানই থাকত। বিনয় স্যার হাসিখুশি মানুষ ছিলেন, কথা বলতেন সুরসিকের মতো, শুনতে ভালো লাগত। পড়াতেন মজা করে। তাঁর ক্লাস থেকে 'বিরক্তি' শব্দটি ছিল নির্বাসিত। ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষায় আমি যে-প্রবন্ধটি রচনা করি সেটির অকৃপণ প্রশংসা করেন বিনয় স্যার। বাংলা সেকেন্ড পেপারে আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম। 'এক টুকরো কয়লার আত্মকাহিনী' লিখে নজর কেড়েছিলাম অনেকের। টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজি সেকেন্ড পেপারে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাই, যদিও ফার্স্ট পেপারে আমার নম্বর ছিল চার পাঁচজনের নম্বরের চেয়ে কম। অসুস্থ ছিলাম বলে টেস্টে সব পরীক্ষা দিতে পারিনি। তবে বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় টেস্টে উৎরে যাই। 'দুর্ভিক্ষ' বিষয়ক আমার প্রবন্ধটি পড়ে মনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এত খুশি হন যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। দেখি, তাঁর টেবিলের উপর আমার পরীক্ষার খাতা। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটির কোনও কোনও জায়গা পড়ে তিনি তারিফ করলেন। তখনই বুঝেছিলাম, আমি টেস্টে অ্যালাউড হয়ে যাব।

পোগজ ইশকুলে সহপাঠী হিসাবে পেয়েছিলাম আবু তাহের, বিমল, সুবিমল, অনিল, সুনীল, শিশির, নীহার, সূর্যকিশোর, আশরাফ, সুজা, নিরঞ্জন এবং আরও অনেককে। আমাদের ইশকুলের মোট আট শ' ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র দশজনের বেশি ছিল না, বাকি সবাই হিন্দু। মুসলমান ছাত্রদের প্রতি অবহেলার কিছু পরিচয় পাওয়া যেত টিফিন ঘরের ব্যবস্থাপনায়। আমাদের পানির অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসটি রাখা হতো জলখাবার

ঘরের বাইরে কিছুটা অযত্নে। হিন্দু ছাত্রদের জন্যে ছিল অনেক পিতলের গ্লাস আর সেগুলো থাকত ঘরের ভেতর। কোনও কোনও শিক্ষকের আচরণে সাম্প্রদায়িকতা ফুটে উঠত, লক্ষ করেছি। শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ তপাদার সেই দু'তিনজনের অন্যতম। অন্য শিক্ষকদের স্নেহ এই সামান্য মালিন্যকে মুছে ফেলত নিমেষে। চিন্তাহরণ সোম আমার প্রতি ছিলেন এতই স্নেহশীল যে আমার কয়েকজন সতীর্থ আমাকে চিন্তাহরণবাবুর জামাই বলে ডাকত। কোনও কোনও হিন্দু ছাত্র রাগান্বিত হলে আমাকে নেড়ে বলে ডাকত। এজন্য একদিন আমিও ক্রুদ্ধ হয়ে একজনের সঙ্গে মারপিট করেছিলাম, ঘুষি মেরে রক্ত বের করে দিয়েছিলাম ওর মুখ থেকে। সে, বোধহয় ওর নাম বিজয়, ক্লাসটিচারের কাছে নালিশ করে আমার বিরুদ্ধে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। ক্লাশটিচার যখন জিজ্ঞেস করলেন ওকে কেন মেরেছি, আমি নির্ভয়ে কারণটি উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে কিছুই বললেন না, বিজয়কে শাস্তি দিলেন। এসব কারণেই সাম্প্রদায়িকতা আমাকে কখনও স্পর্শ করেনি।

অসাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা পেয়েছি আব্বার কাছে। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমাদের সামনে বড়ো করে তুলে ধরেননি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সবাই যে একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এটা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারাটাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য। এই বিবেচনা তাঁর মনে গ্রন্থপাঠের ফলে গড়ে ওঠেনি; কেননা, তিনি বেশি পড়াশোনা করেননি। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাঁর বড়ো ভাই ফী পাঠাননি বলে আব্বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হন। তাঁর পড়াশোনা ইশকুলের পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল। জ্ঞানার্জনের অনুসন্ধিৎসাও তাঁর মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। তা' বলে মনুষ্যত্ব অর্জনে তিনি অনেকের চাইতে অগ্রগামী ছিলেন অনেকখানি। 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' — চণ্ডীদাসের এই বাণীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন কি-না বলতে পারব না, তবে সেই বাণীকেই জীবনে ধ্রুব বলে জেনেছিলেন। হয়তো জীবন তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিল।

তাঁর এই অসামান্য অর্জন তাঁর সন্তানদের উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। আমরা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখেছি বহুবার, মানসিকভাবে পীড়িত বোধ করেছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতা ও মালিন্য আমাদের মনুষ্যত্বকে কলুষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যাঁকে আমাদের গ্রামে কৈবর্তদের প্রাণরক্ষার জন্যে একা বন্দুক হাতে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখেছি, যাঁকে দেখেছি আমাদের প্রেসের হিন্দু ম্যানেজারকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে মাসের পর মাস, তাঁর এই জীবনচর্যাই আমাদের বিভ্রান্ত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয়নি। আব্বার এই শিক্ষার ফলেই আমি কখনও আবু তাহের এবং সূর্যকিশোরের মধ্যে কোনও প্রভেদ খুঁজে পাইনি, একমাত্র তাদের দুজনের চেহারার পার্থক্য ছাড়া। দু'জনের প্রতিই ছিল আমার সমপরিমাণ টান। কখনও কখনও সূর্যকিশোরের জন্যেই বেশি মন কেমন করত। ছুটে যেতাম ওদের বেচারাম দেউড়ির বাসায়, সেও চলে আসত আমাদের মাহুৎটুলীর বাসায়। সূর্যকিশোরের পড়াশোনায় মন ছিল না, পরীক্ষায় সে ভালো নম্বর পেত না; পক্ষান্তরে আবু তাহের ক্লাসের সেরা ছাত্রদের অন্যতম, সবসময় ভালো ফল

প্রত্যাশী। সূর্যকিশোর পরীক্ষায় ভালো না করুক, কিন্তু ব্লেড ভক্ষণে তার পারদর্শিতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। অবলীলাক্রমে সে একটা আস্ত চকচকে ব্লেড চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। কেরোসন খাওয়ার অভ্যাসও ছিল ওর। সূর্যকিশোরই আমাকে ইশকুলের সরস্বতী পূজা দেখতে নিয়ে যায়। নইলে হয়তো ছেলেবেলায় সরস্বতী পূজা আমার দেখাই হত না। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আমি একাই সেদিন স্কুলপ্রাঙ্গণে। আর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে গরহাজির ছিলেন মৌলভী সাহেব।

ইশকুল প্রাঙ্গাণ শব্দটি লেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে এখানেই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ১৮৭৩ সালে একটি নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এখানেই তিনি তাঁর ঢাকা বিষয়ক সনেটটি আবৃত্তি করেন মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে। চতুর্দশপদীটির প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি হল :

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি,
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রানী।

স্বামী বিবেকানন্দের পদচ্ছাপ পড়েছিল পোগজ ইশকুল প্রাঙ্গাণে। তিনি ১৯০১ সালে এখানে প্রায় তিন হাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে ধর্ম সম্পর্কে দুই ঘন্টা জুড়ে এক বক্তৃতা দেন। একদা পোগজ ইশকুল প্রাঙ্গাণে বেজে উঠেছিল মধুসূদন ও বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, একথা ভাবতেও ভালো লাগে। আমার বিদ্যালয়ের জন্য গর্বে মাথা উঁচু হয়ে যায়। এ দেশের কত কীর্তিমান ব্যক্তির পদচিহ্ন পড়েছে এই বিদ্যালয়ের মাঠে, ক্লাসে, দোতলায় ওঠার নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িতে, প্রধান শিক্ষকের ঘরে।

## ॥ চার ॥

ছেলেবেলায়, যখন আমি স্কুলের ছাত্র, আমার নান্দনিক ক্ষুধা মিটিয়েছি সস্তা ছবি। পোগজ ইশকুলে যেতে হত বাবুর বাজার অতিক্রম করে। আরেকটি সহজ পথ ছিল, যেতে সময়ও কম লাগত। জিন্দাবাহার লেন পেরিয়ে; ইসলামপুর হয়ে শাঁখারি বাজারের ভেতর দিয়ে পোগজ স্কুলে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই বেছে নিতাম বাবুর বাজারের পথ। কারণ বাবুর বাজারে কয়েকটি ছবির দোকান ছিল। সেসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ছবি দেখা যেত। তেমনি একটি দোকানে দেখেছিলাম দুলদুলের ছবি। কাঁচের আড়ালে তিরবিদ্ধ রঙিন দুলদুল। 'বিষাদ সিন্ধু' পড়া ছিল বলে ইমাম হোসেনের ঘোড়া দুলদুল ছিল আমার চেনা। এখন বুঝি সেই ছবি ছিল খুবই সাধারণ, শিল্পের 'শ'টুকু তাতে ছিল না। কিন্তু তখন ইশকুলে যাওয়ার পথে কতদিন সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছি ঘন্টার পর ঘন্টা। দুলদুলের ছবিটি কিনতে পয়সা জোগাড় করা তখন সহজ ছিল না। জানি, আম্মার কাছে চাইলে পেয়ে যেতাম। কিন্তু কেন জানি মনে-মনে স্থির করে ফেললাম, আমার টিফিনের পয়সা জমিয়ে দুলদুলের ছবি কিনব। কিন্তু টিফিনের পয়সা আর জমে না। রোজ এক পয়সা পেতাম টিফিনের

জন্যে। হয়তো কিছু পয়সা জমত, কিন্তু মাঝে মাঝে পেয়ারা কিংবা বরই খাওয়ার লোভ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ত। ফলে অনেকগুলো পয়সা মিলে চার আনা আর হত না। দোকানের ছবি দোকানেই ঝুলত, শূন্যহাতে ফিরে আসতাম বাড়িতে। এক পয়সা দু'পয়সা করে একদিন জমিয়ে ফেললাম চার আনা এবং সেদিনই কেনা হয়ে গেল আমার ছেলেবেলার প্রথম সম্পত্তি — রক্তাক্ত দুলদুল। দুলদুলকে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে অপরিসীম আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই ছবি অনেকদিন ছিল আমাদের ঘরে। কবে যে সেটি দেয়াল থেকে অপসৃত হল, বলতে পারব না। তার হদিস আর মেলেনি। দুলদুলের ছবি হারিয়ে যাওয়ায় আমার খেদ হয়েছিল সত্য, কিন্তু পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়নি সেদিন। বলা যাবে না, কোনও অভাববোধ আমাকে পীড়িত করেছিল।

যে দোকান থেকে দুলদুল কিনেছিলাম তার কাছে ছিল আরেকটি ছবির দোকান। সেটি অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং ছবিবহুল। দেবদেবীর ছবি; সরস্বতী ছাড়া অন্য কাউকে শনাক্ত করা আমার পক্ষে মুশকিল ছিল, বড়োজোর শিবকে চিনতাম তার গলায় সাপ এবং কপালে চাঁদের জন্যে, এক ধরনের আকর্ষণও বোধ করতাম। কিন্তু সেটি কেনার দুর্মর বাসনা জাগেনি। তা'ছাড়া ছবিটা ছিল বৃহদায়তন। আমার ক্রয়ক্ষমতার অনেক বাইরে। কিনতে পারলেও শিবের ছবি হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব হত না। আমার প্রবেশ নির্বিঘ্ন হলেও মহাদেবের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে সওয়াল জবাব হত তা প্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। দেবদেবীর ছবির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ছবিও ছিল নিশ্চয়, কিন্তু আমি তখন এরকমই অর্বাচীন ছিলাম যে কে গোবিন্দ এবং কে রবীন্দ্র তা বলতে পারা আমার পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না, যেমন ছিল না জটিল অঙ্ক কষা। বলতে খারাপ লাগছে, তখন রবীন্দ্রনাথের কোনও অস্তিত্বই ছিল না আমার কাছে। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কবিতা পড়েছি সত্য, কিন্তু বাংলার কবি সার্বভৌমের মহিমা বিষয়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অসচেতন। কাকে বলে কাব্য এবং কাকে কবি, এই ধারণাই ছিল না আমার, ক্লাসের পড়া তৈরি করা সত্ত্বেও কবিতার শিরোনামের নীচে কবির নাম মুদ্রিত থাকা সত্ত্বেও। কোনও কোনও কবিতা পড়ে আন্দোলিতও হয়েছি, কিন্তু সেসব কবিতা ও কবির নাম আজ আর মনে নেই। কবির নাম তখনও মনে রাখার ব্যাপারে ছিলাম নিশ্চেষ্ট। শুধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্ন মুকুল' কবিতাটির কথা মনে পড়ে। আমার জীবনের প্রথম লেখাটির সঙ্গে — ঠিক লেখা বলা যাবে না — 'ছিন্ন মুকুল'-এর একটি যোগসূত্র রয়েছে।

তখন আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বছরের শেষের দিকে আমার ছোটো বোন নেহার এবং ছোটো ভাই রফিক, পরে যে ব্যারিস্টার তোফায়ালুর রাহমান হিসাবে পরিচিত হয়েছে, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। রফিক বেঁচে গেল, কিন্তু নেহারের মৃত্যু হল এক দুপুরে। আমি স্কুলে ছিলাম। আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করেনি, ডেকেও নিয়ে যায়নি। বসন্ত যাকে দংশন করে তার লাশ বেশিক্ষণ ঘরে রাখা যায় না। বুঝি তাই তাড়াহুড়ো করে নেহারকে কবর দেয়া হয় আজিমপুর গোরস্তানে। নেহারের মৃত্যু আমাকে খুব বিচলিত করে। শীতবিকালে স্কুল থেকে ফিরে এসে সব শুনে বুক ঠেলে উঠে-আসা কান্না থামাতে পারিনি অনেকক্ষণ। নেহার দেখতে ছিল ফুটফুটে, সুন্দর। বসন্তের হিংস্র

আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে একটি কলি। নেহারের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, যখন শোক অতীব্র, ওকে নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি গদ্য-রচনা লিখে ফেললাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্ন মুকুল'-এর ছায়ায়। সংসারে যে ছিল সবচেয়ে ছোটো, সে-ই সবার আগে চলে গেল, এই বেদনা প্রকাশ করার ব্যাকুলতা থেকেই গদ্য-রচনাটির জন্ম। কী লিখেছিলাম তা আজ আর মনে নেই, অমন তুচ্ছ লেখা মনে রাখবার কথাও নয়। আমার বাল্য বয়সের সেই নাবালক, অসমর্থ রচনাকে কিছুতেই কোনও সাহিত্য-প্রয়াস বলে চিহ্নিত করা যাবে না। যে বালক সাহিত্য কী তা-ই জানে না সে কী করে সাহিত্য রচনায় হবে চেষ্টাশীল? প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল শোকার্ত বালকের কাছে তার অন্তর্গত সত্তার পত্র লেখা। আমি আবার নির্বোধের মতো সেই লেখা আম্মাকে পড়ে শোনালাম। আমার এই নির্বুদ্ধিতা তাঁকে খুব কাঁদাল। সেই মুহূর্তে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল।

এরপর অনেক বছর পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া আর কিছুই লিখিনি। এমনকি চিঠিপত্রও নয়। কাকেই বা লিখব? নিজের সঙ্গে পত্রালাপ করার স্পৃহাও ছিল লুপ্ত, কখনও কখনও মনে-মনে কথা বলেছি, কিন্তু সেগুলো কাগজে জড়ো করার বাসনা অদমনীয় হয়ে ওঠেনি একবারও। তাই, যখন পড়ি, স্কুলে নিম্নশ্রেণিতে পড়ার সময় অর্থাৎ বালককালে কোনও কোনও লেখক অনেক বই পড়েছেন, রীতিমতো লেখা শুরু করে দিয়েছেন, তখন নিজের পশ্চাৎপদতা আমাকে লজ্জিত করে। আমি তো সাত-আট বছর বয়সে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিবদ্ধ কিছু রচনা ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের কিছুই পড়িনি। পরবর্তীকালে এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টাশীল হয়েছি, নিজ উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরির সদস্য হয়েছি। কিন্তু কোনও ক্ষতিরই পূরণ হয় না শেষপর্যন্ত।

বাবুর বাজারের আরেকটি ছবির দোকানের কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না। সে দোকানে প্রথম একজন শিল্পীকে দেখেছিলাম। শিল্পীর নাম নঈম মিঞা, খাস ঢাকার বাসিন্দা। না, তাঁর নাম আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসের কোনও পাতার ফুটনোটেও পাওয়া যাবে না। তিনি তুলি দিয়ে কাঁচের উপর ছবি আঁকতেন, লিখতেন 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে', 'আজ নগদ কাল বাকি', 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবে না', জাতীয় কিছু কথা। সেই কথাগুলোর জন্য নয়, নঈম মিঞার আঁকা নদী, নৌকো, পাখি, গাছ-গাছালি দেখার জন্যে দাঁড়াতাম দোকানটির সামনে। নঈম মিঞার মধ্যে একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল। লম্বাটে মুখ, মাথায় ঘন-লম্বা চুল, গালভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে সাদা শার্ট আর পাজামা। বারবার চা খেতেন তিনি। একদিন শিল্পী আমাকে কাছে ডাকলেন, কথা বললেন কিছুক্ষণ। আমি তাঁর শাগরেদ হওয়ার খায়েশ প্রকাশ করলাম। তিনি খুশি হননি, আঁচ করতে পেরেছিলাম। তবে আমাকে আশ্বস্ত করলেন ছবি আঁকা শেখানোর ওয়াদা করে। আমি কয়েকদিন গেলাম তাঁর কাছে, তিনি তালিম দিতেও শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাশতে কাশতে — প্রায়ই খুক খুক করে কাশতেন নঈম মিঞা — রুক্ষ স্বরে আমাকে বারণ করে দিলেন যাতে আমি আর দোকানে না আসি। নঈম মিঞা আমাকে অপছন্দ করতেন, এমন নয়। হয়তো তিনি চাননি আরেকজন নঈম মিঞা হয়ে আমি চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাশতে কাশতে ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটিয়ে দিই। আমার আঁকা দেখে তিনি হতাশ হননি, ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন আমাব তুচ্ছ পরিণামের কথা ভেবে।

আমি সেই কাঁচের শিল্পীর কাছে কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে ক্রোধের এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিলেন জীবনের অন্য এক মোড়ে। অবশ্য সেই মোড় উদিত হল আরও অনেক পরে। হয়তো নঈম মিঞার কাছে খুব বেশি আসা-যাওয়া করলে আমার আর পড়াশুনা হত না, হয়তো বিপথগামী হতাম, আব্বার তিরস্কার শুনে গৃহত্যাগী হতাম। নিজের জীবনে ডেকে আনতাম সর্বনাশ কিংবা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ হয়ে যেতাম। যা হোক, নঈম মিঞার নিষেধবাক্য উচ্চারিত হবার পর আমি কাঁচের ছবিশোভিত দোকানে যাইনি, ভগ্নস্বাস্থ্য শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়নি আর কোনওদিন। পরে শুনেছিলাম, কী এক রোগে ভুগে তিনি মারা যান। নঈম মিঞার মতো যাঁরা কাঁচে ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের কেউ মনে রাখে না। আমার সাম্প্রতিক নান্দনিক চেতনা নঈম মিঞাকে কোনও শিল্পী বলে গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁর ছবি ভালো লেগেছিল, মনে মনে তাঁকে ওস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, এ কথা অস্বীকার করি কীভাবে?

ব্রিটিশ আমলে আব্বা কিছুদিন সাব ইনস্পেক্টর অব পুলিশের চাকরি করেছেন। তিনি পুলিশ অফিসার হিসাবে কী রকম ছিলেন তা বলতে পারব না। আশা করি, দক্ষতার সঙ্গেই কাজ করেছিলেন। খাকি শার্ট, হাফ প্যান্ট আব হ্যাট পরে, কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে যখন তিনি বাইরে বেরুতেন, তখন তাঁকে দারুণ লাগত। তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। তখন আব্বার স্যার আশুতোষ মুখার্জির গোঁফের মতো জবরদস্ত গোঁফ ছিল। একদিন সকালবেলা আব্বা বসে আছেন বৈঠকখানায় ইউনিফর্ম পরে, তাঁর হাতে শক্ত খাটো একটি ডাণ্ডা। তাঁর পায়ের কাছে হাতকড়া-পরা কাঁচুমাচু এক লোক। শুনেছিলাম, পুলিশ এক চোর ধরে নিয়ে এসেছে, আব্বা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। কখনও চোর দেখিনি। ভেবেছিলাম ভয়ংকর কিছু হবে হিংস্র কোনও জন্তুর মতো। কিন্তু প্রায় মাটিতে মিশে-যাওয়া করুণ মুখের একজন মানুষকে দেখে রীতিমতো হতাশ হলাম। এই চোর তো আর দশজনের মতোই একজন মানুষ। আব্বার হাতে ডাণ্ডা ছিল সত্য, কিন্তু তিনি সেটি ব্যবহার করেননি, হাতে নাচাচ্ছিলেন শুধু। আব্বা এক সময় লোকটার জন্যে নাশতা আনতে বললেন। বাসনে দু'টো বাকরখানি রুটি আর কিছু চিনি আনা হল। সে যাতে নাশতা খেতে পারে সে জন্য হাতকড়া সাময়িকভাবে খুলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন আব্বা। লোকটা গোগ্রাসে খেল। ওর খুব খিদে পেয়েছিল, বুঝতে পারলাম।

আব্বা বেশিদিন সাব ইন্‌স্পেক্টর অব পুলিশের কাজ করেননি। কেন চাকরি ছেড়েছিলেন, সে-কথা আগেই বলেছি। আব্বার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল যে জন্যে কোনও কাজই দীর্ঘদিন করেননি। ব্যাংকে চাকরি করেছেন, ঠিকাদারি করেছেন কিছুদিন, সিনেমা হলের মালিকানার অংশীদার হয়েছেন — প্রথমে নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড থিয়েটার, পরে ঢাকার তাজমহলে। হজ্ব থেকে ফিরে এসে সিনেমার ব্যবসা ছেড়েছুড়ে প্রেসের ব্যবসা শুরু করেন এবং এতেই থিতু ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কর্মজীবনের এক পর্যায়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িত হন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। আব্বা কৃষক প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থী খাজা মোহাম্মদ সেলিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যতদূর মনে পড়ে আব্বার নির্বাচনী প্রতীক ছিল হুক্কা। আব্বার

গভীর অনুরাগ ছিল তাঁর এলাকা রায়পুরা এবং এলাকাবাসীর প্রতি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এলাকাবাসীরা তাঁকেই জয়যুক্ত করবে নির্বাচনে। তিনি খাঁটি বাঙালি, গ্রামবাসীদের আপনজন, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। খাজা সেলিম এলাকার কেউ নন, তা'ছাড়া সেকালে ঢাকার নবাব পরিবারের লোকজন নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয়ও দিতেন না, তাদের মধ্যে বাঙালিত্বের ছিটেফোঁটা খুঁজতে যাওয়া মস্ত বিড়ম্বনা। কিন্তু আব্বার বাঙালিত্ব নির্বাচনে তাঁর কোনও কাজে লাগল না, তিনি পরাজিত হলেন খাজা সেলিমের কাছে। আব্বার আপনজনরাই তাঁকে প্রতারিত করে। তিনি যখন এটা বুঝতে পারলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই পরাজয় আব্বাকে রাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। পরাজয় তাঁকে ক্ষুব্ধ করেনি, তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন আপনজনদের প্রতারণায়। কিন্তু তা' বলে এলাকাবাসীদের প্রতি বিরূপ হননি কোনওদিন। সবসময় পাড়াতলী, আশপাশের অন্যান্য গ্রাম ও রায়পুরার কথা ভাবতেন, আমাদের বারবার শোনাতেন সেসব এলাকার কথা। আমরা ছিলাম মুগ্ধ শ্রোতা। আব্বা নিজের অজ্ঞাতে এবং আমাদের অজান্তে তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন পল্লীপ্রীতি, প্রকারান্তরে দেশপ্রেম।

## ॥ পাঁচ ॥

আব্বা জীবিকা নির্বাহের জন্য ঢাকা শহরে বসবাস করতেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত আমাদের গ্রামের বাড়িতে, পাড়াতলীতে। গ্রামীণ পরিবেশে থাকতে পারলে তিনি মুক্তির স্বাদ পেতেন। তিরিশের দশকের শেষ দিকে আব্বা আজিজা খালার কাছ থেকে ইস্কাটনে দুই বিঘা জমি কেনেন। আজিজা খালা আমার আম্মার দূরসম্পর্কের বোন। আজিজা খালা আত্মীয়তা সূত্রে ঢাকার নবাব পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল আহসান মঞ্জিলে। আসর জমানোয় তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাই নবাববাড়ির নানা অনুষ্ঠানে, বেগম সাহেবাদের মজলিশে তাঁর আমন্ত্রণ লেগেই থাকত। মেয়ের কান কিংবা নাকে ফুটো করতে হবে, আজিজা বিবিকে খবর দাও; ছেলের খৎনা উপলক্ষে। অনুষ্ঠান হবে, আজিজাকে ডাক; বিয়ে-শাদির ধুমধাম, আজিজাকে আসতেই হবে। আজিজা খালার চেহারায় পুরুষালি ভাব ছিল। তাঁর চেহারা দেখে, কথা শুনে ভদ্রমহিলাকে বেশ জাঁদরেল মনে হত। আব্বা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, সহজে তিনি আজিজা খালার কোনও কথা ফেলতেন না। তিনি কিসে খুশি থাকবেন, সেদিকে আব্বা-আম্মা দু'জনই খেয়াল রাখতেন সবসময়। আজিজা খালাকে এই তোয়াজে রাখার ব্যাপারটি আমাদের কছে মাঝেমাঝে বাড়াবাড়ি মনে হতো। এ নিয়ে আব্বাকে কিছু বলার সাহস ছিল না, আম্মাকে বললে তিনি হেসে জবাব দিতেন, 'তিনি মুরব্বি মানুষ, আমাদের ভালো চান, খোঁজখবর নেন হামেশা।' পরে অবশ্য আমরাও আজিজা খালার খবরদারি কিছুটা মেনে নিয়েছিলাম আব্বা-আম্মার কারণে, কখনও-সখনও এই নিঃসন্তান মহিলার স্নেহস্পর্শ আমাদের মনে কোমলতা বুলিয়ে দিত; ফলে, বিদায় নিত মনের বিদ্রোহী ভাব।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৪০ সালে আব্বা ইস্কাটনে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা মাহুৎটুলি ছেড়ে শহর থেকে দূরে পল্লীপ্রতিম ইস্কাটনে চলে গেলাম। সেখানে আমাদের দুই বিঘা জমি ছিল বটে, কিন্তু কোনও ঘরদোর ছিল না। আজিজা খালার বাড়ির অংশে আম্মা সংসার সাজিয়ে ফেললেন। কোনও রান্নাঘর না থাকায় আম্মাকে খোলা আকাশের নীচে উনুন জ্বালাতে হত, রান্নাবান্না করতে হত অনেক কষ্টে। কিন্তু আম্মা কখনও বিরক্ত হননি, খেদোক্তি করেননি। আমাদের দুই বিঘা জমিতে কোনও ঘরবাড়ি ছিল না সত্য, কিন্তু ফলমূলের প্রচুর গাছ ছিল। আজও সেসব গাছ আমার মনে তাদের ডাল এবং পত্রাদি দুলিয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করে। এখনও নাকের কাছে হাত নিলে লিচু কিংবা নেবু গাছের পাতার ঘ্রাণ পাই। আমাদের জমিনে লিচু এবং নেবু গাছ তো ছিলই, আরও ছিল আম, কাঁঠাল ও বেল গাছ। কয়েকরকম আম ও কাঁঠালের গাছ ছিল। কাঁচা-মিঠা আমের স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। একটি ছোটো গাছ ছিল যার ডালে বারো মাস ঝুলে থাকত সিঁদুর রঙের আম। সেই আম দেখতে যত ভালো খেতে তত নয়। তখন ইস্কাটন শহরের এক নিভৃত কোণে; একটি কি দু'টি দালানের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেই এলাকায় ছিল গ্রামের আদল। চতুর্দিকে গাছগাছালি, কোথাও কোথাও জলাশয়। কতরকমের পাখি চোখে পড়ত, কোনও কোনও পাখির মধুর সুর কেড়ে নিত মন আমার দিনরাত্রি, বলা যেতে পারে, প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় ছিল ভরপুর। বাড়ির চৌহদ্দিতেই ঘুরে বেড়ানোর মতো যথেষ্ট জায়গা। কত সময় কাটিয়ে দিয়েছি লিচু গাছের ডালে বসে, নেবুতলায় শুয়ে রসালেনা নেবু পেড়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছের দিকে আস্তে সুস্থে হেঁটে যেতে যেতে, কখনও কখনও প্রজাপতিদের উড়াউড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। জীবনে প্রথম মাছ ধরতে শিখি ইস্কাটনে। মাছ ধরার শখ ছিল আজিজুল ইসলাম দেওয়ানের। তিনি আমার এক চাচাতো বোনের স্বামী অর্থাৎ আমার দুলাভাই। তিনি তখন আমাদের সঙ্গে থাকতেন। দু'বেলা পড়াতেন আমাদের — আমাকে এবং আমার ছোটো ভাই সাইফুর রহমান চৌধুরীকে। দুলাভাইয়ের স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার, যদিও মৃত্যুর বেশ কিছু আগে তিনি চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলেন। যা হোক, সূর্য ওঠার আগে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন, হেঁটে বেড়াতেন খোলা হাওয়ায়। একদিন তিনি মাছ ধরার তিনটি ছিপ তৈরি করে ফেললেন, বড়শি আনা হল বাজার থেকে, নিমেষে বানানো হল ফাতনা। টোপের জন্যও এক পয়সা খরচ হল না। মাটি খুঁড়তেই কেঁচো। বড়ো ছিপটি রাখলেন দুলাভাই আর ছোটো ছিপ দু'টি দিলেন আমাদের দুই ভাইকে। এক ভোরবেলা দুলাভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা — আমি আর আমার অনুজ — মাছ শিকারে বেরুলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল আম্মার শুভেচ্ছা আর তাঁর হাতে-গড়া আটার রুটি ও হালুয়া। বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে এক পুরনো দিঘিতে আমরা ছিপ ফেললাম। যে পথ পেরিয়ে আমরা দিঘির কাছে এলাম সেটি ছিল মনোমুগ্ধকর। প্রায় সারা পথই ছিল গাছগাছালিতে ভরা। ছায়া-ছায়া পথ। কয়েকটি গাছে অগুনতি জাম। দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে। ফেরার পথে কখনও কখনও খেয়েছিও। বারণ করার কেউ নেই। গাছতলায় কত জাম পড়ে থাকে। আমরা গাছতলা থেকে কুড়িয়ে নয়, ডাল থেকে সজীব, টসটসে জাম পেড়ে খেয়েছি। দুলাভাই মাছ ধরায় ছিলেন দক্ষ। মাছগুলো কী করে যেন তার বড়শিতে এসে ধরা দিত স্বেচ্ছায়।

আমরা দুই ভাই বসে থাকতাম ঘন্টার পর ঘন্টা; ফাতনা দু'একবার নড়ে উঠলেও মাছ ধরা পড়ত না। অথচ দুলাভাই অবলীলাক্রমে ভরে তুলতেন খালই শিং মাছ দিয়ে। অন্য দু'এক রকম মাছ থাকত। তবে সিংহভাগই শিং মাছ। মাঝেমধ্যে আমার ছিপও তৎপর হয়ে উঠত বড়শিতে আটকে পড়া মাছের টানে। একবার আমার ছিপে ধরা পড়ে বড়োসড়ো এক মাগুর মাছ। মাছ ধরতে পেরে আমার সে কী আনন্দ। দুলাভাইও সাগরেদের কৃতিত্বে খুশি।

ঢাকায় তখন রায়ট, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা; উপরন্তু বিশ্বজোড়া যুদ্ধ। আব্বার উপার্জনে ভাটা। তাজমহল সিনেমাহলে ভিড় জমে না। খরচ বাঁচানোর জন্য আব্বা ইস্কাটন থেকে মৌলভীবাজার হেঁটে আসা-যাওয়া করেন। রোজ দেড় টাকা করে পান তাজমহল থেকে। তাঁর উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হয় সোলেমান ভাইয়ের আটআনা। সোলেমান অর্থাৎ আমিনুর রাহমান চৌধুরী আমার সেজো ভাই। আব্বার এই স্বল্পশিক্ষিত পুত্র তাজমহলে অপারেটরের কাজ করতেন। আব্বা এবং সোলেমান ভাইয়ের মিলিত উপার্জনে তখন আমাদের সংসার চলত। এই স্বল্পশিক্ষিত মানুষটির নগণ্য আয় দুর্দিনে আব্বার খুব কাজে লেগেছিল। সোলেমান ভাই এআরপি'তেও ভর্তি হন, মনে পড়ে। যখন তাঁর মনে আনন্দ তরঙ্গায়িত হত, তখন তিনি নাকি সুরে হিন্দি ফিল্‌মের গান গাইতেন নিরালায়। আমি কখনও কখনও তার নাকি সুর শুনে ফেলে আনাড়ি গায়কের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতাম। তিনি খেপে গিয়ে ভারী ওজনের ঘুষি লাগিয়ে দিতেন, কিন্তু কখনও রাগ পুষে রাখতেন না। তাঁর একটি সুন্দর চিরুনি এবং সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি ছিল। দু'টির উপরই আমার লোভ এ কথা তিনি টের পেয়ে যান, মুখ ফুটে কিছু বলেন নি কখনও। মৃত্যুর আগে তিনি এ দুটো জিনিস আমাকে দিয়ে গেলেন। আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু তিনি কোনও ওজরআপত্তিকে আমল দেননি। যৌবনের প্রথম পর্বেই পিত্তের অসুখে তিনি বিদায় নেন পরিবার থেকে, পৃথিবী থেকে। বার বার বমি করতেন শেষের দিকে, তাঁর পাকস্থলীকে মুচড়ে দিয়ে নির্গত হত সবুজ তরল পদার্থ সোলেমান ভাই হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে আর বাঁচবেন না তিনি। নইলে তাঁর অমন পছন্দের পাঞ্জাবি আর চিরুনি আমাকে দিয়ে দেবেন কেন। আব্বা তাঁর এই স্বল্পশিক্ষিত কিন্তু উপকারী পুত্রটিকে হারিয়ে অত্যন্ত শোকার্ত হয়েছিলেন। আব্বার চোখে প্রথমবারের মতো পানি দেখতে পাই সেদিন। আব্বাকে আর কখনও কাঁদতে দেখিনি।

ইস্কাটনে আমাদের বাসায় উলটো দিকের বাড়িটা ছিল কাজী কাইয়ুমের। তাঁর এক কন্যার বিয়ে হয়েছিল নবাব সলিমুল্লাহর সঙ্গে। তাঁর আরেক কন্যা ঘরনী হন খাজা জহরুল হকের। খাজা জহরুল হক আমার বড়ো ভাই খলিলুর রাহমান চৌধুরীর শ্বশুর। আজিজা খালার উৎসাহ এবং উদ্যোগে খাজা জহুরুল হকের বড়ো মেয়ে জাহানারা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয় আমার ভাইয়ের। জাহানারা বেগম ভাইয়ের শ্বশুরের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত। কাজী কাইয়ুমের কন্যা অকালমৃতা। এই বনেদি ভদ্রলোকের তিন নাতনি — রওশন, দিলারা ও শওকত — ছিল চোখে পড়ার মতো। রওশন তরুণী, দিলারা ও শওকত বালিকা। দুই যমজ বোন, চেহারা প্রায় অবিকল, যমজদেব যেমন হয়। তবু পার্থক্য বোঝা যেত। ওরা দু'জন একজন মৌলবি সাহেবের কাছে কোরান শরীফ পড়ত।

মৌলবি সাহেবের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর, পড়াতেনও ভালো। দূর থেকে তাঁর কোরান তেলওয়াত শুনতাম মুগ্ধ হয়ে। দিলারা ও শওকতকেও দেখতাম, ওরা দুলে দুলে পড়ত। দিলারার প্রতি আমার একটি পক্ষপাত জন্মে গিয়েছিল। ওকে ভালো লাগত আমার, একজন বালকের এই ভালো লাগা বালিকার অজানা ছিল, বলব না। বরাত ভালো বালকের, একদিন তারও ঠাঁই হয়ে গেল দুই বালিকার মক্তবে, ওদের বৈঠকখানার বারান্দায়। সেখানে বসেই ওরা কোরান শরীফের পাঠ নিত। আম্মার কাছে আমার আরবি পড়ার হাতেখড়ি হয়। আবার কোরান শরীফের পাঠ যাতে একজন মৌলবি সাহেবের তদারকিতে হয়, এটা আম্মা চাইতেন। আম্মার উদ্যোগে কাজী কাইয়ুমের বাসগৃহে আমি কিছুদিনের জন্যে তালিবে ইলিম হয়ে যাই। রোজ বিকেলে দিলারাকে কাছে থেকে দেখতে পাব, এটাই ছিল আমার কোরান শিক্ষার উৎসাহের অন্যতম প্রধান কারণ। ওরা দুই বোন তালিবে ইলিমটিকে দেখে মিটিমিটি হাসত এবং ওস্তাদজির সতর্ক নজর এড়িয়ে আমিও ওদের দিকে তাকাতাম। একে কি বাল্যপ্রেম বলা যায়? না। একজন মুখচোরা বালক ও লাজরাঙা বালিকার প্রায় অগঠিত সম্পর্কে প্রেমের সন্ধান না করাই ভালো। আমার আত্মীয় নয় এমন কোনও অল্পবয়েসি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার মৃদু চেষ্টা করেছিলাম, স্বীকার করি কিন্তু পারস্পরিক হাসি বিনিময় ছাড়া অন্য কোনওকিছু সেই প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এমনও হতে পারে, তাজমহল সিনেমা হলে দেখা 'লায়লা মজনু' ফিল্‌মের সেই দৃশ্যটি আমাকে প্রভাবিত করেছিল, যেখানে বালক কায়েস এবং বালিকা লায়লার বিদ্যাশিক্ষার প্রাথমিক পর্ব ফুটিয়ে তোলা হয়। সেই ফিল্‌মে অবশ্য ওরা বাল্যবয়সেই প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। কিন্তু আমার বাল্যকাল একজন বালিকার কৌতুক মিশ্রিত চাহনি এবং ঈষৎ হাসি ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কিছু প্রাপ্ত হয়নি। দিলারা আমার সঙ্গে কখনও কথা বলার চেষ্টা করেছে বলে মনে পড়ে না। শুধু ওর দূরের নির্দোষ দুষ্টুমিভরা হাসি নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আমার এক মামাতো ভাই, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন, রওশনের রূপে মুগ্ধ, কিন্তু তরুণীর তরফ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গিয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আমার ভ্রাতাটিকে প্রায়শই লিচুতলায় ঘুরঘুর করতে দেখতাম। জায়গাটি ছিল আমারও প্রিয় বিচরণক্ষেত্র। আমাকে দেখলে হাসতেন তিনি; আমি যে তাঁর এই পদচারণার কারণ টের পেয়েছিলাম, এটা তিনি জানতেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আমার অসতর্ক বালকের দৃষ্টি পাঠ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

আমরা দেড় বছর ছিলাম ইস্কাটনে। যদিও আজিজা খালা সাগ্রহে আব্বাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, থাকার জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন বিনা ভাড়ায়, তবু আমাদের ইস্কাটন ছেড়ে ফিরে আসতে হল। আজিজা খালার টাকার প্রয়োজন, অথচ আব্বার কাছ থেকে টাকাকড়ি নেবেন না। একদিন অন্য কারও কাছে বাড়ি ভাড়া দেয়ার কথা ওঠে। আব্বা তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সাত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মাহুৎটুলিতে, নিজের বাসগৃহে। ইস্কাটনের একটি ঘটনা আজও আমাকে পীড়িত করে। আমরা আর্থিক অনটনের নিষ্ঠুর ছায়ায় বসবাস করছিলাম তখন। আব্বার আয় রাহুগ্রস্ত, যুদ্ধের দরুন জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মাসের সওদা ধারে আনা হয় মুদির দোকান থেকে। একদিন বিকালে আব্বা আমাকে মুদির দোকানে ধারে চাল আনার জন্য পাঠালেন। দোকানের

মালিক রুক্ষ স্বরে আমাকে জানিয়ে দিল যে ধারে আর চাল দেওয়া হবে না। এর আগে এমন কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি হইনি। নিজেকে একজন অসহায় ভিখারির মতো মনে হল। ক্ষুব্ধ, দগ্ধ মনে বাড়ি ফিরে এসে আব্বাকে দোকানের মালিকের ব্যবহারের কথা জানালাম। আব্বার মুখ প্রত্যাখানের ধাক্কায়, অপমানে কালো ও মূক হয়ে রইল অনেকক্ষণ। সে রাতে কীভাবে চাল পাওয়া গেল, যথারীতি ভাত রান্না হল কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি।

আজ আমি ইস্কাটনে নেই, মাহুৎটুলিতে নেই, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনেও নেই, আছি শহরের এক প্রান্তে, শ্যামলীতে। একটি কথা বলে রাখি, আজ যেখানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে দালান এবং পুস্তকসম্ভার সমেত, তার উলটোদিকেই ছিল আমাদের দুই বিঘা জমি, যা আব্বা পরে বিক্রি করে দেন মাত্র তিরিশ হাজার টাকায়। এক অগ্নিকাণ্ডে তাজমহল পুড়ে যাওয়ায় ব্যবসাকে কিঞ্চিত চাঙ্গা করার জন্য আব্বা ইস্কাটনের সুন্দর সুন্দর গাছভর্তি জমি হাতছাড়া করতে বাধ্য হন। আজ শ্যামলীর ঘরে বসে দিলারার হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখ, একটি বালিকার মুখ, লিচু গাছ, নেবুতলা, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা নলকূপ, প্রশস্ত উঠোন, ওস্তাদজির মধুর কোরান তেলাওয়াত, সেই পুরনো দিঘির কথা মনে পড়ে। মনে একটি উদাস রাগিণী বাজতে থাকে। শ্রাবণ-দুপুরে, চৈত্রের পূর্ণিমা রাতে সেই দিঘি কী রূপ ধারণ করে আজ এই ১৯৯২ সালে, ভাবতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় ছুটে যাই সেখানে একা-একা। কিন্তু কোন পথে যাব আমি? অনেক আগেই যে পথ হারিয়ে গেছে শাহরিক ভিড়ভাট্টায়। পুরনো সেই দিঘিটি আছে তো? হয়তো নেই। অনেক জলাশয়ের মতো সেটিও বুঝি চাপা পড়ে গেছে কোনও আলিশান বহুতলের দালানের ভিত্তিপ্রস্তরের নীচে।

## ॥ ছয় ॥

দুর্ভিক্ষের হাভাতে ছায়ায় আমরা ইস্কাটন ছেড়ে মাহুৎটুলিতে ফিরে এলাম। প্রথমদিকে কয়েকদিন খুব খারাপ লাগল। কয়েকটি চেনামুখ, গাছপালা, লিচুতলা, পুরনো দিঘিতে যাওয়ার পথের আলো-ছায়া, বুনো ঘ্রাণের জন্য মন কেমন করত। কিন্তু কিছুদিন পর ইস্কাটনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল। দুর্ভিক্ষের চেহারা যে কত কুৎসিত ও ভয়াবহ হতে পারে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমার কাছে।

রাস্তাঘাটে কংকালসার মানুষ, সভ্যতা ব্যঙ্গ করে অভুক্ত কণ্ঠ তুলছে 'ফ্যান দাও' ধ্বনি। ভাত নয়, ভাতের ফ্যান দিয়ে ক্ষুধা মেটাবে। ভাত চাইবার মতো সাহস নেই। কেউ কেউ কোনও কথা বলে না, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। আব্বা অভাব-অনটনের আঁচ আমাদের গায়ে লাগতে দেননি। সেই দুর্ভিক্ষেও একবেলা না খেয়ে থাকতে হয়নি আমাদের। তবে তখন একবেলা আমরা ভাত খেতাম আর অন্যবেলা আটার রুটি। তখনই প্রথম ভাতের পরিবর্তে আটার রুটি খেতে হল। জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত স্কেচমালায় তখনকার দুর্ভিক্ষের রূপ ফুটে উঠেছে। সেই সময়ে জয়নুল আবেদিন ছিলেন কলকাতায়। তখন তাঁর নাম শোনার সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর কোনও ছবি দেখিনি। একটি মুখের কথা।

দুর্ভিক্ষপীড়িত একজন মানুষের চেহারা কখনও ভুলতে পারব না। সকালবেলা বৈঠকখানায় বসে নাশতা খাচ্ছিলাম। আটার রুটি আর আলু ভাজি। হঠাৎ জানলার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। মানুষেরই মুখ, অথচ মানুষে মুখ বলে মনে হচ্ছে না। যেন হাজার বছর ধরে ক্ষুধার্ত লোকটা। তার চোখের ভিতর মৃত্যু যেন বোবা চিৎকার করে জীবনকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। আমার খাদ্যের বেশ কিছু ভাগ লোকটাকে দিলাম। রুটি নিয়ে সে চলে গেল। ক্ষণকাল বিলম্ব করল না। দুর্ভিক্ষ আমাদের বৈঠকখানার জানালা থেকে সরে কংকালের মতো হেঁটে গেল নিঃশব্দে। আরও দু'তিনবার তার মুখ ভেসে উঠেছিল জানালায় খাদ্যের প্রত্যাশায়। তার প্রত্যাশাকে ব্যর্থ হতে দিইনি। লোকটা মাহুৎটুলির গলিতেই কোথাও থাকত। একদিন শুনতে পেলাম, সে মারা গেছে। অনাহারেই মৃত্যু হয়েছে তার।

আমার মেজো ভাই তখন ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে কাজ করছেন। তিনি, আজিজুর রাহমান চৌধুরী, মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন আব্বাকে। চিঠির ভাষা ছিল ইংরেজি। প্রত্যেক চিঠিতেই থাকত টাকা পাঠানোর আশ্বাস। প্রথম-প্রথম আব্বা হয়তো মেজো ভায়ের আশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, পরে তিনি পুত্রের আশ্বাসবাণীকে কথার কথা বলেই মেনে নেন। মিথ্যা আশ্বাসে কি আব্বা বিরক্ত হয়েছিলেন? হলেও টের পাইনি। তবে তিনি যে পুত্রের আচরণে ব্যথিত হয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আব্বা তাকে টাকা পাঠাতে বলেননি, এ ব্যাপারে তার কোনও প্রত্যাশা ছিল না। মেজো ভাই নিজেই টাকার প্রসঙ্গ তোলেন বিদেশ থেকে পাঠানো চিঠিতে। তখন আব্বার টাকার খুব প্রয়োজন, টাকা পেলে তিনি নিশ্চয় খুশি হতেন। না পেলেও নাখোশ হবার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন পুত্রের কপটতায়। মেজো ভাই বরাবরই অপব্যয়ী। আব্বাকে টাকা পাঠানোর সদিচ্ছা তার ছিল না, এমন নয়; তার খরচিলা স্বভাব ইচ্ছেটাকে বাস্তবায়িত হতে দেয় নি। মেজো ভাই হঠাৎ নৌবাহিনীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। চাকরিতে বহাল থাকলে তিনি খুব উন্নতি করতেন। কিন্তু তা হবার নয়। মেজো ভায়ের মধ্যে একটি উড়নচণ্ডীভাব আছে। একবার তিনি কাউকে কোনও কিছু না বলে লাপাত্তা হয়ে যান। সেবার তিনি প্রায় সারা ভারত পর্যটন করেন। দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মাজারে কিছুকাল কাটান। তখন তিনি অবিবাহিত। তাই তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভোগান্তির প্রশ্ন ওঠে না। তবে আব্বা ও আম্মা ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমার কিন্তু মেজোভাইকে বড়ো ভালো লাগত। হয়তো তার এই উড়নচণ্ডী স্বভাবের জন্যই আমার কাছে তিনি ছিলেন একজন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি। মেজো ভায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোর অন্যতম ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'। তিনি মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে একলা ঘরে আবৃত্তি করতেন —

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।

কোথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন —
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল নীল।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে, দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে —
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

আমার মেজো ভাই, আজিজুর রাহমান চৌধুরী, ভালো আবৃত্তিকার ছিলেন না। আবৃত্তিচর্চা তিনি করেননি কোনওকালে। কিন্তু 'ভারততীর্থ' কবিতাটি, আমার মনে পড়ে, বহুবার পড়েছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। বিশেষ করে 'মহামানবের সাগরতীরে' পৌঁছে তিনি কণ্ঠস্বরকে জোরালো করে তুলতেন। হয়তো কবিতাটির ছন্দ তাঁর মন কেড়েছিল, কিংবা 'মহামানবের সাগরতীরে' শব্দবন্ধটি তাঁর ভ্রমণ-ব্যাকুল চিত্তকে দোলায়িত করত। এমনও হতে পারে মহামানবের সাগরতীরে'র সম্মোহনে তিনি নৌবাহিনীতে যোগ দেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, ঘুরে বেড়ান সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে। যা হোক, মেজো ভায়ের এই কবিতা পাঠ আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমিও আলোড়িত হতাম 'মহামানবের সাগরতীরে'র কথা কল্পনা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আমার মনে কোনও রেখাপাত করেনি সেই বয়সে, বাংলাভাষার মহত্তম কবির মাহাত্ম্য কিছুটা উপলব্ধি করার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা-পরবর্তী এক বিকাল পর্যন্ত, যে বিকাল আমার পক্ষে ছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অনুরূপ। আমার নিজের কোনও সৃষ্টিকর্মের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর, বিপুল সাহিত্যলোকে প্রবেশের লগ্ন হিসাবে।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও লজ্জিত বোধ করি। তখন নিচু ক্লাসে পড়ি। একদিন ইশকুলে এসে ক্লাসরুমে বসেছিলাম যথারীতি। হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। কীসের ছুটি? রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন, সে জন্য ছুটি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখিত হইনি বিন্দুমাত্র, বরং ছুটি পাওয়া গেল বলে আনন্দিত হই। রবীন্দ্রনাথ এবং মৃত্যু — উভয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলাম, তাই সেদিন অমন একটি সবদিক অন্ধকার করে দেয়া সংবাদ শোনার পর বই বগলদাবা করে, শব্রি আম খেতে-খেতে হাসিখুশি বাড়ি ফিরছিলাম। ইস্কাটনের দিলারা আমার বাল্যসখী হয়নি, হয়েছিল আমার খালাতো বোন হেনা। প্রায় সবসময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, খেলার আগ্রহ প্রকাশ করত। ওর সঙ্গ খেলতে ভালো লাগত, কিন্তু সে সারাক্ষণ আমার কাছাকাছি থাকুক, এটা আমি চাইতাম না। হেনা কখনও কখনও আমার সঙ্গে ইশকুলে যাবার বায়না ধরত। বারণ করলেও শুনত না। একদিন সে চুপিসারে আমার পেছনে পেছনে অনেকটা পথ হেঁটে এল। ওর পরনে হাফ প্যান্ট, ফ্রক ভেতরে গোঁজা, ফ্রকের উপর সোয়েটার। প্রথমে লক্ষ করিনি, আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ইসলামপুরের শেষ মাথায়, শাঁখারি বাজারের গলির মোড়ে পুলিশ ফাঁড়িটার কাছে পৌঁছে দেখি, হেনা আমাকে অনুসরণ করছে। কেন না, সে আমার ইশকুলে যাবে, ক্লাসে আমার পাশে গিয়ে বসবে। এখন কী করি? বোকা মেয়ে, ও জানেও না যে আমার পক্ষে ওকে ইশকুলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, সেখানে মেয়েদের কোনও ঠাঁই নেই। তখন পোগজ ইশকুলে সহশিক্ষা ছিল গরহাজির।

তাছাড়া বিদ্যালয়ে শত শত ছেলের মধ্যে একজন বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হওয়া মানে তুমুল হাসাহাসির খোরাক হওয়া। শিক্ষকের ধমক খেতে হবে নির্ঘাৎ। ভারি রাগ হল হেনার উপর। ইচ্ছে হল, দিই এক চড় বসিয়ে ওর রাঙা ফুলো-ফুলো গালে। আরও ইচ্ছে হল ওর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু ওর ভড়কে যাওয়া চোখ মুখের দিকে তাকাতেই আমার ইচ্ছার ফণা নুয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে কী যেন বললাম ওকে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। মাঝপথে ওকে ফেলে রেখে তো আর ইশকুলে যাওয়া চলে না। যদি সে পথ ভুলে যায়, বাড়িতে পৌঁছতে না পারে। জানি, ক্লাস শুরু হয়ে যাবে; তবু ওকে বাড়ির কাছে পৌঁছে না দিয়ে ইশকুলে যেতে পারলাম না। সেদিন ক্লাসে ঢুকতে দেরি হয়ে গেল, সে জন্য অবধারিত ছিল মাস্টার মশাইয়ের বকুনি। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার জন্য কোনওদিন বকাঝকা খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ক্লাসে ঢুকতে কখনও দেরি করিনি, বহুদিন ঘন্টা বাজার অনেক আগে গিয়ে ক্লাসসঙ্গীদের সঙ্গে গল্প-সল্প করেছি।

হেনা ওর আম্মার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল কলকাতা থেকে। ও যখন খুব ছোটো ছিল তখন ওর আব্বা মারা যান। হেনার আম্মা ছিলেন আমার নানার প্রথম স্ত্রীর কন্যা। মহিলা ছিলেন বেশ দেমাকি, রেগে গেলে তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার মতো ধৈর্য তার থাকত না তখন। বিশেষত নিজের অন্যায় তার চোখে ধরা পড়ত না তখন। কিন্তু হেনা ছিল শান্ত, সহজে রাগ-টাগ করত না, তবে ভেতরে ভেতরে অভিমান পুষে রাখত, সেই অভিমান কারও কোনও ক্ষতির কারণ হত না। আমাকে সে পছন্দ করত এবং সেই পছন্দের পরিচয় পেতাম তার অনেক আচরণে। আমি তাকে আমল দিতে অনিচ্ছুক জেনেও হেনা আমার কাছে থাকতে চাইত। সে যে একটি মেয়ে, এ কথা হয়তো ওর মনেই থাকত না। না, একে বাল্যপ্রেম বলা যাবে না কিছুতেই। সেই বাল্যকালে আমার এবং হেনার মধ্যে কোনও প্রেম-ট্রেম অঙ্কুরিত হয়নি, মঞ্জুরিত হওয়া তো দূরের কথা। আপাতত হেনার প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। বাল্যকালেই সে ওর আম্মার সঙ্গে আবার কলকাতায় চলে যায়। তবে সে ফিরে আসবে আমার জীবনে অনেক পরে, আমার যৌবনে। তার কথা আবার বলা যাবে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম বেশ কিছুদিন জ্বরে ভোগার পর। নানা কারণে পরীক্ষা ভালো দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে অঙ্ক এবং আরবি প্রশ্নপত্রের যোগ্য উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছি। আব্বা ভেবেছিলেন, আমার পরীক্ষার ফল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবে। আমার মনে আগে থেকেই আশঙ্কা ঠাঁই নিয়েছিল। যেহেতু তখনও পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি, তাই আপাতত স্বস্তিতে দিন কাটছিল কিছুই না করে, শুয়ে-শুয়ে আকাশে চিলের ওড়াউড়ি দেখে, ছাদে বসে রাতের নক্ষত্রময় আকাশ দেখে, তাজমহল সিনেমায় হিন্দি ফিল্‌ম উপভোগ করে। কদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল বিকেলে। হাতের কাছেই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড'। বইটি আমাদের পাঠ্য ছিল ম্যাট্রিকে। তখন কয়েকটি গল্প পড়েছিলাম। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট গল্পগুলো ছাড়া অন্য কোনও গল্প পড়িনি। ঘুম ভাঙা চোখে 'গল্পগুচ্ছ' নতুন করে পড়তে শুরু করলাম পড়ন্ত বেলায়। বিকাল কখন রাত হয়ে গেছে, টের পাইনি। আম্মা খেতে ডাকার

পর খেয়াল হল। হাতমুখ ধুয়ে কোনওমতে খাওয়া শেষ করে ফিরে গেলাম 'গল্পগুচ্ছ'-এর কাছে নতুন উদ্দীপনায় জ্বলে উঠে। মনে হল, এই গল্পগুলো কোনও মানুষের লেখা নয়, নিশ্চয় কোনও ফেরেস্তা কিংবা দেবতা এসব কাহিনির স্রষ্টা। এই প্রথমবারের মতো আমি সচেতন হলাম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। অনুপম এক মুগ্ধতাবোধ আমাকে কৌতূহলী করে তুলল তাঁর অন্যান্য লেখা সম্পর্কে — শুরু হল সন্ধান। বই সহজলভ্য হল না। ফলে গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হতে হল। ইশকুলে যাওয়ার পথে পাটুয়াটুলিতে রামমোহন লাইব্রেরির উপস্থিতি টের পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করি নি। কেউ আমাকে বলে দেয় নি সেই লাইব্রেরির সদস্য হতে, নিজেই উদ্যোগ নিলাম, সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরি থেকে বই ধার নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে গেলাম। ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত এই গ্রন্থাগার আমার সামনে খুলে দিল আলাদা এক জগৎ, বেড়ে গেল আমার পাঠস্পৃহা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও বেশি পরিচয় তো হলই, বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠলাম। রামমোহন লাইব্রেরি সংলগ্ন দালানে জীবনানন্দ দাশের বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই তথ্য অবশ্য পরে জেনেছি। কারণ, তখনও জীবনানন্দের অস্তিত্ব আমার কাছে অজ্ঞাত। ভাবতে অবাক লাগে, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়, গদ্য রচনাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র — এই দু'জনের কেউই কবি ছিলেন না, যদিও তাদের কোনও কোনও রচনাংশে নির্ভুল কবিতার স্বাদ লভ্য। কবিতার সঙ্গে প্রেমে পড়ি আরও পরে।

নবাব বাড়ির মেয়ে আমার বড়ো ভাবি জাহানারা বেগম। উর্দুর উপর তার দখল তর্কাতীত। উর্দু সাহিত্য তিনি বিস্তর পাঠ করেছেন। তিনি আমাকে উর্দু ভাষার কোনও গল্প এবং বেশকিছু কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন গালিবের কোনও কোনও গজলের মানে। আমার আগ্রহ লক্ষ করে তিনি কখনও ক্লান্তি কিংবা বিরক্তিকে কাছে ঘেঁষতে দেননি; যখনই কবিতা শুনতে চেয়েছি শুনিয়েছেন। কখনও কখনও নিজের আগ্রহেই শুনিয়েছেন, তাঁকে অনুরোধ জানানোর প্রয়োজন হয়নি। সাহিত্যপাঠের স্বাদ আমরা ভাগাভাগি করে গ্রহণ করেছি। তিনি দিয়েছেন বেশি, আমার কাছ থেকে নিয়েছেন সামান্যই। পরিতাপের বিষয়, আমার বড়ো ভায়ের মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা ত্যাগ করে করাচিতে চলে যান পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে। অবশ্য তাঁর ঢাকা ত্যাগের অনেক আগেই আমাদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। মানুষের সম্পর্ক এমনই যে, একবার এতে ফাটল ধরলে সহজে জোড়া লাগে না। তিনি আমার অনেক প্রহর কাব্যময় করে তুলেছিলেন এ-কথা কী করে অস্বীকার করি? আমি তার কাছে ঋণী। মনে পড়ে, যেদিন আমি রেডিওতে প্রথম কবিতা পড়ি, সেদিন বড়ো ভাবি খুব খুশি হয়েছিলেন। উপহার হিসাবে তিনি আমাকে কয়েকটি টাকা দেন কিছু কেনার জন্য। আমি সেই টাকা দিয়ে 'অল্ডাস হ্যাক্সলি'র 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' এবং 'দোজ ব্যারেন লিভস' উপন্যাস দু'টি কিনি। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। করাচিবাসিনী জাহানারা বেগমের চোখে এই লেখা পড়বে না, পড়বার কোনও কারণ নেই। দৈবক্রমে পড়লেও এটি অপাঠ্য থাকবে। কারণ, বাংলা ভাষা লিখতে কিংবা পড়তে তিনি পারেন না। টুটাফুটা বাংলা হয়তো বলতে পারেন। এখন তো সেই পাঠও চুকে গেছে। আমার কথা শুনে তিনি খুশি

হবেন কি-না জানি না, হয়তো অপ্রসন্নই হবেন। এই সুযোগে আমি তাঁর কাছে লিখিতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, এটুকুই আমার তৃপ্তি।

জানতাম, আবু তাহের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো করবে। তার মন আমার মতো বিক্ষিপ্ত, অগোছাল ছিল না। ওর বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ণ আর আমি বোকার হদ্দ। আমার ফল দেখে কেউ কেউ চমকে উঠলেও আমি অবাক হইনি। টেনেটুনে প্রথম বিভাগে উৎরে যাব, এরকম একটা ক্ষীণ আশা ছিল মনের ভেতরে। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। যেন পাসই করিনি এমন একটা আবহাওয়া তৈরি হল আমার মধ্যে। সবচেয়ে বেশি নিরাশ হলেন আব্বা। তখন তাকে দেখে মনে হয়েছে, বড়ো রকমের একটি শারীরিক আঘাত পেয়েছেন তিনি। নিজেকে অপরাধী মনে হল। কবিতা লেখার জন্য ফল খারাপ হয়েছে, তা বলা যাবে না। তখন আমি গল্প-উপন্যাস পড়তে শুরু করিনি। কবিতা লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল আমার জীবনধারাকে বদলে দেবে বলেই এত কথা বললাম। প্রায় আত্মধ্বংসী এক চেতনা আস্তে আস্তে দখল করতে থাকে আমাকে। নিজের জীবন সম্পর্কে অসতর্ক, উদাসীন, অথচ নারী বিষয়ে আশুচেতন, প্রণয়লোলুপ এক সদ্য যুবককে আবিষ্কার করলাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুবার পর আবু তাহের ছাড়া ক্লাসের আর কারও সঙ্গে দেখা হয়নি। বিমল, সুবিমল, অনিল, নীহার, শিশির, আশরাফ — কারও সঙ্গে নয়। যেন এক ঝড়ো হাওয়া এসে কয়েকটি বালককে ছড়িয়ে দিল নানা জায়গায়। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা অনেককে ঠেলে দিল অনিশ্চয়তার দিকে। আমি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম, মনমরা, ঈষৎ বিষণ্ণ, ক্লাসের পড়াশোনায় অনাগ্রহী, প্রায় বাউণ্ডুলে। যখন ম্যাট্রিক পাস করি নি, তখন ঢাকা কলেজে পড়ার আনন্দ বুকে লালন করেছি। প্রাসাদের মতো বাড়িতে ক্লাস হবে, এই উত্তেজনা অনেক সময় মাতিয়ে রেখেছিল আমাকে। কিন্তু সিদ্দিকবাজারের গলিতে ঢুকেই মন খারাপ হয়ে গেল। এখানে এই ছন্নছাড়া পরিবেশে মন বসবে কী করে?

## ॥ সাত ॥

ম্যাট্রিক পাস করবার পর ভেবেছিলাম, কলেজে পড়ব এক উদ্দীপক, মনোমুগ্ধকর পরিবেশে। কখনও রমনার দিকে গেলে নজর কাড়ত ঢাকা কলেজের অমল ধবল সৌধটি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঢাকা কলেজকে সৈনিকদের আস্তানায় পরিণত করে। ফলে ছাত্র হিসাবে সেখানে প্রবেশাধিকার হারিয়ে ফেলি। ঢাকা কলেজ সিদ্দিকবাজারে স্থানান্তরিত হয়, রমনার সবুজিমা থেকে পুরনো ঢাকার ধূসর গলিতে। একেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি, তার ওপর কলেজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এই পরিবেশে এসে পড়াশোনায় আমার মন বসেনি। আমার ভেতর যে উড়নচণ্ডী যুবা উসখুস করছিল সে আস্তে-সুস্থে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হয়তো আব্বা আমার চিত্তচাঞ্চল্য টের পেয়েছিলেন। তাই, আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হল ঢাকা কলেজের হোস্টেলে, যাতে ভালো করে লেখাপড়া

করতে পরি। বাড়ির হট্টগোলে আমার লেখাপড়ায় প্রচুর ব্যাঘাত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আব্বা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ডেরা বাঁধতে হল বেগমবাজারের নূরপুর ভিলায়। আব্বা, আম্মা, নানি এবং ভাইবোনকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না: কিন্তু আব্বার কড়া হুকুম, তামিল না করে যাব কোথায়? আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল আমার চেয়ে আব্বাকেই বেশি বিচলিত করেছিল। আমার সিট পড়ল নূরপুর ভিলার শেষ সীমায় অন্ধকার এক ঘরে। সেখানে দিন-দুপুরেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কোণার সেই ঘরে একজনেরই সিট। সে ঘরে ঢুকলে প্রথম প্রথম গা ছমছম করত। ভূত-প্রেত কিছু আছে বলে বিশ্বাস করি না, তবু ভয় পেতাম মনে মনে। লজ্জায় কাউকে বলতে পারতাম না ভয় পাওয়ার কথা। তখন নূরপুর ভিলায় কারা থাকতেন আজ আর মনে নেই। শুধু একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি আজকের অন্যতম রাজনীতিক জনাব অলি আহাদ। তিনি আমার কিছু সিনিয়র ছিলেন, তাই খুব কাছে ঘেঁষতাম না। ঘেঁষার সাহসই হত না। তখনকার দিনকাল ছিল অন্যরকম। যিনি সিনিয়র — সিনিয়রিটি যতদিনের হোক — তাঁকে সমীহ করে চলতাম। অলি আহাদের ঘরে আরও দু'একজন থাকতেন। তাঁদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল, অধিকার ছিল কথাবার্তা বলার। আমার একাকিত্ব তাঁরা অনুভব করেছিলেন বলেই হয়তো কাছে ডাকতেন। কিন্তু আমি লাজুক এবং স্বল্পভাষী। কোনও কোনও দিন তাদের ঘরে গিয়ে বসেছি, কিন্তু আলাপ তেমন জমেনি আমারই দোষে। অলি আহাদ কি রাজনীতির কথা বলতেন? বলাটাই স্বাভাবিক। কারণ, ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। নূরপুর ভিলার ঘরে তিনি কী কথা বলতেন, আমার মনে পড়ে না। তখন রাজনীতি সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

নূরপুর ভিলায় দু'মাসের বেশি আমাকে থাকতে হয়নি। হোস্টেলে বসবাস দুঃসহ হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে। ডাইনিং হলে ঢুকলে গা গুলিয়ে উঠত। তরকারি বিস্বাদ, বিশেষ করে জলবৎ ডালের হরিদ্রাভ ধারার কথা মনে পড়লে আজও অন্ত্র বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হোস্টেলে থাকার সবরকমের অসুবিধার কথা বেশ বাড়িয়ে বলতাম আম্মার কাছে। ডাইনিং হলের কথা শুনে আম্মা বিচলিত বোধ করেছিলেন। আমি সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলাম, তিনি বিচলিত হয়ে আব্বাকে বলে কয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনুন ছেচল্লিশ নম্বর মাহুৎটুলিতে, আমাদের বাড়িতে। সাফল্যের জন্য আমাকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। দু'মাস না যেতেই ঘরের ছেলে পরমানন্দে ফিরে এলাম ঘরে।

নূরপুর ভিলার ছবি স্মৃতিতে ভেসে উঠলেই আমার মনে পড়ে যায় একটি অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর ঘর এবং হাস্নুহানার ঝাড়। যখন রাত্রিবেলা জ্যোৎস্নার জোয়ার এসে ভাসিয়ে দিত হাস্নুহানার ঝাড়টিকে, তখন খুব ভালো লাগত আমার। সেই তরল জ্যোৎস্না আর স্তব্ধ হাস্নুহানা কোনও এক জাদু বলে আমার ভেতরে প্রবেশ করত। প্রফুল্ল আমি কাটিয়ে দিতাম কিছু সময়। নূরপুর ভিলার নিরানন্দ জীবনে কিঞ্চিৎ আনন্দরেণু ছড়িয়ে দিয়েছিল সেই হাস্নুহানার ঝাড়। মনে পড়ে, নূরপুর ভিলার প্রায় ভুতুড়ে ঘরটিতে প্রথম পড়েছিলাম শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'। উপন্যাসটির শেষের যে কয়েকটি বাক্যকে আজ অপ্রয়োজনীয় মনে হয় আমার কাছে, সেই বাক্যসমূহ পড়েই খাঁ খাঁ দুপুরে ছায়া-ছায়া ঘরে এক তরুণের

চোখ হয়ে উঠেছিল অশ্রুনদী। আজও যখন 'দেবদাস'-এর কথা মনে পড়ে, তখন নূরপুর ভিলার কোনার ঘরটি জেগে ওঠে বিস্মৃতির ধুলোর পুরু আস্তরণ ফুঁড়ে। শরৎচন্দ্রের কালজয়ী এক নায়ক এবং দূরবর্তী যুবকের ক্ষণস্থায়ী একটি অস্বস্তিকর ডেরা অবিছিন্ন অন্তত আমার কাছে।

ছেচল্লিশ নম্বর মাহুৎটুলিতে আব্বা এবং আমার ছোট চাচা আরিফুর রহমান চৌধুরী একই বাড়িতে থাকতেন সেকালে। বাড়ি একই বটে, কিন্তু দু'জনের সংসার আলাদা। ছোটো চাচার সংসারে কাজ নিয়েছিল এক প্রৌঢ়া রাঁধুনি, আমাদের মহল্লারই বাসিন্দা। তার এক তন্বী কন্যা, আমাদের বাসায় প্রায়শই ছিল যার আসা-যাওয়া, খুচরো কাজে সাহায্য করত মাকে। ওর গায়ের রং ছিল কোনও দ্রাবিড় কন্যার মতো, ওর চোখ যেন একজোড়া অপরূপ যমজ ভ্রমর। রবীন্দ্রনাথ, অনুমান করি, এমন কোনও মেয়েকে দেখেই লিখেছিলেন, 'কালো? তা সে যতই কালো হোক/দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' আমি কি সেই গৃহপরিচারিকা মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলাম? হয়তো; হয়তো কেন? স্বীকার করে নেওয়াই ভালো, সেই কালো মেয়ে না জেনেই আমার মনে আলো জ্বেলে দিয়েছিল, যে আলোর অন্য নাম অনুরাগ। আমার রক্তে, বলা যেতে পারে, আগুনের ফুলকি সে-ই প্রথম তৈরি করে। এর আগে রক্তে আগুন ধরা কাকে বলে জানতাম না।

কেমন ছিল আমার যৌবন? বর্তমানে বার্ধক্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে সেই অনুভূতি ফিরে পাওয়া মুশকিল। কৈশোর পেরিয়ে কখন যে যৌবনের পুষ্পিত ঝলমলে প্রান্তরে পা রাখলাম আশ্চর্যের যুবরাজ, বুঝতে পারিনি। তবে আবছা মনে পড়ে, কলেজে ভর্তি হবার সময়ে দেহ মনে শিহরণ জাগিয়ে সে ঘোষণা করেছিল সগর্বে, 'এই যে আমি এসে গেছি।' আর সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল পরিচিত বস্তুজগৎ। সবকিছু কেমন নতুন হয়ে দেখা দিল আমার কাছে। মাহুৎটুলির গলি, ধূলিধূসর, জমে ওঠা আবর্জনার দুর্গন্ধে ভরপুর, মাতালের চিৎকারে সচকিত, রূপান্তরিত হল রূপকথার গোধূলি-রঙিন পথে, যে পথ পেরুলেই দেখা যাবে অনুপম এক প্রাসাদ, যার প্রধান প্রকোষ্ঠে ঘুমিয়ে আছে হৃদয়-কাঁপানো অপরূপ সুন্দরী এক রাজকন্যা, মণিমুক্তাখচিত খাটে, শিয়রে রাখা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে তার ঘুম ভেঙে যাবে এক লহমায়, বরমাল্য পরিয়ে দেবে কৃশকায়, লাজুক এই সদ্য যুবককে।

না, অপরূপ সুন্দরী কোনও রাজকন্যা কিংবা বঙ্গদেশীয় ললনা মালাটালা দিয়ে আমাকে বরণ করেনি কস্মিনকালেও, তবে কোনও কোনও সুন্দরীর সঙ্গে এই পৃথিবীর পথে পরিচয় হয়েছে আমার, তাদের প্রণয়ের স্পর্শে আমার মনের দিগন্ত ক্ষণকালের জন্যে হলেও উদ্ভাসিত হয়েছে। এখানে বলে রাখি, আমি জন্মেছি এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে, নানা বিধি-নিষেধ দিয়ে ঘেরা ছিল আমাদের পারিবারিক গণ্ডি। গুরুজনেরা প্রেম ব্যাপারটিকে সহজ চোখে দেখেছেন কিংবা ভালো মনে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়নি কোনওদিন। আমার পিতামহ, মাতামহ কোনওকালে প্রেমে পড়েছেন বলে শুনি নি। আব্বারও কোনও প্রেমকাহিনি নেই; তবে পত্নীপ্রেম ছিল না, একথা বলি কী করে। বিবাহিত প্রেম অনুমোদন লাভ করত সবার, প্রাক-বিবাহ প্রণয়ের দিকে সর্বক্ষণ উদ্যত তর্জনী, কান মলে দেওয়ার শত আয়োজন। সেকালে সমাজে নিকট আত্মীয়া ছাড়া অন্য কোনও নারীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল দুর্লভ।

যা হোক, দ্রাবিড় কন্যার মতো তন্বীর প্রতি আমার অনুরাগ ছিল প্রকাশিত। স্বেচ্ছায় আমি শ্রেণিচ্যুত হয়েছিলাম সবার অগোচরে। আমার মনের গতিবিধি কেউ লক্ষ করেনি, এমনকি সেই হরিণ নয়নার কাছেও পৌঁছে নি আমার কমলের সৌরভ। সত্যি বলতে কী, ওকে আমি কখনও মুখ ফুটে বলিনি, 'তোমাকে ভালোবাসি'। আমার স্বভাবসিদ্ধ লাজুকতা ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আমাকে। কেউ বিশ্বাস করবে কি-না জানি না, আমি কোনওদিন ওর সঙ্গে একটি কথাও বলি নি, সেও ছিল নীরব। তবে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে অসংখ্যবার। আমার দৃষ্টির ভাষা সেই আনপড় মেয়ে পড়তে পারত কি-না জানি না। ওর চোখের প্রকৃত ভাষাও কি সঠিক পড়তে সক্ষম হয়েছি আমি, যে আমি ইশকুলের বেড়া ডিঙিয়ে এক কলেজ পড়ুয়া? সেই ভাষায় আর যাই থাক, প্রাকৃত কিছু ছিল না।

তখনও আমি নূরপুর ভিলাতেই আছি। মাঝেমধ্যে ছেচল্লিশ নম্বর মাহুৎটুলিতে যাই। একদিন কী মনে হল, কিছু হাস্নুহানা নিয়ে ভর সন্ধেবেলা বাসায় গেলাম। দোতলা বাড়ির ছাদে এক ফাঁকে ফুলগুলো সেই মৃগনয়নার হাতে দিলাম দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে। কোনও কথা না বলে মধুর হেসে গ্রহণ করল আমার সামান্য উপহার। ছাদে আমি আর থাকি নি বেশিক্ষণ, তরতরিয়ে নেমে এলাম নিচে। ঘণ্টাখানেক পরে দেখলাম ওকে বারান্দায়, ওর খোঁপায় ফুলগুলো আরও সুন্দর হয়ে মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে।

নূরপুর ভিলায় ক্লাসের পড়ায় কোনও অগ্রগতি হয়নি, বাড়িতে ফিরে এসেও বইপত্রে মন বসল না। আমি বসে থাকি তার আসা-যাওয়ার পথের ধারে। লেখাপড়া করার জন্য আম্মা আমাকে বড়ো ঘরের নিরিবিলি একটি কোণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই পাতা হয় আমার পড়ার টেবিল। দেয়ালে কাঠপেনসিল দিয়ে আঁকি রবীন্দ্রনাথের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের আদল। শ্মশ্রুরাশির জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রোফাইল আঁকা সহজ মনে হয়। সেই প্রোফাইলের নিচে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তি লিখে রাখি — 'কালো? তা সে যতই কালো হোক/দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

গৃহপরিচারিকার কন্যার কাছে সেই প্রোফাইল এবং পঙ্‌ক্তিদ্বয় কোনও অর্থ বহন করে না।

আমি চেয়ারে বসে এইচ.জি.ওয়েলস-এর 'টাইম মেশিন' বইটি পড়তে চেষ্টা করি, বেশিদূর এগোতে ব্যর্থ হই। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে হিন্দি ফিল্‌মের গানের সুর। তারই কণ্ঠসুর, যে আমার হৃদয়-কানন বিহারিণী। জানি না কার উদ্দেশে সে বইয়ে দিচ্ছে তার সুরের ঝরনা। আমি সেই রূপালি জলধারায় স্নাত, এটুকুই আমার লাভ। হয়তো সে পাশের ঘর থেকে আমাকে গানের ভাষায়, প্রাণের ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে তার উপস্থিতি। সংকোচ আমাকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেয় না, বসে থাকি একা-একা। সেও কাছে আসে না, পাছে কোনও সতর্ক দৃষ্টি আবিষ্কার করে ফেলে সেই মোহন দৃশ্য। একদিন সারাক্ষণ অপেক্ষা করেও ওর কোনও সাড়াশব্দ পাই না। না চকিত দৃষ্টি, না গানের সুর। পরপর কয়েকদিন সে এল না। শুনতে পেলাম ওর নাকি বিয়ে।

সেদিন আমার বুকের ভেতর কেউ কি ডুকরে উঠেছিল কোনও কথা বলতে না পারার বেদনায়? জানি না কোথায় হারিয়ে গিয়েছে দ্রাবিড় কন্যার মতো তন্বী। তার খবর রাখার কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি। খবর আমাকে দিতই বা কে? কিছুদিন একটা অন্ধ অভিমান দখল করে রেখেছিল আমাকে। কার উপর অভিমান? তার উপর? সঙ্কীর্ণ, কপট, নিষ্ঠুর সমাজের উপর? নাকি আমার নিজেরই উপর? যার উপরই হোক, তাতে কারও কিছু যায় আসে না। আজও কখনও কখনও কানে ভেসে আসে ওর গানের ছায়াচ্ছন্ন সুর, সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে দু'টি গভীর, আয়ত চোখ।

ঢাকা কলেজের দিনগুলো কাটতে থাকে উত্তেজনার মধ্য দিয়ে, প্রায়ই স্ট্রাইক, মিটিং। একবার কলেজ প্রাঙ্গণে এক সভায় তাজুদ্দিন আহমদকে প্রথম দেখি। সেদিন তিনি একটি উদীপক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, মনে পড়ে। তাঁর বক্তব্য আমার মনে নেই। তবে তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছিল, তিনি একজন আদর্শবাদী ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে ছিল দৃঢ়তার পরিচয়, একজন সত্যিকারের নেতা হওয়ার গুণাবলি। তখন চলছে পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই সমবেত হচ্ছে মুসলিম লিগের পতাকার নীচে নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তাজউদ্দিন আহমদ সেই সময়ে একজন ছাত্রনেতা, মুসলিম লিগের নিষ্ঠাবান কর্মী। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। দূর থেকে দেখেছ সেই প্রত্যয়ী, কর্মিষ্ঠ দেশপ্রেমিককে।

কলেজ জীবনে পরিচয় হয়েছিল আজকের অন্যতম আওয়ামী লিগ নেতা জিল্লুর রহমানের সঙ্গে। কলেজের অফিসঘরে যাবার মুখে একটি বারান্দা ছিল। মাঝে মাঝে, যখন ক্লাস থাকত না কিংবা কোনও অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগত না, সেখানে বসে সময় কাটাতাম একা-একা। একদিন বসে আছি সেই জনবিরল বারান্দায়, এমন সময় জিল্লুর রহমান আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কী মনে হল তিনি আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী লেখেন?' কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, 'না তো।' মিথ্যা বলি নি। জিল্লুর রহমান আমার পাশে বসে বললেন, 'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় যে, আপনি লেখালেখি করেন। লেখেন না কেন?' দেখে কাউকে লেখক মনে হয় না কি, নিজেকে প্রশ্ন করলাম। আমাদের দু'জনের মধ্যে আলাপ জমে উঠল। আমি বেশি কথা বলি নি। জিল্লুর রহমান আলুর বাজারে একটি মেসে থাকতেন। তিনি আমাকে সেই মেসে আমন্ত্রণ জানালেন। মেসে যাওয়া শুরু হল আমার। জিল্লুর রহমানের অমায়িক ব্যবহার ছিল প্রধান আকর্ষণ। আমি বিশিষ্ট কেউ নই, তবু যে তিনি আমাকে সম্মান জানালেন একজন ব্যক্তি হিসাবে সেজন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। মন খারাপ হলেই তাঁর মেসে চলে যেতাম। কোনও কোনও দিন ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়তাম তাঁর বিছানায়। যখনই দেখা হত তিনি আমাকে লিখতে বলতেন। কী লিখব? আমার পক্ষ কখনও কি লেখা সম্ভব? এ ধরনের দু'একটি প্রশ্ন করতাম নিজেকে। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসার কোনও আগ্রহ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হত না।

কলেজের লাইব্রেরিতে যেতাম কখনও-সখনও। মনে পড়ে লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়ে রোমা রঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ' পড়েছিলাম। এই মহৎ উপন্যাসের গভীরতা তখন বোধহয় পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি আমার ছটফটে স্বভাবের দরুন, কিন্তু এটুকু বুঝতে

পেরেছিলাম যে, এ ধরনের বই পড়লে নিশ্চিত আত্মশুদ্ধি ঘটে। বিরাট কোনও মনের সংস্পর্শে এলে সেই বিরাটত্বের ছায়া নিজের মানসে পড়ে। এটা কম উপকারী নয়। একদিকে 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর মতো বই পড়ছি রাত জেগে, অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি দেখাচ্ছি চরম অবহেলা। ক্লাস ফাঁকি দিয়েছি প্রচুর। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, হারামণির বিখ্যাত সংকলক, আমাদের বাংলা পড়াতেন। ক্লাস নেওয়ার সময়ে প্রায়শই ক্লাসরুমের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। না, তাকিয়ে থাকা শব্দ দু'টি ব্যবহার করা ঠিক হল না। তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকত। তাই তাঁর উর্ধ্বচারী নিমীলিত নেত্রের সুযোগ নিয়ে ক্লাস পালানো ছিল সহজ। প্রক্সি দিয়ে দাও ছুট 'ব্রিটানিয়া' সিনেমা হলের দিকে। 'ব্রিটানিয়া' ছিল তখনকার অভিজাত সিনেমা হল, যেখানে শুধু ইংরেজি ফিলম্ দেখানো হত। ব্রিটানিয়ায় ম্যাটিনি শোতে বহু নামজাদা ফিলম্ দেখেছি। পল মুনি অভিনিত একাধিক ছবি সেখানেই দেখি। 'গ্রেটা গার্বো' এবং চার্লস বয়ারের 'ম্যারি ওয়ালেস্কা'ও দেখি ব্রিটানিয়ায়। কলেজ জীবনের অনেক দুপুরের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বহুকাল আগে লুপ্ত ঐ সিনেমা হলটিতে।

সে-সব দুপুর এখন ধূসর ছায়া, এবং রকমারি ছায়া আমার বর্তমানকে ভরিয়ে রাখে তাদের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর দিয়ে। কোনও কোনও ধূসর গোধূলিতে যখন দৃষ্টি ছড়িয়ে দিই অদৃশ্য করুণ রঙিন পথে, তখন একটি কি দু'টি মুখ, আবছা কোনও কথা কিংবা অস্পষ্ট স্মৃতি, কোনও গানের কলি হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মনের ভেতরে বাজতে থাকে বেহাগের সুর।

## ॥ আট ॥

স্মৃতিরেখা কখনও একরোখা নয়, সবসময় শুধু একটি অনুসরণ করে না, নানা দিকে এর গতিধারা। কখনও উর্ধ্বমুখী, কখনও অধোগামী। কখনও স্মৃতি চলে ঘুরপথে। তাই, ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে ওঠে। সত্যি বলতে কী, সময়হীনতার সময় বয়ে চলেছে স্রোতের মতো। কখনও কখনও মনে হয়, সময় বলে কিছু নেই। আমাদের জীবনধারণের মধ্যে নানা তরঙ্গ ভঙ্গ আছে, আছে চূর্ণ চূর্ণ অগণিত বুদবুদ, সেই বিলীয়মান বুদবুদগুলোকেই সময় বলে শনাক্ত করতে আমরা চেষ্টাশীল হই। জীবনকথা রচনা করতে গিয়ে এই আপাত-সত্য আরও স্পষ্ট মূর্তিতে উপস্থিত হয় সম্মুখে। পরের ঘটনা আগে হাজির হয়, আগের ঘটনা মুখভার করে কুণ্ঠিত মনে পরে এসে দাঁড়ায়। যেন সে উপেক্ষিত হয়েছে। আসলে জীবনের অভিজ্ঞতা কিছুই তুচ্ছ নয়, উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই আমাদের সকলের জন্য লিখে গেছেন, 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।' যে অতিথির আগে আসার কথা কোনও কারণে তিনি খুব পরে এলেও পরম কাঙ্ক্ষিত। কোনও অবহেলা তার প্রাপ্য নয়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আলস্য পোহাচ্ছি। পাঠ্য বই পড়তে হচ্ছে না, স্কুলে যাওয়ার দায় নেই। আবু তাহের ছাড়া অন্য কোনও বন্ধুর মুখ দেখা যায় না। আব্বা আগেকার ক্ষতির ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন। আমি ১৯৪৫ সালের কথা বলছি। ইস্কাটনের স্মৃতি ইতিমধ্যে অনুজ্জ্বল। কখনও কখনও দিলারা-শওকতের কথা মনে পড়ে। ওস্তাদজির

সুরেলা কণ্ঠও ভেসে আসে। বৃদ্ধ আবদুল কাইয়ুম, দিলারা-শওকতের গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় নানা, লাঠি হাতে হেঁটে যাচ্ছে গাছ ঢাকা পথ দিয়ে -- এই দৃশ্যও ঝলসে ওঠে কখনও সখনও। পাড়া-গাঁ তুল্য কাওরান বাজারের ছায়াচ্ছন্ন পথ, জলাশয়, লেবুতলা, সারি সারি জামগাছ, বুনো ফুল, আর দিঘির জন্য হঠাৎ কোনওদিন মন কেমন করে। মাত্র দু'বছরে স্মৃতি কত ফিকে হয়ে যায়। সে-কথা ১৯৪৫ সালের এক বিকাল প্রথম আবিষ্কার করে ব্যথিত হই। আমাদের সংসারে আবার কিছু স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আব্বা আজমীর শরীফে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। এর আগে একবার আব্বা সবাইকে নিয়ে আজমীর শরীফ বেড়িয়ে এসেছেন, জিয়ারত করে এসেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মাজার। সেবার আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দরুন আব্বা-আম্মার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারিনি। এবার সুযোগ এল যাওয়ার। ট্রেনপথে দূরের যাত্রা। কিন্তু শারীরিক কোনও ক্লেশ বোধ করিনি, ভ্রমণের আনন্দে দীর্ঘ পথ ক্লান্তিকর মনে হয়নি মুহূর্তের জন্যেও।

আজমীর শরীফে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হল। ওরশের সময় ছিল। সর্বক্ষণ মাজারে ভিড়। অসম্ভব ভিড়। লোকজনের বিরতিহীন আসা-যাওয়া। সবাই মাজার জিয়ারত করছেন। প্রত্যেকে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির মাজারে যান, আমার ধারণা, কিছু প্রাপ্তির মকসদে। কারও চাওয়ার কোনও অন্ত নেই। এক এক জনের মকসদ একেক রকম। মনে পড়ে, আজমীর শরীফের মাজারে এক সময়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী এবং মেহবুব খানের বিবি, সরদার আখতারকে দেখি। মেহবুব খান ছিলেন নামজাদা চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি 'আওরাত', 'রোটি' ও 'আন্দাজ'-এর মতো সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সরদার আখতার যুগপৎ রূপবতী এবং গুণবতী। 'আওরাত' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেন তিনি। তার সেই অভিনয় আজও অম্লান আমার স্মৃতিতে। তাকে আজমীর শরীফে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। একবার ইচ্ছা হল তার কাছে গিয়ে কথা বলি, কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল সংকোচ। দূর থেকেই সন্তোষ লাভ করতে হল। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মাজারে প্রবেশ করলেই মনে ভাবান্তর হয়। এই জনদরদি সুফির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। তবে তাঁর মাজারে গিয়ে বুক চাপড়াতে হবে, 'ইয়া খাজা দে দে' বলে চেঁচানো অনুমোদনযোগ্য মনে করি না। কেউ কেউ, ফকির তারা, শরীরের কোনও কোনও অংশে চাকু চালিয়ে দরবারে আর্জি পেশ করে। মাজার জিয়ারতকারীদের টাকা-কড়ি পেয়ে তাদের রোজগার ভালোই হয়, লক্ষ করেছি। শুনেছি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মাজার জিয়ারত করে অনেকের মনষ্কামনা পূর্ণ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের ভিড় জমে সেই সুফির মাজারে, যিনি খাজা গরিব নাওয়াজ বলেও পরিচিত অগনিত ভক্তের কাছে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলতে হয় এই মনষ্কামনা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি কোনও যুক্তিবাদী মনের কাছে গ্রাহ্য নয়। কোনও মানুষকে সাহায্য করার ক্ষমতা কোনও ব্যক্তির, তিনি যত অসামান্যই হোন জীবদ্দশায়, মৃত্যুর পর থাকে না; থাকা সম্ভব নয়। কোনও মহান ব্যক্তির জীবনচর্যা কিংবা শৈল্পিক সৃষ্টি, তার মৃত্যুর পরেও অনেককে পথ দেখাতে পারে। কিন্তু তিনি কারও বিত্ত বাড়ানো কিংবা সন্তান লাভে কোনও কিছুই করতে পারেন না। আজমীর শরীফের মাজারের দু'টি জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছিল — মাজারের ভিতর থেকে ভেসে আসা ফুলের

সুগন্ধ এবং চিত্তাকর্ষক কাওয়ালি। সেখানকার কাওয়ালির মতো কাওয়ালি আমি খুব কমই শুনেছি।

তাজমহল দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। আব্বা-আম্মা আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখে এসেছেন আগের বার। এবার তাঁরা যাবেন না। আমার প্রবল ইচ্ছার কথা জানতেন বলেই আমাকে আগ্রায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন আব্বা। একা সেখানে যাওয়ার সাধ্য নেই আমার। তাঁর ভ্রমণভীরু, অনভিজ্ঞ পুত্র কোথায় গিয়ে কোথায় চলে যাবে এই আশঙ্কায় আব্বা আমাকে আজমীরের খাদেম সাহেবের ছোটো ভাই জনাব শাহাবুদ্দিনের হাওয়ালা করে দিলেন রাহা খরচ দিয়ে। আমরা দু'জন ট্রেনযোগে যাত্রা করলাম আগ্রার দিকে। দুপুরের কিছু আগে আগ্রায় পৌঁছে প্রথমেই বুটি-গোশত খেয়ে নিলাম আমরা দু'জন। লস্যিও খেলাম। যা গরম। খাওয়ার পরেই রওয়ানা হলাম তাজমহলের উদ্দেশে। স্বচক্ষে, ছবিটবিতে নয়, একেবারে সাচ্চা তাজমহল দেখব, এই সুন্দর ভাবনাতেই মশগুলি ছিলাম। ঠিক দুপুরবেলা প্রবেশ করলাম তাজমহলে। কবুল করতে দ্বিধা নেই, তাজমহল দেখে একটু যেন হতাশই হলাম। এই নাকি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য? স্থাপত্যের স-টুকু তখন জানি না। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তাজমহলের অনিন্দ্য রূপের কথা শুনেছি। জানি, তখন আমার এই হতাশ হওয়ার খবর জানালে সবাই আমার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা-তামাশা করত। তাজমহল দেখার শ্রেষ্ঠ সময় হলো পূর্ণিমা রাত। পূর্ণিমা রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হলে তাজমহল দেখাই হবে না। তাই সেই ঝকঝকে, অগ্নিউদগীরণকারী দুপুরেই তাজমহলের বিশ্বনন্দিত রূপ দেখে তৃপ্তি খুঁজতে হল স্বপ্নভঙ্গের অনুভূতি নিয়ে। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, তাজমহলের শ্রেণিবদ্ধ ঝাউগাছের কাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই দেখি, আমার মাথা ঘাসের উপর নেই। জনাব শাহাবুদ্দিনের জানুতে স্থাপিত। আমাকে আরাম দেয়ার জন্য তিনি কখন আমার মাথা তার জানুতে রেখেছিলেন টের পাই নি। আগ্রার তীব্র উত্তাপ এবং আমার অজ্ঞানতাকেই দায়ী করব। আমার দেখার ত্রুটির জন্যই আমি অসামান্য সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়েও বঞ্চিত হলাম। তবু আমার চিত্তে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে রবীন্দ্রনাথের কতিপয় পঙ্‌ক্তি —

> হীরা মুক্তো মানিক্যের ঘটা
> যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রচ্ছটা
> যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
> শুধু থাক
> একবিন্দু নয়নের জল
> কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
> এ তাজমহল।

কেন জানি সেকালে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতার উদ্ধৃতি মন কেড়ে নিতে পারল না, সে জন্য পঙ্‌ক্তিমালার সঙ্গে আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি কখনও কখনও অকারণেই আমার মনের অলিন্দে গুমরে গুমরে উঠত। না-কি পরবর্তী জীবনের কোনও কোনও ঘটনার পূর্বাভাস আমাকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়ে নিত —

তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া --
'ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

যে অদেখা প্রিয়াকে ভবিষ্যতে প্রিয়তমাকে ভুলে যাব, তার ছায়া বুঝি আমাকে এই পঙ্‌ক্তিগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যেত। তাই, বারবার আমাকে উচ্চারণ করতে হত আমার অবচেতন মনের আবছা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে। জীবন হয়তো এমনই রহস্যময়। এখানে পরবর্তীকালে পড়া একজন উর্দু কবির একটি কবিতার কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন, একজন সম্রাট তার অপরিমেয় ঐশ্বর্যের সাহায্য নিয়ে প্রিয়তমার কবরে বিরাট স্মৃতিসৌধ অর্থাৎ তাজমহল নির্মাণ করে আমার মতো দরিদ্র প্রেমিকের ভালোবাসাকে তামাশা বানিয়েছেন।

## ॥ নয় ॥

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে দুটি বছর দেখতে না দেখতে কেটে গেল। টুকরো টুকরো স্মৃতি হালকা মেঘের মতো ভেসে আসে মাঝে-মাঝে। কোনও কোনও মুখ, কোনও কোনও ঘটনা হঠাৎ এসে হাজির হয় মনের ভেতর। কারও কারও নাম মনে পড়ে, কোনও কোনও নাম মুছে গেছে স্মৃতি থেকে। মোশাররফ হোসেন চৌধুরীর কথা খুব মনে পড়ে। প্রায় সবসময় কোট পাতলুন পরে কলেজে আসতেন, গলায় থাকত স্কার্ফ। বেশি সিগারেট খেতেন সেই তরুণ। লেখার হাত ছিল তার। গল্প লিখতেন, কখনও কখনও লিখতেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধরনে কিছু। তার হস্তাক্ষর ছিল বড়ো ধাঁচের, কিন্তু দৃষ্টিনন্দন। তখন তার ভাষাও আমার মন কাড়ত। চমৎকার সাবলীল ভাষা, কিছু কাব্যিয়ানাও ছিল মোশারফ হোসেন চৌধুরীর লেখায়। এখন সেই গদ্যভাষা আমাকে টানবে না, সেকালে মুগ্ধ হতাম। তার কোনও কোনও গল্পের নাম অনেকটা এ ধরনের 'যে কথা হয়নি বলা', 'সে রাতে ওঠেনি চাঁদ'। একবার তিনি আমাকে তার একটি খাতা দিয়েছিলেন পড়ার জন্যে। দীর্ঘ ব্যক্তিগত রচনা। সেই লেখায় তার অন্তরের পরিচয় ছিল, ছিল এক ধরনের দার্শনিকতা। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছিলাম সেই দীর্ঘ লেখা। বড় ভালো লেগেছিল। খাতার কয়েকটি পাতা শূন্য ছিল। একটি পাতায় লেখা ছিল —

জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনি তরো শূন্য থাকে,
আপন মনের ধেয়ান দিয়ে
পূর্ণ করে লও না তাকে।

এই চারটি পঙ্‌ক্তি কার লেখা? সেদিন মনে প্রশ্ন জেগেছিল। মোশারফ হোসেন চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিলাম কি? করলেও কোনও উত্তর পাইনি। হয়তো ইচ্ছে করেই তিনি নীরব ছিলেন, রহস্য উন্মোচন করতে চাননি। আজও আমি জানি না পঙ্‌ক্তিগুলো

কার রচনা। কখনও কখনও মনে হয়, এই চারটি পঙ্‌ক্তি কোনও ফারসি কবির কবিতার অনুবাদ।

মোশাররফ হোসেন চৌধুরী সেকালে নিজেকে একজন ট্রাজিক নায়ক বলে মনে করতেন। তাকে কেউ কেউ সিডনি কার্টন বলে ডাকতেন। সিডনি কার্টন চার্লস ডিকেন্স-এর উপন্যাস 'এ টেল অফ টু সিটিজ'-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্র, যে প্রেমিকার স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তার বদলে নিজে গিলোটিন-মঞ্চে আরওহণ করেন। বড়ো মর্মস্পর্শী এই আত্মোৎসর্গ। ঢাকায় তখন 'এ টেল অফ টু সিটিজ' ফিল্‌মিটি দেখানো হচ্ছে। সিডনি কার্টনের ভূমিকায় অভিনয় করেন নামজাদা অধিনেতা রোনাল্ড কোলম্যান। গভীর বেদনা মুদ্রিত ছিল তার দু'টি চোখে। মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, যতদূর মনে পড়ে, রোনাল্ড কোলম্যানরূপী সিডনি কার্টনকে অনুকরণ করতে চেষ্টাশীল ছিলেন চলনে, বলনে এবং বেশভুষায়। তিনি যখন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হেঁটে যেতেন সিদ্দিক বাজারের গলিতে, ঢাকা কলেজের প্রাঙ্গাণে, বেশ লাগত তাকে। স্বল্পভাষী ছিলেন, তিনি যে একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, এ কথা সবসময় মনে রাখতেন। তার ব্যক্তিগত কথা কখনও বলতে শুনিনি তাকে।

ঢাকা কলেজে পড়ার সময় বন্ধু আবু তাহেরের সঙ্গো আমার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। তেমন দেখা হত না তখন। সে ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র আর আমি আর্টস-এর। কালেভদ্রে দেখা হত ক্ষণিকের জন্যে। কলেজে আওয়ামী লীগের জিল্লুর রহমান ছাড়া অন্য কারও সঙ্গো বন্ধুতা গড়ে ওঠেনি। কয়েকজনের সঙ্গো সামান্য পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু তাদের নাম এখন ভুলে গিয়েছি। একজনের কথা মনে পড়ে, যিনি হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের গায়ক-অভিনেতা সুরেন্দ্রর ধরনে গান শোনাতেন আমাদের ক্লাসরুমে অফ পিরিয়ডে। তার চেহারায় সুরেন্দ্রর ঈষৎ আদল ছিল।

লাগাতার স্ট্রাইকের জন্যে প্রায়শই ক্লাস হত না, ফলে সহপাঠীদের সঙ্গো বেশি দেখাশোনা হত না, তাছাড়া আমি নিজেই ছিলাম অমনোযোগী, উদাসীন এক ছাত্র। পাঠ্যপুস্তকের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করিনি, মাঝে মাঝে ক্লাস পালিয়ে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি কিংবা সিনেমা দেখেছি। এরই মধ্যে ক্লাসও করেছি আধামনস্কভাবে। আমাদের ইংরেজি পড়াতেন আবু রুশদ মতিনউদ্দিন, একেএম আহসান এবং শফিউল আজম। এই তিন অধ্যাপকই ছিলেন সুদর্শন। তবে আমার কাছে একে এম আহসানকেই মনে হত সবচেয়ে বেশি কান্তিমান। তিনি পড়াতেনও চমৎকার। আবু রুশদ মতিনউদ্দিনও ভালো পড়াতেন। এখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি টেবিল এবং টেবিলের পিছনে একটি উঁচু চেয়ার আর সেই চেয়ারে বসে আছেন সাদা পাঞ্জাবি ও পাজামা-পরা ইংরেজির অধ্যাপক আবু রুশদ মতিনউদ্দিন, তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে শেক্সপিয়রের পঙ্‌ক্তিমালা। তিনি আমাদের 'দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস' পড়াতেন। একে এম আহসান স্যুট পরতেন এবং পড়াতেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গো, ইংরেজি এবং বাংলা দুটো ভাষাই তিনি বলতেন শুদ্ধ উচ্চারণে এবং মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে। কী করে যে তার ক্লাস কখন শেষ হয়ে যেত ঘন্টা না বাজলে বুঝতেই পারতাম না। পরবর্তীকালে আবু রুশদ এবং একেএম আহসানকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

অনেক বছর আগের কথা। তখন কবি এবং সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর জীবিত। 'সমকাল' অফিসে চলে তুমুল আড্ডা। এক সন্ধ্যায় সিকান্দার আবু জাফর আমাকে টেলিফোনে জানালেন, তক্ষুনি আমাকে 'সমকাল' অফিসে হাজির হতে হবে। তিনি আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবেন। তখন আমি 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সহকারী সম্পাদক। 'দৈনিক পাকিস্তান' থেকে 'সমকাল'-এ হেঁটে যেতে দেড় মিনিটের বেশি সময় লাগে না। তাড়াহুড়ো করে কাজ সেরে রওয়ানা হলাম সিকান্দার আবু জাফরের দারবারের উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছতেই জাফর ভাই বললেন, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।' কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে — কিছুই বললেন না। তিনি বলেছেন এটাই যথেষ্ট। কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। তাঁর মোটরকার কিছুক্ষণ পর প্রবেশ করল একটি সুন্দর বাড়িতে। গৃহকর্তাও অসুন্দর নন। তিনি দীর্ঘকায়, সুবেশ এবং স্মার্ট। তাঁর নাম আবদুল আহাদ। না, সংগীতজ্ঞ আবদুল আহাদের কথা বলছি না। ইনি অডিগনামের আবদুল আহাদ, যাঁকে একাত্তরে বর্বর পাকিস্তান বাহিনী হত্যা করে। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। আবদুল আহাদের সঙ্গে সৈয়দা জামাল ইউসুফের বিয়ে হয়। বিদুষী এই মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় করাচিতে ১৯৫৯ সালে। তিনি অধ্যাপনা করতেন। তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য। খুব ভালো ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারতেন। 'পোয়েমস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান' বলে একটি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন করাচি থেকে। সেই গ্রন্থে আমারও একাধিক অক্ষম রচনার অনুবাদ ছিল। সৈয়দা জামাল ইউসুফের তরজমার গুণে আমার অক্ষম পদ্যগুলোকে ততটা অক্ষম মনে হয়নি। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক বছর আগেই তিনি এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বামীহারা তিনি গুলশানে বসবাস করতেন। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। যেদিন খবরের কাগজে পড়লাম তাঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে এবং তিনি নিহত হয়েছেন, সেদিন মর্মাহত হই। যদিও তার সঙ্গে দেখা হত না, তবু আমাদের সুসম্পর্ক ছিল। মাঝে-মাঝে টেলিফোনে আমার খোঁজখবর নিতেন। তাই তাঁর মৃত্যু আমাকে বেদনার্ত করেছিল। অডিগনামের সলিসিটর আবদুল আহাদের সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যাতেই প্রথম পরিচয় হয় আমার। জাফর ভাইয়ের সৌজন্যে একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা এসেছিল আমার জীবনে। রুচিশীল পরিবেশে কাটল কয়েকটি ঘন্টা। গান শুনে, সুরা পান করে, কথা শুনে বেশ রাত করে ঘরে ফিরেছিলাম। সেই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন আমার শিক্ষক একে এম আহসান। আগেকার সেই কালো, কোঁকড়ানো চুল আর নেই মাথায়। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে টাক, কিন্তু কান্তি তখনও অটুট। কিছুক্ষণ কথা হল। কথা বললেন একেএম আহসান, আবদুল আহাদ এবং সিকান্দার আব জাফর। আমি নিষ্ঠাবান শ্রোতা, একটি কি দু'টি বাক্য উচ্চারণ করেই চুপ থাকি। আমরা বসে আছি বারান্দায়। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই হুইস্কির গ্লাস। বাইরে গোপনতার মতো গাঢ় অন্ধকার। এক সময় একে আহসানের কণ্ঠে মঞ্জুরিত হল রবীন্দ্রনাথের গান —

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে।।

সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে —
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকলখানে।।

একেএম আহসান তন্ময় হয়ে গাইছিলেন। তখন আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম তিনি আমার শিক্ষক, বিখ্যাত সিএসপি, তুখোড় আমলা। সেই অন্ধকারে জেগে উঠেছিল তাঁর প্রেমিক সত্তা। গান থামিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ক্লাসের ছাত্র। তিনি তাদের আমলের এক সুন্দরী ছাত্রীর কথা বললেন। তরুণী হিন্দু, অর্থনীতির এক অধ্যাপকের কন্যা। পিতার বিভাগেরই ছাত্রী। তাকে কয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি। অনেকেরই মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো চেহারা। লম্বা, সুগঠিত শরীর, টানা টানা চোখ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রূপ যেন তার সত্তা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তার নাম সম্ভবত শান্তি আয়ার। হয়তো তার দক্ষিণ ভারতীয় পিতা বিয়ে করেছিলেন কোনও বাঙালি তরুণীকে। ঠিক জানি না, এ আমার অনুমান।

ঢাকা কলেজের আরেকজন অধ্যাপকের কথা আমার মনে পড়ে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ আবুল মাসুদ সাঈদ আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে একেএম আহসান এবং শফিউল আজমের মতোই সরকারি আমলা হয়েছিলেন পাকিস্তান আমলে। বাংলাদেশে যুগ্ম সচিব হিসাবে অবসরগ্রহণ করেন। তাকে দু'একবার দূর থেকে দেখেছি কিন্তু আলাপ করার সুযোগ হয়নি। আমাকে চেনার কথা নয় তাঁর। এত কম ক্লাস করেছি যে, হয়তো তিনি কখনও আমাকে লক্ষ্যই করেননি।

মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের কথা আগেই বলেছি। তার ক্লাস ফাঁকি দিয়েছি অনেকবার, তবু কেন জানি তিনি আমাকে মনে রেখেছিলেন। এর প্রমাণ পরবর্তীকালে পেয়েছি। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার কবিতা তার ভালো লাগত। একবার তিনি আমাকে একটি গোলাপ উপহার দিয়ে বলেছিলেন, যদি আমার অনেক টাকা থাকত তাহলে তোমাকে বড়ো রকমের পুরস্কার দিতাম। আমার কাছে তার দেওয়া গোলাপ অনেক পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে হয় আজও। তিনি যখন সস্নেহে একটি রক্ত গোলাপ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন আমি কোনও পুরস্কারই পাইনি। পরবর্তী জীবনে আমি বহু পুরস্কার পেয়েছি। সে সব পুরস্কারের সবগুলোর কথা আমার মনেও পড়ে না, অথচ 'হারামণি' গ্রন্থের প্রণেতা প্রদত্ত গোলাপটির কথা কস্মিনকালেও ভুলব না। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, এই যে পোয়েট, তোমার কবিতাগুলোর তর্জমার ব্যবস্থা করো।

মহম্মদ মনসুরউদ্দিন ছাড়া আর যারা বাংলা পড়াতেন, কেউ কেউ বেশ ভালো পড়াতেন, তাদের নাম মনে পড়ছে না। সেই সুদূর ১৯৪৬ সালের কথা। স্মৃতি থেকে অনেক নাম মুছে গিয়েছে, অনেকের চেহারাও অত্যন্ত আবছা হয়ে এসেছে। একজন হিন্দু অধ্যাপক আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পড়াতেন। খুবই আন্তরিক ছিল তার পড়াবার ধরন। তাঁর মুখে অমায়িক হাসি লেগে থাকত সব সময়। আজ তাঁর নাম মনে করতে পারছি না বলে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। আমাদের কালে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর পরিমল রায়। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় তিনি এবং ইতিহাসের একজন

অধ্যাপক, যাঁর নাম মনে নেই, মুসলমান গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন। ডক্টর পরিমল রায় ছোরার আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান; কিন্তু ইতিহাসের অধ্যাপক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ঢাকা কলেজের ছাত্ররা তাঁকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই সত্য আজও আমাকে লজ্জিত করে।

ডক্টর পরিমল রায় ঢাকা কলেজে আর ফিরে আসেননি। তার বিদায়ের পর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হন জহুরুল ইসলাম। তার পিএইচডি ডিগ্রি ছিল কিনা মনে পড়ে না, তবে কৃতী অধ্যাপক ছিলেন তিনি। অধ্যক্ষ হওয়ার পরও ইতিহাসের কোনও অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকলে তিনি ক্লাস নিতেন। ছোটোখাটো মানুষ, কিন্তু এক ধরনের তেজস্বিতা ছিল তাঁর মধ্যে। এই তেজ তাঁর শারীরিক ত্রুটিকে আড়ালে ঢেকে রাখত।

ঢাকা কলেজের প্রাক্তন দু'জন নিরীহ শিক্ষকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, এই কলঙ্কময় ঘটনা আজও আমাদের গলায় কোলরিজের কবিতার প্রাচীন নাবিকের আলবাট্রস পাখির মতো ঝুলে আছে।

## ॥ দশ ॥

কলেজের বেড়া ডিঙিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে আমি সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনের এক পুরনো বাড়িতে চলে এলাম মাহুৎটুলি ছেড়ে। পুরনো বাড়ি খুব মনোমুগ্ধকর এ কথা বলা যাবে না। তবে কেমন একটা আকর্ষণ ছিল ৩০ নম্বর সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনের সেই আধো-অন্ধকার, আধো-আলোকিত বাড়িটার। মাহুৎটুলি ছেড়ে এসে প্রথম দিকে মন বসে নি এখানে। মাহুৎটুলিতে আমার জন্ম, স্বাভাবিকভাবেই ৪৬ নম্বর মাহুৎটুলির দোতলা বাড়িটার প্রতি আমার গাঢ় টান ছিল, এখনও সেই দোতলা বাড়ির কথা ভাবলে মন কেমন করে। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সরু গলির ভেতরকার বাড়িটার সঙ্গে। মাহুৎটুলির বাড়ি আজ আর আমাদের নেই। এখন সেখানে গেলে সেই বাড়ি আর খুঁজে পাব না। কারণ এখন সেই বাড়ির মালিক যারা তারা সেটিকে ভেঙেচুরে একেবারে নতুন করে ফেলেছে, পুরনো কোনও কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে নানা-নানির কথা, আব্বা-আম্মার কথা, মামা-মামির কথা, চাচা-চাচির কথা, ভাই-বোনদের কথা। কোনও কোনও কাজের লোকের মুখও মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই ছাদটির কথা, যা এখন আর নেই, যেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি সকাল সন্ধ্যায়, কখনও কখনও রাতে। ছাদে বসে দেখেছি মেঘের ভেসে-যাওয়া, উড্ডীন কিংবা ভোকাট্টা ঘুড়ি, অনেক দূরের তারার মেলা, চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি খেলা। মনে পড়ে, ছাদের অন্ধকারে কোনও এক সন্ধ্যায় একজন তরুণীর ইচ্ছুক ঠোঁটে ওষ্ঠ স্থাপন করেছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এখন সে কোথায় আছে জানি না। তার হয়তো মনেও পড়ে না সেই সন্ধ্যার কথা।

গোড়ার দিকে সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনের বাড়িতে আমার মন বসেনি। পুরনো বাড়ি আমার মন কাড়ে। হাল আমলের ঝকঝকে নতুন বাড়ি দেখলে চোখ জুড়োয়, কেমন রহস্যঘন পরিবেশ তৈরি হয় মনের ভেতর। পুরনো বাড়িগুলো ধারণ করে এক দীর্ঘ ইতিহাস, অনেক অজানা তথ্য লুকিয়ে থাকে পলেস্তরা-খসা দেয়ালে, ছাদের কার্নিশে।

পুরনো বাড়ির কণ্ঠস্বর থাকলে আমরা শুনতে পেতাম অনেক কাহিনি, আমাদের কাছে উন্মোচিত হত অনেক রহস্য।

যা হোক, আস্তে আস্তে সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনের ৩০ নম্বর বাড়িটি আমার কাছে আদরনীয় হয়ে উঠল, এক ধরনের মায়া জন্মাতে শুরু করল বাড়িটির জন্যে। সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনের আরেকটি নাম ছিল আশেক জমাদার লেন, সংক্ষেপে আশেক লেন। আমি অনেকদিন আশেক লেন নামটিরই বেশি পক্ষপাতি ছিলাম। আশেক লেনের উলটোদিকে ডাক্তার আবেদউদ্দিন আহমদের বাড়ি। একদা এই চিকিৎসকের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতেন অজিত দত্ত। এই তথ্য আমি পরে সংগ্রহ করি। আর ১৭ নম্বর আসেক লেনের বাড়ি আমার বন্ধু শিল্পী হামিদুর রহমানদের। আজ হামিদুর রহমান নেই, নেই তার অগ্রজ নাসির আহমদ এবং নাজির আহমদ। বেঁচে আছে হামিদের অনুজ নাট্যকার সাঈদ আহমদ। এই ১৭ নম্বর আশেক লেনের দোতলা বাড়ির প্রান্তিক এক ছোটো ঘরেই পরে জমে উঠবে আমাদের আড্ডা হামিদুর রহমানের আগ্রহে এবং উদ্যমে। হামিদ আমাকে ডেকে নেন একদিন আমাদের বাড়ির গেট থেকে। এক বিকেলবেলা আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম গেটের সামনে। অন্যমনে দেখছিলাম পথচারীদের আসা-যাওয়া। আমার দিকে এগিয়ে এলো প্রায় আমারই সমবয়সি সতেজ এক তরুণ। মাথায় ছোটো চুল, মুখে বসন্তের দাগ, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত, ওর হাসিতেও যেন বুদ্ধির ছটা। আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। চেনার কথাও নয়। হামিদ সেই বিকেলেই ওদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল। একটু অবাকই হয়েছিলাম সেদিন। দেখলাম, ওদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় চারজন তরুণ ব্যাডমিন্টন খেলছিল। পরে একদিন হামিদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি আমাকে এভাবে ডেকে নিয়ে এসেছিলে কেন? আমাকে তো চিনতে না তুমি?' সে যা বলেছিল তার সার কথা হল — আমি লেখালেখি করি এমন এক ধারণা জন্মেছিল ওর মনে। সে মহল্লায় আমি আগন্তুক এবং বেশ আলাদা অন্য তরুণদের চেয়ে, এটা সে নাকি বুঝতে পেরেছিল।

অথচ তখন আমি লেখালেখি শুরুই করি নি।

কারও চেহারা দেখে কি বুঝতে পারা যায় যে, তিনি একজন লেখক? লেখার সঙ্গে চেহারার কী সম্পর্ক। মূলত নাজির আহমদের জন্যেই হামদিদের বাসায় একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। সেই বাসায় অনেক গুণীজনের আসা-যাওয়া ছিল। মোট কথা, ১৭ নম্বর আশেক লেনের পরিবেশ খুব ভালো লাগল আমার। সেখানেই প্রথম দেখি অসামান্য চিত্রকর এস এম সুলতান; সংগীতশিল্পী আবদুল আহাদ, অভিনেতা ফতেহ লোহানী, ওস্তাদ মাস্তান গামা এবং কাদের জামেরিকে। দুই ঘরে জমে উঠত দু'টি আড্ডা। আমরা যারা বয়সে ছোটো ছিলাম তাদের আসর জমত হামিদের কোনার ছোটো ঘরে। বড়োরা আড্ডায় মশগুল হতেন খাস বৈঠকখানায়, যাকে নাজির ভাই বলতেন দহলিজ। হামিদের অন্যতম বন্ধু নূরুল হুদা হরহামেশা আসত ছোটো ঘরের আড্ডায়। আমিও তার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। নুরুল হুদা পরে একজন বড়ো সরকারি আমলা হয়েছিল। আর মাঝে-মাঝে আসত ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে

দেখতাম সেই মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, যার লেখার অনুরক্ত পাঠক ছিল হামিদুর রহমান। এই আড্ডায় আসত হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, চিত্রকর আমিনুল ইসলাম, মুর্তাজা বশীর, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। নবাববাড়ি থেকে আসত আশরাফ আলী। আশরাফ আলী আমাদের কাছে মাবেজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড়ো হলেও আমরা বন্ধু হতে পেরেছিলাম তার। তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। তিনি সেই সময় নবাববাড়ির এক পাশের একটি ভাঙাচোরা দালানে থাকতেন। এই দালানটি একদা ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। দোতলায় থাকতেন আশরাফ আলী। প্রচুর চা-সিগারেট খেতেন তিনি। তার পড়ার ঘরে ছিল রাশি রাশি ইংরেজি বই। মাঝে-মাঝে তিনি ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের বিশেষত জন কিটস-এর কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আমি যে পরে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হই তার পিছনে আশরাফ আলীর উৎসাহ ও প্রেরণা কাজ করেছিল। হামিদ, নূরুল হুদা এবং আমি প্রায়শ আশরাফ আলীর নবাববাড়ির ডেরায় হাজির হতাম আড্ডার লোভে। সেই আড্ডার প্রধান কথক ছিলেন আশরাফ আলী অর্থাৎ মাবেজ। তার মুখে হরহামেশা উচ্চারিত হত ইংরেজি কবি-সাহিত্যিকদের নাম।

হামদুর রহমানের ঘরেই প্রথম দেখি রবীন্দ্র রচনাবলীর সুদৃশ্য সেট। সেট-এর কয়েকটি ভল্যুম কোথায় ছিটকে পড়েছিল, কে জানে। তখন আমি রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট ছিলাম না। ফলে কোনওদিন হামিদের কাছ থেকে কোনও ভল্যুম ধার নিইনি। অন্য কী বই ধার নিয়ে পড়েছিলাম তা আজ মনে পড়ে না। হামিদ সম্ভবত কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, এজন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি সে। সে কোন কলেজে পড়ত, আমার জানা ছিল না। হামিদের কাছে জানতেও চাইনি কোনওদিন। হামিদ যেমন ছিল তেমনই পছন্দ করতাম। কথাবার্তায় পটু, বন্ধুবৎসল তরুণটি কী ডিগ্রি হাসিল করল কী করল না তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কোনও মানুষকে আমি ডিগ্রিপ্রাপ্তির মাপকাঠিতে বিচার করার লোভ তারুণ্যেই সংবরণ করতে পেরেছিলাম। তা বলে ভালো ডিগ্রিপ্রাপ্তদের প্রতি কোনও অসূয়া বোধ করিনি কখনও। তাদের অনেকেরই বন্ধু ছিলাম, এখনও আছি।

ইতিমধ্যে আমার মধ্যে একটা কিছু সৃষ্টি করার আগ্রহ হয়তো আমার অজান্তেই উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল। আর হঠাৎ এক মেঘলা দুপুরে মনোভার নামানোর ব্যাকুলতায় একটি কবিতা লিখে ফেলি। আমার কবিতা পড়ে হামিদ খুব খুশি হয়। তখন সে গল্প লিখত। পরে অবশ্য কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়। আজ সে নেই, কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, সে আমাকে গোড়ার দিকে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে। তারই তাগিদে আমি আমার একটি কবিতা সেকালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোনার বাংলা'য় দাখিল করি। 'সোনার বাংলা'য় একসময় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য নামজাদা লেখক লিখতেন। আমার অক্ষম লেখা কে ছাপাবে, একথা হামিদকে বললেই সে জবাব দিত, 'পাঠিয়েই দেখ না, আমার বিশ্বাস, তোমার লেখা ছাপা হবেই।' আর কী আশ্চর্য, আমার কবিতা ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি 'সোনার বাংলায়' প্রকাশিত হল। সেই দিনটি আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে। সেদিন আমার চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিল হামিদ। আমরা তখন ইংরেজির অধ্যাপক আজহার হোসেনের সংস্পর্শে আসি।

তাঁর বাসায় সাহিত্যের আসর বসত। আমরা সেই আসরে কেউ গল্প, কেউ কবিতা পড়ে শোনাতাম। আজহার হোসেন নিজে ছোটোগল্প লিখতেন। তিনি যে বুদ্ধদেব বসুর একজন অনুরক্ত ভক্ত পাঠক ছিলেন তার প্রমাণ মিলত তার লেখা গল্পে। তিনি আমাদের লেখার সমালোচনা করতেন এবং সৎপরামর্শ দিতে কার্পণ্য করতেন না কখনও। তার মুখে, মনে পড়ে, সবসময় একটা লাজুক হাসি লেগে থাকত। বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। জানি না, তিনি এখন কেমন আছেন। আশা করি, ভালোই আছেন।

'সোনার বাংলা'য় আমার কবিতা মুদ্রিত হওয়ার পর পরই হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল সদরঘাটে একটি ফলের দোকানের সামনে। আমরা কেউই ফল কিনতে যাই নি সেখানে। সেদিন কেন যে সদরঘাটে গিয়েছিলাম, মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে একটি ফলের দোকান আর হাসান হাফিজুর রহমানের স্নিগ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। হাসান বয়সে আমার দু'বছরের ছোটো কিন্তু লেখক হিসেবে আমার সিনিয়র ছিল। কারণ আমার লেখা ছাপা হওয়ার আগেই ওর ছোটোগল্প 'অশ্রুভেজা পথ চলতে' কলকাতায় মাসিক 'সওগাত'-এ এবং একটি কবিতা 'পুনর্বসতি' 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। সে আমাকে কী করে চিনল, বুঝতে পারি নি। আমি আগে কখনও দেখি নি, যদিও তার কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল কলকাতার 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর সাহিত্য সাময়িকীর পাতায়। তখন 'ইত্তেহাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন আহসান হাবীব।

প্রথম দেখাতেই হাসান আমার কবিতার তারিফ করেছিল, যদিও সবেমাত্র একটি কবিতাটি তখন প্রকাশিত হয়েছে। তখন হাসানের বাসা ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছাকাছি নাজিমুদ্দিন রোডের একটি গুলির ভেতর। সেখানেই দেখি সাইয়িদ আতীকুল্লাহকে। তখন তার মাথায় বাবরি বাউলদের মতোই। কিন্তু পরনে শার্ট এবং ট্রাউজার। চোখেমুখে এক ধরনের দীপ্ত অহংকার, যা তাকে বেশ মানিয়েছিল।

## ॥ এগারো ॥

স্মৃতি কোনও বাঁধাধরা নিয়ম চলে না। বড়ো জটিল এর গতি। তাই কখনও কখনও আগের ঘটনা পরে এসে পড়ে। আবার পরের কোনও কোনও ঘটনার ছায়া পড়ে আগে। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি ভর্তি হই তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম একটি বড়ো ভবনে প্রবেশ করব, কিন্তু এখানেও আমার স্বপ্নভঙ্গ হল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে। এই ভবনের অর্ধেকটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগে পড়ে আধখানা দালান এবং কার্জন হল। আমি যখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই তখন এই বিভাগে বেশ ক'জন নামজাদা অধ্যাপক ক্লাস নিতেন। এঁরা হলেন এম এন ঘোষ, যাঁকে সংক্ষেপে বলা হত এমএনজি, এসএন রায়, অমলেন্দু বসু, বিসি রায়, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখ। এমএনজির দু'টি ক্লাস আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মাত্র দু'দিন ক্লাস পেয়েছিলাম। তিনি যে ক্লাস দু'টোতে আমাদের শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি

বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে দু'টি লেকচার শুনেছিলাম। তিনি শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি বিষয়ে যা বলেছিলেন তা আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করে। তিনি যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তার চেয়ে গভীর কিংবা উজ্জ্বল ভাষণ বা বক্তব্য আমি কোনও পুস্তকে পাইনি। দুঃখের বিষয়, দাঙ্গার প্রকোপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু হিন্দু অধ্যাপক ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। বিখ্যাত সমালোচক অমলেন্দু বসু, যিনি বুদ্ধদেব বসুর বন্ধু ছিলেন, তাঁর একটি ক্লাস করারও সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। তবে বিসি রায় এবং অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর বেশ কিছু ক্লাসে আমাদের সময় কেটেছে। অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, আমাদের পড়াতেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের কাব্য। তিনি কিটস, শেলি, বায়রনের কবিতা পড়িয়েছেন। বিসি রায় আমাদের পড়াতেন আলেকজান্ডার পোপের কবিতা। তাঁর ক্লাস আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তবে এখানে তাঁর বিষয়ে একটি আলাদা ধরনের কথা বলার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। ওয়াকিবহাল মহলের সূত্রে জানতে পেরেছিলাম, তিনি এবং হুমায়ূন কবির হিন্দু সম্প্রদায়ের একই তরুণীকে ভালোবাসতেন। তাঁরা দু'জনই সেই তরুণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই তরুণীর শর্ত ছিল, এই দু'জন প্রণয়প্রার্থীর মধ্যে যিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবেন তার গলায় তিনি বরমাল্য পরাবেন। ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন হুমায়ূন কবির, যিনি পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্থায়ী দাগ কেটেছিলেন। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদই ছিলেন না, একজন কবি এবং বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গা'র সম্পাদকও ছিলেন। যা হোক, আমাদের শিক্ষক বিসি রায় পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিলেন বলে তিনি তার দয়িতাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে ব্যর্থ হন। তিনি শেষপর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসেন নি।

আমার সাবসিডিয়ারি ছিল বাংলা ও ইতিহাস। বাংলা যাঁরা পড়াতেন তাঁদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগত অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ীকে। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় এবং সুদর্শন। সোনালি রঙের রিমলেস চশমা পরতেন তিনি। তাঁর চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তি। তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র প্রবন্ধ পড়াতেন। মুগ্ধ হয়ে তাঁর লেকচার শুনতাম। তাঁর ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সব ছাত্র বিদায় নেয়ার পর আমি তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতাম। তাঁকে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে নেয়ার তৃষ্ণা প্রখর ছিল আমার। ক্লাসের পাঠ্যবস্তুর বাইরে অনেক বইয়ের বিষয় সম্পর্কে জেনে নেয়ার আমার আগ্রহ দেখে তিনি সানন্দে ক্লাস শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে আমার কথা শুনতেন এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অল্পবয়সি ছাত্র বলে কখনও অবহেলা করতেন না। আজও কখনও কখনও আমার সেই প্রিয় অধ্যাপকের মুখ স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী আমাকে পছন্দ করতেন, আমি কবিতা লিখি বলে। তিনি কী করে যেন জানতে পেরেছিলেন আমার এই গোপন কাজটির কথা। এ প্রসঙ্গে আমি পরে বলব।

আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, এসএম আলী এবং সাবের রেজা করিম। একদিন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর হাতে আমি জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর

পাণ্ডুলিপি' বইটি দেখতে পাই। জীবনানন্দ দাশের নাম আমার কাছে তখন অচেনা ছিল। কিন্তু বইটির নাম আমার খুব ভালো লেগেছিল। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর কাছে বইটি ধার চাওয়ার লোভ সামলাতে পারি নি। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'এক শর্তে বইটি দিতে পারি। কাল সকালেই বইটি ফেরত দিতে হবে। এ বই আমার নয়, কল্যাণ দাশগুপ্তের কাছ থেকে ধার নিয়েছি।' আমি এ শর্ত পালন করতে রাজি হলাম। বইটি বিকালেই পেয়েছিলাম এবং বাড়িতে এসে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পাতায় মনোনিবেশ করলাম। কোনওমতে আম্মার পরিবেশিত খাদ্য জঠরে চালান করে সেই কবিতার বই পড়তে শুরু করলাম। আজও মনে পড়ে, সারা রাত জেগে ধূসর পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলো পড়েছিলাম। এরকম কবিতা আমি আগে কখনও পড়িনি। এরপর থেকেই আমি জীবনানন্দ দাশের অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়ি। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নিজে কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতা কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত 'সওগাত' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এ কথা আমি ইতোমধ্যে জানতে পেরেছিলাম। তাঁর কবিতায় একটি রোমান্টিক সুর ফুটে উঠত। তিনি তাঁর দু'তিন সহপাঠীর কাছে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আমি নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে মনে লজ্জা পেতাম। ফলে কারও সামনে কবিতা পড়ার লোভের টুঁটি চেপে ধরেছি বার বার।

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী অর্থাৎ এসএম আলী, যিনি আমার অন্যতম সহপাঠী ছিলেন, তিনি সেই ছাত্রাবস্থাতেই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান অবজারভারে তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন। বেশ কিছু পরে তিনি তাঁর কলামে আমার কবিতা বিষয়েও উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করেছিলেন মনে পড়ে। তিনি আমার যে কবিতাগুলোর তারিফ করেছিলেন সেসব কবিতা আমার কোনও কাব্যগ্রন্থে ঠাঁই পায়নি। আমার কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর নানা উক্তিতে। আজও মনে পড়ে, তিনি ডেইলি স্টারের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে আমার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলেন ডেইলি স্টারে। তিনি নিজে সেই সাক্ষাৎকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নানা প্রশ্ন করে। তাঁর মৃত্যু আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল তা আজ অবধি পূর্ণ হয়নি। আমার অন্যতম সহপাঠী সাবের রেজা করিম একজন জাঁদরেল আমলা হন ছাত্রাবস্থার পরে সিএসপি হিসাবে। এখন তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন স্বদেশে, যদিও মাঝে মাঝে বিদেশে যান। সহপাঠী এবং বন্ধু জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী পরীক্ষায় ঔজ্জ্বল্যের স্বাক্ষর রেখে অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখনও তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করছেন। আমি যে তিন বন্ধুর কথা বললাম, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট, সফল এবং দীপ্তিমান।

আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে অনেক গাফিলতি করেছি। পরীক্ষা-লাজুক ছিলাম আমি। বেশ কিছুটা খামখেয়ালি করেছি এবং একাধিকবার পরীক্ষার অসম্পূর্ণ রেখে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছি কী এক অজানার টানে। আমার এই খামখেয়ালিপনা এবং অস্থিরতার ফলে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি হাসিল করার সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বিএ পাস করে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে

এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়ে পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় সফল হই। আমি সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিলাম প্রায় বইয়ের পাতার সঙ্গে সখ্য স্থাপন না করেই সেবার প্রথম শ্রেণি কেউই অর্জন করে নি। সেকেন্ড পার্ট দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েও শেষপর্যন্ত পরীক্ষার হলে পা রাখিনি। এভাবেই একটি ছেড়াখোঁড়া ছাত্রজীবন শেষ করতে হয়েছে আমাকে। পরীক্ষা না দেয়ার ফলে আমার চেয়ে বয়সে ছোটো বেশ কয়েকজন উজ্জ্বল ছাত্রেরই সহপাঠী হতে হয়েছে আমাকে। তাঁদের মধ্যে আবুল মাল আবদুল মুহিতেরও সহপাঠী হয়েছি আমি।

পরীক্ষায় কৃতিত্বের ঝলক দেখাতে না পারলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আমার কিছু সাফল্য ধরা পড়েছিল সে-সময়ে কারও কারও কাছে। আমার শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী আমার লেখায় একজন ভালো কবির আভাস পেয়েছিলেন -- একথা আমি বুঝতে পারি তাঁর উদার আচরণে। মনে পড়ে, একদিন দুপুরে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে তাঁর বাসার দিকে রওয়ানা হন। তাঁর বাসা ছিল ওয়ারিতে। তিনি সাইকেল চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি সেদিন সাইকেলে সওয়ার না হয়ে পুরো রাস্তাই সাইকেল হাতে করে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাসায় পৌঁছেন। চলার পথে তিনি ফুলবাড়িয়া স্টেশনের রেললাইনে রাখা কিছু বাতিল রেলওয়ের ওয়াগনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে বলেন, 'দেখ মানুষের কী দুর্ভোগ'। আমি ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে দেখি ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে ক'জন নারী, পুরুষ এবং শিশু ওয়াগনের ভিতর বসে আছে। এরা সবাই রিফিউজি, যারা বিহার থেকে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এসব ওয়াগনের ভিতরেই এরা দিনরাত কাটাচ্ছে। আমার শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী বললেন, 'এসো আমরা দু'জনেই এদের নিয়ে কবিতা লিখি।'

## ॥ বারো ॥

চামড়া-পোড়ানো, চোখ-ঝলসানো রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে আমার প্রিয় অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর বাসার দিকে এগুনোর পথে ওয়াগনের বাসিন্দাদের কথা, ওদের দুর্দশার কথা ভাবছিলাম। শিক্ষকের কবিতা লেখার প্রস্তাব তখন আমার ভাবনা থেকে গায়েব। স্যারের বিনীত ড্রইংরুমের চেয়ারে বসে এক গ্লাস পানি গলায় চালান করে, দুটো সন্দেশের সৎকার সেরে, ফ্যানের হাওয়া খেয়ে বেশ তৃপ্তি হল। ঘরের চার দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো অনেকগুলো র‍্যাকে সাজানো বই আর বই। দেখে চোখ-প্রাণ ঔৎসুক্যে, লোভে চকচক করছিল, অনুভব করছিলাম। স্যার নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন। তিনি সুন্দরভাবে বললেন, 'তোমার জন্যে অবাধ আমার লাইব্রেরি। এখানে বসে ইচ্ছে মতো বই পড়তে পার। ইচ্ছে হলে বই বাড়িতেও নিয়ে যেতে পার। আমার তরফ থেকে কোনও বাধা নেই।' আমার শিক্ষকের কথা শুনে মন জুড়িয়ে গেল। তাঁর লাইব্রেরি থেকে বেশ কয়েকটি ভালো বই এনে পড়েছিলাম। তার একটি কি দুটি বই আমার কাছে শেষ তক রয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ে। তবে দুঃখের বিষয়, আজ সেই বই আমার বইয়ের ভাণ্ডারে অনুপস্থিত। পুরনো ঢাকার পুরনো বাড়িতে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে আমার অনেক বইয়ের সঙ্গে সেই দু'টি বইও বেনো জলে আর কীটের দংশনে নষ্ট

হয়ে গেছে। স্যার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধমকে খুব তাড়াহুড়ো করে একদিন ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। আমার শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর মুখ প্রায়শই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শুনতে পাই তার কণ্ঠস্বর। কী করে ভুলব তার স্নেহস্পর্শ?

তিনি ছিলেন ষোলো-আনা অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল। ঢাকার বেশ ক'জন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। তাঁর ওয়ারির বাসার ড্রইংরুমে আড্ডায় মিলিত হতেন কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক এবং অধ্যাপকগণ। সেই আড্ডায় শরিক হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমার সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল স্যারের ভালোবাসা এবং ঔদার্যের জন্যে। কবি এবং সাংবাদিক সৈয়দ নূরুদ্দিন, মনে পড়ে, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর বাসায় নিয়মিত আসতেন।

সৈয়দ নূরুদ্দিনের চেহারা ভালো এবং বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। তাঁর কথাতেও ছিল বুদ্ধির ঝলক। তিনি নৌকো নিয়ে কয়েকটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন। এ জন্যে ফররুখ আহমদ তাকে নিয়ে 'হায়াত দরাজ খান' পাকিস্তানি ছদ্মনামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন সে-কালে। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ এবং আরও কিছু কবিতা আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলে একদা আনন্দ পেয়েছি সত্য, কিন্তু সৈয়দ নূরুদ্দিনকে সেই না-হক আক্রমণ আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল।

যা হোক, অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর ড্রইংরুমে একদিন স্বয়ং গৃহকর্তা এবং আমি ওয়াগন বিষয়ে কবিতা পড়লাম। আমার কবিতাটির নাম ছিল 'কয়েকটি দিন, ওয়াগনে'। সৈয়দ নূরুদ্দিন সে-কালে একটি উঁচুদরের সাহিত্যপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই সম্ভাব্য পত্রিকার জন্যে তিনি লেখা সংগ্রহ করছিলেন। সম্পাদক সৈয়দ নূরুদ্দিন স্যারের কবিতাটি চাইলেন। কিন্তু স্যার তাঁর কবিতা দিলেন না। তিনি সম্পাদককে আমার উপস্থিতিতেই বললেন, 'শামসুর রাহমানের কবিতাটি আপনার পত্রিকার জন্যে নিন। ওর কবিতা আমার কবিতার চেয়ে অনেক বেশি ভালো হয়েছে।' স্যারের এই বিরল ঔদার্যে আমি স্তম্ভিত তো হলামই, আমার চোখও ছলছলিয়ে উঠল। সৈয়দ নূরুদ্দিন আমার কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ কবিতাটি চেয়ে নিলেন এবং মানিব্যাগ থেকে পঁচিশ টাকা বের করে আনাড়ি, তরুণ কবিকে দিলেন। সেকালে একটি কবিতার জন্যে পঁচিশ টাকা পাওয়া ছিল মস্ত ব্যাপার। দুঃখের বিষয়, সেই পত্রিকা কখনও দিনের আলো দেখে নি। পরে আমি পঁচিশ টাকা ফেরত দিতে চাইলেও সৈয়দ নূরুদ্দিন সেই টাকা কিছুতেই নিতে চান নি। তারুণ্যের ভোরবেলা লেখা সেই কবিতা অনিল সিংহ সম্পাদিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত উন্নতমানের প্রগতিশীল পত্রিকা 'নতুন সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়েছিল। আমার এই কবিতায় সোৎসাহে সুর সংযোজন করেছিলেন বন্ধু হামদুর রহমান। পরে হামিদের ভাই সাঈদ আহমদ সেই সুরটি সেতারে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে বাজান।

সেই কবিতা আখেরে কোথায় হারিয়ে যায়, আমার কোনও কাব্যগ্রন্থেই ওর ঠাঁই হয়নি। জীবনের কত কিছুই তো এভাবে হারিয়ে যায়। কত মুখ, কত না-বলা কথা, কোনও কোনও ইতিহাসের উপাদান, এই আমার জীবনেরই কোনও কোনও ঘটনা, যা

শত চেষ্টা করলেও ধরা পড়বে না স্মৃতিতে। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর কোনও কোনও সংবাদ। তিনি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, শিশু-কিশোরদের জন্য ছড়া লিখেছেন, ছড়ার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর। বইটির নাম মনে পড়ে না। একটি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন আমার স্যার। শুনেছি, কখনও কখনও তিনি আমার কথা জিজ্ঞেস করতেন এখানকার কারও কারও কাছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ কয়েক বছর পর কলকাতার আবৃত্তি সংগঠন, যার সভাপতি ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'আবৃত্তিলোক'-এর আমন্ত্রণে সেখানে কবিতা পাঠের জন্যে গিয়েছিলাম আমরা ক'জন। স্যারের বড়ো ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেবার। আমার শিক্ষকের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম ওর কাছে। সে বলল, বাবা আর নেই। তিনি আপনার কথা খুব বলতেন। আগে কলকাতায় অনেকবার যাওয়া সত্ত্বেও স্যারের কাছে যাই নি ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলাম সেদিন। এখনও অনুতপ্ত হই। কত অনুতাপই আমরা মনে বয়ে বেড়াই তার হিসেব কে রাখে!

আবৃত্তিলোকের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১ সালে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয় ক'জন ছাত্রের উদ্যোগে। আজিজুল জলিল এবং আরও কেউ কেউ ছিলেন সংগঠক। তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ছিলেন সংস্কৃতি সংসদের একজন সক্রিয় সদস্য। পরে ১৯৫৫ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন রফিককুল ইসলাম, প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মী আবদুস সাত্তার এবং আরও কেউ কেউ। সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গী সংগঠন হিসেবেই সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়া জাগানো ড্রামা সার্কেল। মকসুদুল সালেহীন, বজলুল করিম প্রমুখ নাট্যজন ছিলেন ড্রামা সার্কেলের প্রাণভোমরা। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আবুল হুসেনের পুত্র আবিদ হোসেনও ড্রামা সার্কেলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আবিদ হোসেন ছিলেন খুবই স্মার্ট এক তরুণ। চোখেমুখে কথা বলতেন। বজলুল করিমকে আমি একজন বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে। তিনি নিজে নাটক না লিখলেও চমৎকার অনুবাদ করতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সুখপ্রদ দিন কাটিয়েছি আড্ডা দিয়ে তাঁদের বাসায়। বিয়ে করেন নি একজনকে না পাওয়ার বেদনায় দগ্ধ হয়ে। বজলুল করিম এবং আবিদ হোসেন — দু'জনই মারা যান অকালে। বজলুল করিম ঢাকায় এবং আবিদ হোসেন লন্ডনে।

সংস্কৃতি সংসদ, বলা যেতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুন্দর, শুভ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সঞ্চারিত করেছিল। আমি প্রায়শই এই প্রগতিশীল সংগঠন আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ পেতাম। নিজের কবিতা তো কয়েকবারই পড়েছি, একবার রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটির আবৃত্তি করেছিলাম, মনে পড়ে। একবার জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' আবৃত্তি করে পুরস্কার পেয়েছিলাম দু'টি বই। তবে সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে আমার জীবনের একটি রোমান্টিক ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে, যার জের চলেছে বহুদিন। সংস্কৃতি সংসদের অনুষ্ঠান শুরু হত বিকেলের কিছু আগে, সন্ধ্যার বেশ আগেই শেষ হয়ে যেত। অনুষ্ঠানগুলো ছিল সংহত, পরিচ্ছন্ন। অনেক ছাত্র উপস্থিত থাকতেন,

নিয়মিত ছয়-সাতজন ছাত্রীও আসতেন। ছাত্রীদের জন্য প্রথম সারির বেঞ্চ বরাদ্দ ছিল। প্রথম সারিতে একজনের উপস্থিতি আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করত। সেই সুদর্শনার ঈষৎ নীলচে দু'টি চোখে এমন কিছু ছিল, যা চুম্বকের মতো কাছে টানত। কিছুদিন নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলাম ঢের চেষ্টা করে। পরে একদিন সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব উজিয়ে কথা বলে ফেললাম ওর সঙ্গে। কী কথা তাব সাথে? তাহার সাথে? সেই চিরন্তন কথা যা শুধু ওষ্ঠ নয়, চোখ দিয়েও বলা যায়। আমার হৃৎস্পন্দন ওর হৃদয়ের উপত্যকাকেও গুঞ্জরিত করে তুলল। ওকে আমি বন্যা বলে ডাকতাম মনে মনে, সাক্ষাতেও। প্রথম দিকে বন্যা ওর বান্ধবীদের নিয়ে বেড়াত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিয়দ্দূরে দীর্ঘ গাছের সারি ছায়াতলে কিংবা রমনা লেকের কিনারে। পরে আমরা দু'জন হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম কোনও ভাঙা মন্দিরের ছায়ায় কিংবা অন্য কোনও জায়গায়, যেখানে অশ্লীল দৃষ্টি অনুপস্থিত। কিন্তু সেকালে আমি বন্যাকে এতটুকু স্পর্শ পর্যন্ত করিনি।

দেহাতীত প্রেম কি সম্ভব? আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলাম দীর্ঘকাল। অনেক বছর পর অবশ্য দয়িতাকে প্রবলভাবে স্পর্শ করেছিলাম কখনও নিরালা ঘরে, কখনও বাইরে জনহীনতায়। সেও তার ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিল কোনওরকম কার্পণ্য ছাড়াই।

## ॥ তেরো ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রথম প্রবেশাধিকার পাই, তখন এমন কোনও সংগঠন ছিল না যার উদ্যোগে নতুন লিখিয়েরা নিজেদের লেখা কোনও আসরে মিলিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে পাঠ করতে পারে। প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ যাদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাদের ছাত্রজীবনের অবসান ঘটেছে ততদিনে, ফলে সেই সংগঠনটি ঝিমিয়ে পড়েছে। তবে একটি কি দু'টি সভায় আমি বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমানের কল্যাণে উপস্থিত ছিলাম। তিনিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গী হিসেবে। নইলে আমার হয়তো যাওয়াই হত না, এমনই ভিতর-গোজা তরুণ ছিলাম আমি। আকাশে যখন গোধূলির জাফরানি রঙের বাহার দিনান্তের নীরবতা ঘোষণা করছে, আমরা দুই বন্ধু লিটন হলে প্রবেশ করি। ইতোমধ্যে হল পুরোপুরি ভরে উঠেছে উৎসাহী শ্রোতা সমাগমে। হাসান এবং আমি হলের শেষ প্রান্তে কোনওমতে জড়সড় হয়ে বসলাম। হাসানের মধ্যে জড়তার তেমন লক্ষণ ছিল না, ছিল শুধু আমার ভেতর-বাইরে। প্রথমে গল্প পড়ে শোনালেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, তাঁর গল্পের নাম 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'। সাড়া-জাগানো এই ছোটোগল্প। মুনীর চৌধুরী পাঠ করলেন তার অননুকরণীয় স্টাইলে 'মানুষের জন্য' গল্পটি। খোদ লিটন হলটি পর্যন্ত যেন মুগ্ধতায় অভিবাদন জানাল গল্পকার মুনীর চৌধুরীকে। শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় মনে মনে হাজার সালাম জানালাম। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মুনীর চৌধুরীর ছোটোগল্পের খুবই তারিফ করেছিলেন বলে শুনেছি। মুনীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর চলতি অর্থে সুললিত ছিল না, বরং বসে-যাওয়া এবং খসখসে ছিল। কিন্তু তিনি যখন ক্লাসে পড়াতেন কিংবা রেডিও

টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতেন, তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। তখন তার কণ্ঠস্বর চিত্তাকর্ষক মনে হত। আধঘন্টার বক্তব্য, আশ্চর্যের বিষয়, এক লহমায় শেষ হয়ে যেত তার বলার স্টাইলে এতটুকু কষ্টার্জিত হলে ধরা পড়ত না সেই ধরন মনে হত, বয়ে চলেছে ঝরনাধারা।

মুনীর চৌধুরী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই সাম্যবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ছাত্রসমাজ এবং সরকারের কাছে তিনি একজন কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন। এজন্য তাকে অনেক ধকল সইতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্ররা সালিমুল্লাহ মুসলিম হলের কামরা থেকে তার বিছানাপত্তর, জামাকাপড় নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এ ধরনের ভুক্তভোগী শুধু মুনীর চৌধুরীই ছিলেন না, ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের আরেকজন ছাত্র সুদর্শন একেএম আহসানও হয়েছিলেন। মুনীর চৌধুরী পরবর্তীকালে আমৃত্যু অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। একেএম আহসান প্রথমে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি করেন অবসর নেয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। চাকরি জীবনেও তিনি সবসময় বাঙালিদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অকুণ্ঠ; একাত্তরের সঙ্কটকালেও উৎপীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাহসিকতার সঙ্গে।

মুনীর চৌধুরী কোনও সরকারি চাকরি করেন নি, জীবনের প্রথম পর্যায়ে তাঁকে সইতে হয়েছিল অনেক জেলজুলুম, কিন্তু মাথা নত করেন নি, ত্যাগ করেন নি ন্যায়নীতির পথ। জেল থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা দিয়ে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পান। অবশ্য আগেই তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেলে বসে পরীক্ষা দেয়ার আগে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক অজিত গুহ এবং আরও কারও কারও সহায়তা পান বলে শুনেছি। এ কথা না বললেও চলে যে, মুনীর চৌধুরী নিজের মেধার কারণেই এমন ঝলমলে কৃতিত্বের অধিকারী হন।

পঞ্চাশ দশকের প্রত্যুষ লগ্নে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র ছিলাম তাদের ক'জন, ধোঁয়াশার মতো স্মৃতি জেগে উঠছে, কখনও কখনও বেলতলায় কবিতা পাঠের আসর জমাতাম। সেই প্রায়-পুশিদা আসরে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী (এসএম আলী), সাবের রেজা করিম, আমি এবং আরও দু'একজন উপস্থিত থাকতাম। নিজের লেখা সনেট চমৎকার আবৃত্তি করতেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। আমরা তার সনেটের অনুরক্ত শ্রোতা ছিলাম। এখানে উল্লেখ করতে চাই, তিনি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র তখনই তার সনেট ছাপা হত মাওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত মাসিক 'মোহাম্মদী' এবং কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'-এ। মাসিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকের নাম হিসেবে মাওলানা আকরাম খাঁর নাম মুদ্রিত হলেও তখন পত্রিকাটির সম্পাদকীয় দায়িত্ব ফররুখ আহমদ পালন করতেন বলে শোনা যায়। দু'টি পত্রিকাই কলকাতায় প্রকাশিত হত। 'মিল্লাত' বেশ উঁচু মানের পত্রিকা ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এক কোণে দাঁড়ানো বেলতলায় আমাদের যে আসর বসত কখনও সখনও, সেই আসরে কি আমি কবিতা পড়তাম? হয়তো পড়েছি একটি কি দু'টি, কিন্তু সহপাঠী এবং বন্ধু জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর কবিতা শুনতেই ভালো লাগত। আলোচনায় শরিক হতেন সাবের রেজা করিম, সৈজয় মোহাম্মদ আলী এবং আরও কেউ কেউ। মাঝে মাঝে লক্ষ করতাম একজন ছাত্র গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘুরতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। তিনি কি যোগ দিতেন আমাদের বেলতলার আসরে? সেই আসরের ছবি তোলার উদ্দেশ্যে তার ক্যামেরা ক্লিক করে উঠত কখনও? কোনও ছবি অবশ্য চোখে পড়ে নি কোনওদিন।

ঢাকায় প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের অস্তরাগের লগ্নে, মধু দা'র ক্যান্টিনে এক বিকেলে সেই সংগঠনের শেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মুস্তফা নূরউল ইসলাম একটি ঝাঁঝালো প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, আমি পড়েছিলাম একটি কবিতা। কবিতাটির নাম 'কোনও একটি নিমগ্ন শহরকে'। দু'একজন আলোচক কবিতাটিকে প্রশংসাধন্য করেছিলেন, যদিও একজন আলোচক আমার লেখাটিকে রোমান্টিক বলে খারিজ করে দেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল রাগী মুস্তফা নূরউল ইসলাম আমার কবিতার তারিফ করে বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমাদের কবিতা নতুন মোড় নিল। এই কবিকে ধন্যবাদ জানাই।' হয়তো এমন তারিফের যোগ্য ছিলাম না আমি; তবু সত্যের খাতিরে বলতে হয়, সেদিন অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। সেই কবিতাটি আমার কোনও কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়নি। সেটি সেকালে ফজলে লোহানী এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত সাড়া জাগানো পত্রিকা 'অগত্যা'য় ছাপা হয়েছিল।

'অগত্যা' পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকা জগতে একটি নতুনত্বের সূচনা করেছিল প্রতিশ্রুতিশীল কবি-সাহিত্যিকদের রচনাদির সঙ্গে মজাদার সব ফিচার পরিবেশন করে পাঠকদের চমকে দিয়ে, কৌতুক উপভোগের উপকরণ সাজিয়ে। ফজলে লোহানীর অগ্রজ ফতেহ লোহানী 'অগত্যা'র একজন পরামর্শক এবং লেখক ছিলেন। ফতেহ লোহানীকে অনেকে জানেন চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবেই। তিনি যে ভালো ছোটোগল্প লেখক এবং কৃতী আবৃত্তিকারও ছিলেন, এ-কথা কি কেউ মনে রেখেছে? ফতেহ লোহনীর কতা বললেই নাজির আহমদ এবং আবদুল আহাদের কথা মনে পড়ে যায় অনিবার্যভাবে। নাজির আহমদ ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী এক উজ্জ্বল আবৃত্তিশিল্পী, অভিনেতা এবং কথক। মহালয়ার দিন প্রত্যুষে আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠানের সূচনা হত স্তোত্র পাঠ দিয়ে। এখনও কি সেই রীতি প্রচলিত আছে? জানি না। যাই হোক সেই স্তোত্রের অবধারিত পাঠক ছিলেন বীরেন ভদ্র। অন্য কেউ তার মতো স্তোত্র আবৃত্তি করতে পারতেন না। একবার মহালয়ার স্তোত্র পাঠের নির্ধারিত সময়ে তিনি বেতার কেন্দ্রে আসতে পারেন নি। রেডিওর অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে প্রচার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নাজির আহমদ জানালেন যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন তাহলে তিনি স্তোত্র পাঠ করতে পারেন। অনুমতি পাওয়া গেল। ঠিক সমমাফিক মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন তার আবেদনময় কণ্ঠস্বরে। ইতোমধ্যে বীরেন ভদ্র এসে হাজির। তিনি দাঁড়িয়ে নাজির

আহমদের স্তোত্রপাঠ শুনলেন নিবিষ্ট চিত্তে। কেউ কেউ নাজির আহমদকে থামানোর প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু বীরেন ভদ্র বারণ করলেন। কারণ তিনি একজন প্রকৃত গুণীর মতোই অন্য গুণীর কদর করতে জানতেন।

যারা আকাশবাণী কলকাতার আরেকটি বিশেষ অনুষ্ঠান শুনেছিলেন বহু বছর আগে তারা আজও স্মরণ করেন সেটির কথা। আপনাদের সবার নিশ্চয়ই মনে পড়ে শুধু কচ ও দেবযানীর সংলাপ সংবলিত রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদে কাব্য নাটিকাটির কথা। 'সঞ্চয়িতা'র পাতা ওলটালেই খুঁজে পাবেন। সেই সংলাপ কাব্য নাজির আহমদ এবং নীলিমা সেনের কণ্ঠে এমনই জীবন্ত এবং নান্দনিক হয়ে উঠেছিল যে, যদি রবীন্দ্রনাথ শুনতেন, তা হলে তিনিও সাধুবাদ জানতেন সেই দুই শিল্পীকে।

সংগীত শিল্পী আবদুল আহাদের সংগীত শিক্ষা শান্তিনিকেতনেই সাধিত হয়। তিনি একদা নিজে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন। মনে পড়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো গুণী শিল্পীও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে আসার পর তাঁর কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন বেশ ক'জন বিখ্যাত শিল্পী। অনেক রুচিশীল আধুনিক গানের সুরস্রষ্টা তিনি। তিনি রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। নাজির আহমদ, আবদুল আহাদ, ফতেহ লোহানী আজ নেই, রয়ে গেছে তাদের কীর্তির স্মৃতি।

## ॥ চোদ্দো ॥

ছেলেবেলায় বছরে অন্তত একবার আব্বা ও আম্মার সঙ্গে আমাদের গ্রাম পাড়াতলীতে যেতাম। নানা-নানিও যেতেন। নানা এবং আব্বার জন্মস্থান পাড়াতলি। দু'জনেরই জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে গ্রামের বাড়িতে। আমার দাদা ও নানা সহোদর। শৈশবে গ্রামে বেড়াতে যাওয়া ছিল খুবই আনন্দের ব্যাপার। পিতৃপুরুষদের ভিটেমাটিতে দিনরাত কাটানো, দাদাজানের তৈরি মসজিদের সামনের খোলা জায়গায় বসিয়ে বাঁশবাগানের মাথার ওপর ফুটফুটে চাঁদ দেখা, দুপুরে বাড়ির পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে একটি কি দু'টি আম পাড়া — এসব কথা আজও জীবনের গোধূলিবেলায় ভাবতে গিয়ে কেমন এক মন আনমন-করা অনুভূতির জন্ম হয়। অনেক বছর আগে, তখন আমি বালক, নানা-নানি, আব্বা-আম্মা সাথে পাড়াতলী যাই। আমার ছোটো চাচা আরিফুর রহমান চৌধুরীও সেবার তাঁর পরিবারসহ আমাদের সঙ্গে যান। অত্যন্ত সুখপ্রদ ছিল আমাদের ভ্রমণ। আমরা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা উৎসব শুরু হয়ে গেল। আনন্দের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলেছি চার পাঁচটি দিন। তারপরেই সুখী পরিবারে নেমে এল দুঃখের ছায়া। বসন্ত রোগ হামলা করল আমার এক চাচাতো ভাই এবং বোনকে। মোমেনা খালা, আরিফুর রহমান চাচার স্ত্রী। তাঁকে চাচি না বলে খালাম্মা বলছি এজন্যে তিনি আম্মার ছোটো বোন। তিনি নিজেও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর সন্তান দু'টি তো রক্ষা পেল আমার নানির অসামান্য যত্নে। কিন্তু দুঃখিনী নানি, নিজের কন্যাটিকে কোনও মতেই বাঁচাতে পারলেন না। নানা ও নানি তাঁদের স্নেহাস্পদা কন্যাকে মসজিদের লাগোয়া পারিবারিক গোরস্তানে শুইয়ে ফিরে আসেন ঢাকায়।

পাড়াতলী গাঁয়ের আলুঘাটায় আমাদের আসতেই হয় নৌকোর জন্য। নৌকো ছাড়া মেঘনা নদী পাড়ি দেব কী করে? আলুঘাটা নামটি কখন কে রেখেছিল জানতে পারি নি। তবে এই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে। কারণ নদীর এই ঘাট ঘেঁষে-থাকা জমিতে প্রচুর মিষ্টি আলুর ফলন হয়, লক্ষ করেছি। এই বড়ো, স্থূল আলু পুড়িয়ে কিংবা সেদ্ধ করে খেতে ভারী স্বাদ লাগে। ছেলেবেলায়, এমনকি যৌবনেও প্রচুর খেয়েছি। পাড়াতলীতে তো বটেই, এমনকি আমাদের ঢাকার বাড়িতেও চলে আসত আলুঘাটার আলু।

যা বলছিলাম, আমাদের গোটা পরিবার অন্তরে শোকের কালো মেঘ নিয়ে, মেঘনা নদীতে নৌকো ভাসিয়ে ভরসন্ধ্যায় মেথিকান্দা স্টেশনে পৌঁছলাম। আমাদের শোক যেন প্রকৃতিকেও স্পর্শ করেছিল সেদিন। আকাশ ছেয়ে গেল ভীষণ কালো মেঘে, তোড়েজোড়ে শুরু হয়ে গেল ঝড়বৃষ্টি। নানাভাই মেথিকান্দা স্টেশনে দাঁড়িয়ে মাগরেবের আজান দিতে শুরু করলেন। হয়তো সেই আজানে ছিল কন্যার অকালমৃত্যুর জন্য তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকার্ত ফরিয়াদ আর সেই প্রচণ্ড তুফান থামোনোর আকুল আবেদন। বেশ কিছুক্ষণ পর ঝড় দাপট-দেখানো দৈত্যের মতোই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমাদের মন থেকে শঙ্কা মুছে গেল, কিন্তু খালাম্মার জন্য মন কেমন-করা রয়েই গেল।

যখন ক্লাস নাইনের বেঞ্চিতে বসার অধিকার পেলাম, তখন আমাদের গৃহশিক্ষক হিসেবে আসেন সতেজ তরুণ আবদুল আউয়াল। চমৎকার স্বাস্থ্য, চোখে দীপ্তি, মুখে হাসি, ভঙ্গিতে এক ধরনের দৃঢ়তা। তিনি যে মাথার অধিকারী সেটি যেন কারও সামনে নোয়াবার নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর পড়াবার ধরন ছিল আলাদা। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তেমন নাড়াচাড়া করতেন না, কথা বলতেন বেশি। সেসব কথা পরীক্ষায় তেমন কাজে লাগবে, মনে হত না। তবে তাঁর কথামালা যে জীবনকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, এটা আমি সেই অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর কথাবার্তায় প্রগতির স্পষ্ট ছাপ ছিল। চারপাশের লোকজনের কথার সঙ্গে আমার শিক্ষক আবদুল আউয়ালের গাঢ়, দীপ্ত কথার কোনও মিল ছিল না। তিনি আমার চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। ক্রমশ প্রশ্নাকুল হয়ে উঠেছিল আমার মন। অনেকের কাছে যা ছিল স্বতঃসিদ্ধ তা মেনে নেওয়ার প্রবণতা মন থেকে উধাও হয়ে গেল। অনেক কিছুকেই যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার এলাকাও অনেকখানি বিস্তৃত হল। বাস্তব এবং স্বপ্ন পথ চলতে লাগল হাত ধরাধরি করে। আবদুল আউয়াল কি টের পেয়েছিলেন? সচেতন ব্যক্তি তিনি, আমার ভেতর যে রসায়ন চলছিল সেটা আঁচ করা তাঁর পক্ষে মুশকিল ছিল না।

মনে পড়ে, আমার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়াল মাঝারি সাইজের একটি এক্সারসাইজ খাতা ভরিয়ে তুলেছিলেন তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে রচিত দীর্ঘ একটি চমৎকার খেয়ালি প্রবন্ধে। তিনি কী লিখেছিলেন সেই মনোজ্ঞ নিবন্ধে তা আজ আর মনে নেই, কিন্তু একটি সদ্য-কিশোরের মন সেকালে যে প্রবল আন্দোলিত হয়েছিল, তা এখনও একজন বাহাত্তুরে ব্যক্তির মনে পড়ে। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম জনাব আবদুল আউয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন এবং আমার প্রিয় এই ঢাকা শহরেই সপরিবারে বাস করছেন।

তিনি কি বেঁচে আছেন? আমার কথা কি কখনও মনে পড়ে তাঁর? কিছুই জানি না। আমাদের নাগরিক জীবনের এক অভিশাপ হল, আমরা আমাদের চেনামানুষদের হারিয়ে ফেলি, যেমন বড়ো ধরনের মেলায় শিশু হারিয়ে ফেলে অভিভাবককে। তবে এটুকু বলতে পারি, আমার সেই গৃহশিক্ষকের স্মৃতি মন থেকে কোনওদিন মুছবে না।

স্মৃতি কি কোনও নিয়মের, কোনও রীতির তোয়াক্কা করে পথ চলে? না, স্মৃতি প্রায়শই ধারাবাহিকতার বেড়া টপকে অন্য পথ ধরে। ফলে অনেক পরের কথা আগে এবং আগেকার কথা পরে বলে ফেলি নির্দ্বিধায়। এতে কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হলে কথক নাচার। ক্লাস নাইনে আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেশ জ্বলজ্বলে হয়েছিল। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়ি। বাবা আমার ওপর ডাগর ভরসা করেছিলেন। পরীক্ষার ফল আদৌ ঝলমলে হলো না। পরীক্ষার আগে অসুস্থ ছিলাম বটে, কিন্তু অসুস্থতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব না, ক্লাশ টেনে উঠে আমার মন কেমন উড়ু উড়ু হয়ে যায়। পড়াশোনায় তেমন মন বসাতে পারিনি। অসুস্থ শরীর আমাকে নিস্তেজ, নিস্পৃহ করে তুলেছিল। কোনওমতে টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বাংলা এবং ইংরেজি পরীক্ষা দিতে পারলাম শুধু। জ্বর পুরো পরীক্ষা দেওয়ার পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর হেডমাস্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো নম্বর পেয়েছিলাম। ইংরেজিতে সবার চেয়ে বেশি নম্বর জুটল আমার। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে আমার প্রবন্ধের খুব তারিফ করলেন শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্র বাবু, পোগজ স্কুলের হেডমাস্টার। টেস্টে আমাকে এলাউ করা হল বাংলা এবং ইংরেজিতে ভালো নম্বর হাসিল করার দৌলতে।

কিন্তু পরে পড়ায় খুব ভাটা পড়ল। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলাম। আব্বা আম্মা ভাবতেই পারেন নি আমার পরীক্ষার ফল এমন শোচনীয় হবে। তাঁদের মন ভেঙে গেল। অঙ্ক এবং আরবি-ই ডোবল আমাকে। অথচ কেন জানি খোদ আমি তেমন মর্মাহত হই নি। যেন আমি তৈরি ছিলাম এই ধরনের রেজাল্টের জন্য। আরবি প্রায় পড়ি নি বললেই চলে, এসত্ত্বেও যে উৎরে গেছি পরীক্ষায় এজন্য চিত্তকে সামান্য প্রসন্ন হতে দিলাম। এরপর থেকে জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতাকে আমল দিই নি; সবসময় এড়িয়েই চলেছি।

সবেমাত্র ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু মন ময়ূরের মতো নেচে উঠে নি নানা কারণে। একটি কারণ কলেজের জন্য বরাদ্দ জায়গা আমাকে গোড়াতে দমিয়ে দিয়েছিল। এঁদো গলিতে কোনও কলেজের অবস্থান কি মানায়? ক্লাসরুমগুলোর ওলটানোর স্পৃহা মনে জাগে না। কলেজের এই পরিবেশ 'পালাও পালাও' আওয়াজের জন্ম দেয় যেন। অন্তত আমার তো সেকালে তা-ই মনে হত।

তাই, যখন আব্বা সপরিবারে আবার পাড়াতলীতে যাওয়ার আয়োজন করলেন, খুব ভালো লাগল আমার। কয়েকটি দিন প্রকৃতির খুব কাছে কাটানো যাবে। সর্ষে খেতে প্রজাপতির নাচ, গাছপালার সমারোহ, দিঘির টলটলে, ঢলঢলে রূপ, স্বাস্থ্যবান খালে নৌকোয় বেড়ানো, বাঁশবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পাখির ডাক শোনা, রাতে নানা জায়গায়

ঝোপঝাড়ে জোনাকির জ্বালা আর নেভা দেখার খালিশ আনন্দ লুট করার সুযোগ ঢাকা শহরে কোথায়? এবার অবশ্য আমরা পাড়াতলীতে গেলাম আমাদের মামা মৌলভী আহম হোসেনের মেজো ছেলে আশরাফুল হোসেনের বিয়ে উপলক্ষে। আব্বা আম্মার সঙ্গে আমরা ভাইবোন বরযাত্রী হিসেবে গেলাম মেঘনা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম তীরের বড়িকান্দি গ্রামে। এই গ্রামটি সেকালে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর ছিল। বড়িকান্দি পূর্বপাড়ার জনাব আবদুল লতিফের ছোটো মেয়ে রওশন আক্তারের বিয়ে হয় আমার মামাতো ভাই আশরাফুল হোসেনের সঙ্গে। আশরাফুল হোসেনকে আমরা ডাকতাম আসাদ ভাই বলে।

আসাদ ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি ছিল ছিমছাম। সে বাড়ির প্রতিটি খাবার টেবিল সাজানো ছিল রুচিশীল সুচিকাজের টেবিলক্লথে। বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটির বারান্দায় এক সকালে আয়েশি চেয়ারে বসে-থাকা একজন সুদর্শন যুবককে দেখলাম। তিনি একটি ইংরেজি বই পড়ছিলেন। যত দূর মনে পড়ছে বইটি ছিল আল্ডুস হাক্সলির উপন্যাস 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'। পাঠকের কাছে ঘেঁষার সাহস হয়নি সেদিন। সেই পাঠকের এমনই ভঙ্গি ছিল যে, 'তুমি কে হে বাপু যে তোমাকে লক্ষ করতে হবে আমার।' তবে তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হতে পারি নি কিছুতেই। আমার মুগ্ধতাবোধটাই প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর পরিচয় জানতে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। জানতে পারলাম তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল ছাত্র। নাম খান সরওয়ার মুরশিদ। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন অধ্যাপক হিসেবে দেখতে পেয়ে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নি। ততদিনে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি একাধিকবার পড়ে ফেলেছি। অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদকে কেন জানি অমিত রায় বলে মনে হত। চোখে পড়ার মতো চেহারা, চমৎকার বাচনভঙ্গি, স্মার্টনেস ইত্যাদির জন্য তাঁকে বিশিষ্ট মনে হত আমার। যদিও প্রথম দিকে আমাকে কোনও পাত্তাই দেন নি, তবু তাঁকে বড়ো ভালো লাগত। অবশ্য সময় প্রবাহ অনেক দূর বয়ে যাওয়ার পর তাঁর কৃপণ স্নেহ ও প্রীতিধন্য হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পরীক্ষা বার বার সম্পূর্ণ রেখে ত্যাগ করতাম বলে তিনি ঈষৎ ক্রোধ-মিশ্রিত ব্যথিত হতেন — কখনও কখনও মনে হত আমার। দু'একটি পেপারে নাকি ভালো নম্বরই পেতাম অসম্পূর্ণ পরীক্ষায়। পরীক্ষার ব্যাপারে আমার খামখেয়ালিতে আব্বা অত্যন্ত রুষ্ট হতেন, আম্মা আহত হতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না তাঁর পরীক্ষা-পালানো সন্তানকে। এক ধরনের প্রশ্রয় ছিল তাঁর কবিতামাতাল পুত্রের প্রতি। দুঃখ পেতেন, কিন্তু সর্বংসহা মা আমার কস্মিনকালেও ভর্ৎসনা করেন নি আমাকে। আমার প্রতি তাঁর এক ধরনের অটল বিশ্বাস ছিল। আমার দিকে আব্বার ন্যায্য উষ্মামিশ্রিত বাক্যঝড়ের মুখে তিনি এমনই নীরব থাকতেন যে, আমার জনকের ক্রোধ সহজেই ঝিমিয়ে পড়ত। আমি আব্বার ক্রোধে কখনও অপ্রসন্ন হই নি, কারণ তিনি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন বড়ো আশা নিয়ে। সুখপ্রদ স্বপ্নের ভগ্নদশা দেখলে কার মনেই না খেদের জন্ম হয়। আব্বার মনে আমি একের পর এক ক্ষত সৃষ্টি করছিলাম। তিনি তো উষ্মার জ্বালায়, বেদনার

পীড়নে দগ্ধ, বেদনার্ত হবেনই। আমিও জনক জননীকে কষ্ট দিয়ে আত্মগ্লানিতে প্রচুর ভুগেছি, হৃদয়কে খুঁড়েছি, রক্তাক্ত করেছি।

## ॥ পনেরো ॥

চমৎকার সবুজের আভাময় পরিবেশে ছিল আমাদের আপন বিশ্ববিদ্যালয়। আমার জীবনের এক উদ্দীপনাময় অধ্যায় কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আশেপাশে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশ কিছু বেশি সময় আমি কাটিয়ে দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে হেঁটে, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করে, মধুর ক্যান্টিনে আর আমতলার সবুজ ঘাসের ওপর বসে। পরীক্ষাছুট আমি দীর্ঘায়িত করেছি আমার বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ছাত্রজীবন। অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কোনও প্রস্তুতি নেয়ার উদ্যোগই ছিল না আমার। অসম্পূর্ণ এমএ ডিগ্রি নিয়ে তো আর অধ্যাপনা করা চলে না, এমনকি উপেক্ষিত মফস্সলের কোনও কলেজেও নয়। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, তবু বলতে চাই। একটি চরম হাস্যকর কারণে এমএ পার্ট টু-এ প্রায় সবগুলো ক্লাসে হাজির থেকেও আখেরে পরীক্ষা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। পরীক্ষা দিলে ফল মোটামুটি ভালোই হত। অন্তত সেকেন্ড ক্লাসের প্রথম কি দ্বিতীয় স্থান তো দখল করতামই, প্রস্তুতি যত কমই থাক না কেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই অধ্যাপনা করার লোভ সামলাতে পারতাম না। ঢুঁ মারতে হত মফস্বলের যেন তেন কোনও কলেজে। সেকালে গুলিস্তান সিনেমা হলে হামেশা মর্নিং শো দেখার সুযোগ ছিল, দেখতামও খুব, ভালো ভালো ইংরেজি চলচ্চিত্র দেখে বাড়ি ফিরতাম। সে সব মর্নিং শো দেখতাম বন্ধু মোশতাক আহমদের সৌজন্যে। তিনিই গাঁটের পয়সা খরচ করে বন্ধুবান্ধবদের চিত্তবিনোদনে এগিয়ে আসতেন নিত্য। মোশতাক এবং আমি কোনওদিনই সহপাঠী ছিলাম না, কিন্তু তিনি আমার প্রিয় বন্ধুদের অন্যতম। তার কথা কোনওদিন ভুলব না। তিনি অনেক বছর যাবত আমেরিকায় আছেন। পরম দুঃখের কথা তিনি বেশ কিছুদিন ধরে একটি নার্সিংহোমে প্রায়-নিশ্চেতন অবস্থায় আছেন। এমন একজন সুদর্শন, হাসি খুশি, দিলদরাজ ভালোমানুষ দিনরাত এই অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছেন, এটা ভাবলে মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তখন কিছুই ভালো লাগে না।

যাই হোক, গুলিস্তান সিনেমায় নিয়মিত প্রভাতী শো দেখার লোভে এম এ পরীক্ষা দিই নি। এই তথ্য অনেকের কাছে হাস্যকর, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ঘটনাটি নগ্ন সত্য। ফিল্মের প্রতি আমার আসক্তি এমনই প্রবল ছিল সেকালে, একালে এমন প্রবল না হলেও ভালো-লাগা একেবারে উবে যায় নি। সম্প্রতি কখনও কখনও ভালো ছবি দেখার সুযোগ হাজির হলেও অসুস্থতার জন্য দেখা হয়ে ওঠে না। উত্তম ফিল্ম দেখতে না পাওয়ার খেদ কালো ছায়া হয়ে ঝুলতেই থাকে মনে।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছেই ছিল একটি বইয়ের দোকান। দোকানটির নাম 'বিবলোফিল'। দোকানের মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপক। নাম আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার

বামুনিয়া গ্রাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কয়েক বছর কাজ করার পর ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রিডারের পদ অলংকৃত করেন ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। তিনি এই বিভাগের প্রফেসর এবং অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন জ্বলজ্বলে কৃতিত্বের সঙ্গে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত নামজাদা ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গ'-এ তাঁর উন্নতমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর সে-সব প্রবন্ধ অগ্রসর পাঠকদের প্রশংসা লাভ তো করেইছে, এমনকি আমার মতো অনভিজ্ঞ, অমনোযোগী পাঠকও মুগ্ধ হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে। তিনি ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি ইতিহাসকেন্দ্রিক গবেষণামূলক বই লিখেও পণ্ডিতসমাজে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত লেখক এবং রাজনীতিবিদ হুমায়ূন কবির।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। অন্তত দূর থেকে আমার এরকমই মনে হত। যখনই তাঁকে দেখেছি তাঁর মুখমণ্ডল গাম্ভীর্যে আচ্ছাদিত থাকত, লক্ষ করতাম। সঙ্কোচের দরুন তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলি নি কখনও। দূর থেকেই মনে-মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই শ্রদ্ধা শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যই নয়, তাঁর চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাসের জন্যও। তিনি মুক্তবুদ্ধির চর্চা তো আমৃত্যু করেছেন, তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনাও ছিল প্রখর। 'সবার ওপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', এই বাণী, আমার মনে হয় তিনি অবিচলভাবে সবসময় নিজের চিন্তায় ধারণ করেছেন, প্রমাণ করেছেন কর্মের মাধ্যমে। সাম্যবাদে আস্থাবান এই মানুষটি মনে প্রাণে চাইতেন দেশবাসীর কল্যাণ হোক, প্রগতিশীল চেতনায় সমৃদ্ধ হোক তারা। দুঃখের বিষয়, তাঁর এই বাসনা অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আজ অব্দি মুখ তোলার অবকাশ হল না। জানি না, আবু মহামেদ হবিবুলাহর স্বপ্ন, আশা কোন্ ভাবীকালে সফল হবে! আজ কাল পরশু তো নয়ই, তেমন সুদিন আমরা অনেকেই দেখে যেতে পারব না। হয়তো অনেক দশক পেরিয়ে যাবে, তবু কাঁটা উলটো দিকেই ঘুরতে থাকবে। কোন কালে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর, আমাদের অনেকের কাঙ্ক্ষিত দেশ হবে বাংলাদেশ — কে বলবে?

বইয়ের দোকান বিবলোফিলের কথা আগেই বলেছি। এই দোকানটি, আমার বিশ্বাস, প্রগতিশীল পণ্ডিত আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কেবল ব্যবসায়ের খাতিরে স্থাপন করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই কেনার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই বিবলোফিলের জন্ম হয়েছিল। হাতের কাছে বই দেখলে স্বাভাবিকভাবেই নেড়েচেড়ে কিছু পাতায় চোখ বুলানোর,কিনে ফেলার ঝোঁক হবে ওদের। আমি নিজে সেই দোকান থেকে বাংলা কবিতার কয়েকটি বই চটজলদি কিনে ফেলেছিলাম। জানি না, অধ্যাপকদের কেউ কেউ বিবলোফিলে প্রবেশ করতেন কি-না। যতদূর মনে পড়ে, অন্তত আমি কাউকে সেই দোকানে পা রাখতে দেখি নি। অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ কি কোনও বইয়ের খোঁজে বিবলোফিলে প্রবশ করতেন কি-না, বলতে পারব না। তাঁকে জিজ্ঞেসও করি নি কখনও। যা হোক, দোকানটি বেশিদিন চালু থাকে নি, সম্ভবত খদ্দেরের স্বল্পতার দরুন। তবে যখনই অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদকে

দেখেছি, তাঁর হাত পুস্তকবিহীন দেখি নি। যখন শিক্ষকদের প্রশস্ত কামরায় তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়েছে আমার, তাঁকে পাঠরত দেখেছি। আজও যখন তিনি জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন এবং আমিও যৌবনের একই স্থানে দাঁড়িয়ে নেই, তখনও ডক্টর খান সারওয়ার মুরশিদের মধ্যে পুস্তক প্রেমের ঔজ্জ্বল্য দেখে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হই। যে-কোনো বুকশেলফের দিকে যখন তিনি অত্যন্ত উৎসুক দৃষ্টিতে তাকান, তখন বড়ো ভালো লাগে তাঁর অফুরন্ত পাঠতৃষ্ণা লক্ষ করে।

একজন অধ্যাপক হিসেবে খান সারওয়ার মুরশিদের সুখ্যাতি তো রয়েইছে, তিনি একজন কৃতী গবেষকও সন্দেহ নেই। লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তিনি ইয়েটস, টিএস এলিয়ট এবং অল্ডাস হাক্সলির ওপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব নিয়ে একটি অসাধারণ থিসিস রচনা করেন। পরীক্ষক এই থিসিসের ভূয়সী প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হন নি, ডক্টর খান সারওয়ার মুরশিদকে এমন একটি তারিফখচিত ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন যা শুধু একজন অসামান্য গবেষকেরই প্রাপ্য। নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন খান সারওয়ার মুরশিদ। পরে ১৯৬৩-৬৫ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শেক্সপিয়র নিয়ে গবেষণা করেন।

খান সারওয়ার মুরশিদ ১৯৪৯ সালে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন 'New Value' নামে একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ইংরেজি সাহিত্যপত্র প্রকাশের মাধ্যমে। এই পত্রিকাটি এই অঞ্চলের বিদ্বৎসমাজে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। তখন পূর্ব বাংলা থেকে এরকম উন্নতমানের সাহিত্যপত্র প্রকাশ করা আদৌ সহজ ব্যাপার ছিল না। ভালো মুদ্রণালয় ছিল গরহাজির। তিনি যে বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে প্রতিকূল পরিবেশে একটি উন্নতমানের ইংরেজি সাহিত্যপত্র প্রকাশ ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সফলভাবে, এ-কথা অতি নিন্দুকেও স্বীকার করবে। তাঁকে এ-কাজে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না তখন। তবে যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন, বৌদ্ধিক, প্রগতিশীল চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ছিলেন সে-জন্যে বেশ ক'জন ধীমান অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন সহজে। কাজী আবদুল ওদুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, হুমায়ূন কবির, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, এমএন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শিবনারায়ণ রায়, পশ্চিম পাকিস্তানের আহমেদ আলি 'New Value' এ লিখেছেন নির্দ্বিধায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মিস এজি স্টক, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগের এএইচ দানি এই সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন, যাতে 'New Value' টিকে থাকে। সাহিত্য পত্রটি টিকেওছিল ১৭ বছর। এটি তুচ্ছ ঘটনা নয়। আমি আমার কবি-জীবনের শুরুতে 'কম্পোজিটার' নামে একটি কবিতা লিখেছিলাম। সেটি তখনকার 'সৈনিক' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আমার 'কম্পোজিটার' অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সেটি অনুবাদ করে 'New Value'-এ ছাপতে দেন। ছাপাও হয় যথারীতি। একজন তরুণ কবির জন্য এই ঘটনা খুবই সুখকর এবং অনুপ্রেরণামুলক। স্যার আমার অজ্ঞাতেই সেই কবিতাটি

অনুবাদ করেছিলেন, হয়তো আমাকে চমক দেয়ার জন্যেই। পরে কান সারওয়ার মুরশিদ সম্পাদিত 'New Value'-এ আমার আরও কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। একটি কবিতার অনুবাদক খোদ সম্পাদক। তাঁর অনুবাদটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের ঊষালগ্নে ঢাকা থেকে 'নতুন কবিতা' নামে একটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্কলনের সম্পাদক ছিলেন আশরাফ সিদ্দিকী এবং আব্দুর রশীদ খান। 'নতুন কবিতার' প্রথম কবি ছিলেন প্রয়াত হাবীবুর রহমান এবং শেষ কবির নাম বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। 'নিউ ভ্যালিউজ'-এর সম্পাদক খান সারওয়ার মুরশিদ একটি দীর্ঘ, সহানুভূতি শীল, দিকনির্দেশক আলোচনা লিখেছিলেন তাঁর উন্নতমানের পত্রিকায়। তিনি নিজে কবিতা লেখেন না, কিন্তু অপরিসীম তাঁর কাব্যপ্রেম। পাশ্চাত্যের তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন কবিদের বহু বই তাঁর বুকশেলফে শোভা পায়। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন সে-সব কবিতা। লক্ষ করেছি, তিনি কোনও উৎকৃষ্ট কবিতার ভাসা-ভাসা ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না, অভিজ্ঞ ডুবুরির মতো গহনে প্রবেশ করতে চান। করেনও চমৎকারভাবে।

সম্প্রতি আমার স্যার খান সারওয়ার মুরশিদের একটি অসাধারণ বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'কালের কথা'। আমরা যারা বাংলাদেশের বাসিন্দা আর আমাদের প্রতিবেশী ভূখণ্ডের বাঙালিরা যদি এই বইটি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করেন তা'হলে তাদের কাছে এ যাবত অনেক কুয়াশাচ্ছন্ন, বিকৃত বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং এই সঙ্গে লেখক মানুষটি সম্পর্কেও কিছু কিছু অজানা, গুরুত্বপূর্ণ কথা জানার সুযোগ হবে। তিনি কোনও সাদামাটা অধ্যাপক ছিলেন না। শুধু ঘরে বসে রাশি রাশি বই পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে বক্তৃতা দিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়াটাকে জীবনের একমাত্র তাৎপর্য মনে করেন নি, সমাজ ও দেশের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য সক্রিয় থাকাটাকেও বড়ো করে দেখেছিলেন। তাই তাঁকে আমরা দেখেছি পাকিস্তান আমলের প্রতিকূল পরিবেশে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে। সেকালে এ ধরনের অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকাটাও ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মনে পড়ে, সেই সাড়া জাগানো অনুষ্ঠানে কমিটির সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিচারপতি মাহবুব মোরশেদ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। তখনকার তরুণ আমি 'গীতবিতান'সহ বিপুল কাব্যসম্ভারের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে 'সূর্যাবর্ত' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করি।

আমার স্যার খান সারওয়ার মুরশিদের ভূমিকা এদেশের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংগ্রামে সীমাবদ্ধ নয়, যে সংগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছিল সেই মুক্তিযুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন ব্যক্তিগত আলাপে, কখনও কখনও লেখাতেও। অবহেলিত তাজউদ্দিন আহমেদের যথাযোগ্য কদর অন্য দল তো দেয়ই নি, এমনকি আওয়ামি লিগও যথেষ্ট কার্পণ্য করেছে বলে কারও কারও মতো স্যারও বিষণ্ন। খোদ শেখ মুজিব তাজউদ্দিন আহমেদের প্রতি অপ্রসন্ন হন কুচক্রীদের কানকথায়।

খান সারওয়ার মুরশিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন শেখ মুজিবের নির্দেশে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও পালন করেছেন সেকালে। কমনওয়েলথের

সহকারী মহাপরিচালক হিসেবেও কর্ম করেছেন। বলা হয় নি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি ম্যুরাল সৃষ্টির ভার দেন নন্দিত চিত্রকর মুর্তজা বশীরকে। আরেকটি কথা উল্লেখ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি — এমন চিত্তাকর্ষক গদ্যশৈলী যাঁর, এমন মননশীল প্রবন্ধ যিনি রচনা করেছেন বাংলা ভাষায়, তাঁর সম্পর্কে একটি লাইনও মুদ্রিত হয় নি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত লেখক-অভিধানে, অথচ অনেক গুরুত্বহীন লেখক বিষয়ে তথ্যাদি পেশ করা হয়েছে।

## ॥ ষোলো ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। তবে অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী কিংবা খান সারওয়ার মুরশিদ আমাকে যতটা আপন করে নিয়েছিলেন ততটা তিনি পারেন নি। সে জন্যে তাঁকে আমি কম পছন্দ কিংবা ভক্তি করতাম না। আমার কোনও খামতির জন্যেই সম্ভবত সামান্য দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার চেহারায় বুদ্ধিদীপ্ত কান্তি ছিল। অন্তরের আভাই হয়তো ছড়িয়ে থাকত তার চোখে-মুখে। প্রচলিত অর্থে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন কি-না বলতে পারব না। তবে সহকর্মীবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই ধীমান, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যাপক অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সম্পর্কে তাঁর সহকর্মী এবং সারস্বত সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল সদস্য ডক্টর খান সারওয়ার মুরশিদ একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন 'কালের কথা' গ্রন্থে।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা একজন র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট ছিলেন। মানবেন্দ্র রায়ের মতবাদে দীক্ষিত এই মানুষটি মানবতাকে সবার উপরে স্থান দিতেন। একজন মানুষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, এই তথ্য তার কাছে ছিল অবান্তর। লোকটি যে সম্প্রদায়েরই হোক, তাঁর মনুষ্যত্ববোধই বিবেচ্য ছিল অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার ভাবনায়। তিনি যে ষোলোআনায়ই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা আমি লক্ষ করেছি তাঁর কথায় এবং কাজে। খান সারওয়ার মুরশিদ লিখেছেন, 'সাহিত্যের সুবেদী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত সরস শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের অনুরাগের পাত্র ছিলেন। কিন্তু এরকম তো আরও দু'চারজন ছিলেন। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে বৈশিষ্ট্য তাহলে কী ছিল? বিশ্ববিদ্যালয় জায়গাটা বুদ্ধি চর্চার জায়গা এবং বুদ্ধি চর্চাকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সংস্কৃতি বিচিত্র এবং বিভিন্ন। এ বিভিন্নতা বিরুদ্ধতার রূপ নিতে পারে এবং তার প্রকাশ সব সময়ে খুব যুক্তিপূর্ণ ও নয়নাভিরাম হয় এমন দাবিও করা যাবে না। ক্ষমতা যতই ক্ষুদ্র মাপের হোক কারও কারও জন্যে তা মাদকের মতো। যৌথ জীবনের এই দিকটা ছোট, এমনকি, বড়ো দুঃখের এবং প্রায়ই বড়ো ফার্সের জন্ম দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের ভেতর ছোটোকাটো দ্বন্দ্ব যেখানে কোনও নীতির প্রশ্নে সেখানে সশব্দ সংগ্রামে লিপ্ত না হয়েও বুঝিতে দিতে পারতেন, অন্যায়ের প্রতি তাঁর সমর্থন নেই। শুভাশুভের তীক্ষ্ণ বোধ তাঁর ছিল, তবে অন্যায়-অবিচার পৃথিবীতে আছে বলেই প্রতিটি দিনকে লড়াইয়ের তীব্রতা ও বীরত্ব দিয়ে ভরে রাখতে হবে এমন প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি।'

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হয়ে গেল। একজন সহকর্মীর অন্য সহকর্মীর প্রতি এমন চমৎকার অকৃপণ মূল্যায়নের কিছু ভাগ আমার এই সামান্য লেখার পাঠক-পাঠিকাদের না দিয়ে পারলাম না। দিলখোলা প্রশংসা পাওয়ার হকদার ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। এখানে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা তার চরিত্রের আরেকটি সুন্দর দিক স্পষ্ট করে সবার কাছে। অনেকদিন আগের কথা, তবু ঘটনাটি আমার প্রায়শই মনে পড়ে। রমনা রেস্তোরাঁয় সাহিত্য-বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। আমার আসন পড়েছিল অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পাশে। তাঁর মুখে সেই পরিচিত প্রফুল্ল হাসি খেলা করছিল। আমার স্বভাব-বিরোধী একটি কাজ করে ফেললাম স্যারের উপস্থিতিতে। তাঁর একজন প্রতিক্রিয়াশীল সহকর্মী বিষয়ে একটি নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করে ফেললাম নীচু স্বরে। স্যার আমাকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে বললেন, 'ছিঃ, এমন কথা বলতে নেই। এ ধরনের আচরণ তোমাকে মানায় না।' স্যারের মৃদু ভর্ৎসনায় লজ্জায় বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আর ক্ষমা প্রার্থনা করলাম নিজের অশোভন আচরণে। এই ঘটনা কি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মানসিক ঐশ্বর্যের পরিচায়ক নয়? তাঁর ছাত্রদের শুধু ক্লাসের শিক্ষা দিয়েই নিজের দায়িত্ব ফুরালো বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেন না। মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাও দিতেন নিজস্ব পদ্ধতিতে, কখনও ঈষৎ রুষ্ট চিত্তে — কখনও হাসিমুখে।

এমন একজন গুণীব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক হামলায়, যেমন হারিয়েছি প্রতিভাবান লেখক এবং সফল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে খুনী আলবদরদের অস্ত্রাঘাতে। তাঁদের হারানোর শোক বিবেকবান বাঙালিরা শত ওলোট-পালট সত্ত্বেও কখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। জীবনের শেষ পর্যায়ে মুনীর ভাইয়ের দিকে নিন্দার অনেক পাথর ছুঁড়েছে অনেকে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেলেন যে, মুনীর চৌধুরী বৈরিপরিবেশের শিকার হয়েছিলেন, বাঙালি জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি কোনওকালেই। অনেক সময় অনেকে কোনও কোন ব্যক্তিকে খামোখাই ক্রুশবিদ্ধ করে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। শহিদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে তেমন কোনও অপবাদ সইতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, কট্টর সাম্যবাদীরা তাঁর দিকে সুনজর দেন নি। কারণ, তিনি র‍্যাডিকেল হিউম্যানিজমের প্রবক্তা এম.এন. রায়ের একজন বিদগ্ধ অনুসারী ছিলেন। যা হোক, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবনসঙ্গিনী বাসন্তী গুহঠাকুরতা স্বামী হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে কন্যা মেঘনা গুহঠাকুরতাকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন কঠোর সাধনায়। মেঘনা গুহঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতোই সেই একই ঋদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যাপীঠের একজন অধ্যাপিকা। মেঘনা অবশ্য ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা নয়, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বিভাগই তার কর্মক্ষেত্র। শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী গুহঠাকুরতা বেশ কিছুদিন হল চলে গেছেন জীবনের পরপারে। তবে মেঘনা বেঁচে আছে; সুদীর্ঘকাল সে বেঁচে থাকুক, পিতার মতোই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাক আজীবন। ওর জীবনচর্যার দীপ্তিতে লুপ্ত হোক বহুরূপী অন্ধকার।

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বিষয়ে একটি জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। খান সারওয়ার মুরশিদ সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকা 'নিউ ভ্যালু'-এ তো তিনি লিখতেনই,

‘মুক্তি’ নামে একটি উন্নতমানের বাংলা সাহিত্য পত্রিকারও নিয়মিত লেখক ছিলেন স্যার। এই সাহিত্যপত্রের সম্পাদক ছিলেন আবদুল গণি হাজারী এবং মাহবুব জামাল জাহেদী। আবছা মনে পড়ছে, এই পত্রিকার নাম প্রচ্ছদপত্রে ‘মুকতি’ ছাপা হত। কেন এরকম হত, বলতে পারব না। সম্পাদকদের জিজ্ঞেস করতে পারতাম, মানসিক আলস্যের প্রভাবে নিশ্চুপ ছিলাম। তাছাড়া পত্রিকাটিতে প্রকাশিত রুচিশীল কবিতা,গল্প, প্রবন্ধ অন্য কোনও বিবেচনাকে মাথা তুলতে দিত না। আজও মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে সেই পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাই। কিন্তু আমার কাছে ফাইল থাকা দূরের কথা, একটি কপিও নেই। হায়, কত দামি জিনিস এভাবে হারিয়ে যায়। পত্রিকাটিতে সেকালে আমার একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, সেই অক্ষম লেখা আমার কোনও কাব্যগ্রন্থে ঠাঁই পায় নি। তাই, দুর্বার ইচ্ছে হলেও সেগুলো পড়া হবে না কোনওদিন।

একটি জরুরি কথা আমাদের সবার মনে রাখা দরকার, আজকের অনেক তরুণ লেখক তাদের নানাবিধ কীর্তির জন্যে গর্ববোধ করেন এবং প্রচারও করেন। এটা অন্যায় কিছু নয়। তবে বিস্মৃত হলে চলবে না যে, আজকের ভিত্তি গড়ে তুলেছেন তাদের অগ্রজ লেখকবৃন্দ। মাসিক ‘সওগাত’ কিংবা ‘মোহাম্মদী’র ভূমিকাকে বিস্মরণের অন্ধকারে ঠেলে দেয়া অন্যায় হবে। এমনকি মাসিক ‘তাহজিব’ এবং ‘মাহে-নও’-এর অবদান অবহেলার যোগ্য নয়। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, একদা সাড়া-জাগানো ফজলে লোহানী সম্পাদিত মাসিক ‘অগত্যা’র কথা। এই পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ফজলে লোহানীর অগ্রজ ফতেহ লোহানী। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ‘অগত্যা’র অন্যতম চালিকাশক্তি ছিলেন।

ফতেহ লোহানী শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। কয়েকটি ভালো ছোটোগল্প লিখেছিলেন সেকালের ‘মোহাম্মদী’ এবং ‘সওগাত’ পত্রিকায়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী’ উপন্যাসের চমৎকার অনুবাদ করেন। তাছাড়া সুকণ্ঠের অধিকারী এই শিল্পী মানুষটির আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছি অতীতে। টেলিভিশনে আমার ‘কখনও আমার মাকে’ শীর্ষক কবিতার রেকর্ডে ধারণকৃত তাঁর আবৃত্তি বেশ ক’বার প্রচারিত হয়। শ্রদ্ধেয় ওবায়েদ-উল হক পরিচালিত ‘জীবন যাদের দুঃখে গড়া’ ফিল্‌মে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাছাড়া পরবর্তীকালে বহু ফিল্‌মে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দুঃখের বিষয়, মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ফতেহ লোহানীর ছোটো ভাই ফজলে লোহানী লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জ করেন নি। আমরা যেকালে ‘সওগাত’ অফিসে আসর জমাতাম মানে আড্ডা দিতাম, সেকালে তিনি দুই তিনটি কবিতা হয়তো লিখেছিলেন। তাঁর একটি কবিতাই আমি পড়েছি। কবিতাটি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক সঙ্কলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’তে প্রকাশিত হ। সেই কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি —

**শীতল পৃথিবী, অবশ নগর,**
**অসার আকাশ, বাতাস নিথর**
**ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে জীবনের সব রেণুকণা যত।**
**রোদগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে, বিছিয়ে রয়েছে ঘাসের মতন,**
**পলাশ ফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোস্টের উঁচু কোণটায়।**

একুশে বিকেল।
মৃত্যু হয়েছে আজকে ওদের।
বোবা পাখাগুলো পাখা ঝাপটায়।
একুশে রাতের আঁধার নামে সব শহরের গলি ঘুঁজিতে গাঁয়ের বাঁকা পথগুলোতে।
রেল কলোনিতে, কেরানির ঘরে, কিষাণের ঘরে।
ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
আঁধার নেমেছে।
আজকে তাদের মৃত্যু হয়েছে তাই শুনে
সব স্তব্ধ পাষাণ।

ফজলে লোহানী তাঁর অগ্রজের মতো উৎকৃষ্ট ছোট্টগল্প লিখতে পারেন নি, হয়তো লেখার চেষ্টাও করেন নি। সাহিত্য রচনায় নিষ্ঠাবান হলে, তিনি এ দেশের একজন ভালো লেখক হতে পারতেন। ফতেহ লোহানী ছোটোগল্প রচনায় যে শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয়, সেই তুলনায় ফসল সংগ্রহে মনোযোগী হন নি। এভাবে কত প্রতিভার দীপই না নিভে যায়। ফজলে লোহানী সৃজনশীল লেখক হতে পারেন নি, কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং টেলিভিশনের একজন অসাধারণ উপস্থাপক হিসেবে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন'-এর কথা আজও অনেকের মনে পড়ে।

মাসিক সাহিত্যপত্র 'তহজিব' এবং সেই পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ আবদুল মান্নান সম্পর্কে কিছু না বললে অন্যায় হবে। সৈয়দ আবদুল মান্নানের জন্মস্থান বাখরগঞ্জের চাচইর গ্রাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর অন্য কোনও ডিগ্রি সংগ্রহ করার সুযোগ পান নি। তবে তাঁর জ্ঞানপিপাসা আমৃত্যু বজায় ছিল। সাংবাদিকতাকে বরণ করেছিলেন পেশা হিসেবে। দৈনিক 'সংবাদ'-এর বার্তা বিভাগে কাজ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তবে তিনি অনেকের কাছে একজন লেখক এবং 'তহজিব' পত্রিকার সম্পদক হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সেকালে 'তহজিব' পত্রিকা প্রচুর সুনাম অর্জন করে। আমরা তরুণ লেখকেরা সৈয়দ আবদুল মান্নানের স্নেহসিক্ত ছিলাম। কে কোন মতাদর্শে দীক্ষিত এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না; সবাইকে মুক্তমনে গ্রহণ করতেন। তবে তাঁর বিবেচনায় যারা প্রতিশ্রুতিশীল এবং শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক তাদের রচনায় সমৃদ্ধ হত 'তাহজিব'-এর পৃষ্ঠাসমূহ। ফররুখ আহমদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মূল্যবান রচনাগুলো যেমন প্রকাশিত হত, তেমনি ছাপা হত আমাদের মতো তরুণদেরও লেখা। তিনি 'গুলে বাকাওয়ালী', 'মহাকবি ইকবাল', 'এক যে ছিল সওদাগর', 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'সোনালী যুগের কাহিনী', 'শাহী, দরবারের কিসসা', 'আগুনের ফুলকি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। আমার মনে পড়ে, তিনি ইকবালের বিখ্যাত 'আসরারে খুদী'র একটি সফল অনুবাদ করেছিলেন। সে আমলে গুণীজন অনুবাদকর্মটির প্রচুর তারিফ করেছিলেন।

সখেদে বলতে হচ্ছে, কে আজ মনে রেখে সৈয়দ আবদুল মান্নানকে? কোথাও তাঁর নাম উচ্চারিত হতে শুনি না। আমরা যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম,

তাদের কেউ কেউ হয়তো হঠাৎ সেই উদারচিত্ত, সাহিত্যপ্রেমীর মুখটি দেখে ফেলি মানসে, অতিদূর থেকে ভেসে আসা একটি গাঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কানে। আমাদের দেশে অনেকে গুণীজনকে স্মৃতির কুয়াশা থেকেও নির্বাসিত করতে বেজায় দড়!

## ॥ সতেরো ॥

আমি যে কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, সেকালে আমরা কে কোন রাজনীতিতে সমর্পিত তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই নি। অন্তত আমি কোনও হিসেব-নিকেসের ধার ধারতাম না, এমনকি জিজ্ঞেসও করতাম না কোনও বন্ধুকে। তবে কথাবার্তা থেকে তার রাজনৈতিক বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠত। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে আমি নিজে রাজনীতি সচেতন ছিলাম না। ভাসা ভাসা ধারণা সম্বল করে মিশতাম নির্বাচিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। ঢাকা কলেজে আমি বেশিরভাগ সময় একলা কাটাতাম। কারও কারও সঙ্গে মেলামেশা হত বটে, কিন্তু বন্ধুতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। মোশাররফ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে যৎকিঞ্চিত ঘনিষ্ঠতা ছিল বটে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আওয়ামী লিগ নেতা জিল্লুর রহমানের সঙ্গে মিশেছি কিছুদিন, অথচ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে নি আমারই দোষে, তার রাজনৈতিক বিশ্বাস কী তা জানার একরত্তি কৌতূহলও ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দীর্ঘায়িত ছিল কেন তা আগেই বলেছি। হ্যাঁ, এখানেই পেয়েছি কয়েকজন ভালো বন্ধুকে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, সাবের রেজা করিম, তরীকুল আলম, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বদরুদ্দীন উমর, আবুল মাল আবদুল মুহিত, মোস্তফা কামাল, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, সৈয়দ আলী কবির এবং আরও কারও কারও সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সাবের রেজা করিম মুক্তমনের অধিকারী। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ঝুঁকেছিলেন বাম রাজনীতির দিকে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন সেকালে। বদরুদ্দীন উমরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে। এই প্রতিষ্ঠানের সভায় তিনি নিয়মিত যোগ দিতেন। তমদ্দুন মজলিসের কিছু আকর্ষণীয় শক্তি ছিল তখন। কিছু পরে তিনি তমদ্দুন মজলিসের সংস্রব ত্যাগ করে সাম্যবাদে সমর্পিত হন। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, তরীকুল আলম, মোস্তফা কামাল যতদূর মনে পড়ে, ইসলামিক ব্রাদারহুডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় মনোনিবেশ করায় স্বস্তি পেয়েছি তখনও। তা বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কখনও মলিন হয় নি। পরে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, তরীকুল আলম প্রাক্তন বিশ্বাস থেকে সরে আসেন।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় অটল আস্থাশীল। কোনও কিছুই, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই কম দেখা হয়, কখনও কখনও টেলিফোনে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়। তরীকুল আলমকে তিনি পছন্দ করতেন ওর আন্তরিক ব্যবহারের জন্যে। ওর ছটফটে ভঙ্গি উপভোগ করতাম আমরা। ওকে প্রথম দেখি রেডিও পাকিস্তানের কবিতা পাঠের আসরে। ১৯৫০

সালে 'শিরিন কালাম' অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হই। যতদূর মনে পড়ে, সেই অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েছিলাম হাবীবুর রহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আনোয়ারা বেগম, তরীকুল আলম এবং আমি। তখন কবি আবুল হোসেন রেডিও পাকিস্তানে একজন প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই 'শিরিন কালাম' প্রচারিত হত। আমাদের সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন স্টাফ আর্টিস্ট কবি ফররুখ আহমদ। বলতে ইচ্ছে করছে, আমার কয়েকটি কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধু হামিদুর রহমান বলেছিলেন, 'তুমি রেডিও অফিসে গিয়ে কবিতা পড়ার জন্য আবেদন করো না কেন?' ওকে বললাম, 'আমি যেচে ওখানে যাব কেন? যেদিন আমন্ত্রিত হব সেদিনই রেডিও অফিসে যাব, তার আগে কখনও নয়।' আসল রেডিওতে কবিতা পাঠের লালসা কস্মিনকালেও লকলকিয়ে ওঠে নি মনে।

যা হোক, আমন্ত্রিত হয়ে আবুল হোসেনের কাছে একটি মুদ্রিত কবিতা জমা দিই। তিনি আমাকে অন্য একটি কবিতা আনতে বললেন, সম্ভবত জীবনানন্দ গন্ধী কবিতাটি তাঁর ভালো লাগে নি। তিনি যদি কবি না হয়ে শুধু একজন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হতেন, তাহলে আমি হয়তো কবিতাটি ফেরত দিয়ে আর রেডিওমুখো হতাম না। একজন উৎকৃষ্ট অগ্রজ কবির কথা মেনে নিলাম সানন্দে। সদ্য রচিত 'কয়েকটি দিন : ওয়াগনে' কবিতাটি দাখিল করি তাঁর টেবিলে। রেডিওতে প্রথম কবিতা পড়তে গিয়ে ভেতরে ভেতরে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। অনুষ্ঠানের কিছু আগে বার বার শুকিয়ে যাচ্ছিল গলা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমার পালা যখন এল, মাইক্রোফোনে প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়তে গিয়ে গলা ঈষৎ কেঁপে উঠল। শেষ পর্যন্ত আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললাম। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসার পরক্ষণেই দেখি, রেডিওর একজন ইঞ্জিনিয়ার দোতলা থেকে নীচে ছুটে এসেছেন আমাকে অভিবাদন জানানোর জন্যে। ভদ্রলোকের নাম আমার মনে নেই, মনে পড়ে তাঁর করমর্দন, আবেগময় কথা এবং মুখময় বসন্তের দাগ। জানি না তিনি আজ কোথায় আছেন, কেমন আছেন? বেঁচে আছেন তো?

রেডিওর 'শিরিন কালাম'-এর সেই অনুষ্ঠানের এক বছর পর তরীকুল আলম খুলনা থেকে ঢাকায় আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে। যথারীতি ভর্তি হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে তরীকুল আলম, তার ভাই জহুরুল আলম, মোস্তফা কামালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তরীকুল এবং মোস্তফা কামাল বয়সে আমার ছোটো এবং তাদের তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারটি সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্বে কোনও ফাটল ধরে নি তখন। তরীকুল আমাকে খুবই পছন্দ করত, ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। অনেক বছর পর মৃত্যুর তিন চার মাস আগে ওর আচরণ কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে পড়ে। কথাবার্তা খানিক অসংলগ্ন, কোনও কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে হঠাৎ খামোকা খারাপ ব্যবহার করা ইত্যাদিতে অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠত। এই তরীকুল আলম আমার অচেনা।

তরীকুল আলমের কর্মজীবন শুরু হয় সাংবাদিক হিসেবে। বেশ কয়েক বছর সে দৈনিক 'আজাদ'সহ কয়েকটি সংবাদপত্রে স্টাফ রিপোর্টারের কাজ করে। পরবর্তীকালে সরকারের একজন পিআরও হয়। বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী আভা দে'র প্রেমে পড়ে

এবং এই প্রণয় রূপান্তরিত হয় পরিণয়ে। আভা দে হলেন আভা আলম। তাদের তিনটি সন্তান। তাদের নাম ইমন, সাবেরি এবং আহির। সন্তানদের রাগভিত্তিক সুন্দর নামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে স্বামী-স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছি।

তরীকুল যেদিন মারা যায় সেদিন বদরুদ্দীন উমরকে মৃত বন্ধুর বাসায় দেখি। এটা প্রত্যাশিত ছিল, কারণ তরীকুল উমরের বন্ধু ছিল। উমর তাঁকে পছন্দ করতেন। তরীকুল যখন শেষের দিকে এক ধরনের অস্থিরতায় ভুগে ভুগে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তখনও নানা ব্যস্ততার মধ্যে বন্ধুবৎসল উমর একাধিকবার তরীকুলকে দেখতে গেছেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে।

সব কিছুতেই কেমন তাড়াহুড়ো করত তরীকুল আলম। তাড়াহুড়ো করেই সে বিদায় নিল দুনিয়া থেকে। কবিতা লিখত সে, তাঁর একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা রচনায় তেমন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারে নি। তবে একজন বন্ধু, স্বামী এবং পিতা হিসেবে অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। আভার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসামান্য। ওকে হারিয়ে সে প্রায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। একদিন জীবনসঙ্গিনীর কবরে ফুল দিতে না পারলে সম্ভবত নিজেকে খেদ ও ভর্ৎসনায় জর্জরিত করত, অনুমান করি।

আমরা অনেক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি, অনেককে পছন্দ করি, বন্ধু হিসেবে পেয়ে যাই কয়েকজনকে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধা করতে পারি খুব কম ব্যক্তিকেই। বদরুদ্দীন উমর সেই বিরল ব্যক্তিদেরই একজন। খ্যাতিমান পিতা আবুল হাশিমের উজ্জ্বল সন্তান তিনি। উমর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের নামজাদা ছাত্র ছিলেন। জনাব আবুল হাশিম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বাসিন্দা ছিলেন। সেখান থেকেই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বর্ধমান থেকে তাঁর পিতা ঢাকায় চলে এলে উমর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন দর্শন বিভাগে। এই বিভাগের কৃতী ছাত্র বদরুদ্দীন উমর। তিনি যখন অনার্সের ছাত্র তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রাথমিক পরিচয় বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আমাদের বন্ধুত্বের পথে কোনও বাধা সৃষ্টি করে নি। তাঁদের হাটখোলা রোডের কেএম দাস লেনের বাসায় আমি যেতাম, তিনি আসতেন আমাদের পুরনো ঢাকার আশেক লেনের বাড়িতে। আড্ডা জমে উঠত আমাদের। সেই আড্ডায় তরীকুল আলমও থাকত। আমি সেই আড্ডায় তমদ্দুন মজলিসের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেছি, ইসলামিক ব্রাদারহুড বিষয়েও নীরব থেকেছি। ওরাও আমার মতাদর্শ নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি। কারণ আমরা আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। খামোকা প্রশ্ন করে নিজেদের বিব্রত করতে চাই নি, এমনকি কোনও অসতর্ক মুহূর্তেও। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকত মূলত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে। সেকালেই লক্ষ করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং গান নিয়ে উমরের অসামান্য ভালো লাগার দিকটি।

বদরুদ্দীন উমর এমএ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে চাকরি পেয়ে গেলেন চার-পাঁচ মাসের জন্যে। সচরাচর এরকম হওয়ার কথা নয়। তবে উমরের মেধা এবং পরীক্ষার ফল বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান সুনিশ্চিত

ছিলেন বলেই এই ব্যতিক্রম ব্যাপারটি ঘটতে পেরেছিল। অন্য একটি কারণ হল, তখন দর্শন বিভাগে অধ্যাপকের অনটন ছিল। যা হোক, জীবনের প্রথম চাকরির প্রথম মাসেই মাইনে তিনি তাঁর বন্ধুদের গুলিস্তান এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় আপ্যায়ন করেছিলেন মজাদার কাবাব ও পরোটার মাধ্যমে। আমরা দারুণ উপভোগ করেছিলাম সেদিন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিপিই ডিগ্রি হাসিল করে সগৌরবে ঢাকায় ফিরে আসেন। যদিও আমি নিজে অকৃতী একজন, আমার ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ও বন্ধু জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং যিনি আমার সহপাঠী নন অথচ একজন সুহৃদ বদরুদ্দীন উমরে জ্বলজ্বলে কৃতিত্বে সেকালে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। উমর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রফেসার হিসাবে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ততদিনে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রগতিশীল সংগ্রামী চেতনায় ঋদ্ধ হয়েছে তাঁর মনন। ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। এটা যে কোনও সহজ পদক্ষেপ ছিল না, মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীর পক্ষে তা সবার কাছে সুস্পষ্ট। এ ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে দুর্লভ, সন্দেহ নেই। জীবনধারণের পক্ষে কঠোর এই পথে নেমে এসে উমর ত্যাগ ও কঠোর জীবনসাধনায় নিয়োজিত হলেন। সত্য, জাগতিক অর্থে বিত্তবান তিনি নন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের এবং সুস্থ রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যে-কোনও বিবেকবান অগ্রসর ব্যক্তির কাছে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পাবে। তবে আমি জানি, বদরুদ্দীন উমর, যিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক এবং প্রগতিশীল রাজনীতিতে নিবেদিত, কোনওরকম স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নন, সমাজকে সঠিক পথে চালিত করে সকল উপেক্ষিত, দরিদ্র, অসহায় মানুষকে আলোকিত, সুখী, সমৃদ্ধ জীবনের স্বাদ দেয়াই তাঁর ব্রত। সেই সমাজ কোন কালে গঠিত হবে, জানি না; এটুকু জানি, আমার জীবদ্দশায় যে হবে না সে-কথা সখেদে এবং উচ্চকণ্ঠেই বলতে পারি চারপাশের লোকজনের মতিগতি লক্ষ করে।

অন্ধকার, পশ্চাৎপদতা, হতাশা যতই হামলা করুক, তবু আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে বদরুদ্দীন উমর রচিত 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সংস্কৃতির সঙ্কট', 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ', 'বাংলাদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা', 'যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ', 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ', 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'বাংলাদেশে মার্কসবাদ', 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক', 'বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার', 'বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি', 'সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি', 'পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা', 'বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব', 'ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে', 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র', 'বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র', 'বাংলাদেশে দুর্নীতি', 'সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য', 'বামপন্থী মহলে অনৈক্য ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রসঙ্গে', 'আমাদের সময়কার জীবন' ইত্যাদি।

বদরুদ্দীন উমর কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেছেন। উমর বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের অন্যতম সমন্বয়কারী, কৃষক ও গ্রামীণ মজুর ফেডারেশন, বাংলাদেশ

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রথম সারির নেতা। তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটিরও একজন সদস্য।

আমাদের দেশে অনেকে লেখকের মধ্যে পুরস্কার লাভের জন্য লোভ ও লালসার যে লকলকে আচরণ লক্ষ করেছি তা অত্যন্ত অশোভন। কিন্তু উমর দু'দুটো পুরস্কার হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই কোনও কোনও বিষয়ে তার সঙ্গে একমত না হওয়া সত্ত্বেও আমি এই অসাধারণ লেখকবন্ধুকে হাজার সালাম জানাই। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় না, তবে সম্পর্কে কোনও চিড় ধরে নি। কখনও সখনও উমর আমার খোঁজখবর নেন টেলিফোনে, আমিও মাঝে মাঝে টেলিফোন করি তাকে। আমার চোখের দুরবস্থার কথা শুনে তিনি আমাকে মাদ্রাজের শংকর নেত্রালয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং কম খরচে কোন হোটেলে থাকা যাবে সেই হোটেলের অবস্থানেরও খোঁজ পাই তাঁর কাছে। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি নি ব নম্রভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আমি লজ্জিত হই। আমি যে অবহেলা করে তাঁকে জানাই নি, এটা বুঝতে পারেন বন্ধু উমর। জানি দীর্ঘকাল আমাদের সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা না হলেও বন্ধুত্বে চিড় ধরবে না। আমি ভালো করেই জানি, আমার কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি আমাকে সুহৃদ বলে গণ্য করেন।

সত্যি বলতে কি আমার বন্ধুভাগ্য খুবই ভালো। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সাবের রেজা করিম, রশীদ করীম, কায়সুল হক, শহীদ কাদরী, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখের সখ্য লাভ করেছি। একদা জিল্লুর হমান সিদ্দিকীর সহপাঠী ছিলাম। অনেক সহপাঠীই তো বিস্মৃতির কুয়াশায় মিলিয়ে যায়, কিন্তু তিনি আমার জীবনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন সময়ের বিরূপতা সত্ত্বেও।

## ॥ আঠারো ॥

আমি যৌবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নিজেকে রাজনীতির আঁচ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছি। রাজনীতি আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হত না। এক ধরনের ঔদাসীন্য আমাকে রাজনীতি থেকে আড়াল করে রাখত। কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম শৈশবে, শেরে বাংলা ফজলুল হককে আব্বার সঙ্গে আলাপ করতেও দেখেছি। একদা আব্বা রাজনীতিতে, বলা যেতে পারে, মশগুল ছিলেন। তিনি ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির একজন নিবেদিত সদস্য ছিলেন। ফজলুল হকের অনুরোধে তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে রায়পুরা ইউনিয়ন থেকে কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতাগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন বলেই তাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমনিষ্ঠ কৃষক এবং খেটে-খাওয়া মানুষদের স্বার্থ রক্ষায় ছিলেন আন্তরিক। কিন্তু মুসলিম লিগে সমবেত হয়েছিলেন জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের তেমন কোনও যোগাযোগও ছিল না। বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম

ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ। তাঁর বক্তৃতার বাংলাভাষা ছিল শুদ্ধ এবং পরিপাটি। অবশ্য বক্তা হিসাবে ফজলুল হক এমনই দক্ষ এবং আবেদন সৃষ্টিকারী ছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। এ ব্যাপারে কারও কোনও দ্বিমত ছিল বলে শুনি নি।

আমার পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী শেরে বাংলা ফজলুল হকের একজন প্রিয় পাত্র ছিলেন। ফজলুল হক আব্বাকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে অনুরোধ করেন। আব্বা তাঁর নেতার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এলাকাবাসীর জন্যে আন্তরিক টান ছিল আব্বার, জন্মস্থানকে তিনি পুণ্যভূমি মনে করতেন। নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করতে পারলে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখা সহজ হবে — এই বিশ্বাস তাঁকে সেকালে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলেন, কিন্তু কারও সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতেন। অন্তত আমি তাঁকে কখনও সে বিষয়ে আলোচনা করতে দেখি নি।

নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি, স্বজনদের প্রতারণা মোখলেসুর রহমান চৌধুরীর নিজের জন্মস্থানের প্রতি ভালোবাসার জমিনে সামান্য চিড় ধরাতেও ব্যর্থ হয়েছে। যে পাড়াতলী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছে, যেখানে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তাঁর, যেখানে সদ্য যৌবনের নানা দিন কাটিয়ে দিয়েছেন হাওয়ায় শস্য-দোলানো খেত, নদী-নালা, গাছপালা এবং কুটিরের শোভা দেখে, ঢাকা শহর থেকে বারবার ছুটে গেছেন সেখানে। বার্ধ্যকেও এই আসা-যাওয়ায় ছেদ পড়ে নি। আব্বা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন পাড়াতলীতে। কখনও কখনও বজরায় তিন চার দিন নদীপথে কাটিয়ে, প্রকৃতির শোভা দেখে পৌঁছে গেছি পাড়াতলীর আলুঘাটে। কী উপভোগ্যই না হত সেসব ভ্রমণ!

যেখানে তিনি সাধারণ নির্বাচনে সফল হন নি সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কোনওরকম মতলব কিংবা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য তাঁকে পরিচালিত করে নি। সেজন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পাড়াতলীর প্রাইমারি স্কুলটিকে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের নাম এখন মুন্সি কলিমুদ্দিন হাই স্কুল। পাড়াতলী এবং পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো পাচ্ছে বছরের পর বছর। আব্বার মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের ওপর স্কুলটিকে সচল রাখার দায়িত্ব বর্তেছে।

আমার নিজের শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের অনেক স্মৃতি জড়িত রয়েছে পাড়াতলীর সঙ্গে। সেই যে কবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিংবা পুকুরপাড়ে গাছতলায় বসে উদাস দুপুরে ডাহুকের ডাক শুনতাম, পাড়াতলী স্কুলের নিকটবর্তী বড়ো পুকুরটায় গা ভাসিয়ে, পানি ছিটিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ধরে গোসল করতাম, বাঁশ বাগানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখতাম, সর্ষেক্ষেতে প্রজাপতিদের চঞ্চলতা উপভোগ করতাম, হাটবাজারে ঘুরে বেড়াতাম পড়ন্ত বিকেলে, বুকের ভেতর ভয় পুষে রাতে একা কিছুটা পথ হেঁটে আলুঘাটে নোঙরবাঁধা বজরায় গিয়ে উঠতাম ঘুমাবার জন্যে — এসব কি ভোলা যায় কখনও? কী করে ভুলব মোমেনা খালার মৃত্যুর কথা? আব্বাকে একটি কাঠের চেয়ারে বসে পাড়াপড়শিদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছি, দেখেছি বাড়ির মসজিদে নামাজ পড়তে, স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টার এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মিটিং করতে, ঝোড়ো আবহাওয়ায় আব্বার লাশ নিয়ে মেঘনা নদী পাড়ি দিয়ে পাড়াতলী পৌঁছে আলহাজ্ব মোখলেসুর

রহমান চৌধুরীর তৈরি সুন্দর একতলা দালানে সন্ধ্যারাতে পৌঁছুনো, বাড়িলগ্ন মসজিদে জানাজা পাঠ, তাঁর লাশ পারিবারিক গোরস্তানে আমার দাদা মরহুম মুন্সী কলিমুদ্দিন আহমদের কবরের পাশে মাটি খুঁড়ে নতুন কবরে তাঁর সন্তানকে শুইয়ে দেয়া ইত্যাদি অনেক কিছুই ভিড় করে আসছে মনের চিত্রপটে।

মনে পড়ছে, মেঘনার বুকে আমাদের বজরা, বিকেলে সেই বজরা নোঙর করে দাঁড়িয়ে জিরোয় নদীতীরের নিভৃত এক টুকরো জায়গা ঘেঁষে। সূর্যের তেজ কমে গেছে। বজরার ছাদে পাশাপাশি বসে আছেন আব্বা আর আম্মা। আমার হাতে ক্যামেরা। এক ফাঁকে আনাড়ি হাতে তুলে নিলাম দু'জনের ছবি। হায়, আজ যখন আমি আমার এই সামান্য আত্মজীবনী লিখছি, তখন তাঁরা দু'জন নেই এই আলোছায়াময় দুনিয়ায়, বেঁচে আছেন তাদের সন্তানদের ভাবনায় এবং আরও কিছু মানুষের স্মৃতিতে, যাঁরা তাঁদের চিনতেন, তাঁদের আন্তরিক ব্যবহারের মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছেন।

আমি যখন আত্মজীবনীর এই অংশটি লিখছি, তখন বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তদারকির ছায়ায় সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে কয়েক দিন পরে। প্রায় প্রতিদিনই খুনখারাবি চলছেই। শান্তিপ্রিয় মানুষদের মনে হানা দিচ্ছে শঙ্কা। অনেকেই উদ্বেগ নিয়ে ভাবছেন, কী-যে হবে আখেরে। শান্তি ফিরে আসবে তো? বন্ধ হবে তো খুনোখুনি? এক ধরনের উন্মত্ততা যে চলছে সারা দেশে শিগগিরই কি তা সুস্থতায় রূপান্তরিত হবে? কে দিতে পারে এই ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব?

আজকের এই পরিস্থিতিই আমাকে নিয়ে গেছে দূরের ধোঁয়াটে ১৯৩৭ সালে। সেই বছরের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে। তখন কী শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই না নির্বাচন হয়েছে! কোনও লাঠালাঠি নেই, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন নেই, নেই রক্তাক্ত লাশের ছড়াছড়ি। কী শান্তিই না বিরাজ করেছে তখন! এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারটি চালু হল আমাদের দেশে তা কি খুব সম্মানজনক রাজনীতিবিদদের জন্যে? এই ব্যবস্থা আমাদের রাজনীতিবিদদের মানসিক অপরিপক্বতা, ব্যর্থতা এবং চরম অসহিষ্ণুতাকেই সুস্পষ্ট করে তোলে, যা কোনও সুশীল সমাজের জন্যে আদৌ সম্মানজনক ও কল্যাণকর নয়।

আমার ছেলেবেলায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে আব্বার কৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষীদের আচরণ আমাকে অনেক আগেই রাজনীতিবিমুখ করে তুলেছিল। রাজনীতিকদের কথাবার্তা, কোন্দল এবং কারও কারও নীতিহীন কর্মকাণ্ড আমি কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য মনে করতাম না. প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা আমাকে দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে গোড়া থেকেই। রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়েও আমি প্রগতি, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চায় নিয়োজিত ছিলাম। মানসিক সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, চিন্তাক্ষেত্রে পশ্চাদমুখীনতা এবং মানুষের অকল্যাণ আমাকে পীড়িত করত। আমার এই চেতনা শুধু পুথির বহু পাতা-নির্ভর নয়, জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাতও বটে।

আমার প্রতিভাবান সহপাঠী এবং বন্ধু জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ছাত্রাবস্থায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকতেন। একবার তিনি মুসলিম হলের নির্বাচনে সাধারণসম্পাদকের পদে এবং মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। আমি মুসলিম হলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে আমারও একটি ভোট ছিল। সেই ভোট মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর বাক্সেই পড়েছিল। তারা দু'জনই আমার পরিচিত তো বটেই, একজন তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যিনি পরবর্তীকালে প্রধান বিচারপতি এবং '৯৬ সালে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ অলঙ্কৃত করেন, আমার বন্ধু না হওয়া সত্ত্বেও শুভার্থী তো বটেই। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতোই তিনি উজ্জ্বল ছাত্র এবং কৃতী পুরুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে কিছু সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাইসজ্জিত একটি বাক্স গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ধূমপায়ীদের কাছে। ব্যাপারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, মনে পড়ে। এই প্রতিবাদের ফলে অন্যায়ের প্রতিকার হয়েছিল।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক বই লিখেছেন। বইগুলো হলো যথাশব্দ, মাতৃভাষার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার, কোরানসূত্র, বচন ও প্রবচন, গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা, রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট সংগীত ও সাহিত্য, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অর্থাৎ জি.র.সি. ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। জি.র.সি. ১৯৫০ সালে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় চোখ-ধাঁধানো ফল লাভ করেন — অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। পরীক্ষার চার মাস আগে তিনি টাইফয়েডে ভোগেন; পরীক্ষার সময় কালাজ্বর হামলা করে তাকে। পরীক্ষার সিটে বসা অসম্ভব ছিল। ইংরেজি বিভাগের প্রধান মিস এজি স্টক তাঁর প্রিয় ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে বারণ করেন। কিন্তু জি.র.সি. দমবার পাত্র নন। তিনি পরীক্ষা দেবেনই। রোগশয্যায় আধশোয়া অবস্থায় দিলেনও। পরীক্ষার ফলে সেই বিরূপ অবস্থার বিন্দুমাত্র ছায়া পড়ে নি। আমার তো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল সহপাঠী বন্ধুর এই সাফল্যে আর নিজেকে ধিক্কার দিলাম পলায়নী মনোবৃত্তির জন্যে। পরের বছর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী আমাকে দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মুচলেকা লিখিয়ে নিলেন যে, এবার আমি পরীক্ষা দেবই। কিন্তু মুচলেকার অসম্মান করলাম হেলায়। বন্ধু হাল ছেড়ে দিলেন। যা হোক, জি.র.সি. যখন এমএ ক্লাসের ছাত্র তখন তার করতলে এসে গেল ইংল্যান্ডে যাওয়ার স্টেট স্কলারশিপ। এমএ পরীক্ষাতেও তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ১৯৫২ সালে অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজিতে অনার্স করে ১৯৫৪ সালে স্বদেশে ফিরে এলেন। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা কলেজে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যান। বেশ কিছুকালের জন্যে ঢাকা কলেজে থাকতে হবে, এই মর্মে বন্ড দিতে হয়েছিল তাকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জুবেরির প্রয়োজন ছিল জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতো একজন উজ্জ্বল প্রভাষকের। তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে জি.র.সি.কে বন্ডমুক্ত করে নিয়ে গেলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার বন্ধু, যিনি বিশিষ্ট কবি, অনুবাদক এবং প্রাবন্ধিক, ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। সেখান থেকে চলে আসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ বছর একজন নিষ্ঠাবান প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। এর মধ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন

করেন। এখানে স্মরণযোগ্য, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতির একজন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিন মাস। বর্তমানে তিনি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নিঃসন্দেহে আমার স্বল্পসংখ্যক খাঁটি বন্ধুদের অন্যতম। এমন ভদ্র, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি নেই আমাদের সমাজে। মনে পড়ে, ১৯৪৭ সালে অনার্স ক্লাসের প্রথম দিনে অধ্যাপক যখন আমার রোল কল করলেন আমি 'ইয়েস স্যার' বলার সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেঞ্চ থেকে পেছনের দিকে ঈষৎ ঘুরে হাসি উদ্ভাসিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমাকে ওভাবে দেখার কোনও কারণ ছিল না। তখনও আমার মধ্যে কোনও কবির জন্ম হয় নি, আমি অত্যন্ত অপরিচিত এক যুবা মাত্র। অবশ্য এই ঘটনার কিছুকাল পর আমি কবিতা লিখতে শুরু করি, ১৯৪৮ সালের দিকে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও তখন মূলত একজন কবি, যদিও নানা ক্ষেত্রে তিনি আরও বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি কবিতা রচনায় প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রাখেন। কৈশোরেই তার কবিতা মুদ্রিত হয়েছে 'মোহাম্মদী' এবং 'সওগাত'-এর মতো নামজাদা সাহিত্যপত্রে। একজন কিশোরের পক্ষে এই ঘটনা কম গুরত্বপূর্ণ নয়। তখনই তিনি সনেট রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন, যা পরবর্তীকালে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার প্রথম আধুনিক কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায়। সেকালের আমরা ক'জন তরুণ আরমানিটোলা মাঠে এক পড়ন্ত বিকেলে বসে চীনা বাদাম চিবোতে চিবোতে 'নতুন কবিতা' প্রকাশে উদ্যোগী হই। যতদূর মনে পড়ে, সঙ্কলনটির নাম আমি প্রস্তাব করেছিলাম। 'নতুন কবিতা' শুরু হয়েছিল হাবীবুর রহমানের কবিতা এবং শেষ হয়েছিল তরুণতম বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কবিতা দিয়ে। প্রত্যেক কবির চার কিংবা পাঁচটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছিল। প্রত্যেক কবির কবিতাবলির আগে ছোটো ভূমিকা লিখেছিলেন মোহাম্মদ মামুন। বেশ ক'বছর আগে তিনি অবেলায় জীবনের হাট থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'নতুন কবিতা'র হাবীবুর রহমান, চৌধুরী ওসমান, হাসান হাফিজুর রহমানও অনুপস্থিত। মনোজ রায় চৌধুরী জীবিত আছেন কি নেই, জানি না।

যা হোক, 'নতুন কবিতা'য় জি.র.সি.'র যে কয়েকটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে আমার এখনও মনে পড়ে 'ভূমধ্যসাগর তীরে' এবং একটি সনেট যেটি শুরু হয়েছিল এভাবে—

> ভয় নেই শুধাব না তুমি মোরে ভালোবাসো কিনা।
> শুধাব না তব নাম শুধাব না তব পরিচয়।

এই সনেটটি কি তার প্রেমিকা কায়সার বেগমের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল, যিনি ১৯৫১ সালে আমার সহপাঠী এবং কবি-বন্ধুর জীবনসঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হয়ে আজ অব্দি সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করছেন? আমার অনুমান ষোলোআনা যথার্থ। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, গাজীউল হক, ১০ নম্বর বেচারাম দেউড়ির মাসুদুল হক এবং আমি সেই বিয়ের বরযাত্রী হয়ে ময়মনসিংয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুবরের আনন্দধারায় স্নাত সেদিনের কিছু সময় আজও দীপ্ত হয়ে রয়েছে আমাদের স্মৃতিতে। হায়, এসএম আলী

অর্থাৎ সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, আমাদের প্রিয় বন্ধু এবং বিখ্যাত সাংবাদিক আজ আর নেই। আমাদের বান্ধবমণ্ডলীর মধ্যে যাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কালীন প্রণয় পরিণয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল তারা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ আলী কবীর, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ এবং সম্ভবত মোস্তফা কামাল। এসএম আলী এবং আমিনা (মীনা) এই দু'জনের প্রণয় পরিণয় হয়ে উঠতে পারে নি হয়তো আমার প্রবাসী বন্ধুটির গড়িমসির ফলেই। অত্যন্ত মর্মাহত হয় তার প্রেমিকা। তার সঙ্গে কিছুকাল পর বিয়ে হয় বাহাউদ্দিন চৌধুরীর। বাহাউদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিক, সরকারি আমলা এবং রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তি। তিনি বর্তমানে, যতদূর মনে হয়, বিপত্নীক। বহুদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

সময় বয়ে যায় আপন মনে, কারও অপেক্ষায় থাকে না। একদা আমরা যারা যুবক ছিলাম, আজ তারা বার্ধক্যের পথে কেউ দৃঢ় পদে, কেউ বা ঈষৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। তবে এখনও হাল ছাড়িনি, যে যার কাজ যথাসাধ্য করে চলেছি। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এখনও দিব্যি স্বাস্থ্যবান, চলিষ্ণু, সৃষ্টিশীল পুরুষ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। আমার এই প্রতিভাবান বন্ধু 'হৃদয়ে জনপদে', 'চাঁদ ডুবে গেলে', 'আসন্ন বাস্তিল' নামে তিনটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়া অনেক কবিতা এখনও অগ্রন্থিত রয়ে গেছে, যেগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত 'কবিতা সংগ্রহে' ঠাঁই পেয়েছে। অনুবাদকর্মেও তিনি উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই বাঙালি পাঠক সমাজ শেক্সপিয়রের সনেটমালা, নাটক কি টেম্পেস্ট', মিল্টনের কাব্যনাট্য 'স্যামসন অ্যাগনিসটিজ' — মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। প্রত্যেকটি অনুবাদকর্মে একজন উঁচুদরের সৃজনশীল অনুবাদকের পরিচয় সুস্পষ্ট। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করলে, আশা করি, অন্যায় হবে না। তখন ভয়ানক এক কৃষ্ণপক্ষ বাংলাদেশকে জবরদখল করে রেখেছে। বলে দিতে হবে না যে আমি ১৯৭১ সালের কথা বলছি। সে-বছরের মধ্যকালে আমি 'স্যামসন' নামে একটি কবিতা লিখে খাতায় লুকিয়ে রাখি। কী আশ্চর্য, প্রায় সেই সময়েই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী মিল্টনের 'স্যামসন অ্যাগনিসটিজ' কাব্যনাটকটি অনুবাদ করেন। পরে বিষয়টি আমাদের দুই বন্ধুর আলাপের মধ্যে জানাজানি হয়। যা হোক জি.র.সি. বেশি লেখেন নি বলে প্রচারিত হলেও আসলে তা সত্য নয়। তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রচুর না হলেও কমও নয়। যেসব বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি সেগুলো তো রয়েছেই, তাছাড়া তিনি উপহার দিয়েছেন 'শব্দের সীমানা', 'আমার দেশ, আমার ভাষা', 'অনুবাদ', 'শান্তিনিকেতনে তিন মাস', 'প্রবাসে প্রতিদিন', 'বাঙালির আত্মপরিচয়', 'বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা সঙ্কট ও সম্ভাবনা', 'Visions and Revisions', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'। বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে Eanglish-Bengali dictionary। সম্প্রতি 'Quest For A Civil Society' শীর্ষক তার ইংরেজি রচনার সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার এবং জেবুন্নেসা মাহবুবউল্লাহ কল্যাণ পদক পেয়েছেন। আমার বিবেচনায় তাঁর সিদ্ধির তুলনায় পুরস্কারের সংখ্যা কম। তবে পাঠক-পাঠিকার চিত্ত জয় করতে পারাই প্রকৃত পুরস্কার।

## ॥ উনিশ ॥

নিজের জীবন সম্পর্কে লিখতে গেলে যারা জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং অনেকে এখনও আছেন তাদের কথা বার বার এসে পড়ে। কারও প্রতিকৃতি দু'তিন রেখায়, কারও কারও অনেক রেখায় আঁকতে হয়। আমার মায়ের কথা, বাবার কথা, ঘুরে ফিরে আসবেই। যখন আমি এই কথাগুলি লিখছি, তখন আমি আর বালক, কিশোর, অথবা যুবক নই, প্রৌঢ়ও নই, পা রেখেছি বার্ধক্যের সিঁড়িতে। সময়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে, কোনও ঢেউ আছড়ে দিচ্ছে, কোনও ঢেউ এক ধাক্কায় অনেক দূরে ছুঁড়ে সত্তায় এক ধরনের ক্ষত তৈরি করছে, আবার কোনও ঢেউয়ের আঘাতে বালুচরে ছিটকে গিয়ে হাঁপাচ্ছি। জীবন তো এরকমই। জীবনের বসন্তকাল বেশ কিছুদিন আগেই পলাতক, এখন শীত ক্রমান্বয়ে দখল করছে আমাকে। সেজন্য কি মন খারাপ করে বসে থাকি সবসময়? না, মেনে নিয়েছি। ইতিমধ্যে কত প্রিয়জনকে হারিয়েছি। বাবা-মা, নানা-নানি, চাচা-চাচি, ভাই-বোন, মামা-মামি, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয় শিক্ষক আরও কত পরিচিত জনকে হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মাঝে চলার পথে ক্লান্তি দখল করে নেয় আমাকে। তবুও এখনও নানা অসুবিধা সত্ত্বেও জেদি পথিকের মতো কখনও জোর কদমে, কখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছি। হেঁটে যেতে যেতে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যপঙ্‌ক্তি — 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে', আর হঠাৎ একদিন থেমে যাবে এই পথ চলা। হারিয়ে যাব মৃত্যুর প্রগাঢ় কুয়াশায়।

একদা যারা আমার অত্যন্ত কাছাকাছি ছিলেন, যাদের অপরূপ স্নেহ পেয়েছি, যাদের বন্ধুত্বের উষ্ণতায় দীপ্ত হয়েছি, তারা আজ নেই — এই বোধ আমার মধ্যে এক ধরনের বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি করে। একদা নানির স্নেহ আমার মুখ থেকে স্বেদকণা মুছিয়ে দিত, সৃষ্টি করত অনন্য স্নিগ্ধতা তাঁর হাতপাখা আমার সত্তায়, আম্মা অপার আদরে আমাকে স্কুলের জন্য তৈরি করতেন চুল আঁচড়ে দিয়ে হাফ শার্টের বোতাম ঠিকঠাক করে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দিয়ে — এসব কথা আজও মনে পড়ে আমার জীবনের এই গোধূলিবেলাতেও। কীভাবে যে প্রায় এক লহমায় সেদিনের এক শিশু আজ প্রায় বুড়ো হয়ে গেল! এই তো নিজেকে দেখছি পোগজ স্কুলের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছি চিন্তাহরণ সোম স্যারের কিছু কথা শোনার জন্যে, গোল্লাছুট খেলছি ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের খোলা মাঠে, গেটের সামনে হজমি কিনে মজা করে খাচ্ছি, ছাব্বিশ বছরের যুবক আমি বর সেজে আব্বা-আম্মাকে কদমবুসি করছি, আটষট্টি বছরের আমি আমার বাসার কোণার ঘরে মুগ্ধ, অসুস্থ চোখে দেখছি মা নরম আলোয় কোরান শরীফ তেলাওয়াত করছেন গভীর মগ্নতায়।

অতীতের নানা ছবি কখনও কখনও সুস্পষ্ট হয়ে, কখনও-বা মৃদু কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ভেসে ওঠে দৃষ্টিপথে। এই মুহূর্তে ভোরবেলা ঘরের বাইরে তাকাতেই মনে পড়ে গেল আমাদের কালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধু দা'র চা-সিঙাড়া-ডিম পোচের দোকানে আড্ডায় মেতে আছেন কোনও কোনও সিনিয়র এবং বেশ ক'জন জুনিয়র ছাত্র। সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে শামসুর রাহমান অর্থাৎ মরহুম আতাউর রহমান খানের ছোটো ভাই। আমি যেমন

আমার নামের সঙ্গে 'চৌধুরী' নামক লেজুড়টি জুড়ে দিই নি কখনও; তেমনি শামসুর রাহমানও পরিহার করেছিলেন 'খান' শব্দটি। তাকে অবশ্য কারণটি জিজ্ঞেস করা হয় নি কোনওদিন। যাই হোক, তাকে ঘিরে বসতাম আমরা ক'জন। মধ্যমণি শামসুর রাহমানকে আমরা ডক্টর জনসন বলতাম সেকালে তার ঈর্ষাযোগ্য পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা এবং ঘন্টার পর ঘন্টা অনলস আসর গুলজার করে রাখার জন্য। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে শুনতাম তার কথা, বিভিন্ন বিদেশি লেখকের রচনার উদ্ধৃতি। এতটুকু হোঁচটও তিনি খেতেন না আর বক্তার ঠোঁটে লেগে থাকত হাসির আভা। তার গায়ের রং উল্লেখযোগ্য কালো, কিন্তু বর্ণের মালিন্য আমাদের কাছে, আমরা যারা তার ভক্ত ছিলাম, এখনও আছি, মনে হত খুব আকর্ষণীয়।

তিনি প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি। একদা একটি কি দু'টি গল্প লিখেছিলেন উন্নতমানের 'ক্রান্তি' পত্রিকায়। তার একটি দাঙ্গাবিরোধী ছোটো গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমার যৌবনের উষালগ্নে। তখনও তাকে চোখে দেখি নি। অবাক হই এ কথা ভেবে, যার লেখার ক্ষমতা ছিল, তিনি কেন কলমকে অলস করে রেখেছেন। তিনি সিএসপি হয়েছেন, উঁচু পদে সরকারি কাজ করেছেন, আগরতলা 'ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। উনসত্তরের দুর্বার গণআন্দোলনের উত্তাল ঝাপটায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শেখ মুজিবসহ সকল বন্দি কারামুক্ত হন। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে সোভিয়েট ইউনিয়নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তিনি আমাকে প্রায়ই সকৌতুক বলতেন, "তুমি হলে 'সাকার' শামসুর রহমান আর আমি নিরাকার শামসুর রহমান।" ব্যক্তিগত জীবনে একদা বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী আফসারী খানম তাঁর স্ত্রী। তার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। লক্ষ করেছি, এই বয়সেও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেন বইয়ের সাহায্য ছাড়াই। বাংলা কবিতা তো বটেই, বহু সংস্কৃত কবিতাও তিনি চমৎকার আবৃত্তি করে আমাদের শুনিয়েছেন ঘরোয়া আসরে। বহুদিন তার সঙ্গে দেখা নেই। আব্দুল বারিক চৌধুরী, যাকে আমরা এবিসি বলতাম, যখন জীবিত ছিলেন, তখন শামসুর রহমানের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হত। এবিসির অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতি ছিল। কবিতার প্রতি তার অনুরাগ লক্ষ করেছি মুগ্ধ চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখের অনেক কবিতা তিনি কোনও বই হাতে না নিয়েও নির্ভুল আবৃত্তি করতে পারতেন। আশ্চর্যের বিষয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি তিনি এক বর্ষার সন্ধ্যায় তন্ময় হয়ে শুনিয়েছিলেন বইয়ের সাহায্য ছাড়াই। একবারও কোথাও হোঁচট খান নি। ঈর্ষাযোগ্য ছিল তার স্মরণশক্তি। আমার মতো এখন কবিরও কিছু কবিতা তিনি বই না দেখে আবৃত্তি করেছেন বহুবার। টিএস এলিয়টের 'Four Ouaterets' আদ্যোপান্ত মুখস্ত শুনিয়েছেন বিস্মিত আমাকে।

এই গুণী মানুষটি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সংসার পাতার আগে পাকিস্তান আমলে ঢাকাস্থ রাইটার্স গিল্ডের অফিসে কাজ করেছেন আবদুল বারিক চৌধুরী। তাকে, যতদূর মনে পড়ে, চাকরিটি শ্রদ্ধেয় মুনীর চৌধুরী দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' এবিসি'র উদ্যোগ এবং মুনীর চৌধুরীর

সম্মতির ফলে রাইটার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। সেকালে 'রৌদ্র করোটিতে' কবিতাপ্রেমীদের মন জয় করতে পেরেছিল। এই বই আদমজী পুরস্কারের জন্য জমা দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার অনেক আগে থেকে আমার বইটির বিরুদ্ধে বেশ ক'জন কবি ও লেখক একটি আক্রমণাত্মক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর পাতায়। এটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই আমার অন্যতম সুহৃদ সালেহ চৌধুরী আমাকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। তখন সালেহ চৌধুরী এবং আমার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ দূরত্ব ছিল। আমি আমতা আমতা করে নিজের নিস্পৃহতা এবং নিষ্ক্রিয়তা তার কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিচারকদের বিবেচনার ফলে আমার বইটিই পুরস্কৃত হয় শত্রুদের নিরাশ করে। 'ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন, তাদের নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম। কিন্তু পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী ফায়দা? নীরব থাকাই ভালো।

ইচ্ছে করলে এবিসি একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পারতেন। কিন্তু সাংসারিক লাভ লোকসানের অনেক ওপরে বাস করতেন এই অসাধারণ মানুষটি। তার অভাব আজও আমি বোধ করি, যেমন অনুভব করি আমার অকালমৃত বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমানের অনুপস্থিতি।

হাসান হাফিজুর রহমান একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যে-কোনও একজনকে কিছুক্ষণের মধ্যে একান্ত আপন করে ফেলার গুণ তার মধ্যে ছিল। বন্ধু হিসেবেও তার মতো মানুষ বিরল। তিনি যাকে পছন্দ করতেন তাকে নিমেষে বন্ধুত্বে বরণ করে নিতে পারতেন। তিনি কী করে এটা পারতেন এই প্রশ্ন তাকে একাধিকবার করেছি, কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কোনও জবাব না দিয়ে মৃদু, মধুর হাসতেন — যেন কোনও দক্ষ জাদুকর। হাসান হাফিজুর রহমান পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি, গল্পকার (যদিও মাত্র চার, পাঁচটি গল্প লিখেছেন) এবং প্রাবন্ধিক। তিনি 'আরও দু'টি মৃত্যু' ছোটোগল্পটি লিখে পাঠক সমাজে সাড়া জাগিয়েছিলেন। এ ধরনের ছোটোগল্প আমাদের সাহিত্যে বিরল। হাসান 'আধুনিক কবি ও কবিতা' বিষয়ে একটি অত্যন্ত মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থেরও প্রণেতা। তাছাড়া 'বিমুখ প্রান্তর', 'আর্ত শব্দাবলী', 'অন্তিম শরের মতো', 'যখন উদ্যত সঙ্গীন', 'শোকার্ত তরবারি', 'আমার ভেতরের বাঘ' এবং 'ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থাবলী সৃষ্ট হয়েছে তার সুফলপ্রসূ লেখনীতে। এছাড়াও কিছু গ্রন্থ তিনি রেখে গেছেন তার কীর্তির চিহ্ন হিসেবে।

হাসান হাফিজুর রহমান আমার জীবনের আন্তরিক, অপরিহার্য বন্ধু। এমন নয় যে তার সঙ্গে কখনও সখনও ছোটোখাটো বিরোধ বাধে নি, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি হাসানের নির্মল, খাঁটি স্বভাবের জন্য। হাসান, তোমার কথা বলতে গিয়ে 'করেছেন', 'দিয়েছেন', 'রেখেছেন' বলতে আর ভালো লাগছে না। তাই এখন থেকে হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে তুমি-জড়ানো ভাষা ব্যবহার করে ফেলব।

একটি কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। মধু দা'র ক্যান্টিনে ঢুকতে না ঢুকতেই ধ্বনিত হল হাসান হাফিজুর রহমানের কণ্ঠস্বর, 'এই যে কবি সাহেব, কী খবর?' কবির সঙ্গে সাহেব শব্দটি কেউ জুড়ে দিলে মনে হয় সে ইয়ার্কি মারছে। তখন গা রি রি করে।

আমার মাথায় চকিতে রক্ত চেপে গেল। চট করে বন্ধুবর হাসানের শেভ-মসৃণ গালে কশিয়ে চড় লাগালাম। আমার চড় যে এত জোরালো হতে পারে, আমি নিজেই বুঝি নি। হাসান গাল ধরে নিশ্চুপ বসে রইল। একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। চারদিকে বসে ছিল ওর ন্যাওটা কয়েকজন বন্ধু। হাসানের সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষমান। ইশারা পেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার ওপর। কিন্তু হাসানের সংযমের জন্যেই আমি সেদিন মধু দা'র ক্যান্টিনে নিগৃহীত হইনি। পরে অবশ্য অনুতাপ হয়েছিল আমার। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেদিনই পড়ন্ত বেলায় হাসান আমার হাত ধরে ওর প্রাণ-জুড়ানো হাসিটি উপহার দিল। দু'জনেই আবার কবিতা নিয়ে আলোচনা করলাম, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠল। বেড়ালামও প্রফুল্ল চিত্তে।

হাসান আমাকে বুঝতে পারত, আমার কিছু গুণ আছে — এ-কথা সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত বলেই কেউ আমার নিন্দা করলে কিংবা খুঁত ধরলে তৎপর হলে সে আমাকে রক্ষা করত সেই অসূয়াপ্রবণ ব্যক্তিদের অপ্রিয়, ঈর্ষাপূর্ণ বাক্যবাণ থেকে। আমি আমার ধ্যানধারণা সহজে কারও কাছে প্রকাশ করতাম না। আমি প্রগতিশীল, এ-কথা প্রচার করাটাও আমার রুচি-বিরুদ্ধ ছিল। আপন মনে কাজ করে যাওয়াতে বিশ্বাসী ছিলাম; দেশবাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি হোক, এটাই কামনা করতাম সবসময়। আমাদের সমাজের পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামি এবং শ্রেণিবৈষম্য যে আমাকে পীড়িত করত, এটা হাসান ভালো করে জানত বলেই সে বিশ্বাস করত যে কমিউনিস্ট পার্টির খাতায় নাম না লেখালেও, জোর গলায় কিছু ঘোষণা না করলেও আমি প্রগতির সপক্ষে, মানবকল্যাণে নিয়োজিত নিষ্ঠাবান এক কর্মী। প্রিয় বন্ধুর এই বিশ্বাসকে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধুলোয় লুটাতে দিই নি, এটুকু বলতে পারি।

এমন একটা সময় ছিল যখন একটি কবিতা লেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসানকে শোনাতে না পারলে স্বস্তি বোধ করতাম না, সেও তার কবিতা কিংবা গল্প লেখা মাত্রই আমাকে সাগ্রহে শোনাত। আমরা আমাদের মতামত জানাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতাম না। লেখা ভালো হলে তারিফে ফুলঝুরি, খারাপ হলে সাফ সাফ নামঞ্জুরের ঘোষণা। একবার আমি আমার সদ্য লেখা একটি কবিতা পড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসান পাণ্ডুলিপিটি নিয়েই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নি। একবার আমিও হাসানের একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলি। সেও হাসিমুখে মেনে নিয়েছিল আমার এই সমালোচনা। সেকালে আমরা এরকমই ছিলাম। আমরা কোনও নকল সৌজন্য অথবা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিই নি। আমাদের এই ধরনের সমালোচনা নিঃসন্দেহে উপকারী ছিল। আরও ভালো লেখার চেষ্টা প্রকৃত আত্মসমালোচনারই প্রসূন। এই যে আমরা দুই বন্ধু নিজেদের রচনায় ভালোমন্দ দিকগুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে আলোচনা করতাম সেজন্যই অল্পসময়ের ব্যবধানে আমাদের রচনা ক্রমশ কবিতা হয়ে উঠছিল। একই সময়ে হাসান হাফিজুর রহমান এবং আমার কবিতা পশ্চিমবঙ্গের উন্নত মানসম্পন্ন সাহিত্যপত্র 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত হল। 'পূর্বাশা'র সম্পাদক ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো বরেণ্য কবি, প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক। 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত হাসানের

'কোনও একজনের মৃত্যুর মুহূর্তে কবিতাটির কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না —

আমরা এসে দাঁড়ালাম
অরণ্যের স্তব্ধ ঘাসের স্তবকের মতো নৈঃশব্দ আমাদের বুকে
অনেক সঞ্চয়ে ভোরের শিশিরের মতো আমরা এখন ফলিত,
আমরা সঞ্চারিত হয়েছি নিটোল এক অনুভূতিতে
প্রিয়ার ঠোঁটের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম যেমন জমে ওঠে উদ্বিগ্নতায়।
প্রত্যুষের শেষ তারার মতো তার চোখ দুটো এখন কাঁপছে।
শুধু এই এক মুহূর্ত
শুধু এই মুহূর্তে আমরা জেগেছি,
আমাদের বুকের গুহায় ফিরেছি সন্ধ্যার পাখির মতো,
অনেক রাত্রি এবং রৌদ্রকে মেখে নিয়েছি আমাদের বুকে,
আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের আমূল জীবনকে একবা: ফিরে পেলাম,
একটি মৃত্যুমুখি জীবনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত কবিতাটির আবেদন আজও আমাকে আন্দোলিত করে, কবিকে প্রাণ খুলে তারিফ করতে ইচ্ছে হয়। পরে সে আরও কয়েকটি অসাধারণ কবিতা লিখেছে, সমৃদ্ধ করেছে আমাদের কাব্যসাহিত্যকে। আমাদের ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক তিনটি উৎকৃষ্ট কবিতার রচয়িতা হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। ওবায়দুল্লাহর কবিতাটি পড়লে নিজের অজান্তেই চোখে জন্ম নেয় অশ্রুকণা।

জীবনবাদী দেশপ্রেমিক হাসান মাত্র ৫১ বছর বয়সে কঠিন রোগে ভুগে বিদেশে মৃত্যুর মুহূর্তে প্রত্যুষের শেষ তারার মতো নিজের চোখ দুটোর কম্পন অনুভব করতে করতে মিশে গেছে অনন্তে। অল্প সময়েও সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছে। লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে তার কৃতিত্ব, তর্কাতীত। কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর আমার অনুরোধে সে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেয়। আমার সমান বেতন ওকে দিতে হবে, এই দাবি আমি পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং উর্দু কবি, যদিও তিনি বাঙালি, আহসান আহমদের কাছে পেশ করি। প্রথমে তিনি রাজি হন নি, কিন্তু পরে আমার পীড়াপীড়ির ফলে দাবি মেনে নেন। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হলে কী হবে, আসলে কবিচিত্তের অধিকারী বলেই হাসানকে নিয়োগপত্র দেন।

১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক পাকিস্তান' বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'দৈনিক বাংলা' নামে রূপান্তরিত হয়। হাসান 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হয় ১৯৭২ সালে। এরপর একটি ভুল পদক্ষেপের দরুন সে পত্রিকাটির চাকরি হারিয়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে মস্কোতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করে। এখানে উল্লেখ করা দরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হাসান 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ কাজ করে নি। সে বাংলাদেশেই আত্মগোপন করে কাটিয়ে দিয়েছে নয়

মাস। আমি সখেদে বলছি, সেই সময়ে সাত মাস কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। সেই গ্লানি আজও আমাকে পীড়িত করে। হাসানের আরেকটি অসামান্য কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের প্রধান হিসেবে শেষ দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। তার সম্পাদনায় ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'। এই কাজটি করার সময় সে প্রচুর পরিশ্রম করেছে সহকর্মীদের সঙ্গে। এই সময়ে ওর সঙ্গে আমার কম দেখা হয়েছে আমাদের উভয়ের ব্যস্ততার কারণে। জীবন এরকমই। কিন্তু ভালো করেই জানি, আমাদের সম্পর্কে কোনও চিড় ধরে নি। সে আমাকে শুধু ভালোই বাসত না, ভুলও বুঝত না কখনও। ওর কাছে আমি ঋণী।

## ॥ কুড়ি ॥

এখন মাঝে মধ্যে মনে হয়, যদি এই উপমহাদেশে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হত, হিন্দু-মুসলমান সবাই নিজেদের আন্তরিকতার, ভালোবাসার দীপ্তিতে ভাস্বর রাখতে পারত সবসময়, কস্মিনকালেও হিংস্রতাকে প্রশ্রয় না দিত, শুভবাদী ও অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের দিক-নির্দেশ মেনে চলত তাহলে কী ভালোই না হত। এই উপমহাদেশে রক্তবন্যা বইত না, দেশ তিন খণ্ডে খণ্ডিত হত না। অসংখ্য সংসার ছারখার হত না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, আখেরে যা হওয়ার তাই হল। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখটি গুরুত্বপূর্ণ সেদিন তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় মিলিত হন। সেই আলোচনায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কী মতামত প্রকাশিত হয়েছিল তা আজ অব্দি কেউ জানে না। ১৯৪৭ সালে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ অখণ্ড বাংলা গঠনের যে উদ্যোগে নেন তাও ভেস্তে গেল। প্রাদেশিক মুসলিম লিগ এই শুভ উদ্যোগটি গ্রহণ করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, আবুল হাশিম এবং শরৎচন্দ্র বসুর প্রশংসনীয় প্রয়াস নিষ্ফল হল গান্ধিজির স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবটির প্রতি নিস্পৃহতার দরুন। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর কোনও কোনও দাবি যদি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মেনে নিতেন, তাহলে পাকিস্তানের সৃষ্টি যে হত না, এ কথা অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার মনে করেন। তাহলে কাউকে শুনতে হত না 'লাড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান। এই উপমহাদেশকে নানা ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে।

আমি মনে করি, এই উপমহাদেশের কিছুসংখ্যক গোঁড়া, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদের একগুঁয়েমির দরুন, ষড়যন্ত্রের ফলে এক নিদারুণ ট্র্যাজেডির শিকার হতে হয়েছে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে, যার জের যুগ যুগ ধরে চলবে, যদি না বিরাট কোনও পরিবর্তনের সূচনা হয়। কী সেই পরিবর্তন তা অনুমান করাও আমার সাধ্যাতীত। কোনও অসামান্য ধীমান, দূরদর্শী ব্যক্তি হয়তো তেমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আবু তাহের, আশরাফ এবং সুজার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু সূর্যকিশোর, বিমল, অনিল, অরুণ, সুনীল, বিজয় এবং

নীহারের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয় নি। কোথায় যে চলে গেল ওরা। ওদের মধ্যে কে কে বেঁচে রয়েছে আজও, কোথায় বসবাস করছে তাও তো জানব না কোনওদিন। কোনও কোনও মুহূর্তে বুক টনটন করে, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে নিজেরই অজ্ঞাতে। নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার এই অত্যন্ত প্রিয় ঢাকা শহরেই দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার পাটুয়াটুলিতে ওদের সোনার অলংকারের দোকানে। অনেক পরে ওদের দোকানে গিয়ে শুনি, নিরঞ্জন অলংকারময় দোকান ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, ঢাকা শহর ছেড়ে মহাশূন্যতায় মিলিয়ে গেছে। আমি সাধারণত কারও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কৌতূহল প্রকাশ করি না। তাই, নিরঞ্জনের ছেলেমেয়ে ক'জন, সে বিবাহিত কি-না, এসব সওয়াল ওকে করি নি। তবে আমার বিয়ের পর দেড় দু'বছর বেকার জীবনের সময় ওর দোকানে ঘন ঘন গিয়েছি উপহার পাওয়া কয়েকটি আংটি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। স্কুল জীবনের ক্লাসমেট নিশ্চয়ই আমাকে কম টাকা দেবে না, এই প্রত্যাশায়। আমি যে বাধ্য হয়ে আংটিগুলো বিক্রি করছি, এটা সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল। আমি কেন বিক্রি করছি তা সে জানতে চায় নি। আমার প্রথম সন্তান সুমির দুধের খরচ জোগানোর জন্যে এই কর্মটি করছি, এ কথা আমি তাকে বলি নি।

সুনীলকে আবিষ্কার করেছিলাম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোনার বাংলা'র দপ্তরে। সেখানে সে কাজ করত। এই সুনীল কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সব্যসাচী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নয়, সে আমার স্কুলের সহপাঠী অসামান্য সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী। এখন সে কোথায় আছে, কেমন আছে, বেঁচে আছে কি-না, তা সুদ্ধ জানি না। কেউ আমাকে জানাবে না। তবে আশরাফের কথা জানি, যে প্রথম জীবনে একজন 'খাকসার' ছিল, পরে দীক্ষিত হয়েছিল কমিউনিজমে। শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদেই সমর্পিত থাকে, অন্য কোনও দিকে ঘেঁষে নি। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি। তবে কখনও সখনও টেলিফোনে সে আমার খোঁজখবর নিত। সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, একদিন সে খবর আমাকে টেলিফোনে জানায় ওর ছেলে। একে একে স্কুলজীবনের সঙ্গীরা বিদায় নিচ্ছে।

আবু তাহের জার্মানিতে বসবাস করছে। ওর স্ত্রী একজন জার্মান মহিলা। তাহের কোনও কোনও বছর ঢাকায় আসে ওর বড়ো ভাইয়ের কাছে। তখন দেখা হয় আমার সঙ্গে।

চমৎকার হাসি-খুশি মানুষ আমাদের আনু ভাই। জানি না, এখনও তিনি তার সেই আকর্ষণীয় হাসি বজায় রাখতে পেরেছেন কি-না এই বিরূপ পরিবেশে। আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, তিনি পেরেছেন। দুঃখের বিষয়, তার জামাতা অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম আনু ভাইয়ের স্মৃতি বেশ কিছুটা ভ্রষ্ট হয়েছে। তিনি পরিচিত ব্যক্তিদের অনেককেই চিনতে পারেন না। কারও কারও পরিচয় ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হয় আস্তে আস্তে হাজির হয়। শুনে খারাপ লাগল। ভাবলাম, কিছুদিন পর শরীর একটু সুস্থ হলে তাকে দেখতে যাব, তিনি আমাকে চিনতে পারুন আর না-ই পারুন।

অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। তাকে একজন গুণী, সজ্জন বলে জানি। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের একজন সফল অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন কিছুকাল। বর্তমানে তিনি নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। হারুন-উর-রশিদ শুধু ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি, বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন অক্লান্ত অনুবাদক বলেই তার অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। তার অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, হায়াকাওয়ার ভাষা — চিন্তায় ও কর্মে; সমকালীন বাংলা কবিতার তিনজন কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ এবং শহীদ কাদরীর কবিতার অনুবাদ (এই গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক এবং সম্পাদক তিনি); তিনটি ফরাসি প্রবন্ধের অনুবাদ; জাঁ পল সাত্রের Flies -এর অনুবাদ; আবুল হাসান বয়াতির সুখ দুঃখ (মালয়েশিয়ার একটি উপন্যাসের অনুবাদ)। এ ছাড়াও তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে — Choice of Contemporary Verse From Bangladesh। তিনি 'শব্দের শিল্পের শব্দরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' এবং 'হাওয়াই থেকে লিখছি' গ্রন্থের প্রণেতা। কৃতী অধ্যাপক এবং অনুবাদক হারুন-উব-রশিদ বর্তমানে 'মিলেনিয়াম ইংলিশ বেঙ্গালি ডিকশনারি অফ কারেন্ট ইউসেজ' নামে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান অভিধান তৈরির কাছে নিয়োজিত আছেন। আমরা তার এই বিপুলায়তন অভিধানের প্রতীক্ষায় আছি।

আমার প্রিয় পোগজ স্কুলের ছাত্রবন্ধুদের মুখ স্মৃতিপটে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু মনে পড়ে গেল। ছোটো ছোটো সামান্য ঘটনা, কিন্তু আমার কাছে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। পোগজ স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে সূর্যকিশোর কিংবা আবু তাহেরের সঙ্গে পেয়ারা অথবা হজমি খাওয়া, টিফিন আওয়ারে গোল্লাছুট খেলা, ক্লাস বসার আগে খানিক গল্প করা — এসব কি ভোলা যায় কখনও? আজও এই বাহাত্তর বছর বয়সেও মনে পড়ছে কারও কণ্ঠস্বর, কারও মধুর হাসি, কারও অভিমান, কারও-বা হঠাৎ উষ্মা। মনে পড়ে সূর্যকিশোর কিংবা তাহেরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে স্কুল ছুটির পরে বাড়ি ফেরা। সূর্যকিশোর থাকত আরমানিটোলায়, তাহের বংশালে, আমি এই দুই বন্ধুর মাঝখানে অর্থাৎ মাহুৎটুলিতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ আমাদের অনেককেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে চিরতরে। কখনও আর দেখা হবে না আমাদের। ভারতবর্ষের মানচিত্র হিন্দু-মুসলমানের রক্তধারায় কলঙ্কিত, ভীষণ বেদনার্ত, অগণিত হাহাকারে দীর্ণ। আখেরে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের দুটো ভিন্ন তারিখে দু'টি পৃথক দেশের জন্ম — ভারত এবং পাকিস্তান। দু'দিকে দু'টি ভিন্ন আওয়াজ। জনসমুদ্রের গর্জন — জয় হিন্দ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। এক বছর যেতে না যেতেই পাকিস্তানের এক অংশ পূর্ব বাংলার সুখস্বপ্নে চিড় ধরল। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এলেন পাকিস্তানের হর্তাকর্তা হিসেবে। রমনার খোলা মাঠে উৎসুক জনারণ্য — গভর্নর জেনারেলের বক্তৃতা শোনার জন্যে। আমি রমনার মাঠে ভিড়ে মিশে যাই নি। বহুদূরে আরমানিটোলার একটি সস্তা রেস্তোরাঁয় একটি চেয়ারে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক

দিতে দিতে বক্তৃতা শুনলাম। ইংরেজি ভাষার বক্তৃতায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

জনতার মধ্য থেকে কে একজন জোরালো কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'নো, নো।' সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল সারা বাঙালি জাতির কণ্ঠ গর্জে উঠেছে। প্রতাপশালী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'খামোশ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন মাইক্রোফোনে। কিন্তু তার ধমক বাঙালি জাতিকে 'খামোশ' রাখতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে এক অর্থে আমাদের ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ১৯৪৭ সালেই। বুদ্ধিজীবী মহলের উদ্যোগেই এর সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু আমাদের প্রাজ্ঞ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর পাণ্ডিত্য এবং যুক্তির প্রাখর্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। এক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। কয়েকজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং লেখক তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা ইংরেজি এবং উর্দু প্রচলনের উদ্যোগ নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসদলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে গণপরিষদে ইংরেজি এবং উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল এই দাবি। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা যে বাংলা, তা সবার কাছেই সুস্পষ্ট সত্য। সত্যকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক, অন্যায়। কিন্তু মুসলিম লিগের সদস্যদের অন্যায় গোঁয়ার্তুমির দরুন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দাবি অগ্রাহ্য হয়। যা হোক, বাংলা ভাষার সংগ্রামকে সহজে ব্যর্থ হতে দেন নি পূর্ব বাংলার সচেতন ছাত্রসমাজ, লেখকবৃন্দ এবং প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ।

সংগঠিত হল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদে তমদ্দুন মজলিশ, গণ আজাদী লিগ, গণতান্ত্রিক যুব লিগ। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলিগ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধিকে যুক্ত করা হয়। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, রমনার জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত জেদি ঘোষণার পর তমদ্দুন মজলিশের সক্রিয়তায় ভাটা পড়ে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তেজী, সংগ্রামী ছাত্রসমাজ হাল ছেড়ে দেয় নি। পুলিশের লাঠিচার্জ এবং হিন্দুদের প্ররোচনা সংক্রান্ত সরকারের মিথ্যা অপবাদ সত্ত্বেও ছাত্রদের আন্দোলন থেমে যায় নি। ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে, এই আন্দোলন চূড়া স্পর্শ করে ১৯৫২ সালে। গাজীউল হক, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহবায়ক আব্দুল হকের উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের সভায়, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। ছাত্রদের মিছিলে পুলিশে গুলি চালালে জব্বার, রফিক এবং বরকত শহিদ হন। শহিদদের রক্তে রঞ্জিত ২১ ফেব্রুয়ারি শেষ পর্যন্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

আগে আমি একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত তিনটি কবিতাকে শ্রেষ্ঠ বলেছিলাম, আমার এই মন্তব্যে অনবধানতাবশত একটি ভুল রয়ে গেছে। চট্টগ্রামের

মাহ্‌বুব আলম চৌধুরীর সাড়া জাগানো 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটির উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি?' গানটির কথা। যৌবনের উষালগ্নে যাদের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী অন্যতম। সেকালে গাফ্‌ফার যখন কলেজের ছাত্র, তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রদের একটি হোস্টেল আরমানিটোলাস্থ 'বান্ধব কুটির'-এ ছিল। সেখানে হাসান হাফিজুর রহমান, এবং আমি প্রায়শই যেতাম গাফ্‌ফারের কামরায় আড্ডার লোভে। আবদুল। সেই ছাত্রাবাসে, যতদূর মনে পড়ে, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানও 'বান্ধব কুটির'-এ থাকতেন। আমাদের আড্ডা মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক ছিল বটে, তবে কথাবার্তা সর্বক্ষণ সেখানেই আবদ্ধ থাকত না, কখনও-কখনও আদি রসের ভিয়েনে যুবাদের আড্ডা দিব্যি রসালো হয়ে উঠত এবং আমরা মেতে উঠতাম হাসির হুল্লোড়ে। জানতাম না হোস্টেলের অন্যান্য ছাত্র-বাসিন্দাদের মেজাজ গরম হত কিনা। কখনও তাদের গঞ্জনা আমাদের জখম করে নি, লাঠিসোটার আঘাতও আমাদের রক্ত ঝরায় নি।

যা হোক, ছাত্রাবস্থাতেই আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী কয়েকটি গল্প লিখে রীতিমতো নামজাদা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কালের আবর্তনে তিনি আমাদের দেশের একজন অসাধারণ সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংবাদপত্রে তার যেসব কলাম প্রকাশিত হয়, সেগুলি এমনই যুক্তি-ঋদ্ধ এবং তথ্যসমৃদ্ধ যে, তার সাংবাদিক লেখা পাঠে বে-খেয়াল ব্যক্তিও চাতকের মতো প্রতীক্ষা করি।

কিন্তু মাঝে-মধ্যে আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে, প্রতিভাবান সাংবাদিক কি অসাধারণ সাহিত্যিককে হত্যা করে ফেলল? জানি না, ভবিষ্যতে কী হবে। অনেক অনেক পরে, হাজার বছর পরে যদি বাংলাদেশ থাকে, তাহলেও আমাদের বন্ধু আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। আমাদের অন্তরবাসী গাফ্‌ফার, তিনি যে দেশেই থাকুন না কেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাদের কালের বিরল এক প্রতিভাবান সব্যসাচী সাহিত্যস্রষ্টা। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ সবক্ষেত্রেই প্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর রেখেছেন। মনে পড়ে, আমার যৌবনের প্রত্যুষে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'সওগাত'-এ 'শ্রাবণসন্ধ্যায়' নামক একটি মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তখন আলাউদ্দিন আল আজাদের বয়স খুবই কম। অত অল্প বয়সে অমন চিত্তাকর্ষক গদ্য রচনা আদৌ সহজ কাজ নয়। পরবর্তীকালে তাঁর ছোটোগল্প, কবিতা এবং অন্যান্য অনেক লেখা পড়ার সুযোগ হয়েছে। সন্দেহ নেই, আমরা যারা পঞ্চাশ দশকের লেখক চিহ্নিত তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ শুরু থেকেই একজন নামজাদা লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তার প্রথম বইয়ের নাম 'জেগে আছি'। এই বই কয়েকটি ছোটোগল্পের সংগ্রহ। 'জেগে আছি'র প্রকাশক আমাদের প্রিয় বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত এই বই সম্পর্কে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন, 'জেগে আছি' মুসলিম বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ এবং

সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা বই। একজন লেখক, যার বয়স মাত্র আঠারো বছর, তার সম্পর্কে এ ধরনের প্রশংসা বাক্য নিঃসন্দেহে বিরল এবং উৎসাহব্যঞ্জক।

১৯৫৩ সাল থেকে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় নিয়মিত আমার কবিতা প্রকাশিত হতে থাকি। কিছুকাল পর ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকায় আলাউদ্দিন আল আজাদের 'জল রং' শীর্ষক একটি কবিতা আমি পড়ি। কবিতাটি আমার বেশ ভালো লাগে। এরপর অবশ্য তাঁর কোনও কবিতা সেই পত্রিকায় দেখি নি।

আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখনী কখনও আলস্য পোহায় নি; জনপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠা, নানামুখী সাফল্য তাকে আত্মতুষ্টির মোহে আটক রাখতে পারে নি। তিনি লিখে গেছেন অনবরত, এখনও লিখে চলেছেন, প্রশংসিত হচ্ছেন বিজ্ঞ সমালোচক এবং উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা মহলে। ঈর্ষাযোগ্য তার সাহিত্য রচনার ক্ষমতা। গোড়ার দিকে তার জীবনযাত্রার পথ পুষ্পময় ছিল না, অভাবের কাঁটার খোঁচা তাকে খেতে হয়েছে বারবার। কিন্তু প্রতিভার উজ্জ্বলতা যার সত্তাকে লালন করে কোনও বাধা, কোনও অভাব কিংবা বহুরূপী প্রতিকূলতা তার অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারে না। তাই আজাদ রূপকথার নায়কের মতো অভাবের রাক্ষসটিকে সাধনার ক্ষুরধার অস্ত্রের আঘাতে বধ করে গোছানো, নিরাপদ, ঝলমলে সংসাররূপী রাজকন্যার সঙ্গে সুখী জীবনযাপন করছেন। কিন্তু আমরা জানি, কোনও প্রকৃত শিল্পীর বাইরের জীবন যত জ্বলজ্বলে এবং প্রশান্তই হোক, তার অন্তর্লোকে নানা টানাপোড়েন, অস্থিরতা অবিরত চলতেই থাকে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাউদ্দিন আল আজাদ কস্মিনকালেও স্থবিরতাকে মেনে নেবেন না; কারণ তিনি আমাদের একজন প্রধান লেখকই নন, একজন অত্যন্ত সচেতন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও। আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তিনি তোলেন না বলেই জানি। তিনি ছাত্র হিসেবেও ছিলেন তুখোড়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিএ অনার্স এবং এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। পিএইচডিও করায়ত্ত হয়েছে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দেশের শিক্ষা বিভাগের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ। তবে ভবিষ্যৎ তাঁকে কুর্নিশ করবে এ দেশের একজন প্রতিভাবান লেখক হিসেবেই। কারণ, তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা। আলাউদ্দিন আল আজাদের গ্রন্থপঞ্জি সুদীর্ঘ — ছোটোগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ, গবেষণা, জীবনী, শিশুসাহিত্য — সম্পাদনাগ্রন্থ সবখানেই রয়েছে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

তাছাড়া আলাউদ্দিন আল আজাদের কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বিদেশি ভাষায়। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, আবুল কলাম শামসুদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বর্ণপদক পেয়েছেন এবং আরও কিছু পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর বহুমাত্রিক সাহিত্যকর্মের জন্যে। কথক একাডেমি তাকে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

অনেক আগের একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। ঘটনাটি আমার অজানা ছিল। সেদিন টেলিফোনে কথা প্রসঙ্গে আজাদ আমাকে জানান।

১৯৫১ সালে 'নতুন কবিতা' নামে একটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হয় আমাদের এবং ওয়ার্সি বুক সেন্টারের মিলিত উদ্যোগে। এই সঙ্কলনটির সম্পাদক আশরাফ সিদ্দিকী এবং আব্দুর রশীদ খান। ওয়ার্সি বুক সেন্টার কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিল। আমরা সঙ্কলিত কবিগণও কিছু চাঁদা দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান এই সঙ্কলনে কবিতা দিতে রাজি হন নি। আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমাকে তিনি কবিতা দিলেন। সম্ভবত 'নতুন কবিতা' নামকরণটিও আমার ছিল।

'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর আগে ওয়ার্সি বুক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী এ ধরনের একটি কাব্যসঙ্কলনের প্রস্তাব পান আলাউদ্দিন আল আজাদের কাছ থেকে ওয়ার্সি বুক সেন্টার আজাদকেই সম্পাদক হতে অনুরোধ জানিয়েছিল। আজাদ সম্মত হন। কিন্তু শান্তি সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশে আলাউদ্দিন আল আজাদকে তাড়াহুড়ো করে কলকাতা যেতে হয়। শান্তি সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই প্রগতিশীল লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে কিছুদিন কাটাতে হয়। ফলে সময়মতো দেশে ফিরতে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে আশরাফ সিদ্দিকী এবং আব্দুর রশীদ খানের সম্পাদনায় 'নতুন কবিতা' প্রকাশের কাজ শুরু হয়ে যায়। ইচ্ছে করলে আজাদ বাধা দিতে পারতেন যৌক্তিক কারণেই। কিন্তু তিনি সে-পথে যান নি, বরং কলকাতায় রচিত 'মিউজিয়ামের সিঁড়ি', 'প্রোফাইল' ও 'প্রার্থনার শেষ' কবিতা তিনটি প্রকাশের অনুমতি দেন সানন্দে। এই মনোভঙ্গি নিঃসন্দেহে আলাউদ্দিন আল আজাদের ঔদার্যের একটি উদাহরণ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্যে তাকে পাকিস্তান আমলে দু'বার কারারুদ্ধ হতে হয়। অত্যন্ত মূল্যবান তার জীবন, একান্ত প্রয়োজনীয় তার উন্নত মানের সাহিত্য সাধনা।

## ॥ একুশ ॥

কোনও কোনও জাতির জন্যে একটি বিশেষ বছর, মাস অথবা তারিখ জাতীয় ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। এই মাসের একুশ তারিখটি প্রত্যেকটি বাঙালির হৃদয়ে রক্তের অক্ষরে মুদ্রিত। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সকল আন্দোলন, সকল সাফল্যের প্রেরণার উৎস। রফিক, সালাম, বরকত, শফিউর, জব্বার, অহিউল্লাহ শহিদ হন আন্দোলন চঞ্চল, জাগর একুশে ফেব্রুয়ারির বিভিন্ন সময়ে। তারা আত্মবিসর্জন দিয়ে আমাদের প্রেরণা দিয়ে চলেছেন সকল জাতীয় সঙ্কটে। আমরা দেদীপ্যমান হয়ে উঠি বারবার। বাঙালি জাতি সর্বকালে নতুন আকাঙ্ক্ষায়, নতুন অভীপ্সায় পা বাড়াবে ভবিষ্যতের দিকে মহামুক্তির প্রেরণায়।

১৯৫২ সালের পুরো ফেব্রুয়ারি মাস আমি শয্যাশায়ী ছিলাম প্যারা টাইফয়েডের আক্রমণে। এমন দুর্বলতা আমাকে দখল করে ফেলেছিল যে, সহজে বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারতাম না। জ্বর লেগেই থাকত গায়ে। খাদ্য গ্রহণের রুচি ছিল না। ভাষা আন্দোলনের খবর শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। আব্বা ইউনিভার্সেল প্রেসের অফিস থেকে দোতলায় এসে আমাকে কোনও কোনও ঘটনার বিবরণ শোনাতেন। বিভিন্ন

লোকের কাছ থেকে আহরিত খবরই তিনি শোনাতেন তার উৎসুক, সংবাদপিপাসু সন্তানকে। আমি অসুস্থ, নড়বড়ে হাতে সেসব বিবরণ টুকে রাখতাম আমার একটি ডায়েরিতে। সেই ডায়েরিতে নানা ঘটনার বিবরণ থাকত, থাকত আমার অনেক চিন্তার খুঁটিনাটি আক্ষরিক মানচিত্র। কয়েক মাস পর ডায়েরিটি আমি বন্যার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলি।

সেই ঐতিহাসিক ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে না পারার খেদ, হতাশা আমাকে যন্ত্রণাকাতর করেছে বহুকাল। অসুস্থতা আমাকে একুশে ফেব্রুয়ারির মিটিং ও মিছিলের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছে সত্য, কিন্তু কেড়ে নিতে পারে নি বাংলাভাষার প্রতি আমার প্রবল ভালোবাসাকে, কবিতার প্রতি অকুণ্ঠ নিবেদনকে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস আমার কবিতা রচনায় একটি নতুন বাঁকের জন্ম দেয়। তখন আমি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে উঠতে পারি। আমার কবিতার এই অচানক রূপান্তর রংপুরের কায়সুল হককে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। কে এই শামস্‌র রাহমান? এমন একটি প্রশ্ন উদিত হয় তার মনে। ইতিমধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক 'পূর্বাশা' পত্রিকায় আমার একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কায়সুল হকের মনে এমন ধারণা জন্মে যে, কলকাতার 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত কবিতাবলির রচয়িতা এবং ঢাকার পত্রিকায় যার কবিতা এতদিন মুদ্রিত হয়েছে তারা দুই ভিন্ন ব্যক্তি। 'পূর্বাশা'য় যার কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে তিনি নিশ্চয়ই কলকাতাবাসী। নিজেকে ধন্দ থেকে মুক্ত করার জন্য কবি-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখলেন। 'পূর্বাশা'-র সম্পাদকের ত্বরিত জবাব জানিয়ে দিল যে, শামসুর রাহমান ঢাকার বাসিন্দা এবং সে কবিমনের অধিকারী। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার ঠিকানায় চিঠি লিখতে কায়সুল হক বিলম্ব করলেন না। শুরু হয়ে গেল আমাদের দু'জনের পত্রালাপ — যা কিছুকালের মধ্যে রূপান্তরিত হল বন্ধুত্বে। কায়সুল হকের মতো সত্যিকারের ভালো মানুষ এবং অকপট, নিবেদিতচিত্ত, বিশ্বস্ত বন্ধু দুর্লভ। আশ্চর্য তার সাহিত্যপ্রেম। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি তার গভীর অনুরাগ আমি বরাবরই লক্ষ করেছি। সাহিত্যবিষয়ক তার আলোচনা, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমাকে অনেক সময় উদ্দীপনা জুগিয়েছে। কায়সুল হক ১৯৫২ সালের শেষের দিকে ঢাকায় আসেন। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই প্যারা টাইফয়েডের নিপীড়নে আমার স্বাস্থ্যের যে অবনতি ঘটেছিল তার পুনরুদ্ধারে আব্বা-আম্মার মিলিত স্নেহার্দ্র প্রচেষ্টাই মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল, সন্দেহ নেই। আম্মা প্রতিদিন নামাজ পড়ে, কোরান শরীফ তেলাওয়াৎ করে আমার মাথায়, বুকে নিয়মিত ফুঁ দিতেন তিন চার মাস ধরে। ভালো পথ্যও পরিবেশিত হত নিত্যদিন। সেসব দিনের কথা কখনও ভোলা সম্ভব নয়। বারবার মনে পড়ে বেলা অবেলায়। ক'মাসের মধ্যে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হল। নতুন উদ্যমে পথে বের হওয়া শুরু হল, যাওয়া-আসা চলল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আবার জমে উঠল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা।

কায়সুল হক ঢাকায় এসে হাজির হলেন আমাদের ৩০ নম্বর আশেক লেনের বাসায়। তার সঙ্গী একজন তরুণ। আমি আগে কখনও কায়সুল হককে দেখি নি, কিন্তু সমাগত দুই তরুণের মধ্যে ঠিকই শনাক্ত করতে পারলাম রংপুরের শুভার্থীকে। আমি তার দিকে

দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনিই কি কায়সুল হক?' যার উদ্দেশে আমার এই প্রশ্ন তিনি বিনীত ভঙ্গিতে আমার অনুমানকে সমর্থন জানালেন। দুটো দিন আমাদের বাসায় তিনি কাটালেন আমার নাছোড় অনুরোধে। বাংলা কবিতার হালচাল, পত্র-পত্রিকার মান ইত্যাদি নিয়ে জম্পেশ আড্ডা দিয়ে সময় যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। আড্ডার এক ফাঁকে কায়সুল হক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা পাঠান না কেন? পাঠানো উচিত আপনার।' আমি নিজের ভয়ের কথা বললাম, বুদ্ধদেব আমার কবিতা তার পত্রিকায় ঠাঁই দেবেন না হয়তো। কী লাভ পাঠিয়ে? কায়সুল হক আমার ভীতিকে আমল দিলেন না। আমি নীরবতা অবলম্বন করলাম।

কায়সুল হক তার বন্ধুসহ রংপুরে চলে গেলেন একটি সুন্দর আড্ডার স্মৃতি রেখে। আমার কবিতা রচনার বিরাম নেই। কবিতা লেখা হলেই 'সংবাদ' অফিসে যাই, কবিতা জমা দিই সাহিত্য সম্পাদক আবদুল গণি হাজারীর হাতে। ইতিমধ্যে আমার বেশ কয়েকটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে 'সংবাদ'-এর পাতায়। একটি কবিতার কিছু অংশ মরহুম কথাসাহিত্যিক আনিস চৌধুরী তার একটি বেতার-কথিকায় ব্যবহারও করেছিলেন, মনে পড়ে। একদিন ভোরবেলা লেখা হয়ে গেল 'রূপালি স্নান' শীর্ষক একটি কবিতা। উৎফুল্ল মনে বেলা এগারোটার দিকে সদ্য লেখা কবিতাটি নিয়ে 'সংবাদ' অফিস হাজির হলাম। যথারীতি দাখিল করলাম সাহিত্য সম্পাদকের টেবিলে। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে ফিরে এলাম আশেক লেনে, নিজের ঘরে। বিছানায় গা' এলিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

পরদিন ডাক এল 'সংবাদ' অফিস থেকে। যেতে হল সম্পাদক খায়রুল কবিরের কামরায়। তার সামনেই বসে ছিলেন কবি-সাংবাদিক আবদুল গনি হাজারী। কয়েকটি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত কবিতার রচয়িতা তিনি। জনাব খায়রুল কবির আমার দিকে 'রূপালি স্নান' কবিতার পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দিলেন। লক্ষ করলাম কবিতার কয়েকটি শব্দ লাল কালিতে দাগানো। সম্পাদক আমাকে জানালেন চিহ্নিত শব্দগুলো বদলে দিলে ছাপানো যেতে পারে। কবি-সাংবাদিক আবদুল গনি হাজারী নিশ্চুপ। আমি কম্পিত কণ্ঠস্বরে বললাম, 'আমি শব্দগুলো বদলাব না'। 'রূপালি স্নান' ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলাম। এরপর বহুদিন আর 'সংবাদ'-এর পথ মাড়াইনি।

আবদুল গনি হাজারী 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতাটি লিখে পাঠকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক পরে তিনি এটিসহ আরও কয়েকটি ভালো কবিতা উপহার দিয়েছিলেন পাঠকসমাজকে। 'কতিপয় আমলার স্ত্রী'র জন্যে কবি একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যু আমাদের কাব্যসাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে মনে করি।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 'রূপালি স্নান'-এর কয়েকটি জায়গা লাল কালি লাঞ্ছিত হওয়ায় আমি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তবে এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি আমার জন্য শাপে বর হয়েছিল। সেই ক্ষতবিক্ষত পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়ে এসেই আমি তাড়াতাড়ি 'রূপালি স্নান'-এর একটি নতুন কপি করে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার ঠিকানা ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯-এ রওয়ানা করে দিলাম। মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল কবিতা বিষয়ে। কিন্তু আমাকে অবাক এবং উৎফুল্ল করে দিয়ে অল্প কয়েক দিনের

মধ্যেই খোদ বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি পেলাম। মহীশূর থেকে লেখা সেই চিঠিতে 'রূপালি স্নান' যথাশীঘ্র প্রকাশিত হবে, এই সংবাদটি ছিল। একটি শব্দ বুদ্ধদেব পড়তে পারেন নি বলে লিখলেন এবং শব্দটি কী হবে তা' কবি নরেশ গুহকে জানিয়ে দিতে বললেন। নরেশ গুহর ঠিকানা বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে পাওয়া গেল। আমি এই সুখবরটি কায়সুল হককে জানাতে এক মুহূর্তও দেরি করি নি। রংপুরে পৌঁছে গেল আমার আনন্দ-বিহ্বল পত্র। কায়সুল হক যে আমার চেয়েও বেশি খুশি হবেন তা' আমি জানতাম।

দেখতে দেখতে ১৯৫২ সাল কেটে গেল। আম্মার যত্নে অসুখে লুট হয়ে যাওয়া আমার স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম। এখানে বলে রাখি, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিক 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সঙ্কলনে আমার যে কবিতাটি ঠাঁই পেয়েছে সেটি আমি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে কিংবা তার কয়েকদিন পরে লিখি নি, লিখেছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন আগে। কবিতাটির নাম ছিল 'আর যেন না দেখি'। এটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে ঢাকা কলেজের ম্যাগাজিনেও মুদ্রিত হয়। হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর সঙ্কলনে এই কবিতাটি জায়গা এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, আমার কবিতায় পরবর্তী মর্মান্তিক অথচ বীরত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্বাভাস রয়েছে। হাসানের যুক্তিকে উপেক্ষা করার জো ছিল না। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবকালে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতন থেকে কায়সুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় সাহিত্যমেলায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কোন কোন সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করা যায় তার একটি তালিকা পাঠানোর জন্য। কায়সুল হক সেই তালিকায় আমার নামটি যুক্ত করেন এখানকার কবিতা বিষয়ে বক্তা-প্রতিনিধি হিসেবে। এই সংবাদটি প্রচারিত হয়ে যায় ঢাকায়। কেউ কেউ যারা শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন, আমার বিরুদ্ধে চিঠি পাঠান শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলার আয়োজকদের কাছে। ধন্দে পড়ে যায় সাহিত্যমেলার কমিটি। বিষয়টি জানতে পেরে আমার বিষয়ে নানা তথ্য এবং অনেক কবিতা কপি করে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আমন্ত্রিত লেখক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী। কায়সুল হকের চিঠিটি শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলা কমিটির কাছে পৌঁছুনোর পর কায়সুল হকের ওকালতি আমাকে অন্যতম অতিথির সম্মান দিতে সফল হয়।

শেষ পর্যন্ত মোতাহের হোসেন চৌধুরী সাহিত্যমেলায় শরিক হতে পারেন নি, তবে ঠিক সময়ে উপস্থিত হন কাজী মোতাহার হোসেন এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। কায়সুল হক এবং আমিও শান্তিনিকেতনে হাজির হতে পেরেছিলাম সম্মানিত অতিথি হিসেবে। আমার পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব কায়সুল হক গ্রহণ করেন স্বেচ্ছায়। কায়সুল হক না থাকলে আমার কিছুতেই শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় যোগ দেয়া সম্ভব হত না। কায়সুল হক এবং আমি প্রথমে ঢাকা থেকে রংপুরে গেলাম। সেখানে দু'এক দিন জিরিয়ে ট্রেনে রওয়ানা হলাম পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে। পূর্ব-বাংলার কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। বিষয়টি সহজ নয়। একটি লাইনও লিখে উঠতে পারি নি। কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই ট্রেনে চেপে

বসেছি। কায়সুল হক দিব্যি বসে বসে ট্রেনের জানলা দিয়ে উপভোগ করছে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য আর আমি ভাবছি কী করে লিখব কাঙ্ক্ষিত প্রবন্ধটি। হতাশা তার ঘোর কৃষ্ণ মুখমণ্ডল নিয়ে হাজির হয়েছে আমার সামনে। এক সময় মনে হল কেন যে ছাই রাজি হলাম শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় অংশ নিতে!

শেষ পর্যন্ত হতাশাকে তাড়িয়ে কাগজকলম নিয়ে বসে গেলাম লেখার কাজে। প্রকৃতি বানু নিশ্চয়ই রুষ্ট হবেন না আমার অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্যে। ফাঁকে ফাঁকে তার চিত্তহারিণী রূপে মুগ্ধ হওয়ার সুযোগ চুরি করে নেবই। যে প্রবন্ধটি শুনে শান্তিনিকেতনে অনেক বোদ্ধা শ্রোতা, ছাত্রছাত্রী মুগ্ধ হয়েছিলেন, দিল খোলা তারিফ করেছিলেন আমার, যে নিবন্ধ শুনে গৌরী দত্ত, যিনি পরবর্তীকালে আবু সয়ীদ আইয়ুবের জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন, তিনি বলেছিন, 'You have a wise head on your young shoulders'. সেটি লেখা হয়েছিল তাড়াহুড়ো করে চলন্ত ট্রেনের একটি কামরায় ঢুলতে ঢুলতে।

## ॥ বাইশ ॥

ট্রেনে চেপে অনেক দূর বেড়ানো ছেলেবেলায় এক দুর্দমনীয় শখ ছিল। আজও সেই শখের অবসান হয় নি। কিন্তু ইদানিং ট্রেনে চড়ে বেড়ানো হয়ে ওঠে না। দূরের পাল্লায় পথ পাড়ি দিতে, হয় মোটরকার নয়তো উড়োজাহাজের সিটে বসে। উড়োজাহাজের চেয়ে মোটরকারে ভ্রমণ করা আমার কাছে, শারীরিক ক্লেশ সত্ত্বেও, অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে, পছন্দমাফিক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে খানিক জিরিয়ে নিয়ে আবার পথ চলার আনন্দে, মন ময়ূরের মতো নেচে ওঠে এই বিস্তর বয়সেও। মনে পড়ে, কতবার ছেলেবেলা এবং কৈশোরে কখনও ট্রেনে, কখনও বজরায় অর্থাৎ গ্রিন বোটে মহানন্দে আমাদের পাড়াতলী গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। কী করে ভুলব ট্রেনের জানালা দিয়ে দু'পাশের গাছপালা, মাঠ, কুঁড়েঘর, হাওয়ায় ঢেউ-খেলানো ধানের খেত, কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দাঁড়িয়ে-থাকা, কোনও কোনও গেরস্ত বাড়ির গৃহিণীর ঘোমটা-দেয়া মুখের ঝলক, কৃষকের লাঙল-কাঁধে হেঁটে-যাওয়া দেখার স্মৃতি? দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে বজরার ছাদে চৌকিতে বসে থাকা আব্বার আনন্দিত মুখ, আব্বার পাশে-বসা আম্মার স্বর্গীয় চেহারার মোলায়েম দীপ্তি, সন্ধ্যার ছায়া-ঢাকা পাড়া গাঁ, আদিগন্ত জ্যোৎস্নাময় রাতের রহস্যময়তা, মাঝির দাঁড় বাওয়া, বিশ্রামের মুহূর্তে দাঁড় থামিয়ে আব্বার ভরদুপুরে জেলের কাছ থেকে সদ্য জালে আটকাপড়া মাছ কেনা। কিছুতেই এই দৃশ্যাবলি স্মৃতিপট থেকে লুপ্ত হয় না।

শান্তিনিকেতনের নিমন্ত্রণ পেয়ে খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলাম এখানকার কতিপয় লেখকের মনোভঙ্গি জানতে পেরে। তাদের বিরোধিতা আমাকে আহত করেছিল, কিন্তু হতাশ করতে পারে নি। গেলাম সেখানে, পেলাম আশাতীত অন্তরঙ্গ ব্যবহার, অনেকের প্রশংসা। শান্তিনিকেতন থেকে আমাদের বলা হয়েছিল আমরা যেন কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে দেখা করি। আমরা কলকাতা পৌঁছে পথঘাট ঠিকমতো না জানার দরুন তাঁর ঠিকানায় হাজির না হয়ে শিয়ালদহ থেকে সরাসরি হাওড়া স্টেশনে এসে বোলপুর রওয়ানা হওয়ার

জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। যতদূর মনে পড়ে বিকেলে ট্রেনের কামরায় উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড়ে পড়ে গেলাম। কোনওরকম দু'জনের দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া গেল। আমাদের দু'জনের কথাবার্তা শুনে বসে-থাকা যাত্রীদের একজনের সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ হলাম। খুব সম্ভব আমাদের মুখে শান্তিনিকেতন বারবার উচ্চারিত হতে দেখে তিনি আমাদের ওখানকার ছাত্র ঠাওরালেন। আমরা ভদ্রলোককে জানালাম যে, শান্তিনিকেতনে সাতাশে ফেব্রুয়ারি থেকে যে সাহিত্যমেলা হচ্ছে, তাতে আমরা পূর্ববাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছি। ভদ্রলোক যে সজ্জন তা তাঁর আচরণে প্রকাশ পেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা বসুন। আমরা দু'স্টেশন পরেই নেমে যাব। আপনারা বিদেশ থেকে এসেছেন, 'আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের বয়স যতই কম হোক না কেন আপনারা আরাম করে বসে পড়ুন, সঙ্কোচ করবেন না।' আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ে স্বস্তি নিয়ে বোলপুরের দিকে এগুতে থাকলাম। ভদ্রলোক বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমরা খুবই ক্লান্ত।

সন্ধ্যার একটু আগেই পৌঁছে গেলাম। স্টেশন থেকে রিকশা করে সন্ধ্য হয়-হয় এমন সময় পৌঁছলাম শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসে। সুরজিৎ দাশগুপ্তর খোঁজ করতেই একজন ছাত্র ছুটলেন ঢাকার অতিথির খবর নিয়ে সুরজিতের কাছে। খবর পেয়েই সুরজিৎ মহানন্দে ছুটে এলেন। কে বলবে এখনই, এই মাত্র আমাদের সাক্ষাৎ হতে চলেছে। ওর সঙ্গে কায়সুল হকের পরিচয় আগেই হয়েছিল পত্রালাপের সূত্রে। তিনি বললেন, 'আপনাদের থাকার ব্যবস্থা যদিও অন্যত্র, তবে আজ রাতটুকু আমাদের সঙ্গেই কাটাতে হবে। কুছ পরো নেই' বলেই আমাদের টিফিন ক্যারিয়ার, হোল্ডল হাতে তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে বললেন আমাদের। তারপর আমরা পাতা বিছানায় খুব ক্লান্তির আমেজ নিয়ে বসে পড়লাম। সুরজিৎ একটু এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে এসে বললেন, 'আপনারা কি স্নান-টান সেরে ফেলবেন?' আমরা সম্মতি জানাতেই আমাদের দু'জনকেই দুটো বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। ঢুকেই মন আনন্দে ভরে গেল। বেশ খোশবু-ছড়ানো নতুন তোয়ালে ঝোলানো। আমরা বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখি অমলেট এবং চা হাজির। ঝটপট চা নাশতা সেরে খানিক আয়েশ করে বসলাম। সুরজিৎ তাড়া দিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় মশাইয়ের বাসায় যাওয়ার জন্যে। আমরাও খুশি হলাম, ক্লান্তি উধাও। সুরজিৎ মহানন্দে আমাদের নিয়ে পৌঁছে গেলেন শ্রী রায়ের বাসায়। ওঁরা অর্থাৎ লীলা রায় ও শ্রী রায় আমাদের পেয়ে খুব খুশি। পথে কোনওরকম অসুবিধা হয়েছিল কি-না, তাও জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, 'ভিসা অফিসার আপনার চিঠি আগেই পেয়েছিলেন, সে-কথা আমাদের জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভিসা দেয়ার নির্দেশ দিলেন।' শুনে তিনিও খুশি হলেন। আমাদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল।

হঠাৎ কী এক কাজে অন্নদাশঙ্কর রায় ঘরের ভেতরে গেলেন। খানিক পরে ফিরে এসে লীলা রায়কে বললেন, 'শুধুই গল্প করে চলেছ, ওদের কিছু খাওয়াও-দাওয়াও।' অমনি উঠে গিয়ে ট্রে হাতে নিয়ে ফিরে এলেন শ্রীমতী লীলা রায়। গল্পগুজব এবং খাওয়াদাওয়া করতে করতে আটটা বেজে গেল। সুরজিৎ আমাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে চললেন ছাত্রাবাসে। বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতি চলছি চারপাশে। একদল ছেলেমেয়ে গান

গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এতকাল পর মনে হচ্ছে, গানটি বুঝি ছিল ' আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'। দলটি আমাদের কাছাকাছি আসতেই সুরজিৎ বলে উঠলেন, 'শান্তিদা, এই যে দেখুন কারা এসেছেন, শামসুর রাহমান, কায়সুল হক পূর্ববাংলার ঢাকা আর রংপুর থেকে।' অমনি শান্তিদেব ঘোষ গান থামিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। আমাদের মনে হতে লাগল, আমরা যেন স্বপ্নলোকে হেঁটে বেড়াচ্ছি। এত বড়ো গুণীজন অথচ মুহূর্তেই তার সমবয়সি বন্ধু ভেবে নিয়ে দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেললেন! আদাব, নমস্কার বিনিময় করে ফিরে চললাম ছাত্রাবাসের দিকে।

ছেলেদের সঙ্গে রাতের খাবার সেরে ঘুমাবার আয়োজন চলল আমাদের। বলতে ভুলে গেছি, এখানকার নিয়মানুসারে আহারপর্ব শেষ হওয়ার পর কাঁসার থালা বাটি সবই নিজেদের পৌঁছে দিতে হয় ধোওয়া-মোছার জায়গায়। আমাদের অনভ্যস্ত হাত কোনওরকমে ধীরে সুস্থে পৌঁছে দিল বাসন-কোসন।

বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না দিতেই কবি-অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা হাজির হলেন আমাদের খবরাখবর নিতে। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ামাত্র আমাদের মনে পড়ে গেল তার কবিত'র একটি চমৎকার পঙ্‌ক্তি, 'আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে।' তিনি ছাত্রদের বললেন, 'আজ আর রাত্রি জাগরণ নয়, সব আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। ওদের যেন অসুবিধা না হয়।' আর আমরা ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে চলেছি। সুরজিৎ সকালে এসে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট নিবাসে নিয়ে যাবেন বলে ঘুমোতে গেলেন।

সুরজিৎ ভোরবেলা এসে আমাদের নাস্তার ব্যবস্থা করে ফেললেন। এদিকে আমাদের বর্ধমান স্টেশনে কেনা মিহিদানা বন্দি থেকে যাচ্ছে টিফিন ক্যারিয়ারে, যদিও কেনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু নিয়েছিলাম চলতি পথে। মনে পড়ে চলার পথে দু'জন সুঠাম শরীরের সাঁওতাল যুবতীকে দেখেছিলাম মুহূর্তের জন্যে। যা হোক, এই মিহিদানা সুরজিৎ তৃপ্তি সহকারে সাবাড় করলেন। সুরজিৎ, তার সঙ্গে ফরিদা মালিক এবং অন্য একজন মিলে আমাদের জুতো, হোল্ডল সব বয়ে নিয়ে চলেছেন উদ্দিষ্ট জাস্টিস বি.কে গুহর বাসভবনে।

সেদিন দুপুরে এসে পৌঁছলেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এবং পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ও তুলসি লাহিড়ী। এঁরা দুজন পশ্চিমবঙ্গীয় ক্যাম্পে না থেকে নিজেদের রংপুরবাসী হিসেবে আমাদের সঙ্গেই ক'টি দিন কাটানোর জন্যে এসে গেলেন। আমরাও সুযোগ পেলাম দু'জন নামজাদা ব্যক্তির সঙ্গে কয়েকটি দিন থাকার। একদিন দুপুরে আমাদের সঙ্গে আড্ডার উদ্দেশ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে এলেন আমাদের ডেরায়। এদিকে বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু উঠেছেন 'রতন কুঠিতে'। কাজী মোতাহার হোসেন সুভাষকে লক্ষ করে বললেন, 'চলুন রাণুর গান শুনে আসি।' রানু অর্থাৎ প্রতিভা বসু। আমরা বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুর সকাশে উপস্থিত হলাম বটে, কিন্তু কাজী সাহেব আর গান শোনানোর প্রস্তাব রাখলেন না। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বললেন বুদ্ধদেব বসু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকদিন পর এই দেখা হল

তাঁদের, উভয়ের কথায় এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। পরবর্তী অধিবেশনের সময় ঘনিয়ে আসছে দেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাওয়ার। আমরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে সেখানে যাওয়ার জন্যে। কারণ কণিকা দেবীর গান শোনার আকর্ষণ তো আছেই, তদুপরি সেখানে অতিথি হিসেবে আছেন কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে খোদ কথাশিল্পীই অভ্যর্থনা জানালেন। গৃহকর্ত্রী ঘরের ভেতর থেকেই বললেন, 'বসুন সবাই, আসছি আমি।' নারায়ণ বাবুর হাতে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর অটোগ্রাফের খাতা, যেখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, চিয়াং কাইশেক প্রমুখের স্বাক্ষর। আমি আর কায়সুল তো বিস্ময়ে বিহ্বল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। এরই ফাঁকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'এই মুহূর্তে এক কাপ পেলে যতটা ভালো লাগত ততটাই ভালো লেগেছে আপনাদের শান্তিনিকেতন।' সুভাষই সরবে পড়লেন নিজের বাক্যটি। অমনি হারে-রে-রে, করতে করতে কণিকা জানালেন, 'কথা না লিখলেও চা হতো।'

কায়সুল এবং আমি সেই অসাধারণ খাতায় স্বাক্ষর রাখতে বিরত থাকলাম। কণিকা দেবী এটি লক্ষ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত খাতাটি আবার পাঠালেন আমাদের দু'জনের স্বাক্ষরের জন্যে। আখেরে আমাদের হার মানতে হল।

আমাদের ব্যস্ততার শেষ নেই। সাহিত্যমেলার অধিবেশন আর এরই ফাঁকে ফাঁকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সাক্ষাতের জন্যে বিভিন্ন স্থানে ছুটে যাওয়া। একদিন সকাল নয়টা দশটার দিকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর বাসায় উপস্থিত হলাম, সঙ্গে ফরিদা বারী মালিক বীথি। তখন সে বিশ্বভারতীর ছাত্রী। নন্দলাল বসু আমাদের বললেন, 'তোমরা এত দেরিতে এসেছ যে, আমার মূল ছবিগুলো তো নেই। সব প্রিন্ট দেখতে হবে।' তিনি নিজেকে একে একে দেখাতে লাগলেন — শিশুর সরলতা নিয়ে। ফরিদাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওর মা-ও এখানকার ছাত্রী ছিল এবং এখানকার সবার প্রিয় ছাত্রী ছিল।'

খানিক পরেই ওখনে দেখা হয়ে গেল গেরুয়া পোশাক পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যাঁকে আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার হিসেবে সমধিক জানি।

যেহেতু কায়সুল হক এবং আমি সাহিত্যমেলা শুরু হওয়ার দিন দুই আগেই হাজির হয়েছিলাম, তাই আমাদের নবলব্ধ বন্ধু সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক ফাঁকে প্রবাদপ্রতিম ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, শিল্পী এক বুড়ো মতো মডেলকে সামনে বসিয়ে কাজ করছেন। তাঁর এক হাতের আঙুলে জ্বলন্ত সিগারেট, আরেক হাতে বাটালি। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত আলাপ হল। ফিরে আসতে আসতে সুরজিৎকে জিজ্ঞেস করলাম, শিক্ষাভবনের চৌহদ্দিতে রবীন্দ্রনাথ সকলের জন্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে গেছেন বলে শুনেছি, কিন্তু রামকিঙ্কর মশাইকে ধূমপান করতে দেখা গেল যে! সুরজিৎ জানালেন যে, রবীন্দ্রনাথ একমাত্র তাঁকেই ধূমপানের অনুমতি দিয়ে গেছেন। কারণ, ঐ বস্তুটি ছাড়া শিল্পী রামকিঙ্কর কোনও কাজ করতে পারেন না।

সাহিত্যমেলায় যোগ দিতে গিয়ে চাক্ষুষ করলাম রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রতিমা ঠাকুর (রথীন্দ্রনাথের পত্নী), রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রতিভা বসু, শান্তিদেব ঘোষ, অম্লান দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁর পত্নী (আমেরিকান) লীলা রায়, অশোকবিজয় রাহা, বাণী রায়, ('প্রেম' নামক উপন্যাসের রচয়িত্রী), লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, দিনেশ দাস, নরেশ গুহ, জগদীশ ভট্টাচার্য, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী, সুনীলচন্দ্র সরকার, গৌরী দত্ত (পরবর্তীকালের গৌরী আইয়ুব) প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। আমাদের সময় আনন্দময় হয়ে উঠেছিল সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং নিমাই চট্টোপাধ্যায় নামক দুই তরুণের সাহচর্যে।

নিমাই চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যমেলার একদিনে চটজলদি একটি ছড়া লিখে ফেলেছিলেন। ছড়াটি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি, কিছু ভুল থাকতেও পারে —

কবি শামসুর রাহমান
বলেন : আজ ভেগেছে অতীত
বর্তমানেরও ভেঙে গেছে ভিত
নয়া মানুষের তাজা ধমনীতে
ভাবীকাল শুধু বহমান।

কবি শ্রী নরেশ গুহ
দুরন্ত কোনও দুপুরে ভাবেন :
"কবি যদি পলিটিক্সে নাবেন
কে আনবে তবে শিল্পের সুরা
গড়বে রসের ব্যূহ?"

কবি শ্রী সুভাষ মুখো
কাব্যমার্গ ত্যাগ করে আজ
(credo-গর্হনে কিবা কাজ?)
ওহো কী কাণ্ড, ধরেছেন এক
রাজনৈতিক হুঁকো।

সাহিত্যমেলা ৫টি শাখায় বিভক্ত ছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকালে উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও প্রথম অধিবেশন বসে। বিষয় ছিল লোকসাহিত্য। সন্ধ্যায় কবির লড়াই। কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন গুমানি দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তী। এঁরা দু'জনই খ্যাতিমান লোককবি। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে শিশু সাহিত্যের অধিবেশন — এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরী। মনোমুগ্ধকর ছিল তাঁর ভাষণ। আজও কানে গুঞ্জরিত হয়। এই অধিবেশনের পর পরই অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাসায় চা-পার্টি ও বাউল গানের আসর — কয়েকজন বাউল মাতিয়ে

তোলেন সবাইকে। সেদিন বুঝেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের গায়কী আমাদের বাউলদের গায়কী এক নয়। রাতে কফি পার্টি প্রাক্তনীতে।

কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের অধিবেশন ১ মার্চ পূর্বাহ্ণ সময়ে। এই অধিবেশনটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যের বৈপরীত্য নিয়ে, বুদ্ধদেবই সতর্ক শ্রোতায় রূপান্তরিত করেন সেদিনের প্রচুর শ্রোতাকে। আমারও বক্তব্য রাখার নির্ধারিত অধিবেশন ছিল এটি। এ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি, বলেছি শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ার কথা। আমার এবং আরও ক'জনের বক্তব্যের পর দুপুর ওর প্রখরতা নিয়ে ঠিক মাথার ওপর এসে হাজির, এমন সময় আজকের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত অধিবেশনের সভাপতি প্রবোধচন্দ্র সেনের কাছে সময় চেয়ে বসলেন কিছু কথা বলার জন্যে। সেন মহাশয় তো সময় দিতে নারাজ। বারবার অনুরোধের ফলে আখেরে মাত্র দু'মিনিট সময় দিতে রাজি হলেন। এটুকু সময়ে অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন দত্তকুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি অম্লানবাবু। প্রবোধচন্দ্র সেন ঘোষণা করলেন, 'শ্রীদত্ত দু'মিনিট সময়ও নেন নি। আর এই সময়টুকুর ভাষণে তিনি সবাইকে ম্লান করে দিলেন।' একথা বলে সভাপতি দীর্ঘ সময় ধরে চলা অধিবেশনের টেনে দিলেন। ঐ দিন বিকেলে বসে কথাসাহিত্যের এবং সন্ধ্যায় প্রবন্ধসাহিত্যের অধিবেশন। সব শাখায় জমজমাট আলোচনা ইতিপূর্বে কোনও সাহিত্যসম্মেলনে হতে দেখি নি। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। লোকসাহিত্যে বিষয়ক অধিবেশনে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন আহমদের ভাষণ তিনি আগে লিখতে পারেন নি। অধিবেশনের আগের দিন বিকেলবেলা তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে কিছু তথ্য বলে দিচ্ছি, তুমি চটপট ওগুলোর ভিত্তিতে একটি ছোটো নিবন্ধ দাঁড় করাও।' গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিলাম। তাঁর দেয়া হাড়গুলোর ওপর আমি কিছু মাংস সাজিয়ে দিলাম খেটেখুটে। তিনি সন্তুষ্ট হলেন। আমি নরেশ গুহ, কায়সুল হকের সঙ্গে বাইরে যেতে পারলাম না। অবশ্য মন খারাপ হয় নি আমার। আমার শিক্ষকের কিছু কাজ করে দিতে পেরে ধন্য মনে করেছি সেদিন।

পরদিন বিকেলে আমরা চারজন অর্থাৎ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, কায়সুল হক এবং আমি বিকেলের ট্রেন ধরে কলকাতা রওয়ানা হলাম। বোলপুর স্টেশন ছাড়ার পর পরই বসন্ত উৎসবে আসা কলকাতার এক ঝাঁক তরুণী কামরাটাকে রবীন্দ্র সংগীতের সুরে সুরে রাঙিয়ে তুললেন। আকাশে তখন গোধূলি ছড়ানো। তরুণীদের অনেকেই দেখলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করে তারা গান থামিয়ে কবির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। সঙ্গে আনা কিছু খাবারও পরিবেশন করলেন আমাদের সামনে। মজা করে খেলাম আমরা। তারপর গানের সুরের আদরে আপ্লুত হয়ে পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশনে। নেমে সুকণ্ঠী সুদর্শনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিদায় নিয়ে কায়সুল হক আর আমি নরেশ গুহর সঙ্গে 'দুরন্ত দুপুর'-এর কবির বাসা ৫ সত্যেন দত্ত রোডের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। মনে পড়ে গেল, শান্তিনিকেতনে কয়েকজন তরুণীর সঙ্গে আমাদের তিনজনেরই বেশ আলাপ জমে উঠেছিল ক'দিন। মধুর ছিল সেসব দিন।

## ॥ তেইশ ॥

কবি নরেশ গুহর বাসায় বসে ঠিক করা হল, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করার কথা। তকন আইয়ুব সীমিত জনের কাছে উচ্চারিত নাম, যেমন ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তাই, বেরিয়ে পড়া গেল। আমি, কায়সুল হক এবং নরেশ গুহ তো ছিলামই, সঙ্গে জুটে গেলেন 'দুরন্ত দুপুর'-এর কবির দু'জন বন্ধু। তাঁদের কারও নাম এখন মনে নেই। নরেশ গুহর জানা ছিল আইয়ুবের আস্তানা। কিন্তু সঠিক বাড়ি চেনা ছিল না। পাঁচ নম্বর পার্ল রোডে অবস্থিত আইয়ুবের বড়ো ভাই ডাক্তার এমও গণির নিজস্ব বাড়ি। ডাক্তার গণি সিপিআই দলের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবে খ্যাত। আইয়ুবের বাসার অবস্থান জেনে নিতে আমরা প্রথম যে-বাসায় কড়া নেড়েছিলাম সে-বাসাটি ছিল ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ারে। মোস্তফা আনোয়ার কবি গেলাম মোস্তফার বড়ো ছেলে। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জেনে গেলেন, আমরা পূর্ব বাংলা থেকে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলায় যোগ দিতে এসেছিলাম। তাই তিনি আগাম চায়ের আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে রাখলেন, যাতে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ওখান থেকে ফিরে তাঁদের ড্রইংরুমের কড়া পুনরায় যেন নাড়ি।

আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছি, তখন ডাক্তার গণি নেমে আসছেন। মাঝপথেই আমরা আবু সয়ীদ আইয়ুবের দর্শনার্থী একথা তাঁকে বলতেই তিনি আমাদের জানালেন যে, খানিক আগেই যাদবপুর হাসপাতালে আইয়ুবকে ভর্তি করা হয়েছে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমরা ফিরে এসে ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ারের বাসায় এলাম। চা খেতে-খেতে আয়সুল হক মোস্তফা আনোয়ারকে বললেন, "আপনার বাবা 'মর্নিং নিউজ'-এ একটি বিবৃতিতে বলেছেন, উর্দু ভাষা বাংলা ভাষা থেকে উন্নত।" মোস্তফা আনোয়ার এটুকু শুনেই বললেন, 'আমি পড়েছি এবং এ জন্যই পিতা হিসেবে তাকে ত্যাজ্য করেছি। এখন থেকে তার ছেলে হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিই না।'

ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ারের এই পরিচয় পেয়ে আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়লাম। ঐ চায়ের টেবিলেই তাঁরা বিদুষী স্ত্রী সুস্মিতার স্বল্প কথা এবং আচরণ আমাদের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলল। পরে কায়সুলের কাছ থেকে জেনেছি, ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ারের সঙ্গে তার পত্র বিনিময় হয়েছিল। জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী একই বাসায় আলাদা অংশে থাকতেন। কিছুক্ষণ পর আলী সাহেবের আগমন ঘটল ক্যাপ্টেন আনোয়ারের ড্রইংরুমে। আগমন তো নয়, আবির্ভাব। বকের পায়খানার মতো ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি ছিল তাঁর পরনে। গৌরবর্ণ কান্তির অধিকারী সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমরা সালাম জানালাম, তিনি বুকের সামনে হাত রাখলেন নমস্কারের ভঙ্গিতে, সম্ভবত নরেশ গুহর নমস্কারের জবাবে। সোফায় বসতে-বসতে তিনি কায়সুল হক এবং আমাকে বললেন, 'আপনারা পূর্ব পকিস্তান থেকে এসেছেন, ভালো কথা। কিন্তু বেশিদিন সেই মুলুকে থাকতে পারবেন না।' আমরা ঈষৎ ভড়কে গেলাম। আমাদের মুখে কোনও কথা সরল না। আর কী কী বলেছিলেন, মনে নেই। একটু পর তিনি বললেন, "এক্ষুনি আমাকে জয় মা কালকাত্তাওয়ালী বলে ট্রামে উঠতে হবে। একটু তাড়া

আছে। 'আনন্দবাজারে' গিয়ে কলাম লিখতে হবে।" তাঁর প্রস্থানের পর আবার কিছুক্ষণের জন্য জমে উঠল আমাদের আলাপ-আলোচনা। আমি বরাবরই স্বল্পবাক। তাই কথার খই ফোটালেন মূলত ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার, নরেশ গুহ এবং কায়সুল হক। ইতিমধ্যে আরেক প্রস্থ চা, বিস্কুট ও সন্দেশ পরিবেশন করলেন সুস্মিতা আনোয়ার।

আড্ডা শেষ হলে আমরা রওয়ানা হলাম নরেশ গুহর বাসার দিকে। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে দেখা হল না বলে মনে খারাপ-লাগার কালো মেঘ লেগেই রইল। দুপুরে পাঁচ নম্বর সত্যেন দত্ত রোডে ফিরে এসে দেখি বসার ঘরে ক্যারাম খেলছেন দীর্ঘদেহী নিরুপম চট্টোপাধ্যায় এবং নরেশ গুহর ছোটো ভাই ও বোন। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের চোখে। অত পুরু লেন্সের চশমা নিয়ে ক্যারামের গুটি দেখা যে সম্ভব তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?' তাঁরও চোখেমুখে বিস্ময় ছড়ানো — 'আপনি এত বড়ো মানুষ, আপনাকে দেখব না?' — বলেই এক গাল হেসে ফেললেন। তখনও আমার জানা ছিল না যে, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ও, যিনি নরেশ গুহর একজন সুহৃদ, মাঝে-মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। তিনি নরেশ গুহর বাসাতেই একটি ঘরে থাকেন। গৃহকর্তার মতো তিনিও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের একজন অধ্যাপক। এই ঘটনার বছর তিনেক পর ১৯৫৬ সালের ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ · দু-জন অসবর্ণ কবি' প্রবন্ধটি চোখে পড়তেই সেই নিরুপম চট্টোপাধ্যায়কেই মনে পড়ে যায়। প্রবন্ধটি আমার সামান্য বিবেচনায় বুদ্ধিদীপ্ত, সুলিখিত এবং আধুনিক কবিতার বিশ্লেষণ, সে-সময়কার সমালোচকদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ার মতনও বটে। খানিকটা উদ্ধৃতি পেশ করার লোভ সামলাতে পারলাম না —

"'বাঁশি' কবিতাটিও ('কিনু গোয়ালার গলি') আমাদের সহায়তা করবে। দীন, সাধারণ জীবন থেকে সেখানে অনেকগুলি রূপকল্প উপস্থিত করা হয়েছে। এগুলি বাদ দিলে অবশ্যি কবিতাটি পুরোপুরি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু রূপকল্পগুলি কী প্রকৃতির দেখা যাক :

**বর্ষা ঘনঘোর।**
**ট্রামের খরচা বাড়ে**
**মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।**
**গলিটার কোণে কোণে**
**জ'মে ওঠে প'চে ওঠে**
**আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি**
**মাছের কানকা,**
**মরা বেড়ালের ছানা,**
**ছাইপাঁশ আরও কত কী যে।**
**ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া**
**মাইনের মতো,**
**বহু ছিদ্র তার।**

এখানে যে ফর্দ উপস্থিত করা হয়েছে তা কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, গলির নোংরামি প্রমাণ করা ছাড়া তার অন্য কোন ব্যঞ্জনা নেই। এর সঙ্গে আমরা যদি জীবনানন্দের কয়েকটি পঙ্ক্তি মিলিয়ে পড়ি :

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে — হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে — দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে — টেরিটি বাজারে;
চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে। (রাত্রি) —

তৎক্ষণাৎ লক্ষ করব চীনে বাদামের একটি মাত্র উল্লেখে জীবনানন্দ কত সুষ্ঠুভাবে আমাদের নগর-জীবনের বিশুষ্ক সত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে চীনে বাদামে বিধৃত হয়েছে নাগরিক আত্মা।"

বুদ্ধিদীপ্ত প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি পড়ার সময় বারবার মনে ঝলসে উঠছিল তার পুরু লেন্সের আড়ালে জ্বলজ্বলে চোখ, হাসি। জানি না, তার প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছিল কি-না। তার কোনও বই, কিংবা বইয়ের বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ে নি। কয়েক বছর নরেশ গুহর সঙ্গে আমার নিয়মিত পত্রালাপ ছিল। সুন্দর, দীর্ঘ চিঠি লিখতেন নরেশ। তিনি তার প্রিয় বন্ধুর কোনও বইয়ের খবর আমাকে জানান নি। সম্ভবত নিরুপম চট্টোপাধ্যায় বেশি প্রবন্ধ লেখেন নি। হয়তো দু'তিনটি বিদগ্ধ প্রবন্ধ লিখেই থেমে গিয়েছিলেন। এরকম তো হয়, কোনও কোনও লেখক একটি কি দু'টি লেখার দীপ্তি ছড়িয়ে ঘুমিয়ে দেন কলমের গতি।

যা হোক, সেদিন দুপুরে নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের ক্যারাম খেলা শেষ হওয়ার পর আমরা দুপুরের আহার পরমানন্দে সেরে নিলাম। বিকেলের দিকে নরেশ গুহ কী একটা জরুরি কাজে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় কায়সুল হক এবং আমাকে বললেন যে, ফিরতে তার বেশ রাত হবে, আমরা যেন রাতের খাবার সেরে ফেলি। নরেশ গুহর প্রস্থানের কিছুক্ষণ পর কায়সুল ও আমি বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, রাসবিহারী এভিনিউ এবং তার আশেপাশে বৈকালিক ভ্রমণটি সেরে নেওয়া। তখন রাসবিহারী এভিনিউতে বেশ কয়েকটি গাছ ছিল, পথঘাটও ছিল নিরিবিলি। আসলে, সেকালে ট্রামে বাসে আজকের মতো দম-আটকানো ভিড় ছিল না, ছিল না তেমন হই-হুল্লোড়। এক ধরনের মোলায়েম আরাম ছিল পথ চলায়। অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়িয়ে ফিরে এলাম ডেরায়। সন্ধ্যা নেমেছে কলকাতায়, সত্যেন দত্ত রোডে। রাস্তাটির নাম কি কবি সত্যেন দত্তের সম্মানে রাখা হয়েছে! কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমরা দোতলায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্রশস্ত ঘরের মেঝেতে প্রস্তুত বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দু'জনই। ভোরে ঘুম ভাঙল। রাতের খাবার উদরস্থ করেছি কি করি নি কায়সুল কিংবা আমি মনে করতে পারছিলাম না। নরেশ গুহ জানালেন, আমরা রাতের খাবার স্পর্শ না করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তিনি অধিক রাতে ঘরে ফিরে খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন। আমাদের গভীর ঘুম ভাঙাতে তার ইচ্ছে হয় নি। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টেবিলে-রাখা ঝকঝকে নতুন একটি বই — 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা।' কায়সুল হক এবং আমি বইটির অনেকগুলো পাতা উলটে দেখলাম, আমাদের প্রিয় অনেক কবিতাই

সঙ্কলিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, এই বই একদিন কিনব ঢাকার কোনও লাইব্রেরি থেকে। কলকাতায় কেনা সম্ভব নয়। কারণ সহজ, সরল — অর্থাভাব। বাড়ি ফেরার ভাড়ার টাকা ছাড়া ব্যাগে অতিরিক্ত টাকাকড়ি গরহাজির।

হাত-মুখ ধুয়ে চা-নাশতা খেয়ে বাইরে বেরুনোর ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। 'কবিতা ভবনে' যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। কবিতাপ্রেমীদের বলে দিতে হবে না যে 'কবিতা ভবন' বুদ্ধদেব বসুর বাসভবনের নাম। রোদ-ঝলমলে সুন্দর দিন। বাসা এবং আমাদের সাময়িক ঘুমোবার ঘরে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে নরেশ গুহর নির্দেশে ২০২ রাসবিহারী এভেনিউর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। 'কবিতা ভবনে' এই প্রথমবারের মতো যাচ্ছি। এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করছি। বুদ্ধদেব বসু থাকেন দোতলায় এবং তাঁর বন্ধু কবি অজিত দত্ত থাকেন তেতলায়। দোতলায় গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে খোদ বুদ্ধদেব দরজা খুলে দাঁড়ালেন আমাদের মুখোমুখি। হাসিমুখে ভিতরে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানালেন এবং আসন গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তাঁর নির্ধারিত আসন গ্রহণ করার পর আমরাও বসলাম। আমাদের কুশল জানার পর শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ উঠল। এক সময় তিনি আমাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে বললেন। আমার জন্য তাঁর এই বিবেচনা আমাকে আনন্দিত করল। আমি মনে মনে এই বিখ্যাত সব্যসাচী সাহিত্যিককে কৃতজ্ঞতা জানালাম। বিনীতভাবে বললাম, আমার পক্ষে নানা কারণে এখানে আসা সম্ভব নয়। এরপর তিনি প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। একটু পরে প্রতিভা বসু ভিতর থেকে এসে বুদ্ধদেবের পাশের চেয়ারে বসলেন। তিনি দু'চারটি কথা বললেন। কথাবার্তার বেশির ভাগ ঝলসে উঠছিল বুদ্ধদেবের ওষ্ঠে। এক সময় তিনি বললেন, 'খুব কষ্ট হয় যখন আমার ছেলে বাপ্পা আমাকে জিজ্ঞেস করে, চর কাকে বলে, বাবা?' ঠিক তক্ষুনি স্বয়ং বাপ্পা এসে দাঁড়াল তার বাবার পাশে। এই বাপ্পাই পরবর্তীকালের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শুদ্ধশীল বসু। যা হোক, বাপ্পা নরেশ গুহকে প্রশ্ন করল, 'কখন এলে?' মানে কখন শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেছ? নরেশগুহ জবাব দিলেন মৃদু কণ্ঠস্বরে। কিছুক্ষণ পর প্রতিভা বসু আসর ছেড়ে চলে গেলেন। দূর থেকে লক্ষ করলাম, ভেতরের ঘরে দাঁড়ানো একজন সুশ্রী তরুণী। কে সে? মীনাক্ষী? এক সময় আসর ভেঙে গেল। আমরা বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নেমে এলাম। কবি অজিত দত্তের সঙ্গে দেখা করা হল না। ঠিক হল, ল্যান্সডাউন রোডে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন'-এর কবি জীবনানন্দ দাশের বাসায় যাব। তাঁর বাসার দরজার কড়া নাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন স্থূলাকৃতি ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। তাঁকে কেমন অপ্রস্তুত দেখাল। নরেশ গুহ বললেন, 'এরা দু'জন পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' বুঝতে পারলাম এই সাধারণ চেহারার ব্যক্তিটিই আশ্চর্য সব কবিতার রচয়িতা জীবনানন্দ দাশ। মনোভাব লুকাব না, কবিকে দেখে ঈষৎ হতাশই হলাম। আমার চেহারা দেখে নরেশ গুহ এবং কায়সুল হক দু'জনই আমার মনোভাব টের পেলেন। যা হোক, আমরা গৃহকর্তাকে অনুসরণ করে উঠোনের নিম গাছটির ছায়া গায়ে মেখে লম্বা বারান্দায় উঠলাম। পরিষ্কার তকতকে বারান্দায় একটি আরাম কেদারা ছাড়া অন্য কোনও আসন নেই। জীবনানন্দকে খুবই

অপ্রস্তুত এবং বিব্রত মনে হলো। আমরা তিনজন চটজলদি মেঝেতেই বসে পড়লাম। মনে হল, বিব্রত কবি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনিও বারান্দায় বসে গেলেন। নরেশ গুহ তাঁকে জানালেন, 'এরা দু'জন শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন। আপনার পরম ভক্ত এরা।' জীবনানন্দ মৃদু হাসলেন, হাসিতে লজ্জার ঈষৎ আভা।

কথা প্রসঙ্গে আমি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পাঠের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বললাম। জীবনানন্দ জানালেন, বেশ কয়েক বছর আগে তিনি বরিশালে একটি তোরঙ্গে অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে ফেলে এসেছেন। আমি বললাম, 'সেসব পাণ্ডুলিপি আজ ধূসর থেকে ধূসরতম হয়ে গেছে।' তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। স্বল্পভাষী জীবনানন্দের সেই হাসি বর্ণনাতীত, যে হাসির কোনও সম্পর্ক নেই এই জগত-সংসারের সঙ্গে। সেই হাসি থেমে যাওয়ার পর নীরব হলেন কবি। আর কোনও কথা বললেন না। আমরাও তাঁকে অপ্রস্তুত করতে চাইলাম না। এই মাত্র লাবণ্য দেবী, জীবনানন্দ দাশের স্ত্রী, উঠোন পেরিয়ে দরজা খুলে বাইরে চলে গেলেন, নিঃশব্দ, নির্বিকার। আমরা জীবনানন্দ দাশের সময় অধিক হরণ না করে বিদায় নিলাম। ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়, নরেশ গুহর বাসায়। আমার মনে, চেতনায় জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিমালা গুঞ্জরিত হচ্ছিল। জানি না, আমার অন্য দুই বন্ধুর চিন্তাপ্রবাহে তখন কী আলোড়ন সক্রিয়।

পরদিন সকাল এগারোটায় নরেশ গুহর কর্মস্থল চারুচন্দ্র কলেজে গেলাম। সেই কলেজে তখন তিনি ইংরেজির অধ্যাপক। আমরা কলেজে হাজির হয়ে দেখি তিনি ক্লাস নিচ্ছেন। কায়সুল এবং আমি শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে বসে বন্ধুর আগমনের অপেক্ষায় কাটালাম কিছুক্ষণ। ক্লাসের দায়িত্ব চুকিয়ে নরেশ ফিরে এলেন শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে। আমাদের দেখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। বেয়ারাকে ডেকে তিন কাপ চা আনতে বললেন। চা খেয়ে, কলেজি পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা তিনজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখি রাস্তার ওপারে জীবনানন্দ দাশ হেঁটে যাচ্ছেন। ছাতা দিয়ে রোদের তাপ ঠেকাচ্ছেন। 'যাবেন নাকি তাঁর কাছে', নরেশের প্রশ্ন। আমি বললাম, 'না, থাক — তিনি বিব্রতবোধ করবেন।' কেন জানি মনে হল, এই কবি-মানুষটিই তো লিখতে পারেন, 'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'।

পরদিন কায়সুল হক এবং আমি রওয়ানা হলাম প্রিয় স্বদেশের উদ্দেশে। নরেশ গুহ আমাদের শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। মনে ঘরে ফেরার আনন্দ এবং নরেশের মতো বন্ধুর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা, নবলব্ধ অভিজ্ঞতার মধুর গুঞ্জরণ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে ট্রেনের জানালা থেকে পূর্ব বাংলার অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। গাছপালার সবুজ, ফসলের ঢেউ, আকাশে নীলিমা, টেলিগ্রাফের তারে দীঘল লেজের পাখির বসে থাকা আমাকে উদ্দীপিত করে তুলল। মাথায় সম্ভাব্য নতুন কবিতার মৃদু আলোড়ন। আমার আপন ঘরের দিকে যাওয়া।

## ॥ চব্বিশ ॥

যৌবনের প্রারম্ভকালে ঢাকা শহরের পথে একা-একা হাঁটতে খুব ভালো লাগত। সেকালে তো ঢাকার রাস্তাগুলো এখনকার মতো এমন ভিড়াক্রান্ত ছিল না, ছিল না গাড়ি

চাপা পড়ার শঙ্কা। দিব্যি হাঁটা যেত। শরীরে রিকশার গুঁতো খাওয়া, পথচারীর ধাক্কায় ধুলোয় লুটিয়ে খাবি খাওয়ার দুর্ভাবনা ছিল গরহাজির। তাই নির্বিবাদে হেঁটে যেতে পারতাম বহুদূর। তাছাড়া জীবনানন্দ দাশের সদ্য পড়া 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' পঙ্‌ক্তির প্রেরণা তো ছিলই। তাই, সেকালে ইচ্ছে হলেই হেঁটে আশেক লেন থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে চলে যেতাম কোনও কোনও বন্ধুর সাহচর্যের লোভে। আমি এসএম হলের অ্যাটাচড্-ছাত্র ছিলাম। সেখানে যাওয়ার একটি মৌলিক অধিকার ছিল আমার। যখনকার কথা বলছি, তখন এসএম হলের বাসিন্দা ছিলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ফারুক চৌধুরী, আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং আরও কোনও কোনও বন্ধু।

অবশ্য ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই দেখা হত বেশি। যদিও আমরা একই ক্লাসের ছাত্র ছিলাম না, তবু তার সঙ্গে দেখা হত মধুদা'র ক্যান্টিনে। হাসান হাফিজুর রহমানের সৌজন্যে আমাদের ঘন ঘন দেখা হত। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর সিংহভাগ পুরস্কার পেয়ে যেতেন তার বিষয়বস্তু এবং কথা বলার ভঙ্গির জন্যে। তার কণ্ঠস্বরেরও এক ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে সত্যের অনুরোধে বলতে হচ্ছে, হাসান হাফিজুর রহমান ওবায়দুল্লাহর বেশ কিছু বক্তব্যের মোদ্দাকথা আমাদের বন্ধুকে সরবরাহ করতেন প্রতিযোগিতার আগে। অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহর প্রস্তুতির ক্ষেত্র সাজিয়ে দিতেন হাসান। অবশ্য এটা ঠিক, সাফল্যের তৃতীয়াংশের কৃতিত্ব প্রতিভাবান আবু জাফর ওবায়দুল্লাহরই প্রাপ্য। সেবার আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলাম। বরাবরই আমি প্রতিযোগিতা-বিমুখ। কিন্তু কী করে যে সেবার আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম ঈষৎ গা' ছাড়া ভাবে তা' বলতে পারব না। আবৃত্তির বিষয় ছিল জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। সত্যি বলতে কি, এ ধরনের প্রতিযোগিতায় আমি কখনও অংশ নিই নি। আশ্চর্যের বিষয়, আনাড়ি আমিই প্রথম পুরস্কারটি পেয়ে গেলাম। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলাম কয়েকটি ভালো বই। বইগুলোর মধ্যে একটি ছিল প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত হয়েছিল। একথা আগেও বলেছি। এ কারণে বেশ ক'জনের সঙ্গে সখ্য হয়েছে, ক'জনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আর এ কথাও সত্যি, হাসান হাফিজুর রহমানের উদ্যোগেই এটি হতে পেরেছিল। নিজের ভেতরগোঁজা স্বভাবের জন্যেই কারও সঙ্গে যেচে গিয়ে পরিচিত হতে চেষ্টা করি নি আড়ালে থাকতেই সচেষ্ট ছিলাম। এর ফলে কেউ কেউ আমাকে ভুলও বুঝেছেন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এবং আমার মধ্যে যোগসূত্র রচয়িতা হাসান হাফিজুর রহমান। প্রাথমিক পর্যায়ে এই যোগসূত্র ক্ষীণ হলেও পরে প্রসারিত এবং দৃঢ় হয়ে ওঠে।

একদিন বেলা একটু পড়ে গেলে হেঁটে এসএম হলে ওবায়দুল্লাহর কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। হন্তদন্ত ওবায়দুল্লাহ আমাকে দেখে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেছেন। আমার সামনে একটি কাগজ রেখে তৎক্ষণাৎ সই করতে বললেন, যেন এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে। এসএম হলের নির্বাচনে আমাকে লাইব্রেরিয়ানের পদে প্রতিযোগিতা করতে হবে। আমার মাথায় বাজ পড়ল যেন। আমি

দু'হাতে বারণ করলাম। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ছাড়বার পাত্র নন। আখেরে আমাকে হার মানতে হল। ওবায়দুল্লাহ জয়েন্ট সেক্রেটারির পদে প্রার্থী। এরপর শুরু হল এসএম হলের প্রতিটি রুমে যাওয়া এবং ভোট প্রার্থনা করার পালা। ব্যাপারটি, কবুল করছি, আমার পক্ষে মোটেই সুখকর ছিল না। অবশ্য আমাকে কোনও কথা বলতে হয় নি, আমার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেছেন ওবায়দুল্লাহ এবং আরও কেউ কেউ। আমি শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতাম অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে। নির্বাচন হল যথাসময়ে। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার একটা দুর্ভাবনা ছিল, কিন্তু তরী কৃতিত্বের সঙ্গেই ভিড়ে গেল তীরে। বিপুল ভোটে পাস করলাম। আমরা সবাই প্রফুল্ল চিত্তে কয়েকদিন এসএম হলে ঘুরে বেড়ালাম। বিজয়ী দলের ফটোও তোলা হল। লুকাব না, কয়েকটি দিন ভালোই লেগেছিল। লাইব্রেরিতে যেতে, সেখানে বসে পড়াশোনা করতে ভালোই লাগে আমার। সুযোগ পেলে এখনও ভালো গ্রন্থাগারে সময় কাটাতে ইচ্ছা করে। যৌবনের প্রত্যুষে রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রচুর সময় কেটেছে বই নেড়েচেড়ে এবং পড়ে। কিন্তু কেন জানি, এসএম হলের লাইব্রেরি আমাকে টানে নি। আমি একদিনও সেখানে প্রবেশ করি নি, দূরে সরে রয়েছি সবসময়। লাইব্রেরিটি কেন জানি একটি কবরের মতো মনে হত!

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে যে পরিচয় গড়ে ওঠে তাতে ছেদ পড়েছিল, আমাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যে ক'দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, ততদিন মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হত, খুচরো আলাপও হত। ইতিমধ্যে সম্ভবত তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত নরী হার' প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি নিজের খরচায় সযত্নে বইটি প্রকাশ করেন। কোনও মুনাফা লোটার লোভে নয়, একজন প্রকৃত প্রতিভাবান তরুণ কবির কবিতাবলি পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। হাসানের এই দুর্লভ গুণ কখনও ভোলার নয়। ছড়ার ছন্দে ওবায়দুল্লাহর যে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন প্রথম বইতেই। মূলত ছড়ার ছন্দে রচিত 'সাত নরী হার'-এর অধিকাংশ কবিতা। কিন্তু কবিতাগুলো আদৌ শিশুতোষ নয়, পরিণত মানসের অধিকারী পাঠকরাই ওগুলোর রসাস্বাদ করতে পারবেন। এই কবিতার বইয়ে কিছু বিদেশি কবিতার অনুবাদও রয়েছে। অনুবাদে ওবায়দুল্লাহ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি জানি, আরবি কবি আবুল আলা আল্ মারীর কয়েকটি কবিতা তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক এবং পণ্ডিত আবদুর রাজ্জাকের অনুরোধে অনুবাদ করেন। সেই কবির ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বইটি রাজ্জাক স্যার ওবায়দুল্লাহকে পড়তে দেন। চমৎকার অনুবাদ আমরা পেয়েছি আমাদের কবিবন্ধুর হাত থেকে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রায়শই আড্ডাপ্রিয় অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে কাটাতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কামরায়। জানতাম না তাদের মধ্যে আলাপের কী ধারা বয়ে যেত। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের প্রবাদতুল্য জ্ঞানের কথা আমরা জানি, এ-ও অনুমান করি বন্ধু ওবায়দুল্লাহ সেই জ্ঞানের কিছু আভায় স্নাত হয়েছেন। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আমার খুব বেশি দেখা হয় নি, কথাও হয়েছে কম। কিছুক্ষণ তার সঙ্গ পেলেই এক ধরনের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তার মুখের ভাষায় কোনও কৃত্রিমতা লক্ষ করি নি। তিনি বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের বাংলা ভাষায় কথা বলতেন।

চোস্ত বাংলা তাকে বলতে আমি শুনি নি। বিস্মিত হই এই ভেবে যে তার মতো অসামান্য পণ্ডিত কোনও ডক্টরেট ডিগ্রি হাসিলে আগ্রহী হন নি। শুনেছি; তার গুরু লাস্কির মৃত্যু হওয়ার পর তিনি নিজের সম্ভাব্য থিসিসের খসড়াটি হাওয়ায় উড়িয়ে দেন। তখন থেকে ডক্টরেট হাসিল করার ইচ্ছা চিরতরে ডুবে যায়। অথচ তার মতো পণ্ডিত, জ্ঞানী ব্যক্তি আমাদের সমাজে খুব বিরল। যদিও তিনি নিজে ডক্টরেট ডিগ্রি হাসিল করেন নি, তবু বহু ডাকসাইটে বিদেশি পণ্ডিত তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, কোনও কোনও প্রতিভাবান পণ্ডিত তাঁকে বই উৎসর্গ করেছেন, যারা ভূমিকায় তার ঋণ স্বীকার করেছেন তাদের সংখ্যাও কম নয়।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, কিছুটা হলেও তার মতো এমন একজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। হতে পেরেছিলাম তার স্নেহধন্য। তবে নানা কারণে, বিশেষত আমার ভেতর-গোঁজা স্বভাব আমাকে দূরে ঠেলে রাখত। এই স্বভাবের দরুন কত ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে যে বঞ্চিত হয়েছি তা আর না-ই বা লিখলাম। এখন আর আফশোশ করে লাভ নেই। তবু যেটুকু পেয়েছি সে-জন্যে সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই। আশ্চর্য ভরাট ছিল তার জ্ঞানভাণ্ডার। তবু পাঠে তার ক্লান্তি আসে নি কখনও। জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছেও জ্ঞান আহরণে অক্লান্ত ছিলেন। চিরকুমার এই মানুষটি তা' বলে জীবনের স্বাদ গ্রহণে এবং অন্যকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে উদাসীনতাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি একজন নিপুণ দাবাড়ু এবং অসাধারণ রন্ধনশিল্পী ছিলেন। পরবর্তীকালে ড. আনিসুজ্জামানের বাসায় স্যারের হাতের অপূর্ব রান্নার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল আমার।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি ইসলামিক একাডেমীতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'হোয়াই আই ওয়ান্টেড পাকিস্তান'। সেকালের পক্ষে একটি মজাদার বিষয়, সন্দেহ নেই। পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন বহু পণ্ডিত। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক পণ্ডিতও সামিল হয়েছিলেন সেই আলোচনা সভায়। সবাই বলেছিলেন, ইসলামের জন্যেই পাকিস্তান চেয়েছিলাম। শুধু অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের কণ্ঠে বেজে উঠল ভিন্ন সুর। তিনি জোরালো যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, এটার সঙ্গে ইসলামের খেদমত নয় অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি যুক্ত, সে-জন্যে আলেমদের বদলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তিরাই যুক্ত হয়েছিলেন এই সংগ্রামে। সেমিনার হট্টগোলের মধ্যে ভণ্ডুল হয়ে যায়। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারেন নি। আসলে ইচ্ছা করেই তাঁকে বেশি কথা বলতে দেয়া হয় নি। কারণ, উচিত কথা শুনতে সবাই নারাজ। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পাকিস্তানের তথাকথিত 'লৌহমানব' আইয়ুব খানের একান্ত বিশ্বস্ত খেদমতগার মোনায়েম খান খবরের কাগজে বিবৃতির মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন যে তিনি প্রমাণ করতে পারেন, অধ্যাপক রাজ্জাকের বক্তব্য ভুল। তখন অধ্যাপক রাজ্জাক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শর্ত দেন, মোনায়েম খান এবং তিনি একই সভায় মিলিত হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য দেবেন। তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে কার বক্তব্যে কতটুকু আঁশ রয়েছে। অর্থাৎ কোনটি যথার্থ বক্তব্য। সভার একটি তারিখও নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু গভর্নর মোনায়েম খান ছিলেন অনুপস্থিত। আখেরে বক্তৃতামালা সংবলিত

পুস্তকটিও প্রকাশিত হয়নি। অনেকের ধারণা, বাঙালির মুক্তি সনদ ছয়-দফা প্রণয়নে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের মুখ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকার শ্রদ্ধেয় আবদুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করে এবং তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে একটি পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল। সংবাদপত্রে এই খবরটি পড়ে পাকিস্তানের 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক জেডএ সুলেরি একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের মতো ব্যক্তি কোনও মত পোষণ করেন তবে তাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

রাজ্জাক স্যার কস্মিনকালেও কোনও অন্যায়কে মেনে নেন নি, মুক্ত মনের এই মানুষটি কারও মুখ চেয়ে কথা বলার নিকৃষ্ট আর্ট চর্চা করেন নি, নিজের মনোভাব তিনি প্রকাশ করতেন কখনও মৃদু হেসে, কখনও দৃঢ় কণ্ঠে।

আমার সাংবাদিক সুহৃদ সালেহ চৌধুরীকে রাজ্জাক স্যার খুব পছন্দ করতেন। তারা দু'জনই দাবাড়ু বলে দু'জনের সম্পর্কে একটি আলাদা মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। আমি সালেহ চৌধুরীর সঙ্গে দু'একবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্যারের কোয়ার্টারে গিয়েছি। তাঁর বেশ কিছু কথা শুনেছি, কিন্তু আমার কবিতা বিষয়ে আমাকে কখনও কোনও কথা বলেন নি। তবে সালেহ চৌধুরীর সঙ্গে আমার অনুপস্থিতিতে শামসুর রাহমানের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে প্রচুর প্রশংসা করেছেন। একবার লিবিয়ায় একসঙ্গে গিয়েছিলেন তারা দু'জন। অবসর যাপনের সময়ে রাজ্জাক স্যার, সালেহ চৌধুরী আমাকে জানিয়েছেন, 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে বেশ কয়েকটি কবিতা নিজস্ব ঢাকাইয়া ভঙ্গিতে সুন্দর আবৃত্তি করেছেন। বেশ আগে ড. হুমায়ুন আজাদ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি দৈনিক পত্রিকায়। সেই সাক্ষাৎকারে রাজ্জাক স্যার নিজের পছন্দের দু'জন কবির নাম উল্লেখ করেছিলেন। উল্লিখিত কবিদ্বয়ের নাম — জসীমউদ্‌দীন এবং শামসুর রাহমান। লুকাব না, সেদিন আমি উল্লসিত হয়েছিলাম।

সম্ভবত আশির দশকের মাঝামাঝি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সম্মানিত সদস্য পদ দেয়া হয়। শুনেছি, আমার এই সম্মান প্রাপ্তির পেছনে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আগ্রহ সক্রিয় ছিল। রাজ্জাক স্যার নেই, তাঁর লেখা কোনও বইও নেই — যদিও কেউ কেউ তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে থিসিস লিখে ডক্টর উপাধি লাভ করেছে — তবে আমরা যারা তার সাহচর্য পেয়েছি, তাদের জন্যে রয়ে গেছে কিছু জ্বলজ্বলে স্মৃতি। আমরা কোনওদিনই তাঁর কথা ভুলতে পারব না। শুধু আমার নয়, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনসহ বহু দেশি-বিদেশি পণ্ডিতই তাঁকে স্মরণ করবেন, মনে মনে নিবেদন করবেন শ্রদ্ধা। আমি সৌভাগ্যবান যে তাঁর সময়ে বেঁচে ছিলাম। মৃত্যু রাজ্জাক স্যারকে যেমন দূরে সরিয়ে রাখত পারবে না আমাদের কাছ থেকে, স্মৃতি থেকে, তেমনি পারবে না অসামান্য কবিবন্ধু আবু জাফার ওবায়দুল্লাহকেও। তিনি বেঁচে আছেন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পাঠক-পাঠিকাদের স্মৃতিতে, চেতনায়। অত্যন্ত উজ্জ্বল তাঁর ছাত্রজীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি হাসিল করেছেন সগৌরবে। ক্যামব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনশাসনে এবং উন্নয়ন অর্থনীতির ডিপ্লোমার অধিকারী এবং সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো তিনি। তাঁর কর্মজীবনে তিনি যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন তা-ও সহজলভ্য নয়। তিনি জাতীয় সরকারের প্রশাসক, সচিব, রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছেন। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার আন্তর্জাতিক সহকারী মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। শেষের দিকে বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

কিন্তু আমাদের জীবনে বার বার তাঁর নাম উচ্চারিত হবে এ দেশের একজন প্রতিভাবান কবি হিসেবে। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত নরী হার'-ই আমাদের কাব্যসাহিত্যে সাড়া জাগিয়েছিল। এরপর দীর্ঘকাল তার কোনও কবিতার বই প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু যিনি জাতকবি, তার পক্ষে দীর্ঘকাল কলম গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। একদিন হঠাৎ বন্ধ্যা মাটি ফুঁড়ে প্রস্ফুটিত হবেই কবিতার ঝরনা। তাই, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে 'কখনও রঙ কখনও সুর', 'কলমের চোখ', 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি', 'সহিষ্ণু প্রতীক্ষা', 'বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'আমার সকল কথা' এবং 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গ্রন্থাবলির অন্তর্গত অনেক বিশিষ্ট কবিতা, যেগুলোর আবেদন সহজে ম্লান হওয়ার নয়।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শুধু একজন কবিই নন, তিনি প্রবল প্রেমিক, বন্ধুবৎসল, সত্যিকারের ভালো মানুষ। আমরা অনেকেই জানি, তিনি একজন অধ্যাপক হিসেবে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম প্রেমিকার ইচ্ছা পূরণের তাগিদেই সিএসপি হন, বেশ কিছুকাল পর মাহজাবীনও ওবায়দুল্লাহকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতে শুরু করে। এর আগে অবশ্য আমাদের কবিবন্ধু এবং তার প্রথমা স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দ্বিতীয়বারের মতো বাসর শয্যা রচিত হলো ওবায়দুল্লাহ এবং মাহজাবীনের। সুন্দর, সুখী সংসারে এল নতুন ছোট্ট অতিথি কাকাতুয়া। কন্যার নাম রেখেছিলেন খোদ পিতা। কয়েক বছর পর ওবায়দুল্লহার সরকারি বাসায় আমাদের কয়েকজনের আসর জমে উঠল। কবিতা পাঠ এবং কখনও কখনও কলিম শরাফী, মাহজাবীনের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা, পানাহার ও তুমুল আড্ডায় সময় যে কীভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারি নি। মনে হত পরম আকুলতায় পান করছি সময়, কবিতার সুধা। বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, রবিউল হুসাইন, অসামান্য কথাশিল্পী মাহমুদুল হক, রশীদ হায়দার এবং আরও কেউ কেউ নিয়মিত অতিথি ছিলেন। আমিও অনেক সুখকর সময় কাটিয়েছি সেই অনুপ্রেরণা সঞ্চারী আড্ডায়। কোনও কোনও সন্ধ্যারাতে আমাদের আসর বসত ওবায়দুল্লাহর সরকারি বাসার ছাদে। এই বাসাটি ছিল শেরাটন হোটেলের উলটোদিকে। বাসায় ঢোকার আগে দেখা হত কয়েকটি সবুজাভা-বিতরণকারী গাছের সঙ্গে, ছাদ থেকে দেখতে পেতাম জ্যোৎস্নার ঝলক-লাগা একটি পুকুর। চোখ জুড়িয়ে যেত। কয়েকটি ছড়ানো চেয়ারে বসতাম আমরা। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বলা বাহুল্য, আসরের মধ্যমণি। তবে আড্ডা জমে উঠলে আমরা প্রত্যেকেই অনায়াসে হয়ে যেতাম মধ্যমণি। এক সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত হল, আমরা একটি কবিতার আসরের আয়োজন করব প্রতি মাসে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হল 'পদাবলী'। রবিউল হুসাইন নির্ধারিত হলেন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে।

সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারি ইত্যাদির কোনও পদই সৃষ্টি করা হয় নি। প্রতিটি অনুষ্ঠানই বেশ জমে উঠত। অনতি-তরুণ, তরুণ এবং প্রবীণ কবিদের কেউ কেউ যুক্ত হলেন 'পদাবলী'র অনুষ্ঠানের সঙ্গে। কবিদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগও নিয়েছিল 'পদাবলী'। কাব্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'পদাবলী' পুরস্কার লাভ করেন আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ এবং সৈয়দ শামসুল হক। আমিও পুরস্কারটি পেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, ওবায়দুল্লাহ কর্মসূত্রে বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে 'পদাবলী'র পাট চুকে যায়। তবে কিছু মধুর স্মৃতির রেশ রয়ে গেছে আজ অব্দি। একটি কথা মনে পড়ে গেল। ওবায়দুল্লাহর সেই বাসার ছাদ থেকে দু'তিনটি গাছ এবং একটি পুকুরের শোভা আমাদের মুগ্ধ করত। ছোটো একটি মাদারের গাছ ছিল এবং সেই গাছে বছরে একবার ফুল ফুটত। আগুন রঙের ফুল। একটি রেইন ট্রি-ও ছিল সেখানে। এই গাছটির বাংলা নাম মেঘ-শিরিষ। আবু জাফর ওবায়াদুল্লাহ গাছটি নিয়ে একটি ভালো কবিতাও লিখেছিলেন। আজ সেই গাছগুলি নেই, কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহও নেই। সেই কাব্য সাধনায় তেনি শেষের দিকে পুরোপুরি সমর্পিত ছিলেন, লিখেছিলেন অসাধারণ কয়েকটি কবিতা, সেই কবিতার একটি আসর থেকেই এক সকালে প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে ফিরে আসাতে বাধ্য হন তিনি। হয়তো সেই অন্যায় অপমানের ভীষণ কীট তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বহুদিন নিশ্চেতন অবস্থায় শ্বাস টেনে একদিন চলে গেলেন প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেম ও আশঙ্কাময় দৃষ্টি থেকে দূরে, বহুদূরে — জানি না, কোনওদিন জানব না কোথায়!

## ॥ পঁচিশ ॥

কবিতা আমার ভালোবাসার বিষয়। একটি উৎকৃষ্ট কবিতা দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ক্ষুদ্রতা, ক্রমাগত মনুষ্যত্ব হরণকারী প্রবণতা, সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী মাতব্বরদের ফাঁপা, ফাঁকা বোলচাল থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় আনন্দলোকে, জীবনের অন্তহীন গভীরে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে টানে নি, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাও নয়, আমি মজেছিলাম তিরিশের কবিদের কাব্যসৌন্দর্যে, বিশেষত জীবনানন্দ দাশের কবিতার রহস্যময়তায়, গভীরতায়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার ফলে ইংল্যান্ডের কবিকুলের কবিতাবলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। অনুবাদের কল্যাণে ইউরোপের প্রধান কবিকুলের অসাধারণ, নানা ধরনের কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছিল তখন।

সন্দেহ নেই, এই কাব্যপাঠে আমি প্রচুর উপকৃত হয়েছি। কিন্তু এই সঙ্গে আমি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, আমাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে হবে আমার নিজের অন্তর্লোকে, আমার চারপাশের মানুষ এবং পরিবেশের দিকে। আমার সমাজ, চারপাশের লোকজন এবং নানা ঘটনাবলির দিকে নজর না রাখলে জীবনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে না। এ ব্যাপারে সবসময় আমি যে সফল হয়েছি, তা নয়। কখনও কখনও যোগসূত্র আমার অজান্তেই আলগা হয়ে গেছে। হঠাৎ কোনও ঝাঁকি খেয়ে আবার জেগে উঠেছি, চোখ মেলে দেখেছি চারদিকে।

যখন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন আমি রাজনীতি বিষয়ে আদৌ উৎসুক ছিলাম না। কোনও কোনও ঘটনা ঘটতে দেখেছি, সে বিষয়ে সামান্য কিছু জানতেও পেরেছি, কিন্তু তা আমাকে তেমন ভাবায়নি, যেন সেসব ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, যেন আমি অন্য কোনও গ্রহের বাসিন্দা। তবে একটি কথা বলব, বলতেই হবে আমাকে — মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আমাকে খুব বিচলিত করত। আগে আমার এক গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়ালের কথা বলেছি। তিনি একজন আদর্শবান, প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তখন আমি ক্লাস এইটে কিংবা নাইনে পড়ি। তিনি আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতেন, ধনী দরিদ্রের বৈষম্যের কথা, সাম্যবাদের কথাও বলতেন। সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না, কিন্তু কিছু কিছু কথা বেশ পরিষ্কার হয়ে ঠাঁই করে নিত আমার মনে। এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আজ যে আমি একজন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হয়ে উঠতে পেরেছি, তার ভিত্তিভূমিটি রচনা করেছিলেন আমার ছেলেবেলার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়াল। এই প্রসঙ্গে পগোজ স্কুলের শিক্ষক চিন্তাহরণ সোমের কথা না বললে ঘোরতর অন্যায় হবে। তিনি একজন ভালো শিক্ষক তো ছিলেনই, অসাম্প্রদায়িক চেতনায়ও ঋদ্ধ ছিল তাঁর চিত্ত। চিন্তাহরণ সোম এবং আমার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়ালের কথা আমি কস্মিনকালেও ভুলতে পারব না। কেননা, তাঁরা দু'জনই মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, সাবের রেজা করিম। হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আবুল মাল আবদুল মুহিত, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, তরীকুল আলম, বদরুদ্দীন উমর এবং মোস্তফা কামালের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু এদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে — যে-কারণে আমাদের দু'জনের উদ্দেশে 'মানিকজোড়' শব্দটি উচ্চারিত হত প্রায়শই।

হাসান হাফিজুর রহমান আজ নেই। তার অকাল মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। কত কথা মনে পড়ে, কত ঘটনা। হাসানের সঙ্গে একদিন দেখা না হলে কেমন অস্থির অস্থির লাগত। যদিও আমি প্রগতিশীল চেতনায় কিছু দীপ্ত ছিলাম, তবু মাঝে মাঝে কট্টর বামপন্থী সমালোচকবৃন্দ আমার কড়া সমালোচনা করতেন। তখন আমার সামনে ঢাল তুলে ধরতেন হাসান হাফিজুর রহমান। সেই ঢাল ভেদ করা সম্ভব হত না কারও পক্ষে। হাসান কখনও আমার কথায়, কবিতায়, অথবা কাজে প্রতিক্রিয়াশীলতার গন্ধ পেতেন না বলেই তিনি আমার পক্ষ গ্রহণ করতেন। তিনি আমার ভাবনায় এক ধরনের ঔদার্য্য লক্ষ করেই তার এই স্বল্পভাষী বন্ধুটিকে বাক্যবীরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন। আমি যে সেকালে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, বদরুদ্দীন উমর, তরীকুল আলম এবং মোস্তফা কামালের সঙ্গে মেলামেশা করতাম তা কোনও কোনও প্রগতিপন্থী ছাত্র ভালো চোখে দেখতেন না। তা বলে আমি তাদের সংসর্গ ত্যাগ করি নি। কারণ, তাঁরা আমার চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি কখনও এবং আমি যে চটজলদি মত পালটাবার লোক নই, এটা তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন।

মোদ্দা কথা, আমি কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লেখাবার প্রেরণা বোধ করি নি কোনও কালে। আমি আমার বিশ্বাসে অটল রয়েছি সবসময়। মত পরিবর্তন করার যথেষ্ট কারণ না থাকলে, পরিবর্তনের পক্ষে প্রবল যুক্তি না থাকলে প্রগতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দিই নি না সেকালে, না একালে। প্রায়শই আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি বিচ্যুত হয়েছি প্রগতির পথ থেকে? অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে? মানবকল্যাণের আদর্শ থেকে? এখনও, এই তেয়াত্তর বছর বয়সে পা রেখেও বলতে পারি, আমি এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হই নি আমার মতাদর্শ এবং মানবিক বোধ থেকে।

দলীয় রাজনীতি আমাকে কখনও আকর্ষণ করত না। যে রাজনীতি মানুষের সবরকম বন্দিত্বকে ঘুচিয়ে দেয়, যে রাজনীতি প্রগতিশীল চেতনায় সমুজ্জ্বল, যে রাজনীতি পশ্চাৎপদতাকে পরিহার করে, যে রাজনীতি মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত, আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই মতাদর্শের পক্ষে থাকব, কিন্তু কোনও বিশেষ দলের কুক্ষিতে আটকা পড়তে আমার চরম অনীহা। জানি আমার এই উক্তি কাউকে কাউকে ক্ষুব্ধ করবে, ক্রুদ্ধ করবে। কিন্তু আমি কিছুতেই মিথ্যা কথা বলে নিজেকে প্রতারিত করতে চাই না।

তবে একথাও তো সত্য, রাজনীতি বিষয়ে ষোলো আনা অনাগ্রহী হয়ে থাকাও সম্ভব নয়। রাজনীতির আঁচ শরীর ও মন দুটোকেই স্পর্শ করে, কাউকে হালকাভাবে ছুঁয়ে যায়, কাউকে নাড়িয়ে দেয় প্রবলভাবে। আমাকে হালকাভাবে ছুঁয়ে যায়, অন্তত যৌবনে তা-ই যেত।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের কথা মনে পড়ছে। সেই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট তার প্রেরণা হিসেবে পেয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে যুক্তফ্রন্ট তার কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করেছিল ২১ দফা। এই ২১ দফা খসড়ার প্রণেতা ছিলেন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ। এই স্মরণীয় ২১ দফায় ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, প্রদেশের জন্য বেশি স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনে বাঙালির বেশিসংখ্যক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়। ২১ দফায় সকল দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, বলা যাবে না। দু'তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির কথা উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও ২১ দফার দাবিগুলো ভোটারদের সুখী করেছিল। খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তারা।

নির্বাচনের ফল ছিল সাড়া জাগানো। শোচনীয় পরাজয় হয় মুসলিম লিগের এবং যুক্তফ্রন্টের অসামান্য বিজয় ঘোষিত হয়।

এই নির্বাচনের ফলাফল জানবার ইচ্ছা যে প্রবল ছিল আমার মনে, একথা না বললেও চলে। ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছি। আরও অনেকের মতো আমিও যুক্তফ্রন্টের বিজয় দেখতে চেয়েছিলাম নির্বাচনে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষণকালের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের অবসান হল।

দু'তিন দিন পর আবার ফিরে গেলাম খাতার কাছে। কবিতা লেখার খাতা কি ছিল আমার? সেকালে? হয়তো ছিল, হয়তো আলগা কাগজের বুকেই পাগলের মতো পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি সাজিয়ে যেতাম। কত বিনিদ্র রাত ভোর হয়েগেছে শব্দ ও ছন্দের দ্বন্দ্ব মেটাতে গিয়ে। হয়তো রাত দশটায় ঘুমোতে গিয়েছি, গা এলিয়ে দিয়েছি বিছানায়, কিন্তু এক লহমায় চোখ থেকে গায়েব হয়ে গেল ঘুম, কবিতার নতুন পঙ্ক্তি গুনগুনিয়ে উঠল হৃদয়ের বাগানে। পঙ্ক্তিটিকে স্থাপন করলাম সাদা কাগজে, তারপর আরও এক পঙ্ক্তি। এভাবেই হয়ে উঠল একটি কবিতা। কোনও কোনও কবিতা লেখা হয়ে যায় দু'তিন ঘন্টায়, আবার কোনও কোনও কবিতা গিলে ফেলে চার পাঁচটি দিন। আবার কোনও কোনও কবিতার দু'তিনটি পঙ্ক্তি রচিত হওয়ার পর সেটি বহু না-লেখা কবিতার ভিড়ে হারিয়ে যায়। যা হোক, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনটির ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পর আমার কবিতা রচনায় জোয়ার এসে গেল যেন। তবে মাঝে মাঝে বিরতির ছায়াও পড়ল।

এই কথাগুলো লিখতেই মনে পড়ে গেল ৩০ নম্বর আশেক লেনের পুরনো বাড়ির কথা, ইউনিভার্সেল প্রেসের কথা, কমরেড লাইব্রেরির কথা। আমার পিতামাতার ভাইবোনের, আমার স্ত্রী ও সন্তানদের এবং আমার নিজের কত স্মৃতি জড়িত সেই বাড়িটির সঙ্গে। কী করে ভুলব সেসব দিনের কথা? অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি সেই বাড়িতে। কত কবিতাই না লিখেছি, কত রাত-জাগা প্রহরই না আমার কেটে গেছে কবিতা পড়ে আর কবিতা রচনা করে। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে উঠোনের মাটি, সবুজ ঘাস, ঘাসে সাদা বেড়ালের বিশ্রাম, ফুলের গাছ, গেটের শরীরে নীল অপরাজিতা ফুলের গাছের লতার জড়িয়ে থাকা। বর্ষার মওসুমে উঠোনে এক হাঁটু পানি, রাস্তার হালও তথৈবচ। মনে পড়ে, চওড়া বারান্দায় আম্মার পায়চারি, দূরের চাঁদ আর তরার ঝিলিমিলি দেখা। রাতে বাড়ি ফেরার সময় আমাদের গেটে সামনে গলিবাসী এক মাতালের নিরীহ মাতলামি, আর আবোলতাবোল কথা, কমরেড লাইব্রেরির নিষ্ঠাবান কর্মচারী টুপি-পরা সিরাজ মিয়ার ঝুঁকে পাঠ্যপুস্তকের প্রুফ দেখা, বিকেলবেলা ইউনিভার্সেল প্রেসের অফিস-কামরায় আব্বার বসে-থাকা আর আমাদের গ্রাম পাড়াতলী থেকে আসা অতিথির সঙ্গে আলাপে মগ্ন হওয়া — অনেক কিছুই ফুটে ওঠে স্মৃতির আয়নায়।

সিরাজ মিয়া বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন। আব্বা কাজের ফাঁকে তার সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতেন। সিরাজ মিয়া আব্বাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন — দূর থেকে দেখে মনে হত না একজন মালিক এবং অন্যজন কর্মচারী। দৃশ্যটি আমার ভালো লাগত। আমি আব্বার দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টাশীল ছিলাম বেশিরভাগ সময়। পরীক্ষা দিই না, এম.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েও পরীক্ষার হল থেকে দূরে থাকি।

ইতিমধ্যে বন্যার উদাসীনতা এবং সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপনের বাসনা আমাকে দূরে ঠেলে দেয়, শুরু হয় বন্যার নতুন সংসার। আমি আহত, ব্যথিত পড়ে রইলাম নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণাদগ্ধ দিনরাত্রি কাটাবার জন্যে। কিছুদিনের মধ্যে হৃদয়ের ক্ষত শুকিয়ে এল। বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকি, কথা বলি নিজের সঙ্গে, কবিতার খাতার সঙ্গে। আমার এক

বোনের বিয়েতে দূরসম্পর্কের একজন আত্মীয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল আমার। ওর চেহারার মাধুর্য, চোখের দৃষ্টি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনও কথা হয় নি। জোহরা ওর নাম। আমার মেজো ভাবির নিকট আত্মীয়া সে। পরিচয়ের এটুকুই সূত্র। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসত। আমি দূর থেকে ওকে দেখতাম, সে-ও কখনও সখনও বারান্দায় এসে আমার দিকে তাকাত। মনে হত আমি যে ওকে পছন্দ করি, তার জন্যে আমার এক ধরনের টান আছে, তা সে বুঝতে পেরেছিল। বেশ পরে জানতে পেরেছিলাম, সে ওর আম্মার সঙ্গে আমাদের আশেক লেনের বাড়িতে আসার জন্যে বাহানার আশ্রয় নিত।

এবার আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে আবার ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের দিনগুলোর রৌদ্রছায়ায়। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই বছরের ২৬, ২৭ এবং ২৮ মার্চে। এই বিশিষ্ট সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন এবং আবদুল গণি হাজারী; সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান আর সহ-সভাপতি ছিলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেগম সুফিয়া কামাল, মুজিবর রহমান খান এবং কামরুল হাসান।

সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলা থেকেই প্রতিনিধি যোগদান করেন। চট্টগ্রাম থেকে আসেন সর্বাধিক প্রতিনিধি। চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কলিম শরাফী। তিনি গণসঙ্গীত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাহবুব আলম চৌধুরীও যোগদান করেন সম্মেলনে। তখন তিনি ১৯৫২ সালে রচিত ‘কাঁদতে আসি নি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ শীর্ষক কবিতার রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত। সেকালে তিনি ‘সীমান্ত’ নামে একটি রুচিসম্মত সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ‘সীমান্ত’ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। সেই সম্মেলনেই মাহবুব আলম চৌধুরীর সঙ্গে কায়সুল হক এবং আমার পরিচয় ও আলাপ হয়। মনে পড়ে, সীমান্তে আমিও কবিতা লিখেছিলাম।

সম্মেলনে কবি জসীমউদ্‌দীন আধুনিক কবিতার বিপক্ষে বলতে গিয়ে আমার সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন; অভিযোগ উত্থাপন করেন দুর্বোধ্যতার এবং আমার কবিতা মাটি-সংলগ্ন নয় বলে রায় দেন। তাঁর বক্তব্যের জন্যে উপস্থিত তরুণ কবিদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় ‘নক্সীকাঁথার মাঠ’-এর কবিকে। বাকবিতণ্ডার কারণে সম্মেলনের কয়েক বছর পরে শ্রদ্ধেয় জসীমউদ্‌দীনের বাসায় গিয়েছিলাম সৈয়দ শামসুল হক এবং আমি। সেদিন তিনি আমাদের আপ্যায়ন করেন মিষ্টান্ন এবং তাঁর তখনও অসমাপ্ত আত্মজীবনীর অনেকগুলো পাতা পাঠ করে। আমরা কয়েকটি ঘন্টা খুব উপভোগ করেছিলাম। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কবি নবেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ‘পরিচয়’ পত্রিকার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি সাহিত্যিক যোগদান করেন। এদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ, আকর্ষণীয়, মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এখানে সবিনয় নিবেদন করতে চাই, আমিও এক অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। শ্রোতা-দর্শকদের করতালির পর স্টেজ থেকে নেমে এসে শ্রোতাদের দৃষ্টির আড়ালে স্টেজের পিছনে আমাকে এক অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় — হতচকিত আমার দিকে মারমুখো মূর্তিতে এগিয়ে আসছেন কবি আশরাফ সিদ্দিকী। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিশর্মা আশরাফ সিদ্দিকীকে দু'হাতে ধরে দূরে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে ক্রুদ্ধ কবি জানিয়ে গেলেন, তার উপস্থিত ভক্তকুল নির্দেশ পেলেই আমাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে বেহুঁশ করে দিতে পারে। আমি অবশ্য তার শাসানিতে বিচলিত হই নি। আমার প্রবন্ধে তার হালের কবিতা বিষয়ে সামান্য বিরূপ মন্তব্য ছিল। এখন যখন আশরাফ সিদ্দিকী এবং আমার উভয়েরই বিস্তর বয়স হয়েছে, তার সেই ক্রোধ আর নেই। তিনি আমাকে বর্তমানে, যতদূর মনে হয় পছন্দই করেন। আমিও তাঁকে অপ্রসন্ন কবতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করি না। আমাদের সম্পর্ক এখন ভালো এবং স্বাভাবিক।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দপ্তর আমরা মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের সৌজন্যে বানিয়ে রেখেছিলাম 'সওগাত' অফিসের একটি কামরাকে। সেখানেই সম্মেলনে যোগদানকারী পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই অভ্যর্থনা আয়োজনের ব্যয়ের সিংহভাগ সংগ্রহ করে দেন কবি সানাউল হক। তখন তিনি নারায়ণগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক। সানাউল হক উঁচুপর্যায়ের সরকারি আমলার দায়িত্ব পালন করার পরও আমৃত্যু সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। এ দেশের প্রবীণ ও নবীন বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় কবিতাপাঠের আসর বসত। আমরা কয়েকজন সেই আসরে কবিতা পড়েছি, কবিতাবিষয়ক আলোচনা করেছি। তিনি নিজেও তাঁর সদ্যলেখা কবিতা আমাদের শোনাতেন। সেসব কবিতাময় রাতের কথা ভুলব না।

## ।। ছাব্বিশ ।।

আমি সংগঠন বিলাসী নই, কখনও ছিলাম না। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে ভালো লাগত, ভালো লাগত নির্ভেজাল আড্ডা দিতে। জীবনে লেখাকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। কখনও ঘরের এক কোণে টেবিলে ঝুঁকে, কখনও-বা বিছানায় শুয়ে বালিশে বুক পেতে লিখতাম অনেক আগে। এখন টেবিলে ঝুঁকেই লিখি। বিছানায় গা এলিয়ে লেখার বিলাসিতাটুকু বর্জন করেছি ঘুমের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। কোনও সংগঠনের সঙ্গে সামান্য যুক্ত থাকা, অথবা সংগঠনটির একজন প্রধান ব্যক্তি হয়ে থাকার দুর্দমনীয় সাধ লক্ষ করেছি অনেকের মধ্যে। আমার এমন সাধ-আহ্লাদ ছিল না। তবে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও দূর-অতীতে এবং নিকট-কালে বৃহত্তর স্বার্থে কোনও কোনও সংগঠনে যুক্ত হতে হয়েছে আমাকে। ১৯৫১ সালে আমি যুক্ত হয়েছিলাম একটি সংগঠনে। আমার বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান একজন নিষ্ঠাবান, উদ্যোগী সচেতন সাহিত্যিক ছিলেন। সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারেও তার উদ্যম ও নিষ্ঠার কোনও কমতি আমি লক্ষ করি নি। প্রচুর খাটতেও পারতেন তিনি। তাছাড়া প্রায়

সবাই তার প্রস্তাব গ্রহণ করতেন অম্লান বদনে। নেতৃত্বের সহজাত গুণ ছিল তার। কখনও কখনও নিজেকে অন্তরালে রেখেও নেতৃত্বের মূল কাজটি করতে পারতেন।

আমি তার প্রবল অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারি নি বলেই পাকিস্তান সংসদের সদস্য হতে সম্মত হয়েছিলাম। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয় ১৯৫১ সালে। এই সংগঠনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন কাজী মোতাহার হোসেন। বেগম সুফিয়া কামাল, কামরুল হাসান, অজিত কুমার গুহ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং আবদুল গণি হাজারী সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয় ফয়েজ আহ্‌মদের ওপর। ফজলে লোহানী, সরদার জয়েনউদ্দীন, লায়লা সামাদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান এবং আমাকে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদে নির্বাচিত করা হয়।

১৯৫২ সালে 'সওগাত' অফিসে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের যে অধিবেশনগুলি অন্তত মাসে একবার অনুষ্ঠিত হত, সেখানে কেউ কবিতা, কেউ গল্প, কেউবা প্রবন্ধ পাঠ করতেন। উপস্থিত লেখকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সমালোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এ রকম এক অধিবেশনে আবদুল গণি হাজারী তাঁর কবিতা পড়ে শোনালেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি উপস্থিত লেখকদের মধ্য থেকে কাউকে পঠিত কবিতাটির সমালোচনা করার অনুরোধ জানালেন। সকলেই খুব দ্বিধাগ্রস্থ। অবশেষে কবি আমাকেই অনুরোধ করলেন, 'শামসুর রাহমান, আপনি কিছু বলুন'। কবিতাটি আকারে তেমন দীর্ঘ ছিল না। আমিও দ্বিধান্বিত ছিলাম। আসলে কোনও কবিতা একবার পড়ে বা শুনে গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনা করা সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি। যেহেতু সভাপতির অনুরোধ রক্ষা না করা অশোভন, তাই কবিতাটি আবদুল গণি হাজারীর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। বার দুয়েক পড়ে কবিতাটির শব্দ নির্বাচন সম্পর্কে আমার ভালো-লাগার ব্যাপারটি অল্প কথায় প্রকাশ করলাম। খোদ রচয়িতা আমার বক্তব্য সানন্দে মেনে নিলেন। আমার আপত্তির কোনও প্রতিবাদ তিনি করেন নি। তাঁর এই মনোভঙ্গি আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেদিন ঐ কবিতাটি নিয়ে অন্য কেউ আলোচনা করেন নি।

সেদিনের পর আরেক দিনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এই ঘটনাই বলে দেবে কত মজার ব্যাপারই না ঘটত আমাদের সেই পাঠচক্রে! যেদিনের কথা লিখছি সেদিনের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং কৃতী নাট্যকার নূরুল মোমেন। রম্যসাহিত্য স্রষ্টা হিসেবেও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। সেদিনের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন আবদুল্লাহ আল-মুতী। কবিতা পড়েন ফজলে লোহানী এবং যতদূর মনে পড়ে, আলাউদ্দিন আল আজাদ একটি গল্প শোনান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। রংপুর থেকে এসেছিলেন কায়সুল হক। অনুষ্ঠানের পরিচালক কায়সুল হককে কিছু আলোচনা করার অনুরোধ জানান। বিপত্তিটা ঘটালেন আলোচক। তিনি আলোচনায় নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগটি পিছিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সভাপতির আসন

থেকে স্বয়ং নূরুল মোমেন আপত্তি ক'রে বসলেন। কিন্তু কায়সুল হকও পিছু হটবার পাত্র নন। তিনি নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস' নাটকটির প্রসঙ্গ টেনে অনেক কথাই বলেন। কায়সুল হকের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেই সভাপতির ভাষণ। সেই ভাষণে সভাপতি তাঁর নাট্যচর্চার কথা সবিস্তারে বলতে গিয়ে প্রশ্ন রাখলেন আলোচককে লক্ষ করে, 'রবীন্দ্রনাথ আমার নাটকের যে প্রশংসা করেছিলেন তা কি আপনার চোখে পড়ে নি? আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় কলকাতার একজন নামজাদা সাহিত্যিকের লেখা বাদ দিয়ে আমার নাটক পত্রস্থ হয়েছিল, আপনারা কি তা' জানেন?' নূরুল মোমেনের কথাবার্তা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হত। তাঁর আত্মকথার খানিকটা অংশ জানতে পেরে মন্দ লাগে নি। বেশ উপভোগ্য হয়েছিল সেদিনের অধিবেশন, যে জন্য কৃতিত্বের প্রায় সবটাই দাবি করতে পারতেন নূরুল মোমেন। সেই অধিবেশনে 'বাইদামারার ঝড়' শীর্ষক নিজের লেখা কবিতা 'অগত্যা' পত্রিকার সম্পাদক ফজলে লোহানী নিয়ন্ত্রিত আবেগমণ্ডিত ভঙ্গিতে পড়েছিলেন। কবিতাটির আলোচনা হতে পারে নি সময়াভাবে। কেননা, সেদিন খোদ সভাপতি নিজের বিষয়ে বলতে গিয়ে সময়ের সিংহভাগ খরচ করে ফেলেছিলেন নির্বিকার চিত্তে।

এতকাল পরেও নূরুল মোমেনের স্মৃতি বারবার মনের দিগন্তে জেগে ওঠে। এক ধরনের সুন্দর হাসি ফুটে উঠত তাঁর মুখে। অনেক কথা বলতেন, তার ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে গেলে খুব খুশি হতেন। কথার খই ফুটত তাঁর মুখে; মজা করে কথা বলার একটা নিজস্ব ঢং ছিল তাঁর। আমি একজন মনোযোগী ভালো শ্রোতা, তাই তিনি অবিরাম কথা বলে যেতেন। তবে মিষ্টান্ন, কেক আর চা না খেয়ে কোনও দিন তাঁর ড্রইংরুম থেকে বেরুনো যেত না।

যত ঘোরাঘুরিই করতাম, আড্ডা দিতাম, কবিতাকে অবহেলা করি নি কোনও দিন। কারণ, কাব্যলক্ষ্মী যে বিন্দুমাত্র অমনোযোগ কিংবা অবহেলা বরদাশত করেন না, তা আমার জানতে বাকি ছিল না। যখন যেখানেই যাই না কেন, ইয়ারদের সঙ্গে যত গল্পগুজবে মেতে থাকি না কেন, হঠাৎ দৃষ্টিপথে ভেসে উঠত কাব্যলক্ষ্মীর উপস্থিতি। আসরের অন্য কেউ টের পাক আর না-ই পাক আমি স্পষ্টতই দেখতাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে, তার দৃষ্টিতে কখনও ক্রোধ, কখনও অভিমান, কখনও-বা কোমল, মধুর হাসি। আমি যতদূর সম্ভব তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি, বুঝি তাই তিনি হাজির হয়েছেন আমার চলার পথে, আমার বিশ্রামের প্রহরে, বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকারে, সুখে, অসুখে। অনুপম আবেগে আলিঙ্গনে আমাকে বেঁধেছেন অক্লান্তভাবে। আবার অকারণেই বিরূপ হয়েছেন আমার প্রতি, দেখা দেন নি বেশ কিছু দিন। কিন্তু আমার বেদনা, তার জন্য গভীর আকুতি, তাকে পাওয়ার ব্যাকুলতা কাব্যলক্ষ্মী টের পেয়ে আবার আমার বুকে লগ্ন হয়ে তার ঠোঁট ঘষে, আমার বাস্তবকে আলোড়িত ক'রে ভিন্ন বাস্তবে নিয়ে যান — যেখানে আমি চাঁদের ডিঙিতে সওয়ার হয়ে বৈঠা চালিয়ে মেঘের ভিতর নতুন সৌন্দর্য তৈরি করি, পৌঁছে যাই নক্ষত্র সমাজে, যেখানে ধ্বনিত হচ্ছে মানবতার গীতিমালা। সেই সব মুহূর্তে আমি কলম না ধরে, খাতার সাদা পাতায় কবিতার পঙ্‌ক্তিমালার জন্মদিন পালন না করে স্থির থাকতে পারি না।

এভাবেই আমি কবিতা লেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। কত উদ্বিগ্ন দিন, কত বিনিদ্র রাত কাব্যলক্ষ্মী আমাকে নিয়ে খেলা করেন, যেমন বিড়াল ইঁদুরকে নিয়ে মেতে ওঠে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, নিজের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করার পর পেয়ে যাই কাব্যলক্ষ্মীর বর, ক্রমশ পুষ্পিত হয়ে ওঠে কবিতার খাতা। সেই পুষ্পরাজি কারও কারও মন জয় করে, আবার কারও কারও ধিক্কারে মলিন হয়ে ওঠে। আসলেই সেসব কি আমার প্রয়াসের অনুপম কুসুম নাকি ব্যর্থতার আবর্জনা — কে বলবে? কাল যে বড়ো নির্দয়, বড়ো উদাসীন। তবু যে লেখনীকে সক্রিয় রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তার কারণ, সাধনায় আমি বিশ্বাসী। তা' ছাড়া কাব্যলক্ষ্মী কারও উপেক্ষা কিংবা অবহেলা বরদাশত করেন না। কোনও জানান না দিয়েই তার কাছ থেকে দূরে সরে যান।

যখন প্রথম লিখতে শুরু করি তখন অতশত বুঝতে পারি নি। একটি প্রবল ইচ্ছা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে কিছু পঙ্‌ক্তিমালা। সে সব পঙ্‌ক্তি যে আমার ভেতরে প্রকাশিত হওয়ার জন্য থরথর করত, তা কি আগে ভাগে জানতাম? কস্মিনকালেও না। শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পেরেছি, এই আনন্দটুকু সম্বল করেই আমার কাব্যযাত্রা শুরু। তবে এই আনন্দ যে আজ অব্দি বজায় রয়েছে তার কারণ আমার স্বপ্ন, আমার কাছের জগত, দূরের হাতছানি, নানা গ্রন্থের সাহচর্য, আপনজনদের সান্নিধ্য, চেতনাকে জাগ্রত রাখার অক্লান্ত প্রয়াস। বহু মন্তব্যের হামলা, সুহৃদদের সহানুভূতি এবং বরাভয়, নানা কোমল দৃষ্টির অনুরাগ আমাকে চলার পথে দুর্লভ পাথেয় জুগিয়েছে। আমার জনক, জননীর অকৃত্রিম স্নেহ, তাঁদের আশ্চর্য সহনশীলতা, অসীম শুভেচ্ছা আমাকে সংসারের নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশেষ করে আমার মায়ের সহনশীলতা ছিল অসামান্য। তাঁর অনেক কথা, আচরণ, ঔদার্য কারও কারও শত্রুতাকেও হাসি মুখে মেনে নেয়ার, ধৈর্য আমাকে ঘোর অন্ধকারেও আলোর সন্ধান দিয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আমার 'রূপালি স্নান', 'মনে মনে', 'তার শয্যার পাশে' ইত্যাদি কবিতা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা'য় প্রকাশিত হয়। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলছি। একদিন কলকাতায় 'কবিতাভবনে' বুদ্ধদেব বসু আমাকে আলাপ আলোচনা কালে একটি কথা বলেছিলেন 'কবিতা'র ১৯৫২ সালের জুন মাসের সংখ্যাটির বিষয়ে। সেই সংখ্যায় আমার 'মনে মনে' এবং 'তার শয্যার পাশে' শীর্ষক দু'টি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় রাহা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অরুণ কুমার সরকার, রাজলক্ষ্মী দেবী, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু সংখ্যাটি শুরু করতে চেয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা দিয়ে। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমার কবিতা দু'টি দিয়ে 'কবিতা' পত্রিকার সেই সংখ্যাটি শুরু করার পরামর্শ দিলেন বুদ্ধদেব বসুকে। কারণ, তাঁর মতে আমার কবিতা দু'টিই সেই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাই, বুদ্ধদেব সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতটিকেই সম্মান জানালেন। প্রকৃত কবি এবং উদারচিত্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয় নি। কিন্তু তাঁর কথা আজও আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। এরকম ব্যক্তির বড়োই অভাব আজকের পৃথিবীতে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকাতেও আমার কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'পূর্বাশা'র প্রতিটি সংখ্যা শুরু হত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ

দিয়ে। এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই পত্রিকার। একবার রীতি ভঙ্গ করে সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'পূর্বাশা'র একটি সংখ্যা শুরু করেছিলেন আমার 'এ্যাপোলোর জন্যে' কবিতাটি দিয়ে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যস্রষ্টা ও গুণীজনের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি পেয়েছি একজন তরুণ কবি হিসেবে।

আমার জীবন থেকে বন্যার প্রস্থানের পর কিছুদিন আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। সেই সময় বিষণ্ণতা আমাকে অনেক কিছু থেকে বিযুক্ত করে ফেলেছিল, এমনকি কবিতাও আমাকে কোনও সান্ত্বনা দিতে পারছিল না। টেবিলের সান্নিধ্য থেকে দূরে ঢাকার কোনও কোনও রাস্তায় উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতাম। এড়িয়ে চলতাম বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য। মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন পর জোহরাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিলাম আমার এক বোনের বিয়েতে। বিদ্যুচ্চমকের মতো ছিল ঘটনাটি। সে-ও আমার দিকে তাকিয়েছিল কয়েকবার, হয়তো আমার দৃষ্টিতে সে আনন্দের আভা দেখতে পেয়েছিল। এ-কথা আমি আগেও বলেছি। এই ক্ষণিকের চক্ষুমিলন আমাকে বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি দিল, ফিরিয়ে আনল কবিতার আলিঙ্গনে। আমি আবার কবিতার প্রতি, মানুষের প্রতি আগের মতোই আগ্রহী এবং অনুরক্ত হয়ে পড়লাম। আমি আবার একটি দু'টি করে কবিতা লিখে পত্রিকায় ছাপতে দিলাম। সময় এগোতে থাকে এবং সেই সঙ্গে জোহরাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছাটিও ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। ব্যাকুলতা মানুষকে দখল করে ফেললে সে তার অস্থিরতাকে বশ করতে পারে না। আমি নিরুপায় হয়ে জোহরাদের নাজিমুদ্দিন রোডের বাড়ির ঠিকানায় ডাকে জোহরাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, সেই পত্র আগাগোড়া প্রেমপত্র ছিল। পত্রটি লেখা হয়েছিল সহজ বাংলা ভাষায়, নইলে হয়তো চিঠির মর্মার্থ জোহরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, সেই চিঠি তার কাছে পৌঁছে নি, যা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। হয়তো এমনও হতে পারে যে, ওর কোনও গুরুজনের হাতে চিঠিটি পড়েছিল এবং তিনি সেটি কুটি কুটি করে ছুড়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। হয়তো ডাকঘরের গাফেলতির দরুন আমার মনোনীতার হাতের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেই হতভাগ্য পত্র। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে ভাবীকে আমার অপ্রতিরোধ্য বাসনার কথা বলে ফেললাম। তাঁর আত্মীয়াকে আমার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার কথা বললাম। আমার কথা শুনে ভাবী মৃদু হাসলেন। আমার পীড়াপীড়িতে তিনি বাধ্য হয়ে ব্যাপারটি আমার আম্মাকে বলেন এবং পরে জোহরার আব্বা মোহাম্মদ নবী বখ্‌শ্‌কে জানান। নবী বখ্‌শ্‌ প্রস্তাবটিকে প্রথমে আমল দেন নি, কিন্তু কিছুদিন পর জোহরা এবং আমাকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখতে রাজি হলেন। আব্বার সম্মতি আদায় করেন আম্মা। আমি ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসের আট তারিখে নওশার সাজে সজ্জিত হই। তখনও আমি একজন বেকার যুবক, তবু আব্বা তার নিষ্কর্মা, অপদার্থ কবিতা-লিখিয়ে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করেন মোটামুটি শান-শওকতের সঙ্গে। নিজেকে রীতিমতো যুগপৎ সুখী এবং অপরাধী মনে হল। অপরাধী এ জন্য যে, সংসার চালানোর কোনও অবলম্বন আমার নেই, অথচ আব্বার এতগুলো টাকা খরচ করিয়ে দিলাম। আমার বিয়েতে ক'জন বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন আমার আনন্দে শরিক হতে।

সবার নাম মনে পড়ছে না, তবে ঔপন্যাসিক রশীদ করীম, হাসান হাফিজুর রহমান, মোশতাক আহমদ ও তরীকুল আলম এসেছিলেন, আর কেউ কি এসেছিলেন? হয়তো, হয়তো নয়।

বাসর রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা সহজ নয়। এই প্রথমবার আকাঙ্ক্ষিতা যুবতির সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করা, তার সঙ্গে কিছু কথা বলা, তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে চুম্বন করা, শয্যাসঙ্গিনীর মধুর হাসি উপহার পাওয়া, ফুলের সুঘ্রাণ — এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমি বেশ কিছু কথা বলেছিলাম সে-রাতে, কিন্তু তার মুখ ছিল বাক্যহীন। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই।

## ॥ সাতাশ ॥

বিয়ের এক বছর মহানন্দে কেটে গেল। প্রথম সন্তান সুমির জন্ম হল শ্বশুরবাড়িতে; নাজিমুদ্দিন রোডে। উৎসব হল, সবার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কয়েক মাস নিশ্চিন্ত মনে হালকা হাওয়ায় ভেসে কাটিয়ে দিলাম। সুমির জন্মদিনে আমাদের অঞ্চলের প্রথম কবিতাপত্র 'কবিকণ্ঠ' প্রাকশিত হল ফজল শাহাবুদ্দীন এবং আমার যুগ্ম সম্পাদনায়। সত্যের অনুরোধে বলা দরকার, ফজল শাহাবুদ্দীনের অদম্য উৎসাহ এবং অর্থব্যয়ের সঙ্গতি না থাকলে আমাদের পরিকল্পনা হাহাকার হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাই ছিল আমাদের আদর্শ। বুদ্ধদেব বসুর কাছে 'কবিতাকণ্ঠে'র জন্যে একটি কবিতা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলাম। চিঠির উত্তর পেলাম, কিন্তু বঞ্চিত হলাম তার কবিতা থেকে। তিনি অপরাগতা জানালেন কবিতা রচনায় তাঁর সাম্প্রতিক খরার কথা উল্লেখ করে। জীবনানন্দ দাশ জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর একটি অপ্রকাশিত কবিতা আমাদের না হলে চলবে না। কায়সুল হক তখন ঢাকায় 'কাফেলা' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের দায়িত্বে ব্যস্ত। তার শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাদের দু'জনেরই সুহৃদ সুরজিৎ দাশগুপ্তকে জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। জীবনানন্দ জীবিত থাকলে তাকে আমি চিঠি লিখতাম একটি কবিতার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাদের বিমুখ করতেন না। যদিও তাঁর সঙ্গে একবারই দেখা করতে পেরেছিলাম কলকাতায়, তবু কেন জানি আমার ভেতর এই বিশ্বাস বাসা বেঁধেছিল।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত অল্প সময়ে জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা 'কবিকণ্ঠে'র জন্য পাঠাতে পেরেছিলেন। কবিতাটির নাম 'আবার আসিব ফিরে'। সেই কবিতাটি পেয়ে, না লিখলেও চলে, আমরা অতিশয় আনন্দিত এবং কৃতার্থ হয়েছিলাম। আমাদের দীন-দরিদ্র কবিতাপত্রের প্রথম পাতাটি ধনী এবং আলোকিত হয়ে উঠেছিল। কবির এই অসামান্য পরোক্ষ দানে আমরা কতটা কৃতজ্ঞ-বিহ্বল হয়েছিলাম তা তিনি জেনে যান নি, এ কথা ভাবলে আজও মন খারাপ হয়। যাই হোক, কবিকণ্ঠে প্রকাশিত হওয়ার পর তারিফ এবং বদনাম দুটোই জুটেছিল আমাদের ঝুলিতে। সম্ভবত বদনামের ওজনের দিকটিই ছিল ভারি। আমরা তা' গায়ে মাখি নি। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠি। ফজল শাহাবুদ্দীনের উৎসাহই ছিল অধিক। তবে, দ্বিতীয় সংখ্যাটি আখেরে প্রকাশিত হলো এক যুগ পরে। লেখার অভাবের জন্য নয়, অর্থের অনটনের দরুন। হয়তো

আমাদের উদ্যমেও ভাটা পড়েছিল। অনেক আগে টাকাকড়িকে আমি তেমন আমল দিই নি। কিন্তু আমার প্রথম সন্তান সুমির জন্মের পর থেকে অর্থ যে কত অর্থময় তা' একটু-আধটু টের পেতে শুরু করি। তা ছাড়া স্ত্রীর এমন কোনও কোনও জিনিসের প্রয়োজন হয় যা সে মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না, নীচু স্বরে শুধু আমাকেই জানাতে পারে। কবিতা লিখে কোনও কোনও পত্রিকা থেকে সামান্য কিছু পাই তা' দিয়ে প্রয়োজনের গহ্বর ভরা খুবই মুশকিল। বিয়েতে অনেকগুলো সোনার আংটি উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম। সেগুলো থেকে একটি দু'টি নিয়ে পটুয়াটুলির অলংকারের দোকানে বিক্রি শুরু করি। আমার ইশকুলের সহপাঠী নিরঞ্জনের স্বর্ণালঙ্কারের একটি ভালো দোকান ছিল। সেখানেই নিরঞ্জনের কাছে একটি দু'টি করে নিয়ে আংটিগুলো বিক্রি করতে থাকি। আংটিগুলো নেওয়ার সময় জোহরা আমার দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকাত তাতে এক ধরনের অসহায়তা এবং বেদনা লক্ষ করতাম। ওর সেই দৃষ্টি আমাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করত, কিন্তু বাস্তবতা আমার ঘাড় ধরে অসহায় আমি-কে ঠেলে দিত নিরঞ্জনের সোনাসজ্জিত দোকানের দিকে।

সেই সময়ে আমার ছোটো বোন শানু রিক্শা থেকে পড়ে খুব চোট পায় হাতে। আমার মা ওকে নিয়ে প্রায় এক মাস হাসপাতালে থাকেন। তখন আজিজা খালাম্মা, যার ইস্কাটনের বাসায় ছেলেবেলায় আমরা কিছুদিন বসবাস করেছিলাম, আমাদের সংসারের তদারকি করতেন। তার বিশেষ পক্ষপাত ছিল আমার ছোটো ভাই সাইফুর রহমান চৌধুরী এবং ওর স্ত্রীর প্রতি। এটা আপত্তিকর কিছু নয়। কিন্তু তিনি জোহরার সঙ্গে অনুদার ব্যবহার করতেন, এমনকি খাদ্য বিতরণের বেলাতেও জোহরার পাতে পড়ত পাউরুটির প্রায়-বর্জ্য অংশ এবং আরও কোনও কোনও ব্যবহার, যাতে থাকত অবহেলার স্পষ্ট চিহ্ন। আমি মর্মাহত হতাম, কিন্তু আম্মার অনুপস্থিতিতে কাউকে কিছু বলতেও পারতাম না। মুখ বুজে সহ্য করতে হত অনেক কিছু। বাবা থাকতেন প্রেস এবং লাইব্রেরির কাজে ব্যস্ত এবং মা আমার ছোটো বোন শানুকে নিয়ে হাসপাতালে।

বাবা আমাকে লাইব্রেরির ভার নিতে বলেছিলেন। যেহেতু আমি লেখালেখি করি, তাই লাইব্রেরি চালানো আমার পক্ষে সহজ এবং ভালো হবে — এরকম একটি ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি এমনটি ভেবেছিলেন। কিন্তু বাবার এই ইচ্ছা পূরণে আমি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারি নি। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। মনে-মনে নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, তার এই অপদার্থ সন্তানটিকে দিয়ে কিছুই হবে না। তার এই ভাবনাকে খারিজ করার মতো সম্বল আমার কিছুই ছিল না। তিনি যে এই অকর্মণ্য পুত্রটিকে তার স্ত্রী কন্যাসহ দু'বেলা আহার জুগিয়ে চলেছেন, এতদিনে সহ্য ক'রে যাচ্ছিলেন অধম এই আমাকে আরও অনেক কিছুর মতো এজন্যও আমি তার কাছে চিরঋণী। আমি একটি চাকরি খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু চাকরি নিয়ে তো কেউ আমার জন্য বসে নেই। চাকরি যে একটি দুর্লভ ব্যাপার তা বুঝতে ক্ষণকাল বিলম্ব হয় নি। আমার চাকরি খোঁজার পালা ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি শুরু হয়। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। কখনও ক্লান্তি, মাঝে মাঝে বিরক্তি এবং কখনও হতাশা কেমন জেঁকে বসে মনে।

এর কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে গুলিস্তান সিনেমা হলে একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হয় আমার জীবনে। কী একটা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল সেকালের সেই সুন্দর সিনেমা হলে। বন্ধু মোশতাক আহমদের সৌজন্যে সন্ধ্যার শো'তে একটি বিদেশি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। হলের ভেতর আমাদের সামনের সারিতে চুপচাপ বসেছিলেন সহপাঠী এবং বন্ধু সাবের রেজা করিম। তাকে ডেকে বললাম, "আপনার একটি গল্প পড়লাম মোহম্মাদী'তে। ভালো লেগেছে।" তিনি স্মিত হেসে জবাব দিলেন, "আপনি কি 'অল্প স্বল্প গল্পে'র কথা বলছেন? গল্পটি আমি লিখি নি। লিখেছেন রশীদ করীম। তিনি আপনার পেছনের সারিতে বসে আছেন।" আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে গল্পের প্রকৃত লেখককে আবিষ্কার করলাম। আমাদের দু'জনের মধ্যে হাসি-বিনিময় হল। এভাবেই তার সঙ্গে আমার প্রথম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পর কবি আবুল হোসেনের আজিমপুর কলোনির দোতলার ফ্ল্যাটে দ্বিতীয়বারের মতো রশীদ করীমকে দেখি। হালকা শীতের ভোর। বেলা নয়টা। রশীদ করীমের গালভরা সাবানের ফেনা, হাতে সেফটি রেজার। আবুল হোসেন তার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপরত। আবুল হোসেন আগেই দরজা খুলে একটি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেন। সেদিন কী আলাপ হয়েছিল তা' আজ আর মনে নেই। সম্ভবত দাড়ি কামানোর ফাঁকে তিনি আমাকে বিদেশি গল্প পড়ার জন্যে একটি বই এগিয়ে দেন। গল্প কিংবা গল্প লেখকের নাম কিছুই মনে নেই আজ। বইয়ে মগ্ন থাকার সময়টুকুর মধ্যে আবুল হোসেন ও তার বন্ধুর জরুরি আলাপ এবং রশীদ করীমের দাড়ি-কামানো দুটো কাজই সুসম্পন্ন হল। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। রশীদ করীমের কথা শুনে ভালো লাগল। সেদিনই কেন যেন মনে হয়েছিল এই মানুষটির সঙ্গে আমার বনবে ভালো এই অনুমান মিথ্যে হয় নি। কুড়ি বছরের ওপর আমাদের পরিচয়। প্রথম পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই সেই পরিচয় নিবিড় হয়েছে সখ্যে পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখাশোনার মধ্যে ছেদ পড়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কখনও বড়ো রকমের খেদ তৈরি হয় নি। আজও বজায় রয়েছে আমাদের বন্ধুত্ব। তাকে আমার একজন খাঁটি শুভার্থী হিসেবে জানি। প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি তার সঙ্গে, যদিও আমি স্বভাবতই স্বল্পভাষী। রশীদ করীম শুধু একজন প্রথম সারির অসাধারণ লেখকই নন, সজ্জন হিসেবেও তিনি শ্রদ্ধাভাজন। কালেভদ্রে হঠাৎ তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যান, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হ্রদ — এইটে তার এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তার স্মরণশক্তির তারিফ না করে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এবং গান তার কণ্ঠস্থ। মাঝে মাঝে তিনি সেসব কবিতা ও গান টেলিফোনে আবৃত্তি করে ও গেয়ে শোনান। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী আবৃত্তি করেন আলাপ করার সময়। সেসব মুহূর্ত বাস্তবিকই উপভোগ করি। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি আংশিক পক্ষাঘাতজনিত সর্বক্ষণ গৃহবন্দি, লিখতে অপারগ, যদিও অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা তার আজও অদম্য। কিন্তু হঠাৎ হতাশার কালো ছায়া ঘিরে ধরে তাকে তিনি নীরবতাকে মেনে নেন, যদিও মাঝে মাঝে টেলিফোনে আমার এই সুহৃদ কথার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠেন।

রশীদ করীম যেসব উপন্যাস লিখেছেন সেগুলির গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে প্রতিভাত হচ্ছে প্রবুদ্ধ সমালোচক এবং অগ্রসর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। তার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলিও

নন্দিত হয়েছে বোদ্ধাদের কাছে, কয়েকটি বিদেশি কবিতার অনুবাদক হিসেবেও জ্বলজ্বলে তার সাফল্য। এ-কথা স্মরণ করে ভালো লাগছে যে, তার 'আমার যত গ্লানি' উপন্যাসসহ বেশ কয়েকটি প্রধান সৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে পুস্তক আকারে নয়, পাণ্ডুলিপিরূপে। কোনও কোনও পুরো পাণ্ডুলিপি খোদ লেখকের বাসায় এক নাগাড়ে সশব্দে পাঠ করেছি নির্বাচিত বন্ধুবান্ধবদের জমাট আসরে। কোনও কোনও বন্ধু আমার পাঠের দিলখোলা তারিফ করতেন, মনে পড়ে। লেখক- বন্ধু এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ আজও কখনও কখনও সখেদে বলেন, 'কেন যে সেসব দিনের আপনার কথা আর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি-পাঠ ক্যাসেটে রেকর্ড করে রাখি নি। ভারি আপশোস হয় আজও।'

রশীদ করীম আমার কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কবিতার একজন বুদ্ধিমান সমঝদার তিনি। আমার কবিতার দোষগুণ সম্পর্কে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে আলোচনা করেছেন — কখনও ব্যক্তিগত আলাপে, কখনও পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে। আমি উপকৃত হয়েছি তার আন্তরিক সমালোচনা পড়ে। সব সময় যে তার সব কথা আমি মেনে নিয়েছি তা' নয়, তবে বিবেচনা করেছি গুরুত্ব সহকারে। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে রশীদ করীমের সুসম্পর্ক ছিল। আইয়ুব রশীদ করীমের প্রাথমিক পর্যায়ের কোনও কোনও ছোটোগল্পের প্রচুর তারিফ করেছেন, কিন্তু পরের দিকে তিনি উৎসাহ বোধ করেন নি সেই একই তরুণ-লেখকের লেখা সম্পর্কে — এ কথা খোদ রশীদ করীমই আমাকে বলেছেন। আমার এই বন্ধু সত্যভাষণে বরাবরই নিষ্ঠাবান। তার অন্যান্য গুণের সঙ্গে এই গুণটির জন্যে তাকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধা করে এসেছি। তার মধ্যে কখনও কোনও ভড়ং লক্ষ করি নি।

রশীদ করীম পরবর্তীকালে একবার আমার কবিতা সম্পর্কে আবু সয়ীদ আইয়ুবের মত জানতে চেয়েছিলেন। আমার বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'শামসুর রাহমান একজন বড়ো মাপের কবি।' রশীদ করীম তিরিশের বিখ্যাত পাঁচজন কবির এক কাতারে আমি ঠাঁই পাওয়ার মতো কবি কি না, এই প্রশ্নটি করেছিলেন আইয়ুবকে। আইয়ুব কিছুক্ষণ নীরব থেকে যা বললেন তাতে শামসুর রাহমান সেই কাতারে এখনও দাঁড়াবার মতো কেউ নন — এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তখনও আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। অনেক পরে ১৯৭২ সালে তাকে প্রথম এবং শেষবারের মতো দেখি। তিনি কায়সুল হক এবং আমাকে তার বাসায় নৈশ ভোজনের দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি সেই দাওয়াতে শরিক হতে পারি নি। আটকা পড়ে গিয়েছিলাম শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের তুমুল আড্ডায়। পরে খুব অনুশোচনা হল, আবু সয়ীদ আইয়ুবের দাওয়াতে যেতে পারি নি বলে। দু'দিন পর কায়সুল হককে সঙ্গে নিয়ে হাজির হই পাঁচ নম্বর পার্ল রোডে অর্থাৎ আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাসায়। যখন ঘরের ভেতর ঢুকলাম, দেখি আইয়ুব রাতের আহারান্তে সন্দেশ খাচ্ছেন। গৌরী আইয়ুব আমাদের দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে সন্দেশ পরিবেশন করলেন আমাদের সামনে। আমরা রাতের খাবার খেয়েই এসেছিলাম, সন্দেশ পরম তৃপ্তিসহকারে জঠরস্থ করলাম। আইয়ুব তাঁর স্টাডিতে নিয়ে গেলেন আমাদের।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর নানা কথা শুনলাম। বললেন, একাত্তরের সেই দুঃসহ দিনগুলোয় আমার কথা ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে দু'একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে আরও অনেকের মতোই কোনওমতে বেঁচে থাকার কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সঙ্কলনটির কথা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী বিষয়ে মূল্যবান চিত্তাকর্ষক আলোচনায় আমাদের সময়কে সমৃদ্ধ করে তোলেন তিনি। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তাঁর কথা। কখন যে অনেকটা সময় কেটে গেল দ্রুত লয়ে, খেয়াল করি নি। আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকার ইচ্ছা থাকলেও অসুস্থ বিদগ্ধ জ্ঞানী মানুষটির স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে লোভ সামলে আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং গৌরী আইয়ুবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বন্ধু রশীদ করীম আজও বার বার আইয়ুবকে স্মরণ করেন সশ্রদ্ধচিত্তে। তিনি অনেকদিন তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনেছেন। কলকাতার সেসব উজ্জ্বল দিনের কথা, পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের বাসিন্দা সেই দীপ্তিময়, প্রকৃত গুণী মানুষটির কথা কতবার যে শুনেছি রশীদ করীমের কাছে তার হিসেব রাখি নি। পুরনো দিনের কথা, অথচ কখনও পুরনো হওয়ার নয়, যেমন কখনও পুরনো হয় না আসমানের নক্ষত্রমালা।

## ।। আঠাশ ।।

কী ব্যবসা, কী বাণিজ্য — এই দুটোর কোনওটির প্রতিই কখনও তেমন আকর্ষণ বোধ করি নি। ধনকুবের হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে মন থেকে শত হস্ত দূরে রেখেছি সবসময়। অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করব, এমন গগনবিহারী আমি নই। ভদ্রভাবে জীবনযাপন করার সঙ্গতি থাকলেই আমি খুশি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হওয়ার সাধ আমার আগেও ছিল না, এখনও মালিক হওয়ার সাধ আমার নেই। জীবনধারণের জন্য সামান্য টাকাও তো আকাশ থেকে খসে পড়া তারার মতো টুপ করে হাতে এসে পড়বে না। সে জন্য কমবেশি শ্রম তো করতেই হবে। কোদাল, খুন্তি নিয়ে পরিশ্রম করার মতো তাকৎ নেই, শক্তিতে কুলালেও মধ্যবিত্ত পরিবারের ঠুনকো অহমিকা এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে উপার্জন হত তাতে আমার নিজস্ব সংসারের নৌকাটি চড়ায় ঠেকে হা-পিত্যেশ করত। তাই চাকরির জন্য নানা অফিসে ধরনা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ধরনা দেওয়ার ব্যাপারটি আমার মনঃপূত ছিল না। আমি লেখালেখি করি, আমার কবিতা ছাপা হয় সংবাদপত্রের সাহিত্য সাময়িকীতে। কালেভদ্রে একটি কি দু'টি নিবন্ধেরও ঠাঁই হয় সেখানে। হয়তো কোনও সংবাদপত্রে আমার হিল্লে হয়ে যেতেও পারে।

আমি যে বেকার, এই তথ্যটি কোনও কোনও বাংলা সংবাদপত্রের কর্তাদের অজানা ছিল না। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাড়া পাই নি সেকালে। বহু আগে আমি হামেশা ঘুরে বেড়াতাম আমার প্রিয় ঢাকা শহরের নানা রাস্তায়, অলিতে-গলিতে। উদ্দেশ্যহীন এই ঘোরাঘুরি আমার মনে আনন্দ সঞ্চারিত করত। কোনও কোনও রাস্তার নাম জানতাম না, কোনও পথচারীকে পথের নাম জিজ্ঞেস করতাম না, পাছে তিনি অপ্রসন্ন হন। আমার

তো পথ চলাতেই আনন্দ। একদিন বিকেলে সেকালের জিন্নাহ এভিনিউস্থ 'মর্নিং নিউজ' দৈনিক পত্রিকার অফিসে ঢুকে পড়লাম। হয়তো নিয়তি কৌতুকবশত আমাকে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাটির সিঁড়ি ভাঙতে প্ররোচিত করেছিল আড়াল থেকে, আমি বিন্দুমাত্র টের পাই নি। টের পেলে কি আমি প্রবেশ করতাম না সেই নিন্দিত পত্রিকার দরবারে? জানি না। যা অবধারিত তার হাত থেকে নিস্তার পাব কী করে?

'মর্নিং নিউজ'-এর তিন-চারজন সাংবাদিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু সম্পাদক এসজিএম বদরুদ্দীন আমার অচেনা ছিলেন। আমার সামান্য কবি পরিচয় তার জানা ছিল কি-না, আঁচ করতে পারি নি। তবে তার বড়ো কামরায় প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে একটি চেয়ারে বসে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, তিনি জানতেন আমি কোনও নিষ্কর্মা, করুণাপ্রার্থী ভবঘুরে নই। আমার সঙ্গে কিছু কথা বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই অনভিজ্ঞ বাঙালি যুবকটিকে অন্তত একজন জুনিয়র সহ-সম্পাদকের চাকরি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেদিনই তিনি আমাকে আশার বাণী শোনান নি; দু'তিনদিন পর তার সঙ্গে আবার দেখা করতে বললেন। চাকরির আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তিনি হয়তো 'মর্নিং নিউজে' কর্মরত দু'একজন বাঙালি সাংবাদিকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এটাও অনুমান করেছিলাম।

যা-ই হোক, নির্ধারিত দিনে আবার 'মর্নিং নিউজ' অফিসে হাজির হলাম। সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। পেয়ে গেলাম। সম্মতিসূচক সাড়া এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পাদক এসজিএম বদরুদ্দীনের সেক্রেটারি আমার নিয়োগপত্র নিয়ে এলেন। মাসিক এক শ' পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরি পেয়ে গেলাম! টাকার পরিমাণ যাই হোক, অন্তত বেকারত্ব তো ঘুচল। আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, এই পত্রিকার বাঙালি সাংবাদিকগণ এবং সহকারী সম্পাদক সিংহলনিবাসী আবদুল লতিফ খতিব, আমার নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিহারী উদ্বাস্তু সালাউদ্দিন মোহাম্মদও আমার পক্ষে ছিলেন। বাঙালি সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন হাসানুজ্জামান, সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ, দেবপ্রিয় বড়ুয়া এবং রেজাউল হক। বার্তা সম্পাদক মিস্টার লুইস এবং মিস্টার জনস্টোন অবশ্য ছিলেন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত এই উপমহাদেশেরই বাসিন্দা। উর্দুভাষীদের অধিকাংশ সাংবাদিকই বিহারী উদ্বাস্তু। তারা হলেন দু ভাই আবদুল হান্নান ও আবদুল মান্নান। আর যাদের নাম মনে পড়ছে, তারা হলেন আশরাফ পায়ামি, তাহের মির্জা এবং কফিল আহমদ। তাহের মির্জা একজন সুশীল, সুদর্শন রিপোর্টার ছিলেন। তিনি কি বিহারের বাসিন্দা ছিলেন? ঠিক মনে পড়ছে না। ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের অধিবাসী নয় তো? আব্দুল মান্নান বিমান ভ্রমণে বেজায় অনিচ্ছুক ছিলেন। তাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে কায়রো যাত্রার খুবই পীড়াপীড়ি করা হল সহকর্মীদের পক্ষ থেকে। আখেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিমানভীত এই মানুষটি কায়রো যেতে রাজি হলেন। কায়রো বিমান দুর্ঘটনার কথা আজও আমাদের কখনও সখনও বেদনার্ত করে তোলে। আমরা হারিয়ে ফেলি 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক, দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর সহকারী সম্পাদক আহমেদুর রহমানকে। আমি তখন 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। সেই বিমান

দুর্ঘটনায় আরও যারা প্রাণ হারান, তাদের নাম এখন মনে পড়ছে না। সে জন্য আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। সাংবাদিকতার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও 'মর্নিং নিউজ'-এ কাজ করা আমার পক্ষে মুশকিল হয় নি, সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে। হাসানুজ্জামান, সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ, সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ — এরা যারা ডেস্কে কাজ করতেন, তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সাহায্য করেছেন আমাকে। সালাউদ্দিন মোহাম্মদ তো কখনও কখনও টেলিপ্রিন্টারে আসা নিউজ শিট আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে সেটাকে দুরস্ত করে প্রেসে পাঠিয়ে দিতেন। ফলে আমার শ্রম কিছুটা লাঘব হতো। নিউজ টেবিলে শিফট-ইন-চার্জের দায়িত্ব পালন করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাকে তার উর্দু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে ভালোবাসতেন। তিনি একজন প্রগতিপন্থী, প্রতিশ্রুতিশীল কবি ছিলেন। কালেভদ্রে আমরা রাতের ডিউটি সেরে, অফিসের লম্বা নিউজ টেবিলে খবরের কাগজের স্তূপে মাথা রেখে ঘুমিয়ে, কোনও মতে রাত কাটিয়ে দিতাম। কোনও কোনও রাত নির্ঘুম কেটেছে কবিতা-বিষয়ক আলাপ করে। সকালে উঠে হাঁটতে হাঁটতে নবাবপুরের সেন্ট্রাল হোটেলে ঢুকে পড়তাম আমরা দু'জন। হোটেলের বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে কোণের কোনও টেবিলে বসে বেয়ারাকে ডেকে নেহারি এবং নান রুটির অর্ডার দিতাম। বিল বেশির ভাগ সময় সালাউদ্দিন মোহাম্মদই চুকিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আমিই দিতাম তার ওজর-আপত্তির পাশ কাটিয়ে। তখন থেকে এই বিশেষ নাশতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য এই দুই হাজার এক সালেও দুবছর আগে থেকে এই লোভনীয় নাস্তা আমার জন্যে বিলকুল হারাম হয়ে গেছে হৃদরোগ হেতু। অবশ্য নান রুটি নিষিদ্ধ হয় নি, যেটি বেশি উপাদেয় সেই খাসির গোশত এবং হাড় নিংড়ানো রস ও মশলার মিশ্রণে তৈরি বস্তুটিই নিষিদ্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। আমাদের দেশের পক্ষে, বাঙালিদের উন্নয়নের পক্ষে 'মর্নিং নিউজ'-এর ক্ষতিকর, আপত্তিকর ভূমিকার কথা আমি ভুলি নি। সংবাদপত্রটির বাংলা ভাষার বিরুদ্ধাচারও আমার মনে ছিল। আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকার পথে পথে 'ধুতি পরিহিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সয়লাব' — এই ধরনের স্থূলাক্ষরে সজ্জিত হেডিং সম্বলিত খবর 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেকালে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, উশকানিমূলক ডাহা মিথ্যা সংবাদের মারফত বাঙালিদের ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধাচরণই ছিল এই পত্রিকাটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এসব কথা স্মরণে জমা থাকা সত্ত্বেও যে 'মর্নিং নিউজ'-এ চাকরি খুঁজেছিলাম এবং করেছিলাম কিছুকাল — তা জীবিকারই তাগিদে। অন্য কোনও পত্রিকা আমাকে চাকরি দেয়ও নি। একবার শুনেছিলাম, অবশ্য তখন আমি মর্নিং নিউজ'-এর একজন সহসম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক'-এ আমাকে একজন সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। ব্যাস এইটুকুই, তারপর সব চুপচাপ, ফিসফিসানিও গায়েব শুনেছি, সেখানকার একজন সাংবাদিকই আমার নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন। শোনা কথা, কতদূর সত্য তা প্রমাণ করার উপায় আমার তখনও ছিল না, এখনও নেই।

'মর্নিং নিউজ'-এ কাজ করার গ্লানি কখনও পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারি নি। বার বার অনুতাপের কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছি। তবে যখন আমি বিবাহিত, এক সন্তানের জনক,

আমার বেকারত্ব নিজের কাছেই বিরক্তিকর, অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে তৃষিত হয়ে উঠেছিলাম, যে-কোনও জায়গায় একটি চাকরির জন্যে। সেই মুহূর্তে বাছবিচার করার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। বাবা, মা অবশ্য কখনও আমার বেকারত্বের অবস্থার প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান নি, কোনওরকম চাপও সৃষ্টি করেন নি সাততাড়াতাড়ি কিছু একটা করার জন্যে। আমি নিজেই অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলাম। রীতিমতো একজন অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে। কী করি, কী করি, এই ভাবনা আমাকে হিংস্র জন্তুর থাবার মতো দখল করে ফেলেছিল। এই ভাবনাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল 'মর্নিং নিউজ' অফিসের দোতলায় জনাব এসজিএম বদরুদ্দীনের কামরায়।

সেখানে আমার অবস্থান সহনীয় তো বটেই, সুখকর করে তুলেছিলেন খতিব ভাই, সালাউদ্দিন মোহম্মদ, হাসানুজ্জামান, সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, আরশাদ, তাহের মির্জা, আখতার পায়ামি এবং রেজাউল হক। তাদের সাহচর্যে 'মর্নিং নিউজ'-এর দিনগুলি বেশ ভালোই কেটেছিল। খতিব ভাই এ এল খতিব-এর কামরায় প্রায় রোজই কিছু সময় কাটাতাম। বিদেশি সাহিত্য বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন। ইংরেজি ভাষায় তিনি কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। তার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫-এর জঘন্য, কৃতঘ্ন হত্যাকাণ্ড বিষয়ে একটি জরুরি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। বইটির নাম 'হু কিলড মুজিব'। বইটি এই উপমহাদেশে সাড়া জাগিয়েছিল। আজ তিনি নেই, কিন্তু তার মুখ এখনও বারবার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। ভুলতে পারি না তার মধুর হাসি, হেঁটে চলার ভঙ্গি, সিগারেট খাওয়ার ধরন। প্রেসক্লাবে থাকতেন একা একটি ঘরে। তার লেখার টেবিল, কফির পেয়ালা, অনেক বইয়ের সমাহার — এই সবকিছুই আজও ফিল্মের দৃশ্যের মতো পরিস্ফুট আমার কাছে। বাংলাদেশ এবং বাঙালিদের এমন একজন বিদেশি প্রেমিক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর মৃত্যু আমাদের অনেকের জন্যেই হৃদয়বিদারক এক ঘটনা, যা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। তাঁর মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে, নিঃসঙ্গতায় একটি কামরায় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে, বহু দূরে।

মনে পড়ে, খতিব ভাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি ইংরেজি সঙ্কলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কবি-সাহিত্যিকদের লেখা সংগ্রহ করছিলেন তিনি। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিতব্য সেই সঙ্কলনের জন্যে সম্পাদক এএল খতিব আমারও একটি কি দু'টি কবিতা নির্বাচিত করেছিলেন ভেবে আমি গর্ব বোধ করি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সঙ্কলন প্রকাশনার আলোয় আলোকিত হয় নি। রয়ে গেছে চির অন্ধকারে।

তাঁর কথা ও আলোচনার কিছু আলো আমি পেয়েছি, কিন্তু সেই চিত্তাকর্ষক গুণী মানুষটিকে আমি কিছুই দিতে পারি নি। শুধু তাঁকে আমার একটি অনুবাদগ্রন্থ উৎসর্গ করতে পেরেছিলাম।

সেকালে রেডিও পাকিস্তানের অফিস ছিল নাজিমুদ্দিন রোডের একটি ছোট দোতলা বাড়িতে। রেডিও অফিসের সরাসরি উলটো দিকে ছিল আবন মিয়ার চা এবং কিছু খাবারের দোকান। এই দোকান গুলজার করে রাখতেন কবি ফররুখ আহমদ এবং বেশ

কয়েকজন বেতারশিল্পী। সেই দোকানে কবি শাহাদাৎ হোসেনকেও এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। শাহাদাৎ হোসেন রেডিওর একজন স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রিকা 'এলান' সম্পাদনার দায়িত্ব পাল করতেন এই প্রবীণ কবি। জীবিকার তাগিদে। আকর্ষণীয় আবৃত্তির ক্ষমতা ছিল তাঁর। চাকরিচ্যুত হয়ে তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস ছিল না, তবে কখনও সখনও ফররুখ আহমদের আড্ডায় শরিক হতাম। নিশ্চুপ বসে থাকতাম, শুনতাম 'সাত সাগরের মাঝি'র কবির কথা। তাঁর মাথায় ছিল বাবরি চুল, মুখে হালকা দাড়ি। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। তবে বেশি যেতাম রেডিওর প্রোগ্রাম অরগানাইজার, কবি আবুল হোসেনের কামরায় ভিন্ন ধরনের নীচু স্বরে বাঁধা আলাপ-আলোচনার আকর্ষণে। তিনি আমার প্রকৃত শুভার্থীদের অন্যতম। আমি যাতে একটু ভালো অবস্থানে থাকি, সেদিকে তাঁর নজর থাকত। পুলিশের একটি ভ্রান্ত রিপোর্টের ফলে রেডিওতে আমার প্রোগ্রাম বেশ কিছুদিনের জন্যে বন্ধ ছিল। বছর দু'এক আমি নিষিদ্ধ ছিলাম সেখানে, মাইক্রোফোন থেকে তফাতে রাখা হয়েছিল আমাকে। আমি কট্টর বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত, এমন একটি তথ্য একজন পুলিশ অফিসার বাবাকে জানিয়েছিলেন। আমার দিকে নজর রাখা হচ্ছে এবং কোর্ট হাউস স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে আমি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলাম এই খবর মিথ্যা নয়। কোনও কট্টর বামপন্থী দলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তবে প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রতি আমার অটল বিশ্বাস ছিল, আজও আছে। আমার কাজ এবং কমিউনিস্ট শামসুর রহমানের তৎপরতাকে একত্রিত করে তদানীন্তন সরকার একটি জগাখিচুড়ি রিপোর্ট করেছিলেন, যে জন্যে আমি প্রায় এক বছর কি দেড় বছর রেডিওর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াতে পারি নি।

আমার দ্বিতীয় সন্তান ফাইয়াজের জন্ম হয় ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে। তখনও 'মর্নিং নিউজ'-এর একজন জুনিয়র সহসম্পাদকের কাজে বহাল রয়েছি। আমার ছোটো ভাই তোফায়েলুর রহমান 'মর্নিং নিউজ' অফিসে টেলিফোনে করে আমার পুত্রসন্তানের জন্মের খবর জানায়। আমি এবং আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরা তখনই দ্বিতীয় সন্তান চাই নি। সে যাতে পৃথিবীতে না আসে, সে জন্যে আমরা সচেষ্ট ছিলাম, কিন্তু যা হবার তা রোধ করব কীভাবে? মেনে নিতে হল দ্বিতীয় সন্তানের আগমন, ওর মুখ দেখে মায়া হল আমার। যা খাঁটি স্নেহে রূপান্তরিত হতে দু'তিন দিনের বেশি লাগে নি।

ফাইয়াজের জন্মের অল্প কিছুদিন পর আমি রেডিও অফিসে গেলাম কবি এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজার আবুল হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে; কিছু ভালো সময় কাটানোর আশায়। আলাপের মাঝখানে তিনি বললেন, 'রেডিওতে প্রোগ্রাম প্রোডিউসারের পদ খালি হয়েছে, তুমি একটা দরখাস্ত করে দাও রিজিওনাল ডাইরেক্টরের উদ্দেশে'। যদি নির্বাচিত হই, বেতন পাওয়া যাবে সবসুদ্ধ দুই শ' বেয়াল্লিশ টাকা। 'মর্নিং নিউজ-এর বেতনের চেয়ে একশ' সতেরো টাকা বেশি। তখন এই টাকার পরিমাণই খুব বেশি আমার কাছে। তা ছাড়া অধিক রাত অবধি জেগে কাজ করার ঝক্কিও থাকবে না। ব্যাপারটি আশাপ্রদ, মন বলল। এখন চাকরি হওয়া-না হওয়ার ভাবনা আমাকে ক'দিনের জন্য পেয়ে বসায় 'মর্নিং নিউজ' অফিসে সময় যাপন করতে কেমন অস্থিরতা বোধ করি।

চার-পাঁচদিন পর রেডিও অফিস থেকে ইন্টারভিউর ডাক এল চিঠির মারফত। মনে চাঞ্চল্য, আশা-নিরাশার দোলা। মামুলি শার্ট আর কডরয়ের ট্রাউজারের পরে রেডিও অফিসে হেঁটে রওয়ানা হলাম। বেলা এগারোটার দিকে আরভি এফ.এ. কলিমুল্লাহর কামরায় ডাক পড়ল। পিয়ন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে লুকাব না, স্নায়ুতন্ত্রে ঈষৎ বিচলিত বোধ করলাম। পা দুটি কাঁপছিল কি? চেয়ারে বসতেই কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। ডিজি যেসব প্রশ্ন করলেন, মনে হল সেগুলোর জবাব ভালোভাবেই দিতে পেরেছিলাম। প্রোগ্রাম প্রোডিউসারের চাকরি পেয়ে ভালোই লাগল। খবরটি প্রথমেই জানালেন আমার অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী আবুল হোসেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে আব্বা-আম্মাকে জানালাম। জোহরাও জানল। পরে 'মর্নিং নিউজ'-এর সম্পাদকসহ সবাইকে জানালাম। পদত্যাগপত্র দাখিল করার সময় কেমন যেন বেদনাবোধ হল। বিদায়ের বেলা হৃদয়ে অশ্রুকণা ঝরতে থাকে, তাকে কেউ টের পায় না।

## ॥ উনত্রিশ ॥

নিজের বেকারত্বের জন্যে এক ধরনের বেদনাবোধ এবং হতাশা আমাকে খুব কাতর করে তুলেছিল সত্য। আমার এই মনোভাব কোনও বন্ধু, এমন কি জীবন সঙ্গিনীর কাছেও প্রকাশ করি নি। বাবা-মার সঙ্গেও এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখেছিলাম। তা বলে অবশ্য আমার কলমকে ঝিমোনোর ফুরসত দিই নি এতটুকু। প্রায় রোজই কবিতার কথা ভেবেছি, কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা সাজিয়েছি সাদা পাতায়। কোনও কোনও দিন কলম বিদ্রোহ করে বসেছে, কিন্তু আমি সেই ক্ষণিক বিদ্রোহকে আমল না দিয়ে লিখে গিয়েছি দিনের পর দিন। কাটাকুটি করেছি, কখনও কখনও পুরো কবিতাটিকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বেকার কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছি। মোহ বড়ো বাধা, একটি পুরো কবিতাকে শূন্যতায় মিলিয়ে দিতে মন সহজে চায় না, কিন্তু মোহের দাবি কোনও শিল্পীর কাছে অধিকাংশ সময় মেনে নেয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

কবিতা আমাকে হতাশার, ব্যর্থতার অন্ধকার আলোর সন্ধান দিয়েছে যৌবনে, এখনও এই তিয়াত্তর বছর বয়সের শুরুতেও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্লান্তি আমাকে দখল করতে পারে নি, পারে নি বিশুষ্ক করতে কবিতা নামের প্রস্ফুটিত পদ্মকে। জানি না কতটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি, তবে এটুকু দাবি করতে পারি যে, কবিতার প্রতি ভালোবাসা আমার আগের মতোই অবিচল, গভীর।

'মর্নিং নিউজ' আমার পছন্দের সংবাদপত্র না হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ে এক বছরের কিছু কম সময় কাজ করেছি সেখানে। সহকর্মীদের ছেড়ে আসতে ভালো লাগে নি। জীবিকার গরজ এমনই যে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে হয়। চাকরি ব্যাপারটি আগাগোড়াই আমার ঘোর অপছন্দের ব্যাপার। চাকরির শরীর থেকে অবিরত 'দাস, দাস' গন্ধ বেরোয়। আমরা যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তাদের অনেককেই এই দাসত্বের শেকলটি সত্তায় সেঁটে রাখতেই হয়। ভেবেছিলাম রেডিওর কাজ ভালো লাগবে আমার। কিন্তু আমার ভাবনাকে হোঁচট খেতে

দেরি হয় নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছি। সত্যি বলতে কি, আমার জীবনের দেড়টি অন্ধকার বছর আমাকে কাটাতে হয়েছে সেখানে। অনেকটা কড়াইয়ের ফুটন্ত তেল থেকে আগুনে পড়ার মতো অবস্থা।

রেডিওতে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম এহিয়া খান, জনাব আখন্দ, সরফুল আলম, সেলিমুদ্দিন আহমদ, গোলাম রব্বানী এবং আরও কাউকে। আমরা সবাই ছিলাম প্রোগ্রাম প্রডিউসার। যতদূর মনে পড়ছে, দিলারা হাশেম কিছুদিনের জন্য প্রোগ্রাম প্রডিউসারের দায়িত্ব পালন করেন। আমাকে প্রোগ্রাম প্রডিউসার হিসেবে এক সঙ্গে প্রায় চারটি বিভাগের কাজ করতে হত। সকাল-সন্ধা, কখনও কখনও রাত দশটা অব্দি অফিসের কাজে ডুবে থাকতে বাধ্য হয়েছি। কোনও কোনও দিন অন্য প্রোগ্রাম প্রডিউসারের কাছে একাধিক সুন্দরী মহিলা আসতেন, কিন্তু দূর থেকে তাদের রূপসুধা পান করার সামান্য সময়টুকুও পেতাম না, কারণ ফাইল এবং কথিকা ইত্যাদি পরখ করার কাজ কোনও দিন দৈবক্রমে আমাদের ঘরে তেমন বেশি অতিথির আগমন ঘটত না। যদি নুরুল মোমেন আসতেন কখনও তখন বড় ভালো লাগত আমাদের। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মজাদার কথা, আত্মপ্রশংসা উপভোগ করতাম খোলা মনে। তাঁর কথা শুনে কখনও বিরক্তি ঘেঁষে নি মনের কোনও কিনারায়। খেদোক্তির সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তার মতো ইন্টারেস্টিং মানুষ আজকের সমাজে বিরল।

নানা ধরনের ব্যক্তির আনাগোনা ছিল রেডিও অফিসে। অনেকে আসতেন কাজে, কেউ কেউ অকাজে। আগে আমিও কোনও কোনও দিন অকাজে আসতাম। আসতাম আবুল হোসেনের সঙ্গে আলাপ করতে। ভালো লাগত বলেই আসতাম। অবশ্য কোনও কোনও দিন প্রোগ্রাম করার জন্যেই আসা হত নাজিমুদ্দিন রোডের সেই দোতলা বাড়িটিতে। বিভিন্ন সময়ে সেই সাধারণ বাড়িতে অনেক অসাধারণ ব্যক্তির পদধূলি পড়েছে।

সময় পেলেই অর্থাৎ খানিক অবসর মিললেই সেলিমুদ্দিন আহমদ আর আমি আবন মিয়ার দোকানে গিয়ে বসতাম। সেখানে আড্ডা জমত কবি ফররুখ আহমেদকে ঘিরে। ততদিনে তিনি আমাদের ফররুখ ভাই হয়ে গেছেন। সাহিত্যকেন্দ্রিক কথাই হত বেশি। ফররুখ ভাই ইংরেজি ভাষার রোমান্টিক কবিদের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে শেলি, কিটসের অনেক পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন স্মৃতি থেকে। অনবরত চা আর পান খেতেন তিনি। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে চা না খেয়ে আসন ত্যাগ করা সম্ভব হত না। আজও এতকাল পরেও তার তেজী চোখের চাওয়া, চমৎকার কণ্ঠস্বর স্মৃতিকে ঘন ঘন দুলিয়ে যায়। তার মতাদর্শ আমাকে কখনও টানে নি, তবে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধায় ভাটা পড়ে নি কস্মিনকালেও। তিনি আপাদমস্তক ইসলামীপন্থী ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে একদা যিনি প্রগতিশীল মার্কসবাদী চিন্তাধারায় দীক্ষিত ছিলেন, তিনিই প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাম্পে ঠাঁই নিলেন। এই পরিবর্তন, আমার সামান্য বিবেচনা, তার কাব্যপ্রতিভাকে কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেলিমুদ্দিন আহমদ ছিলেন দিলখোলা মানুষ। আমাদের দু'জনের মধ্যে 'তুমি' শব্দটির প্রবেশ ঘটেছিল খুব অল্প সময়ে। আমি সহজে কাউকে তুমি বলতে পারি না, এক ধরনের আড়ষ্টতা দখল করে ফেলে। তবে সেলিমুদ্দিনের

আন্তরিক এবং দিলখোলা ব্যবহার, বাতচিত আমাদের মধ্যে কোনও কৃত্রিম অচরণের দেয়াল তৈরি করতে পারে নি। স্বীকার করছি, এটা সম্ভব হয়েছিল আমাদের সেই প্রয়াত সহকর্মী এবং বন্ধুটির জন্য। সে কবিতা পড়তে ভালোবাসত, কিন্তু নিজে কবিতা লিখতো কি-না জানতে পারি নি। সম্ভবত কয়েকটি বিদেশি কবিতার অনুবাদ করেছিল। আমি একবার সৈয়দ নুরুদ্দিনের কাছ থেকে অনেকগুলো ফরাসি কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ ধার এনেছিলাম। দুঃখের বিষয়, বইটি নুরুদ্দিন ভাইকে আমি ফেরত দিতে পারি নি। বইটি তার খুবই প্রিয় ছিল। কিন্তু সেই অনুবাদগ্রন্থ আমার গাফেলতির জন্যে খোয়া যায় নি। সে বই আমার হাতছাড়া হয় সেলিমুদ্দিনের পীড়াপীড়ির দরুন। তার পাঠের তীব্র আগ্রহ লক্ষ করে বইটি কয়েক দিনের জন্যে তাকে ধার দিতে রাজি হয়ে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেলিমুদ্দিন বইটি আমাকে ফেরত দিতে পারে নি। বইটি নাকি সে হারিয়ে ফেলেছে। সৈয়দ নুরুদ্দিন আমার কথা বিশ্বাস করেছিলেন কি না, তা আমি কোনও দিনই জানতে পারব না। তবে তার আকর্ষণীয় পুস্তক-ভাণ্ডার থেকে আর কোনও বই ধার নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি নি তার কাছে।

রেডিওতে যারা কথিকা, গল্প ও কবিতা পাঠ করতেন অথবা বেতার-নাটকে অভিনয় করতেন, সংগীত পরিবেশন করতেন তাদের কাছে আগেভাগে চুক্তিপত্র পাঠানো হত। তারা চুক্তিপত্র তাড়াতাড়ি সই করে পাঠালে বেচারা প্রোগ্রাম প্রডিউসারগণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। সই করা চুক্তিপত্র তো এল কিন্তু কথিকা সময়মাফিক কথকবৃন্দের কেউ কেউ রেডিও স্টেশনে পাঠাতেন না। এমনকি শেষমুহূর্তে পাঠাবার গরজও বোধ করতেন না। এদিকে প্রোগ্রাম অর্গানাইজারদের খবরদারির তাপ তো বেচারা প্রোগ্রাম প্রডিউসারদের সইতেই হত। প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের হম্বিতম্বি কখনও কখনও সহ্যের সীমা যে পেরিয়ে যেত, তা আমার কালের কোনও কোনও ভুক্তভোগীর মনে পড়ে নিশ্চয়ই। বদমেজাজি বলে আমার কোনও সুখ্যাতি নেই। তবে একজন বিশেষ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার আমার সঙ্গে প্রায়শই এমন আচরণ করতেন যেন আমি তার পারিবারিক ভৃত্য। একদিন দুপুর বেলা তার একটি মন্তব্য শুনে এমন খেপে গিয়েছিলাম যে, হাতের কাছের কাগজ-চাপাটা তুলে দিয়ে জনাবের দিকে ছুড়ে দিতে প্রায় উদ্যত হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত ক্রোধকে বাগ মানাতে পেরেছিলাম। নইলে আমাকে মানুষ খুন করার চেষ্টার অপবাদ নিয়ে জেলের ভাত খেতে হতো বেশ কিছুদিন।

এমনও সময় গেছে যে, একজন কেউ চুক্তিপত্র সই করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত কথিকা লিখে পাঠান নি। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মহোদয়ের রাগান্বিত বক্রোক্তি শোনার কুৎসিত ব্যাপারটি এড়ানোর তাগিদে কষ্ট স্বীকার করে নিজেই কথাটি লিখে ফেলতাম, যা প্রচারিতই হত না। এ ধরনের কিছু ঝক্কি একজন প্রোগ্রাম প্রডিউসারকে পোয়াতেই হত সেকালে। জানি না, একালে কোনও প্রোগ্রাম প্রডিউসারকে তার বসের কতটা দৌরাত্ম্য সইতে হয়। আশা করি দিনকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও বদমেজাজি উপরঅলার আচরণের বদল হয়েছে অনেকখানি।

বলতে ভুলে গিয়েছি, রেডিও পাকিস্তানে কর্মরত থাকার কালে আমার আসল কাজ কবিতা রচনায় ভাটা পড়েছিল। কখনও-সখনও একটি কি দু'টি কবিতা লিখতে পেরেছি মাত্র।

কর্মজীবন শুরু করার আগে থেকেই আমি বিরক্তিকর অর্শ রোগে ভুগতে থাকি। এই রোগ যে শুধু বিরক্তিকরই নয়, বেজায় কষ্টকরও তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। আমার ভোগান্তির শেষ ছিল না অনেকগুলো বছর। ভীষণ অস্বস্তি এবং যন্ত্রণায় কাটাতে হয়েছে বহুকাল। মর্নিং নিউজে কোনও কোনও রাতে টেবিলের পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে কাজ করেছি অনেকক্ষণ। অসহনীয় যন্ত্রণা ঠোঁটে চেপে লাগাতার কাজ চালিয়ে গিয়েছি কয়েক ঘন্টা। রেডিও অফিসে কাজ করার সময়েও ঐ বিচ্ছিরি অসুখের চাপে নাস্তানাবুদ হয়েছি বহুদিন। একবার তো বাধ্য হয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিতে হল পায়ুপথের যন্ত্রণা সহ্যাতীত হয়ে যাওয়ার দরুন। এই ছুটি পুরোপুরি সুখপ্রদ না হলেও তিন-চারটি মোটামুটি ভালো কবিতা লিখে উঠতে পেরেছিলাম। এই কবিতাগুলোর মধ্যে একটি কি দু'টি চতুর্দশপদীও ছিল। একটি চতুর্দশপদীর নাম রেখেছিলাম 'ক্ষত এবং ধনুক'। সেই কবিতায় তখনকার আমার শারীরিক রক্তক্ষরণের ছায়া ছিল।

রেডিও অফিসে আমার অন্যতম সহকর্মী শরফুল আলম একজন চমৎকার মানুষ এবং সফল ব্রডকাস্টার। তার কণ্ঠস্বরও চিত্তাকর্ষক। তিনি বহু বছর আমেরিকায় প্রবাসী জীবনযাপন করছেন। ভালোই আছেন, আশা করি। একটি কি দু'টি বছর তার সাহচর্য পেয়েছি, তিনি আমার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করেছেন সব সময়। এহিয়া খান, জনাব আখন্দ, গোলাম রব্বানী এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম প্রডিউসারের সঙ্গেও আমার সদ্ভাব ছিল। তাদের সহমর্মিতার ঘাটতি থাকলে রেডিও অফিসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় আমার পক্ষে অধিকতর তিমির উপদ্রুত মনে হত।

কবি আবুল হোসেনের পরামর্শ এবং সহযোগিতার ফলে আমি রেডিও পাকিস্তানের একজন প্রোগ্রম প্রডিউসারের কাজ পেয়ে যাই। আমি ঢাকা বেতারকেন্দ্রে চাকরি পাওয়ার আগে আবুল হোসেনের উদ্যোগে এবং আমার সামান্য যোগ্যতার ফলে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার সুযোগ পাই, এমনকি আবু রুশদের একটি ছোটো-গল্পনির্ভর আমার একটি নাটিকাও প্রচারিত হয় গুরুত্বের সঙ্গে। আমার এই নাটিকা রচনার পিছনে আবুল হোসেনের তাগিদ সক্রিয় ছিল। মনে পড়ছে, একটি উৎকৃষ্ট প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল পূর্বসূরি এবং উত্তর সাধক। অনুষ্ঠানটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। কাব্যসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের দুই বিভাগে আলোচনা করবেন দু'জন প্রবীণ এবং দু'জন নবীন লেখক। কাব্যশাখায় বক্তব্য পেশ করার জন্য নবীন লেখক হিসেবে আমন্ত্রিত হন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। আগে তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দীন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রবীণ সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সঙ্গে পার্থক্য বোঝানোর উদ্দেশ্যেই নামজাদা কথাসাহিত্যিক তার নামটি ঈষৎ পালটে নেন। পালটানো নামটি আমার কাছে অধিক আকর্ষণীয় মনে হয়। যা হোক, প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার কিছু আগে তিনি রীতিমতো বিগড়ে যান। তার পূর্বসূরি হিসেবে কোন কথাশিল্পীকে রেডিও

কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত করেছিলেন তা আজ আর আমার মনে নেই। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ঘোরতর আপত্তি ছিল আমাকে কাব্যক্ষেত্রে একজন উত্তর সাধক হিসেবে গণ্য করার জন্য। শেষ পর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কি-না আজ আমার আর মনে নেই। হয় তো তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আগ্রহী শ্রেতাদের উদ্দেশে তার কথা বলেছিলেন নিজস্ব ঢঙে। কবি জসীমউদ্‌দীন কিন্তু আমাকে তার উত্তরসাধক হিসেবে গ্রহণ করতে কোনও কোনও আপত্তি করেন নি। খোলা মনে নিজের কথা সে রাতে শুনিয়েছিলেন শ্রোতাদের। তাঁর বক্তব্যও ছিল সুন্দর।

আমি রেডিও পাকিস্তানে প্রোগ্রাম প্রডিউসারের আসনে বসার কয়েকটি দিন পরেই আবুল হোসেন রেডিওর চাকরি ছেড়ে অধিক ভালো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হলেন। যতদিন আমি রেডিওতে কর্মরত ছিলাম ততদিন তার সঙ্গে সময়াভাবে বেশি দেখা করতে পারি নি। এখানকার কাজ থেকে স্বেচ্ছায় বিযুক্ত হওয়ার পরেই আবার তাঁর বাসায় আমার যাওয়া অনেক বেশি বেড়ে গেল। কখনও কখনও সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী এবং অন্য কাউকে কাউকে নিয়ে যেতাম। আবুল হোসেন তাদের পছন্দ করতেন। কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা না হলেই খারাপ লাগত। তিনি এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন 'সংলাপ' নামে একটি উন্নতমানের ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করতেন। এই সাহিত্যপত্রটি ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত সাতটি সংখ্যা উৎসাহী, রুচিশীল পাঠক-পাঠিকারা কিনতে পেরেছিলেন। সাত সংখ্যার পরেই 'সংলাপ' থেমে যায় আমাদের অনেককে বিষণ্ন করে। কারণ, আমাদের দেশে উন্নতমানের সাহিত্যপত্রের বড়ো আকাল। মাসিক 'সওগাত'-এর উপস্থিতি অবশ্য আমাদের তরুণ লেখকদের ভরসার স্থল ছিল। 'সমকাল'-এর আবির্ভাব তখনও ঘটে নি।

'সংলাপ'-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় আমার কবিতা গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হত। সেকালের পক্ষে ভালো সম্মানী পেতাম প্রতিটি কবিতার জন্য। 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি' ইত্যাদি কবিতা ছাপা হয়েছিল 'সংলাপ'-এ। পরে শোনা গেছে, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশনের আর্থিক আনুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। কিন্তু সেই সাহিত্যপত্রে কোনও রকম সরকারি প্রচারণার বিন্দুমাত্র ঘ্রাণ ছিল না। অন্তত আমি তেমন কোনও গন্ধ পাই নি। আমার মতো আনাড়ি তরুণের পক্ষে যা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছি, তীক্ষ্ণধী, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শুঁকে তা' টের পেয়ে গেছেন হয়তো।

সময়টা তখন সুবিধার ছিল না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ জমে উঠছে ক্রমান্বয়ে। কবুল করছি, সেকালের রাজনীতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমি খুবই অজ্ঞ ছিলাম। যদিও খবরের কাগজে কিছুদিন কাজ করেছিলাম, তবু দেশি-বিদেশি রাজনীতি বিষয়ে ছিলাম প্রায় বে-খবর। কারণ, আমি খবরের কাগজ না পড়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাসই বেশি পড়েছি। আর পড়েছি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক সিরিয়াস প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। তবে প্রগতিশীল, মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রতি আমার আনুগত্য দীর্ঘকালের। এ জন্য আমি আমার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়ালের কাছে ঋণী। আমি কখনও কোনও রাজনৈতিক

দলের সঙ্গে যুক্ত হই নি, কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতাকে শ্রদ্ধা করেছি, এখনও করি কিন্তু কাউকেই 'জী হুজুর, জী হুজুর' বলে তার সব কথায় সায় দিতে পারি নি, তার সব কাজকেই সমর্থনযোগ্য মনে করি নি। অবশ্য আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির এই ধরন অনেকের কাছেই অগ্রাহ্য ঠেকতে পারে। সে জন্য আমি আদৌ চিন্তাগ্রস্ত কিংবা উদ্বিগ্ন নই। কারণ, আমি কারও করুণাপ্রার্থী নই, কাউকে কোনও দাসখৎ লিখে দিই নি। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি, ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের আধিক্য লক্ষ করে অত্যন্ত শঙ্কিত ছিলাম একজন সাধারণ বাঙালি হিসেবে, একজন কবি হিসেবে। কারণ, এই কালো মেঘ কোনও শুভ বার্তাবহ নয়। আমাদের দেশ কি অন্ধকারে ডুবে যাবে?

## ॥ ত্রিশ ॥

রাজনৈতিক ডামাডোল এবং ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলীর মৃত্যু পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। ডেপুটি স্পিকার ছিলেন আওয়ামী লীগ দলভুক্ত। ডেপুটি স্পিকার উদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে আইন পরিষদে স্পিকারের চেয়ারে বসার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং তার সমর্থক দলের উত্তেজিত সদস্যগণ জনাব শাহেদ আলীর দিকে হিংসাত্মকভাবে নানা বস্তু ছুড়তে থাকে। সেই আঘাতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে আহত ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলীর মৃত্যু হয়। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কাছেই এই হামলা এবং তার ফলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু পূর্ববাংলা জাতীয় পরিষদের এক কলঙ্কজনক ঘটা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মর্মান্তিক, কলঙ্কময় ঘটনার মাত্র এগারো দিন পরেই শুরু হয় পাকিস্তানের ইতিহাসে এক দীর্ঘস্থায়ী অমাবস্যা। ১৯৫৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সামরিক আইন জারি করা হল। ফলে লুপ্ত হল সংসদীয় সরকার পদ্ধতি। কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে উঠলেন জেনারেল আইয়ুব খান। অবশ্য ফিল্ড মার্শাল খেতাবটি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে নিতেও তাকে বেশি দেরি করতে হয় নি, কোনও কাঠখড়ও পোড়াতে হয় নি। উৎসুক তাবেদাররা তো চারপাশে ছিল বন্দনাগীত গাওয়ার জন্যে।

আমি রেডিও পাকিস্তানে দু'বছর তিন মাস পর্যন্ত কাজ করেছি। কাজে কোনও গাফিলতি করি নি, মাঝে মাঝে মন বিষিয়ে উঠলেও সংযত রেখেছি নিজেকে। কিছুদিন পর পর 'মর্নিং নিউজ'-এর সম্পাদক এসজিএম বদরুদ্দীন আসতেন রেডিও অফিসে ইংরেজি কথিকার কথক হিসেবে। কিছুক্ষণের জন্যে তার সঙ্গে আমার সামান্য কতাবার্তা হত। আমি অন্য বিভাগের সঙ্গে ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব পালন করতাম। ইতোমধ্যে আমি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলাম আস্তে-সুস্থে, যদিও কোনও প্রকাশক আমাকে বই প্রকাশের প্রস্তাব দেন নি। এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার আগে 'মেধাবী রাতের নদী' নামে একটি বই প্রকাশের ভাবনায় মশগুল ছিলাম। নানা পত্রিকায় মুদ্রিত আমার অনেকগুলো কবিতা একাট্টা করে একটি পাণ্ডুলিপি

প্রস্তুত রেখেছিলাম। অবশ্য কোনও প্রকাশকের তালাশে পথের ধুলো ওড়াই নি। কিছুদিন পর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এক বিকেলে ছাদে গিয়ে বসলাম, একা। চোখ বুলিয়ে গেলাম পুরো পাণ্ডুলিপিটির ওপর। বিরক্তিকর মনে হল আমার। একটি একটি পাতা করে সবগুলো কবিতা ছাদ থেকে কাটা ঘুড়ির মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম না জানি কোন অজানায়। যদিও সেই পাণ্ডুলিপিতে 'পূর্বাশা', 'নতুন সাহিত্য', 'উত্তরসূরী' এবং 'দেশ'-এর মতো পত্রিকায় মুদ্রিত কিছু কবিতাও ছিল।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর অকালমৃত গল্পকার সম্পাদক এবং প্রকাশক মহীউদ্দিন আহমদের অনুরোধে তাকে 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র পাণ্ডুলিপি দিই। পাণ্ডুলিপি দেয়ার বেশ কয়েক মাস পর বই প্রকাশিত হল। এ জন্যে অবশ্য মহীউদ্দিন আহমদ দায়ী ছিলেন না। যেহেতু আমি তখন রেডিও পাকিস্তানের একজন কর্মচারী ছিলাম সে জন্যে পুস্তক প্রকাশের আগে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হয়। সরকারি অনুমতি পাওয়ার জন্য আমাকে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। বই ছাপা হয়ে যাওয়ার পরেও বইয়ের বাজারের মুখ দেখতে পায় নি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। যখন সরকাবি অনুমতিপত্র এলো করাচি থেকে তখন প্রথম বইয়ের প্রকাশিত হওয়ার উত্তেজনা এবং আনন্দ একেবারে লাপাত্তা। অনেক লেখক তাদের প্রথম প্রকাশিত বই নিয়ে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা অনুভব করেন আমি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এই সত্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে। জানি না, স্বাধীন বাংলাদেশে কোনও সরকারি কর্মচারিকে পুস্তক প্রকাশের জন্যে সরকারের অনুমতি প্রার্থী হওয়ার বিড়ম্বনা সইতে হয় কি-না। যা হোক, 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যগ্রন্থটি খুব বেশি বিক্রি হয়েছে বলে প্রকাশক কিংবা কোনও পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে শুনি নি। এ জন্যে আমার কোনও খেদ ছিল না। প্রকাশকের কাছ থেকে যৎসামান্য টাকা পেয়েও কোনও হা-হুতাশ করি নি। লিখে যাওয়াতেই আমার আনন্দ। সেকালে এমনই মনোভঙ্গি ছিল আমার।

বইয়ের বিক্রি যেমন হোক, 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাভাগ্য মোটামুটি ভালোই ছিল. তখন বইয়ের জগতে সাধারণত সমালোচকগণ এমন কার্পণ্য করতেন যে, লেখক এবং প্রকাশকের উৎসাহ রীতিমতো উবে যেত। প্রকাশকের কথা জানি না, কবি হিসেবে আমার উদ্যমে ভাটা পড়ে নি। মনে পড়ে, তরুণ কবি-সমালোচক মনজুরে মওলা বইটির একটি প্রশংসামূলক আলোচনা করেছিলেন! এই আলোচনা এনামুল হক সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরণ'-এ প্রকাশিত হয়। 'মর্নিং নিউজ'-এ আবুল হোসেন 'এ রাইটার্স নোট' কলামে বইটির আলোচনা করেন। রশীদ করীম সেই একই পত্রিকায় 'স্ট্রিকেন ডিয়ার' শীর্ষক একটি চমৎকার নিবন্ধে 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' সম্পর্কে আমার কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে। কবি-সমালোচক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী উন্নতমানের সাহিত্যপত্র 'পূর্বমেঘ'-এ এমন সুন্দর, অকৃপণ প্রশংসাময় আলোচনা করলেন যা আমাকে আরও সৃষ্টিমুখর হতে উৎসাহিত করে। তখন আমার কবিতা লেখায় ছেদ পড়ে নি, যদিও রচিত কবিতার সংখ্যা ছিল কম। ইতোমধ্যে রেডিও অফিস স্থানান্তরিত হল পিজি হাসপাতালের ঈষৎ

উলটো দিকে। আগের চেয়ে অনেক বড়ো। তখন এক কামরায় চারজন প্রোগ্রাম প্রডিউসার বসতেন না। দু'জনের বসবার জায়গা এবং ব্যবস্থা ছিল এক কামরায়। এতে কাজেরও সুবিধা হত।

রেডিও পাকিস্তানের একজন প্রোগ্রাম প্রডিউসারের জীবন তখন প্রায় প্রাণান্তকর ছিল। আমার স্বভাবে 'জী হুজুর'-পনার অভাব আছে বরাবরই। তবে গায়ে পড়ে কাউকে অপমান করা কিংবা মানসিক কষ্ট দেয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। কিছু কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, এখনও করি, কিন্তু কারও বাড়া ভাতে ছাই ছিটানোর প্রবণতা আমার মধ্যে নেই। বেশিরভাগ সময় অফিসে অথবা আবন মিয়ার দোকানে চুপচাপ থেকেছি, কখনও-সখনও কিছু কথা বলেছি সহকর্মীদের সঙ্গে, বেশি শুনেছি তাদের কথা। শারফুল আলম এবং সেলিমুদ্দিন আহমদ দু'জনই ভিন্ন ধরনের মানুষ ছিলেন। তাদের ধরন-ধারণ, কথা বলার ঢং ছিল একেবারে আলাদা। তবে তাদের দু'জনকেই আমার আকর্ষণীয় মনে হত।

দেশে মার্শাল ল' কায়েম রয়েছে। আমি হঠাৎ একটি কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতাটির নাম 'হাতির শুঁড়'। আগে আমি এ ধরনের কবিতা লিখি নি। 'হাতির শুঁড়' সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল'-এ ছাপা হল। একদিন টেলিফোন করে আমাকে বললেন, 'শামসুর রাহমান, তোমার 'হাতির শুঁড়' কবিতাটি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার ভাগ্য ভালো যে, দেশের রাজা এবং তার খাস সভাসদরা বাংলা ভাষা জানে না।' এর বেশি তিনি আর কিছু বলেন নি। 'হাতির শুঁড়'-এর মাধ্যমে আমি জেনারেল আইয়ুব খানের হঠাৎ পাকিস্তানের তখতে বসে পড়ার ব্যাপারটিকেই রূপকথার আড়ালে বলতে চেয়েছিলাম। ব্যাপারটি শওকত ওসমান ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। তখন অন্য কেউ সেই কবিতাটি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। শওকত ওসমান অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একজন সদ্য লিখতে শুরু করা তরুণের পদ্যও পড়তেন। দুর্লভ এই গুণ। তিনি আমাদের প্রথম সারির বিরল কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। তিনি নানা ধরনের লেখা উপহার দিয়েছেন আমাদের। প্রতিভাবান এই লেখক কয়েকটি অসামান্য ছোটোগল্প লিখেছেন, লিখেছেন 'জননী'র মতো সার্থক উপন্যাস। 'ক্রীতদাসের হাসি'র মতো সাড়া-জাগানো গ্রন্থেরও স্রষ্টা তিনি। মৃত্যু তাঁকে আত্মজীবনীটি শেষ করার সুযোগ দেয় নি, পাঠকদের বঞ্চিত করেছে একজন প্রধান লেখকের সম্পূর্ণ জীবনস্মৃতি 'রাহনামা' পাঠের সুযোগ থেকে।

দুঃখের মধ্যে এ কথা ভাবতে ভালো লাগে যে, আমি তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য ছিলাম। আমার চাকরিবিহীন জীবনে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে 'দৈনিক বাংলা' এবং 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে নিজেকে যখন অনিশ্চয়তার কুয়াশায় ঠেলে দিই, তখন বার বার তিনি আমাকে কিছু অর্থদানেব প্রস্তাব দিযেছেন। আমি তাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে প্রতিবারই বলেছি, 'শওকত ভাই, আপনি আমাকে কিছু দিতে চেয়েছেন, এতেই আমি খুব খুশি। এখন কিছু দিতে হবে না। দরকার হলে আমি নিজেই চেয়ে নেব।' এমন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি আমাদের সমাজে ক'জন আছেন? তিনি যে খুব বিত্তবান ছিলেন, এমন তো নয়।

আগেই বলেছি, 'মর্নিং নিউজ'-এর সম্পাদক এসজিএম বদরুদ্দীন রেডিও অফিসে ইংরেজি কথিকা প্রচারের আমন্ত্রণ পেয়ে এলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি আবার আমাদের পত্রিকায় কাজ করবেন?' আমি বললাম, 'বেশি বেতন পেলে অবশ্যি যাব।' তিনি বেশি বেতনে আবার আমার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। আমার নতুন নিয়োগপত্রে সাড়ে তিনশ' টাকা ধার্য করা হল। পদ পেলাম সিনিয়ার সাব-এডিটরের। সুখের বিষয় 'মর্নিং নিউজ-এ আবার যোগদানের কিছুদিন পরই নতুন ওয়েজ বোর্ড ঘোষিত হল। ফলে, আমার বেতন প্রায় নিমিষে সাড়ে তিনশ' টাকা থেকে সাড়ে চারশ' টাকায় উন্নতি হল। ইতোমধ্যে আমার নিজস্ব সংসারে আরও একজন সদস্য যুক্ত হল আমার তৃতীয় সন্তান, ফাওজিয়া।

'মর্নিং নিউজ'-এ প্রবর্তনের পর আমার লেখনীর বেগ বেড়ে গেল। লেখার প্রেরণা এবং সময় দুটোই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল কবিতার পর কবিতা। পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে মোটামুটি তাগিদ আসতে লাগল কবিতার জন্যে। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ আদমজী পুরস্কারের জন্য দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমি পুরস্কৃত হই নি। তা বলে আমি আদৌ দমে যাই নি। আমি তো আর পুরস্কৃত হওয়ার লোভে নানা ছোটোখাটো সুখ বিসর্জন দিয়ে, রা'তের পর রাত জেগে কবিতা লিখি নি। অন্তরের বেয়াড়া তাগিদেই এক মেঘলা দুপুরে প্রথম লিখতে শুরু করি এবং এখনও এই তিয়াত্তর বছর বয়সেও আমার ভেতরের এক নাছোড় সত্তার প্রেরণা-তাড়িত হয়ে হাতে কলম তুলে নিই। যদি কোনও সম্পাদক আমার কাছে কবিতা আর না চান, এড়িয়ে চলেন আমাকে, তবু আমি লিখে যাব অবিরত, লিখে যাব আমার ভেতরকার সেই জেদি সত্তার চাহিদা মেটানোর জন্যে। নইলে আমি যে জীবন্মৃত হয়ে থাকব।

অর্শ ভারি নাছোড় এক রোগ। বছরের পর বছর এই রক্ত-ঝরানো ব্যাধি আমাকে ভুগিয়েছে। বেশ কয়েক বছর জুড়ে এর উৎপীড়ন সহ্য করেছি। ভুগেছি, ভুগেছি, শুধু ভুগেছি তবু কোনও চিকিৎসকের দরজায় কড়া নাড়ি নি। অবিশ্বাস্য রক্তক্ষরণ হয়েছে ক্রমাগত, এই রোগ ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনতে পারত যে-কোনও দিন, তবু সতর্কতা অবলম্বন করি নি। আমার এই শারীরিক কষ্টের কথা বিবেচনা করে সম্পাদক আমার দায়িত্ব দিনরাত্রি থেকে শুধু দিনের প্রথম অংশে অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো অব্দি স্থির করে দেন। এতে আমার কষ্টের কিছু লাঘব হল, সন্দেহ নেই। আমি আজও কৃতজ্ঞচিত্তে জনাব এসজিএম বদরুদ্দীনের কথা স্মরণ করি। জানি না, তিনি কোথায় আছেন, কী করছেন এবং কেমন আছেন। তিনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন এ আমার আন্তরিক কামনা।

শ্রদ্ধেয় এএল খতিবের কামরায় প্রতিদিন একবার না গেলে স্বস্তিবোধ করতাম না। তাঁর কথা শোনাও ছিল আনন্দঘন অভিজ্ঞতা। অবশ্য তিনি যখন সম্পাদকীয় কিংবা কলাম লেখার কাজে মগ্ন থাকতেন, তখন তার কামরায় প্রবেশ করার লোভ সংবরণ করতাম। তাঁর কাছে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য জগতের অনেকেই আসতেন, বিশেষ করে যারা দোভাষী অর্থাৎ বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই যাদের দখল তারিফযোগ্য তারাই বেশি আসতেন। আহসান আহমদ আশক প্রায়শই আড্ডা দিতেন খতিব ভাইয়ের কামরায়।

আহসান আহমদ আশক বাঙালি ছিলেন, কিন্তু কবিতা লিখতেন উর্দু ভাষায়। উর্দু এবং বাংলা দুই ভাষার কবিতা সম্পর্কেই তাঁর জানাশোনা ছিল। কিন্তু উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যতটা ছিল, বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ততটা নয়। ইংরেজি ভাষার ওপরও তার দখল ছিল। মাঝে মাঝে খতিব ভাই তাদের অনির্ধারিত আসরে আমাকে ডেকে নিতেন। তাঁরা দু'জনই আলাপ-আলোচনা বেশি করতেন। আমি খুব অল্প কথায় তাঁদের কোনও কোনও বক্তব্যের সঙ্গে নিজের ধারণা সবিনয়ে তুলে ধরতাম।

আমার বক্তব্য কখনও তাঁদের কথার সপক্ষে থাকত, কখনও কোনও কোনও বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমতও সবিনয়ে প্রকাশ করতাম। তাঁরা বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হতেন না। আমার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতেন। আহসান আহমদ আশ্‌ক আমার কবিতা পছন্দ করতেন।

'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশিত হওয়ার পর আমি যে কবিতাবলি লিখতে শুরু করি সেসব স্পষ্টতই আমার আগের লেখা কবিতা থেকে কী বিষয়ে, কী ভঙ্গিতে আলাদা হতে শুরু করে। পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে যে আমি আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম, তা কিন্তু নয়। গাছের ডালে যেমন পাতা আসে তেমনি তৈরি হয়ে যাচ্ছিল কবিতাবলি। তবে স্বীকার করতে হবে, একটি কবিতা হয়ে ওঠার পেছনে কিছু চিন্তা-ভাবনা তো থাকেই। মনোযোগী সমঝদার পাঠকগণ আমার লেখায় এই পরিবর্তনকে মনে মনে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এটা অনুভব করতে পেরেছিলাম সাহিত্যপাড়ার কিছু গুঞ্জন শুনে।

আস্তে আস্তে আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার মতো কবিতা জমে উঠেছিল। কিন্তু এ নিয়ে আমার তাড়াহুড়ো করার কিংবা কোনও প্রকাশকের কাছে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা হয় নি। আমি অপেক্ষা করতে শিখেছিলাম। ভালো কথা, বনিয়াদি আদমজি পুরস্কারের জন্যে কয়েক কপি 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' দাখিল করেছিলাম নির্ধারিত স্থানে। আদমজি পুরস্কার দেয়ার জন্যে কয়েকজন মান্যগণ্য লেখককে নির্বাচিত করা হত। তাদের বিচারের ফল অনুযায়ী একজন কি দু'জন পুরস্কার পেতেন। আমার সেই প্রথম কবিতার বই পুরস্কৃত হয় নি। একজন প্রবীণ বিচারক, পরে জানতে পেরেছিলাম, বইটির নানা জায়গায় দাগ দিয়ে বিরূপ কিছু মন্তব্য লিখেছিলেন মার্জিনে। বিচারকদের বিচার কি আমাকে আহত কিংবা নিরাশ করেছিল? সবিনয় নিবেদন করি, আদৌ না। আমি তো লিখে চলেছি ক্রমাগত, এতকাল পরে আজও।

## ॥ একত্রিশ ॥

স্মৃতি মাঝে মাঝে বড়ো বিভ্রান্ত করে আমাকে। রেডিও পাকিস্তানে যখন প্রোগ্রাম প্রডিউসারের কাজ করতাম তখন আরও দু'একজন প্রোগ্রাম প্রডিউসার আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁরা হলেন আহমদ-উজ-জামান, এ.এইচ.ফাতেমি, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন। তিনি পি.পি. হওয়ার আগে সম্ভবত প্রেজেন্টেশন অর্গানাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। পরে পদোন্নতির ফলে পি.পি. অর্থাৎ প্রোগ্রাম প্রডিউসার হন। তাঁর ঠোঁটে প্রায়শই আবছা মধুর হাসি ফুটে থাকত। আর খুব হাসিখুশি মেজাজের মানুষ ছিলেন আমাদের আরেকজন সহকর্মী এ.এইচ.

ফাতেমি। এই উর্দু-ভাষী চমৎকার মানুষটি ছিলেন বিহারের বাসিন্দা। আর মনে পড়ে অত্যন্ত স্মার্ট প্রেজেন্টেশন অর্গানইজার সৈয়দ মোজম্মেল হোসেনের কথা।

রেডিওর চাকরি ছেড়ে দ্বিতীয়বার মর্নিং নিউজ-এ যোগদানের পরও রেডিওর সহকর্মীদের কথা মনে পড়ত। সেলিম উদ্দিন আহমদের সঙ্গে তো বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু নানা কারণে দেখা হত কম। হার্টের অসুখ ছিল ওঁর। টেলিভিশনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরে তিনি রাতে একা ঘরে এই সুন্দর পৃথিবীর সঙ্গে সকল সূত্র ছিন্ন করে মিলিয়ে যান সেই তিমিরে, সেখান থেকে কেউ কোনওদিন ফিরে আসে না। গোলাম রব্বানীও বেঁচে নেই। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আর এ.এইচ. ফাতেমি কি বেঁচে আছেন? জানি না বলে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করি। আহমদ উজ-জামান কি এখন অবসর জীবন যাপন করছেন? না কি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর অন্য কোনও কাজ করছেন — এই খবরও আমার অজানা। আধুনিক জীবনে অপরিহার্য এই বিচ্ছিন্নতা। রেডিও পাকিস্তানে আমি যে দু'বছর কাজ করেছি সেই সময়ে শুধু অফিসার কিংবা লেখক ও অধ্যাপকদের সঙ্গেই পরিচয় গড়ে ওঠে নি, রেডিও অফিসের স্টাফ আর্টিস্ট এবং বিভিন্ন সংগীতশিল্পীদের সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে আমার। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এবং বিশেষজ্ঞ আবদুল আহাদ, উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী এবং গজল ও গীত গায়ক ওস্তাদ কাদের জামেরি সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। আবদুল আহাদের অনুরোধেই আমি গান লিখতে উদ্বুদ্ধ হই। তাঁর চাহিদা এমন আন্তরিক ছিল যে আমার পক্ষে তাঁক গান না দেয়া সম্ভব হয় নি। আমি গান লিখব, একথা আগে কখনও ভাবিই নি। আমার প্রথম লেখা গানের সুর তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন, আর গানটি ঢাকা বেতারে প্রচার করেছিলেন মধুরকণ্ঠী ফেরদৌসী রহমান। আবদুল আহাদ আমার বেশ কয়েকটি গানের সুরস্রষ্টা।

কাদের জামেরি আমাকে গান দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনিও আমার রচিত কথায় সুর সংযোজন করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। আবদুল আহাদের চাহিদা মিটিয়ে কাদের জামেরিকে গান দেয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ, আমি এ ব্যাপারে ছিলাম বিরলপ্রজ। কোনও কোনওদিন অফিসের করিডরে কাদের জামরি আমার দিকে এমন অভিমানময় দৃষ্টিতে তাকাতেন যে আমার খুব কষ্ট হত। এক ধরনের বলা যেতে পারে, অপরাধবোধ পীড়িত করত আমাকে। কিছুদিন পরে অবশ্য আমি ওস্তাদ কাদের জামেরির হাতে একটি কি দু'টি গান অর্পণ করতে পেরেছিলাম। বিনিময়ে তিনি আমাকে আনন্দিত হয়ে অনিন্দ্য সুন্দর হাসি উপহার দিয়েছিলেন। এতকাল পরেও সেই হাসি মুছে যায় নি আমার স্মৃতি থেকে। আবদুল আহাদের নির্দেশনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীও রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছেন। একদা আবদুল আহাদ সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর কণ্ঠ প্রাক্তন মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছিল। যতদূর জানি, কোনও পীড়ার দরুন নয়, কোনও দুর্ঘটনাও দায়ী নয় এজন্যে। একদা কাদের জামেরি ছিলেন আসর মাতানো কিন্নরকণ্ঠ এক সংগীতশিল্পী। কিন্তু যৌবনেই তিনি প্রকৃত কণ্ঠস্বর থেকে বঞ্চিত হন। অনেক আগে হামিদুর রাহমানদের আশেক লেনের বাসায় আমার সুযোগ হয়েছিল কাদের জামেরির গান শোনার। নাজির আহমদ সেই গানের আসরটির

আয়োজন করেছিলেন। তখনও ভগ্নকণ্ঠ গায়ক কাদের জামেরি। কিন্তু আসর মেতে উঠেছিল সেই ভগ্নকণ্ঠ গায়কের সুরমদিরায়। সেদিনই আমি জানতে পেরেছিলাম প্রতিভাবান সংগীতশিল্পী কাদের জামেরির জীবনের এক মারাত্মক দুর্ঘটনার কথা। একদা সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল এই শিল্পীর। সাড়া জাগানো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সংগীত জগতে তরুণ বয়সেই। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ নিম্নস্তরের এক ব্যক্তি কাদের জামেরিকে সিঁদুর মেশানো পান কাইয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর অমন আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়। এই ঘটনা প্রত্যেক শিল্পীকেই মর্মাহত করবে, লানত দেবে সেই হিংসুটে লোকটিকে, যে অমন একটি ক্ষতি করেছিল সংগীত জগতের।

আজ আবদুল আহাদ এবং কাদের জামেরি নেই, তাঁদের স্মৃতি রয়ে গেছে বেশ কিছু গুণগ্রাহীর মনে। বহুগুণে গুণান্বিত নাজির আহমদও নেই, নেই আমার বন্ধু হামিদুর রাহমানও। শুধু তাঁদের সিদ্ধির পরিচয় থেকে যাবে আগামীর দিনগুলিতেও, হয়তো কিছুটা আবছাভাবে। জীবনের ধারাই এমন, দেশের এক একজন কৃতী সন্তান এভাবেই ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে যান মৃত্যুর পরে। মৃত্যু অনিবার্য, বড়ো করুণ এবং সবচেয়ে বেশি নির্দয়। এই বাক্যটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আজিজুর রহমানের কথা। একসময় তিনি মোটামুটি ভালো কবিতা লিখতেন। পরে গান রচনায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়েন। রেডিওর জন্য গান লেখার তাড়নায় তিনি মফস্বল থেকে ঢাকায় চলে আসেন। সারাদিন তিনি আবন মিয়ার দোকানে এবং রেডিও অফিসে কাটিয়ে দিতেন। কখনও কখনও অনেক রাতে বাসায় ফিরতেন। আবন মিয়া না-কি আবুল মিয়ার দোকান? আজিজুর রহমান অনেক গান লিখেছেন। এমন গীতপাগল গীতিকার আমি কম দেখেছি। বেশ কিছু জনপ্রিয় গানের রচয়িতা তিনি। গান তাঁকে কবিতা লেখার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

আমার প্রথম কবিতার বই 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র উৎসর্গপত্রে কোনও নাম নেই, আছে কয়েকটি কাব্য পঙ্‌ক্তি —

আমার খামার নেই নেই কোনও শস্যকণা
আছে শুধু একটি আকাশ।
তারই কিছু আলো-নীল আজও হে সুদূরতমা
ভালবেসে তোমাকে দিলাম।।

ইচ্ছে করেই কোনও নাম উল্লেখ করি নি। যে তরুণীকে বইটি উৎসর্গ করেছিলাম তার অসুবিধা হতে পারে, একথা ভেবে। খুবই সুন্দর ছিল সে দেখতে, আচরণে ছিল সলাজ সুষমা। তার চোখ জুড়ানো রূপ আমাকে সে-কালে উদ্বেলিত করেছিল, তার স্নিগ্ধ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ছিলাম। ওর কথা ভাবতাম প্রায় অষ্টপ্রহর। আমার ব্যাকুলতার বাঁধ ভেঙে গেল একদিন। তাই, আমার ভালোবাসার কথা তাকে না জানিয়ে পারলাম না। আমি বিবাহিত দুই সন্তানের জনক তখন। সেই তরুণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিংবা পালিয়ে কোথাও গিয়ে বিয়ে করার সম্ভাবনাও নেই। সে কিন্তু আমার আবেগের প্রাবল্যে, আমার ভালোবাসার টানে আশ্চর্য সাড়া দিয়েছিল। প্রস্তুত ছিল যে-কোনও ঘটনার জন্যে, অর্থাৎ আমার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে। শেষে আমি ভীরুতার অপবাদ

মাথায় নিয়ে পিছিয়ে যাই। কারণ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম এর পরিণতি কারও জন্যেই শুভ হত না।

ওর শেষ চিঠি ছিল উষ্মাপূর্ণ, প্রায় ধিক্কারের হুলময়। চিঠি পেয়ে রাগান্বিত হওয়ার অধিকার আমার ছিল না। আমি তো আমার আবেগ এবং অনুভূতির কথা ওর কাছে জাহির না করলেই পারতাম। আমি সেই চিঠির উত্তর দিতে পারি নি। সেই চিঠির হুলের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেছিলাম। আমি তার নাম ইচ্ছা করেই উহ্য রেখেছি। কে হায়, এই সংকীর্ণ নিষ্ঠুর সমাজে একজন মহিলাকে, আজ সেকালের তরুণী একজন সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া, অনাবশ্যক সমস্যার কাদায় ঠেলে দিতে চায়! নাম প্রকাশ করলে আমার কোনও অসুবিধা হবে না, কিন্তু তাকে হতে হবে ভয়ানক বিব্রত, নানা বাঁকা দৃষ্টির শিকার। বিশেষত তার আত্মীয়স্বজনের অসম্ভব গঞ্জনা সইতে হবে। আমি চাই, আন্তরিকভাবেই কামনা করি, সে যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক, যাপন করুক নিরুপদ্রব জীবন। একদা আমরা ভালোবাসার রঙধনুর স্পর্শে রঙিন হয়েছিলাম, আমার কোনও কোনও কবিতায় তার আভা রয়ে গেছে — এই সান্ত্বনাটুকু আমার থাক, অন্য কিছু না-ই বা রইল।

কে যেন বলেছেন, একেকটি বিদায় যেন মৃত্যুর মতো। যে তরুণীকে আমি ভালোবেসেছিলাম, যার কাছ থেকে অনাড়ম্বরভাবে বিদায় নিয়েছিলাম, কিংবা সে-ই হয়তো ফেয়ারওয়েল শব্দটি উচ্চারণ করেছিল হেলায়, সে আমাকে কি একেবারে মুছে দিতে পেরেছিল তার অন্তর্লোক থেকে? কে জানে? যাই হোক, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এর মতো কাব্যগ্রন্থের অসামান্য রচয়িতা, যাকে আমি প্রায় এক ঘন্টা কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি সময় কবির বাসায় দেখেছিলাম, কিছু কথা বলেছিলাম তাঁর সঙ্গে, তিনি পৃথিবীর পথ থেকে চিরবিদায় নিলেন ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর। আমাদের অনেকেরই হৃদয়ের অনেক কাছের কবির তিরোধানের দিন শহীদ কাদরী এবং আমি ঢাকার ধূলিধূসর পথে বিষণ্ণ মনে হেঁটেছিলাম প্রায় সারা দিন। দ্বিপ্রাহরিক আহার পর্যন্ত করি নি। ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কালজয়ী কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাকে কাঁদিয়ে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আরও একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করল জগতবাসী। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সূচিত হল মহাশূন্য অভিযান। স্পুটনিক-১-এর সাহসী সফল সওয়ার ছিলেন গ্যাগারিন। তিনি সগৌরবে ফিরে এলেন প্রিয় স্বদেশভূমিতে।

পল্লিগীতির বিরল সাধক, অগণিত বাঙালির প্রিয় সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদকে আমরা হারালাম ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর। তাঁর ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া গানের সুর অনেক বছর আগে তো বটেই, আজও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের মাতিয়ে তোলে। এই অসামান্য সংগীতশিল্পীকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর বড়ো ছেলে মোস্তফা কামালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মধু দা'র ক্যান্টিনে। মোস্তফা কামাল ছিলেন জ্বলজ্বলে, কথাবার্তায়

তুখোড়। এই যুবকটি যে বুদ্ধিদীপ্ত তা বুঝতে পারা যেত কিছুক্ষণের মধ্যেই। মোস্তফা কামালের সঙ্গে আমার অন্যতম বন্ধু তরীকুল আলমের হৃদ্যতা ছিল। বয়সে ওরা দু'জনই আমার চেয়ে কিছু ছোটো ছিলেন। কিন্তু বয়সের পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। মাঝে মাঝে তরীকুল এবং আমি পুরানা পল্টনের আব্বাসউদ্দিনের বাড়ি হীরামন মঞ্জিলে যেতাম মোস্তফা কামালের সঙ্গে আড্ডার লোভে। কোনও কোনও দিন আড্ডা এমন জমে উঠত যে, ঘড়ির দিকে নজর দেয়ার অবকাশ হত না। সেদিন সেখান থেকে দ্বিপ্রাহরিক আহার না সেরে বাড়ি ফেরা যেত না। বরেণ্য সংগীতশিল্পীকে দূর থেকে দেখতাম। তিনি আমাদের আড্ডায় এসে তরুণদের বিব্রত করতে চাইতেন না। বিকেলবেলা দূর থেকে দেখতাম তিনি তাঁর নিজের হাতে গড়ে তোলা বাগানটির পরিচর্যা করছেন। বড়ো মায়া ছিল তাঁর গাছপালা আর ফুলের জন্যে। তিনি মনেপ্রাণে নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি যেমন সযত্নে একটি বাগান সৃষ্টি করেছিলেন বাসভবনের সামনের জায়গায়, তেমনি গড়ে তুলেছিলেন তিন সন্তানকে। মোস্তফা কামাল, মোস্তফা জামান আব্বাসী এবং ফেরদৌসী রহমান — বাংলাদেশের তিন নক্ষত্র। মোস্তফা কামাল অবশ্য ভাইবোনদের মতো কণ্ঠশিল্পী নন, কিন্তু তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামালের সঙ্গে চলে যাওয়া অনেকগুলো বছরে আমার তেমন দেখা হয় নি। হয়তো তিন চারবার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। কিন্তু দেখা হওয়ার দু'তিন মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলো বছর যেন লুপ্ত হয়েছে আমাদের কথাবার্তার সুরে, যেন আমরা আবার মধু দা'র ক্যান্টিনের চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে আলাপ করছি। একবার হাইকোর্টে তাঁর কামরায় আমাকে নিয়ে বসালেন মাননীয় বিচারপতি মোস্তফা কামাল। কিন্তু চোখের এক পলকে উধাও হল তাঁর গাম্ভীর্য, মুখে ফুটে উঠল সেই তরুণ হাসি, তাঁর টিফিন ক্যারিয়ার থেকে একটি মিষ্টি তুলে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। নাশতা করতে করতে কিছু কথা হল, কথার আড়ালে ফুটল কথা।

একবার এক বিয়েবাড়িতে আমার অসুস্থ চোখে ওষুধ দেয়ার সময় ঘনিয়ে এল। আমার পাশেই ছিলেন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল। কাকে আমার চোখে ওষুধ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যায়, এমন ব্যক্তির সন্ধান করছিলাম এদিক ওদিক। প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল আমার হাত থেকে ওষুধের শিশিটি নিয়ে বন্ধুর অসুস্থ চোখে দুই ফোঁটা ঢেলে দিলেন।

মোস্তফা জামান আব্বাসীও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। গায়ক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। অসামান্য গায়িকা তাঁদের বোন ফেরদৌসী রহমান। তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত, ভাওয়াইয়া এবং আধুনিক গানে ঈর্ষাযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি আবদুল আহাদ সুরারোপিত আমারও কয়েকটি গান গেয়েছেন — রেডিও এবং টেলিভিশনে।

আরও একটি মৃত্যুসংবাদ আমাকে শুনতে হল ১৯৬০ সালের ২০ জুন তারিখে। আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় বাঙালি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর তারিখ সেটি। সেই বছরের ২০ জুন তারিখটি অন্যসব দিনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল।

তাঁর মতো ধীমান, বিদগ্ধ কবি বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিরল। তাঁকে আমি কখনও দেখি নি। দেখার সুযোগ হয় নি আমার। তবে তাঁর কবিতাবলি এবং প্রবন্ধসমূহ আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি শুধু বি.এ পাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মেধা এমন তীক্ষ্ণ এবং পাঠের সীমা এমন বিস্তৃত ও গভীর ছিল যে, বুদ্ধদেব বসু তাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন একজন অধ্যাপক হিসেবে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়োগ করতে সম্মত হন নি। কারণ, শুধু বি.এ পাস কোনও ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরি দেয়ার রেওয়াজ নেই। কিন্তু কবি এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান বুদ্ধদেব বসুর নাছোড় আগ্রহের কাছে আখেরে কর্তৃপক্ষের হার মানতে হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হলেন তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন এমন কৃতিত্বের সঙ্গে যে, আজও তাঁর ছাত্রগণ প্রয়াত শিক্ষকের গুণকীর্তনে মুখর। আজ এই মুহূর্তে তাঁর অনেক পঙ্‌ক্তি গুঞ্জরিত হচ্ছে মনে। আমি উদ্ধৃতির লোভ সামলে নিচ্ছি। আমার অনুরোধ, কবিতাপ্রেমীরা অভিনিবেশ সহকারে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ুন। সকল বিশিষ্ট কবির কবিতা পড়ুন।

## ॥ বত্রিশ ॥

সাংবাদিকতা সাহিত্যের জাতশত্রু, এই সত্য উপলব্ধি করতে আমাকে অপেক্ষা করতে হল 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার জন্মলগ্ন পর্যন্ত। ডেস্কে যারা কাজ করেন তাদের দায়িত্ব শুধু টেলিপ্রিন্টারে আসা খবরগুলো দেখেশুনে মেশিন-ঘরে পাঠিয়ে দেয়া। অবশ্য সংবাদের শিরোনাম রচনার কাজও একজন সাব-এডিটরকেই করতে হয়। যদিও খবরের শিরোনাম শিফ্‌ট-ইন-চার্জ কিংবা বার্তা-সম্পাদককেই করতে হয়। ইংরেজি পত্রিকার সাব-এডিটরকে অবশ্য তর্জমা করার ঝামেলা পোয়াতে হয় না। সংবাদের জুতসই শিরোনাম বানানো কখনও কখনও দেরি হয়, আবার কাঙ্ক্ষিত শিরোনামটি চটজলদি ঝলসে ওঠে মনে। খবরের গুরুত্ব বুঝতে পারা চাই, নইলে ধাতানি খেতে হয় শিফ্‌ট-ইন-চার্জ অথবা বার্তা-সম্পাদকের। মাঝেমধ্যে বিরক্তিকর মনে হয় এই কাজ। ইচ্ছে হয় অফিস থেকে বিদায় নিয়ে 'গুড বাই' বলে চলে যাই অনিশ্চয়তার কুয়াশায়।

আমার চতুর্থ সন্তান ওয়াহিদুল রাহমান ওরফে মতিন। মতিন দেখতে সুশ্রী ছিল। কেমন মায়াময় ছিল ওর দু'টি চোখ। ও যখন চার বছরের শিশু ছিল, তখন দৌড়ে গিয়ে আমার জুতো জোড়া নিয়ে আসত, জুতোর ফিতে বেঁধে দিত। আমি বারণ করলে অভিমান করত। ইশকুলে যেত কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। কী যে হল, সিজোফ্রিনিয়া দখল করে নিল ওকে। এমনিতে শান্ত থাকত, কিন্তু কখনও কখনও বিগড়ে সামনে যাকে পেত জোরে খামচে দিত, মেয়েদের চুল ধরে টানত। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সান্নিধ্যে যে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, এই আশায় বিচ্ছেদের দুঃখকে দমিয়ে আমার এক চাচাত ভাইয়ের কাছে রেখে আসা হল। খরচ বাবদ আমার চাচাত ভাইকে প্রথমে সাতশো এবং পরে এক হাজার টাকা করে দিতাম। সেই সময় টাকার অঙ্ক কম ছিল না। আমার ছেলের যাতে

কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে সেই ব্যক্তিকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে, চাচাত ভাই ছেলের যত্ন নেয় নি। অসুস্থ ছেলেটি কোনওরকম কষ্ট না পাক, এ জন্যেই সেই আমলের পক্ষে অর্থের পরিমাণ বেশি ছিল। কিন্তু, আমি আমার চাচাত ভাইকে, যার নাম ইসলাম, কিছুই বলি নি। মনে মনে কষ্ট পেয়েছি। মতিন ভালো কিছু খেতে ভালবাসত। আমি তো একরত্তিও কার্পণ্য করি নি, অথচ অবহেলা এবং অযত্নে বহু কষ্টে সে কাটিয়েছে দিনের পর দিন। ইসলাম মতিনের দিকে তেমন লক্ষই রাখে নি। নইলে একজন অসুস্থ কিশোর আমাদের মসজিদ এবং বাড়ির লাগোয়া পুকুরে দিনদুপুরে ডুবে মারা গেল কী করে? ওয়াহিদুল রাহমান ওরফে মতিন আমাদের গ্রাম পাড়াতলীতে আদরযত্নের অভাবের কালো, কর্কশ দাগ সত্তায় নিয়ে প্রস্থান করেছে দুনিয়া থেকে। মাথা কুটে মরলেও ওকে আর ফিরে পাব না কস্মিনকালেও।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে মতিনের কথা। দেখি, সে এসে দাঁড়িয়েছে বিছানার পাশে। সে তাকায় আমার দিকে দরদময় দু'টি চোখ মেলে। ওর দৃষ্টিতে কোনও অভিমান কোনও অপ্রসন্ন ছায়া নেই। এই যে ওর জীবন এমন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল, সে-জন্যে আমিই দায়ী, অন্য কেউ নয়। আমি তো আমার হৃদয়ের টুকরোকে আমাদের গ্রামে পাঠিয়েছিলাম ওর সুস্থতা এবং কল্যাণ কামনা করে। তবু মন মেঘলা আকাশ হয়ে যায় — মনে মনে বলি, মতিন, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না বাবা। আজও হঠাৎ তোর কথা মনে পড়লে, দৃষ্টিপথে তোর মুখ জেগে উঠলে স্মৃতির পর্দায়, আমি বিহ্বল হয়ে যাই, তোর আব্বু ডাক শারদ ভোরের আবা হয়ে যখন চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে। তোকে একটু স্পর্শ করার জন্য, তোকে চুমো খাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। কিন্তু তোকে আমি কোথাও খুঁজে পাই না। মতিন, আমার 'স্মৃতির শহর' বইটি তোকে উৎসর্গ করেছি, এই খবর তুই জেনে যাস নি। তোর জানার পরিধি এত সীমিত যে, অধিক প্রশ্ন করাই অবোধ মনের শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা।

মতিন, আমি জানি পাড়াতলীর মুন্সীবাড়ির একই বিনীত ঘরের দেয়ালে রক্ষিত আমার বড়ো সাইজের একটি ফটো ঝোলানো রয়েছে। তুই ঘন ঘন সেই দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতি। আমি তোকে দেখতে আসব, এমন একটি আশা ছিল তোর। কিন্তু আমি কাজ ফেলে আসতে পারি নি। হায় কাজ, বিড়ম্বনা।

জীবন এরকমই। ওর মৃত্যুর খবর পেয়েও পাড়াতলী যাই নি তখন। ওর প্রতি কি আমার হার্দিক টান ছিল না? ছিল না ছিল না তা আমার হৃদয় জানে, যে হৃদয় আজও এত বছর পরেও অকালমৃত মতিনের জন্যে অশ্রুসিক্ত হয়।

মনে পড়ে, ১৯৬১ সালের মে মাসে মাসে ঢাকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। সরকারের আপত্তি হাওয়ার এক ঝটকায় উড়ে গেল। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের ভাগ্নে বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে প্রধান অতিথি নাকি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আমাকে নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠের জন্যে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে রচিত 'সূর্যাবর্ত' কবিতাটি আবৃত্তি করি। আরও কোনও কবি সেই মঞ্চে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন কি-না, জানি না। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান

গাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের একজন সফল সচিব মুসা আহমদ এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যাতে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি বিঘ্নিত না হয়। অসাধারণ কথাশিল্পী রশীদ করীম মুসা আহমদের ভগ্নীপতি। মুসা আহমদের মতো ধীরস্থির, রুচিবান এবং পরোপকারী ব্যক্তি আমাদের সমাজে খুব বেশি নেই। তিনি অনেকদিন থেকে আমেরিকায় বসবাস করছেন। তিনি ধার্মিক, কিন্তু ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা দেখানোপনা, স্বার্থোদ্ধারের জন্যে লালায়িত হওয়া তিনি বরদাশত করেন না। জনাব মুসা আহমদ আমার কিছু উপকারও করেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে যোগ দেয়ার জন্যে দিল্লি যেতে হয়েছিল পূর্ব বাংলার কয়েকজন সাহিত্যিককে। সেই সেমিনারে আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও ছিলাম। কিন্তু আমার কোনও পাসপোর্ট ছিল না। পাসপোর্ট ছাড়া যাই কী করে। পাসপোর্ট অফিস থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে খুবই অপ্রস্তুত হলাম। পাসপোর্ট পাওয়া গেল না। পাসপোর্ট অফিসের বড়োকর্তা আমাকে চিনতেন। তিনি আমাকে জানালেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ছাড়পত্র দিতে পারছি না, কারণ, আপনার নাম গুণ্ডাদের তালিকায় রয়েছে।' তিনি হাসতে হাসতেই কথাটা বললেন। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। একজন দাগী গুণ্ডার যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি ভগ্ন মনোরথ হয়ে জনাব মুসা আহমদের কাছে গেলাম। মুসা আহমদের কল্যাণে পাসপোর্ট হয়ে গেল আমার।

দিল্লি গিয়ে সেমিনারে যোগ দিলাম প্রসন্নচিত্তে। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তিনজন বক্তার বক্তৃতা শুনে আমার খুবই ভালো লাগল। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নন, জওহরলাল নেহরু এবং এ.কে. ব্রোহি — এই তিনজনই কোনও বই কিংবা সংক্ষিপ্ত নোটস-এ ভর করে বক্তৃতা দেন নি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তাদের বক্তৃতা। সেই কবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নন বক্তৃতা করেছিলেন একটি মাঝারি সাইজের হলরুমে, কিন্তু আজও আমার মনে পড়ে যায় তার ভাষণের কোনও কোনও অংশ। মনে হচ্ছিল একটি মাঝারি সাইজের কবিতা আবৃত্তি করছেন। জওহরলাল নেহরু একটু থেকে থেকে হ্যামলেটের ধরনে শ্রোতাদের শোনাচ্ছেন অন্তর্জগতের কথা। আর এ.কে. ব্রোহির বলার ভঙ্গিতে ছিল যুক্তির আভা, সংগীতের ছোঁয়া।

ষাটের দশকের প্রত্যুষে 'মর্নিং নিউজ' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এলেন একজন তরুণ কবি। প্রশান্ত ঘোষাল তার নাম। তিনি আমাকে 'স্বাক্ষর' নামে একটি ছোটো পত্রিকা উপহার দিলেন। তার সঙ্গে আর কেউ ছিলেন কি-না তা আজ আর মনে পড়ে না। পত্রিকাটি ছিল আগাগোড়া কবিতা-নির্ভর। 'স্বাক্ষর'-এ যাদের কবিতা ছিল তাদের নাম আমি আগে শুনি নি। সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ এবং অশোক সৈয়দ। প্রশান্ত ঘোষালের কবিতাও সম্ভবত ছিল। প্রতিটি নাম আমার কাছে অপরিচিত ছিল তখন। পরে জানতে পারলাম আবদুল মান্নান সৈয়দেরই ছদ্মনাম অশোক সৈয়দ। 'স্বাক্ষর'-এ প্রকাশিত কবিতাবলি যে আমার ভালো লেগেছিল তা বলব না। তবে এই কবিদের কোনও কোনও কাব্যপঙ্ক্তি আমাকে, বলা যেতে পারে, মুগ্ধ করেছিল। দুঃখের বিষয়, 'স্বাক্ষর' ক্ষীণায়ু ছিল। তবে পরবর্তীকালে 'স্বাক্ষর'-এর সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ কবি হিসেবে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন।

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশিত হওয়ার পর বইটি তেমন চলে নি, এমন একটি সংবাদ হাওয়ায় উড়ছিল। এই যে আমার কবিতার বই বেশি বিক্রি হয় নি, এই উড়োখবর আমাকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু এই তথ্য আমাকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। আমার কলমের গতি আগের মতোই এগিয়ে গেছে। আমার কবিতার একজন অনুরক্ত, বোদ্ধা পাঠক আবদুল বারি চৌধুরী একদিন লুঙ্গি-শার্ট পরে 'মর্নিং নিউজ' অফিসে চলে এলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন আমার মুখোমুখি। নিজের সম্পর্কে কিছুই না বলে আমার কবিতা বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেন; সেই দুপুরবেলার পরিচয় কখন যে বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হল, বলতে পারব না। আমার দু'তিনটি কবিতা নীচুস্বরে আবৃত্তি করে শোনালেন। এই প্রকৃত কবিতাপ্রেমী লেখকসংঘে একটি চাকরি জুটিয়ে নেন। লেখকসংঘের প্রধান ব্যক্তি মুনীর চৌধুরী আমার নবলব্ধ বন্ধু আবদুল বারি চৌধুরীকে লেখকসংঘের দফতরে মোটামুটি ভালো একটি চাকরি দিলেন।

আবদুল বারি চৌধুরী অর্থাৎ এ.বি.সি. একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবিতার বই প্রকাশ করার মতো কবিতা আমার কাছে আছে কি-না। আমি আমতা আমতা করে আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে গেলাম।

আবদুল বারি চৌধুরী একদিন আবার জিজ্ঞেস করলেন, একটা বই প্রকাশের মতো কবিতা আমার কোনও বক্সে অথবা লেখার টেবিলের দেরাজে জমা আছে কি-না। আমি বললাম, 'একটি বই প্রকাশের মতো কবিতা রয়েছে প্যাকেটে।' তিনি প্যাকেটটি নিয়ে রওয়ানা হলেন লেখকসংঘ অফিসের দিকে। তিনি সেখানে পৌঁছে আমার পাণ্ডুলিপি মুনীর চৌধুরীর হাতে দেন। মুনীর চৌধুরী কবিতাবলি পড়ে এ.বি.সি.'কে আমার পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্যে প্রেসে দিতে বললেন। বই বাবদ আমার প্রাপ্য টাকাও চটজলদি পেয়ে গেলাম। আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম রেখেছিলাম 'রৌদ্র করোটিতে'। আদমজীর পুরস্কারের জন্য বইটি দাখিল করা হল এ.বি.সি'র মাধ্যমে। আমার তেমন উৎসাহ ছিল না 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র পরিণাম লক্ষ করে। বন্ধু এ.বি.সি. আমার অনীহাকে দূরে ঠেলে নিজেই কয়েক কবি 'রৌদ্র করোটি'তে দাখিল করলেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের জন্যে। এই সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তি বিষয়ে আশা, নিরাশা কিছুই আমাকে ব্যাকুল করে নি।

একদিন দুপুরে আজিমপুর কলোনিতে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন যুবক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে কয়েকজন সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, যাতে আপনি আদমজী পুরস্কারটি না পান। এই ষড়যন্ত্র যাতে সফল না হয়, সে-জন্যে কিছু একটা করুন।' সাহিত্যিকরা এ ধরনের নোংরামিতে লিপ্ত হতে পারেন তা আমি ভাবতেই পারি নি। যিনি ভরদুপুরে আমাকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানান তিনি সালেহ চৌধুরী। তাকে আমি বলেছিলাম, আমার পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়। সালেহ চৌধুরীর কথা যে মিথ্যা নয়, এর প্রমাণ পেয়ে গেলাম পরদিন সকালে। দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর একটি পাতায় বেশ ক'জন প্রবীণ এবং নবীন সাহিত্যিকের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় — 'রৌদ্র করোটিতে'-র বিরুদ্ধে। তাদের মতো করে আপত্তিকর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি যুক্ত করেন বিবৃতিতে। কিন্তু তার আমার পুরস্কারটি ছিনিয়ে নিতে পারেন নি।

## ॥ তেত্রিশ ॥

কোনও বিশেষ কাজের জন্য পুরস্কৃত হলে কার না ভালো লাগে? যদি কেউ বলেন, তার ভালো লাগে না, তাহলে তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবেন। আমি আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে'র জন্য আদমজী পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এই পুরস্কার আমার বাবা-মাকে খুশি করতে পেরেছিল বলে আমি বাস্তবিকই অতিরিক্ত আনন্দের স্বাদ উপভোগ করেছিলাম সেকালে। সেবার কথাসাহিত্যে আদমজী পুরস্কার পান শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসটির জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের আহমদ নাদিম কাসমি পুরস্কৃত হন কবিতার জন্য। তিনি একজন প্রগতিশীল উর্দু কবি। এই বর্ষীয়ান কবি ছোটোগল্প লিখেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। সে বছর কথাসাহিত্যের জন্য কোন উর্দুভাষী লেখক আদমজী পুরস্কার পান তাঁর নাম আমার মনে পড়ছে না। তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে প্রসন্ন হয়েছিলাম। জানি না, তিনি বেঁচে আছেন কি-না। আমার এই লেখা কোনওদিনই তাঁর চোখে পড়বে না। দৈবক্রমে তাঁর দৃষ্টিপথে এলেও তিনি নিশ্চয়ই পড়তে পারবেন না। কারণ, উর্দুভাষীরা বাংলাভাষা রপ্ত করার চেষ্টা সচরাচর করেন না। এ আমার জোরালো অনুমান। যা হোক, সেই ঔপন্যাসিকের অগ্রসর ধ্যানধারণা আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

কবি আহমদ নাদিম কাসমি আমার মতোই স্বল্পভাষী, তাই আমাদের আলাপ বেশিদূর এগোয় নি। তবে এই সামান্য আলাপসূত্রেই মানুষটিকে আমার পছন্দ হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল আন্তরিকতার আভা, বুদ্ধির দীপ্তি। তিনি আমার চেয়ে ১৩ বছরের বড়। জানি না, তিনি বেঁচে আছেন কি-না। আমি তাঁকে দূর থেকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি যাতে আদমজী পুরস্কার না পাই, সে-জন্য যাঁরা আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন তাঁরা অবশ্য বিন্দুমাত্র প্রসন্ন হন নি। তাঁদের সেই মনোভাবের কারণে আমি আদৌ অপ্রসন্ন হই নি। কারণ, আমার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার ব্যক্তির সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। বিশেষত আমার বাবা-মার আনন্দ পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপিত করেছিল আমাকে।

শহীদুল্লাহ কায়সার এবং আমি ১৯৬৩ সালে করাচিতে যাই আদমজী পুরস্কার গ্রহণের উদ্দেশ্যে। করাচিতে সহীদুল্লাহ কায়সারের পরিচিতি আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল সঙ্গত কারণেই। প্রগতিশীল রাজনীতিতেসমর্পিত ছিলেন তিনি। আদর্শের জন্য ঢের জেলজুলুম সইতে হয়েছে সেই হাস্যোজ্জ্বল মানুষটিকে। আখেরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লগ্নে প্রতিক্রিয়াশীল আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন তিনি।

পুরস্কারের অর্থমূল্য আহামরি কিছু ছিল না। তবে সেকালের পক্ষে ভালোই। তবে কবিতার জন্য জীবনের প্রথম পুরস্কার লাভের একটি আলাদা শিহরণ বোধ করেছিলাম। পুরস্কারটি গ্রহণ করতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের হাত থেকে যার বিরুদ্ধে 'হাতির শুঁড়' কবিতাটি লিখেছিলাম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাদের বসতে হয়েছিল একেবারে প্রেসিডেন্টের পাশে। কথাপ্রসঙ্গে আইয়ুব খান আমাকে আমার বইয়ের নাম এবং তার অর্থ অনুবাদ করতে বললেন। আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'সানরেইস অন দ্য

স্কাল'। সেই মুহূর্তে আমার মুখে 'রৌদ্র করোটিতে'র ইংরেজি এরকমই এসেছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মৃদু হাসলেন। অবশ্য সেই মুহূর্তে তাঁর মনে কী অনুভূতির জন্ম হয়েছিল তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় কাজ করতে আর ভালো লাগছিল না। রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ভাবছিলাম, যদি কোনও বাংলা দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ পেতাম তাহলে ভালো হত। সুযোগ এসেও গেল। ১৯৬২ সালের শেষের দিকে ঢাকা থেকে 'জেহাদ' নামের একটি নতুন দৈনিক পত্রিকার জন্মলগ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পত্রিকার মালিক খোশরোজ লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী জনাব মহীউদ্দিন অভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাভাজন সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ জানান। জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন 'আজাদ' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন না। তাই তিনি 'জেহাদ' এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে রাজি হলেন। তবে তিনি পত্রিকার মালিককে আগেভাগে একটি দৈনিক পত্রিকা চালবার প্রয়োজনীয় খরচ ইত্যাদি বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয়টি যে সহজ নয় এবং বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এ কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেন পত্রিকার উৎসুক, উদ্দীপনাময় মালিককে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তো কোনও অনভিজ্ঞ, সদ্য গজিয়ে-ওঠা সাংবাদিক নন, তিনি সাংবাদিকতার অলি-গলি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি।

'জেহাদ' বলা যেতে পারে দিব্যি শান শওকতের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের শেষের দিকে। 'জেহাদ' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর আমি কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সঙ্গে দেখা করে বলি যে, আমার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার খুব ইচ্ছা। তিনি আমাকে 'জেহাদ'-এর সম্পাদক, যিনি তাঁর শ্বশুরও, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কাছে নিয়ে যান। মাননীয় সম্পাদক আমাকে দেখে খুশি হলেন এবং 'জেহাদ'-এর একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগপত্র দেয়ার নির্দেশ দিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে। 'জেহাদ'-এ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মোসলেম আলী বিশ্বাস, ফওজুল করীম, নির্মল সেন, আবদুর রাজ্জাক, আফজাল প্রামাণিক, আসাদুজ্জামান খাঁ আরও কেউ কেউ নিযুক্ত হন সাংবাদিক হিসেবে।

'জেহাদ'-এ নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। কারণ, এর আগে আমি সহকারী সম্পাদকের কাজ করি নি। তবে আবুল কালাম শামসুদ্দীন আমাকে সম্পাদকীয় লেখার কায়দাকানুন শিখিয়ে দেন ধৈর্যসহকারে। পরবর্তীকালে তিনি আমার কাজ পছন্দ করেছেন, এটা টের পেয়েছিলাম। তাঁর শিক্ষা আমার কাজে লেগেছিল, এ-কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। তিনি শুধু একজন বিখ্যাত সম্পাদকই ছিলেন না। একজন উঁচুদরের মানুষ হিসেবেও তিনি শ্রদ্ধাভাজন।

আমি একমাসের বেশি দৈনিক 'জেহাদ'-এ কাজ করি নি। কেন জানি সেই অফিসে মন বসছিল না। 'মর্নিং নিউজ' থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছিলাম। তাই, সেখানে ফিরে যেতে কোনও অসুবিধা হয় নি। কিছুদিন পর 'জেহাদ'ও বন্ধ হয়ে গেল। অভিজ্ঞ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন আগেই পত্রিকার মালিককে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একটি দৈনিক পত্রিকা চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। প্রচুর কাঠখড় কেরোসিন পোড়াতে হয়,

তবে গিয়ে দাঁড়ায় একটি সংবাদপত্র। অভিজ্ঞতার মূল্য যারা দেয় না, তাদের কোনও না কোনওভাবে খেসারত দিতে হয়। আখেরে মালিকানা বদল করেও 'জেহাদ'কে টিকিয়ে রাখা গেল না।

'জেহাদ'-এর একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক সৈয়দ আবদুল কাহ্হার একদিন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সেকালের মন্ত্রী এটিএম মোস্তফার অনুজ ইব্রাহিম তাহার প্রসঙ্গ টেনে বললেন যে, তিনি 'জেহাদ' চালু রাখতে ইচ্ছুক। কিন্তু ইব্রাহিম তাহার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পত্রিকাটি টিকল না। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে লুপ্ত হয় 'জেহাদ'।

এখানে একটি স্বীকারোক্তি করে নেয়া প্রয়োজন মনে করি। যদিও জীবনের বেশিরভাগ সংবাদপত্রে কাজ করে কাটিয়ে দিয়েছি, তবু আমাকে একজন তুখোড় সাংবাদিক বলা যাবে না। সাংবাদিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অবশ্যই আছে, অসীম কৃতজ্ঞতাও বোধ করি জীবনধারণকে সহনীয় করে তোলার জন্য। অনেক প্রবীণ এবং নবীন সাংবাদিকের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি, তাঁদের অনেকের প্রীতিধন্যও হয়েছি। কোনও মতে জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবে কাটিয়ে দিয়েছি। কৌতুকের ব্যাপার, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুরস্কৃতও হয়েছি, যা আমার প্রাপ্য নয়।

কবুল করছি, নিজের কবিসত্তাকে সজীব রাখার প্রেরণায় জীবিকার অবলম্বনকে স্বেচ্ছায় কিছুটা হলেও অবহেলা করেছি। যতটুকু কাজ করলে চাকরি বজায় থাকে তা করেছি, বাকি সময় অর্পণ করেছি অপরূপ সুন্দরী কিন্তু অমনোযোগ-বিদ্বেষী কবিতা নাম্নী দেবীকে। জানি না, এটা অন্যায় কি-না, স্বার্থপরতার নির্লজ্জ উদাহরণ কি-না। যাই হোক, সেই কাজটি আমি করেছি গোড়ার দিকে। পরবর্তীকালে অবশ্য ইচ্ছা সত্ত্বেও দায়িত্ব এড়িয়ে চলার অবকাশ হয় নি। বিস্তর কেজো প্রহর কাটিয়ে কবিতার প্রতি যথাযোগ্য মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এতে নিশ্চয়ই কাব্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হয়ে শাস্তি দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু জীবিকা বজায় রাখতে গিয়ে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছি কোনও নালিশ রুজু না করেই। প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে কতটা সাফল্য অর্জন করেছি তা বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকাকুল।

বাঙালি অথচ উর্দু কবি আহসান আহমদ আশক্-একদিন 'মর্নিং নিউজ' অফিসে খতিব ভাইয়ের কামরায় বসে আলাপরত অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী শামসুর রাহমান, বাংলা কাগজে কাজ করবে?' আমি বললাম, 'ভালো পদ এবং বেতন পেলে অবশ্যই করব।' তিনি জানালেন, 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যে। প্রেস ট্রাস্টের এই পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। আহসান আহমদ আমাকে একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করলেন মাসিক সাতশো পঁচিশ টাকা বেতনে। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে দু'সপ্তাহ ধরে ডামি প্রকাশের পর ৬ নভেম্বর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে গেল একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা। সত্যিকারের নতুন পত্রিকা। এই নতুনকে খোলামনে বরণ করে নিলেন পাঠকসমাজ। যদিও 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর জন্মের পেছনে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও কোনও মহলের প্রভাব

কার্যকর ছিল, তবু এই নতুন পত্রিকা খয়ের খাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি। এক ধরনের স্বাধীনসত্তা হিসেবে গড়ে উঠতে চেষ্টাশীল ছিল। বাধা যে আসে নি, এমন নয়। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা চলছিল পত্রিকাটির সাংবাদিকদের কাজে যাতে খাসদালালের কালিমা না লাগে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর ললাটে। সবসময় দু'কূল রক্ষা করা সম্ভব হত না, তবু একটি রুচিশীল, আধুনিক সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল পাঠকসমাজে। এই পত্রিকায় হাসান হাফিজুর রহমান, সানাউল্লাহ নূরী, আহমেদ হুমায়ুন, আহসান হাবীব, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মোজাম্মেল হক, তোয়াব খান, আলী আশরাফ, ফওজুল করীম, গোলাম রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আফলাতুন এবং আরও কেউ কেউ যুক্ত হন।

আমাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন উদার মানসিকতার অধিকারী। অবসর মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সিনেমা এবং খেলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। তিনি নিজে অনেককিছু বলেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে, আমরাও কেউ কেউ নির্দ্বিধায় আমাদের আপন সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নি, ইয়ার্কি মারা তো দূরের কথা। কখনও বিস্মৃত হই নি তাঁর কীর্তি, বাংলাভাষার জন্য তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে তিনিই প্রথম পদত্যাগ করেন প্রাদেশিক আইন পরিষদ থেকে। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর পেয়েই তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নিজের কোনও বিপদের আশঙ্কাকে আমল না দিয়ে। এমনই ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দীনের নির্দেশে রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই নির্দেশ আমরা মেনে নিতে পারি নি। মুনীর চৌধুরী রচিত এক প্রতিবাদী বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর হাসান হাফিজুর রহমান, আহমেদ হুমায়ুন, ফজল শাহাবুদ্দীন এবং আমি সই করি। এই বিবৃতি 'দৈনিক পাকিস্তান'সহ অন্যান্য সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এতে পাকিস্তান সরকারের কর্তাব্যক্তিগণ খেপে আমাদের বরখাস্ত করার কথা জানান সম্পাদক আবুল কলাম শামসুদ্দীনকে। কিন্তু তিনি কোনও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না বলেই উপরঅলাদের কথা অনুযায়ী কাজ করেন নি, বরং আমাদের পক্ষে তাঁর যুক্তিঋদ্ধ মত প্রকাশ করেন। ফলে আমরা চাকরিচ্যুত হই নি। ব্যাপারটি সামান্য নয়, এটা আশা করি চাকরিজীবী মাত্রই উপলব্ধি করবেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ঔদার্যের কথা অনেকের মতো আমিও কোনওদিন ভুলব না। রবীন্দ্রনাথ-বিরোধী আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশজন লেখক একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, যাতে রবীন্দ্রনাথ বর্জনের উসকানি ছিল। এতে আমাদের সম্পাদকের নামও ছিল। এটি আমার পছন্দ হয় নি। আমার একটি প্রতীকী উপসম্পাদকীয়তে খোদ সম্পাদক সম্বন্ধে কিছু কথা ছিল প্রতীকের আড়ালে। অনেকে তা টের পাবে না। কিন্তু আমাদের সম্পাদক তো সাধারণ কেউ নন, তিনি অবশ্যই বুঝবেন, এই বিশ্বাস আমার ছিল। তিনি লেখাটি বাতিল করে দেন নি। মৃদু হেসে প্রেসে পাঠিয়ে দেন। আমি লজ্জিত হলাম।

## ॥ চৌত্রিশ ॥

যদি বলি, আনন্দিত হতে চাই না, তাহলে মিথ্যাচার করা হবে। আনন্দধারায় প্লাবিত হওযার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রবল। এ জন্য প্রচুর উপকরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এক চিলতে নীল আকাশ, ভাসমান মেঘ, গাছের পাতার মৃদু কম্পন, শিশুর হাসি, একটি উত্তম কাব্য-পঙ্‌ক্তি আমাকে আনন্দিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু এখন আমার জীবন থেকে আনন্দের ঝলক নির্বাসিত। আমাদের দেশে কিছুকাল ধরে সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন চলেছে, প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় খুন এবং ধর্ষণের যেসব প্রকাশিত হচ্ছে, তা যে-কোনও অনুভূতিশীল, বিবেকবান মানুষের ঠোঁট থেকে হাসি মুছে ফেলতে পারে।

সম্প্রতি ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজ কট্টর সাম্প্রদায়িক কিছু লোক হত্যাযজ্ঞে মেতেছে। তারা ইতিমধ্যে চার শ'রও বেশি মুসলমানকে হত্যা করেছে। বিশজনকে পুড়িয়ে মারার খবরও পাওয়া গেছে। তবে এই নারকীয় যজ্ঞ থামাবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ভারত সরকারে পক্ষ থেকে, এই খবর আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি। ভারতে শুভবাদী, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাংলাদেশের মানবতাবাদে সমর্পিত প্রগতিশীল সমাজও এই দাঙ্গাবাজদের দুষ্ক্রিয়াকে নিন্দা জানিয়েছেন। ভারতের দাঙ্গাবাজদের অমানবিক, পশুদেরও লজ্জা দেয়ার মতো দুষ্কর্মের বদলা নেয়ার জন্য বাংলাদেশের কোনও বাসিন্দা যেন অনুরূপ পাশবিক কাজে লিপ্ত না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে সরকার এবং জনগণকে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা একটি ভয়ংকর ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রকোপের শিকার হয় যে সমাজ, তার পরিণতি কখনও শুভ হতে পারে না। আমার বাবা নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বেশ আগে যখন মহাত্মা গান্ধি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নোয়াখালি এবং অন্য দুয়েকটি জায়গা সফর করেছিলেন, সেবার আমার আব্বা একা একটি দোনলা বন্দুক হাতে আমাদের গ্রাম পড়াতলীতে একদল দাঙ্গাবাজকে বুখে দিয়েছিলেন কিছুসংখ্যক কৈবর্তের প্রাণ রক্ষার তাগিদে। এই ঘটনা আমার জানা ছিল। মা-বাবার সুচেতনার প্রভাবেই আমি অনেক আগে থেকেই অসাম্প্রদায়িক হতে পেরেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

এটা তো আমরা লক্ষই করলাম, সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কী ভয়াবহ নির্যাতনই না শুরু হল। হত্যা, নিপীড়ন, ঘরবাড়ি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ কিছুই বাকি রইল না। এ আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, যাকে সরকার তেমন আমলই দেন নি। 'অতিরঞ্জন' হিসেবে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। ফলে কোনও বিবেকবান, মানবিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে আড্ডায় অথবা নিরালায় হেসে ওঠা অথবা মশকরাকে প্রশ্রয় দেয়া কঠিন। বিরূপ ঘটনাপ্রবাহ যার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করে. সে হাসবে কী করে? তাই, ইদানিং আমার মতো অনেকেরই মুখের হাসি লুপ্ত হয়েছে। আমাদের অনেকের মনেই এখন ধ্বনিত হচ্ছে এক ধরনের আর্তনাদ।

আপাতত বর্তমানকে খানিক দূরে সরিয়ে রাখি, কাছে টেনে নিই অতীতকে। প্রথম যেদিন 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসে হাজির হলাম, সেদিন সত্যি বলতে কী, মন খারাপ হয়ে গেল। এই অফিসের বাড়িটি টিপু সুলতান রোডে ভাড়া করা হয়েছিল সেটি জরাজীর্ণ, কদিমী দোতলা। ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ি কম্পমান, নড়বড়ে। দেয়াল থেকে চুন বালি পড়ো-পড়ো। সম্পাদকের হতশ্রী কামরাটি, যতদূর মনে পড়ছে কাঠের দেয়াল দিয়ে সাধারণ বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো সম্পাদকের পক্ষে ঘরটি ছিল অত্যন্ত বেমানান। ম্যানেজিং এডিটর আহসান আহমদ আশ্‌ক-এর ঘরটিও তেমন সুবিধার ছিল না। জ্বলজ্বলে মধ্যদুপুরেও কামরাটি ছিল আঁধার-ঘেরা। নিউজ রুমের হতদরিদ্র অবস্থা দেখে মন দমে যেত। আমাদের সহকারী সম্পাদকদের আস্তানা ছিল সবচেয়ে করুণ। ঘেঁষাঘেষি করে আমরা বসতাম সেই এতটুকু দীন কামরায়, যেখানে পাশের বাড়ির রান্নাঘরের ধোঁয়া নির্দ্বিধায়, অকাতরে ঢুকে পড়ত বেচারা সহকারী সম্পাদকের দীর্ঘস্থায়ী সাহচর্যদানের বিবেচনাবোধে! এ হেন পরিবেশেই সেকালে আমাদের কাজ করতে হত। আশা ছিল, ভবিষ্যতে উন্নত পরিবেশ জুটবে কাজ করার জন্য।

আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অভিজ্ঞ এবং প্রগতিশীল। নিউজ এডিটর মোজাম্মেল হক শুধু সাংবাদিক হিসেবেই সুনামের অধিকারী ছিলেন না, ভালো মানুষও ছিলেন তিনি। সবার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করতেন। ১৯৬৫ সালে কায়রো বিমান দুর্ঘটনা মোজাম্মেল হকসহ বেশ ক'জন সাংবাদিককে জীবন এবং কর্মক্ষেত্র থেকে ছিনিয়ে নেয়।

মোজাম্মেল হকের হাসিদীপ্ত মুখ এতকাল পরেও মাঝে মাঝে হাজির হয় আমার স্মৃতির প্রান্তরে। তার সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মোজাম্মেল হক আমার কোনও আত্মীয় ছিলেন না। কিন্তু কোনও আত্মীয়, এমনকি, আমার কোনও অতি প্রিয়জনের মৃত্যু কি আমাকে এতটা শোকবিহ্বল করতে পেরেছে? আত্মীয়তার সম্পর্ক তাঁর সাথে ছিল না বটে, কিন্তু আমার আত্মার এত বড়ো আত্মীয় আর কেউ ছিলেন এমনও তো মনে পড়ে না। তাঁর সাথে আমার এই যে আত্মার আত্মীয়তা, এর সূচনা তাঁর সাথে যখন আমার প্রথম পরিচয়, প্রায় তখন থেকেই। এর মূলে ছিল তাঁর অমলিন চরিত্রবল, অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা, অপূর্ব কর্তব্যজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর রুখে দাঁড়াবার দুর্জয় মনোবল। তিনি ছিলেন এককথার মানুষ। কথা দিয়ে কখনও তাঁকে কথার খেলাপ করতে দেখি নি। এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ আজ বড়ো একটা দেখা যায় কি? তা'ছাড়া তিনি ছিলেন যাকে বলে জাত-সাংবাদিক, তা-ই। প্রায় ১৫ বছর আগে যখন তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, তখনি তাঁর সাংবাদিকতার সততা, সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতায় আমি মুগ্ধ হই।'

সাংবাদিক মোজাম্মেল হকের সঙ্গে আমার পরিচয় যদিও খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না, তবু তার কথা এবং ব্যবহারে টের পেতাম তিনি আমাকে অপছন্দ করতেন না, বরং বেশ পছন্দই করতেন। এমএন রায়ের প্রতি অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা আমি লক্ষ করতাম তাঁর কথা শুনে।

যা বলছিলাম, একটি দমিয়ে-দেয়া পরিবেশে কাজ করতে হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা। কাজের শুরুতে অথবা শেষে আমরা মানে সানাউল্লাহ নূরী, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, আহমেদ হুমায়ূন, ফজল শাহাবুদ্দীন এবং কখনও কখনও আফলাতুন তুমুল আড্ডা দিতাম। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে বাড়ি ফিরতাম।

আমাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ঘরেও কখনও-সখনও আড্ডা জমত। তিনি আমাদের ভালোবাসতেন, এই সত্য অনুভব করতে তেমন দেরি হয় নি। আমি একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলার তাগিদে সম্পাদকের কামরায় ঢুকেই দেখি একজন ভদ্রলোককে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মুখোমুখি বসে থাকতে। আমি ফিরে যেতে চাইলাম আমাদের ঘরে। কিন্তু কিয়দ্দূর থেকেই আমাদের উদার সম্পাদক আমাকে ভেতরে আসার সঙ্কেত জানালেন। ইতিপূর্বে সেই অতিথিকে আমি কখনও দেখি নি। তবু তাঁকে সালাম জানালাম। আবু কালাম শামসুদ্দীন বুঝতে পারলেন, আমি তাঁর অতিথিকে চিনতে পারি নি। তিনি হাসিমুখে আমাকে বললেন, 'ইনি আবুল মনসুর আহমদ আর ইনি শামসুর রাহমান, কবি এবং আমাদের একজন সহকারী সম্পাদক।'

সম্ভবত এই প্রথমবার এবং শেষবারের মতো আমাদের পত্রিকায় তিনি এসেছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের বুদ্ধিদীপ্ত, বলিষ্ঠ চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ লক্ষ করলাম। তিনি সাহিত্য নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন, কিন্তু স্মৃতিবিভ্রম ইদানিং আমাকে এতদূর ভোগাচ্ছে যে দূর-অতীত কিংবা নিকট অতীতের অনেক কথাই মনে নেই। স্মৃতির সঙ্গে কোনও জোচ্চুরি করব না, এমন একটি শপথ নিজের সঙ্গে বলা যেতে পারে, চুক্তি করে রেখেছি, এই সামান্য আত্মজীবনী লেখার শুরুতেই। 'ফুড কনফারেন্স' এবং আরও কিছু বইয়ের লেখক আবুল মনসুর আহমদ, যতদূর মনে পড়ে, ঈষৎ লক্ষ্মীট্যারা ছিলেন। এরপর তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয় নি। তবে তাঁর বাক্যের ধার ভোলা যায় না। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য মনে করেন অনেকেই।

জানি না, বলা ঠিক হবে কি-না, তবু সত্যের তাগিদে কিছু বলা দরকার বলে মনে করি। আহসান আহমদ আশক্ ফজল শাহাবুদ্দীনকে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সাহিত্য সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি আহসান আহমদ আশক্‌কে বললাম যে, এই পদে আহসান হাবীবকে নিযুক্ত করলে সুফল হবে। প্রথমে ম্যানেজিং এডিটর আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমার পীড়াপীড়ির ফলে আখেরে তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সেই সময় আহসান হাবীব 'ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স'-এ কাজ করতেন। কিন্তু সেই কাজটি তাঁর কাছে আর ভালো লাগছিল না, এ-কথা তিনি আগে আমাকে নানা গল্প করতে গিয়ে বলেছিলেন। কথাটি তিনি বলেছিলেন 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর জন্মলগ্নের অনেক আগে।

তাঁর সে কথা আমি ভুলিনি। কারণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজে লিপ্ত থাকা মানসিক কষ্ট অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আখেরে তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'দৈনিক বাংলা'য় রূপান্তরিত হয়, তার সহিত্যের পাতা সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন

করেন আমৃত্যু। তিনি সম্পাদক হিসেবেও খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করেছিলেন। আমরা যারা সেই পত্রিকায় বহুবছর কাজ করেছি, তাঁর স্নেহধন্য হয়েছি, কবি ও সাহিত্য-সম্পাদক আহসান হাবীবের কথা যতদিন এই দুনিয়ায় আলোছায়া উপভোগ করব, ততদিন কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখব, যেমন রেখেছি বরণীয় লেখক এবং সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে।

'দৈনিক পাকিস্তান'-এ প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি সম্পাদকীয় এবং একটি উপসম্পাদকীয় লিখতে হত। আমি ছদ্মনামের আড়াল নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধাঁচে একটি কলাম লিখতাম। অনেকদিন 'মৈনাক' ছদ্মনামে অনেক কলাম লিখেছি। বেশ কয়েক বছর পরে আমি যখন 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক হলাম কলাম লেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম অফিসের নানা ঝামেলা এবং সমস্যা মেটানোর ঘর্মাক্ত কার্যাদির প্রকোপে। একদিন দুপুরে নামজাদা সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী টেলিফোনে বললেন, 'আপনি কলাম লেখা বন্ধ করে দিলেন কেন?' আমি তাঁর প্রশ্নের জবাবে জানালাম, 'আমার এসব লেখা লিখলেই বা কী, না লিখলেই বা কী। আপনি যা লেখেন তা অসংখ্য পাঠক পড়েন, উপভোগ করেন খুব। আমি নিজেও সেই পাঠকদের একজন।' জহুর ভাই বললেন, 'আমি লিখি সাধারণ পাঠকদের জন্য, নানা সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আমার লেখা হল মরুভূমি আর আপনার লেখা মরূদ্যানের মতো, আপনার লেখা আমি উপভোগ করি।'

জহুর হেসেন চৌধুরীর মতো একজন জাঁদরেল সম্পাদকের তারিফ শুনে আন্দোলিত হয়েছিলাম সেই জ্বলজ্বলে দুপুরে। কিন্তু কলাম লেখার মতো মানসিক অবস্থা তখন নানা কারণে ছিল গরহাজির। তবে নানা ঝুটঝামেলার চড়চাপড় খেয়েও কোনও কোনও মধ্যরাতে কবিতা লিখতে যত্নশীল হয়েছি। কোনও কোনও রাতে একট কবিতা লিখে উঠতে পেরেছি, কোনও কোনও রাত ভোরের আলোয় নেয়ে ওঠার পরেও একটি কি দু'টি পঙ্‌ক্তিও রচিত হয় নি। কবিতা লেখা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ধরে বসে আছি। সেই ময়ূরপঙ্ক্ষী নাও ডুবে যাবে ঘোর কুয়াশায়, না-কি চলতে থাকবে আমার নিশ্বাস যতদিন না ফুরোয়।

## ॥ পঁয়ত্রিশ ॥

স্মৃতি এমনই একটি ব্যাপার, যা কোনও নিয়ম কিংবা রীতি মেনে চলে না। স্মৃতিধারা বড়ো বেয়াড়া। একটি ঘটনা যা আগে, বেশ আগে ঘটেছে, মনে পড়ে গেল এখন, আবার ঠিক আজকের কাণ্ডকারখানা আজকে ঠিকই মনে দাগ কাটল, কিন্তু সম্ভবত কখনও স্মরণপথে উদিত হবে না। এভাবে যে কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে যায় এবং কিছু সামান্য বিষয় ঘুরে-ফিরে স্মরণের দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায় অকাতরে। সাহিত্যে স্ট্রিম অফ কনসাসনেস অর্থাৎ চেতনা-প্রবাহ বলে একটি বিষয় যে রয়েছে, তা অনেকেই জানেন। ধরা যাক, কোনও উপন্যাসের একটি মুখ্য চরিত্র চেয়ারে বসে কিংবা বিছানায় শুয়ে চিন্তা করছে তার বর্তমান পরিস্থিতি কিংবা ঘটনার কথা, সেই ঘটনার

সদ্য-স্মৃতি থেকে চেতনা-প্রবাহ এক নিমেষে চলে গেল কয়েক বছর আগের জীবিত অথবা মৃত এক ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত কোনও ঘটনার — একেই আমরা চেতনা-প্রবাহের একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই ব্যাপারটি শুধু কোনও গল্প উপন্যাসের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়, আমাদের অনেকের জীবনেই কখনও কখনও অথবা হামেশা চেতনা-প্রবাহ বয়ে যেতে পারে। বয়ে যায়ও; কেউ কেউ টের পায়, অনেকে পায় না। অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না।

এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে কোনও কোনও মুখ, যা আমার স্মৃতি-প্রবাহে ভেসে ওঠে নি, অথচ ভেসে ওঠা উচিত ছিল। সেদিন আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল মরহুম আবুল মনসুর আহমদের বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। জীবনে তাঁকে একবারই দেখেছি, কিন্তু তিনি আমার মনে আজ অব্দি ভাস্বর হয়ে আছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং এ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য। তিনি 'ফুড কনফারেন্স' নামে একটি বই লিখেছিলেন, এ-কথা আমি আগেও বলেছি। কিন্তু উল্লেখ করি নি 'আয়না'র মতো সেকালে সাড়াজাগানো বইটির কথা। ইচ্ছে করে নয়। 'আয়না' আমি পড়ে প্রচুর উপভোগ করেছিলাম ব্যঙ্গশূলে বিদ্ধ চরিত্রগুলোর কাণ্ডকারখানা লক্ষ করে।

আবুল মনসুর আহমদ জাত সাংবাদিক ছিলেন। ধারালো ছিল তাঁর লেখনী। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দৈনিক ইত্তেহাদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই তুখোড় লেখক ও সাংবাদিকের অবদান ঈর্ষাযোগ্য। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ তো করেই ছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরিচালিত স্বরাজ দলের একজন কর্মীও ছিলেন। আওয়ামী লিগের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসেবেও তাঁর নাম আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' পরে 'শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু' দুটি বইও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবুল মনসুর আহমদ ১৯৬০ সালে গল্পকার হিসেবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান।

টিপু সুলতান রোডের ৫০ নম্বর সেই নড়বড়ে পুরনো বাড়িটিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ আরেকজন প্রবীণ লেখক আসতেন। নাজিবুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান তাঁর নাম। তবে তিনি লিখতেন নাজিবুল ইসলাম নামে। সেকালে, তখনও পাকিস্তানের জন্ম হয় নি, শিশু-সাহিত্য এবং উপন্যাস লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন পোশাক-পরিচ্ছদে কেতাদুরশ্ত সেই লেখক। আমি তাঁকে যতবার 'দৈনিক পাকিস্তান' কার্যালয়ে দেখেছি, তিনি ধোপদুরশ্ত শার্ট এবং ট্রাউজার পরিহিত লক্ষ করেছি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। নাজিবুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান স্বল্পভাষী ছিলেন বলে আমার ধারণা। কখনও সখনও মৃদু হাসতেন। বসতেন আমাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কামরায়। অন্য কোনও কামরায় তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমরা যারা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সহকারী সম্পাদক ছিলাম অর্থাৎ হাসান হাফিজুর রহমান, সানাউল্লাহ

নূরী, আহমেদ হুমায়ুন, মোহাম্মদ মাহ্‌ফজউল্লাহ্‌ এবং আমি ছদ্মনামে প্রতিসপ্তাহে একটি করে কলাম লিখতাম। আমাদের পত্রিকার দু'জন অতিথি কলামিস্ট ছিলেন নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এখানে বলে রাখা ভালো, ফজল শাহাবুদ্দীন এবং নির্মল সেনও কলাম লিখতেন 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিস ১নং ডিআইটি অ্যাভিনিউতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর। আমরা প্রত্যেকেই লিখতাম ছদ্মনামে।

সেকালে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান শুধু একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেই খ্যাত ছিলেন না, তাঁর সম্পাদনায় 'ছায়াবীথি' নামে একদা একটি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকাও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ ছিল। 'ছায়াবিথী'র সম্পাদকের অনুরোধে 'অগ্নিবীণা'র কবি কিছুসংখ্যক কবিতা ও গান লিখেছেন সেই পত্রিকায়।

নাজিরুল ইসলাম 'দূরে দূরান্তরে, গ্রেট ব্রিটেন' শীর্ষক একটি ভ্রমণকাহিনীরও রচয়িতা। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' তাঁর তিন খণ্ডে রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, যা নিয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত তর্ক করতেই পারেন, কিন্তু উপেক্ষা করতে বিফল হবেন।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের অন্যান্য রচনা থেকে গবেষণামূলক রচনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত গুণীমহলে। কবিবন্ধু এবং একদা আমার সহকর্মী সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাছে শুনেছি, নাজিরুল ইসলামের পারিবারিক জীবন সুখকর ছিল না। তিনি বেশ ক'বছর তাঁর জীবনসঙ্গিনী থেকে এক বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। এই নিঃসঙ্গতা তাঁর সঙ্গী ছিল আমৃত্যু। অসুস্থতার হিংস্র আঘাতে এই লেখক মৃত্যুবরণ করেন। পরিচিত দু'তিনজন তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে৺ মর্গে। তারপর কবর দেয়া হয় তাঁকে।

কেউ কেউ আমার 'কালের ধুলোয় লেখা' পড়ে মন্তব্য করেছেন, আমি নাকি আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে অন্যদের বিষয়ে বেশি লিখে থাকি, নিজের সম্পর্কে বাক্য খরচ করি কম। তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করি না। তাদের অভিযোগ মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। তবে আমার বিনীত নিবেদন হল, যাদের আমি দেখেছি, যাদের সঙ্গে কথা বলেছি অনেকদিন, তাদের কথা বিশদভাবে লিখলে কি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অত্যাবশ্যক? অন্যদের কথা বলতে গিয়ে তো আমার নিজের কিছু কথা বলা হয়ে যায় অন্তরঙ্গতার ছোঁয়ায়।

পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলন 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান 'নতুন কবিতা' সম্পাদনা করেন। সঙ্কলনটি হাবীবুর রহমানের কয়েকটি কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছিল। সঙ্কলিত কবিদের আড়ম্বরপূর্ণ পরিচিত রচনা করেছিলেন মোহাম্মদ মামুন। আজ সেসব পরিচিতির কথা স্মরণ করলে, সত্যি বলতে কী, হাসি পায়। কাউকে শেলি, কাউকে কিটস হিসেবে গণ্য করে আমার মতো সদ্য শুরু-করা আনাড়ি কবির পরিচিতিও রচিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের প্রত্যুষে। 'নতুন কবিতা'র কবিদের মধ্যে পাঠকসমাজে বেশি পরিচিত ছিলেন হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ। সঙ্কলিত কবিদের

প্রত্যেকের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে ওয়ার্সি বুক সেন্টারের কিঞ্চিৎ সহায়তায় 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হয়। হাসান হাফিজুর রহমান কবিতা ও টাকা দিতে রাজি হন নি। আমি তাকে, বলা যেতে পারে, কবিতা দেয়ার জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি করেছিলাম। বন্ধুর অনুরোধ তিনি ঠেলে সরিয়ে দিতে পারেন নি। এই অঞ্চলের প্রথম কাব্যসঙ্কলনে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা থাকবে না, এ-কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল। সেকালে 'নতুন কবিতা'র কবিদের মধ্যে হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী এবং আলাউদ্দিন আল আজাদেরই খ্যাতি ছিল বেশি।

হাবীবুর রহমানের প্রবল পাঠস্পৃহা থাকা সত্ত্বেও তিনি আর্থিক অনটনের দরুন উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনো চালাতে পারেন নি। জীবন রক্ষার তাগিদে প্রথমে কয়লা খনিতে কাজ শুরু করেন। পরে সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি 'ইত্তেহাদ', 'আজাদ', 'মিল্লাত' এবং 'সংবাদ'-এর বিখ্যাত পত্রিকায় কাজ করেছেন। হাবীবুর রহমান প্রায় সতেরো বছর ঢাকার ইউসিএস-এর বাংলা অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আগ্রহ এবং আমার দক্ষতার ওপর ভরসা ছিল বলেই তিনি আমাকে মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্টের কয়েকটি কবিতা অনুবাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে হতাশ করি নি। আমার রবার্ট ফ্রস্টের কবিতাবলির অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। ফলে হাবীবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ফ্রস্টের কবিতাবলির বাংলা অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। অনুবাদকর্মটি বেশ পাঠকনন্দিত হওয়ার কারণে বইটির দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় বৃহদাকারে। অর্থাৎ রবার্ট ফ্রস্টের অর্ধশত কবিতার অনুবাদ ছিল দ্বিতীয় সংস্করণে।

আমার হঠাৎ পাওয়া বন্ধু দেলোয়ার হোসেন খান এই অনুবাদ গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হন ক'বছর আগে। কিন্তু স্বত্বাধিকারের জটিলতার দরুন তাঁর উদ্দীপনা আজ অব্দি বাস্তবে অনূদিত হয় নি। বহুদিন তাঁর সঙ্গ এবং কণ্ঠস্বর থেকে বঞ্চিত আছি আমি। ডিএচকে অর্থাৎ আমার সেই সুহৃদ এবং তাঁর জীবসঙ্গিনী সুলতানা খানের সঙ্গে অনেকদিন যাবৎ দেখাসাক্ষাৎ নেই। কী করে ভুলব তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা, রুচিশীল তুমুল নৈশ আড্ডা? দু'জনই কবিতাপ্রেমী এবং কবিতা লেখেন। শুনেছি দেলোয়ার হোসেন খান সম্প্রতি ব্যবসা করছেন। তাঁদের অর্থাৎ চমৎকার যুগলের জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় থাক। কল্যাণ হোক গোটা পরিবারের।

যা বলছিলাম, কবি এবং শিশু-সাহিত্যিক হাবীবুর রহমান আমাকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি আমাকে 'শামস্' বলে ডাকতেন। এই বাক্যটি বিশেষ কারণে লিখলাম। আমার নামের দুটো অংশ বিদ্যমান অর্থাৎ শামসুর রাহমান। অনেকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য শামসু অথবা শামসুর বলে থাকেন। কিন্তু দুটি শব্দই বেঠিক। 'উর' আরবি শব্দটির বাংলা হলো 'ওর'। শামস্ মানে সূর্য। 'শামসুর' বললে দাঁড়ায় সূর্যের। আর এটা কারও নাম হতে পারে না। 'শামসু'-ও অর্থহীন। বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র হাবীবুর রহমানকেই দেখেছি যিনি আমাকে আমার নামের অর্ধাংশ শুদ্ধ এবং চমৎকারভাবে উচ্চারণ করতেন। তাঁর সেই সুশীল সুন্দর সম্বোধনের অভাব বড়ো বেশি বোধ করি।

তিনি তাঁর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন 'উপান্ত' নামের একটি ভালো কবিতার বই। সনেট লেখার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল তাঁর। বাংলাদেশের শিশুদের জন্য তিনি রেখে গেছেন 'আগডুম বাগডুম', 'সাগর পারের রূপকথা', 'বিজন বনের রাজকন্যা', 'লেজ দিয়ে যায় চেনা', 'বনে বাদাড়ে', 'পুতুলের মিউজিয়াম', 'গল্পের ফুলঝুরি', 'হীরা মতি পান্না'র মতো ছোটোদের মনে আনন্দ জাগানিয়া বেশ কিছু বই।

'দৈনিক সংবাদ'-এ 'খেলাঘর' নামে ছোটোদের জন্য যে পাতাটি বরাদ্দ থাকে প্রতি সপ্তাহে তার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন কবি এবং শিশু-সাহিত্যিক হাবীবুর রহমান। তিনি সেই বিভাগটি পরিচালনা করতেন 'ভাইয়া' নামের আড়ালে। তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তিকেই মানায় এই গুরুদায়িত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া। দুঃখের বিষয়, এখন হাবীবুর রহমানের মতো ব্যক্তি বিস্মৃতপ্রায়, যেমন বিস্মৃত নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অতীতে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁদের কাছে ঋণী এদেশের মানুষ। স্মৃতিপট থেকে তাঁরা মুছে যাচ্ছেন, এটা কি শুভ চিহ্ন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য? কখনও নয়।

## ॥ ছত্রিশ ॥

ভুল তো মানুষেরই হয়। ছেলেবেলায় মুরুব্বিদের কাছে শুনেছি, ফেরেশ্‌তা আর শয়তানের ভুল হয় না। তাই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, জীবনে অনেক ভুল করেছি, এই বয়সেও যে করছি না, এমন নয়। ভুলের জন্য অনেক খেসারতও দিয়েছি, এখনও দিতে হচ্ছে। কখনও কখনও সামান্য ভুল করে ফেলি, আবার কখনও কখনও ভুলের মাত্রা বেশ বড়ো হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তিও হয় বড়ো ধরনের। এই লেখার ব্যাপারটাই ধরা যাক, আমার কলম থেকে এমন কথা বেরিয়ে যায়, প্রকাশিত হয় ছাপার অক্ষরে, যা ভুল। তবে হলফ করে বলতে পারি, সেই ভুলটি ইচ্ছাকৃত নয়। এই যে আমি আত্মজীবনী লিখছি কিছুদিন ধরে, এই লেখায় আমি কোনও মিথ্যা লিখি না, সবসময় খেয়াল রাখি যাতে আমার কলম থেকে শুধু সত্যই নিঃসৃত হয়। স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে মিথ্যাচারে লিপ্ত হব না কস্মিনকালেও। আমার মা শৈশবে আমাকে একবার বলেছিলেন, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলো না। মিথ্যা উক্তি যে অন্যায়, অপরাধ, এই শিক্ষা ধর্মে সমর্পিতা মায়ের কাছেই পেয়েছি।

যা হোক, আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর প্রতিষ্ঠা বছরে। সে-বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পঞ্চাশ হাজার পাহাড়ি ভারতে আশ্রয় খুঁজে নেয়। সেই বছরেই নারায়ণগঞ্জ মিলে বাধে দাঙ্গা। তারিখটি ছিল চৌদ্দই জানুয়ারি। ষোলোই জানুয়ারি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' ইস্তাহারটি প্রচারিত হয়। ফলে অশুভ দাঙ্গা প্রসারিত হতে পারে নি। একই বছরের শেষের দিকে ঢাকা থেকে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

আমরা যারা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সাংবাদিক ছিলাম তারা কেউই সরকারের খয়ের খাঁ ছিলাম না। জীবিকার তাগিদেই পত্রিকাটিতে যুক্ত হয়েছিলাম। কখনও কখনও সরকারের

পক্ষে লিখতে হয়েছে সত্য, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কিছু লিখতাম না। আমি নিজে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি নি, কিন্তু প্রগতি এবং কল্যাণের পক্ষে সর্বদা নিবেদিত ছিলাম। বড়াই করার জন্য এ-কথা উচ্চারণ করি নি, সত্যের অনুরোধেই বলেছি।

সম্ভবত ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ভোরবেলা অফিসে আমার নির্ধারিত চেয়ারে বসে সেদিনের পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিলাম, এমন সময় একজন সদ্যতরুণ ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠস্বরে। আমি তাকে ভেতরে আসতে বললাম। ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীতে তার গায়ে কোনও শীতবস্ত্র নেই। হালকা শার্ট আর ট্রাউজার পরিহিত সেই প্রায়-কিশোরকে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলাম, অবশ্যই আসন গ্রহণের জন্য। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, শীত করে না?' জবাব পেলাম 'জি-না'। অতিথির ঠোঁটে মৃদু হাসি। খানিক থেমে বলল, 'আমাকে তুমিই বলুন। আমার নাম ভুঁইয়া ইকবাল। আমি একটি কবিতাপত্র প্রকাশ করতে চাইছি। আপনার একটি কবিতা আমার দরকার।'

অনেকদিন আগেকার কথা। ভুঁইয়া ইকবালের পত্রিকাটির নাম ছিল, যতদূর মনে পড়ছে 'পূর্বলেখ'। আমি তাকে ক'দিন পরে একটি কবিতা দিয়েছিলাম। সম্ভাব্য পত্রিকাটি আদৌ প্রকাশিত হবে কি-না তা না জেনেই। ভুঁইয়া ইকবালের কণ্ঠস্বরে নয়, ওর চশমার আড়ালে দীপ্ত দৃষ্টি লক্ষ করেই বুঝতে পারলাম সে দৃঢ়চেতা এবং নিজের কাছে সঙ্কল্পবদ্ধ। তাকে শনাক্ত করতে আমার ভুল হয় নি। আঠার বছরের এই তরুণ বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর। 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র' অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি হাসিল করেছেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই উপহার দিয়েছেন পাঠকদের। ভুঁইয়া ইকবালের খ্যাতি আমাকে আনন্দিত করে খুবই। কারণ তাকে আমি চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখেছি। আরও ভালো লাগে এ কারণে যে, কোনওরকমের অহমিকাকে ঠাঁই দেন নি তার মনের গভীরে অথবা বাইরের আচরণে। অনেকদিন তাকে দেখি নি, তাতে কিছু এসে যাবে না কারও। বিলম্বে হলেও প্রিয়জনদের দেখা পেলে ভালোই তো লাগে। মন ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। তাই নয় কি?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আরেকজন অধ্যাপক আছেন, যিনি আমার প্রিয়জনদের অন্যতম। আমি বিশিষ্ট কবি ময়ুখ চৌধুরীর কথা বলছি। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে একজন সুখ্যাত অধ্যাপক। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি একজন খুবই প্রিয় শিক্ষক। তার পড়াবার চমৎকার স্টাইল, বাকভঙ্গি এবং বক্তব্যের সারবত্তার জন্য। আমি তার ক্লাসের ছাত্র নই, তার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ কিছুকাল আগে থেকে, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে চট্টগ্রামে ফিরে যেতেন না। হামেশা মধুর হাসি খেলা করত।

মাঝখানে তার বিষয়ে আমি একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হই কারও কারও কথা শুনে। তবে কিছুদিন পর তিনি ঢাকায় আমার বাসায় এলে নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা লুপ্ত হয়। বুঝতে পারলাম সংবাদবাহকগণ ভুল খবর পরিবেশন করেছিলেন। ময়ুখ চৌধুরীর কোনও কবিতার বই আমার কাছে নেই। তবে তার বেশ কিছু কবিতা

পড়ার সুযোগ পেয়েছি পত্রপত্রিকায়। তার প্রায় প্রতিটি কবিতায় একজন প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্র্যের ছাপ বর্তমান। তার কবিতায় চালাকি অনুপস্থিত, তিনি বিরলপ্রজ, কিন্তু যা লেখেন তাতে প্রতিভার ছাপ থাকে।

ময়ূখ চৌধুরীর কবিতা বিষয়ক আলোচনায় একজন রসজ্ঞের পরিচয় পরিস্ফুট। ছাত্রাবস্থায় তাকে কবিতা বিষয়ে গবেষণামূলক একটি সন্দর্ভ রচনার দায়িত্ব দেয়া হয়। বিষয় হিসেবে শামসুর রাহমানের কবিতা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষক কর্তৃক প্রশংসিত সেই রচনাটি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন, মনে পড়ে। সেই সন্দর্ভে তার মেধার ঝলক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বহুদিন ময়ূখের সঙ্গে দেখা নেই। আমাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব রচিত হয়ে গেছে। জানি না, এই দূরত্ব শুধু স্থানিক না-কি মানসিকও। মানসিক হলে খুব খারাপ লাগবে আমার। আমি তাকে পছন্দ করি খুবই।

'দৈনিক পাকিস্তান'-এ ছোটোদের জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি পাতা বরাদ্দ হয়েছিল। এই পাতাটির নাম ছিল 'সাত ভাই চম্পা'। আমি এই নাম রেখেছিলাম। আরও কোনও কোনও পাতার নামকরণের দায়িত্ব পালন করেছিলাম আমি।

হঠাৎ একদিন 'সাত ভাই চম্পা'র সম্পাদক আফলাতুন তার পাতার জন্য আমার একটি লেখা দাবি করলেন। আমি তো হতবাক। ছোটদের জন্য লেখার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। শুধু ১৯৫০ সালে বিখ্যাত ছড়াকার এবং সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত ছোটোদের পত্রিকা 'হুল্লোড়'-এ একটি নড়বড়ে ছড়া লিখেছিলাম। 'হুল্লোড়' সেকালের একটি ভালো পত্রিকা বলেই খ্যাত হয়েছিল। ফয়েজ আহমদের একটি আকর্ষণীয় স্বভাব ছিল সেকাল থেকেই। ফলে তার পত্রিকার দপ্তরে অনেক কবি সাহিত্যিক এসে রীতিমতো জম্পেশ আড্ডায় মেতে উঠতেন, সহনীয় হুল্লোড় করতেন। সেই আড্ডায় ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন যেমন আসতেন, তেমনি কামরুল হাসান, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সরদার জয়েনউদ্দিন, আবদুল গনি হাজারী, আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ শিল্পী-লেখকরা আসতেন আড্ডার টানে। আমিও শরিক হয়েছি কখনও-সখনও।

যা বলছিলাম, আফলাতুন শেষ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে একটি চলনসই ছড়া আদায় করে ছাড়লেন। কিন্তু, তিনি সেই একটি লেখা ছেপে ক্ষান্ত হন নি। তার অনুরোধ রাখতে গিয়ে আমাকে আরও কয়েকটি ছড়া লিখতে হল। ইতোমধ্যে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর 'সাত ভাই চম্পা' বিভাগে আমার কয়েকটি ছড়া পড়ে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই তার সম্পাদিত মাসিক 'কচি ও কাঁচা'র জন্য আমার কাছে লেখা চাইলেন। আমার বেশ কয়েকটি ছড়া সেই পত্রিকায় ছাপা হল। সেখানকার একটি ছড়া এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত সঙ্কলনগ্রন্থে স্থান পেল। সেই সুপাঠ্য, সুদৃশ্য সঙ্কলন রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তোলে পাঠকসমাজে। ছোটোরা তো সেই বই হাতে পেয়ে আনন্দে মশগুল। সম্পাদক এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ বাংলা একাডেমীর হলঘরে সেই বইটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করেন। হলভর্তি লেখকদের প্রশংসামূলক আলোচনায় মুখরিত হল সারা সভাকক্ষ। সেটাই ছিল সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পুস্তক-প্রকাশনা অনুষ্ঠান; অতিথিদের

শুধু বই দেখিয়ে, আলোচনা শুনিয়ে ক্ষান্ত হন নি এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ। তাদের সম্মানে মিষ্টান্নও পরিবেশন করা হয়েছিল। আমাদের দেশের শিশু-সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে হাবীবুর রহমান, ফয়েজ আহমদ, রোকনুজ্জামান খান, আফলাতুন এবং এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখা জরুরি। আমার দেয়া এই তালিকায় আফলাতুনের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কেউ কেউ ভুরু কুঁচকাতে পরেন। তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আফলাতুন এদেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র 'দৈনিক বাংলা'র সাড়াজাগানো ছোটোদের পাতা 'সাত ভাই চম্পা'র সুদক্ষ সম্পাদকই ছিলেন না, তাঁর কলম থেকে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বেশকিছু লেখাও আমরা পড়েছি। এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ শুধু একটি উল্লেখযোগ্য ছড়াগ্রন্থের সম্পাদক হিসেবেই সুখ্যাতি অর্জন করেন নি, আমাদের শিশু-সাহিত্যের একজন প্রধান লেখকও এই সুদর্শন ব্যক্তি। ছোটোদের তিনি এমন কিছু ছড়ার বই উপহার দিয়েছেন যেগুলো বয়স্ক পাঠকদেরও মন কাড়ে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এখ্‌লাস ছোটোদের জন্য অনেক আগে 'টাপুর-টুপুর' নামি সুদৃশ্য, উন্নতমানের পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, কয়েক বছর পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করার পর রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই সম্পাদিত মন-জয়-করা 'কচি কাঁচা'র মতোই বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কোনও ভালো কিছুকেই আমরা দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারি না।

এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ একজন নাছোড় ব্যক্তি। 'টাপুর-টুপুর'-এর সম্পাদক এবং বর্তমান কালের উন্নতমানের দৈনিক পত্রিকা 'জনকণ্ঠ'-এর একজন সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই নাছোড়বান্দা প্রায় অতীতের কাবুলিঅলার মতোই লেখকদের কাছ থেকে লেখা আদায় করে ছাড়েন। অনেক আগে 'টাপুর-টুপুর'-এর কালে দেখেছি, এখন দেখছি 'জনকণ্ঠ'-এর জমানায়। তার নির্ধারিত দিনে লেখা না দিয়ে রেহাই নেই। কখনও কখনও কষ্ট হয় আমার, কিন্তু না লিখে পারি না। কারণ, 'জনকণ্ঠ' আমার যথেষ্ট কদর করে, বিপদের দিনে আমার সহায়ক হয়েছে।

যা হোক, 'টাপুর-টুপুর'-এর পাতায় আমার অনেক ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। একটি কি দু'টি ছোটোদের উপযোগী নিবন্ধও ঠাঁই পেয়েছে সেই পত্রিকায়। একবার সম্পাদক এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদের মাথায় কী বেয়াড়া খেয়াল চাপল যে, আমার লেখনী থেকে নিঃসৃত একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক রচনা তার না হলেই চলবে না। আমি পড়লাম মহামুশকিলে। কী ধারাবাহিক গদ্য রচনা কোমলমতি শিশু-কিশোরদের উপহার দেব? দিনের তো বটেই, রাতের ঘুমও হারাম। এক মধ্যরাতে মনে এল, আমার প্রিয় জন্মশহর ঢাকা নিয়েই তো লেখা যেতে পারে। কিশোর শামসুর রাহমানের চোখে দেখা পুরনো শহরটিকেই প্রধান চরিত্র করে কিছু তো লেখা যেতেই পারে। শেষরাতে সম্ভাব্য দীর্ঘ রচনার নাম রাখলাম 'স্মৃতির শহর'। সেই রাতেই দু'তিন পাতা লেখা হয়ে গেল এক টানে।

'স্মৃতির শহর'-এর কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর সম্পাদকের তারিফ তো জুটলই, বিভিন্ন পাঠকের ভালো লাগার খবরটিও পৌঁছে গেল আমার কাছে; কেউ

কেউ জানালেন টেলিফোনে, কেউ কেউ সাক্ষাতেই সানন্দে বললেন। আমি আমার চেনা-অচেনা পাঠকদের কাছে, কবুল করতে দ্বিধা নেই, খুবই কৃতজ্ঞ। তাদের প্রশংসা আমাকে উৎসাহিত করে নি বললে মিথ্যাচার হবে।

ইতিমধ্যে 'স্মৃতির শহর'-এর চারটি সংস্করণ ছাপা হয়েছে। প্রথম দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় চট্টগ্রামের 'বইঘর' থেকে। তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ইতিহাসবিদ ও দক্ষ কলাম-লেখক মুনতাসীর মামুনের উদ্যোগে এবং চতুর্থ সংস্করণটি প্রকাশ করেন জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনের কমলকান্তি দাস।

শিশু একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমার একাধিক শিশুতোষ ছড়ার বই প্রকাশ করেছেন। একটি পাণ্ডুলিপি কিছুদিন যাবৎ গচ্ছিত রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে। জানি না কখন আলোর মুখ দেখবে বইটি, না-কি আদৌ দেখবেই না। বিপ্রদাস বড়ুয়া এবং উজ্জ্বল ছড়াকার রহীম শাহ সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে আমার বই প্রকাশের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে তরুণ রহীম শাহ এখনও আমাকে ছড়া লেখার জন্য তাগিদ দেন, এখ্‌লাসউদ্দিন তো দেনই। আর এক্ষেত্রে খালেক বিন জয়েনউদ্দিনের কথা না বললে অন্যায় হবে।

## ॥ সাঁইত্রিশ ॥

আমি একজন বাঙালি। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, আমি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসব। আমার পূর্বপুরুষদের, আমার মা-বাবা এবং আমার নিজের ভাষার জন্য অসীম ভালোবাসা থাকবে। আমার এই ভালোবাসার উৎসটিকে যারা আঘাত করতে উদ্যত হয় তাদের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বিরাগ জন্মাবে। বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানের মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, খাজা নাজিম উদ্দিন (যদিও তার জন্ম হয়েছিল আমাদেরই অঞ্চলে), আইয়ুব খান এবং বহু পাকিস্তানি বাংলাভাষাকে সুনজরে দেখতেন না। তাই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তো ১৯৪৮ সালে রমনার মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় 'শুধু উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা দেন। তার সেই বাক্যের বিরুদ্ধে সেদিন জোরালো কণ্ঠে 'না, নো' প্রতিবাদ জানান ক'জন সাহসী বাঙালি যুবক। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্য এই প্রতিবাদ ছিল অপ্রত্যাশিত। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে, এরকম কিছু ঘটতে পারে।

আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজস্ব যুক্তি দেখিয়ে বাঙালিদের ভজাতে চাইলেন যে, দুই অঞ্চলের সংহতির প্রয়োজনেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। অর্থাৎ উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে পাকিস্তানের সকল বাসিন্দাকে। রোমান হরফে বাংলা লেখার মহড়াও প্রায় শুরু হয়ে যায়। এজন্য যে সংস্কার জরুরি, তার দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলা একাডেমীর ওপর। সেই বছরটি ছিল ১৯৫৯। তখন বাংলা একাডেমীর পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কবি এবং সুপণ্ডিত সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। এই পদক্ষেপ অর্থাৎ রোমান

হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা মেনে নিতে পারেন নি অনেকেই। দু'টি প্রতিবাদী সম্পাদকীয় 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত হয়। মাসিক 'মোহাম্মদী'ও প্রতিবাদ জানাতে দেরি করে নি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সরকারের এই উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। এই বরেণ্য, সুখ্যাত পণ্ডিত এবং ভাষাবিদ তথাকথিত ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদ করেন শাণিত যুক্তির মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব করে সরকারের অপপ্রয়াসের ভিত নাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ১৯৬০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদী অনুষ্ঠানে বাংলাভাষা সংস্কারের আইয়ুবশাহী খায়েশের মাথায় শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়ে গেল। আইয়ুব খানের প্রচেষ্টা গেল ভেস্তে। অক্ষত রইলি আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাভাষা, যে ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন সালাম, বরকত, জব্বারের মতো তরুণ।

পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার উপর উৎপীড়ন হয়েছে নানাভাবে। পাকিস্তানি শাসকদের অপশাসনের অত্যাচার শুধু এদেশের বাসিন্দাদেরই ভোগ করতে হয় নি, বাংলাভাষাকেও নিপীড়নের কাণ্ড-কারখানা দেখতে হয়েছে। এই নিপীড়নের হাত থেকে কাজী নজরুল ইসলামও নিস্তার পান নি। পাকিস্তানের এই এলাকার ক'জন তাবেদার ব্যক্তির অপ্রয়াস আমরা লক্ষ করেছি সেকালে। কিন্তু আমরা অনেকেই এই অপপ্রয়াসকে মুখ বুজে মেনে নিই নি। নিতে পারি নি। প্রতিবাদ করেছি তাদের কর্মকাণ্ডের, বিরোধিতা করেছি এই বিষয়ে। ছেলেবেলা একটি সুবোধ্য কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। কবিতাটির প্রথম দু'টি পঙ্‌ক্তি হল —

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।

দুঃখের বিষয়, এ-কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি এই পঙ্‌ক্তি দু'টিকে পাকিস্তান আমলে বদলে করা হয়েছিল এভাবে —

ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।

কোনও কবির লেখা পালটে দেয়ার অধিকার বিশিষ্ট পণ্ডিতেরও নেই। 'দিলে দিলে বলি' কোন্ কিসিমের বাংলা? এ ধরনের বেয়াদবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও হয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'। এই কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি এরকম — 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান'। পাঠ্যবইয়ে কোনও এক পণ্ডিত প্রবর কবির পঙ্‌ক্তিটি থেকে 'মহাশ্মশান' শব্দটি উড়িয়ে দিয়ে তার পরিবর্ত অবলীলায় বসিয়ে দিয়েছেন 'গোরস্তান' শব্দটি। 'গোরস্তান' আমাদের কোনও অপরিচিত শব্দ নয়। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কোনও শব্দ বদলের অধিকার তাকে কে দিল? এ ধরনের হটকারিতা বরদাশ্‌ত করা মুশকিল।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার করা যেতেই পারে। কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, ফররুখ আহমদও করেছেন। ফররুখ আহমদ, যতদূর মনে পড়ে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছেন। কিন্তু সেসব শব্দ শ্রুতিকটু

কিংবা বেখাপ্পা নয়। আমাদের শব্দে আরবি- ফারসি ব্যবহার করা যাবেই না — এমন গোঁড়ামিরও পক্ষে আমার সায় নেই। এজন্য আমি মাঝে মাঝে জুতসই আরবি ফারসি শব্দ আমার লেখায় ব্যবহার করি নির্দ্বিধায়। অনর্থক প্রত্যেকটি বাক্যে জোর জবরদস্তি করে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি করতে পারেন না।

আজকাল আরেক ব্যামোর উৎপাত শুরু হয়েছে ছোটোদের পাঠ্যপুস্তকে। এই ব্যামোর নাম ইতিহাস-বিকৃতি। ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত নগ্ন এবং আপত্তিকরভাবে ফুটে উঠছে পাঠ্যপুস্তকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তিকে প্রায়-তুচ্ছ করে জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে আকাশচুম্বী করে দেখানো হচ্ছে। এ ধরনের শিক্ষা যে দেশের ইশকুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হবে, সে-দেশের ভবিষ্যৎ কী রকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ইদানিংকালের এই হযবরল পরিস্থিতি থেকে আপাতত অতীতের দিকে মুখ ফেরানো যাক। হয়তো চলে যাওয়া দিনগুলোর জন্যে হৃদভুবনে দীর্ঘশ্বাস হয়ে যাবে বার বার, কিন্তু কোনও পীড়ন আমাকে আহত করবে না। এখন এই মুহূর্তে আমি চলে যেতে পারছি ৫০ নম্বর টিপু সুলতান রোডের পড়ো-পড়ো দোতলা বাড়িতে অর্থাৎ 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসে। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সম্পাদক চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, নিউজ রুমে কাজ চলছে ঢিলে তালে, কারণ দুপুর; সহকারী সম্পাদকের কামরায় বসে আছি আমরা তিন চারজন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ এবং আমি চেয়ারে। হাসান হাফিজুর রহমান একটি নতুন ইজি চেয়ারে। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ কিছু একটা লিখছিলেন। হাসান আর আমি কথা বলছিলাম। আরাম কেদারাটি অবশ্য মাননীয় সম্পাদকের ঘরের জন্যেই বরাদ্দ ছিল। কিন্তু স্থানাভাবের দরুন সেটি আমাদের কামরায় রাখা হয়। আরাম কেদারায় গা-এলানো হাসান সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হঠাৎ একসময় রেডিও পাকিস্তানের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। রেডিওর সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম প্রডিউসার হেমায়েত হোসেনের কথা বললেন হাসান। সে-কথা তেমন শ্রুতিপ্রিয় ছিল না। হাসান অভিযোগ করলেন যে, হেমায়েত হোসেন ইচ্ছে করে তাঁকে প্রোগ্রাম দেন না। মাহ্‌ফুজউল্লাহ হাসানের অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন নম্র কণ্ঠেই। তার কথা শুনে হাসান ক্ষেপে আগুন। আরাম কেদারা ছেড়ে হাসান তেড়ে গেলেন মাহ্‌ফুজউল্লাহর দিকে। মাহ্‌ফুজউল্লাহও চেয়ার ছেড়ে উঠে কলম ছেড়ে প্রহার-যোগ্য কিছু একটা তুলে নিলেন হাতে। রক্তারক্তি হওয়ার আগেই আমবা তাদের দু'জনকেই বিচ্ছিন্ন করতে পারলাম। পেরে স্বস্তিবোধ হল। খানিক পরেই পিয়ন এসে হাসানকে জানাল, 'আপনার ফোন আসছে স্যার।' বার্তা বিভাগে যেতে হল বন্ধু হাসানকে। কারণ, আমাদের ঘরে কোনও টেলিফোন সেট ছিল না। কিছুক্ষণ পর হাসান হাফিজুর রহমান হাসিমুখে বার্তা বিভাগ থেকে ফিরে এলেন। আমরা জানতে পারলাম টেলিফোন এসেছিল রেডিও পাকিস্তান থেকে। ফোন করেছিলেন রেডিওর বাংলা বিভাগের প্রোগ্রাম প্রডিউসার হেমায়েত হোসেন। এই মিষ্টভাষী ব্যক্তিটি কবিতাও লিখতেন। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই, দুঃখের বিষয়, তিনি মারা যান। সম্ভবত গুরুতর স্ট্রোকে মৃত্যু হয় তাঁর। একদা বিভিন্ন

সাময়িকপত্রে তার বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। হেমায়েত হোসেনের একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল সেকালে — স্মৃতি আমাকে প্রতারিত করলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্ভবত আজ দু'একজন ছাড়া হেমায়েত হোসেনের কথা, তার কোনও কবিতার কথা কারও মনেই পড়ে না। সাহিত্যের ইতিহাস বড়োই খেয়ালি, বড়োই বিস্মৃতিপ্রবণ। আজ যারা আমরা কবিতা লিখে পত্রিকার পাতা ভরিয়ে তুলছি দিনের পর দিন, প্রতি বছর বইমেলায় কবিতার বই প্রকাশ করে চলেছি, নিজেদের সর্বেসেরা কবি ভেবে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা নরক গুলজার করছি, মৃত্যুর ক'বছর পরে আমাদের ধূলি-ধূসর বইয়ের পাতা ওলটাবার কথা বিবেচনা করে দেখবে ক'জন পাঠক-পাঠিকা। কোন ধীমান সমালোচক কার রচনা নিয়ে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ হবেন? বহুকাল পর কার কাব্যগ্রন্থ টিকে থাকবে বনেদি গ্রন্থাগারের র‍্যাকে? সময় বড়োই নির্দয়, বড়োই কৃপণ।

হাসান হাফিজুর রহমান বার্তা বিভাগ থেকে উৎফুল্ল চিত্তে ফিরে এসেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌কে। হেমায়েত হোসেন হাসানকে রেডিওতে একটি কথিকা কিংবা কবিতা পাঠ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমাদের ঘরের গুমোট আবহাওয়া দূর হল হাসানের হাসিতে। তিনি উৎফুল্ল হয়ে আমাদের জন্য খাবার এবং চায়ের অর্ডার দিলেন। আমরা, বলা বাহুল্য, সেই নাশতা উপভোগ করলাম। আমাদের ঘরের ভেতরের ঘটনা অন্য বিভাগে প্রচারিত হয় নি। আমরা ক'জনই প্রত্যক্ষ করেছিলাম এই ঘটনা, অফিসের অন্য কাউকে জানতে দিই নি।

একজন শুভার্থী, গুণী যিনি আমার এই সামান্য আত্মকথার সতর্ক পাঠকও বটে, আমাকে গত অধ্যায়ের একটি কি দু'টি খুঁত ধরিয়ে দিলেন। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক যে আবেদনপত্রটি দৈনিক 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার উদ্যোগে 'ইত্তেফাক', 'আজাদ' ও 'সংবাদ' পত্রিকায় একই দিনে প্রকাশিত হয়, সেটি আমার হুবহু উদ্ধৃত করা উচিত ছিল এবং আরও দু'একটি তথ্য আমার লেখায় অনুপস্থিত বলেও তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আমি বইপত্তর ঘেঁটে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক যৌথ আবেদনপত্রটির সন্ধান পেয়েছি। সেটি এখানে উল্লেখ করছি—

> সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি, নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি পোড়ান হইতেছে। সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমনকি জনাব আমির হোসেন চৌধুরীর মতো শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাদের অপরাধ কী ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের

মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় কলুষস্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিতেছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের ওপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমরা পূর্ববাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি।

প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন;

গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন;

পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন।

লজ্জার বিষয়, আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং নটরডেম কলেজের প্রভাষক ফাদার নোভাকের নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা। তিনটি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত যুক্ত আবেদনপত্রটিই শুধু সংবাদপত্রে ছাপা হয় নি, সেসব পত্রিকা একযোগে একটি যৌথ প্রতিবাদী সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়।

প্রগতিশীল সচেতন ছাত্র সমাজ, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা দাঙ্গাবাজবিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলার ফলে অশুভ শক্তির আগুন বেশিদূর এগুতে পারে নি। জগন্নাথ কলেজে আশ্রয়শিবিরও স্থাপিত হয় সাময়িকভাবে। মনে পড়ে, ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাতে দিনদুপুরে খুন হন প্রগতিশীল, শক্তিশালী গল্পলেখক ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী সোমেন চন্দ। তাকে হত্যা করা হয় প্রথমে তার চোখ দুটো উপড়ে ফেলে। তিনি ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগদানের জন্য মিছিল নিয়ে আসার পথে বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে লক্ষ্মীবাজারে শহিদ হন।

## ॥ আটত্রিশ ॥

সাম্প্রদায়িকতা আমার দু'চোখের শূল। যখন ছোটো ছিলাম, বোধশক্তি তেমন ছিল না, তখন অনেক কিছুই বোধের বাইরে ছিল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা কানে আসত। একে অন্যকে খুন করছে। কারণ একজন হিন্দু এবং অন্যজন মুসলমান। তখন স্বাভাবিকভাবেই, যেহেতু আমি মুসলমান পরিবারের ছেলে, পক্ষ গ্রহণ করতাম মুসলমানদের। ছেলেবেলায় এই সাম্প্রদায়িক চেতনা সামান্য হলেও খেলা করত। যখন নীচু ক্লাসের ছাত্র ছিলাম মাঝে মাঝে মাথায় টুপি পরে পোগজ ইশকুলে যেতাম। সেই ইশকুলে মাত্র ক'জন মুসলমান ছাড়া বাকি সবাই ছিল হিন্দু। কিছুদিন পর অবশ্য আমার আর টুপি পরে ইশকুলে যেতে ইচ্ছে করত না।

আমার আব্বা, আম্মা দু'জনই ছিলেন ধার্মিক, কিন্তু পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক। তাঁদের দু'জনের প্রভাবে এবং ছেলেবেলার ইশকুল শিক্ষক চিন্তাহরণ সোমের সংস্পর্শে আমি অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চেতনার অধিকারী হয়ে উঠি। এই প্রসঙ্গে আমার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়ালের কথা না বললে আমার চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তো করা হবেই, গৃহশিক্ষকের প্রতি ঘোরতর অন্যায় এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হবে। আমার বাবা মা বেঁচে নেই, সম্ভবত আমার ইশকুল জীবনের শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম শিক্ষক চিন্তাহরণ সোমও পৃথিবীর রৌদ্রছায়া ও বইপড়ার আনন্দ উপভোগ করার জন্য আর নিশ্বাস নিচ্ছেন না কোথাও। একদা আমার গৃহশিক্ষক, জনাব আবদুল আউয়াল, আশা করি, সুস্থ আছেন এবং সুখী জীবনযাপন করছেন। আমার কথা কি মনে পড়ে তাঁর? কে বলে দেবে আমাকে? আধুনিক জীবনধারাই এই মতো যে, একই শহরের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেকেই একে অপরের খবর রাখি না। অনেক পরিচিত মানুষের অস্তিত্বসুদ্ধ ভুলে থাকি আমরা। হঠাৎ একমুহূর্তে সেই ভুলে থাকা মানুষটির চেহারা ঝলসে ওঠে দৃষ্টিপথে। মনে পড়ে যায় অনেক কথা, বহু কথাবার্তা, হাসি তামাশা, রাগ, অভিমানের কথা। আপনা থেকেই বুক চিরে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস। হয়তো কাউকে একটি অপ্রিয় কথা বলেছিলাম কখনও, চটজলদি কিছু লেখার জন্য কারও কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম একটি বলপেন, তাড়াহুড়োয় আর ফেরত দেয়া হয় নি। এরকম কত কিছুই তো ঘটে আমাদের জীবনে। সামান্য কোনও বস্তুর কথা ভুলে গেলে তেমন খারাপ লাগে না। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে গেলে পরিতাপ হওয়া স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে আমি এমনি একটি পরিতাপে ভুগছি।

এ পরিতাপের মূলে রয়েছেন একজন কবি। তাঁর কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। আমার এই 'কালের ধুলোয় লেখা'য় সাইত্রিশ অধ্যায়ে তাঁর নাম উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য ছিল আমার। তাঁর নাম প্রজেশ কুমার রায়। তিনি সিলেটে ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রথম পর্বেই তিনি একজন সুকবির খ্যাতি অর্জন করেন। সেকালে সিলেট থেকে প্রকাশিত 'বলাকা' পত্রিকায় অশোক বিজয় রাহা, মৃণাল কান্তি দাস এবং প্রজেশ কুমার রায়ের কাব্য সাধনা গড়ে ওঠে। প্রজেশ কুমার রায় সাম্যবাদে সমর্পিত ছিলেন। যেহেতু তাঁর অন্তরে ছিল একজন প্রকৃত কবির বসবাস, তাই কোনও মতবাদ প্রজেশ কুমার রায়ের কবিত্বকে খর্ব করতে পারে নি। তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে বেশ কিছু ভালো কবিতা। যতদূর মনে পড়ে, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সাড়াজাগানো অসামান্য ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কবিতা'য় প্রজেশ কুমার রায়ের কবিতা আমি পড়েছি। বুদ্ধদেব বসুর মতো পাকা জহুরী কোনও খারাপ কবিতাকে কিছুতেই তাঁর পত্রিকায় ঠাঁই দিতেন না। যতদূর জানি, প্রজেশ কুমার রায়ের চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে — (১) যাত্রারম্ভ, (২) চাঁদ ও রাহু, (৩) সীমান্তের চিঠি, (৪) জনসমুদ্র, (৫) নূতন কবিতা, (৬) একটি ফুলের গুচ্ছ, (৭) এক যে ছিল। 'এক যে ছিল' অবশ্য শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা, কিন্তু বইটি বড়োদেরও মন কাড়ে। এই বই দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হয়। 'একে যে ছিল' পুস্তকটির দু'টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি —

এক যে ছিল প্রজেশ কুমার রায়
আবোল-তাবোল লিখত কবিতায়।

এখন তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'জনসমুদ্র' থেকে উদ্ধৃত করছি পাঁচটি পঙ্‌ক্তি —

সাহিত্যের রঙ্গামঞ্চে নবীন নায়ক
আমরা কেবলই নই,
জনতার পুরোভাগে অগ্রগামী আমরা সৈনিক,
সংগ্রাম সঙ্কল্পবদ্ধ নির্ভীক আমরা পদাতিক —
কিছুতেই পিছনে হটি না।

প্রজেশ কুমার রায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্তের চিঠি' বিষয়ে ১৯৪২ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যে মন্তব্য করেছিল, তা এখানে উদ্ধৃত করছি, 'সীমান্তের চিঠি প্রমুখ ২৩টি ক্ষুদ্র কবিতা লইয়া এই পুস্তক। একটা অনায়াসলব্ধ গভীর অনুভূতি, ভাষায় অনাড়ম্বর স্বচ্ছতা ও ছন্দের অবাধ গতি মিলিয়া কবিতাগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়াছে।' 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এই প্রশস্তি মামুলি নয়। কারণ, এই পত্রিকাটি উন্নতমানের। যত্রতত্র প্রশংস্যা ছড়ানোও এই পত্রিকার নীতি নয় বলেই জানি।

প্রজেশ কুমার রায়কে আমি অনেকবার পথে হেঁটে যেতে দেখেছি। তখন আমি প্রায়শই ঢাকা শহরের নানা পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রজেশ কুমার রায় ছিলেন নেহাতই সাদাসিধে গো-বেচারা মানুষ। কিন্তু তা বলে তাঁকে বোকাসোকা ভাবলে ভুল হবে। সরল ব্যক্তিকে আহাম্মক ভাবলে অন্যায় করা হবে। কোনও আহাম্মকের পক্ষে আর যা-ই হোক, ভালো কবিতা লেখা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তিনি, যতদূর মনে পড়ে, পাঞ্জাবি-ধুতি কিংবা শার্ট ও ধুতি পরতেন। কিছুদূর থেকে তাঁর কাপড় ধুলো-ধূসর, ঈষৎ ময়লা মনে হত। কিংবা এমনও হতে পারে আমি যখনই তাঁকে দেখেছি, ঘটনাচক্রে তখনই তাঁর পরনে থাকত ম্লান পোশাক। সম্ভবত তাঁকে আমি সিগারেট খেতেও দেখেছি।

কবি এবং প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ-র সঙ্গো কবি প্রজেশ কুমার রায়ের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি সরকার-পরিচালিত মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকা অফিসে প্রায়শ যেতেন। সেই পত্রিকায় মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ কাজ করতেন। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আবদুল কাদিরের মতো কবি, পণ্ডিত এবং বিখ্যাত 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য। যাই হোক, প্রজেশ কুমার রায় ১৯৬৪ সালের এক দুপুরে শেষবারের মতো 'মাহে-নও' অফিসে যান মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহর সঙ্গো দেখা করার জন্য। সম্ভবত কোনও কবিতা দিতে কিংবা প্রকাশিত লেখার টাকা আনতে। তখন ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। একতরফা সেই দাঙ্গা। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ প্রজেশ কুমার রায়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবেন?' তিনি জবাব দিলেন 'ইত্তেফাক অফিসে'। দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এ কাজ করতেন সেই শিশুর মতো সরল, সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন কবি। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ তাঁকে অফিসে যেতে বারণ করলেন পথে প্রজেশ কুমার রায়ের বিপদ হওয়ার আশঙ্কায়। প্রজেশ কুমার রায় বললেন, 'আমাকে কে মারবে?' কিন্তু হায়, একজন সরল, কবি'র মানুষের উপর বিশ্বাস তাঁকে রক্ষা করে নি। তিনি 'ইত্তেফাক' অফিসে পৌঁছেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের ডেরায় পৌঁছতে ব্যর্থ হন। এক

অসভ্য, পশুর চেয়েও অধিক পাশব এক অমানুষের হাতে আক্রান্ত হন তিনি। ছুরিকাঘাতে কাতর সেই কবি প্রাণ হারালেন তাঁর প্রিয় স্বদেশের ঢাকা শহরের এক খোলা পথে। সত্যের তাগিদে বলতে হবে, প্রজেশ কুমার রায় বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত পাক্ষিক 'দেশ'-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত করিমগঞ্জ (অসম)-এর জন্মজিৎ রায় লিখিত চিঠি, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ এবং বেলাল চৌধুরীর কোনও কোনও বক্তব্যের ভিত্তিতে। আমার নিজের সামান্য বক্তব্য তো আছেই।

কেউ কেউ বলেছেন, কবি প্রজেশ কুমার রায় ১৯৬৫ সালে নিহত হয়েছেন এক দাঙ্গাবাজের হাতে। তবে অধিকাংশ ব্যক্তির মত হল, তিনি ১৯৬৪ সালে নিহত হন। কারণ, ১৯৬৪ সালেই দাঙ্গা হয় ঢাকায়, ১৯৬৫ সালে নয়। এবং ১৯৬৪ সালেই তো হিন্দুদের রক্ষা করতে গিয়ে মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ হারান আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং নটরডেম কলেজের প্রভাষক ফাদার নোভাক।

দুঃখের বিষয়, প্রজেশ কুমার রায়ের কথা আজকাল কোথাও উচ্চারিত হয় না। তিনি এখন বিস্মৃত এক কবি। তাঁর বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলা একাডেমীর চরিতাভিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু শুধু পণ্ডশ্রম হয়েছে আমার, একটি লাইনও সেই কবির বিষয়ে পাওয়া গেল না, ছবি তো দূরের কথা। প্রসঙ্গত আরেকজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ না করে পারি না। শৈশবে আমি তাঁকে আমাদের বাসায় দেখেছি কয়েকবার। তিনি আব্বার বন্ধু ছিলেন। এই ঔপন্যাসিক প্রচুর পান খেতেন লক্ষ করেছি। তিনি দারিদ্র্যের হামলায় আখেরে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেকালে এই রোগটির ভালো চিকিৎসা-ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর নামও বাংলা একাডেমীর চরিতাভিধানে খুঁজে পাই নি। অথচ এমন কিছু কিছু ব্যক্তির ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পেয়েছে সেই গ্রন্থে যে, তাদের নাম, বলতে খারাপ লাগছে, উহ্য থাকলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। হয়তো নাক-উঁচু কোনও কোনও ভদ্রলোক বলতে পারেন, 'আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের কথা বাংলা একাডেমীর চরিতাভিধানে নেই বলে কি ভূমিকম্প হয়ে যাবে না-কি বুড়িগঙ্গা একেবারে পানিশূন্য হয়ে যাবে?' হ্যাঁ, এমন কথা তাঁরা বলতেই পারেন। আমি চুপ থাকব, কারও সঙ্গে বচসায় অবতীর্ণ হব না।

একদা আমাদের এই ঢাকা থেকে 'সওগাত', 'মোহাম্মাদী', 'সমকাল', 'অগত্যা', 'দিলরুবা', 'মাহে-নও', 'মুকতি' প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হত। অবশ্য অনেক পরে কিছুকালের জন্য প্রকাশিত হয় 'ত্রৈমাসিক সংলাপ'। যদি মাসিক 'পূর্বালী'র কথা না বলি তাহলে অন্যায় হবে। এই পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, যদিও প্রকৃত সম্পাদনার কাজটি করতেন, কখনও আড়ালে থেকে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ। সদাশয় সম্পাদক তাঁর ওপর পুরোপুরি দায়িত্ব অর্পণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ কৃতিত্বের সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করে 'পূর্বালী'কে বেশ পাঠকপ্রিয় করে তুলেছিলেন। প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের প্রথম তিন চারটি সংখ্যায় মাহ্‌ফুজ উল্লাহর নাম মুদ্রিত হয়

নি, যদিও তাঁর লেখা প্রকাশিত হত ছদ্মনামে। তখন তিনি 'মাহে-নও' সম্পাদনা বিভাগে কাজ করতেন। 'মাহে-নও'-এর চাকরি ছাড়ার পর তার নাম প্রকাশিত হতে থাকে 'পূবালী'র সম্পাদকীয় বিভাগে।

'পূবালী', যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবত আট-নয় বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুতে আমরা শুধু একজন রুচিশীল, শিল্প প্রেমিক উত্তম পুরুষকেই হারাই নি, 'পূবালী'কেও হারিয়েছি। 'সওগাত', 'সমকাল' এবং 'সংলাপ'কে হারিয়ে ফেলার বেদনা কি কম আমাদের, আমরা যাঁরা সাহিত্যচর্চাকেই জীবনের অপরিহার্য অংশ বলে স্বীকার করি? 'পূবালী'কে একটি ভালো পত্রিকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, অনেকের কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিয়েছেন আন্তরিক তাগাদায়। আমার মতো আলস্যপ্রিয় ব্যক্তিও 'পূবালী'র প্রথম সংখ্যায় কবিতা তো লিখেছেই, পরবর্তী কিছু সংখ্যাতেও কবিতা দাখিল করেছে নাছোড় সম্পাদকের হাতে। মাহ্ফুজ উল্লাহ আমাকে দিয়ে একটি নিয়মিত কলামও লিখিয়ে নিয়েছেন 'পূবালী'তে। কলামটির নাম ছিল 'খোলা জানালা'। কোনও ছদ্মনাম ব্যবহার করতাম কি-না মনে নেই। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী নাগরিক ছদ্মনামে 'ঢাকায় থাকি' নামক একটি নিয়মিত আকর্ষণীয় কলাম লিখতেন সেই পত্রিকায়। কবি ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যনাটক 'হাতেমতাই' ধারাবাহিকভাবে 'পূবালী'তে প্রকাশিত হয়। যতদূর মনে পড়ে, শওকত আলীর একটি উপন্যাসও ছাপা হয় মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহর সেই পত্রিকাটিতে।

'পূবালী'র প্রথম সংখ্যায় বেগম সুফিয়া কামালের কবিতার সঙ্গে আমার 'অস্তরাগের আগে' শীর্ষক কবিতাটি ছাপা হয়। আমি এই কবিতার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এই সেদিন মাহ্ফুজ উল্লাহ আমাকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন। কবিতাটি তেমন ফ্যালনা নয়, ভালোই মনে হল আবৃত্তিকার এবং লেখক দু'জনেরই কাছে। কিন্তু অবহেলিত এই কবিতা আমার কোনও কাব্যগ্রন্থেই ঠাঁই পায় নি। আমার বেশ কয়েকটি কবিতাই 'পূবালী'তে ছাপা হয়েছিল। কার লেখা ছাপা হয় নি সেই পত্রিকায়? আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুর রশীদ খান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আরও অনেকের লেখা 'পূবালী'তে ছাপা হয়েছে। আট বছর ধরে প্রকাশিত হওয়ার পর সম্ভবত মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটে। কারণ, পত্রিকাটি চালু ছিল একমাত্র তাঁরই অর্থানুকূল্যে। পত্রিকাটি চালানোর জন্য মাহ্ফুজ উল্লাহ কম খাটেন নি, ব্যয় করেছেন সর্বশক্তি। কিন্তু তিনি তো টাকাকড়ির মালিক নন, তাই আখেরে থেমে গেল 'পূবালি'র অগ্রযাত্রা।

ইংরেজিতে একটি কথা প্রচলিত আছে 'লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট'। যে সাহিত্যপত্রের কথা এতক্ষণ বলি নি, সেই ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নাগরিক'-এর কথা মনে পড়তেই ইংরেজি শব্দগুচ্ছটি স্মৃতিতে জেগে উঠল। এই উন্নতমানের সাহিত্যপত্রটির সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক এবং বুদ্ধিজীবী আহমদ রফিক। 'নাগরিক'-এর সম্পাদক হিসেবে

তাঁর নাম প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নি। প্রকাশক হিসেবে বাহাউদ্দিন ভুঁইয়ার নাম মুদ্রিত হয়। আহমদ রফিক নিজের নাম ব্যবহার করতে পারেন নি, কেননা তিনি একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট ছিলেন বলেই তাঁর নাম পুলিশের খাতায় সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিল। যদিও 'নাগরিক' প্রকাশের কালে তিনি নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করেছিলেন, তবু তাঁর নাম আগের মতোই বহাল ছিল সেই খাতায়। গোয়েন্দা বিভাগের একজন ওয়াকিবহাল অফিসারের উদ্যোগে আপত্তিকর নামসমূহের তালিকা থেকে আহমদ রফিকের নাম কেটে ফেলা হয়। তারপরই তাঁর নাম 'নাগরিক'-এর সম্পাদক হিসেবে ছাপা হতে থাকে। একদা সাড়াজাগানো এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হত। আহমদ রফিক যেমন-তেমন লেখা ছাপার মনোবৃত্তি নিয়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন নি। সত্যিকারের গুণসম্পন্ন লেখা তিনি প্রকাশ করতেন। তাঁর সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি উচ্চ মানসম্পন্ন এবং সুদৃঢ় ছিল বলেই কোনও নিকৃষ্ট রচনা 'নাগরিক'-এ প্রকাশিত হত না। তিনি কোনও কোনও সংখ্যায় আমার দু'তিনটি কবিতাও ছাপতেন। আমাকে দিয়ে প্রবন্ধও তিনি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। হায়, 'সমকাল' এবং 'নাগরিক'-এর মতো সাহিত্যপত্রের বড়ো আকাল বর্তমান বাংলাদেশে।

## ॥ উনচল্লিশ ॥

এই মুহূর্তে যখন আমি টেবিলে ঝুঁকে হাতে কলম নিয়ে লিখতে শুরু করছি তক্ষুনি মনে হল আত্মজীবনী রচনার উদ্যোগ অনেক আগে নিলেই পারতাম। বিখ্যাত রুশ কবি ইভতেশেঙ্ক তো তার আত্মকথা যৌবনেই লিখে ফেলেন। অবশ্য তার জীবন তখন বেশ ঘটনাবহুল হয়ে উঠেছিল। আমার জীবন মোটেই তেমন ছিল না সেই বয়সে। অর্থাৎ আমার জীবন নেহাতই সাদামাটা। তবে অনেক আগে লিখলে বেশ কিছু লখতে পারতাম স্মৃতির ওপর ভর করে। যৌবনে এবং তারও কিছু পরে আমার স্মৃতি ছিল প্রখর। তখন কিছু মনে করার জন্য অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াতে হত না। চটজলদি মনে পড়ে যেত। এখন হাতড়ে বেলালেও স্মৃতিপটে কিছু ভেসে ওঠে না। মন খারাপ হয়ে যায়। স্মৃতির ওপর ভরসা করে কিছু লিখতে গেলে আজকাল অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়, ভুল কথা লিখে ফেলি। পরে, কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে যুগপৎ লজ্জিত এবং উপকৃত হই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার সরাসরি কথা বলে কিংবা লেখার মাধ্যমে।

এই তো আমার এই সামান্য আত্মজীবনীর আটত্রিশ অধ্যায়ে প্রজেশ কুমার রায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটি কি দু'টি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছি। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ আমার একটি ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন টেলিফোন আলাপের মাধ্যমে। আমি লিখেছিলাম প্রজেশ কুমার রায় তাঁর কর্মক্ষেত্র 'ইত্তেফাক'-এ যান, যেদিন তিনি দাঙ্গাবাজ এক নরপশুর হাতে রাস্তায় নিহত হন। না, তিনি কখনও 'ইত্তেফাক'-এ কাজ করতেন না। মাঝে মাঝে লেখা দিতে যেতেন সেখানে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন সম্পর্কে আমি কোনও ভুল তথ্য পেশ করি নি। তবে

পরে এ-কথা ভেবে পরিতাপ হয়েছে যে, এই লেখক, যাঁকে আমি শৈশবে আমাদের বাসায় দেখেছি বাবার সঙ্গে আলাপ মশগুল হতে, পান চিবোতে, হুঁকোয় টান দিতে, তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু বলা কর্তব্য ছিল আমার। যদিও আগে তাঁর বিষয়ে সামান্য কিছু লিখেছি, তবু এখন আরও কিছু লিখে পাঠকদের কাছে নিজের অপরাধের বোঝা সামান্য লাঘব করতে পারি। এটা তো অস্বীকার করার জো নেই যে, শ্রদ্ধেয় আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন আমার দেখা জলজ্যান্ত প্রথম লেখক। আমাদের বৈঠকখানায় তিনি ছিলেন প্রায় প্রতিদিনের প্রিয় অতিথি। দেখতে কেমন ছিলেন তিনি? আমার স্মৃতি বলে দিচ্ছে, তিনি ছিলেন দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীরের অধিকারী। মনে হত, বড়ো বেশি শুকিয়ে যাওয়া সরু পাটাতন। আমাদের বাসায় তখন আসতেন তাঁর পরনে থাকত সাদা ট্রাউজার, কালো রঙের কোট আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। আব্বা হর-হামেশা তাঁর এই লেখক বন্ধুটির কথা বলতেন। উন্নত মনের মানুষ তিনি, বাবা বলতেন আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময়। চাল-চুলোর খবর রাখেন না তেমন। পুরোপুরি সাহিত্যে সমর্পিত এক সাধক যেন। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু রসদ দরকার তা সংগ্রহ করার দিকে কোনও ঝোঁক ছিল না লেখক মানুষটির। কাগজে কলম চালিয়ে, বই পড়ে আর হুঁকোয় টান দিয়ে, পান চিবোতে চিবোতে সময় কেটে যেত আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের।

অনেক আগের পুরনো ঢাকার বাবুর বাজারের পুলের সামনেই ছিল বাবার প্রিয় সেই লেখকবন্ধুর আস্তানা। অত্যন্ত ছোটোখাটো একটি প্রেসে তিনি থাকতেন। প্রেসটির নাম আমার মনে নেই। অন্ধকার, এতটুকু একটা ঘরে থাকতেন একা। সেখানেই লিখতেন, বসে বসে হুঁকো টানতেন। একদিন, তখন আমি ইশকুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের আস্তানাটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ভেতরে আসতে বললেন। মুরুব্বির নির্দেশ না মেনে গত্যন্তর নেই। তাই তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সাদরে আমাকে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। সেদিন তিনি আমাকে কী কী বলেছিলেন, সেসব মনে নেই। নিশ্চয়ই গুরুভার কিছু বলেন নি; কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন সেসব কথা আমার মতো ছেলেমানুষের মাথায় ঢুকবেই না। আজ সেদিনের অন্য কোনও কথা মনে না থাকলেও তাঁর চেহারাটি স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের মাথার কালো কোঁকড়ানো চুল, মাঝখানে সিঁথি-কাটা। মনে পড়ে হুঁকো টানার শব্দ, সেই লেখকের ঠোঁট পানের রক্তিম দাগ।

বলতে খুব খারাপ লাগছে, এই চমৎকার মানুষটি গলায় রক্ত তুলতে তুলতে একদিন ঢলে পড়লেন নীরন্ধ্র অন্ধকারে, অতল গহ্বরে। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে কেউ ছিল কি-না, জানতে পারি নি। আব্বাকে জিজ্ঞেসও করি নি। সত্যি বলতে কী, মৃত্যু বিষয়ে সেকালে আমার তেমন কোনও চেতনাও ছিল না। আজ বুঝি, মৃত্যু কী ভয়ংকর, সত্তা বিলোপকারী এক দুর্ঘটনা — সেই বিলুপ্তি, অস্তিত্বহীন, ধুলো, শুধু ধুলো।

যখন আমার বয়স বাড়ল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হলাম, তখন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের পুরনো ম্যাগাজিনে আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের একটি দু'টি ছোটোগল্প পড়েছিলাম। ভাষার ওপর তাঁর দখল আমাকে, মনে পড়ে, মুগ্ধ করেছিল। তাঁর একটি দু'টি প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত হয়েছিল সেকালে। তিনি প্রকৃতই একজন গুণী

ব্যক্তি ছিলেন, নইলে কাজী নজরুল ইসলামের মতো কবি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না। আমরা জানি, নজরুল 'কাব্যে আমপারা' এবং 'রুবাইয়াৎ-এ ওমর খৈয়াম'-এর ভূমিকায় আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এই কৃতজ্ঞতা খামোকা এবং খেয়ালি কিছু নয়। বইগুলোর ভূমিকায় নজরুল স্পষ্টতই বলেছেন, তিনি বই দুটো তর্জমা করার সময় আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের কাছে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত ছিলেন কি-না, এই তথ্য আমার জানা নেই। তবে, এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা কবি-সমালোচক আবদুল কাদিরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। শুনেছি, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের মুখপত্র 'শিখা'র একটি দু'টি সংখ্যার সম্পাদনার ব্যাপারে সম্পাদককে সাহায্য করেছিলেন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। আসলে এই মানুষটি সাহিত্যের কাজেই সমর্পিত করেছিলেন নিজেকে। লাভ-ক্ষতির কোনও হিসেব করেন নি জীবনযাপনের কোনও মুহূর্তেই। দুর্লভ নয় কি এ ধরনের লেখক কিংবা মানুষ আমাদের সমাজে? একালে?

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন একটি উর্দু উপন্যাসের তর্জমা করেছিলেন বাংলায়। 'খুন না আঁসু' ছিল উপন্যাসটির নাম। তিনি তাঁর অনুবাদগ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন 'রক্ত না অশ্রু'। আর তাঁর অন্তর্গত রক্তে ভরে উঠত পিকদানি দিনের পর দিন। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। সে কালে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু ছিল অবধারিত।

আব্বা তাঁর প্রিয় বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে বড়ো শোকাহত হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুর করুণ পরিণতির কথা আব্বার মনে বার বার হানা দিত বলেই পরবর্তীকালে তিনি বেশ কিছুকাল আমার সাহিত্যচর্চাকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। আমি ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম বলেই বাবার গোড়ার দিকের আচরণে ক্ষুব্ধ হই নি। ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলাম। যা হোক, প্রজেশ কুমার রায় নিহত হওয়ার দিন ইত্তেফাক-এর কোনও কর্মচারী হিসেবে নয় সেই সংবাদপত্রের দপ্তরে একজন লেখক হিসেবে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এই তথ্যে কোনও ভুল নেই। তিনি গিয়েছিলেন সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদকের কাছে একটি কবিতা দাখিল করার জন্য। সেকালে 'ইত্তেফাক'-এর সাহিত্যের পাতা সম্পাদনার ভার ছিল শামসুল হকের ওপর। শামসুল হক নিজেও একজন কবি এবং ব্রিটিশ ইনফরমেশন অফিসে কর্মরত ছিলেন। সেকালে তাঁর বেশ কিছু কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত। হায়, তিনি আজ বিস্মৃতির তিমিরে বিলুপ্ত। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে অকালে মৃত্যু হয় তাঁর। 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর একটি উপসম্পাদকীয়তে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ লেখেন, 'মরহুম শামসুল হক ছিলেন সুকবি, সুপুরুষ এবং অত্যন্ত অমায়িক ও সম্পন্ন ব্যক্তি।' এই মুহূর্তে বিস্মৃতির অন্ধকার-ছেঁড়া তার হাসি ঝলসিত মনোরম মুখটি ভেসে উঠছে আমার দৃষ্টিপথে।

স্মৃতি আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল বলে 'পূবালী'-র কোনও কোনও লেখার শিরোনাম ভুল লিখে ফেলেছিলাম। *লিখেছিলাম, 'কবি ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক 'হাতেমতাই'*

ধারাবাহিকভাবে 'পূবালী'তে প্রকাশিত হয়। আসলে সেটি কাব্যনাটক নয়, একটি আখ্যানকাব্য। 'হাতেমতাই' ১৯৬৬ সালে বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক 'নৌফেল ও হাতেম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকায়। পূর্ব পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড বা লেখকসংঘ থেকে এই কাব্যনাটক প্রকাশিত হয়।

ওসমানিয়া বুক ডিপো এবং তার স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের জীবনাবসান হয় 'পূবালী' পত্রিকার মৃত্যুর বেশ কিছু পরে। মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম পুস্তক-ব্যবসায়ী এবং একাধিক লঞ্চের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে একজন শিক্ষিত, রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন। মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের শিল্পীসত্তার পরিচয় আমরা অনেকেই পেয়েছিলাম। তিনি ছবি আঁকতেন, মূর্তি সৃষ্টি করতেন। শিল্পকর্মে নিয়োজিত থাকার সময় ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বেমালুম ভুলে যেতেন। অর্থ সঞ্চয়ের নেশা তার ছিল না। অনেক লেখক তার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছেন। কেউ কউ বই দেবেন বলে অগ্রিম পুরো টাকা নিয়েছেন, কিন্তু ওসমানিয়া বুক ডিপোতেই বই দেন নি। ব্যবসায়ী, শিল্পী এতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলে শুনি নি। ১৯৫৮ সালে তার জীবনাবসান হয়।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বিষয়ে আরও কিছু কথা মনে পড়ে গেল মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহর কল্যাণে। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী চিন্তাবিদ এবং সৃজনশীল লেখক। প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের বই ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয় কলকাতায়। বইটির নাম 'ভাঙা-গড়া'। কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহ লাভ করেছিলেন তিনি। আবদুল কাদির, জসীমউদ্দীন, ঔপন্যাসিক ও 'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ কাসেম এবং আরও কয়েকজন লেখকের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। আবদুল কাদির লিখেছেন, 'নজরুলের প্রথম ঢাকা আগমনের (১৯২৬ সালে নজরুল প্রথম ঢাকা আগমন করেন) খবর পেয়ে বন্ধুবর মোহাম্মদ কাসেম ও আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে যাই। মোহিনীবাবু থাকতেন ঢাকা কাছারির কাছে একটি বাড়িতে (তৎকালে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অর্থাৎ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন স্বরাজ দলের মনোনীত পরলোকগত চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাশ)। কবি ও হেমন্ত বাবু (পরলোকগত হেমন্ত কুমার সরকার এম.এল.এ) আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। কবির সঙ্গে আমার এই দেখা।' [ঢাকায় নজরুল, আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ]

কবি ও ছান্দসিক আবদুল কাদির তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ কাসেম ও আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল দর্শনে যান প্রথমবারের মতো। সেই একই বছর আগস্ট মাসে নজরুল আবার ঢাকায় আসেন। তাঁকে ঘিরে যথারীতি ভক্তদের ভিড় ৫২ নং বেচারাম দেউড়ির ঠিকানায়। সেই আস্তানায় আবদুল কাদির, আবুল ফজল, মোহাম্মদ কাসেম, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, নবাবজাদা ফজলে রাব্বী নিয়মিত গিয়ে দেখতেন 'অগ্নিবীণা'র কবি তাঁর কোনও কবিতা আবৃত্তি করছেন, নয়তো কোনও নবীন কবি যশঃপ্রার্থীর পদ্য-ভর্তি খাতায় চোখ বুলিয়ে চলেছেন দিব্যি মনোযোগ সহকারে। এই যে কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা কাব্যজগতের এক প্রধান সৃজনশীল পুরুষ, তিনি অনেক

কাজ দূরে সরিয়ে রেখে একজন তরুণ, যে হয়তো কোনওদিনই কবি নামের যোগ্য হবে না, তার পদ্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে চোখ বুলিয়ে গেলেন আগাগোড়া, এই ঘটনা 'অগ্নিবীণা'র কবির মাহাত্ম্যকেই প্রমাণ করে। মানুষ হিসেবেও যে কত বড়ো মাপের ছিলেন তা এছাড়াও আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন কথা প্রসঙ্গে একবার আমাকে বলেছিলেন, মাসিক 'সওগাত'-এর জন্য কবিতা নির্বাচনের ভার নজরুলকে দেয়া হলে তিনি নির্বিচারে সবগুলো কবিতাই বাছাই কবিতা হিসেবে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সম্পাদক আপত্তি জানালে উদারচিত্তে কবি স্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কষ্ট করে লিখেছে ওরা, বাতিল করি কীভাবে?'

কবি আদুল কাদির কিন্তু কবিতা বিচারের ব্যাপারে কাজী নজরুল ইসলামের মতো ছিলেন না। তাঁর প্রশংসা সহজলভ্য ছিল না, এ কথা আমরা অনেকেই জানতাম। কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন পাকা জহুরি। তবে পাকা জহুরিরও যে কখনও কখনও ভুল ত্রুটি হত না, এমন নয়। সে যাই হোক, মনে পড়ে, আবদুল কাদির এবং রেজাউল করীমের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৪৫ সালে 'কাব্য মালঞ্চ' নামে এটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই ঐতিহাসিক সঙ্কলনের প্রথম কবি ছিলেন শেখ ফয়জুল্লাহ এবং সঙ্কলনটি শেষ হয়েছিল সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা দিয়ে। কাব্য সঙ্কলনটি সেকালে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। সেই সঙ্কলনে আবদুর কাদির একটি সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকা লিখেছিলেন। ভূমিকাটি নাম ছিল 'বাংলা কাব্যের ইতিহাস'।

অনেক পরে শ্রদ্ধাভাজন আবদুল কাদির আমাকে জানিয়েছিলেন, তিনি শিগগিরই 'কাব্য মালঞ্চ'-এর নতুন আঙ্গিকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবেন। আমাকে এ-কথাও বলেছিলেন যে, তিনি সঙ্কলনের শেষ কবি হিসেবে আমাকে নির্বাচন করেছেন। আমার 'রূপালি স্নান' কবিতাটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন। আমি, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই সময়ে আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়েছিলাম। কারণ, তখন আমার বয়স কম এবং আবদুল কাদিরের মতো একজন সমালোচকের স্বীকৃতি পাওয়া কম কথা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সম্ভাব্য নতুন 'কাব্য মালঞ্চ' দিনের আলো দেখেনি। তবু তিনি যে, আমার কবিতা পছন্দ করতেন, এই তথ্য আমাকে উৎসাহিত করত।

আবদুল কাদির 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট চালিকাশক্তি ছিলেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা'র পথ ধরেই শুরু হয়েছিল আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'জয়তী' পত্রিকা। 'জয়তী'-র চরিত্র ছিল লিটল ম্যাগাজিনের মতো। এই উন্নতমানের পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য সম্পাদককে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। অর্থ ছাড়া তো আর পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গাঁটের পয়সা খরচ করেই কাগজ কেনা, পত্রিকা ছাপা, বাঁধাই করতে হয়। তাই, 'জয়তী' খুব বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। 'জয়তী'-র অকালমৃত্যু হলেও তার সুনাম ছিল দীর্ঘজীবী। অনেক ভালো লেখক এই পত্রিকায় লিখে তৃপ্তি বোধ করতেন।

আবদুল কাদিরের কর্মজীবন কলকাতায় শুরু হলেও শেষ হয়েছিল ঢাকায়। তিনি মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি

'মাহে নও' পত্রিকায় ১২ বছর অর্থাৎ এক যুগসম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার পর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রকাশন অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সেই চাকরি থেকে অবসর নেন ১৯৭০ সালে। অবশ্য এইসব চাকরির জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হবেন না, হবে তাঁর সাহিত্যিক অবদানের কারণে। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'দিলরুবা', 'উত্তম বসন্ত' তো বটেই 'বাংলা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা', 'কবি নজরুল', 'ছন্দ সমীক্ষণ' এবং বিভিন্ন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থাবলীর সম্পাদনার জন্য।

কবি আবদুল কাদিরের কবিতায় মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার মতোই এক ধরনের পৌরুষের ছাপ ছিল, নজরুলের আবেগের রূপটিরও ছায়া ছিল, অথচ কাব্যিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করেন নি তিনি। তাঁর মতো একজন কবি মাত্র দু'টি কাব্যগ্রন্থ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, রেখে গেছেন আমাদের দেশের কাব্যভাণ্ডারে ভাবলে এক ধরনের খেদের জন্ম হয় আমাদের মানসে।

আবদুল কাদিরের ছন্দের জ্ঞান তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ় ছিল, যা ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন লক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছেন। ছান্দসিক হিসেবে আবদুল কাদির প্রবোধচন্দ্র সেনের সবচেয়ে কাছের আসনটির যোগ্য অধিকারী। 'ছন্দ-সমীক্ষণ'-এর মতো অসামান্য বই তিনি লিখেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতায় ছন্দ বৈচিত্র্যের তেমন ছাপ নেই। আমার কেন জানি মনে হয়, পরবর্তীকালে আবদুল কাদির যে সৃজশীল সাহিত্য রচনায় অধিক মনোযোগী হতে পারেন নি সে জন্য দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকাটির ভূমিকা রয়েছে। সেই পত্রিকার নিয়মিত আবদুল কাদিরের বিরুদ্ধে অনর্থক আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশিত হত। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ আবদুল কাদির সেসব ফুজুল লেখার জবাব দিয়ে নিজের শক্তির অপচয় করতেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা। দুঃখ হয় এই অপচয়ের জন্য। মনে পড়ে, তাঁর কথা শোনার জন্য কতবারই না আজিমপুরের সরকারি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা কবি ছান্দসিক আবদুল কাদিরের সান্নিধ্যে গিয়েছি। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার অভিজ্ঞতা কখনও ভোলার নয়। আশ্চর্য ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। আমাদের দেশের কোনও কোনও কবি, সাহিত্যিকের বিষয়ে মজাদার গল্প বলতেন, তাঁর কাছে ছিল নানা রসালো কাহিনির ভাণ্ডার, জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অভাব তো ছিলই না। আজিমপুর কলোনি নিউ মার্কেটের প্রায় গা ঘেঁষে থাকায়, আবদুল কাদির রোজ বিকেল নিউমার্কেটের অন্যতম বইয়ের দোকান প্রিমিয়ার বুক শপে বসতেন। তাঁকে ঘিরে জমে উঠত তুমুল আড্ডা। পুস্তক ক্রেতা ক'জন আসতেন সেই দোকানটিতে, তার হিসেব রাখা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবদুল কাদির-কেন্দ্রিক সেই মহফিলের ডাকে সাড়া না দেয়া ছিল অসম্ভব। প্রিমিয়ার বুক শপের মালিক শিশুসাহিত্যিক গোলাম রহমান নিজেই ছিলেন একজন আড্ডাধর। তার মুখে চমৎকার এক ফালি হাসি খেলে যেত প্রায়শই। গোলাম রহমান ছোটোদের জন্য 'রকম ফের', 'বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি', 'আজব দেশে এলিস', 'বুদ্ধির ঢেঁকি', 'পানুর পাঠশালা', 'চকমকি' লিখেছেন। বড়দের জন্য লিখতেও তিনি কসুর করেন নি। ১৯৭২ সালে তিনি আততায়ীর হাতে খুন হন। বাংলা একাডেমী থেকে তার রচনাবলিও প্রকাশিত হয়েছে।

কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির জীবনের রূপ, রস, ঘ্রাণ ভালোবাসতেন। সবকিছু থেকে তিনি বিদায় নেন ১৯৮৪ সালে। আজও আজিমপুর কলোনি আছে, নিউমার্কেটও বিরাজমান, নেই আমাদের অনেকের প্রিয় গুরুজন, উঁচুদরের বিদ্বান, কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির, গোলাম রহমান এবং আরও কেউ কেউ। আজও যখন বহুদিন পর পর নিউমার্কেটে যাই, যাই 'জীনাত' নামের বইয়ের দোকানে কোনও ভালো বই কেনার উদ্দেশ্যে, তখন প্রিমিয়ার বুকশপ যে কোণটিতে ছিল, সেদিকে যাই না, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলি, পাছে হৃদপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে, চোখ হয়ে সজল। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' — এই প্রশ্নটি তো আজ অনেকেরই বরণীয়, নিত্য স্মরণীয়, হৃদয়ের খুব কাছের কবি জীবনানন্দ দাশ করে গেছেন অনেক আগে।

## ॥ চল্লিশ ॥

এই যে আমি নিয়মিত লিখে চলেছি আত্মকথা, কী লাভ এভাবে টেবিলে ঝুঁকে ঘন্টার পর ঘণ্টা সাদা কাগজ কালো অক্ষরে ভরিয়ে তুলে? এই লেখার নাম আমি নিজেই তো ভেবে-চিন্তে রেখেছি 'কালের ধুলোয় লেখা'। অর্থাৎ আমি নিশ্চিত, মনোযোগ সহকারে নিষ্ঠার সঙ্গে অনেক সময় ব্যয় করে যে বাক্যগুলো রচনা করছি, এসব একদিন সময়ের ধুলোর সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে, যেমন আমি, এই লেখার সৃষ্টিকর্তা, নিজেও বিলীন হব ধুলোয়। এসব জেনেশুনেও কেন লিখে চলেছি দিনের পর দিন? কেন নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় জুড়ে লিখছি, জীবনের এই গোধূলি বেলাতেও লিখছি কবিতা? এটা তো একটা সে-রকমই খেলা, যাতে শেষতক পরাজয়ের মুখই দেখতে হবে, তবু মেতে আছি, আমৃত্যু মেতে থাকার কথা দিয়েছি শামসুর রাহমানকে। এতকাল পরেও এই লেখা-লেখা-খেলায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছি এক ধরনের ঘোরের ভেতর —এই খেলা, যতদূর জানি, অনেকের ভালো লাগে, আবার অনেকে বিরক্ত হন, কেউ কেউ আবার গাঁটের পয়সা খরচ করে ইয়ার-বন্ধুদের বাসায় অথবা রেস্তরাঁয় আড্ডায় চাউর করেন। নইলে তাদের উদরের অন্ন হজম হয় না।

আমার এমন অনেকে আছেন, যারা আমার কোনও লেখা পছন্দ হলে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তাদের মধ্যে আমার কোনও কোনও বন্ধু তো রয়েইছেন, অনেক আধ-চেনা, একেবারে অচেনা কিছু পাঠক তাদের তারিফেব আলো আমাকে পৌঁছে দেন কিংবা সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে জানান। এটুকু পুরস্কার পেতে ভালো লাগে না, এমন অস্বীকৃতি কোনও লেখক, মনে হয়, প্রচার করতে কুণ্ঠিত হবে।

আমার এই সামান্য আত্মজীবনীর অন্যতম মনোযোগী পাঠক আবু শাহরিয়ার। না, তিনি আবু হাসান শাহরিয়ার নন। দু'জনই সাহিত্যজগতের বাসিন্দা এবং খ্যাতিমান। আবু শাহরিয়ার প্রবীণ এবং আবু হাসান শাহরিয়ার নবীন। আবু হাসান শাহরিয়ারের প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বেশি, কিন্তু আবু শাহরিয়ারের বইয়ের সংখ্যা কম। তরুণ শাহরিয়ার মূলত কবি, তার প্রবন্ধগুলিও জ্বলজ্বলে। সম্প্রতি রচিত তার অপ্রকাশিত বেশ কিছু কবিতা আমি কবিকণ্ঠে শুনেছি, যেগুলি আমার বিবেচনায় উৎকৃষ্ট, প্রকৃত অর্থেই নতুন কবিতা।

যা হোক, আজ আমি আবু শাহরিয়ারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কিছু কথা বলতে চাই। এই স্বল্পবাক, নম্র স্বভাবের সাহিত্যে নিবেদিত মানুষটি আমার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনজনদের অন্যতম। আমাকে, যতদূর জানি, তিনি খুবই পছন্দ করেন। তার সঙ্গে যে খুব বেশি দেখা কিংবা টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা হয়, এমন নয়। কালেভদ্রে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং টেলিফোনে কথা বলেন। আমি যা বলি তিনি শুনতে পান না। দুঃখের বিষয় বেশ কিছুকাল আগে এই সুলেখক শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। যখন তিনি আমার বাসায় আসেন, তখন আমি যেসব কথা বলি, সেগুলি তারই দেয়া কাগজে লিখে দিই। তিনি সেগুলো তৎক্ষণাৎ পড়ে উত্তর দেন।

আবু শাহরিয়ারের সঙ্গে প্রথম কোথায় দেখা হয়, ঠিক মনে নেই আমার। সম্ভবত নাজিমউদ্দিন রোডে আমার শ্বশুরবাড়িতে। আমার শ্বশুরবাড়ির উলটোদিকে ছিল তাদের বাসা। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রথম দেখাতেই তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার মতোই তিনি কম কথা বলেন, তার কথা মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক। আজেবাজে কথা তাকে বলতে শুনি নি।

আবু শাহরিয়ার, আমার ধারণা, বেশি লেখেন নি। তবে যতটুকু লিখেছেন তাতে যত্ন এবং উত্তম লিখনশৈলীর পরিচয় রয়েছে। তার ছোটোগল্প সঙ্কলন 'এই সময়' একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ। বর্তমান সময়ের হিংস্রতা, লোভ-লালসা এবং বর্বরতার চেহারা 'এই সময়'-এর দর্পণে দেখলে শিউরে উঠতে হয়; লেখকের সমাজ-সচেতনতা এবং লেখার ক্ষমতা লক্ষ করে পাঠক এবং সমালোচক সবাই মুগ্ধ হবেন, সন্দেহ নেই। জনপ্রিয় লেখক তিনি নন, তাতে কী? তিনি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করেন এটাই বিবেচ্য অগ্রসর পাঠকদের কাছে।

তিনি শেক্সপিয়রের দু'টি নাটক অনুবাদ করেছেন। নাটক দু'টির নাম 'হ্যামলেট' এবং 'এ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা'। মনে পড়ে 'দৈনিক বাংলায়'য় আমার কোনও একটি কলামে লিখেছিলাম যে, আমি শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকটির কিছু অংশ অনুবাদ করেছি, বাকি অংশও করে ফেলব কিছুদিনের মধ্যে। এই কলাম পড়ে আবু শাহরিয়ার আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, তিনি ইতিমধ্যে 'হ্যামলেট' অনুবাদ করে ফেলেছেন। এইখবর শুনে আমি যাতে আমার অনুবাদের কাজটি অসমাপ্ত না রাখি, সে-কথা সুন্দরভাবে বললেন। আমরা দু'জনই দু'জনের এই প্রচেষ্টার কথা না জেনেই তো কাজ শুরু করেছি। আবু শাহরিয়ারের 'হ্যামলেট' প্রকাশিত হওয়ার পরেই আমার 'হ্যামলেট' অপ্রকাশের অন্ধকার থেকে প্রকাশের আলো দেখতে পায় বাংলা একাডেমীর সৌজন্যে। আমি অবশ্য শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট'-এর যেখানে কাব্যাংশ এবং যেখানে গদ্যাংশ ঠাঁই পেয়েছে সে-রকমই রেখেছি আমার অনুবাদকর্মে। আবু শাহরিয়ারের অনুবাদে পুরোটাই গদ্য জাঁকিয়ে বসেছে। আমার 'হ্যামলেট' বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পর সেখান থেকে কিছু অংশ কলকাতার 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার সম্পাদক তার পত্রিকায় ছাপিয়েছেন বাংলা একাডেমীর সৌজন্যে।

যতদূর মনে পড়ে, একসময় আবু শাহরিয়ার কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলেন। একটি কি দু'টি তো আমিও পড়েছি কোনও পত্রিকায়। পরে তার কোনও কবিতা কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখি নি। তবে তিনি অনুবাদের জন্য খ্যাতি তো বটেই, বাংলা একাডেমী পুরস্কারও পেয়েছেন ১৯৭৯ সালে। আবু শাহরিয়ারের একটি উপন্যাসের নাম 'অন্বেষা'। 'স্বপ্নলোক' তার আরও একটি ছোটোগল্প সঙ্কলনের নাম।

এই নিভৃতলোকের বাসিন্দা আবু শাহরিয়ারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হুমায়ূন কাদির। অকালপ্রয়াত শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন কাদির, বলতে কষ্ট হচ্ছে, আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত। ক'জন আজ মনে রেখেছে সেই ভেতর-গোঁজা, আত্মমগ্ন লেখককে, যিনি যৌবনেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন গদ্যশিল্পী হিসেবে? গোছানো স্বভাবের মানুষ ছিলেন না হুমায়ুন কাদির। অল্পসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমএ প্রথম পর্বের ক্লাস করে পরীক্ষা না দিয়েই সেই বিদ্যানিকেতন থেকে, বলা যেতে পারে, সট্‌কে পড়েন। আমি তাকে কিছুটা হলেও বুঝতে পারি। এমএ পরীক্ষা না দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে মাঝপথে সট্‌কে পড়ার প্রবণতা সেকালে আমার মধ্যেও ছিল। কোনও কোনও সংবেদনশীল সহপাঠী এবং শুভার্থী শিক্ষক যুগপৎ বিস্মিত এবং ব্যথিত হতেন।

হুমায়ূন কাদির সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দৈনিক 'সংবাদ'-এর বার্তা বিভাগে কর্মরত ছিলেন কিছুকাল, পরে মাসিক 'সওগাত'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পাকজমহুরিয়াত' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর সেই পত্রিকা রূপান্তরিত হয় 'সচিত্র বাংলাদেশ'-এ। হুমায়ূন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই পত্রিকাতেই কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহেদা বেগম নামে একজন স্কুলশিক্ষিকাকে বিয়ে করেন। জাহেদা বেগম, যতদূর মনে পড়ে, ক্ষয়িষ্ণু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাদের বাসা ছিল জিন্দাবাহারে। তাদের সংসারে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম কিছুদিনের জন্য আনন্দের ঝলক এনে দেয়। দুঃখের বিষয়, হুমায়ূন কাদির এবং জাহেদা বেগমের বিয়ে টেকে নি। বনিবনা হয় নি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। সন্তানের জন্মের পরেই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটে।

এরপর সম্পূর্ণ একা হয়ে যান আমাদের প্রিয় লেখক হুমায়ূন কাদির। একটি ভাড়াটে ঘরে বসবাস করতেন একা। সেই জীবন আনন্দময় ছিল, এ-কথা বলা যাবে না। মানুষ সুখের জন্যই ঘর বাঁধে, সন্তানকে বুকে জড়িয়ে স্বর্গসুখ লাখ করবে, এই আশাতেই তো সে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়, কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করে না। কিন্তু হুমায়ূন কাদির সেই স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হলেন। তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন, ছিলেন অনেকের চেয়ে আলাদা। এই নিঃসঙ্গ কথাসাহিত্যিক মাত্র ৪৫ বছর বয়সে সম্ভবত মধ্যরাতে শূন্য ঘরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর মুহূর্তে তার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এক গ্লাস পানি দেয়ার মতো কেউ ছিল না কাছে ধারে। পরদিন ঘরের দরজা ভেঙে কেউ আর প্রকৃত হুমায়ূন কাদিরকে দেখতে পায় নি, পেয়েছিল তার লাশ।

হুমায়ূন কাদিরের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল, যদিও আমাদের দেখা ঘন ঘন হত

না। তিনি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতেন, আমরা সামান্য আলাপ-আলোচনা করতাম। যেহেতু আমরা দু'জনই কম কথা বলতাম, তাই আসর তেমন গুলজার হতে পারে নি কখনও। তবে এ-কথা স্পষ্টতই বলতে পারি, তার সঙ্গে কখনও মনোমালিন্য হয় নি আমার। তাকে আমার ভালো লাগত খুবই। তিনি যে আমাকে অপছন্দ করতেন না তা ওঁর আচরণেই বুঝতে পারতাম। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত, সাহিত্যিক পরিবেশ নিয়েও কোনও কোনও দিন আলোচনা হত। তাকে কোনও কটু কথা বলতে শুনি নি কখনও, কারও নিন্দা তিনি আমার কাছে করেন নি। তবে কখনও সাংসারিক বিপর্যয়ের আভাস পেয়েছি তার কোনও কোনও উক্তিতে। তবে সেই উক্তি শালীনতার বেড়া ডিঙায় নি কখনও।

হুমায়ূন কাদির সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বলতে পারেন, ভালো বলতে পারেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু শাহরিয়ার। আবু শাহরিয়ার তার এই বন্ধুটিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসায় কোনও দেখানোপনা ছিল না। হুমায়ূন কাদিরের মৃত্যুর পর তার নাম যাতে জাগরূক থাকে পাঠক-পাঠিকাদের স্মৃতিতে সে-জন্য পরলোকগত লেখকের এই বন্ধু 'হুমায়ূন পুরস্কার' প্রবর্তন করেছিলেন। জানি না এখনও সেই পুরস্কার প্রচলিত আছে কি-না। তা ছাড়া, হুমায়ূন কাদির সম্পর্কে বাংলা একাডেমী থেকে যাতে প্রয়াত লেখকদের জীবনী সিরিজ গ্রন্থমালায় তার বন্ধু সম্পর্কিত একটি বই প্রকাশিত হয় সে-জন্য তিনি কম কাঠখড় পোড়ান নি। বাংলা একাডেমীর অনুরোধে তিনি নিজেই বন্ধু সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন, যেটি পরে প্রকাশিত হয়েছে। সেই বই পড়লে হুমায়ূন কাদির রচিত সাহিত্যের পরিচয় এবং যথার্থ মূল্যায়ন পাওয়া যাবে। এজন্য আমরা যারা হুমায়ূন কাদিরকে চিনতাম, তার লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তার কদর বুঝতাম, তারা সবাই আবু শাহরিয়ারের কাছে ঋণী। এই বইটি আছে বলে হয়তো কোনও কোনও উৎসাহী ছাত্র কিংবা গবেষক দূর ভবিষ্যতে হুমায়ূন কাদির সম্পর্কে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন সহজেই। আজকালে কেই-ই বা স্মরণ হুমায়ূন কাদিরকে? কথাসাহিত্যিক কিংবা গবেষকদের মধ্যেই বা ক'জন স্মরণ করেন তাকে? সখেদে বলতে পারি, অনেকেই মনে রাখেন নি অকালপ্রয়াত কিন্তু সৃজনশীল কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন কাদিরকে। তিনি বিস্মৃত আজ অনেকেরই মতো। তার কোনও বই সম্ভবত কেউ ছুঁয়েও দেখে না এখন। হুমায়ূন কাদিরের সাহিত্যে তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা ছিল, ছিল রোমান্টিক ধারার স্পষ্ট রূপ, তার সৃষ্ট চরিত্রের মানসিক জটিলতার রূপায়ণ ছিল শিল্পসম্মত। সত্য, তিনি সমাজ-সচেতন লেখক ছিলেন, কিন্তু প্রচারণার কোনও চিহ্ন লক্ষণীয় ছিল না তার কোনও রচনায়। একালে পাঠক-পাঠিকাদের আমি অনুরোধ করব হুমায়ূন কাদিরের উপন্যাস 'নির্জন মেঘ', ছোটগল্পের বই (১) 'একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প', (২) 'আদিম অরণে এক রাত্রি', (৩) 'শীলার জন্যে সাধ', (৪) 'কোথায় পাব তারে' পড়ার জন্য। আশা করি, তারা প্রতারিত হবেন না। বরং পুরস্কৃত হবেন। হুমায়ূন কাদির ছোটোগল্পের জন্য মরণোত্তর বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান মৃত্যুর তিন বছর পর।

আবু শাহরিয়ার 'কালের ধুলোয় লেখা' খুঁটিয়ে পড়েন বলে আমার ধারণা। কারণ, আমার এই ধারাবাহিক রচনা সম্পর্কে তিনি কিছু সমালোচনা করেছেন কথা প্রসঙ্গে। আমি যে আত্মজীবনী লিখছি, এই বিষয়টি তার ভালো লেগেছে। তিনি কিছু তারিফও করেছেন, তবে এই সঙ্গে অপ্রসন্ন কণ্ঠস্বরে জানিয়েছেন, আমি নিজের কথা বেশি না লিখে অন্যদের কথাই বিস্তার লিখছি। এটা তার পছন্দ নয়। যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কিংবা এখন হচ্ছে তাদের প্রসঙ্গে আমার কথা কি কিছুই এসে পড়ছে না? তাদের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আমিও কি নেই? তবে আবু শাহরিয়ারের মন্তব্য এবং পরামর্শ মনে রাখতে সচেষ্ট হব। এখানে একটি মুশকিলের কথা বলছি। যেহেতু 'কালের ধুলোয় লেখা' আগে লিখে রাখি নি তাই প্রতি সপ্তাহে কিছু লিখে সম্পাদকের দপ্তরে একটি নির্দিষ্ট তারিখে সেটি দাখিল করতে হয়। স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে কোনও কোনও ঘটনা, কোনও কোনও চেনা ব্যক্তি সম্পর্কে লিখতে হয়। ভুল জেনেশুনে পরিবেশন করা অন্যায় বলেই তথ্যটি যথার্থ কি-না সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কাজটি সহজ নয়। স্মৃতি ঝালাইয়ের কাজের কথা বলছি। আমি মনগড়া কোনও ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই না বলেই সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকি।

হয়তো এই মুহূর্তে বর্তমানের কোনও ঘটনা কিংবা চেনা কোনও ব্যক্তির কোনও উক্তি মনে ঝিকিয়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে লেখার সময় হঠাৎ অনেকবছর আগের একটি দৃশ্য ফুটে উঠল আমার দৃষ্টিতে। দুটোই জায়গা করে নিল আমার লেখায়। এই বাক্যটি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে উদিত হল দূর অতীতের কিছু দৃশ্য — মনোহর বিকেল, আমাদের পাড়াতলী গ্রামের প্রায় গা ঘেঁষে বয়ে-যাওয়া মেঘনা নদী, চলমান নৌকোয় বসে আছেন আমার বাবা, তাঁর হাতে একটি দু'নলা বন্ধুক, আমি এবং আমার এক ছোটো ভাই বসে আছি বাবার পাশে। উদগ্রীব আমরা সেসব পাখির জন্য যারা শিকার হবে বাবার বন্দুক-নিঃসৃত গুলিতে। মেঘনার কিছু পানি আচমকা লাল হয়ে গেল কয়েকটি পাখির তাজা রক্তে। আমি কি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম সেই পাখি শিকারের দৃশ্যটি দেখে? হয়তো আনন্দিত হয়েছিলাম, হয়তো বেদনার্ত হয়েছিলাম। আজ আর সে-কথা স্পষ্ট মনে নেই। জীবন সম্ভবত এরকমই — হয়তো একই সময় মনের গহনে বয়ে যায় দু'টি বিপরীত ধারা।

## ॥ একচল্লিশ ॥

আমার বয়স এখন সত্তরের কোঠায়। যাদের বয়স এখন সত্তরের কিংবা আশির কোঠায় শুধু তাদের সঙ্গই আমি পছন্দ করি না, প্রৌঢ়, যুবক, শিশু-কিশোর সবার কথা শুনতে ভালো লাগে, ভালো লাগে তাদের সঙ্গ। তাই, সদ্য-তরুণ লেখকদের অনেকেই আমাকে সহজেই আপনজন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাদের খুব আপন মনে করি বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। মুরুব্বিয়ানা ফলানো আমার ধাতে নেই, তা বলে কোনও ধরনের ফাজলামিকেও প্রশ্রয় দিই না। আমি নিজে বেশি কথা বলি না, এই যে

কম কথা বলার অভ্যাস, এর পিছনে কোনও হামবড়া ভাব নেই, আমার চরিত্রের লাজুকতাই এর কারণ। অন্যদের কথা শুনতেই আমার ভালো লাগে। আমার কোনও কোনও শুভার্থী, বন্ধু কখনও-সখনও আমার এই অনিচ্ছাকৃত বাকসংযম বিষয়ে মন্তব্য করলে আমি তাদের অভিযোগ মাথা পেতে নিই অসংকোচে। তবে, ইদানিং আমি আগের তুলনায় কিছুটা বেশি কথা বলি; এমন ধারণা আমার ওপর ভর করেছে বলে মনে করি। যারা বুদ্ধির ছোঁয়া-লাগা ভালো কথা বলেন, যাদের কথাবার্তায় চমৎকার গল্পের উপাদান থাকে, কোনও কোনও বাক্যে কবিতার ঝলকানি খেলে যায়, তাদের কথা আমার কাছে খুবই উপভোগ্য মনে হয়।

সেজন্য যে প্রবন্ধের ধরনে কথা বলতে হবে, এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। কোনওরকম কৃত্রিমতা কথাবার্তায় কাম্য হতে পারে না। যদি কেউ সহজ সুন্দরভাবে নিজের কথা বলতে পারেন তা'হলে তার বচনগুলো শ্রোতার কাছে সুখাদ্যের মতোই উপভোগ্য হবে, সন্দেহ নেই। কেউ যদি চিত্তাকর্ষক কথা বলার জন্য এক ধরনের স্টাইল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং তাতে যদি শ্রুতিকটু দেখানোপনা প্রশ্রয় না পায়, তবে তা সবার কাছেই প্রশংসিত হবে, আমার বিশ্বাস।

আমি পুরনো ঢাকার মাহুতটুলী পাড়ার শীর্ণকায় এক গলির একটি মাটির ঘরে জন্মগ্রহণ করি। বাড়িটি ছিল আমার নানার। সেই গলিতেই কাটিয়েছি অনেকগুলো বছর। আমার নানা এবং বাবা দু'জনেই গ্রামের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে তাঁরা এসেছিলেন ঢাকা শহরে। যা হোক, মাহুতটুলীর গলিতে প্রচলিত ছিল ঢাকাইয়া উর্দু ভাষা। সেই ভাষার কিঞ্চিৎ আঁচ আমাদের পরিবারেও লেগেছিল। আমরা সেই পরিবেশে বাস করেও ঢাকাইয়া ভাষার গ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। ঢাকাইয়া ভাষার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। আসলে কোনও ভাষার দিকেই আমি আপত্তিকর দৃষ্টিতে তাকাই না। ঢাকাইয়া ভাষার প্রতি বেশকিছু ব্যক্তির একধরনের বিদ্বেষ রয়েছে, এটা আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ করে আসছি। এই ভাষাটির প্রতি বিদ্রুপ মিশ্রিত 'ছে ছে' ভাব রয়েছে। কিন্তু কোনও ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা অন্যায় বলে মনে করি।

কৈশোরে আমার এক বন্ধুর গৃহশিক্ষক আমাকে লক্ষ করে একবার বলেছিলেন, 'এই ছেলেটা দেখছি শুদ্ধ বাংলা বলছে!' তাঁর বিদ্রুপ-বাক্যটি আমাকে ভীষণ আহত তো করেইছিল, আমার ভিতরে এক ধরনের তেজী জেদও সৃষ্টি করেছিল। সেদিন থেকে আমার মাতৃভাষা চর্চার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে চেষ্টা করি। মাতৃভাষাও যে লাগাতার গভীর চর্চার প্রতীক্ষায় থাকে, এই সত্য, আশা করি, প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির মানসপটেই প্রতিভাত। মাতৃভাষাও যে শিক্ষার মুখাপেক্ষী এবং সেই শিক্ষা চলতে থাকে আমৃত্যু — এ-কথা কোনও ভাষাশিল্পীরই অজানা নেই।

আমি আমার মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাভাষা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছি তা বিদ্বজ্জন এবং সচেতন পাঠকরাই বলতে পারেন। নিজের মতো করে প্রতি পদে শেখার চেষ্টা করছি, সফল হচ্ছি কি-না তার বিচার করবেন সচেতন পাঠকসমাজ।

আমার কবি জীবনের প্রত্যুষে লেখা নিয়ে হাজির হয়েছি গুরু গম্ভীর সম্পাদকের দরবারে। লেখা দাখিল করেই যাত্রা করেছি কোনও বন্ধুর আস্তানায় কিংবা আমাদের

বাসার দিকে। কবিতা পত্রিকাস্থ হলে খুশি হয়েছি। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার কবিতা রচনার আদিকালেও আমাকে কবিতা প্রকাশের জন্য হতাশায় ভুগতে হয় নি।

সম্পাদকের বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয় নি আমার কবিতা। তেমন দিন আসার আগে, হয় কবিতা রচনায় ইতি টানব, নয়তো লিখলেও কাছেই বন্দি করে রাখব।

আহসান হাবীব 'দৈনিক পাকিস্তান' যা পরবর্তীকালে 'দৈনিক বাংলা'য় রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন। কবি হিসেবে যেমন খ্যাতিমান ছিলেন, তেমনি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেও তাঁর সুকৃতি আজও নন্দিত আমাদের লেখক এবং পাঠকসমাজে। আমি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক হবার পরেও হাবীব ভাই আমার কাছে সাহিত্য সাময়িকীর জন্য কবিতা চাইলে আমি নিজে তাঁর কামরায় গিয়ে কবিতার পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করতাম কবি এবং সাহিত্য সম্পাদক আহসান হাবীবের হাতে। সেই মুহূর্তে একেবারেই ভুলে যেতাম যে, দৈনিক পত্রিকাটির সম্পাদক আমি। নিজেকে একজন বহিরাগত কবি, যে সাহিত্য সম্পাদকের কাছে তার কবিতা প্রকাশের তাড়নায় এসে হাজির হয়েছে, সেভাবেই আমি তাঁর কাছে যাই। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। পঞ্চাশের দশকের কথা। তখন দৈনিক 'ইত্তেহাদ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই পত্রিকার সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন আহসান হাবীব। সেকালে একজন তরুণ কবি হিসেবে আমার সুখ্যাতি হয়েছিল, এ-কথা সবিনয়ে নিবেদন করছি। ইতিমধ্যে আমার অনেক কবিতা পূর্ব বাংলার তো বটেই, পশ্চিম বাংলার বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর সাহিত্য সাময়িকীতে হাবীব ভাই আমার কিছু কবিতা প্রকাশ করেছেন। আমি একটি কবিতা 'ইত্তেহাদ'-এর জন্য তাঁর হাতে দিলাম। কবিতাটি তাঁর ভালো লাগে নি বলে আমাকে ফেরত দিলেন। লুকাব না, সেদিন আমি খানিক আহত হয়েছিলাম, তবে আহসান হাবীবের এই প্রত্যাখানে কোনওরকম বিরূপতাকে মনে ঠাঁই দিতে পারি নি। তাঁর কাব্যরুচির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। আমার সব কবিতাই তাঁর পছন্দ হবে, এমন প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দেয়া আমার অনুচিত মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে। আহসান হাবীব তো আমার অনেক কবিতার প্রশংসাও করেছেন। তাই তাঁর ফিরিয়ে দেয়া কবিতা হাতে নিয়ে এক ফোঁটা অসন্তোষকেও মনের কিনারে ঘেঁষতে দিই নি। পরে তিনি যখনই আমাকে কবিতা দিতে বলেছেন, আমি প্রফুল্লচিত্তে সদ্য লেখা কবিতা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়েছি। আমার যে কবিতাটি আহসান হাবীবের পছন্দ হয় নি, সেটি আমি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'র ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই কবিতা বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেছিলেন।

এই ঘটনা আমাকে আহসান হাবীবের কাব্যবোধ সম্পর্কে আদৌ সন্দেহপ্রবণ করতে পারে নি। কারণ, এ-কথা আমি বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, এখনও পারি যে, একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চেতনায় ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। যাই হোক, আমাদের অনেকের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় কবি আহসান হাবীব দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সামিয়িকীর সম্পাদক হিসেবে যে উজ্জ্বল উদাহরণ রেখে গেছেন, তা একালে দুর্লভ। আমার এই উক্তি, আশা করি, বর্তমানে অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হবে।

নাসির আহমেদ বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ছাত্র এবং একজন সুকবি। তিনি ভাগ্যবান, কারণ 'দৈনিক বাংলা'য় আহসান হাবীবের একজন কনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নাসির আহমেদ দিনের পর দিন হাবীব ভাইকে কাজ করতে দেখেছেন খুব নিকট থেকে। আহসান হাবীবের অনেক কথা তিনি শুনেছেন, একজন প্রধান অগ্রজ কবির সান্নিধ্য, তাঁর কথাবার্তা এবং আচরণ থেকে অনেক কিছু আহরণ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ক'জন তরুণ লেখকের জীবনে দীর্ঘকাল আহসান হাবীবের এমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে?

বর্তমানে নাসির আহমেদ 'দৈনিক জনকণ্ঠে'র একজন সহকারী সম্পাদক। আহসান হাবীবের কাছে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল বলেই হাবীব ভাই তাকে স্নেহ এবং পছন্দ করতেন। তিনি তাঁকে সযত্নে কাজ শিখিয়েছেন ধৈর্য সহকারে। নাসিরের মধ্যে শেখার ইচ্ছা প্রবল ছিল, তাই তিনি আহসান হাবীবের ছায়ায় বাস করে কিছু শিখতে পেরেছেন। আমি বলব না, নাসির আহমেদ সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনার কাজে আহসান হাবীবের দক্ষতা এবং সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, তা সম্ভবও নয়।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এই যে প্রতি সপ্তাহে 'কালের ধুলোয় লেখা' 'দৈনিক জনকণ্ঠে' প্রকাশিত হচ্ছে, তার পেছনে এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এখলাসউদ্দিন আহমদের একটি ভূমিকা রয়েছে। তাঁর অক্লান্ত উপর্যুপরি তাগিদের ফলেই আমি আত্মকথা লিখতে উদ্বুদ্ধ হই। জানি, এই আত্মকথা লিখিত না হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। তবু এই যে জীবন আমি যাপন করে চলেছি, নানা ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, এখনও হচ্ছি, অনেক বিশিষ্ট এবং ভালো মানুষের সাহচর্য লাভ করেছি — এসব নিয়ে কিছু কথা আমার লেখার প্যাড থেকে 'দৈনিক জনকণ্ঠ'র পাতায় ঠাঁই পেলে কারও তো কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। যদি এই লেখা চার পাঁচজন সংবেদনশীল পাঠকেরও মনে কিছু তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে, তা হলেই আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে গণ্য করতে পারব।

দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেক কিছুই চোখে পড়ে, কিন্তু সেগুলোর সবকিছুই মনে দাগ কাটে কি? বেশ কয়েক বছর আগে, তখন আমি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকের আসনে বসার অধিকার পেয়েছি আমার সহকর্মীদের প্রবল ইচ্ছায়। অফিসের কাজ ছাড়াও অনেকটা সময় কেটে যেত পার্টিতে এবং কোনও কোনও বন্ধুর বাসায় নৈশ আড্ডায়। সেসব আড্ডায় শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা তো হতই, একই সঙ্গে চলত সুরাপান। কেউ কেউ উচ্চস্বরে কথা বলতেন, কারও কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হত মোলায়েম স্বরের দার্শনিক উক্তি, কেউ বা আবৃত্তি করতেন বিখ্যাত কোনও আধুনিক কবির পঙ্‌ক্তিমালা। সেই আসরে কখনও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এবং কখনও আমি অনুরুদ্ধ হয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতাম। আমাদের প্রিয় বন্ধু এ বি সি যিনি অকালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অনেক আগে, তিনি আবৃত্তি করতেন টিএস এলিয়ট, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং মাঝে-মধ্যে এই অধমেরও কোনও কোনও কবিতা। এ বি সি অর্থাৎ আব্দুল বারি চৌধুরী কখনও কখনও হাসিমুখে নিজেকে বলতেন এবিসিডি অর্থাৎ তাঁর বিবরণে আবদুল বারি চৌধুরী ড্রাঙ্ক। নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করার এই দুর্লভ গুণটি ছিল আমার সেই অনুজপ্রতিম বন্ধুটির। তার অনুপস্থিতি কখনও কখনও হৃদয়ে অশ্রুধারা সৃষ্টি করে।

কবি এবং বহু গুণে গুণান্বিত প্রাক্তন মন্ত্রী আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, প্রাক্তন সচিব শওকত আলী এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও সচিব আসাদুজ্জামানের বাসভবনে প্রায়শই আমাদের আসর জমত একটি অর্কেস্ট্রার মতো। সেসব দিনের কথা মনে পড়লে নিজের অজান্তেই অনেক ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মনে পড়ে মনসুর আহমদের কথা। মায়াময় চেহারা ছিল মনসুর আহমদের। বিনয়ী, মৃদুভাষী, প্রতিশ্রুতিশীল লেখক এবং দক্ষ যুগ্মসচিব। তারুণ্যের দ্বিপ্রহরে পা রাখার আগেই মৃত্যুর নিষ্ঠুর কৃষ্ণ থাবা তাঁকে উপড়ে নেয় জীবনের বর্ণিল আলিঙ্গন থেকে। রশীদ করীমের বাসায় গৃহকর্তা, মনসুর এবং আমি কতই না মন-মাতানো আড্ডা দিয়েছি রাতের প্রথম প্রহরে। আমাদের কোনও কোনও মদির সন্ধ্যা কেটেছে মনসুর আহমদের ধানমণ্ডির বাসায়।

তবে সবচেয়ে বেশি নৈশআড্ডা জমেছে শওকত আলীর বাসায়। তখন তিনি ঢাকার ডি.সি.। আমাকে নিয়ে আসার জন্য নিয়মিত গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। মধ্যরাতে আসরের অবসান হলে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাদের আমাদের সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন মানে আশেক লেনের বাসায় পৌঁছে দিতেন। সেইসব দিন, সেইসব রাত, হায়, রইল না, রইল না আমাদের নানা রঙের দিনগুলো। এ বি সি নেই, দেবদাস অসুস্থ, প্রায় নিশ্চল, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ নেই, মনসুর আহমদ নেই। কতকাল দেখা হয় না আসাদুজ্জামান এবং শওকত আলীর সঙ্গে। অথচ সম্ভবত আমরা একই শহরে আছি। আমরা কেউ কারও খোঁজ নিই না। নেয়ার চেষ্টা করি কি?

এক ধরনের মানসিক জাড্যে কি ভুগছি আমি? আমরা? কে এর উত্তর দেবে? অনুসন্ধানের জন্য যে আবেগ, যে অনুভূতির প্রয়োজন, তা-ই হারিয়ে ফেলে আমরা যে যার কন্দরে বসবাস করে দিন কাটাচ্ছি, খুইয়ে ফেলছি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ জীবন!

## ॥ বিয়াল্লিশ ॥

ঢাকাইয়া ভাষায় আমার পরিবারের কেউ কখনও কথা বলতেন না। আমিও না। কারণ বলতে পারতাম না, যদিও বহু শব্দার্থ আমার জানা ছিল। আমাদের পারিবারিক উৎস পূর্ব বাংলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী একটি গ্রাম — পাড়াতলী। তা বলে ঢাকাইয়া ভাষার প্রতি আমাদের কোনও বিরূপতা ছিল না। আমার তো ছিলই না। কারণ, আমি ছেলেবেলা থেকেই বুঝতে শিখেছিলাম যে, কোনও ভাষাই নিন্দনীয় নয়, যেমন কোনও জাতিই ঘৃণ্য নয়।

আমি ১৯৮৫ সালের আগে কোনওদিন ভাবি নি যে, পুরোপুরি ঢাকাইয়া ভাষায় কবিতা লিখব অথবা লিখতে পারব। মনের গভীরতম স্তরেও এমন ইচ্ছা ঠাঁই পায় নি। বংশপরম্পরায় যারা ঢাকা শহরের বাসিন্দা তাদের ঢাকাইয়া কিংবা কুট্টি বলা হয়। অনেকে ঢাকাইয়া এবং কুট্টি শব্দ দু'টি, যতদূর লক্ষ করেছি, গালি হিসেবে এস্তেমাল করেন। এটা যে মানুষের প্রতি অহেতুক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন এবং আত্ম-গৌরবের অহমিকা প্রকাশের

এক ধরনের অশ্লীলতা, তা ওরা বোঝেন না। কিংবা এ-ও হতে পারে, সচেতনভাবেই এই আপত্তিকর ভঙ্গিটি ফুটিয়ে তোলেন তাদের কথায়, আচরণে।

আমি ১৯৮৪ সালে 'এই মাতোয়ালা রাইত' নামে একটি কবিতা লিখেছিলাম। এই কবিতাটি আমার সাতাশ নম্বর কাব্যগ্রন্থ 'এক ফোঁটা কেমন অনল'-এ ঠাঁই পেয়েছে। কবিতাটি আগাগোড়া ঢাকাইয়া ভাষায় লেখা হয়েছে। কোনওদিন ঢাকাইয়া ভাষায় লিখব, এমন কোনও বাসনা আমার মনে 'এই মাতোয়ালা রাইত' রচনার আগে প্রস্ফুটিত হয় নি। এই কবিতাটি লিখে উঠতে পারার দু'টি কারণ আছে। প্রথম কারণ হলো, এক মধ্যরাতে বন্ধুবান্ধবদের আসর থেকে পুরনো ঢাকার সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনের আমাদের বাসার সামনে আমাকে বহনকারী মোটরকারটি থামার পর নেমে পড়লাম দিব্যি প্রফুল্ল চিত্তে। বন্ধুদের আড্ডায় উন্নতমানের মদির পানীয় সেবন করা হয়েছিল একটু বেশিমাত্রায়। তবে হুঁশ ছিল ষোলোআনাই। মোটরকার থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মধ্যরাতে মহল্লার এক যুবক টলতে টলতে এসে আমাকে কদমবুসি করে খানিক অতিরিক্ত মাত্রায় শ্রদ্ধা নিবেদন করল। ওর মুখ থেকে সস্তা কিসেমের মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছিল ভুর ভুর করে। হাসি-মেশানো কী সব কথা বলার চেষ্টা করল সেই মাতাল জোয়ান, বুঝতেই পারলাম না। কোনওমতে ওর টলমল সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে বাসার ভেতর প্রবেশ করলাম। সে পাশের গলিতে টলতে টলতে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা ঘুমের কুয়াশা চোখ থেকে মুছে যাওয়ার পর গতরাতের আমাদের বাসার গেটের সামনের দৃশ্যটি মানসপটে ভেসে উঠল বন্ধুদের নৈশ আসরের টুকরো টুকরো ছবিকে সরিয়ে। সেই মাতাল যুবার একটি কি দু'টি ঢাকাইয়া বাক্য আমাকে, বলা যেতে পারে, পরিচালিত করল কবিতার দিকে। প্রচলিত যে-ভাষায় বাংলা কবিতা লেখা হয়, সেই ভাষায় এই বিশেষ কবিতাটি লিখলে চলবে না, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বেশি দেরি হল না। বিদ্যুল্লতার মতো মনে খেলে গেল, এই কবিতা ঢাকাইয়া ভাষায় অর্থাৎ কুট্টি ভাষা দাবি করে। ঢাকাইয়া ভাষায় কবিতা লেখার জন্য সাহসের প্রয়োজন বলে মনে করি। এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জও বটে। এই কবিতা লেখা যে সহজ কাজ নয়, সেটি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম। যে-ভাষায় এতকাল কবিতা রচনা করে এসেছি সেই ভাষা এখানে খাটবে না। ঢাকাইয়া ভাষা ব্যবহার করতে হবে প্রতিটি শব্দে, বাক্যে, প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললাম চটজলদি। মনে পড়ে গেল, যুবনাশ্ব অর্থাৎ মনীশ ঘটক কিছুদিন আগে একটি কবিতা লিখেছিলেন ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গে'। সেটি ঠিক ঢাকাইয়া ভাষায় নয়, বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের ভাষা। আমার সম্ভাব্য কবিতাটির পক্ষে সে ভাষা যথাযথ হবে না। আমাকে ব্যবহার করতে হবে ঢাকা শহরের আদি বাসিন্দা কুট্টিদের ভাষা। পারব কি আখেরে? ভাবলাম, এটা তো এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের কাছে পরাস্ত হলে চলবে না, জয়ী আমাকে হতেই হবে। আখেরে একদিনের মধ্যে লেখা হয়ে গেল, 'এই মাতোয়ালা রাইত'। খাস ঢাকাইয়া ভাষায় লেখা এটাই প্রথম বাংলা কবিতা, এমন দাবি যদি করি, তাহলে অন্যায় হবে না, আশা করি।

'এই মাতোয়ালা রাইত' প্রসঙ্গে প্রাক্তন 'দৈনিক বাংলা'র জেনারেল ম্যানেজার মরহুম তওফিক আজিজ খানের কথা মনে পড়ছে। তিনি আমাকে দু'তিনটি খাস ঢাকাইয়া শব্দ সরবরাহ করেছিলেন। পুরো কবিতাটি যখন তাকে শোনালাম, তিনি দিলখোলা তারিফ করলেন। 'এই মাতোয়ালা রাইত' আদ্যোপান্ত একজ মদ্যপের স্বগতোক্তি। কবিতাটির খানিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি —

হালায় আজকা নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপট্টির খান্কি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতের তামাম গতরে। পাও দুইটা কেমুন
আলগা আলগা লাগে, গাড়া আবরের সুনসান
অন্দরমহলে হাঁটে। মগর জমিনে বান্ধা পাও।
আমারে হগলে কয় মইফার পোলা, জুম্মনের
বাপ, হুস্না বানুর খসম, কয় সুবরাতি মিস্ত্রি।
বেহায়া গলির চাম্পা চুমাচাট্টি দিয়া কয়, 'তুমি
ব্যাপারী মনের মানু আমার, দিলের হকদার।'

আমার গলায় কার গীত হুনি ঠাণ্ডা আঁসুভরা?
আদতে কেউগা আমি? কোন্হানতে আইছি হালায়
দাগাবাজ দুনিয়ায়? কৈবা যামু আখেরে ওস্তাদ?
চুড়িহাট্টা, চানখাঁর পুল, চকবাজার, আশক
জমাদার লেইন, বংশাল — যেহানেই মকানের
ঠিকানা থাউক, আমি হেই একই মানু, গোলগাল
মাথায় বাবরি: থুতনিতে ফুদ্দি দাড়ি, গালে দাগ,
যেমুন আধলি একখান খুব দূর জমানার।

আমার হাতের তালু জবর বেগানা লাগে আর
আমার কইলজাখান, মনে অয়, আরেক মানুর
গতরের বিতরে ফাল পাড়ে, একটুও চৈন নাই
দিলে, দিল জিঞ্জিরার জংলা, বিরান দালান। জানে
হায়বৎ জহরিলা কেঁকড়ার লাহান হাঁটা-ফিরা
করে আর রাইতে এমুনবি অয় নিজেরেও বড়
ডর লাগে, মনে অয় যেমুন আমিবি জমিনের
তলা থন উইঠা আইছি বহুত জমানা বাদ।

এ কার মৈয়ত যায় আন্ধার রাইতে? কোন্ ব্যাটা
বিবি বাচ্চা ফালাইয়া বেহুদা চিত্তর অইয়া আছে।

একলা কাঠের খাটে বেফিকির, নোওয়াব যেমুন?
বুঝছোনি হউরের পো, এলা আজরাইল আইলে
আমিবি হান্দামু হ্যাষে আন্ধার কব্বরে। তয় মিয়া,
আমার জেবের বিত্‌রের লোটের লাহানই হাচা মৌত।

এনহবি জিন্দা আছি, এহনবি এই নাকে আহে
গোলাপ ফুলের বাস, মাঠার লাহান চান্নি দিলে
নিরালা ঝিলিক মারে। খোওয়াবের খুব খুবসুরৎ
মাইয়া, গহীন সমুন্দর, হুন্দর পিনিস আর
আসমানী হুরীর বরাত, খিড়কির রৈদ, ঝুম
কাওয়ালীর তান, পৈখ সুনসান বানায় ইয়াদ।
এহনবি জিন্দা আছি, মৌতের হোগায় লাথ্‌থি দিয়া
মৌত তক সহি সালামত জিন্দা থাকবার চাই।

ইচ্ছে করেই পুরো কবিতাটি এখানে তুলে ধরি নি। যারা কবিতাটি আদ্যোপান্ত পড়তে আগ্রহী হবেন, তারা নিশ্চয়ই 'এই মাতোয়ালা রাইতে'র সন্ধান করবেন। এই কবিতাটি সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর আমি বেশকিছু সাধুবাদ পেয়েছিলাম বিভিন্ন পাঠকের কাছ থেকে। কয়েকজন আবৃত্তিশিল্পী এই কবিতা নানা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে প্রশংসিত হয়েছেন। সেই প্রশংসার ভাগ 'এই মাতোয়ালা রাইত'-এর ভাগ্যেও জুটেছে।

তবে, এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিষয়ে কিছু কথা না বলে পারছি না। ঢাকা শহরের একজন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত যুবক কোনও এক সন্ধ্যারাতে ঢাকা ক্লাবের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে সালাম বিনিময়ের পর আমাকে বললেন যে, 'এই মাতোয়ালা রাইত' কবিতাটি লেখা আমার উচিত হয় নি। আমি ঢাকার খাস বাসিন্দাদের হেয় করেছি। সেই যুবক একজন ঢাকাইয়া। কিন্তু আমি আমার কবিতায় খাস ঢাকাইয়া ভাষা ব্যবহারেব মাধ্যমে ঢাকার আদি বাসিন্দাদের অপমান করা তো দূরের কথা, ভাষাটির মধ্যে যে একটি আলাদা সৌন্দর্য এবং তেজ রয়েছে, সেটাই প্রকাশ করতে চেয়েছি, যা এর আগে কেউ চেষ্টা করেন নি। কিন্তু সেই যুবক, আমি উপলব্ধি করলাম, আমার যুক্তিকে তার চেতনায় ঠাঁই দিতে পারেন নি।

যদিও আমাদের পরিবারের উৎস মেঘনা নদীর তীরবর্তী একটি গ্রাম, আমি জন্মগ্রহণ করেছি ঢাকায়। খাস ঢাকাইয়াদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের ভালোবেসেছি, কোনওদিন বেগানা মনে করি নি, অপছন্দ করি নি কস্মিনকালেও। তাদের খামোকা নিম্নস্তরের মানুষ মনে করার মানসিকতা আমাদের কোনও কালেই ছিল না।

ঢাকা ক্লাবের সেই যুবকের কথা, লুকাব না, আমাকে বিব্রত, মর্মাহত করেছিল। তারপর বহু বছর কেটে গেছে, আজ অব্দি খাস ঢাকাইয়া ভাষায় আর একটি কবিতাও লিখি নি। কালেভদ্রে লেখার ইচ্ছা জেগেছে, কিন্তু লেখনীকে ধমকে থামিয়ে রেখেছি। তবে যদি বেঁচে থাকি, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আরও কিছু কবিতা ঢাকাইয়া ভাষায়

লিখব। এই তো ক'দিন আগেও কবি এবং সাংবাদিক ব্রাত্য রাইসু আমাকে খাস ঢাকাইয়া ভাষায় কবিতা লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সম্ভবত আমার 'এই মাতোয়ালা রাইত' পড়ে তার ভালো লেগেছিল। এই বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাটিকে আমাদের কাব্যসাহিত্য থেকে নির্বাসিত রাখা ঠিক নয়। একটি স্বতন্ত্র ধারা তো তৈরি হতেই পারে। এই ধারা যদি কালক্রমে প্রবল এবং সুন্দর হয়ে ওঠে তাহলে এটি অবশ্যই নন্দিত হবে। নিন্দিত হবে না। নিন্দা করার মূঢ়তা কেউ প্রদর্শন করবে না নিশ্চয়ই।

কোনও কোনও কাজ ফেলে রাখার প্রবণতা আমার মধ্যে রয়েছে, এ-কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদক কিছুকাল আগে আমার একটি প্রবন্ধ ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটি পাওয়ার একটি বিশেষ সময়ের সীমারেখাও টেনে দিলেন। লেখাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদকের টেবিলে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতিও দেয়া হল আমার তরফ থেকে। কিন্তু লিখব লিখব করে লেখা আর হয় না। এই দেরি করার জন্যে নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে দিই সম্পাদকের সামনে। মাননীয় সম্পাদক আমার এই গড়িমসিকে অগ্রাহ্য করে আবার একটি তারিখ নির্ধারিত করে দেন সবিনয়ে। হয়তো অসন্তোষ আড়ালে ঢেকে রেখেছিলেন।

কখনও কখনও চটজলদি লেখা শুরু হয়ে যায় ভাবনা এবং লেখনীর সঠিক সংযোগে। কলম যে সবসময় দ্রুত চলে, তা কিন্তু নয়। একটি জুৎসই কিবা যথার্থ শব্দের জন্য প্রতীক্ষায় মগ্ন থাকতে হয়। কোনও কোনও বিশ্ববিখ্যাত লেখকের কথা জানা যায়, যারা একটি শব্দের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতেন। কারও কারও পাণ্ডুলিপি এমন কাটাকুটি সজ্জিত দেখা যায়, একটি বাক্যকে নানাভাবে লেখার প্রমাণ দুর্লভ হলেও অলভ্য নয়। গদ্যশিল্পীগণ তো বটেই কবিদেরও অনেকে, তাদের পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলোলেই বোঝা যায়, কত কাটাকুটিই না তারা করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশের কিছ কিছু পাণ্ডুলিপি ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করলেই সবাই অনেক কাটাকুটি দেখতে পাবেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি তো চমৎকার চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কোনও কোনও বাতিল পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠেছে নান্দনিক গুণে গুণান্বিত। অবশ্য জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি আদৌ রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক কাটাকুটির কাছে ঘেঁষতে পারে না। আমরা যাবা কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তো দূরের কথা জীবনানন্দেরও ধারে কাছে পৌঁছতে অতিশয় ব্যর্থ, তাদের কাটাকুটিময় পাণ্ডুলিপি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির কাটাকুটি খচিত পাতার মতোই এমনকি সেগুলোর চাইতে অধিকতর আকর্ষণীয়। এই যে এমন একটি উক্তি করলাম, এটা নিশ্চয়ই বেয়াদবি বলে বিবেচিত হবে না। সত্য কথা উচ্চারণে কাউকে অসম্মানিত কিংবা খাটো করা হয় না।

আমি এমন একটি আগামীকালের কথা ভাবছি, যে-কালে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের পাণ্ডুলিপি ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হবে বিভিন্ন বিরাট গ্রন্থাগারে। সেকালে আমরা অনেকেই বেঁচে থাকব না, যেকালে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং চিত্রকরদের অসামান্য কদর হবে। দেশ-বিদেশের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা সেসব গ্রন্থশালায় আসবেন বাংলাদেশের কবি এবং ঔপন্যাসিকসহ অন্যান্য লেখকের গ্রন্থমালা, পাণ্ডুলিপি দেখার জন্যে। এই যে আমার মানসপটে এখন তেমন একটি ছবি ফুটে উঠেছে, এতে

তো কারও কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যতদিন আমার কল্পনাশক্তি থাকবে ততদিন এভাবেই কল্পনাকে ছুটতে দেব সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীতে, তেপান্তরের অসীম মাঠে, নক্ষত্রমালার ওপারে। কোথায় আমার কল্পনার অন্তহীন জগতে হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। জয়তু অধমের কবিমন, জয়তু কল্পলোক।

## ॥ তেতাল্লিশ ॥

আমরা যারা পঞ্চাশ দশকের লেখক হিসেবে চিহ্নিত, তারা দশকের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই নি। বিশেষ দশকের জোয়ালের রেওয়াজ বেশ তোড়জোড়ের সঙ্গে শুরু হল ষাটের দশক থেকে। কবি সাহিত্যিকদের কোনও একটি বিশেষ দশকের গণ্ডিতে আটকে রাখার মানে হয় না, আটকে রাখাও যায়ও না। একজন সৃজনশীল, অক্লান্ত লেখক দশকের গণ্ডি পেরিয়ে অনেকদূর চলে যান। রবীন্দ্রনাথকে কোন দশকের কবি বলে চিহ্নিত করব আমরা? নানা দশক পেরুনো নয় কি তাঁর সৃষ্টি? মধুসূদন দত্ত কোন দশকের কবি? তিনি কি একটি বিশেষ দশকের সীমায় বন্দি থাকার মতো কবি?

লক্ষ করেছি, ইদানিংকালের অনেক কবি নিজেদের একটি বিশেষ দশকে বন্দি রাখতে পছন্দ করেন। বিশেষ করে এই প্রবণতা কবিদের মধ্যেই প্রবল। একটি বিশেষ দশকে আটকে থাকার অভিলাষ, আমার সামান্য বিবেচনায়, কাঙ্ক্ষণীয় নয়।

যারা আমাদের পঞ্চাশ দশকের কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী তাদের সঙ্গে বিবাদ বাধানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বরং 'নীরব' বংশের কবি বললেই চলে। কারণ, আমরা নিজেদের বিষয়ে কোনওরকম হই-চই না করে আপনমনে কবিতা রচনা করেছি, অগ্রজদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি নি। নিজেদের মতো করে লিখব, প্রগতিশীল, শুভবাদী চেতনা ধারণ করব — এমন সদিচ্ছাই আমাদের দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের প্রায় অন্তিমলগ্নের অমানিশায় সামরিক শাসন জারির পর ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আইয়ুব-বিরোধী, সামরিক শাসন-বিরোধী প্রবল ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এতদিন ছাত্র সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ হল। ছাত্ররা পুরনো কলাভবন থেকে মিছিল বের করে, মনে পড়ে। খবর পাই দূর থেকে 'মর্নিং নিউজ' অফিসে বসে।

এই আন্দোলনের পরপরই বেধড়ক ধরপাকড় শুরু হয় এবং নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজন আত্মগোপন করে ছাত্র আন্দোলনকে জিইয়ে রাখেন। এই সময় আসন্ন একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে গোপনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই সময় 'মর্নিং নিউজ' অফিসে সম্ভবত ১৬ কিংবা ১৭ তারিখে সদ্য কৈশোর-পেরুনো দুই তরুণ মতিউর রহমান (বর্তমানে দৈনিক 'প্রথম আলো'র সম্পাদক) ও আবুল হাসনাত (বর্তমানে 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক) এসে হাজির হন। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই তারা এসেছিলেন। কার্জন হলে ডাকসু আয়োজিত কবিতা পাঠের আসরে আমাকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন অত্যন্ত বিনীতভাবে। বহু আগে থেকেই তারা অত্যন্ত বিনয়ী, সেই বিনয়ের আভা আজও বজায় রয়েছে, তা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস

করি। কারণ, তার পরিচয় আমি অসংখ্যবার পেয়েছি। তারা অবিনয়ী, এমন কথা আমি অন্তত কখনও শুনি নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কে কে কবিতা পাঠ করবেন?' তারা সিকানদার আবু জাফরের নাম বলেন। আমি কবিতা পাঠ করতে চটজলদি রাজি হয়ে গেলাম। জানতাম, সেই আসরে আমার অপছন্দের কোনও কবি উপস্থিত থাকবেন না।

মতিউর রহমান এবং আবুল হাসনাতকে পছন্দ না করে, ভালো না বেসে পারা যায় না। এমনই মধুর তাদের ব্যবহার। আমাকে তারা শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। মতিউর রহমান একদা কবিতা লিখতেন। তিনি বহুকাল আগেই, যতদূর জানি, কবিতাকে ছুটি দিয়ে সাংবাদিকতাকে আলিঙ্গান করেছেন নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মতো।

ঢের আগে মতিউর রহমান (মতিয়া গ্রুপ) ছাত্র ইউনিয়নের অফিস সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি তখন থেকেই ছাত্র আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন, এ-কথা সেকালের অনেকেই স্বীকার করবেন। মতিউর রহমান, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'একতা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মতিউর রহমান-এর নাছোড় তাগিদে আমি বিচলিত হয়ে 'একতা'য় কখনও কখনও কবিতা এবং বেশ কয়েকটি কলামও লিখে ফেলেছি।

তার বন্ধু আবুল হাসনাত ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে কায়েম থাকেন। হাসনাত ১৯৬৫ সালে দৈনিক 'সংবাদ'-এ বার্তা বিভাগে যোগ দেন একজন সহ-সম্পাদক হিসেবে। রাতে পালন করেন সাংবাদিকের ভূমিকা এবং দিনে মগ্ন থাকেন ছাত্র রাজনীতিতে।

আবুল হাসনাতের অন্য একটি নাম মাহমুদ আল জামান। দ্বিতীয় নামটির আড়ালে রয়েছে একটি কবিসত্তা, যে তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে কিছু কবিতা। সম্ভবত সেগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তিনি সম্ভবত নিজেকে জোর গলায় একজন কবি বলে দাবি করেন না। তবে আমি তার লেখা যে কটি কবিতা পড়েছি, সেগুলো বলে দেয় মাহমুদ আল জামান কবি-মনের অধিকারী। কিন্তু চর্চায় অবহেলা এবং অনীহা প্রশ্রয় পেলে ক্ষমতায় জং ধরে যায় প্রচণ্ডভাবে, যা সর্বনেশে বটে। তবে মাহমুদ আল জামান নামেই তিনি বেশ কিছু উজ্জ্বল গদ্যগ্রন্থও রচনা করেছেন। ছোটোদের জন্য লেখা তার কয়েকটি বইয়ের নাম মনে আসে এ মুহূর্তে — টুকু ও সমুদ্রের গল্প, ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়, কবি জসীম উদ্দীন প্রভৃতি। এ দেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের গল্প ও কবিতার দুটি সঙ্কলনও হাসনাত সম্পাদনা করেছেন — যার ভূমিকা লিখেছিলাম আমি। গুরুত্বপূর্ণ ঐ সঙ্কলন দুটির প্রকাশক ছিল সন্ধানী।

যা হোক, আবুল হাসনাত ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সহ-সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। একইসঙ্গো তিনি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় এই সংগঠন যে বিশিষ্ট, সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছে, তা সচেতনা ছাত্রসমাজ তো বটেই, প্রকৃত সংস্কৃতিবান বাঙালি মাত্রই অবহিত।

সংস্কৃতি সংসদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি কবিতা পড়েছি। সেসব অনুষ্ঠানের সুরুচির পরিচয় ছিল বলে আমি কবিতা পড়তে অনুপ্রাণিত বোধ করতাম। প্রগতিশীল ছাত্রদের অনিয়মিত ছোটো কাগজেও অনেক কবিতা লিখেছি লিখতে ভালো লাগত বলেই। ষাটের দশকে বাঙালির 'ঘরে ফেরা'র আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রবল স্বরূপ চেতনায় যুক্ত হয়েছিল নতুন মাত্রা। এই চেতনাই আখেরে সম্প্রসারিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই।

সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশিত ছোটো কাগজে, যতদূর মনে পড়ে, 'আমার স্বরের ডালে' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। এই কবিতাটি আমি লেডিস ক্লাবের মিলনায়তনে নিজের ঢঙে আবৃত্তি করেছিলাম। অন্যান্য কবিগণও কবিতা পড়েছিলেন সংস্কৃতি সংসদ-আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত কবিতা পাঠের আসরে আমি নিঃসঙ্গ কবি ছিলাম না। অন্যান্য কবিগণও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। সংস্কৃতি সংসদের অনুষ্ঠানগুলোয় প্রগতির আভা এবং সুরুচির পরিচয় থাকত। কোনওরকম হালকা চিন্তা প্রশ্রয় পেত না। কখনও সখনও গানের আসর জমে উঠত কবিতা পাঠের আসরের পাশাপাশি। গানের আসরগুলোয় ইকবাল আহমেদ (বর্তমান প্রবাসী), ইফফাত আরা দেওয়ান, মিলিয়া আলী, বেলা ইসলাম, সাকেরা আহমেদ অংশগ্রহণ করতেন।

সংস্কৃতি সংসদ যখন আবুল হাসনাত এবং মাহফুজ আনামের নেতৃত্বাধীন ছিল, তখন তিনটি উল্লেখযোগ্য একুশের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্কলন তিনটি ছিল দৃষ্টিনন্দন এবং ভালো লেখায় সমৃদ্ধ। সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, এর আগে এমন সচারু, মুদ্রণ পারিপাট্যে উজ্জ্বল সঙ্কলন প্রকাশিত হয় নি। একটি সঙ্কলনে অ্যালবাম ধরনে (নাম মনে পড়ছে না) জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, নিতুন কুণ্ডু সহ বারোজন বরেণ্য শিল্পীর ড্রইং ছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা থেকে একটি সাড়া-জাগানো মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম 'গণসাহিত্য'। সম্পাদক আবুল হাসনাত। আমি সেই পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। উপদেষ্টা হওয়ার কোনও ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু আবুল হাসনাতের নাছোড় অনুরোধ ঠেলে দিতে পারি নি। সম্পাদককে রশীদ করীম এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তাঁরা দু'জনই সম্পাদকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লিখতে রাজি হয়ে যান। তাঁদের লেখায় 'গণসাহিত্য' যে সমৃদ্ধ হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। রশীদ করীম 'গণসাহিত্য'তে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' বিষয়ে একটি অসামান্য প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে, জানিনে।'

'গণসাহিত্যে' আমার একাধিক কবিতা প্রকাশিত তো হয়েইছিল, সম্পাদকের ঐকান্তিক অনুরোধ আমাকে দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়ে নিয়েছিল, মনে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মায়াকোভস্কি, জীবনানন্দ দাশ ও পিকাসো সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ 'গণসাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধাবলি আমার 'আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। একটি কথা বিস্মৃত হয়েছি, যা রীতিমতো অপরাধ বলে গণ্য করি। বিষ্ণু দে নিয়মিত

কবিতা দিয়ে ‘গণসাহিত্যে’র সম্পাদক এবং উপদেষ্টামণ্ডলীকে ধন্য করেছেন। কবিতাপ্রেমী পাঠকগণ তো মুগ্ধ হয়েইছেন। উপরন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, এই পত্রিকায় আমার কাবিতা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ লিখেছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর রহমান, শিবনারায়ণ রায় এবং সন্তোষ গুপ্ত।

ভাবতে গেলে বিষণ্ণ বোধ করি, কোনও ভালো কিছুকে আমরা দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে পারি না। বড়ো আশা নিয়ে, বহু শ্রম দিয়ে একটি ভালো উপহার আমরা নিবেদন করি সমাজকে, ‘এক বর্ষার বৃষ্টিতে, হায়, মুছে যায় নাম।’ কোথায় আজ ‘সমকাল’, ‘পূর্ব মেঘ’, ‘কণ্ঠস্বর’-এর মতো সাহিত্যপত্র? কোথায় ‘শিখা’র তেজী আলো? হ্যাঁ ‘একবিংশ’ এখনও টিকে আছে সগৌরবে, কিন্তু সেই পত্রিকার সুরক্ষিত দ্বার অবারিত নয় যৌবন-হারানো কবিদের জন্য। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে লিখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় প্রৌঢ় কিংবা প্রায়-বুড়ো কবিদের। এই রীতি প্রবর্তন করেছিলেন ‘কণ্ঠস্বর’ পত্রিকার সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। পরে অবশ্য তিনি এই রীতির বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের মতো কোনও কোনও যৌবন-পেরুনো কবি-সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার পত্রিকায় লেখার জন্য। আমার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি তখন ‘কণ্ঠস্বর’-এর সম্পাদককে লেখা দিতে পারি নি। তখন আমার কবিতার খাতায় প্রখর খরা। খোন্দকার আশরাফ হোসেন এবং তার তরুণ, অনতিতরুণ কবিবন্ধুগণ, আশা করি, একদিন নবীনের সীমা পেরিয়ে প্রবীণ হবেন, তখন তাদের প্রবল সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা কবিতা দিতে পারবেন না সম্পাদকের হাতে কিংবা দফতরে। কারণ, তখন তাদের দেহ-মন ধুলোয় রূপান্তরিত। ধুলোর আর যে ক্ষমতাই থাক কবিতা পেশ করার মতো এখতিয়ার থাকে না।

একদা ফজল শাহাবুদ্দীন এবং আমি ‘কবিকণ্ঠ’ নামে একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম। তখন আমরা দু’জনই তরুণ কিন্তু কোনও মুহূর্তেই আমরা আমাদের মনের নিভৃততম অংশেও এমন ধারণাকে ঠাঁই দিই নি, আমরা প্রবীণদের কাছে লেখা চাইব না, কিংবা তাঁদের লেখা ছাপব না। আমি বুদ্ধদেব বসুর কাছে কবিতা প্রার্থনা করেছিলাম। তখন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সৃজনের ক্ষেত্রে খরার মরশুম চলছিল। তিনি চিঠি লিখে আমাকে তাঁর অপারগতার কথা জনিয়েছিলেন। কায়সুল হকের উদ্যোগে সুরজিত দাশগুপ্তের মারফত প্রয়াত জীবনানন্দ দাশের অনুজ অশোকানন্দ দাশ-এর কাছ থেকে কবির একটি অপ্রকাশিত কবিতা আমরা পেয়েছিলাম। সেটি ‘কবিকণ্ঠে’র প্রথম সংখ্যায় প্রথম কবিতা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের এই প্রাপ্তি, বলা বাহুল্য, ছিল অসামান্য। ধন্য হয়েছিলাম আমরা সবাই।

‘কবিকণ্ঠ’ সেকালে হলেও কবিকুল এবং পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর পর। আকাশবাণীতে দ্বিতীয় সংখ্যাটির একটি উৎসাহব্যঞ্জক, সপ্রশংস আলোচনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে। তৃতীয় সংখ্যা কবে বেরিয়েছিল, মনে পড়ে না। তৃতীয় সংখ্যা থেকে নানা কারণে আমি নিজেকে বিযুক্ত করেছিলাম। সেসব কারণ উহ্য থাক। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ? তা ছাড়া কারণগুলো

এতকাল পর বড়ো ধূসর হয়ে গেছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই তো আজকাল দিব্যি ভুলে থাকি। কেউ বললেও মনে কোনও তরঙ্গের সৃষ্টি হয় না। জীবনের পথ হয়তো এরকমই।

## ॥ চুয়াল্লিশ ॥

এই যে আমি লেখক হয়ে উঠেছি, এজন্যে অন্য কেউ দায়ী নয়। আমাকে কেউ বলেন নি, 'তুমি কবি হও, কবি হওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে লেগে যাও।' হঠাৎ এক মেঘলা দুপুরে, অনেক বছর আগে, কাগজ-কলম নিয়ে বসে যাই টেবিল ঘেঁষা একটি সামান্য চেয়ারে। তারপর এই আজ অব্দি প্রায় তিয়াত্তর-পেরুনো বয়সেও লিখে চলেছি। 'বাপু, তোমাকে লিখতেই হবে', এ-কথা আমার পাড়াপড়শিরা অথবা আত্মীয়স্বজন কেউই পীড়াপীড়ি তো দূরের কথা, একটিবারও বলেন নি। তবে আমার অন্তর্জগতে যে আরেকজন শামসুর রাহমান সবার দৃষ্টির আড়ালে বসবাস করে, সে বড়ো বেয়াড়া বাসিন্দা। তার, সত্যি বলছি, মর্জিমাফিক এই অসহায় আমাকে কলম ঠেলতে হয়। তখন কেউ বারণ করলে ঈষৎ থমকে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু ওর পথ চলা থেমে যায় না। পথ যত দুস্তর এবং ভীতিপ্রদই হোক না কেন, উন্নত শিরে পাড়ি দিতে থাকে।

অতীতের দিকে তাকালে অনেক প্রিয় দৃশ্যের পাশাপাশি অত্যন্ত অপ্রিয় দৃশ্যও ভেসে ওঠে। স্মৃতি অবিমিশ্র নয়, এ-কথা জানার জন্যে জীবনপথ অনেকখানি পাড়ি দিতে হয় না। অন্তত আমাদের হয় নি। বাল্যকাল থেকে আজকের জীবনের এই প্রায় শেষবেলায় বহু সুন্দর ঘটনার সঙ্গে অসুন্দর, ভয়াবহ ঘটনাও তো কম হাজির হয় নি আমাদের অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল হয়ে আমাদের প্রিয় পূর্ব বাংলায় অনেককিছু ঘটে গেছে। একদিকে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যদিকে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। বিদেশে বাঙালি সাতারু ব্রজেন দাশের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া, প্রাদেশিক পরিষদে জখমি শাহেদ আলীর মর্মান্তিক মৃত্যু। প্রায় পাশাপাশি চলছে মাওলানা ভাসানির কাগমারি সম্মেলন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটির অপসারণ, চিনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর পাকিস্তান সফর, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়া, পাকিস্তান সংবিধান বাতিল, সামরিক শাসন জারি, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার বিদায়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে তথাকথিত লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খানের শান শওকতের সঙ্গে প্রবেশ।

ফি.মা. আইয়ুব খানের পাকিস্তানের মসনদ দখল করার কালে আমি ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর একজন সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সেই কাজ উপভোগ করতাম, এ-কথা বলা যাবে না। তবে পত্রিকাটির নুন খেয়েও তার গুণ গাইতে পারি নি বলে ঈষৎ মানসিক পীড়ন হত, এ-কথা না বললে অন্যায় হবে। আমার সহকর্মীদের অনেককেই আমি পছন্দ করতাম। শত বিস্মৃতির মধ্যেও কারও কারও সহযোগিতার কথা আজ অব্দি স্মরণ করি।

আমার বাবা আলহাজ্ব মোখলেছুর রহমান চৌধুরী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই বিখ্যাত জননেতা আমার পিতাকে যে অত্যন্ত পছন্দ করতেন, তা আমি আমার অপরিমত বয়সেই টের পেয়েছিলাম। যাই হোক, আমার বাবা দেশের হাল-হকিকত দেখে শুনে এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ফি.মা. আইয়ুব খানের তথাকথিত তেলেসমাতি দেখে এতই আন্দোলিত হয়েছিলেন যে, মহানন্দে তিনি সেই একনায়কের উদ্দেশে একটি মোবারকবাদ-সম্বলিত তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হয় নি। কিন্তু আমি তাঁকে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারি নি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাবা তাঁর বরেণ্য ব্যক্তিটির কাছ থেকে কোনও জবাবই পান নি। এজন্যে তাঁর মনে কোনও আক্ষেপ তৈরি হয়েছিল কি-না, তা জানার সুযোগ আমার ছিল না। তিনিও এ নিয়ে কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নি কখনও।

যা-ই হোক, সেকালে স্বৈরশাসক, মহাপ্রতাপশালী ফি.মা. আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখেছিলাম। সেই কবিতা 'সমকাল' পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক এবং কবি সিকান্দার আবু জাফর প্রকাশ করেছিলেন নির্দ্বিধায়। কবিতাটির নাম 'হাতির শুঁড়' —

আদ্যিকালের বেবাক কিছুই অলৌকিক।
পক্ষীরাজের পক্ষছায়ায় দিগ্বিদিক
নীল আকাশে উড়তো কত রাজকুমার,
আদ্যিকালের আজব কথার নেই শুমার।

ফলতো সদা সোনার ডালে হীরের ফল,
জাগতো জ্বেলে ঘিয়ের প্রদীপ লাল কমল,
অসির খেলায় দৈত্যদানো করতো বধ।
মরুভূমি, দূরের পাহাড়, মায়ার হ্রদ।

উড়ন্ত সেই গালিচাটায় হচ্ছে পার।
সাত সফরে এই জীবনের সত্যসার
সিন্দাবাদের নখমুকুরে বিম্বিত।
সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি চিহ্নিত।

ঘুমের খাটে শঙ্খমালা ঘুমন্ত;
কৌটো-খোলা ভোমরা মরে জীবন্ত।
ঐরাবতের খেয়ালখুশির ধান্দায়
ভোরের ফকির মুকুট পরে সন্ধ্যায়।

প্রাক্তন সেই ভেল্কিবাজির মন্তরে
যাচ্ছে চেনা অনেক সাধু-সন্তরে!
সেই চালে ভাই মিত্র কি-বা শত্তুর
চলছে সবাই — মস্ত সহায় হাতির শুঁড়।

কবিতাটি 'সমকাল' পত্রিকায় ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রদ্ধেয় শওকত ওসমান, যাঁকে আমি 'শওকত ভাই' বলতাম, অফিসে টেলিফোন করে বলেন, 'শামসুর রাহমান, তোমার নসিব ভালো যে, দেশের শাসকরা বাংলা ভাষা জানে না, নইলে গর্দান থাকত না।' তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলেছিলেন। আমাদের সেকালের এতদঞ্চলেও তেমন আহামরি সংখ্যক কবিতার পাঠক-পাঠিকা ছিল না। তাই, আমার ধারণা, 'হাতির শুঁড়'-এর মর্ম তেমন প্রচারিত হয় নি। বলা অত্যাবশ্যক নয় যে, কবিতাটি তৎকালীন সামরিক শাসক ফি.মা. আইয়ুব খানের পাকিস্তনের তখ্‌তে উড়ে এসে জুড়ে বসার ব্যাপারটিকেই উপকথার মাধ্যমে বলা হয়েছে। অসংখ্য বাঙালি ছেলেমেয়ের মতো আমিও ছেলেবেলায় ময়মরুব্বির কল্যাণে বেশ কিছু উপকথা, রূপকথার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলাম।

আমরা বিধবা বড়ো ফুফুর সন্তান ছিলেন ইয়াকুব আলি খান। ফুফুর এই সন্তানের জন্ম হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই আমার ফুফার মৃত্যু হয়। পিতৃহারা ছেলেটিকে অনেক কষ্টে আমার ফুফু লালন পালন করেন। তেমন শিক্ষিত হয়ে ওঠার ব্যাপারে ইয়াকুব আলি তেমন ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট হতে পারেন নি। তার লেখাপড়া চালাবার মতো সঙ্গতি আমার বিধবা ফুফুর ছিল না। পরে বেকার যুবক পুত্রকে তিনি নওশা সাজিয়ে সুন্দরী পুত্রবধূ এনেছিলেন তাঁর সীমিত সংসারে। একটি ফুটফুটে কন্যাকে জন্ম দিয়ে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন অল্পবয়সে।

আমি আমার সেই ভাবিকে দেখি নি। তার কন্যা তাহমিনা এখনও একটি সুখী, সফল পরিবারের মুরুব্বি এবং অভিভাবিকা হিসেবে শান্তিময় জীবন কাটাচ্ছে। তাহমিনা এবং আমি সমবয়সি। যে যুবতি হয়েছে আমাদের গ্রাম পাড়াতলীতে এবং আমি যুবক হয়ে উঠেছি ঢাকা শহরে। তাই ওর প্রেমে পড়ার সুযোগ আমার হয় নি; তার মনের কথা আজ অব্দি জানার সুযোগ হয় নি আমার, হবেও না কোনওদিন, তার প্রতি আমার প্রাক্তন মনোভাবও সে কখনও টের পায় নি সম্ভবত। কারণ সেই প্রাথমিক ক্ষণিক বাসনা অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে।

যা বলছিলাম, ইয়াকুব আলি ভাই রোজগারের সন্ধানে ঢাকায় চলে এলেন তার মামার আশ্রয়ে অর্থাৎ আমার বাবার বাসায় ৪৬ নম্বর মাহুতটুলিতে। বাবা তখন চাকরি ছেড়ে ঠিকাদারি ব্যবসায়ে নিয়োজিত। তাঁর তদারকিতে ঢাকায় নির্মিত কোনও কোনও আকর্ষণীয় দালান এখনও সগৌরবে আছে বইকি! ইয়াকুব আলি খান তার মামার সঙ্গে চলাফেরা করে কাজ কতটা শিখেছিলেন, বলতে পারব না, তবে দেখেছি বাবা কখনও কখনও তাঁর ভাগ্নেটিকে বেশকিছু অপ্রিয় কথা বলতেন। বাবার মেজাজ তখন রীতিমতো তেতে উঠত। তখন দূরের ঘরের ভেতর মাথার মাঝখানে একটি হাত রেখে গুপ হয়ে বসে থাকতেন সেই মামাতো ভাই। তার মুখ থেকে কোনও শব্দই বেরুত না।

আমার বিধবা ফুফু তাঁর ভাইয়ের কাছে পুত্রটিকে সোপর্দ করে, ভাবতে প্রলুব্ধ হই, নিশ্চিন্ত ছিলেন। সহোদরের আশ্রয়ে তাঁর ছেলের কোনওরকম অসুবিধা এবং অযত্ন যে হবে না, এই বিষয়ে তিনি ষোলোআনা নিশ্চিত ছিলেন। আমার মায়ের গুণাবলিও তাঁর অজানা ছিল না।

এই ইয়াকুব আলি ভাই আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শুনিয়েছেন প্রচলিত রূপকথার সঙ্গে নিজের কিছু ভিয়েন জুড়ে দিয়ে। তিনি বলতেনও বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে। বারবার তার কাছে আব্দার করতাম কল্পকাহিনি শোনার জন্যে। আজও তার বসার, গল্প বলার চমৎকার ধরন আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার আজকের এসব কথা তার জানা হল না, এ-কথা ভাবলে মনে কেমন এক ধরনের উদাস স্রোত বইতে থাকে।

হ্যাঁ, ইয়াকুব আলী ভাইয়ের রূপকথার ভাণ্ডারই আমার 'হাতির শুঁড়' কবিতার উৎস। খুব অল্পবয়সি শামসুর রাহমান, সে বাচ্চুও বটে, ওর মুরুব্বির এবং ছেলেবেলার খেলার সঙ্গীদের কাছে, এই ঋণটুকু স্বীকার না করে কি পারে? রূপকথার প্রভাব এবং প্রয়োজনীয়তা কোনওটিকেই উপেক্ষা করা চলে না, বাদ দেয়া যাবেও না আমাদের জীবন থেকে, সায়েন্স ফিকশনের আকর্ষণীয় আবির্ভাব সত্ত্বেও। কোনওটিকেই বাদ দেয়া, অস্বীকার করা সম্ভবও নয়। এই যে আজ কম্পিউটারের যুগে আমাদের দেশেই অনেক ধরনের কাজ নানা অফিসে সমাধা করা হয় উক্ত যন্ত্রটির সাহায্যে ত্বরিত গতিতে, পরিচ্ছন্নভাবে, তা প্রশংসনীয়, অভিনন্দনযোগ্য, সন্দেহ নেই! আমাদের দেশেও ক'জন কবি-সাহিত্যিক কম্পিউটারে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সৃষ্টি করেন, এই সংবাদ আমার অজানা নয়। কিন্তু আজ অব্দি আমি এই যন্ত্রটি সংগ্রহ করতে পারি নি। তেমন প্রেরণাও জাগে নি আমার মধ্যে। এখনও আমি পেনসিল কিংবা ঝর্ণা কলমের ওপরেই নির্ভরশীল। কখনও কখনও সময় বিষয়ে ভাবি, মনে আশ্চর্য ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কখনও মনে হয়, যাপিত দিবস, মাস, বছর, অত্যন্ত হ্রস্ব, আবার কখনও মনে হয় বড়ো দীর্ঘ, যেন শেষ হতেই চায় না। সময় কি কোনও স্বপ্ন? নাকি দুঃস্বপ্ন? এই যে আমি আত্মজীবনী লিখছি, আমার জীবনের অনেকগুলো বছরের কিছু কিছু অংশে স্মৃতি ধরে রাখতে চেষ্টা করছি, সাদা কাগজের পাতাগুলো কালো অক্ষরে ভরে তুলছি আমার ব্যক্তিগত জীবন, আমার পরিচিত, অন্তরঙ্গ ক'জন ব্যক্তি বিষয়ে কিছু কথা, এমন কিছু ঘটনার কথা যেগুলো আমার মনে দাগ কেটেছিল – সতি সত্যি-এর কি কোনও মূল্য আছে?

আমার জন্মের আগে আমি কি ছিলাম কোথাও? তখন তো আমি অসীম 'না'-এর অস্তিত্বহীন কণাও নই। যখন এই সুন্দর পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেব, তখনও আমি স্মৃতিহীন, অস্তিত্বহীন, বিলুপ্তি, শুধু বিলুপ্তি ব্যতীত কিছু নই। হঠাৎ কোনও কোনও সন্ধ্যা কিংবা রাতে যখন ভাবি, আমার মৃত্যুর পর আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরা, আমাদের সন্তান-সন্ততির, আত্মীয়স্বজনদের, বিশেষত আমার সহায়সম্বলহীন পুত্র ফাইয়াজ, পুত্রবধূ টিয়া, দুই পৌত্রী নয়না তার দীপিতার ভবিষ্যৎ কী রকম হবে, আমি জানবই না, যেমন আমার বাবা-মার জানার কোনও উপায় নেই কীভাবে জীবন যাপন করছে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা। কারণ, ভাবতে, বলতে খারাপ লাগছে, তাঁরা নেই, কোথাও নেই!

আমি এ-কথাও ভালো করে জানি, কোটি কোটি মানুষ অনেকানেক আগের কালের বাসিন্দা এবং এই একবিংশ শতাব্দীর বিচিত্র মানুষও পরকালে জীবিত থাকার ব্যাপারে অবিচল বিশ্বাসী। আমি তাদের এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু কিছুতেই অন্য কোথাও স্বর্গে ও নরকের উপস্থিতি মনে ঠাঁই দিতে অপারগ। অনেক আগে আমাদের এই

মুসলিম সমাজেরই একজন কবি বলে গেছেন স্বর্গ, নরক এখানে এই জগতেই রয়েছে। তাঁর এই বাণীকে উপেক্ষা করব, এমন ঔদ্ধত্য নিজের ভেতরে লালন করি নি।

আমি এই দুনিয়ারই লোক, যত ক্ষীণই হোক, অসার্থকই হোক আমার জীবন, একথা ভাবতে আমার মনের মৃত্তিকা আনন্দধারায় স্নাত হয়। নানা বিরোধ, ভয়ংকর দুর্যোগ, প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, মতবাদের গোঁড়ামি, সংহারপ্রবণ দারিদ্র্য, (যদিও কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্রের মধ্যে মহত্ত্ব দানকারীর গুণ অর্পণ করেছেন) এবং নির্যাতনকারীর দাপট বিদ্যমান আমার প্রিয় স্বদেশসহ আরও কিছু দেশে, তবু আমি কি, আমরা কি সূর্যালোকিত প্রভাত, বৃষ্টিময় শ্রাবণ-দুপুর, জ্যোৎস্নার মায়াবি আলো, ধানক্ষেতের নাচন, সুন্দরী নারীর অপরূপ দৃষ্টি, শিশুর স্বর্গীয় হাসি, সন্ধেবেলার নীড়ে ফেরা পাখির উড়াল, কোনও উৎকৃষ্ট কবিতা ভালো না বেসে থাকতে পারি? যতই আমি মরণশীল, তুচ্ছ, এক মুঠো বিস্মৃতি হই না কেন, এই যে এতদিন পৃথিবীতে ছিলাম বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী চেনা, অচেনা কিন্তু সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সঙ্গে।

## ॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও আমি গান্ধিবাদী নই। তবে এ-কথাও সত্যি, হিংসা-বিদ্বেষ, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, হত্যা ইত্যাদি ব্যাপারে আমার উৎসাহ, উদ্দীপনা, পক্ষপাত একেবারেই শূন্যের কোঠায় হামেশা বিদ্যমান। কারও আঙুল কেটে রক্ত বেরুলে, প্রাণী হত্যার দৃশ্য চোখে পড়লে, তা মুরগি, ছাগল কিংবা গোরুই হোক — আমার গা প্রায় গুলিয়ে আসে। জানি না আমার এ-কথা শুনে কেউ উপহাস কিংবা অবিশ্বাস করবেন কি-না। আমার ধারণা, এ-ব্যাপারে আমি নিঃসঙ্গ নই। আমি চাই আর না-ই চাই, হত্যাকাণ্ড দিব্যি মাথা উঁচু করে জগত জুড়ে বিরাজমান ছোটো কিংবা বড়ো আকারে। আমাদের দেশেই তো অতীতে কী ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। একাত্তরের পাকিস্তানি জালিমদের তাণ্ডব, গণহত্যা, তাদের তাঁবেদার বাঙালি আজ্ঞাবহদের জুলুম, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে, তাঁদের কারও কারও চোখ উপড়ে, কারও কলজে ছিঁড়ে, কুপিয়ে হত্যা করা কি ভুলতে পারে এদেশের মানুষ? অনেকে পারে না, আবার অনেকেই দিব্যি পেরে যায়। আমার এই সামান্য মন্তব্য খণ্ডন করার মতো কেউ কি আছেন আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশে!

আমার তো আজও মনে পড়ে চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ড. আলীম চৌধুরীর কথা। তিনি 'যাত্রিক' নামে একটি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এতে আমাদের অনেকেরই লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেকালে। তখন আমার দৃষ্টিশক্তি ভালোই ছিল। চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। তাঁর বন্ধু ছিলেন একজন হার্ট স্পেশালিস্ট। তিনি ড. ফজলে রাব্বি। তাঁর কাছে যেতাম বুকের কিছু অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে। প্রায়শই মাঝরাত অব্দি কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। কোনও ভাবনা লিখে ফেলতাম নিবিষ্ট চিত্তে। প্রতিবারই যে সফল হতাম, তা কিন্তু নয়। কবিতা ছলনা করত কোনও কোনও সময়। তাই, সারারাত কেটে যেত ছটফটানিতে। তবে শহুরে জানালার ভেতর দিয়ে প্রত্যুষের যেটুকু শোভা উপভোগ করা সম্ভব তাতেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতাম। তা ছাড়া উপায় তো ছিল না!

তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথা চুপ করে শুনতাম সুবোধ বালকের মতো। তিনি হাসি ছড়িয়ে বলতেন, 'কবি, বেশ ভালোই আছেন। একটু আধটু ঘুম হয় না, তাতেই কাঁৎ হয়ে পড়েছেন। আমার তো কোনও রাতেই ঘুম হয় না। তবু তো কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের চিকিৎসা করছি।' তাঁর কথাগুলো আজও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে আমাকে উদাস করে তোলে।

একাত্তরের ঘাতকরা ১৪ ডিসেম্বর ড. আলীম চৌধুরীর দুই চোখ তুলে নেয় জীবন্ত অবস্থায় এবং একই প্রক্রিয়ায় হৃদপিণ্ড উপড়ে নেয় জীবন্ত চিকিৎসক ড. ফজলে রাব্বির। বুদ্ধিজীবীদের যে পাশবিক নিপীড়নের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, সে-কথা ভাবলে আজও এই ২০০২ সালেও বুক কেঁপে ওঠে, চোখ হয়ে যায় অশ্রুসিক্ত। এমন কোনও ভাষা নেই যা দিয়ে ধিক্কার, ঘৃণা এবং ক্রোধ প্রকাশ করা যায় ঘাতকদের বিরুদ্ধে।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অনেকের বিষণ্ণ অথচ গৌরবান্বিত মুখ বার বার মনে পড়ে আমাদের এতকাল পরেও। সেই নামের দীপ্র মিছিল জেগে ওঠে আমাদের স্মৃতিপটে — অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. আবুল খায়ের, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, ড. মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রশীদুল হাসান, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. মোহাম্মদ মুর্তজা, সেলিনা পারভিন, ড. আলীম চৌধুরী, ড. ফজলে রাব্বি, লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার ও নিজামুদ্দিন। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ-এর রাতে পাকিস্তান বাহিনী হামলা করে অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার কোয়ার্টারে। অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের কোয়ার্টারেও মৃত্যু হানা দেয়। তাঁদের প্রত্যেকেই শহিদ হন পাকিস্তানি হানাদারদের বুলেটের বৃষ্টিতে। আমাদের মধু দা'ও রেহাই পান নি।

যুদ্ধ, খুনোখুনি আমি বরদাশত করতে অক্ষম। তবে কখনও কখনও অপরিহার্য হয়ে ওঠে যুদ্ধ, যখন আমরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হই। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ না করে আমাদের দেশবাসীদের উপায় ছিল না। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা আমাদের ঠেলে দিয়েছিল যুদ্ধের দিকে। ওরা বাঙালিদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য করেছিল। স্বদেশকে হানাদারমুক্ত এবং যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি জেনারেলদের কব্জা তেকে বাঁচাবার জন্যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনপণ করে। তাঁদের আত্মদানে, বীরত্বে আমরা শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও একটি স্বাধীন দেশে জীবনযাপন করতে পারছি।

তবু অস্ত্রের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই। আমি ভালো করেই জানি, আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেও আমি সেটি কোনও প্রাণীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে পারব না। আমার পিতার একটি বন্দুক ছিল, যা দিয়ে তিনি একদা মাঝে মাঝে পাখি শিকার করতেন। লুকাব না, পাখির মাংস খেতে খুবই ভালো লাগত, আজও লাগে, যদিও গুলিবিদ্ধ মৃত পাখি দেখে মন কেমন মেঘলা হয়ে যেত, কষ্ট পেতাম। আজ পর্যন্ত আমি কোনও ছোরা, রিভলবার, বন্দুক স্পর্শ করি নি, এমনকি বাবার বন্দুকটিও নয়।

আমি চাই আর না চাই, আমার মনের দিকে লক্ষ রেখে কেউ অস্ত্রবাজি কিংবা বিপুল রক্তক্ষয়ী লড়াই থেকে বিরত থাকে না। আমি তো চাই না সমাজে অত্যাচার, অবিচার

থাকুক; চাই না কোনও সন্ত্রাসীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হোক কোনও ব্যক্তির, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোক অপহৃত শিশুর স্নেহকাতর শরীর। চাই না গণধর্ষণের পর ধর্ষকদের হাতে কেউ খুন হোক। আমরা যারা শান্তিপ্রিয় নাগরিক, যারা সবার মঙ্গল কামনা করি, যারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ, দুর্বৃত্তদের নিকট থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চাই, আজ তাদের উদ্বেগ, ভীতি, হতাশার অন্ত নেই। অনেকেই জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও ঘরের বাইরে বেরুতে শঙ্কাবোধ করেন। কে জানে পৈতৃক প্রাণটি কখন কোন নরমাধমের অস্ত্রাঘাতে খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়। সম্প্রতি ভোরবেলা খবরের কাগজে চোখ বুলাতেও ভয় হয়। কখন দেশের কোন খবরের কোন শিরোনাম পড়লে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে, কে জানে। খবরের কাগজ যে শত হস্ত দূরে রাখব, সেটাও তো সম্ভব নয়। ভোরবেলা পছন্দের দৈনিক পত্রিকাটি আগাগোড়া না পড়লে স্বস্তিবোধ করি না অনেককাল আগে থেকেই। বর্তমানে দৈনিক পত্রিকা পড়লেও মন উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত হতে থাকে, না পড়লেও এক ধরনের শূন্যতা, অস্বস্তি জুড়ে বসে চেতনায়। কিছু একটা হারিয়ে ফেলার অনুভূতি পীড়ন করতে থাকে সারাক্ষণ। একেক সময় মনে হয়, সংবাদপত্র স্পর্শই করব না আর। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরমুহূর্তেই হাতে কী যেন একটির অভাব কিছুটা অস্থির করে তোলে আমাকে। বাসায় খবরের কাগজ এল কি-না, এটা জানার জন্যে বাড়ির সদস্যদের, বলা যেতে পারে, রীতিমতো অস্থির করে তুলি। এই প্রবণতা আমার মধ্যে অনেক আগে সক্রিয় ছিল না, কিছুকাল আগে থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে। এর কারণ কী, তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি দীর্ঘকাল সংবাদপত্রে কাজ করেছি, একটি উন্নতমানের বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের সম্মানিত আসনে বসার অধিকারও পেয়েছিলাম এক দশকের মতো। কবুল করছি, তখনও আমি আজকে যেমন, তেমন নিষ্ঠাবান খবরের কাগজের পাঠক হতে পারি নি। যথেষ্ট উদাসীন ছিলাম এ ব্যাপারে। আমার সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে শামসুর রাহমানের সাংবাদিক সত্তার কাছে। সাংবাদিক হিসেবে তেমন সাফল্য প্রদর্শন করতে পারি নি সত্য, কিন্তু আমার ব্যর্থতাও যে তেমন পর্বতপ্রমাণ হয় নি, এই সত্য, আশা করি, আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের কাছে উদ্ভাসিত। আর কিছু না হোক অন্তত তাদের বেতন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিই নি। সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক সবার বেতনবৃদ্ধির দিকে অনেক ঝুঁকি সত্ত্বেও উদার দৃষ্টি রেখেছি। যেহেতু দৈনিক বাংলা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ছিল, তাই তথ্য মন্ত্রণালয়ের কড়া নজর ছিল এর কর্মকাণ্ডের দিকে। কখনও কখনও মন্ত্রণালয়ের গঞ্জনা সহ্য করেছি, কিন্তু সহকর্মীদের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গা বাঁচানো কার্পণ্য প্রদর্শন করি নি।

পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে গিয়ে চকিতে স্মৃতি চলে গেল ১৯৬৫ সালের দিকে। সেই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে গেল। 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসেও অনেক জায়গার মতোই এক ধরনের যুদ্ধংদেহি ভাব লক্ষ করা গেল। সংক্রামক এই উত্তেজনা, যার ফলে আমার শান্ত মনেও যুদ্ধের হালকা ধরনের ধাক্কা লাগল। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী হাসান হাফিজুর রহমান এবং কারও কারও মধ্যে আকর্ষণীয় উত্তেজনা

পরিস্ফুট হল। সন্দেহ নেই, সংক্রামক এই উত্তেজনা। হাসান হাফিজুর রহমান উত্তেজক-জনপ্রিয় উপসম্পাদকীয় লিখেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি, আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং আরও কোনও কোনও সাংবাদিক পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করে যুদ্ধপরবর্তী হাল হকিকত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্যের কথা ও কাহিনি শুনে ফিরে এসে বেশ কিছু লেখালেখি করেন। যতদূর মনে পড়ে, এই যুদ্ধ সংক্রান্ত হাসান হাফিজুর রহমানের একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। অন্য কারও কারও বই প্রকাশিত হয়েছিল কি-না মনে পড়ে না। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কোনও বই কি প্রকাশিত হয়েছিল?

আমরা কেউ কেউ সেই ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ বিষয়ে কবিতা লিখেছিলাম। সম্ভবত আমি দু'তিনটি কবিতা লিখেছিলাম। পাকিস্তানের একটি মসজিদের জনৈক ইমামকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে একটি মিনি কাব্যনাটক রচনা করেছিলাম কল্পনার মিশেল দিয়ে। সেই রচনার কোনও কপি আমার কাছে নেই। এই সঙ্গে সেই দু'তিনটি প্রকাশিত কবিতাও বিস্মৃতির অন্ধকারে সমাহিত। তবে এ-কথা বলব, আমার সেসব কবিতায় উত্তেজনা সৃষ্টির কোনও প্রয়াস ছিল না, বরং শান্তির পক্ষেই ছিল উচ্চারণ।

আমার কোনও কাব্যগ্রন্থেই সেই কবিতাবলির একটিও ঠাঁই পায় নি। এখন আফশোশ হয়, কবিতাগুলো গ্রন্থভুক্ত হতে পারত। আমার প্রিয় শিক্ষক এবং কল্যাণকামী ড. খান সারওয়ার মুরশিদ সেই কবিতাবলির একটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে তাঁর উঁচুদরের বিখ্যাত পত্রিকা 'New value'-এ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সেই কবিতার শিরোনামটির অনুবাদ করেছিলেন এরকম — 'A Red Rose on the Moving Branch of Time', প্রকৃত বাংলা শিরোনামটি হুবহু আমার মনে নেই, কবিতার পঙ্‌ক্তিমালাও বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত। এখানে প্রথমে আমার শিক্ষকের আশ্চর্য সুন্দর অনুবাদটি উপহার দিচ্ছি পাঠক-পাঠিকাদের, পরে নিরুপায় হয়েই ইংরেজি অনুবাদের একটি চলনসই বাংলা তর্জমার নমুনা পেশ করছি। এই তস্য অনুবাদের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। প্রথম বাংলা কবিতাটির খান সারওয়ার মুরশিদ কর্তৃক অনূদিত কবিতাটির উদ্ধৃত করছি —

**A Red Rose on the Moving Branch of Time**

I was walking through the familiar streets.
The still houses glowed like faith in the darkness.
I lowered my head firm in homage.
A boundless consciousness on fire.

Lines on the streets my father and is father walked
Daily with untrembling feet, lighted houses, fruit shops.
Images seen through open windows.
All, all were in my heart.

My heart shot through
My vision stretches of ravaged fields
And Shattered walls, yet I walked by the garden
Searching eagerly among the star-like leaves :

The youngman who holds in his lifted hands
Bunches of golden days, the old man leaning
Lost in dreams of the past at the on his stick alley head
The girl wrapping autumn day in her skirt,
The village mother in her hut. whose love
Sews dreams into the quilt under the kerosene lamp
The child in deep sleep on the quilt with its doll.
in the beings of these I see your face, my country.

I see you every day, feel you always in my veins,
When I die and mingle with the foam of the stars
or the nothingness of matter
I will still look on the miracle of your riches.

The raped earths bears flowers for the martyves
Gave themselves their glory breeds dreams's. trees grow
on heaps of debris loving hands rouse beauty :
my living country is a red rose in the moving branch of time.

এখন আমি এই অনূদিত কবিতার বাংলা অনুবাদ উপস্থিত করছি। আমার মনে হয়, সম্ভবত কাব্যের ইতিহাসে এই প্রথম একজন কবি তাঁর নিজের প্রকৃত বাংলা কবিতার একটি সুন্দর অনুবাদের বাংলা রূপান্তর করলেন। আমার আসল কবিতাটি হারিয়ে যাওয়ার ফলেই এই অনন্য ঘটনার জন্ম হল—

কালের স্পন্দিত ডালে রক্তিম গোলাপ

চেনা জানা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম
শান্ত বাড়িগুলো অন্ধকারে বিশ্বাসের মতো দীপ্তিমান
অনড় ভঙ্গিতে মাথা নত করলাম
আগুনের ঝলসানিময় সীমাহীন চেতনায়।

আমার জনক আর তাঁর পিতা যে-পথে গেছেন
হেঁটে প্রতিদিন অকম্পিত পদে, আলোকিত বাড়ি,
ফলের দোকানগুলো উন্মুক্ত জানালা সমুদয় —
সবই, সবই ছিল এই হৃদয়ে আমার।

আমার হৃদয় দীর্ণ হয় লহমায়,
আমার অন্তর্দৃষ্টি বিস্তৃত বিধ্বস্ত ফসলের ক্ষেতে আর
সব চূর্ণ বিচূর্ণ দেয়ালে, তবু আমি বাগানের কাছ ঘেঁষে
হেঁটে যাই এবং ব্যাকুলতায় কী-যে খুঁজি নক্ষত্র প্রতিম
পাতাদের ভিড়ে।

যে-যুবক তার উত্তোলিত দু'হাত সোনালি
দিনের অরূপ গুচ্ছ তুলে ধরে, যে-বুড়ো লাঠি ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে গলির মুখে অতীতের স্বপ্নে ডুবে যায়,
যে-কিশোরী ঘাগড়ায় জড়িয়ে রেখেছে হেমন্তের দিনগুলি
কুটিরবাসিনী গ্রামীণ মা ভালোবাসা যার
কেরোসিন বাতির আলোয়
কাঁথায় নীরবে গেঁথে যায় স্বপ্নমালা, যে শিশু গভীর গুমে
অচেতন ওর পুতুলটি বুকে নিয়ে—
এদের সবার মধ্যে, হে স্বদেশ, দেখি তোমারই প্রকৃত মুখ।
প্রত্যহ তোমাকে দেখি, শিরাপুঞ্জে সর্বদাই করি অনুভব,
মৃত্যু হবে যখন আমার আর আমি নক্ষত্রফেনায়,
বস্তুর অসারতায় যাব মিশে, তবু
থাকব দু'চোখ মেলে তোমার এ অলৌকিক ঐশ্বর্যের দিকে।

ধর্ষিতার মৃত্তিকা জন্ম দেয় পুষ্পরাজি, কেননা শহীদগণ
করেছেন আত্মদান, তাঁদের মহিমা সৃষ্টি করে স্বপ্ন,
বেড়ে ওঠে গাছ, ধ্বংসস্তূপে প্রেমময় হাত সৌন্দর্য জাগায় :
আমার সজীব দেশ কালের স্পন্দিত ডালে রক্তিম গোলাপ।

## ॥ ছেচল্লিশ ॥

প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মানুষই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, যুদ্ধবিগ্রহ বিরোধী। আমাকে যারা চেনেন, তারা ভালো করেই জানেন যে, কোনও দাঙ্গাবাজ, যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তি আমার বন্ধুবান্ধবের তালিকায় গরহাজির। তবে এটাও সত্য, আমার দেশের বিরুদ্ধে যদি কোনও শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করে, বাংলাদেশের জনসাধারণকে উৎপীড়িত করে নানা ছলে, তাহলে আমার ঘৃণা, ক্রোধ ধাবিত হবে সে অপশক্তির দিকে। হয়তো আমি হাতে মারণাস্ত্র তুলে নিতে পারব না, প্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করতে অক্ষম হব, কিন্তু ধিক্কার বর্ষণ করতে ব্যর্থ হব না কিছুতেই। এজন্যেই পাক-ভারত যুদ্ধে আমি স্বদেশী বীরদের জয় কামনা করেছি, পরাজয় চেয়েছি শত্রুপক্ষের।

পাক-ভারত যুদ্ধকালীন যেসব কবিতা এবং 'তিনটি গোলাপ' নামে ক্ষুদ্রকায় কাব্যনাটকটি লিখি, সেসব রচনায় যুদ্ধের জয়গান ধ্বনিত হয় নি, হয়েছে শান্তি এবং মানবতার পক্ষে উচ্চারণ। হাসান হাফিজুর রহমানের পাক-ভারত যুদ্ধবিষয়ক বইটির নাম 'সীমান্ত শিবির'। সেই বইটির জন্যে হাসান একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। হাসান সেই বই লেখার দরুন কখনও গ্লানি কিংবা অনুতাপ বোধ করেন নি। তার দিক থেকে তিনি ঠিক ছিলেন। তার যুক্তি ছিল অকাট্য। হাসানের ভেতরে লক্ষ করেছি, একটি লড়াকু ভাব ছিল, যা কখনও কখনও প্রকাশিত হত তার কথায় এবং কাজে।

যা হোক, এ-কথা তো দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্বপাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা আমাদের এই অঞ্চলের পক্ষে ছিল ষোলো-আনা ঝুঁকিপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীরা নিরাপত্তাহীন ছিলাম। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জোরালো, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। ভারত চাইলে প্রতিরোধহীন পূর্ব পাকিস্তানকে বোমা বিধ্বস্ত করে তার দখলে নিয়ে যেতে পারত। আমাদের সৌভাগ্য যে, ভারত এদিকে পা বাড়ায় নি। সুতরাং আমাদের বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না যে, আমরা ভয়ানক নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করছি।

মতলববাজ পাকিস্তান সরকার তাদের পশ্চিম অংশের ব্যাপারে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী আর উপেক্ষিত এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতি ছিল সীমাহীন ক্যালাস অর্থাৎ নিশ্চেতন, উদাসীন। পূর্বপাকিস্তানের বাসিন্দাদের যা হওয়ার হোক, আমাদের লুটেপুটে নিয়ে তারা সহি-সালামতে থাকলেই হল। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এই হাল-হকিকত বাঙালিদের যত বিপন্নই করুক, তাতে তাদের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না, হলেও তা এত সামান্য যার ফলে বাঙালিদের অকাতরে কোরবানি দেয়া যেতে পারে। অথচ এই পাক-ভারত যুদ্ধে বাঙালি সেনারা পশ্চিম পাকিস্তানের সীমা-পেরুনো যুদ্ধে এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল, যার ফলে যুদ্ধে নাকাল হতে হয় নি সেই অঞ্চলের নেতাদের।

তাসখন্দ চুক্তির পর ভারতের পক্ষ থেকে পূর্বপাকিস্তানের বিপদের মেঘ কেটে গেল বটে, কিন্তু এই অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের বিশেষত শেখ মুজিবুর রহমানের মন থেকে সংশয়ের মেঘ কাটল না। পাকিস্তানের কেন্দ্রীভূত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির কুমতলব এবং অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

আওয়ামী লিগের দেশপ্রেমিক সাহসী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি একচক্ষু, বৈরী শাসক মহলের শোষণ, অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে শোষকদের পিলে-চমকানো, ভিত-কাঁপানো ঐতিহাসিক ছয়-দফা আন্দোলন শুরু করলেন। ছয়-দফা আন্দোলনে বিভিন্ন সাড়া-জাগানো দাবি সংবলিত দলিলটি রচনার পেছনে পূর্ব পাকিস্তানের ক'জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলার ভূমিকা ছিল, এমন একটি কথা আমরা সেকালে শুনেছিলাম। এটি যে কোনও গুজব ছিল না, তা আমি বিশ্বাস করি। তবে মোদ্দা বক্তব্য যে শেখ মুজিবেরই এতে কোনও সন্দেহ নেই। ছয় দফার দলিল প্রকাশিত হওয়ার পর শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লিগের অনেক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পরিবর্তনের ঝড় যখন শুরু হয়, তখন সেটা কিছুতেই থামানো যায় না। হ্যাঁ, নানা প্রক্রিয়ায় এই ঝড়কে কিছুদিনের জন্য দমানো, থামানো যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। সাময়িকভাবে বাধাবিপত্তির ফলে খানিক ঝিমিয়ে আসে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। কিন্তু আদর্শ যেখানে মহান, জনগণের কল্যাণকামী, দেশের মুক্তির প্রেরণাসঞ্চারী, সেখানে পরাজয়, ব্যর্থতা কিছুতেই পথ খুঁজে পায় না। আদর্শের জয় আজ হোক, বহুদিন পরে হোক হবেই। উদ্দেশ্য যদি মানুষের প্রগতি, উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্যে অনড় থাকে, তাহলে মানুষের প্রয়াস মুখ থুবড়ে পড়ে না, জ্বলজ্বলে

সাফল্য তার দোরে এসে কড়া নাড়ে, ঘুটঘুটে অন্ধকারেও জ্বলে ওঠে আলো। মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক নেতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিজ নিজ প্রক্রিয়ায় ঠিক পথটি দেখিয়েছেন। আমরা কি তাঁদের অবদানের কথা ভুলতে পারি? আমাদের স্মৃতি থেকে কি মুছে ফেলতে পারি তাঁদের অসামান্য সংগ্রাম, ত্যাগ এবং জাতি গঠনের অক্লান্ত সাধনার কথা? যদি ভুলে যাই তাঁদের অসামান্য অবদানের কথা, যদি অবহেলা করি আমাদের মহান নেতাদের, তাহলে আমরা চিহ্নিত হব অকৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠী হিসেবে।

কখনও ভুলতে পারব না ১৯৬৬ সালের কথা একটি ব্যক্তিগত কারণের জন্যে। সেই বছরের শুরুতেই অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে গোড়ার দিকে আমার বাবা, অসামান্য ছিল যাঁর স্বাস্থ্য, অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে-সে অসুখের হামলা নয়। গোড়াতেই ধরা পড়ল এক কালান্তক ব্যাধি। গোড়াতেই বললাম বটে, কিন্তু কিছুদিন থেকে, আমরা লক্ষ করছিলাম, বাবা কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, তিনি ক্যান্সারে ভুগছেন। আমার মনে অনেকগুলো দীপ যেন আচমকা দপ্‌ করে নিভে গেল। আব্বা ও আম্মাকে এই ভয়ংকর খবর দিতে পারি নি। দেয়া সম্ভব ছিল না। কয়েকদিন পর তাঁকে মেডিক্যাল হসপিটালে একটি কেবিনে ভর্তি করা হল। হাসপাতালেও আম্মা হলেন আব্বার যুগপৎ সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী এবং নার্স। আমার মায়ের মতো এমন একাগ্র নিষ্ঠা এবং মমতা আমি আজ অব্দি কারও মধ্যে দেখি নি।

বাবার এই ভয়ংকর অসুস্থতা আমাকে আমার জনকের খুব নিকটে নিয়ে গেল সমুদ্র তীরে মাথা কোটা ঢেউয়ের মতো। কবুল করছি এর আগে বাবার জন্যে এমন সপ্রেম অনুভূতি হয় নি কোনও মুহূর্তে। আগেই বলেছি, এক ধরনের অকারণ ভীতি আমাকে সরিয়ে রাখত জন্মদাতার কাছ থেকে। তিনি অসুস্থ হওয়ার পর আমি যেখানেই থাকি যে কাজই করি পিতার মুখ ভেসে উঠত দৃষ্টিপথে। মনে পড়ত আমি যখন মেট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হব — বাবা সেই সময় কলকাতায় তাঁর কাজ শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসার সময় আমার জন্যে একটি টেবিলঘড়ি এবং একটি সুন্দর সুটকেস কিনে এনেছিলেন। সানন্দে দেখলাম এই সুটকেসে স্থূলাক্ষরে আমার নাম লেখা রয়েছে। বাবার সেই উপহার পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। আমি মেট্রিক পরীক্ষায় জ্বলজ্বলে রেজাল্ট করব, এমন একটি ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল। কারণ, নবম শ্রেণিতে আমার রেজাল্ট ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু, অসুস্থতা এবং আমার গাফিলতির দরুন মেট্রিক পরীক্ষায় ফল হল নিষ্প্রভ। মেট্রিকের বেড়া ডিঙোতে ব্যর্থ হই নি সত্য, কিন্তু এমন অনুজ্জ্বল ফল ছিল তাঁর প্রত্যাশার বাইরে। আমি তাঁকে হতাশ করেছিলাম বলে নিজের মধ্যে খুব গুটিয়ে যাই এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে রচিত হল অনাকাঙ্ক্ষিত দূরত্ব। এজন্য অবশ্য আমার এক ধরনের উদাসীনতাযুক্ত লাজুকতাই দায়ী। যদি আমি উদ্যোগী হয়ে পিতার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতাম, তাহলে সম্ভবত এই দূরত্বের জন্ম হত না।

যা হোক, বাবার জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তাঁর অন্তরঙ্গতা লাভ আমার কাছে অসামান্য এক উপহার হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। এরকম উপহার আমি এর আগে কিংবা পরে পাই নি। অফিসের কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সন্ধ্যায় রাতের খাবার শেষ করে ছুটে যেতাম

হাসপাতালে। আমার উপস্থিতি বাবার কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ছিল, এটা আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম। বাবা হাসপাতালে থাকাকালীন এক সন্ধ্যারাতে বিছানায় শুয়ে আমার একটি অনুষ্ঠান শুনছিলেন রেডিওতে। সেই সময় তাঁকে দেখতে আসা আত্মীয়স্বজনদের তিনি বললেন, 'বাচ্চুর অনুষ্ঠান। একটু পরেই সে আসবে।' এই এক টুকরো খবর আম্মা আমাকে জানিয়েছিলেন। আজ সেই কথা স্মরণে ঝিকিয়ে ওঠায়, আমার অন্তরে হু হু হাওয়া বয়ে গেল।

আব্বা অর্শরোগে ভুগেছেন বহুদিন। অর্শের ক্ষতকে কব্জা করে ফেলল কর্কট ব্যাধি। এই রোগের তেমন চিকিৎসা না হওয়ার দরুন আমার বাবাকে সইতে হল ভয়ংকর ব্যাধির আক্রমণ, নির্যাতন। তাঁর ক্ষতে মেশিনের যে সেঁক দেওয়া হতো, সেই প্রক্রিয়ার পরবর্তী ফলটি ছিল খুবই উৎপীড়ক। বিপন্ন রোগী জ্বালা ও যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তেন। তাঁর সেই অস্থিরতার কথা মনে পড়লে এতকাল পরে আজও বিষণ্ণ হয়ে পড়ি পিতার অর্শরোগের শিকার এই আমিও। বেশ কয়েক বছর জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করার পর বাধ্য হয়ে হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারে প্রবেশ করে নিজেকে অভিজ্ঞ সার্জেনের অস্ত্রের কাছে সমর্পণ করি। এই সার্জারির পর অর্শের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে বিলকুল রেহাই পেয়ে যাই। এই অস্ত্রোপচারের ফলে বহুকাল অর্শমুক্ত ছিলাম, ইদানিং কালেভদ্রে অর্শজনিত সামান্য কিছু রক্ত আমাকে অপ্রস্তুত এবং কিঞ্চিৎ ভীত করে বটে, তবে তেমন আমল দিই না এই ব্যাপারটিকে।

হাসপাতালে দিনরাত আম্মা তো আব্বার দেখাশোনা এবং সেবা শুশ্রূষার জন্যে রোগীর রুমে থাকতেনই প্রত্যহ, রাতে কখনও আমি কিংবা আমার অনুজ সাইফুর রহমান চৌধুরী থাকত। বেশিরভাগ রাতে আম্মার সঙ্গে আমিই থাকতাম। বাবার ক্ষতে সেঁক দেয়ার পর রাতে সারা মাথায় অসহ্য জ্বালা করত, জ্বালায় অস্থির হয়ে যেতেন তিনি। তাই রাতে সারাক্ষণ তার মাথায় জোরে হাতপাখা দিয়ে উপরের সদাচঞ্চল ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া সত্ত্বেও বাতাস করতে হত আমার ক্লান্ত মাকে। কখনও জোর করে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমানোর তাগিদ দিতাম। তখন হাতপাখার হাওয়া চালু রাখতাম আমি কিংবা আমার ছোটো ভাই। আম্মা তো দিনরাত আব্বার সেবা করেই চলেছেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর হাসি ঝরিয়ে। চিকিৎসকের নির্দেশানুসারে ভোরবেলা হাসপাতালের বারান্দায় বিশ মিনিটের মতো হাঁটতে হত। বাবা ছিলেন লম্বাচওড়া শক্তিশালী পুরুষ। কিন্তু কর্কটরোগের নিপীড়নে তিনি বড়ো বেশি শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এতটাই শুকিয়ে গিয়েছিলেন যে আমার সামান্য কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতেন। তাঁর সেই ভার বইতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হত না।

একদিন দুপুরে এক অঘটন ঘটে গেল ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের আব্বার জন্যে বরাদ্দ কামরায়। তাঁর বেডের বালিশের নীচে রাখা একটি প্রেসক্রিপশন কৌতুহলবশত বাবা হাতে নিয়ে পড়ে ফেললেন। সর্বনাশ! বাবার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনার পর, একে একটি দুর্ঘটনাই বলব আমি, আমার বাবা একেবারে প্রায় নীরব হয়ে গেলেন। এর আগে বেশ কথা বলতেন। সেসব কথায় আনন্দের স্পর্শ এবং সঞ্জীবতার ছোঁয়া ছিল। একদিন মনে পড়ল, বিকেলে তিনি শুনতে

পেলেন যে, আমার ছোটো মেয়ে শেবা স্কুলে যাওয়ার পথে একটি গোরুর গাড়ির চাকার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছে। তিনি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি ভালো হয়ে গেলে তোর জন্যে একটি মোটরগাড়ি কিনে দেব।'

তিনি সুস্থ হলেন না আর, তাঁর সেই গাড়িও কেনা হল না। আমার অসুস্থ পিতা, আমার প্রায় নিঃশব্দ জনক, হতাশার কালো কুয়াশায় নিমগ্ন এক পুরুষ ফিরে গেলেন তাঁর পুরনো আশেক লেনের বাসায়। আমাদের মনে আশঙ্কার তুফান। কে জানে কখন কী-যে ঘটে যায়। চিকিৎসা চলল পুরোদস্তুর, একদিন রাত বারোটার দিকে বাবার শারীরিক অবস্থা অত্যধিক খারাপ হয়ে গেল। চিকিৎসক দ্রুত একটি প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। প্রায় দৌড়ে গেলাম মিটফোর্ড রোডে ওষুধের তালাশে। একটি কি দু'টি দোকান খোলা ছিল। এক দোকানে ওষুধ পাওয়া গেল। ওষুধ নিয়ে ছুটলাম বাসার দিকে। বাবার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াতেই দেখি আমার মা'র কোলে বাবার ঢলে-পড়া মাথা। পরিবেশ আমাকে জানিয়ে দিল, তিনি নেই। আমি হাতে-সামলানো ওষুধের প্যাকেট ছুঁড়ে মারলাম আঙিনায়। আমার মা পাথরের মতো নিস্তব্ধ, সারা ঘরে কান্নার রোল। মা আমার প্রস্তরমূর্তি! সারারাত আমাদের অনেকের চোখেই ঘুম নেই। প্রত্যুষে ক্লান্তি আমাকে ঘুমের পাড়ায় ঠেলে দিল। শরীর কেমন যেন নিস্তেজ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব খিদে পেল। কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে পারছি না। মাথা ঝিম ঝিম করছে। আমার এই হাল দেখে কে যেন আমার সামনে তুলে ধরল দু'তিনটি বিস্কুট। চটপট খেয়ে ফেললাম। এক গ্লাস পানি শূন্য করে বারান্দায় রাখা আব্বার পাশে দাঁড়ালাম। খুব কান্না ঝরল দু'চোখ বেয়ে, পাশের ঘরে আম্মা বসে আছেন মরুভূমির মতো শুকনো চোখে। সারা মুখে নিস্তব্ধতার হাহাকার যেন গেঁথে দিয়েছে। এই যে তিনি কাঁদছেন না অনেকক্ষণ ধরে, এটা মোটেই ভালো নয় তাঁর জন্যে। কোনও বিপদ ঘটে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। আমি আম্মার মুখোমুখি বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে দু'হাত ধরে কিছু কথা বলতে শুরু করলাম। কোনও কিছু ঠিকঠাক করে কথা বলি নি। বলার আগে জানতামই না কী বলে মায়ের হৃদয় এবং চোখ দিয়ে কান্না ঝরাব। কী করে প্রাণসঞ্চার করব পাথরের মূর্তিতে? কী কথা উচ্চারণে করে শোক-শুষ্ক চোখে আনব অশ্রু-বন্যা? আমার কথার স্পর্শে আম্মা নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে করুণ কান্না হয়ে উঠলেন নিজেই। তাঁর এই কান্নায় সবাই আবার কেঁদে উঠলেন সারাঘরে।

আব্বার নির্দেশ ছিল তাঁর কবর যেন হয় গ্রামে আমাদের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁর পিতার কবরের পাশে। বাবার ইচ্ছা পূরণের তাগিদে আমরা তাঁর লাশ চায়ের পাতা এবং বরফ দিয়ে সাজিয়ে একটি কফিনে রেখে রওয়ানা হলাম পাড়াতলী গ্রামের উদ্দেশে। ট্রেনে চেপে আমরা আব্বার লাশ নিয়ে পৌঁছলাম ভৈরব স্টেশনে মেঘলা বিকেলে। চতুর্দিকে হাওয়ার দুরন্ত মাতলামি। একটি হু হু আওয়াজ যেন জাপটে ধরছিল শববাহী যাত্রীদের। আমার মেজভাই আজিজুর রহমান চৌধুরী তখন সপরিবারে আমাদের গ্রাম পাড়াতলীতে। সেখানে তাঁর কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। তাঁরা থাকতেন বাবার তৈরি সুন্দর একটি একতলা দালানে। বাড়ির ভেতরে নানা ফুল আর ফলের গাছ প্রশস্ত জায়গাটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে অনেকখানি।

আমরা দেরি না করে ঝড়ো আবহাওয়ায় আব্বার কফিন নিয়ে নৌকায় উঠে পড়লাম। তখন মানসিক অবস্থা এমন দুর্যোগময় ছিল যে, প্রকৃতির বিরূপতাকে পাত্তা দেয়ার কোনও অবকাশই ছিল না। মেঘনার বুক চিরে হাওয়ার ঝাপটা সয়ে নৌকা চলছিল আলুঘাটার দিকে। নৌকা থেকে আলুঘাটায় নেমেই হেঁটে যেতে হয় আমাদের গ্রামের বাড়িতে। নদী সেদিন যে-রকম মারমুখী হয়ে উঠেছিল, অন্য কোনওদিন হলে আমি অন্তত মাঝিকে তীর ছেড়ে নৌকা চালাতে বলতাম না। ১৯৬৭ সালের ২৮ এপ্রিলের পড়তি বিকেলে তেমন চিন্তা মনের কোনও কোণেই ঠাঁই পায় নি।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে কফিন খুলে উপস্থিত সবাইকে শেষবারের মতো বাবার মুখ দর্শনের জন্যে কফিনের মুখ খুলে দেয়া হল। আমার মাস্টার চাচার ছোটো মেয়ে 'আব্বা', 'আব্বা' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর কান্নার কারণ বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি। কিছুদিন আগেই আমার দাদাজানের তৃতীয় পুত্র অর্থাৎ আমার বাবার পিঠাপিঠি বড়ো ভাই মাস্টার চাচা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ছোটো চাচাতো বোনটি আমার জনকের মৃত মুখে ওর পিতাকে মুখকে আবিষ্কার করেই দ্বিগুণ শোকে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ওর কান্নায় আবার আমার বুকে আর চোখে কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে। কিন্তু চোখ মুছলেও শোক মোছা যায় না।

## ॥ সাতচল্লিশ ॥

আমাদের গ্রামের বাড়ির প্রায় গা ঘেঁষেই আমাব পূর্বপুরুষদের তৈরি মসজিদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সগৌরবে। মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করার আগে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা একটি মসজিদ লাগোয়া খোলা প্রশস্ত জায়গায় কখনও-সখনও আলাপ-আলোচনা কিংবা নীরবে সময় যাপন করেন। মসজিদটির পাশেই আমাদের পারিবারিক গোরস্তান। এই গোরস্তানেই দাদাজানের পুরনো বাঁধানো কবরের পাশেই তাঁর পুত্র মোখলেছুর রহমান চৌধুরীর মরদেহ কবরস্থ হয়। কিছুদিন পর তাঁর কবরও বাঁধানো হয়। এই গোরস্তানে আজ অব্দি দুটোই বাঁধানো কবর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বজায় রয়েছে।

নানা বয়সে আমি বহুবার এই মসজিদলগ্ন খোলা প্রশস্ত জায়গায় বসে অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছি কখনও ভোরের স্নিগ্ধ প্রহরে, কখনও বিকেলের নরম রোদে গা এলিয়ে, কখনও বা জ্যোৎস্নারাতে তারা, গাছগাছালি, সামনের পুকুরের রহস্যময় পানি দেখে। মসজিদ লাগোয়া বাঁধানো খোলা জায়গায় সময় যাপনের বারণ ছিল না কোনও মুরুব্বির। তাঁদের এই ঔদার্য ভালো লাগত আমার। প্রকৃতির প্রতি আমার অনুরাগের পেছনে এই সীমিত স্থানটুকুর অবদান কম নয়। বার বার সেইসব প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখের সামনে এসে হাজির হয় আমার মনকে বাস্তবতা পেরিয়ে অন্য কোনওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাস্তব সৌন্দর্য উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে এইটে ছিল মূল্যবান উপরি পাওনা।

আব্বাকে তাঁর জন্মস্থানের মাটিতে দাফন করার পরদিনই ফিরে এলাম ঢাকায়। আমাদের দেখে শোকার্ত আম্মা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এই শোক তাঁকে দখল করে রাখবে অনেক বছর। ফিকে হবে না সহজে এর তীব্রতা। তবে এও তো সত্য, এই

তীব্রতা চিরস্থায়ী হওয়া দূরের কথা, ক্রমান্বয়ে সময়ের ধুলোর প্রলেপে ম্লান হয়ে আসে। পিতার মৃত্যু আমার অস্তিত্বকে ভীষণ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এ-কথা শুনে অনেকে হয়তো আমার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করবেন, তবু আমি সত্য উচ্চারণের পক্ষপাতী, সেই সত্য আমার বিপক্ষে গেলেও। আব্বা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর বিষয়ে তেমন বেশি কিছু ভাবি নি, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে আমার অন্তরের অন্তস্তলে এনে দিল প্রবল টানে। আসলে তাঁর অসুস্থতার লগ্ন থেকেই এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল। তাঁর জীবনাবসানের পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর মিলিয়ে গেছে কালের তিমিরে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর তিমির আমার স্মৃতিপট থেকে পিতার মুখ এতটুকু ঢেকে ফেলতে পারে নি। বলব না, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁর কথা মনে পড়ে। কিছুদিন হয়তো তিনি অনুপস্থিত থাকেন স্মৃতিপটে, কিন্তু আমার চেতনাকে আলোড়িত করে আবার এক নিমেষে হাজির হন আমার সামনে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি তাঁরই দিকে দেখা না-দেখার বিস্ময় নিয়ে।

মাকে কখনও জিজ্ঞেস করি নি, তাঁরও এমন হয় কি-না। তিনি হয়তো গভীরতর, অধিকতর কিছু দেখতে পেতেন, শুনতে পেতেন। কে জানে? আজ আমার ভারি কষ্ট হয় এ-কথা ভেবে যে, পিতা তাঁর এই অযোগ্য, ব্যর্থ সন্তানের বেশ কিছু সাফল্য দেখে যেতে পারেন নি, শুধু ওর ব্যর্থতার বোঝা বয়ে যাওয়ার ক্লান্তিই দেখে গেছেন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। আমার পুরস্কারপ্রাপ্তির উজ্জ্বল চিত্রটি হাজির হতে পারে নি পিতার দৃষ্টিপথে। এই খেদ আমাকে কখনও রেহাই দেবে না। তবু এটুকু সান্ত্বনা, আমার মা তাঁর সন্তানের বেশ কিছু সাফল্য দেখে যেতে পেরেছেন। তিনি আমাকে ঈষৎ খেয়ালি মনে করতেন বটে, কিন্তু একেবারে নালায়েক, অকর্মণ্য মনে করেন নি কোনওকালেই। এই সান্ত্বনাটুকু আমাকে আজও ঘুটঘুটে অন্ধকারেও আলো দেখায়। সত্যি বলতে কী, বর্তমানে এই তিয়াত্তর বছর বয়সেও পিতামাতার অনুপস্থিতি আমাকে কেমন একাকীত্ব এবং শূন্যতায় বড়ো বেশি ভোগায়। আমি দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হই। তবে এ-এ সত্যি, তাঁদের, আমার ক'জন শিক্ষক এবং বন্ধুর কিছু কথা আমাকে মনুষ্যত্ব বজায় রাখার প্রেরণা জাগায়।

আমার পিতার মৃত্যুর বছরেই রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। এর আগে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কালেও রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারিত হয় নি। সরকারি নির্দেশেই প্রচার স্থগিত থাকে। তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন সেকালে একটি তোফা উক্তি পেশ করেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে। তিনি বলেন, পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী হলে রবীন্দ্রসংগীত আর প্রচারিত হবে না। খান এ সবুর নিজেও বাঙালি সত্তাকে খারিজ করে পয়লা বৈশাখ উদযাপন এবং রবীন্দ্রসংগীতকে হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ ঠাউরে নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। এইসব অসার বক্তব্যের বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন আঠারোজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী। সেই বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় —

> ...সরকারি মাধ্যমে হতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত

দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খোদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, জনাব এ.এ. বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, ড. আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রাহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিককুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

এই বিবৃতি 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ প্রকাশিত হওয়ার পর পরেই একই পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় —

> ...(১৮ জন বুদ্ধিজীবীর) বিবৃতির ভাষায় এ ধারণা জন্মে যে, স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানি ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোনও পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সংস্কৃতির সম্পর্কে এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।

বিবৃতিটির স্বাক্ষরদাতা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক কে.এম.এ মুনিম (ইংরেজি), এম. শাহাবুদ্দিন (আইন), ড. মেহের আলী (ইতিহাস), এ.এফ.এম আবদুর রহমান (অংক)। এই পাঁচজন অধ্যাপকের বিবৃতির সঙ্গী আরেকটি বিবৃতি প্রকাশিত হল দৈনিক পত্রিকায়। এই বিবৃতিতে সোৎসাহে স্বাক্ষর দান করেন মোট ৪০ জন। বিবৃতিতে জোশযুক্ত বক্তব্য পেশ করা হয় —

> রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ১৮জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক। ...যে তমুদ্দনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতি বিরোধী বলে মনে করি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিরোধী ৪০জন বিবৃতিদাতা হলেন — মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি ফররুখ আহমদ, কবি আহসান হাবীব, ড. হাসান জামান, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. গোলাম সাকলায়েন, কবি বেনজির আহমদ, কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন, আ.কা.মু. আজম উদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, কবি আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, সানাউল্লাহ নূরী, কবি

আবদুস সাত্তার, শিল্পী কাজী আবুল কাশেম, কবি মুফাখখারুল ইসলাম, গ্রন্থাগারিক শামসুল হক, অধ্যক্ষ ওসমান গণি, মফিজউদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক মোঃ মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ.কে.এম নূরুল ইসলাম, কবি জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার-উল-আলম। রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জগত থেকে নির্বাসিত করার সাম্প্রদায়িক, কূপমণ্ডুক চেতনা-তাড়িত ব্যক্তিদের অপচেষ্টা আখেরে বিফল হয়েছে। তাদের এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী এ দেশের সুস্থ, শুভবাদী, প্রগতিশীল, সংগ্রামী কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ। এই চেতনাই আমাদের স্বাধীনতার সূর্যোদয় দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অদম্য, সুন্দর ইচ্ছার ফলেই আমাদের জাতীয় সংগীতই হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি অনিন্দ্য সুন্দর গান — 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই গান বাংলাদেশের কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক, নারী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবারই প্রাণের গান হয়ে উঠেছে।

এটা তো শেখ মুজিবের শত্রুরাও স্বীকার করবেন যে, তাঁর জীবনের অনেকগুলো বছর কারাগারে কেটেছে মতাদর্শের জন্যে। নেলসন ম্যান্ডেলার মতো অত দীর্ঘকাল না হলেও সেই সময়ের কাছাকাছি হবে। তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন স্বদেশে এবং স্বদেশবাসীর মুক্তি এবং কল্যাণের গুরুত্বকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন বলেই।

আমি আমার যৌবনে, স্বীকার করেছি, রাজনীতি-বিমুখ ছিলাম। এটা কোনও গৌরবের কথা হিসেবে জাহির করছি না। সত্য উচ্চারণে আমি দ্বিধার আশ্রয় খুব কমই নিয়েছি জীবনে। সত্য উচ্চারণে আমি দ্বিধার আশ্রয় খুব কমই নিয়েছি জীবনে। সত্য নিজের বিরুদ্ধে গেলেও সত্য এবং তা স্বীকার করে নেয়াই মনুষ্যত্বের পরিচয়। রাজনীতি গোড়ার দিকে আমাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে নি। কোনও বিশেষ দলের তাবেদারি করার প্রবণতাও আমার প্রকৃতিতে অনুপস্থিত। তবে যে রাজনৈতিক দল আন্তরিকতার সঙ্গে দেশে ও দেশের জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে তৎপর এবং সক্রিয় সেই দলের আমি সমর্থক কিন্তু তোষামোদকারী অথবা দাস নই। কুণ্ঠিত নই সেই রাজনৈতিক দলের ভুল কিংবা নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দেয়ার মনোবৃত্তিকে নিন্দা করতে। এই প্রবণতা আমি পিতৃসূত্রে পেয়েছি। নিজে কিছু অর্জনও করেছি।

শেখ মুজিবুর যখন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পান নি, তখনই সম্ভবত ১৯৬৬ কিংবা ১৯৬৭ সালে তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখি গ্রিক পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে। কবিতাটির নাম 'টেলেমেকাস'। তখন শেখ মুজিব কারাবন্দি। টেলেমেকাস বীর ইউলিসিসের পুত্র। ইউলিসিস তার রাজ্য ইথাকায় দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। তার পুত্র পিতার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাকুল দৃষ্টিতে। আমার কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে —

তুমি কি এখনও আসবে না? স্বদেশের পূর্ণিমায়
কখনও তোমার মুখ হবে না কি উদ্ভাসিত, পিতা,
পুনর্বার? কেন আজও শুনি না তোমার পদধ্বনি?
এদিকে প্রাকারে জমে শ্যাওলার মেঘ, আগাছার
দৌরাত্ম্য বাগানে বাড়ে প্রতিদিন। সওয়ারবিহীন
ঘোড়াগুলো আস্তাবলে ভীষণ ঝিমোয়, কুকুরটা
অলিন্দে বেড়ায় শুঁকে কত কী-যে, বলে না কিছুই।

সেকালে কবিতাটির আড়ালে যে আমাদের দেশের হাল-হকিকত এবং জননেতা শেখ মুজিবের কথাই বলা হয়েছে, এই সত্য অনেকের কাছেই সম্ভবত উদ্ভাসিত হয় নি। তবে একটি কবিতার আত্মা যাদের অন্তর্দৃষ্টিতে পরিস্ফুট তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন কেউ আমাকে কবিতাটির তাৎপর্যের কথা জানান নি! সে জন্যে আমার কোনও আফশোশ নেই। আজও নেই। আমাদের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ হৃদয়ের উল্লেখ দেখলেই যেন সাপ দেখার মতো চমকে ওঠেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের ভেতর কুঁচকে যান। হৃদয়বত্তা এবং ভাবালুতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, স্বীকার করি। কিন্তু কোনও কবিতায় হৃদয়বত্তার খানিক আভাস পেলে যারা নাক সিঁটকিয়ে সেটি শত হস্ত দূরে সরিয়ে দেন কিংবা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলেন, তাদের আমি দূর থেকেই সালাম জানাই, সহজে কাছে ঘেঁষতে চাইব না। তবে, কবিতায় আবোল তাবোল উগরে দেয়ার মধ্যেও কোনও বাহাদুরি নেই। হৃদয়বত্তা এবং বুদ্ধির মিলনেই উত্তম শিল্পের জন্ম হয়।

মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে থেকেই পূর্বপাকিস্তান অনেক বেশি চঞ্চল এবং উত্তেজনাময় হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার তথাকথিত উন্নয়ন দশক উদযাপন করে শান শওকতের সঙ্গে। আগেই আমি আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের বিষয়টি নিয়ে একটি ছদ্মবেশী কবিতা রচনা করেছিলাম। রাজনীতি-বিমুখ এই আমি ক্রমান্বয়ে রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠলাম। আমার কবিতায় তার ছায়াপাত শুরু হয়। কিন্তু কবিতা যেন শ্লোগানধর্মী হয়ে না ওঠে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমার গোড়া থেকেই। কোনও কোনও বিষয় আছে যেগুলোকে কবিতা করে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য। কোনও কষ্টসাধ্য ব্যাপারকে সফল করে তোলার মধ্যে এক ধরনের নান্দনিক আনন্দ লাভ হয়।

কবিতাকে আমি তারুণ্যের শুরু থেকেই অনেক উচ্চতর স্থান দিয়েছি। কবিতা লিখতে গিয়ে অনেক গঞ্জনা, উপহাস সহ্য করেছি। আজও বহু কটু কথা বর্ষিত হয় আমার কাব্যধারায়। ব্যাঙ্গোক্তিরও মুখোমুখি হতে হয় কখনও-সখনও। কিন্তু, এটুকু সান্ত্বনা কয়েকজন বন্ধু এবং বেশ কিছু চেনা অচেনা ব্যক্তি আমার কাব্যপ্রচেষ্টাকে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। যদি কেউ আমার কবিতা পছন্দ না-ও করেন, তবু আমি আমৃত্যু লিখে যাব আমার অন্তরাত্মার তাগিদে, সম্মানে।

## ॥ আটচল্লিশ ॥

যৌবনের প্রত্যুষে, কবুল করছি, রাজনীতি বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাই নি। মানবী এবং কাব্যপ্রিয়ার প্রেমে অষ্টপ্রহর মগ্ন ছিলাম। আমার চারদিকে কী ঘটছে, কাদের কী অভিসন্ধি সক্রিয়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদিকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সমস্যাদির সমাধান কীভাবে হতে পরে, কাদের প্রচেষ্টায় হতে পারে এসব নিয়ে গভীর চিন্তা করি নি। তবে মোটা দাগের একটি ভাবনা মনের কন্দরে ছিল। সমাজের সকল মানুষের জীবনযাত্রা আনন্দপ্রদ, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হোক, এটা আমার আন্তরিক কামনা ছিল। তবে কোনও রাজনৈতিক দলের তাবেদারি করার মতো ঝোঁক আমার মানসে বাসা বাঁধে নি।

হ্যাঁ, আমি কবিতা এবং দয়িতার প্রেমে ডুবে 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এই কলরব', এই রাবীন্দ্রিক শব্দমালাকেই ধ্রুবজ্ঞানে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা রচনা এবং প্রেয়সীর চোখে চোখ মেলে, হাত হাত রেখে কাটিয়ে দিয়েছি নানা প্রহর। তবে যতই কবিতা ও প্রেম নিয়ে মশগুল থেকে সময় কাটিয়ে দিই না কেন, কোনও কোনও ঘটনা — পারিবারিক কিংবা দৈশিক — মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রোগশয্যায় প্রেমিকার কথা ভেবে আনন্দিত এবং বিষণ্ন হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার তাগিদে প্রাণ বিসর্জন দেয়া ভাষা শহিদদের জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে, ধিক্কার এবং প্রতিবাদ গর্জে ওঠে হন্তারকদের বিরুদ্ধে। জানি, আমার মতো অসুস্থ, অসহায় একজন কবির এই ধিক্কার এবং প্রতিবাদের কথা কেউ জানবে না। তবু রোগশয্যায় এক ধরনের সংহতি পেয়ে যাই সংগ্রামী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। এই বাক্য যথেষ্ট নয়, স্বীকার করি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে উপস্থিত মনে করি সংগ্রামে। আমি বিশ্বাস করি, কবিতার চারদিকে চক দিয়ে এঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কবিতা আকাশের মতো, যার কোনো সীমা নেই। আকাশে নানা রঙের সৃষ্টি হতে পারে বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু আকাশ আকাশই থাকে শেষপর্যন্ত। বিভিন্ন শতকের কবিতা বিভিন্ন ধরনের। যত ধরনেরই হোক, কবিতাকে কবিতা হতেই হবে। নইলে সেটি কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য হবে না কোনও প্রকৃত পাঠকের কাছে। অর্থাৎ রচিত পঙ্‌ক্তিমালার শরীর থেকে একধরনের আভা বিচ্ছুরিত না হলে সেটি বিবেচিত হবে না কবিতা হিসেবে। এই আভা যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনিই কবি। সত্যি বলতে কী, এই আভা সৃষ্টি সবাই করতে পারেন না বলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি সোজা-সাপটা বলেছেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একজন বরেণ্য পণ্ডিত, কিন্তু তিনি কবিতা লিখতে গিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে প্রকট করেছেন। অন্যদিকে লালন শাহ্ ইশকুল কলেজের কাছ ঘেঁষেও যান নি, কিন্তু তাঁর কবিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ এক আজব খেলা সংসারে।

এখন আমি তিয়াত্তর বছর পাড়ি দিচ্ছি। কবিতা লেখার চেষ্টায় কলম ধরেছি প্রায় চুয়ান্ন বছর ধরে। জীবনের আর যে ক্ষেত্রেই হোক, এ ক্ষেত্রে আমি পারতপক্ষে কোনও ফাঁকি কিংবা কোনওরকম ওপর চালাকিকে প্রশ্রয় দিই নি; প্রতিটি মুহূর্তে প্রকৃত পরহেজগারের মতো নিবেদিত চিত্ত থাকতে সচেষ্ট রয়েছি। সত্যিকারের সাফল্য এসেছে কি না, বলতে পারব না তবে আমার সাধনায় কোনও ফাঁকি নেই।

বিষয় যা-ই হোক না কেন, কবিতার আভাকে ম্লান করার কোনও উদ্যোগকেই কাগজ কলমের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিই নি। জানি না, কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি। এ যাবৎ আটান্নটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছি সত্য, আদৌ সেগুলো কাব্য পদবাচ্য হয়েছে কি-না তা আমার পক্ষে বলা সাজে না, বলবেন সত্যিকারের কাব্যপ্রেমী বোদ্ধারা। যদি সামান্য কিছুসংখ্যক কবিতাও তাঁদের কষ্টিপাথরের ঘর্ষণে জ্বলজ্বলে থেকে যায়, তাহলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মানব।

কাব্যক্ষেত্রে পদার্পণের পর কিছুকাল কবিতার ত্রিসীমায় দরিদ্র সাধারণজনের কোনও সমস্যা, বাস্তবের ছায়াকে ঘেঁষতে দিই নি। কিন্তু কিছুকাল পর সমাজের অস্থিরতা, নানা সমস্যা আমার কবি-সত্তার ঘাড় ধরে বাস্তবতার মুখোমুখি নিয়ে এল। বুঝতে আমার অসুবিধা হল না যে, শুধু কল্পনার মায়াজালে আটকে থাকলে চলবে না, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের কাছেও হাত পাততে হবে কবিতার সারবত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে। জানি না আমার এই উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে। কোনও জাঁদরেল, শক্তিশালী ব্যক্তির হুকুম কিংবা তর্জন গর্জনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কিছু লিখি না। আমার মনোভূমিতে যে বাগান রয়েছে, সেখানে সৌন্দর্য, কল্যাণ এবং প্রগতির সহাবস্থান বিদ্যমান, সেই বাগানের পরিচর্যার একটি প্রধান উপাদান হল কবিতা। সেই মালঞ্চের মালাকার হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। জানি সেই মালঞ্চ কখনও কখনও ঝড়ঝাপ্টায় বিপন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকে থাকে মালাকারের মান রক্ষার তাগিদে।

মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি দেয়া হল। তিনি ১৯৬৬ সালের মে থেকে সেখানে বন্দি ছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি মুক্তি পেলেন, সেদিন জেলফটক থেকে বাইরে পা বাড়াতে না বাড়াতেই আবার কারাবন্দি হলেন। সে বছরের জুন মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যর শুনানি শুরু হয়। সেই সময় বাংলা হরফের রদবদল নিয়ে কিছু সংখ্যক বাঙালি লেখক মেতে উঠেছিলেন। ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য রোমান হরফ এবং একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টির জন্য প্রস্তাবের মাধ্যমে কোশিশ করেন। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালি সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক আইয়ুবের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। ১৯৬৮ সালের আগস্টে ৪১ জন সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক বিবৃতির মাধ্যমে সরকার ও দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা এটি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকাতার সৃষ্টি করবে'।

স্মৃতির পাতা উলটিয়ে দেখছি, তখন আমি বাংলা হরফের রদবদলের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে কয়েকটি ছড়া এবং একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটির নাম 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃতি করছি :

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?

উনিশ শো' বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস!
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্র বিলাসী একনায়ক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রেমীদের আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছিল, যা ১৯৬৯ সালে চূড়া স্পর্শ করে। প্রতিবাদী মিছিলের পর মিছিলে প্রকম্পিত হতে লাগল ঢাকার পথ। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি। সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। মিছিলের শ্লোগানে শুধু রাজপথই ঝংকৃত হচ্ছে না, হচ্ছে মুক্তিকামী বাঙালিদেরও মনপ্রাণ। দুপুরে রওয়ানা হলাম দৈনিক পাকিস্তান-এর দিকে। পথে যানবাহন নেই। ঝকঝকে রোদে পথ হাঁটছি। নানা চিন্তা ভিড় করছে মনে। গুলিস্তান সিনেমা হলেব কাছে আসতেই যেন সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেলাম। একটু পরেই রাস্তায় অসামান্য এক মিছিল। প্রতিবাদী মিছিলের পুরোভাগে একজন যুবকের হাতে অন্যরকম একটি পতাকা। লাঠির ডগায় জড়ানো রক্তাক্ত শার্ট। বুঝতে অসুবিধা হল না যে শার্টটি একজন শহিদের। আমি তাকিয়ে রইলাম আসাদের শার্টের দিকে। তখন হৃদয়ে আমার তোলপাড়, কান্না স্তব্ধ দু'চোখে। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। পুরো মিছিল চলে যাওয়ার পর রওয়ানা হলাম অফিসের দিকে।

অফিসে আমার কামরায় একা বসেছিলাম অনেকক্ষণ। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল লাটির ডগায় ঝুলে-থাকা একটি রক্তাক্ত শার্ট। আসাদের শার্ট। যাকে আমি, দেখি নি কোনওদিন, সেই মুক্তিকামী, রাজনীতিসচেতন, দেশপ্রেমিক যুবকের কথা ভেবে মনে এক ধরনের শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে আশার এক পবিত্র প্রদীপ জ্বলজ্বলে হয়ে কাঁপছিল। এই আত্মদান কি বৃথা লুণ্ঠিত হতে পারে পথের ধুলোয়? আমাদের দুঃখিনী বাংলা কি পরাধীনতার শেকলবন্দি হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে শুধু? মুক্তির আলোধারায় স্নাত হবে না কি তার সত্তা? অফিসের চেয়ারে বসেই আমি আমার অজ্ঞাতে যেন নিঃশব্দে উচ্চারণ করছিলাম দু'টি শব্দ 'আসাদের শার্ট'। সেদিন দুপুর কিংবা বিকেলে কারও সঙ্গে বেশি কথা বলি নি। বলতে পারি নি। গোধূলিবেলায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেও নীরব ছিলাম। সন্ধ্যারাতে লেখার টেবিলে ঝুঁকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লিখে ফেললাম 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। এই কবিতা দু'তিন দিন পরেই একটি প্রগতিশীল ছোটো কাগজে ছাপা হলো। এই সামান্য কয়েক পঙ্‌ক্তির একটি ক্ষুদ্রকায় কবিতা যে এত লোকের চিত্তে সাড়া জাগাবে, কল্পনাও করি নি তখন। আসাদুজ্জামান, যিনি পুলিশের বুলেটে শহিদ হন, ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা ছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনও প্রকৃত দেশপ্রেমিক শহিদকে কোনও সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা কিংবা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের খোপে আটকে রাখা চলে না। তাই, সেকালে আমার লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এমন তিনটি পঙ্‌ক্তি —

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

যখন কবিতাটি লিখছিলাম টেবিলে ঝুঁকে আমার সেই সুনসান ঘরে, লিখছিলাম আমার অচেনা এক যুবকের রক্তাক্ত শার্টের ক্ষণিক অথচ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিকে অবলম্বন করে তখন আসাদ আমার কাছে হয়ে উঠেছিল একটি স্বাধীনচেতা, নির্যাতিত কিন্তু বীর, দুর্জয় জাতির প্রতীক — কোনও সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত করা কঠিন। এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমার 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ১৯৬৯-এ রচিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থেই সঙ্কলিত হয় 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'হরতাল', 'আসাদের শার্ট', 'এ শহর', 'মা', 'দুঃস্বপ্নে একদিন'-এর মতো কবিতাবলী। তখন কোনও কোনও শুদ্ধাচারী সমালোচক আর পাঠক, অনুমান করি, ভুরু কুঁচকে ছিলেন। আমি কবিতার সর্বনাশ করছি, শ্লোগানের জন্ম দিচ্ছি ইত্যাদি উক্তি হাওয়ায় রঙিন ঘুড়ির মতো উড়িয়ে ছিলেন।

স্বীকার করছি, আমার কবিতা যে একটি বাঁক নিয়েছে 'নিজ বাসভূমে', এমন উক্তি সত্যে উদ্ভাসিত, তবে কবিতার সর্বনাশ ঘটানোর মতো ক্ষমতা আমার ঝুলিতে গরহাজির। আমাদের জাতীয় জীবনের বেশ কিছু ঘটনা আমাকে আন্দোলিত করেছে, আমি কিছু কিছু কবিতায় সেসব স্পন্দনকে রূপায়িত করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি একাত্মবোধ করেছি উৎপীড়িত, দুঃখী আমজনগণের সঙ্গে। আমি তাদের দুঃখকষ্ট মোচনের ক্ষমতা ধারণ করি না — এ ক্ষেত্রে আমি অসহায়, নাচার। কিন্তু সমাজের অনাচার, অবিচার, শাসকের অপশাসন এবং বেয়াড়া লুণ্ঠনের কথা তো আকারে ইঙ্গিতে হলেও প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখি। সেটুকু কাজ করার জন্যে লেখনীকে ব্যবহার তো করতেই পারি। তবে সেসব কথা লিখতে গিয়ে প্রপাগাণ্ডায় কাঁধে সওয়ার হই নি সিন্দাবাদের নাছোড় বুড়োর মতো। কবিতাকে যথাসাধ্য কবিতাই রাখতে চেয়েছি। পেরেছি কি-না সেই রায় দেয়ার ভার আলোকিত সমকালীন পাঠক সমালোচক এবং ভাবীকালের অনুসন্ধানী খাঁটি পাঠক এবং প্রকৃত কাব্যরস-সন্ধানী সমালোচকদের। যুগে যুগে মূল্যায়নের পাল্লায় কত যে হেরফের হয় তা-ও তো আমাদের অজানা নয়।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, কম্পিত হওয়ার প্রয়োজন কী? আমার বিশ্বাস, বহির্জগত এবং অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি উন্মীলিত রেখে কবির একজন প্রকৃত সাধকের মতোই নিরন্তন সাধনা করে যাওয়া উচিত। লালন শাহ্ কি জানতেন যে তাঁর গীতিমালা আজকের কবি এবং ধীমান গবেষকের মনে এমন সাড়া জাগাবে? গ্রামীণ এবং শাহরিক অদীক্ষিত শ্রোতাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কোন্ ধরনের কবিতা কিংবা গীত কখন কোন যুগে কাদের যে মন কাড়বে, কেউ বলতে পারে না।

এ-কথা আমি বিশ্বাস করি বলেই নিজের মন যা লিখতে চায় লিখে যাই আন্তরিকতার সঙ্গে। কোনও ধরনের ভড়ংকে কোনওকালেই প্রশ্রয় দিই নি, যদি বেঁচে থাকি, ভবিষ্যতেও দেব না। এই যে আজ জীবনের গোধূলিলগ্নেও ঘন্টার পর ঘন্টা টেবিলে ঝুঁকে সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকি, মনোলোকে খুঁজে বেড়াই কাঙ্ক্ষিত কোনও পঙ্ক্তি, জানি না আখেরের এর ফল কী হবে? আশার আলোর ঝলকানি নাকি নিরাশার তিমির।

## ॥ উনপঞ্চাশ ॥

প্রতিবাদী, সাহসী, সংগ্রামী ছাত্রনেতা আসাদকে হত্যা করে প্রতিক্রিয়াশীল উৎপীড়ক অপশক্তি বাঙালিকে গণঅভ্যুত্থানের পথে নামতে উদ্বুদ্ধ করল! আসাদ জেনে গেলেন না তাঁর আত্মদান এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিল অল্প সময়ের মধ্যে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক আরেকজন বীর বাঙালি স্বৈরশাসকদের বুলেটবিদ্ধ হয়ে একজন শহিদের মর্যাদা লাভ করলেন। ১৯৬৯, ১৮ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হল; কারণ, তিনি ক'জন ছাত্রকে স্বৈরাচারীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ড. শামসুজ্জোহাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। এই সদা প্রসন্ন-চিত্ত মানুষটি যে-কোনও ব্যক্তিকে সহজে আপন করে নিতে পারতেন। তিনি একজন প্রকৃত প্রগতিশীল, সত্যান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কারও নিন্দা করতেন বলে শুনি নি। কিন্তু নিজের মতামত প্রকাশ করতে কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ করতেন না। জ্ঞানার্জনে ছিলেন নিষ্ঠাবান। তাঁর হাসিমাখা মুখ মনে পড়লে আজও মেনে নিতে পারি না, যেমন পারি না আরও কিছু মানুষের জীবনাবসান। তাঁর তো মৃত্যুর বয়স হয় নি। যদি তিনি বৃদ্ধকালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতেন, তা হলে, যদি আমি ততদিন বেঁচে থাকতাম একজন থুতথুরে বুড়ো হিসেবে, মেনে নিতে হয়তো কষ্ট হত না।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনলেন সংগ্রামী বীর বাঙালিরা। এই সংগ্রামী জনতার নেতৃত্ব দান করেন মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। ১৯৬৯, ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়। ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারি করেন। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই বিজ্ঞানের জগতে ঘটল বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা। একটি ইতিহাসের সূত্রপাত হল, বলা যেতে পারে। সেটি ঘটল মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মেধাবী গবেষণার ফলে। আমাদের দেশের একটি ছড়া শুরু হয়েছে এভাবে — 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসী চাঁদের বাড়ি যেও'। আর সত্যি সত্যি একদিন তিন মার্কিন নভোচারী মহাকাশযান চেপে চাঁদের বাড়ি গিয়ে হাজির। এঁরা তিনজন হলেন নেইল আর্মস্ট্রং, এ্যাডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, চন্দ্রাভিযানের ক্ষেত্রে রুশ মহাশূন্য বিজ্ঞানীগণ এবং বিশেষ করে চন্দ্রাভিযানে রুশ নভোচারী য়্যুরি গ্যাগারিনের ভূমিকা পথিকৃতের।

একদিকে চাঁদে মানুষের সফল আর প্রায় একইসময় আমাদের দেশের ঢাকার মোহাম্মদপুর-মিরপুরে বাঙালি আর বিহারীদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। পাকিস্তান সরকারের কুচক্রী শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছিল অধিকাংশ বিহারী। তারা হয়ে উঠেছিল হিংস্র, বাঙালি-নিধনে উৎসাহী। তারা শুভবাদী বিহারী কবি-সাহিত্যিক এবং শান্তিপ্রিয় সগোত্র ভালো মানুষদের কথায় কান দেয় নি। কিন্তু এর ফল যে ভালো হয় নি তা ওরা অনেক পরে উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিছু লোক, অনুমান করি, ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই এতদঞ্চলে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

মনে পড়ে বিশিষ্ট উর্দু কবি এবং আমার একজন সুহৃদ নওশাদ নূরী এবং আরও ক'জন উর্দু কবি-সাহিত্যিকের কথা। নওশাদ নুরী এই পৃথিবীর রৌদ্র-ছায়া, অন্ধকার এবং জ্যোৎস্নার মায়া ছেড়ে চলে গেছেন মৃত্যুলোকে। রয়ে গেছে তাঁর বেশি কিছু স্মরণীয় কবিতা এবং শুভকর্মের ইতিহাস যা পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্দীপিত করবে, দেখাবে প্রকৃত প্রগতির পথ। তাঁর স্ত্রী বেঁচে আছেন, আছে তাঁর টগবগে, ভালো ছেলেমেয়ে। নওশাদ নূরীর ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে উন্নতির দু'তিন ধাপ পেরিয়ে গেছে। চমৎকার, শুদ্ধ বাংলা বলে ওরা। তার ছেলের বিনয় এবং আদবকায়দা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পিতার আদর্শ তাঁকে এবং তাঁর বোনকে প্রগতি ও কল্যাণের পথে আমৃত্যু পরিচালিত করুক, এ আমার একান্ত কামনা।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বজ্রকণ্ঠে পূর্ব পাকিস্তানের নাম রাখলেন 'বাংলাদেশ'। এই নামটির জন্য তৃষ্ণার্ত চাতকের মতোই উদগ্রীব ছিল কোটি কোটি বাঙালি। তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিব সেই তৃষ্ণা মেটালেন। সবুজ মাঠ, জল-ছলছল নদীর দেশ আমাদের এই বাংলা। যখন মাইল-মাইল জোড়া মাটিতে ধান গাছের ঢেউ খেলে যায়, যখন সবুজ গাছগাছালির শাখা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায় নানা রঙের পাখ-পাখালি, যখন নদীর বুকে গর্বিত পাল উড়িয়ে নৌকাগুলো এগিয়ে যায় গন্তব্যের দিকে, যখন দূর থেকে ভেসে আসে বাউলের একতারার সুর, তখন প্রকৃত বাঙালির মনে-প্রাণে সৃষ্টি হয় এক অপরূপ জগতের রূপ। তখন দেশের নানা স্মৃতি উড়ে উড়ে এসে বসে আমাদের মানস-ডালে। তখন সুখস্বপ্ন আমাদের কঠোর বাস্তবের ধুলোবালির ভয় দেখানো ঢিবি থেকে অনেকদূরে মখমল-কোমল পথে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। নৌকোয় মেঘনা নদী পেরুনোর সময় কতবারই না হাত দিয়ে ছুঁয়েছি ঠান্ডা, নরম পানি। সেসব মুহূর্তে মনে হয়েছে, এই কোমল জলজ স্পর্শ, এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা ছাড়া কোথায় পাব আমি? কোথায় পাবে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা? তাই তো, কোথায় পাবে? কোন মুলুকে? ভাবতে খারাপ লাগে, আমরা আমাদের নদীগুলোর প্রতি বড়ো উদাসীন। সুন্দর নদীগুলোকে শ্রীহীন, নষ্ট করে ফেলার কুমতলবে আমরা যেন আদাজল খেয়ে নেমেছি। আমাদের ঘরের কাছের বুড়িগঙ্গা কি তার প্রাক্তন স্বাস্থ্য, রূপ বজায় রাখতে পেরেছে? লোভী, বিবেকবর্জিত কিছু লোকের ফাঁদে পড়ে সে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তার দিকে তাকালে বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে পড়ে, আমার শৈশবে, এমনকি যৌবনেও বুড়িগঙ্গা যতটা রূপসী, বেগবতী ছিল আজ তার পাঁচ ভাগও নেই। বুড়িগঙ্গা বর্তমানে, হু হু দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুবিন্দাহারা ক্রন্দন। বর্জ্যের সন্ত্রাসে উৎপীড়িত। হায়, প্রাণদায়িনী বুড়িগঙ্গা এখন প্রাণনাশিনী! যত্নের অভাবে সুন্দরী কর্ণফুলিও কুশ্রী হয়ে পড়ছে ক্রমশ, মালিন্য তাকেও গিলে খাওয়ার জন্যে উদগ্রীব। পদ্মা, মেঘনাও কি আগের মতো রূপ বজায় রাখতে পারছে? যাঁরা ওদের আগের উত্তাল যৌবনের রূপ দেখেছেন তাঁরা অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে মেলাতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমার এই উক্তি যদি ভ্রমাত্মক হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি হব আজকের আমি।

নদ-নদীর কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিতে ভেসে উঠছে বন্যাকবলিত ঢাকা শহরের কোনও কোনও মহল্লার কথা। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের কিছু অংশ কেটেছে পুরনো ঢাকার মাহুতটুলি এবং আশেক লেনে। যৌবনে এখন আমি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এ সহ-সম্পাদকের কাজ করছি, তখন প্রথমবারের মতো বন্যার কিছু স্পর্শ অনুভব করলাম সত্তায়। ষাটের দশকেও বন্যা ভুগিয়েছে ঢাকাবাসীদের, বিশেষ করে নীচু জায়গাগুলোর বাসিন্দাদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। তখন আমি আশেক লেনের একটি একতলায় বাস করতাম স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে। ষাটের দশকের বন্যায় এক রাতে কালো, নোংরা পানি আমাদের উঠোন পেরিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। রাতে টের পাই নি, ভোরে চৌকির পা এবং আমার সাধের বুকশেলফ-এর গা-ডোবানো পানি দেখে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে বেশ কিছু ভালো বইয়ের দুর্দশায় বুকের ভেতর এক ধরনের আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করলাম একসঙ্গে অনেকগুলো বই হারানোর ফলে।

দেশজোড়া বন্যার কথা ভাবলে মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত। আমরা শহরবাসীরা একহাঁটু পানিতে হাঁটতেই বিরক্ত হয়ে উঠি, মুখ থেকে অনবরত নিঃসৃত হয় কটূক্তি। কিন্তু যখন বন্যার পানিতে ডুবে-যাওয়া গ্রামগুলোর বিপন্ন মানুষদের দুর্দশার কথা ভাবি, তখন নিজেদের আচরণে লজ্জিত বোধ করি। তাদের বিপর্যয়ের তুলনায় আমাদের ভোগান্তি তো খুবই তুচ্ছ।

আশেক লেনের পানিবন্দি দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও এক ধরনের বিরূপতা মনে জেগে ওঠে। পানিতে ভাসমান নোংরা আবর্জনা, গা ঘুলিয়ে-দেয়া খণ্ড খণ্ড মল এখনও হঠাৎ দৃষ্টিকে ধাক্কা দেয়। সেকালের বিবমিসা একালেও হানা দেয় হঠাৎ কোনও কোনও বৃষ্টিমুখর দিনে। আজ যখন শ্যামলীর গলিতে আমার ঘরের বাইরে দৃষ্টি মেলে দিই বৃষ্টিময় খণ্ডিত আকাশের দিকে, মনে পড়ে অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতার কতিপয় পঙ্‌ক্তি —

> অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।।
> বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
> মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
> ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
> শিরায়-শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।

কিংবা সেই একই কবির অন্য একটি কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে', প্রায়শই আমার স্মৃতিতে জেগে ওঠে প্রদীপের স্নিগ্ধ, ব্যথিত আলোর মতো। শ্যামলীতে ডেরা বাঁধার পর আমাকে আর একহাঁটুর নোংরা পানিতে ভিজে ঘরের দোরে পৌঁছতে হয় নি। অবসারপ্রাপ্ত জেনারেল এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে আমি যে খুব পছন্দ করি, এমন নয়; তবে তাঁর কোনও কোনও কাজের তারিফ না করলে অন্যায় হবে। জেনে শুনে অন্যায় করার প্রবণতাকে আমি প্রশ্রয় দিতে অপারগ। তিনি ঢাকা শহরকে বন্যার দাপট থেকে রক্ষা করার জন্যে

বাঁধ নির্মাণ করার একান্ত জরুরি একটি কাজ করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের রাস্তা তৈরির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছেন। এসব কাজের সুফল দেশবাসী পাচ্ছেন, সন্দেহ নেই। তবে, এসব কাজ করতে গিয়ে দুর্নীতিকে কী মাত্রায় প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ বন্যার উৎপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে না, এজন্যে প্রকৃতিকে ধন্যবাদ। কেননা তার রুদ্র মূর্তি রাজধানী ঢাকা শহরে জাগ্রত হয় নি। জানি না, হঠাৎ কোন দিন সেই মূর্তি কোন রূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রস্তুত, অসহায় নাগরিকদের ওপর। আমি কি বেঁচে থাকব তখন প্রাকৃৎতক তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করার জন্যে? নাকি আমার অজ্ঞাতসারে, আমার অনুপস্থিতিতেই ঘটবে এক ধরনের প্রলয়। কে বলবে? এসব প্রশ্ন মনে জাগলে মন চরম বিষণ্ণতা কবলিত হয়ে পড়ে। হিংস্র শূন্যতা আমাকে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় আঁচনাতে থাকে। ভীষণ রক্তাক্ত হয়ে পড়ি। দম বন্ধ হয়ে আসে আমার।

শ্যামলীর একটি গলির শেষপ্রান্তে আমার বিনীত নিবাস দাঁড়িয়ে আছে কোনও সাধকের মতো, যে অনেকের মধ্যে থেকেও যেন কেমন নিঃসঙ্গ, আলাদা। কোনও জাঁকজমকের বালাই নেই তার। একজন বাউলের মতোই সাদাসিধে লেবাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কোণে একতারা হাতে। সেই একতারার সুর সবাই শুনতে পায় না, কেউ কেউ শোনে খাঁ খাঁ দুপুরে কিংবা গহীন রাতে। কেউ যদি শুনতে না পায় তাহলে আমার কোনও খেদ নেই। অন্তত আমি তো শুনতে পাই খোলা মাঠের হৃদয় থেকে উঠে-আসা মন-কেমন করা এক গহীন সুর। সেই একতারা যেন আমার অন্তরাত্মায় সুরের মায়াজাল বুনতে থাকে।

সেসব মুহূর্তে আমার মনে এক স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়। যেন আমি নিজেও তৈরি হতে থাকি নানাভাবে। তখন কবিতা রচনার তাগিদ প্রবল হয়ে ওঠে মনে। কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ি কখনও ভোরবেলা কিংবা মধ্যদুপুরে, কখনও সন্ধ্যাকালে, কখনওবা নিঝুম মধ্যরাতে। কবিতা রচনার কোনও নির্ধারিত সময় নেই আমার।

প্রকৃতি উন্মুক্ত হাতে দান করে মানুষকে। গাছের সবুজ পাতা, নানা জায়গায় বিরানায় প্রস্ফুটিত হয় রঙবেরঙের ফুল। কখনও কখনও পথ চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই নিঃসঙ্গ একটি গাছের শাখায় পাতার নাচন কিংবা নাম-না-জানা ফুলের সৌন্দর্য দেখে। প্রকৃতির কাছে সেই মুহূর্তে কৃতজ্ঞ বোধ করি ওর অকৃপণ দানের জন্যে। আমি যে গলির বাসিন্দা সেখানে গাছের সংখ্যা কম, কেউ কেউ দালানের সীমা বাড়ানোর দুর্মর তাগিদে কোনও কোনও কৃষ্ণচূড়ার গাছ কেটে ফেলেছেন। এতে শ্যামলীর গলিটির শোভা অনেকাংশেই লুপ্ত হয়েছে। আশেপাশে একটি কি দু'টি গাছ সবিনয়ে নিজেদের অস্তিত্ব নিবেদন করছে এলাকাবাসী পথচারীদের প্রতি। ফুলের ছোটো বড়ো গাছ নেই বললেই চলে। হয়তো এলাকাবাসী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতোই মনে করেন, 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'। এলাকায় বৃক্ষের দুর্ভিক্ষের জন্যেই এখানে পাখি তেমন আসে না। আমি এই পাড়ায় এগারো বছর কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার একবারও কোকিলের ডাক শুনি নি। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কাক এবং চড়ুই-এর ডাক শুনতে পাই।

ঢাকার আকাশ থেকে চিল তো অনেক আগেই গায়েব। প্রকৃতিকে বেপরোয়াভাবে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছি আমরা। এই প্রক্রিয়া কায়েম থাকলে একদিন হয়তো আমরাই বিলুপ্ত হব রুষ্ট, ক্রুদ্ধ প্রকৃতির প্রহারে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই আমাদের পরিবেশকে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর রাখা উচিত আমাদের প্রত্যেকের। ঝড়-বৃষ্টি হবে, খরার প্রতাপ আমাদের সইতে হবে, কিন্তু তা বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রকৃতি যাতে আমাদের দিকে সস্নেহে তাকায়, আমাদের লালন করে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে, সেজন্য উদ্যোগী হতে হবে, ওর ভালোবাসা যোগ্য করে তুলতে হবে আমাদের। নইলে সমূহ সর্বনাশ গিলে খাবে আমাদের। আমরা সর্বনাশা বাদামি বৃষ্টি চাই না; চাই শুভ্র জলধারা, নানা রঙের ফুল, সতেজ ফল, মাইল মাইলব্যাপী ক্ষেতের সোনালি ফসল।

## ॥ পঞ্চাশ ॥

ঢাকা শহরে ক্রমাগত কয়েকদিন হাঁটু ও কোমর-ডোবা পানি পেরিয়ে অফিসে যাওয়া এবং ফিরে-আসার ধকল সামলানোর কসরতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জীবনযাত্রা। সেই পানি স্বচ্ছ এবং সুগন্ধময় ছিল না। আমরা শহরবাসীরা এক-হাঁটু পানি ভেঙে কোথায় গেলে হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু বাংলাদেশের এমন অনেক গ্রাম আছে যেগুলো বন্যার পানিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত থাকে অনেকদিন। কুটিরের মাথায় ক্ষণকালের ডেরা বেঁধেও স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। যে-কোনও মুহূর্তে শিশু হয়তো গড়িয়ে পানিতে পড়ে ডুবে যেতে পারে। বিষধর সাপ হয়তোবা দংশন করতে পারে কোনও বন্যার্তকে। শহরে বন্যার পানি হামলা করলে আমাদের যত দুর্ভোগই হোক, বানে ডুবে-যাওয়া গ্রামবাসীদের দুরবস্থার তুলনায় নাগরিক অসুবিধা হলো রীতিমতো নস্যি।

কিন্তু বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় যখন আঘাত হানে, তখন সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্গতির কথা ভাবলে মন এমন বেদনার্ত হয়ে যায় যে, ঢাকার বন্যা-প্রসূত নিজেদের কিছু অসুবিধার জন্য খেদ কিংবা অসন্তোষ প্রকাশ করা অপরাধ বলে মনে হয়।

মনে পড়ছে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের মহাপ্লাবন ও ঘূর্ণিঝড়ের কথা। নভেম্বরের ১২ তারিখ বাংলাদেশের উপকূলে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে. এরকম একটি আবহাওয়া-পূর্বভাস প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই পূর্বাভাস কোনও মহলেই তেমন গুরুত্ব পায় নি। সেই সময় ঢাকা মেতেছিল এশীয় কার র্যালির উত্তেজনায়। তুরস্ক থেকে কার র্যালির ঢাকায় এসে পৌঁছুনোর কথা। 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর বার্তা সম্পাদক আবদুল তোয়াব খান, বর্তমানে যিনি 'দৈনিক জনকণ্ঠ'-এর উপদেষ্টা সম্পাদক, উপকূল এলাকার মফস্বল সাংবাদিকদের সতর্ক করে রেখেছিলেন যেন কিছু ঘটলেই 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর বার্তা বিভাগকে জানানো হয়। তখন আমাদের পত্রিকার অন্যতম স্টাফ রিপোর্টার আহমদ নজির তাঁর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালিতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। আমাদের বার্তা-সম্পাদক-আবদুল তোয়াব খান তাঁকেও পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। আমাদের বার্তা-সম্পাদকের যোগ্যতা

ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর মধ্যে যে নৈপুণ্য এবং তৎপরতা আমরা লক্ষ করেছি, তা শত্রুও উপেক্ষা করতে পারবে না। বস্তুত আমাদের মাননীয় সম্পাদক মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ম্যানেজিং এডিটর এবং উর্দু কবি মরহুম আহসান আহমদ আশক, বার্তা বিভাগের অনেকেই, সম্পাদকীয় বিভাগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে পাঠকসমাজে সমাদৃত ছিলেন তো বটেই, সাংবাদিকতাতেও সুনাম অর্জন করেছেন। মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান, মরহুম সানাউল্লাহ নূরী, মরহুম আহমদ হুমায়ূন, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ এবং শামসুর রাহমান সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে ছিলেন নিষ্ঠাবান ও দক্ষ।

যা হোক, বার্তা সম্পাদক-এর দূরদর্শিতা এবং তৎপরতার ফলে আমাদের অফিসে ঘূর্ণিঝড়ের শুরুতেই খবর এসে যায়। মহাদুর্যোগের ভয়াবহতা আঁচ করতে পারলেও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত খবর তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় নি। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার দরুন তৎক্ষণাৎ ছবি সংগ্রহ করার উপায় ছিল না। ফলে খবরটি 'লাখো মানুষের প্রাণহানি', এই অনির্দিষ্ট শিরোনামে হাতে লেখা প্রকাণ্ড অক্ষরে একমাত্র আমাদের পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিল। খবরের সঙ্গে উপকূলীয় দুর্যোগের পুরনো ছবি কেটে নিয়ে ঝড়ের একটি আভাস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই উপদ্রুত এলাকায় 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সুদক্ষ ফটোগ্রাফার মরহুম গোলাম মাওলা এবং মরহুম আকিল খানকে পাঠিয়ে দেয়া হয় নতুন ছবি তোলার উদ্দেশ্যে। রিপোর্টারদের প্রায় সবাইকে উপদ্রুত এলাকায় পাঠানো হয়। ছবি ছাপানোর ব্যাপারে বার্তা-সম্পাদক আবদুল তোয়াব খান এবং প্রধান সহ-সম্পাদক ফওজুল করিম (তারা মিয়া) ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, তখন সহ-সম্পাদক সালেহ চৌধুরীও পত্রিকায় ফটো স্থাপনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

'গোর্কি' অর্থাৎ সেই ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসের পর 'দৈনিক পাকিস্তান' এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, আমাদের চারআনা দামের পত্রিকা আড়াই টাকায় বিক্রি হয়। আমাদের মেশিনে পত্রিকার পঁচাশি হাজার কপির বেশি ছাপানোর সামর্থ্য ছিল না। 'দৈনিক পাকিস্তান' প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও যে কোনও প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক জাতীয় দুর্যোগে যে ভূমিকা রেখেছে, তা পত্রিকাটির কঠোর সমালোচকদেরও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, উপকূল এলাকার অধিবাসীরা ঘূর্ণিঝড় এবং সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসকে 'গরকি' বলে থাকেন। 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর অন্যতম সহকারী সম্পাদক মরহুম সানাউল্লাহ নূরী আমাদের পত্রিকায় সর্বপ্রথম আঞ্চলিক 'গরকি' ব্যবহার করেন তাঁর লেখায়।

সেই সময় 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর প্রত্যেক সাংবাদিক এবং সাধারণ কর্মচারী অসামান্য ভূমিকা পালন করেন, এ-কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। আজ এতকাল পরেও সেই সময়ের অফিসের প্রত্যেকের দায়িত্ব পত্রিকাটিকে, বলা যেতে পারে, একটি জীবন্ত, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছিল। আমরা অনেকে নিজ কাজ শেষ করার পরেও দুর্যোগ-মথিত উপকূল এলাকার আরও কোনও খবর জানার জন্যে থেকে যেতাম অফিসে।

আমাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'গোর্কি'র আক্রমণের পরে একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেটি 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক বিশেষ সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল। সেই নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি —

মহাপ্রলয়ের ঘূর্ণিঝড় ও ফুলে ওঠা সমুদ্র তরঙ্গের প্রলয়-নাচন এ যে কত বড় ভয়াবহ ব্যাপার, দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগে এবার তার নিষ্করুণ স্বাক্ষর রেখে গেছে। ইতিপূর্বে বহুবার পৃথিবীর বুকে মানুষের ব্যাপক মৃত্যুর স্বাক্ষরকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করতে আমরা দেখেছি। কিন্তু একই দিনে এত অত্যল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন আকস্মিক মৃত্যুর কাহিনী ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যাপক মৃত্যুও এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।...

ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তার আকস্মিক থাবার আঘাতে লাখ লাখ আদম সন্তানের জীবনাবসান ঘটিয়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে আরও লাখ লাখ জীবন্মৃত মানুষ। ...ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া যাচ্ছে দীর্ঘদিনের অনাহারে কদাহারে এদের অনেকে মরেছে। মরতে বসেছে। এদের এই মৃত্যুর জন্য প্রকৃতিকে নিশ্চয়ই দায়ী করা যেতে পারে না — আগেকার মহা মন্বন্তরের মৃত্যুর মতো এদের মৃত্যুও মেন-মেড। এদেশের মানুষের, বিশেষ করে শাসকগোষ্ঠীর অপরিহার্য কর্তব্য ছিল এই জীবন্মৃত মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা।... রিলিফ কমিশনার স্বীকার না করলেও, ইতিমধ্যে যে তাদের গাফিলতির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে — একটু সহৃদয় চেষ্টা চালালেই তাদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল না। এই 'মেন-মেড' মৃত্যুর দায়িত্ব তাঁরা এড়াবেন কী করে।

'গোর্কি' প্রসূত নানা বিপর্যয় এবং সমস্যা নিয়ে দৈনিক পাকিস্তান সেকালে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। বিশেষ সংখ্যাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন সালেহ চৌধুরী। সেই বিশেষ সংখ্যায় আমাদের অনেকের লেখা তো ছিলই, ফটোগ্রাফার গোলাম মাওলা এবং আকিল খানের তোলা অনেক ছবিও ছিল। সেকালে এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, মনে পড়ে। জানতে পেরেছি, অনেক পাঠকের কাছেই সংরক্ষিত আছে সেই বিশিষ্ট সংখ্যাটি। এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করছে, কার্ডিফ-এর টমসন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ডি.জি.এইচ রোনাল্ডস তখন ঢাকায় এসে আমাদের পত্রিকার ঘূর্ণিঝড়বিষয়ক সংখ্যাগুলো দেখে এমনই মুগ্ধ হন যে, সেগুলি তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে যান। সেগুলো আজও সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে সাংবাদিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে।

'গোর্কি' বিধ্বস্ত উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শন করা তো দূরের কথা, পাকিস্তান-এর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চিন সফরের পর ঢাকা এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে আরাম না করেই প্লেন থেকেই কিছু সরকারি কর্মচারীর উদ্দেশে হাত নেড়ে উড়ে চলে যান। মাওলানা ভাসানী উপদ্রুত এলাকা সফর করে লাখ লাখ মানুষের লাশ ও দুর্দশা দেখে

ঢাকায় ফিরে এসে এক জনসভায় অসামান্য এক বক্তৃতা দেন পল্টনের ময়দানে উৎসুক শ্রোতাদের উদ্দেশে। তিনি পাকিস্তান-এর ইয়াহিয়া খান এবং তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের লক্ষ করে শূন্যে হাত তুলে উচ্চারণ করেছিলেন 'ওরা আসে নি'। এই একটি বাক্যই যথেষ্ট ছিল পাকিস্তানি শাসকদের ধিক্কৃত করার জন্যে। আমি সেদিনের গণনায়ক মৌলানা ভাসানীর হাত তোলা দেখে, তাঁর বক্তৃতা শুনে একটি কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হই সে-রাতে। কবিতাটির নাম 'সফেদ পাঞ্জাবি' —

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহা-প্লাবনের পর নূহের গম্ভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলিময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদ দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ।

আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনও
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।
ঝাঁকা-মুটে, ভিখিরি, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজ সেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফেরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানি;
সমস্ত দোকান-পাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকশা, ট্যাকসি, অতিকায় ডবল-ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, দপ্তর
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ এ কী মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।

বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার,
অতিদ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,

যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত, বে-আব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতাটি তখন ফজল শাহাবুদ্দীন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'চিত্রিতা'য় প্রকাশিত হয়। শুনেছি কবিতাটি মৌলানা ভাসানী পড়েছিলেন। 'চিত্রিতা'র যে সংখ্যায় 'সফেদ পাঞ্জাবি' প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যাতেই নন্দিত নেতা মৌলানা ভাসানীর একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন ফজল শাহাবুদ্দীন। জানতে পেরেছিলাম, কবিতাটি মৌলানা ভাসানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি খুশি হয়েছিলেন। আমার খোঁজখবরও নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় নি 'সফেদ পাঞ্জাবি'র কবি।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। তখন আওয়ামী লীগের অনেকেই মনে করেছিলেন যে, যাতে নির্বাচন ভণ্ডুল হয়ে যায়, সেজন্যে ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক সংবাদ অতিরঞ্জিত রূপে সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিব 'গোর্কি'র তাণ্ডবের ভয়ংকর দৃশ্যাবলি স্বয়ং দেখে আসার পর এই ভুল ধারণার অবসান ঘটে। উপদ্রুত এলাকা সফর করে ফিরে এসে ১৯৭০ সালের ২৮ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে দশ লাখ লোক মারা গেছে, স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলার আরও ১০ লাখ প্রাণ দেবে।'

'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতাটি আমি 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রহণ করি নি। তখন কবিতাটি তেমন ভালো মনে হয় নি আমার। সেই কবিতাহীন 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সঙ্কলনটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন উৎসাহী, বোদ্ধা পাঠক এই ব্যাপারটি নিয়ে পত্রিকায় পত্র লেখেন। তাঁদের পত্রাঘাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, কখনও কখনও খোদ কবিও তাঁর কবিতার গুণ বুঝতে অপারগ। তবে এ যাবৎ আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ছয়টি সংস্করণের পরবর্তী পাঁচটিতেই 'সফেদ পাঞ্জাবি' সংকলিত রয়েছে।

আশ্চর্য এই কাব্যজগৎ, বড়ো রহস্যময় এর গতিবিধি। আজ যে কবিতা নিয়ে পদ্যের আসর গুলজার, কাল তা বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত হয়। আজ যে কবিতা উপেক্ষিত, কাল তা বহু লোকের কণ্ঠে ও মনে গুঞ্জরিত হয় বারবার। কখনও কখনও কাব্যবিচারে জাঁদরেল সমালোচকগণ প্রতারিত হন। যিনি প্রকৃত কবি, তাঁকে হতে হবে প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি উদাসীন থেকে সদিচ্ছা ও বিবেককে জাগ্রত রেখে কবিতার খাতায় খাতায় পঙ্‌ক্তিমালা রচনা করা। সত্যিকারের সাধনা পথে মুখ থুবড়ে পড়বে না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

## ॥ একান্ন ॥

এই আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে একটি সত্য বার বার উদ্‌ভাসিত হয়েছে যে, স্মৃতি বড়ো বেয়াড়া, কোনও নিয়মশৃঙ্খলার তোয়াক্কা করে না। কখনও কখনও খুব তালগোল পাকিয়ে যায়। পরবর্তীকালের কথা আগে গলা বাড়িয়ে দেয়, বর্তমানের কোনও কোনও কথা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির ধু-ধু প্রান্তরে। সেজন্য এক ধরনের অস্বস্তি, খেদ হয়। অথচ

আমার প্রায় সমবয়সি কিংবা আমার চেয়েও অধিক বর্ষীয়ান ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি কত প্রখর, তারা সাবলীলভাবে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা খুঁটিনাটি ঘটনা প্রায় মুখস্থের ধরনে বলে যেতে পারেন। কখনও হোঁচট খান না, কিংবা স্মরণ করতে গিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে মাথা চুলকোন না। কবুল করতেই হবে আমার স্মৃতির চেয়ে বিস্মৃতির ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তৃত। বহু কষ্টে কোনও কোনও স্মৃতি উদ্ধার করতে পারি বটে, কিন্তু বিস্মৃতির বহর এমনই প্রসারিত যে, নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। স্বেচ্ছায় ধিকৃত হইও বটে মাঝে মাঝে। কিন্তু আত্মধিক্কার সমস্যা সমাধানে কোনও ভূমিকা রাখতে অপারগ হয়।

এই তো আমাদের উপকূল এলাকায় ১৯৭০ সালে। 'গোর্কি'র ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের কথা লিখতে গিয়ে বেমালুম কিছু তথ্য ভুলে গিয়েছিলাম। এখন সে বিষয়ে কিছু লিখে আমার ত্রুটির মাত্রা লাঘব করতে চাই। গোর্কি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানার খবর প্রথমে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর প্রথম পাতায় অসাধারণ স্থূলাক্ষরের হেডিং দিয়ে ছাপা হয়। এই প্রশংসনীয় সাড়াজাগানো কাজটি করা সম্ভব হয়েছিল 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সদা-তৎপর বার্তা-সম্পাদক তোয়াব খান, তরুণ, চটপটে স্টাফ রিপোর্টার হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ-এর কর্মদক্ষতার জন্য। এই প্রসঙ্গে ভূঁইয়া ইকবালের কথা বলতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার ছিলেন। তিনি সেই মহাদুর্যোগকালে তার পিতার কর্মস্থল ভোলায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন। সেখান থেকে ভূঁইয়া ইকবাল কষ্টেসৃষ্টে টেলিফোনে কিছু খবর দৈনিক পাকিস্তানের অন্যতম সহকারী সম্পাদক আহমদ হুমায়ূনকে জানাতে পেরেছিলেন। তবে এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে গোর্কিবিধ্বস্ত এলাকায় যে ভয়াবহ, মর্মন্তুদ দৃশ্যাবলির বিবরণ দৈনিক 'পাকিস্তান'-এ হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের অসামান্য রিপোর্ট ও ফটোগ্রাফার গোলাম মাওলারা তোলা ছবিতে প্রকাশিত হয়েছিল তা এই পত্রিকাটির শ্রেষ্ঠ অবদানের অন্যতম মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। বার্তা সম্পাদক তোয়াব খান প্রতিদিন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং তাঁর রিপোর্টের তারিফ করতেন। তোয়াব খানের মতো স্বল্পবাক ব্যক্তির প্রশংসা অর্জন সাধারণ ব্যাপার নয়। গোর্কি-বিধ্বস্ত উপকূল এলাকা বিষয়ে আমি যে সামান্য কয়েকটি কথা বলে শেষ করে দিলাম তাতে হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ এবং 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের ভূমিকাকে আমি খাটো করে দেখছি না। তখন অনেকেই কাজ করেছেন নিবেদিত চিত্তে। কিন্তু এ-কথাও তো অস্বীকার করলে চলবে না যে, গোর্কি-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সশরীরে হাজির থেকে তার বিবরণ ইত্যাদি রচনা করা খুব সহজ কথা নয়। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই, মোরশেদ অসামান্য সঙ্গীত সাধক, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল চেতনায় আলোকিত ওয়াহিদুল হকের সহযাত্রী ছিলেন গোর্কি-বিধ্বস্ত এলাকা থেকে খবর সংগ্রহের অন্তর্তাগিদে। অফিসের দায়িত্ব পালন না করতে হলেও ওরা দু'জন সেই অঞ্চলে যেতেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যারা ঢাকা শহরে 'গোর্কি'র ভয়ঙ্কর থাবার আওতার বাইরে নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করছিলাম তারা গোর্কি-আক্রান্ত এলাকাবাসীর সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার না হলেও

তাদের সর্বনাশ, ক্ষয়ক্ষতির পরিণতি আন্দাজ করতে সক্ষম ছিলাম। আমরা অনেকেই ভুখমিছিল বের করে ঘন্টার পর ঘন্টা পথে পথে ঘুরে জনসাধারণের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর অনেকেই ভুখমিছিলে শামিল ছিলাম। আমাদের সংগৃহীত টাকাকড়ি গোর্কি-আক্রান্ত অধিবাসীদের ক্ষতি ও প্রয়োজনের তুলনায় সিন্ধুতে বিন্দুর চেয়ে এক রত্তি বেশি যে নয় তা আমরা জানতাম। তবু বিপন্ন ব্যক্তিদের দিকে তুচ্ছ উপহারটুকু হাজির করা আমরা কর্তব্য মনে করেছিলাম। সেই প্রথমবারের মতো পথচারীদের কাছে হাত পেতেছিলাম গোর্কি-আক্রান্ত দুর্গতদের সাহায্যার্থে। সত্যি বলতে কী, স্বভাব-লাজুক আমি সহকর্মীদের সঙ্গে ভুখমিছিলে যুক্ত হয়ে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা, কুণ্ঠা কিছুই বোধ করি নি সেদিন। বরং দুর্গতদের জন্য যত তুচ্ছই হোক, কিছু কাজ করার তৃপ্তি বোধ করছিলাম।

তখন আমি একাধিক কবিতা লিখেছিলাম গোর্কি-আক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে, মানব মানবীর দুর্ভোগ নিয়ে। আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না, কবিতা ঘূর্ণিঝড় থামাতে অক্ষম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার বাসিন্দাদের খাদ্যদানে অসমর্থ, কোনওরকম ব্যাধি সারানোয় অকেজো। কিন্তু কোনও কোনও কবিতা, এ-কথাও সত্য, কারও কারও ব্যথিত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোতে সক্ষম। কোনও কোনও দীপ্তিমান কবিতা অবশ্য কাউকে কাউকে, কখনও অনেককে অনুপ্রাণিত করতে পারে, কোনও কোনও কবিতা শোকার্তের শোক কিছুক্ষণের জন্যও লাঘব করে। এই ক্ষমতা খুব কম কবিতারই থেকে। যা হোক, আমি নিজেকে ভারমুক্ত করার তাগিদেই গোর্কি-আক্রান্ত এলাকাবাসীর বেদনামথিত অনুভূতিকে অবলম্বন করে তিন চারটি কবিতা লিখেছিলাম। সেই কবিতাবলির একটি হল 'আসুন আমরা আজ' —

> আসুন আমরা শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করি আজ,
> আমরা সবাই যারা কেমন দৈবাৎ বেঁচে গেছি;
> আসুন আমরা আজ নীরব দাঁড়াই যথারীতি
> সকাতর কিছুক্ষণ লক্ষ লক্ষ মৃতের সম্মানে, —
> আমাদের বহুকাল এভাবে দাঁড়াতে হবে বুঝি!
> চলুন শামিল হই আজ শোক-মিছিলে সবাই,
> পথে মেলি কালো বস্ত্র 'ভিক্ষা দাও পুরবাসী' ব'লে —
> শহরে উঠুক বেজে শোকাতুর হারমোনিয়াম।
> খোলা ছাদ, কবুতরময় মসজিদের গম্বুজ,
> জীর্ণ বাস, গার্বেজের ডাম্প আর পোস্টার, ব্যানার,
> নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, পুরনো পাঁচিল শোক নয়,
> জ্যোৎস্নারাত, ফুটপাত, ডাকবাক্স, পিয়নের খাকি
> জামা, নদী নালা কিংবা পিয়ালের ডাল শোক নয়,
> কচুরিপানাও নয়, বাবুই পাখির বাসা, সর্ষেক্ষেত,
> নৌকার নয়ন, ডুরে শাড়ি অথবা নয়ানজুলি
> শোক নয়; শোক জানি বাস্তবিক অবয়বহীন।

তবু শোক হয়ে যায় অকস্মাৎ অনেক কিছুই।
মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার একান্ত ছায়াখানি
শোক হ'য়ে ব'সে থাকে এক কোণে, পথ হাঁটে আর
হাতের তালুতে বারবার দেখে নেয় জলোচ্ছ্বাসে
কর্দমাক্ত দ্বীপপুঞ্জ, জনপদ, উদগ্র শকুন।

চাদ্দিকে সতেজ ঘ্রাণ কাফনের; অনেক জায়গায়
দাফনের জন্য কোনও লোক নেই। আমার পকেটে
দু'টি মৃত গ্রাম্য শিশু, গলায় ঝুলছে যুব-লাশ,
আঙুলে জড়ানো লজ্জাবতী বিবস্ত্র বধূর চুল।
আমার হৃদয় হয় অগোচরে রুক্ষ মরুভূমি,
যোজন যোজনব্যাপী অতিশয় উদার শ্মশান!

ভোরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সংবাদ প'ড়ে
আর ফটোগ্রাফারের একান্ত বাস্তবপ্রীতি দেখে
রেডিওতে কবিতা আবৃত্তি ক'রে ডবকা দুপুরে
পঁয়ত্রিশ টাকার একটি সবুজাভ চেক নিয়ে
সিনেমায় বিজ্ঞাপন, নির্বিকার ভিড় দেখে বাড়ি
ফিরি একা প্রতিশ্রুত চকোলেট ছাড়াই উদাস।
খেতে বসি, রাত হ'লে শুতে যাই, অভ্যাসবশত
নিবিড় জড়াই ক্লান্ত গৃহিণীর নিদ্রাপ্লুত গলা।
অকস্মাৎ খাঁ খাঁ কাফনের ঘ্রাণে স্বপ্নের মধ্যেই
মেলায় হারিয়ে-যাওয়া বালকের মতো কেঁদে উঠি।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের রিপোর্ট এবং গোলাম মাওলার ক্যামেরায় তোলা গোর্কি-বিধ্বস্ত এলাকার ছবি পাঠকদের মনে যে গভীর দাগ কেটেছিল, তা আমি বিশ্বাস করি। কারণ তখনকার রিপোর্ট এবং ফটো আমাকে বেদনাবিহ্বল এবং নীরব হাহাকারময় করে তুলেছিল। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ তাঁর একটি রিপোর্টে লিখেছেন যে, দুর্গত এলাকায় গোটা পরিবার-হারানো খাঁ খাঁ প্রান্তরে বসে-থাকা এক ব্যক্তিকে বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম, 'কেমন আছেন?' সেই প্রশ্ন-আক্রান্ত সর্বহারা মানুষটি ক্রোধে জ্বলে উঠে মোরশেদের শার্টের কলার ধরে ওকে জমি থেকে সামান্য উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন। ফলে খ্যাতিমান স্টাফ রিপোর্টার দু'চোখে তারা দেখতে শুরু করেন ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে। কিন্তু শোকে প্রায় উন্মাদ লোকটি আমাদের সহকর্মীকে কোনওরকম আঘাত করেন নি। প্রশ্নটি করে তিনি যে চরম আহাম্মকি করেছিলেন সেটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তৎক্ষণাৎ। তবে নিজের এই অনাবশ্যক বোকামিটুকু তিনি সবার কাছ থেকে আড়ালে রাখতে পারতেন সহজেই। কিন্তু তিনি সে-পথে যান নি, সততা এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছেন অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে।

আমি কখনও গোর্কি-আক্রান্ত এলাকায় যাই নি। কিন্তু 'দৈনিক পাকিস্তানে' প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট এবং ছবি দেখে বুঝতে পেরেছি সেই প্রাকৃতিক তাণ্ডবের এবং মানুষের দুর্গতির কথা। খবরের কাগজে মুদ্রিত নানা ছবি, মোরশেদের রিপোর্ট এবং আমার সামান্য কল্পনাশক্তি আরও একটি কবিতা লিখিয়ে নিল আমাকে দিয়ে। কবিতাটির নাম 'একজন জেলে' —

সমুদ্রে যাবো না আর কোনও দিন; সমুদ্রে হাঙর,
ঘূর্ণি, গর্কি সেই রাক্ষুসীর পেটে আমার ডাঙর
ছেলেমেয়ে, বউ আর জোয়ান ভাইটা গেছে, শুধু
আমি একা পড়ে আছি। মাথার ভিতর কী যে ধু-ধু
করছে ক'দিন ধ'রে। এদিক ওদিক ছুটি, ভিটেমাটি
কোথাও পাই না খুঁজে। চারদিকে শূন্যতার ঘাঁটি।

সেই ছেলেবেলা থেকে জলের দিকেই ছিল মন;
জলে জলে গেছে বেলা, মুগ্ধতায় যখন তখন
ছুঁয়েছি সাগর জল আর আয় মাছ ধরি আয়
ব'লে ভাসিয়েছি ডিঙি নদীতে রঙিনা দরিয়ায়।
এই লোনা সমুদ্দুর ছেড়ে আমি কোথাও যাই নি,
অথচ আমারই সব নিলো কেড়ে মাতাল ডাইনি।

এসব বলছি কী-যে! না, না, ঘর-দোর সবই আছে।
এই তো ছেলেটা দৌড়ে উঠোন পেরুলো, লম্বা গাছে
ডাকছে কুটুম পাখি, বউ রাঁধে, মেয়েটা তেঁতুল
খাচ্ছে আর ভাই জাল দিচ্ছে মেলে। হায়, শুধু ভুল
হ'য়ে যায়, যেন ফের সামুদ্রিক ঘন কুয়াশায়
হারিয়ে ফেলেছি সব মাথা কেমন গুলিয়ে যায়।

আচ্ছা, আপনারা কেউ দয়া ক'রে আমার সঠিক
নামটি দেবেন ব'লে? কেবলি ঘুরছি দিগ্বিদিক
পড়ে না নিজেরই নাম মনে। নিজেকে কী নামে ডাকি?
আমি কি রসিক দাস? বিশু? জগদিন্দ্র মালো? নাকি
আলী মৃধা? কতো না বয়স হলো? সবদর গাজী
হয়তো-বা এই আমি। আসলে সক্কলই ভোজবাজি।

কী যেন লাফিয়ে ওঠে অগোচরে মনের ভেতর —
অত্যন্ত উজ্জ্বল কিছু, কী ক'রে ভাববো তাকে পর?
ত্রাণসামগ্রীর ঝলকানি? সে যে সু-স্বপ্নের মতো,
একটি বিশাল মাছ সামুদ্রিক, শূন্যে কেলিরত।
এখন মাছের চিন্তা! ভুলি না জালের কীর্তি, মাছ
আমাকে উড়িয়ে নেয় মেঘে, রাঙা গাঙে, দেখি নাচ

একজন মৎস্যরমণীর, আমাকে কোমল ডাকে।
প্রকৃত আহার্য নয় তারা, স্মৃতিবৎ ভেসে থাকে।

আমি তো জলেরই লোক চুপচাপ থাকা দায় ঘরে,
ডিঙি বেয়ে বারবার যাবো আমি সুনীল সাগরে।

এ-কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে গোর্কি'র ভয়াবহ তাণ্ডবের পর অনেকদিন পর্যন্ত আমার দৃষ্টিপথে মাঝে মাঝে ভেসে উঠত ভেজা মাটিতে পড়ে-থাকা নারী-পুরুষ আর শিশুদের লাশ। সেসব দৃশ্য যে আমার মনে বেদনা সঞ্চার করত, মানুষের অসহায়তা, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাকেই প্রকট করে তুলত তা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেকালে বহুদিন সত্যি-সত্যি শান্তিতে, স্বস্তিতে পুরোপুরি ঘুমোতে পারতাম না। মৃত্যুর ঘ্রাণে অস্থির হয়ে পড়তাম কখনও সখনও। মাঝে মাঝে নির্ঘুম প্রহরে ভাবতাম, না, গোর্কি কিংবা ঘূর্ণিঝড় আমাদের উপকূলকে আঘাত হানে নি। এই তো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে উপকূলবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নানা ছবি। জেলে জাল হাতে নিয়ে ছিপছিপে নৌকোয় বসে যাত্রা করেছে মাছ শিকারের অভিযানে, একজন কিশোরী উঠোনে দাঁড়িয়ে শব্রি আম খাচ্ছে, ক'জন বালক বালিকা মহানন্দে খেলায় মেতে উঠেছে, একজন যুবতি কাঠের চিরুনি দিয়ে দীঘল চুল আঁচড়াচ্ছে, একজন স্বাস্থ্যবতী মা তার শিশু সন্তানকে ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনাচ্ছে, একজন বুড়ো হুকো টানছেন পরম তৃপ্তিতে। কিন্তু পরক্ষণেই এইসব শান্ত, নিরিবিলি দৃশ্য মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। অন্ধকার উপহার দেয় হু হু বাতাস, মানুষ এবং পশুর অজস্র মৃতদেহ, বিলুপ্ত সংসারের নিঃশব্দ বিলাপ।

## ॥ বাহান্ন ॥

আজ কলম নিয়েই যেসব কথা লিখতে হচ্ছে অর্থাৎ সদ্য-প্রয়াত ইলা মিত্র সম্পর্কিত আমার কিছু স্মৃতির বিবরণ, যা আগেই লেখা উচিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর মৃত্যু আমাকে দিয়ে এখনই যেসব লিখিয়ে নিচ্ছে। প্রথমবার আমি তাঁকে দেখি কলকাতায় একটি অতি-সাধারণ, আটপৌরে ফ্ল্যাটে। তাঁর স্বামী এবং নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট রমেন মিত্রকেও প্রথম দেখি এই ছোটো ঘরে। কলকাতাবাসী এক তরুণের সঙ্গে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেই তরুণের নাম গৌতম রায়।

লেখক এবং সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত থাকতেন ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্রের বাসস্থানের কাছেই একটি ছোটো, উপেক্ষিত লেনিন ইশকুলের এক কোণে একটি খুদে হতদরিদ্র ঘরে। সেই ঘরটি দেখে মনে পড়ছিল ডস্টয়ভস্কির 'নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড' শীর্ষক বড়ো গল্পটির নায়কের ভূগর্ভস্থ হতশ্রী সঙ্কীর্ণ কামরার কথা। ঘরে একটিমাত্র কৃপণ চৌকি। একজনমাত্র বাসিন্দা কোনওমতে কষ্টেসৃষ্টে শুতে পারে সেই চৌকির বিছানায়। তবে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারে তিন চারজন। আমাকে দেখে রণেশ দা' খুব খুশি হলেন এবং আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন হাসিমুখে। ঢাকার অনেকের কথা জানতে চাইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করার পর বললাম, 'আমি ইলা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' রণেশ দা'র এই জায়গার খুব কাছেই ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্রের বাসস্থান।

তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমার সঙ্গী এবং আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তখন দুপুর সাড়ে এগারটা। প্রথমবারের মতো দেখলাম কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই দীপ্তিময়ী কিংবদন্তিতুল্য নেত্রী ইলা মিত্রকে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সেই মহীয়সী সত্তার দিকে। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, তাঁর মুখোমুখি অর্থাৎ প্রগতির, জ্বলজ্বলে ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়ের এত কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি। যেন মহিমার নিশ্বাস অনুভব করছি নিজের সৌভাগ্যবান সত্তায়। রণেশ দা' আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন অমরত্বের অধিকারিণী নাচোলের অগণিত সংগ্রামী কৃষকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্রী ইলা মিত্র এবং তাঁর যোগ্য জীবনসঙ্গী রমেন মিত্রের সঙ্গে। আমাকে বসতে বলে ওঁরা দু'জন আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি যে, রণেশ দা' আমার যা পরিচয় দিলেন তাতে স্বামী-স্ত্রী কারুরই আমাকে তেমন ফালতু লোক মনে হয় নি। লাল কথার ফাঁকে প্লেটে সন্দেশ এবং সিঙারা পরিবেশন করা হলো আমাদের সামনে।

আমি এমনিতেই স্বল্পবাক, তাই আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া অন্য কিছু বলি নি। মুগ্ধ শ্রোতারই ভূমিকা পালন করেছিলাম। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কৌতূহলবশত একটি কি দু'টি প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর জীবনের কোনও কোনও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। তিনি হাসিমুখে উত্তর দিয়েছেন সেসব প্রশ্নের। পিতৃগৃহে তাঁর নাম ছিল ইলা সেন। জমিদার-পুত্র রমেন মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি রূপান্তরিত হলেন ইলা মিত্রে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দু'জনেই মনেপ্রাণে সাম্যবাদী ছিলেন বলেই শুরুতেই ডি-ক্লাসড্ অর্থাৎ শ্রেণিচ্যুত হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ তো করেনই নি, বরং মহামুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন যেন। এ ধরনের যাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল, তাঁদের পক্ষেই মহৎ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব।

নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের একান্ত আপনজন ইলা মিত্র তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন 'রাণীমাতা'। কোনও ভয়ভীতির নয়, ভালোবাসার আলোর প্রভাবের ফলেই সেই অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে এই উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন। যতদিন 'নাচোল' অঞ্চল থাকবে, তেভাগা আন্দোলনের কথা উচ্চারিত হবে, বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে মানুষের মনে, ততদিন ইলা মিত্রের নাম বার বার ধ্বনিত হবে অগনিত দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে। যখন তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে, শুনছিলাম তাঁর কথা, আমার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠছিল নানা ছবি — মিছিলের পুরোভাগে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিবাদী মিছিলে, দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের সামনে, চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম তরুণী ইলা মিত্রকে মুসলিম লীগ সরকারের কারাগারে, দেখছিলাম পাশবিক নিপীড়নের ভয়ংকর দৃশ্য।

তিনি নিজে কোর্টে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় পুলিশী অত্যাচার ও নিপীড়নের যে অমানবিক, হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন, সেই বর্ণনা পাঠ করলে এতকাল পরে আজও শিউরে উঠতে হয়। তিনি আদালতে বলেছিলেন —

> ... তারা আমার মস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে।... দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দু'টি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং

সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বলছিল যে, আমাকে 'পাকিস্তানি ইনজেকশন' দেওয়া হচ্ছে।

একটি রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিল।...আমার চুল উপড়ে ফেলছিল।

...আমার যৌনাঙ্গের মধ্যে একটি গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি আগুনে পুড়ে যাচ্ছি। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

...বুট দিয়ে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো।... তিন চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সিপাই আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করল।...

এই চরম বর্বর ঘটনার কথা পড়লে কিংবা শুনলে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীদের চরম শাস্তিদানের জন্য কোনও রক্ত-মাংসের বিবেকবান মানুষ ক্ষেপে উঠবে না? এই নির্যাতনের এখানেই শেষ নয়, মানুষের বিবেক জাগানো, দেশের নিপীড়ন প্রগতির পথে ছিল যার অক্লান্ত যাত্রা, তাঁর সঙ্গে এই আচরণে বনের পশুরাও লজ্জাবোধ করবে, মানুষরূপী জানোয়ারদের ধিক্কারে জঙ্গল তোলপাড় করে তুলবে! এই বর্বরতার পরেও নরপশুরা ইলা মিত্রকে নগ্ন রেখে কয়েদিদের প্রদর্শনের জন্য তাদের দৃষ্টিপথে হাজির করত। একজন অসামান্য জননেত্রীকে এ ধরনের অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ সইতে হয়েছে মুসলিম লীগ সরকারের তল্পিবাহক কেনা গোলামদের হাতে।

ইলা মিত্র বহুদিন পর ১৯৯৬ সালে ঢাকায় আসেন জননেত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন প্রগতিশীল রাজনৈতিক জগতের কিংবদন্তি ইলা মিত্রকে তাঁর যোগ্য সম্মাননা প্রদর্শন করেন, এ-কথা মনে পড়লে ভালো লাগে। তখন আমি ইলা মিত্রকে ৩২ নং ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দোতলা বাড়িতে দেখি। আমাদের দু'জনের কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর তিনি এবং আমি শেখ মুজিবের একটি বিরাট ছবির দু'পাশে দাঁড়াই একজন ফটোগ্রাফারের অনুরোধে। তিনি আমাদের ছবি তুলে নিলেন সানন্দে। সেই ছবি আমি সযত্নে রেখেছি আমাদের পারিবারিব অ্যালবামে। সেবার ইলা মিত্রকে একটি বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল আমাদের ঐতিহাসিক শহিদ মিনারে। আমি, মনে পড়ে, শওকত ওসমান এবং নাচোল ও তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিশিখার মতো আলোকিত, অদম্য নেত্রী। সেদিন নিজেকে আমার বড়ো ভাগ্যবান এবং সম্মানিত মনে হচ্ছিল। সেই দিনটির, সেই মুহূর্তটির কথা মনে পড়লে কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে, হৃদয় হয় সেতারের মতো ঝঙ্কৃত। জানি না, কার সামনে সেই মুহূর্তে আমার মাথা নত হয়ে এসেছিল।

পরে আরেকবার গিয়েছিলাম এ/৩ গভর্নমেন্ট হাউজিং স্টেট সিআইডি রোড, পদ্মপুকুরে, যেখানে একটি বাসার দোতলায় থাকতেন ইলা মিত্র, রমেন মিত্র এবং তাদের পুত্র ও পুত্রবধূ। দ্বিতীয়বার রমেন মিত্রকে শয্যায় শায়িত দেখলাম। লক্ষ করলাম, তিনি

অত্যন্ত অসুস্থ। আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। আমি বারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। তাঁর হাত তো স্পর্শ করি নি, করেছি একটি প্রগতিশীল, সংগ্রামী কালকে, গৌরবময় ইতিহাসের একটি অংশকে। দৈনিক 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত, যিনি অতীতে 'গণসাহিত্য' নামে একটি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদন করতেন — রমেন মিত্রকে নিয়মিত সেই সাহিত্যপত্র পাঠাতেন। তখন আমি 'গণসাহিত্যে' প্রায় প্রতিমাসে কবিতা লিখতাম। হাসনাত আমাকে দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়ে নিয়েছিলেন। আলাপসূত্রে 'গণসাহিত্য' সম্পাদক আবুল হাসনাত জানিয়েছিলেন, রমেন মিত্র আমার কবিতা এবং প্রবন্ধের প্রশংসা করতেন। এই খবরে, লুকাব না, আমি আনন্দিত এবং গর্বিতবোধ করেছি।

অনেকবছর আগেকার কথা। সেকালে প্রগতিশীল, সংগ্রামী কবি গোলাম কুদ্দুস 'ইলা মিত্র' সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। সেটি একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কবিতার বইটির নাম 'ইলা মিত্র'। সেকালে আমি সেই বইটি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ক্রয় করি বাংলা বাজারের একটি লাইব্রেরি থেকে। লাইব্রেরির নাম এতকাল পরে আজ আর মনে নেই। গোলাম কুদ্দুস তাঁর কবিতায় ইলা মিত্রকে 'স্তালিন নন্দিনী' ফ্যাসিস্ট কারাগারে নিহত 'ফুচিকের বোন' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই অভিধা দু'টি নিঃসন্দেহে গৌরবের।

আমার বন্ধু বিখ্যাত শিল্পী মূর্তজা বশীর, সেকালে ইলা মিত্রকে বিষয়বস্তু করে একটি সাড়াজাগানো তেলচিত্র আঁকেন। বশীর আমাকে বলেছিলেন, 'শামসুর রাহমান, আমি আপনার 'তাঁর শয্যার পাশে' কবিতাটি পড়ে এই ছবি আঁকতে মনস্থির করি।' এটি এমন কোনও ব্যাপারই নয়, তবু সততা-ঋদ্ধ মনের অধিকারী এই তুচ্ছ ঋণটি স্বীকার করতে মূর্তজা বশীর বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি আমাকে জানাতে। সেকালে ইলা মিত্র সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পও লেখা হয়েছে। দু'টি গল্পের লেখকের নাম আমার জানা আছে। একজন আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের কীর্তিমান সাহিত্যিক আলাউদ্দিন-আল-আজাদ এবং অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের অকাল প্রয়াত লেখক দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একদা যিনি কয়েকটি সাড়াজাগানো গল্প লিখেছিলেন। আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পটির নাম 'কয়েকটি কমলালেবু'। আর মনে পড়ে একাত্তরের হানাদার বাহিনীর আগুন-লাগানো 'দৈনিক সংবাদ'-এ সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে শহিদ লেখক শহিদ সাবেরের কথা, যিনি একজন প্রগতিশীল, প্রতিশ্রুতিময় গদ্যশিল্পী ছিলেন।

শহিদ সাবের ইলা মিত্রকে নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। সেটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কি-না এ বিষয়ে সঠিক তথ্য শ্রদ্ধেয় লেখক এবং প্রগতিশীল, উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী সরদার ফজলুল করিমেরও অজানা। আমি সাধারণত প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতাই পড়ি, চেষ্টা করি সাম্প্রতিক কবিতার গতিধারার প্রতি নজর রাখতে। আদৌ শহিদ সাবেরের লেখা সেই কবিতা কোনও পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল কি-না, তা রহস্যই রয়ে গেল।

আমি আজ অব্দি ইলা মিত্রকে নিয়ে কোনও কবিতা লিখি নি। যদি বেঁচে থাকি হয়তো একদিন কবিতায় তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব। সম্ভবত সেই কবিতা হঠাৎ

তিন চার দিনের মধ্যে রচিত হতে পারে কিংবা তিন চার মাস পরেও হতে পারে। কবিতার জন্মের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে কবিতার শপথ, সেই লিখে না উঠতে পারার মধ্যে তিলমাত্র অনিচ্ছার ছায়া থাকবে না। কবিতা-সৃষ্টির ওপর রহস্যময়তার ছায়া থাকে, যা একজন কবিকে হঠাৎ তাঁর লেখার টেবিলের দিকে নিয়ে যায়, কাগজ-কলম নিয়ে বসতে অনুপ্রাণিত করে। সেই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কবি কখনও অল্প সময়ের মধ্যে কবিতা লিখে ফেলেন। আবার কখনও সেই কবিতা লিখে শেষ করতে চার পাঁচদিন লেগে যায়। আমার বিশ্বাস এরকম অভিজ্ঞতার অধিকারী প্রায় সকল কবি, কোনও কোনও কবি নয়।

আমার পরম সৌভাগ্য, ইলা মিত্রের মতো একজন মহীয়সী নারীকে দেখার, তাঁর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ আলাপ করার সুযোগ পেয়েছি, পেয়েছি উদার প্রীতির স্পর্শ। এই সুযোগ আমাদের দেশের অনেকেই পেয়েছেন। অনেকেই ঋদ্ধ, উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাঁর সংস্পর্শে এসে। আমাদের প্রাণপ্রিয় পূর্ব বাংলাতেই তাঁর জন্ম, কিন্তু তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন কলকাতা শহরে, পশ্চিমবাংলায়। তিনি তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে চান নি অন্য কোথাও, অন্য কোনও দেশে। কিন্তু ইলা মিত্রের সুচিকিৎসার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার তাকে কলকাতায় পাঠায়। তিনি জন্মভূমি ছেড়ে অন্য কোথায় বসবাস করতে চান নি। কিন্তু নাচোলের সাঁওতালদের 'রাণী মা' এবং নেত্রী, তেভাগা আন্দোলনের নেত্রীকে স্বদেশ ছেড়ে চলে যেতে হল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবী নেত্রীকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে নি।

সেকালে অসামান্য জননেত্রীকে তাঁর জন্মভূমিতে ঠাঁই দিতে ভরসা পায় নি যুক্তফ্রন্ট সরকার, তবে তাতে ইলা মিত্রের মহানুভবতায় বিন্দুমাত্র আঁচ লাগে নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এই অঞ্চলের কিছুসংখ্যক ব্যক্তির দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন এমনকি সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট হিংস্র লোকদের। আমরা জানি, তাঁর আসন অমরদের পাশেই রয়েছে, থাকবে।

ইলা মিত্র জীবনের দীর্ঘকাল নানা দুঃখ কষ্টের, নিপীড়নের মধ্যে বসবাস করেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি মুহূর্তের জন্য। নিজেকে সর্বদা চাওয়া-পাওয়ার অনেক উপরে রেখে জনগণের কল্যাণের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। এমনকি মৃত্যুর পরে মানুষের কাজে লাগার উদ্দেশ্যে নিজের মরদেহকেও হাসপাতালে দান করে গেছেন, যা মেডিকেল বিভাগের কাজে লাগবে। এমন একজন মানুষের স্মৃতির উদ্দেশে মাথা নত করে, লাখো সালাম জানিয়ে নিজেকেই ধন্য করতে হয়।

## ॥ তিপ্পান্ন ॥

দীর্ঘকাল আগেই জেনে গিয়েছিলাম একটি ভয়ংকর সত্য। সেই সত্যটির নাম মৌত অর্থাৎ মৃত্যু। এই শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে বড়োই নিরীহ। কিন্তু এই শব্দের অর্থ অনুধাবন করলে দুই অক্ষরের শব্দটিকে আদৌ আর গোবেচারা, ভাজা মাছটা উলটে খেতে পারে না গোছের কিছু মনে হয় না। যদিও ভানুসিংহ ওরফে রবীন্দ্রনাথ আগে লিখেছিলেন,

'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান', পরে তাঁরই লেখনীর থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। আসলেই তো এই সংসারে আমাদের কতই না দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়, কত বিপদ আমাদের কামড়ে ধরে, তবু আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গান করতে ব্যাকুল হই না। অনেক রোগশোক সয়েও মুখে মরণ কামনা করলেও, জীবনের আঁচল আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই প্রাণের অন্তিম স্পন্দন পর্যন্ত। আমি জীবনবাদী মানুষ; এই পৃথিবীর মাটি, গাছপালা, নদনদী, সামুদ্রিক তরঙ্গমালা, নদীঘেরা দ্বীপ, গোধূলি বেলায় নীড়ে-ফেরা উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, নানা রঙের, ঘ্রাণের ফুলের বাগান, এমনকি ঘাসফুল তো আছেই, তবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি শিশুদের হাসি, মানব-মানবীর স্নেহ, প্রেম, শিল্প-সাহিত্য। পিতা-মাতার স্নেহ না পেলে তো বেঁচে থাকাটাই হত মুশকিল। তাই, মাঝে মাঝে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছে হয়, এই যে এমন একটি দুনিয়ার নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আজ অব্দি নিশ্বাস নিতে পাচ্ছি আপনজনদের মাঝে, এমনকি তেমন পরিচিতি নেই তাদের উপস্থিতিতে, মোটকথা এই প্রাণের মেলায়, প্রকৃতির অবদানের ঔজ্জ্বলে, মাটির ফসলের ঢেউ আর আকাশের চাঁদ আর নক্ষত্রের মালা দেখে, এজন্যে মানব জন্মের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করি বিভিন্ন সময়ে।

মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার কোনও পথ নেই। রাজা-প্রজা, প্রতিভাবান, জ্ঞানী, আকাট, মূর্খ, বিদ্বান — কারওই উপায় নেই মৃত্যুর চোখে বালি ছিটিয়ে পার পাওয়ার। আজ হোক, কাল হোক মৃত্যুর ঘুটঘুটে কালো হাতে ধরা তাকে দিতেই হবে, তা তিনি আকবর বাদশাহ্ই হোন কিংবা হরিপদ কেরানিই হোন। কিন্তু এটা তো নগ্ন সত্য যে, আকবর বাদশাহ্ এবং হরিপদ কেরানি দু'জনেরই নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে গেছে চিরতরে। কিন্তু সম্রাট আকবরের নাম ভারতের ইতিহাস যতদিন থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায়, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিতে, আলোচনায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হরিপদ কেরানির নাম উল্লিখিত হবে না। তবে সেই কাল্পনিক ব্যক্তিটির নাম হয়তো উচ্চারিত হবে কখনও-সখনও রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে।

যা হোক, রাজনৈতিক জগতের একজন প্রধান নেত্রী ইলা মিত্রের চির বিদায়ের শোকের সজীবতা আমাদের মন থেকে মুছে যাওয়ার কিছুদিন পরেই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবি-সাহিত্যিক এবং অগণিত পাঠক-পাঠিকার মন ছেয়ে গেছে বিষণ্ণতার ঘন মেঘে। বিষণ্ণ চিত্তেও উল্লেখ করতে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে যে, আমি স্নেহাস্পদদের অন্যতম ছিলাম। যখনই তাঁর বাসায় গিয়েছি কিংবা কোনও সাহিত্যসভায় — সেই অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি এবং কালজয়ী সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হলে কলকাতায় এবং আমার প্রিয় ঢাকায় তিনি যে আনন্দিত হতেন, তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি। বিনীত জ্বলজ্বলে বুদ্ধিজীবী, স্পষ্টবাদী, অসাম্প্রদায়িক লেখক সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কবি কায়সুল হক নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাসায়। তরুণ বুদ্ধিজীবী গৌতম রায় আমাকে পথ দেখিয়ে কয়েকবার নিয়ে গেছেন শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক, কবি এবং ছড়াকারের পরিচ্ছন্ন, পরিমিত ড্রইং রুমে। এক কোণে রাখা আছে তাঁর প্রয়াত জীবন-সঙ্গিনী লীলা রায়ের বড়ো সাইজের ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফটির নীচে ছড়ানো কিছু ফুল। লীলা রায়ের মুখে আনন্দধারা। অনেক বছর আগে, মনে

পড়ে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'স্টেটসম্যান'-এর রবিবাসরীয় পাতায় বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে আমার বিষয়ে কিছু মন্তব্য এবং তরুণ শামসুর রাহমান রচিত 'রূপালি স্নান' কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

উৎসাহী পাঠক পাঠিকাদের জন্য অন্নদাশঙ্কর রায়-এর একটি কি দু'টি কবিতাংশ এবং তিন চারটি ছড়া উদ্ধৃত করছি। প্রথমে কবিতাংশ নিবেদন করছি — এসব কবিতা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সঙ্কলন থেকে গৃহীত হয়েছে —

সারা দিন ভর পদে-পদে ব্যর্থতা
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত —
এই কি মোদের বহু দিবা বাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস।

নির্জন দ্বীপ, ভেক মক-মক করে
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধ'রে
জলের সঙ্গে জাগায় কী অনুভব
মৃদু তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস।
(জর্ণাল থেকে)

তোমায় বলছি পলাতক, ব'লে হেসেছি কত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
তুমি তো পালালে সংসার হতে সুসংযত।
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমি পলাতক সংগ্রাম হ'তে ভীরুর মতো!

আমি রণছোড়, টিটকারি দেয় পুরুষ যত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
বলে কাপুরুষ! গম্বুজে ব'সে বাদ্যরত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমারি উক্তি আমারি কর্ণে বর্ষে শত!

ওদের কী বলি, কী করে বোঝাই। শরমে নত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
জীবনের লোভে নই পলাতক সুদূরগত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
সৃষ্টির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত!
(দীলিপদা'কে)

কবুল করছি, এ-ক্ষেত্রে আমি নিজের উক্তির বরখেলাপ করেছি। কবিতাটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারি নি।

তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?
যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?
(খুকু ও খোকা)

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!

বাঘ নয় ভালুক নয়
নয় কো জাপানি,
বোমা নয় কামান নয়
পিলে-কাঁপানি।

মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাওয়ার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ-হাতে ও-হাতে,

দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে

বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে 'পালাই'।
জাপানিরা ভাগলো কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন

পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটতো
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হঠতো।
(কাঁদুনি)

আমরা অনেকেই জানি, আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় অন্নদাশঙ্কর রায় কৃতিত্বের সঙ্গে আইসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন; বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ আমলে। সেকালে একটি সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই শুরুতেই সরকারি চাকুরে বনে যান তিনি। তাঁর চাকরি-জীবন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে শুরু হয়। এস.ডি.ও-র দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি প্রথমে পূর্ব বাংলার নওগাঁয় আসেন। আমাদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ধনী এলাকায় এসে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলটিকে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়ে ফেলেন একান্ত গুরুত্বের সঙ্গে। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তো বটেই, মরহুম মাহবুব-উল আলমসহ অন্য লেখকদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায় তাঁর। মাহবুব-উল আলম এবং অন্নদাশঙ্কর রায়-এর পত্রালাপ আমরা অনেকেই সোৎসাহে পাঠ করেছি, পরিচয় পেয়েছি দুই অঞ্চলের দু'জন সাহিত্যিকের ধ্যান ধারণার।

অন্নদাশঙ্কর রায় পূর্ব বাংলা, ওরফে পূর্ব পাকিস্তান এবং আখেরে বাংলাদেশ ও তার বাসিন্দাদের মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন, তার পরিচয় শুধু আমি কেন অসংখ্য মানুষই পেয়েছেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান দিয়েছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বিচলিত, মর্মাহত, শোকার্ত হয়ে তিনি লিখেছেন —

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,—
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ রক্তগঙ্গা
অশ্রুগঙ্গা বহমান

তবু হবে জয়,
নাহি নাহি ভয়
জয় মুজিবুর রহমান।

সেই সময়েই তিনি 'কাঁদো, প্রিয় দেশ কাঁদো' শীর্ষক একটি অসামান্য প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গাবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরেই অন্নদাশঙ্কর রায় 'বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে' একটি প্রতিবাদী সনেট রচনা করেন —

নরহত্যা মহাপাপ, তার চেয়ে পাপ আরও বড়ো
করে যদি যারা তাঁর পুত্রসম বিশ্বাসভাজন
জাতির জনক যিনি অতর্কিতে তাঁরেই নিধন।
নিধন সবংশে হ'লে সেই পাপ আরও গুরুতর।

সারা দেশ ভাগী হয় পিতৃঘাতী সে ঘোর পাপের
যদি দেয় সাধুবাদ, যদি করে অপরাধ ক্ষমা।
কর্মফল দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে হয় এর জমা
একদা বর্ষণ হয় বজ্ররূপে সে অভিশাপের।

রক্ত ডেকে আনে রক্ত, হানাহানি হয়ে যায় রীত।
পাশবিক শক্তি দিয়ে রোধ করা মিথ্যা মরীচিকা
পাপ দিয়ে শুরু যার নিজেই সে নিত্য বিভীষিকা।
ছিন্নমস্তা দেবী যেন পান করে আপন শোণিত।

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো নাকো নীরব দর্শক
ধিক্কারে মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক।

এখানে উল্লেখ করতে চাই অসংখ্য বাঙালির মতো, মানুষের মতো আমিও অত্যন্ত শোকার্ত হয়েছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর। সেই গাঢ় শোক আমাকে দিয়ে একটি কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিল ১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্টের কয়েকদিন পরেই। কবিতাটির নাম 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'। সেই কবিতায় বিভিন্ন পঙ্ক্তির আড়ালে বঙ্গাবন্ধুর হত্যা এবং ঘাতকদের পরিচয় ছিল। 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক 'সমকাল'-এর আগস্ট সংখ্যার প্রথম কবিতা হিসেবে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটিতে যে শেখ মুজিব এবং তাঁর ঘাতকদের প্রতীকধর্মী বর্ণনা ছিল কোনও কোনও অংশে, এ-কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব-বিরোধী কতিপয় ছাত্র টের পেয়েছিল এবং কোনও কোনও অছাত্র পাণ্ডা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। তারা 'সমকাল'-এর সেই সংখ্যার কিছু কপি পায়ে থেঁতলে, আগুনে পুড়িয়ে নিজেদের উষ্মা প্রকাশ করে। তাদের এই উষ্মার কারণেই আমার তখন মনে হয়েছিল আমার কবিতাটি সফল হয়েছে। তবে এ-কথা না বললে অন্যায় হয় যে, ১৯৭৫ সালের ট্রাজেডি নিয়ে লেখা প্রথম কবিতাটি শক্তিশালী, জনপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণ রচনা করেন। তার সেই কবিতা অসংখ্য পাঠকের মুখে মুখে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়।

যা হোক, ক'দিন আগে (৩০ অক্টোবর) দৈনিক 'জনকণ্ঠে' অন্নদাশঙ্কর রায় বিষয়ে তাৎক্ষণিক যে বিশেষ পাতাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে নাসির আহমেদ 'সত্যাসত্যে'র

মতো অসাধারণ উপন্যাস, বহু উন্নত মানের প্রবন্ধের লেখক এবং ছেলে ও বুড়ো-ভোলানো সদা প্রয়াত অনন্য ছড়াকার-এর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে একটি কবিতা রচনা করেন, যার উল্লেখ করতে আমার ভালো লাগছে।

'কালের ধুলোয় লেখা'র কোনও কোনও পাঠক সখেদে আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আত্মজীবনীতে নিজের কথা বেশি না লিখে অন্যদের কথা বেশি লিখি। কিন্তু মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকি। আমি নিজের কথা নেহাত কম লিখছি না, যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্কিত কোনও না কোনওভাবে, তাদের কথা একটু বেশি লিখলামই না হয়, তাতে ক্ষতি কী? তবে সৎ সমালোচকদের আমি পছন্দ করি। তাদের কোনও কোনও সমালোচনা, দিকদর্শন উপকারীও বটে।

## ৷৷ চুয়ান্ন ৷৷

দীর্ঘকালের অসুস্থতা নির্জীব এবং হতাশ করে তোলে, মৃত্যুচিন্তা অনাকাঙ্ক্ষিত, বিরক্তিকর অতিথির মতো পেয়ে বসে। এমনকি তিন-চার বছরের পীড়া যা কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক চলাফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেটিও অকাম্য। পরিতাপের বিষয়, আমার আঙুলে গোনা প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে রশীদ করীম অন্যতম। রশীদ করীম কে, আমাদের সমাজে তাঁর গুরুত্ব কতখানি, কেন তিনি অপরিহার্য বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কথাসাহিত্যের আলোচনায় প্রথম দু'জনের নাম উচ্চারিত হলেও তাঁর নামটি এসে যাবে অবধারিতভাবে। কেন এসে যাবে তা যারা রশীদ করীমের একটি দু'টি উপন্যাস পড়েছেন তারাই বিলক্ষণ বুঝতে পারবেন।

সম্প্রতি রশীদ করীম উপন্যাস সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য প্রকাশ থেকে। বইটির প্রকাশনায় মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জায় চোখ বুলোলে বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না কেন প্রকাশক মফিদুল হকের রুচি ও নান্দনিক গুণের এত তারিফ করা হয়। রশীদ করীমের উপন্যাস সমগ্রের অন্তর্গত বারোটি উপন্যাসের কোনটির চেয়ে কোনটি উত্তম, এটা বলতে গেলে হিমশিম খেতে হয়। এককেটি এককেরকম গুণে গুণান্বিত। অনুপম প্রতিটি উপন্যাসের ভাষা-বিন্যাস বিষয়বস্তু। চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা লক্ষ করে বিস্মিত হতে হয়। 'বড়ই নিঃসঙ্গ' উপন্যাসটি পড়ার পর মনে হয়েছে, যা-কিছু সহজলভ্য তার বিরুদ্ধেই তিনি, রশীদ করীম, এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি পাঠক্-ঠকানো এলেবেলে উপন্যাস লেখার পক্ষপাতী নন। তাঁর উপন্যাস থেকে কাহিনি নির্বাসিত নয়, কিন্তু শুধু একটা সাদামাটা গল্প বলেই তিনি ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব চুকিয়ে দিতে চান না। তাই আমরা তাঁকে প্রবেশ করতে দেখি জীবনের গভীরে, আধুনিক মানুষের সমস্যাপীড়িত, যন্ত্রণাকাতর মনের অতলে। এর ফলে তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়ে যাই সেই মননভাস্বর সওগাত, যার নাম 'বড়ই নিঃসঙ্গ';এ-কালের দিশাহারা, বিচ্ছিন্নতা-বিহ্বল এক ব্যক্তিসত্তার জীবনকথা, আমাদের শত টানাপোড়েনময় সমাজের শিল্পিত দলিল।

রশীদ করীমের উপন্যাস কামড়ে ধরে পাঠককে, বই শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি মেলে না। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর ভাষার জন্যে। অশেষ শ্রম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে তিনি এই ভাষা অর্জন করেছেন, যা অনুরণিত নিজের সুরে। তাঁর উপন্যাসে নানা জটিল চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে, জটিল মনোবিকলন চিহ্নিত তাঁর সাহিত্য, কিন্তু তাঁর ভাষা কখনও জটিল নয়। এই ভাষা বিড়ম্বিত কিংবা প্রতিহত করে না কোনও পাঠককে, বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় পাঠকের দিকে। রশীদ করীমের উপন্যাস আমাদের ভাবায়, কিন্তু পীড়িত করে না।

রশীদ করীম রচনায় নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করেছেন। উপস্থিত সিদ্ধি তাঁকে কখনও একই বৃত্তে ঘুরতে প্রলুব্ধ করতে পারে নি, তিনি আবিষ্কার করেন নতুন এলাকা। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা, এই বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্যই তাঁকে নন্দিত করেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাশিল্পী হিসেবে।

আগেই বলেছি, আমার এই প্রতিভাবান প্রিয় বান্ধবটি কয়েক বছর যাবৎ অসুস্থতার পীড়নে বন্দি, তার শরীরের ডান অংশটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এই ব্যাধির প্রকোপ সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি দিন বহু কষ্টে উজিয়ে একটি খুবই কৃপণ আত্মজীবনী এবং কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। কবিতা ক'টি আদৌ ফ্যালনা কিছু নয়। এখন তাঁর রচনায় তিনি, যতদূর মনে হয়, একেবারে যতি টেনে দিয়েছেন। সম্ভবত আর কখনও লিখবেন না। কবিতার অনুবাদেও তিনি ঈর্ষণীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেন্ডারের 'ফল এফ এ সিটি' কবিতাটির 'নগরীর পতন' নামে অপূর্ব অনুবাদ করেছেন ঔপন্যাসিক রশীদ করীম। রবার্ট ফ্রস্টেরও তিন চারটি কবিতা অনূদিত হয়েছে আমার বন্ধুর লেখনীতে। এসবও মন জয় করেছে অনেক কবিতাপ্রেমীর।

আরেকটি বিষয় সম্পর্কে বলতে তো ভুলেই গিয়েছি। বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক, চিন্তা উদ্রেককারী প্রবন্ধও রশীদ করীম লিখেছেন। সেই লঘু-গুরু প্রবন্ধাবলি শুধু সাধারণ পাঠকদেরই নয়, বিদগ্ধ পাঠকগোষ্ঠী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও মুগ্ধ করেছে। এমন শক্তিশালী একজন লেখকের কলম যে স্তব্ধ হয়ে গেছে মানসিক দুর্বলতার দরুন নয়, শারীরিক পক্ষাঘাতের কারণে, এটা আমাদের সাহিত্য জগতের ট্রাজেডি বলে গণ্য করি। তিনি কি পাঠকসমাজের পাঠতৃষ্ণা মেটাতে লেখার টেবিলে ঝুঁকে সাদা পাতায় ঝর্ণা-কলম দিয়ে শব্দের সুদীর্ঘ মিছিল সৃষ্টি করবেন না?

যার সম্পর্কে শ্রদ্ধাভাজন, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অমর স্রষ্টা সদ্যপ্রয়াত অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "আমার যত গ্লানি' লিখে রশীদ করীম লিপিকুশলতা ও বিন্যাস কৌশলের অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনিটি ধীরে ধীরে বীভৎস থেকে সাবলাইমের দিকে গেছে। শেষের দিকে লেগেছে মুক্তিযুদ্ধের ছোঁয়া। সোনা হয়ে গেছে।" অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো মহান সাহিত্যিকের কাছ থেকে এমন প্রশংসা লাভ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

তাছাড়া 'দেশ' পত্রিকায় অক্টোবর ২৭, ১৯৭৩ সংখ্যায় সনাতন পাঠক (সব্যসাচী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) বলেন, 'এর মূল চরিত্র এমন একজন মানুষ, যে উচ্চ

চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত, ভোগবিলাসের জীবন যার কাছে অনায়াসলভ্য... সাধারণ লেখকরা এদের নিয়ে ব্যঙ্গ রচনা লেখে কিংবা হঠাৎ একে নানা রকম ত্যাগ থ্যাগ করিয়ে আদর্শবাদ মহৎ চরিত্র বানায়। রশীদ করীম এই রকম একটি মানুষ যা হতে পারে, সেই রকম হতে দিয়েছেন।'

কবি, পণ্ডিত, উন্নত শিক্ষাবিদ, যার বন্ধু হতে পেরে আমি ধন্য, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, 'রশীদ করীম এ যুগের চ্যালেঞ্জ।... রশীদ করীমের সংহত শিল্পবোধ, তাঁর সুরুচি ও বিদগ্ধতা আজ প্রশ্নাতীত। তাঁর গদ্য স্বচ্ছ, গতিময়, পরিশ্রুত ও শিক্ষিত।'

একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তীব্র আর্থিক কষ্টের শিকার হয়েও আমি কারও কাছে ধার হিসেবেও হাত পাতি না। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা, আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরা তখন ভীষণ অসুস্থ, মরণাপন্ন; তাকে ডায়াবেটিস সেন্টারে ভর্তি করতে হয়। তখন দারুণ অর্থকষ্টে ভুগছি আমি। আখেরে নিরুপায় বন্ধু রশীদ করীমের শরণাপন্ন হলাম। চাওয়া মাত্রই তিনি কয়েকটি নোট আমার হাতে গছিয়ে দিলেন। যতদূর মনে পড়ে চার হাজার টাকা। অবশ্য কোনওরকম ইঙ্গিত কিংবা তাগাদা পাওয়ার আগেই ধার শোধ না করলেও তিনি কিছু মনে করতেন না। একবারও সেই টাকা ফেরত চাইতেন না, এমনই মানুষ অসাধারণ ঔপন্যাসিক, আমার একান্ত কল্যাণকামী বন্ধু রশীদ করীম। দীর্ঘজীবী হোন তিনি।

আমার বন্ধুর নাছোড় অসুস্থতার কথা তো বলেইছি, এখন আমার আপন ছোটো বোন মেহেরুন্নেসার বেমারির বিষয়ে বলব। মেহের আমার পাঁচ বছরের ছোটো। আমাদের দু'জনেরই শৈশব, কৈশোর, যৌবনের কিছুভাগ একই বাড়িতে খেলাধুলোয়, নানা জায়গায় আসা-যাওয়া এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন ফিল্ম দেখে কেটেছে। আমরা ছিলাম চলচ্চিত্রের পোকা। আব্বা-আম্মা যখন প্রায় এক বছর মাহুতটুলির বাসা সাময়িকভাবে ছেড়ে ইস্কাটনের আমার এক খালা-আম্মার বাসায় সংসার পেতেছিলেন, সেই দালানের সংলগ্ন দুই বিঘা জমি, বাবা খালার কাছ থেকে কিনেছিলেন। সেই জমিতে ছিল আম, জাম, লিচু, বেল, কাঁঠাল, করমচা, লেবু ইত্যাদির গাছ। লিচু গাছের ডালে বসে কিশোর শামসুর রাহমান কতবার যে মেঘের ভেলায় চেপে ভেসে বেড়িয়েছে অসীম আকাশে তার ইয়ত্তা নেই। সেই গাছের ডালে বসেই তো বার বার দেখেছি পাশের বাড়ির অপরূপ দুই যমজ বোনকে, যাদের রাঙা ঠোঁটে হাসি ফুটত আমাকে দেখে। বড়ো ভালো লাগত তখন ওদের দেখে।

সেকালে ইস্কাটনের গাছগাছালিময়, জনবিরল ও যানবিরল দীর্ঘ পথ হেঁটে মেহের নাজিমুদ্দিন রোডস্থ মুসলিম গার্লস স্কুলে, আমার ছোটো ভাই সাইফুর রহমান চৌধুরী সদরঘাট-ঘেঁষা কলেজিয়েট স্কুলে এবং আমি পোগজ স্কুলে যেতাম মাসের পর মাস। সাইফুর রহমান কিছু রাস্তা কখন-সখনও চলন্ত ঘোড়াগাড়ির পেছনের বাইরের ছোটো অংশে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি কাঠের আসনে ঝুলে পার হতে চেষ্টা করত। অনাহুত, অবাঞ্ছিত ক্ষুদে আরোহীটিকে চক্ষুশূল ঠাউরে নিয়ে অসন্তুষ্ট গাড়োয়ান সাহেব পেছনের দিকে বেধড়ক চাবুক চালাতেন। আমার অনুজকে বাধ্য হয়েই সেই জায়গাটি ছাড়তে হত।

আমার ছোট বোন মেহেরের গায়ের রং আম্মার গাত্রবর্ণের মতোই জ্বলজ্বলে। স্কুল যাওয়ার দীর্ঘ পথে রোদের জবরদস্ত ছোঁয়ায় রং গাল ফুটে বেরুতে চাইত। বেচারির নিশ্চযই খুব কষ্ট হত তখন। সেকালে আমাদের তাজমহল সিনেমা হল আগুনে পুড়ে যাওয়ায় আমার পিতা বড়ো বেশি আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। আরাম আয়েশে ডুবে থাকার কোনও সুযোগই ছিল না আমাদের। সেই সময় আব্বা-আম্মার অসামান্য ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা, বিপদেও মেজাজ প্রসন্ন রাখার বিনীত প্রয়াস ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মুদির দোকানের মালিকের চরম দুর্ব্যবহারেও মাথা ঠান্ডা রাখার, ভদ্রতা বজায় রাখার অনায়াস প্রয়াসের স্মরণ করে আজও আমার মন শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। আব্বা ছিলেন, এতটুকু বানিয়ে বলছি না, সিংহপুরুষ। তিনি অন্যায়, অবিচার, নষ্টামি একেবারেই সইতে পারতেন না। নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি ছিলেন সর্বদা অবিচল। কোনও মাতব্বরই তাঁকে ভীত করতে পারে নি, প্ররোচিত করতে পারে নি অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে। বহু শ্রমের বিনিময়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন, কিন্তু এতটুকু অর্থগৃধ্নু ছিলেন না। সাদাসিধা জীবনযাপন করেছেন সবসময়, বিলাসিতাকে কাছে ঘেঁষতে দেন নি কোনও কালেই।

যা হোক, সময় কারও জন্যেই তার রথের যাত্রা এক নিমেষের জন্যেও থামায় না, চলতে থাকে অবিরাম, থাকবে হাজার যুগের পর, হাজার হাজার যুগ, অনন্ত কাল। একসময় কিশোর আমি তরতাজা যুবক হলাম। আমার বোন মেহেরও হয়ে উঠল তরুণী। আসতে শুরু করল বিয়ের প্রস্তাব নানা জায়গা থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে সবার অগোচরে আমার বড়ো ভাই খলিলুর রহমান চৌধুরীর শ্যালক খাজা সিকান্দার বখতের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হল আমার বোন মেহেরুন্নেসার। খাজা সিকান্দার ভালো মানুষ, এ-কথা সত্য, চারিত্রিক কিছু গুণও আছে তার, কিন্তু মেহের ও তার মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন না আমার বাবা-মা। আব্বা তো আমার বোনের, অনেকের মতোই, এই জীবনসঙ্গী চয়নের বিষয়টি কুৎসিত এবং রীতিমতো অন্যায় অপরাধ বলে মনে করলেন। সত্যি বলতে কী, আমার কাছে মেহেরের নির্বাচন ভুল হতে পারে, কিন্তু অন্যায় বলে বিবেচিত হয় নি। কিন্তু তখন সে ব্যাপারে আমার মতামত গ্রহণের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নি আমার মা-বাবা। করবেনই বা কেন? সেকালে আমি তো খুবই অল্পবয়সি সামাজিক বিষয়ে ষোলো-আনা অনভিজ্ঞ উড়চণ্ডী এক তরুণ মাত্র। আমার খেয়ালি মতামতের কী-ই বা মূল্য?

আখেরে মেহেরের ব্যাপারটি চরম তিক্ততায় পরিণত হল। মেহের বাবা-মা'র বাড়ি ছেড়ে সিকান্দারের সঙ্গে ঢাকা থেকে মধ্য ভারতের এক শহরে চলে গেল। ওদের ভালোবাসায় কোনও খাদ ছিল না, কিন্তু দুঃখকষ্ট বহুকাল ওদের ভুগিয়েছে। সিকান্দারের কিছু শারীরিক খুঁত আছে যা ওকে ভোগায়। কিন্তু সংসার চালাবার তাগিদে খুব সীমিত আকারের হলেও অর্থ উপার্জন করেছে। তার স্ত্রী, আমার বোন মেহের, ঢাকার নবাববাড়ির বিভিন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েদের টিউশনি করে স্বামী, চার পুত্র এবং কন্যার সংসার-তরীকে নানা ঝড় তুফানে ভাসিয়ে রেখেছে। এমন একটা সময় এল অসুস্থতার কারণে সিকান্দার রোজগারহীন হয়ে পড়ে, ফলে আমার বোনকেই একা সংসারের হাল

ধরতে হয়। মেহের এমনই দৃঢ় চরিত্রের নারী, কখনও কারও কাছে একরত্তি সাহায্য কিংবা ধার কর্জের জন্যে হাত পাতে নি। শুধু একবার ওর মেজো ছেলে মাঞ্জারের এম.এ পরীক্ষার ফি দেয়ার জরুরি প্রয়োজনে অন্য কোনও পথ না দেখে আমার কাছে এক হাজার টাকা ধার চেয়েছিল। আমি ওদের কাজে সামান্য অংশ নিতে পেরে খুশি হয়েছিলাম। কিছুদিন পর মেহের সেই ধারের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য হাজির হল আমার বাসায়। সেই ধারের টাকা শোধ করার তাগিদে বেশ কিছু নোট বের করল মানিব্যাগ থেকে। আমার মনে জমে উঠল অভিমানের মেঘ। আমি নিতে অস্বীকার করি। আমার মনের পুঞ্জীভূত মেঘের আভাস পেয়ে সে আর ধার পরিশোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। আমি ব্যাপারটি তখনকার মতো ভুলে যেতে পারলাম। আলাপ জমে উঠল ভাই-বোনের মধ্যে। তখন আব্বা জীবননদীর পরপারে চিরনিদ্রিত।

মেহের যখন একান্ত নিজের শ্রম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে চারটি ছেলেকে এবং একটি মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলেছে, তাদের সংসার গড়ে দিতে সফল হয়েছে, অসুস্থ স্বামীর দেখভাল করেছে ভালোভাবে, সঞ্চয় করেছে কিছু অর্থ, তারপরই ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পড়ল নিজে। তার চার ছেলেই বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাজে সমাদৃত। অসুস্থ মা-বাবার সুচিকিৎসার জন্য ওরা চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। অর্থ ব্যয় করছে অবিরল। আমি আমার ভাগ্নেদের জন্যে গর্ব অনুভব করি। ওরা এবং ওদের জীবন সঙ্গিনীরা দিনরাত সেবাযত্ন করছে সর্বনেশে কর্কট রোগে আক্রান্ত আমার বোনের। ভাগ্নেদের মোটরকারেই প্রায় প্রতিদিন দেখতে যাই ওদের প্রাণপ্রিয় দৃঢ় চরিত্রের মা মেহেরুন্নেসাকে, যার চেহারায় কখনও কখনও হঠাৎ ফুটে ওঠে আমার মায়ের মুখের আবছা আদল।

ইন্দ্রজালে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তবু যদি কোনও ঐন্দ্রজালিক ঝলকে আমার অসুস্থ বোন সুস্থ হয়ে ওঠে, আবার সংসারে যুক্ত হয়, মাঝে মাঝে পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে বেড়াতে আসে আমার শ্যামলীর বাসায়, কী-ই-না ভালো লাগবে আমার। ভাগ্য কি এত প্রসন্ন হবে আমার প্রতি? হবে কি?

## ॥ পঞ্চান্ন ॥

এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রত্যেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতিই স্বাধীন দেশের বাসিন্দা হিসেবে জীবনযাপন করতে গৌরববোধ করে। এই গৌরব অনির্বাণ কারণেই প্রাণ বিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তাই তো দেখা যায়, বিদেশি শাসকের শোষণ এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন দেশপ্রেমিকগণ। তাদের কাউকে কাউকে জেলে পচিয়ে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে কিংবা খোলা আকাশের নীচে দাঁড় করিয়ে হত্যার মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয় অমরতার ভুবনে। কিন্তু এসব করে কিছুতেই নতুন দেশপ্রেমী অর্থাৎ প্রাক্তন শহিদদের উত্তরসাধকদের সংগ্রাম থামানো যায় না। আখেরে এক সূর্যালোকিত ভোরে স্বাধীনতার অমেয় আলোকধারায় উদ্ভাসিত হয় সারাদেশ। আমরা বাঙালিরা পাকিস্তানি উৎপীড়ক শাসকদের কব্জা থেকে নিজেদের মুক্ত করি অনেক ত্যাগ ও তিরিশ লক্ষ প্রাণের আত্মদানে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের কল্যাণে।

কিন্তু এ-কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, এই বিজয়ের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য আমাদের প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে অনেক বছর। মুক্তিযুদ্ধের আগে বাঙালিদের বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, মুখ বুঁজে কিছুকাল থাকতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অসাম্য উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও জৌলুস বৃদ্ধির একরৈখিক উদ্যম লক্ষ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের নতুন রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডির চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধি লক্ষ করে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি কেবল এবং আমাদের হতশ্রী ঢাকার নামমাত্র উন্নয়ন দেখে। সেজন্যে আমি অনেকের মতোই কষ্ট পেয়েছি, ক্রুদ্ধ হয়েছি সত্য, আমার প্রিয় ঢাকা, তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমার কিছু খামতি সত্ত্বেও, তোমাকে আমৃত্যু হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা দেব।

বাংলাদেশের নাম পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান ছিল। কিন্তু 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি শেখ মুজিবুর রহমান পছন্দ করতেন না বলেই মহান জননেতা ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' নামকরণের উদ্যোগ নেন। আমি বলতে লুব্ধ হচ্ছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটি সহজাত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল শেখ মুজিবের। তিনি ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর একুশের কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলাভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলাভাষা চালু হবে, সে হবে না।'

এখানে উল্লেখ করা দরকার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল বলেই তিনি এই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের 'গীত বিতান' থেকে আমাদের জাতীয় সংগীত নির্বাচন করেছিলেন :

> আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
> চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
> ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরি হায়, হায় রে—
> ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

১৯৬৯ সালে প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানই শুধু পুলিশের গুলিতে নিহত হন নি, কয়েদখানায় সার্জেন্ট জহুরুল হককেও হত্যা করা হয়। সেই একই বছর ১৮ ফেব্রুয়ারি টগবগে প্রাণ এবং সদা আনন্দিত মুখের অধিকারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক এবং আমাদের অনেকের প্রিয়জন ড. সামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে। আজও আমার প্রায়শ মনে পড়ে, দেখতে ছোটখাটো কিন্তু মানসিক সমৃদ্ধিতে ঋদ্ধ এবং প্রকৃত বড়ো সেই ব্যক্তিটিকে। ১৯৭১ সালে জনগণের দাবি আদায়ের মিছিলে আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র ফারুক ইকবাল পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করলে কলেজের পাশে মালিবাগের মোড়ে সেখানেই তার স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়। চৌরাস্তার মোড়ে। এইসব শহিদের স্মৃতি আজও অনেককে ভাবায়। শোকার্ত হয়ে। ভাবায়, কারণ, বৃথাই কি তিরিশ লক্ষ মানুষ তাদের প্রাণ দিয়েছিল, শহিদ হয়েছিলেন বহু বুদ্ধিজীবী, বহু নারী হারিয়েছিলেন সম্ভ্রম? আজকের বাংলাদেশের হাল-হকিকত দেখে এক ধরনের নৈরাশ্যের অমাবস্যায় আচ্ছন্ন হয় অনেক শুভবাদী, প্রগতিশীল ব্যক্তির মন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন হানাদার পাকিস্তান সরকারের লাহোরের এক কারাগারে। বঙ্গবন্ধু নিজ চোখে কারাগারের লোহার শিক-ছাওয়া জানালা দিয়ে দেখেছেন, তাঁর জন্যে খোঁড়া হচ্ছে একটি কবর। নিজ চোখে আপনকার কবর তৈরি দেখা যে কতটা মর্মপীড়ক, তা শুধু ভুক্তভোগীই জানে! শেখ মুজিবকে সেই অভিজ্ঞতার মানসিক উৎপীড়নও সইতে হয়েছে চরমে নৈঃসঙ্গ্যে।

আমাকে আবার ফিরে তাকাতে হচ্ছে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিকে। মনে ঝিকিয়ে উঠছে নানা দৃশ্য। কানে ভেসে আসছে কত না টুকরো কথা, মিছিলের প্রস্তুতি। বিখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান দাঁড়িয়ে রয়েছেন — কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার' কাব্যপঙ্ক্তি-খচিত একটি ব্যানার হাতে। আমার একটি মুঠি লগ্ন সেই ব্যানারে — কামরুল হাসানের নির্দেশে। আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, কবি এবং প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্প লেখক মাহমদুল হক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং অভিনেতা হাসান ইমাম, শিশু-সাহিত্যিক এখলাসউদ্দিন আহ্মদ। একটি খুবই পুরনো ছবি, আজও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মন কেমন করে, একটা বেদনাশ্রয়ী সুর মনে গুঞ্জরিত হতে থাকে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের ছবি থাকতে পারত কারও কারও কাছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সেই ছবিটি আজ অব্দি আমার চোখে পড়ে নি। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি কেউ ক্যামেরায় আদৌ ধারণ করেছিলেন কি-না আমার জানা নেই। কারও কাছে কখনও দেখি নি। প্রয়াত গবেষক, প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ সেই সংগ্রামের কালে সম্ভবত একাত্তরের তেইশে মার্চের বিকেলে শহিদ মিনারে লেখক, শিল্পী ও অধ্যাপকদের এক জনাকীর্ণ সভায় আমাদের সবাইকে দিয়ে কোরাস হিসেবে বলিয়ে নিয়েছিলেন কিছু কথা। আমাদের সেই সমবেত আবৃত্তি গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো মনে হয়েছিল আমার। সেই আবেদনময় বিশিষ্ট বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল সেকালে। জানি না, সেটি কোথাও সংরক্ষিত হয়েছে কি-না। অন্তত আমার চোখে কখনও পড়ে নি। সেই ঐতিহাসিক দলিলপত্রটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, এটা আমি সজোরে উচ্চারণ করতে চাই। সেই দলিলপত্রটির নির্দেশানুসারে কাজ করা অনেকের পক্ষে, এমনকি খোদ রচয়িতা ও পাঠকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তাতে কী? কেউ কেউ তো কাজ করতে সচেষ্ট ছিলেন। দলিল তো দলিলই, সেটা সংরক্ষিত হওয়া একান্ত জরুরি ছিল।

শহিদ মিনারের সেই ঐতিহাসিক সভার আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। সেদিন সেখানে কোনও উল্লেখযোগ্য কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন কি-না মনে নেই, তবে কৌতুকউদ্দীপক ঘটনা হিসেবে না বললেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বরেণ্য অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী না-পদ্য না-গদ্য ধরনের একটি স্বরচিত লেখা কবিতা হিসেবে পাঠ করেছিলেন। শ্রোতাদের মনোভাব জানার সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয় নি। তবে কোনও কোনও কৌতুকপ্রিয় শ্রোতা প্রশংসার ফোয়ারা খুলে দিয়েছিলেন কি-না তা-ও আমাদের অনেকেরই অজানা রয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সত্য তো বটেই, উক্তি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, 'পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি। পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বানে অহেতুক বিলম্ব দুঃখজনক।' তাঁর এই উক্তি যে কত নগ্ন সত্য, তা জানতে কাউকে অধিক বিলম্ব করতে হয় নি। বাংলার জনগণের নেতা শেখ মুজিব ছয় দফার কোন রদবদলের প্রশ্নকেই প্রশ্রয় দেন নি এক লহমার জন্যে। অনেক কিছু মতো এ ব্যাপারেও তিনি অটল ছিলেন। কিন্তু আপোস করলেই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারতেন। কিন্তু সেই ধাতের মানুষই ছিলেন না বঙ্গাবন্ধু। ভুট্টোর গোঁয়ার্তুমি এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অভিসন্ধি জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের দিকে ঠেলে দিল, 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হল।

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম দিকে 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্রা ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' ইত্যাদি দৃপ্ত শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে ঢাকা শহর। পরে পবিত্র আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা' রূপান্তরিত হল 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রে'। ৬ মার্চ পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল ভদ্র-শান্ত এসএম আহসানকে অপসারণ করে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন জালিম ও খুনি কসাই লে. জেনারেল টিক্কা খানকে।

এদিকে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ভোরবেলা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে সাক্ষাৎ করে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানিয়ে দিলেন, 'পূর্ব বাংলায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা হলে যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না।' অবশ্য পরবর্তীকালে আমাদের জানতে ও বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি, যুক্তরাষ্ট্র কী বৈরী ভূমিকাই না গ্রহণ করেছিল বীর বাঙালিদের বিরুদ্ধে, তাদের জন্মভূমির বিপক্ষে! কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের জানা ছিল না যে, বঙ্গাবন্ধু কারও, কোনও পরাশক্তিরই পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ রক্তরাঙা চক্ষু কিংবা ধমকে কাতর হয়ে পড়ার মতো কোনও ব্যক্তি ছিলেন না। তাই, আমরা দেখি সেই একই দিন বিকেলবেলা রমনা ময়দানের মঞ্চে ঋজু দেহে, প্রকৃত বীরের মতো উন্নত শিরে অভূতপূর্ব, প্রদীপ্ত ব সামনে বঙ্গাবন্ধু অসাধারণ এক কবিতার মতো, বলা যেতে পারে, উচ্চারণ করলেন তাঁর ভাষণ। আদৌ লিখিত ছিল না সেই ভাষণ, টেবিলের ওপর রাখা ছিল শুধু এক টুকরো কাগজ এবং তাঁর চশমা। তিনি বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল সমুদ্রের কল্লোল।

বঙ্গাবন্ধু তাঁর অনুপম ভঙ্গিতে শুরু করলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই... এরপর যদি একটা গুলি চলে — এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় — তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু — আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।... গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। ... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম — জয় বাংলা! জিয়ে পাকিস্তান!'

সেদিন আমি রমনার ময়দানে যাই নি। এই রমনার ময়দান আমার বহুদিনে চেনা, ঘোড়দৌড়, রেসুড়েরদের ভিড়, চিনে বাদাম, শব্রি আম, ডালমুট, লজেন্স ইত্যাদির বিক্রেতা ও ক্রেতাদের প্রায় ভিড় ঘেঁষে ইশকুল থেকে অনেকদূর হেঁটে ইস্কাটনের বাসায় প্রায় সন্ধ্যা লাগো লাগো সময়ে ফিরতাম আমার ছোটো ভাইবোনকে নিয়ে। যা হোক, বিকেলবেলা আশেক লেন থেকে দূরে একটি চায়ের দোকানে এক কাপ চা ও একটা বিস্কুট কিনে রেডিওর সামনে বসে গেলাম বেশ কৌতূহল নিয়ে বঙ্গাবন্ধুর বক্তৃতা শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। রমনার ময়দানে যাই নি মানুষের ভিড়ের ভয়ে। মানুষের মিছিল দেখতে এবং মিছিলে অংশ নিতে ভালো লাগে আমার, কিন্তু ভিড়-ভীতি আজ অব্দি রয়ে গেছে। সত্যি কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই।

লক্ষ করেছি, বঙ্গাবন্ধুর এই অবিস্মরণীয় বক্তৃতার শেষ পঙ্‌ক্তির শেষ দু'টি শব্দ পরবর্তী অনেক মুদ্রিত ভাষণে উল্লিখিত হয় না। তাঁর বক্তৃতার কোনও অংশে কাঁচি চালানো কি উচিত? এটি আমি ঘোর অন্যায় বলে মনে করি। সেই দু'টি শব্দ মুদ্রিত থাকলেও বক্তৃতার মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হত না বলেই মনে করি। যারা এই কাজটি করেছেন, আমার বিবেচনায়, ভালো করেন নি। বরং সেই মহান নেতা, জাতির পিতাকে ঈষৎ খাটো করেছেন। আমি আমার তখনকার শ্রবণশক্তিকে অবিশ্বাস করতে পারি না।

যা হোক, যতদূর মনে পড়ে ২৩ কিংবা ২৪ মার্চ আমরা অনেকে তোপখানা রোডে লেখক শিবিরের দপ্তরে আহমদ ছফার উদ্যোগে আয়োজিত একটি সভায় যোগদান করি। সেই সভায় উপস্থিত বেশ ক'জন প্রবীণ ও নবীন শিল্পী, সাহিত্যিক বর্তমান পরিস্থিতিকেন্দ্রিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। আলোচনা শেষে আমাদের একটি বিবৃতি সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠানো হয়। পঁচিশে মার্চ সেই প্রতিবাদী, তদানীন্তন পরিস্থিতিকেন্দ্রিক বিবৃতিটি ছাপা হয়। পঁচিশে মার্চের আগে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সম্পাদকীয় পাতায়, যতদূর মনে পড়ছে, পর পর তিন দিন সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ শামসুল হক এবং আমার একটি করে তখনকার পরিস্থিতিকেন্দ্রিক প্রতিবাদী কবিতা ছাপা হয়। সম্ভবত সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার শিরোনাম ছিল 'তোমরা বাংলা ছাড়ো'; সৈয়দ হক এবং আমার কবিতার শিরোনাম মনে পড়ছে না। তখন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ 'গর্বিত পিতার মুখ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেটি কোথায় ছাপা হয়েছিল, কিংবা তখনকারই লেখা তাঁর 'সুন্দরবনের বাঘ' কোন পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এই উপরে রচিত স্তবক শেষ করাব সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেখানে রংপুরে বসবাস করা বন্ধু এবং কবি কায়সুল হকের কথা। জানি না, কী এক মায়াবী, অবুঝ ইঙ্গিতের ফলে আতঙ্কিত হয়ে তিনি সপরিবার শ্বশুরবাড়ি মালদহে চলে গেলেন অনির্দিষ্টকালের জন্যে। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন তাঁর সদ্য লেখা এবং স্থানীয় একটি ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত 'তোমার সোনার খোকন সৈনিক এখন' শীর্ষক কবিতাটি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণী, কলকাতা থেকে 'সংবাদ পরিক্রমা' অনুষ্ঠানের আবৃত্তি করেছেন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে।

## ॥ ছাপ্পান্ন ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'। তিনি এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর কালের জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে হিংসা, দ্বেষ ও হানাহানি লক্ষ করে। তিনি বিশ্বে হানাহানি, হিংসার সর্বনাশা দাবদাহ দেখে বলা বাহুল্য, উল্লসিত বোধ করেন নি। বিশ্বজোড়া হানাহানি দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, মানুষ অন্যকে ধ্বংস করে নিজের ধ্বংসকেও আমন্ত্রণ জানায়। আমরা কি লক্ষ করি নি শক্তি মদমত্ত হিটলার তার এবং স্বদেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল আখেরে? যে আগুন সে লাগিয়েছিল অন্যদের ধ্বংস করার জন্যে সেই আগুনেই পুড়ে ছাই হল স্বয়ং সে এবং প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত হল জার্মানি। সেই ভস্মস্তূপ থেকে পুনরুজ্জীবিত হতে, সমৃদ্ধিশীল হতে লাগল দীর্ঘ সময়।

এটি তো আমরা লক্ষ করেছি পাকিস্তানের অধিকাংশ বাসিন্দা এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী অনেক বিহারী ছিল বাঙালি-বিদ্বেষী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এবং আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক অবাঙালি ব্যক্তি এখন আছেন এবং সেই আমলেও ছিলেন যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি-প্রেমী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রয়াত উর্দু কবি নওশাদ নূরী। তিনি, বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, মানুষ এবং কবি হিসেবে ছিলেন অসামান্য। নওশাদ নূরী আগে বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। পাকিস্তানের জন্ম তাকে ঢাকাবাসীতে রূপান্তরিত করেছিল। এই প্রগতিশীল উর্দু কবির অনেক কবিতা পাকিস্তান এবং ভারতের পত্রপত্রিকায় মর্যাদা সহকারে প্রকাশিত হত। তাঁর কিছু কিছু কবিতা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনিও ক'জন বাঙালি কবির কবিতা সোৎসাহে পড়ার চেষ্টা করেছেন। সেই কবিদের অন্যতম আমিও। এই তথ্য আমার অজানা ছিল না।

ফজল শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্রায়শই 'দৈনিক বাংলার' বিপরীত একটি দোতলা অফিসে যেতেন আড্ডার আকর্ষণে। সেই অফিসটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন সেকালের চিত্রনায়ক হারুন। অফিসের নাম 'হারুন এন্টারপ্রাইজ'। অভিনেতা হিসেবে তিনি এখন বিস্মৃতপ্রায়। তবে সজ্জন হিসেবে তিনি এতকাল পরেও অনেকের কাছে স্মরণীয়। বহু বছর আগের মতোই ফজল শাহাবুদ্দীন এখনও তাঁর বন্ধু এবং সহযোগী হিসেবে টিকে আছেন। কিছু কিছু বন্ধুত্বে দুর্ভাগ্যবশত কালো ছায়া পড়ে, এ ক্ষেত্রে তা ঘটে নি বলেই অনুমান করি। শুভ বন্ধুত্ব খুবই কাঙ্ক্ষনীয় ও বিরল।

আমি কখনও সখনও 'হারুন এন্টারপ্রাইজ'-এ আড্ডার লোভে যেতাম। আমাদের সেকালের আড্ডা জমে উঠত সাহিত্য, ফিল্ম এবং অন্যান্য খুচরো বিষয় নিয়ে। কেউ কেউ নির্দোষ খিস্তি খেউড়ের লোভ সামলাতে পারতেন না। হারুন, অর্থাৎ অফিসের কর্তার তহবিল থেকে টাকাকড়ির বিনিময়ে চা-বিস্কুট তো বটেই, মাঝে মাঝে কাবাব পরোটাও আসত। আমরা তৃপ্তি সহকারে স-গল্প গুজবসহ উদরস্থ করতাম। যা হোক, উর্দু কবি এবং আমাদের আপনজন নওশাদ নূরী 'হারুন এন্টারপ্রাইজ'-এ যেতেন আড্ডার মোহে। ফজল শাহাবুদ্দীন-এর সঙ্গে নওশাদ নূরী'র হৃদ্যতা ছিল। সম্ভবত অধিকসংখ্যক

হিন্দি ও উর্দু ফিলম্ দেখে এবং উর্দুভাষী চিত্রনায়ক, হারুনের সঙ্গগুণের ফলে ফজল মোটামুটি উর্দুতে বাতচিত চালাতে পারতেন। উর্দু কবিতার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। আর হ্যাঁ, আমিও উর্দু কবি ও কবিতা বিষয়ে সামান্য খোঁজখবর রাখতাম, এখনও রাখতে চেষ্টা করি, তবে দক্ষ অনুবাদক জাফর আলমের ধারে-কাছে যাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। উর্দু কবিতা বিষয়ে ঈর্ষাযোগ্য তাঁর জ্ঞান। এই ভাষার বিভিন্ন কবির প্রচুর ভালো কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন বাংলা ভাষায়।

নওশাদ নূরীর বাসায় যাব যাব করে বেশি যাওয়া হয় নি; যতদূর মনে পড়ে, কী একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য একবারই গিয়েছিলাম। তিনি একাধিকবার আমার বাসায় এসেছিলেন। অসুস্থ শরীরে শেষবারের মতো এসেছিলেন আমাদের শ্যামলীর বাসায় আমার মায়ের মৃত্যুর একদিন পর। শোকার্ত আমাকে কয়েকটি কথা বলে আমার হাতে রাইটিং প্যাডের একটি পাতা দিলেন। পাতাটিতে, লক্ষ করলাম, কাঁচা বাংলা হরফে লেখা পঙ্‌ক্তিমালা। সদ্য-রচিত একটি বাংলা কবিতা। তখনই পড়ে ফেললাম। তেমন দীপ্ত নয় শব্দগুচ্ছ, কিন্তু ভাবনায় ধনী। কৃতজ্ঞতায় ভিজে উঠল আমার দু'চোখ। কিছুক্ষণ মূক হয়ে তাকিয়ে রইলাম উর্দু কবি নওশাদ নূরীর অসুস্থ অথচ অন্যধরনের উজ্জ্বল মুখের দিকে।

আমার মার মৃত্যুর পর পরই তাঁকে নিয়ে কোনও কবিতা রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মা মারা যান ১৯৯৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। সেই বছরের ৭ মার্চ আমি লিখে উঠতে পারি 'মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে' কবিতাটি —

কী ক'রে যে তোমাকে শুইয়ে দিতে পেরেছি এখানে
শীতল মাটির নিচে? মা, তুমি নিথর নিদ্রা মুড়ি
দিয়ে আছো; ফাল্গুনের রোদ
বিছানো কাফন-ঢাকা শরীরে, তোমার
উন্মোচিত মুখ স্পর্শ করে শেষবারের মতন।
বজ্রের আওয়াজ কর্জ করে
যদি ডাকি বারবার, তবুও তোমার এই ঘুম
ভাঙবে না কোনওদিন, কোনওদিন আর।

নির্বিকার গোরখোদকের কোদালের
মাটি-খোবলানো ঘায়ে দ্বিপ্রহরে আমার পাঁজর
বোবা আর্তনাদ করে। নিঃসীম অনন্তে
তোমার নিঃসঙ্গ যাত্রা করেছি ধারণ অনুভবে
প্রত্যেকের অগোচরে। হঠাৎ কবরস্তানে ব্যাকুল কোকিল
ডেকে ওঠে রৌদ্র চিরে, নিঝুম দুপুর
আরও বেশি স্তব্ধতায় সমাহিত। মা'র কবরের
পাশে বসে এবং দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ
মা'র আদরের মতো প্রশান্তির স্নেহ পাই; মাটি
ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন বুকে টেনে নেয় তাঁকে।

মানুষের কী স্বভাব! এখানেও কতিপয় লোক কিয়দ্দূরে
তুমুল বচসা করে না জানি কী নিয়ে!
টাকাকড়ি? দলাদলি? কবর-বাঁধানো বিষয়ক
জটিলতা? মাঝে মাঝে নিভৃত কোকিল ডেকে ওঠে।

বলতে বুক পোড়োবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তবু
বলছি মা, তোমার আমার দেখা হবে না কোথাও
কোনও কালে; আমিও তোমারই মতো অস্তিত্ববিহীন
হয়ে যাব কোনওদিন, শুধু
মাঝে মাঝে ধু ধু স্মৃতিকণারূপে ছুঁয়ে
যাব কি যাব না কারও কারও ভুলো মন!
মা, তোমার শিয়রে গোলাপ রেখে হৃদয়ে সায়াহ্ন
নিয়ে পথ হাঁটি, প্রাণে ঝরে মরা পাতা,
মৃদু হাওয়া বন্দিনীর শীতল ফোঁপানি,
চোখ বড় বেশি জ্বালা করে।

এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, স্মৃতি কখনও নির্ধারিত নিয়ম অথবা ধারায় প্রবাহিত হয় না। পরের ঘটনা আগে, আগের ঘটনা পরে মনে পড়ে। বুঝি তাই আধুনিক সাহিত্যে চেতনা-প্রবাহ বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। সাহিত্যে তো কথাটি নাহক চালু হয় নি। এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলেই চেতনা-প্রবাহের দিকে ঝুঁকেছি। আমি ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি উসকানিতে বিহারীদের দাঙ্গা-ফ্যাসাদের কথা বলতে গিয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, উদারচিত্ত একজন বাঙালিপ্রেমী, প্রগতিশীল উর্দু কবির কথা বলতে কোনও কোনও ভিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি।

এবার আমি ফিরে যাব ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর দুরভিসন্ধি, বাঙালি স্বার্থ-বিরোধিতা ও চক্রান্তের বিষয়ে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা গড়িয়ে নিতে নিতে আখেরে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মিলিত সিদ্ধান্ত অশুভ পরিণামের দিকে ধাবিত হয়। ১৫ মার্চ করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো একগুঁয়েমি কায়েম রেখে বলেন যে, শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের দৌলতে পাকিস্তানে শাসন পরিচালনা অসম্ভব। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে আওয়ামী লিগ এবং তার দল পিপলস পার্টিকে শাসনভার অর্পণ করতে হবে। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান পেশোয়ার আইনজীবী সমিতির এক সভায় স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'এই মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দু'অংশকে একত্রে ধরে রেখেছেন। সংখ্যাগুরু দলের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক এবং এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রসম্মত।'

কিন্তু ইতিহাস নেপথ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনার। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো কেউই কোনও সুস্থ ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজি হন নি। ফলে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হল। কেউই সেই ইতিহাসের গতিরোধ করতে পারে নি, বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড়ল আকাশে বাতাসে।

পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'বিশ্বের কোনও শক্তিই পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসঙ্গত দাবিকে নস্যাৎ করতে পারবে না। জনতার দাবিকে শক্তির দাপটে দাবিয়ে রাখার জন্য যদি কেউ রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে আমরা তা বরদাশত করব না এবং তা নিশ্চিহ্ন করে দেব।'

পঁচিশে মার্চ প্রাক দুপুরে ডিউটি ছিল আমার 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে। আমার কামরায় বসে সেদিনের ফাইলবন্দি দৈনিক পত্রিকাগুলোয় চোখ বুলোতে শুরু করলাম। হঠাৎ 'মর্নিং নিউজ'-এর পাঠকদের চিঠিপত্রের স্তম্ভে একটি বিশেষ চিঠি বাঙালি এবং আওয়ামী লিগ-বিরোধী বাক্যে আপাদমস্তক ভর্তি। ভীষণ রাগ হল আমার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্রের ওপর। ছুটে গেলাম প্রতিবেশী 'মর্নিং নিউজ'-এর বার্তা বিভাগে। সেখানে প্রবেশ করে দেখি সারা ঘরে বৈরী বাতাসে কম্পমান নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাঙালি সাব এডিটর রহমত আলী। অন্য কাউকে না দেখে আমি অসহায়, নিরীহ রহমত আলীর ওপরই মনের ঝাল মিটালাম। আমার কাছে 'মর্নিং নিউজ'-এর ওরকম একটি চিঠি ছাপা হওয়াকে অশুভ সঙ্কেত বলে মনে হল। সেই চিঠিকে কেন্দ্র করে সারাদিন আমার কামরায় অনেক কথা হল সহকর্মীদের কারও কারও সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। কিছু কিছু পথ হেঁটে পৌঁছে গেলাম স্টেডিয়ামে। সেখানে একটি পুস্তক সমৃদ্ধ লাইব্রেরির সম্মুখে দেখা হয়ে গেল নূরুল ইসলাম খানের সঙ্গে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মচারি এবং লেখক তিনি। কয়েকটি ভালো উপন্যাস লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, 'কথাসাহিত্য' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন লেখকের ছোটগল্পের তিনটি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কথাবার্তা বেশ উপভোগ্য মনে হতো আমার কাছে। দীর্ঘকাল এই সাহিত্যিক এবং প্রাক্তন সিএসপি কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা নেই। তাঁর সঙ্গ, স্বীকার করছি, বেশ উপভোগ্য ছিল। আজও তাঁর কথা মনে পড়ে।

যাই হোক, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ-এর সন্ধেবেলার কথা ঘন ঘন মনে পড়ে আমার। সেই সন্ধ্যায় মন খারাপ ছিল আমার দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর অশুভ চিঠিটি পড়ে, অন্যান্য ঘটনা তো ছিলই মনে কাঁটা বিঁধানোর প্রক্রিয়ায়। নূরুল ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা হলেই, অন্যদের সঙ্গে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করলে; এই লেখকের কোনও কোনও কৌতূহল-উদ্দীপক ঘটনার কথা মনে পড়ে যেত। বহু আগে তিনি তখন নূরুল ইসলাম খান সবুজ তরুণ, 'কাফেলা' পত্রিকায় পূর্ব বাংলার কবিতা বিষয়ে একটি মজাদার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি তালিম হোসেন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'তালিম হোসেন-এর তালিমারা কবিতা!' পঁচিশে মার্চ-এর সন্ধ্যারাতে তিনি একটি লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের বড় দুঃসময় আসছে। রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পারে পাকিস্তান আর্মি।' তাঁর এই আশঙ্কামূলক উক্তি সে-রাতেই প্রমাণিত হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হল ও শিক্ষকদের বাসভবনে ঘটল পাক সেনাদের তাণ্ডব, গুলির বৃষ্টিতে প্রাণ হারালেন অনেক

শিক্ষক এবং ছাত্র। মধ্যরাতে আমার স্ত্রী জোহরা এবং আমার ঘুম ভেঙে গেল গোলাগুলির আওয়াজে। কী ঘটছে, ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝতে পারি নি। এত ক্লান্ত ছিলাম, এত ঘুমকাতর হয়ে পড়েছিলাম যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এলিয়ে পড়লাম এক ধরনের নিশ্চেতনার তিমিরাচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ, গা ছমছম-করা প্রান্তরে। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্যান্য সকালের মতো মনে হল না। কেমন গা ছমছমে ভাব আর চাপা গুঞ্জন চারদিকে, যেন সারা শহর ভীষণ আতঙ্কিত, লাশের গন্ধে ভরপুর। একটু পরেই ঢাকা বেতারে কেমন অ-বাংলা টানে বাংলা ঘোষণা ধ্বনিত হল কয়েকবার। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লিগের অন্যান্য নেতা কিংবা ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক নেতা বিষয়ে সেই অদ্ভুত উচ্চারণময় কণ্ঠস্বর নিশ্চুপ। অবশ্য বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এসেছে পাকিস্তানি সেনাদের তাণ্ডবের কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনিবাসে বসবাসকারী ছাত্রদের খুন হওয়ার খবর। জানা গেল বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. মনিরুজ্জামান এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক নিহত হলেন। 'পাক' শব্দটির বাংলা অর্থ পবিত্র। পবিত্রতার কী বাহারই না দেখাল পাকিরা!

পঁচিশে মার্চ রাতেই পাক সেনারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। ইচ্ছা করলেই তিনি আওয়ামী লিগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে চলে যেতে পারতেন ভারতে ২৫ মার্চ রাতে। কিন্তু তিনি তা করেন নি তাঁর নিজস্ব বিবেচনার তাগিদে। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, তিনি যদি গা-ঢাকা দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডবাসী হন বিপ্লবী নেতাদের মতো তাহলে তাঁর সন্ধানে পাক সেনারা দেশ জুড়ে হাটে মাঠে ঘাটে, বাড়িতে তাণ্ডব এবং খুনখারাবি করে বেড়াত। এজন্যে অসংখ্য বাঙালি প্রাণ হারাত। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিবেচনায় তিনি ঠিক কাজটি করেছিলেন। ফলে আখেরে সাপ মরেছে, লাঠিও ভাঙে নি। যারা মুজিব-বিরোধী তারা ব্যাপারটিকে ঘোলাটে করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাতকাহন বক্তব্য জুড়ে দেয়। ছাব্বিশে মার্চ সারাদিন ও রাত অব্দি ছিল কারফিউ। সেদিনই আমাদের ৩০ আশেক লেনের বাসার প্রায় লাগোয়া নয়াবাজারে পাক সেনারা অগ্নিসংযোগ করে। জোহরা, আমি এবং আমাদের পাঁচ সন্তান দোতলার জানালা দিয়ে দেখছিলাম জড়িয়ে যাওয়া আগুনের ভয়ংকর জিহ্বা। পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। আগুনের তাপ এসে লাগছিল যেন আমাদের মুখে। দেড় দু'মাস পরে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে এসে লিখেছিলাম 'তুমি বলেছিলে' শীর্ষক একটি কবিতা। সেদিনের আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরার ভয়ার্ত দৃষ্টি এবং গলিতে শিশুসন্তান কোলে নিয়ে ছুটে যাওয়া তরুণীর অসহায়তা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল কবিতাটি —

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার
পুড়ছে দোকানপাট কাঠ,
লোহালক্কড়ের স্তূপ, মসজিদ এবং মন্দির।
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।

বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘর-বাড়ি।

পুড়ছে টিনের খাঁচা, রবীন্দ্র রচনাবলী, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার,
মানচিত্র, পুরনো দলিল।
মৌচাকে আগুন দিলে যেমন সশব্দে
সাধের আশ্রয়ত্যাগী হয়
মৌমাছির ঝাঁক,
তেমনি সবাই
পালাচ্ছে শহর ছেড়ে দিগ্বিদিক। নবজাতককে
বুকে নিয়ে উদ্ভ্রান্ত জননী
বনপোড়া হরিণীর মতো যাচ্ছে ছুটে।
অদূরে গুলির শব্দ, রাস্তা চষে জঙ্গী জীপ। আর্ত
শব্দ সবখানে। আমাদের দু'জনের
মুখে আগুনের খরতাপ। আলিঙ্গনে থরথর
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও এই বর্বর আগুন থেকে, আমাকে বাঁচাও,
আমাকে লুকিয়ে ফেলো চোখের পাতায়,
বুকের অতলে কিংবা একান্ত পাঁজরে,
শুষে নাও নিমেষে আমাকে
চুম্বনে, চুম্বনে।'

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার,
আমাদের চৌদিকে আগুন,
গুলির ইস্পাতী শিলাবৃষ্টি অবিরাম।
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও।'
অসহায় আমি তা-ও বলতে পারি নি।

## ॥ সাতান্ন ॥

সাতাশে মার্চ কারফিউ ভাঙার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা সামান্য কাপড়চোপড় এবং সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আম্মার কাছে মাহুতটুলির বাড়িতে চলে গেলাম। তবে পরিচারিকা ইউসুফের মাকে ফেলে যাই নি তাড়াহুড়োয়। ইউসুফের মা আমাদের পাঁচটি ছোটো সন্তানকে, মনে হত, নিজের সন্তানের চাইতেও বেশি আদরযত্ন করত। বারবার এর প্রমাণ পেয়েছি। কখনও কখনও নিজের বাসন থেকে তার বরাদ্দ খাবারের কিছু অংশ তুলে খাওয়াত। তাকে আমি সম্মান করতাম, পছন্দ তো করতামই। সে তা বুঝতে পারত। একবার ইউসুফের মা'র উপর খেপে গিয়ে কড়া কথা বলেছিলাম। অভিমান করে সে মীরপুরের গ্রামীণ এলাকায় চলে গেল। আমিও বাধা দিই নি। সে চলে যাওয়ায় বাড়িটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরা এবং ছেলেমেয়েরাও কেমন যেন চুপসে গেল। সত্যি বলতে কী, নিজেকে ধিক্কার দিলাম মনে-মনে।

দুদিন পরই জোহরা এবং আমি বেশ কষ্ট করে দূরের সেই মীরপুরের অনেক ভেতরের বাড়িটিতে গেলাম, যেখানে ওরা থাকত। আমাদের দেখে তো ইউসুফের মা-সহ প্রতিবেশী অনেকেই থ! আমাদের দুজনকে ইউসুফের মা যত্নআত্তি করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটিকে প্রশ্রয় দেয় নি। সে বিশ্বাস করতে পারে নি যে, আমরা ওকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে এতদূরে আসব। আমাদের আন্তরিক অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারে নি।

যা-ই হোক, মাহুতটুলি যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে নিতে ভুলি নি। তখন আমি আশঙ্কা এবং ভীতিতে দিশেহারা। মাহুতটুলিতে পৌঁছে কিছু স্বস্তি পেলাম বটে, কিন্তু অস্থিরতা, ভয় ও দুশ্চিন্তা কাটে নি। ইউনিভার্সিটি এলাকায় পাকিস্তানি হানাদারদের তাণ্ডবের ব্যাপার, অধ্যাপক, ছাত্রনিবাসগুলোর বাসিন্দাদের রক্তাপ্লুত লাশ আমার কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে। আমি ভয়ানক শিউরে উঠি, গা কেমন ঘুলিয়ে ওঠে খাওয়ার সময়, খাদ্যের লোকমা হাত থেকে মুখে উঠতে চায় না। দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে আমার শিক্ষক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের তুখোড় অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, দর্শনের আত্মভোলা ভালো মানুষ, ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের চেহারা দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে, মন কেমন করে। পাকসেনারা আরও যাদের হত্যা করে তাঁরা হলেন ড. মনিরুজ্জামান, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আবদুল মুকতাদির, শরাফত আলী, মোহাম্মদ সাদেক, সাদত আলী এবং আনিসুর রহমান।

সারাক্ষণ ভাবছি, কী ঘটবে? কী হবে পরিণতি আমাদের? আমাদের মাহুতটুলির বাসার দোতলায় বসে ভাবছি, আখেরে আমরা বাঁচতে পারব তো? শেখ মুজিবুর রহমানকে তো ২৬ মার্চেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লিগ নেতা বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। বিকেল ছুঁই-ছুঁই সময়ে অচেনা এক রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত হল এক ক্ষীণ আশা-জাগানিয়া খবর। প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে শেখ মুজিবের এক বাণী প্রচারিত হল। বাণীটি প্রচারিত হল সদ্য নতুন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। আলোক-শিখার মতো জ্বলে উঠলাম সেই বাণী শুনে। কালুরঘাট থেকে প্রচারিত 'মহান নেতা ও বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক মুজিবুর রহমানের পক্ষ হতে' স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন মেজর জিয়াউর রহমান।

তখন এই ঘোষণা অত্যন্ত আশান্বিত করল আমাদের। তাহলে সামনে আমাদের শুধু অন্ধকার নেই, আলোর ঝলকও বিদ্যমান। মার্চ মাসের একেবারে শেষপ্রান্তে স্থির করলাম কয়েকজন ছাড়া আমরা সবাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাব। ঢাকায় থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না, ঝুঁকি অনেক বেশি। জানি না কখন হায়েনারা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনওমতে লুকিয়ে চুরিয়ে রওয়ানা হলাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে। একটু বেশি মন খারাপ হল ইউসুফের মা-র জন্যে। ওকে সঙ্গে নিতে পারলাম না প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। আম্মা বললেন ওকে আমার চাচাতো বোন হাসিনা আর তার পরিবারের কজন সদস্যের কাজ করার জন্যে। আম্মার কথার ওপর তো আর কথা বলতে পারি না। আখেরে চুপ থাকতেই হল এবং আমাকে বুঝল ইউসুফের মা।

সকাল দশটা সাড়ে দশটার সময় ঢাকা থেকে বাসে চেপে রওয়ানা হলাম নরসিংদীর উদ্দেশে। সেখান থেকে নৌকোয় মেঘনা নদী পেরিয়ে পৌঁছতে হয় আমাদের পাড়াতলীর আলুঘাটায়। সেখানে কিছুপথ পেরুলেই আমাদের মুন্সিবাড়ি। এটা বলা তো খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু সেদিন পাড়াতলীতে পৌঁছুতে তেমন অনায়াস ছিল না। শুরু হল আমাদের যাত্রা বাসের দুলুনি খেতে খেতে। মনে সংশয়, বিপদের আশঙ্কা পদে পদে। ডেমরার কাছে এক জলাশয়ে দেখতে পেলাম ভাসমান চার-পাঁচটি মৃতদেহ। পাক হানাদারদের করুণ শিকার। চোখ ফিরিয়ে নিলাম সেই দৃশ্য থেকে পলায়নপর আমি। বাস থামল পথের নানা জায়গায়। সেসব জায়গায় অনেক সহানুভূতিশীল মানুষ আমাদের একটু সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন চিড়া, গুড়-মুড়ি, পানি ভরা জগ আর গ্লাস নিয়ে। ওদের এই দাক্ষিণ্যের সম্মানার্থে আমরা তৃপ্তির সাথে খেলাম। জঠরে ক্ষুধাও জ্বলছিল অগ্নিশিখার মতো। অমৃত সদৃশ সেই নাশ্‌তার জন্যে মেজবানদের কৃতজ্ঞতা জানালাম। অপরিচিত, অনাহুত অতিথিদের এরূপ সেবা অভাবনীয়। কৃতজ্ঞতায় সেদিন চোখে পানি এসে গিয়েছিল। এখনও এই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর সময়েও হয়তো কোনও কোনও গ্রামীণ এলাকায় এমন আতিথেয়তা টিকে রয়েছে। নরসিংদী স্টেশন এলাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্যের রাগান্বিত আচরণ বেশ টের পেতে শুরু করলাম। ছোটোদের আরও বেশি কষ্ট হচ্ছে, বোঝা গেল। কিন্তু অবোধ শিশুরা ভ্রমণের আনন্দের প্রভাবের জন্যেই হয়তো তেমন কষ্টের কথা কাউকে বলছিল না। এপ্রিল ছুঁই-ছুঁই সময়ের গরমও আমার কাছে অসহনীয় ঠেকে। আমি বেশ কিছুটা কাতর হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু নালিশ করব কার কাছে? কার কাছেই বা প্রকাশ করব নিজের মনোভাব? নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনে তখন বেশ কজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন অনেক যাত্রীর সঙ্গে। এই যাত্রীদের মধ্যে আমার ছোটো ভাই ব্যারিস্টার তোফায়লুর রহমান এবং অন্যজন ব্যারিস্টার সুদর্শন আবদুল মুমতাকিম চৌধুরী। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আওয়ামী লিগ কর্মী। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তিনি আওয়ামী লিগ আমলে মন্ত্রী ছিলেন। অনেক আগে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হত। বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। তিনি কোথায় আছেন এবং আদৌ আছেন কি-না তা সুদ্ধ জানি না।

যা-ই হোক, নৌকো না মিললে আজ পাড়াতলীতে পৌঁছুনো অসম্ভব, এতে কোনও সন্দেহ নেই। রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক স্বর্গীয় উপহার হিসেবে একটি বেশ বড়োসড়ো নৌকো এসে তীরে ভিড়ল। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নিজের চোখ দুটোকে। তক্ষুনি আমরা ছুটে গেলাম নৌকাটির দিকে। কোনওরকম দরাদরি না করে মাঝিদের চাহিদা মেনে নিলাম। আমরা নৌকোয় উঠেই নিলাম স্বস্তির নিশ্বাস। নৌকো নোঙর তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পাটাতনে শুয়ে হাত দিয়ে মেঘনা নদীর শীতল পানি স্পর্শ করলাম কিছুক্ষণ। ওদিকে সূর্য তার শেষ রশ্মি ছিটোতে শুরু করেছে সর্বত্র। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় হতে লাগল ডাকাতের হামলার আশঙ্কার কথা ভেবে। শেষে ঢাকায় পাক-হানাদারদের হাতেও নিপীড়ন, মৃত্যুর কালো হাত থেকে পালিয়ে এসে ডাকাতের ভয়ংকর কবলে না পড়তে হয়। তাহলে তো প্রায় তীরে এসে ডুববে তরী।

না, কোনওরকম বিপদ আপদের মুখোমুখি আমাদের হতে হয় নি। আলুঘাটায় এসে যখন আমাদের নৌকো ভিড়ল তখন প্রায় মধ্যরাত। আব্বার তৈরি আমাদের দালানে পৌঁছুনোর আগে আমাদের মুন্সিবাড়ির এলাকায় পেরিয়ে আসতে হল ফুফুর শূন্য বাড়ি, আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দারোগাবাড়ি, বড়ো চাচার বাড়ি, কবরস্তান ঘেঁষা পুরনো মসজিদ। আমাদের দালানের ভেতরে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল প্রয়াত পিতা, দাদা, নানা, চাচা এবং আরও কেউ কেউ আমাদের স্বাগত জানালেন আলিঙ্গানের মাধ্যমে। বাড়ির ঘরের সামনের অযত্নে বেড়ে-ওঠা বাগানের নানা ফুলের সুঘ্রাণে মদির হয়ে উঠল মন! ঘরের খালি মেঝেতেই শুয়ে পড়লাম বালিশ ও তোষকের তোয়াক্কা না করেই। কখন যে ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল টেরই পাই নি। ঘুম ভাঙল ভোরে পাখির মধুর ডাকে। এই যে পাখির ডাক শুনে, গাছপালার সবুজাভা ও নীল আকাশের স্নিগ্ধ রূপ দেখে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, এর কারণ নিরাপত্তার আশ্বাস। আমাদের গ্রামের অবস্থানই এমন যে এখানে পাক খুনিরা সহজে হানা দিতে পারবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে, পুকুরের পাড়ে। কিছুক্ষণ আমাদের পারিবারিক কবরস্তানের সামনে সশ্রদ্ধ দাঁড়িয়ে ফিরে এলাম বাড়ির ভেতর। সারা দুপুর এবং রাতে কিছুই খাওয়া হয় নি শুধু হাওয়া ছাড়া। সকালে আম্মার হাতে তৈরি নাশ্‌তা অমৃতের মতো মনে হল।

খবর পাওয়ার একমাত্র উৎস ছিল রেডিও। প্রায় সারাক্ষণই খুলে রাখা হত, কান পেতে শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী এবং বি.বি.সি.। তবে লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই ভল্যুম চড়িয়ে। কারণ পাড়া-পড়শিদের কয়েকজন হাজির হতেন সংবাদ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতার শোনা যেত না সেদিন সবকিছু কেমন আবছা মনে হত। এক ধরনের মনের তো বটেই, সারাদিনের মুখও নিরাশায় কালো হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ সেই বেতার কেন্দ্র সচল হলেই মনে সূর্যোদয়।

এপ্রিল মাসের সাত অথবা আট তারিখ দুপুরের কিছুক্ষণ আগে বসে ছিলাম আমাদের পুকুরের কিনারে গাছতলায়। বাতাস আদর বুলিয়ে দিচ্ছিল আমার শরীরে। পুকুরে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরীও ছিল ক'জন, সাঁতার কাটছিল মহানন্দে। হঠাৎ আমার মনে কী যেন বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো খেলে গেল। সম্ভবত একেই বলে প্রেরণা। কবিতা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চট্‌জলদি আমার মেজচাচার ঘরে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে একটি কাঠপেনসিল এবং কিছু কাগজ চাইলাম। সে কাঠপেনসিল এবং একটি রুলটানা খাতা দিল। এই খাতা পেনসিল দিয়ে সে যেন নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করল। আমি সেই কাঠপেনসিল এবং খাতাটি নিয়ে সাততাড়াতাড়ি পুকুরের দিকে ছুটলাম। পুকুর মুন্সীবাড়ির একেবারে গা ঘেঁষে তার অবস্থান ঘোষণা করছে যেন সগর্বে। পুকুরের প্রতিবেশী সেই গাছতলায় আবার বসে পড়ে খাতায় কাঠপেনসিল দিয়ে শব্দের চাষ শুরু করলাম। প্রায় আধঘন্টা কিংবা কিছু বেশি সময়ে পর পর লিখে ফেললাম দু'টি কবিতা — 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'।

আমরা প্রায় দেড় মাস পাড়াতলীতে ছিলাম। এই দেড় মাসের মধ্যে বহুবারই পারিবারিক গোরস্তানের সামনে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়েছি প্রয়াত গুরুজনদের সম্মানার্থে, নানাভাই, আব্বা এবং আরও কারও কারও আবছা মুখ ভেসে ওঠে। বাড়ির

লাগোয়া মসজিদের বাইরের বাঁধানো চত্বরে গিয়ে বসতাম মাঝে মাঝে, বিশেষত চাঁদনি রাতে। মসজিদের চত্বরে বসলেই এই পবিত্র প্রার্থনাঘরের গা-ঘেঁষে-থাকা কবরস্তান ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যেত। কখনও কখনও মন উদাস হয়ে যেত গুরুজনদের অভাবে, নিজের মৃত্যুর কথা ভেবে। যার আমাদের গ্রামের বাড়িতে বারো মাস থাকেন বছরের পর বছর, তাদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় জানতে ইচ্ছে করেছে বহুবার, কিন্তু কেন জানি না আজ অব্দি সেই প্রশ্ন আমার মনেই রয়ে গেছে।

একদিন বিকেলে আমরা ক'জন নৌকোয় নদী ভ্রমণে বের হলাম। নদী-সংলগ্ন একটি উদার খালে যেতে-যেতে তীর থেকে ভেসে এল গানের সুর — 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' একটু কাছে আসতেই চোখে পড়ল একজন রাখাল বালক তন্ময় চিত্তে গানটি গাইছে। ভুল সুর, ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ। কিন্তু ওর এই নিবেদনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই, খুবই খাঁটি ওর আবেগ। একধরনের পবিত্র আবেগ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

## ॥ আটান্ন ॥

আমাদের পাড়াতলী গাঁয়ের সতেজ হাওয়া, খোলা সবুজ মাঠ, নদীর বুকে নৌকোয় গা এলিয়ে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে-করতে মুক্ত পরিবেশে দিন কাটাচ্ছিলাম। মনে প্রেরণা জাগাত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নানা অনুষ্ঠান। বিশেষ করে এম.আর. আখতার মুকুলের 'চরমপত্র' অত্যন্ত উদ্দীপিত করত আমাদের। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সন্ধেবেলা চাদরে মাথা-ঢাকা একজন যুবক এসে হাজির হলেন আমাদের বাড়ির সামনে। যুবকের মুখটি আবিষ্কার করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। কমিউনিস্ট পার্টির মতিউর রহমান। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছেন অন্যান্য আরও ক'জনের সঙ্গে। আমিও যাব কিনা, তিনি জিজ্ঞেস করলেন আন্তরিকভাবে। আমি তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে বাড়ির ভেতরে গেলাম আম্মার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্যে। ভেতরে গিয়ে আম্মাকে বললাম যে, আমি কলকাতায় চলে যেতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেই যাব, তার আগে নয়। তিনি আমার দিকে বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, 'তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে!' তাঁর কণ্ঠস্বরের যুগপৎ বেদনা এবং বিস্ময় ছিল। আম্মার মনোভাব স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। ফিরে এসে মতিউর রহমানকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। মতিউর রহমান বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি তার চলার পথে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, যতক্ষণ না তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেলেন এবং আমিও পড়ে রইলাম ভিন্ন তিমিরে।

পাড়াতলীতে প্রায় দেড় মাস কাটানোর পর আমার টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেল। এভাবে শূন্য হাতে এখানে আর পড়ে থাকা যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি যত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হোক ওসব দেখে এবং পাখির গান শুনে তো আর ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। তাই দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকা শহরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তাই সঙ্গে যেটুকু সহায়-সম্বল এনেছিলাম উপদ্রুত ঢাকা থেকে সেটুকু গুছিয়ে-গাছিয়ে রওয়ানা হলাম পুরনো বাসস্থলের দিকে। পাড়াতলী ছেড়ে আসতে মনে বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে এল সত্য, নিরাপত্তার অভাবও হুল ফোটাতে লাগল একইসঙ্গে, কিন্তু উপায় কী?

ঢাকা শহরে ঢুকতেই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। মনে হল, এক ছন্নছাড়া গোরস্তানে প্রবেশ করেছি। সারাক্ষণ মনে আশঙ্কা — না জানি কী অঘটন ঘটে যায়। ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছিলাম চারদিকে। মনে হচ্ছিল, মৃতের নগরে প্রবেশ করেছি। পথে যে দু'চারজনের মুখ দেখা গেল, সেগুলো মৃতের মুখ, জীবনের একরত্তি আভাও নেই। আমাদের ৩০ নম্বর আশেক লেনের বাড়িতে এসে প্রবেশ করতেই দেখি, উঠোন জুড়ে গজিয়েছে আমার বড়ো কন্যার উচ্চতা সমান সবুজ ঘাস আর সেই ঘাসের ভেতরে নিশ্চিন্তে আরাম পোহাচ্ছে একটি ধবধবে সাদা বেড়াল। সেদিনের অভিজ্ঞতা আমার 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের পূর্বলেখ অংশটি হুবহু উদ্ধৃত করছি, 'চারদিকে বিষণ্ণ স্তব্ধতায় নিঝুম। দেড় মাস আমরা কেউ ছিলাম না, আর এরই মধ্যে উঠোনের ঘাসগুলো এত ডাগর হয়ে গেছে; ফুলের চারাগুলোও বেড়ে উঠেছে অনেকখানি মনে হল। সাদা বেড়ালটাকে আগে দেখি নি। মনের মধ্যে নানা ছবির আনাগোনা; টুকরো টুকরো এলেবেলে সব ছবি, কখনও পরপর সাজানো কখনও বা সম্পূর্ণ পারম্পর্যহীন। দেড় মাসে আমি এক আলাদা মানুষ হয়ে গেছি। মাথার চুলে পাক ধরেছে, জীবন-মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদলে। এক ধরনের খাপছাড়া ঔদাস্য যেন আমাকে দখল করে নিয়েছে, অথচ জীবনতৃষ্ণাও দুর্মর।'

'উনিশ শো একাত্তরের মে মাসের মধ্যসীমায় দেড় মাস পরে ঢাকায় ফিরে এসে আমাদের বাড়ির উঠোনের দীর্ঘ সবুজ ঘাসে সাদা বেড়ালটাকে দেখে আমার প্রেতায়িত মনেও ক্ষণিকের জন্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। চারদিকের চরম তাণ্ডবের প্রতি উদাসীন এই প্রাণীটিকে বিশ্রাম করতে দেখে কেন জানি একটা আশ্বাসের স্পর্শ পেলাম। এই আশ্বাসের বড়ো প্রয়োজন ছিল আমার। এখনও, হ্যাঁ, এখনও মাঝে মাঝে শিউরে উঠি, উনিশ শো একাত্তরের মে মাসের ঢাকাকে স্মরণ করে। তখন আমি, অনেকেরই মতো, আমার এই প্রিয় শহর ঢাকায় সন্ত্রাসবন্দি। সদ্য গ্রাম থেকে ফেরা। পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞের পর নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে ছুটে গিয়েছিলাম এক গণ্ডগ্রামে। আমাদের নিজেদের গ্রামে। দেড় মাস পর ফিরে এসে দেখি, ঢাকা শহরের পথ-ঘাট প্রায় ফাঁকা, রাস্তায় খুব কমই লোকজন দেখা যায়, চেনা মুখের সন্ধান পাওয়া ভার! শুধু নিরুপায় যারা, শুধু তারাই বেরোন পথে, জীবিকার তাগিদে, জরুরি সামগ্রী সংগ্রহের আশায়।'

তখন ঢাকা এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। সুদীর্ঘ ন-মাস আমরা যে পরিবেশে বাস করেছি তাকে কাফকার জগৎ বললে কিছুই বলা হয় না। উৎপীড়ন, হত্যা এবং সন্ত্রাস আমাদের চারপাশে রচনা করেছিল এক ভয়ংকর তমসাচ্ছন্ন ও বিভীষিকাময় পটভূমি। আমরা তৃষিত হয়ে পড়েছিলাম একঝলক আলোর জন্যে। নীরন্ধ্র, শ্বাসরোধকারী সেলের ভিতর বন্দি যেমন ব্যাকুল হয়ে থাকে এক ফোঁটা আলোর জন্যে, ঠিক তেমনি। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, শিশুরা নিশ্চুপ, ফৌজি জিপের গর্জন, ট্রাকের ঘর্ঘর, বুটের শব্দ, আগুন, আর্তনাদ — আমরা এই নিয়েই ঢাকায় ছিলাম তখন। আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতাম। সবসময় মনে হত, কেউ যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। ঘুমের ভেতর চিৎকার করে উঠতাম কোনও কোনও রাতে। বধ্যভূমির ধারে বেঁধে-রাখা জীবজন্তুর

অনুরূপ আমরা আতঙ্ককে জেনেছি নিত্যসঙ্গী বলে। এমন কোনও দিনের কথা মনে করতে পারি না, যেদিন হত্যা কিংবা ধরপাকড়ের কোনও না কোনও খবর কানে না আসত। সেই নরকবাসের সাক্ষী হয়ে আছে তখনকার লেখা আমার কিছু কবিতা। তখন আমি লিখেছিলাম —

কখনও নিঝুম পথে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে কেউ গুলির আঘাতে,
মনে হয়, ওরা গুলিবিদ্ধ করে স্বাধীনতাকেই।
দিন দুপুরেই জিপে এক তরুণকে কানামাছি করে
নিয়ে যায় ওরা:
মনে হয়, চোখ-বাঁধা স্বাধীনতা যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।
বেয়নেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষ্যায় ভাসে:
মনে, স্বাধীনতা লখিন্দর যেন,
বেহুলাবিহীন,
জলেরই ভেলায় ভাসমান,
যখন শহরে ফাটে বোমা, হাতবোমা, অকস্মাৎ
ফাটে ফৌজি ট্রাকের ভেতর,
মনে হয়, স্বাধীনতা গর্জে ওঠে ক্রোধান্বিত দেবতার মতো।
এরই মধ্যে মৃত্যুগন্ধময় শহরে যখন খুব
কুঁকড়ে থাকা কোনও শীর্ণ গলির ভেতর
আঁধারের নাড়ি-ছেঁড়া নবজাতকের
প্রথম চিৎকার জেগে ওঠে,
মনে হয়, স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী
কবিতার মতো
তুমুল ঘোষণা করে অলৌকিক সজীব সংবাদ।

হ্যাঁ, অলৌকিক সজীব সংবাদ। কিন্তু সেই সংবাদ ছাপা হত না কালো, কুটিল কাঁটাতার ঘেরা খবরের কাগজে। সাংবাদিকদের পিঠে বন্দুকের নল উদ্যত সর্বক্ষণ, সামরিক রক্তচক্ষুর নীচে রিপোর্টারের লেখার প্যাড অষ্টপ্রহর। তাই, খবরের কাগজে ছাপা হত শুধু সেইসব খবর যেগুলো ছাড়পত্র পেত ইয়াহিয়া, টিক্কা, নিয়াজি আর তাদের স্যাঙাৎদের কাছ থেকে। তবে কিছু কিছু অলৌকিক সজীব সংবাদ রটে যেত আস্তে-সুস্থে পাড়াপড়শির সাবধানী মুখ থেকে মুখে, কখনও কখনও খবর দেয়া-নেয়া চলত জ্বলন্ত চোখের তারায় তারায়। আমাদের প্রিয় গেরিলাদের খবর, মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের নানা কাহিনি। আমাদের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে ঝিকিয়ে উঠত বিদ্যুচ্চমক।

কখনও চেনা, কখনও বা অচেনা ব্যক্তি নিখোঁজ হতে হঠাৎ। তাঁরা আর ফিরে আসতেন না কখনও। এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করার জো ছিল না কারুর। একটা নিদারুণ মৌন বয়ে বেড়াতাম আমরা সবাই। শুধু বন্ধ ঘরে নীচু স্বরে কথা বলতাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম কানের কাছে, বুকের কাছে রেডিও লাগিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা।

আমরা কথা বলতাম শুধু আস্থাভাজনদের সঙ্গে। কখনও আবার তেমন কোনও বাক্য বিনিময় করতাম না, কথোপকথন চালাতাম চোখের ভাষায়। একদিন আমার এক সহকর্মী ও বন্ধু বললেন বিষণ্ন হেসে, 'রোজ বাইরে বেরুবার আগে আয়নায় আমাকে সেলাম ঠুকে বলি, বিদায়। কারণ সেই আমির সঙ্গে কাল আবার দেখা না-ও হতে পারে।' তার এই আপাত পরিহাসময় কথা শুনে আমার ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল সেদিন। আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই মারাত্মক সত্য ছিল সেই উক্তি, আমরা যারা জীবন নিয়ে জুয়ো খেলেছিলাম, সেই বুলেটবিদ্ধ বিভীষিকাময় দিনগুলিতে। শ্বাসরোধকারী সেই সময়ে, মনে পড়ে, আমার এক তরুণ সহকর্মী, ক্ষণিকের জন্যে হলেও, কিছু হাওয়া বইয়ে দিতেন আমাদের মধ্যে। তার কাছে থেকে শোনা যেত টুকরো টুকরো খবর এবং সেসব খবর আমাদের ভীতিকে ঘুম পাড়াত, আমাদের দৃষ্টিপথে উন্মোচিত হত স্বাধীনতার মুক্ত পথ।

ফাঁদে আটকে পড়া জন্তুর মতো আমরা ক্ষোভে, ধিক্কারে নিজেরাই নিজেদের হাত-পা কামড়াতাম। কেমন অর্থহীন মনে হত সবকিছু। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের ঠেলে দিয়েছিল হতাশার অতল খাদে! তখন পড়াশোনা, লেখালেখি, অফিসে যাওয়া-না-যাওয়া, খাওয়া-না-খাওয়া সবকিছুই অর্থহীন ঠেকত। পথের কৃষ্ণচূড়া গাছ, পলাশের ডাল, মাঠের সবুজ, আকাশের নীল, রমনার লেক — সবকিছুই কেমন বেগানা হয়ে গিয়েছিল। আমরা অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকি আমাদের একান্ত আপন প্রিয় নিসর্গের দিকে, পৃষ্ঠপোষকতাহীন প্রতিষ্ঠানের দিকে। নিজ বাসভূমে পরবাসী। সেই দীর্ঘ পরবাসে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যেত। তখন কেমন নিষ্ফল অর্থহীন মনে হত কাগজের ওপর শব্দের মিছিল সাজানো, যখন একদা উজ্জ্বল, মুখর ঢাকা শহরে মানুষের জীবন্ত কোনও মিছিল চোখে পড়ে না আর। মোটকথা, এক ভয়াবহ শূন্যতা পেয়ে বসেছিল আমাকে।

যখন এই অর্থহীনতায় ভুগছিলাম চরমভাবে, যখন আহত পশুর মতো নিজের ক্ষত চাটছিলাম নিজস্ব গুহায়, তখন হঠাৎ একদিন মনে পড়ে গেল একটি ছবির কথা। উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি ছবি দেখেছিলাম সংবাদপত্রে — রাস্তার ধারে একজন গুলিবিদ্ধ মানুষ নিজের রক্ত দিয়ে লিখছেন শ্লোগান তার দেশের সপক্ষে, দেশবাসীর সপক্ষে। সেদিন সেই গুলিবিদ্ধ মানুষটিকে স্বাধীনতার নকীব বলে মনে হয়েছিল আমার। এই ছবি উজ্জ্বল হয়ে ফিরে এল আমার কাছে, ফিরে এল বারবার। ভাবতাম, যদি একজন মৃত্যুপথযাত্রী নিজের বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতির জাগরণের জ্বলন্ত স্বাক্ষর আঁকতে পারেন বোবা দেয়ালের গায়ে, যদি একটি পাথুরে দেয়ালকে করতে পারেন অমন ঐতিহাসিক, প্রবল বাঙ্ময়, তবে আমি কেন খাতার পাতা শব্দাকীর্ণ করতে পারব না? আর সেই মুহূর্তেই, সেই কৃষ্ণঋতুতে মনস্থির করে ফেললাম, আমি আবার লিখবই। একাত্তরের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে আমাদের গ্রামে এক দুপুরে লিখে ফেললাম 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', কবিতা দু'টি। জানতাম, এতে অনেক ঝুঁকি আছে, তবু লেখনীকে ক্যাপমুক্ত করলাম। সন্ত্রাসের কাঁটাতারে বিদ্ধ আমি, জঙ্গি জিপের শব্দময় শহরের বুদ্ধবাক বাসিন্দা, গেরিলাদের হঠাৎ পদধ্বনিতে

সচকিত, আশান্বিত এক শ্বাসজীবী কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তি গচ্ছিত রাখতে শুরু করলাম ডায়েরির পাতায়। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে চলছিল আমার এই অভিযাত্রা। শুধু আমার স্ত্রী, দু-চারজন সুহৃদ এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জানতেন সে কথা। খানাতল্লাশির মরশুমে, ধরপাকড়ের হিড়িকে এই ডায়েরিকেও গা-ঢাকা দিতে হয়েছে বার বার। কখনও কোনও আত্মীয়ের বাসায়, কখনও শাড়ির ভাঁজে, কখনও বা রান্নাঘরের সামান্য মশলার নীচে। কয়েক মাসে ভরে উঠল ডায়েরির পাতা, যুগল মলাটের পাহারায় আমার কবিতাবলি এক ভয়ানক তিমিরাচ্ছন্ন ঋতুর ফসল, শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রয়ে গেল এবং এজন্যে সেই অচেনা সংগ্রামী, তেজী মানুষটির কাছে আমি চিরঋণী, যিনি নিজের বুক থেকে ঝরে-পড়া তাজা খুনের অক্ষরে একটি সামান্য দেয়ালকে অর্পণ করেছিলেন অসামান্যতা।

আমি কি বাস্তবিকই এই ছবিটি কখনও দেখেছিলাম কোনও সংবাদপত্রে? নাকি এ আমার পরাবাস্তব অভিজ্ঞতারই এক অবিচ্ছেদ্য, দুর্মর অংশ। উনিশ শো একাত্তরের মার্চ মাসের খবরের কাগজের পাতা ওলটালেই বোঝা যাবে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন একটি ছবি আমি নিশ্চিত দেখেছিলাম। না দেখলেও ক্ষতি নেই। এই যে ছবিটির কথা বার বার আমার মনে পড়ে, এটাই তো এক পরম তাৎপর্যপূর্ণ সত্য; যেমন সত্য দীর্ঘ সবুজ ঘাসে নিমগ্ন সেই সাদা বেড়ালের ছবি।'

## ॥ ঊনষাট ॥

ঢাকায় ফিরে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। কিছু একটা না করে উপায় নেই। নাজিমুদ্দিন রোডে আমার শ্বশুরালয়। প্রথমে সেখানেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আশ্রয় নিলাম। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। প্রথমে সঙ্কোচ হলেও সেখানেই সাময়িক ডেরা বেঁধে ফেললাম। আমার শ্বশুর মোহাম্মদ নবী বক্‌শ আমাদের আনন্দিত চিত্তেই গ্রহণ করলেন। আমিও প্রাথমিক সঙ্কোচ পুরোপুরি মুছে ফেলে প্রয়োজনীয় মালপত্তর নিয়ে হাজির হলাম সেখানে। আমার এই অস্থায়ী ঠিকানা অনেকেরই অজানা ছিল। কিন্তু মানসিক উদ্বেগ ও শঙ্কা এমনই বস্তু যা পাতালেও প্রবেশ করে অতি সহজে। তাই ভয় প্রায় সর্বক্ষণই হানা দিত মনে। ছেলেমেয়েরা এত ছোটো ছিল যে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা ওদের বোধাতীত ছিল। তাই ওরা অধিকাংশ সময় খেলাধুলোয় মেতে থাকত। আমার স্ত্রী এবং আমি প্রায় সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম।

কিছুদিন নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করেছি সেখানে। কিন্তু জনাব নবী বক্‌শ আমার চাকরির জন্য আমার চেয়ে শত গুণ বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। অর্থাৎ আমার বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য তিনি অতিশয় ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। আমি যাতে আর কাল বিলম্ব না করে হুট করে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর কার্যালয়ে ঢুকে পড়ি, এটাই ছিল তাঁর প্রবল ইচ্ছা। তাঁর এই মনোভঙ্গি আমার কাছে অপ্রিয় মনে হলেও নবী বক্‌শ সাহেবকে দোষ দেয়া যায় না। তিনি কন্যা এবং জামাতার 'কল্যাণ' (তাঁর দৃষ্টিতে) চান বলেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে আমি আমার দু'চারজন শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ যোগদানের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমার ব্যারিস্টার ভ্রাতা

তোফায়লুর রহমান, বন্ধু এখলাসউদ্দিন আহমদ, শুভার্থী এবং সহকর্মী আহমেদ হুমায়ূনের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলাম। সর্বপ্রথম এখলাসউদ্দিন আহমদ এবং আমার ব্যারিস্টার ভ্রাতা তোফায়লুর রহমানের সঙ্গে এখলাসের বাসায় চাকরিতে যোগ দেব কি দেব না, এ নিয়ে আলোচনা করলাম। যদ্দূর মনে পড়ে আরও কারও কারও পরামর্শ কামনা করেছিলাম। প্রায় সবাই বললেন, ঢাকায় থাকতে হলে কাজে যোগ দেয়াই ভালো। যেহেতু আমার পক্ষে অন্য কোথাও গা ঢাকা দেয়া সম্ভব ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে শ্বশুর সাহেবের নসিহত অনুসারে কাজ করতে হল।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসে প্রবেশ করলাম পরাজিত, গ্লানিপীড়িত ব্যক্তির মতো। কোনওমতে ম্যানেজিং এডিটর আহসান আহমদ আশ্‌ক-এর কামরায় পা রাখলাম। তার অনুমতি নিয়ে একটি চেয়ারে বসলাম। আমরা আচরণে কি কোনও অপরাধীর ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল? কে জানে! আহসান আহমদ আশ্‌ক-এর ব্যবহারে কেমন যেন দূরত্ব এবং অপরিচয়ের ভাব নগ্নভাবে ফুটে উঠেছিল সেদিন। জানি না তিনি সেদিন কী মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে একজন অত্যন্ত অচেনা ব্যক্তির রুক্ষ্ম, রূঢ় মনোভাব নিয়ে কথা বলছিলেন। তিনি প্রায় কর্কশ ভাষায় উচ্চারণ করলেন, 'আমি কী করে জানব তুমি এই দিনগুলো মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ছিলে না? না, তোমাকে আমাদের কাগজে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।' আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বেরিয়ে পড়লাম ম্যানেজিং এডিটরের ঘর ছেড়ে। একধরনের মুক্তির হাওয়ার ঝলক স্পর্শ করল আমাকে।

ম্যানেজিং এডিটরের ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা বারান্দায় কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর আমার দিকে ছুটে এল তার পিয়ন। জনাব আহসান আহমদ আশ্‌ক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে আগামীকাল থেকে চাকরিতে যোগ দেয়ার কথা বললেন। তারপর তাঁরই অনুরোধে সামনের একটি চেয়ারে বসলাম। তাঁর কথায় আগেকার দিনের সুর বেজে উঠল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, সেই মুহূর্ত থেকে আমার মুক্তির ভাবটি উবে গেল। মনে জমে উঠতে শুরু করল মন খারাপের মেঘ। এক ধরনের দাসত্বের শেকলের আওয়াজ হানা দিতে শুরু করল আমার চেতনাপ্রবাহে। জীবনধারণের প্রক্রিয়া মানুষকে কখনও কখনও যে বেশ খাটো করে দেয়, এটি আরেকবার হাড়ে হাড়ে টের পেলাম ১৯৭১ সালে।

এজন্য নিজের কাছেই মনে-মনে ধিকৃত হয়েছি বহুবার। ভারাক্রান্ত মনে প্রবেশ করতাম 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর দালানে। যে ঘরটি বরাদ্দ ছিল হাসান হাফিজুর রহমান এবং আমার জন্য, হাসানের আসনটি শূন্য থাকত অধিকাংশ সময়। আমাদের কোনও কোনও সহকর্মী সেই আসনে বসে গল্পগুজব করতেন জমিয়ে। হাসান শেষ অব্দি অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস কাজে যোগদান করেন নি। তিনি তার পরিবারের সহযোগিতায় এবং নিজের মানসিক বলের সাহায্যে দুস্তর পথটি পাড়ি দিতে পেরেছিলেন শেষ অব্দি। তবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমাদের কারও কারও সঙ্গে হাসানের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। একবার তিনি তার হালের শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা নিয়ে উদিত হয়েছিলেন আমাদের আশেক লেনের বাসায়।

আমার অফিসরুমে প্রায় রোজই নির্দিষ্ট ক'জনের, বলা যেতে পারে, একটি গোপন আড্ডা জমত। সেই আড্ডায় থাকতেন আহমেদ হুমায়ূন, ফজল শাহাবুদ্দীন, এখলাসউদ্দিন আহমদ, হেদায়েত হোসেইন মোরশেদ, 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর স্টাফ আর্টিস্ট কালাম মাহমুদ। একদিন আমার অফিসরুমে হেরায়েত হোসেইন মোরশেদ, কালাম মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন এবং আমি বসে আছি। মোরশেদ আমার টেবিলে রাখা প্যাডটি তুলে নিয়ে একটি গোলাকার নকশা আঁকলেন। আমাদের দিকে ছবিটি তুলে ধরে বললে, 'এই হাত-বোমাটাই মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে দেন।' এর ফলাফল কী হয় তা বুঝতে আমাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। হেদায়েত হোসেইন মোরশেদ নিউজপ্রিন্ট প্যাডের বিপজ্জনক পাতাটি দলা পাকিয়ে আমার দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন। বর্তমান পরিস্থিতিতেই এই বিপজ্জনক বিস্ফোরকটির ছবি কারও হাতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কামরার দরজা ঠেলে মারণাস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ল দুই খোট্টা পাকিস্তানি। একজন লেফটেনেন্ট কর্নেল এবং একজন সাধারণ সেনা। চোখে-মুখে ওদের উষ্মার শিখা। এহা কোই গাদ্দার হ্যায়? কটমটে দৃষ্টিধর, খোট্টা লেফটেনেন্ট জেনারেল সওয়াল করল। প্রচুর হিন্দি ছবি দেখা এবং একদা চিত্রনায়ক হারুনের সঙ্গে সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্বের ফলে, ফজল শাহাবুদ্দীন কিছুটা উর্দু ভাষা রপ্ত করেছিলেন। তিনি চটপট জবাব দিলেন, যার মর্মার্থ হল, ওসব বালাই এই ঘরে কিংবা সারা অফিসেই নেই।

আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের ভক্ত ছিলাম। মনে-মনে সবসময় তাদের গুণ গাইতাম, তাদের আশাব্যঞ্জক কর্মপন্থায় নিজেদের বৃত্তে প্রশংসায় মশগুল থাকতাম। কারণ, তারাই ছিল আমাদের আশা ভরসার স্থল — হিংসার দাঁত, নখ বের করা অন্ধকারে শান্তি ও মুক্তির জ্বলজ্বলে আলো।

হিংস্র পাকি দু'টি আমার কামরা থেকে গটগট ফটফট করে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি ক্ষণিক আগেই তার ভয়ংকর শিল্পকর্মটি কুটি কুটি করে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন বলে। নইলে সেদিন আমার ঘরে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে সুনিশ্চিত ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হত, যেমন আমাদেরই এক সৈয়দ আবদুল কাহারকে সেদিনই ঢাকায় ক্যান্টনমেন্টে গলায় ধাক্কা দিয়ে সম্ভবত হাত বেঁধে, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই চা-বিস্কুট খাইয়ে আদর করার সৎ উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের সহকর্মীকে শারীরিক ও মানসিক দু'ধরনের উৎপীড়ন সইতে হয়েছিল। আমাদের ম্যানেজিং এডিটর এবং উর্দু কবি আহসান আহমদ আশ্‌ক-এর উদার তৎপরতার ফলে সহজেই পাকিদের উৎপীড়নশালা থেকে সৈয়দ আবদুল কাহার মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছিলেন।

আমার আশেক লেনের বাসায় মাঝে মাঝে সৈয়দ শামসুল হক, এখলাসউদ্দিন, আমিনুল ইসলাম আসতেন। একদিন সম্ভবত এখলাসউদ্দিন আহমদের সঙ্গে চিত্রকর রফিকুন্নবীও এসেছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনকে তখনকার লেখা কবিতা, যেগুলো, বলাবাহুল্য, তখন অপ্রকাশিত, আমার জীবনসঙ্গিনীর অসামান্য তৎপরতা এবং ধৈর্যে,

লুকিয়ে রাখা, পড়ে শুনিয়েছি। সবাই তারিফ করেছিলেন। আমার দেশের মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না, এমন একটি সিদ্ধান্ত সেদিন গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আখেরে জানা গেল, সৈয়দ শামসুল হক, মুর্তজা বশীর ইউরোপ পাড়ি জমিয়েছেন।

আমার অফিসের কামরায় প্রায়শ ফজল শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে ব্যাংকার ফজলুল কাদের কাদেরী আসতেন মনের কথা আমাদের ক'জনের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনাবলির কথা শোনাতে এবং শুনতে। এ ধরনের অংশীদারিত্বে আমাদের মন কিছুটা হলেও হালকা হত। ফজলুল কাদের কাদেরী সঙ্গে লুকিয়ে নিয়ে আসতেন, 'টাইম' এবং 'নিউজ উইক' দুটি ইংরেজি সাপ্তাহিক। আমরা সবাই মিলে সেই দু'টি পত্রিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্ট পড়ে উৎসাহিত হতাম। আমাদের হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই, এরকম আশার ঝলক জেগে উঠত মাঝে মাঝে। ফজলুল কাদের কাদেরী এই দু'টি এবং অন্য বিদেশি পত্রিকার রিপোর্ট টাইপ করে কিছু কপি বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধবদের বিলিয়ে দিতেন। এই কাজটুকু করে কিছুটা হলেও ভালো বোধ করতেন তিনি। বহুবছর তার সঙ্গে দেখা নেই। জানি না, এখন তার ধ্যানধারণা কোনদিকে সমর্পিত। কী ভাবেন আজকাল? শুনেছি, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল নিয়ে অতিশয় পরহেজগার হয়ে পড়েছেন। কী দ্রুত মানুষ বদলে যায়। বদলে যায় তার জীবনদর্শন? তবে এখনও আমার বিশ্বাস তিনি তথাকথিত মৌলবাদী হয়ে ওঠেন নি। তার বাহ্যিক পরিবর্তন সত্ত্বেও।

আমরা কেউ কেউ স্বনামে উপসম্পাদকীয় কিংবা ব্যক্তিগত কলাম রচনা করা থেকে বিরত থেকেছি। যতদূর মনে পড়ে, কখনও বাঙালি বিরোধী কোনও কলাম লিখি নি এবং সেই রচনাগুলো প্রকাশিত হতো আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগের পিয়নদের নামে। তাদের অনুমতি নিয়েই সেসব নাম ব্যবহার করা হত। আর এমন কিছু লেখাও হতো না যাকে আপত্তিকর বলে চিহ্নিত করা যায়। আটপৌরে সব কথাবার্তা থাকত সেসব রচনায়। অবশ্য কখনও কখনও সম্পাদকীয় নিবন্ধে যথাসাধ্য সতর্কতা বজায় থাকত, কোনও উত্তেজনা সৃষ্টির অভিসন্ধি থাকত না। এবং সুদক্ষ স্টাফ রিপোর্টার হেদায়েত হোসেইন মোরশেদ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাঙালিদের নিত্যব্যবহার্য হস্তশিল্পের বস্তুগুলোকে তুলে ধরতেন ক্রেতাদের কাছে। ফলে দেশজ শিল্পের স্রষ্টাদের লাভ তো হতই সমাজের অনেকের কাছে বাঙালিদের আপন জিনিসগুলোও বড়ো প্রিয় হয়ে উঠেছিল এটা, সন্দেহ নেই, দেশপ্রেমের আবেগকে উসকে দেয়ার একটি কৌশল সৃষ্টির প্রয়াস যে ছিল তা উপলব্ধি করতে নিজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করেছিল হেদায়েত হোসেইন মোরশেদের ছোটো ছোটো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টগুলো। সে সব চমৎকার বিনীত, শিল্পিত রিপোর্টগুলোর কথা আজও কি মনে পড়ে সেই দুঃসময়ের মুখোমুখি হওয়া বাঙালিদের? খোদ হেদায়েত হোসেইন মোরশেদের কি মনে পড়ে বিশ্রামের কোনও অলস মুহূর্তে?

সত্যের অনুরোধে বলা প্রয়োজন, এই যে আমরা আমাদের সাদামাটা উপসম্পাদকীয়গুলো নিরীহ পিয়নদের নামে ছাপতাম সেজন্য শ্রদ্ধেয় সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং প্রিয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আহসান আহমদ আশ্‌ক কখনও

আমাদের কোনও শাস্তি তো দেনই নি, কোনও কিছু বলেনও নি। তাঁরা দু'জনই আমাদের ভালো করে চিনতেন এবং অকৃত্রিম ভালোবাসতেন। এ-কথা অন্তত আমি কোনওদিন ভুলব না, অস্বীকার তো করবই না। তাঁদের জায়গায় অন্য কেউ হলে আমাদের যে দুর্দশা হতে পারত তা ভেবে আজও এতকাল পরেও শিউরে উঠি।

আজ আমাদের এই রৌদ্রছায়া এবং জ্যোৎস্নাময় পৃথিবীতে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর কর্ম করা সহকারী সম্পাদক বেঁচে আছি মাত্র মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ এবং আমি। হাসান হাফিজুর রহমান, সানাউল্লাহ নূরী এবং আহমেদ হুমায়ূন আর নেই, তারা মিলিয়ে গেছেন মৃত্যুপুরীতে। তবে তাদের কাজের নিদর্শন রয়ে গেছে পাঠকসমাজের জন্য। তিনজনই শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, খ্যাতনামা সাহিত্যিকও ছিলেন। বিশেষত হাসান হাফিজুর রহমানের নাম আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিমধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

## ॥ ষাট ॥

অন্ধকার ১৯৭১ সালে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে দাঁত-নখ দিয়ে মরণ-কামড় যে দিয়েছিল, তা সেকালের বাঙালিদের মনে এতকাল পরে আজও গেঁথে রয়েছে। অনেকেই সেসব ভয়ংকর ঘটনার কথা স্মরণ করে শিউরে ওঠেন। কী করে ভোলা যায় পাক সেনাদের হত্যাযজ্ঞ এবং বাঙালি নিপীড়নের কথা? এই পাশব হত্যাযজ্ঞে সক্রিয় সহযোগী ছিল এ দেশেরই কিছুসংখ্যক সন্তান, যারা আলবদর ও আলশামস বলে চিহ্নিত। বাংলাদেশের জনসাধারণ যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী কব্জা থেকে মুক্ত না হতে পারে, সে-জন্যেই ধর্মের জিগির তুলে তারা অকাতরে খুন করেছে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, হাত মিলিয়েছে জঙ্গি পাকিস্তানিদের সঙ্গে, যাতে স্বাধীনতা অর্জিত না হতে পারে।

এসব কথা স্মরণ করলে কালো মেঘে ছেয়ে যায় মন। যা হোক, এখন আমি ফিরে যাচ্ছি অমাবস্যাঘেরা একাত্তরে। কিন্তু সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে পড়লে, আজ হয়তো অনেকের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না, যেন কিছুই ঘটে নি, হত্যা করা হয় নি তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে, সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয় নি অসংখ্য নারীর। যেন বাংলার নিপীড়ত বাঙালির কবর তৈরি হয় নি।

তবে অসংখ্য বাঙালির দুঃখকষ্ট, পাক সেনা এবং তাদের এ দেশীয় খেদমতগারদের হত্যাযজ্ঞে এবং তাণ্ডব সত্ত্বেও কোনও কোনও মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎ লাভ করা, তাদের ক্ষণিক আশা-জাগানিয়া কাজের তাজা খবর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মনে হত। অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে একদিন বিকেলে আমাদের বাসায় এসে হাজির হলেন তেজী মুক্তিযোদ্ধা আলম (হাবিবুর আলাম বীরপ্রতীক) এবং তাঁর সহযোগী শাহাদাত চৌধুরী। কিছুক্ষণ ওঁরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আমি তাঁদের আমার সদ্য-লেখা কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালাম। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রচিত কবিতাবলি শুনে ওঁরা কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে স্থির করলেন। কয়েকটি কবিতা শেষপর্যন্ত শিল্পী আলভির মারফত শাহাদাত চৌধুরী কলকাতায় শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর কাছে পাঠাতে পেরেছিলেন। আবু সয়ীদ ও তার সহধর্মিণী গৌরী আইয়ুবের

উদ্যোগ ও উৎসাহে আমার 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি কলকাতায় ১৯৭২ সাল-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এই বই-এর দু'চারটি কবিতা কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ মজলুম আদিব ছদ্মনামে বেরিয়েছিল। এই ছদ্মনামটি রেখেছিলেন খোদ আবু সয়ীদ আইয়ুব। মাজলুম আদিব-এর অর্থ হচ্ছে নির্যাতিত লেখক। সত্যি, তখন আমরা যারা শত্রু-অধিকৃত ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় বন্দির জীবনযাপন করছিলাম, তাদের অনেকে শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে অত্যন্ত নিপীড়িত ছিলাম।

যা হোক, আমার কয়েকটি কবিতা শার্ট ও প্যান্টের কোনও কোনও অংশে লুকিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ওঁরা আমার এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন যে, অল্প কিছুক্ষণ পরেই ইসলামপুরে কিছু কাজ সেরে আবার আমার এখানে ফিরে আসবেন। আমি বহুক্ষণ অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় পায়চারি করতে শুরু করলাম। তাঁরা দু'জন শত্রুর হাতে ধরা পড়েন নি তো? বিকেলের রোদ মুছে যাওয়ার পর সন্ধ্যা এল, আমার দুশ্চিন্তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করল গাঢ়ভাবে। বেশ কিছুক্ষণ পর এসে ওঁরা আমাকে শঙ্কামুক্ত করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতেই দেরি হয়ে গেল, বললেন তাঁরা। আবার কখনও দেখা হতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা জানিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিলেন। আমি গভীর অভিনিবেশে ওঁদের যাওয়ার পথে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ক'দিন পর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে ঢাকা শেরাটন) যে জবরদস্ত বিস্ফোরণটি হল, তা আলম, শাহাদাত এবং তাঁদের কোনও সঙ্গীরই কাজ, এটা জানা গেল বিশ্বস্তসূত্রে। পরে আরও কোনও কোনও জায়গায় যে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ধরনের কাজের খবর কানে এল তাতেও আলম এবং তাঁর অন্য কোনও সঙ্গীর সম্পৃক্ত থাকার কথা জানতে পারলাম। তবে এসব কথা অন্য কাউকে বলার উদ্দীপনাকে নিজের মনেই সঞ্চিত রাখতে চেষ্টা করেছি। কোথায় কার কাছে এ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনি, সে ব্যাপারে সচেতন ছিলাম। কোথায় কে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, কে বলতে পারে। এই সতর্কতা আমাকে ভবিষ্যতে কোনও ফাঁদে পা দেয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অফিসে আমার কামরায় কাজে-অকাজে সময় যাপনের সময়ও লোকজন বুঝে কথাবার্তা বলতাম। শুধু মনের ফোয়ারা খুলে আড্ডা দিতাম ফজল শাহাবুদ্দীন, হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, আহমেদ হুমায়ুন, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, মাশির হোসেন, কালাম মাহমুদ এবং সানউল্লাহ নূরীর সঙ্গে। আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল নানাবিধ। গোড়ার দিকে সরকারের নির্দেশেই 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিস থেকে আমাদের ক'জনকে একটি বিশেষ ফর্ম দেয়া হলো কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তলব করে যা সরকারের কাছে যাবে। যতদূর মনে পড়ে, এ ফর্ম দেয়া হল ফজল শাহাবুদ্দীন, আহমেদ হুমায়ুন এবং আমাকে। সম্ভবত আর কাউকে দেয়া হয় নি। হলেও মনে করতে পারছি না। এক্ষেত্রে ভুল হলে তা অনিচ্ছাকৃত। যা হোক, আমরা যতদূর সম্ভব উত্তরগুলোকে একেবারে মিথ্যাশ্রয়ী করি নি, প্রশ্নের নালিশের সত্যতা ষোলোআনা খারিজ করে দিই নি। কিছু কিছু অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু জবাবে চাতুর্যও ছিল, অস্বীকার করব না। আমাদের উত্তরের গুণে রেহাই পেয়ে যাই শাস্তির খাঁড়া থেকে। শেষপর্যন্ত ফাঁড়া কেটে যাওয়ার স্বস্তির স্বাদ পেলাম।

একদিন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ আমাকে ঘরে একা পেয়ে বললেন, 'আপনি যাঁদের দেখতে পারেন না তাঁদের দু'জনের কারণে আপনি বেঁচে গেছেন। তাঁরা হলেন অধ্যাপক হাসান জামান এবং অধ্যাপক ও সাংবাদিক আখতার ফারুক।

আখতার ফারুক-এর সঙ্গে হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ-এর, সম্ভবত আত্মীয়তা সূত্রেই হবে, ঘনিষ্ঠতা ছিল। আখতার ফারুক এবং হাসান জামান-এর কাছে পাক সামরিক জান্তা একটি হিট লিস্ট পাঠিয়েছিলেন, সেই লিস্ট অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করার মতলবে। হাসান জামান আমার ভিন্ন মতামত সত্ত্বেও আমার কবিত্ব শক্তির অনুরক্ত ছিলেন, তিনি আমাকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য করতেন। তাই, তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেই সামরিক জান্তার প্রেরিত লিস্টে আমার নামের পাশে ইতিবাচক প্রশংসনীয় মন্তব্য করেন। আখতার ফারুকও আমার বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করেন নি, প্রশংসাসূচক কথাই লিপিবদ্ধ করেন।

হাসান জামানের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন, তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। কিন্তু তাঁর একটি ব্যাপার আমি ঠিক মেনে নিতে পারতাম না। হাসান জামান কোনও কোনও সময় স্বাভাবিক কথা বলার পর হঠাৎ বলতেন যে, তিনি কাল রাতে ইরানে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার একজু বুজরুকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তখনই ঢাকায় নিজের নিবাসে ফিরে এলেন। এটা আমি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতাম না। তিনি রহস্যজনক হাসি হেসে তাকাতেন আমার দিকে। তিনি যে-রকমই হোন না কেন, তাঁর ধ্যান-ধারণা আমার কাছে যত উদ্ভটই মনে হোক না কেন, তাঁকে আমি অপছন্দ করতে পারি নি, বরং কৃতজ্ঞতা বোধ করি আজ অব্দি।

আমাকে ঢাকা থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন জ্বলজ্বলে তরুণ আফতাব আহমদ। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল বিদ্রোহীর ভঙ্গি। সেকালে তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকা এবং জাসাদ রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য এখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং দৈনিক 'ইনকিলাব'-এর প্রায় নিয়মিত লেখক। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা নেই; জানি না কালের ঘর্ষণে বর্তমানে তাঁর মুখাবয়বের কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে। এখন, অনুমান করি, তিনি আমার সঙ্গে অন্তত টেলিফোনে কথা বলতে অথবা দেখা করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পতিত ব্যক্তি হিসেবে জ্ঞান করেন, যার সঙ্গে কথা বলা এবং বর্জ্যের স্তূপে তাকানো একই কথা। তিনি তার পথে থাকুন, আমি আমার পথে চলতেই পছন্দ করি। তিনি হয়তো মনে মনে আমার মুণ্ডুপাত করেন, তা করুন, আমার কোনও আপত্তি নেই। তাঁর কল্যাণই আমার কাম্য। তবে তাঁর পন্থা আমার কাছে বর্জনীয়। কোনওদিন যেন তাঁর পন্থা অবলম্বন-এর দুর্মতি আমার না হয়। তবে হ্যাঁ, অতীতের পরিচিতির সৌজন্যে এ-কথা বলতে পারি নির্দ্বিধায়, সর্বদা আফতাব আহমদ-এর কল্যাণ হোক, দীর্ঘজীবী হোন তিনি।

এ-কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি, একাত্তরে শত্রু-শাসিত ঢাকা শহর ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে পারি নি বলে পরিতাপ হয়। যারা সেখানে গিয়ে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে

লড়াই করে নি, কোনও কাজ করে নি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাদের কেউ কেউ যখন মনগড়া গালগল্প জুড়ে দিত স্বাধীনতার পরে এবং এখনও, তখন আমার অন্তরাত্মা হেসে ওঠে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলি না, চুপচাপ অবোধ শিশুর মতো শুনে যাই সব। যাঁরা প্রকৃতই তখন কাজ করেছিলেন নানা অসুবিধার মধ্যে, তাঁরা কিন্তু নিজেদের ফুলিয়ে তোলার মতলবে বেশি কথা বলেন না। অনেকে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন নানা ঝক্কিঝামেলা উজিয়ে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন অনেকে স্বদেশকে হানাদারমুক্ত করার জন্যে। তাজউদ্দিন আহমদের মতো উন্নতমানের দেশপ্রেমিক নেতা নিজের হাতে স্নানঘরে নিজের কাপড় আপন হাতে ধুয়েমুছে গায়ে দিয়েছেন তো বটেই, পরিবারের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন নি নয় মাস, স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার জন্যে মুক্তিবাহিনীর দেখাশোনার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধ-সমর্থনকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে ছুটে গিয়েছেন বার বার। আমরা একমনই অকৃতজ্ঞ যে, তাঁর যে'গ্য সম্মান তাঁকে দিই নি। এমনকি আওয়ামী লিগের কাছ থেকেও তিনি পেয়েছেন অবেহেলা। বিরোধী দলগুলোর কথা নাই-বা বললাম।

কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। এখন তো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছবি নানা জায়গা থেকে সরানো হচ্ছে, কোনও কোনও জায়গায় বিএনপির কর্মীরা তাঁর ছবি ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলছে। কিন্তু সত্যকে কি কখনও মুছে ফেলা যায়? সত্যের নিজস্ব একটি শক্তি আছে যার স্রোতের টানে মিথ্যার বর্জ্য ভেসে যায় একদিন না একদিন। কখনও সেই দিনটি আসে শিগগীরই, কখনও দেরিতে। মূঢ় মানুষ সেটি বুঝতে পারে না।

স্বাধীনতার কয়েকদিন আগে 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসে আমার কামরায় বসে আছি, খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় আমার সামনের একটি চেয়ারে এসে বসলেন মাশির হোসেন। গম্ভীর তাঁর মুখ। ধীর কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, 'চটপট অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ুন। বাড়িতেও থাকবেন না। আজই অন্য কোথাও চলে যান। তাঁর কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মাশির হোসেন বেশ খোঁজখবর রাখেন বলে জানতাম। সাত তাড়াতাড়ি অন্য কাউকে কিছু না বলেই রিকশায় চেপে আশেক লেনের দিকে রওয়ানা হলাম। অসময়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরেছি বলে জোহরা বিস্মিত হলেন। আমি ওকে আম্মার বাসা ৪৬ নং মাহুতটুলিতে যাওয়ার জন্যে চটপট কিছু জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হতে বললাম।

আমাদের এভাবে আচানক আসতে দেখে আম্মা খানিক অবাক হলেন। আম্মাকে সব কথা খুলে বললাম। আশঙ্কা এবং দুশ্চিন্তায় মনে কালো মেঘ জমতে শুরু করল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিষাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। কোন দুর্গতি ওৎ পেতে রয়েছে আমাদের জন্যে, কে জানে? স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র এবং আকাশবাণীর খবর এবং অনুষ্ঠান শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকি।

## ॥ একষট্টি ॥

অফিস থেকে, ৩০নং আশেক লেনের বাসা ছেড়ে ৪৬নং মাহুতটুলিতে আম্মার আশ্রয়ে এসে নিরাপদ বোধ করছিলাম, স্বীকার করি। তবু একধরনের অস্বস্তি মাঝে-মাঝে হানা দিত মনে। মনে পড়ত অফিসের পরিচিত কামরা আর প্রিয় সহকর্মীদের কথা। জানি না, কবে তাদের সঙ্গে দেখা হবে, আবার কোনওদিন দেখা হবেই বা কি-না। কত চিন্তাই ভিড় করত মনে। খবর শোনার জন্যে ঘন ঘন রেডিও-র সামনে এসে বসতাম। কোনও কোনওদিন চাতকের মতো অপেক্ষা করতাম। কোনও কোনওদিন স্বাধীন বাংলা বেতার মূক হয়ে থাকত যান্ত্রিক অসুবিধার দরুন। শোকার্ত মানুষের মতোই ঘরের কোণে বসে থাকতাম সেদিন। মনে হত, আমাদের পরম সুহৃদ কেউ আসবার কথা দিয়ে কথা রাখে নি। কেন জানি নিজের উপরই ভীষণ রাগ হতো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পঁচিশে মার্চ রাতে এবং এটি ঘোষণার জন্যে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দেন। সেই ঘোষণা ২৬ মার্চ ভোরবেলা জনাব আবদুল হান্নান মাইকে প্রচার করেন চট্টগ্রামে। কিন্তু প্রবলভাবে প্রচারিত হতে পারে নি বলে একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা হল শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি রেডিওতে প্রচার করার উদ্দেশে। ইতিহাসের বাঁক কখন যে কোন দিকে মোড় নেয় তা বলা ভারি মুশকিল। অনুপস্থিত, শত্রুর হাতে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। আমি অস্পষ্ট ঘোষণাটি শুনি সাতাশে মার্চ। বিকেলবেলা। এরপর অবশ্য কয়েকবার সেই ঘোষণা অনেকের মতো আমাকেও আশার আলো দেখায়, অনুপ্রাণিত করে। না, আমাদের ভবিষ্যত একেবারে তিমিরাচ্ছন্ন নয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম যে ঘোষণাটি দেন তাতে বঙ্গাবন্ধুর কোনও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়বারই তিনি নিজের ত্রুটি শুধরে নেন। তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেন, 'অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আই হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডেপেন্ডেন্স ওয়ার...।'

আমার এই অধ্যায়ের বক্তব্যে কিছু পুনরুক্তি রয়েছে স্বীকার করছি। স্মৃতিভ্রমকে শুধরানোর জন্যেই কিছু লিখতে হল আবার। পাঠকগণ, আশা করি, মার্জনা করবেন। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একরত্তি ভ্রান্তিও অপরাধ বলে গণ্য হবে সবার কাছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার অপরূপ সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য হল। বাংলাদেশ ঝলসে উঠল আনন্দধারায়। কিন্তু এই আনন্দ অবিমিশ্র ছিল না। স্বদেশের মুক্তির জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে, তিরিশ লক্ষ বাঙালির রক্তে প্লাবিত হয়েছে দেশের মটি। বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের লালসার শিকার হয়েছেন এ দেশের অনেক নারী। লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত হয়েছে অসংখ্য নিরবরাধ বাঙালির ঘরবাড়ি। সেই বর্বরতার কথা ভাবলে আজও এতকাল পরেও গা শিউরে ওঠে, পাকিস্তানি বর্বরদের এবং তাদের এ দেশীয় সাঙাতদের অত্যাচার এবং পাশবিকতার কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে, ক্রোধে জ্বলে ওঠে শরীর। এসব সত্ত্বেও,

লুকাব না, স্বাধীনতার অপরূপ সূর্যোদয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে নেচে উঠেছিল হৃদয়, চোখ হয়েছিল অশ্রু-সজল।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম কয়েকদিন পর। না, আমি বধ্যভূমিতে যাই নি আমাদের প্রিয় বুদ্ধিজীবীদের উৎপীড়িত, ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখতে। পথে পড়ে থাকা একটি কি দুটি অপরিচিত লাশ দেখতে পেলাম। জানতে পারি নি এরা কারা! বাঙালি না অবাঙালি? যে-ই হোক, মানুষ তো। কিন্তু কজন মনে রাখে এ-কথা? মনে রাখলে তো, কেউ কারও গলায় কিংবা হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসাতে পারত না। মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষের দরুনই তো যত অনাসৃষ্টি এই দুনিয়ায়।

দু'একদিন পরেই দেখা হল দাড়িধারী বন্ধু, সহকর্মী সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান এবং ফটোগ্রাফার সুহৃদ আমানুল হকের সঙ্গে। সেদিন আমরা ছিলাম দৈনিক বাংলার আমাদের নির্ধারিত ঘরে। স্বাধীনতার পর পরই আমরা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর নাম পরিবর্তন করে 'দৈনিক বাংলাদেশ' রাখি। কিন্তু কিছু সংখ্যক তেজী মুক্তিযোদ্ধা আমাদের অফিসে এসে জোর গলায় বলে যে, আমাদের পত্রিকার নাম বদলাতে হবে। 'দৈনিক বাংলাদেশ' নাম রাখতে পারব না, কারণ এই নামে তারা একটি পত্রিকা বের করছে। আমরা বাধ্য হয়ে নাম পালটে ফেললাম চটজলদি। দৈনিক বাংলাদেশ হয়ে গেল দৈনিক বাংলা। ছবিটি আমানুল হকের ক্যামেরায় তুলেছিলেন আমাদের সহকর্মী আহমেদ হুমায়ূন। হাসানের মুখমণ্ডল ইতিপূর্বে কখনও এমন শ্মশ্রুমণ্ডিত দেখি নি। দিব্যি লাগছিল বটে। কিন্তু হাসান এই শ্মশ্রুরাজিকে অধিক স্থায়ী হতে দেন নি। এদের আয়ু ছিল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস।

যা হোক, আমানুল হক ফটোগ্রাফির একজন নামজাদা শিল্পী। অনেকবছর আগেই তাঁর অনেক ছবি বিখ্যাত স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। এটা যে চাট্টিখানি কথা নয় তা ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত সবাই স্বীকার করবেন। বিশ্ববিশ্রুত সৃজনশীল চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় আমানুল হকের প্রতিভার কদর করতেন বলেই তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যগত অসুবিধার জন্যে আমাদের এই প্রতিভাবান বন্ধুটি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে খুব বেশিদিন কাজ করতে পারেন নি। শারীরিক নানা অসুবিধার দরুন তিনি ইদানিং বাসা থেকে বেরই হোন না বলে জানি। তবে এ-ও জানি, যেহেতু তিনি একজন জাত ফটোগ্রাফ-শিল্পী, তাই তাঁর সিংহভাগ সময় ফটোগ্রাফির নানা বিষয় এবং সৃজনের ভাবনাতেই কাটে। ফলে কখনও কখনও উত্তম ফটোগ্রাফের আভায় জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে তাঁর ঘর। কিছুকাল আগেও 'দৈনিক বাংলা'র সহযোগী সাড়া-জাগানো সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'য় আমানুল হকের অনেক চোখ ও মন জুড়ানো ছবি ছাপা হয়েছে।

মনে পড়ে, অনেক বছর আগে 'দৈনিক বাংলা' থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম কোথাও। ফটোগ্রাফ-শিল্পী আমানুল হক পেছন থেকে আমাকে পাকড়াও করলেন। তাঁর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে আমাকে। তিনি আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন 'দৈনিক বাংলা' অফিসের খানিক দূরে একটি ছোটো পাতাহীন, শুকনো কিছু ডাল-অলা ন্যাড়া গাছের সামনে। গাছটি অবশ্য আমার চেয়ে খানিক লম্বা। কিছুক্ষণ পর ক্লিক করে উঠল আমানুল হকের ক্যামেরা। কদিন পর তিনি এক কপি ছপি আমাকে উপহার দিলেন।

দিব্যি অর্থপূর্ণ একছবি, যেটি আমি আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র একটি সংস্করণে ব্যবহার করি কৃতজ্ঞচিত্তে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এবং সুলেখক আহসানুল হক ও বিশিষ্ট নজরুলসংগীত বিশেষজ্ঞ আসাদুল হক দুজনই আমানুল হকের সহোদর।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের অল্প কদিনের মধ্যেই অনেককিছুর মতো দৈনিক 'পাকিস্তান'-এরও কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। আহসান আহমদ আশ্‌ক প্রথমদিন থেকেই ছিলেন অনুপস্থিত। কদিন পর আমাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে কয়েকজন অফিসে আর না আসার জন্যে বললেন। অবশ্য তাঁকে সম্মান জানানো হলো অফিসের বার্তা বিভাগে সংবর্ধনা করে। ব্যাপারটি আমার কাছে তেমন শোভনীয় মনে হয় নি। তিনি থাকলে কী এমন ক্ষতি হত কার? যা হোক, যা হওয়ার তাই হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সম্পাদক মর্মাহত হয়েছিলেন কোনও কোনও সাংবাদিকের আচরণে। কিন্তু অতিশয় সজ্জন বলেই মুখ ফুটে কিছু বলেন নি, বলতে পারেন নি। সেদিন আমার কাছে ব্যাপারটি অশোভন, প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। আজও তাই মনে হয়।

তোয়াব খান সম্পাদক, হাসান হাফিজুর রহমান প্রধান সম্পাদক, আলী আশরাফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ফওজুল করিম তারা হলেন বার্তা-সম্পাদক। এভাবে কিছুদিন চলল। এরপর হঠাৎ একদিন ঘটল বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের মূল কারণ প্রধান সম্পাদক এবং সম্পাদকের মিলিত সিদ্ধান্তে। কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিবাদী মিছিলে আওয়ামী লিগ সরকারের গুলি চালনার ফলে একজনের মৃত্যু হয়। পরের দিন এই সংবাদ সংবলিত টেলিগ্রাম প্রকাশ করে 'দৈনিক বাংলা'। আমি হাসান হাফিজুর রহমানকে এই টেলিগ্রাম প্রকাশ করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ তো গ্রহণ করেন নি, উলটে আমাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করলেন। নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। বঙ্গবন্ধু রুষ্ট হয়ে সম্পাদক তোয়াব খান এবং প্রধান সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানকে দায়িত্বমুক্ত করলেন। আমরা 'দৈনিক বাংলা'র কর্মীরা একযোগে বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁদের দুজনকে আমাদের পত্রিকায় ফিরিয়ে দেবার জন্যে বিনীত অনুরোধ করলাম। আমরা প্রায় মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর নিকট গেলাম বিনীত প্রার্থী হিসেবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন যে, তিনি ওঁদের দুজনকে আমাদের পত্রিকায় ফিরিয়ে দেবেন না, তবে অন্য চাকরি দেবেন।

'দৈনিক বাংলা'য় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। আমাদের নতুন সম্পাদক ভালোভাবেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমরা সহকারী সম্পাদকগণ তাঁর জন্যে কোনও ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি না করে বরং সহযোগিতা করলাম নানাভাবে। তিনি আমাদের ব্যবহার ও কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। আমরা যে তাঁর পথে কোনও কাঁটা নই, তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ছিল চমৎকার। কিন্তু সাধারণ বিভাগ ও মেসিন বিভাগের কর্মীদের দাবিদাওয়া ক্রমশই বাড়তে শুরু করল। কখনও কখনও সেই দাবি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তা মেটানো সম্পাদকের পক্ষে তেমন সহজ ছিল না। যেহেতু 'দৈনিক বাংলা'র কর্তৃপক্ষকে এই প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয়ভারের হিসেব এবং ব্যয়ের যৌক্তিকতা সরকারের কাছে পেশ করতে হত, তাই

ইচ্ছে করলেই সম্পাদক অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বেপরোয়া এবং বল্গাহীন হতে পারতেন না। অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোনও যুক্তি তা যতই যথার্থ এবং জোরালো হোক না কেন বুঝতে চাইতেন না। যে করেই হোক তাদের দাবি মেটানো চাই-ই চাই!

সম্পাদক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর কাছে দাবিদাওয়া সংবলিত একটি কাগজ পেশ করা হল আলটিমেটাম হিসেবে। আমি সম্পাদকের আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর কামরায় যাই। তাঁকে আসন্ন ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরামর্শ হিসেবে কর্মচারীদের একটি কি দুটি দাবি মেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান করে ফেলার পরামর্শ দিলাম। কর্মচারীরা সম্পাদককে চাকরিচ্যুত করে আমাকে তাঁর আসনে বসাতে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের এই প্ল্যানে সায় দিতে পারি নি বলেই নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীকে কর্মচারীদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাদের জবরদস্তির কাছে মাথা নত করতে রাজি হন নি কিছুতেই। এজন্যে অবশ্য আমি তাঁকে মনে-মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

আমার কাছে অফিসের সবার এই আচরণ মোটেই শোভনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নি। তিনি চলে গেলে আমারই লাভবান হওয়ার কথা। কিন্তু আমার বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, নানা কারণে আমি প্রথমদিকে 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু যা হওয়ার তা হবেই। তা এড়ানোর সাধ্য আমার ছিল না। প্রথমদিকে অনিচ্ছুক থাকলেও পরে কোনও কোনও কারণে নিজেকে অনিশ্চয়তার ধু ধু প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন নানা ভাবনার সঙ্গে খেলা করেছি। কোনও আশা প্রত্যাশাকে মনের কিনারে ঘেঁষতে দিই নি। বেশিরভাগ সময় শূন্যতার তপস্যায় মজেছি। কখনও হাওয়ায় নড়েছে মনের নানা গাছের পাতা, ফুটেছে ফুল, ঝরে পড়েছে স্বপ্ন। কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা আমাকে নিয়ে গেছে তরঙ্গিত নীল সমুদ্রে, কখনও মরুভূমির বিরানায়। মুছে গেছে মেশিনের আওয়াজ, মানুষের হট্টরোল।

## ॥ বাষট্টি ॥

সাহিত্য সম্মেলন জরুরি বিবেচিত শুধু লেখকদের কাছে নয়, যারা সাহিত্যচর্চা করেন তাদের কাছে তো বটেই, যারা সাহিত্য পাঠকে অবশ্য-কর্তব্য জ্ঞান করেন, তারাও বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেন। তাই আমরা লক্ষ করি সাহিত্য সম্মেলনে শুধু কবি-সাহিত্যিকরাই নন, সাহিত্যরস পিপাসু ব্যক্তিগণও সাহিত্য সম্মেলনে হাজির হন সোৎসাহে।

যা হোক, এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলার কথা। সেবার সেই মেলার বিশিষ্ট আয়োজকদের কাছ থেকে তাঁদের আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্যে বাংলাদেশের আমরা কজন কবি-সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হই। কোনও কোনও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও আমন্ত্রণলিপি পায়। ফলে সেই অনুষ্ঠানে আমাদের বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীর উপস্থিতি নেহাত কম ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কায়সুল হক, শহীদ কাদরী,

মহাদেব সাহা এবং আমি ছিলাম। নির্মলেন্দু গুণ কি ছিলেন? কেমন যেন আবছা ঠেকছে। আমাদের আসরে একদিন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় লেখক মাহবুব তালুকদার এসে অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেলেন। সেকালে তিনি সম্ভবত কলকাতাস্থ মিশনে কর্মরত ছিলেন। আড্ডাটি, মনে পড়ে, দিব্যি জমে উঠেছিল।

শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে তাঁর পুত্র জিষ্ণুকে কলকাতায় আমার পৌঁছুনোর দিনেই সাউথপয়েন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেন। জিষ্ণু দে জানাল যে, তার পিতা আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন তাদের বাসায়। তার পিতা নাকি নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন আমার থাকার জায়গা। আমি জিষ্ণুকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি যদি সঙ্গীদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই, তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হবে। 'তাই, ব্যাপারটি অনুগ্রহ করে আমার এই পরিস্থিতি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলো। আমি পরে অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। তার অনেক সময় নষ্ট করব নির্দ্বিধায়।' জিষ্ণু পুরোপুরি আমার কথা ঠিক ঠাঁই দিতে পারে নি মনে। ঠোঁটে অনিচ্ছাপ্রসূত হাসি ঝুলিয়ে বিদায় নিল। শহীদ কাদরী আর মির্জা আবদুস সামাদ, যিনি একসময়ের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সম্পাদক এবং তাঁর স্ত্রী লায়লা সামাদের মোটরকারে বসে ঢাকা থেকে কলকাতায় গিয়েছিলাম সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। তাঁরা দুজনও একই উদ্দেশ্যে কলকাতার যাত্রী হয়েছিলেন। মোটরকারে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার একটা মজা আছে, যদি না কোনও বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়ে আচমকা। মাঝে মাঝে প্রকৃতির শোভা দুচোখ ভরে দেখা, উপভোগ করা এবং মাঝে-মাঝে টিফিন ক্যারিয়ার থেকে আস্তে-সুস্থে খাদ্য তুলে নেয়া, জিভের ডগায় স্বাদ উপভোগ করা যে কী মজার ব্যাপার, তা শুধু দীর্ঘপথ-পেরুনো ভ্রমণকারীরাই জানেন। সুখের বিষয়, পথে আমাদের কোনও উটকো ঘটনা কিংবা বিপদের মুখে পড়তে হয় নি। মির্জা আবদুস সামাদ কোনও আনাড়ি মোটরচালক নন। আমরা শেষ অব্দি সহি সালামতে কলকাতায় পৌঁছতে পেরেছিলাম। অক্লান্ত ছিলাম বলা যাবে না। এপ্রিল মাসের কিছু তাপ তো মুখ বুজে সইতেই হবে। শহীদ কাদরী এবং আমি সাউথ পয়েন্ট স্কুলের আস্তানা খুঁজে পেলাম। মির্জা আবদুস সামাদ এবং লায়লা সামাদ, যতদূর মনে পড়ে, ভিন্ন কোনও জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করেন।

পরদিন সকাল দশটা এগারোটার দিকে জিষ্ণু দে এল। আমি ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম ওদের বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাদের বাসায় যাওয়ার পথে বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের আস্তানা। খুবই বিনীত একতলা বাসা। ঘরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল একটি ছোটো চৌকি। চৌকির উপরে একটি মামুলি বিছানা, বিছানার উপর একটি পুরনো হারমোনিয়াম, হারমোনিয়ামের রিডগুলোর উপর একটি সাহিত্য পত্রিকা চোখে পড়ল। সেই সাহিত্যপত্রটি হাতে নিয়েই আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত কণ্ঠস্বরে বলল, 'দেখুন, দেখুন'। বলেই পত্রিকাটির খোলা পাতার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোৎসাহে। পত্রিকাটির পাতা যেভাবে হারমোনিয়ামের উপর ছিল হুবহু সেভাবেই জিষ্ণু আমার হাতে দিল। পত্রিকাটি বাংলাদেশে প্রকাশিত। বিশেষ পাতাটিতে একটি কবিতা মুদ্রিত রয়েছে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি গৃহকর্তার কলমের কালিতে দাগানো এবং পাশে লেখা

'সাবাস'। কবিতাটি আমারই লেখা। লুকাব না, এই একটি শব্দ আমাকে প্রচুর আনন্দিত করল। এমন একজন গুণী শিল্পী, যাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুস দেখা হয় নি, যাঁর গান আমার এত প্রিয়, আমার কবিতা তাঁর এত ভালো লাগবে ভেবে আনন্দিত তো হয়েই ছি, অনুপ্রাণিত বোধ করছি।

যে ব্যক্তি ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তিনি জিষ্ণুকে ভালো করেই চেনেন। আমরা চা খাব কি-না জিজ্ঞেস করলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, গৃহকর্তা অর্থাৎ দেবব্রত বিশ্বাস বেশ দেরি করে বাসায় ফিরবেন। দেবব্রত বিশ্বাসের বাসা থেকে বেরিয়ে জিষ্ণু দে আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। পরিচ্ছন্ন, বিনীত ড্রইংরুমে প্রবেশ করে দেখি বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং গৃহকর্তা বিষ্ণু দে বসে আছেন একা। এই প্রথম দেখলাম তাকে, অবশ্য তার ছবি অনেক আগেই দেখেছি। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে, কিন্তু সেই চেহারার অধিকারী দর্শনে অসাধারণ সৌম্য এবং আকর্ষণীয়। কণ্ঠস্বর চেহারার সঙ্গে মানানসই। মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে সুশীল, চমৎকার হাস্যরস সঞ্চার করেন। কোনও কোনও বিখ্যাত কবি সম্পর্কে নির্দোষ ঠাট্টা করেন এবং শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন। আলাপের ফাঁকে কখনও কখনও গ্রামোফোনে বিদেশি সংগীতজ্ঞদের জগদ্বিখ্যাত রেকর্ড বাজিয়ে শোনান।

তাছাড়া যখনই তাঁকে তাঁর কবিতা শোনাতে অনুরোধ করেছি, তিনি কোনও ভানভনিতা না করেই বই খুলে পুরনো কবিতা কিংবা হাল আমলে লেখা অপ্রকাশিত কবিতাও আমাকে শুনিয়েছেন। এতকাল পরেও সেই ক'টি দিনের স্মৃতি জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে আমার চেতনায়। আমার উপলক্ষে এক রাতে শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে তাঁর বাসায় একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত গায়ক অর্ঘ্য সেনকে গান গাওয়ার জন্যে আসতে বলেছিলেন সে-রাতে। বিষ্ণু দে'র অসংখ্য ভক্তের অন্যতম অর্ঘ্য সেন সানন্দে সে-রাতে গান গেয়ে উপস্থিত সবাইকে, বলা যেতে পারে, সুরমুগ্ধ করেছিলেন।

আমাদের সবার পৈটিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে কবি-পত্নী প্রণতি দে তাঁর তৈরি অপূর্ব লুচি, মজাদার তরকারি এবং মোহনভোগ পরিবেশন করেন হাসিমুখে। সবাই যেন তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারেন, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর।

মনে পড়ে, সাহিত্য সম্মেলনে কবিতাপাঠের আগে বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার কয়েকটি কপি শ্রোতাদের হাতে পৌঁছে দেন। কবিতাটি দীর্ঘ ছিল, কিন্তু কবির আকর্ষণীয় আবৃত্তির গুণে শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন। বিষ্ণু দে'র আবৃত্তিতে কোনও দেখানোপনা ছিল না, একধরনের সহজ, সুন্দর পরিমিত স্টাইল ছিল, যা পরিশীলিত শ্রোতাদের আকর্ষণ করত। সেই আসরে আমিও একটি কবিতা পড়তে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। কবিতাটি ইতিপূর্বে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। আমার কবিতা সেই সবায় অবহেলিত হয় নি বলেই মনে হয়েছিল। 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। সেই সাধুবাদ, আশা করি, কৃত্রিম ছিল না। আমি যে সারিতে বসেছিলাম, সেই সারিতে আমার পার্শ্ববর্তী চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন একজন রূপসী তরুণী। তিনি হাসিমুখে আমার কবিতার তারিফ তো করলেনই, উপরন্তু তার হাতপাখা দিয়ে আমাকে বাতাস করলেন বেশ কিছুক্ষণ। বেজায় গরম ছিল তখন। আমার আপত্তিকে পাত্তাই দিলেন না।

আমি যে ক'দিন সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম, সেই ক'দিন তরুণীটিও ওর নির্দিষ্ট আসনে বসে থাকত এবং ওর পাশের সিট সম্ভবত আমার জন্যে আগলে রাখত। ওর নাম সে আমাকে বলেছিল এবং এ-ও জানিয়েছিল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এতকাল পর ওর নাম আজ আর মনে নেই, তবে তাকে আজও একেবারে মুছে ফেলতে পারি নি স্মৃতিপট থেকে। হঠাৎ কোনও কোনও মুহূর্তে তার মায়াময় দুটি চোখ, মৃদু হাসিমাখা আকর্ষণীয় ঠোঁট এবং আশ্চর্য কণ্ঠস্বর কোনও কোনও গোধূলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে আমার স্মৃতিতে। জানি না, সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে। ওর কি কোনও অলস মুহূর্তে মনে পড়ে সেই কবির কথা, যাকে দু'তিনদিন কিছু কথা, হাসি এবং পাখার হাওয়া উপহার দিয়েছিল?

ঠিক মনে নেই, সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় কি তৃতীয়দিন কে একজন এসে বললেন, তিনজন কবি আমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছেন। আমি তাড়াতাড়ি হল থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হলাম তাঁদের উদ্দেশে। কিছুদূর হাঁটার পর দেখি বাইরে খোলা জায়গায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ এবং অরুণ কুমার সরকার বসে আছেন। তাঁরা সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্যে আসেন নি, আমার সঙ্গে দেখা হবে বলেই এসেছেন, অন্য কোনও কারণে নয়। তাঁদের নাকি আমন্ত্রণই জানানো হয় নি। পরে একদিন ওঁদের সঙ্গে তুমুল আড্ডা দেব, এ-কথা বললাম নরেশ গুহকে। তিনি জানতেন যে, আমি কোনও মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। দুঃখের বিষয়, পরে এমনই এক ঘটনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, আমি কথা রাখতে পারি নি।

আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং তাঁর জীবনসঙ্গিনী গৌরী আইয়ুব সেবার নৈশভোজনে কায়সুল এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানান তাঁদের পার্ল রোডের বাসভবনে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে-রাতে আমি সেই দাওয়াত রক্ষা করতে পারি নি। সেদিন বিকেলবেলা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় একটি বিশেষ আসর দিব্যি জমে গিয়েছিল। ওমর খৈয়ামি ঢঙের পানে মশগুল হয়েছিলেন কবিকুল। শক্তির কল্যাণে বিকেল প্রায় মধ্যরাতে গড়াল। এই মাতোয়ালা ঢঙে আর যা-ই হোক মধ্যরাতে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর বাসভবনে বন্ধ দরজার কড়া নাড়া যায় না। পরদিন কায়সুল হককে সঙ্গে নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর বাসায় গেলাম। কায়সুল অবশ্য গতরাতেই সময় মাফিক দাওয়াত রক্ষা করেছিলেন। যা হোক, পার্ল রোডে গিয়ে দেখি আবু সয়ীদ আইয়ুব নৈশ আহার শেষ করে একটি কি দুটি মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। গৌরী আইয়ুব হাসিমুখে এইমাত্র হাজির হওয়া অনাহূত মেহমানকেও মিষ্টান্ন উপভোগ করতে মিনতি জানালেন। আমরা মিষ্টান্নের সৎকারে কালবিলম্ব করি নি। আমাদের পাত্র শূন্য হওয়ার পর পাশের ঘরে প্রবেশ করতে অনুরুদ্ধ হলাম গৌরী আইয়ুব-এর আন্তরিক, স্নিগ্ধ হাসিমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে।

আমরা সেই ঘরের দুটি চেয়ারে দুজন বসে পড়লাম। আইয়ুব, মনে হল, আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমি যে আসরে জড়িয়ে পড়েছিলাম সে ধরনের আসর থেকে সহজে সময় মাফিক বেরিয়ে আসা যায় না। এরপর তিনি সাহিত্য বিষয়ক নানা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর অকালমৃত প্রতিভাবান সাহিত্যিক বন্ধু ফজলুল হকের

কথা বললেন। ফজলুল হক কলকাতা থেকে চাকরির খোঁজে ঢাকায় এসে চলন্ত ট্রেনের চাকার নীচে নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্মহননে মেতেছিলেন হতাশার হিংস্র কুয়াশার চাপে!

আমার পরম সৌভাগ্য যে, অনেক বছর আগেই আবু সয়ীদ আইয়ুব ফজলুল হকের ছোটো ভাইয়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে আমার কবিতার প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। সেই প্রশংসা যে তিনি খামোকাই করেন নি, কিছুকাল পরে প্রকাশিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'য় বোঝা গেল। এই সঙ্কলনটির সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত সেই সুদৃশ্য সঙ্কলনে পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র দু'জন কবির কবিতা ছিল। জসীমউদ্‌দীন এবং শামসুর রাহমানের। লুকাব না, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম সেকালে। আবু সয়ীদ আইয়ুব আমার কবিতা পছন্দ করতেন, কখনও কখনও কবিতার প্রশংসা সংবলিত চিঠি লিখতেন — এ-কথা ভাবলে আজও এই বয়সেও আমার দু'টি চোখ কেন জানি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

## ॥ তেষট্টি ॥

মনে পড়ল 'কবি ও কবিতা' পত্রিকাটির কথা। পত্রিকাটির সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য। তিনি কবিতাও লেখেন। তাঁর পত্রিকায় আমার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবি ও কবিতা'য় কায়সুল হকও লিখেছেন। জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। তাঁর কথা বেশ মার্জিত এবং শুনে মনে হয়, তিনি যেন কোনও প্রবন্ধ থেকে কিছু বাক্য উদ্ধৃত করছেন। তাঁর কথায় আন্তরিকতার পরিচয় পেলাম। তিনি 'কবি ও মানসী' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট বইয়ের রচয়িতা শুধু নন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থমালার প্রত্যেকটির অসাধারণ ভূমিকা রচনা করে সাড়া জাগিয়েছেন বাঙালি সারস্বত সমাজে তো বটেই, সেসব রচনা সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছে।

জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবি ও কবিতা' পত্রিকার জন্যে নিয়মিত কবিতা পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। আমি সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, নিয়মিত না হোক মাঝে মাঝে তাঁর ঠিকানায় কবিতা পাঠাব। কিছুকাল সেই প্রতিশ্রুতির খেলাপ হয় নি। কায়সুল হক এবং আমার কবিতা ছাড়াও সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, জিয়া হায়দার ও নুরুল করিম নাসিমের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। দুপুরে ফিরে এলাম সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। আমার দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করার পর বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলাম বিছানায় আলস্য করে। বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষক কমলকুমার মজুমদার আমাদের প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আলসেমি ঝেড়ে ফেলে উঠে বসলাম এবং মুগ্ধ হয়ে শুনলাম তাঁর কথা। তিনি শুধু যে ইংরেজি ভাষা ভালো জানতেন, তা-ই নয়, ফরাসি ভাষার ওপরও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। সেদিন তাঁর হাতে একটি ফরাসি কেতাব শোভা পাচ্ছিল। সেই বই এবং বইয়ের লেখকের নাম আমার মনে নেই।

দুপুর ঢলে পড়ল বিকেলে। আকাশে গোধূলির রং। এমন সময় আমাদের ঘরে প্রবেশ করলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সন্তোষকুমার

ঘোষ এবং কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দুজনকেই খুব গম্ভীর মনে হল। সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে একটি চিঠির মতো একখণ্ড কাগজ। একটু পরেই জানা গেল সেই কাগজ আমার মেজ ভাই আজিজুর রহমান চৌধুরীর একটি টেলিগ্রাম যাতে আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরার অসুস্থতার কথা জানানো হয়েছে। আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লাম, কারণ আমাকে তৎক্ষণাৎ ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হতে বলা হয়েছে। কেন জানি আমার মনে হল, সম্ভবত জোহরা আর বেঁচে নেই। তখন আমার বুক চিরে হু-হু করে কান্না বেরিয়ে এল। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি নি। বালিশে মুখ গুঁজে একটানা অনেকক্ষণ কাঁদলাম। নিঃশব্দ হয় নি সেই কান্না। আমার এই অবস্থা দেখে সবাই খুব বিচলিত বোধ করলেন।

সে-রাতেই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রভাবে বিমানের একটি টিকিট পাওয়া গেল যাতে আমি পরদিন সকালেই ঢাকায় রওয়ানা হতে পারি। রাত কাটল চাপা কান্নায়, অনিদ্রায় এবং দুর্ভাবনায়। বারবার মনে পড়ছিল জোহরার মুখ। ভোরবেলা রওয়ানা হলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমার সঙ্গী হলেন মহাদেব সাহা। আর কেউ ছিলেন কি-না, মনে পড়ে না। তবে আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে বিমানবন্দরে আগেভাগেই হাজির ছিলেন লেখক এবং সাংবাদিক সঞ্জীব দত্ত। সঞ্জীব ঢাকা থেকে চলে এসে কলকাতায় বসবাস করছিলেন। এই যে তিনি আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে এই ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন, এ-কথা ভেবে কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলাম তখন। মহাদেব সাহা যে সাতসকালে আমাকে এই বেদনার্ত সময়ে অনেকক্ষণ সঙ্গ দিলেন অকাতরে, এ-কথা কী করে ভুলতে পারি? আমাদের এই বিশিষ্ট কবি যে সহানুভূতিশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, এর পরিচয় একাধিকবার পেয়েছি।

সারা পথ কাটল উদ্বেগের ঝাপটায়। বাসায় পৌঁছে দেখি, জোহরা নেই। তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে তিন দিন আগেই প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষণকাল বিলম্ব না করে ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। চিকিৎসক জানালেন যে, ফাঁড়া কেটে গেছে, রোগিণী এখন আস্তে-সুস্থে রোগমুক্ত হয়ে পড়বেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ষোলোআনা ভালো হয়ে ফিরে যেতে পারবেন নিজ বাসগৃহে। আমার মনের উপত্যকায় স্বস্তির মুক্ত বাতাস বয়ে গেল।

চার পাঁচ দিন পর কলকাতা থেকে আমার কাছে কমলকুমার মজুমদারের লেখা ছোট একটা চিঠি এল। সেই চিঠিতে তিনি মূলত আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কী অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁর এই উদ্বেগ আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল যে কমলকুমার মজুমদার শুধু একজন বড়ো মাপের লেখকই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি অসাধারণ। ক'দিন পর আমি তাঁর চিঠির জবাব দিই। সেই চিঠি পেয়ে তিনি একটি অসাধারণ পত্র পাঠান আমার উদ্দেশে কমল মজুমদারীয় বঙ্গীয় ভাষায়। পরে যখন কলকাতায় গেলাম, তখন তিনি লোকান্তরিত। একদিন দুপুরবেলা খালাশিটোলার সেই নামজাদা পানশালায় গেলাম। তখন পানশালার টেবিলে সারি সারি পানপাত্র উপুড় করে সাজানো। জনমানুষের চিহ্ন নেই কোনওখানে। চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে। আমার পথপ্রদর্শক একটি বিশেষ স্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এখানটায় সন্ধেবেলা কমলদা বসতেন।' আমার

অজান্তেই বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কমলকুমার মজুমদারকে আমি দু'তিন-দিনের বেশি দেখি নি। বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁর কিছু কথা শুনেছি। তন্ময় হয়ে তাঁর কয়েকটি বই পড়েছি। কিন্তু আজও তাঁর কথা মনে পড়লে একধরনের ঔদাস্য আমাকে দখল করে নেয়।

যে তিন-চারটি দিন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলায় কাটিয়েছিলাম, সে ক'টি দিনের স্মৃতি আমার মনে খেলা করে। মনে পড়ে — কায়সুল হক, শহীদ কাদরী, আল মহামুদ, মহাদেব সাহা আমরা সাউথ পয়েন্ট স্কুলে কাটিয়েছিলাম মহানন্দে সৎসঙ্গে। আমরা এই ক'জন ছাড়া আরও ছিলেন সংস্কৃতি সংসদের আবুল হাসনাত, মাহফুজ আনাম, ইকবাল আহমদ, আসাদুজ্জামান নূর, সালাউদ্দিন আহমেদ। আবুল হাসনাত রচিত নৃত্যনাট্য 'লাল গোলাপ-এর জন্য' পরিচালনা করেন শারমিন হাসান। আবুল হাসনাত রচিত এই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আকর্ষণীয় নৃত্যনাট্য ঢাকায় বেশ সাড়া জাগিয়েছিল, মনে পড়ে। আশীষ কুমার লোহ ছিলেন লায়লা সামাদের দলে। লায়লা সামাদ পরিচালিত নাটকটির বেশ কদর হয়েছিল। লায়লা সামাদ এবং তাঁর নাটকের দল আমাদের সঙ্গে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ছিলেন না। তাঁরা অন্যত্র তাঁদের ডেরা বেঁধেছিলেন।

নানাস্থানে আসা-যাওয়ার মধ্যেই কিংবদন্তিতুল্য কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র এবং তাঁর জীবনসঙ্গী সংগ্রামী রমেন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়ে যাই আবুল হাসনাতের উদ্যমে। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে এ/৩ গবর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেটে (পদ্মপুকুর) নিয়ে যান। পরিচয়ের পরমুহূর্তেই রমেন মিত্র আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কিছুক্ষণ কথা বলা এবং বেশি শোনার পরই রমেন মিত্রের পড়াশোনার ব্যাপ্তি বিলক্ষণ টের পেলাম। এরই মধ্যে ইলা মিত্র চা-বিস্কুট পরিবেশন করলেন সস্নেহে। দিনের সেই ঋদ্ধ প্রহরটি আমি কোনওদিন ভুলব না।

জীবনের অনেক কিছুই সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয় না। এই যে আমি আত্মকথা লিখছি, তা কোনও শৃঙ্খলে আটক নেই। কখনও পরের কথা আগে এসে যায় হুট করে, কখনও আবার আগের ঘটনা বর্ণিত হয় পরবর্তী সময়ে।

## ॥ চৌষট্টি ॥

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে বেজায় মুশকিলে পড়েছি। কোনওদিন আত্মকথা লিখে পাঠকসমাজের কাছে পেশ করতে হবে, সত্যি বলতে কী, স্বপ্নেও ভাবি নি। কারও কারও মতো আমি নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত রোজনামচা লিখে রাখি নি। ফলে অতীতের কোনও কোনও ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, কিছু কিছু ঘটনা আবছা ভাসমান স্মৃতির কুয়াশায়। তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সে-জন্যেই আগের কথা পরে এবং পরের কথা আগে এসে যায়। তবে আমার এই 'কালের ধুলোয় লেখা' যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের একটি বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি এ-কথা বলে যে, যা আমি লিখে চলেছি, তার অন্য কোনও গুণ না-ই থাক, অন্তত সত্য যেন লাঞ্ছিত না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রেখেছি।

কালের ধুলোয় লেখা'য় এ যাবৎ যা লিখেছি তার কদর বাড়াবার মতলবে আমার জীবনে যা ঘটে নি, যাঁদের সঙ্গে কোথায় দেখাও হয় নি, যে-দেশে যাই নি অথবা যাঁর

সঙ্গে কস্মিনকালেও আলাপ আলোচনা হয় নি সেসব অবাস্তব বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে পাঠকসমাজের বাহ্‌বা কুড়োবার মনোবৃত্তিকে আদৌ প্রশ্রয় দিই নি। একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির জীবনে সত্যি-সত্যি যা ঘটেছে কিংবা সে যা তার সীমিত জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলোকেই তুলে ধরা হয়েছে।

কেউ কেউ নালিশ করেছেন যে, আমি নিজের কথা বেশি না বলে অন্যদের কথা অনেক বলেছি। ব্যাপারটি তাঁদের পছন্দ হয় নি। আমি কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা, যাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে, বহুদিন তাঁদের বাসায় গিয়েছি, তাঁরাও আমার বাসায় এসেছেন, গুলজার করেছেন আসর, তাঁদের কথা তো স্বাভাবিকভাবেই আমার লেখনীকে খানিক বাকমুখর করবে, এটাই তো প্রত্যাশিত।

আজ এই মুহূর্তে হুমায়ুন আজাদের কথা মনে পড়ছে। ১৯৬৩ সালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সম্ভবত তখন তিনি কলেজের ছাত্র। ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছেন। বরাবরই তিনি ছাত্র হিসেবে জ্বলজ্বলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণি তো হাসিল করেছেনই, বিদেশের ডক্টরেট উপাধিও তাঁর আয়ত্তে রয়েছে। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখেছেন, ভাষাতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক, উন্নত চিন্তার অধিকারী পাঠকদের মানসভূমি নাড়ানোর মতো গ্রন্থাদিও রচনা করেছেন।

হুমায়ুন আজাদ তাঁর 'কাব্য সংগ্রহ'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, '...মধুর আলস্যে জীবন উপভোগ আমি করি নি; বন্ধুরা যখন ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে উপভোগ করছেন তাদের অতীত কীর্তি, সিসিফাসের মতো আমি পাথর ঠেলে চলছি। কবিতার মতো প্রিয় কিছু নেই আমার বলেই বোধ করি, তবে আমি শুধু কবিতার বাহুপাশেই বাঁধা থাকি নি; কী করেছি হয়তো অনেকেরই অজানা নয়। কবিতা কেন লিখতাম? খ্যাতি, সমাজবদল এবং এমন আরও বহু মহৎ উদ্দেশ্যে কবিতা আমি লিখি নি বলেই মনে হয়; লিখেছি সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে, আমার ভেতরের চোখ যে-শোভা দেখে, তা আঁকার জন্যে; আমার মন যেভাবে যেভাবে কেঁপে ওঠে, সে-কম্পন ধরে রাখার জন্যে। মানুষের অনন্ত সৃষ্টিশীলতা আমার ভেতর দিয়েও প্রকাশ পাক কিছুটা, এমন একটা ব্যাপারও হয়তো আছে। জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা আমি করি নি; যদিও আমার কবিতা অপ্রিয় নয়। কবিতা প্রলাপ নয়, তবে প্রলাপ ও কবিতা আজ অভিন্ন অনেকের কাছে; এটা এখনকার এক জনপ্রিয় রোগ... শুধু বলি আমি কবিতা লিখেছিলাম, লিখছি এবং লিখব; এটা আমাকে সুখী এবং আমার বেঁচে থাকাকে সুখকর করেছে — অন্য আর কিছু এতটা করে নি।'

আমিও হুমায়ূন আজাদের অনেক গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকার মতোই আন্তরিকভাবে কামনা করি, তাঁর লেখনী আজীবন সক্রিয় থাক, সমৃদ্ধি হোক আমাদের কবিতা।

একসময় হুমায়ূন আজাদের সঙ্গে প্রায়শই দেখা হত, কখনও তাঁর বাসায় কখনও অন্য কোথাও। সে কী তুমুল, সফেন আড্ডা জমত তখন। আমাদের আসর বিকেল পেরিয়ে রাতের কোনও কোনও প্রহরে পৌঁছে যেত। কবিতা-বিষয়ক আলোচনা তো হতই, আরও কিছু রসালো মনমাতানো আলাপেরও কমতি ছিল না। কিন্তু সামান্য অশ্লীলতা কোনও কোনও সন্ধ্যারাতে আমাদের কথাবার্তায় সিঁদে কেটে ঢুকে পড়ত কি? সত্যি বলতে কী, মনে পড়ছে না। জৈব বিষয়ের উল্লেখ যে কালেভদ্রে হত না, তা হলফ করে

বলতে পারি না। তবে আড্ডার মূল বিষয় অধিকাংশ সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বিদেশি সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত।

হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই তিনি আমার কবিতা পড়তেন। অল্পবয়সেই তিনি আমার লেখা 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং 'রৌদ্র করোটিতে' বই দু'টি সোৎসাহে পড়েছিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে যখন পরিচিত হলাম, তখন রৌদ্র করোটি'র কোনও কোনও কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তাঁর কণ্ঠে শুনেছি। সে জন্যে তাঁকে বইয়ের পাতা উলটাতে হয় নি। হুমায়ুন আজাদ আমার কবিতাকে যে মূল্য দিতেন, তার পরিচয় আলাপ- আলোচনার মধ্যে তো পেয়েছিই, ১৯৮৩ সালে তাঁর লেখা 'শামসুর রাহমান নিঃসঙ্গ শেরপা' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর, সত্যি বলতে কী, অত্যন্ত আনন্দিত হই। আমি জানতাম, কাউকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তাঁকে দিয়ে এমন কাজ করানো যাবে না। বইটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিল।

এই ঘটনার আগে কেউ কেউ আমার কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিশিষ্ট কবি এবং সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক গ্রন্থে আমার কবিতা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, একজন খুব ছোটো একটি বইও লিখেছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন আজাদের 'শামসুর রাহমান নিঃসঙ্গ শেরপা' নিঃসন্দেহে একটি উন্নতমানের সমালোচনা গ্রন্থ, যার জুড়ি যত্রতত্র মিলবে না। হুমায়ুন আজাদ কয়েকটি উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর 'ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল', 'সব কিছু ভেঙে পড়ে', 'মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ' এবং 'শুভব্রত তার সম্পর্কিত সুসমাচার'।

এই প্রথা-বিরোধী সাহিত্যিকের উপন্যাসগুলো বাজারের চলতি উপন্যাসের মতো কিছু নয়। তাঁর উপন্যাস পাঠককে চিন্তাশীল হতে বাধ্য করে, যারা দুপুরে বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ওষুধ হিসেবে উপন্যাস হাতে তুলে নেয়, হুমায়ুন আজাদ তাঁদের জন্যে কথাসাহিত্য রচনায় সময় ক্ষেপণ করেন নি।

হুমায়ুন আজাদ কিশোরদের জন্যেও চমৎকার সব বই লিখেছেন। সেসব বইয়ের ভাষা যেমন সরস, নামও খুব আকর্ষণীয়। 'কিশোর কিশোরীরা', 'লাল নীল দীপাবলি' বা 'বাঙলা সাহিত্যের জীবনী', 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না', 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী', 'আব্বুকে মনে পড়ে', 'বুক পকেটে জোনাকি পোকা', 'আমাদের শহরে একদল দেবদূত'। 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না' এবং 'আব্বুকে মনে পড়ে' জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

একজন কবি হিসেবেও যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তা অনেকে ভুলে থাকেন। যাঁরা এই ভুলটি করেন তাঁদের আমি হুমায়ুন আজাদের কাব্য সংগ্রহটি পড়তে অনুরোধ করব। আমি জানি, এই কবির পাঠক-পাঠিকা একেবারে কম নয়, তবু যে-কবির সৃষ্টি 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে', 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে', 'কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু'-র মতো কাব্যগ্রন্থ, তাঁর নাম গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। হুমায়ুন আজাদ তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থে নিজের জন্মস্থান এক গ্রামের কথা লিখেছেন নানাভাবে। সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে সেসব কবিতায়।

কোনও গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি নি, কিন্তু আমার পিতামহ, মাতামহ, পিতা সবারই জন্মস্থান মেঘনা নদীর তীরবর্তী এক গাঁয়ে, পাড়াতলী যার নাম। কালেভদ্রে সেখানে আমাদের যাওয়া খুবই অল্পসময়ের জন্যে।

আমি শহুরে হয়ে উঠেছি। অনেক আগে আকাশে চিল উড়তে দেখেছি সকালে, দিনদুপুরে, বিকেলেও। দুপুরে চিলের ডাক শুনে মনে কেমন এক উদাসীনতা ছেয়ে যেত। এখন আমি বেশ কয়েক বছর ধরে শ্যামলীতে আস্তানা গেড়েছি। এখানে বসে কিংবা পথে হেঁটে যেতে আকাশে চিল কিংবা অন্য কোনও পাখি দেখা কিংবা ওদের ডাক শোনা কিছুই ঘটে না। তবে হ্যাঁ, কোনও কোনওদিন কাকের দেখা মেলে, ওদের ডাকাডাকিও কর্ণকুহুরে প্রবেশ করে। অনেক আগে কোনও কোনও পাখি এসে বসত আমার বারান্দায়, বেশ কিছুদিন থেকে ওরাও উধাও। শহরের বিষাক্ত আবহাওয়া ওদের বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমি শ্যামলীতে বসবাস করছি তেরো বছর ধরে। এই তেরো বছরে একবারের জন্যেও কোনও কোকিলের ডাক শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি। অথচ বিখ্যাত কথাশিল্পী এবং আমার প্রিয় বন্ধু রশীদ করীম এখনও কখনও কখনও চেয়ারে বসে দিব্যি কোকিলের মধুর গান শোনেন। আমার আপনজন আরও কেউ কেউ শোনে, কিন্তু আমি বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছি বছরের পর বছর। ঢাকা শহর যেভাবে ক্রমশই বৃক্ষহীন পাথুরে হয়ে উঠছে, তাতে সম্ভবত কোকিল চিরতরে এখান থেকে নির্বাসিত হবে।

## ॥ পঁয়ষট্টি ॥

অনেক মানুষের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল, এরকম বাক্য লিখলে অন্যায় হবে, অসত্য তো হবেই। অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে নি সবার ক্ষণিক সাহচর্যে। তবে আজ অব্দি যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা বজায় রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তারা, যে বয়সেরই হোন না কেন, আমার বান্ধবে পরিণত হয়েছেন। অন্তত আমি তো তাঁদের প্রিয় বান্ধব বলে মনে করি। যাই হোক, এই মুহূর্তে আমি চলে যাচ্ছি বেশ কিছুটা পেছনের দিকে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের দিকে। তখন প্রৌঢ়ত্ব কিংবা বার্ধক্য আমার ধারে কাছে ঘেঁষে নি।

সেকালের আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। আশরাফউদ্দিন চৌধুরী একজন ইনকামট্যাক্স অ্যাডভাইজার ছিলেন। তিনি, বলা নিষ্প্রয়োজন, কোনও মামুলি ব্যক্তি ছিলেন না। তবে আমরা তাকে পছন্দ করতাম তাঁর আলাদা গুণের জন্যে। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। রবীন্দ্র এবং নজরুল সংগীত তো তিনি পছন্দ করতেনই, উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সমঝদার। তাঁর পুরনো পল্টনের বাসায় হামেশা সংগীত এবং সাহিত্যের আসর জমে উঠত সন্ধ্যারাতে। সেসব আসর প্রায় মধ্যরাত অব্দি বজায় থাকত। এবং অতিথিরা কেউ অভুক্ত তো থাকতেনই না, তাঁদের তেষ্টা মেটাবার নানা সরঞ্জামও থাকত। আর আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর সেসব আসর ছিল সর্বদাই সুশীল, প্রফুল্ল, রুচিশীল এবং সম্ভ্রান্ত। কোনও ধরনের অশ্লীলতা সখানে কস্মিনকালেও লক্ষ করে নি কেউ।

বিশেষ করে একটি আসরের কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। সে-রাতে বিখ্যাত উর্দু কবি ফয়েদ আহমাদ ফয়েজ ছিলেন গৃহকর্তা আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর বিশেষ অতিথি। মুনীর চৌধুরীও ছিলেন অন্যতম অতিথি। গৃহকর্তার অনুরোধে মুনীর চৌধুরী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে পেশ করলেন উপস্থিত, উৎসুক অতিথিদের কাছে। শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তখন সুরার কৃপায় টলটলায়মান। কিন্তু শের অর্থাৎ কবিতা আবৃত্তি করলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। শ্রোতাদের অনুরোধে ক্রমাগত একটির পর একটি কবিতা আবৃত্তি করে গেলেন অকম্পিত নিজস্ব ভঙ্গিতে। কোথাও হোঁচট খেলেন না, উলটোপালটা কিছু উচ্চারণ করলেন না। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কবিতাপাঠ শুনলাম। আর মাঝে মাঝে মুনীর চৌধুরীর বিদগ্ধ বক্তব্য শুনে নিজেকে সমৃদ্ধ মনে হয়েছে।

সেই সন্ধ্যারাতে ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে প্রথম দেখি, শুনি কবিকণ্ঠে তাঁর নিজের বেশ কয়েকটি কবিতা। সেকালে আমি ছিলাম অসম্ভব স্বল্পবাক, ভেতর-গোঁজা এক যুবক। নিজেকে সরিয়ে রাখতাম অনেকের কাছ থেকে। একবার আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর আমন্ত্রণে বিখ্যাত গায়িকা আঙুরবালা আমন্ত্রণকারীর বাসার আসরে কয়েকটি ঘন্টাকে সুরমূর্ছনায় রূপালি সোনালি করে তুলেছিলেন। বিখ্যাত, পুরনো কয়েকটি গান শুনিয়ে রাত্রিকে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন আমাদের জন্যে। আমি আমার স্বাভাবিক লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলাম আর তিনি আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। পথে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন নক্ষত্রের বৃষ্টিতে গোসল হয়ে গেল। কেউ কেউ আমার নীরবতাকে অহংকার বলে মনে করতেন! আশরাফউদ্দিন চৌধুরী কবি শামসুর রাহমানকে বুঝতে পারতেন, তাই তিনি আন্তরিকভাবে তাঁর সেই প্রায় প্রত্যেকটি শৈল্পিক আসরে আমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেন।

তাঁর বদান্যতার কথা মনে করে আজও তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই আন্তরিকভাবে। বহুদিন হল তিনি শিল্প থেকে, পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রগাঢ় ধূসরতায় মিলিয়ে গেছেন। কবুল করি, আজ এতকাল পর তাঁর মুখ আর সুস্পষ্ট রেখাবলিতে মনে পড়ে না, ছায়াছায়া মনে হয় আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর মুখ। তাঁর মতো ব্যক্তির সবরকম বাধা-বিপত্তি উজিয়ে, হরেক অসুখকে পরাজিত করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা উচিত ছিল। যখন তাঁর কথা মনে পড়ে, মানসপটে গাঢ় হয়ে ফুটে ওঠে একটি প্রসন্ন, মানবপ্রেমী, সংস্কৃতিবান মুখ। তাঁর কথা বহুদিন কারও কাছে শুনি না। এরকম একজন মানুষের স্মৃতি কি লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত? তাঁর সঙ্গে তো অনেকেরই পরিচয় ছিল। তাঁরা কি কখনও রাতের কোনও প্রহরে ক্ষণিকের জন্যেও ভাবেন তাঁর সেই আসরের কথা? কবিতার কথা? সংগীতের কথা? এই যে আমি 'কালের ধুলোয় লেখা' নিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলছি, প্রায়শই সেও তো ভুলেই বসেছিল আশরাফউদ্দিন চৌধুরীকে। হঠাৎই এই একদিন আগে সেই সংস্কৃতিমান মানুষটি আমার স্মৃতির আকাশে নক্ষত্রের মতোই ঝলসে উঠলেন। তাঁর কথা কিছু বলে আমার অপরাধবোধকে অতি সামান্য হলেও লাঘব করতে পেরেছি।

এমন অনেকে আছেন, যাঁরা নানা দেশে বহুদিন ঘুরে বেড়াতে খুবই পছন্দ করেন। কোথাও যেতে না পারলে মনে হয় তাঁদের মানব জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। নিজের

কপাল ঠুকতে থাকেন। আমি তাঁদের দলভুক্ত নই। কোনও অজানা দেশে যেতে পারলে ভালোই লাগে, তবে কোথাও যাওয়া না হলে হাপিত্যেশ করি নি কোনওকালেই। এমনও হয়েছে বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি আমি, কিন্তু অন্য একজনের সেখানে যাওয়ার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বেশি, আমি স্বেচ্ছায় তার যাওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছি আমার নিজের বদলে।

যাই হোক, এ সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি দেশে ভ্রমণ করা হয়েছে আমার গাঁটের পয়সা খরচ না করেই। যতদূর মনে পড়ে বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭২ সালের জুন মাসে মস্কো শহরে যাওয়া হয় আমার সেখানকার আমন্ত্রণে। একজন কবি হিসেবেই আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তবে সত্যের অনুরোধ বলা দরকার, সেকালের একজন নিবেদিতপ্রাণ মার্কসবাদী এবং একালের দৈনিক 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমানই একদিন আমাদের বাসায় এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি মস্কোয় যেতে ইচ্ছুক কি-না। সেখানে পুশকিন মেলায় নানা দেশের কবি অংশগ্রহণ করবেন। আমি বাংলাদেশের কবি হিসেবে আমন্ত্রিত। চটজলদি রাজি হয়ে গেলাম। জানি না আমি কতটুকু মার্কসবাদী, তবে অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি যে, প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে শত হস্ত দূরে রয়েছি বহুকাল থেকেই।

তখনও বাংলাদেশ সরকার কেতাদুরস্ত পাসপোর্ট চালু করতে পারেন নি। একটি লম্বা কাগজে কিছু দরকারি তথ্য জানাবার জন্য কয়েকটি বাক্য মুদ্রিত রয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। সেই পাসপোর্টই আমাকে উড়োজাহাজে মস্কো বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল। বিমানবন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সার্গেই সেরিব্র্যয়ান্নই। সেই যুবকই আমার সঙ্গী ছিলেন যতদিন সোভিয়েট ইউনিয়নে ছিলাম।

সার্গেই সেরিব্র্যয়ান্নই আমাকে পৌঁছে দিলেন উপক্রাইনা হোটেলে। এই হোটেলটি খুবই পুরনো এবং বনেদি। আমার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করে সার্গেই সেরিব্র্যয়ান্নই নিজের বাসায় চলে গেলেন। বিদায় নেয়ার আগে তিনি তাঁর বাসার টেলিফোন নম্বরটি আমাকে দিয়ে বললেন, কোনও প্রয়োজন হলে আমি যেন তাঁকে টেলিফোন করি নির্দ্বিধায়।

রাতের খাবার খেয়ে পুরনো জমিদারি ঢঙের খাটে ঘুমোতে গেলাম। টুকরো টুকরো ছেঁড়া ঘুম গায়েব হলে টয়লেটে গিয়ে সাবান দেখে রীতিমতো হতাশ হলাম। আমাদের বাংলাদেশের বাংলা সাবান যেন কেউ সাজিয়ে রেখেছে সাবানদানিতে। হতাশাগ্রস্ত আমি বেপরোয়া হয়ে ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই সার্গেই সেরিব্র্যয়ান্নইকে টেলিফোন করলাম। ঘুম-জড়ানো চোখে এবং গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার?' আমি তাঁকে সাবানের ব্যাপারটি জানালাম। তিনি যা বললেন তাতে আমার আক্কেলগুড়ুম। আমি ভদ্রলোককে ভোর ভেবে রাত তিনটেয় টেলিফোন করে বসেছি! তিনি আমাকে সকালে এসে ভিন্ন সাবান দেবেন বলে আশ্বস্ত করলেন। লজ্জিত আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। অচেনা জায়গায় এরকম হতে পারে বলে যুবক আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

সকালবেলা সার্গেই সেরিব্র্যয়ান্নই হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে পকেট থেকে সাবান দিলেন তাঁর অতিথির হাতে। আমি হোটলে এবং তাঁর আনা সাবানের মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। আমার চোখে-মুখে বিস্ময় লক্ষ করে সার্গেই

বললেন, আমাদের এখানে এই একই সাবান চালু রয়েছে। অন্য কোনও সুগন্ধি সাবানের অস্তিত্ব নেই এখানে; এ-কথা বলে তিনি মৃদু হাসলেন।

এই মানুষটিকে তাঁর কথাবার্তা শুনে এবং ঠোঁটে হাসি দেখে কেমন যেন একটু আলাদা মনে হল, পরে আরও বেশি মনে হবে। সার্গেই আমাকে পরদিন বিকেলে লেখকদের ক্লাবে নিয়ে গেলেন। সেকানেই মারিয়াম সালগানিকের সঙ্গে দেখা হল। মারিয়াম সালগানিক নিজে কোনও কবি-সাহিত্যিক নন, তবে তাঁদের সমাজে একজন গণ্যমণ্য মহিলা। প্রত্যেক লেখকই তাঁকে চেনেন এবং পছন্দ করেন। তিনি লেখক সংঘের সেক্রেটারি। স্মার্ট মহিলা, চমৎকার ইংরেজি বলেন। সম্ভবত এ কারণেই তিনি এই বিশেষ পদটি অলংকৃত করতে পেরেছেন। বিভিন্ন দেশের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ধারণাও বিশেষ, নইলে তিনি এই পদের চেয়ারে বসতে পারতেন না। আমাকে দেখে মারিয়াম সালগানিকের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। আমার কোনওরকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন এবং সার্গেইকে বাংলাদেশের কবির দিকে খেয়াল রাখতে বললেন, যাতে মস্কোয় এবং অন্যস্থানে তাঁর কোনওরকম কষ্ট না হয়। এই রাইটার্স ক্লাবেই এক বিকেলে দূর থেকে ক্ষণিকের জন্য কবি ইভতেশেঙ্কুকে দেখেছিলাম। আন্দ্রেই ভজনেস্কিকেও দেখেছিলাম একবার। কিন্তু কোনও কথা হয় নি। তবে তাঁদেরই মতো আরেকজন কবি রজদেস্তভেনস্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবং তিনি আমাকে এক সন্ধ্যায় নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাসায়। সার্গেইও আমন্ত্রিত হলেন। চমৎকার দিলখোলা মানুষ এই কবি। কয়েকটি ঘন্টা বেশ ভালো কেটেছিল তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে।

পুশকিন মেলায় আমন্ত্রিত কবিকুলের মধ্যে একজন ভারতীয় হিন্দি কবিও ছিলেন। তাঁর নাম সর্বেশ্বর দয়াল। প্রথম দিকে তাঁকে তেমন পছন্দ করতে পারি নি। তবে ক্রমান্বয়ে তাঁর ব্যবহার আমার মন জয় করে ফেলল।

পোল্যান্ডের একজন তরুণ সুদর্শন কবির সঙ্গে ক'দিন দিব্যি আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন পর তাঁর নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। একদা আমি 'মস্কো থেকে ফিরে' শিরোনামে একটি দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলাম। সেটি কিস্তিওয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি পাণ্ডুলিপিও তৈরি করেছিলাম একজন প্রকাশকের তাগিদে। কিন্তু আমার আলস্য এবং অমনোযোগের ফলে পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। আমার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ফলেও সেটি কোনওদিন উদ্ধার করতে পরি নি। ফলে অনেককিছুই বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকার তলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পুশকিন মেলা বিভিন্ন দেশের কবির গুঞ্জনে, তাঁদের চমৎকার কবিতা আবৃত্তির গুণে বিকেলটি সন্ধ্যারাতে গড়িয়ে গেল নানা ছন্দে। আমি আবৃত্তি করলাম আমার একটি বাংলা কবিতা। সার্গেই আমার কবিতা রুশ ভাষার অনুবাদ পেশ করলেন। এটুকু বলতে পারি, কবিতাটি অবহেলিত হয় নি। বেশকিছু হাততালি জুটেছিল আমার কবিতাটির ভাগ্যে। মনে পড়ছে, আরও একটি কবিতাপাঠের আসরের কথা। সেই আসরে আমি কবিতা আবৃত্তি করি নি। শ্রোতাদের একজন হিসেবে বসেছিলাম সার্গেইর পাশে। একসময় স্টেজে দেখতে পেলাম একজন বুড়োসুড়ো কবিকে। কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে দু'জন

সুন্দরী তরুণীকে বগলদাবা করে পথে হেঁটে আসতে দেখেছিলাম। সার্গেই মৃদু হেসে বললেন, তরুণী দু'জন কবির প্রেমিকা। আমি তো বিস্ময়ে থ' বনে গেলাম। সেই বুড়ো কবি যখন স্টেজে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন, যখন আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল আমার জন্যে। যেন এক তেজী যুবা আশ্চর্য আবেদনশীল পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করছেন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। সেই কবির নাম আমি বিস্মৃত হয়েছি। তাতে কিছু এসে যায় কি? তিনি আমার স্মৃতিতে তো আজও উজ্জ্বল। তাঁর সেই ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, দুই তরুণীকে একসঙ্গে প্রণয় বিতরণের চিত্র তো এখনও আমাকে আন্দোলিত করে, বার্ধক্যকে সামান্য দূরে সরিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

সার্গেই আমাকে একদিন নিয়ে গেলেন মস্কোর বেশ কিছু দূরে, যেখানে পাস্তারনেকের নিবাস দাঁড়ানো কেমন বেদনার্ত, যেন শূন্যতা হাহাকারময়। আমরা দু'জন দাঁড়ানো সেই বাড়ি থেকে দূরে। তার পর সার্গেই এবং আমি হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেলাম এক কবরস্তানে। এক নির্জন স্থানে ছড়ানো রয়েছে কয়েকটি কবর। একটি কবরে, লক্ষ করলাম অনেকগুলো ফুল ছড়ানো এবং কয়েকটি কাগজ। সার্গেই বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, 'ক'জন অখ্যাত তরুণ কবি পাস্তেরনেককে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে গেছেন কয়েকটি ফুল এবং কয়েক টুকরো কাগজে। সার্গেইর অলক্ষ্যে আমার বুক চিরে বেরুল দীর্ঘশ্বাস।

## ॥ ছেষট্টি ॥

'কালের ধুলোয় লেখা' শুরু করার পর বুঝতে পারলাম যে, জীবনে অর্থাৎ আমার যাপিত জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সেগুলো একটি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা একান্ত জরুরি ছিল। কখনও কখনও ডায়েরিতে কিছু কিছু লিখেও ছিলাম; কিন্তু সেগুলো এতই কম যে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। এতকাল পর ঘটনা মনে পড়ে তো তারিখ গায়েব হয়ে থাকে স্মৃতির চৌহদ্দি থেকে। মাথার চুল ছিঁড়ে ফেললেও কোনও ফায়দা হয় না। ফলে অনেক আগেকার ঘটনা উহ্য থেকে যায়, ঢের পরের ব্যাপার বেশ আগেই লিখে ফেলি। কিন্তু যাঁরা আমার মতো এমন অগোছালো, বিস্মৃতিপ্রবণ নন, তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা করেন জীবনকথা। তাঁরা আমার ঈর্ষার পাত্র। তাঁদের তারিফ করার মতো ভাষা আমার দখলে নেই।

যা হোক, হঠাৎ পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি ডায়েরি পেয়ে গেলাম। সেই ডায়েরির কয়েকটি পাতায় আমার কিছু কথা লেখা আছে। মাত্র কয়েকটি পাতা। সেগুলোই এখানে উদ্ধৃত করছি —

**২৮/১/১৯৮৭**

'রাষ্ট্রের সেকুলার চরিত্র যার দ্বারা নির্ধারিত হয় সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্মের আশ্রয় না নেওয়া আর ধর্মীয় ব্যাপারে রাজনীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া।' বাক্যটি আমার নয়। কার তা আজ আর মনে নেই।

**২৯/১/১৯৮৭**

আজ খুলনা এসে পৌঁছলাম রাত দশটায়। স্টেশন থেকে সোজা যেতে হল সেন্ট

যোশেফ্‌স স্কুলে, যেখানে খাবার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন উপলক্ষে এবার খুলনায় দু'দিন কাটাতে হবে। আমাকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধকের ভূমিকা পালন করতে হবে, এরকম একটি কথা সন্‌জীদা খাতুন আগেভাগে জানিয়ে রেখেছিলেন। সার্কিট হাউসে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং আমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে একটি কামরায়। অন্য একটি কামরায় থাক্‌বেন কামরুল হাসান আর রফিকুল ইসলাম। দলের অন্যান্যরা কোথায় থাকবেন জানি না।

জাতীয় কবিতা উৎসবের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। এটি সফল না হলে খুব খারাপ লাগবে। নীতির জন্যে মস্ত বড়ো ঝুঁকি নিয়েছি। ভালোয় ভালোয় কাজ সম্পন্ন হলে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত তৃপ্তিকর হবে ব্যাপারটা। যারা আমাকে দেখতে নারে, আমাদের কাছে আমার হর চলনই বাঁকা। ফজল শাহাবুদ্দীন এবং তার সঙ্গীরা নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, আমি নাকি পশ্চিমবঙ্গের কবিদের এশীয় কবিতা উৎসবে যোগ দিতে বারণ করেছি চিঠি লিখে। তাজ্জব ব্যাপার। এরকম মিথ্যা লোকে রটায় কী করে?

৩০/১/১৯৮৭

আজ সকালবেলা সপ্তম জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। সপ্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে, নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলাম। সেমিনারে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করলেন। সনৎ কুমার সাহার প্রবন্ধ শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনা পড়ে শোনালেন নাজিম মাহমুদ। রফিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুল হক এবং মোহাম্মদ কায়কোবাদ আলোচনা করলেন। ওদের আলোচনা ভালো লাগল, বিশেষ করে ওয়াহিদুল হক এবং রফিকুল ইসলামের বক্তব্যে সারবত্তা ছিল।

শুনলাম কামরুল হাসানের শরীর খারাপ। আমিনুল ইসলাম, চিত্রকর, বিকেলে আমাদের কামরায় এলেন। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আমিনুল ইসলাম এবং আমি কামরুল হাসানকে দেখতে গেলাম। ইতিমধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সেন্ট যোশেফ্‌স বিদ্যালয়ে আহমদ রফিকের সঙ্গে দেখা হল। বছরখানেক আগে সে কলোন থেকে ফিরে এসেছে। এখন খুলনায় স্থায়ী। আস্তানা গেড়েছে পিতৃগৃহে। সময়টা চমৎকার কাটল ওর পিতার পুরনো আমলের বাড়িতে। এ ধরনের বাড়ি আমার ভালো লাগে। আহমদ রফিক বাড়িটির সংস্কার করছে পুরনো আদল বজায় রেখে। দেবব্রত বিশ্বাসের চিঠি পড়লাম। গানও শুনলাম। রফিকের গ্রন্থাগারটি চমৎকার। ওর কাছ থেকে আঁদ্রে মালারোর 'দ্য ভয়েসেস অব সাইলেন্স' বইটি ধার নিলাম। এ বই কিছুকাল থেকে খুঁজছিলাম। সে হাসিমুখে নির্দ্বিধায় বইটি আমার ইচ্ছুক হাতে ধরিয়ে দিল।

৩১/১/১৯৮৭

খুলনা ছেড়ে এলাম খুব সকালে। যশোর এয়ারপোর্টে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং আমাকে নাজিম মাহমুদের ভাগনি তার মোটরকার দিয়ে পৌঁছে দিলেন। স্নিগ্ধশ্রী এই মহিলাকে ভালো লাগল, কথাবার্তায় রুচির লাবণ্য লক্ষ করলাম। তার ব্যবহার অত্যন্ত আন্তরিক মনে হল। আমরা অনেকটা পথ একসঙ্গে এলাম, অথচ তার নাম জানা হল না।

দুপুরবেলা ঢাকায় পৌঁছেই টেলিফোনে খবর পেলাম যে, জাতীয় কবিতা উৎসবের চারজন চারকর্মীকে পোস্টার লাগানোর অপরাধে (?) পুলিশ গ্রেফতার করেছে। চমৎকার

গণতান্ত্রিক শাসন! কবিতার মতো নিরীহ ব্যাপার নিয়েও পুলিশ মাথা ঘামায়, এমনকি কবিতার সপক্ষে উচ্চারিত সামান্য কিছু শব্দসম্বলিত পোস্টার আটক করতে তাদের পারঙ্গমতার তুলনা নেই।

ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। কত রকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছি, টিভি, রেডিওর নীরবতা, অসহযোগিতা প্রত্যক্ষ করছি, জানালাম। নির্মলেন্দু গুণ বললেন যে, আমি চাকরিচ্যুত হতে চলেছি এমন একটা খবর ওর কানে এসেছে।

১/২/১৯৮৭

নির্বিঘ্নে প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসবের প্রথম দিনটি উদযাপিত হল। আশাতীত সাফল্য কবিদের আলোড়িত করেছে। আমাদের অনুষ্ঠানে বেগম সুফিয়া কামাল শরিক হয়ে আরেকবার প্রমাণ করলেন যে, তিনি সত্য ও ন্যায়ের পথে, সাধারণ মানুষের চলার পথে দিশারীর ভূমিকা পালনে সক্ষম। তাঁকে সালাম জানাই। আমাদের দেশে তাঁর যে মাতৃমূর্তি গড়ে উঠেছে তা অম্লান থাক। তিনি আমাদের প্রেরণা।

দেশের দূরদূরান্ত থেকে অনেক কবি এসেছেন জাতীয় কবিতা উৎসবে যোগদানের জন্যে। আজ প্রায় দু'শো কবি কবিতা পাঠ করলেন। সকলের লেখাই যে কবিতা-পদবাচ্য, তা বলা যাবে না। তাতে কী? এই যে সবাই মিলে একই মঞ্চ থেকে শত শত মানুষকে পদ্য শোনালেন, এইটের একটা আলাদা সৌন্দর্য ও তাৎপর্য আছে বলে মনে করি। সাধারণ মানুষও কবিতার সঙ্গে যুক্ত হলেন, কবিদের তাদেরই লোক হিসেবে চিনতে পারছেন, এটা কি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবার মতো বিষয়?

২/২/১৯৮৭

জাতীয় কবিতা উৎসবের সাফল্যে আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছি। আমাদের উদ্যোগে, সামান্য আয়োজন এরকম সাড়া পাব ভাবতে পারি নি। সকালের সেমিনার চলল দুপুর দু'টো পর্যন্ত। কবিতাপাঠের আসর বিকেল চারটায় শুরু হল আর শেষ হল রাত সাড়ে এগারোটায়। আমি কবিতা পড়লাম সবার শেষে। আমার পরে একটি ছেলে কবিতা পড়ল। ওকে আমার আগে পড়তে দেওয়া উচিত ছিল। বেচারির ঘাবড়ে যাওয়া চেহারা দেখে বড়ো মায়া হল আমার। আমিও তো কম ঘাবড়ে যাই নি। শ্রোতাদের ভিড়ে তখন ভাঙন ধরছে। শীতের রাত এগারোটা। শ্রোতাদের ধৈর্যের তারিফ করতে হয়। ভাঙন-ধরা শ্রোতাদের সামনে কবিতা পড়তে গেলে কার না বুক দুরু দুরু করে? অনেক সাহস সঞ্চয় করে একটি কবিতা পড়তে পারলাম। পাঠ নেহাত মন্দ হয় নি, অনেকেই প্রশংসা করলেন। আমি বহুদিন নাকি কবিতাকে গলায় এমন খেলাতে পারি নি।

৩/২/১৯৮৭

লুৎফার রহমান সরকার আমাকে তাঁর মোটরকারে বাসায় পৌঁছে দিলেন রাত বারোটায়।

বড়ো ক্লান্ত লাগল সারদিন। অনেকে অভিনন্দন জানালেন আমাদের দু'দিনব্যাপী কবিতা উৎসবের সাফল্যের জন্যে। তাদের ধারণা, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা একটা বড়ো রকমের কাজ করেছি, যার ফল সুদূরপ্রসারী। হবেও বা। জাতীয় পর্যায়ে

কবিতা উৎসব উদযাপনের জন্যে মনের গভীরে জোরালো তাগিদ বোধ করছিলাম বেশ কিছুদিন থেকে। প্রথমদিকে খোন্দকার আশরাফ হোসেন এবং রেজাউদ্দিন স্টালিন এক সন্ধেবেলা আমার বাসায় এসে জাতীয় পর্যায়ে একটি কবিতা উৎসব করার ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগী হতে বললেন। এর কয়েকদিন পরেই এলেন রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহন রায়হান একই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে। সেজন্যে আমাকে উদ্যোগ নিতে হবে সক্রিয়ভাবে।

যদিও এরকম একটি কিছু করার জন্যে তাগিদ বোধ করছিলাম মনে মনে, তবু এ-ও তো বিলক্ষণ জানি আমার মধ্যে কোনও সাংগঠনিক ক্ষমতা তেমন নেই। আমি বরাবরই ভেতর-গোঁজা মানুষ। আমার বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমানের অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল। এ ধরনের অনুষ্ঠানে ওর কথা খুব মনে পড়ে।

তরুণ কবিরা, বলা যায়, আমাকে দিয়ে প্রায় একজন নেতার কাজ করিয়ে নিলেন। আমার ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি। আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠেছে কোনও কোনও মহল। সরকার সমর্থিত কোনও কোনও সংবাদপত্র বাঁকা উক্তি করেছে, একজন একটি চিঠি শহরময় বিলি করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আমি তাদের পাকা ধানে মই দিতে চেষ্টা করেছি। অথচ পুরো ব্যাপারটি মিথ্যাচার। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়। যখন কোনও ব্যক্তি বন্ধুত্বের সাজ পরে অভিনয় করেন, তখন মনে মনে হাসি।

**৫/২/১৯৮৭**

কলকাতা থেকে 'নবার্ক' প্রকাশিত আমার কবিতার বই 'ঝর্ণা আমার আঙ্গুল' এল — মাত্র তিন কপি। পরে হয়তো আরও কিছু কপি পাওয়া যাবে। রশীদ করীম আর সালেহ চৌধুরীকে এক কপি করে দিলাম, বাকিটা রাখলাম নিজের জন্যে। এই বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব 'টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে'-এর চেয়ে ভালো হয়েছে। অনেকদিন বিরাম মুখোপাধ্যায় কোনও চিঠি লেখেন না। তিনি কি অসুস্থ?

বিকেল তিনটায় খোশনূর আলমগীর আয়োজিত একটি কবিতাপাঠের আসরে গেলাম। ভদ্রমহিলা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার অবিশ্যি কবিতাপাঠের দায় ছিল না। আমাকে পালন করতে হবে উদ্বোধকের ভূমিকা। রমনার বটমূলে অনুষ্ঠান, সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে দেখা হল, আরও দু'চারজন চেনা কবি ছিলেন সেখানে। সন্ধেবেলা রশীদ করীমের বাসায় গেলাম। কিছুক্ষণ পর এলেন সালেহ চৌধুরী এবং হুমায়ূন আহমেদ। জমাটি আড্ডা হল। রশীদ করীম আমার 'ঝর্ণা আমার আঙুল' থেকে কিছু কবিতা শোনাতে বললেন। দ্রব্যগুণে গলা দিব্যি খোলতাই, পড়তে ভালো লাগল।

**২/৬/১৯৮৭**

জীবনানন্দ দাশ-এর 'সতীর্থ' উপন্যাসটি পড়তে শুরু করেছি। আট দশ পাতা পড়া হয়েছে। বইটি ১৯৮৩ সালে কিনেছিলাম, এতদিন পড়া হয়ে ওঠে নি। কোনও একদিন পড়ব, এই আশায় অনেক বই কিনে রাখি। ঢাকায় পুস্তক প্রাপ্তি তেমন সহজ নয়; বিশেষ করে ভালো বিদেশি বই পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যে-বই পাশ্চাত্যে সাড়া জাগায়, বিশিষ্ট সমালোচকদের মন কাড়ে, সে-বই আসে বহুবছর পর, কোনও কোনওটি কখনও

আসেই না। স্পেংলারের 'ডিকলাইন অব দ্য ওয়েস্ট' কতকাল ধরে খুঁজছি, আজও সেই-বই কিনতে পেলাম না ঢাকায়।

ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশের উত্থান সাম্প্রতিক ঘটনা। তিনি যে কথাশিল্পী হিসেবেও অত্যন্ত বিশিষ্ট, এটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হচ্ছে। উপন্যাসেও তাঁর ভাষাশৈলী স্পষ্টতই জীবনানন্দীয়। কিছু কিছু বর্ণনাভঙ্গি কবি জীবনানন্দকেই প্রবলভাবে উপস্থিত করে আমাদের সামনে। বিস্ময়কর ক্ষমতা নিয়ে এই শিল্পী মানুষটি জন্মেছিলেন, সন্দেহ নেই।

## ॥ সাতষট্টি ॥

'দৈনিক বাংলা' স্বাধীনতার পর একটি ঝাঁকুনি খেয়ে সামলাতে না সামলাতে আরেকটি ঝাঁকুনির মুখোমুখি হল ১৯৭৭ সালে। নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, আমার বিবেচনায়, সম্পাদক হিসেবে ভালোভাবেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু পত্রিকার কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে গেল। কর্মচারীদের নানা চাহিদা মেটানোর সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্মীদের বিরোধ পৌঁছল চরম পর্যায়ে। আমি তাঁকে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দিই। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শে কর্ণপাত না করে নিজের জেদ বজায় রাখলেন। 'দৈনিক বাংলা'র সকল কর্মচারী সম্পাদক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে একটি পত্র দাখিল করলেন। সাংবাদিক বিভাগ, সাধারণ বিভাগ এবং প্রেস বিভাগের সবাই সেই পত্রে সই করলেন সোৎসাহে। আমার কাছে যখন পত্রটি আনা হল, আমি বিনীতভাবে সই করতে রাজি হলাম না। যেহেতু আমাকে সম্পাদক নিয়োগ করার প্রস্তাব ছিল সেই আবেদনপত্রে, তাতে আমার নিজের দস্তখৎ-এর উপস্থিতি অত্যন্ত অশোভন বলে সবাইকে বোঝাতে পারলাম। তাঁরা আমার যুক্তি মেনে নিলেন।

'দৈনিক বাংলা'র তিন বিভাগের ইচ্ছাপূরণে কিছু বিলম্ব করা হল তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। লুকাব না, সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে ভালো লাগল। প্রথমদিকে ঘোরের মধ্যে কাটল, কিন্তু বেশ কিছু সময় কাটার পর, কোনও কোনও সমস্যা, বিশেষ করে মাইনে বাড়াবার তাগিদে আমি ক্রমাগত উৎপীড়িত হতে লাগলাম। মনে হল, সহকারী সম্পাদক হিসেবে থাকাটাই ছিল ভালো। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বড়ো কর্তার বাঁকা বাক্যের তোড়ে পীড়িত হওয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারতাম। তবে কেউ কেউ বলতে পারেন, অফিসের মোটরকারে সওয়ার হয়ে নানা জায়গায় যাওয়া চলে, প্রায়শ বিভিন্ন জমকালো নৈশপার্টিতে সময় কাটানো তো তোফা ব্যাপার। কিন্তু কিছুকাল পর এগুলো কেমন ফাঁপা, ফাঁকা মনে হয়। আবার এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে, সহজে সেই আকর্ষণীয় চক্র থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল। নেশাগ্রস্ত মানুষ তাই আটকা পড়ে যায় মদির আসরে। আমিও রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম নৈশ আসরে। প্রায়শ বাসায় ফিরতাম মধ্যরাত পেরুনো প্রহরে, কখনও কখনও প্রত্যুষ ছুঁই-ছুঁই সময়ে। আমার স্ত্রী জোহরা স্বামীর এই নৈশবিহার প্রথম প্রথম অপছন্দ করলেও, যেহেতু আমি কোনওরকম খারাপ ব্যবহার করতাম না, বরং অধিকতর কাঙ্ক্ষনীয় আচরণের দৃশ্য সৃষ্টি করতাম, সে আমাকে সহনীয় তো বটেই, বরং আশ্চর্য প্রীতিময় মনে করত।

আমার জন্যে এতরাতে দরজা খোলা এবং অনেক রাত অব্দি জেগে থাকা, বুঝতে আমার মুশকিল হত না, জোহরার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু বেশি রাত করে ঘরে ফেরা আমার এক নাছোড় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতি সকালেই ভাবি, নৈশ আসরের মায়া আমাকে ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর, রাতের অন্ধকার শহরে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন দূর থেকে মায়াবিনী কোনও সুন্দরী ইশারায় আমাকে নিজের কাছে ডাকতে থাকে। অপ্রতিরোধ্য সেই আমন্ত্রণ। অফিস কিংবা বাসা থেকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ি নির্ধারিত ঠিকানার উদ্দেশে। কোনও কোনও সন্ধ্যায় নির্ধারিত আসরের অন্য কোনও সদস্য এসে যান আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এভাবেই ফাঁকা, ফাঁপা অথচ নাছোড় রাতগুলো আমাকে দখল করে নিয়েছিল।

অফিসের কোনও কোনও সমস্যা সমাধানের জন্যে সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ইনফরমেশন সেক্রেটারির কাছে ধর্ণা দিতে হত, কখনও কখনও শুনতে হত অপ্রিয়, উত্তপ্ত কথা। নিজের কোনও অপকর্মের দরুন নয়, আমি যে পত্রিকার সম্পাদক তার কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্যে, বেতন বাড়ানোর দোষে — নিজের কোনও ফায়দা লোটার মতলবের কারণে নয়। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের আবদার ও চাহিদা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেত যে, ইচ্ছে হত এক্ষুনি পদত্যাগপত্র দাখিল করে 'দৈনিক বাংলা' চিরতরে ত্যাগ করি। মধ্যবিত্ত, বিপন্ন মানুষের যা হয়, আমার বেলাতেও তা-ই হল। পদত্যাগপত্র লেখা হল না। অধিকাংশ ছা-পোষা মানুষ ফুঁসতে ফুঁসতে আখেরে ফণা মাটিতে লুটিয়ে দেয়। সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়ার ফ্যাকড়া অনেক। ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ তা বুঝবেন না।

তবে একটি কথা না বললে, আমার কয়েকজন সহকর্মীর কথা স্মরণ না করলে অন্যায় হবে যাঁরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আন্তরিকভাবে। তাঁদের ব্যবহার এবং সক্রিয় সহযোগিতা আমাকে 'দৈনিক বাংলা'য় বেশ কয়েক বছর থাকতে উৎসাহিত করেছে, তাঁরা আমার কোনও কোনও সমস্যা সমাধানের পথ মসৃণ করার জন্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের কথা এতকাল পরেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া যে কত বিড়ম্বনাময় তা আগে বুঝতে পারি নি। চলার পথে পাথরে ঠোকর খাওয়ার পরেই পথচারী টের পায় পথচলা কত বিপদসঙ্কুল। সহকর্মীদের নানা অযৌক্তিক চাহিদা মেটানোর সমস্যা তো আছেই, সরকারের কোনও কোনও উটকো বিষয়ও সম্পাদককে বিব্রত করে, বিপদগ্রস্ত করে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শুধু হাতে রাইফেল তুলে নেন নি, পদ্য লেখার কলমও তুলে নিতেন অবসর মুহূর্তে এবং তাঁর এই কাব্যচর্চা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলেছিল, যখন আমি 'দৈনিক বাংলা' এবং 'বিচিত্রা'র সম্পাদক ছিলাম। 'বিচিত্রা'র যোগ্য, চটপটে প্রধান সাংবাদিক শাহাদাৎ চৌধুরীর হঠাৎ কী খেয়াল হল 'বিচিত্রা'র একটি পাতায় কবিতা ছাপা হবে 'শামসুর রাহমান নির্বাচিত কবিতা'। তাড়াহুড়োর মধ্যে কোনও ভাবনা চিন্তা না করেই শাহাদাৎ চৌধুরীর প্রস্তাবে সায় দিয়ে ফেলি। ভেবে দেখা হল না, যেহেতু 'বিচিত্রা'র সম্পাদক হিসেবে আমার নাম ছাপা হয়, সব রচনাই তো আমার নির্বাচিত।

যাই হোক এই ভুলের খেসারত আমাকে দিতে হয়েছে বহুদিন। হয়তো এখনও কেউ কেউ আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন সে-জন্যে। একদিন বিকেলবেলা বসে আছি আমার নির্ধারিত কামরায়। আমার চোখের সামনে কামরুল হাসানের আঁকা একটি তৈলচিত্র। এমন সময় শাহাদাৎ চৌধুরী আমার হাতে একটি কাগজ দিলেন। কাগজে পদ্যাকারে ছন্দছুট একটি পদ্য। রচয়িতা প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ! খানিক চমকে উঠলাম। 'বিচিত্রা'য় ছাপতে হবে। আসলে রচনাটি কবিতা পদবাচ্য নয়। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যে ধরনের লেখাই পাঠান না কেন, তা ছাপতেই হয়। বিশেষ করে যখন তাঁর কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। 'বিচিত্রা'য় শামসুর রাহমান নির্বাচিত কবিতা'য় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর আমার বিরুদ্ধে নানা মহলে নানা কথা উচ্চারিত হল, ধিকৃত হলাম আমি। কিন্তু কেউ আমার পরিস্থিতির কথা একটুও ভেবে দেখলেন না। সেই কবিতা আমি তাঁর কাছে যাচ্ঞা করি নি। তিনি স্বেচ্ছায় সেটি 'বিচিত্রা'য় পাঠিয়েছেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধান পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে কবিতা পাঠালে সেটি যে স্তরেরই পদ্যই হোক, একজন সম্পাদক তা না ছাপিয়ে কি পারেন? দু'একদিন পরে তো ঢাকার বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম কিংবা শেষের পাতায় ছাপা হল জেনারেল এরশাদের কবিতা। এরপরে নিয়মিত ভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কবিতা ছাপা হতে লাগল। অথচ ঠাট্টা, মশকরা এবং নিন্দার শিকার হলাম আমি।

এটা স্বীকার করতেই হবে, কিছুদিন পর প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদ্য রীতিমতো ভালো কবিতা হয়ে উঠল। এ নিয়েও গুজবের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আমি নিজে তাঁর কোনও প্রমাণ পাই নি, তাই এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না। সে-সব কবিতা কার লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে তা সৃষ্টিকর্তাই জানেন। অন্তত আমি ধরে নেব সে সব কবিতা প্রেসিডেন্ট এরশাদেরই সৃষ্টি। এখানে উল্লেখ করতে চাই, অনেক পরে যখন আমি আর দৈনিক বাংলা/বিচিত্রার সম্পাদক নই এবং তিনিও নন বাংলাদেশের হর্তাকর্তা, তাঁর প্রকাশিত দৃষ্টিনন্দন একটি কাব্যগ্রন্থ আমাকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই সৌজন্য, স্বীকার করছি, মুগ্ধ হয়েছিলাম।

**২৬/১১/১৯৮৭**

আমার বন্ধু এবং সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মন খারাপ হয়ে গেল। এই প্রগতিশীল সংগ্রামী মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। আমাদের পরিচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছিপছিপে, সুদর্শন যুবক। স্বাভাবিক কারণেই আজকের প্রৌঢ়, প্রায় বুড়ো ইশতিয়াকের সঙ্গে মিল খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় ইশতিয়াক যে রাজনীতি করতেন তার প্রতি আমার কোনও সায় ছিল না। তিনি ইসলামিক ব্রাদারহুডের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আমি কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হই নি, সেই যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে আমি মনেপ্রাণে বামপন্থী ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ছিলাম, যদিও আমার বিশ্বাসে কখনও অন্ধত্ব কিংবা গোঁড়ামি প্রশ্রয় পায় নি।

আজকের ইশতিয়াক ভিন্ন ছাঁচে গড়া মানুষ। তাঁর মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, তিনি একাত্ম হয়েছেন দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে। দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র কায়েমের জন্যে তিনি যে-কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। অনেক দিনের অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ওঁর বাড়ির আড্ডাগুলোর কথা। অনেক রাতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সংগ্রামী কর্মী লাকী টেলিফোন করলেন। আগামীকাল শহিদ মিনারে আমাকে কবিতা পড়তে হবে। শরীর খুবই খারাপ। অনেকদিন থেকে ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছি। তবু কবিতা পাঠের জন্যে রাজি হয়ে গেলাম। এমন পরিস্থিতিতে কবিতা না পড়তে চাইলে অপরাধ হবে।

**২৭/১১/১৯৮৭**

শহিদ মিনারে হাজির হলাম বিকেল সাড়ে চারটায়। তখনও জনসমাগম তেমন হয় নি, লক্ষ করলাম। এদিক ওদিক বসে আছে মাত্র কয়েকজন, অথচ অনুষ্ঠান সাড়ে চারটায় শুরু হওয়ার কথা। মনখারাপ হয়ে গেল। দেশের এই পরিস্থিতিতে এত কম লোক হবে কেন? এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে? এ তো শুধু যেমন তেমন অনুষ্ঠান নয়। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অনেকখানি।

বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হল। তখনও লোকজনের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য নয়। আমি সদ্য লেখা একটি পদ্য 'একজন শহীদের মা বলছেন' পড়লাম। এই কবিতাটি লেখার সময় আমার মনের পেছনে ছিল নূর হোসেনের কথা, যে গত ১০ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ওর বুকে লেখা ছিল 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' আর পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। উদোম গায়ে সে ছিল মিছিলের পুরোভাগে। নূর হোসেনকে আমি ১৯৬৯-এর আসাদের চেয়েও বড়ো বীর বলে মনে করি। অবশ্য শহিদদের মধ্যে এই তুলনা টেনে আনা ঠিক নয়। তবে এ-কথা আমাদের মনের রাখতে হবে, জেনে শুনে এভাবে প্রাণ দিতে পারে ক'জন? বেশ কিছুক্ষণ পরে কবি মহাদেব সাহা এবং আবৃত্তি শিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম এলেন। মহাদেব সাহা একটি কবিতা পড়লেন আর হাসান ইমাম আবৃত্তি করলেন নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতা। ওঁদের দু'জনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। আস্তে-সুস্থে লোকজন আসতে শুরু করে। মহাদেব সাহা এবং আমি একটি জরুরি কাজে হুমায়ূন আজাদের বাসায় গেলাম। কবিদের একটি বিবৃতি তৈরি করতে হবে। বিবৃতি প্রেসে নিয়ে গেলেন তারিক সুজাত ও অরুণ চৌধুরী।

## ॥ আটষট্টি ॥

দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ার ফলে সরকার আমার প্রতি ক্রমাগত বিরূপ হয়ে পড়লেন। 'দৈনিক বাংলা'র শেষের পাতায় প্রতিদিন সম্পাদকের নাম প্রকাশিত হওয়ার কলাম থেকে নির্বাসিত হল আমার নাম। অর্থাৎ আমাকে দৈনিক বাংলায় ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হল। সবধরনের কাজ থেকে সরানোর হুকুম এল সরকার থেকে। গাড়ি ব্যবহার হয়ে গেল অত্যন্ত সীমিত, প্রায় না থাকারই মতো। আমি কোনও প্রতিবাদ না করে এইসব কিছু সহ্য করে গেলাম এবং আমার বাইরের আসা-যাওয়া সামান্য খর্বিত হল বটে, তবে অন্য যান অর্থাৎ রিকশায় তো অনেক জায়গাতেই যাওয়া

যায়, গিয়েছিও। অফিসে বিন্দুমাত্র হই-হাঙ্গামা করি নি। এসেছি এবং চলে গিয়েছি। বাইরে আমার অন্যধরনের কাজ আরও বেড়ে গেল। মিছিল, মিটিং-এ অংশ নিতে পারছিলাম বেশি করে। একটু একটু করে এক ধরনের বক্তাও হয়ে উঠলাম।

২৮/১১/১৯৮৭

জেনারেল এরশাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। ঢাকাসহ কয়েকটি শহরে কারফিউ জারি করা হল। ব্যাপক ধরপাকড়ের জন্যেই কারফিউ। তড়িঘড়ি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্রের ভেকধারী প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর এই অপচেষ্টায় জনতার সংগ্রাম কি বন্ধ হয়ে যাবে? যাবে না। এ দেশের মানুষ, কতিপয় স্বার্থান্বেষী, ধামাধরা লুটেরা ছাড়া, এরশাদকে বাংলাদেশের ওপর ব্যাটন ঘোরাতে দিতে চায় না আর। ব্যাটনই তো। তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে, একদিন তাঁর হাতে ব্যাটন ছিল।

আজ রাতেই বাসা ছেড়ে অন্যত্র গা-ঢাকা দিলাম। আমি কোনও রাজনৈতিক কর্মী নই, তবু নানা কারণে পাকিস্তানি কায়দায় পরিচালিত এরশাদী হুকুমতের আমার ওপর নেকনজর রয়েছে।

'দেশবন্ধু' পত্রিকায় এখন থেকে আর আগের মতো লেখা যাবে না; জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর পত্রিকার চেহারা একেবারে পালটে যাবে। শুধু সরকারি খবর ছাড়া অন্য কোনও সংবাদ থাকবে না সংবাদপত্রে। জনসাধারণের সকল মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।

২৯/১১/১৯৮৭

কিছুই ভালো লাগছে না। তবে আশার কথা জরুরি অবস্থা ঘোষণা অমান্য করে কারফিউ লঙ্ঘন করে কোনও কোনও এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে। গুলিতে কেউ কেউ নিহত হচ্ছেন। এদেশে শহিদের সংখ্যাবৃদ্ধি কি রোধ হবে না কোনওদিন?

স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে আছি। যদি রাস্তায় বেরুতে পারতাম। গতকাল পেশাজীবীদের মিছিলে প্রায় বিশ হাজার লোক হয়েছিল, জানতে পারলাম। বিভিন্ন পেশার মানুষের বিক্ষোভ মিছিলে বহু সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছেন। দর্শক হয়ে না দাঁড়িয়ে ফুটপাত থেকে নেমে এসে মিশে গিয়েছিল মিছিলে। জেনে খুব ভালো লাগল। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সেই মিছিলে যোগ দিতে পারি নি। এজন্যে দুঃখ আছে। আমার মনে হয়, এই মিছিলের রিপোর্ট পেয়েই স্বৈরাচারী এরশাদ সাততাড়াতাড়ি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। ভয় পেয়ে গেছেন। কিন্তু জনতার প্লাবন কি বালির বাঁধ দিয়ে রোধ করা যাবে?

৩০/১১/১৯৮৭

'দৈনিক বাংলা' থেকে পদত্যাগ করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যে। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে আমি ক্ষীণতম সূত্রে যুক্ত থাকব, এটা আর মেনে নিতে পারছি না। জনগণের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে, ধরপাকড় চলছে পুরোদমে। জরুরি অবস্থার পরোয়ানার বদৌলতে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে সংবাদপত্রের। মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবে না। এরশাদী গণতন্ত্রের নমুনা দেখে অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঘৃণা ও ক্রোধে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

'দৈনিক বাংলা'/'বিচিত্রা' থেকে পদত্যাগ আমাকে করতেই হবে। জানি, আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হব, সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। তবু ইস্তফা আমাকে দিতেই হবে। তারপর কী করব? জানা নেই। মাথায় কিছু আসছে না। শত অসুবিধা হোক, বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হওয়ার এই মুহূর্তে একমাত্র পথ হচ্ছে এরশাদ সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করা।

**১/১২/১৯৮৭**

আমার পদত্যাগ করার তীব্র ইচ্ছাটির কথা দু'তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানাই নি। ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, ড. হুমায়ুন আজাদ এবং অধ্যাপক শফি আহমদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে মফিদুল হককেও আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। ড. হুমায়ুন আজাদ আমার শুভানুধ্যায়ী, তিনি আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে সায় দিলেও অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা ভেবে দেখতে বললেন। ড. মুরশিদ আমার শিক্ষক এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তিনি আমাকে যথেষ্ট মনোবল জোগালেন। মফিদুল হক এবং শফি আহমদ আমার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানালেন আন্তরিকতার সঙ্গে।

আশ্চর্যের বিষয়, ৮ (আট) দল এখনও সংসদ থেকে পদত্যাগ করছে না। আমার বিবেচনায় নভেম্বরের ১০ তারিখেই করা উচিত ছিল। এদের রাজনীতি আমি বুঝি না।

**৫/১২/১৯৮৭**

সন্ধেবেলা পদত্যাগপত্র লিখে ফেললাম। আগামীকাল দাখিল করা হবে। অধ্যাপক শফি আহমদ আমার পদত্যাগপত্র যাতে ঢাকার প্রতিটি সংবাদপত্রে পৌঁছায় এবং এই সংবাদ যাতে বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়, তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

আমি যখন প্যাডে পদত্যাগপত্রটি কপি করছি শফি আহমদের উপস্থিতিতে, তখন ড. আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক অজয় রায় এলেন। আনিসুজ্জামানের আসার কথা ছিল। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে আমার সই নেয়ার জন্যে তাঁরা এসেছিলেন। বিবৃতিটি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে পাঠানো হবে। আমি যে 'দৈনিক বাংলা'/'বিচিত্রা' থেকে পদত্যাগ করতে যাচ্ছি তা ওরা টের পান নি। রাত আটটার দিকে শফি আহমদ চলে গেলেন আমার পদত্যাগপত্রটি নিয়ে। তির ছোঁড়া হয়ে গেল। বিকেলে সাপ্তাহিক 'দেশবন্ধু'র সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু এবং তারেক সুজাত এসেছিল। 'দৈনিক বাংলা' থেকে আমার পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। ওরা খুব খুশি হল।

এরপর অনেকদিন রোজনামচা লেখা হয় নি। লিখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এক ধরনের ক্লান্তি অনেকদিন দখল করে ফেলেছিল। একটি কি দু'টি কবিতা লিখে উঠতে পারছিলাম। নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যাস আমার গড়ে ওঠে নি কোনওকালেও। অথচ ডায়েরি না লেখার অসুবিধা এখন পদে পদে বুঝতে পারছি। আমার জীবনের অনেক ঘটনাই সম্ভবত অলিখিত থেকে যাবে। তবে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনও কোনও পুরনো খাতার বিবর্ণ পাতার অস্পষ্ট অক্ষরের কিছু কিছু বাক্য আবিষ্কৃত হয়ে যায়। সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, এমন অসম্ভব দাবি করব না। তবু পুরনো লেখার প্রতি মায়া ত্যাগ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৯/১/১৯৯৭

বিকেলের শান্ত, মধুর রোদ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বাইরে একটু বসা কিংবা ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। গাইবান্ধায় সার্কিট হাউস-এর বাগানে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই সাহিত্য সম্মেলনে যেতে হবে। এই অবসরে আমরা ক'জন আলাপ জুড়ে দিলাম। একসময় বিপ্রদাশ বড়ুয়া বলল, 'এই দেখুন রাহমান ভাই, আপনার দোয়েল'। সত্যি সত্যি একটি দোয়েল পাখি বসে আছে সার্কিট হাউস-এর ছাদের উঁচু একটি পাইপের ডগায়। দোয়েলের মধুর শিসও শোনা গেল। বিপ্রদাশকে ধন্যবাদ, সে আমাকে দোয়েল চিনিয়ে দিল কয়েক মুহূর্তে। সে দোয়েলের প্রতি আমার দুর্বলতার কথা জানত। এর আগে হয়তো দোয়েল চোখে পড়েছে, কিন্তু চেনা হয়ে ওঠে নি। দোয়েলটির সাদা বুক, কালো রঙের পিঠ, লেজ তুলে বসে থাকার ভঙ্গি আমার চোখে মুদ্রিত হয়ে রইল।

১০/১/১৯৯৭

আজ সন্ধ্যায় গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় ফিরে এলাম। সারাদিন পথে কেটেছে; ক্লান্তিতে কেমন যেন ছন্নছাড়া লাগছিল নিজেকে। ফেরিতে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। অবসন্ন শরীরে ঢাকা পৌঁছেই ছুটতে হল পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালনের জন্যে। আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য বিকল্পধারার চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি দিনের প্রদীপ নিভিয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে কিছু বলতে হল, তানভীর মোকাম্মেলের 'নদীর নাম মধুমতী'র প্রথমদিকের কয়েকটি দৃশ্য দেখে বিদায় নিলাম। বিকল্পধারার এই ফিল্মটি বহুদিন প্রদর্শনীর ছাড়পত্র পায় নি বিএনপির শাসনামলে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হওয়াতেই কসুর। এখন ছাড়পত্র পাওয়া গেছে আওয়ামী লিগ ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে। ফিল্মটির কয়েকটি শট দেখে মনে হল, 'নদীর নাম মধুমতী' একটি উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কলকাতা থেকে যোগ দিতে এসেছেন শ্রীমতী জয়ন্তী সেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'শিল্পী সত্যজিৎ রায়' বইটি আমাকে উপহার দিলেন। ফটোগ্রাফার আনোয়ার হোসেন, চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল, ফরাসি দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা বসে কথাবার্তা বলছিলেন এককোণে। আমিও ছিলাম সেখানে। তখনও অনুষ্ঠান শুরু হয় নি। আনোয়ার হোসেন তাঁর ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী শুরু করতে চলেছেন ১৯ জানুয়ারি, আমাকে উদ্বোধক হতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত রাতে গৌরীর সঙ্গে কথা হল। ওর কথামালা আকর্ষণীয় বুদ্ধিদীপ্ত। আমি মুগ্ধতায়, বলা যেতে পারে, নিমজ্জিত হই। রাতে আমি বেশ কিছুটা জ্বরতপ্ত।

১১/১/১৯৯৭

অসুস্থ আছি। গাইবান্ধাতেই শরীর খারাপ ছিল। ভীষণ সর্দি আর সামান্য জ্বর। অশক্ত শরীরে রোগ সহজেই হামলা চালায়। টিয়া দুপুরে আমার বক্ষ্যব্যাধি বিশেষজ্ঞ শামসুর হকের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসক ১৯৮৭ সাল থেকে আমার রুগ্‌ণ ফুসফুসের চিকিৎসা করছেন। ডাক্তার শামসুল হকের সঙ্গে আমার এক ধরনের হৃদ্যতা জন্মে গেছে। তিনি আমার বুকের এক্স-রে প্লেট দেখে বললেন, মোটামুটি ভালো আছে,

অবনতি তেমন হয় নি। কয়েকটি ওষুধ খেতে বললেন, ডাক্তার শামসুল হকের সঙ্গে দেখা হলেই মনে পড়ে যায়, ১৯৮৭ সালে আমি একজন যক্ষ্মারোগী ছিলাম। তখন আমি এক মাসেরও বেশি সময় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসাধীন ছিলাম। প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলাম সেবার।

রাত সাড়ে ৯টায় আমেরিকা থেকে টেলিফোন এল। যোজন যোজন দূর থেকে ভেসে এল ফাওজিয়ার কণ্ঠস্বর। ফাওজিয়া আমার মেজো মেয়ে। কী-যে ভালো লাগল ওর কথা শুনে। ওর ছেলেরা পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে। ফাওজিয়ার মেজো ছেলে উপলের রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে সেরা ছাত্রের সার্টিফিকেট পেয়েছে সে। মেয়র তার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন সোনার মেডেল।

খুব ভালো লাগল এই খবর পেয়ে। ওদের মঙ্গল হোক।

ইতিমধ্যে আমার নাক বন্ধ হয়ে এসেছে। নাকে অ্যান্টাজল দিয়ে, পাঁচ মিলিগ্রাম রিলাকশন খেয়ে ঘুমোতে গেলাম।

**১৯/১/১৯৯৭**

বিকেলে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন হানিফা ডিনকে আমার বাসায় নিয়ে এলেন। হানিফা একজন লেখিকা। উপন্যাস কিংবা কবিতা লেখেন না। তবে কবিতা ভালোবাসেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় নন-ফিকশন লিখে অস্ট্রেলিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন। যদিও তিনি জন্মেছেন পাকিস্তানে, স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে। তিনি 'ব্রোকেন ব্যাঙ্গেলস' নামে নারী-বিষয়ক একটি বই লিখেছেন। পাক-ভারত ও বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বই। সম্প্রতি তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে একটি নির্মোহ বই লেখার কাজ হাতে নিয়েছেন। জানালেন হানিফা ডিন। এই সূত্রেই তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এসেছেন। হানিফা আমার একটি সাক্ষাৎকার নিলেন।

সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার আনোয়ার হোসেনের আলোকচিত্রমালার একক প্রদর্শনী উদ্বোধন করলাম আলিয়ঁাস ফ্রাসেজে। আনোয়ার হোসেন প্রতিভাবান আলোকচিত্রী (ফটোগ্রাফার)। অনেক সুন্দর, ব্যতিক্রমধর্মী ফটোগ্রাফ তুলে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রশংসনীয় তাঁর কাজ। একটি ফটোগ্রাফ দেখে মর্মাহত হলাম। ছবিটিতে জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' সুস্পষ্ট অস্তিত্বে বিরাজ করছে। পত্রিকাটির বিপুল আগ্রহে পাঠ করছেন ফটোগ্রাফ শিল্পী আনোয়ার হোসেনের বৃদ্ধ পিতা। পত্রিকাটি ফটোগ্রাফার তার পিতার হাতে নিজেই নাকি ধরিয়ে দেন। আমি তাকে ছবিটি প্রদর্শনী থেকে সরিয়ে ফেলতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। তার পক্ষে চিত্রকর মোস্তফা মনোয়ার কিছু কথা বললেন। আমি সেসব কথা ধৈর্য সহকারে শুনলাম। কী জানি, আমার বিবেচনাতেই হয়তো গলদ রয়ে গেছে।

হানিফা ডিনের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল অন্য একজন বিদেশিনীর কথা। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন দুপুরে হঠাৎ 'দৈনিক বাংলা' সম্পাদক অর্থাৎ আমার কামরায় এসে হাজির বেলাল চৌধুরী এবং রবিউল হুসাইন। তাদের সঙ্গে এসেছেন ইরানি কবি তাহেরা সফরজাদে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়ান। ইতিমধ্যে তার সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইরানের কাব্যক্ষেত্রে রীতিমতো অত্যুজ্জ্বল এক নক্ষত্র। তাহেরা সফরজাদের চেহারা এবং শরীরে বয়সের ছাপ। কিন্তু বেশ কিছুকাল আগে শঙ্খ ঘোষ-এর একটি স্মৃতি সংবলিত আকর্ষণীয় গ্রন্থে আমি তরুণী হাতেরা সফরজাদের একটি চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্র দেখি। বলাবাহুল্য, সেই আলোকচিত্রের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়েছিলাম। দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারি নি।

হায়, সময় মানুষকে কেমন বদলে দেয় নানাভাবে। তাহেরা সফরজাদের দৈহিক পরিবর্তন সত্ত্বেও তার দৃষ্টি, কথা বলার স্টাইলে মাধুর্য পরিস্ফুট ছিল। জানালেন, আরও দু'টি কাব্যগ্রন্থ যন্ত্রস্থ। তিনি অনুবাদ বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। সেটি ইরানের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

ইরানি কবি তাহেরা সফরজাদের যে চোখজুড়ানো রূপ দেখেছিলাম শঙ্খ ঘোষের কেতাবে, সেটি আমার দৃষ্টিতে ভেসে উঠছিল বার বার।

অফিসে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে আমরা ইরানি কবিকে বাঙালি খাবার উপভোগ করার জন্যে নিয়ে গেলাম 'কস্তুরী' রেস্তোরাঁয়। এশীয় কবিতা উৎসবে কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে সেটা তাহেরা সফরজাদে বুঝতে পেরেছেন। তা ছাড়া তার বরাত দিয়ে 'দৈনিক বাংলা'য় যা লেখা হয়েছে তাতে তিনি মর্মাহত। তিনি জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে প্রশংসা কিংবা নিন্দাসূচক কোনও মন্তব্যই করেন নি, অথচ তার মুখ দিয়ে মনগড়া তারিফ করিয়ে নেয়া হয়েছে।

তাঁর সঙ্গে চমৎকার একটা দিন কাটল। অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। আমরা কেন এশীয় কবিতা উৎসবে শরিক হই নি, জানতে চাইলেন তাহেরা সফরজাদে। লালবাগ কেল্লায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই তাঁকে বললাম, কেন আমরা এশীয় কবিতা উৎসবে যোগ দিই নি। পরে ইরানি কবিকে সংসদ ভবনের দৃশ্য দেখিয়ে রবিউল হুসাইনের মোটরকারে তাঁর বাড়িতে চা-পর্ব সেরে বিদায় নিলাম আমরা। আজও কোনও কোনও মুহূর্তে চোখের আলোয় ভেসে ওঠে সেই ইরানি কবির মুখ, ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠস্বর, ঠোঁটের মনোমুগ্ধকর হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। জানি না, আজও তিনি বেঁচে আছেন কি-না। বেঁচে থাকলে কোনও আলস্য-পোহানো সময়ে মনে কি পড়ে এশীয় কবিতা উৎসবে অংশ নেয়া ক'জন বাঙালি কবিকে, যাদের সঙ্গে একটি দিন কাটিয়েছিলেন তিনি?

**২০/১/১৯৯৭**

আওয়ামী লিগ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সন্ত্রাস তো বেলাগাম হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। পিতার সামনে একজন তরুণীকে ধর্ষণ করে কয়েকজন তরুণ চট্টগ্রাম শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ ওদের ধরা হচ্ছে না, ওরা কোনও শাস্তি ভোগ করছে না। বিপন্ন পিতা লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। লজ্জায়, গ্লানিতে, প্রাণভয়ে? প্রশাসন কি নীরব দর্শক হয়ে অপরাধীদের আস্কারা দিয়ে যাবে এভাবে?

ভালো লাগছে না। মনখারাপ করা সংবাদ প্রায় প্রত্যহ পড়তে হচ্ছে খবরের কাগজে। আওয়ামী লিগ যদি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, তাহলে সরকারকে কড়া হাতে সন্ত্রাস দমন করে চোর-ডাকাতদের এবং ওদের গডফাদারদের শায়েস্তা করে জনসাধারণকে শঙ্কামুক্ত করতে হবে। সাধারম মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য দৃঢ়পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি দলের লোকজন ধরা পড়লেও তাদের রেহাই দেয়া চলবে না।

২৬/১/১৯৯৭

আজ প্রায় দশদিন পর গৌরীর সঙ্গে দেখা হল। সে একটু শুকিয়েছে, লক্ষ করলাম। ওকে দেখে রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করলাম এমনই নীচু স্বরে যে, সে শুনতে পেল কি পেল না বুঝতে পারলাম না। হালকা হাসির ঝরনাধারা বইতে দেখলাম ওর ঠোঁটে। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছে, বোঝা গেল। আমার নিজের কথা তো রবীন্দ্রনাথের বিপুল ভাণ্ডার থেকে ঋণ করে উচ্চারণ করেছি। গৌরী ভালো থাকুক, মুক্ত থাকুক সকল বিপদ থেকে।

৩/৩/১৯৯৭

আইনস্টাইন বলেছেন, 'তেমন সৃষ্টিকর্তার কথা আমি ভাবতেই পারি না যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে পুরস্কার এবং শাস্তি দেন কিংবা আমরা ইচ্ছাশক্তির বশবর্তী, তিনিও সে-রকমই। এমন কোনও ব্যক্তির কথাও ভাবতে পারি না বা ভাবতে চাই না যিনি তাঁর মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন। যাদের চিত্ত দুর্বল তারা কোনও অস্বাভাবিক দাম্ভিক শক্তির ভয়ে এরকম চিন্তা করতে চাইলে করতে পারেন। আমি জীবনের চিরায়ত রহস্যে এবং জগতের চমৎকার গঠনের কিছুটা পরিচয় পেয়েই তৃপ্ত। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যুক্তি প্রকাশের অতি সামান্য একটু অংশ জানার জন্যে যে আকুতি এবং সাধনা, তা নিয়েই থাকতে চাই।'

আইনস্টাইন বলাবাহুল্য, কোনও সামান্য ব্যক্তি নন। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, তার তাৎপর্য প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন এবং এ-কথাও সত্য তাঁর মতো ব্যক্তি কোনও শতাব্দীতেই ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করেন না। এধরনের জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি তাঁদের অবদানের আলোয় সভ্যতার পথ আলোকিত করে মানুষের জীবনযাত্রা বদলে দেন নতুন আবিষ্কার এবং ধ্যানধারণার পথ সুগম ও বিস্তৃত করে। আমরা কি এতকাল পরেও সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হই না?

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৮৭ সালেরই একদিনের কথা। মাস কিংবা দিনের কথা ঠিক উল্লেখ করতে পারব না। কারণ আমার ডায়েরি অত্যন্ত দরিদ্র। ডায়েরির অসংখ্য পাতাই শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। বছরের পর বছর, মাসের পর মাস রোজনামচা লেখা হয় নি আলসেমির দরুন। রোজনামচা লিখে কী লাভ — এই ধারণাও আমাকে বড়ো বেশি নিরুৎসাহিত করছে। আমি কি জানতাম যে, আমাকে একদিন আত্মজীবনী লিখতে হবে শুভানুধ্যায়ীদের নাছোড় তাগিদে?

অনেক কিছুই লেখা হবে না, আমার অনিচ্ছায় নয়, বিস্মৃতির অন্ধকারের দাপটে। অনেক কষ্ট এবং চেষ্টা করে বিশৃঙ্খলভাবে লিখে চলেছি এই সামান্য আত্মকথা।

গৌরীর সঙ্গে কথা হল অনেকক্ষণ। সাধারণত রাজনীতি নিয়ে আমরা ঘন ঘন কথা বলি না। বিষয়টি এড়িয়ে চলি। একদিন রাজনীতি নিয়ে কথা হল অনেকক্ষণ। আমি আওয়ামী লিগের একজন সামান্য সমর্থক আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে এই রাজনৈতিক দলটির অসামান্য অবদানের জন্যে, এই দলের এবং বাঙালি জাতির গৌরব, ত্রাণকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কালজয়ী ভূমিকার জন্যে। আওয়ামী লিগের দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিষয়ে সচেতন আমি। কিন্তু গৌরী ভাবে, আমি এই দলের কোনও দোষ দেখতে চাই না। আওয়ামী লিগ কোনও ভুল করলে তার সমালোচনা করতে আমি দ্বিধাহীন, কারণ কারও তোষামোদ করা, অন্ধ স্তাবকতায় মজে যাওয়া আমার ধাতে নেই।

গৌরী যখন আওয়ামী লিগের সমালোচনা করে, তা সংগত মনে হলে চুপ করে থাকি। আমি যে সরকারের কোনও কোনও কাজ পছন্দ করি না, এটা সে মানতে চায় না। অন্যেরা আমার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বলে সে পীড়িত হয়। যে যা-ই বলুক, আমি কী তা আমার অজানা নয়। ভালো করেই জানা আছে আমার দোষগুণের কথা। রাজনীতির কারণে গৌরী আমাকে যত অপছন্দই করুক, এর ফলে আমাদের সম্পর্কে কোনওদিন চিড় ধরবে না। আমার প্রতি তার প্রীতি ও শুভেচ্ছার কমতি নেই।

**৪/৩/১৯৯৭**

সুপ্রিয়া গৌরীর সঙ্গে দেখা হল দুপুরে। সুন্দর সময় কাটল কথাবার্তায়, কখনও নীরবতায়। গৌরী চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে। ওর বলায় আড়ষ্টতা অনুপস্থিত। ইচ্ছে হয় চুপচাপ উপভোগ করি ওর কথামালার দোলা। এই যে বললাম কয়েকটি কথা, আসলে কিছুই বলা হল না।

বিদায় নেয়ার আগে এক ফাঁকে বললাম,-'তোমার সাহস গৌরী একটি মুমূর্ষ নদী আজ।' কবিতার মতো এই পঙ্‌ক্তিটি আমার মুখ থেকে, বস্তুত বুক থেকে, বেরিয়ে এল; বলার আগের মুহূর্তেও ভাবি নি এই পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারিত হবে। কেন এই কাব্যের জন্ম হল, কী করেই বা অজানা থেকে এর আবির্ভাব, কে বলে দেবে আমাকে? কেন এই বাক্য উচ্চারিত হল, তা বুঝতে গৌরীর অসুবিধা হয় নি। এ ধরনের কথা ওকে শোনানো উচিত হয় নি। অন্যায় আমার এই আচরণ। কারণ, ইতিপূর্বে তার সাহস যে উত্তাল নদী ছিল, তার সাক্ষী আমি নিজে। আমার চেয়ে কে বেশি জানে সে-কথা?

কাল থেকে ক'দিন আমার জন্যে ঢাকা হয়ে যাবে ধু ধু মরুভূমি। গৌরীর অনুপস্থিতি আমার নিঃসঙ্গতাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। ওর এই অনুপস্থিত, যা সে পরিহার করতে অসমর্থ, আমাকে ব্যথিত, বিষণ্ণ, প্রায়-ক্রুদ্ধ করে তোলে। এ কি আমার স্বার্থপরতা। ক্ষুদ্রতা?

## ॥ সত্তর ॥

আমি সেই হতভাগ্যদের অন্যতম যাকে স্মৃতি মাঝে মাঝে প্রতারণা করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ বেশ কমতে শুরু করছে। স্মৃতিকথা লেখার ব্যাপারে বিস্মৃতির

পরিমাণ বেশি এবং স্মৃতি উলটোপালটা হয়ে গেলে লেখককে খুবই মুশকিলে পড়তে হয়। আমি ইদানিং বেশ বেশিরকম, নাকানিচুবানি খাচ্ছি বিস্মৃতির নিষ্ঠুরতায়। এর ফল যে সুখপ্রদ নয়, তা আমি পদে পদে ঠোকর খেয়ে বুঝতে পারছি। আজ যা লিখতে যাচ্ছি, তা বেশ আগেই লেখা উচিত ছিল। কিন্তু লিখব কীভাবে? ভুলেই যে বসেছিলাম সেসব কথা। সাহিত্যিক এবং একদা আমার সহকর্মী মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, তাকে ধন্যবাদ, যদি আমাকে বেশ কিছু কথা স্মরণ করিয়ে না দিতেন একটি চিঠির মাধ্যমে, এই অধ্যায়টি নিশ্চিত লেখা হত না।

তখন আমি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক নিযুক্ত হই নি। আমার সম্পাদক পদটি লাভের বেশকিছু আগে পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন মরহুম নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর সম্পাদক থাকাকালীনই মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ এবং আমি প্রথমবার বন্ধুবর হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটোভাই খালেদ খালেদুর রহমানের নাছোড় তাগিদে সম্ভবত ১৯৭৪ কিংবা ১৯৭৫ সালে জামালপুর তথা দেওয়ানগঞ্জে এবং হাসানদের গ্রামের বাড়িতে ইসলামপুরে গিয়ে হাজির হই। দিনটি সাধারণ ছিল না। তুমুল বৃষ্টি পড়ছিল। চারদিক আচ্ছন্ন করে। তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই আমাদের সহযাত্রী জনাব রাশেদ মোশারফ (প্রাক্তন মন্ত্রী), মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ এবং আমি জিপারোহী হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হাসানদের বাড়িতে পৌঁছে যাই।

যখন আমরা হাসান হাফিজুর রহমানদের গ্রামের বাড়িতে যাই তখন হাসান মস্কোতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তখন মস্কোতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন জনাব শামসুর রহমান। এই শামসুর রহমান একজন তুখোড় বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃত কবিতা তাঁর স্মৃতিতে ভাস্বর রয়েছে আজ অব্দি। তাঁর উপস্থিতিতে আড্ডা জ্বলজ্বলে হয়ে উঠত। কথার সঙ্গে খাপ-খাওয়া কবিতার পর কবিতা ঝরত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমরা শুনেছি তাঁর আবৃত্তি। আবৃত্তিকালে কখনও তাঁকে হোঁচট খেতে দেখি নি — আশ্চর্য সাবলীল, স্পষ্ট, সুরেলা আবৃত্তি। তিনি যে আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন, সেটি এমনই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত যে সেখান থেকে উঠে আসা ছিল প্রায়-অসম্ভব।

যা-হোক, বৃষ্টিভেজা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে হাসানদের বাড়িতে পৌঁছে যাই, যেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল প্রায় শাহী খাদ্যদ্রব্য। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন হাসানের অনুজ খালেদ খালেদুর রহমান। আমরা খালেদকে বললাম, 'এতসব হই-হাঙ্গামা না করলেই পারতে। পোলাও-কোর্মার চেয়ে এখানকার তরতাজা মাছ, শাকসবজিই তো বেশি উপাদেয়।' আমার কথায় কোনও কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু খালেদ হয়তো বিশ্বাস করেন নি। হয়তো ভেবেছেন, আমরা ভদ্রতা করে সে-কথা বলেছি।

সেখানে কয়েকঘন্টা কাটিয়ে, হাসানদের বাড়ির গ্রামীণ ঘ্রাণ স্মৃতিলগ্ন করে রাখে আমাকে। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র মনে কী কথা ডানা মেলেছিল, তা শুধু তার পক্ষেই বলা সম্ভব। আমার মানসপটে বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমানের কথা প্রায় প্রতি পদে মনে পড়ছিল আর ভাবছিলাম ঢাকার আমার আপন আস্তানার কথা, আমার মা, জীবনসঙ্গিনী

জোহরা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, কোনও কোনও বন্ধু, সহকর্মী এবং আরও কারও কথা, যারা রহস্যাবৃতাই থাক।

আমরা ক'দিন ছিলাম জামালপুরে? যতদূর মনে পড়ে, তিন কিংবা চারদিন ছিলাম সেখানে। রেস্ট হাউজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেওয়ানগঞ্জে সুগারমিল পরিদর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলাম, মনে পড়ে। সুগার মিলটির ঘনিষ্ঠ প্রাকৃতিক শোভা মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এবং আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। সেই প্রাকৃতিক শোভা বিষয়ে আমরা বেশ কয়েকবারই আলোচনা করেছিলাম আমাদের ভ্রমণকালে। সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা কি কখনও ছায়া ফেলেছিল আমাদের কোনও কবিতায়? হয়তো আমাদের অজান্তেই পড়েছিল সেই ছায়া। দেওয়ানগঞ্জ রেস্ট হাউজের স্মৃতি আজও প্রাকৃতিক শোভা নিয়ে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

জামালপুরে, বলতে মজা লাগছে, একটি বিয়ের আসরেও যোগ দিতে হয়েছিল। বড়ো আনন্দঘন আসর ছিল সেটি। চারদিকে অতিথিদের প্রফুল্ল মুখ। অনেকেই আলাপ করছেন এমনভাবে যেন কোনও আনন্দমেলায় এসেছেন। সুখাদ্যের আয়োজনও ছিল প্রসংসনীয়। মোটকথা, বিয়ের আসরটি এমন মনোহর ছিল যে, এ সম্পর্কে নীরব থাকলে রীতিমতো অন্যায় হত। যাঁরা মানুষকে আনন্দিত করতে পারেন অকুণ্ঠ প্রশংসা তাদের অবশ্য প্রাপ্য। এ ব্যাপারে কোনও কার্পণ্যই সমীচীন নয়।

এই যে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এবং আমি আনন্দ লাভ করছি আমাদের ভ্রমণের নানা পর্যায়ে, সেজন্যে আমরা খালেদ খালেদুর রহমানের কাছে ঋণী। তিনি যদি এখানে আমাদের জানার জন্যে পীড়াপীড়ি না করতেন, আমাদের পেছনে লেগে না থাকতেন, তাহলে সম্ভবত আমাদের ভ্রমণ হত না। আমি যে-রকম আলসেমিকে প্রশ্রয় দিই নানা কাজে, তাতে জামালপুর আমার আসাই হত না। না এলে বঞ্চিত হতাম সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা থেকে।

জামালপুরে যে বিয়ের আসরেও যেতে হয়েছিল আমাদের, তা রবাহুত হয়ে নয়, রীতিমতো আমন্ত্রিত হয়ে। বিয়ের আসরে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে উত্তম যানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন আমন্ত্রণকারীরা। সেখানে আরও অপ্রত্যাশিত আনন্দময় ঘটনাও ঘটেছিল একটি। আকর্ষণীয় একটি নাটক দেখারও সুযোগ পেয়েছিলাম সেখানে। নাটকটি, যতদূর মনে পড়ে, চিত্তাকর্ষক ছিল। যারা অভিনয় করেছিলেন তাদের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। হ্যাঁ, প্রশংসা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। নামজাদা অভিনেতা এম.এন. হুদার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। তিনি একজন কবির শ্বশুর। সেই কবির নাম মাহবুব বারী। তার কোনও কবিতা আজকাল কোনও পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ে না। বেশ কিছুকাল থেকেই তিনি কাব্যক্ষেত্রে অনুপস্থিত বলে মনে হয়। তার শ্বশুর নাট্যজগৎ থেকে তো বটেই, জীবনক্ষেত্র থেকেও অনুপস্থিত। আবছা মনে পড়ে তাঁর মুখ। মরহুম এম.এন. হুদা শুধু নাট্যমঞ্চেই অভিনয় করেছেন, তা নয়, তিনি পরে টেলিভিশনের বেশকিছু নাটকেও তাঁর অভিনয় ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তবে আজকাল তাঁর কথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। হায়, বুঝি এমনই রীতি এই সমাজের। ভোলা যায় না এই কথা যে, আমাদের সম্মানেই অনুষ্ঠিত এক সভায় জামালপুরের নাট্যমঞ্চে আমরা মাননীয় অতিথি

হিসেবে বক্তৃতা করেছিলাম। আয়োজকবৃন্দ এবং দর্শক-শ্রোতারা সবাই, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের বক্তব্যে প্রীত হয়েছিলেন।

খালেদ খালেদুর রহমান আমাদের শেরপুর শহর এবং পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যান। খালেদ চটপটে এক যুবক, কোনও কাজ করতে পারলেই খুশি। যেহেতু তার বড়ো ভাই একজন বরণীয় কবি বাংলাদেশের, এজন্যে তিনি গর্বিত নিশ্চয়ই এবং হাসান হাফিজুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব যাঁরা, তাঁদেরও তিনি পছন্দ করেন, শ্রদ্ধা করেন। যা হোক, শেরপুরের কথা মনে পড়লেই জামালপুরের সেই সময়ের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা মানে সহকারী জেলা প্রশাসক শাহ নাজমুল আলমের মুখ ভেসে ওঠে। সজ্জন শাহ নাজমুল আলমের আকর্ষণীয় সঙ্গের কল্যাণে আমাদের কিছু সময় খুব ভালো কেটেছিল। তিনি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এবং আমার দু'জনেরই কবিতার নিষ্ঠাবান, অনুরক্ত পাঠক। তাঁর মতো একজন সংস্কৃতিবান, কাব্যপ্রেমী যত্রতত্র পাওয়া অসম্ভব, এমন কাব্যপ্রেমী যাকে বলে কোটিকে গোটিক।

খালেদ এবং শাহ নাজমুল আলমের নেতৃত্বে আমরা নৌকোয় বসে ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে জিপে চেপে সড়কপথে শেরপুর শহরে পৌঁছই। জিপটিকেও নৌকোয় পার করা হয়েছিল। শেরপুরে পৌঁছে আমরা সেখানে প্রয়াত খান বাহাদুর ফজলুর রহমানের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করি। মধ্যাহ্নভোজটি ছিল অনুপম, তৃপ্তিকর। নানা পদের মধ্যে ইয়া বড়ো পাঙাশ মাছের সালুন ছিল অতিশয় সুস্বাদু, আমরা তার স্বাদ উপভোগ করেছি পুরোমাত্রায়।

খান বাহাদুর ফজলুর রহমান প্রয়াত গবেষক এবং পণ্ডিত সাবেক সচিব মুহম্মদ যাকারিয়ার শ্বশুর এবং শেরপুরের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। প্রয়াত খান বাহাদুর ফজলুর রহমানের বাসভবনে কিছু সময় কাটানোর পর একটি কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায় আমরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করি। আমাদের কবিতা শ্রোতাদের আনন্দিত করেছিল, মনে পড়ে। মফস্সলের বেশিরভাগ শ্রোতাই আন্তরিক এবং সাহিত্যপ্রেমী। সেখানে যাঁরা কাব্যচর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে তেমন কূটবুদ্ধি কিংবা ভণ্ডামি নেই। আগে তো তা-ই ছিল, জানি না বড়ো শহরের ছোঁয়া লেগে এখন ভিন্ন দিকে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে কি-না।

বিকেলে জিপে চেপে আমরা গারো পাহাড়ে যাই। উঁচু পাহাড়ে পৌঁছেই মনে শুধু খোলা হাওয়া নয়, একটা মুক্তির সুর বইতে লাগল যেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ আমরা পাহাড়িদের কারও কারও সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের আন্তরিক ব্যবহারে তারা বিশ্বাসী হয়ে উঠল বাঙালিদের প্রতি। দরিদ্র এরা, কিন্তু এদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাদাসিধা শিল্প সুষমায় স্বতন্ত্র। তাদের ভাষা পুরোপুরি বুঝতে পারি নি, কিন্তু যেটুকু বুঝেছি, তাতে আন্তরিকতা পরিস্ফুট, আনন্দের আভাও বিদ্যমান। গারো পাহাড়ের নিসর্গের রূপ দেখে এবং পাহাড়িদের পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করে সন্ধ্যার পর আমরা শেরপুর শহরে ফিরে আসি ফুরফুরে, প্রসন্নচিত্তে। সেখানকার মহিলা কলেজ মিলনায়তনে নানা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থা আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় যোগদান করি। আমাদের পুষ্পস্তবক উপহার দেয়া তো হলই, তদুপরি মুদ্রিত এবং বাঁধানো মানপত্রও উপহার দেয়া হয়।

আমরা এই সংবর্ধনার আয়োজকদের আন্তরিকতা এবং কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ তো হয়েইছি এবং সেজন্যে তাঁদের অকুণ্ঠ তারিফই করি নি, কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছি। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এমন সুন্দর, পরিপাটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা তো ভাবতেই পারি নি এরকম অনুষ্ঠান এমন অল্পসময়ে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা কী করে সম্ভব হল! শেরপুরের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিসেবীদের তৎপরতা এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধাও যে অপরিসীম, তা সেখানে না গেলে জানতেই পারতাম না। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠেছিল সবার অজ্ঞাতে। প্রায় মধ্যরাতে আমরা জামালপুর শহরে ফিরে আসি এবং নদী তীরবর্তী প্রেসক্লাবে রাত কাটাই গাঢ় ঘুমে। কিন্তু আনন্দের মধ্যে আচানক বিষাদের ছায়া আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিক জানালেন, রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার 'দৈনিক বাংলা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস' ছাড়া দেশের সবগুলো সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা এ-কথাও জানালেন যে, 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীকে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক করা হয়েছে এবং জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীকে করা হয়েছে 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক। এই আকস্মিক পরিবর্তনে প্রবীণ সাংবাদিক এবং আমাদের সবার শ্রদ্ধাভাজন আবুল কালাম শামসুদ্দীন অত্যন্ত বিচলিত হলেন তাঁর প্রিয় জামাতা মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এবং আমাদের কারও কারও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। একজন সাংবাদিক জানালেন উদ্বিগ্ন জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে জামালপুর প্রেসক্লাবে টেলিফোন করেছিলেন আমাদের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে। তিনি চেয়েছিলেন যেন আমরা তৎক্ষণায় ঢাকায় ফিরে আসি। তাঁর টেলিফোনের বক্তব্য সরাসরি তাঁর কাছ থেকে না শুনলেও শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের নির্দেশানুসারে পরের দিনই আমরা ঢাকায় রওয়ানা হয়ে যাই।

## ॥ একাত্তর ॥

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের টেলিফোন-বার্তা পেয়ে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এবং আমি, স্বীকার করছি, বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমরা চাকরিচ্যুত হয়ে পড়ব না তো? অবশ্য অফিসে পৌঁছে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের ওপর সেরকম কোনও খাঁড়া পড়ার সম্ভাবনা নেই। ক'দিন পর জানা গেল যে, যাদের চাকরিচ্যুত করা দরকার তাদের একটি তালিকা তড়িঘড়ি সরকারের দরবারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাদের নাম সেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় নি। কেউ কেউ রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই তালিকা পাঠানোর আগেই 'দৈনিক বাংলা' থেকে সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরীকে চলে যেতে হয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে।

এখন আমি পূর্বে বর্ণিত ঘটনার আগেকার কোনও কোনও ঘটনার কথা উল্লেখ করব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠন করলেন। তাঁর এই পদক্ষেপ শেষপর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনে। এক পর্যায়ে বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়ে যায়। এই হিড়িক

'দৈনিক বাংলা'কেও প্রবলভাবে স্পর্শ করে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে সাড়া-জাগানো গ্রন্থ 'ভাসানী যখন ইউরোপে'-এর লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস 'দৈনিক বাংলা' অফিসে হাজির হলেন সোৎসাহে। তাঁর সঙ্গে আরও এক সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর নাম মনে পড়ছে না। রাহাত খান নয় তো? তাঁরা দৈনিক বাংলার প্রায় সবার সই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। শুধু আহসান হাবীব, নির্মল সেন, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ এবং আমি সই দিই নি। আমি যখন আমার কামরায় বসে সই দিতে অস্বীকার করেছিলাম খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের বিনীত, প্রায়-নাছোড় অনুরোধ সত্ত্বেও তখন ঘরে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাশেদ খান মেনন উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃদু হাসছিলেন। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস চলে যওয়ার পর আমি রাশেদ খান মেননকে আবেগময় কণ্ঠে বলেছিলাম, 'আপনারা যদি কখনও এই ধরনের কাজে আমার কাছে সই সংগ্রহ করতে আসেন, তখনও আমি এভাবেই প্রত্যাখ্যান করব।' জানি না এতদিন পর আজও তাঁর সে-কথা মনে পড়বে কি-না। তাঁর স্মৃতি তীক্ষ্ণ বলেই তো জানি।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার অবিচল শ্রদ্ধা বিদ্যমান। তিনি যখন একজন সংগ্রামী ছাত্রনেতা ছিলেন তখন থেকেই আমি তাঁর ভক্ত। কিন্তু তাঁর কোনও কোনও কাজ আমার অনুমোদনযোগ্য মনে হয় নি। তা বলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধায় ভাটা পড়ে নি কখনও। আমি নিজেকে যদ্দুর চিনি তাতে বলতে পারি যে, 'জি হুজুরি' ভাবটি আমার মধ্যে অনুপস্থিত। আমি আমার ধ্যানধারণা, বিশ্বাসের প্রতি যথাসম্ভব নিষ্ঠাবান। যে-কাজ আমার কাছে ক্ষতিকর, মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনার মতো তা আমার কাছে আদৌ সমর্থনযোগ্য, গ্রহণযোগ্য নয়।

যা হোক, যাঁরা বাকশালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাতে গিয়েছিলেন আনুগত্য, নিঃশর্ত সমর্থন, সর্বোপরি ভালোবাসা বৃষ্টিভেজা শরীর কিন্তু উৎফুল্ল চিত্ত নিয়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, বহু বিখ্যাত প্রবীণ ও নবীন শিল্পী ও সাহিত্যিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি অভিবাদন জানাতে সেই মিছিলে শরিক হই নি। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ প্রথমে যেতে চান নি, কিন্তু সামিল হয়েছিলেন সেই মিছিলে। অবশ্য বৃষ্টিভেজা শরীরে সেখানে বেশিক্ষণ টিকতে পারেন নি। বঙ্গবন্ধু, আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় প্রবীণ বরেণ্য শিল্পী-লেখকদের এই ধরনের উপস্থিতিতে মনে মনে বিব্রতই হয়েছিলেন।

এই যে আমরা ক'জন সরকারি সংবাদপত্রের সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও বাকশালে যোগদান করি নি, সেজন্যে আমাদের কোনও জবাবদিহি করতে হয় নি, চাকরিও হারাতে হয় নি। ব্যাপারটি ভেবে দেখলে সরকারের উদারতাই প্রকাশিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার একটি ক্ষীণ পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার ছোটোভাই ব্যারিস্টার তোফায়লুর রহমানের সঙ্গে জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কন্যা মঞ্জুর বিয়ে হয় এবং সেই সুবাদে আমি উক্ত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। অনেক পরে বঙ্গবন্ধু এই তথ্যটি অবগত হন জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাতের মাধ্যমে। আমি অবশ্য কখনও এই পারিবারিক সূত্র সম্বল করে ৩২ নং ধানমণ্ডিতে একদিনও হাজির হই নি। একদিন মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

আমি অবশ্য অফিসের কাজের চাপে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারি নি। বঙ্গবন্ধু গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সেরনিয়াবাত, কবিকে দাওয়াত করো নি?' জনাব সেরনিয়াবাত বললেন, 'তাঁকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাজের চাপের দরুন তিনি আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।' সেদিন সেই মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন যে, আমি দৈনিক বাংলার একজন সহকারী সম্পাদক।

সেদিনের পরই বঙ্গবন্ধু তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রধান কর্তাকে পাঠালেন আমার কাছে, যার নাম সেলিমুজ্জামান। সেলিমুজ্জামান বললেন যে, বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলছেন, তিনি চান আমি যেন দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। এটি লুফে নেয়ার মতোই এক প্রস্তাব, কিন্তু আমি জনাব সেলিমুজ্জামানকে বললাম যে, 'নূরুল ইসলাম পাটোয়ারি 'দৈনিক বাংলা'র জন্যে অত্যন্ত একজন যোগ্য ব্যক্তি। তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন আমাদের এই পত্রিকায়। তাঁকে এই পদ থেকে অপসারণ করা ঠিক হবে না বলে মনে করি। বঙ্গবন্ধু বিদেশ থেকে ফিরে এলে আমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার আর কোনওদিনই দেখা হয় নি। দূর থেকে কয়েকবার দেখেছি তাঁর আমাকে 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকের পদে নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশের অনেক আগেই। যাক গে, তাঁর সঙ্গে কোনওদিনই মুখোমুখি হয়ে বসার কিংবা কথা বলার সুযোগ আমার হয় নি। এজন্যে কখনও সখনও আমার মনে খেদে জেগে ওঠে। কোনও প্রাপ্তির জন্যে অবশ্যই নয়। ওরকম বড়ো মাপের ব্যক্তি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল, তাঁর শাহাদৎ আমাদের কাঁদাবে যুগের পর যুগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্ধ ভক্ত ছিলাম না আমি, তবে তাঁকে একজন অসামান্য গণনেতা, অসীম সাহসী, হৃদয়বান পুরুষ বলে শ্রদ্ধা করেছি। এতকাল পরেও সেই শ্রদ্ধা এক বিন্দুও হ্রাস পায় নি, বরং আজ যখন আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে বামনদের আস্ফালন করতে দেখি, তখন সেই সিংহপুরুষ, সেই গালিভারকে বড়ো বেশি মনে পড়ে। বার বার মনে পড়ি সেই কালো রাতের কথা, যে রাতে ৩২নং ধানমণ্ডিতে তস্করের মতো হানা দিয়েছিল ১৫ অগাস্টে ক'জন হন্তারক।

শেখ মুজিব রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও ধানমণ্ডির একটি সামান্য দোতলা বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করতেন প্রায়-অরক্ষিত অবস্থায়। তাঁর জন্যে তো বরাদ্দ ছিল দুর্গতুল্য এক বাসভবন, যেখানে অনেক দেহরক্ষী এবং সদা-তৎপর সেনা থাকবে বাসভবনের বাইরে এবং ভেতরে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেরকম কোনও ভবনে যেতে রাজি হন নি, ৩২নং ধানমণ্ডিতেই বাস করতে পছন্দ করতেন অনেক বেশি। অকাল, ষড়যন্ত্রমূলক মৃত্যুই শুধু তাঁকে সেই বাড়ি থেকে চিরতরে সরাতে পেরেছিল।

১৫ আগস্টে আমি 'দৈনিক বাংলা'য় যাই নি, যেতে পারি নি প্রথমত নিজের মানসিক যন্ত্রণা এবং দ্বিতীয়ত আমার ছোটভাই ব্যারিস্টার তোফায়লুর রহমান এবং কান্না-প্লাবিত তাঁর স্ত্রী মঞ্জুর জন্যে। সে তার বাবা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ছোট দু'টি ভাইবোন, এক বড়োবোন এবং তার স্বামী শেখ ফজলুল হক মণিকে হারিয়ে শোকে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাঁর কান্নার করুণ শব্দে পাড়ার লোকজন আমাদের বাসায় চলে আসতে

পারে, এ-কথা বলে ওকে কান্না থামাতে বললাম। সে মুখে কাপড় চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যার পিতা, ভাই, বোন এবং আরও অত্যন্ত প্রিয়জন ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন, সে যে শুধু কাঁদছে, উন্মাদ হয়ে যায় নি, এটাই তো আশ্চর্যের বিষয়। এই যে আমি ওকে মন খুলে কাঁদতে বারণ করছি, এটা তো অন্যায়। কিন্তু কী করব আমি? সবার নিরাপত্তার কারণেই আমাকে এরকম আচরণ করতে হচ্ছে। আমি নিজেও তো কম বেদনার্ত এবং অসহায় বোধ করছিলাম না সেই পরিস্থিতিতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গের করুণ মৃত্যু অনেকের মতো আমাকে অত্যন্ত শোকার্ত, বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। নিজের অসহায়তার দরুন শামসুর রাহমান নামক ব্যক্তিটির প্রতি কেন জানি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।

সেদিন আমি আমার কর্মক্ষেত্রে 'দৈনিক বাংলা'য় যেতে পারি নি। পরদিন বিষণ্ণতায় ডুবে থাকা, অসহায় ব্যক্তির মতো আমি কোনওমতে অফিসে পৌঁছে নিজের কামরায় গিয়ে বসলাম। একে-একে ক'জন সহকর্মী আমার কামরায় এসে বসলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ এবং ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথাবার্তা হলো। অনেকেই মর্মাহত, দু'একজনের মনের ভেতরকার আনন্দ ফুটে উঠেছিল তাঁদের মুখে। অচানক আমার কী-যে হলো আমি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ফেললাম, 'ওশখ মুজিব উইল সুন্ রাইজ ফ্রম হিজ গ্রেইভ।'

আমার সেদিনের বাক্য মিথ্যা হয় নি। কবরে তাঁর মরদেহ বিনষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তিনি জেগে উঠেছেন প্রবলভাবে লক্ষ কোটি বাঙালির মনে। তাঁর শত্রুপক্ষ এখনও বড়ো বেশি ভীত তাঁর নামের জ্বলজ্বলে প্রভাবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এদেশের নির্ভীক, অনন্য দেশপ্রেমিক, বীর সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান সগৌরবে জীবিত থাকবেন কোটি কোটি বাঙালির মনে। চন্দ্র, সূর্যকে বিস্মৃত হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব বঙ্গবন্ধুকে ভুলে যাওয়া।

## ॥ বাহাত্তর ॥

সিলেট আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান নানা কারণে। সেখানকার ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো বটেই, আমার বেশ ক'জন আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবদের বাসস্থান বলেও। আমার মেজো কন্যা ফাওজিয়ার শ্বশুরবাড়ি সুনামগঞ্জের গাছপালাঘেরা সুন্দর একটি দোতলা বাড়িয়ে মাথা তুলে রয়েছে। সেই বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি বিনীত নদী। আমার কন্যা, তার স্বামী দেওয়ান সাবেরিন এবং তাদের তিন ছেলে বেশ কয়েক বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করছে। তারা এখন মার্কিন নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত। যখন ভাবি, আমার জামাতা সিলেটের নামজাদা এবং বাংলার বিখ্যাত কবি হাসন রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সেইসূত্রে আমিও দূরবর্তী এক আত্মীয় সেই অসামান্য ব্যক্তিটির, তখন সেই কথাটি ভেবে ভালো লাগে। যখন সুনামগঞ্জে বেড়াতে গিয়ে আমার কন্যার শ্বশুরবাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হাসান রাজার বাঁধানো কবরটি দেখি তখন আমার চোখের সামনে কেন জানি ঘরের ভেতরে একজন অনুপ্রাণিত, ঢোল-বাজানো,

বাবরি-ঝাঁকানো গায়ক কবির উজ্জ্বল ছবি ভেসে ওঠে। সেই ছবি আর কারও নয়, হাসন রাজার।

তবে সিলেট আমার প্রিয় আরও ক'জন মানুষের জন্যে। তাদের মধ্যে প্রথম যাঁর নাম আমার হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয়, যাঁর কথা প্রায়শই ভাবি তিনি আর কেউ নন তুষার কর। তিনি নিজে কবি এবং একজন অসামান্য কবিতাপ্রেমী। তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়ার আগেই আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রীতির বন্ধন রচিত হয়ে যায়। তার সাহিত্যপ্রীতি এবং আমার প্রতি নিখাদ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা একালে বিরল মনে হয়। এখন তো পদে পদে হোঁচট খেতে হয় জীবনের পথ চলার কালে। অনেকে বন্ধুত্বের ভান করে অগোচরে শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বন্ধুর সর্বনাশসাধনে পাকা খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। যার বিরুদ্ধে সর্বনাশের ফাঁদ পাতা হয় অধিকাংশ সময় সে তা বুঝতেই পারে না। দুর্ঘটনার পরেও তথাকথিত ইয়ারের সঙ্গে ইয়ারানা কায়েম রাখে।

যাই হোক, তুষার করের ব্যবহারে আজ অব্দি কোনও কৃত্রিমতা, উপর-চালকি, ভণ্ডামির এক ফোঁটা পর্যন্ত পাই না, যতদিন বেঁচে আছি পাব না যে, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত। তিনি আমার প্রতিটি লেখা সযত্নে রেখে দেন তাঁর ফাইলে। ফাইলের সেসব লেখা তাঁর কাছে চাওয়া মাত্রই পেয়েছি। কখনও কখনও আমি নিজের যেসব লেখার অস্তিত্বসুদ্ধ বিস্মৃত হয়েছি সেসব রচনার কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং বই প্রকাশের সময় পাঠিয়ে দিয়েছেন সিলেট থেকে ঢাকায় আমার ঠিকানায়। তার সাহায্য না পেলে কোনও কোনও বই হয়তো আমার গাফিলতির দরুন প্রকাশিত থেকে যেত। 'একান্ত ভাবনা' নামে আমার গদ্যগ্রন্থটি হয়তো আলোর মুখই দেখত না। এই বই বেশ ক'জন বোদ্ধার প্রশংসা অর্জন করেছে। অবশ্য জানতে পারি নি বইটি বাজারজাত করার ব্যাপারে কতটা যত্নবান হয়েছেন প্রকাশক।

তুষার কর কিছুদিন যাবৎ হৃদরোগে ভুগছেন। এখানকার কোনও কোনও চিকিৎসক তাকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যেতে বলেছেন। এ এক সমস্যা আমাদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে থাকে। আমাদের সৎ, বিবেকবান চিকিৎসকগণ নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে কঠিন রোগের হামলায় কাতর তুষার করকে কলকাতায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। জানি না এখনও তার সেই শহরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে কি-না। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, যাওয়ার ব্যবস্থা হলে ঢাকা হলে কাঙ্ক্ষিত স্থানে যাবেন, যদিও বেশকিছু টাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

কয়েক বছর আগে সিলেটের উদারপন্থী, প্রগতিশীল লেখক এবং সাহিত্যপ্রেমী আমাকে সংবর্ধনা জনানোর আয়োজন করেছিলেন। যাওয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম, অপেক্ষা করেছিলাম প্রায় পুরো একটি দিন। ঘন ঘন টেলিফোনের মাধ্যমে আমার যাওয়া কখন কীভাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হল। আমার যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল সিলেটের মৌলবাদী লোকজন। তারা আমাকে কিছুতেই সিলেটে পা রাখতে দেবে না। তারা আয়োজকদের কারও কারও বাড়িতে বোমা ফেলেছে, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে। আমার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে বানচাল করার সবরকম কু-ব্যবস্থা

তারা গ্রহণ করল সোৎসাহে। অনুষ্ঠানের মর্মাহত আয়োজকবৃন্দ আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে জানালেন যে, সিলেটে আমার যাওয়া ঠিক হবে না, তারা খুবই মুশকিলে পড়েছেন। আমি বিপদ মাথায় নিয়ে, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সংকল্প বজায় রেখেছিলাম। ভাবলাম, যদি আয়োজনকরা অনুষ্ঠান করতেই না পারেন তাহলে সেখানে ঝামেলা এবং বিপদ মাথায় নিয়ে যাওয়ারই বা কী প্রয়োজন।

টেলিফোনে জানতে পারলাম পুরস্কার হিসেবে উপহার দেয়ার জন্যে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমি অবশ্য পুরস্কৃত হতে পারি নি। সেজন্যে আমার কোনও খেদ হয় নি। মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়াটাই সবচেয়ে দামি পুরস্কার। সেটা আমি পেয়েছি, এখনও পাই। এই যে আমি সেই ক'বছর আগে সিলেটে যেতে পারি নি সেজন্যে মনে-মনে একটি শপথ নিয়েছিলাম, জীবনে কস্মিনকালেও আর সিলেটের মাটিতে পা রাখব না। তা বলে কেউ যেন না ভাবেন যে, আমি সিলেট শহরকে অপছন্দ করি কিংবা তার বাসিন্দাদের ঘৃণা করি। সিলেটের সাধারণ মানুষ, প্রগতিশীল, উদারপন্থী ব্যক্তিবর্গ সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। এই শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাকে কস্মিনকালেও কোনও অমাবস্যা গ্রাস করতে পারবে না।

আমি ভ্রমণবিলাসী কোনও ব্যক্তি নই। আমার গুণীবন্ধু ওয়াহিদুল হকের মতো ঘন ঘন বাংলাদেশের নানা জায়গায় স্বেচ্ছায় ঘুরে বেড়াতেও উৎসাহী নই। আমাকে ঘরকুনো মানুষই বলা চলে, যদিও পৃথিবীর বেশকিছু দেশে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অতিথি হিসেবে যেতে হয়েছে বলেই গিয়েছি, স্বেচ্ছায় কস্মিনকালেও নয়। কখনও কখনও আমন্ত্রিত হয়েও যাওয়ার ইচ্ছা হয় নি। জানি, এটা ভালো কোনও স্বভাব নয়। নিজের ত্রুটি স্বীকার করার মতো সৎসাহস আমার কাছে। তাছাড়া স্বদেশে কিংবা বিদেশে কোনও জায়গায় একবার চলে গেলে খারাপ তো লাগেই না বরং খুবই ভালো লাগে। কত চমৎকার ব্যক্তির সঙ্গেই না পরিচয় হয়, কত দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলিই না আমাকে মুগ্ধ করে। এই ঋণ পরিশোধ করার সাধ্য কি আমার আছে? কোনওকিছুর বিনিময়েই এমন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এই যে আমি সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৌজন্য এবং প্রীতির কথা বললাম তাতে বস্তুত কিছুই বলা হয় নি, সেই কৃতজ্ঞতা রয়ে গেছে শুধু আমার স্মৃতিমালায়। এই যে সিলেটে আর কখনও যাব না বলে যে হলফ করেছি সেজন্যে বাংলাদেশের অন্য কোনোখানে যাব না, এমন তো নয়। এই সোনার বাংলাদেশ আর সবার মতো আমারও যে আপন দেশ, এ তো চন্দ্র সূর্যের মতোই সত্য। তাই দেশপ্রেমী যে-কোনও বাঙালির আবেগ নিয়েই আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। এই দেশের যে-কোনও এলাকায় যেতে আমার ইচ্ছে হয়, তবে চট করে একা কোথাও কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে কিংবা হাতে স্যুটকেস বয়ে কোথাও যেতে মন চায় না। কোনও ভালো সঙ্গী সহযাত্রী হলে অবশ্য ক'দিনের জন্যে ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও বেড়ানোর ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এজন্যেই বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আমি আমন্ত্রিত হলেই সেসব আমন্ত্রণ আন্তরিকতায় এবং সানন্দে গ্রহণ করেছি।

এটা তো ঠিক আগে আমার আলস্য এবং ঔদাসীন্য আমাকে বাংলাদেশের বেশকিছু জায়গায় যেতে পারার সুযোগটা বানচাল করে দিয়েছে। এই তো অনেক কাছের মুন্সীগঞ্জেই

১৯৭৪ সালের আগে যাওয়াই হয় নি। তাই যখন মুন্সীগঞ্জে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম, সেখানে হাজির হতে কোনওরকম দ্বিধা করি নি। মুন্সীগঞ্জের কবি-সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের উদ্যোগে সেখানে পয়লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে একটি সাহিত্যসভা এবং কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই কবি সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে ঢাকায় বসবাসকারী ক'জন লেখক এবং কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তরুণ কবি হাসান হাফিজকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এবং আমাকে মুন্সিগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। হাসান হাফিজ আমাদের বাসায় আসার আগে তাড়াহুড়ো করে দাড়ি কামাতে গিয়ে গণ্ডদেশকে জবর জখমি করে ফেলেছেন। গাল ফুলে পাউরুটি। এই ফোলা গাল নিয়েই তাকে প্রথমে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্কে তাঁর বাসা থেকে এবং পরে আমার বাসা থেকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মুন্সিগঞ্জে যেতে হচ্ছে।

মুন্সিগঞ্জে পৌঁছে বেশ কয়েকজন চেনা কবি-সাহিত্যিককে দেখতে পেয়ে বেশ ভালো লাগল। আসর তোফা জমবে। চলন্ত লঞ্চে বসে আয়েস করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা কম সুখকর নয়। এ ধরনের যাত্রা ভাবনায় কবিতার নতুন পঙ্‌ক্তির জন্ম দেয়। লঞ্চে আগে থেকেই বসেছিলেন সম্ভবত ফজল শাহাবুদ্দীন, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসান এবং আরও ক'জন প্রবীণ ও নবীন কবি-সাহিত্যিক। আমরা গিয়ে যুক্ত হলাম তাদের সঙ্গে। আমাদের বরণ করে নিলেন তরুণ কবি মাসুদুজ্জামান এবং লঞ্চে আমাদের বসার জায়গা করে দিলেন। আমাদের দেখে উপস্থিত সবাই আনন্দিত-চিত্তে স্বাগত জানালেন। প্রকৃতি আমাদের আগমনে যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছেন। নদীর সংযত, সুশ্রী তরঙ্গমালা, পাখির অপরূপ উড়াল, হাওয়ার আদর আমাদের এই যাত্রাকে করে তুলেছিল আনন্দময়, প্রায় অপার্থিব।

আমরা মুন্সিগঞ্জে পৌঁছুনোর পর আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল, আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানেই দ্বিপ্রাহরিক আহারের আয়োজন করা হল আমাদের জন্যে। সেই আয়োজন আদৌ সাধারণ ছিল না। বাদশাহি খানা যাকে বলে তা-ই পরিবেশিত হল। ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের দস্তরখানে। মুন্সিগঞ্জের সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপ্রেমীদের আতিথেয়তায় আমরা সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। নিজ থেকেই কৃতজ্ঞতাবোধের জন্ম হল।

আমাদের আহার-পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর সাহিত্যপ্রেমী, অটোগ্রাফ-শিকারি তরুণ-তরুণীরা ঢাকা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকদের ঘিরে ধরল। আমাদের বহুক্ষণ ধরে অটোগ্রাফ খাতায় সই করতে হল, সেইসঙ্গে প্রত্যেকের জন্যে দু'চারটি কথাও লিখতে হল। তবে সদ্য চিকিৎসা করিয়ে জার্মানি থেকে ফিরে আসা কবি আবুল হাসানকে ঘিরে ধরা তরুণ-তরুণীদের ভিড় আমাদের সবার স্বাক্ষর সন্ধানীদের চেয়ে বেশি। এতেই তার জনপ্রিয়তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কবিতা তারুণ্যে ঝলমলে পাঠক-পাঠিকাদের চিত্ত জয় করেছে, সন্দেহ নেই। তার কবিতায় নিঃসন্দেহে সেই গুণ বর্তমান। তার অকাল মৃত্যুতে আমাদের কাব্যসাহিত্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যা হোক, যে জন্যে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলাম মুন্সিগঞ্জে সেই সাহিত্যসভা ও কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় হরগঙ্গা কলেজ প্রাঙ্গণে। সেখানে তো আমাদের যেতেই হবে। তবে তার আগে দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান দেখে নেয়া উচিত। সেজন্যেই আমরা মোগল আমলের সুপ্রাচীন ইদ্রাকপুর দুর্গ দেখা একান্ত জরুরি বোধ করেছিলাম। মোগল আমলের এই দৃষ্টিনন্দন দুর্গটি দেখে মুগ্ধ তো হয়েইছি তবে একটি ব্যাপারে মর্মাহতও হলাম। অমন একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের একটি অংশকে সরকারি দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা কস্মিনকালেও সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা ভারাক্রান্ত মনের ইতিহাসকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেলাম। না, ঠিক বলা হল না। ইতিহাসের লাঞ্ছনাকে মনে পুষে রওয়ানা হলাম হরগঙ্গা কলেজ প্রাঙ্গণের উদ্দেশে, যেখানে অনুষ্ঠিত হবে সাহিত্যসভা এবং কবিগোষ্ঠীর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি। কবিতাপ্রেমীদের জন্যে চিত্তাকর্ষক এই অনুষ্ঠান, সন্দেহ নেই।

নববর্ষের মন-দোলানো ভাবের পুলক নিয়েই আমরা কবিগোষ্ঠী মঞ্চে আসন গ্রহণ করলাম। প্রকৃতি তখন দিব্যি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আসমান মেঘের আওতায় এসে গেছে, বাতাস বইছে উদ্দামতায়। মুন্সিগঞ্জের দু'চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বক্তৃতা দেয়ার পর কবিগণ নিজ নিজ কবিতা পাঠ করলেন। শ্রোতারা করতালির মাধ্যমে তাদের ভালোলাগার অকুণ্ঠ প্রকাশ নিবেদন করলেন।

অনুষ্ঠানের অন্যপ্রান্তে সংগীতের সুর বয়ে যাচ্ছিল মনোযোগী শ্রোতাদের প্রাণে। সংগীতের স্বতন্ত্র একটি আবেদন আছে যা রসকসহীন ব্যক্তিদের মনেও আবেগ সঞ্চালিত করে। তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই রসস্নিগ্ধ হয়ে ওঠেন। যাক, ক্রুদ্ধ প্রকৃতি আমাদের বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুলল। আমরা অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং 'দৈনিক বাংলা'র মুন্সিগঞ্জের সংবাদদাতা শফিউদ্দিন আহমদের অনুরোধে সাগ্রহে তাঁর বাসায় রাত্রিযাপনে রাজি হলাম। তিনি সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতেও প্লেটে গরম ভাত, বড়ো মাছের তরকারি এবং সুস্বাদু ডাল পরিবেশন করেন। রাতে আবুল হাসানের শরীর বেশ খারাপ হয়ে পড়ল। তাকে ঘুমানোর জন্যে মহাদেব সাহা নিজের জায়গা ছেড়ে দিলেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ এবং আমি একটি চেয়ারে বসে প্রায় না ঘুমিয়ে সারারাত কাটিয়ে দিলাম। আমার দৃষ্টি সারাক্ষণ প্রতীক্ষারত ছিল দুর্যোগের রাতে সকালের প্রথম প্রদীপ্ত আলোর জন্যে।

## ॥ তিয়াত্তর ॥

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৮৭ সালে মার্চ কি এপ্রিল মাসে আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি একটি ওষুধের ভুল ডোজ সেবন করে। আমার বুকের কষ্ট সারাবার তাগিদে সেই ওষুধ সেবন করেছিলাম রোগশয্যায় সারাক্ষণ দ্রুত শীর্ণ হয়ে আসা শরীরকে সোপর্দ করে ক'দিন। বলা বাহুল্য, এর ফল ভালো হয় নি। চিকিৎসকের পরামর্শে আমাকে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এক দুপুরবেলা। হাসপাতালে যাওয়ার কালে আমাকে দেখার জন্যে আমাব ক'জন আত্মীয় এসেছিলেন। আর এসেছিল জাহানারা আখতার, যে আমার আত্মীয় না হলেও আপনজন। যখন আমাকে দোতলা থেকে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে

শুইয়ে দিল, আবছা দৃষ্টিতে লক্ষ করলাম জাহানারা আমাকে সাগ্রহে লক্ষ করেছিল বেদনার্ত দৃষ্টিতে।

তখন আমি তল্লাবাগের একটি চারতলা বাসার দোতলায় একজন ভাড়াটে হিসেবে সপরিবারে বসবাস করছিলাম। আমার এই অসুসস্থার মাসখানেক আগে জাহানারার উদ্যোগেই আমাদের কথা হয় টেলিফোনে এবং চটজলদি প্রথম দেখা হয় সাকুরা রেস্তোরাঁয়। ক'দিনের টেলিফোনের আলাপে আমরা দু'জনই দেখা করার জন্য ব্যাকুল হলাম। সে আমাকে আগেই দেখেছিল কোথাও, কিন্তু এর আগে কখনও তাকে দেখি নি। সাকুরায় এই দেখাশোনা আমাদের মধ্যে মিলনের এক মোহন সেতু সৃষ্টি করল।

যা হোক, বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পৌঁছে আমাকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে একটি স্ট্রেচারে রাখা হল হাসপাতালের বারান্দায়। কিছুক্ষণ পর একজন চিকিৎসক এলেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে। পরে জেনেছিলাম তিনি আমার অবস্থা তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে বুঝতে পেরে রীতিমতো ঘাবড়ে তো বটেই, ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন তার ভীতির কারণ। যদি কোনও কারণে হাসপাতালে সেদিন পটল তুলে ফেলি, তাহলে আমাকে দেখার জন্যে যে ক'জন প্রগতিশীল তরুণ, সংখ্যায় তারা নগণ্য নয়, হাসপাতালে জড়ো হয়েছিলেন তারা তাকে ছিঁড়ে ফেলবেন। সেই চিকিৎসকের নাম প্রফেসর শামসুল হক। কিছুদিন পর তিনি মহাখালীর এই বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ডাইরেক্টরের পদ অলংকৃত করেছিলেন, অবসরপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত। তার চিকিৎসায় আমি একমাসের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠি।

এতকাল পরে আজও আমি হৃৎপিণ্ডজনিত রোগ সারাবার তাগিদে তার বাসায় হাজির হই দীর্ঘ পথ উজিয়ে। তিনি আমার চিকিৎসা করেন হাসিমুখে এবং একটি টাকাও নেন না। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমাকে দেখার জন্য বক্ষব্যাধি হাসপাতালে অনেকেই এসেছেন। কেউ কেউ এসেছেন সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে যাদের সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই, তারাও এসেছেন। শুনেছি, অনেকেই আমার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেছেন। আমার বড়ো জামাতা আমিনুল ইসলাম এবং বড়ো মেয়ে সুমি, মেজো জামাতা দেওয়ান শফিকুস সাবেরিন এবং মেজো মেয়ে ফাওজিয়াও যথেষ্ট সেবা করেছে আমার। কেউ কেউ তো সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছে রুগণ্ আমার কামরায়। আমার ছেলে ফাইয়াজও রাত জেগে তার অসুস্থ বাবার সেবা করেছে। আর যার কথা না বললেই নয় সে আমার কাজের ছেলে আলী আহমদ। সে আমার হাত-পা ম্যাসেজ তো করেইছে এমনকি পরিষ্কারও করেছে শয্যাগত, অসহায় রোগীটির মলমূত্র। এই কাজটি কখনও কখনও আমার ছেলে ফাইয়াজও করেছে।

পরে শুনেছিলাম, হাসপাতালের গোড়ার দিকে আমার মুখে একজন সুন্দরী চুমো খেয়েছিলেন। আমি অবশ্য আবছা টের পেয়েছিলাম আবেগময় সেই চুম্বন। না, তিনি জাহানারা আখতার নন। জাহানারা আখতার হৃদরোগ হাসপাতালে এসেছিল মাত্র একদিন। বেশ কিছুক্ষণ রোগীর বেডের পাশে রাখা চেয়ারে বসে থেকে, কিছু কথা বলে বিদায়বেলায় বলে গেল, সে ভারতে যাচ্ছে কিছুদিনের জন্যে কয়েকটি জায়গায় বেড়াতে। সত্যি বলতে কী, তার এই কথা আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু জীবন এরকমই। এমনই মানুষের এই মনোভঙ্গি।

একদিন বিকালে শহিদ নূর হোসেনের পিতা এলেন বক্ষব্যাধি হাসপাতালে আমাকে দেখার জন্যে। তার পোশাক খুবই সাদাসিধা, গায়ে সাধারণ কাপড়ের পাঞ্জাবি, লুঙ্গিটিও তেমনি, মাথায় সাদা কিস্তি টুপি, মুখমণ্ডলে সাদা-কালো দাড়ি আর গোঁফ। তার হাতে আমার জন্যে আনা একটি সুন্দর ফুলের তোড়া এবং কিছু ফলের স্ফীত একটি প্যাকেট। আমি বিছানায় উঠে বসে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করে নূর হোসেনের পিতাকে চেয়ারে বসতে বললাম। তাকে বললাম, 'আপনি কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছেন তাতে খুবই খুশি হয়েছি, কিন্তু এসব নিয়ে এলেন কেন পয়সা খরচ করে? কোনও দরকার ছিল না এসবের।' তিনি উত্তর দিলেন বিনীত কণ্ঠস্বরে, 'কী বলছেন? আপনি আমার ছেলেকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, আপনার জন্যে এই সামান্য জিনিস আনতে পারব না?' কিছুক্ষণ আমার বেডের পাশে বসে বিদায় নিলেন শহীদ নূর হোসেনের পিতা। আমি তার চলার পথে তাকিয়ে রইলাম।

গোড়ার দিকে একদিন দুপুরে আমাকে দেখতে এলেন সুদর্শন কবি এবং বাংলাদেশ সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সচিব মনযুরুল করিম। যতদূর মনে পড়ে, তখন তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি অসামান্য ভদ্র এবং ভালো মানুষ। আমার যাতে হাসপাতালে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়, সেদিকে হাসপাতালের কর্তাদের বলে দিলেন। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ করে হাসিমুখে বিদায় নিলেন। এরপর শুধু আমার কেবিন নয় পাশের সব কেবিনেরই চেহারা কিছুটা বদলে গেল। কোনও কোনও কেবিনের ইলেকট্রিক বাতি জ্বলত না, সেগুলোরও প্রতিকার করা হল। পার্শ্ববর্তী কেবিনগুলোর রোগীবৃন্দ আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমি বলতে চেষ্টা করলাম যে, এতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। সচিব মনযুরুল করিম খুবই ভালো মানুষ। তিনি সবার দিকেই লক্ষ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু'একদিন পরেই আমি পড়লাম হিক্কার কবলে। ঘুম না আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় অবিরাম চলত নাছোড় হিক্কার নিপীড়ন। কথা বলা তো দূরাস্ত, হিক্কা ছাড়া অন্যকিছুই মুখ দিয়ে করা ছিল অসম্ভব। এটা এক সপ্তাহ পর্যন্ত কায়েম ছিল। ইতিমধ্যে জানতে পারলাম, হিক্কার তাণ্ডবে আগে কোনও কোনও রোগী দু'তিন দিনের মধ্যেই অক্কা পেতেন, এ খবর আমার কানে এসেছে। এটা যে কোনও গুজব নয় তা-ও জানতে পেরেছিলাম। এ খবরে ভড়কে যাই নি বটে, তবে খানিক বিচলিত হয়েছিলাম, সন্দেহ নেই। আট নয়দিন পর হিক্কার প্রতাপ উবে গেল। বেশকিছুটা স্বস্তি ফিরে এল। আমার খোঁজখবর নেয়ার মানুষের অভাব ছিল না। এদিক থেকে এই অধম খুবই ভাগ্যবান। আমার স্নেহময়ী মা, ভাইবোন, আমার তিন মেয়ে, দুই বিবাহিতা কন্যার দুই স্বামী, অনেক বন্ধু তো ছিলই, বহু অপরিচিত জনও আমার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, রোগীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আমি যখন খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠছিলাম, তখন কয়েকদিন ভ্রাতৃবধূ মঞ্জু বাসা থেকে আমার জন্যে রুচি-ফেরানো খাদ্য নিয়ে এসেছে।

যখন অসুস্থতায় অধিক ঘায়েল ছিলাম, তখন অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে কেবিনের জানালা দিয়ে আমাকে দু'এক ঝলক দেখে গেছেন। যাদের দেখতে পেয়েছি, যাদের

দেখতে পাই না — সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি মনে-মনে। কতজন যে আমাকে ভালোবাসেন তাঁর প্রমাণ পেয়েছিলাম তখন। অসুখে বেশ ভাটা পড়ার পর বিকেল বেলা বারান্দায় আরাম-কেদারায় এসে বসতাম। দেখতে পেতাম গাছপালার সবুজাভা, আকাশের নীলিমা, মেঘ, ধীর ছন্দে পলায়নপর রৌদ্রাভা, দূরের পথিক, স্তিমিত আলোয় প্রকৃতির সলজ্জ সৌন্দর্য এমন অনুভূতি সৃষ্টি করত যা আমার প্রকাশের সাধ্যাতীত। আরাম কেদারায় অনেকক্ষণ বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতাম নিবেদিত প্রেমিকের ধরনে।

পুরো একমাস বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসা লাভের পর ফিরে এলাম তল্লাবাগের ভাড়াটে বাসায়। 'দৈনিক বাংলা'র চাকরি ছেড়েছি স্বেচ্ছায় এরশাদ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে। এখনও জানি না কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্য। মনে পড়ে, প্রফেসর শামসুল হকের কথা, বক্ষব্যাধি হাসপাতালের দীর্ঘ বারান্দার কথা, দূরের সবুজ খোলা জায়গাটির কথা।

## ॥ চুয়াত্তর ॥

কেউ কেউ আমার 'কালের ধুলোয় লেখা' নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, আমি প্রায়শই আগের কথা পরে এবং পরের কথা আগে লিখি। এটা তাঁদের কাছে আদৌ অনুমোদনযোগ্য নয়। আমি তাঁদের মতামতকে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু সেই উক্তিকে মেনে নিতে পারি না। স্মৃতি কি সবসময় তারিখের শাসন মেনে চলে? আমার তো মনে হয়, স্মৃতি মাঝেমধ্যে, এমনকি বার বার বেয়াড়াভাবে পরের ঘটনা আগে এবং আগের ঘটনা পরে নিয়ে এসে মনের দরজার কড়া নেড়ে ফেলে। তখন এই কড়ার আওয়াজকে অগ্রাহ্য করা চলে না। এরপরও যদি কেউ কেউ আমার এই কথাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চান তাহলে আমি নাচার।

এই তো এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে এমন কোনও ঘটনার কথা যা অনেক আগে ঘটেছিল। যখন তা ঘটেছিল, তখন আমি লিখি নি, লিখছি আজ ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের পয়লা তারিখে। এ খুবই স্বাভাবিক, তেমনি আজকের কোনও ঘটনার কথাও লিখে ফেলতে পারি আজই। কেউ কি আমাকে বাধা দিতে আসবেন? না, কস্মিনকালেও নয়। তবে আজকের কথা দশ বছর পরে লিপিবদ্ধ করলেও কেউ আমার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে বসবেন না কিংবা আমাকে গালমন্দ করবেন না। এই বাক্যটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জেগে উঠল আমি কি আরও দশ বছর কিংবা তার বেশি এই সূর্যালোক এবং পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বেঁচে থাকব? আমি কি মৃত্যুর শীতল নিশ্বাসে চিরদিনের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে যাব না।

ইতিপূর্বে লিখেছি, আমি সেইসব নিয়মের শাসন-মানা ব্যক্তি নই যাঁরা নিয়মিত হররোজ ডায়েরি লিখে থাকেন। আমি কালেভদ্রে দু'চারদিন দিনলিপি লিখে উঠতে পেরেছি। এই সংখ্যা, বুঝতেই পারছেন, আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। সেই সামান্য ক'দিনের ডায়েরি প্রায় সবটাই ইতিমধ্যে পাঠকদের কাছে পেশ করে ফেলেছি। বাকি রয়েছে মাত্র

দু'তিনদিনের রোজনামচা। আলসেমি আমাকে এর বেশি লিখতে অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

**১৪/৯/১৯৯৬**

বহুদিন পর আবার ডায়েরি লিখতে শুরু করেছি আজ থেকে। গতবছর কয়েক মাস অনিয়মিতভাবে লিখেছিলাম ওর প্রেরণায়। আমার ডায়েরি লেখা উচিত, এ-কথা সে আমাকে বার বার বলেছে। কেন আমি এতকাল লিখি নি, এই প্রশ্ন বহুদিন সে করেছে আমাকে। আলসেমির জন্যেই লিখি নি, লেখার তাগিদ অনুভব করি নি ইত্যাদি জবাব দিয়েছি তাকে। সে সন্তুষ্ট হয় নি আমার উত্তরে। এবারও ডায়েরি লিখতে নিজেকে বাধ্য করেছি ওর অনুরোধে। জানি, আমার এই পরিণামহীন শব্দাবলি কারও কোনও কাজে লাগবে না, এসবের কোনও সাহিত্যিক মূল্য আছে বলেও মনে করি না। একজনের মন রক্ষার জন্যেই আমার এই অর্থহীন প্রয়াস।

ক'দিন ধরে ভীষণ গরম পড়েছে। এই গায়ে জ্বালা-ধরানো তাপ আরও এক মাস স্থায়ী হবে — এই ভবিষ্যদ্বাণী আবহাওয়া অফিসের। এই বেয়াড়া তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা। পাখা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যায়, ঘাম ঝরে দরদর করে।

আজ গৌরীর সঙ্গে বেশি কথা হয় নি। সকালের দিকে লোকজন এলে আমার অসুবিধা হয়। ছিন্ন হয় ওর সঙ্গে যোগাযোগ। আমার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। কিন্তু হাসিমুখে অতিথিদের স্বাগত জানাই। আমাদের দেশে আগে থেকে এত্তেলা না দিয়ে চলে আসাটাই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে এক ধরনের অস্থিরতা নিয়ে আছি, একটা বেদনাবোধ ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলছে আমার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে। ওর অভিমান এবং যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করে গভীরভাবে।

**১৫/৯/১৯৯৬**

আজকের প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রধান খবর খিলক্ষেত রেলক্রসিং-এর কাছে ট্রেন দুর্ঘটনা। মহানগর উর্মি ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পাশের বিলে পড়ে যায়। ফলে সাতজন যাত্রী নিহত হয়েছেন আর আহত হয়েছেন শতাধিক। ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসছিল। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। কেউ কেউ ত্রুটিপূর্ণ স্লিপারের কথা বলেছেন, কেউ কেউ আবার সাবোটাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। কারণ যা-ই হোক, কয়েকটি মূল্যবান প্রাণ বিনষ্ট হল এই ট্রেন দুর্ঘটনায়। যেসব সংসারে বিপর্যয় নেমে এসেছে, সেসব পরিবারের ক্ষয়-ক্ষতি কি দূর করা সম্ভব কখনও?

ছাপার শীতল হরফে আমরা সাত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পড়লাম। কিন্তু এইসব শীতল অক্ষরের আড়ালে রয়েছে হাসি-কান্না জড়ানো অনেক কাহিনি। গৌরীর কাছেই শুনলাম ওর এক বান্ধবীর বাড়ির কাছাকাছি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সদ্য বিবাহিত এক চটপটে যুবকের কথা। যুবকটি তার মৃত পিতাকে গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক গোরস্তানে কবর দিয়ে সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনে ঢাকায় ফিরছিল। বাড়ি পৌঁছার আগেই অপঘাতে মৃত্যু হল ওর।

সেই না-দেখা তরুণ আর তার বিচ্ছেদকাতর পরিণীতার জন্যে শোকার্ত হলাম। কেন এমন হয়? কত ট্র্যাজেডি ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশে, আমরা খোঁজ রাখি না, জানতে পারি না। আমার মধ্যে যে বেদনা, যন্ত্রণা ও হাহাকার রয়েছে তা-কি আমার কাছের মানুষেরা টের পায় কখনও? আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেসব হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, আর্ত অনুভূতিমালা সমাহিত হবে, কেউ জানবে না। জানলেই বা কী লাভ? বরং সেসব জ্ঞাত হওয়া মানেই বিড়ম্বনা, উপহাস!

আজ গৌরীর সঙ্গে কথা বলা গেল অনেকক্ষণ। নিরবচ্ছিন্ন এই আলাপে সব শরতের আকাশের মতো হয়ে গেল; আমি আমার মধ্যে স্নিগ্ধ রোদ, কয়েকটি দূরগামী পাখির ঝলসানি, সরোবরের টলটলে জল, সোনার ঘন্টার ধ্বনি অনুভব করলাম। কথা শেষ হলে মনের ভেতর যে-স্তব্ধতার জন্ম হয়, তা হয়ে ওঠে ভিন্ন কোনও সংলাপের শব্দহীন আলোড়ন। সেই স্তব্ধতা হৃদয়কে জাগিয়ে রাখে, হৃদয় হয়ে ওঠে অনন্তমুখী। সন্ধ্যাটা কাটল সুন্দর এক স্বপ্নের মতো। তবু ভাবনায় দুর্ঘটনা, ক'জন মানুষের মৃত্যু, সদ্য বিবাহিত যুবক, যুবতির মৃত্যুর কালো ছায়া বড়ো বেশি স্পষ্ট হয়ে রইল।

**১৬/৯/১৯৯৬**

দুপুরে বৃষ্টি এল অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুর বাজিয়ে। দুঃসহ গরমে বৃষ্টি করুণাধারার মতোই। ইচ্ছে হল ঘরের বাইরে ছুটে গিয়ে বৃষ্টিধারায় স্নাত হই। গাছগুলোকে খুব সুখী মনে হল। ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রদগ্ধ ছিল ওরা, একটি পাতাও নড়ে নি বহু ঘন্টা ধরে । এখন ওরা নেচে উঠেছে আনন্দে, ওদের গা বেয়ে পড়ছে পানি। গৌরীর কথা মনে পড়ল। সে বৃষ্টি খুব ভালোবাসে। বৃষ্টি তাকে কখনও ক্লান্ত করে না।

ঘরে বসে আছি। আমার দৃষ্টি জানালার বাইরে ছড়ানো। হঠাৎ আমার পৌত্রী নয়না এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। ঘুম থেকে উঠে এসেছে; ওর হাতে এক পিস কেক। কেক খেতে-খেতে হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, দাদাভাই, তুমি কী ভাবছ? কী দেখছ? বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে প্রশ্নটি অসাধারণ। আমি ওর প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে না পেরে চুপ করে বসে রইলাম আমার লেখার টেবিলে ভর দিয়ে। পরে বললাম, তোমার কথা ভাবছি। এই গাছগুলোকে দেখছি। আমার জবাব কি ঠিক ছিল? আমি নিজেই এর সঠিক উত্তর দিতে পারব না সম্ভবত।

**১৭/৯/১৯৯৬**

প্রায় চার বছর পর অভিনেতা আলমগীরের স্ত্রীর বাসায় গেলাম জোহরা এবং আমি। আলমগীরের সঙ্গে খোশনূরের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে সম্প্রতি, এ খবর আমার অজানা ছিল। শুনতে পেলাম বেতার বাংলায় কর্মরত কবি সালাহউদ্দিনের কাছে । খবরটি শুনে খারাপ লাগল। একটি সংসার ভেঙে গেলে কার না দুঃখ হয়? আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল খোশনূরের ছেলেমেয়ের মুখ। খুব হাসিখুশি, প্রাণবন্ত ওরা। বিশেষত তুলতুলের কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে সজীবতা এবং আন্তরিকতা সুপরিস্ফুট। সে যা ভাবে, তা-ই বলে ফেলে, কোনও কিছু আড়াল করে না। অন্তত চার বছর আগে আমার তা-ই মনে হয়েছিল।

এবার এই ভাঙা পরিবারটিকে দেখে কষ্ট হল। আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী খুব কম কথাই বললাম। সামান্য দু'চারটি বাক্য উচ্চারণ করে বেশিরভাগ সময় নিশ্চুপ থেকে ওদের কথাই শুনলাম। খোশনূর, মনে হল, তেমন মুষড়ে পড়েন নি, যদিও একবার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কথাটা অবিশ্যি আলমগীরকে কেন্দ্র করেই। এবারও আমাদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হল না। তুলতুল একগুচ্ছ রজনীগন্ধা দিয়ে স্বাগত জানাল আমাকে, জোহরাকে। ওর মা আমার জীবনসঙ্গিনীকে আলিঙ্গন করে পাশে বসিয়ে গল্প করলেন অনেকক্ষণ। খোশনূরের ছেলে, আলমগীরের চেয়েও লম্বা, অনেকগুলো ছবি তুলল আমাদের সবার। তুলতুল আমার সঙ্গে আলাদাভাবে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করল চার বছর আগের মতোই। আঁখি গান শোনাল ওর মধুর কণ্ঠে। তুলতুলের গানের কণ্ঠ নেই, কিন্তু ওর আচরণে, কথাবার্তায় এমন আন্তরিকতা এবং আলাদা ধরনের সৌন্দর্য আছে, যা খুবই আকর্ষণীয়।

খোশনূরের পাঠানো মোটরকারেই ওঁদের উত্তরার বাসায় গিয়েছিলাম, ফিরেও এলাম একইভাবে। খোশনূর এবং তাঁর ছেলেমেয়ের কল্যাণ হোক।

আলমগীরের প্রতি কেন জানি বিরূপ হতে পারি নি। মনোজগতের আনাচে-কানাচে এত কিছু ঘটে, এত রহস্য জমে ওঠে যে, চট করে কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে সবকিছু না জেনে কোনও রায় দেওয়া সমীচীন নয়।

**১৮/৯/১৯৯৬**

সকাল এগারোটায় বাংলা একাডেমীতে গেলাম অধ্যাপক মোহাম্মদ নোমানের স্মরণসভায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে। আমি স্মরণসভার সভাপতি। মনে পড়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই মোহাম্মদ নোমানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। বন্ধু আশরাফ আলির উদ্যোগেই মোহাম্মদ নোমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওঁরা দু'জন একই ক্লাসে পড়তেন। দু'জনই আজ মৃত। মোহাম্মদ নোমান একজন খাঁটি সজ্জন ছিলেন। এই স্বল্পভাষী অথচ হৃদয়বান মানুষটির সাহচর্য ভালো লাগত আমার। তিনি আমার কবিতার অনুরক্ত পাঠক ছিলেন এবং কবি জীবনের আদিপর্বের কবিতাবলির তারিফ করতেন সুনিশ্চিত ভাষায়। উৎসাহীত বোধ করতাম এই রোমান্টিক, প্রেমিক মানুষটির আলোচনা শুনে। তিনি নিজেও একটু-আধটু কবিতা লিখতেন। একবার আমাকে তাঁর একটি কবিতা শুনিয়েওছিলেন, মনে পড়ে।

মোসলেমা খাতুনকে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই স্নিগ্ধ, রুচিশীল ব্যক্তিটির বিবাহিত জীবন সুখময় ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। তা'বলে আমি তাঁকে বিস্মৃত হই নি কখনও। আশা করি, তিনিও আমাকে মনে রেখেছিলেন এবং আমার কবিতা পড়তেন। তবে দেখাশোনা তেমন হত না, টেলিফোনেও যোগাযোগ হত না। জীবন সম্ভবত এরকমই।

দুপুরে বাড়িতে ফিরে এলাম। আজকের দুপুর ও বিকেল কাটল গৌরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে। ওস্তাদ বেলায়েত খাঁর সেতারের সুরের মতো কেটে গেল সারা দুপুর এবং বিকেলের কিয়দংশ। গৌরীর সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল আমরা

দু'জন রমণে লিপ্ত। সংলাপও যে কখনও কখনও সঙ্গমতুল্য হয়ে ওঠে, আজ প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম।

সন্ধ্যাবেলা জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্রম ফিল্‌ম সোসাইটি আয়োজিত ঋত্বিক ঘটক বিষয়ক সেমিনারে অংশ নিলাম সভাপতি হিসেবে। মূল প্রবন্ধ পাঠ করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সুলিখিত, সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। আলোচনা করলেন আমাদের তানভীর মোকাম্মেল এবং জাহেদুর রহিম অঞ্জন। এই দু'জনের আলোচনা শুনে মনে হলে, আমাদের এখানকার চলচ্চিত্র-সমালোচনা অত্যন্ত পরিণত এবং ধনী।

২৪/৯/১৯৯৬

কোনও কোনও জায়গার প্রতি যে আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ থাকে। এই শহরের একটি বিশেষ স্থানের প্রতি আমার টান বেড়ে চলেছে। এজন্যে কিছু স্মৃতির প্রভাব রয়েছে আমার ওপর। সেই বিশেষ জায়গায় আজ সন্ধেবেলা আবার কিছুদিন পর গৌরী আর আমি মিলিত হয়েছিলাম। এখানেই আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। জায়গাটায় আরও লোকজন ছিল, কিন্তু কোনও হইচই ছিল না; পরিবেশটি ছিল প্রীতিকর, রুচিশীল। গৌরী আর আমি সাঁতার কাটছিলাম আনন্দ-সরোবরে। মনে হচ্ছিল, কতিপয় কোমল গাছ লতাগুল্মসহ নুয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নাময় জলে, কয়েকটি পাখি দোল খাচ্ছিল অদূরে আর দূর কোনও কুঞ্জবন থেকে ভেসে আসছিল বাঁশির সুর।

আমরা দু'জন দেখছিলাম একে অন্যকে। জীবনানন্দের কবিতা গুঞ্জরিত হচ্ছিল মনে, প্রাণে। ঘাই হরিণীর ডাক শুনতে পেলাম কি? নাকি কয়েকটি বুনোহাঁস প্রায় আমাদের ছুঁয়ে উড়ে গেল চলনবিলে? রাত্রি কি নড়ে উঠল খোঁপায় একরাশ নক্ষত্রের ফুল নিয়ে? হয়তো গৌরীর নরম, কালো চুলের ঝরনায় ঝিকিয়ে উঠল রূপালি নক্ষত্রের তোড়া?

১২/১১/১৯৯৬

বেশ কিছুদিন পর, প্রায় এক বছর পরই বলতে হবে, সেগুন বাগিচায় গেলাম। বাংলা একাডেমীতে সামান্য কাজ ছিল। সেই কাজ সেরে রওয়ানা হলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্দেশে। সেখানে ইলা মিত্র এসেছেন; তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আগেই জানিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম কর্মকর্তা এবং স্নিগ্ধ বুদ্ধিজীবী মফিদুল হক। ইলা মিত্র এবং তাঁর জীবনসঙ্গী রমেন মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কলকাতায় দু'জনেরই সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের বাসায়। রণেশদা' আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বাসস্থানে। সেই বিনীত দোতলার ঘরে চা-বিস্কুট খেয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে, তাঁদের আন্তরিকতায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন।

ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্রের সঙ্গে আমার কয়েকবারই দেখা হয়েছে। তাঁদের দু'জনকেই দেখেছি মুগ্ধতা নিয়ে, প্রীত হয়েছি তাঁদের কথা শুনে। এবার ইলা মিত্রকে আরও বেশি প্রাণবন্ত এবং স্নেহময়ী মনে হল। বাংলাদেশে এসে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন বিপ্লবী ইলা মিত্র। ধন্য হলাম। নাচোল, তেভাগা

আন্দোলন, এই আশ্চর্য সাহসিকতার সংগ্রাম, কারাগারে তাঁর শারীরিক নির্যাতন, ইলা মিত্র-বিষয়ক প্রতিভাবান কবি গোলাম কুদ্দুসের বিখ্যাত কবিতা একাকার হয়ে সেই মুহূর্তে আন্দোলিত করল আমাকে। মনে হল, ইতিহাস আর বিপ্লবের আলিঙ্গানে আবদ্ধ হলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ইলা মিত্র, কমিউনিস্ট নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কমরেড ফরহাদের স্ত্রী, আক্কু চৌধুরী, সারা যাকের এবং মফিদুল হকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম, শুনলাম বেশি। যাওয়ার আগে ইলা মিত্র তাঁর পুষ্পস্তবকটি আমাকে উপহার দিলেন। আমি বাংলা একাডেমীতে প্রাপ্ত আমার পুষ্পস্তবকটি তাঁর হাতে অর্পণ করতে পেরে ধন্য হলাম। তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করলেন।

## ॥ পঁচাত্তর ॥

ভাবি নি, কখনও আত্মজীবনী লিখতে হবে। তাই, অনেকের মতো খাতার পর খাতা ভরিয়ে রাখব প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনায়। আমি এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নই যে, আমার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কখনও কোনওকালে কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে জানাতে হবে। সত্যিই তো, কে আমি? আমার গুরুত্ব কতটুকু এই সমাজে? তবে আমার জীবনের শেষপর্যায়ে ক'জন বন্ধুবান্ধব আমাকে প্ররোচিত করলেন এই কাজটি করার জন্যে। বিশেষ করে শিশু-সাহিত্যিক এবং দৈনিক জনকণ্ঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক এখলাস উদ্দিন আহমদ-এর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে 'কালের ধুলোয় লেখা' শীর্ষক আত্মজীবনী লিখতে শুরু করি। অবশ্য সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ এবং উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান-এর সানন্দ সম্মতি না থাকলে 'কালের ধুলোয় লেখা' সম্ভবত অলিখিত থেকে যেত। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেইসব চেনা এবং অচেনা পাঠক-পাঠিকার কাছে, যাঁরা আমার এই লেখা পড়েছেন এবং প্রায়শই তারিফ করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

কিছুদিন থেকে 'কালের ধুলোয় লেখা'র সাপ্তাহিক কিস্তি দিতে কখনও-কখনও আলসেমিকে প্রশ্রয় দিয়েছি, তখন কবি এবং দৈনিক 'জনকণ্ঠ'-এর অন্যতম সহকারী সম্পাদক নাসির আহমেদ আমার কাছ থেকে লেখা আদায় করার জন্যে জোঁকের মতোই আমার সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন। আশা করি, আমার এই উক্তির জন্যে তিনি অপ্রসন্ন হবেন না। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

যা হোক, 'কালের ধুলোয় লেখা' আমি এই কিস্তির সঙ্গেই শেষ করছি। এজন্যে নয় যে, লিখতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আসলে আমার জীবনের এমন কোনও অংশ নেই, যা এই লেখায় যুক্ত করা যায় বর্তমান অধ্যায়টির পর। পুনরুক্তি নিশ্চয়ই বরদাশ্ত করবেন না কোনও পাঠক-পাঠিকা। আর যা কিছু লেখা দরকার, তা এই অধ্যায়তেই শেষ হয়ে যাবে।

'দৈনিক বাংলা' থেকে পদত্যাগ করার পর আমি চাকরিহীনতা কিছুদিন সানন্দে উপভোগ করি। কিন্তু এমন একজন মানুষ, যে সংসারী, যার ক'জন পুত্রকন্যা বিদ্যমান, তার পক্ষে টাকাপয়সা রোজগার না করে গত্যন্তর নেই। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যে মেতে

ওঠা আমার সাধ্যাতীত, তাই চাকরিই করতে হবে আমাকে। কিছুদিন বেকার থাকার পর চাকরি জুটে গেল একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকায়। পত্রিকাটির নাম 'মূলধারা'। এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সাবের হোসেন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বেনজির আহমদ এবং সম্পাদক আমি। 'মূলধারা' একটি উন্নতমানের সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। এই পত্রিকায় নামজাদা লেখকদের লেখা তো প্রকাশিত হতই, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধও মুদ্রিত হত। আমি প্রতি সপ্তাহে একটি কলাম লিখতাম। সবিনয় নিবেদন করি, আমার কলামগুলো অন্য লেখকদের রচনাবলির সঙ্গেই পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়েছিল। তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, 'মূলধারা' দেড় বছরের বেশি টিকে থাকতে পারে নি।

'মূলধারা'র পর সাবের হোসেন চৌধুরী প্রকাশ করেন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউ পেপার'। যতদূর মনে পড়ে, সম্পাদকীয় কাঠামো 'মূলধারা'র অনুরূপ ছিল। আমি এই পত্রিকায় নিয়মিত সাপ্তাহিক কলাম লিখতাম। কলামের নাম ছিল 'ভয়েজ উইদিন'। আমার এই কলাম কী মানের ছিল, তা বলতে পারেন তখনকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ। দুঃখের বিষয়, 'নিউ পেপার' সাপ্তাহিকটিও দীর্ঘজীবী হয় নি। এরপর দীর্ঘ বেকারত্বের পালা। আজ অব্দি চাকরিবিহীন, ব্যবসাবর্জিত। এখনও চাকরি করা সম্ভব হয়তো, কিন্তু ব্যবসা নৈব চ, নৈব চ। এখনও কোনওভাবে সংসার পালন করে চলেছি কলমকে সচল রাখতে পেরেছি বলে। প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই, দৈনিক 'জনকণ্ঠ'-এর সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ যদি আমাকে প্রীতিমুগ্ধ ব্যবহারে ধন্য না করতেন, তা হলে আমার জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত, হয়তো কালো মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলত আমাকে। উপরন্তু 'জনকণ্ঠ'-এর বেশ ক'জন সাংবাদিকও আমাকে পছন্দ করেন, বিশ্বাস করি।

আগেই লিখেছি, রোজনামচা লেখার অভ্যাস আমার কোনওকালেই গড়ে ওঠে নি। এর ফলে লোকসান হয়েছে আমার। না, টাকাপয়সা খোয়া যায় নি, হারিয়ে গেছে অনেকদিনের অনেক ঘটনা। সেসব দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ হলে কোনও বিশেষ ঘটনার বিবরণ খুঁজে বেড়াতে হত না ব্যাকুল হয়ে, ব্যর্থতায় মুষড়ে পড়ার হাত থেকেও রক্ষা পেতাম। যে-সব ঘটনার কথা হারিয়ে ফেলেছি সেই সবই যে গুরুত্বহীন ছিল এমন তো নয়। বিস্মৃতি সম্ভবত কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। সেসব ঘটনা, নানা জনের নানা বক্তব্য আমার মনোজগতে জ্বলজ্বলে হয়ে থাকত, সেগুলো অনেককে শোনাতে পারলে মানসিক তৃপ্তি হত আমার। আমি সেই তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হলাম। যা হোক, এই তো দু'দিন আগে খুঁজে পেলাম ২০০২ সালের একটি ডায়েরি। না, সেই ডায়েরি পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে পারি নি। উলটেপালটে, তন্নতন্ন করে দেখলাম মাত্র একটি পাতায় কতিপয় পঙ্‌ক্তি লেখা হয়েছে —

**৪/৬/২০০২**

বুয়েটের ছাত্রী 'মুমু' তাদের বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হত্যার বিচার এবং একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে জামাতের মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী

আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ-এর মন্ত্রিত্ব, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক জান্তার সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতা, বাঙালি নিধনে তৎপরতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উৎকৃষ্ট সম্পাদকীয় লিখেছিল। সেই রচনায় সত্যের ঔজ্জ্বল্যে জোট সরকারের একজন মন্ত্রী এবং ছাত্রদলের সদস্যবৃন্দ সভায় খেপে ওঠে। জনাব মন্ত্রী তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ম্যাগাজিনটি ছুড়ে ফেলে দেন।

'মুমু'কে সেই সম্পাদকীয় বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ 'মুমু' তাদের অন্যায় নির্দেশের কাছে মাথা নত করে নি। খবরের কাগজে এই খবর এবং শাহরিয়ার কবির-এর একটি লেখা পড়ে 'মুমু'কে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম মনে মনে। কিন্তু বুয়েটে ছাত্রদল এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যে, 'মুমু'কে বুয়েটের ক্যাম্পাসে আসা বন্ধ করতে হল।

ইউকসু ও বুয়েট কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের ক্রীড়নক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী তৎপরতার অংশীদার হওয়ায় ইউকসু থেকে পদত্যাগ করেছে ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী ও ইউকসুর নির্বাচিত বার্ষিকী সম্পাদক তাবাস্সুম মাহযাবীন 'মুমু'।

ছাত্রলিগ নেতা পলাশ এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদলে যোগ দেয় এবং তাদের সঙ্গে একটি আপত্তিকর যৌথ বিবৃতিতেও সই করে। কোন পরিস্থিতিতে কে যে কী করে ফেলে, তা বোঝা মুশকিল। কখনও কখনও আদর্শবান যুবক পরিস্থিতির শিকার হয়ে এমন কাজ করে বসে, যা ওকে পতনের কাদায় ডুবিয়ে দেয়।

জানি না, সেই পতিত ছাত্রলিগ নেতার পরিণাম কী হয়েছে। সে কি আখেরে অন্ধকারেই শিকার হয়েছে? কে আমাকে বলে দেবে? দীপ্তিময়ী 'মুমু' কি বুয়েটে যেতে পেরেছিল ফের, হাসিল করতে পেরেছিল তার কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রি? আজ অব্দি জানা হয় নি আমার। জানতে ভারি ইচ্ছে করে। সে কি সব রকমের বাধা উজিয়ে, বহুরূপী ভয়ঙ্কর দেয়ালগুলি ডিঙিয়ে পৌঁছতে পেরেছে পূর্ণিমার মতো সাফল্যে, যা জীবনকে সার্থক করে তোলে? আমি তার জ্বলজ্বলে সাফল্য, সার্থক জীবন কামনা করি। সে সকল অবিচার, অন্যায়, বিপদ পদাঘাতে নিশ্চিহ্ন করে এগিয়ে যাক, এ আমার একান্ত কামনা। যদি কোনও প্রগতিশীল ব্যক্তি আমার এই লেখা পড়েন, 'মুমু'র জীবনে কী ঘটেছে, তা জানেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করে টেলিফোন করে অথবা ছোটো একটি চিঠি লিখে আমাকে জানিয়ে দেন, তাহলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

'মুমু' কি আমার এই 'কালের ধুলোয় লেখা' পড়ে? যদি ওর দৃষ্টিগোচর হয় আমার আজকের লেখা, সে কি আমাকে ওর প্রতিক্রিয়া জানাবার মতো কষ্টটুকু স্বীকার করবে? ওর কথা জানতে এতকাল পরেও খুবই ইচ্ছে হয়।

অথচ আমাদের কত ইচ্ছেই অপূর্ণ থেকে যায়। এই যে আমি 'কালের ধুলোয় লেখা' যে-ভাবে লিখতে চেয়েছিলাম, যে ভাবে আমার জীবন, যত মামুলিই হোক, তুলে ধরতে চেয়েছিলাম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে, তা কি পেরেছি? সবচেয়ে বেশি এবং সত্য বলে নিজে জানি, আমি পারি নি, ব্যর্থ হয়েছি। অনেক কিছুই বলা হয় নি, এ কথা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানেন না। ইচ্ছেকে খর্ব করে যে আমি ব্যর্থ হয়েছি, তা নয়। স্মৃতি আমাকে ঠকিয়েছে, বিস্মৃতি অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। আমি শুধু কলম হাতে বসে

থেকেছি, চোখ মেলে দিয়েছি খোলা বারান্দায়, বেশিরভাগ আকাশের দিকে। অনেক কথাই বলা হল না, এই আক্ষেপ আমার রয়েই যাবে। বেশ ক'জন কাছের এবং দূরের আত্মার আত্মীয়ের কথা হরহামেশা আবেগকে আলোড়িত করে। তা-ও হয়তো ভালো করে বলতে ব্যর্থ হলাম।

এই সামান্য আত্মজীবনী লেখায় ইতি টানার সময় খেদ রয়ে গেল যে, বেশকিছু কথা অ-লেখাই থেকে যাবে। আফশোশ এই জন্যে যে, স্মৃতিপটের বেশকিছু অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। লিখতে আমার তীব্র ইচ্ছে হয়েছে, অথচ বিস্মৃতি আমাকে ভারি দাগা দিয়েছে। আরও একটি ভাবনা রয়ে গেল — আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু মৃত্যুর পর আমার পরিবার পরিজনদের জীবনে কী ঘটবে, আমি তা জানব না। জানব না আমার স্ত্রী জোহরা, পুত্র ফাইয়াজ, পুত্রবধু টিয়া, তাদের দুই মেয়ে নয়না এবং দীপিতা — এদের কী হবে ভবিষ্যতে। আমার তিন মেয়ে সুমি, ফাওজিয়া, শেবা এবং তাদের স্বামী ও সন্তানদের জীবনধারা কেমন হবে। আমার ভাই-বোনদের ভবিষ্যতও আমার অজানা থাকবে। তাদের সবার কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক বন্ধুবান্ধবের, দেশবাসীর — এই কামনা করে আমার সামান্য আত্মজীবনীর বিবরণে ছেদ টেনে দিচ্ছি।

# উপন্যাস



# অক্টোপাস

চেয়ারে হেলান দিয়ে ইশতিয়াক একটু হাসল। এখন সে অবসন্ন। ক্লান্তির কুয়াশা তার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই অবসাদ স্নায়ুকে তেমন বিপর্যস্ত করে না, বরং উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এ জন্যেই কি হাসল ইশতিয়াক? এই অবসাদ উপভোগের কথা ভেবেই কি তার ঠোঁটে জেগে উঠেছে হাসির কুঁড়ি? না। ইশতিয়াক মৃদু মৃদু হাসছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। এই মাত্র একটি উপন্যাস শেষ করেছে সে। অনেকদিন ধরে লিখছিল, প্রায় তিন বছরের শ্রমে গড়ে উঠেছে রাশি রাশি অক্ষরের একটি ভুবন। ইশতিয়াকের মনোজ ভুবন। হ্যাঁ, ইশতিয়াক হোসেন একজন লেখক। হেঁজিপেঁজি কেউ নয়। ইতোমধ্যেই তার বেশ নাম-ডাক হয়েছে। ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্নই,বলা যায়। খুব বেশি রগড়াতে হয়নি তাকে, প্রকাশকদের দোরে ধরনা দিতে দিতে জুতোর সোল ক্ষয় করেনি সে। একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিকের ইদ সংখ্যায় তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন প্রকাশক ইশতিয়াক হোসেনের লেখা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য রীতিমতো ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। খুব কম লেখকের বেলায় এ রকমটি হয়। এখন সে নামজাদা লেখক। রুচিশীল পাঠকগোষ্ঠী তার লেখা পছন্দ করে। সমালোচকদেরও নেক নজর পড়েছে তার ওপর। কিন্তু ইশতিয়াক হোসেনকে কিছুতেই জনপ্রিয় বলা যাবে না। তিরিশ দিনে তিনটি উপন্যাস লিখে ফেলার তেলেসমাতি ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মায়নি।

ইশতিয়াক হোসেন চটজলদি কিছু লিখতে পারে না, মানে বলামাত্রই উপন্যাস তৈরি করে ফেলল চারপাঁচদিনের মধ্যে, এমন লেখক সে নয়। সে লেখে খুব আস্তে-সুস্থে, ভেবে-চিন্তে। পাঠকের হাতে চুষিকাঠি ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে তার নেই। উপন্যাসের শেষ পাতার অন্তিম লাইনটি পড়েই পাঠক গোটা উপন্যাসটি বেমালুম ভুলে গেল, এমন পরিণামহীন কাহিনি বুনে কী লাভ? কী লাভ পাঠকের কোনো কোনো ইন্দ্রিয়ে খানিক সুড়সুড়ি দিয়ে, দু'চারটি প্যাঁচপ্যাঁচে অধ্যায়ে জুড়ে দিয়ে উপন্যাসের অঙ্গে? মোদ্দা কথা, পাঠক-ঠকানো লেখা ইশতিয়াক হোসেন লিখতে চায় না। এ ধরনের লেখকের অভাব নেই দেশে, সে-দলে ভিড়ে গেলে নগদমূল্য প্রচুর মিলতে পারে। যেমন-তেমন রগরগে একটি কাহিনি ফেঁদে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু ইশতিয়াক হোসেনের দৃষ্টি নিবদ্ধ উঁচু দরের সাহিত্যিকদের ছোটো কাতার।

নিজের উপন্যাসের ভালোমন্দ নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না ইশতিয়াক হোসেন। এই মুহূর্তে যে সে হাসল তা বাজারু উপন্যাসের কথা ভেবে নয়; একটি উপন্যাস লেখা শেষ করতে পারার তৃপ্তিজনক হাসিও এটা নয়। তার ঠোঁটে হাসি খেলে গেছে আলাদা কারণে, যা' অন্য কেউ শুনলে ফিক করে হেসে ফেলবে। নিজের সদ্যসমাপ্ত উপন্যাসটির

নায়িকার প্রেমে পড়ে গেছে ইশতিয়াক হোসেন। লোপাকে সে তিলোত্তমা করেছে। এই অক্ষর-প্রতিমা গড়ে তোলার জন্যে সে নিজেকে ক্ষইয়ে দিয়েছে অনেকখানি। কত খাদ্যবিহীন প্রহর, কত বিনিদ্র রাত সে লোপাকে উপহার দিয়েছে, কে তার খবর রাখে। তিন বছর ধরে তিল তিল করে লোপাকে সে নির্মাণ করেছে। সে জানে, লোপা কোন্ ছাঁদের চুল বাঁধে, কীভাবে শাড়ি পরে, তার উরুর কোন জায়গায় একটা তিল আছে, বাথরুমে গায়ে পানি ঢালার সময় লোপা কী ভাবে। হ্যাঁ, ইশতিয়াক হোসেন লোপা বিষয়ে সবকিছু জানে। সে লোপাকে মুখস্থ করে ফেলেছে তিনবছর ধরে। পিগমেলিয়ানের গল্প মনে পড়ে যায় ওর। গ্রিকপুরাণে কথিত সেই প্রতিভাবান ভাস্কর আর তার মর্মরমূর্তির প্রেমকথা। ইশতিয়াক ভাবে, এ এক মোহন কৌতুক যে, সে নারীবিদ্বেষী ভাস্কর। কিন্তু এক রমণী মূর্তিই গড়ল তার আশ্চর্য দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধ দিয়ে। স্বনির্মিত মূর্তি ভাস্করের মন থেকে ওর হৃদয়ে নারীবিদ্বেষ মুছে ফেলে নিমেষে। ওর হৃদয়ে ভালোবাসা গোলাপের মতো ফুটে ওঠে। পিগমেলিয়ান, সদ্যপ্রেমিক ভাস্কর, অনিন্দ্যসুন্দর মর্মরমূর্তিকে আলিঙ্গন করে, চুমু দেয় বারবার, যেন মূর্তির বাহু, বুক, ঠোঁট পাথরের নয়। তাঁর ভালোবাসা এবং প্রেমের দেবী ভেনাসের দাক্ষিণ্যে পাথরের মূর্তির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তার শরীরে খেলে যায় মানবিক উষ্ণতা, শিরায় বয় শোণিতধারা।

উপন্যাসটি শেষ করবার পর ইশতিয়াক হোসেনের মনে একটি মিশ্র অনুভূতি হয় — শেষ করতে পারার আনন্দ এবং শেষ হয়ে যাবার বিষাদ। লোপাকে সে ভুলতে পারছে না, কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না মন থেকে। এইতো লোপা দাঁড়িয়ে আছে তার লেখার টেবিলের ধার ঘেঁষে। লোপার পিঠছাওয়া চুল স্তব্ধ ঝরনার মতো, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে যৌবনের আলোয়।

'কীগো, এরই মধ্যে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে চাও', লোপার কণ্ঠে কৌতুকের সুর।

ইশতিয়াক হোসেন চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু হাসল। বোকারা বোধহয় এরকমই হাসে। কী বলবে সে লোপাকে? কোনো জবাব এই মুহূর্তে তৈরি করতে পারলো না। অনেক সংলাপ সে রচনা করেছে, কিন্তু লোপার প্রশ্নের জুতসই কোনো উত্তর খুঁজে পেল না, তাই কোনো সংলাপ রচিত হলো না। ইশতিয়াক আমতা আমতা করে, তার গলা থেকে অস্ফুট যে আওয়াজ বেরুলো তাকে কোনো অর্থপূর্ণ বাক্য বলা চলে না। তাই হাসল সে। তার সেই হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটি অসহায়তা থেকে যায়। লোপা দাঁড়িয়ে থাকে তার মুখোমুখি। লোপার নখ খাওয়ার অভ্যাস। এখন একটা নখ ওর ঝকঝকে দাঁতের চমৎকার আদর খাচ্ছে। না, লোপা কিছুতেই ইশতিয়াক হোসেনের এই ছোটো ঘর ছেড়ে যাবে না। এখানেই সে গান গাইবে, ক্যাসেট প্লেয়ার বাজাবে, যখন খুশি আঙুল চালিয়ে দেবে ইশতিয়াকের চুলের জঙ্গলে।

কিন্তু ইশতিয়াক লোপার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারছে কই? সেও তো আঁকড়ে ধরতে চায় লোপাকে, যেমন তার উপন্যাসের নায়ক চেয়েছিল। অথচ শেষ পর্যন্ত পারেনি। পারবে না ইশতিয়াকও। পারবে না যে, একথা খোদ ইশতিয়াক হোসেনের চেয়ে বেশি

কেউ জানে না। সে, লেখক ইশতিয়াক হোসেন, হাসে একটু আলতোভাবে। লোপার বিচ্ছেদ তার কাছে আজ অসহ্য ঠেকছে প্রতি মুহূর্তে, অথচ সে ভালো করেই জানে যে, কয়েক দিন পর তাকে ছুটতে হবে অন্য এক নায়িকার সন্ধানে। হয়তো আগের চেয়ে অনেক বেশি যত্ন করে বানাবে আরেক প্রতিমা, যে আগাগোড়াই অক্ষর-নির্ভর। শব্দপুঞ্জের আড়ালে ফুটে ওঠে যার রূপ। সেই প্রতিমার আদল হয়তো বাস্তব থেকে নেয়া, কিন্তু কল্পনার মায়া থাকবে তাতে এবং সে অন্য বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। দিন নেই, রাত নেই, কখনো কখনো নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত নেই—সেই নায়িকা তাকে দখল করে রাখবে সারাক্ষণ। তখন একটু একটু করে দূরে সরে যাবে লোপা নাম্নী তরুণী। তার কথা হয়তো কোনোদিন মনেও পড়বে না আর। পড়লেও তার মনকেমন করবে না এখনকার মতো।

একসময় চেয়ার ছেড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় ইশতিয়াক। এরই মধ্যে ওর স্ত্রী, ইয়াসমিন, ঘুমে কাদা। ঘুমন্ত ইয়াসমিনের নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। ইশতিয়াক স্ত্রীর দিকে তাকায়। এই মধ্য রাতে নির্ঘুম স্বামীর মনে কোন্ ছবি ভেসে উঠেছে, কী কথামালা লীলায়িত হচ্ছে তা ইয়াসমিন জানে না। নিশ্চিত মনে ঘুমোচ্ছে, যেন পৃথিবীতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, দুঃখ নেই, বেদনাবোধ নেই। কোমল কোনো প্রাণীর মতো এখন সে ঘুমিয়ে আছে। যদি ইশতিয়াক এ মুহূর্তে ওকে জাগিয়ে তোলে, তাহলে ইয়াসমিন ভীষণ চটে যাবে, নির্ঘাৎ বলে বসবে 'রাতে যে একটু শান্তিতে ঘুমোবো, তারও জো নেই।' বিছানা ছেড়ে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে ইশতিয়াক, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে এলেবেলে চোখ বুলোয়। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটি পড়তে গিয়ে কেন যেন হোঁচট খায়, বাক্যটি অনিবার্য ঠেকে না ওর কাছে, একটা খুঁত থেকে গেছে বলে মনে হয়। আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বল পেন দিয়ে বাক্যটির ওপর সার্জারি চালায়, কিছুক্ষণ পর কাটা শব্দগুচ্ছের জায়গায় ঠাঁই পায় ভিন্ন শব্দাবলি।

'এবার ঘুমোনো দরকার,' ইশতিয়াক নিজেকে শুনিয়ে-শুনিয়ে উচ্চারণ করে। রাত অনেক হয়েছে, এখন না ঘুমোলে সারারাত হয়তো আর ঘুমই হবে না। না ঘুমোতে পারলে ভোরবেলা চোখ জ্বালা করবে, মাথা ধরে থাকবে সারাদিন। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে কী যেন ভাবে সে, তারপর ঢক ঢক করে সবটুকু পানি খেয়ে ফেলে। আঃ, ওর অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আরামসূচক শব্দটি।

'লোপা, তুমি আমাকে ঘুমোতে দাও লক্ষ্মীটি। অমন করে তাকিও না আমার দিকে। আমার এখন ঘুমোনো দরকার'; সাহিত্যিক ইশতিয়াক মিনতি জানায় তার অক্ষরপ্রতিমাকে। প্রতিমা অনড়, নাছোড়। উপায়ান্তর না দেখে ইশতিয়াক বাতি নিভিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয়। লেখার টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে লোপা ঠিক ইশতিয়াক আর ইয়াসমিনের মাঝখানে শুয়ে পড়ে নির্দ্বিধায়। মধ্যবর্তিনী লোপার কাণ্ড দেখে ইশতিয়াক হকচকিয়ে যায়। যদি এই মুহূর্তে ইয়াসমিনের ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ইয়াসমিনকে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে, ইশতিয়াক ভাবে। কিন্তু একটু পরেই হাসি পায় ওর। এসব কী ভাবছে সে? লোপা। একটা ছায়া বৈতো নয়। ওকে নিয়ে বিব্রত হওয়ার কী আছে? ভাস্কর পিগমেলিয়ানের সেই মর্মরমূর্তির মতো লোপা কোনোদিনই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে না। লোপা চিরদিন মিশে থাকবে রাশি রাশি নীরক্ত অক্ষরশয্যায়।

অন্ধকারে মেঘ গণনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে ইশতিয়াক, তারপর একসময় ঘুমের স্রোতে ভেসে যায়। ঘুম ওকে ছায়াবিলাসের মোহ থেকে মুক্তি দেয়।

গভীর এক অরণ্যে সে প্রবেশ করেছে। বড়ো বড়ো গাছ, জটিল ঝোপঝাড় আর লুকিয়ে থাকা পশুপাখি ছাড়া চারধারে কিছু নেই। একটা হরিণ, ইশতিয়াক লক্ষ করে, লতাজাল থেকে নিজের শিং ছাড়িয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও সফল হচ্ছে না; সুদৃশ্য নকশার মতো শিং জোড়া আরো বেশি জড়িয়ে যাচ্ছে নাছোড় লতাপাতায়। অদূরে আগুন রঙের বাঘ হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে অপেক্ষমাণ। ইশতিয়াকের গায়ে মধ্যযুগীয় নাইটের মতো বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে তীক্ষ্ণ বল্লম। সে বল্লম উঁচু করে বাঘের দিকে তাক করে, কিন্তু বল্লম কিছুতেই হস্তচ্যুত হচ্ছে না। জ্বলজ্বলে বাঘ নির্ঘাৎ হরিণটাকে সাবাড় করে ফেলবে চোখের পলকে। হরিণের শোচনীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ করার আগেই ইশতিয়াক নিজেকে একটা প্রাচীন প্রাসাদের ভেতর দেখতে পেল। ইতোমধ্যে নাইটের পোশাক-আশাক কোথায় খসে পড়েছে, সে টের পায়নি। এখন তার পরণে থ্রি পিস স্যুট। খয়েরি রঙের স্যুট। কিন্তু গলায় টাই নেই। পায়ে একজোড়া জীর্ণ জুতো, মাথায় রুমি টুপি। সে এগিয়ে যাচ্ছে একটা বিরাট সোনার পালঙ্কের দিকে, যেখানে এক বৃদ্ধ রাজা শুয়ে আছেন প্রাচীন তরবারির মতো, মখমলে আবৃত।

বৃদ্ধ রাজা অসুস্থ। বার্ধক্য জনিত ব্যাধিতে ক্ষয়িত তিনি। স্বপ্নাদ্য ফল খেলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ইশতিয়াকের হাতে একটি আপেল। এই আপেলের মাংস রাজার জঠরে গেলেই সুনিশ্চিত তাঁর আরোগ্যলাভ। ইশতিয়াক আপেলটি বৃদ্ধ রাজার দিকে বাড়িয়ে দেয় সযত্নে, মুক্তিফল দেখে বৃদ্ধ রাজা লোলুপ হয়ে ওঠেন, জীবনতৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর, —ইশতিয়াক অনুভব করে। বৃদ্ধ রাজার নিষ্প্রভ চোখে লোভ, ওষ্ঠে লোভ, শুকনো জিভে লোভ, চোয়ালে লোভ। হঠাৎ কে ছোঁ মেরে আপেলটা নিয়ে দৌড়ে পালায় ইশতিয়াককে স্তম্ভিত করে। ওর মনে হল, পলাতকা লোপা। লোপার এই অদ্ভুত আচরণে ইশতিয়াকের ভীষণ রাগ হয়। সে লোপার পিছনে ছুটে যায়। লোপা তার আয়ত্তে, কিন্তু ওর হাতে আপেল নেই; কী একটা প্রাণী ওর করতলগত। প্রাণীটিকে দেখে ঘেন্না লাগে, অথচ লোপা দিব্যি সেটি হাতে নিয়ে খেলছে।

'লোপা তুমি এমন করলে কেন?'—ইশতিয়াকের রাগী প্রশ্ন।

'আমার ইচ্ছা, আমার মর্জি। তুমি বলবার কে?'

'আমি তোমার কেউ নই?

'না'।

ইশতিয়াক বুঝতে পারে যে, সে স্বপ্ন দেখছে। সে বেশ বুঝতে পারছে যে, এখন সে ছায়ার জগতে পর্যটক। তবু সে বিরূপ হয়ে ওঠে লোপার প্রতি। কড়া কিছু বলবে বলে সে লোপার দিকে, গরগরে দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু লোপা গরহাজির। লোপার হাতের সেই বিচ্ছিরি প্রাণী, ছোটো আর পিছল, লাফাতে লাফাতে একটা করোটি হয়ে যায়। করোটির শব্দহীন হাসিতে চমকে ওঠে ইশতিয়াক। ভয় পায়, যদিও সে জানে সে আসলে একটা স্বপ্নের ভেতরে সে আপাতত বসবাস করছে। কিন্তু ভয় তাকে জড়িয়ে ধরেছে নিষ্ঠুর বেষ্টনীর মতো। চেঁচিয়ে উঠতে চায় সে, কিন্তু গলা থেকে কিছুতেই আওয়াজ বেরুচ্ছে

না। ওর গলার ভেতর, ইশতিয়াকের মনে হয়, একটা পাখির ছানা চিঁ চিঁ শব্দ করছে। ইয়াসমিন ওকে ডাকে। ইয়াসমিন এখন জলবালা আর সে নিজে সমুদ্রতীরে শায়িত, ঢেউ গড়িয়ে পড়ছে ওর ওপর, বার বার। ইয়াসমিনের ডাকে সাড়া দেবার মতো শক্তি তার নেই, আগ্রহ নিবুনিবু। ইয়াসমিনের নাভিমূল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত চকচকে মাছ। এবারও ইশতিয়াক ভয় পায়। অন্য ধরনের ভয়, হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য কিছু দেখে ফেলার পর মানুষের মনে বিস্ময়-মিশ্রিত যে ভয় সঞ্চারিত হয়। ইয়াসমিনের মুখ, ইশতিয়াক লক্ষ করে, ইয়াসমিনের নিজের মুখ নয়। অন্য কারো মুখ। এই মুখ কি ইশতিয়াক কোথায় দেখেছে এর আগে? ইয়াসমিনের এই নতুন মুখ, যা আদতে ইয়াসমিনের নয়, সে আগে কখনো দেখেছে বলে তার মনে পড়ছে না। মনে হয়, বেশ কিছুকাল আগে দেখা কোনো ক্যালেন্ডার সুন্দরীর বিজ্ঞাপনী মুখশ্রীর কিছু আদল এই মুখে রয়েছে, কিন্তু তা স্পষ্ট কিছু নয়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ইয়াসমিন অথচ-ইয়াসমিন নয় মেয়েটি। হঠাৎ মেয়েটির ব্রা-বিহীন ব্লাউজ ছিঁড়ে যায়, উন্মোচিত হয় মারলিন মনরোর স্তন, সেই উন্মোচিত স্তনযুগল যে মারলিন মনরোর, এটা হলফ করে সে বলতে পারবে না। তবে তার মনে হচ্ছে, এ ধরনের বুক মনরোরই হতে পারে। মেয়েটি, যে ইয়াসমিন নয় আর, কার যেন পা ধোয়াচ্ছে পেতলের বদনা দিয়ে। ইশতিয়াকের আব্বার পায়ে গড়িয়ে পড়েছে পানি। পিতার মুখ এক লহমায় যেশাসের মুখ হয়ে যায় কী করে? যেশাসের মুখ পর্সেলিনের।

একজন বাউল একতারা বাজাতে বাজাতে চলেছেন, ইশতিয়াক দেখতে পায়। বাউল যেন 'একদিনও না দেখিলাম তারে' গাইছেন। এক সময় ইশতিয়াকও গান ধরে। ভারি সুন্দর একটা গান। ইশতিয়াকের গলাও চমৎকার খুলেছে; তার নিজের কাছেই নিজের কণ্ঠস্বর খুব মধুর মনে হল। অথচ তার গলা আদপেই গানের নয়। সে বাথরুম-গায়ক বটে, কেই-বা নয়। কিন্তু স্বপ্নের খোলা প্রান্তরে সে নিঃসন্দেহে কিন্নরকণ্ঠের অধিকারী একজন।

ইশতিয়াক হোসেন তার নিজের গ্রামের পুকুরঘাটে। পিতৃপুরুষদের তৈরি মসজিদের লাগোয়া পুকুর। মাছময় অগভীর পুকুর। ইশতিয়াক দেখে, গাছতলায় এডগার এ্যালেন পো আর বোদলেয়ার জোর আড্ডা দিচ্ছেন। পো'র পরনে ফতুয়া আর চুড়িদার পাজামা, বোদলেয়ারের কাশ্মীরী পাঞ্জাবী আর ট্রাউজার। বোদলেয়ার একটা আম চুষে চুষে খাচ্ছেন বালকের মতো আর পো বাজাচ্ছেন আম আঁটির ভেঁপু। পুকুর থেকে বিকট এক জলচর প্রাণী উঠে এসে, বলা-কওয়া নেই, গিলে ফেলল এডগার এ্যালেন পো আর বোদলেয়ারকে। ইশতিয়াক আবার ভয় পায়। শরীরময় কম্পন অনুভব করে সে, দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে প্রাণপণে; কিন্তু ওর পা দুটো কিছুতেই নড়তে চায় না। কে যেন ইশতিয়াকের পা মাটিতে পুঁতে দিয়েছে।

ইশতিয়াকের আব্বা, আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন, দ্রুত হেঁটে চলেছেন হাটের দিকে। তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে পুত্রকে ডাকছেন ইশারায়। সে যেতে চায়, অথচ পা বাড়তে পারে না। আব্বা না ইন্তেকাল করেছেন সাত বছর আগে? স্বপ্নের ভেতরেই ইশতিয়াকের জিজ্ঞাসা— যিনি মরহুম, তিনি ডাকবেন কী করে? ইশতিয়াক দেখে, তার আব্বা বাজারে

মাছ কিনছেন। ইশতিয়াক বালক, শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরা। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক দেখে দশ বছরের বালককে, দারুণ কৌতূহলবশে। বালক বৈশাখী ঝড়ে আম কুড়ায়, দীঘিতে সাঁতার কাটে, শহুরে ছাদে বসে বহুরূপী মেঘ দেখে, দেখে চৈত্রসংক্রান্তির আকাশজোড়া ঘুড়ি। বালক দেখে, একটা আদ্যিকালের বটগাছের নীচে ক'জন লোক ব'সে আছে। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। কারো গাল দিব্যি কামানো, কারো গালে চার-পাঁচদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওদের হাতে ছিলিম। বালক সেই আসরে প্রবেশ করতে চায়, লোকগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখার সাধ প্রবল হয়ে ওঠে ওর মধ্যে। সে এগোতে থাকে; ওকে এগোতে দেখে একজন খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলে, 'ভাগ এহান থন'। ধমকের ধাক্কায় সে থমকে দাঁড়ায়। আরেকজন,যার চোখ দুটো বেশ ঢুলু ঢুলু, 'আবে এমন করস ক্যান, আইবার দেনা বাচ্চাটাকে। ভালো সবক দিয়া দিমু।' বালকের ভালোই লাগে সেই লোকটাকে, লোকটার মায়াদরদ আছে।

বালক আবার নিমেষে পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকে রূপান্তরিত হয়। সেই ঢুলু ঢুলু চোখ-অলা লোকটার হাত থেকে ছিলিম নিয়ে জোরে টান দেয়, সুখটান। ছিলিম কখন চায়ের কাপ হয়ে গেছে, সে টের পায়নি।

কয়েকটি বিড়ালছানা তার চারপাশে ঘুরঘুর করে। বেড়ালছানাগুলি মিউ মিউ করে ডাকছে, কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। ইতোমধ্যে বালক কিশোর হয়ে বসে আছে একটা পোড়োবাড়িতে, সে-বাড়ির চারপাশে গজিয়েছে অসংখ্য আগাছা। এধরনের বাড়ি শূন্য নদীতীরে কখনো কখনো চোখে পড়ে। পোড়োবাড়িটা কিশোরের সঙ্গে কথা বলে নদীর শব্দের মতো কুলু কুলু স্বরে; সেই স্বরে জ্যোৎস্নার ঝিলিক আছে, মাছের ঘাই আছে, মাটির কলসের স্পর্শ আছে, আছে গ্রাম্যবধূর শরীরের গ্রীষ্মকাতর মায়া। সে বালক, সে কিশোর, এবং সে সদ্য যুবা, শুয়ে আছে একটা নকশিদার খাটে। দু'দিকে দুটো ঢাউস কোলবালিশ। পালঙ্কের পাশ-ঘেঁষা টিপয়ে মিক্সচারের শিশি, ওষুধ খাওয়ার ছোটো মেজার গ্লাশ আর কিছু ফল। যুবক, যে ইশতিয়াক, ফলের দিকে হাত বাড়ায়। রুগ্ণ হাত থিরথিরিয়ে কেঁপে ওঠে লাউয়ের ডগার মতো, হাত ফল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না, মিক্সচারের শিশিটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়। গোলাপি রংয়ের মিক্সচার মেঝেতে বয়ে যাচ্ছে কাচের টুকরো সমেত। যুবকের জ্বরতপ্ত কপালে কার হাত, চুলে আঙুল, ঠোঁটে ঠোঁট। যার হাত তাকে সে দেখতে পায় না। বারান্দা থেকে মামীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কেমন আবছা আর মিহি। সদ্য যুবক নিজেকে দেখতে পায় পোড়োবাড়িতে; পোড়োবাড়ির আগাছাগুলি ওর দিকে এগিয়ে আসে ক্যামোফ্লেজ-করা সৈনিকের মতো, ওকে জড়িয়ে ধরে, সে আকণ্ঠ ডুবে যায় আগাছার মধ্যে।

॥ ২ ॥

'কাল রাতে অমন করছিলে কেন, 'ইশতিয়াকের দিকে পটল ভাজির বাটিটা এগিয়ে দিয়ে ইয়াসমিন প্রশ্ন করে।

'কী করছিলাম?'

'ঘুমের ভেতর কীসব হিজিবিজি কথা বলছিলে।'

'তাই বুঝি!'

'জ্বী হ্যাঁ, আর লোপা না খোপা বলে চেঁচাচ্ছিলে।'

'লোপা তো আমার উপন্যাসের নায়িকা, রক্তমাংসের কোনো মেয়ে নয়,' বলে ইশতিয়াক হাসে আর আটার রুটি চিবুতে থাকে। লোপা রক্তমাংসের কোনো নারী নয় বলল বটে, তবে সে জানে তার নায়িকা রক্তমাংসের নারীর চেয়ে অধিকতর সত্য এক মানবী। অথচ তাকে বাংলাদেশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'তুমি এত রাত জেগে লেখো কেন বলো তো? এত রাত জাগলে মাথাগরম হওয়া স্বাভাবিক। আর মাথাগরম হলে ঘুমের ভেতর আবোল-তাবোল তো বকবেই,' ইয়াসমিন আরো একটা রুটি তুলে দেয় ইশতিয়াকের পাতে।

'না লিখে পারি না, তাই লিখি। দিনে সময় পাই না, অফিস পুরো দিনটাই গিলে ফেলে, একথা তোমার অজানা নয়।'

ইশতিয়াক হোসেন একটা বেসরকারি দফতরে মাঝারি ধরনের চাকরি করে। দশটা-পাঁচটার জোয়াল চাপানো তার কাঁধে। স্বেচ্ছায় সে নিয়েছে এই জোয়াল। না নিয়ে উপায় নেই। সংসার চালাবে কী করে? এদেশে কি লিখে পেট চালানো যায়? কস্মিনকালেও নয়। এখানকার এমন একজন লেখকের কথাও সে মনে করতে পারছে না যিনি শুধু লিখে টিকে আছেন। অন্তত একজন আছেন, ইশতিয়াকের হঠাৎ মনে পড়ে, যিনি শুধু সাহিত্য রচনা করে বেঁচেবর্তে রয়েছেন এই বাংলাদেশে। পরমুহূর্তেই এই স্মৃতির প্রুফ পাঠ করল ইশতিয়াক। না, তাঁকেও এমন কিছু কিছু কাজ করতে হয় যার সঙ্গে সৃজনশীল লেখার কোনো সংযোগ নেই। সিনেমার জন্যে সস্তা গল্প লিখতে হয় তাঁকে, চিত্রনাট্য রচনা করতে হয়, টেলিভিশনে নিয়মিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়; তাছাড়া তাঁর স্ত্রী ভালো চাকরি করেন। ফলে সংসার চালানোর জন্যে তাঁকে বাজে কাজে উদয়াস্ত খেটে মরতে হয় না। সৃজনশীল লেখায় তিনি মনপ্রাণ সঁপে দিতে পেরেছেন পুরোপুরি, সময়ের অপচয় না ঘটিয়ে। প্রশংসনীয় তাঁর উদ্যম। কিন্তু এই বিশিষ্ট লেখকের মতো ভাগ্যবান সবাই নন; ইশতিয়াক হোসেন তো নয়ই।

ইশতিয়াক কি ঈর্ষা করে সেই বিশিষ্ট লেখককে; যার বইয়ের প্রচুর কাটতি? লুকিয়ে লাভ নেই, ঈর্ষার কিছু লাল পিঁপড়ে ওকে মাঝে-মধ্যে অস্থির করে তোলে। আমি জনপ্রিয়তা চাই না, এই বাক্যটি কি কোনো লেখক বুকে হাত রেখে উচ্চারণ করতে পারবেন? একটি বই লেখা হলো, বেরিয়ে এলো ছাপাখানা থেকে আর সেই বই অপঠিত রয়ে গেলো, মানে বেশি পাঠক সেটি কিনলো না—না, এমন পরিস্থিতি কোনো লেখকের পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারে না। তা'হলে লিখে কী লাভ? নিজের আনন্দের জন্য লেখো। হুম, নিজের আনন্দের জন্যে তো লিখবই। এটা হক কথা। হাজার কথার এক কথা। নিজের আনন্দ চরিতার্থ হলেই যদি কিস্‌সা খতম হয়ে যেত তাহলে কোনো ল্যাঠাই থাকত না। একজন লেখক আরো কিছু চায়। নইলে সে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের দরবারে পেশ করত না, পাঠাত না কোনো মুদ্রণালয়ে। পাণ্ডুলিপি নিজস্ব বিছানার তলায় চিরকাল চাপা দিয়ে রাখলেই চলত। একাকী গায়কের নহে তো গান। প্রত্যেক লেখকই চায় যে

আর দশজন তার আনন্দসঙ্গী হোক। অর্থাৎ তার বইয়ের খদ্দের নেই। খদ্দের যত বেশি হয় তত ভালো।

'সকাল সকাল কী অত ভাবছ,' ইয়াসমিন তাকে ভাবনা থেকে ছিঁড়ে আনে।

'কই, না তো, কিছুই ভাবছি না।'

'বললেই হলো, রুটি-ভাজি পড়ে আছে সেই কবে থেকে। নাড়া-চাড়া সার, মুখে দেবার নামটি নেই।'

'খাচ্ছি তো, দু'দুটো রুটি খেয়ে ফেললাম,' ইশতিয়াক ইয়াসমিনকে দেখে। ওর দৃষ্টিতে মুগ্ধতাবোধ। ইয়াসমিন দেখতে ভালোই। গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তবে তার চোখ দুটো আয়ত এবং বড়ো মায়াময়। অমন চোখের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকা যায়, ক্লান্তি নামে না। বুদ্ধিবৃত্তি ইয়াসমিনের স্ট্রং পয়েন্ট নয়। লেখাপড়াও তেমন করেনি। স্কুলের গন্ডি পেরিয়েছে বটে, কিন্তু কলেজের দোরগোড়ায় পা রাখেনি। কবিতা কিংবা প্রবন্ধের বই পড়া তো দূরের কথা, এমনকি গল্পের বইয়ের দিকেও তার তেমন ঝোঁক নেই। ইশতিয়াক হোসেনের উপন্যাস পড়তে মাঝে-মধ্যে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো উপন্যাসই পুরো পড়ে উঠতে পারেনি। কেননা ইশতিয়াক হোসেনের উপন্যাসে কাহিনি নেই। চরিত্রগুলোও যেন কেমন, ওদের ভাবনার খেই পাওয়া মুশকিল। ওরা কথা বলে কম, ভাবে বেশি। আর অনেক পাতা জুড়ে এমনসব কথা থাকে যা ইয়াসমিন বেগমের কাছে দুর্বোধ্য মন্ত্রের মতো লাগে। এজন্যে অবশ্য ইশতিয়াক হোসেনের কোনো খেদ নেই। নিজের লেখা নিয়ে সে কখনো স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে না। সে জানে, ইয়াসমিনের মতো অনেকেই তাঁর উপন্যাস বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসীন। বিদগ্ধ সমালোচকরা ইশতিয়াক হোসেনের উপন্যাস সম্পর্কে যতটা আগ্রহী সাধারণ পাঠকরা ততটাই নিরুৎসুক। যেসব পুরুষ ট্রেনে সময় কাটানোর জন্য গোগ্রাসে উপন্যাস গেলেন এবং সেসব মহিলা দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আগে গড়গড় করে গল্প পড়তে চান, তাদের সঙ্গী নয় ইশতিয়াক হোসেনের উপন্যাস। যেসব প্রযোজক ও পরিচালক সস্তা ছবি বানিয়ে বক্স অফিস হিট করতে পারঙ্গম, তারা ইশতিয়াকী উপন্যাসে সিনেমার মালমশলা খুঁজে পান না। এমন উপন্যাস পড়ে ওরা তাদের টাকার ঝনৎকারময় সময় নষ্ট করার ঘোর বিরোধী। ইশতিয়াক এতে বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ কিংবা বিচলিত নয়। তবে সে চায় যে তার পাঠক সংখ্যা বাড়ুক। বই হামেশা প্রকাশকের গুদামে পড়ে থাকবে, উইপোকার খোরাক হবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়।

আজ ছুটির দিন। অফিসে যাবার তাড়া নেই। রিকশা ধরার জন্যে গলির মোড়ে দাঁড়ানো নেই। অন্তত সকাল সাড়ে ন'টায় নাকে-মুখে কিছু গুঁজে ছুটতে হবে না। আজকের দিনটি কিছু না করে, শুধুমাত্র আলসেমি করে কাটিয়ে দেওয়া চলে। কোনো উপন্যাস পড়ে কিংবা না পড়ে আকাশে মেঘের খেলা দেখে, পায়রার ওড়া দেখে, রবীন্দ্রসংগীত শুনে একটি দিন যাপনের আনন্দটুকু পেতে ইশতিয়াকের মন লালায়িত হয়ে ওঠে। অনেকদিন সে এমন অবসর পায়নি। যে উপন্যাসটি লেখা সদ্য শেষ করেছে সে, যার নামকরণ এখনো করেনি, সেই শব্দপুঞ্জ তাকে স্বস্তি দেয়নি বহুদিন; ছুটির দিনগুলো সে নিবেদন করেছে নিজস্ব উপন্যাসকে। স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়নি; বিকেলবেলা আড্ডা দিতে বেরোয়নি। শুধু ভেবেছে আর লিখেছে, লিখেছে এবং ভেবেছে।

আজ তার লেখার কাজ নেই। বহুদিনের গাধার খাটুনির পর আজ সে ছুটি নিতে পারে। ছুটি নিতে পারে নিজের কাছ থেকে। ইশতিয়াক বললো বটে যে আজ তার লেখার কাজ নেই, কিন্তু সত্যি কি তাই? কোন লেখক কি ছুটি নিতে পারে কখনো? এক অর্থে একজন লেখকের কোনো ছুটি নেই। প্রতিদিন তার কাজ, প্রতি মুহূর্তেই তার খাটুনি। হয়তো কাগজে-কলমে নয়, তবে মনের ভেতর এক অলৌকিক কারখানা চালু থাকে সর্বক্ষণ। অলৌকিক কারখানা শব্দটি সে তৈরি করতে পেরেছে বলে ইশতিয়াক খুশি হল। সে জানে, যদি সে এক শব্দবন্ধ ব্যবহার করে কোনোদিন, তাহলে অনেকের লেখাতেই এটি ঘুরেফিরে আসতে থাকবে। কেউ কেউ তা দিব্যি নিজের বলে'ই চালিয়ে দেবে। যাকগে, আপাতত সাহিত্য ভাবনা শতহস্ত দূরে থাক।

আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে—ইশতিয়াকের রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে। অনেকদিন 'সঞ্চয়িতা' পড়েনি সে, অথচ এমন এক সময় ছিল, যখন একদিন সেই কাব্যসঞ্চয়ন হাতে না নিলে আত্মা অতৃপ্ত থাকত। না, আজ কবিতাও পড়বে না সে। আজ বিছানায় শুয়ে-শুয়ে পা দোলাবে, ইয়াসমিনকে আদর করবে। আজ যদি না; বরং সোৎসাহে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবে। দু'জনে মিলে অন্ধকার সিনেমা হলে বাদাম কিংবা চানাচুর খাবে। ইয়াসমিন আজ পিতৃগৃহে যেতে চাইলে সে-ও তার সঙ্গ নেবে স্বেচ্ছায়। আজ সে ভারমুক্ত, অন্তত একটা দিন সে হালকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে চায়।

এমনিতে ইশতিয়াক শ্বশুরবাড়িমুখো হতে চায় না। কোনো উৎসব কিংবা দাওয়াত ছাড়া কখনো শ্বশুরবাড়ি গেছে বলে মনে করতে পারে না। এক ধরনের অসামাজিকতা আছে তার মধ্যে। লোকজনের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারে না, সহজ হতে পারে না আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। কার সঙ্গে কী কথা বলবে তা সে বুঝে উঠতে পারে না, সামান্য দু-চারটি কথা বলে চুপ করে থাকে। কী নিয়ে আলাপ করবে ওদের সঙ্গে? বেগুনের দর? রেশনের চালে কাঁকর? মন্ত্রীর দুর্নীতি? প্রতিবেশীর উড়ো কেচ্ছা? ইশতিয়াক যা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে—যেমন আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা, ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরদের বৈশিষ্ট্য, আয়োনেস্কোর নাটক, কমলকুমার মজুমদারের গদ্যশৈলী ইত্যাদি—তা মোটেই উৎসাহসঞ্চারী নয় ওর আত্মীয়স্বজনদের পক্ষে। তাই সে নীরব থাকাটাই সমীচীন মনে করে। যাদের মনে এখনো নিকার বোকার চাপানো রয়েছে তাদের সঙ্গে আলাপ জমানো দুরূহ কর্ম ভেবেই ইশতিয়াক দূরত্বের বর্ম এঁটে কোনোমতে কিছু সময় কাটিয়ে দেয় ওদের ভিড়ে। ইশতিয়াকের এই আচরণ ইয়াসমিনের কাছে কখনো অনুমোদনযোগ্য ঠেকেনি। প্রথম প্রথম সে আপত্তি করতো; কিন্তু সেসব কথা ইশতিয়াক গায়ে মাখে না বলে ইয়াসমিন শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়েছি। বাজারু বাংলা ছবি দেখার ব্যাপারেও ইশতিয়াকের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। কতদিন ইয়াসমিন বায়না ধরেছে সিনেমায় যাওয়ার জন্যে, বারবার সে নিঃসাড় থেকেছে। কিন্তু আজ সে সবকিছু করতে রাজি।

চার বছর হলো ওদের বিয়ে হয়েছে, ইশতিয়াক ভাবনার খেয়া বাইছে। ইতোমধ্যে চারটি বছর কেটে গেছে, অথচ এইতো সেদিন সে নওশা সেজে গিয়েছিল ইয়াসমিনদের বাড়িতে। সময় বড়ো দ্রুত ফুরিয়ে যায়। এই জনবহুল সমাজে চার বছরের পরেও ওরা

নিঃসন্তান। এ জন্যে ইশতিয়াকের মনে কোনো হাহাকার নেই। ইয়াসমিন মাঝে-মধ্যে খেদোক্তি করে।

'যাক না আরো কিছুদিন, আমাদের অবস্থা আরেকটু সচ্ছল হোক। ওসব পরে হবে খন,' ইশতিয়াক স্ত্রীকে বোঝায়।

'আমার বুঝি মা হতে ইচ্ছে করে না? আর কতদিন কোল খালি থাকবে আমার?

'যদি আমাদের সংসারে এসে সন্তানের কষ্ট হয়, তাহলে খামোকা ওদের টেনে আনা কেন?'

'আল্লাহ যদি আমাদের নতুন মুখ দেখান, তাহলে আহারও জোগাবেন তিনি।'

ইয়াসমিনের এই উক্তির পর ইশতিয়াক হোসেন নিশ্চুপ থাকে। আসলে সে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে ভালোবাসে। এত তাড়াতাড়ি সংসারে কচি জনতা এলে সে হিমশিম খাবে। লেখালেখি যাবে নির্বাসনে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও সংসারের ভেলাটিকে ভাসমান রাখা যাবে না। ভরা-ডুবি হবেই হবে।

হঠাৎ আকাশচেরা শব্দ। একটা বোইং বিমান উড়ে গেল। বিমানের শব্দ ইশতিয়াককে ভীষণ নিঃসঙ্গ করে দেয়। অনেক যাত্রী নিয়ে একটি বিমান উড়ে যায় সুদূরে আর তীব্র নিঃসঙ্গতা আচ্ছন্ন করে ফেলে ইশতিয়াককে। বার বার এরকম হয়েছে। যতদিন সে বাঁচবে, ততদিন বিমানের উড়ে যাওয়ায় সে হয়তো এমন একলা বোধ করতে থাকবে। এই নিঃসঙ্গতা থেকে তার মুক্তি নেই।

সাত বছর আগে একটি বিমানের উড়ে যাওয়া সে দেখতে পায়নি, ইশতিয়াকের মনে পড়ে। দেখার বড়ো সাধ ছিল, বিমানটি বিশেষ একজনকে নিয়ে উড়ে যাবে মেঘমালায় আর সে দেখবে নীচে থেকে, আকাশের দিকে ততক্ষণ তাকিয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সেই আকাশযান মিলিয়ে যায় দূরে, বহুদূরে। সাত বছর আগে এক সন্ধ্যায় ইশতিয়াক ছুটে গিয়েছিল ঢাকা এয়ারপোর্টে, পৌঁছতে তার খানিক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পৌঁছে দেখে, যে-বিমানে একজন উঠবে রাজহংসীর ছন্দে, যে-বিমান সেই সুন্দরীতমাকে জঠরস্থ করে উড়ে যাবে আর সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, সে-বিমান আগেই হাওয়াই বন্দর ছেড়ে চলে গেছে। কেমন এক শূন্যতা সারা এয়ারপোর্টে। যেন কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই আশেপাশে। পোর্টাররা নিষ্ক্রিয়, কাউন্টার নিশ্চুপ। দর্শনার্থীহীন এয়ারপোর্ট গোরস্তানের মতো বিষণ্ন আর ফাঁকা। কয়েক টুকরো কাগজ হাওয়ায় উড়ছে, যেন পুরোনো স্মৃতি। জনমানবহীন এক প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে আছে ইশতিয়াক। এর আগে নিজেকে তার এমন একা আর কখনো লাগেনি।

এয়ারপোর্টে শারমিনের সঙ্গে তার দেখা হয়নি, সে দেখতে পায়নি একটি বিমানের উড়ে যাওয়া। এই দেখতে-না পাওয়া তাকে চিরদিনের মতো নিঃসঙ্গ করে দিয়ে গেলো। সাত বছর পরে আজও যখন ইশতিয়াক কোনো বিমানের শব্দ শুনতে পায়, আকাশে উধাও হতে দেখে কোনো বিমানকে, তখন নিঃসঙ্গতা তাকে হিমায়িত করে ফেলে।

ইয়াসমিন রান্নাঘরে। দুপুরে কী রান্না হবে তা' বলে দিচ্ছে রাঁধুনিকে। অবশ্য রান্না তার তদারকিতেই হবে। এই মুহূর্তে কথাশিল্পী ইশতিয়াক হোসেনের মনে ইয়াসমিন নয়, লোপাও নয়, হানা দিচ্ছে শারমিন বানু। ইশতিয়াকের মনের হানাবাড়িতে শারমিনের পদধ্বনি। সে শারমিনের শরীর আবৃত্তি করে প্রেমিকের মাতৃভাষায়, অত্যন্ত সঙ্গোপনে,

যেন দেয়ালেরও কান আছে। দেওয়ালের কান থাক আর না-ই থাক, এই মুহূর্তে একটি নাম ইশতিয়াকের প্রাণের গভীরে গান হয়ে গুঞ্জরিত হচ্ছে। এই গুঞ্জরণ কোনোদিন হয়তো স্তব্ধ হবার নয়।

নাম, শুধু নাম। ইশতিয়াক জানে, শুধু একটি নামও বাঁচার আশ্চর্য অবলম্বন হতে পারে। জীবন যখন খরায় দগ্ধ হতে থাকে কিংবা মন যখন শীতের সাপের মতো হয়ে যায়, প্রায় মৃত, তখন একটি নাম সঞ্জীবনী চাঞ্চল্য এনে দেয় সমগ্র সত্তায়। কখনো হয়তো মানসিক অবসাদ যখন প্রবল হয়ে ওঠে যে, আত্মহত্যাকেই মনে হয় উদ্ধার। মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাওয়ার স্পৃহা গা চাটতে শুরু করে, আর সেই মুহূর্তে যদি একটি নামের ধ্বনি মঞ্জরিত হয় হৃদয়ের গভীরে, তাহলে আবার নতুন করে বাঁচার সাধ জাগে। জীবনকে তখন এক স্বর্গোদ্যানের মতো মনে হয়, যার প্রতিটি ফুলের গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছে করে, বুক ভরে নিতে ইচ্ছে হয় সুরভিত নিশ্বাস। এ-রকম বারবার হয়েছে ইশতিয়াকের। শারমিনের নাম একটা সুরের মতো খেলা করছে ইশতিয়াকের ঠোঁটে, মস্তিষ্কে, হৃদয়ে।

কত যুগের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সে, শারমিন বানু। মাত্র কয়েকটি বছর, অথচ মনে হচ্ছে কত যুগ কেটে গেছে। কতদিন শারমিনকে দেখি না, ইশতিয়াক বাইরের রোদ্দুরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে উচ্চারণ করে আস্তে আস্তে। সে তার মনের অন্ধকারে একটি প্রতিমা হাতড়ে বেড়ায়। সেই প্রতিমার রূপ এখনো অম্লান তার দৃষ্টিতে। এই শব্দগুচ্ছ মনে মনে উচ্চারণ করার পর ইশতিয়াকের কেমন খটকা লাগে, পাশ ফিরে শুয়ে সে ভাবে, শারমিনের কথা তার মনে পড়ে প্রায়শই, কিন্তু তার চেহারা কি স্পষ্ট মনে আছে তার? শারমিনের হুবহু মুখ তার মনে পড়ে না, সে মুখের রৌদ্রছায়াময় একটা ধারণা ঝলসে ওঠে শুধু। হায়, এরই মধ্যে, মাত্র ক'বছরের মধ্যেই তার মনের মতো প্রতিমার ওপর ধুলো পড়তে শুরু করেছে। সময়ের নির্দয়তা বিষয়ে নানা চিন্তা ইশতিয়াকের মনে আসে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে ইয়াসমিনের চুড়ির শব্দ, যেন সেই শব্দ ইশতিয়াককে ফিরিয়ে আনতে চায় অন্য পথের মোড়ে।

## ॥ ৩ ॥

*ইশতিয়াক হোসেনের ডায়েরি থেকে*

এ এক আশ্চর্য অনুভূতি, অপূর্ব শিহরন আমার সমগ্র সত্তায়। গাছের নতুন পাতা এলে কিংবা ফুল ফুটলে গাছ হয়তো এরকমই শিহরিত হয়। জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আমিও এ রকম জ্বলছি কৃষ্ণচূড়া গাছের মতো। আমার একরত্তি বিত্ত নেই, তবু আজ আমি বিপুল ঐশ্বর্যশালী। শারমিনের দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে আমি পথের কাঙাল থেকে রূপান্তরিত হয়েছি জ্বলজ্বলে যুবরাজে। সারা বিশ্ব আমার দু'বাহুর আলিঙ্গানে বাঁধা পড়েছে। এখন আমি শারমিনের কথা ভেবে এক নাগাড়ে কাটিয়ে দিতে পারি ঘন্টার পর ঘন্টা। গ্রীষ্মের তীব্র দাহন ভুলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে পারি এক স্বপ্নময়তায়, যে কোনো পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারি হেলায়, পাড়ি দিতে পারি সমুদ্র, আমি এখন

সব-পেয়েছি দেশের বাসিন্দা। এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হলেও কোনো খেদ নেই। মনে মনে কত চিঠি লিখি শারমিনের উদ্দেশ্যে। অনেক রাত অব্দি ঘুম আসে না, সেসব চিঠি কোনোদিন লেখা হবে না সেগুলির মনোজ্ঞ মুসাবিদার ভাবনায়।

আমি তাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা শব্দটির মধ্যে একটা হরিণ-খুশি আছে, ঝরনার ঝিরঝির ধ্বনি আছে, আরব্য রজনীর নায়িকার রেশমি নেকারেব রহস্যময়তা আছে, সুদূর কোনো প্রাসাদের ঝালরের ঝিলিক আছে,ঝিলের স্নিগ্ধতা আছে, বনদোয়েলের মখমল-কোমল শিস আছে। আমি তোকে ভালোবাসি;—এই উচ্চারণ আমাকে নিয়ে যায় দিলরুবা-মর্মরিত মরূদ্যানে, জ্যোৎস্নাপ্লুত অরণ্যে, সূর্যোদয়ে ভেতর থেকে সবসময় উৎসারিত হচ্ছে অনিন্দ্য-সুন্দর এক গীতধ্বনি, যা আমাকে প্লাবিত করে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকল তুচ্ছতার স্তূপ থেকে বহুদূরে কোনো সাগরসঙ্গমে। সাগর দোলায় অপরূপ এক ভেলায় দুলছি আমরা দুজন—শারমিন আর আমি।

শারমিন, এই নামটি উচ্চারণ করলেই কেমন এক সুখানুভূতি হয় আমার, আমি সেতারের মতো বাজতে থাকি। যদি শারমিন আমার দিকে তাকায় কখনো, যদি সে সামান্য কোনো কথা বলে আমার সঙ্গে, আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুকুটহীন রাজার মতো ঘুরি শহরের পথে পথে; একা, উদ্দেশ্যবিহীন। অমন ঘুরতে আমার ভালো লাগে। শারমিনের সঙ্গে একটি ব্যাপারে আমার মিল আছে। আমরা দু'জনই আশ্রিত আমার মামার বাড়িতে। আমার মামা শারমিনের চাচা। এ বাড়িতে আমাদের আদরযত্নের অভাব নেই। মামা-মামী সবসময় আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখেন। বড়ো ভালো মানুষ ওরা। ওদের একমাত্র ছেলে আনিস অনেকদিন হলো পড়াশোনা থেকে মন সরিয়ে ফেলেছে। সারাদিন খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকে, রাতে শোনে চড়া সুরের পপ গান। বেপরোয়া ছেলে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। ওকে দেখলেই মনে হয়, এ ছেলে যা চায় তা প্রয়োজন হলে কেড়ে নিতে পারে। ওকে আমার ভালোই লাগে। দিলখোলা, চটপটে, হাসিখুশি।

আমি জানি, শারমিন আমাকে ভালোবাসে। আমার এ জানার ব্যাপারে সাহায্য করেছে শারমিন স্বয়ং। অথচ সে আমাকে এড়িয়ে চলে, চলতে চেষ্টা করে আজকাল। আমাকে দেখলে ওর চোখের তারা নেচে ওঠে, তবু সে আড়ালে-আবডালে থাকে। সে কি আমাকে ভালোবাসে না আর?

না, তা হতেই পারে না। শারমিন অবশ্যই আমাকে ভালোবাসে। যদি শারমিনের ভালোবাসা না পাই, তাহলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। লুট হয়ে যাবে আমার সর্বস্ব। তার এই পরিবর্তন সাময়িক, চিরস্থায়ী কিছু নয়। হয়তো এক ধরনের লজ্জার জন্য হয়েছে ওর ভেতর, যা তাকে কিছুটা রহস্যময় করে তুলেছে, কিছুটা খাপছাড়া। হয়তো তেমন কিছুটা ঘটেনি, আমিই এই অনর্থক ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। শারমিন আমাকে ভালোবাসে, সে আমাকে ওর মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

কিন্তু এ কী দেখলাম আমি? কেন আমি অন্ধ হয়ে যাইনি এই দৃশ্য দেখার আগে? আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যে-দৃশ্য আমাকে নিমেষে রূঢ় বাস্তবের চত্বরে দাঁড় করিয়ে দিলো তাকে অস্বীকারই বা করি কী করে? কার কী এমন ক্ষতি হত যদি এ মুহূর্তে আমার ঘুম না ভাঙত, যদি আমার মূত্রাশয় স্ফীত না হত নিঃসরণযোগ্য জলধারার চাপে? যদি আমি ঘরের বাইরে না বেরুতাম, রওয়ানা না হতাম বাথরুমের

দিকে, তাহলে এ দৃশ্য দেখার যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হতো না। কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে কী ফায়দা? কী লাভ দেয়ালের ফোকরের সেই কাকটির ভূমিকা পালন করে? যা ঘটবার সে তো ঘটতই, ঘটে যেত আমার দৃষ্টির অন্তরালে। ভালোই যে আমি দেখে ফেলেছি এই দৃশ্য। এমন নিষ্করুণই হোক, আমাকে নিয়ে যাক সূর্যালোকিত পথে —এটাই আমার কাম্য।

এক মধ্যরাতে আমি শারমিনকে আনিসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। শারমিনকে কেমন আলুথালু লাগল, যেন একটা ঝোড়ো পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি যে ওকে দেখতে পেয়েছি তা' ওর অগোচর রইল না। আমার দুজনই চমকে উঠেছি মুখোমুখি হয়ে। শারমিনের চোখে আর্ত হরিণীর হাহাকার, চোখ ছলোছলো। আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারিনি সে রাতে। ঝোড়ো মন নিয়ে ফিরে গেলাম যে যার ঘরে। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। শারমিন এবং আনিসের ওপর তো বটেই, সারা দুনিয়ার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলাম। আমার মগজের কোষে কোষে ভীমরুল-দংশন, মন আমার বিষিয়ে গেছে।

পরদিন বিকেলে টি এস এলিয়েটের নির্বাচিত কবিতার ভেতরে একটি চিঠি আবিষ্কার করলাম, চিঠিটা আমাকেই লেখা :

'আমার প্রাণ,

জানি তুমি আমাকে এখন ভীষণ ঘেন্না করছো। যদি তুমি চিরদিন মুখ ফিরিয়ে রাখো, তবু কোনো নালিশ রুজু করবো না। কেননা, সেই অধিকারটুকু আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছি।

এই চিঠি আমি তোমাকে না লিখলেও পারতাম। আমার সব কথাই আজ তোমার কাছে অত্যন্ত ঠুনকো ও অর্থহীন মনে হবে। আমার এই সামান্য চিঠি হয়তো তোমার উপহাসই কুড়াবে শুধু তার বেশি সবকিছু জানার অধিকার তোমার আছে এবং আমারও একটা দায়িত্ব আছে জানাবার। তোমাকে যদি ভালো না বাসতাম, তাহলে আমার কোনো দায় থাকত না।

ভালোবাসার উল্লেখে তুমি হয়তো এই মুহূর্তে হাসতে পারো। রাগও করতে পারো তুমি। কারণ, এটাই স্বাভাবিক। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার মনপ্রাণ তোমাকেই অর্পণ করেছি এটা আর কারো কাছে না হোক আমার কাছে এক পরম সত্য। এরপর তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, 'তাহলে তোমাকে অত রাতে আনিসের ঘর থেকে বেরুতে দেখলাম কেন? এবং খুবই সঙ্গত এই প্রশ্ন।

আনিস আমাকে ভালোবাসে না। আমার শরীরের প্রতি ওর লোভ। আনিসের জন্যে আমার মনে বিন্দুমাত্র প্রেমানুভূতি নেই। কিন্তু ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারিনি। আর একথাও ঠিক যে আনিসের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে আমি নির্দোষ সেজেঁ থাকতে চাইনে। সত্যি বলতে কি, আমার মন তোমার দখলে, কিন্তু আমার শরীর ছুটে যায় আনিসের দিকে। বিশ্বাস করো, আমি নিজেকে সামলাতে অনেক চেষ্টা করেছি, আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে বারংবার, কিন্তু সফল হতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। আনিসের কামোৎসবে আমাকে শরিক হতে হয়েছে রাতের পর রাত।

দিনে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে আমার মন, নিজের শরীর নিজের কাছেই অত্যন্ত নাপাক ঠেকেছে; অথচ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র আকর্ষণ নিশিডাকের মতো আমাকে নিয়ে যায় আনিসের ঘরে। সে আমাকে গ্রহণ করে প্রবল পশুর মতো, তারপর এমন ভাব দেখায় যেন সে আমাকে চেনে না। অবশ্য তার এই আচরণে আমার কিছু এসে যায় না। কারণ, ওকে আমি ভালোবাসি না। যদি ওকে আমি ভালোবাসতে পারতাম, তাহলে বেঁচে যেতাম। তাহলে অন্তত গ্লানির এই গুরুভার আমাকে বয়ে বেড়াতে হতো না। মন যাকে চায়, শরীর তার দিকে ঝোঁকে না; যার শরীরের সঙ্গে শরীর মিশে যেতে চায়, তার প্রতি মন নিঃসাড়—এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। এই দোটানায় আমি বেঁচে আছি।

অন্য কেউ হলে এসব কথা আমি বলতাম না, বলতে পারতাম না। তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, তুমি অন্যরকম। আর দশজনের মত নও। আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে, বিশ্বাস করবে, এই ভরসায় এলোমেলো কিছু কথা বলেছি। বিশ্বাস না করলেও তোমাকে চোখের বালি মনে করবো না। আমার মন, যদি তার কোনো মূল্য থেকে থাকে তোমার কাছে, চিরদিন তোমারই জন্যে উন্মুক্ত হয়ে রইবে। যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। তবুও ভালোবাসা জানাই, গ্রহণ করো আর না-ই করো।

*হতভাগিনী শারমিন*

শারমিনের চিঠি কয়েকবার পড়লাম। একবার ইচ্ছে হলো চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলি, তাহলে ওকেও ছিন্নভিন্ন করা হবে। কিন্তু পারলাম না, ওর প্রথম ও শেষ চিঠি কিছুতেই নষ্ট করতে পারলাম না; বরং সযত্নে লুকিয়ে রাখলাম যক্ষের ধনের মতো! বড়ো মায়া হলো ওর জন্যে। কিন্তু লুকিয়ে লাভ নেই, আমি শারমিনের সঙ্গে আর কোনোদিন সহজ হতে পারিনি। জানি ওর স্মৃতির গোলাপ চিরদিন আমার মনের ভেতর হালকা সৌরভ বিলোবে, কিন্তু সেই একটা কাঁটাও খচ খচ করবে সবসময়!

কবুল করছি, শারমিনের ওপর আমি চটে আছি। কিন্তু না,ওকে আমি ঘৃণা করি না। যদি ঘৃণাই করব, তাহলে ওকে এত দেখতে ইচ্ছে করে কেন? নানা অজুহাতে ওকে ক্ষণিক দেখবার লোভ সামলানো মুশকিল আমার পক্ষে। ও কি আমার এই মনোভাব টের পায়? পায় নিশ্চয়; নইলে কেন ওর শাড়ির খসখসানি শুনতে পাই আশেপাশে? কেন ওর অমন সুন্দর মুখ ঝলসে ওঠে আমার চোখের সামনে? ব্যস, এই পর্যন্ত। আমাদের মধ্যে কোনো বাক্যবিনিময় প্রায় হয় না বললেই চলে। ভালোই, আমরা কোনো কথা বলি না। কথা প্রকৃত উপলব্ধিকে কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারে? সর্বক্ষণ কথাই যদি বলতে হবে, তবে চোখ আছে কেন? কেনই বা আছে মুখভঙ্গি?

## ॥ ৪ ॥

ইশতিয়াক হোসেন প্রাতঃকৃত্য সেরে শেভ করছে। গালময় পামোলিভ শেভিং ক্রিম। ব্রাশের দৌলতে সবুজ ক্রীম সাদা সরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা গালে, গলা পর্যন্ত

সফেদ প্রলেপ। দাড়ি কামানোটা ইশতিয়াকের কাছে বরাবরই বিরক্তিকর। তাই, মাঝে-মধ্যে-গালে রেজর স্পর্শ করে না সে। কিন্তু অফিসে কাজ করতে হলে, বিশেষ করে যে দফতরে ইশতিয়াক চাকরিবন্দি, একটু ফিটফাট থাকতে হয়। অফিসে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে হাজির হবার জো নেই। বাধ্য হয়েই নিয়মিত সেভ করতে হয় তাকে। কোনো কোনোদিন করে না।

তবে এটাও ঠিক কখনো সখনো সকাল যখন সতেজ, মন যখন ফুরফুরে, তখন অনেকক্ষণ ধরে দাড়ি কামাতে তার নেহাৎ মন্দ লাগে না, যেমন আজ লাগছে। ক্রিমের গন্ধটি উপভোগ করেছে সে, মুণ্ডিত গালে হাত বুলিয়ে দেখে নেয় কোথাও দাড়ির কুশাগ্র রয়ে গেছে কিনা। আফটার সেভ লোশন লাগানোর পরে গণ্ডদেশের ত্বক কিছুটা জ্বালা করবে, তারপর মসৃণ আরাম।

ইতোমধ্যে ইয়াসমিন নাশতা খাবার জন্য তাড়া দিয়ে গেছে দু'একবার। দিক। আজ না হয় একটু দেরি করে নাশতা খাওয়া হবে। আবার নিজের গালে হাত বুলোয় ইশতিয়াক। আয়নায় ভালো করে নিজের মুখ দেখে। তেমন খারাপ নয় তার চেহারা, অন্তত তার নিজের কাছে তা-ই মনে হয়। মাথায় টাকের আভাস নেই, বরং চুল তার ঘন আর কাক কোলো। তার যে গায়ের রং তাকে ফর্সাই বলা চলে। নাক খাঁদা নয়, চোখ নয় পিটপিটে। না, নিজের চেহারা নিয়ে তার কোনো নালিশ নেই। ইয়াসমিন তো মাঝে মাঝে ঠাট্টাচ্ছলে স্বামীর চেহারার তারিফ করে ফেলে।

অনেকদিন হল সে কিছু লিখছে না। এবার নতুন একটি উপন্যাসে হাত দিতে হবে। 'অপচ্ছায়া' উপন্যাসটি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'অপচ্ছায়া' সেই উপন্যাস, যার নায়িকা লোপা। 'অপচ্ছায়ার' পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের দেরাজবন্দি হয়ে আছে। ইশতিয়াক হোসেনের প্রকাশক এই উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তেমন গা করছেন না, ইশতিয়াক লক্ষ করেছে। অথচ ভদ্রলোক পাণ্ডুলিপিটি হাতছাড়া করতেও চাইছেন না। এই প্রকাশ করি-করব করে কাটিয়ে দিচ্ছেন সময়। উপন্যাসটি রোগাপটকা নয় বলেই বোধ হয় জনাব প্রকাশক বইটি ছাপতে ভরসা পাচ্ছেন না। একটা বই ছাপাতে খরচ ইদানীং বেজায় চড়া। তাছাড়া, এ বই সাধারণ পাঠক নেবে না বলে প্রকাশকের ধারণা। উপন্যাসটি বেশ জটিল; বলা যায়; শাস্ত্রবিরোধী। সম্প্রতি এ কথাটির চল হয়েছে। হ্যাঁ, হত যদি অমুক লেখকের উপন্যাস, তাহলে পাণ্ডুলিপি এতদিন দেরাজের গুহায় পড়ে থাকত না, অল্পদিনের মধ্যেই দিনের ঝকঝকে আলো দেখে ফেলত। আর সেই বইয়ের কাটতিও হত এন্তার।

'অপচ্ছায়া' এখনো আত্মপ্রকাশ করেনি বলে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। নতুন কিছু লেখার কথা ভাবতেই হয়। ইশতিয়াক হোসেন দু'তিন দিন ধরে নতুন উপন্যাস লেখার কথা ভাবছে। উপন্যাস কীভাবে শুরু হবে, তার একটা আবছা নকশা সে ইতোমধ্যে তৈরি করে নিয়েছে, সেজন্যে অবশ্য একরাত অনিদ্রায় কেটেছে।

দাড়ির সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ইশতিয়াকের চোখ পড়ে ঘরের এককোণে। শোবার ঘরে সে দাড়ি কামায়, আর এই একই ঘরে পাতা ওর লেখার টেবিল। ঘরের যে কোণটায় ইশতিয়াকের চোখ পড়ে, সেখানে কোনো কিছু রাখা হয় না। জায়গাটা খালিই থাকে। এখন সেখানে খুদে একটা প্রাণী তার অস্তিত্ব জাহির করছে, এই প্রাণীটাই কি সে

স্বপ্নের ভেতরে লোপার হাতের তালুতে দেখেছিল? না, স্বপ্নে-দেখা প্রাণীটির সঙ্গে ঘরের কোণস্থিত প্রাণীর কোনো মিল নেই। এটা কি গিরগিটি? না, এর কয়েকটি শুঁড় আছে বলে মনে হলো। শুঁড়গুলো নড়ছে। খুব সূক্ষ্ম তারের মতো।

ইয়াসমিনকে কি ডাকবে ইশতিয়াক? ও এসে একবার দেখে যাক এই আজনবি প্রাণীটিকে। রেজর, ব্রাশ আর পামোলিভ শেভিং ক্রিমের টিউব তাকে রাখার পর ঘরের কোণে চোখ চালিয়ে ইশতিয়াক দেখে যে, জায়গাটা অবিকল আগের মতোই ফাঁকা। কোথায় গেল সেই আজনবি? একটু আগে ছিল, অথচ এখন লাপাত্তা। খাটের তলায় যায়নি তো? অনেক খোঁজাখুঁজির পরও প্রাণীটির কোনো হদিশ মিলল না। আসলেই সে প্রাণীটিকে দেখেছে, না কি এ তার দৃষ্টিভ্রম? ইশতিয়াক ইয়াসমিনকে আর ডাকল না।

রিকশায় সিটে বসার সময় ইশতিয়াকের হঠাৎ সেই প্রাণীটির কথা মনে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ ভাবল সে হিজিবিজি ভাবনা। প্রাণীটির শুঁড়গুলো যেন ওর কানের কাছে, গেঞ্জির নীচে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কেমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। তবে অফিসে ঢোকার পর সে প্রাণীটির অস্তিত্ব ভুলে যায়। রোজ ছোটো একটা কামরায় বসে সে কাজ করে। একই ঘরে বসেন তার অন্য এক সহকর্মী। ভদ্রলোকের নাম মোহাম্মদ তোসররফ আলি। একে দেখলেই ইশতিয়াকের সুকুমার রায়ের রামগরুড়ের ছানার কথা মনে পড়ে যায়। রামগরুড়ের ছানার হাসতে মানা। সত্যি, ইশতিয়াক পাঁচ বছর ধরে তার সঙ্গে কাজ করছে একই ঘরে, অথচ আজ অব্দি সে জনাব মোহাম্মদ তোসররফ আলির ঠোঁটে হাসি খেলতে দেখেনি। হাসি যেন ভয় পায় তাকে। শুধু হাসি নয়, পিয়নটাও ভীষণ ভয়ে-ভয়ে থাকে মোহম্মদ তোসররফ আলির দাপটে। পিয়নের সঙ্গে ধমক ছাড়া তিনি কথা বলতে পারেন না। হয়তো পিয়নকে এক গ্লাস পানি কিংবা এক কাপ চা আনতে বললেন, তার বলার ধরনই এমন যে, মনে হয় তিনি ধমকাচ্ছেন। বেচারি পিয়নের অস্তিত্বটাই যেন এক মস্ত বেয়াদবি।

ইশতিয়াকের পাশের টেবিলে চেয়ার আজ ফাঁকা। বেলা এগারোটা বাজে, অথচ এখনো জনাব মোহাম্মদ তোসররফ আলি তশরিফ আনেননি, এ-এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় তিনি হাজির হন দপ্তরে। আজ এখনো কেন এলেন না ভদ্রলোক? কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? ইশতিয়াক মোহাম্মদ তোসররফ আলির জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করে। তার এই সহকর্মী ভদ্রলোকটি বিশ্বসুদ্ধ সবার ওপর বিরূপ, সারাক্ষণ খেঁকিয়ে থাকেন, ইশতিয়াকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত হেসে কোনো কথা বলেননি, তবু তার অনুপস্থিতি ইশতিয়াককে ভাবায়। আধঘন্টা পরে অবশ্য জানা গেল যে তিনি দু'দিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছেন।

মোহাম্মদ তোসররফ আলি ছুটিছাটা কমই নেন। খামোকা অফিস কামাই করার প্রবণতা তার মধ্যে কখনো লক্ষ করেনি ইশতিয়াক। তাই, ইশতিয়াক আবার ভাবে, ভদ্রলোকের কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? রগচটা মানুষ তিনি, হাইপারটেনশনের প্রবণতা আছে। কথায় কথায় একদিন জানিয়েছিলেন ইশতিয়াককে। প্রায়শই ওষুধ খেতে হয়। ডাক্তার বলেছেন, জীবনভর খেয়ে যেতে হবে।

ইশতিয়াক ফাইলের কাজে ডুবে যায়। কাজের চাপে সে বিস্মৃত হয় আজ সকালে দেখা সেই প্রাণী এবং মোহম্মদ তোসররফ আলির কথা। বেশ কিছু কাজ জমে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করতে না পারলে বস নারাজ হবেন, হয়তো দুচার কথা শুনিয়েও দিতে পারেন।

কাজ করতে করতে এক সময় ক্লান্তি এল তার। পিয়নকে ডেকে বলল, 'এক পেয়ালা চা এনে দিন তো তাড়াতাড়ি।' সচরাচর পিয়নকে সে আপনি বলেই সম্বোধন করে। মাঝে-মধ্যে যে মুখ থেকে তুমি বেরিয়ে পড়ে না, এমন নয়। কী পিয়ন, কী রিকশঅলা—কারুকেই সে সহজে তুমি বলে না। বিশেষ করে যারা বয়স্ক, তাদের তুমি বলতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকে।

ইশতিয়াক ফাইল একপাশে সরিয়ে রেখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়। অফিসের ক্যান্টিনের চা ইশতিয়াকের পছন্দ। তাই সে ঘন ঘন চায়ের অর্ডার দেয়। কোনো অতিথি এলে তো কথাই নেই, এমনকি একা একা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে তার ভালো লাগে। মাঝে-মধ্যে জনাব মোহাম্মদ তোসররফ আলিকেও আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করে। জনাব তোসররফ অবশ্য যাকে বলে গ্রাজিলিংলি ইশতিয়াকের অর্ডার দেয়া চা পান করেন। সেই চা তাঁর কাছে বিস্বাদ লাগে কিনা তার খবর অবশ্য ইশতিয়াক রাখে না। জনাব তোসররফ আলি যখন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, তখন দূর থেকে আড়চোখে ইশতিয়াক ওর দিকে তাকায়। দৃশ্যটি সে উপভোগ করে। মোহাম্মদ তোসররফ আলিও মাঝে-মধ্যে ইশতিয়াকের জন্যে চায়ের অর্ডার দেন, বোধহয় নিজেকে দায়মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ইশতিয়াককে চা না খাওয়ালে যেন ইশতিয়াকের অর্ডার-দেওয়া চা তার জঠরে কোনো একটা চক্রান্ত শুরু করে দেবে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নিজের অজান্তেই ইশতিয়াক মোহাম্মদ তোসররফ আলির চেয়ারের দিকে দৃষ্টি দেয়। আর অমনি চমকে ওঠে সে, ভূত দেখার মতো। না, মোহাম্মদ তোসররফ আলি সেই চেয়ারে উপবিষ্ট নন। তাঁর জায়গায় বসে আছে ইশতিয়াকের ঘরের কোণের সেই প্রাণী যার কয়েকটি শুঁড় নড়ে সূক্ষ্ম তারের মতো। প্রাণীটির আকার এখন সামান্য বেড়েছে বলে মনে হয় ইশতিয়াকের। সকাল বেলায় যেমনটি ছিল, এখন আর ঠিক তেমন নয়। একটু অন্যরকম। ইশতিয়াকের গা শিরশিরিয়ে ওঠে। বেশিক্ষণ সে তাকাতে পারে না মোহম্মদ তোসররফ আলির চেয়ারের দিকে। চোখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু তার ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ দুটো বারবার সেদিকেই চলে যায়। এবার চেয়ার শূন্য। সেখানে কিছুই নেই। আগন্তুক নিমেষে উধাও। ইশতিয়াকের কাছে ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হয়। এবারও কি তার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে? হতেও পারে। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে সে, এক নাগাড়ে পাক্কা দুঘন্টা। মাঝে একফোঁটা বিশ্রাম পর্যন্ত নেয়নি, চোখ বুলোয়নি খবরের কাগজে কিংবা চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করেনি হালকা ভাবনার ভেলায়। একটানা বেশ কিছুক্ষণ কাজ করলে ইদানীং ইশতিয়াকের মাথা ঝিমঝিম করে। চোখে ভর করে ক্ষণিক অন্ধকার। গোড়ার দিকে সে ভেবেছিল, হয়তো চোখ খারাপ হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, চক্ষু-বিশেষজ্ঞ তার সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায় ইশতিয়াক। লেখাপড়া নিয়ে যাকে থাকতে হয় প্রায় অষ্টপ্রহর তার চোখ খারাপ হলে কি চলে? চোখ কচলাতে

কচলাতে ইশতিয়াক আড়চোখে আরো একবার জনাব, তোসররফ আলির চেয়ারের দিকে তাকায়, তারপর বিচলিত মনে হাতঘড়ি দেখে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর তর তর করে নামতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে, লিফট-এর জন্যে অপেক্ষা করে না।

রাস্তায় নেমে বুক ভরে নিশ্বাস নেয় ইশতিয়াক। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল অফিসের কামরায়। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে পেরে তার ভালো লাগছে। যেন এই মুহূর্তে সে আরোগ্য লাভ করল। এখন আর কোনো ভয় নেই। চোখের সামনে বয়ে চলেছে জনস্রোত, ছুটে যাচ্ছে নানা ধরনের যানবাহন। মানুষের গন্ধে বাতাস ভরপুর। ইশতিয়াক মিশে যায় জনস্রোতে। ঢাকা শহরে লোক, লোক আর লোক, ইশতিয়াক তার সামনের ভিড়ের দিকে চোখ রেখে ভাবে। সে নিজেও এদের একজন। এখন আমাকে আলাদা করে সনাক্ত করার জো নেই, আমি মিশে গেছি এই বিপুল জনমানুষের দঙ্গালে, এখন আমার নিজস্ব কোনো মুখ নেই, আমি সে সম্পূর্ণ আলাদা একটি সত্তা, এই জনপিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র একজন মানুষ—এই মুহূর্তে তার কোনো স্বীকৃতি নেই ভাবলেশহীন ভিড়ের কাছে, ইশতিয়াক হোসেন ভাবছে চলতি পথে। অথচ তার, এবং ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষের একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেকের আলাদা জগৎ আছে। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একটি কাহিনি, সে কাহিনির বুনন চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই যে লোকটির সঙ্গে ইশতিয়াকের ধাক্কা লাগল, তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি দুঃখী। তার চেহারায় দুঃখের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে; অন্তত ইশতিয়াকের কাছে তাই মনে হলো।

ভদ্রলোক কি বিবাহিত? হতে পারেন বিবাহিত, আবার না-ও হতে পারেন। ধরা যাক ভদ্রলোক বিবাহিত এবং তার একটি সংসার আছে। অভাবের সংসার বোঝাই যায়। ভদ্রলোকের পাঞ্জাবিটা ময়লা, কাঁধের কাছে ছেঁড়া। ক্লান্ত পায়ে হাঁটছেন তিনি, বলা যায় শরীর নামক গাধাটিকে টেনে নিয়ে চলেছেন। হয়তো ঘরে তার স্ত্রী আছেন, যিনি সংসারের অ্যাসিডে ক্ষয়িত এবং মুখরা। হয়তো তিন-চারটে পুষ্যি আছে সেই লবেজান সংসারে। সারভান্তিসের ডন কিহোট উপন্যাসে, ইশতিয়াকের মনে পড়ে, এক জায়গায় নায়ক এক মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে—কে একে হত্যা করেছে? জবাব পায়—বিধাতা তাকে জ্বরের মাধ্যমে হত্যা করেছেন, এই ভদ্রলোকটিকে, যার পাঞ্জাবি ময়লা, কাঁধের কাছে ছেঁড়া, খোদা হত্যা করেছেন, অভাবের মাধ্যমে। অভাবের জন্যেই কি ভদ্রলোক দুঃখী? না কি স্ত্রীর হুলযুক্ত সান্নিধ্য তার মুখে দুঃখের মানচিত্র তৈরি করেছে? ভাগ্যকে ধন্যবাদ, ইয়াসমিন মুখরা নয়। সংসারের অভাব অনটন নিয়ে তেমন কোনো নালিশ নেই তার। এখনো নেই। ভবিষ্যতের কথা কে জানে। যদি ইশতিয়াকের সঙ্গে শারমিনের বিয়ে হতো তাহলে কি তার সংসারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারত? সে কি মুখরা হয়ে উঠত এই ভদ্রলোকের কাল্পনিক গৃহিণীব কথা ভেবে?

ভিড়াক্রান্ত শহরের ফুটপাতে হেঁটে যেতে-যেতে ইশতিয়াক মনে মনে আবৃত্তি করে, 'জানিনি কখনো আগে এত লোক জীবনের বলি।' এখন এই মুহূর্তে যত লোক রাস্তায় হাঁটছে, রিকশা, স্কুটার, বাস কিংবা মোটরকারে যাচ্ছে, তারা সবাই একদিন মরে যাবে। সে নিজেও বাদ পড়বে না। হায়, মানবগোষ্ঠীর কী বিপুল অপচয়, কথাগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঘোরে ইশতিয়াকের মনের ভেতর। তার সামনে চলেছে মৃতের দীর্ঘ মিছিল। এখনো সে জীবন বিমা কোম্পানির শরণাপন্ন হয়নি। একটা জীবনবিমা করানো দরকার। দশ

হাজার টাকার একটা বিমা করালে ভালো হয়। সিনেমার রঙিন পোস্টার ছাপিয়ে ইয়াসমিনের প্রসাধনবিহীন মুখ ভেসে ওঠে ইশতিয়াকের চোখে। কিস্তির যোগান দিতে পারবে তো? এমনিতেই সংসার চালানো মুশকিল; তার ওপর বিমার কিস্তি। না, বিমার দামি কাগজ সংগ্রহ করা আপাতত সম্ভব নয়। কে জানে, এ মুশকিল কখন আসান হবে। ভদ্রলোক, যার পাঞ্জাবি ময়লা, কাঁধের কাছে ছেঁড়া, তিনি কি বিমা করিয়েছেন তাঁর জীবনের? এ সওয়ালের জবাব ইশতিয়াক কোনো দিন পাবে না। আপাতত ভদ্রলোক চলন্ত বাসের একটা হাতল ধরে ঝুলছেন। দৃশ্যটি দেখে ইশতিয়াকের কেমন মায়া লাগে।

॥ ৫ ॥

অনেকদিন পর ইশতিয়াক আবার লিখতে বসে। যে সম্ভাব্য উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়ের একটা নকশা সে তৈরি করেছিল কিছুকাল আগে সে অধ্যায়টি আজো অলিখিত রয়ে গেছে। একটি লাইন লেখা হয়নি। আজ সে করেই হোক শুরু করতেই হবে, মনে মনে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইশতিয়াক হোসেন। প্রথম বাক্যটি লিখে সে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর কেটে ফেলল। বাক্যটি মনের মতো হয়নি। আবার আঁচড় কাটে সাদা কাগজে, হোঁচট খায় বাক্যের মধ্যপথে। আবার কাটাকুটি। লিখতে পারছে না সে। অনেক দিনের অনভ্যাসের ফলেই কি লেখা হচ্ছে না? ইশতিয়াক খুব বেশি কখনো লিখে না, তেমন দ্রুত চলে না তার কলম। তবে এর আগে এরকম কখনো হয়নি।

প্রায়শ লেখায় ছেদ পড়েছে, কিন্তু কোনো ছেদ এমন দীর্ঘস্থায়ী হযনি। কিছুকাল পর লেখা শুরু কবতে গিয়ে এরকম বিড়ম্বিত হতে হয়নি তাকে। প্রাথমিক আড়ষ্টতার পর বরফ ফেটে উৎসারিত হয়েছে স্বচ্ছ ঝরণাধারা। আর আজ তার কলম অক্ষম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দু'তিন ঘন্টা শ্রমেব পর একটি বাক্যও তৈরি হয না—এই অভিজ্ঞতা শক্তিশালী লেখক ইশতিযাক হোসেনের পক্ষে খুবই নতুন। ভয় পায় সে। কুঁকড়ে যায নিজের ভেতর।

কে যেন বলেছে, বলবার মতো কিছু থাকলে লেখা হয ওঠে অনেক সহজ। তাহলে কি ইশতিয়াক হোসেনের বলবার কথা ফুরিয়ে গেছে? নতুন কোনো বক্তব্য কি তাব নেই আর? না কি সৃজনী ক্ষমতা ত্যাগ করে গেছে তাকে? কেন এমন হলো? কেন তার মগজ আগের মতো সক্রিয় নয় আর? নিজের এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পায় না ইশতিয়াক।

রাত বাড়ছে, অথচ একটি লাইনও লেখা হলো না। এই লিখতে না পারা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা শুধু একজন লেখকই অনুভব করতে পারেন। না-লেখার মরুভূমিতে হঠাৎ পান্থপাদপের মতো জেগে ওঠে শারমিনের স্মৃতি। শারমিনকে সে একবারে মুছে ফেলতে পারেনি। মাঝে-মধ্যে মনে পড়ে যায় ওর কথা। বিশেষত যখন সে মুশকিলে থাকে, তখনই বেশি করে মনে পড়ে শারমিনকে। শারমিনের বিয়ে হয়েছে একজন কৃতী স্থপতির সঙ্গে। সে এখন তিন সন্তানের জননী। আনিস যে শারমিনকে বিয়ে করবে না, শারমিন তা ভালো করেই জানত। শারমিনও হয়তো ওকে স্বামী হিসেবে কামনা করেনি কোনোদিন। শারমিনের জীবনে ফাটল ধরানোয় আরো সুন্দর হয়েছে। তবে শরীর ও মনের দ্বন্দ্বে আজো সে ঘোচাতে পেরেছে কিনা তা শুধু শারমিনই বলতে পারে। অন্য কারো জানার উপায় নেই। শারমিন ভালো থাক, সুখে থাক।

শারমিনের স্মৃতিও তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে ব্যর্থ হল আজ। হঠাৎ একটা চিন্তা মাছের মতো ঘাই মারে ইশতিয়াকের মনে। যখন থেকে সেই শুঁড়-অলা প্রাণীটা তার চোখে পড়েছে, তখন থেকেই কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। প্রাণীটাকে আরো কয়েকবার দেখেছে সে ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু একথা কাউকে সে বলেনি, এমনকি ইয়াসমিনকেও নয়। এই সংবাদের গোপনীয়তা ভূতলবাসী রাজনৈতিক কর্মীর মতো বজায় রেখে চলেছে ইশতিয়াক। এই খবর ফাঁস হয়ে গেলে সবাই তার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। ছেড়ে কথা বলবে না কেউ। এসব উদ্ভট চিন্তা থেকে রেহাই পেতে চাও—যাও ডাক্তারের কাছে। এমন হ্যালুসিনেশন মন থেকে মুছে ফেলতে চাও—যাও মনোবিজ্ঞানীর কাছে। এর চেয়ে বরং চুপচাপ থাকাই শ্রেয়।

তবে কি সত্যি সত্যি উদ্ভট ভ্রান্ত ছবি হানা দেয় আমার দৃষ্টি-পথে? নিজেকে প্রশ্ন করে ইশতিয়াক। এ তার দৃষ্টিভ্রম, এ-কথা সে মেনে নেবে না। দৃষ্টিভ্রম একবার দুবার হতে পারে, বরাবর একই প্রাণী এভাবে তার চোখে পড়বে কেন?

ইশতিয়াক বুঝতে পেরেছে, তার লিখতে না পারার সঙ্গে এই অষ্টভুজবিশিষ্ট প্রাণীটির কোথায় যেন একটা যোগসাজস রয়েছে। এ বিষয়ে তার কোনো দ্বিধা নেই। ইশতিয়াক কি ইদানীং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে? নইলে তার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী এই' অচেনা তার অচেনা নয়, খুবই চেনা, বহু ছবিতে এবং বিদেশি ফিল্মে দেখেছে। অষ্টভুজ-বিশিষ্ট এই প্রাণীর নাম অক্টোপাস। নিরীহ, অথচ ভীষণ হিংস্র এই জলচর প্রাণী। এই অষ্টভুজপাশে যে একবার আবদ্ধ হয় তার আর নিস্তার নেই।

সুখের বিষয়, এই অক্টোপাসটি এখনো তার হিংস্রতার কোনো পরিচয় দেয়নি, রবারের টিউবের মতো বাহুগুলি দুলিয়ে দুলিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। রোজ সকালে ইশতিয়াক খবরের কাগজের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। হকার না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না সে। বিশেষ একটি সংবাদের জন্যে ইশতিয়াক লোলুপ হয়ে ওঠে, তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কিন্তু কোনো রিপোর্টার আজ অব্দি এই স্থলচর অক্টোপাসের প্রতিবেদন দাখিল করেনি পাঠকদের কাছে। প্রতিদিন হতাশ হয়ে খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দেয় ইশতিয়াক।

'আজো সারারাত জেগে জেগে কাটিয়ে দেবে নাকি? সেই সকালে যে আবার অফিসে যেতে হবে, সে খেয়াল আছে?' বিছানা থেকে ইয়াসমিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ঘুমেপাওয়া কণ্ঠস্বর।

'এইতো আর কিছুক্ষণ, তুমি ঘুমোও।'

'এভাবে বাতি জ্বালিয়ে রাখলে কেউ ঘুমোতে পারে নাকি?'

'পাঁচ মিনিট পরেই স্যুইচ অফ করে দেবো'।

ইশতিয়াক কেন যে পাঁচ মিনিটের কথা বলল তা' সে নিজেই জানে না। কথার পিঠে কথা বলার জন্যেই হয়তো। কালই, ইশতিয়াক মনস্থির করে, একটা টেবিল ল্যাম্প কিনতে হবে। সত্যিই তো, এভাবে বাতি জ্বালিয়ে রাখলে ঘুমোনো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। চোখের সামনে সাদা কাগজ কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে জেগে আছে, এভাবে সারারাত বসে থাকলেও কোনো লাভ নেই। এখন তার জন্যে সময় বড়ো নিষ্ফলা!

ইশতিয়াক বাতি নিবিয়ে শুতে যায়। মনে হয়, ইয়াসমিন এখনো ঘুমোয়নি। কিছুক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করছে।

'এই শোনো,' ইশতিয়াক প্রায় প্রেতায়িত স্বরে স্ত্রীকে ডাকে।

'কী'?

'না, কিছু না।'

'তাহলে এভাবে ডাকলে কেন? নিশ্চয় আমার কাছ থেকে কিছু লুকোতে চাইছ।'

'লুকোবার কী আছে?'

'তাহলে কিছু বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলে কেন?'

'না, তেমন কোনো কথা নয়, বলছিলাম কাল একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে আনব। রাতে বাতি জ্বালিয়ে রাখি বলে তোমার খুব কষ্ট হয়।'

ইশতিয়াক যা বলতে চেয়েছিল তা না বলে একেবারে ভিন্ন কথা বলল। ইয়াসমিনকে সে অক্টোপাসের কথা বলতে চেয়েছিল, যে বারবার দেখা দিয়ে, ইশতিয়াককে ভীষণ চমকে দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এই খবর শুধু ইশতিয়াক জানে, আর কেউ নয়। কিন্তু এ-কথা শেষ পর্যন্ত সে ইয়াসমিনকে বলতে পারল না।

অন্ধকারে নিজেকে ভীষণ একলা লাগে। ইয়াসমিন পাশে আছে, তবুও। ইশতিয়াক বুকের কাছে একটা চাপ অনুভব করে। আটটি রবারের শক্ত টিউব ওকে জড়িয়ে ধরেছে। তার পাশে ইয়াসমিন নেই, আছে অষ্টভুজসম্বলিত সেই প্রাণী।

'ছাড়ো আমাকে ছাড়ো, ইশতিয়াক আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু ওর গলা থেকে কোনোরকম শব্দ বেরুচ্ছে না। গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে শুধু।

'কী হলো? আমাকে এভাবে ঠেলছ কেন? বিছানা থেকে পড়ে যাব যে,' ইশতিয়াককে ঝাঁকুনি দেয় ইয়াসমিন। 'একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম,' ইশতিয়াক কোনোমতে এই শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করে।

'ঘুমোলে কখন যে দুঃস্বপ্ন দেখবে?'

ইশতিয়াক কোনো উত্তর না দিয়ে ঘুমোবার ভান করে। ইয়াসমিন তাকে আর খোঁচায় না। তার স্বামী কিছুদিন ধরে বেশ খাপছাড়া ব্যবহার করছে—ইয়াসমিন লক্ষ করেছে। এমনিতেই তার স্বামী , ইশতিয়াক হোসেন একটু আলাদা ধরনের মানুষ। সে কিছু বুঝুক আর না-ই বুঝুক, অন্তত একটুকু বোঝে যে, ইশতিয়াকের জীবন শুধু আলুপটলের হিসেব নির্ভর নয়। সে ভালো লেখে। তার স্বামী রীতিমতো খ্যাতিমান। এ নিয়ে ইয়াসমিনের মনে একটা লুকানো গৌরববোধও আছে, যদিও সে ইশতিয়াক হোসেনের ভক্ত পাঠিকাদের একজন নয়। লোকটা কিছুদিন ধরে লিখতে পারছে না বলেই হয়তো কখনো কখনো অত অদ্ভুত আচরণ করে ঘুমের ভেতর কেঁদে ওঠে। ইয়াসমিনের সহানুভূতি হয় ইশতিয়াকের জন্যে, তার সহানুভূতি এক নিবিড় আলিঙ্গন হয়ে যায় নিমেষে, সে উষ্ণ ঠোঁট রাখে পুরুষ ওষ্ঠে। এই স্পর্শে আস্তে আস্তে ফণা তোলে ইশতিয়াকের পুরুষত্ব। এমন প্রবলভাবে, অনেকদিন এমন নিবিড়ভাবে ইশতিয়াকের সঙ্গে মিলিত হয়নি ইয়াসমিন।

অনেক বেলা করে ওদের ঘুম ভাঙে। ইয়াসমিন তাড়াহুড়ো করে ছুটে যায় রান্নাঘরে। কখন নাশতা তৈরি হবে, কখনই বা খাবে ইশতিয়াক, এই চিন্তা তাকে রান্নাঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ইশতিয়াক দাঁত ব্রাশ করতে করতে ভাবে টেবিল ল্যাম্পের কথা। আজ একটা টেবিল ল্যাম্প কিনবে, এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে কাল রাতে। সিদ্ধান্ত তো নিয়েছে, কিন্তু ঐ চেরাগটি আসবে কোত্থেকে? মাস এখন অন্তিম পর্বে, এখন দেড়শো টাকা খরচ করে একটা জলজ্যান্ত টেবিল ল্যাম্প কেনার সামর্থ্য তার নেই। সে সামান্য কটি টাকা আছে তা দিয়ে বাকি দিনগুলি কাটানোই মুশকিল। ইতোমধ্যে ইয়াসমিন জানিয়ে দিয়েছে যে, তার ট্রেজারি একেবারে ফাঁকা। না, কুলি করার সময় ইশতিয়াক মনে মনে বলে, এ মাসে টেবিল ল্যাম্প কেনা অসম্ভব। টাকা পাবে কার কাছে? অফিস থেকে কিছু আগাম নেয়া হয়ে গেছে; এখন চাইলেও পাবে না। যে দু'তিনজন বন্ধু আছে ওদের অবস্থাও তারই মতো কেরাসিন। অর্থাৎ এক অন্ধের অন্য অন্ধের কাছে পথ সন্ধানের সামিল।

প্রকাশকের দহলিজে ধর্না দেবে? তাতে কোনো ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। তাঁর দহলিজে হাজির হলে জনাব প্রকাশক এক গাল হেসে সাদর (অকৃত্রিম?) অভ্যর্থনা জানাবেন, ব্যস্ত হয়ে উঠবেন চা-বিস্কুট আনানোর জন্যে। প্রকাশক চায়ের অর্ডার দিলেই বুঝে নিতে হবে আজ আর ডাল গলবে না। থরে থরে সাজানো রং-বেরঙের বইগুলির দিকে একটু তাকাবে ইশতিয়াক, তারপর অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে আমতা-আমতা করে, যেন ভিক্ষা চাইছে, প্রাপ্তির প্রসঙ্গটি তুলবে। 'এভাবে কথা বলে খামোখা লজ্জা দেবেন না ইশতিয়াক সাহেব। কিছুদিন পরে আপনার পাওনা পুরোপুরি চুকিয়ে দেবো', প্রকাশকের ভাবভঙ্গি দেখে কথাসাহিত্যিক ইশতিয়াক হোসেনের মনে হবে যে ভদ্রলোক ওর কাছ থেকে একসময় টাকা ধার নিয়েছেন, সেটা শোধ করার জন্য কিছু সময়ের মহলত চাইছেন।

'আমার খুব দরকার ছিলো,' চোখের মাথা খেয়ে ইশতিয়াক বলবে। 'জানেনই তো বাজার ভীষণ মন্দা। ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে।'

ইশতিয়াক জানে বৈকি। বইয়ের বাজার রবরবা নয়, এ-কথা লেখক ইশতিয়াক হোসেন জানে। তা বলে জনাব প্রকাশক তার রয়েলটি থেকে সামান্য কিছু টাকা দিতে পারবেন না, অতটা খারাপ পরিস্থিতি নিশ্চয় নয়। তাহলে তো বেবাক বইয়ের দোকানের জায়গায় অন্যান্য পণ্যের বিপণী বসে যেতো। কিন্তু প্রকাশকের কাছে কোনো যুক্তি খাটে না। তাই, ইশতিয়াককে খালি হাতে ফিরে আসতে হবে।

'নাশতা তৈরি, খেতে এসো,' ইয়াসমিন তাড়া দেয়। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ইশতিয়াক ভাবনার জাল গুটিয়ে আনে। দেশের প্রকাশনা সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে সে মুখে রুটি-ভাজি পোরার জন্যে খাবার টেবিলের দিকে এগোয়। এবং সে মুহূর্তেই তার মনে পড়ে গেল অষ্টভুজী প্রাণীটির কথা। আশেপাশে তাকায়, হয়তো সেটা কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। প্রাণীটি আগেকার মতো গোবেচারী নয় আর। তার প্রমাণ গতরাতের বরারের আটটি টিউবের হামলা। অতর্কিত হামলায় ইশতিয়াকের দম বন্ধ হয়ে এসেছিল, কোনোমতে রক্ষা পেয়েছে সে।

'দু'একদিনের মধ্যে টাকা জোগাড় করতে না পারলে চুলোয় হাঁড়ি চড়বে না, বলে রাখছি,' ইয়াসমিনের সতর্কবাণী।

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু জোগাড় করব কোত্থেকে? সব পথ বন্ধ।'

'কেন, তোমার প্রকাশকের কাছ থেকে তো নিতে পারো।'

ইশতিয়াকের ঠোঁটে একফালি বাঁকা হাসি।

'আমি কি কোনো হাসির কথা বলেছি,' ইয়াসমিনের গলায় বিস্ময়। 'না, হাসির কথা বলবে কেন তুমি?'

'তাহলে যে হাসছো বড়ো।'

'হাসছি, কারণ একটু আগেই আমি জনাব প্রকাশকের কাছে হাত পাতার একটা মহড়া দিচ্ছিলাম মনে-মনে। সেই নাটকের পরিণতিসুদ্ধ ভাবা হয়ে গেছে। তাই আমার হাসি পেল।'

'পরিণতিটা কী দাঁড়াল শুনি?'

'খাতি হাত।'

'মানে?'

'মানে শূন্য হাতে ফেরা।'

'কেন, তা হবে কেন? অনেকদিন তুমি প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা নাওনি।'

'বইয়ের বাজার এখন মন্দা'।

'একবার গিয়েই দেখ না। আগে থেকে হতাশ হবার কোনো মানে হয় না।'

ইয়াসমিন দুনিয়াটাকে যত সহজ মনে করে, আসলে এই রঙ্গালয়টি তত সহজ জায়গা নয়, ইশতিয়াক আটার রুটির একটা অংশ ছিঁড়ে নেয়ার ফাঁকে ভাবে। তারপর স্ত্রীর মায়াময় চোখে চোখ রেখে বলে, 'ঠিক আছে, অফিস থেকে ফেরার পথে জনাব প্রকাশকের খুরে সেলাম ঠুকে আসবো একবার। দেখি আজ বরাত ফেরে কিনা।'

'আমার মন বলছে আজ তুমি টাকা পাবে।'

'তোমার মন যা বলে সচরাচর তা হয় বটে,' ইশতিয়াক গৃহিণীকে খুশি করতে চায়। ইয়াসমিন আনন্দিত ছন্দে রান্নাঘরে যায় চা করে আনার জন্যে। ইয়াসমিন নিজের হাতে চা বানায়, রাঁধুনির হাতের চা খাওয়া যায় না।

'প্রকাশকের কাছে যাব একবার,' যেন নিজেকে আশ্বস্ত করছে ইশতিয়াক। আজকালের মধ্যে কিছু টাকা জোগাড় করতে না পারলে নৌকো চড়ায় ঠেকবে। শিগগিরই টেবিল ল্যাম্প আর কেনা হচ্ছে না। এই বিলাসিতা থেকে আপাতত নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হবে এবং আরো কিছু খরচ কমিয়ে আনতে হবে। সিগারেট সে খায় না, আগে খেত একটু আধটু; তা-ও এখন ছেড়ে দিয়েছে চিকিৎসকের পরামর্শে। গলা জ্বালা করত বলে ওর সিগারেট খাওয়া বারণ। ইশতিয়াক সিগারেট খায় না, ইয়াসমিন খুশি। অনেকগুলি টাকা বেঁচে যায়, শুধু এজন্যে নয়, সিগারেটের গন্ধ সে বরদাস্ত করতে পারে না।

ইশতিয়াক দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখে, পামোলিভ শেভিং ক্রিমের টিউবটি নিঃশেষিত প্রায়। বড়ো জোর আর পাঁচ দিন চলবে। আগামী মাস থেকে পামোলিভ শেভিং ক্রিম ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইশতিয়াক। বাপরে, যা দাম, এই অসম্ভব বিলাসিতা

পোষাবে না হে। আফটার-শেভ লোশনের বদলে স্যাভলন ব্যবহার করো। কলগেটের বদলে টিবেত ডি ফাইভ। এখন থেকে এভাবেই ক্রমাগত খরচ কমিয়ে আনতে হবে। মোট কথা, কঞ্জুসি করে সংসার চালাতে হবে। নইলে কিছুতেই হালে পানি মিলবে না।

॥ ৬ ॥

অফিসে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল ইশতিয়াকের। অফিসের দোরগোড়ায় পৌঁছেই সে একটা থমথমে ভাব লক্ষ করে। বিগ বস কি খেপে গেছেন কারো ওপর? নাকি কোনো দাবি-দাওয়া নিয়ে ঝামেলা? কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে এগোয় লিফট-এর দিকে। লিফটম্যানের কাছেই শুনল একটা দুঃসংবাদ। শোকসংবাদ। জনাব মোহাম্মদ তোসররফ আলি ইন্তেকাল করেছেন কাল রাত এগারোটায়। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। খুব বেশি বয়স হয়নি ভদ্রলোকের। সাতচল্লিশ- আটচল্লিশ হবে। অথচ এরই মধ্যে খবরের কাগজের ভাষায় 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন।' আজকাল খবরের কাগজ খুললেই এ ধরনের খবর চোখে পড়ে বেশি। বাংলাদেশে হৃদরোগ পয়লা নম্বরী হন্তারক হয়ে উঠেছে। হৃদরোগের কথা শুনলেই বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে, কোনদিন যে বিনা নোটিশে আজরাইল এসে হাজির হবে কে জানে।

নিজের অফিস রুমে ঢুকেই মরহুম তোসররফ আলির চেয়ারের দিকে তাকায়। হায়, কাল যিনি ছিলেন একজন জলজ্যান্ত মানুষ, আজ তার নামের আগে মরহুম শব্দটি ব্যবহার করতে হচ্ছে। বিষণ্ণ ইশতিয়াক হোসেন নিজের চেয়ারে বসে থাকে চুপচাপ। অভ্যাসবশত পিয়নকে ডাকার জন্যে কলিং বেল টিপতে গিয়েও টিপল না। অফিসে এসেই ইশতিয়াক এক পেয়ালা চা খায়। এটা তার অনেকদিনের অভ্যাস। কিন্তু আজ কেন জানি কলিং বেল বাজাতে মন চাইছে না তার। ইশতিয়াক আবার তাকায় মরহুম মোহম্মদ তোসররফ আলির চেয়ারের দিকে। শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। তার ঐ সহকর্মীটির সঙ্গে যে খুব একটা কথা বলতো তা' নয়, তিনিও আলাপী ছিলেন না। অধিকাংশ সময় এই কামরাটি বেশ চুপচাপই থাকত। মাঝে-মাঝে বেজে উঠত কলিং বেল। কলিং বেলের আওয়াজে ঘরের নিস্তব্ধতা আরো প্রখর হয়ে উঠত। কিন্তু ইশতিয়াকের কাছে আজকের মতো এত নিশ্চুপ লাগেনি কখনো।

বস্তুত সারা অফিসটাই আজ বড়ো বেশি নিশ্চুপ। দু'একজন ছাড়া প্রায় সবাই গেছে মরহুম মোহম্মদ তোসররফ আলির বাড়িতে। দাফন কাফনের ব্যাপার আছে। তাকে নাকি জুরাইনের গোরস্তানে দাফন করা হবে। অনেকেই যাবে মরহুমের লাশের সঙ্গে। ইশতিয়াকেরও যাওয়া উচিত। কিন্তু ইশতিয়াক হোসেন সাধারণত বিয়ে ও মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলে। সে চুপচাপ বসে থাকে তার চেয়ারে, চা না খেয়ে, কোনো কাজ না করে।

এই তো সেদিন, ইশতিয়াক ভাবে, মরহুম তোসররফ আলির শূন্য চেয়ারে অষ্টভুজী জন্তুটি বসে ছিলো কিছুক্ষণ। জন্তুটি ঐ চেয়ারে বসেছিলো বলেই কি ভদ্রলোক মারা গেলেন? প্রশ্নটি ইশতিয়াককে বিচলিত করে। ওর শিরদাঁড়ায় একটা ঠান্ডা বিদ্যুৎ বয়ে

যায়। ভয় পায় সে। নিজের ও ইয়াসমিনের কথা ভেবে ভয় পায়। যদি সে মরে যায় হঠাৎ, মরহুম তোসররফ আলির মতো? ইয়াসমিনের কী হবে তখন? তার সংসার ছারখার হয়ে যাবে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সামর্থ্য ইয়াসমিনের নেই। আজ অব্দি একটা জীবন বিমা পর্যন্ত করতে পারেনি ইশতিয়াক। ইয়াসমিনকে পিতৃগৃহে আজীবন অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে। ইয়াসমিনের যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়, তাহলে হয়তো সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। ইশতিয়াকের আকস্মিক মৃত্যুর পর এই অল্প বয়সে ইয়াসমিন বিধবা সেজে থাকবে, এটা ইশতিয়াক কামনা করে না কখনো। সে আধুনিক মনের অধিকারী, র‍্যাশনালিজমের ভক্ত। কিন্তু তবু ইয়াসমিনের দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে ইশতিয়াক কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়।

বিকেল চারটায় অফিসে শোকসভা হবে। বড়ো সাহেবের সভাপতিত্বে। এই শোকসভায় সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে। ইশতিয়াক হোসেনকেও হাজির থাকতে হবে, যদিও এ ধরনের অনুষ্ঠানে শরিক হতে সে অনাগ্রহী।

শোকসভা শুরু হতে হতে সাড়ে চারটা বেজে গেল। অনেকে মরহুম মোহাম্মদ তোসররফ আলির প্রচুর গুণগান করে বক্তৃতা দিলেন। মরহুমের যে এত গুণ ছিল, তা অবশ্য এর আগে কেউ আবিষ্কার করেনি। এক সময় ইশতিয়াকের নাম ঘোষণা করা হলো। তার সহকর্মী সম্পর্কে কিছু বলতে হবে তাকে। জনাব ইশতিয়াক হোসেন সাহিত্যিক, তার কাছে সবাই একটি ভালো বক্তৃতা প্রত্যাশা করে। কিন্তু ইশতিয়াক বলতে টলতে পারে না। কিছু বলার জন্যে উঠে দাঁড়ালেই তার মাথা ঝিমঝিম করে, কানের দু'পাশে ঝাঁ ঝাঁ করে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। যে কথাটা যখন বলা দরকার, তখন সে-কথা কোনোক্রমেই মনে পড়ে না। বাক্যগুলি তার নিজের কাছেই নড়বড়ে মনে হয়।

তবু কিছু বলতে হবে আজ। 'মাননীয় সভাপতি, আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ', বলে একটা ঢোক গিলে ইশতিয়াক বক্তৃতা শুরু করে। সে-ও অন্যান্যদের মতো গুণকীর্তন করলো মরহুমের। বক্তৃতার মাঝখানে সে হঠাৎ অমৃতপুরুষ যিশুর কিছু কথা ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হলো। বলল, 'বলায়-চলায় এক হও। উপদেশ না হয়ে উদাহরণ হয়ে ওঠো। ভান বিসর্জন দিয়ে প্রাণে প্রমাণ দাও। মুখসর্বস্ব না হয়ে কর্মসর্বস্ব হও।' শেষ পর্যন্ত ইশতিয়াক হোসেনের বক্তৃতাটি অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো হয়ে গেল। শোকসভা না হলে করতালিতে মুখর হয়ে উঠত কনফারেন্স রুম। সভা শেষ হল প্রায় পৌনে আটটায়। বক্তারা কেউ সহজে থামতে চান না, থামতে জানেনও না। আমাদের যে জিনিসটির অভাব সবচেয়ে বেশি সেটি হল মাত্রাজ্ঞান, এ-কথা ইশতিয়াক মনে মনে উচ্চারণ না করে পারল না। বিশেষ করে কারো মৃত্যু হলে আমরা মৃত ব্যক্তিটি সম্পর্কে কাহনের পর কাহন কাহিনি ফেঁদে বসি। জীবিতাবস্থায় যে প্রশংসা তার ভাগ্যে জোটে না, মৃত্যুর পর তা সুবোধ বালকের মতো এসে যায় এক লহমায়। এই তো সেদিন, ইশতিয়াকের মনে পড়ে যায়, একজন প্রাবন্ধিক, মরহুম সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে জেমস জয়েসের সঙ্গে তুলনা করলেন। ওয়ালিউল্লাহ নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক, ইশতিয়াক তাঁর একজন অনুরক্ত ভক্ত, কিন্তু তা বলে কি তাঁকে জেমস্ জয়েস বানিয়ে ফেলতে হবে? হালে কে একজন, এই মুহূর্তে তার নাম মনে পড়ছে না, সদ্যপ্রয়াত এক কবিকে টি এস এলিয়টের টাইটেল দিয়েছেন। আমরা এক নিশ্বাসে অনেকগুলি বিশ্ববরেণ্য নাম আউড়ে

ফেলতে পারলে বেজায় আহ্লাদিত হই। আমাদের দেশের কোনো লেখকের সাহিত্যকৃতি প্রসঙ্গে কোনো নামজাদা বিদেশি লেখকের নাম উচ্চারণ করা যাবে না, এটা অবশ্য ইশতিয়াক স্বীকার করে না। তবে সেই উচ্চারণ একটু সংযত হওয়া দরকার। টমাস মান, এজরা পাউন্ড এমন নাম খানিক বুঝেসুঝে ব্যবহার করাই সমীচীন।

এ ধরনের অতিশয়োক্তির ফলে মৃত ব্যক্তিটির সম্মান তো বাড়েই না, বরং তাঁর অসম্মান করা হয়। আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের দাঁত, ইশতিয়াক ভাবে, আজো উঠল না। যদি উঠত তাহলে হর হামেশা অর্বাচীন উক্তিরাশির উৎপীড়ন থেকে আমরা রেহাই পেতাম। মুড়ি মুড়কি একদরে বিকোতো না এখনকার সাহিত্যের বাজারে। এসব কথা মনে-মনে উচ্চারণ করে তৃপ্তি বোধ করে ইশতিয়াক? নিজের অভিজাত সাহিত্যরুচিকে মিহি পালকে সুড়সুড়ি দিয়ে উড়ে যায় সপ্ত আসমানে? না, আপাতত সে অফিসের লিফট-এ চড়ে দ্রুত নিম্নগামী। ওর তাড়া আছে। বই পাড়ায় আজ না গেলেই নয়। প্রয়োজন বড়ো বালাই।

কে জানে, এখন প্রকাশককে পাওয়া যাবে কিনা। সভার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইশতিয়াক বইপাড়ার দিকে রওয়ানা হয়। খোদাকে ধন্যবাদ, জনাব প্রকাশক তার চেয়ারে সমাসীন রয়েছেন। ইয়াসমিনের মন যা বলে তা সব সময় না হলেও, এবার কিন্তু ঠিকই হলো। আজ প্রকাশক জনাব মকবুল আহমদের মেজাজ যথেষ্ট শরিফ আছে। চা আনানোর জন্যে তেমন ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন না, শুধু মধুর হেসে বসতে বললেন। এবং কী আশ্চর্য, চাওয়ামাত্র টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলেন কোনো টালবাহনা না করেই।

কিছু ধরা-বাঁধা কথা তোতাপাখির মতো আওড়ানো থেকে নিরস্ত করলেন নিজেকে। টাকার পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবু এই আকস্মিক প্রাপ্তিযোগে কথাশিল্পী ইশতিয়াক হোসেনের প্রাণ রবিন পাখির মতো গান গেয়ে ওঠে। সে গানের সুর অবশ্য জনাব মকবুল আহমদের কান দিয়ে মরমে পৌঁছয়নি।

টাকা পেয়ে ইশতিয়াক আর বেশি দেরি করল না। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার। এক্ষুনি বাড়ি ফেরা দরকার।

আজ রাতে ইশতিয়াক লিখতে বসল না। লেখার প্রাণান্তকর চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। এজন্যে নয় যে বেশি রাত অব্দি বাতি জ্বালিয়ে রাখলে ইয়াসমিন বিরক্ত হবে, এজন্যেও নয় যে লিখতে হচ্ছে করছে না, উদ্যমহীনতা এখনো তাকে পেয়ে বসেনি। আসলে আজ সে বড়ো ক্লান্ত। মরহুম মোহাম্মদ তোসররফ আলি তাকে আপাদমস্তক ক্লান্ত করেছেন। পুরো দিনটাই তিনি ইশতিয়াকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, এমনকি তাকে দিয়ে শোকসভায় যোগদান ও বক্তৃতা করিয়ে ছেড়েছেন। এই দুর্বহ ক্লান্তির কথা ভাবতে গিয়ে ইশতিয়াকের নিজের বক্তৃতার কথা মনে পড়ে। না, আজকের বক্তৃতার জন্যে সে ফুল মার্ক পেতে পারে। তার অবসন্ন ঠোঁটে হাসি ফোটে। সে-ও দিব্যি ভণ্ডামি করতে জানে। কথায় চাকচিক্য দিয়ে সে যে কাল্পনিক তোসররফ আলিকে আজ নির্মাণ করেছে, তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক কতটুকু?

ইশতিয়াক নিজের এই কৃতিত্বে যতটা না বিস্মিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছে সেই পিয়নটির কথা ভেবে, যে প্রায় রোজই মরহুম তোসররফ আলির

ধমক খেত। ইশতিয়াক আজ তাকে কাঁদতে দেখেছে। সত্যি বলতে কি, মহব্বত মিয়ার মতো শোকহত অফিসের আর কাউকে মনে হয়নি। আমার কথাই ধরো না, ইশতিয়াক নিজেকে বলে, একটানা ক'টি বছর একই ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি জনাব তোসররফ আলির সঙ্গে, অথচ একবারও আমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠেনি। মনখারাপ হয়েছে সত্য, কিন্তু বিষাদ ছিল ক্ষণস্থায়ী। শোকসভা থেকে বেরিয়ে সোজা প্রকাশকের কাছে ছুটে গেছে সে, আর হাতে কয়েকটি নোট আসার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ গান গেয়ে উঠেছে রবিন পাখির মতো।

পিয়ন মহব্বত মিয়া সত্যি অবাক করেছে তাকে। তার আন্তরিকতা নিখাদ, তার মধ্যে সত্যিকারের মমত্ববোধ আছে। মহব্বত মিয়া শ্রদ্ধার পাত্র। যার কাছ থেকে ধমক আর বকুনি ছাড়া হয়তো কিছুই পায়নি, তার জন্যেই এমন কান্না। আশ্চর্য এই মানবিক সম্পর্ক। কখন যে কীভাবে দু'জন মানুষের মধ্যে সাঁকো তৈরি হয়ে যায়, তাকে বলতে পারে!

আজ রাতে লিখতে না বসার কারণ ইশতিয়াক অবসন্ন। কিন্তু এর আগেও ক্লান্ত শরীরে রাত জেগে সে লিখেছে পাতার পর পাতা। কালো পিঁপড়ের সারি সাজিয়ে তুলেছে খাতার সাদা পাতায়। ক্লান্তি তার লেখার অন্তরায় হয়নি; আজ লেখা তো দূরের কথা, হাতে কলম পর্যন্ত তুলে নিল না। তবে কি সে ভয়ে কলম ধরেনি, ঝুঁকে বসেনি টেবিলে, পাছে একটি লাইনও লেখা না হয়? ইশতিয়াক সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে বলেই লেখার টেবিল থেকে আজ দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেকে। একটা অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়েছে শারীরিক অবসাদকে। সে জানে সারারাত হাতে কলম নিয়ে বসে থাকলেও, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরলেও, কাগজে আঁচড়-মাচড় কিছুই পড়বে না। ইশতিয়াক এখন প্রেরণারহিত কবির মতো একটি মাটির ঢিবি যেন, পুরো একটা দেশলাইয়ের বাক্স ফুরিয়ে ফেললেও জ্বলবে না আতশবাজি। একথা ভাবতে গিয়ে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল ইশতিয়াক। আজ না হয় ক্লান্তির দোহাই পেড়ে ব্যর্থতাকে চোখ ঠারা গেল, কিন্তু কতকাল এভাবে সে নিজেকে ফাঁকি দেবে? কতকাল তার লেখকসত্তাকে সরিয়ে রাখবে লেখার টেবিল থেকে?

'ঘুমিয়ে পড়েছো?' ইশতিয়াক জানতে চায় ইয়াসমিন ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা, ওর কণ্ঠস্বরে একটা চাপা ভয়। ইয়াসমিন নিরুত্তর, ইশতিয়াক ঠান্ডা শ্বাস ফেলে। হঠাৎ সে খুব শীত অনুভব করে, যদিও শীতকাল শুরু হতে এখনো অনেক দেরি। যেন ওকে কেউ বরফঠাসা একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওর হাত-পা, মগজ অসহ্য ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে।

লোপা, ইশতিয়াক হোসেনের উপন্যাসের নায়িকা, বিছানার পাশে বসে। ওর চোখে হিরের ঝলক, ঠোঁটে হাসি। বুকের কাপড় খসে পড়েছে, স্বর্গীয় ফলের মতো দুটি স্তন ব্লাউজের নীচে দেদীপ্যমান। ইশতিয়াকের ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখবে নাকি ছুঁয়ে? লোপা কিছু মনে করবে না তো? ইশতিয়াক দেখতে চায় লোপার স্তন কেমন দৃঢ় আর সজীব। ইয়াসমিনের চেয়ে ভালো? শারমিনের চেয়েও? শারমিনের স্তন ইশতিয়াক কোনোদিন স্পর্শ করেনি, এমনকি হাতও ধরেনি। শারমিনকে সে ভালোবাসত দূর থেকে। তখন প্লেটোনিক প্রেমের প্রতি ইশতিয়াকের অনড় আস্থা। দেহাতীত প্রেমই প্রকৃত প্রেম,

সেকালে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল তার মনে। আর আজ? নিজের অজান্তেই ইশতিয়াক হাসে। অবিশ্বাসীর হাসি। না, অমন নাইভ চিন্তা ইশতিয়াক ইদানীং করে না। কোনো অশরীরীকে মানুষ ভালোবাসতে পারে না।

'কেন পারবে না?' লোপার নিঃশব্দ প্রশ্ন।

'সত্যি পারে না,' চাপা স্বরে জবাব দেয় ইশতিয়াক।

'এই যে আমাকে ভালোবাসছ তুমি। আমিও তো অশরীরী।'

'কে বলে তুমি অশরীরী?'

'বাঃ রে, আমি জানি না বুঝি? আমি কচি খুকি নাকি।'

'না লোপা, তুমি অশরীরীও নও, কোনো মায়াবিনীর মায়া নও। অত্যন্ত জীবন্ত তুমি, যে-কোনো রক্ত-মাংসের নারীর চেয়ে বেশি জলজ্যান্ত। তোমার শিরায় শিরায় আমি প্রাণের স্পন্দন বইয়ে দিয়েছি, সে স্পন্দন কোনোদিন থামবে না। ইয়াসমিনের হৃদয়স্পন্দন থেমে যাবে একদিন, আমারও শরীর একেবারে নিথর হয়ে যাবে। শোনো লোপা, আমি তোমার মধ্যে এক সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করেছি যে, তোমার প্রাণচাঞ্চল্য কখনো স্তব্ধ হবার নয়।'

লোপা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। এ কি, লোপা আইসক্রিমের মতো গলতে শুরু করেছে কেন? ভুল দেখছে ইশতিয়াক, আসলে লোপা অকম্পিত শিখার মতো বসে আছে তার বিছানার পাশে। ইশতিয়াকের বুকের ওপর মাথা রাখে লোপা, ওর চুলের গন্ধ, শরীরের ঘ্রাণ তাকে মাতাল করে তোলে। সাহিত্যিক ইশতিয়াক হোসেন নিমেষে রূপান্তরিত হয় প্রেমিক ইশতিয়াকে। কিন্তু এ প্রেমে কোনো উন্মাদনা নেই, তীব্র দাহন নেই। বুঝি তাই এমন নিস্পন্দ ইশতিয়াকে। ঘুমে তার দুচোখ জড়িয়ে আসে, লোপার কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান।

জাহাজের ডেকে সন্ধ্যা নামে। সিঁদুর রঙের গোল সূর্য ডুবছে একটু একটু করে। ইশতিয়াকের চুল উড়ছে হাওয়ায়। শারমিন বানু রেলিং ধরে দাঁড়ানো। কী যেন একটা গান গাইছে সে, হয়তো লতা মুঙ্গেশকরের কোনো হিন্দি গান। অথচ শারমিনকে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির ভক্ত বলেই জানে ইশতিয়াক। ইশতিয়াক শারমিনকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে, গানের কথা স্পষ্ট শুনতে চায়। হঠাৎ শারমিনের জায়গায় এক পিঙ্গলকেশী বিদেশিনি। এই বিদেশিনির সঙ্গে শারমিনের চেহারা কিংবা বেশভূষার কোনো মিলই নেই, তবু যেন কোথাও একটা মিল রয়ে গেছে, ইশতিয়াক ভাবে। তন্বী বিদেশিনির দিকে এগিয়ে যায় সে, চমকে ওঠে ভিকটোরিয়া ওকাম্পোকে দেখে। ওকাম্পো, ওরফে বিজয়া, ইশতিয়াকের কুশল জিগ্যেস করেন স্পষ্ট বাংলা ভাষায়। ওর কথা বলার ধরন হুবহু ইয়াসমিনের মতো। বলা নেই, কওয়া নেই ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় আনিস। ইশতিয়াকের মামাতো ভাই। আনিসকে দেখা মাত্র ইশতিয়াকের মেজাজ বিগড়ে যায়। আনিসের পরনে নওশার পোশাক। ওকাম্পোর মধ্যে বিরক্তির কোনো চিহ্নই খুঁজে পেল না ইশতিয়াক, আনিস এবং ওকাম্পো পরস্পর হাত ধরাধরি করে জাহাজের ডেক ছেড়ে চলে যায়। ওকাম্পের কাছে সাহিত্যিক ইশতিয়াকের সঙ্গ থেকে জ্বলজ্বলে ব্যবসায়ী আনিস কামালের সান্নিধ্যই যেন বেশি কাম্য।

একজন বুড়োসুড়ো দর্জি কাপড় সেলাই করছেন, হেঁটে যেতে-যেতে ইশতিয়াক লক্ষ করে। বুড়ো দর্জি অনেকটা আলিবাবার বাবা মুস্তাফার মতো দেখতে। কার পাঞ্জাবি সেলাই করছেন দর্জি সাহেব? ইশতিয়াকের নিশ্চয়। কিন্তু বেজায় ভুল সেলাই করেছেন তিনি। ইশতিয়াক সাত তাড়িতাড়ি দর্জির দোকানে ঢুকে নিজেই সূচ চালাতে শুরু করে। সূচ নীল পাখির পালকের কলমরূপে নাচতে থাকে তার হাতে আর সে তরতরিয়ে লিখতে শুরু করে কাগজে নয়, মুঙ্কের 'চিৎকার' নামক ছবিটির ওপর। সুন্দর সব বাক্য লেখা হয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। বুড়ো দর্জি হঠাৎ খেপে গিয়ে মুঙ্কের ক্যানভাসটি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন, তারপর শিশুর মতো কাঁদতে থাকেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এমন একটা অদ্ভুত ঘর কস্মিনকালেও ইশতিয়াক দেখেনি। অসম্ভব লম্বা আর সরু; দুজন লোকের বেশি পাশাপাশি হাঁটা মুশকিল। ঘরের দু'পাশে অনেকগুলো বাক্স সাজানো, কফিনের মতো। ইশতিয়াক কি কোনো মর্গে ঢুকে পড়েছে? ওর আশেপাশে কেউ নেই। এই ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। পারে না। একটা বাক্সের ডালা খুলে ইশতিয়াক বাক্সের ভেতর আঙুরের সোনালি গুচ্ছ দেখতে পায়, এত যত্নে রাখা যেন হিরেজহরত। আচমকা কয়েকজন লোক খুব ঘটাপটা করে চকচকে একটা বাক্স নিয়ে ঢোকে সেই ঘরের ভেতর। লোকগুলোর মুখে মুখোশ-আটা, গায়ে ডুবুরীর পোশাক। বাক্সটা একপাশে রেখে ওরা এক মুহূর্তও দেরী করে না, বাইরে চলে যায়। ইশতিয়াক ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে ঠান্ডা মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে। পর মুহূর্তেই উঠে দাঁড়ায় সে, এগোয় কিছুদূর, বেরুনোর পথে খুঁজে পায় না; ঘর তো নয়, এক আজব গোলকধাঁধা। একটা বাক্সের ভেতর থেকে, ইশতিয়াক সবিস্ময়ে লক্ষ করে, একজন দীর্ঘকায় পুরুষ বেরিয়ে এলেন। চুল-দাড়ি সাদা। বিস্তর বয়স হয়েছে, বোঝা যায়। এই দীর্ঘকায় পুরুষটিকে চিনতে পারে সে। ইনি জর্জ বার্নার্ড শ। বার্নার্ড শ'র সারা গায়ে তুলো। তিনি ইশতিয়াকের সঙ্গে কোনো কথা না বলে ট্রাউজারের বোতাম খুলে আঙুরের সোনালি গুচ্ছের ওপর পেশাব করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মেহগনি কাঠের একটা ছড়ি দিয়ে ইশতিয়াককে খোঁচাতে থাকেন হেড পণ্ডিতের মতো।

হঠাৎ চোখ খুলে যায় ইশতিয়াকের, ইয়াসমিন তাকে ধাক্কাচ্ছে, 'কী, আজ অফিসে যাবে না? বেলা কত হলো খেয়াল আছে? সাড়ে আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, নাশতা তৈরি কিন্তু।'

ইয়াসমিন আলনা গোছাতে থাকে। ইশতিয়াকের শয্যাত্যাগ করার কোনো গরজ আছে বলে মনে হয় না। সে পাশ ফিরে শোয়। সদ্য-দেখা স্বপ্নটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ। মুঙ্কের ক্যানভাসের ওপর নিজে লেখা অত্যন্ত অর্থবহ, অনবদ্য বাক্যগুলি মনে করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু এখন একটি শব্দও মনে পড়ছে না। অথচ যখন জর্জ বার্নার্ড শ' আঙুরের সোনালি গুচ্ছের ওপর নির্বিকারচিত্তে পেশাব করছিলেন, তখনও বাক্যগুলি ইশতিয়াকের মনে জ্বলজ্বল করছিল। এথগুলি স্বপ্নাদ্য উজ্জ্বল লাইন শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ায় ইশতিয়াকের খুব খারাপ লাগছে। লেখার জন্যে সে ব্যাকুল। কয়েকদিন ধরে, ক্রমাগত সে চেষ্টা করে চলেছে, প্রায় সারাক্ষণই ভাবছে লেখার কথা। নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে একটি বাক্যে তৈরি করতে চেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ঈপ্সিত বাক্যটি দেখা

দেয় না; এমনকী আবছাভাবেও উপস্থিত হয় না। যখন তার মন খরাগ্রস্ত, তখন স্বপ্নের ভেতর বাক্যধারা নেমে এলো সত্যি, কিন্তু জেগে ওঠার পরপরই হারিয়ে গেল চোখের পলকে। আজব এই স্বপ্নের দিল্লাগি। স্বপ্নের কি কোনো অর্থ আছে? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু কিছু স্বপ্ন অর্থময়। ইয়ুং তো অনেক স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে স্বপ্নের অর্থময়তা বিলক্ষণ প্রমাণ করেছেন; ইশতিয়াক তার নিজের স্বপ্নের অর্থ খোঁজে। ল্যাজা মুড়ো কোনোকিছুরই হদিশ পায় না। মনের অচেতন ও অবচেতন আড়তে কত কিছু জমা থাকে, সেগুলিই কি নড়েচড়ে ওঠে স্বপ্নের ভেতর? যা ছিলো একেবারে অস্পষ্ট ঘোমটাপরা, অতলবিহারী তা-ই কেলিপরায়ণ মাছের মতো ভেসে ওঠে উপরিতলে! হারিয়ে যাওয়া বাক্যগুলির খুব প্রয়োজন ছিল ইশতিয়াকের। সেই বাক্যাবলি তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতো পারত, পারত তার লেখকসত্তাকে নতুন করে ঝলমলিয়ে দিতে। টিপয়ে-রাখা হাতঘড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে সময় দ্যাখে ইশতিয়াক। হ্যাঁ, বেশ বেলা হয়েছে। এবার উঠতে হয়। ইশতিয়াক ঘড়িতে দম দেয়।

॥ ৭ ॥

অফিসের কোনো শূন্য চেয়ারই বেশিদিন খালি থাকে না। মরহুম তোসররফ আলির চেয়ারটিও খালি থাকেনি। তাঁর জায়গায় এখন বসেন জনাব এহসান চৌধুরী। এই ভদ্রলোক ইশতিয়াকের সমবয়সি এবং চলার বলায় মরহুম তোসররফ আলির বিপরীত। এহসান চৌধুরী মিশুক ও সদালাপী। অফিসে নতুন জয়েন করলেও ইতোমধ্যে অনেকের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। মাঝারি গড়নের চটপটে মানুষ। দেখতে ভালো, কথা বলার ধরনটিও চমৎকার। উচ্চারণে আঞ্চলিকতার টান নেই, কথাবার্তা রুচিশীল। তার ব্যক্তিত্বে একটা মাধুর্য আছে, স্বীকার করতেই হবে।

'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই,' এহসান চৌধুরী ইশতিয়াকের টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারটিতে এসে বসে। ইশতিয়াকের ভুরু ঈষৎ কুঁচকে যায়।

'বলুন, শুনি।'

'আপনার উপন্যাস আমি পড়েছি। আপনার লেখা আমার ভালো লাগে। আপনি যে একজন শক্তিমান লেখক এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।' ইশতিয়াককে যেন কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এই অফিসের কেউ ইশতিয়াক হোসেনের লেখা পড়েছে বলে কোনোদিন তার মনে হয়নি। সে একটু অবাক হল। এহসান চৌধুরী যেভাবে তার উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করল তাতে তাকে ইশতিয়াকের লেখার মনোযোগী পাঠক বলে ধরে নেয়া যায়। এহসান চৌধুরী ইশতিয়াক হোসেনের রচনার গভীরে প্রবেশ করেছে, সন্দেহ নেই। তার আলোচনা রীতিমতো বুদ্ধিমান।

'আপনি দেখছি আমার লেখা আমার চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন! অত খুঁটিনাটি আমার নিজেরও মনে নেই' ইশতিয়াকের কথায় কৌতুকের ছাপ। এহসান চৌধুরী মৃদু হাসে।

'এবার চায়ের অর্ডার দিন, না কি আমিই দেবো,' এহসান চৌধুরী উচ্ছলতা প্রকাশ করে।

'আপনি আমার উপন্যাসের যে তারিফ করেছেন তাতে আপনাকে শুধু চা নয়, মিষ্টি খাওয়ানো উচিত, 'ইশতিয়াক কলিংবেল টেপে। মহব্বত মিয়া যথারীতি হাজির।

'শুধু চা-ই আনতে বলুন। মিষ্টি-ফিষ্টি আরেকদিন হবে।'

মহব্বত মিয়া চা আনতে যায়।

'এহসান সাহেব, আপনি বলেছিলেন আমি যদি কিছু মনে না করি, তাহলে আমাকে একটা কথা বলবেন। আপনি অবশ্যি অনেক কথাই বলেছেন, তবে তার একটির মধ্যেও কিছু মনে করার মতো কোনো গন্ধ পাইনি।

'আপনার উপন্যাস সম্পর্কে আমার আলোচনা এখনো শেষ হয়নি,' চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ায় এহসান চৌধুরী।

'অর্থাৎ হুল-ফোটানো কথাগুলো জমিয়ে রেখেছেন, এখন ছাড়বেন। তাইতো?'

'ছিঃ ছিঃ, হুল-ফোটানোর কথা বলছেন কেন? আমি আপনাকে খোঁচা দিতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নই। আমি আপনার একজন অনুরক্ত ভক্ত। আপনার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলেছি, এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। নইলে আপনার লেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে ভরসা পাব না।'

'আপনি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেলেন দেখছি। আসলে আমি কিছু মাইন্ড করব না। আপনি নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারেন, সমালোচনা গ্রহণ করবার মানসিকতা থেকে আমি বঞ্চিত নই। আমার লেখার নির্দয়তম সমালোচক আমি নিজে।'

'আপনার লেখা সম্পর্কে একটা নালিশ আমার মনে জমে আছে বেশ কিছুদিন থেকে। আপনার লেখায় মেহনতি মানুষের কোনো ছবি পাওয়া যায় না। ওদের কথা যেন আপনি পাশ কাটিয়ে যেতে চান। আপনি মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতার কথা লিখেছেন, যারা সর্বহারা, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, ওরা অনুপস্থিত আপনার উপন্যাসে।'

'কোন লেখক নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে লিখতে পারে না, লেখা উচিতও নয়। যে অভিজ্ঞতা আমার নেই, তা নিয়ে কিছু লিখলে তাতে ফাঁকি ও ফাঁক দুটোই থেকে যাবে। কোন লেখকেরই নিজের সঙ্গে প্রতারণা করা সমীচীন নয়।' আমি যাদের চিনি, তাদের সম্পর্কেই লিখতে চেষ্টা করি। যে-জীবন আমার অচেনা, তা' নিয়ে উপন্যাস লিখব কী করে? কথাশিল্পী ইশতিয়াক হোসেন আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে।

'তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক লেখকের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাকে ভাবতে হবে জনগণের কথা, বিশ্বাস করতে হবে যে তার কাজ এবং একজন কৃষকের কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

'তাহলে কি আপনি বলতে চান যে, জনগণ জনগণ ব'লে গলা ফাটালেই তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যিকের দায়িত্ব চুকে যায়। শিল্পবোধ কি শিকেয় তুলে রাখতে হবে?'

'সে-কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। অবশ্যই সাহিত্যকে শিল্পসম্মত হতে হবে। পাবলো নেরুদার কবিতা কি শিল্পসম্মত নয়? ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকরা

কি শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস লিখছেন না?' ইশতিয়াক হোসেন থমকে যায়। এহসান চৌধুরীর বক্তব্য খণ্ডন করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সে। তর্কের খাতিরে তর্ক করে কোনো ফায়দা নেই। সে নিজে নেরুদার কবিতার ভক্ত। ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন লেখকের উপন্যাস বাস্তবিকই উঁচু মানের। এ সত্ত্বেও সে আরো কিছুক্ষণ তর্ক চালিয়ে যেতে পারত, তার পক্ষে দাঁড় করিয়ে দিতে পারত ভিন্নধর্মী ক্ষমতাবান লেখকদের। কিন্তু ইশতিয়াক এখন নিস্পৃহ। মাঝে-মাঝে তার এ রকম হয়। তীব্র এই নিস্পৃহতা তাকে পেয়ে বসে হঠাৎ আর তখন কিছুই তাকে উৎসাহিত করতে পারে না—না বই, না নিসর্গ, না নারীসঙ্গ।

'আজ আলোচনা এখানেই মূলতবি থাক,' এহসান চৌধুরীর প্রস্তাব। কেননা, সে ইশতিয়াকের মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ করেছে। ইশতিয়াক চটেনি বোঝা যায়। কারণ তার দৃষ্টিতে ক্রোধচিহ্ন নেই, রয়েছে ঔদাসীন্য।

'হ্যাঁ, আজ বরং থাক' ইশতিয়াক ক্ষমাপ্রার্থীর ধরনে বলে, 'এ নিয়ে আরেকদিন কথা বলা যাবে।' এহসান চৌধুরী নিজের চেয়ারে ফিরে যায়, চোখ রাখে ফাইলে। এই এক ফ্যাশন হয়েছে হালে, সবাই নসিহত করবে লেখককে—কী লিখতে হবে, কীভাবে লিখতে হবে ইত্যাদি। যেন এই বিষয়টি সম্পর্কে একমাত্র লেখক ছাড়া বাকি আর সবারই বলার অধিকার আছে। সবাই মনে করে, লেখক নিকার বোকার পরে বসে আছে পেরামবুলেটারে, ওর হাতে ঝুমঝুমি বা অন্য কিছু তুলে দেয়া দরকার! যার একরত্তি সাহিত্যবোধ নেই, ইশতিয়াক ভাবে, সে-ও দিব্যি জ্ঞান দিচ্ছে লেখককে। এহসান চৌধুরী অবশ্য সে দলে পড়ে না। ভদ্রলোকের সাহিত্যরুচি নেহাৎ মন্দ নয়। তবে তার সাহিত্যবিষয়ক ধ্যান ধারণায় কোথায় যেন এক ধরনের চলতি আলোচনার ছায়া আছে। আজকাল অনেকেই প্রোপাগান্ডাকে সাহিত্যের নামে চালিয়ে দিতে চায়। প্রোপাগান্ডার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা বলে প্রোপাগান্ডা তো আর সাহিত্য নয়। প্রোপাগান্ডা সর্বস্ব রচনা যে সাহিত্যপদবাচ্য নয় তার প্রমাণ বহন করছে সোভিয়েট ইউনিয়নের হাল আমলের ভুরি ভুরি তথাকথিত উপন্যাস। যে-রাশিয়ায় গোগল, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, তুর্গেনিভের মতো কালজয়ী ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেছেন, সে-রাশিয়ায়, হায়, আজ উপন্যাসের নামে রাশি রাশি বিবর্ণ, নীরক্ত বাক্য মুদ্রিত হচ্ছে দিনের পর দিন। প্রোপাগান্ডা সাহিত্যের হন্তারক। বোরিস পাস্তারনাকে অবশ্য টলস্টয় প্রমুখের ধারায় উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর জিভাগো নিয়ে যত হৈ হল্লাই হোক না কেন, ভদ্রলোক আসলে কবি। পাস্তারনাকের সাড়াজাগানো উপন্যাসটি আসলে একজন বড়ো কবির উপন্যাস। পাস্তারনাকে যে একজন উজ্জ্বল দেশপ্রেমিক তার পরিচয় বিধৃত জিভাগোর ছত্রে ছত্রে। রাশিয়ার নিসর্গ কিন্নরকণ্ঠ পেয়েছে উপন্যাসটিতে। এহসান চৌধুরী কি এ-কথা স্বীকার করবে? সে নিশ্চয় পাস্তারনাকের ওপর খড়্গহস্ত। না-ও হতে পারে। এহসান অতটা অসহিষ্ণু হয়তো নয়। হলে সে সৈয়দ নওশাদ করিম কিংবা আমার উপন্যাস নিয়ে আলোচনাই করত না।

ইশতিয়াক এহসান চৌধুরীর কথাগুলি মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। এই নিস্পৃহতার মধ্যেও মনে পড়ে বারবার। ওর কথা ফালতু বলে উড়িয়ে দেয়া কঠিন। সত্যিই তো, এদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন সম্পর্কে তার কোনো উল্লেখযোগ্য ধারণা নেই, কথাসাহিত্যিক ইশতিয়াক হোসেন স্বগতোক্তি করে। নিজের ভেতরটা কেমন

ফাঁকা আর ফাঁপা মনে হয়। ইশতিয়াকের মগজে শূন্যতা। শুধু কিছু বটের পাতার মতো মেঘের টুকরো মগজের ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কাজে মন বসে না। এহসান চৌধুরীর দিকে তাকায় এক ফাঁকে। তার সহকর্মীর ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট, সে ফাইলে দ্রুত নোট লিখে চলেছে। ইশতিয়াক দৃশ্যটি নিজের অজান্তেই উপভোগ করে। হঠাৎ এক সময় মরহুম মোহাম্মদ তোসররফ আলির নিরানন্দ মুখটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। উনি ঐ চেয়ারটায় বসতেন। বসতেন কথাটার মধ্যে শোক-শোক গন্ধ পায় ইশতিয়াক। একদিন তার নিজের চেয়ারে এসে বসবে অন্য কেউ, যেমন মরহুম তোসররফ আলির চেয়ারে এখন এহসান চৌধুরী বসছে। কোনো আসনই শূন্য থাকে না বেশিদিন।

সে এখন রিটায়ার করবে কিংবা হঠাৎ মারা যাবে, তখন তার জায়গায় আসবে নতুন কেউ। রিটায়ার করা পর্যন্ত ইশতিয়াক হোসেন এই একই চেয়ারে বসবে, একথা সে ধরে নিয়েছে কেন? এই পোস্টের হার্ডল পেরিয়ে বেটার পোস্টেও তো যেতে পারে সে। নিজের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সে এতদূর সন্দিহান হয়ে উঠেছে ইদানীং যে রিটায়ারমেন্টের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একই ঘরে, একই আসনে বসে ফাইলের পোকা বেছে যাবে, এই সিদ্ধান্তে ইশতিয়াক, বলা যায়, সহজেই পৌঁছে গেছে। রিটায়ারমেন্ট শব্দটিতে সূর্যাস্তের বিলীয়মান রং আছে, পুরনো পাঁচিলের শ্যাওলা আছে, ছানিপড়া চোখের দীপ্তিহীনতা আছে। ইশতিয়াক নিজেকে দেখে, অবসরপ্রাপ্ত, লোলচর্ম বৃদ্ধ। মাথায় টাক, তোবড়ানো গাল, দু'পাটি নকল দাঁত, মুখে অনেক মেচেতা। অসহায়, বোকা-বোকা, অথর্ব। তার মাথায় কি সত্যি সত্যি টাক পড়বে কখনো? শেষ বয়সে ইশতিয়াকের আব্বার মাথার চুল ভীষণ কমে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃত টাক পড়েনি।

ইশতিয়াকের মাথাভর্তি চুল এখন। ঘন আর মিশমিশে কালো। চুলের ভেতর সহজে চিরুনি চালানো যায় না, এত চুল। কখনো কখনো চিরুনিসুদ্ধ বেঁকে যায়। যত বুড়োই হোক সে, হয়তো শেষ পর্যন্ত তার মাথায় টাক পড়বে না। টেকো কথাটা ভারি বিচ্ছিরি লাগে ইশতিয়াকের। থুত্থুরে বুড়ো হবার আগেই যেন ওর মৃত্যু হয়, সামনের দেয়ালের দিকে চোখ রেখে সে প্রার্থনা জানায়। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে ভাবলেই তার শিরদাঁড়ায় একটা হিমপ্রবাহ বয়ে যায়। ইশতিয়াক অন্তত দেড়শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়; লোকে ওকে মেথুসেলাহ বলে উপহাস করুক তবু সে বেঁচে থাকতে চায়। আসুক বার্ধক্য, সে ভয় পাবে না। বেঁচে থাকার মতো কিছুই নয়।

দরজায় নক। শব্দটি চেনা। এই কামরায় ঢোকার সময় সচরাচর কেউ নক করে না। হয় সরাসরি ঢুকে পড়ে নয়তো মহব্বত মিয়ার মারফত স্লিপ পাঠায়। শুধু ইশতিয়াকের বন্ধু এবং বিখ্যাত লেখক সৈয়দ নওশাদ করিম দরজায় নক করেন।

'আসতে পারি?' চেনা কণ্ঠ। ইশতিয়াকের অনুমানই ঠিক। হাসি উদ্ভাসিত মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সৈয়দ নওশাদ করিম।

'আরে আসুন, আসুন,' নওশাদ করিমকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ইশতিয়াক। সৈয়দ নওশাদ করিম ইশতিয়াকের চেয়ে তিন বছরের বড়ো। অত্যন্ত ফর্সা, টিকোলো নাক, মাথায় কাঁচাচুল, যদিও চুল পাকার বয়স তার হয়নি। সৈয়দ করিম সব্যসাচী লেখক।

কী কবিতা, কী ছোটগল্প, কী উপন্যাস, কী নাটক—সাহিত্যের প্রায় সব শাখাকেই মঞ্জরিত করেছেন নিরলস শ্রম ও নিষ্ঠায়।

ইশতিয়াক সৈয়দ নওশাদ করিমের সঙ্গে এহসান চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দেয়।

'আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে,' স্মিত হেসে সৈয়দ করিমের দিকে হাত বাড়ায় এহসান চৌধুরী।

'এহসান সাহেব সুপাঠক। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলেই আপনি মুগ্ধ হবেন, ইশতিয়াক ওর বন্ধুকে জানায়। 'ইশতিয়াক সাহেব বাড়িয়ে বলছেন। আমি একজন সাধারণ পাঠক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়,' এহসান চৌধুরী, ইশতিয়াকের সহকর্মী, তার স্বভাবসুলভ বিনয় প্রকাশ করে।

'ইশতিয়াক কিন্তু সহজে কারো তারিফ করে না। তার কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করা খুবই মুশকিল,' সৈয়দ করিম মুচকি হাসেন।

'এবার বলুন, আপনার লৈখিক কর্ম কেমন চলছে আজকাল,' 'সৈয়দ নওশাদ করিমের কণ্ঠে ঔৎসুক্য।

'এই লিখছি একটু -আধটু, নতুন একটি উপন্যাস শুরু করেছি,' মিথ্যা বলল ইশতিয়াক। সাধারণত সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। সরল সত্য কথা বলতেই পছন্দ করে সে। বন্ধুর কাছে এই মিথ্যা কথাটা বলার কী দরকার ছিল? ছিল বৈকি। এই মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে কথাশিল্পী ইশতিয়াক হোসেন আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চায়। যেন লিখছি বললেই লেখা চলে আসবে জ্যোৎস্নাধোয়া হরিণের মতো।

'আপনি নিশ্চয় খুব চুটিয়ে লিখছেন' ইশতিয়াক বন্ধুর হাঁড়ির খবর নিতে চায়।

'কিছুদিন যাবত একটি লাইনও লিখিনি। ইচ্ছে করে নয়, লিখতেই পারছি না। কয়েকবার জোর করে লিখতে বসেছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি,' সৈয়দ নওশাদ করিমের স্বীকারোক্তি।

ইশতিয়াক চমকে ওঠে। সে জানে, তার বন্ধু সৈয়দ করিম নিয়মিত লেখেন। প্রায় প্রতিদিনই কিছু লেখেন তিনি; বলা যেতে পারে, প্রায় রুটিন মেনে চলে তাঁর কলম। আর তিনিই কিনা লিখতে পারছেন না। তাহলে শুধু ইশতিয়াক হোসেনের নিষ্ফলা সময় যাচ্ছে না, সৈয়দ নওশাদ করিমের মতো অতিপ্রজ লেখকের কলমও আজ অলস।

'এর আগে আমার এমন অবস্থা হয়নি কখনো,' সৈয়দ করিমের কণ্ঠস্বরে চাপা উদ্বেগ। এর আগে আমিও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি, ইশতিয়াক মনে মনে বলে। ইশতিয়াক এজন্যে সেই অষ্টভুজী জন্তুটিকে দায়ী করতে প্রলুব্ধ হয়। আরো একট প্রমাণ পাওয়া গেল। বন্ধুকে অষ্টভুজী জন্তুর কথা বলবে কিনা ভাবল ইশতিয়াক। বলতে শুরু করেছিল প্রায়, কিন্তু চেপে গেল। হয়তো তার বন্ধু বিশ্বাস করতে চাইবে না, হয়তো পরিহাস করবে।

'আমি আজ আপনাকে দাওয়াত করতে এসেছি কিন্তু,' সৈয়দ করিম জানালেন।

'কীসের দাওয়াত? বিবাহ-বার্ষিকী নাকি?'

'আরে না, আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি অন্য একজনের হয়ে দাওয়াত করতে এসেছি। তিনি আপনার মতো লেখার অনুরাগী। আপনাকে যেতেই হবে। তিনি নিজেই আসতে চেয়েছিলেন দাওয়াত করতে, আমি বললাম, ওসব ফর্মালিটির দরকার হবে না। আমি বললেই চলবে। কী, চলবে না?'

'আপনি যদি জাহান্নামে যেতে বলেন নির্দ্বিধায় সেখানেও চলে যাব।'

'না, আমন্ত্রণকর্তার নিবাসটি জাহান্নাম নয়, তবে সেখানে বেশ নরক গুলজার করা যাবে।'

'আমন্ত্রণকর্তার নিবাসটি কোথায়?'

'গুলশানে। অত্যন্ত বিচ্ছিরি রকমের বড়োলোক, কিন্তু খুবই সংস্কৃতিবান মানুষ। অবসর সময়ে সরোদ বাজান। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি দেখার মতো। নানা ধরনের দুর্মূল্য বই আছে।'

'এই যাঃ, আপনার জন্যে চা আনাতে ভুলে গেছি। আপনি তো আবার পুরো কাপ চা খান না। কোল্ড ড্রিংক চলবে?'

'না, গরম চা কিংবা কোল্ড ড্রিংক কোনোটারই দরকার নেই।'

'আপনার যা প্রিয় পানীয় সেটি এখানে অলভ্য,' ইশতিয়াক মৃদু হেসে বলে, 'মিষ্টি আনানো যেতে পারে, কাছেই গরম জিলিপি পাওয়া যায়। আপনি তো মিষ্টি পছন্দ করেন।'

'ওসব থাক, বরং এক স্টিক ফাইভ ফাইভ আনান' এহসান চৌধুরী কাজের ফাঁকে ওদের দিকে তাকায়। ওর পকেটে পূর্বাণীর প্যাকেট। অফার করতে সংকোচ হল। ইশতিয়াক কলিং বেল টেপে। মহব্বত মিয়া হাজির।

'দু'শলা ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট নিয়ে আসুন চট করে। নাম মনে থাকবে তো? ফাইভ ফিফটি ফাইভ,' ইশতিয়াক পার্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে মহব্বত মিয়াকে দেয়।

'আপনার সেই সহকর্মীটি কোথায়? কী না নাম ভদ্রলোকের? মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন, ওকে দেখে মনে হয় উনি জগৎসংসারের সবার প্রতি নাখোশ।' ইশতিয়াক একবার এহসান চৌধুরীর দিকে তাকায়। এহসানের দৃষ্টিও ইশতিয়াকের দিকে। সামান্য একটু কেশে ইশতিয়াক সৈয়দ নওশাদ করিমকে জানায়—

'তোসররফ আলি সাহেব মারা গেছেন।'

'ওফ্, তাই নাকি? সরি, আই অ্যাম ভেরি সরি। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।' সৈয়দ করিম কথাগুলো এভাবে বললেন যেন মরহুম তোসররফ আলির মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী।

মহব্বত মিয়া সিগারেট নিয়ে আসে। ইশতিয়াক একশলা সৈয়দ নওশাদ করিমের দিকে এগিয়ে দিয়ে এহসান চৌধুরীর কাছে যায়। অন্য শলাটি সহকর্মীর দিকে বাড়িয়ে দেয়। ইশতিয়াক এহসানের টেবিলের কাছে আসতেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ইশতিয়াকের এই উপহার ফিরিয়ে দিতে পারে না, হাত পেতে নেয়, যদিও সে এক ধরনের দামি সিগারেট খেতে অভ্যস্ত নয়।

'আমার ব্র্যান্ড একটু আলাদা,' এহসান চৌধুরী কিঞ্চিৎ জোর দিয়ে বলে। সেকি তার প্রিয় লেখক সৈয়দ নওশাদ করিমকে আঘাত করতে চাইল? নাকি কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে নিজের অসচ্ছলতার মান বাঁচানোর চেষ্টা করল?

'আমার ব্রান্ড একটু আলাদা,' এই শব্দগুচ্ছ সৈয়দ নওশাদ করিমের কানে যাওয়ার সময় তিনি আড়চোখে এহসান চৌধুরীর দিকে তাকান। বন্ধুবর ইশতিয়াক হোসেনের সহকর্মীটির কথায় শ্রেণি সংগ্রামের গন্ধ আছে ব'লে মনে হলো তাঁর। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বলেন, 'আমি রেগুলার স্মোকার নই, মাঝে-মাঝে খাই। আর খেলে এই সামান্য বাবুগিরিটি করি,' যেন তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। তাঁর গলায় কৈফিয়তের সুর। এহসান চৌধুরী একটু অবাকই হয়। কী করে তিনি এহসানের মনোভাব টের পেলেন? সাহিত্যিক মানুষ, তাই তাঁর চোখ কানে সবকিছুই ধরা পড়ে যায়, এহসান ভাবে, নিজেকে কিছুটা অপরাধী বলে মনে হয় তার। ওভাবে কথাটা সে না বললেই পারত।

এহসান চোধুরীর কথায় যে একটা চাপা ঝাঁঝ ছিল তা ইশতিয়াকের কাছেও ধরা পড়ে। কিন্তু সে কথাটাকে আমল দেয়নি। সে তার বন্ধুকে ভালোভাবেই জানে। এসব কথা তিনি গায়ে মাখেন না। তার মনে কোনো তিক্ততা কিংবা মালিন্য নেই। সুদর্শন পুরুষ। একটু ফিটফাট থাকেন। আজো পরে এসেছেন ক্রিম কালারের লাউঞ্জ স্যুট। মেরুন টাই। সৈয়দ নওশাদ করিমের চলায় বলায় একটা অভিজাত্য আছে। খুব যে একটা সচ্ছল অবস্থা তার, এমন নয়। তবে তাকে দেখলে বেশ ঐশ্বর্যশালী মনে হয়। ইশতিয়াক খুব পছন্দ করে তার এই লেখক-বন্ধুটিকে। সে সৈয়দ নওশাদ করিমকে তার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করে। তার উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সৈয়দ নওশাদ করিমের উপন্যাসের তুলনায় তার নিজের সাহিত্যের প্রসূনগুলিকে অনুজ্জ্বল লাগে।

'এবার আমি গোত্রোত্থান করি,' সৈয়দ করিম কখনো কখনো প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করেন, ইচ্ছে করেই, পরিবেশকে লঘু করার জন্য। তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়ান। এহসান চৌধুরীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, আসুন করমর্দনের পালাটা চুকিয়ে ফেলা যাক।

'আমরা কিন্তু আপনার নতুন লেখার অপেক্ষায় আছি।'

'আজকাল একেবারে লিখতে পারছি না। মনে হয় কলমের প্যারালাইসিস হয়েছে,' সব্যসাচী লেখক সৈয়দ নওশাদ করিম স্মিত হাসেন। ইশতিয়াকের কাছে বিদায় নেবার সময় সৈয়দ করিম বললেন, 'কাল-সন্ধ্যে সাতটায় তৈরি থাকবেন, আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।' তারপর তিনি খোদা হাফেজ বলে পা বাড়ালেন দরজায় দিকে। ইশতিয়াক এবং এহসান দু'জনই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে একটি সহজ, সুন্দর চলে যাওয়া।

অফিস থেকে বেরিয়ে আজ আর রিকশা নেয় না ইশতিয়াক। পয়সা বাঁচানোর জন্য নয়। সে আজ অনেকক্ষণ পথ হাঁটতে চায়। পথ হাঁটা, একা-একা পথ হাঁটা—একা এবং পথ হাঁটা, এই শব্দগুলি কেমন যেন একটা মায়া ছড়িয়ে দেয় মনের ভেতর, ইশতিয়াকের ধারণা। অনেকদিন সে এভাবে পথ হাঁটেনি। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়ে বাংলা কবিতার

একটি বিখ্যাত পংক্তি, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' সাধু ভাষার প্রতি ইশতিয়াকের কোনো আকর্ষণ নেই। প্রথম যখন সে, অনেকদিন আগে, এই লাইনটি পড়ে, তখন হাঁটিতেছি শব্দটি তার মনঃপুত হয়নি। কিন্তু আজ সে জানে এই পংক্তির জন্যে 'হাঁটিতেছি' একটি অমোঘ ক্রিয়াপদ। দীর্ঘকাল ধরে পথ হাঁটার ব্যঞ্জনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে হাঁটিতেছি শব্দটিতে, ইশতিয়াক ভাবে। তার নিজের এই পথ-হাঁটার মধ্যে একটা প্রাচীনতা আছে, যেন সে হেঁটে ক্লান্ত প্রাণ সে। তবু হাঁটতে হবে তাকে, এই দায় সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। একটা দারুচিনি দ্বীপের ভেতর যেতে হবে তাকে। কাউকে কি সে কথা দিয়েছে? কোথাও নেই দারুচিনি দ্বীপ?

কাউকে সে কথা দেয়নি। তাই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। শারমিন বানুকে নয়, লোপার আড়ালে যে তরুণী রয়েছে তাকে নয়, ইয়াসমিনকে তো নয়ই। শারমিনের কোনো প্রত্যাশা ছিল না ইশতিয়াকের কাছে, ছিল না লোপারূপী তন্বীর: ছিল কি? থাকলেও, ইশতিয়াক জানে না। তাকে জানতে দেয়া হয়নি। তবে হ্যাঁ ইয়াসমিনের কিছু প্রত্যাশা আছে ইশতিয়াকের কাছে। ইশতিয়াক সংসারের প্রতি লক্ষ রাখবে, একজন আদর্শ স্বামী হবে, তার সন্তানের পিতা হবে— এই প্রত্যাশা ইয়াসমিন করে। ইশতিয়াক ইয়াসমিনকে কোনো কথা দেয়নি। তাই কথা রাখা না-রাখা একটা অবাস্তব ব্যাপার।

ইশতিয়াক সংসারের দিকে যথাসাধ্য নজর রাখতে চেষ্টা করে। তেমন কোনো বাজে খরচ করে না, যা আয় করে তার সিংহভাগই ঢালে সংসারে। সে কি স্বামী হিসেবে একজন আদর্শ পুরুষ? ইয়াসমিনকে সে অবহেলা করে না, এক ধরনের ভালোবাসাও আছে তার প্রতি। ভালোবাসার বদলে প্রীতি শব্দটি ব্যবহার করা ভালো। দুটি মানুষ একসঙ্গে বসবাস করলে যে ধরনের প্রীতি সঞ্চারিত হয় তাদের মধ্যে, সেই প্রীতি বংশবৃদ্ধি? আপাতত সে এ ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী নয়। টায়েটুয়ে সংসার চলে, অবস্থা একটু সচ্ছল হলে দেখা যাবে। ইয়াসমিন অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করে। জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে দুর্বার। ইশতিয়াক সতর্ক থাকে, নিয়মিত কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করে। কিন্তু সে-রাতে অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছিল ইশতিয়াক, যে-রাতে আটটি রবারের নাছোড় টিউব তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর সে ভীষণ ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। সে রাতে ইশতিয়াক কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করতে ভুলে যায়। ইয়াসমিনও তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়নি, নিশ্চয় ইচ্ছে করেই। ইশতিয়াক এর আগেও একবার সেই জন্মনিরোধক বস্তুটি ব্যবহার করতে বিস্মৃত হয়, কিন্তু তার নসিব ভালো, কোনো অঘটন ঘটেনি তার ফলে। এবারও হয়তো ঘটবে না, ইশতিয়াক নিজেকে আশ্বস্ত করে।

হাঁটতে হাঁটতে ইশতিয়াক গুলিস্তান বাস টার্মিনালের কাছে এসে যায়। মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা থেকে এই বাস টার্মিনাল দূরে নয়। তাহলে সে বেশিক্ষণ হাঁটেনি? অথচ খুব ক্লান্ত লাগছে, মনে হচ্ছে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে সে। অনেক দূর থেকে পথ হেঁটে সে এই বাস টার্মিনালে পৌঁছেছে। অসম্ভব ভিড়ের জন্যেই বোধ হয় এতটুকু পথ এত দীর্ঘ মনে হয়েছে ইশতিয়াকের। এবার রিকশা নেয়া দরকার। যেকোনো একটা বাসে উঠে পড়ে যে-কোনো দিকে চলে গেলে মন্দ হয় না। কেউ কেউ তো যায়।

একটু হাঁটাহাটি তার মনের স্থবিরতা দূর করতে পারবে ভেবে ইশতিয়াক পথ হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হয়তো আবার লিখতে উদ্বুদ্ধ হবে সে, আগে যেমন হয়েছে বহুবার। তেমন কোনো লক্ষণ এখনো পরিস্ফুট নয়। তার মগজ এখন ধু ধু মরুভূমি, কোনো পান্থপাদপ কিংবা ফণিমনসা তো দূরের কথা, একখণ্ড তৃণেরও দেখা মেলা ভার। এই শূন্যতা নিয়ে কী করবে ইশতিয়াক? হয়তো বাড়ি ফিরে গেলে, ইশতিয়াক নিজেকে প্রবোধ দেয়, লেখার টেবিলে বসলে কাগজ ভরে উঠবে সুবিন্যস্ত বাক্যে। তাহলে এক্ষুনি একটি রিকশা নেয়া যাক। ভাড়া নিয়ে সচরাচর কোনো বচসা করে না সে, তাই ভাড়া ঠিক না করেই রিকশার পাদানিতে মোকাসিনপরা পা রাখে। মোকাসিনটা পুরোনো হয়ে গেছে, নতুন একটা কেনা উচিত, নিজের পায়ের দিকে নজর পড়ে ইশতিয়াকের। নগ্ন পায়ে রিকশা চালাচ্ছে রিকশাঅলা। লোকটা বুড়ো আর খর্বুটে, পরনে ছেঁড়া শার্ট। পেটের দায়ে বুড়ো বয়সে রিকশা চালাতে হচ্ছে ওকে। কী করে এই বুড়ো লোকটার সংসার চলে? ক'জন পুষ্যি ওর ঘরে? ঘর নিশ্চয় কোনো বস্তিতেই হবে। সংসারের ঘানি টানতে তো তার নিজেরই জিভ বেরিয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করেছে সে। তার সহকর্মী এহসান চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। ওর সংসার কেমন চলছে ইশতিয়াক সে খবরও রাখে না। এত কথা বলে এহসান, কিন্তু নিজের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সে নিশ্চুপ। এখনো সে ইশতিয়াককে কিছু বলেনি, ইশতিয়াকও যেচে কিছু জিগ্যেস করেনি। সে অন্যের হাঁড়ির খবর নিতে বরাবরই অনাগ্রহী। তার রুচিতে বাধে।

এহসান চৌধুরী ইশতিয়াককে তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এহসানের কথা যন্ত্রণাবিদ্ধ। এহসান তার নিজস্ব যন্ত্রণা ইশতিয়াক হোসেনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। নিজের লেখা সম্পর্কে ইশতিয়াককে নতুন করে ভাবতে হবে। শুধু নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিবমিষা ও মৃত্যুচেতনা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না তৃতীয় বিশ্বের লেখককে। তার অন্য সমস্যা আছে, অন্নসমস্যা আছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে। তারা কি কখনো সুন্দর, মহত্তর জীবনের সন্ধান পাবে না? এইসব অসহায়, নিপীড়িত মানুষের কথা জোরালো করে বলতে হবে, ফুটিয়ে তুলতে হবে এদের জীবনালেখ্য। এদের জীবনতৃষ্ণা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা লেখা তৃতীয় বিশ্বের লেখকের অবশ্যকর্তব্য। ইশতিয়াক নিজের গলায় এহসান চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। কিন্তু সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে লেখায় ক্যানভাসারের সুর না লাগে। লেখা যদি শিল্পোত্তীর্ণ না হয় তাহলে সাহিত্য রচনা করে কী লাভ, প্রচার পুস্তিকা লিখলেই তো উদ্দেশ্য সাধিত হয়। জনগণ কি জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাস পড়তে পারবেন? পড়লেও কি তার মর্মোদ্ধার করতে পারবেন? ক'জন শিক্ষিত ব্যক্তি এই উপন্যাসের শিল্পরস উপভোগ করতে পারেন? অনেকেই পারে না। খোদ সৈয়দ নওশাদ বলেছেন যে তিনি অন্তত তিন-তিনবার শুরু করেও উপন্যাসটি শেষ করতে পারেননি। মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়েছেন। কিন্তু তা হলে জয়েস কিম্বা তাঁর 'ইউলিসিস'-এর মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। জেমস জয়েস বিশ শতকের একজন প্রধান লেখক এবং 'ইউলিসিস' এই শতাব্দীর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপন্যাস।

বাড়ির সামনে রিকশা থামে। সাতরওজার এই গলিতে গত তিন বছর ধরে ইশতিয়াক আর ইয়াসমিন বসবাস করছে। একতলা বাড়ি। দুটি খুদে কামরা। একটি বাথরুম আর নামকাওয়াস্তে রান্নাঘর। ভালো কোনো বাসা ভাড়া নেয়ার মতো সংগতি ইশতিয়াকের নেই। কোনোদিন হবে বলেও মনে হচ্ছে না। রিকশার ভাড়া চুকিয়ে দেয় সে। আট আনা বেশি পেলে রিকশাঅলা তার বার্ধক্যের জন্যে। সেই অষ্টভুজী জন্তু, অক্টোপাস, তার বাসার ছাদের ওপর, হঠাৎ ইশতিয়াকের চোখে পড়ে। ভয় পেয়ে সে দরজার কড়া নাড়ে, জোরে, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জোরে। রাঁধুনি এসে দরজা খোলে।

'এত জোরে জোরে কড়া নাড়ছিলে কেন? আমরা বয়রা হয়ে গেছি বুঝি?' ইয়াসমিন কপট বিরক্তি প্রকাশ করে। কেন সে অমন জোরে নেড়েছে, সে কথা কি ইশতিয়াক তার গৃহিণীকে বলবে? বলতে পারে? সে কি বিশ্বাস করবে ইশতিয়াকের কথা? কেউ বিশ্বাস করবে না এ-কথা। হয়তো সারাজীবন তাকে এ-কথা লুকিয়ে রাখতে হবে, যেমন ফোড়া লুকিয়ে রাখে রক্ত আর পুঁজ।

## ॥ ৮ ॥

*ইশতিয়াক হোসেনের ডায়েরি থেকে*

অনেকদিন ডায়েরি লিখি না। লিখতে ইচ্ছে করে না। কেন যে হঠাৎ একদিন একটা মোটা খাতা সংগ্রহ করে ডায়েরি লিখতে শুরু করেছিলাম তার কোনো কারণ আজো খুঁজে পাইনি। আমার ভেতর যে এক সত্তা বসবাস করছে তার সঙ্গে নিভৃতে দু'দণ্ড আলাপ করার জন্যে? নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে? নাকি অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যে? আমি কি খুঁড়ে বের করে আনতে চাই সেসব কথা যেগুলো লুকিয়ে আছে আমার মনের স্তরে স্তরে?

যেদিন প্রথম ডায়েরি লিখতে শুরু করেছিলাম, হলফ করে বলতে পারি, সেদিন কোনোকিছু ভেবেচিন্তে লিখতে বসিনি। লিখতে ইচ্ছে হলো ব্যস ভারিক্কী গোছের একটা খাতা জোগাড় করে লেখা লেখা খেলা শুরু করে দিলাম। যেমন কোনো তরুণ কবি তার প্রথম কবিতাটি লিখে ফেলে, কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম না করেই, একটা নাছোড় খেয়ালের বশীভূত হয়ে।

কতদিন ভেবেছি ডায়েরির পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলব, ডায়েরিটাকে পুড়িয়ে মারব যেমন কোনো ডাইনিকে ক্রুদ্ধ জনতা পুড়িয়ে মারত মধ্যযুগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডায়েরির পাতাগুলি ছিন্নভিন্ন করতে পারেনি, পারিনি ভস্মীভূত করতে। বরং সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমি ছাড়া অন্য কেউ এই ডায়েরির কোনো হদিস জানে না। আমার এই নেপথ্য বিহারের অবলম্বনটি ইয়াসমিনেরও চোখে পড়েনি। আমিই পড়তে দেইনি। আমি এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে ডায়েরিটা ইয়াসমিনের চোখের আড়ালে থাকে সবসময়।

আমি জীবনকে একটা গণিকার মতো ব্যবহার করে চলেছি। কিন্তু প্রেমহীন তাপে

সত্তাকে কতটুকু উষ্ণ রাখা চলে? বেশিক্ষণ চলে না হয়তো, আর চলে না বলেই একসময় সমস্ত বুক জুড়ে একটা বিষণ্ণতা জেগে ওঠে। তখন নিজেকে অসুস্থ মনে হয়। রীতিমতো অসুখী এই আমিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ি। থাবা জখম হলে বাঘ হিংস্র হয়ে ওঠে, ধরে ধরে মানুষ খায়। আর কোনো কোনো মানুষের গোপন কথাও জখম হলে সে মনের বিবরে নিঃশব্দে প্রবেশ করে। এটা এক ধরনের মৃত্যুর সমান। কিন্তু আমি পুরোপুরি বাঁচতে চাই, নিছক বাঁচার আনন্দে বাঁচতে চাই। তাই বিবরবাসী মনের সঙ্গে আমার নিরন্তর লড়াই। এ-থেকে আশা হয় যে একদিন হৃদয়ের কপাট দরাজভাবে মেলে দিতে পারব। যতদিন না পারি যন্ত্রণা ভোগ আছে। আমার চারদিকে কোনো আলো নেই, দূরত্বজ্ঞাপক পাথরচিহ্নের মতো অনড় পড়ে আছি। কিছুতেই সাড়া জাগে না। যখন সত্যিকারের লেখকের কথা গ্রন্থে পাঠ করি তখন তাঁদের আত্মার উন্মুখ ব্যাকুল বেদনার সঙ্গে নিজের সর্বাধিক অক্ষমতার তুলনা করে সন্দেহ হয়, লেখক হওয়ার ক্ষমতা আদৌ আমার আছে কি না। তা না হলে কিছুই না করে কিছুই না হয়ে শুধু একচিলতে উঠোনে দাঁড়িয়ে, বিছানায় কাত হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে যৌবন কাটিয়ে দিতে পারতাম কী করে?

কাজ করার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ক্লান্তি—ক্লান্তিতে মনের গ্রন্থিগুলো খসে খসে পড়ছে। উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, —তবু অভ্যাসবশে বেঁচে থাকা আছে। সেই নিরর্থক বেঁচে থাকার মধ্যেই ক্বচিৎ দোলা লাগে। হাওয়া দেয়, যেমন হয়েছে এই মাত্র শারমিনের কথা মনে হওয়ায়। কিন্তু তা-ও মুহূর্তের জন্যে। আবার সেই ক্লান্তি বিষের মতো ছড়িয়ে পড়ে আমার চেতনায়। আমার বন্ধু সৈয়দ নওশাদ করিম একদিন রেস্তোরাঁয় চা খেতে খেতে বলেছিলেন, আমার অসুস্থতা শরীরে নেই, হয়তো মনে মধ্যে তার বাসা। ভাবছিলাম, কী উত্তর দেব?

হ্যাঁ, আমার বাইরের শরীর স্বাস্থ্য ভালোই। বুক ঠুকে বলবার মতো কিছু নয় যদিও, তবুও ভালোই বলতে হবে। মা-বাবা রুগ্‌ণ ছিলেন না। আর ছিল কৈশোর জীবনে বাংলাদেশের খোলা মাঠ, দুরন্ত নদী, প্রাণময় পরিবেশ। আমার স্বাস্থ্যের ভিতে তাই শক্ত গাঁথুনি। সে গাঁথুনি কিছু যদি আলগা হয়ে থাকে তাহলে স্বকৃত অনাচারের ফলেই হয়েছে। আর আমার মন। তার কথা বলতে ইচ্ছা করে না। অসংখ্য ভাঙা জাহাজের টুকরো আবর্জনায় মনের বেলাভূমি আকীর্ণ হয়ে আছে। হঠাৎ সেখানে ভাঙা কম্পাসের কাঁটা ঝিকমিক করে ওঠে। সে বেলাভূমির নির্জন অন্ধকারে আমি একা ঘুরে বেড়াই। জীবনের হিংস্র সমুদ্র গর্জন করছে, লাফিবে আসছে গ্রাস করবে বলে। মনের মধ্যে দুরাশার কত জাহাজডুবির ইতিহাস নিয়ে ভদ্র নির্বিবাদী মানুষ হয়ে ঢাকার রাস্তায়ঘুরে বেড়াই। সেসব ইতিহাস নিস্পৃহ হয়ে বলা চলে না কাউকে। বলতে গেলে ভাবালুতার বাষ্পে ভিজে উঠবে মন। থাক সেসব। বেঁচে থাকা লাভ, চিরকাল তো আর থাকবো না পৃথিবীতে। দুঃখ নেই, আনন্দে জেগে উঠি, বৃষ্টিতে মনে পড়ে কারো মুখ, কিম্বা অনেকদিন আগে দেখা কোনো দৃশ্য—বেঁচে আছি বলেই তো। বিশুদ্ধ মধুর মতো হোক জীবন, সে অসম্ভবের কামনা আমি করি না। যা-কিছু ঘটছে, যা কিছু ঘটবে—সবকিছু যেন তৃষ্ণার্তের মতো পান করতে পারি, এই আমার ইচ্ছে।

দিবাস্বপ্ন দ্যাখে যারা তাদের বিপদ এই যে, বাস্তবের ঘরটা তাদের ফাঁকাই পড়ে থাকে। স্বপ্নের সঙ্গে, ইঙ্গিতের সঙ্গে না মেলাতে পারলে কাজটা তারা ফেলে রাখে। দেখিই না, থাক না আরো কিছুদিন, তারপর একদিন বোধ করি মনের মতো করেই কাজটা সমাধা করা যাবে। কিন্তু সময় ভারী পাথরের মতো ঢালু পাহাড় বেয়ে কেবলি গড়িয়ে পড়তে থাকে, এক কাজের জায়গায় একশো কাজ এসে হাজির হয়। এবং দিবাস্বপ্নের পরিধি অনন্ত অবধি বাড়িয়ে দেয়ার পক্ষে যদিও কোনো বাধা নেই, কিন্তু অনেক অকৃত কর্মের মগ্ন চাপে মানসিক কল ক্রমশ বিকল হতে থাকে।

এই দার্শনিক তত্ত্বকথা আমার নিজের চরিত্র আলোচনা করে আমি আবিষ্কার করেছি অথচ শারীরিকভাবে মোটামুটি ভালোই আছি। ঘন ঘন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে ছুটতে হয় না ওষুধের দোকানে। মনে হচ্ছে এইরকম অজ্ঞাতবাস যদি আরো কিছুকাল বজায় রাখতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে একদিন পৃথিবীতে সুস্থ হয়ে বাঁচার মতো শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে পারব। আর সাদা কাগজগুলো লগ্নের অক্ষম আশায় ফেলে রাখতে হবে না। এবং যে-দূরত্বের জীবন আমি যাপন করতে চাই তা' সংসারের কর্মঠ ভিড়ের মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব হবে।

দূরত্বের জীবন নিতান্তই চাই। তা না হলে কিছুই করা যাবে না। এবং সে জীবন দূরে পালিয়ে গিয়ে পেতে চাইলে ভুল করা হবে। এ দূরত্ব কী রকম? পরমাণুর অন্তরে ইলেকট্রনরা যেমন অতি ক্ষুদ্র একটি অনন্ত-দূরত্ব রক্ষা করে—সেইরকম। আমি সবার মধ্যে একই আবর্তনের নিয়ম মেনে ঘুরছি, ফিরছি, কিন্তু সেই আদি, মৌলিক ব্যবধানকে যেন বিসর্জন না দিতে হয়।

একজন সাম্প্রতিক লেখক তাঁর একটি চরিত্রের মুখে এই কথাগুলো বসিয়েছেন : 'আমি বরং গণিকালয়ে গেছি। প্রেমহীন দেহ ভোগ করতে গিয়ে আমি বিফল হয়েছি সত্য, তবু আমি পাপ করিনি। আমি কখনও কিছুতেই কোনো গণিকার ওষ্ঠ চুম্বন করিনি।' কথাগুলো নিঃসন্দেহে ধারালো। এই বক্তব্যের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতেই তাকাতে হয়, একটা ধাক্কাও লাগে মনে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই উক্তিটির ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। গণিকার প্রেমহীন শরীর সম্ভোগ করতে গিয়ে পাপবোধে পীড়িত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পট পট করে গণিকার ব্লাউজের বোতাম খোলা কিম্বা উদ্বেল মাছের মতো উরু স্পর্শ করে উত্তেজিত হওয়া তেমন পাপ নয়। আর গণিকার ওষ্ঠ চুম্বন করাটাই হলো চরম পাপ। এমন অনেক আছে যারা বেশ্যালয়ে যায়, বারবণিতার সঙ্গে সঙ্গমরত হয়, কিন্তু গণিকার ওষ্ঠ চুম্বন করে না। পাপবোধে পীড়িত হয়ে? মোটেও না। বারবণিতার ওষ্ঠ চুম্বন করলে সংক্রামক ব্যাধি দ্রুত বিষ ছড়িয়ে দেবে, এই আশঙ্কায়।

আমিও কখনও কোনো গণিকার ঠোঁটে চুমু খাইনি। চুমু খাওয়াতো দূরের কথা, হাত পর্যন্ত ধরিনি। তবে কি আমি কখনও গণিকালয়ে যাইনি? সত্যের অপলাপ করবো না, নিজের কাছে কবুল করাই ভালো, জীবনে একবারই আমি বেশ্যালয়ে পা রেখেছিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার একরাতে, চট্টগ্রামে। দু'তিনজন বন্ধুর প্ররোচনায় যেতে রাজি হয়েছিলাম, বলা যায়। আত্মগরজ যে একেবারেই ছিল না, তা বলা যাবে না। সাহিত্যপাঠের ফলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাস অনেক আগেই গণিকালয় সম্পর্কে কৌতূহলের দীপ

জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমার মনে, সেই দীপশিখাটিকে প্রখরতর করে তোলে কোনো কোনো লেখকের উল্লোল জীবনযাত্রা; তাই চট্টগ্রামের এক শীতরাতে বন্ধুরা যখন কামনা-থরোথরো প্রস্তাব পেশ করল, তখন আমি দ্বিধার মেঘে উড্ডীন এক পাখি, নিঃসঙ্গ এবং কম্পমান। শেষ পর্যন্ত আমি সঙ্গী হলাম তাদের নৈশ অ্যাডভেঞ্চারে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায়।

নিষিদ্ধ এলাকায় পৌঁছে গা ছমছম করে ওঠে আমার। কিঞ্চিৎ সুরাসিক্ত দেহমন ভীষণ টলটলায়মান, নেশায় আদপেই নয়, এক ধরনের উটকো ভয়ে। আমি প্রায় কাষ্ঠমূর্তি সেই নির্ভেজাল প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে। পা চলে না, মন অসাড়। আমার বন্ধুরা অভিজ্ঞ, চটপটে, ভয়রহিত। আমার সেই মুহূর্তে বন্ধুত্রয়ের অসাধারণ সাহসিকতা সত্ত্বেও মনে হলো, এখানে কেউ যদি আমাদের তিনজনকে মাটির তলায় পুঁতে রাখে, তাহলে কস্মিনকালেও এই হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে না। বন্ধুরা এগিয়ে গিয়ে একটি লোকের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বললেন। লোকটি না-বেঁটে, না- লম্বা, মাথায় তেল-চুপচুপে চুল, পরনে লুঙ্গি আর সাদা হাফশার্ট। ডানদিকের কাঁধে একটা গামছা। লোকটাকে দেখতে খুবই নিরীহ; ভেতরে ভেতরে কেমন তা মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

সেই না-বেঁটে না-লম্বা লোকটাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করলাম আমরা চারজন। আমাদের উঠোনের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার অস্তিত্বে ভয়ের কাঁকড়া সঞ্চরণশীল। অত্যন্ত বোকা বোকা লাগছিল নিজেকে মরা কুকুরের চামড়ার মতো তারাহীন আকাশের নীচে। একটু পরে কয়েকটি ঘর থেকে সুড় সুড় করে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক, তারপর সটকে পড়ল চোখের পলকে, —যেমন নেড়ী কুকুর খাদ্য ছেড়ে পালিয়ে যায় ডাকাবুকো কুকুরের আগমনে।

আমরা সবাই একটা খোলার ঘরে ঢুকলাম। কেউ বসলাম মোড়ায় আর কেউ কেউ নোংরা বিছানায়। আমাকে বসতে হল বিছানায়। আমি এত নার্ভাস ছিলাম যে, সেই ঘরের রমণীটির সিগারেট ধরিয়ে দিলাম বন্ধুর লাইটার দিয়ে, যদিও আমি নিজে সিগারেট খাই না। নিজেকে সহজ-স্বাভাবিক করে তোলার উদ্দেশ্যে এই বেমক্কা স্মার্টনেস দেখিয়ে ফেললাম, যা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। মানুষ কখনো কখনো অসম্ভব কাজও করে ফেলে। লাইটারটা বন্ধুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি সেই রূপোজীবিনীর দিকে এরকম ভঙ্গিতে তাকালাম যেন আমি মস্ত ওস্তাদ লোক, জবরদস্ত আমার নার্ভ। একটু পরেই ঘরে গুঞ্জন। কয়েকজন মেয়েমানুষের কণ্ঠস্বর। আমার নেতৃস্থানীয় বন্ধুটির ইশারায় ওরা সারিবন্দি হয়ে দাঁড়ায়। এই খদ্দেরজোটানো সারি থেকে একজনকে বাছাই করতে হবে আমায়। হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে যায়, বিবমিষা লুণ্ঠিত অস্তিত্ব নিয়ে ভয়ানক বিব্রত আমি, বাকরহিত, ষোল আনা অসহায়. কোনোমতে ইংরেজিতে, প্রেতায়িত স্বরে, উচ্চারণ করলাম,—লেট আস গো, প্লিজ। প্রথমত আমার বন্ধুত্রয় আমার ন্যাড়া আর্তনাদে কান পাতেনি। পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে, আমার চেহারা — যা সেই মুহূর্তে নিশ্চয় ছাইঢাকা—লক্ষ করে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ওরা। লোকটার হাতে টাকাকড়ি গুঁজে দিয়ে সেই খোলার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আকাশের নীচে। নেতৃস্থানীয় বন্ধুটি তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে আসে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, —ফানি, হোয়াট হ্যাপেন্ড?

আর ইউ সিক? হ্যাঁ, আমি অসুস্থ, বাস্তবিকই অসুস্থ। হোটেলে ফিরে গিয়েই ভীষণ জ্বর এলো আমার।

আমি বরং জীবনকে গণিকার মতো ব্যবহার করে চলেছি। কিম্বা জীবনটাই আমাকে ব্যবহার করা যাচ্ছে এক ফালি ন্যাকড়ার মতো। মোটকথা, আমি ব্যবহৃত হচ্ছি। জীবন তার সমর্থ দাঁতে আমাকে চিবোচ্ছে মুরগির একটুকরো মসৃণ হাড়ের মতো। চুষে নিচ্ছে ক্রমাগত। আমি নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছি; কারণ, না দিয়ে উপায় নেই, মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা হয়, নড়ে উঠতে চায় প্রতিবাদলোলুপ চোয়াল। গর্তের মতো এই ঘরে আমার শরীর বিস্ফোরণ হতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত একটা নমিত নদী হয়ে যায়। অল্পক্ষণ পরেই সান্ত্বনার দস্তানা মোড়া একটি অদৃশ্য হাত আমার কাঁধ স্পর্শ করে। আমি সেই হস্তধারীকে খুঁজে বেড়াই তন্ন তন্ন করে। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত আমি কোনো অলৌকিক বাগানের দরজা খুলে-যাওয়ার মুহূর্তে এক অতল খাদে পড়ে কাতরাচ্ছি।

এই যে আমি ডায়েরিটা ইয়াসমিনের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছি, যে বন্ধুদের সঙ্গে বেশ্যালয়ে গিয়েছিলাম তাদের নাম চেপে গিয়েছি —এর পেছনে কি আমার নিম্ন মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি কাজ করছে না? আমি জানি, আমার দিনপঞ্জিতে যদি সেই বন্ধুরা তাদের নামের উল্লেখ দেখতেন তাহলে তারা সবাই আমার সঙ্গে নির্ঘাৎ সম্পর্ক ছেদ করতেন। অনেক ভেবেচিন্তে আমি তাদের নামোল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। আর ইয়াসমিন যদি আমার আজকের লেখাটি পড়ে, তাহলে কি সে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে এসব? সে কি একথা বিশ্বাস করবে যে, আমি গণিকাসঙ্গ না করেই ফিরে এসেছিলাম চট্টগ্রামের এঁদো, ঘুরঘুট্টি বেশ্যালয় থেকে? বেট রেখে বলতে পারি, করবে না। এজন্যেই তো আমার এই লুকোচুরি। যদি আমি ইয়াসমিনকে এই ঘটনাটি সবিস্তারে ব[illegible], সেকি মেনে নেবে নিঃশব্দে কোনো চেল্লামেল্লি ছাড়া, বিনা অশ্রুপাতে? আমাকে কি ক্ষমা করতে পারবে সে? পারবে না। চিরদিনের জন্যে ওর মনে একটা অমাবস্যা তৈরি হয়ে থাকবে। ইয়াসমিনের পরপুরুষঘটিত এমন কোনো আবছা অপরাধ কি আমি সাদা মনে গ্রহণ করতে পারব? আমার অন্তর্গত গোখরোটা কি ফণা তুলবে না? এই মুহূর্তে বলা মুশকিল আমার পক্ষে। প্রকৃত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেই মানুষের আসল স্বরূপটি সুদ্বুৎ করে বেরিয়ে আসে।

ডায়েরিটা বন্ধ করে ইশতিয়াক অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। বেশ কিছুদিন আগেকার শব্দগুলি ঘুরতে থাকে মনের ভেতর, শিকারির গুলিচমকিত বিলের একঝাঁক বালিহাঁসের মতো। খুব অল্প সময়ে সে লিখে ফেলতে পেরেছিলো কথাগুলি, একটানা; প্রায় কোনো কাটাকুটি না করে। আর আজ? আজ সে লিখতে পারবে না; সে জানে, মনের সঙ্গে শত জবরদস্তি করলেও, ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করলেও সে লিখতে পারবে না, আধ পাতাও লেখা হবে না। বর্তমানে ব্যর্থ লেখকের পক্ষাঘাত বয়ে চলেছে সে, এক বিপুল শূন্যতায় সে ভাসছে। আমার এখনকার মানসিক অবস্থা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না, ইশতিয়াক ভাবে ঘুমন্ত ইয়াসমিনের দিকে তাকিয়ে। নিটোল আঙুরের মতো

ঘুম ইয়াসমিনের। ইয়াসমিন ঘুমুচ্ছে বলেই ইশতিয়াক তার ডায়েরিটা নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণ ধরে পড়তে পেরেছে। আর রাতে শারমিনের উদ্দেশে একটি চিঠি লেখার চেষ্টা করেছে সে, অথচ একটি বাক্যও গঠন করতে পারেনি। চিঠি লেখার জন্যেও কি প্রেরণার প্রয়োজন? এমন অনেক লেখক আছেন যাঁরা প্রেরণা ফ্রেরণার কোনো ধার ধারেন না; গোঁয়ার গোবিন্দের মতো লেখনী চালিয়ে যান সমানে, তাদের সেসব রচনা দিব্যি উৎরেও যায়। ডস্টয়ভস্কিকে যদি প্রেরণার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হতো সবসময় তাহলে অমন ঢাউস ঢাউস উপন্যাস তিনি লিখতেন কী করে, অত জুয়া খেলার পর? না, অষ্টপ্রহর প্রেরণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা কোনো কাজের কথা নয়।

একটা চিঠিও লিখতে পারছে না, এধরনের অভিজ্ঞতা ইশতিয়াক হোসেনের জীবনে এই প্রথম। এর আগে ইশতিয়াক শারমিনকে মনে-মনে অনেক চিঠি লিখেছে, অনেক চিঠি সত্যি-সত্যি লিখেও ফেলেছে, যদিও সেসব চিঠি কখনো পোস্ট করেনি সে। এই অলিখিত চিঠিটা লেখা হলেও এটি কখনো শারমিনের হস্তগত হবে না। ডাক বিভাগের গাফিলতির জন্যে নয়, পত্রলেখকের অদ্ভুত খেয়ালের ফলে। এ এক নিজস্ব খেলা ইশতিয়াকের। শারমিনের উদ্দেশ্যে, কিম্বা অন্য কোনো নারীর উদ্দেশে, যার কোনো বাস্তবঘেঁষা অস্তিত্বই নেই, রাশি রাশি চিঠি লেখা এবং ছিঁড়ে ফেলা। কখনো কখনো অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে এই খেলা সে খেলেছে। আজ রাতে যে চিঠি লেখার চেষ্টায় সে পর্যুদস্ত হচ্ছে, এটিও তার সেই খেলার অন্তর্গত।

এই দিনলিপির এক জায়গায় ইশতিয়াক লিখেছে যে সে দিব্যি স্বাস্থ্যবান। ওর কোনো অসুখবিসুখ নেই। গড়পড়তা বাঙালি যুবকের স্বাস্থ্যের যা হাল সেই তুলনায় সে ভালোই আছে; অন্তত কয়েক মাস আগেও ছিলো। ইশতিয়াক কি এখন নিজেকে যুবক বলে দাবি করতে পারে? কেন পারবে না? ওর বয়েস এখনো ময়লা হয়নি। বেশ ঝকঝকে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়েছে তার, চল্লিশ ছুঁতে আরো পাঁচ বছর বাকি। এখানে সবাই তাকে যুবকই বলবে। কিন্তু নিজেকে তার আর তেমন সুস্থ বলে মনে হয় না ইশতিয়াকের। ইদানীং ইশতিয়াক ঝিমিয়ে পড়েছে, ওর অস্তিত্ব আফিমখোর যেন। কোনো কিছু করতে ভালো লাগছে না ওর; সবচেয়ে খারাপ লাগে অফিসে যেতে। অফিসে যেতে হবে কথাটি ভাবলেই ইশতিয়াকের গা কেমন গুলিয়ে ওঠে, বমি আসে। এক তীব্র বিবমিষা নিয়ে অফিসে যেতেই হয় শেষ পর্যন্ত; না গিয়ে উপায় নেই। চাকরি টিকিয়ে রাখতে না পারলে উপোস থাকতে হবে। ভাগ্যিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি হাসিল করতে পেরেছিলো, নইলে এই দারুণ প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়ায় টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ত। কত ধানে কত চাল হয় তা সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। যদি হঠাৎ একদিন তার চাকরি চলে যায়, তাহলে কী হবে? প্রশ্নটি মাথা তুলতেই, একটি ভয় ছড়িয়ে পড়ে ইশতিয়াকের শিরায় শিরায়। আজকাল চাকরির যা বাজার তাতে অন্য একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ভয় শিরশিরিয়ে ওঠে ওর সারা গায়ে। অক্টোপাসটা এগোতে থাকে ওর দিকে, ইশতিয়াক স্পষ্ট দেখতে পায়। আটটি শুঁড় জড়িয়ে ধরে ওকে। ইশতিয়াকের মনে হয়, এই অক্টোপাসটি ওর নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে হামলা করেছে। রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ওর নেই, সে যে গলা ছেড়ে চিৎকার করবে

তারও উপায় নেই। কে যেন ওর গলা বন্ধ করে দিয়েছে, মুখে ঝুলিয়ে দিয়েছে মস্ত তালা। ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না, বেরুতে পারছে না। ইশতিয়াক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত ইয়াসমিনের দিকে। ইয়াসমিন ঘুমোচ্ছে তৃপ্তিজনক ভাবে, হয়তো দেখছে কোনো স্বপ্ন। নিশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে ইয়াসমিনের বুক। ইশতিয়াক চেয়ার ছেড়ে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না। অক্টোপাসের শুঁড়গুলি ওকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল লাগছে ইশতিয়াকের; শরীরে একফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই। হয়তো সে এই চেয়ারেই মরে পড়ে থাকবে, যেমন কেউ কেউ থাকে। সকালে যখন ইয়াসমিনের ঘুম ভাঙবে তখন সে আবিষ্কার করবে ইশতিয়াকের মৃত্যুকে। ইশতিয়াকের মাথা ঘুরতে থাকে—লেখার টেবিল, বইপত্র, খাট, ইয়াসমিন, দেয়াল ঘুরছে। সে চোখ বুজে এই ঘূর্ণী থেকে রেহাই পেতে চায়। সবকিছু ঠিক আছে বলে নিজেকে আশ্বস্ত করতে সচেষ্ট হয় ইশতিয়াক। অক্টোপাসটিকে সে কিছুতেই আমল দেবে না আর; এক অস্তিত্ববিহীন প্রাণী নিয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে, ইশতিয়াক নিজেকে প্রবোধ দেয়। অক্টোপাস সমুদ্রবিহারী প্রাণী, স্থলচব নয়; জলচর প্রাণী কী করে ডাঙায় উঠে আসবে?

না, এসব আজগুবি ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। ইশতিয়াকের এ কথা যেন ভয়জাগানো অন্ধকারে শিস বাজানোর মতো। এইতো অক্টোপাস ওকে জড়িয়ে ধরেছে, আটটি শুঁড়ের প্রবল চাপে ওর হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। ইশতিয়াক মরিয়া হয়ে কিছুক্ষণ অক্টোপাসটির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, অনেকটা অথই পানিতে পড়া মানুষের ধরনে প্রচুর ধ্বস্তাধ্বস্তি করা সত্ত্বেও সে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করতে পারছে না। আর কী ভালো হতো, যদি এই মুহূর্তে ইয়াসমিনের ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু ইয়াসমিনের ঘুমে টোল পড়ছে না। নিদ্রা ইয়াসমিনের শরীরকে লেহন করছে। ইয়াসমিনের ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণই আপাতত দেখা যাচ্ছে না। আর এ দিকে ইশতিয়াকের শরীর অবসন্ন, নিস্তেজ হয়ে আসছে। ওর মাথা টেবিলে নুয়ে আসে। সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়ার আগে হয়তো এমন অনুভূতি হয়, ইশতিয়াক ভাবে।

অক্টোপাস ইশতিয়াককে ওর ঘর থেকে টেনে বের করে কোথায় নিয়ে চলেছে? সে স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে না, দৃশ্যাবলি কুয়াশাময়। ইশতিয়াক এখন সমুদ্রের গভীরে; ওর নাকে জলজ ঘ্রাণ, অক্টোপাসের শরীরের গন্ধ। সে ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে; একটা নিমজ্জিত পুরানো জাহাজ দেখে ওর কৌতূহল হয় সেই জাহাজটির ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে। অক্টোপাসের শুঁড়বন্দি সে, স্বেচ্ছায় কোথাও যাবার জো নেই। কয়েকটি তারামাছ ভেসে ওঠে, সে দ্যাখে। দ্যাখে তলোয়ার মাছের ঝলসানি। তলোয়ার মাছ ওকে এফোঁড় ওফোঁড় করে উধাও; সামুদ্রিক পানিতে মিশতে থাকে রক্তধারা। ওকে কে যেন ডাকে বহুদূর থেকে, অস্পষ্ট চেনা কণ্ঠস্বর। এ গলার আওয়াজ সে অনেকবার শুনেছে। কার এই কণ্ঠস্বর? এ মুহূর্তে শনাক্ত করতে পারছে না। 'এই শুনছো?' ইয়াসমিন ইশতিয়াককে জাগাতে চেস্টা করে। ইশতিয়াক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। সে টেবিলে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি।

'এভাবে ঘুমিয়ে থাকবে নাকি সারারাত?'

'হঠাৎ চোখ লেগে গিয়েছিলো।'

'বিছানায় এসো।'

'কটা বাজে?' ইয়াসমিনের জবাবের অপেক্ষা না করে ইশতিয়াক হাতঘড়ি দ্যাখে। রাত দেড়টা বাজে।

এক গ্লাস পানি খেয়ে বাথরুমে যায় ইশতিয়াক। বাথরুমে কয়েকটি আরশোলা ঘোরাফেরা করছে অবাধ স্বাধীনতায়। ইশতিয়াকের ঘৃণা লাগে। আরশোলা দেখলেই ইশতিয়াকের মনে এক ধরনের হিংস্রতা জাগে, এই আদ্যিকালের নাছোড় প্রাণীগুলিকে খতম করার একটা বাসনা ওর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। কোত্থেকে এসে যে হাজির হয় এগুলো, ইশতিয়াক পেশাব করতে করতে প্রশ্নাকুল হয়। শত মারো, কোনো ফায়দা নেই। রক্তবীজের ঝাড়ের মতো গজিয়ে ওঠে বারবার। ইশতিয়াক বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর ইয়াসমিন ঢোকে। বাথরুমের আরশোলাগুলো, বিছানায় শুয়ে ইশতিয়াকের মনে হলো, ওর গায়ে উঠে এসেছে, শুঁড় দিয়ে চাটছে ওকে, ওর গা শিরশির করতে থাকে। নিজের অজান্তেই সে হাত দিয়ে জোরে জোরে গা ঝাড়ে আরশোলা তাড়ানোর জন্যে।

খুব ভোরবেলা ইশতিয়াকের ঘুম ভাঙল। এ সময়টাকে বোধহয় সুবেসাদিক বলে। এত ভোরে অনেকদিন তার ঘুম ভাঙেনি। একটু বেলা করে ওঠাই তার অভ্যাস। রাত জেগে লিখতে হয় বলেই সচরাচর প্রত্যূষে সে শয্যাত্যাগ করতে পারে না। গতরাতে অবশ্য সে একবর্ণও লেখেনি। লেখা হচ্ছে না অনেকদিন থেকেই। আগে চেষ্টা করেছে লেখার জন্যে, কয়েকদিন থেকে চেষ্টা করাও ছেড়ে দিয়েছে।

ইশতিয়াক ধর্মমনস্ক নয়; নামাজ পড়ে না, রোজাও সে রাখে না। ইয়াসমিন নিয়মিত রোজা রাখে, তবে তার নামাজ পড়াটা অনিয়মিত। তার গৃহিণী শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি পাঞ্জেগানা নামাজের পাবন্দ হতে পারেনি। কোনো কোনোদিন তার নামাজ কাজা হয়ে যায়। কিছুদিন লাগাতার পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে ইয়াসমিন, তারপর ভাটা পড়ে উৎসাহে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

ইশতিয়াক ধর্মমনস্ক না হলেও, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের আজান শুনতে ভালো লাগে তার। ছেলেবেলায় আরো বেশি ভালো লাগত। ইশতিয়াকের মনে পড়ে, ওর আব্বার বন্ধু জনাব আব্দুল হাকিম খুব সুন্দর আজান দিতেন। ভদ্রলোকের সুরেলা কণ্ঠস্বর আজো তার কানে বাজে। জনাব আব্দুল হাকিমের হাসিটিও ছিলো মধুর। চোখ দুটো নেচে উঠতো হাসির ঝিলিকে, যেন চোখ দিয়ে হাসছেন তিনি। তার আব্বার বন্ধু ইশতিয়াককে চার্লস ল্যাম্বের '*টেলস্ ফ্রম শেক্সপিয়ার*' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। কৈশোরে ঐ বই ছিল ওর নিত্যসঙ্গী।

ভোরের আজান যদি দূর থেকে ভেসে আসে হাওয়ায় ভর করে আর মুয়াজ্জিন যদি হয় সুকণ্ঠ, তা'হলে আর কথাই নেই, প্রাণ ভরে ওঠে আপনা থেকেই। কিন্তু ইদানীং সেটি হবার জো নেই; কারণ মাইক্রোফোনের দৌলতে আজানের ধ্বনি দূর থেকে ভেসে আসে না; মসজিদ যদি কাছাকাছি থাকে; তাহলে অত্যন্ত জোরে আওয়াজ হয় যা' আজানের মাধুর্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে বলে ইশতিয়াকের ধারণা। আর ঢাকা তো মসজিদেরই শহর।

আজ রাতে তার দাওয়াত, দূর গুলশানে, ইশতিয়াকের মনে পড়ে। তাকে নিতে আসবেন বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের সেরা লেখক সৈয়দ নওশাদ করিম। গুলশনে পার্টিতে কী পোশাক পরে যাবে সে? তার কোনো স্যুট নেই, ভালো হাওয়াই শার্ট নেই। না থাক, ট্রাউজার আর পাঞ্জাবি দিয়েই চালিয়ে দেবে। ইয়াসমিন দু'মাস আগে ওর জন্যে একটা সুন্দর নক্‌শাদার পাঞ্জাবি কিনেছে। দেখতে মন্দ লাগবে না।

বেলা বাড়ে। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। ডিমের কুসুমের রঙের মতো রোদ এখন গাছের পাতায়, ইলেকট্রিক তারে, পুরানো দেয়ালে, কৃ পণ উঠোনে। এরকম রোদ ইশতিয়াকের ভালো লাগে। চড়া রোদ ওর পছন্দ নয়। ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্শেল প্রুস্ত রোদ একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। বছরের পর বছর তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন রোদবিহীন কর্ক-ব্লাইন্ড ঘরে। মার্শেল প্রুস্ত, যাঁর কাছে ফরাসি কথাসাহিত্য অশেষ ঋণী, হাঁপানি রোগে ভুগতেন। ওর বিছানায় কম্বলের বদলে থাকতো কালো ওভারকোট। ভাগ্যকে ধন্যবাদ, আমার হাঁপানি রোগ নেই, ইশতিয়াক মনে-মনে উচ্চারণ করলো। উঃ! যা ভয়ানক কষ্ট। ইশতিয়াক নীরোগ। তবে সম্প্রতি তার ভেতরে অসুস্থতা কালো নিশান উড়িয়ে দিয়েছে। নামহীন এক রোগ। শারীরিক কোনো যন্ত্রণা নেই সত্য,কিন্তু সেই অসুখ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এ রোগের চিকিৎসা তুখোড় চিকিৎসকের অনায়ত্ত। এ কথা কাউকে বলাও যায় না। যাকগে, মার্শেলি প্রুস্ত, ইশতিয়াক কোথায় যেন পড়েছিলো, বিছানার বালিশে বুক ঠেকিয়ে লিখতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে থাকত শয্যাময়। ইশতিয়াক বিছানায় উবুড় হয়ে লিখতে পারে না। টেবিলে না বসলে লেখা আসে না ওর। অনেক চেষ্টা করেও প্রুস্তের রিমেমবারেন্স অব থিংস পাস্ট সে সংগ্রহ করতে পারেনি। গ্রন্থবিলাসী সৈয়দ নওশাদ করিমকে তাগাদা দিয়েও সে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বইটি অনেক খুঁজেছেন ইশতিয়াকের খাতিরে, এবং নিজেরও গরজে, কিন্তু নিষ্ফল সন্ধান। ম্যারিয়েটার জনাব খালেদকে অনুরোধ করে কি কোনো লাভ হবে? তিনি কি আনিয়ে দিতে পারবেন বইটি? একদা নিউমার্কেটের মহীউদ্দিন অ্যান্ড সন্স-এ প্রচুর ভালো বিদেশি বই আসতো। আজকাল সে পাট চুকে গেছে। রোদেলা উঠোনে চড়ুই দম্পতি। ইশতিয়াক একবার পাশ ফিরে দেখে যে, ইয়াসমিন পাশে নেই। বাথরুমে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ইয়াসমিন ফিরে আসে। ইতোমধ্যে ওর হাতমুখ ধোওয়া শেষ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াসমিন চুলে চিরুনি চালায়। গুনগুনিয়ে কী একটা গান গায়। সুন্দর লাগছে ওকে, ইশতিয়াক যেন নতুন করে দেখছে ইয়াসমিনকে; যেন ইয়াসমিন অন্য কেউ, ওর স্ত্রী নয়। স্ত্রী কথাটির মধ্যে, ইশতিয়াকের মনে হয়, স্যাঁতস্যাঁতে ভাব আছে, কিছু কালিঝুল আছে, ছন্দপতনের রেশ আছে, কিছুটা বা ধূসরতা আছে। ইশতিয়াক ইয়াসমিনকে ডাকে। যেন নিজের স্ত্রীকে নয়, অন্য কাউকে ডাকছে সে। লোপার আড়ালে যে তন্বী, তাকে? শারমিন বানুকে? নাকি এর আগে কখনো দেখেনি, এমন কাউকে?

খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসে ইয়াসমিন; ইশতিয়াকের পাশে বসে। লাক্স সাবানের মৃদু ঘ্রাণ পায় ইশতিয়াক, যখন সে ইয়াসমিনকে চুমু খেতে চায়। ইয়াসমিন দ্রুত মুখ সরিয়ে বলে,—জি না, বাসিমুখে এসব চলবে না।' ইশতিয়াক জোর করে, কিন্তু

ইয়াসমিনের ওষ্ঠে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারে না। এক ঝটকায় দূরে সরে যায় ইয়াসমিন। ইশতিয়াক দৃশ্যটিকে উপভোগ করে।

'আজ রাতে আমি আর খাচ্ছি না কিন্তু, আমার দাওয়াত আছে।'

'শুধু তোমাকেই ডেকেছে বুঝি? আমি বাদ?'

'হ্যাঁ।'

'পার্টিতে একা গেলে তোমাদের খুব সুবিধে হয়, তাই না?'

'কী সুবিধা হয়?'

'যত ইচ্ছা হুইস্কি গেলা যায়, হাপুস নয়নে মেয়েদের দেখা যায়, এসব আর কি।'

ইয়াসমিনের মুখ থেকে হাপুস নয়নে কথাটি শুনে হাসি পায় ইশতিয়াকের। নিশ্চয় সে কোনো বাজারু উপন্যাস থেকে শব্দটি আহরণ করেছে। এবং ফ্রেজটির অর্থ না জেনেই ব্যবহার করছে সে।

'হাসছো কেন?'

ইশতিয়াক যদি এখন স্ত্রীকে শব্দার্থ শেখাতে চায়, তাহলে সে চটে যাবে। তাই হাপুস নয়নের প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করে বলে—

'তুমি জানো, বেশি হুইস্কি আমি খাই না। আর যেহেতু আমি অন্ধ নই এবং দরবেশদের মতো চোখ বুঝে থাকার আদত নেই, তাই ধারে কাছে তোমাদের গোত্রের কেউ থাকলে চোখ তো পড়বেই। নইলে যে ওদের সাজসজ্জার মান থাকে না।'

'সব বুঝি আমি। কথা দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না।'

কী বোঝে ইয়াসমিন? একটু আগে সে ইয়াসমিনকে অন্য কেউ ভেবে কাছে ডেকেছিল একথা কি বুঝতে পেরেছে ইয়াসমিন? কে জানে হয়তো বুঝতে পেরেছে। ওদের ফাঁকি দেয়া মুশকিল। ওরা কী করে যেন টের পেয়ে যায়। শারমিনের ব্যাপারটি তো ইয়াসমিনের জানার কথা নয়। লোপার অন্তরালে আছে যে নারী, তার কথাও ইয়াসমিনের অজানা। ইশতিয়াক এসব কথা ইয়াসমিনকে কখনো বলেনি এবং বিয়ের আগে তার স্ত্রীর জীবনে অন্য কোনো পুরুষ এসেছিলো কিনা, এ নিয়ে কোনো ইতর কৌতূহলও প্রকাশ করেনি। এ-ব্যাপারে ওরা দু'জনই মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। কার মনে কোন্ হানাবাড়ি আত্মগোপন করে আছে, কে জানে।

ইয়াসমিন কি অন্য কাউকে ভালোবাসত? ভালোবাসা অসম্ভব কিছু নয়। ওর স্ত্রী আগে কাউকে ভালোবাসত কি বাসত না, এনিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না। কোনোদিন মাথা ঘামায়ওনি ইশতিয়াক। সে নিজে ভালোবেসেছে একাধিকবার; শারমিনকে আজো সে ভালোবাসে। হয়তো আগেকার তীব্রতা নেই কিন্তু এ-কথা সত্য যে, শারমিন তার ভাবলোক থেকে কোনোদিনই লুপ্ত হয়নি। যার মডেলে লোপাকে তৈরি করেছে সে, তার স্মৃতিও মাঝে-মধ্যে হানা দেয় ইশতিয়াকের মনে। তাই, ইয়াসমিনের পূর্বজীবন যদি কারো পদধ্বনিময় হয়ে থাকে, তাহলে ইশতিয়াকের আপত্তি করার কী আছে? ধরো ইয়াসমিন তোমাকে আজ তেমন কোনো একজনের কথা শোনালো, তখন তুমি কী রকম আচরণ করবে হে ইশতিয়াক হোসেন? সহজ মনে মেনে নিতে পারবে?

নাকি তোমার মাথায় খুন চেপে যাবে। না, খুনটুন চাপবে না। মনের ভেতর একটু খচখচও কি করবে না? করতে পারে। করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাবলে ব্যাপারটা নিয়ে হৈ হাঙ্গামা, ঝগড়া ফ্যাসাদ কিছুই হবে না। মেলোড্রামা আমি পছন্দ করি না। ইশতিয়াক হোসেন ইয়াসমিনের দিকে তাকায়। ইয়াসমিন এখন কী ভাবছে? ওর আগেকার জীবনের ঘটনার কথা যা বার-বার মনে পড়ার মতো। মানুষ যদি অন্যের মনের খবর জানতে পারত। মার্শেল প্রুস্ত অনেককে প্রশ্ন করতেন তাদের জীবন সম্পর্কে, তাদের মনোজগতের নানা খবর জানতে চাইতেন। উপন্যাসের মালমশলা সংগ্রহের তাগিদেই এমন কৌতূহল প্রকাশ করতেন প্রুস্ত। ইশতিয়াকেরও এ ধরনের কৌতূহল থাকা উচিত। প্রত্যেক ঔপন্যাসিককেই হতে হয় কৌতূহলী। নয়তো অভিজ্ঞতার সীমা কখনো প্রসারিত হবে না। ইশতিয়াক সাধারণত কাউকে কোনো কিছু জিগ্যেস করে না। কারো অন্তর্লোক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে কাউকে কোনো প্রশ্ন করে না। অবশ্য সে তার চোখ কান খোলা রাখে, অবজার্ভ করে অনেক কিছু, তারপর দেয় কল্পনার ভিয়েন। প্রুস্তের পদ্ধতি অবলম্বন করলে মন্দ হয়না। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। ঘরের মানুষ দিয়েই শুরু করা যাক। ইয়াসমিনের জীবনের কতটুকু জানে সে? সামান্য কিছু খুঁটিনাটি ছাড়া তেমন কিছুই ইশতিয়াক জানে না। ইয়াসমিন স্বেচ্ছায় ওকে যা-যা বলেছে শুধু তাই জানে ইশতিয়াক, তার বেশি কিছু নয়। ঠিক আছে, ইয়াসমিনকে প্রশ্ন করা যাক। কিন্তু পরমুহূর্তেই এই প্ল্যান খারিজ হয়ে গেল। ইশতিয়াক বাইরে দৃষ্টি মেলে দেয়; ইয়াসমিন চিরুনি পরিষ্কার করতে মনোযোগী হয়।

গুলশানের পার্টি থেকে ফিরতে ইশতিয়াকের অনেক রাত হল। সৈয়দ নওশাদ করিম তাকে পৌঁছে দিয়েছেন। ঝকঝকে ডেলুক্স টয়োটায়। কারটি অবশ্য সৈয়দ করিমের নয়, গুলশানবাসী জনাব জহির সিদ্দিকীর। তার আমন্ত্রণকর্তার নাম জহির সিদ্দিকী। হয়তো আগে জহিরুদ্দিন সিদ্দিকী ছিলো, পরে নিজের নামটাকে ঈষৎ হ্রস্ব করে নিয়েছেন। হ্যাঁ, রুচি আছে বটে ভদ্রলোকের। দেয়ালে নামজাদা চিত্রকরের দামি ছবি। যথার্থ বলেছেন সৈয়দ নওশাদ করিম। জনাব জহির সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি বাস্তবিকই দেখার মতো। এন্তার ভালো ভালো বই। নানা ধরনের বই। বেশ কিছুকাল আগে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুইজের 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সালিটিউড' উপন্যাসটির নাম শুনেছিল সৈয়দ নওশাদ করিমের কাছে। সঠিক উচ্চারণ কী? গার্সিয়া না গার্থিয়া? সলিটিউড না সলিচিউড? ধুত্তোরি, উচ্চারণের নিকুচি করি। বইটি সে এর আগে কোথাও দেখেনি, দেখেছে জনাব জহির সিদ্দিকীর বইয়ের সেলফে। এ বই সৈয়দ করিমের কাছে ছিলো একসময়, এখন নেই। হারিয়ে গেছে। কেউ পড়তে নিয়ে হয়তো ফেরত দেয়নি। এই এক নোংরা অভ্যাস অনেকের, বই ধার নিয়ে আর ফিরিয়ে দেয়ার নামটি নেই। মার্কুইজের উপন্যাসটি জনাব জহিরের কাছে ধার চাইতে প্রলুব্ধ হয়েছিল ইশতিয়াক। প্রথম দর্শনেই কারো কাছে বই ধার চাওয়া যায় না, এ বিবেচনায় সে কোনোমতে লোভ সামলিয়েছে। তবে মার্শেল প্রুস্তের রিমেমবারেন্স অব থিংস পাস্ট নেই। এত বই আছে অথচ প্রুস্ত নেই। কেন নেই জিগ্যেস করতে ইশতিয়াক ভুলে যায়। জিগ্যেস করলে কি জহির সিদ্দিকী কিছু মনে করতেন? এতে মনে করার কী আছে? বরং জিগ্যেস করাই ভালো ছিল।

হয়তো বইটি আনানোর জন্য ভদ্রলোক উদ্যোগী হতেন, ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকা থেকে নিয়েও আসতেন। জহির সিদ্দিকী প্রায়ই বিদেশে পাড়ি জমান। দেশভ্রমণের শখ আছে তাঁর, তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনও আছে। আবার কখনো জহির সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা হলে সে প্রুস্ত-প্রসঙ্গটি তুলবে। তিনি খুশিই হবেন। প্রথম সাক্ষাতেই ইশতিয়াক বুঝতে পেরেছে যে, জাঁদরেল এই বিজনেসম্যান জনাব জহির সিদ্দিকী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে অলোচনা করতে যথেষ্ট উৎসাহী। আর এটা কোনো দেখানোপনা নয়। তাঁর এই সাহিত্যপ্রীতি ষোলআনা খাঁটি। ড্রইংরুম সাজানোর জন্যে তিনি বই কেনেন না। তিনি নিয়মিত বই পড়েন, প্রচুর পড়াশোনা যে করেন তা' তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলেই বোঝা যায়।

অনেক চমক ছিল গুলশানের সেই আলিশান বাড়িতে। কিন্তু ইশতিয়াকের জন্যে সবচেয়ে বড়ো চমক ছিল শারমিন বানু। শারমিন একা আসেনি, সঙ্গে ছিল ওর স্থপতি স্বামী আনোয়ার মিনহাজ। শারমিনকে দেখতে এখন আগের চেয়েও সুন্দর। ওর চোখ দুটি বুঝি আরো বেশি মোহময়ী, মদির হয়েছে। শরীরে ভরা যৌবনের অকূল তরঙ্গ। শারমিনকে দেখে দৃশ্যত খুশি হয়ে ওঠে ইশতিয়াক। আনোয়ার মিনহাজ, শারমিনের শরীরের দাবীদার, ইশতিয়াককে সালাম জানায়। ইশতিয়াক ওর সঙ্গে করমর্দন করে, সৈয়দ নওশাদ করিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

শিভাসরিগাল, ডিম্পল আর ব্ল্যাক লেবেলের ছড়াছড়ি। মহিলারা এবং দু'চারজন পুরুষ ছাড়া সবার হাতেই হুইস্কির গেলাশ। কেউ কেউ টানছেন বিয়ার। সফ্‌ট সেক্সের জন্যে সফ্‌ট ড্রিঙ্ক। স্ট্রংড্রিঙ্ক যেসব পুরুষের দু'চোখের বিষ, তাদের জন্যে কোকাকোলা কিংবা ফান্টা। ইশতিয়াক হোসেন দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। এ পার্টিতে শারমিন না থাকলে হয়তো এত খেতো না। হুইস্কি নয়, যেন শারমিনের যৌবনকে পান করছে।

'তুমি বদলে গেছে ইশতিয়াক,' শারমিনের কণ্ঠস্বরে চাপা দীর্ঘশ্বাস।

'তাই নাকি? কী রকম বদলে গেছি, কতটা বদলে গেছি?'

'এসব ছাইপাঁশ ধরেছ কবে? আগে তো কখনো খেতে না।'

'না, ওসব ধরাধরির মধ্যে আমি নেই,' গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বলে ইশতিয়াক হোসেন. 'মাঝে-মধ্যে একটু আধটু চেখে দেখি, এই যেমন আজ দেখছি। শারমিন, তুমিও বদলেছ, আরো বেশি সুন্দর লাগছে তোমাকে!' ইশতিয়াকের চোখে লোভ চক্‌চক্‌ করে, এই দৃষ্টি শারমিনের চেনা।

'তোমাকে কেন দীপ্তিহীন মনে হচ্ছে আমার কাছে, আগের মতো জ্বলজ্বলে তুমি নও আর।'

'তোমার কথা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হলো না শারমিন। যা বলবে স্পষ্ট করে বলো, কোনো হেঁয়ালি করো না।'

'অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলছি। ভাবিনি, কখনো ভাবিনি তুমি আর দশজনের মতো হয়ে যাবে; কেমন যেন পোষমানা পোষমানা ভাব লক্ষ করছি তোমার মধ্যে। আগে তুমি লাজুক ছিলে সত্যি, কিন্তু একটা বুনো সৌন্দর্য ছিলো। সংসার তোমার অস্তিত্বের ধার ক্ষইয়ে দিয়েছে। তুমি একটা ক্ষয়ে-যাওয়া মানুষে পরিণত হয়েছো, যে সবকিছু মেনে

নেয়, কখনো বিদ্রোহ করতে জানে না। তোমার কোনো সন্তান নেই, অথচ তোমাকে বড়ো ছা-পোষা লাগে।' শারমিনের কথা ইশতিয়াক হোসেনকে ভীষণ চমকে দেয়। সে ঢক ঢক করে অনেকখানি হুইস্কি পাঠিয়ে দেয় জঠরে। বুক জ্বালা করে ওর। এক ফাঁকে শূন্য গেলাশ ভরে নেয় আবার; এ নিয়ে চারবার হলো।

'শারমিন, তোমার মনের খবর কী ? এখনো ওটা আমার জন্যে গচ্ছিত আছে, না অন্য কেউ দখল করে নিয়েছে ?' ইশতিয়াকের কণ্ঠে উচ্ছলতা, কিছুটা ঠাট্টার সুর বাজে।

'তোমার মুখে এমন কথা শুনবো, ভাবিনি। তোমাকে ভালোবাসতাম, এখনো বাসি। কিন্তু তুমি তা বুঝবে না কোনোদিন। সে-কথা বোঝার ক্ষমতা তুমি হারিয়ে ফেলেছো।'

'তাহলে তোমার হৃদয়-মন এখনো আমার মুঠোয়, হুররে,' স্খলিত কণ্ঠে ইশতিয়াক বাক্যটি ছুঁড়ে দেয় শারমিনের প্রতি। শারমিনের মনে হলো, ইশতিয়াক এই মুহূর্তে সিটি বাজাতে পারে রকবাজ ছোকরার মতো, কিংবা কোমর দুলিয়ে নাচ শুরু করে দিতে পারে।

'তুমি মাতলামি করছো, প্লিজ আর খেও না।'

'শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের ঢঙ ছাড়ো তো, তুমি কথা বলবে আমার বন্ধু সৈয়দ নওশাদ করিমের নায়িকার মতো। মাতলামির কথা বলছো ? মাতাল আমি হয়েছি বৈকি, তোমার এই চমকিলা যৌবন আমাকে মাতাল করে দিয়েছে।' শারমিনের চোখে বেদনার ছায়া। ইশতিয়াকের কথা আহত করেছে তাকে। শারমিন ইশতিয়াকের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

'যেও না শারমিন, তুমি কি সব সময় আমাকে এভাবে ছেড়ে যাবে,' ইশতিয়াকের কথা জড়িয়ে আসে, একটা আর্তি ধ্বনিত হয়।

ইশতিয়াকের কাছ থেকে শারমিনের সরে আসার আরেকটি কারণ লোকচক্ষু। অনেকেই লক্ষ করছিলো ওদের। হয়তো টুকরো টুকরো কথাবার্তাও শুনেছে। কিন্তু এ ধরনের মজার পার্টির মজা হলো এই যে, সবাই এত জোরে জোরে কথা বলে যে কেউ কারো কথা স্পষ্ট শুনতে পায় না, শুধু প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরাই শুনতে পান, কান পাতলে। সেরকম দু'চারজন সব পার্টিতেই থাকেন। মহিলারা তো আছেনই। ইশতিয়াকের অনুনয় শুনে মায়া হয় শারমিনের; রাগের ফুলকিগুলো নিবে যায়। ইচ্ছে হয়, ইশতিয়াকের মাথা নিজের বুকের কাছে নিয়ে একটু আদর করে ওকে। ইশতিয়াক একথা জানল না।

ইশতিয়াকের পা টলছে; যেন সে মেঘের মধ্যে হাঁটছে। এক সময় একটা সোফায় বসে পড়ে সে। ঘরটা দুলতে থাকে, সবাই কেমন ঘুরছে, ইশতিয়াকের মনে হয়। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করলে, এরকমই হয়, যেমন হচ্ছে ইশতিয়াক হোসেনের। তার অস্তিত্বের ধার ক্ষয়ে গেছে, কোনো সন্তানের জনক না হয়েও সে ছাপোষা মানুষ। বাধ্য, সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে থাকা সার্কাসের নিরীহ বাঘ। অষ্টভুজী জন্তুটা, ইশতিয়াকের মনে হলো, পার্টির সবাইকে জড়িয়ে ধরেছে মারাত্মকভাবে। শারমিনকে বাঁচাতে হবে এই ভয়ংকর বেষ্টনী থেকে। সে শারমিনের দিকে এগিয়ে যায়। ডিনার সার্ভ করা হয়েছে। অনেকেই খেতে শুরু করেছে। ইশতিয়াক এবং আরো দু'একজন খাদ্যের প্রতি তেমন মনোযোগী নয় এখন। শারমিনের হাতে প্লেট, একটু একটু করে খাদ্য তুলে নিচ্ছে মুখে। ইশতিয়াক ওকে অক্টোপাসের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যায়।

'কিছু বলবে?' শারমিন প্রশ্ন করে।

'আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই শারমিন' একথা বলতে গিয়েও বললো না ইশতিয়াক। বলতে পারলো না। না, তার বলার কিছুই নেই। লেখারও কিছু নেই। সে একজন ক্ষয়ে-যাওয়া, সাদামাটা অতি সাধারণ ব্যর্থ মানুষ। ভীত, সন্ত্রস্ত একজন।

শোবার ঘরে ঢুকে হাতঘড়িতে সময় দেখে ইশতিয়াক। রাত সাড়ে বারোটা বাজে। ইয়াসমিনই দরজা খুলেছে। রাঁধুনিটা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ইয়াসমিন জেগে ছিলো, একটা সিনেমা পত্রিকা ওকে জেগে থাকতে সাহায্য করেছে। পার্টিতে সলিড কিছু খায়নি। ওর গা গুলিয়ে আসছিলো বারবার। এখনো তার পা টলছে এবং মাথাটা আগের মতো ঘুরছে না আর। পাঞ্জাবি আর ট্রাউজার খুলে লুঙ্গি পরে ইশতিয়াক। আনাড়ির মতো। বাথরুমে যায় হাতমুখ ধোয়ার জন্যে। বাথরুমে ঢোকার পরই ইশতিয়াকের গা গুলিয়ে ওঠে, ওর জঠরস্থ সবকিছু যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। অথচ বমি হচ্ছে না। টাল সামলানোর জন্যে সে চৌবাচ্চার কিনার চেপে ধরে। বমি হলে বাঁচা যেত, কিন্তু বমি হবে হবে করেও হচ্ছে না কিছুতে। ইশতিয়াক গলার ভেতর আঙুল চালিয়ে দেয় বমি করার জন্যে। কোনো ফায়দা হলো না। দারুণ অস্বস্তিতে আরো বেশি অস্থির হয়ে ওঠে ইশতিয়াক। বাথরুমের দেয়ালে কয়েকটা আরশোলা। একটি পুরুষ আরশোলা এবং নারী-আরশোলা পরস্পর লগ্ন, সঙ্গমরত, ইশতিয়াক লক্ষ করে। 'ওয়াক, ওয়াক' শব্দ বেরিয়ে আসে ওর ভেতর থেকে কিন্তু এবারও বমি হল না। ইশতিয়াক বসে বমি করার চেষ্টা করে, জোর করে উগড়ে দিতে চায় জঠরের ষড়যন্ত্রকারী তরল পদার্থ, কিছু অজীর্ণ খাদ্য। একটা আরশোলা ওর পা বেয়ে ওপরে ওঠার ফিকিরে তুখোড় উদ্যমশীল। ইশতিয়াক পা ঝাড়া দেয়, আরশোলাটা ছিটকে পড়ে দূরে; চিত্তির হয়ে-পড়া, ছটফটানো, লালচে-কালো প্রাণীটাকে আহত যোদ্ধার মতো মনে হয়। তীব্রভাবে গা গুলিয়ে ওঠে ইশতিয়াকের, এবার হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলে সে। দু'তিনবার বমি হওয়ার পর ইশতিয়াক আরাম পেল। ভালো করে কয়েকবার কুলি করে মুখ ধুল। মাথা ধুল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে থাকে আস্তেসুস্থে। বাস্তবিকই মাত্রাটা আজ বড়ো বেশি হয়ে গিয়েছিল। পার্টিতে শারমিনের সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো সে এত হুইস্কি খেতো না। হয়তো খেতো, অন্য কোনো কারণে। সৈয়দ নওশাদ করিমকে তাক লাগিয়ে দেয়ার জন্যে কিম্বা জহির সিদ্দিকীকে ইম্প্রেস করার জন্যে। সচেতনভাবেই যে সে এমন করত, ইশতিয়াক তা মনে করে না। নিজের অজান্তে মানুষ কত কিছু ঘটিয়ে ফেলে, ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর তার একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। শারমিনের শাড়ির কী রং ছিলো? মেরুন না ভায়োলেট? আনোয়ার মিনহাজের গায়ে ছিলো ধূসর রঙের সাফারি স্যুট। শারমিনের স্বামীর সঙ্গে আরেকটু ভালো ব্যবহার করলেই পারতাম, ইশতিয়াক মাথা মুছতে মুছতে নিজের সঙ্গে কথা বলে। মিনহাজ কয়েকবার এসেছে আলাপ জমাবার জন্যে, আমি এড়িয়ে গেছি নানা অছিলায়। পেটি জেলাসি, সবুজ-চোখা জানোয়ারের প্ররোচনা। ইশতিয়াক যে বমি করেছে তা' ইয়াসমিন টের পায়নি নিশ্চয়। বাথরুমের দরজা বন্ধ ছিল। টের পেলে ইয়াসমিন অবিশ্যি ছুটে আসত শাবকের বিপদতাড়িনী মুরগির মতো। ইশতিয়াক বিছানার দিকে এগোয়। ইয়াসমিন জেগে আছে। একটু একটু তার

খিদে লাগছে কিন্তু এত রাতে ইয়াসমিনকে সে খাবার দিতে বলতে পারলো না। ডিনার পার্টি থেকে না খেয়ে কেউ আসে নাকি।

ইশতিয়াকের কানে এখনো শারমিনের কথাগুলো বাজতে থাকে। শারমিনের তরঙ্গিত যৌবনের ঝলকানি ওর সত্তাকে ঝাঁঝিয়ে দিয়েছে। এখনো তার জের চলছে। ইশতিয়াক দেখে, বিছানায় শারমিন শুয়ে আছে। ওর বিদ্রোহী যুগল স্তন ব্লাউজের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। শারমিনের চোখে-মুখে সম্ভোগের আমন্ত্রণ। ইশতিয়াক চেয়ার ছেড়ে বিছানার দিকে এগোয়, সেখানে শারমিন শুয়ে আছে। ইশতিয়াক ওকে আলিঙ্গন করল প্রবলভাবে, নাক দিয়ে শারমিনের গাল ঘষতে থাকে।

'মুখ সরাও, কী বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছে তোমার মুখ থেকে,' ইয়াসমিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ইশতিয়াক। এই গন্ধের সঙ্গে ইয়াসমিন একেবারে অপরিচিত নয়। তবু আজ সে ইশতিয়াকের ওষ্ঠ থেকে ঠোঁট সরিয়ে নেয়, ঠেলে দেয় ওকে। কিন্তু ইশতিয়াক এখন নাছোড়। জোরে চেপে ধরে শারমিনের স্তন, নির্দয় স্পর্শে শারমিনের মধ্যে জেগে ওঠে কবেকার এক সুরসুন্দরী, কামকলায় যে পারদর্শিনী। দুটো শরীর মিশে যায় পরস্পর, মোহন যুগলবন্দি। 'ছাড়ো এবার, আর পারছি না। হলো তোমার?' ইয়াসমিন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। ওর সমস্ত শরীর শিশিরভেজা উদ্যানের মতো। ইয়াসমিন জানাল না, এই মদির মধ্যরাতে কার প্রাপ্য কে পেল। জানতে পারল না শারমিনও।

॥ ৯ ॥

এসির দৌলতে ঘর আরামদায়কভাবে শীতল। এঘরে গরমে ছটফট করতে হয় না। অথচ অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে শারমিন বানু। আজ কি আমার ঘুম আসবে না? সেডাক্সনের আরেকটা বড়ি খাবো? না, থাক। উচিত হবে না। বেশি বড়ি খাওয়া ভালো নয়। মিনহাজ কী নিভাঁজ ঘুমোচ্ছে; মৃদু নাক ডাকছে ওর। আর আমি শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছি না। আমার ঘুম আজ ফেরারী। রোজ রাতে আমরা ঘুমোই, বেশ কয়েক ঘন্টা ঘুমোই, অনেকদিন বেলা করে উঠি; অথচ এক রাত ঘুম না হলেই ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়ি। ঘুম না আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। নিয়মিত ঘুমের বড়ি খেয়ে হলেও নিজেকে ঘুম পাড়ানো চাই। আজকাল ঘুমের বড়ি আমাদের ঘুমপাড়ানি গান, শারমিন নিজেকে শোনায়। একদা আম্মা শারমিনের চুলে বিলি কেটে, পুরানো দিনের কোনো গান গুনগুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন ওকে। শারমিনের মনে পড়ে। শারমিন তখন ফ্রক পরে। নয়দশ বছরের মেয়ে সে। আম্মা কী ফর্সা ছিলেন! শারমিনের দৃষ্টিপথে ওর মায়ের মুখ ভেসে ওঠে। শারমিন নিজেও ফর্সা, তবে ওর আম্মার মতো নয়। শারমিন বানু সুন্দরী, একথা সবাই বলে। শারমিনের নিজের ধারণা, ওর আম্মা ছিলেন ওর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। শুধু গায়ের ফর্সা রঙের জন্যে নয়; টিকোলো নাক, আয়ত চোখ, পাতলা ঠোঁট,—সবকিছু মিলিয়ে চোখে পড়ার মতো রূপ ছিল সালেহা বেগমের।

আজ রাতে শারমিনের ঘুম আসছে না। ঘুম আসেনি সে-রাতেও যে রাতে ওর আম্মা ইন্তেকাল করেন। শারমিনের ভাবনায় ইন্তেকাল শব্দটিই এসেছিলো, মারা যাওয়া

কথাটি আসেনি। কেন জানি সে তার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে মারা যাওয়া কথাটিকে খাপ খাওয়াতে পারেনি কোনোদিন। আম্মা 'মারা গেছেন' বললে কেমন যেন ন্যাড়ান্যাড়া, সাদামাটা শোনায়। আম্মার মৃত্যু সামান্য কোনো ঘটনা নয়, তাই সেই ঘটনাটির অসামান্যতাকে পরিস্ফুট করার জন্যেই সে ইন্তেকাল শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সচেতনভাবে। শারমিন বানু তার নরম শয্যায় শুয়ে-শুয়ে দেখছে ফ্রকপরা একটি বালিকাকে, শারমিনকে—যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ওর মায়ের লাশের পাশে। আগরবাতিটির ঘ্রাণ ভেসে আসে শারমিন বানুর নাকে, ওর আম্মার সুন্দর মুখ কী নিশুত ঘুমে নিথর, জীবনহননকারী কাঠামোয় স্থির। আম্মার গায়ের রং কী ফর্সা, চুল দীর্ঘ, ঘন কালো। টিকোলো নাক এখন আরো বেশি টিকোলো দেখাচ্ছে, আম্মাকে কে যেন, শারমিনের মনে হয়, কাঁচা হলুদের ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। এমন সুন্দর মানুষ এভাবে চলে যাবে কেন? আম্মার ওপর দিয়ে স্বর্গীয় হাওয়ার মতো ভেসে যাচ্ছে কোরানের আয়াতের ধ্বনি। আগরবাতি জ্বলছে কোনো দুঃখিনীর হৃদয়ের মতো। শারমিন পাশ ফিরে শোয়। মিনহাজের হাত এসে পড়ে ওর বুকে। শারমিন আলতোভাবে স্বামীর হাতটা সরিয়ে দেয়। মিনহাজের হাত সরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারমিনের নির্ঘুম চোখে ভেসে ওঠে জহির সিদ্দিকীর বসতবাড়ি, পার্টির লোকজন, কিছু দৃশ্য। পার্টিতে ইশতিয়াক এমন ব্যবহার করল কেন। এ ধরনের আচরণ ইশতিয়াকের চরিত্রের সঙ্গে বেখাপ্পা। ভয়ানক উটকো। ইশতিয়াক আজকাল এমন হুইস্কি-পরস্ত হয়ে উঠেছে, এটা সে ভাবতেই পারেনি। কত বদলে গেছে ইশতিয়াক। মামুজানের বাড়িতে যে ইশতিয়াককে দেখেছি, সেই ইশতিয়াক থেকে আজকের ইশতিয়াক হোসেন কেমন সুদূর। আমি এই সুদূরতার পরিমাপ করব কীভাবে?

হয়তো আমি ওর বাইরের আবরণ দেখে, শারমিন নিজেকে বলে, ওকে বিচার করছি। এই বিচার কতটুকু নির্ভরযোগ্য? বাইরের আবরণ দেখে কি একজন মানুষকে চেনা যায়? আমি তো আর ওর ভেতরের মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না ওর অন্তর্গত জীবনের টানাপোড়েন। আজকের পার্টিতে ইশতিয়াক আমার যে ছবিটি নিয়ে গেলো, সেই ছবিতে আমি কতটুকু ধরা পড়েছি? আমার মনের পাতালপুরীর চিত্রটি তো ইশতিয়াক পেলো না। ইশতিয়াকের 'নির্জন অতলে' উপন্যাসের নায়ক, শারমিনের মনে পড়ে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় নেহাৎ ছাপোষা, আটপৌরে একজন, কিন্তু তার মন অরণ্যের মতো জটিল আর রহস্যময়। এই জটিলতা ও রহস্যময়তার খবর কেউ রাখে না। অন্তর্লোকের এই বাসিন্দাটিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টায় ইশতিয়াকের নায়ক সারাক্ষণ তৎপর। ইশতিয়াক কি তার নিজের আদলে সৃষ্টি করেছে 'নির্জন অতল'–এর নায়ককে? উপন্যাসটির নায়িকার মধ্যে নিজের ক্ষীণ ছায়া দেখতে পায় শারমিন। ইশতিয়াক শারমিনকে যতটুকু বুঝতে পেরেছে তার ওপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করেছে তার নায়িকাকে। আসল শারমিনের কতটা পাঠক পাবে এই নায়িকার মধ্যে? পনেরো আনাই বেপাত্তা। কল্পনাকে যথেচ্ছ দৌড় করিয়েও প্রকৃত শারমিনের সন্ধান ইশতিয়াক পায়নি। ইশতিয়াক নিজেও অনেকাংশে রয়ে গ্যাছে শারমিনের উপলব্ধির অন্তরালে।

ইশতিয়াককে আজ বেশ দেখাচ্ছিলো পার্টিতে। ওর পাঞ্জাবিটা ছিল সুন্দর। ইশতিয়াক নিজেই কিনেছে? না কি ওর স্ত্রী কিনেছে? যে-ই কিনুক নকশাদার পাঞ্জাবিটা ইশতিয়াককে মানিয়েছে। মোটেই ছাপোষা আর স্থূল মনে হচ্ছিলো না ওকে, তবু, শারমিন ঐ দুটো বিশেষণ ব্যবহার করেছিলো ইশতিয়াকের বিরুদ্ধে। ইচ্ছে করে, ওকে চটিয়ে দেয়ার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য, ইশতিয়াক বিন্দুমাত্র আপত্তি করেনি, করেনি কোনো প্রতিবাদ। বরং মেনে নিয়েছিলো, যেন বাস্তবিকই সে একজন স্থূল, ছা-পোষা মানুষ। আমি ইশতিয়াককে চটিয়ে দিয়েছিলাম। খামোকা কোনো ঈর্ষা কি কাজ করেছিলো এর পেছনে? ইশতিয়াককে না পাওয়ার ঈর্ষা? অথচ সে ইশতিয়াককে মরিয়া হয়ে পেতেও চায়নি কখনো। যদি সে মনেপ্রাণে কামনা করতো ইশতিয়াককে তাহলে অসম্ভব ছিলো না ওদের মিলন। হয়তো ওদের জীবন একসূত্রে গাঁথা হতে পারতো, যদি না আনিস লণ্ডভণ্ড করে দিতো সবকিছু। আনিসকে দেহদান করেছিলো বলেই সে নিজেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো ইশতিয়াকের কাছ থেকে। ইশতিয়াককে সে ভালোবাসতো বলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো শারমিনকে। তুমি কি সত্যি ভালোবাসতে ইশতিয়াককে? সত্যি করে বলো শারমিন, তোমার সেই ভালোবাসার মধ্যে কি কোথাও কোনো ফাঁকি ছিলো না তুমি মনে করতে যে, ইশতিয়াককে ভালোবাসো তুমি, আসলে সেটা ভালোবাসা ছিল না ছিলো এক ধরনের প্রেম-প্রেম খেলা।

শারমিন আনোয়ার মিনহাজের দিকে তাকায়। কী অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার স্বামী, তার সন্তানের পিতা। প্রকৃত ভদ্রলোক তার স্বামী, শারমিনের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনো নিজের কণ্ঠস্বরের চড়তে দেয় না আনোয়ার মিনহাজ। পাকা স্থপতির মতো গড়েছে নিজের সংসারকে। স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধন করা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করা—কোনো ব্যাপারেই চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। বনানীতে সুন্দর বাড়ি করেছে, ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছে নিয়মিত। কোনো কু-অভ্যাস নেই। মোটকথা, স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো কিছুই আজ অব্দি খুঁজে পায়নি শারমিন। মিনহাজের বন্ধুরা মনে করে যে, সে স্ত্রৈণ। বন্ধুদের এই ঠাট্টা মিনহাজ উপভোগই করে, বলা যায়। মিনহাজ শারমিনকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে, আর শারমিনও সবসময় সতর্ক থেকেছে যাতে সেই সুখে চিড় না ধরে। আমি কি মিনহাজকে ভালোবাসি? না, যাকে বলে প্রেম তা' আমি মিনহাজকে দিতে পারিনি কোনোদিন। দু'জন মানুষ দিনের পর দিন একসঙ্গে থাকলে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তৈরি হয়ে ওঠে যে অদৃশ্য মোহন শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খলের ধ্বনি মনের ভেতরে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেই আলোড়ন আছে শারমিনের জীবনে।

ইশতিয়াক আজ শারমিনকে ঘুমোতে দিচ্ছে না। পঁয়ত্রিশ বছরে ইশতিয়াক বার বার হানা দিচ্ছে মিনহাজ আর শারমিনের বেডরুমে, শারমিনের মনের ভেতর। আগে কখনো ইশতিয়াকের শরীরকে কাঙ্ক্ষণীয় মনে করেনি শারমিন, যদিও ওর ধারণা যে সে ইশতিয়াককে ভালোবাসে, আজো ভালোবাসে। আজ বিনিদ্র এই প্রথমবারের মতো শারমিন ইশতিয়াকের দৈহিক উষ্ণতালাভের জন্য কাতরতা অনুভব করল। ওর শরীর প্রতীক্ষমান হলো, যেমন কোনো বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত থাকে গুণীর অঙ্গুলিস্পর্শের জন্যে। সেকি

এ-কথা কোনোদিন বলতে পারবে ইশতিয়াককে? তার পক্ষে ইশতিয়াককে এ-কথা জানানো কিছুতেই সম্ভব না। এ ক' বছরে আনিসের শয্যাসঙ্গিনী হবার সাধ কি কখনো জেগেছে শারমিনের দেহমনে? একবারও নয়। আনিস পুরোপুরি মুছে গ্যাছে ওর জীবন থেকে। কী ভালোই না হতো যদি আজ এই মুহূর্তে তার পাশে থাকত ইশতিয়াক। তাহলে সে ইশতিয়াককে বুঝিয়ে দিতে পারত যে সে কত নিবিড়ভাবে কামনা করে আজকের এই ইশতিয়াককে। এটা কি সম্ভব নয় যে কোনো জাদুবলে ঘুমন্ত আনোয়ার মিনহাজ রূপান্তরিত হয়ে গেল জাগ্রত ইশতিয়াক হোসেনে? না, এ কখনো হবার নয়।

শারমিন শুয়ে আছে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে। সেডাক্সেন খাওয়ার পরও তার ঘুম আসছে না আজ। তার খাঁ খাঁ দৃষ্টিতে ভাসছে একটি মুখ, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক একটি মুখ, আজকের পার্টিতে দেখা মুখ। সে মুখ ইশতিয়াকের। শারমিনের বিনিদ্র শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী ঝংকৃত হচ্ছে ইশতিয়াকের জন্যে। শারমিনের তন্ত্রীদ্বয় স্পন্দিত হচ্ছে ঘন ঘন, তার ঠোঁট স্ফুরিত মিলনতৃষ্ণায়; সে প্রতীক্ষারতা যেমন জ্যোৎস্নাচমকিত ঝিলের ধারে উৎসুক হরিণী অপেক্ষা করে তার হরিণের জন্য। ইশতিয়াক জানল না।

## ॥ ১০ ॥

বেশ কয়েকদিন হলো ইয়াসমিনের পিরিয়ড হয়নি। কখনো-কখনো দু'চারদিন দেরি হয়, কিন্তু এত দেরি হয়নি কখনো। তাছাড়া গত দু'একদিন ধরে ইয়াসমিনের গা বমি বমি করছে। সব লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমাগত। ইশতিয়াকের অসতর্কতার সুযোগে চার বছর পর কনসিভ করেছে ইয়াসমিন। সে অন্তঃসত্ত্বা। তার জরায়ুতে একটা ভ্রূণ প্রাণ-সাধনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ইয়াসমিনের সমগ্র সত্তায় বইছে আনন্দস্রোত, কী এক গর্বে ভরাট তার দেহমন।

'তুমি খুশি হওনি,' খুশিতে ঝলমলিয়ে ইয়াসমিন জিগ্যেস করে।

'খুশি হব না কেন, তবে আরো কিছু পরে হলে ভালো ছিলো।' ইশতিয়াকের কণ্ঠস্বরে আনন্দের ঝলক ছিলো না, ছিলো এক ধরনের নিস্পৃহতা, যা কোনো জনকের পক্ষে শোভন নয়। ইশতিয়াকের কথা ভালো লাগে না ইয়াসমিনের। চার বছর পরে ওদের প্রথম সন্তানের জন্ম হতে চলেছে, অথচ ইশতিয়াক কেন নিরুত্তাপ আর উত্তেজনাহীন। ইশতিয়াক টের পায় যে, ইয়াসমিন বেশ আহত হয়েছে তার আচরণে। সে ইয়াসমিনকে চুমু খেয়ে ওর মান ভাঙাতে সচেষ্ট হয়, অভিনয় করে, স্ত্রীর পেটে হাত বুলিয়ে অনাগত সন্তানতে আদর করার মহড়া দেয়। মৃদু হাসে ইশতিয়াক। ইশতিয়াক হোসেন ভয়ে নিজের ভেতর ক্রমাগত সেঁধিয়ে যেতে থাকে। অক্টোপাসের ভয়ে। অক্টোপাসের উপস্থিতি কি কারো চোখে পড়ে না? সে কি অন্ধের সমাজে বসবাস করছে? সে পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো? তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ পরিস্ফুট হলে, সে রোজ অফিস করছে কী করে? কই, ইয়াসমিন তো তাকে কখনো পাগলামির খোঁচা দেয় না। তবে মাঝে-মধ্যে বলে, 'তুমি যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছো। শরীরের দিকে একটু নজর দিচ্ছো না। আয়নায় কি চেহারা দেখতে পাও না? তুমি বদলে যাচ্ছো।'

এ-কথা শুনে আরেকজনের কথা মনে পড়ে ইশতিয়াকের। শারমিনও তাকে এ ধরনের কথা বলেছিল। গুলশানের সেই পার্টিতে। জনাব জহির সিদ্দিকীর বাসভবনে। শারমিন এখন কেমন আছে? সে ইশতিয়াককে ওদের বাসায় যেতে বলেছিল। মিনহাজ প্রচুর রিকোয়েস্ট করেছে ওদের বাড়িতে যেতে। শারমিনের বলায় অনুনয় ছিলো, ছিলো কাতরতা, হয়তো পুনর্মিলনতৃষ্ণা। কিন্তু আজও ইশতিয়াকের যাওয়া হয়ে ওঠেনি শারমিনের বনানীর বাড়িতে। সাতরওজা এবং বনানীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কখনো কখনো শারমিনের সান্নিধ্যের জন্যে লোভাতুর হয়ে ওঠে ইশতিয়াক। অপ্রতিরোধ্য এই লোলুপতা। এই লোলুপতাকে সে বল্গা পরিয়ে রাখে। জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ স্থলচর অক্টোপাসটির কথা মনে পড়ে ওর। ইশতিয়াক ওর চোখের সামনে দেখতে পায় কাঁথা, ছোটো ছোটো বালিশ, নিকার বোকার, ফিডিং বোতাল, ব্রেস্ট রিলিভার, মধুর শিশি, দোলনা। অক্টোপাসটি যেন তার শুঁড় দিয়ে জিনিসগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে ইশতিয়াকের দিকে, একের পর এক, কখনো বা সবগুলো এক সঙ্গে। ইশতিয়াক দ্যাখে ওর বিছানায় হাত-পা ছুড়ছে এক শিশু; ওর মুখে রবারের নিপল্। হঠাৎ ভিজে ওঠে কাঁথা। শিশুটি হিসি করেছে। নবজাত শিশুটি ভীষণ চেঁচাতে শুরু করে একসময়, বোধহয় ক্ষুধার তাড়নায়। ইয়াসমিন নিপুণ হাতে কাঁথা গোছাতে থাকে। কোনোকিছু অগোছালো দেখতে পারে না ইয়াসমিন। সারাদিন সে ঘর গোছায়। অবিশ্যি গোছানোর মতো তেমন কিছু নেই ওদের ঘরে। খুবই সামান্য আসবাবপত্র, একটি কি দুটি ফুলদানি আর ইশতিয়াকের দুটি বুক শেলফ্ আর একটি লেখার টেবিল। ইশতিয়াক অগোছালো মানুষ। বইপত্র, কাপড় চোপড় কিছুই সে গুছিয়ে রাখতে পারে না। ইয়াসমিনের লক্ষ্মী হাত না লাগলে সব কিছু অগোছালো এলোমেলো হয়ে থাকত। ফুলদানি আর ইশতিয়াকের লেখার টেবিলের ওপর ইয়াসমিনের বিশেষ নজর রয়েছে। প্রতিদিন নানাভাবে সাজায় টেবিলটাকে। ইশতিয়াক লক্ষ করছে যে, ওর স্ত্রীর মধ্যে একজন শিল্পী বাস করে। একরত্তি উঠোনে কয়েকটি ফুলের গাছ লাগিয়েছে ইয়াসমিন। ওর যত্নে গাছগুলি এখন ডাগর, পুষ্পবিকাশে উৎফুল্ল। ফুলের গাছগুলিকে সে নিজের সন্তানের মতো আগলে রাখে, নিজের হাতে দু'বেলা পানি দেয় গাছের গোড়ায়। ওদের বেলফুলের গাছটি চমৎকার। বড়ো বড়ো কলি ধরে রোজ, এতবড়ো কলি সচরাচর চোখে পড়ে না। নিজের গাছের বেলফুলের মালা সে মাঝে-মধ্যে খোঁপায় জড়ায়। কখনো কখনো বেলফুলের মালা গেঁথে দিয়ে আসে ওর বড়ো আপা কিম্বা ছোটো বোনকে। ইয়াসমিনের দুর্ভাগ্য, ইশতিয়াক ভাবে, সাজানো গোছানোর মতো যথেষ্ট সারঞ্জাম সে পেলো না। এই অভাবকে অবিশ্যি ইয়াসমিন কখনো বড়ো করে দেখেনি, অভাবে পীড়িত বোধ করলেও স্বামীকে তা জানতে দেয়নি কোনোদিন। ইয়াসমিনকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে তার মনে খেদ আছে, কোনো রকম ক্ষোভ আছে। সংসারের অভাব অভিযোগ নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করা ইয়াসমিনের ধাতে নেই। আর এটাও সে জানে যে কোনোরকম ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি ইশতিয়াকের পছন্দ নয়। তবে ইয়াসমিনের একটা প্রিয় স্বপ্ন আছে; এই স্বপ্ন সে দ্যাখে বহুদিন থেকে। বার বার এই স্বপ্নে বিভোর হয়েছে ইয়াসমিন। একদিন ওদের ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ি

হবে, নিজের বাড়ি—যে বাড়িতে বসবাস করার জন্যে ভাড়া গুনতে হবে না, বাড়ি-অলার কথা শুনতে হবে না। হ্যাঁ তার আপন বাড়ি। বাড়ির সামনে থাকবে একটা বাগান, ফুটফুটে, চোখ-জুড়ানো। বাগান বানাবে সে নিজের মনের মতো করে। নানা ধরনের ফুলে সাজিয়ে রাখবে বাগানটিকে। তার নিজের বাড়ি হবে তকতকে, ঝকমকে — যে দেখবে সে-ই তারিফ করবে।

ইয়াসমিনের এই স্বপ্নের কথা ইশতিয়াক জানে, 'দু' একবার ইয়াসমিন তাকে বলেছে। ইশতিয়াক এ ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন; তাছাড়া ইতোমধ্যে সে জেনে গেছে যে তার মতো লোকের পক্ষে বাড়ি-টাড়ির স্বপ্ন দেখা নেহাতই বেমানান। গরিবের ঘোড়া রোগ। তাই সে ইয়াসমিনের এই স্বপ্নের কথায় কান করেনি। শুধু একটা ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। ইয়াসমিনের জন্যে মায়া হয় তার। সে এমন এক লোকের হাতে পড়েছে যার পক্ষে ঢাকা শহরে কেন, কোথাও কোনো বাড়ি-টাড়ি করা সম্ভব হবে না কস্মিনকালেও। আধ কাঠা জমি কেনারও মুরোদ নেই তার। ইয়াসমিনকে হলেও হতে পারতো বাড়ির স্বপ্ন দেখেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হবে। নানা কষ্ট সহ্য করে ভাড়া বাড়িতেই কাটাতে হবে বাকি জীবন।

ওদের সংসারে নতুন অতিথি আসছে। এবার আরো খরচ বাড়ার পালা। ইশতিয়াক চায়নি যে এই অতিথি আসুক। জনক হবার আনন্দকে সে আরো কিছুকাল স্থগিত রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তা' আর হয়ে উঠল না। এজন্যে সে নিজেকে দায়ী করল। সে যদি একটু সাবধান হতো তাহলে এরকম হতো না। ইয়াসমিন অবশ্য খুশিতে বাগ্‌বাগ্‌; ওর চোখে, ঠোঁটে, কপালে খুশির ঝলক। ইয়াসমিনের অস্তিত্ব গুনগুনিয়ে ওঠে যখন-তখন। আপাতত একটা অসুবিধা হচ্ছে ওর, মাঝে মাঝে গা গুলিয়ে ওঠে, বমি হয়, পেটে কিছু থাকে না। যা খায় তা-ই উগরে দেয়। তবু ইয়াসমিন আনন্দের এক খোলামেলা ঝংকার।

ইশতিয়াক উঠোনের দিকে তাকায়। একরত্তি উঠোনে বিরাট অক্টোপাস, ওর দীর্ঘ, সবল শুঁড়গুলো জড়িয়ে ধরেছে বাড়িটাকে। ইশতিয়াকের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। নাকি সে ইচ্ছে করে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলল? ইদানীং সে ঘন ঘন দেখছে অক্টোপাসটিকে—দিনে কয়েকবার।

## ॥ ১১ ॥

ইশতিয়াকের আজ কাজ করতে ভালো লাগছে না। অবসাদ ওকে দখল করে রেখেছে। পাশের টেবিলে এহসান চৌধুরী এক মনে কাজ করছে। এখনো লাঞ্চ ব্রেকের সময় হয়নি। ইশতিয়াক হাতঘড়িতে সময় পাঠ করে। পৌনে বারোটা বেজেছে। চেয়ারে বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

'আমি একটু ঘুরে আসি', ইশতিয়াক এহসান চৌধুরীর উদ্দেশে বাক্যটি চালান করে। এহসান চৌধুরী কিছু না বলে ইশতিয়াকের দিকে তাকায়। কৌতূহলী দৃষ্টি। সে একটু অবাক হয়েছে। সাধারণত ইশতিয়াক হোসেন লাঞ্চ ব্রেকের আগে কোথাও যায় না। যতক্ষণ অফিসে থাকে টেবিলে মাথা গুঁজে কাজ করে। দশটা থেকেই ইশতিয়াক কেমন

উসখুস করছে, এহসান লক্ষ করেছে। কী হয়েছে ইশতিয়াকের? সাহিত্যিক মানুষ, হয়তো উপন্যাসের প্লট-ফ্লট ভাবছেন। বাসায় সব ঠিকঠাক তো? জিগোস করবে না কি? থাক। 'আপনার শরীর ভালো তো?'

'শরীর ভালোই, তবে কেমন যেন অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে একটু ঘুরে এলেই ভালো লাগবে। কেউ জিগ্যেস করলে বলবেন আমি লাঞ্চ আওয়ারের পর আসব।'

'ও নিয়ে ভাববেন না, আমি সব ম্যানেজ করে নেবো।' এহসান চৌধুরী ইশতিয়াককে আশ্বস্ত করে। একটা সিগারেট ধরায় এহসান। দেশলাইয়ের কাঠিটা অ্যাশট্রেতে রাখে। সিগারেটের ধোঁয়া পেঁচিয়ে ওঠে।

বাইরে চনমনে রোদ। ফুটপাতে একা-একা হাঁটতে থাকে ইশতিয়াক। কোনো রেস্তোরাঁয় ঢোকার তাগিদ অনুভব করে না। কাফেঝিলের সামনে এসে খানিক ইতস্তত করে। খিদে লাগে নি, এখন কিছু খেতে পারবে না সে। আবার হাঁটতে শুরু করে। এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? একে কি বেঁচে থাকা বলে? ইশতিয়াক নিজের জীবনযাপনের পর্যালোচনা করে, কেমন একটা মৃত মৃত গন্ধ পায় সে। রোদ ঝলসাচ্ছে নতুন বউয়ের চেলির মতো। তবু তাকে বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে লেখার জন্যে, তার না-লেখা উপন্যাসগুলির জন্যে, ইয়াসমিনের জন্যে, তাদের অনাগত সন্তানের জন্যে। রাস্তার ওপারে, ইশতিয়াক দেখতে পায়, একটা সাদা ল্যান্সার দ্রুত ছুটে গেলো। কার ড্রাইভ করছে আনোয়ার মিনহাজ, ওর পাশের সিটে শারমিন বানু। সে এক ঝলক দেখতে পেয়েছে মাত্র। শারমিন কি ওকে দেখতে পেয়েছে? পায়নি হয়তো। আর পেলেই বা কী? ওকে দেখতে পেলেই যে গাড়ি থামাতে হবে তার কোনো মানে নেই। ইশতিয়াক কি আর কোনোদিন লিখতে পারবে না? একজন ভিখিরি ইশতিয়াকের কাছে হাত পাতে। প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলো ইশতিয়াক, কিন্তু পরে কী মনে করে পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বের করে ভিখিরিটাকে দিলো। লেখার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্যে সে হাত পাতবে কার কাছে: লেখার জন্যে হাত পাতার ব্যাপারটি ওর নিজের কাছেই বেশ মজার মনে হলো। ইয়াসমিন হয়তো এখন একটা কাঁথা সেলাই করছে কিম্বা শুয়ে শুয়ে যে বাড়ি তার হয়নি, হবে না কোনোদিন তার স্বপ্ন দেখছে, ভাবছে তার অনাগত সন্তানের কথা। যে করেই হোক আমাকে আবার লিখতে হবে। আবার অক্ষরে ডুবিয়ে তুলতে হবে খাতার পর খাতা। লিখতে হবে নতুন কাহিনি, নতুন আঙ্গিকে।

লেখার কথা ভাবতে ইশতিয়াকের মনে পড়ে যায় অক্টোপাসের কথা। ওর গায়ে কাঁটা দেয়। মন থেকে সে ঝেড়ে ফেলতে চায় অক্টোপাসকে। কিন্তু পারে না। ইশতিয়াকের মনে পড়ে, ক্রমবর্ধমান এই জন্তুটি আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে সম্প্রতি। যেখানে সেখানে আতর্কিত হামলা চালাচ্ছে—ধনীর ড্রইংরুমে, নির্ধনের খুপরিতে, রেলওয়ে স্টেশনে, বাস টার্মিনালে, লঞ্চ ঘাটে, কাফে রেস্তোরাঁয়, এয়ারপোর্টে, বন্দরের জেটিতে। এই তো সেদিন, ইশতিয়াক দেখলো, অক্টোপাসটা নিউ মার্কেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিলো। একদিন তছনছ করলো অধ্যাপক পাড়া। অথচ কেউ দেখতে পায় না এ তাণ্ডবলীলা। লোকচক্ষুর আড়ালে কেমন নির্বিবাদে অক্টোপাস এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কারো চোখে পড়ে না ওর গতিবিধি। শুধু ইশতিয়াক দেখতে পায় ওকে। আমি

কি টাইরেসিয়াস? ইশতিয়াক প্রশ্ন করে নিজেকে। ইশতিয়াক হাঁটতে হাঁটতে অফিস থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। কাকরাইলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কাছাকাছি। চড়া রোদ। গরম লাগছে ইশতিয়াকের। তবু সে বাস রিক্সা নিলো না। হাঁটছে আস্তে আস্তে। হাঁটতে তার খারাপ লাগে না। তবে ঝাঁজালো রোদে অনেকক্ষণ হাঁটা তেমন সুখপ্রদ নয়। বেখেয়ালে ইশতিয়াক এতদূর এসে পড়েছে। এবার ফেরা দরকার। হঠাৎ একটা আওয়াজ আসে ওর কানে। শ্লোগানের আওয়াজ। কীসের শ্লোগান, সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। দূর থেকে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, মুষ্টিবদ্ধ হাত। পোস্টারের লেখা পড়া যাচ্ছে না। কোন দলের মিছিল? ইশতিয়াকের চোখ ঝাপসা। অক্টোপাস, ইশতিয়াক লক্ষ করে, পুরো মিছিলটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। শ্লোগান স্তব্ধ, মিছিলের মানুষগুলো সেই নাছোড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মরীয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। অক্টোপাসটি দ্রুত পুরো ঢাকা শহরকে আটকে ফেলেছে,ইশতিয়াক দেখতে পায়। সে নিজেও এখন অক্টোপাসের দখলে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে, নিশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এভাবে কাকরাইলের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ইয়াসমিনের মুখ মনে পড়ে ইশতিয়াকের। ওকে বাঁচতে হবে, মুক্ত হতে হবে অক্টোপাসের মরণপাশ থেকে। ইশতিয়াক উলটো দিকে ছুটতে শুরু করে, যেমন সে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের ভেতরে স্তব্ধ দৌড়বাজ হয়।

## অদ্ভুত আঁধার এক

আস্তে আস্তে চোখ মেলল নাদিম ইউসুফ। ঘাড়ে একটা ব্যথা অনুভব করল, হালকা হালকা। ঘরের ভিতরে মৃদু আলো। বাইরে পাখির ঐকতান। এক ঝলক হাওয়া ওর শরীরে আরাম বুলিয়ে দিল। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। বেলফুলের গন্ধ। জানালা গলে ছোটো একটা ডাল ঢুকে আছে, যেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কেউ। ডালটা একটু একটু কাঁপছে তার একরাশ কালচে সবুজ পাতা আর সাদা ফুটকির মতো ফুল নিয়ে। বেলফুল। এখন বাইরে গেলেই পুরো গাছটাকে দেখা যাবে। দেখা যাবে ছোটো মাঝারি ফুলের গাছটাকেও। আমরা যারা শহরে থাকি, শুয়ে শুয়ে নাদিম ভাবে, তাদের সচরাচর উঠোন দেখার সৌভাগ্য হয় না। শহরে জমিন তেমন দরাজ নয়। সেখানে জমির কার্পণ্য আমরা হাডে হাড়ে টের পাই। অবশ্য যারা পয়সাঅলা তাদের অনেকের বাসভবনের সামনে চোখে পড়ার মতো জায়গা থাকে। সেই উঁচু-কপালে জায়গাকে বিত্তশালী গৃহস্বামীরা উঠোন বলেন না, আদর করে বলেন লন।

নাদিম ইউসুফ দেখল ঘরের ভেতর সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে। কারো ঘুম ভাঙেনি এখনো। ওর মেয়ে তানজিম অস্ফুট একটা শব্দ করে পাশ ফিরে শুল। ঘুম যেন বিশ্রাম নিচ্ছে এই ঘরে, নাদিমের মনে হল। একটা পেইন্টিং-এর কথা মনে পড়ল ওর। অনেকদিন আগে দেখেছিল। চিত্রকরের নাম মনে পড়ছে না। হেনরি মুর? হেনরি মুর তো ভাস্কর। ছবিটা, যতদূর মনে পড়ে নাদিমের, একটা অয়েল পেইন্টিং। হেনরি মুর কি কখনো অয়েল পেইন্টিং করেছেন? নাদিম জোর দিয়ে বলতে পারবে না। চিত্রকলা বিষয়ে ওর জানাশোনা খুবই সীমিত। খুবই ভাসা-ভাসা। ছবিটির নাম বোধ হয় ঘুম ছিল। একটা সুড়ঙ্গের ভেতর এক ভিড় নারী-পুরুষ-শিশু। সবাই ঘুমন্ত। ছবির রং সবুজ। নিদ্রার রং কি সবুজ? আতঙ্কিত নিদ্রার রং বোধ করি সবুজই হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আঁকা হয়েছে ছবিটি। লাগাতার এয়ার রেইডের সময় নিরাপত্তার জন্যে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল যারা, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ছবির থিম অনেকটা এরকম, নিজের কাছে ব্যাখ্যা করে নাদিম। সেই ছবিতে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা।

এ ঘরে যারা এখন ঘুমিয়ে রয়েছে তারাও ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত। একই বালিশে মাথা পেতেছে দু-তিনজন। নাদিম বালিশ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়েছিল, বালিশের জন্যে অপেক্ষা করেনি, এত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল সে। সারাটা দিন যে ধকল গেছে তাতে ক্লান্ত হওয়ারই কথা। আসলে দেহমনের ওপর প্রচণ্ড ধকল যাচ্ছে গত চার-পাঁচ-দিন যাবৎ, নাদিম কয়েকটা দিনের ঘটনাবলি ফ্ল্যাশব্যাকে দেখে নেয় চটজলদি। মনে মনে শিউরে ওঠে সে। ঘাড়ের ব্যাথাটা চাগিয়ে উঠল যেন। নাদিম হাত দিয়ে ঘাড়ে একটু চাপ দিল। কিঞ্চিৎ আরাম পেল। মুখের ভেতর নোনতা আর টক-টক গন্ধ। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল ওর।

নাদিম আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ভোরের হাওয়া ওকে আদর করে। আবার বেলফুলের গন্ধ পায় সে। এই গন্ধটি সে পেয়েছিল কাল রাতে, যখন এ বাড়িতে পা রেখেছিল। এরকম সুগন্ধ আর হয় না, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল নাদিমের। প্রিয় আলিঙ্গনের মতো, মনে হয়েছিল বেলফুলের গন্ধকে। ফুলের গন্ধে হয়তো রাত্রির ঘ্রাণও মিশে ছিল, নইলে গন্ধ এমন মদির আর রহস্যনিবিড় হয় কী করে? নাদিম হাওয়াই শার্টের বুক-পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আনে। প্যাকেটটা খানিক দুমড়ে গেছে, উলটো-পালটা ঘুমের জন্য। নাদিম প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেটটা চ্যাপটা মতো হয়ে গেছে। খেতে অবিশ্যি খুব অসুবিধা হবে না। ট্রাউজারের পকেটে হাত দিল নাদিম। দেয়াশলাইয়ের তালাশে। ডান পকেটে রুমাল। বাঁ পকেটে মিনি চিরুনি আর দেয়াশলাই। নাদিম সিগারেট ধরিয়ে দুটো ছোটো টান দিল। খালি পেটে সিগারেট খেতে বারণ করে ওর স্ত্রী, নাজমা। কিন্তু নাদিম শোনে না। মাঝে-মাঝে অবশ্য সে খালি পেটে সিগারেট খায় না, নাজমাকে খুশি করার জন্যে। এখন নাজমা ঘুমিয়ে আছে। এই ফাঁকে একটা সিগারেট খাওয়া যাক আয়েশ করে। আম্মাও ঘুমিয়ে আছেন। সবাই ভারি ক্লান্ত। আম্মা, নাদিম জানে, খুব সকালে ওঠেন, সূর্য ওঠার অনেক আগে। রোজ ফজরের নামাজ পড়েন। একদিনও কাজা হয় না। আজ আম্মারও ঘুম ভাঙেনি।

নাদিম এখন দেশবাড়িতে। সবার সঙ্গে। নিসর্গ এখানে দরাজদিল। প্রচুর গাছগাছালি, পাখপাখালিও বেশুমার। কেমন নিভাঁজ নির্জন চারদিক। ভিড়াক্রান্ত জায়গায় নাদিমের ভালো লাগে না। ঘরের কোণে সাধারণত একা একাই কাটত ওর বেলা। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে নাদিমের। ওর অধিকাংশ সময় কাটত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ঝিলে জঙ্গালে' জাতীয় বই পড়ে। কখনো কখনো দুপুরে চিলের ওড়াউড়ি দেখত জানালা দিয়ে, কখনো বা দেখত বহুরূপী মেঘের খেলা। নাদিম 'ঝিলে-জঙ্গালে' পড়েছিল অসুস্থতার মধ্যে। সেই মন-মাতানো বইটি একটি রুগণ্ বালকের কিছু কিছু দুঃসহ প্রহরকে আনন্দময় করে তুলেছিল, একথা এখনো মনে পড়ে নাদিমের।

ঘরকুনো ছিল বলে সে, নাদিম ইউসুফ, বাড়ির গণ্ডি ছেড়ে কোথাও বেরুত না, এমন নয়; স্কুলে তো যেতে হতই। তার ওপর বিকেলে প্রায় রোজই মাঠে বেড়াতে যেত। তবে ভিড় এড়িয়ে চলত সবসময়।

আসলে নাদিম ছোটোবেলা থেকেই নিঃসঙ্গতাকে সহোদর বলে জেনেছিল। তাবলে সে গজদন্তমিনারবিলাসী না। ইয়েটস-এর 'টাওয়ার' নাদিমের অত্যন্ত প্রিয় একটি কবিতা। কিন্তু টাওয়ারে কোনোদিন নাদিম বসবাস করতে পারবে না। কিম্বা যদি জনশূন্য কোনো দ্বীপে তাকে থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে হয় সে উন্মাদ হয়ে যাবে, নয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। ভিড়ভাট্টা অপছন্দ করে বলে একেবারে জনশূন্যতা ওর কাম্য নয়। সিগারেটের ধোঁয়া গিলল নাদিম। অনেকখানি। তারপর প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওটা পড়ল গিয়ে লেবুতলায়।

মানুষের সঙ্গ আমি কামনা করি, ঘরের ভেতর দৃষ্টি চালিয়ে সে মনে মনে উচ্চারণ করে। যারা আমার আপনজন, যারা আমার বন্ধু, সহকর্মী, যারা সদালাপী, মানবিকবোধে

দীপ্যমান, তাদের সঙ্গ আমার পক্ষে তৃপ্তিকর। যার মধ্যে চারিত্রিক তেজ আছে, তিনি যদি মতাদর্শে আমার বিপরীতধর্মীও হন, তার সাহচর্য আমার ভালোই লাগে। তবে গোঁড়ামার্কা ব্যক্তির ছায়া মাড়াতে আমি নারাজ।

বাড়ির ভাঙা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নাদিম ভাবে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা গ্লেসিয়ার নিঃসঙ্গতা আছে। কেউ সেটা উপলব্ধি করতে পারে, কেউ পারে না। বড়ো সাধ করে আব্বা এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন এখানে, পলাশতলীতে। খুব শখ ছিল তাঁর গ্রামে একটা পাকা বাড়ি তৈরি করার। বেশ খরচ করে একতলা বাড়ি বানিয়েছিলেন, বাড়ির চারদিকে দিয়েছিলেন দেয়ালের ঘর। আব্বা নেই, নাদিম ইউসুফ ঠান্ডা শ্বাস ফেলে। আব্বার ইন্তেকালের চার বছরের মধ্যেই বাড়িটা বড়ো বেশি জখম হয়েছে। দেয়ালে ফাটল ধরেছে। মেরামত করা দরকার। আব্বা শহরে থেকেও পলাশতলীর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে চেয়েছিলেন। পেরেছিলেনও। পলাশতলীতে জন্মেছিলেন তিনি। এখানেই তার পূর্বপুরুষদের ভিটা, বাপদাদার কবর। আব্বা কি নিঃসঙ্গ মনে করতেন নিজেকে? এমন অনেকেই আছে যারা প্রচুর সঙ্গ লাভ করেও কোনো কোনো মুহূর্তে নিজেদের নগ্ন দেখতে পান এক খাঁ খাঁ প্রান্তরে, এমন এক শ্মশানে, যেখানে মৃতের ভস্মসুদ্ধ উধাও, এমনকি শ্মশানবন্ধুও গায়েব। ফরাসি কবি বোদলেয়ার বলেছেন, ভিড়ের মধ্যেই মানুষ সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ। বিশেষ করে বড়ো শহরে এই নিঃসঙ্গতাবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। অবিরল জনস্রোত, যানপ্রবাহ, উঁচু উঁচু ঘরবাড়ি, রাশি রাশি দোকানপাট, এই সবকিছুর মধ্যে থেকেও নিজেকে ভয়ানক বিচ্ছিন্ন মনে হয়—ভয়ানক বিপন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আর বিপন্ন প্রহরের থাবা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই হয়তো বড়ো বড়ো শহরের বাসিন্দারা ভিড় জমায় ড্রাগ স্টোরে, সেবন করে মাদক বটিকা। ভিড় জমায় পাব-এ, বারে।

সঙ্গ, এমনকি প্রিয়তম ব্যক্তির সঙ্গও কখনো কখনো মানুষকে নিঃসঙ্গতার হিমকর্কশ মুঠি থেকে বাঁচাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, নাদিম ইউসুফ আমগাছের দিকে তাকিয়ে স্মৃতি স্পন্দিত হয়, তার পাশেই আছি তবু একা। অর্থাৎ পরমাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি পাশেই আছেন, তার সঙ্গ উপভোগ করেছেন কবি প্রাণভরে, তবু নিঃসঙ্গতার স্রোত বয়ে চলেছে তার সত্তার কূল-উপকূল ছাপিয়ে। যে-দয়িতা আমার পাশে বসে রয়েছেন, তাকে কি বলা যাবে এই নিঃসঙ্গতার কথা? তিনি হয়তো ভুল বুঝবেন আমাকে। মনে করবেন আমি অন্য কোনো মহিলার কথা ভাবছি, তিনি কাছে নেই বলেই আমি এখন নিঃসঙ্গ। সত্যি বলতে কি, এই নিঃসঙ্গতার সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া ইম্পসিবল। এ সম্পর্কে অনেক দার্শনিক বুলি কপচানো চলে, যুক্তির সঙ্গিন উঁচিয়ে গোটা জিনিসটাকেই খতম করে ফেলতে চাইবেন অনেকে। যাদের মধ্যে গভীর উপলব্ধি আছে শুধু তাদের কাছেই এই নিঃসঙ্গতা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। হয়ত দুয়ে-দুয়ে চার জাতীয় খাঁজে খাঁজে হিসেব মেলানোর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না তাঁরা। তাতে কিছুই এসে যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছুই তো আজ অব্দি ব্যাখ্যা-বহির্ভূত।

আরেকটা সিগারেট ধরাল নাদিম। প্যাকেটে আর মাত্র তিনটি সিগারেট আছে। বাজারে যেতে হবে সিগারেট আনার জন্যে। এখানকার বাজারে ক্যাপস্টান পাওয়া যাবে তো?

অনেক বছর পর পলাশতলীতে এসেছে নাদিম। ওর আব্বা যখন বেঁচে ছিলেন, নাদিমের মনে পড়ে,যখন তিনি দেশবাড়িতে যাওয়ার এন্তেজাম করতেন তখন তিনি নাদিমকেও বলতেন তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে, দাদা-নানার কবর জিয়ারত করার জন্যে। নাদিম তেমন গা করত না। কালেভদ্রে আসত এখানে। এবার সে এসেছে বাধ্য হয়ে। প্রাণের দায়ে!

আব্বা কি খুব নিঃসঙ্গ মনে করতেন নিজেকে? আব্বার কথা আজ বার বার মনে পড়ছে নাদিমের। দেশবাড়ির এই লম্বা বারান্দায় বসে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নাদিম ভাবে, ভাগ্যিস আব্বা এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। নইলে এতগুলো লোক এই পলাশতলীতে আজ মাথা গুঁজত কোথায়? অথচ আব্বার এই বাড়ি বানানোর প্ল্যানের বিরোধী ছিল নাদিম। সে চায়নি যে, আব্বা এতগুলো টাকা খরচ করে একা অজ পাড়াগাঁয়ে দালান তৈরি করুন। নাদিম ওর আব্বাকে অবিশ্যি সরাসরি এ কথা বলেনি কোনোদিন। আম্মাকে অনেকবার বলেছে, আব্বা খামোখা এতগুলো টাকা পানিতে ঢালছেন। আম্মা নিরুত্তর থাকতেন। আব্বাকেও কিছু বলতেন না।

কী দূরদর্শী ছিলেন আব্বা, নাদিম যেন এই বাড়িটাকেই বলল। নাদিমের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। এই বাড়িটা না থাকলে কোথায় আশ্রয় পেত ওরা। কাল যখন রাত এগারোটায় ওরা কুকুর ক্লান্ত হয়ে ঢুকল এই দালানে, তখন কি ভালোই না লেগেছিল ওর। ঝিরঝির বাতাস, বেলফুলের গন্ধ, রাত্রিমাখা ঘাস; গাছগাছালি আর বাড়ির গন্ধ এক স্বাগত সংগীত হয়ে বরণ করেছিল ওদের। যেন নাদিমের মরহুম দাদা, নানা, দাদী, নানী, খালা, আব্বা—সবাই অভ্যর্থনা করলেন ওদের স্বর্গীয় হাসি দিয়ে। ভাগ্যিস, এই বাড়িটা আব্বা বানিয়েছিলেন আমাদের অপছন্দের তোয়াক্কা না করে, নাদিম আবার উচ্চারণ করল মনে মনে।

বেশ খানিকটা ধোঁয়া নাক দিয়ে বের করল নাদিম। বারান্দায় সে বসে আছে একা, পা ঝুলিয়ে। একটা পাখি (পাখিটার নাম তার জানা নেই) আমগাছ থেকে উড়ে গেল। যে নিঃসঙ্গতা মানুষকে শীতের সাপের মতো মৃতকল্প করে তোলে, যে নিঃসঙ্গতা ঘুম পাড়িয়ে রাখে চৈতন্যকে সে নিঃসঙ্গতা থেকে আমি সর্বক্ষণ দূরে থাকতে চাই, নাদিম মনে-মনে বলল। কিন্তু যে নিঃসঙ্গতায় আছে কবিতার বীজ, যে নিঃসঙ্গতা কবির ভেতরের জিনিস তা ওর পক্ষে উপকারী। নাদিম ইউসুফ কবি। সে এদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। তার পাঁচটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দুটি বই অনেকদিন বাজারে নেই। চাহিদা আছে, কিন্তু প্রকাশক দ্বিতীয় মুদ্রণের ব্যাপারে গড়িমসি করছেন। করছি-করব করে কাটিয়ে দিচ্ছেন মাসের পর মাস।

সে যে একজন কবি, নাদিম সেকথা ভুলে গেছে। গত তিন চার দিনে অনেক কিছুই ভুলে গেছে সে। এই কদিন সে এক ভয়ানক নরকের মধ্যে ছিল। সেই নরকবাসের স্মৃতি ওকে কেমন খাপছাড়া করে দিয়েছে, সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে নাদিম, যেমন উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে। গত কদিন কবিতার কথা মনে পড়েনি তার। মনে পড়ার কথাও নয়। যখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু এসে হানা দেয় অস্তিত্বের চারপাশে, যখন কোনোমতে দাঁতে দাঁত চেপে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তখন বাকি সবকিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। নাদিম ছোট্ট টান দেয় সিগারেটে।

নাদিমের ঘাড়ের ব্যথা একটু বাড়ে। সারারাত ঠান্ডা মেঝেতে ঘুমিয়েছিল সে। ঘাড়টা বোধ হয় বেকায়দা পজিশনে ছিল। ব্যথাটা আর না বাড়লেই হয়। এবার হাতমুখ ধুয়ে ফেলা দরকার। একটু পরে অনেকে আসতে শুরু করবে। রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি তেমন।

কেউ কেউ জেগে উঠছে। প্রথমে বিছানা ছেড়ে উঠলেন নাদিমের আম্মা। তারপর নাজমা। আম্মা হাতমুখ ধুয়ে ওজু করে নামাজ পড়লেন। নাজমা শেষ হওয়ার পর নাশতা তৈরির কাজে লেগে গেলেন পুরোদমে। তাঁর সঙ্গে আছে নাজমা আর নাদিমের ভ্রাতৃবধূ। তাওয়ায় সেঁকা হচ্ছে আটার রুটি। রুটিগুলো মাঝারি ধরনের। একটা হাঁড়িতে চাপানো হয়েছে আলুপটল। ভাজি রান্না হচ্ছে। সুন্দর খিদে-জাগানো ঘ্রাণ ভেসে আসছে রান্নাঘর থেকে। রাতে অনেকেরই ভালো খাওয়া হয়নি। রান্না করার সময় ছিল না। আত্মীয়-স্বজনরা যা দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে যা ছিল তা দিয়ে খিদেকে শায়েস্তা করা গেছে। তাই নাশতা তৈরির কাজ ঝটপটিয়ে করে ফেলতে হবে।

'আব্বু, দাদী তোমাকে নাস্তা খেতে ডেকেছেন,' নাদিমের বড়ো মেয়ে স্মিতা বলল। স্মিতা এবার এগারো বছরে পড়েছে। ফর্সা, টিকালো নাক, বড়ো বড়ো চোখ। স্মিতা দেখতে অনেকটা ওর আব্বার মত হয়েছে, সবাই বলে। নাদিমকে তাগিদ দিয়ে স্মিতা চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়াল না বেশিক্ষণ। নাদিম সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল, পোড়া সিগারেটটা এবারও পড়ল লেবুতলায়।

নাদিম একটু পা চালিয়ে টিউবওয়েলের কাছে গেল। স্মিতা প্রায় ছুটে এল সেখানে। ওর হাতে টুথপেস্টের টিউব, টুথব্রাশ আর একটা টাওয়েল। টিউব থেকে পেস্ট বের করে টুথব্রাশে ছড়িয়ে ব্রাশটা নাদিমকে এগিয়ে দিল স্মিতা।

'টাওয়েলটাও দাও। এবার তোমার ছুটি। আমার জন্যে টাওয়েল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না,' নাদিম স্মিতার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে।

'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও না আগে,' স্মিতা বলল। নাদিম ব্রাশ করতে লাগল, ফেনায় ভরে গেল মুখ। অসহযোগ শুরু হবার পর থেকে নাদিম পিয়া টুথপেস্ট ব্যবহার করছে। অন্য পেস্ট ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছে, যদিও বিদেশি পেস্টের প্রতি ওর লোভ ছিল প্রচুর। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল নাদিম। স্মিতা ওর দিকে টাওয়েল এগিয়ে দিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে, রুটি বেলার জন্যে। নাদিম ভালো করে ঘষে ঘষে হাত মুখ মুছল। যেন শরীরের সব ক্লান্তি মুছে ফেলছে সে।

## ॥ ২ ॥

সকাল আটটা। নাদিম পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। পুকুরে এখন বেশি পানি নেই। অবিশ্যি বর্ষায় এই শুকনো পুকুরই অন্যরকম হয়ে যায়, ভরে যায় কানায় কানায়। আব্বা, নাদিমের মনে পড়ে, এই পুকুর পাড়ে বসতেন একটা কাঠের চেয়ারে। গাঁয়ের লোকজন এসে জড়ো হত। গল্প-গুজব চলত অনেকক্ষণ। আব্বা কখনো আবার পুকুরের লাগোয়া মসজিদের খোলা বারান্দায় বসতেন বিশেষ করে বিকেলবেলা। মাগরেবের নামাজ পড়ে

বসতেন মসজিদের খোলা চত্বরে। মসজিদটা নাদিমের দাদা তৈরি করেছিলেন। পুকুরটাও খনন করা হয়েছিল ওর দাদার আমলে। ওর দাদা, আব্বা, এখন ঘুমিয়ে আছেন পারিবারিক গোরস্তানে। মসজিদের ডান দিকে গোরস্তান। ওর আব্বা, আলহাজ্ব তমিজউদ্দীন চৌধুরী যদিও ঢাকা শহরে ইন্তেকাল করেন,তবু তাঁর কবর এখানেই হয়েছে, এই পলাশতলীতে। তাঁর আখেরী খায়েশ অনুযায়ী। তাঁকে যাতে তাঁর পিতার পাশে কবর দেয়া হয়, সেজন্যে তিনি আগেভাগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

নাদিম ওর আব্বার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। গোরস্তানের তেমন যত্ন নেয়া হয় না, দেখলেই মনে হয়। কেমন যেন অগোছাল। জীবনই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, নাদিম মনে মনে বলল। সে ওর নানা আর খালার কবর শনাক্ত করতে চেষ্টা করল। নাদিমের নানা আর আব্বার কবর বাঁধানো। অন্যগুলি নয়। অনেকদিন পর এলে চিনতে কষ্ট হয়। নাদিমের নানীর কবর আজিমপুর গোরস্তানে। ওর নানী যখন ইন্তেকাল করেন, নাদিম তখন কলেজের ছাত্র। নানীর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর সে আজিমপুরগোরস্তানে গিয়েছিল এক বিকেলবেলা। এমনিতেই কী একটা কাজে পিলখানা রোডে যেতে হয়েছিল ওকে, ফেরার পথে সে গোরস্তানে ঢুকে পড়ে। ইচ্ছে ছিল নানীর করবটা একটু দেখবে। অনেক কষ্ট করেও নানীর কবর সে খুঁজে পায়নি। এই খোঁজাখুঁজির কোনো মানে নেই। নাদিম জানে। তবু সে খোঁজে, তাকে খুঁজতে হয়। যদি সে না খোঁজে, নাদিমের মনে হল, নানীকে অসম্মান করা হয়, অবহেলা করা হয়। নানী ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, কত কষ্ট করেছেন ওর জন্যে। নাদিম যখন খুব ছোটো ছিল তখন সে ওর নানা-নানীর সঙ্গে থাকত। অষ্টপ্রহর নানীই ওর দেখভাল করতেন, ভাত-সালুন মেখে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। কখনো কখনো রাত তিনটা চারটায় নাদিম চা খাওয়ার বায়না ধরত। নানীর নাতির ইচ্ছা পূরণের জন্যে অত রাতে উনুন ধরাতেন, তারপর চা করে টিন থেকে কুকিস বিস্কুট বের করে নাদিমকে খাওয়াতেন। তাছাড়া রোজ রাতে নাদিমের হিসিতে ভেজা কাঁথা বদলাতেন বার দু'এক। 'তোমার নাতির জন্যে আমাকে নামাজ ভুলে যেতে হবে দেখছি,' নাদিমের নানা বলতেন মাঝে-মাঝে। ওঁর কণ্ঠস্বরে কপট বিরক্তি প্রকাশ পেত।

নাদিমের পাশে কখন ওর দুই ভাই এসে দাঁড়িয়েছিল সে টের পায়নি। হাসান জামিল। জাভেদ কায়সার। নাদিম একচল্লিশ। হাসান আটত্রিশ। জাভেদ কায়সার নাদিমের দশ বছরের ছোটো। হাসান জামিল ব্যবসায়ী। জাভেদ কায়সার ব্যারিস্টার। হাসানের পড়াশোনায় মন ছিল না কখনো। ম্যাট্রিক টেনেটুনে পাস করার পর সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বসে। আলহাজ তমিজউদ্দীন চৌধুরী পুত্রকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন দেখলেন যে অনিচ্ছুক ঘোড়াকে পানি খাওয়ানো মুশকিল তখন তিনি ওকে নিজের ব্যবসায়ে টেনে নিলেন। হাসান আব্বাকে হতাশ করেনি। হাসান যে বিজনেসমাইন্ডেড তার প্রমাণ সে বিসমিল্লাতেই দাখিল করল। জাভেদ কায়সার মেধাবী ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম এ। অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাসের বুড়ি ছুঁতে পারেনি। ব্যারিস্টার হয়ে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে। ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছা জাভেদের ছিল না। কিন্তু আলহাজ তমিজউদ্দিনের অনেকদিনের সাধ তাঁর এক ছেলেকে ব্যারিস্টারি

পড়াবেন। তাঁর এই সাধের উৎসবের খবর নাদিম রাখে না। পিতার সাধ পূর্ণ করার ভার পড়ল জাভেদ কায়সারের ওপর। কারণ হাসান জামিল তো অনেক আগেই রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

আর নাদিম ইউসুফ? আপাতত নাদিম সেকথা ভাবতে চায় না। নানা ধরনের উলটোপালটা চিত্র জেগে উঠছে ওর মনে। কেমন গোলমেলে, হিজিবিজি। গুলির শব্দ, চিৎকার, মর্টারের আওয়াজ, আগুন, কারফিউ, লাশ। লাশ, গুলি, ব্যারিকেড, মর্টার, চিৎকার, আগুন, কারফিউ, রেডিও, ভয়ানক আওয়াজ; ছুটোছুটি, কুকুরের ডাক, ট্রাক, জিপ, চিৎকার। বাস; তারাবো-যাত্রাবাড়ি, জিন্দাবাহার, নয়াবাজারে লেলিহান আগুন, শাঁখারি বাজারে অবিরাম গুলির শব্দ, পদধ্বনি, এলোমেলো, কুকুরের আর্তনাদ। ছাত্রদের হলে হামলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পাড়ায় হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবলীলা, অধ্যাপক হত্যার খবর, গোবিন্দ দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আরো কেউ কেউ। হঠাৎ রেডিওতে মেজর জিয়ার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কে এই মেজর জিয়া? যিনিই হোন, তিনি বাঙালিদের আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন। তাহলে সব একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আশা আছে। আসলে, নাদিম মনে মনে বলে, ৭ই মার্চ বঙ্গাবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, যখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ধ্বনি আশ্রয় পেয়েছিল এদেশের আকাশে বাতাসে, বাংলাদেশের হৃদয়ে।

নাদিম পুকুর পাড়ে দাঁড়াল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ওর। সে ভুলে থাকতে চায় ঢাকার কথা। ঢাকা থেকে সে পালিয়ে এসেছে বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে, অনেক আত্মীয়-স্বজনকে পেছনে ফেলে রেখে। ওর বড়ো ভাই ফাহিম সাদেক স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে ঢাকায় রয়ে গেছেন। পলাশতলীতে আসেননি। পরে আসবেন, আরো দু' চারটা দিন দেখে। নাদিমের শ্বশুর-শাশুড়িও ঢাকায় ওঁরা অবিশ্যি আসবেন না। আসার সময় বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, কারো খবর নিতে পারেনি নাদিম। উপায় ছিল না। এমন সন্ত্রস্ত ছিল যে, রাস্তাঘাটে বেরোয়নি পর্যন্ত। নাদিম ঢাকার কথা ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়? ফিরে আসে ঢাকা; প্রবলভাবে, অনিবার্যভাবে। বার বার ফিরে আসে।

'ডাহার খবর কী বাই', একজন প্রশ্ন করেন। পুবের হাটির কে যেন। নাম ভুলে গেছে নাদিম। কী খবর দেবে সে? ওর গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরোতে চায় না। সে কোনোমতে বলল, 'পাকিস্তানী সৈন্যরা জ্বালায়া পোড়াইয়া মানুষ মাইরা এক শা করতাছে।' এটুকু বলেই নাদিম চুপচাপ। আর কিছুই বলতে পারল না। নাদিমের সিগারেট খেতে ইচ্ছা করল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করল দেয়াশলাই। প্যাকেটে একটিমাত্র সিগারেট। বাজার থেকে একপ্যাকেট সিগারেট কিনতে হবে। শিগগিরই। এখানে ক্যাপস্টান পাওয়া যাবে তো? সিগারেট ধরালো নাদিম। বসল পুকুর পাড়ের ঘাসে। হাতে ঘাসের স্পর্শ পেয়ে ভালো লাগল ওর। হঠাৎ মনে পড়ল জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মুখ। চশমার আড়ালে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত

চোখ, ঠোঁটময় হাসি। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। নাদিম তাঁর ছাত্র ছিল একদা। তিনি শুধুমাত্র একজন ধীমান শিক্ষকই ছিলেন না, ইনটেলেকচুয়াল হিসেবেও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। তিনি, নাদিম জানে, মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল অগাধ, যদিও ব্যক্তিবাদে তাঁর আস্থা ছিল না কোনোদিনই। ডক্টর গুহঠাকুরতা ছিলেন এম এন রায়ের জেনুইন অ্যাডমায়ারার।

ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, নাদিম নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করতে করতে ভাবে, কখনো কোনো গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। খোলা চোখ-মন দিয়ে তাকিয়েছিলেন জগৎ সংসারের দিকে। যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী ছিলেন, তাই সবকিছুকেই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে চাইতেন। তিনি যে কথাটা বলতে চাইতেন তা বলতেন দৃঢ় কণ্ঠে, আর বিপক্ষের কথাও শুনতেন খুব মনোযোগ দিয়ে। একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সময় নাদিম ওর প্রিয় প্রফেসারের কোনো কোনো উক্তির বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু প্রফেসার গুহঠাকুরতা একটুও অসন্তুষ্ট হননি। আরেকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপককের কোনো বক্তব্য সম্পর্কে নাদিম ঝাঁঝালো মন্তব্য করেছিল। এতে তিনি খুশি হতে পারেননি। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, তাঁরও তো একটা আলাদা ভিউ-পয়েন্ট থাকতে পারে এবং সেটি তোমার মতের সঙ্গে মিলবেই এমন কোনো কথা নেই। সবাই যদি এক মতাবলম্বী হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীটাকে এত ইন্টারেস্টিং প্লেস বলে মনে হবে না তার। ইদানীং এই পরমতসহিষ্ণুতা খুবই বিরল, নাদিম জানে। কিন্তু সবসময় মনে রাখে না।

নাদিমের কানে এই মুহূর্তে ভেসে আসে ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার গাঢ় কণ্ঠস্বর, "নাদিম, বুদ্ধদেব বসুর 'গোলাপ কেন কালো' বইটি তোমার পড়া দরকার। তোমার ভালো লাগবে। এ বইয়ে ঢাকার কথা লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। বইয়ের অনেকখানি জুড়ে আছে ঢাকার বর্ণনা।" নাদিম ঢাকাকে ভালোবাসে, একথা প্রফেসর গুহঠাকুরতা জানতেন। তাই 'গোলাপ কেন কালো' পড়ার সময় তাঁর নাদিমের কথাই মনে পড়েছিল বারবার। তিনি বইটি নাদিমকে পড়তে দিয়েছিলেন। তখন ঢাকায় পশ্চিমবঙ্গের বই একদম পাওয়া যেত না। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা নেই। এই নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না নাদিম। মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁকে নিহত হতে হল নরপশুদের থাবায়। সে থাবা এখন সারা দেশে।

নাদিম বাজারের পথে হাঁটতে শুরু করল। এই পথ তার চেনা। অনেকবার আসা-যাওয়া করেছে এই পথে। কোথাও বাড়ি-ঘর, ফসলের খেত; কোথাও বাঁশঝাড়। বাজারের পথে যেতে একটা বাঁধানো কবর পড়ে, আজো সে কবরটা আছে, অনেক বছর পরেও থাকারই কথা। নানা কথা মনে পড়ে নাদিমের। ছেলেবেলা এসে যায় এক নিমেষে। একটা বালক, গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা কয়েকজন বালকের সঙ্গে চলেছে বাজারের হাটবারে। নানা ধরনের জিনিস দেখার লোভে। হাটে কত জিনিসই তো আসে আশেপাশের গাঁওগেরাম থেকে, দূর-দূরান্ত থেকে। বাজারের মিষ্টির দোকান থেকে ক্ষীরমোহন খেয়েছিল, নাদিমের মনে পড়ে।

এত বছর পরেও বাজার অনেকটা আগের মতোই আছে। অদল-বদল প্রায় কিছুই হয়নি। মুদির দোকান থেকে দু'প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট কিনল নাদিম ইউসুফ। আর দুটো দেয়াশলাই। দেশবাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। তাই যখন তখন দেয়াশলাইয়ের দরকার হয় উনুন ধরাতে, হ্যারিকেন কিম্বা মোমবাতি জ্বালাতে। এক প্যাকেট মোমবাতিও কিনে ফেলল দরকার হতে পারে ভেবে।

বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা খাল। এই খাল মিশেছে মেঘনায়। খালপাড়ে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা। ছইতোলা নৌকা। কাল দুপুরবেলা, নাদিমের মনে পড়ল, একটি নৌকার জন্যে কী প্রতীক্ষাই না ওরা করেছে। কিছুতেই নৌকা পাওয়া যাচ্ছিল না নরসিংদীতে। যা-ও বা পাওয়া যায় চট করে ভাড়া হয়ে যায়। একটা নৌকার জন্যে কী হুড়োহুড়িই না দেখা কাল দুপুরবেলা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তবু একটা নৌকা মিলল না। ভয়ানক ভিড় নরসিংদীতে। নানা জায়গা থেকে লোকজন এসে ভিড় করেছে একটু নিরাপত্তার জন্যে। নিরাপদ জায়গায় আস্তানা খুঁজছে সবাই। আখেরে, বরাত ভালো বলতে হবে নাদিমের, একটা নৌকা পাওয়া গেল। বেশ বড়োসড় নৌকা। মোটা অঙ্কের ভাড়া হাঁকলো। তাই সই, পলাশতলীতে পৌঁছলেই হল কোনমতে। বেশি ভাড়া হাঁকছে হাঁকুক। একটু আগে এখান থেকে বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা অংশ পাস করেছে। হয়তো একটু পরেই হানা দেবে খান সেনারা। সেই আশঙ্কায় নাদিম মুষড়ে ছিল, কিছুই ভালো লাগছিল না ওর। হাসান জামিল ওর দিকে এক টুকরো পাউরুটি আর একটি অমৃত সাগর কলা এগিয়ে দিয়েছিল। সে নেয়নি। অমঙ্গালের আশঙ্কায় সারাক্ষণ তটস্থ সে। নড়েচড়ে রোদে গা পুড়ে যাচ্ছিল। ওর দৃষ্টি নদীর দিকে, নৌকার প্রতীক্ষায়। সন্ধ্যা হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে—এখানে কিম্বা নদীতে। এদিকে খানসেনা, অন্যদিকে ডাকাত। মহিলা আর এতগুলো বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাতে মেঘনা পাড়ি দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যে কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন হয়ে যেতে পারে। দুর্বৃত্তরাও ওঁৎ পেতে থাকে সবসময়, মওকা বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চড়চড়ে রোদে বাচ্চারা অস্থির হয়ে পড়েছে। নাদিমের ছোটো মেয়ে বুমা ইতোমধ্যে বার তিনেক পানি চেয়ে গেল। বেশ কষ্ট করে ভিড় উজিয়ে এক জগ পানি আনল নাদিম। টিউবওয়েলের পানি অনেকেই খেল। ঢক ঢক করে এক গ্লাস নাদিমও খেল। ভীষণ পিয়াস লেগেছিল ওর। এদের সবার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ—যেমন তাড়া-খাওয়া পশুদের চোখেমুখে থাকে। নরসিংদী থেকে কোনোমতে পালাতে পারলে বাঁচে। তাই নৌকার মাঝির সঙ্গে যখন দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেল তখন নাদিমের মন সুন্দরবনের হরিণের লাফের মতো সুশ্রী আর চঞ্চল, আনন্দবিহ্বল। এতক্ষণ ওর মনের ভেতর ঈগল আর সাপের যে বিবাদ চলছিল চরম হিংস্রতায়, তার অবসান ঘটল। নাদিম বিপদতাড়িনী মাঝির দিকে তাকাল, কৃতজ্ঞতায় ওর চোখ ঝাপসা। ঢাঙা মাঝির ততোধিক ঢ্যাঙা লগিটার দিকে চোখ রাখল সে, লগি এখন জাদুদণ্ড। একে একে সবাই উঠল নৌকায়। যারা এই নৌকা ভাড়া করতে পারেনি, তাদের দৃষ্টিতে বাজি হারার অভিব্যক্তি—যা নাদিম অনেক চোখে অনেকবার দেখেছে। একটু মায়াও হল নিরাশাবিদ্ধ ব্যক্তিদের জন্যে,

বিশেষ করে তাদের নারী আর শিশুদের জন্যে। কিন্তু নাদিম কী করবে? অন্য কেউ এই নৌকার মাঝির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারলে সে-ও নরসিংদীতে এই অবেলায় পড়ে থাকত আম্মা, নাজমা, জাভেদ, হাসানের স্ত্রী এবং বাচ্চাদের সঙ্গে। আহ্ বাচ্চাদের কী দুর্গতি এই গরমে। বাচ্চাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ নেই, রোদের আঁচড়ের চিহ্ন আছে। কেননা শিশুদের কল্পনা এখনো তেমন ডাগর ডোগর নয়।

নাদিম নৌকায় উঠল, দিব্যি তাজিম সহকারে। কেন তার অবয়বে এমন আচরণ তরঙ্গিত হল সে নিজেই ঠাওর করতে অপারগ। নৌকায় ওঠা, গলুইয়ে বসা—এই সব কিছুর মধ্যে একটা রিচ্যুয়াল ছিল যেন। এটা নাদিমের অজ্ঞাতেই ঘটল। আঃ, কী শান্তি নাদিম মনে মনে উচ্চারণ করল। লোকজন আর মালপত্র নিয়ে নৌকা ঘাট ছাড়ল মসৃণ গতিতে। থই থই করছে মেঘনা নদীর পানি। নৌকা খানিক এগিয়ে গেলে নাদিম একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে নদীর পানি স্পর্শ করল। পানির স্পর্শে একটা শিহরন জাগল ওর দেহমনে, আনন্দে ঢেউ খেলে গেল ওর সমগ্র সত্তায়। এখন গুলির শব্দ নয়, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া লাশ নয়, নয়াবাজারে লেলিহান আগুন নয়, ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর নয়; তাড়া-খাওয়া মানুষের চিৎকার নয়, এখন পানির নরম স্পর্শ, মাছের উজ্জ্বল ঘাই, নদী তীরবর্তী গাছপালার শ্যামলিমা, আকাশে আকাশে পাখির ওড়াউড়ি, মাঠে ফসলের ঢেউ, কৃষকের ঘরে ফেরা।

নাদিম নৌকার গলুইয়ে এখন, বিপর্যস্ত ঢাকা থেকে মাইল মাইল দূরে। জাভেদ কায়সার ওর দিকে টোস্ট বিস্কুট এগিয়ে দিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সারাদিন নাদিম প্রায় কিছুই খায়নি। অত্যন্ত নার্ভাস ছিল সে। নিজের অস্তিত্বটাকে অস্বস্তির স্তূপ মনে হয়েছে ওর নিজের কাছে। এখন দুটো বিস্কুট খেল নাদিম। তারপর এক গ্লাস পানি। তৃপ্তি পেল; সারা শরীরে ক্লান্তি নেমে এসেছে, তবু ভালো লাগছে, নিসর্গের রূপ দেখছে দু'চোখ মেলে। মেঘনার পানি, দূরের গাছপালা, পালতোলা নৌকা, জেলের ডিঙি—সবকিছুই আপন-আপন লাগছে। এদের সঙ্গে যেন নাদিমের একটা নাড়ির যোগ আছে। এখন সবাই কিছু হাসি-খুশি। যেন মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে।

বাজার থেকে ফিরতে একটু দেরি হল নাদিমের। চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খেতে গিয়ে দেরি করে ফেলল। তখন চা না খেলেও চলত। চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসতে ওর ইচ্ছে হল বলেই চায়ের অর্ডার দিল। নাদিম জানে, এখানকার চা ভালো হবে না। ভালো হবার কথা না। হয়তো খেতেই পারবে না। তবু চায়ের অর্ডার দিল। নড়বড়ে টুলে বসল নাদিম। দোকানের মালিক ডিসপেন্সারি থেকে একটা চেয়ার এনে দিতে চাইল। নাদিম জানাল চেয়ারের দবকার নেই। টুলে বসে চা খেতে ওর মান ইজ্জত যাবে না। ফর এ চেঞ্জ ভালোই লাগবে।

'চিনি কদ্দুর দ্যাম', চা তৈরি করছিল যে লোকটা সে প্রশ্ন করল। 'দুই চামচ,' নাদিম জবাব দিল। নাদিম যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। এই চা খাওয়া মুশকিল। ছোটো করে চুমুক দিল নাদিম। এখানে খানিক অভিনয় করল সে, অনেকটা পাকা অভিনেতার মতো। চোখমুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল যে, চা-টা বেশ রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছে সে।

চা-টুকু শেষ করে সে একটা সিগারেট ধরাল ফ্রেশ প্যাকেটটা খুলে। কিছু ধোঁয়া গিলল নাদিম। দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে। একটা নৌকা ঘাট ছেড়ে চলেছে, লগি ঠেলছে মাঝি। দুধ মাছ কিনছে কেউ কেউ। আগেই বাজার করে নিয়ে গেছে হাসান জামিল। বাজারটা সে ভালোই করে, নাদিম মোটেই বাজার-টাজার করতে পারে না। ঢাকার কথা মনে পড়ল। অনেকের মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। যেন আর্ট গ্যালারিতে অনেকগুলি পোর্ট্রেট। অনেকেরই কোনো খবর নিতে পারেনি ঢাকা থেকে চলে আসার সময়। একে বলে, চুপিসারে। ঢাকার কথা ভুলে থাকতে চায় সে। কিন্তু যতই ভুলে থাকতে চায়, ততই মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে রাজীব আহসানের কথা। শোয়েব চৌধুরী, নঈম আহমেদ, জামিল আখতার—একসঙ্গে ভেসে ওঠে কয়েকটি মুখ। কেমন আছে ওরা? ভালো আছে তো!

নাদিমের বড়ো ভাই ফাহিম সাদেক ভালোই আছেন। এখানে কয়েকদিন পরে আসবেন তিনি। আসতে পারবেন শেষ অব্দি? শ্বশুরবাড়ির সবাই ভালো আছে, কোনো অঘটন ঘটেনি। কপাল ফেরে আজ এখানে এ সময়ে বসে চা খাচ্ছে নাদিম। যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকত, টিক্কা খান ক্র্যাকডাউন না করত বাঙালিদের ওপর, তাহলে সে এই বেলা এগারোটায় অফিসের চেয়ারে বসে আরামসে ক্যান্টিনের চা খেত। এমন বিস্বাদ চা খেতে হত না। সামনে রাখা শূন্য কাপে নাদিম ছাই ঝাড়ল। ছাইদান নেই। এ ধরনের দোকানে থাকার কথাও না। এইতো একজন মাটির মেঝেতেই ছাই ফেলল। ঘর নোংরা হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। কোনো মানেই হয় না এখানে এত দেরি করে ফেলার, নাদিম ইউসুফ স্বগতোক্তি করে ফিস-ফিসিয়ে। এখানে একা-একা বসে চা- খাওয়ার কী মানে হয়? চা যে বিস্বাদ হবে, একথা তো সে জানতই। শুধু দোকানটায় সামান্যক্ষণ বসার জন্যে (এটাও একটা খেয়াল নাদিমের) চায়ের অর্ডার দিল, বেশ উপভোগ করে খাওয়ার অভিনয় করল, কাটিয়ে দিল অনেকটা সময়। নাক দিয়ে কিছু ধোঁয়া বের করল নাদিম। সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে। খাটো সিগারেট টুপ করে ফেলে দিল চায়ের কাপে। সামান্য একটু শব্দ হল।

'আমাগো এহানে খান সেনারা আইবনি' একজন মধ্যবয়সি লোক জিজ্ঞেস করল। নাদিমের কাছ থেকে জবাব পাওয়ার আশায় সে প্রশ্ন করেছিল। ওর গলার আওয়াজে উদ্বেগ ছিল।

'এহানে আইবার পারব না। অগ যত বাহাদুরি সব শহরেই। এই গাঁও-গেরামে আইব মরতে?' নাদিম লোকটাকে আশ্বস্ত করে।

আমি লোকটাকে আশ্বস্ত করবার কে—নাদিম নিজেকে প্রশ্ন করে। আমি কি ছাই জানি কিছু? পঁচিশে মার্চের রাতে হানাদাররা যে নেকড়ের পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ঢাকা শহরে, এটা কি জানতাম আমি? বুঝতে পেরেছিলাম আগে ভাগে? আমি একজন সাংবাদিক। দৈনিক 'পদাতিক'-এর সহকারী সম্পাদক। আমি এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, একটা হাঙ্গামাহুজ্জত হলে হতেও পারে। তবে ঐ বাস্টার্ডরা যে এমন নৃশংসতা করবে তা বুঝতে পারিনি।

নাদিমের জবাব শুনে মধ্যবয়সি লোকটা খুশি হয়েছে, বোঝা গেল। সে বড় একটা চুমুক দিল চায়ের পেয়ালায়। লোকটাকে খুশি করতে পেরে ভালো লাগল নাদিমের। নড়বড়ে টুলটায় ছারপোকা আছে নিশ্চয়ই। নইলে নাদিমের পাছা এমন চুলকাতে পারে না এখন। চুলকানোর কোনো কারণ নেই। কিছুক্ষণ সে চেপে ছিল, চুলকোয়নি। এখন আর পারা যাচ্ছে না, লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে শহুরে সফিসটিকেশনটিকে এক লহমায় বিসর্জন দিয়ে ট্রাউজারের ওপর দিয়ে পাছা চুলকাতে লাগল। ট্রাউজারটা খুলে চুলকোতে পারলে আরাম পেত এখনকার চেয়ে। কিন্তু তার উপায় নেই। জনসমক্ষে আর যা-ই হোক ট্রাউজার খুলে উদোম পাছা চুলকানো যাবে না। এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করলে হাসির রোল পড়ে যাবে।

ছারপোকার কামড়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে পাছায় একটা ফুস্কুড়ির মতো কিছু হয়ে গেছে। ট্রাউজারের ওপর হাত চালিয়ে সে ফোলা ফোলা কী একটা ফিল করে। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাদিম। চায়ের দাম চুকিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে ঝকঝকে রোদ। রোদ মাথায় নিয়ে বেশ কিছুদিন হাঁটতে হবে এখন। একটা ছাতা থাকলে মন্দ হত না। কেন যে ছাতার কথা মনে এল নাদিমের তা সে নিজেই জানে না। সত্যি কথা বলতে কী, নাদিম ছাতাটাতা ব্যবহার করে না। ছাতা ইউজ করাটা ওর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। ভেতো বাঙালি আর কেমন কেরানি-কেরানি লাগে।

আরেকটা ক্যাপস্টান ধরিয়ে পথে হাঁটতে শুরু করল। রোদ বেশ তেজী, তা বলে খুব খারাপ লাগছে না। স্যান্ডেলটা ধুলোময় হয়ে উঠেছে, নাদিম লক্ষ করল। দেশের মাটির সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে। মৃদু হাসল নাদিম। সে নিজের সঙ্গেই ঠাট্টা করছে, ওর কাছে মনে হল। সিগারেটের ধোঁয়া গিলে নাদিম একটু থামল। ঐ জামতলায় খানিক জিরিয়ে নিলে মন্দ হয় না। সে জামগাছটার দিকে এগিয়ে যায় আস্তে আস্তে। একচল্লিশ বছরের মাথাটাকে রোঁদের তাপ থেকে বাঁচানোর জন্যে। এই জামগাছটার বয়স কত হল? আগে কি কখনো গাছটাকে দেখেছিল নাদিম? মনে পড়ছে না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে করতে অনেক চেষ্টা করল। কিছুতেই মনে করতে পারল না। একটা কাক নড়েচড়ে উঠল ডালে। ওপরের দিকে তাকিয়ে নাদিম সতর্ক হল। কাকটা যদি মাথার ওপর হেগে দেয়, তাহলে মার্ডার হয়ে যাবে। এমন একটা সম্ভাবনা ওকে জামতলা থেকে সরিয়ে পথে নিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বাড়ির কাছের পুকুরপাড়ে। পুকুরে গোসলের ধুম। নাদিমের দুই মেয়ে তানজিম আর বুমা, ছেলে রাশেদ মহা আনন্দে পানি ছিটাচ্ছে। বুমাকে ধরে রেখেছে রাশেদ। বুমা ভয় পাচ্ছে না মোটেই, একটু আধটু ভয় পাচ্ছে তানজিম। শিশুরা কী অল্পেই খুশি হতে পারে। নাদিম ভাবল।

॥ ৩ ॥

কখনো কখনো যখন আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হই, তখন একটা আনন্দিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, এই এখন যেমন হয়েছে, নাদিম ভাবে। সবাই হাসিখুশি কথাবার্তায় হালকা সুর কখনো, কখনো বা হাসি-ঠাট্টার ছোঁয়া। সময় কখন ফুরিয়ে যায়, টের পাওয়া

যায় না। হঠাৎ সেই আনন্দিত পরিবেশে কারো মনে পড়ে যায় এমন কারো কথা, যিনি এই মুহূর্তে পারিবারিক আসরে অনুপস্থিত। একদিন তিনি ছিলেন, আজ নেই। মনে পড়ে তার মৃত্যুর কথা। কিছুকাল আগে পারিবারিক মজলিসে, নাদিমের মনে পড়ে, আব্বার ফটোগ্রাফের দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সবাই কথায় মশগুল। কথার পিঠে কথা চলছে, ফাঁকে ফাঁকে চলছে চা খাওয়া। কথা নাদিম ইউসুফও বলছিল। কিন্তু তার চেতনা প্রবাহে ওর আব্বা মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর স্মৃতি বয়ে যাচ্ছিল হু হু করে। একদা তাঁকে ঘিরে আমরা বসতাম, নাদিম পলাশতলীর বাড়ির কোণের কামরায় বসে স্বগতোক্তি করে। তিনি প্রায়শই অতীতের কথা বলতেন, বেশি করে বলতেন তাঁর পিতার কথা। মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর চোখে তাঁর পিতা একজন পির ছিলেন, যদিও সেই বুজুর্গ জমিদারের নায়েবি করতেন এক সময়ে। নাদিমের আব্বা যখন তখন পলাশতলীর কথা বলতেন, যেখানে কেটেছিল তার শৈশব, কৈশোর। যখন তিনি তাঁর স্বগ্রামের কথা বলতেন, তখন তাঁর স্বরগ্রাম আর চোখ দুটো কেমন স্বপ্নময় হয়ে উঠত। মনে হত—ঐ তিনি হেঁটে চলেছেন শস্যখেতের ধার ঘেঁষে, এই তো বসলেন নৌকার গলুইয়ে কিম্বা দাঁড়ালেন ছইয়ে ভর দিয়ে, পুকুরঘাটে ওজু সেরে উঠে গেলেন মসজিদের বারান্দায়, খোলা আকাশের নীচে। আমরা, নাদিমের মনে পড়ে, মুগ্ধভাবে শুনতাম তাঁর কথা।

যাঁর উপস্থিতিতে আমাদের পারিবারিক মজলিস দপ দপ করত, নাদিম মনে মনে বলে, তিনি এখন গরহাজির। আজ যারা এ ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে, হাসি-তামাশা করছে তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন হয়তো থাকবে না অন্য এক আসরে। একদিন আমিও থাকব না। এটাই নিয়ম, এটাই রীতি। সেদিন আমার ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়েও কি কারো দৃষ্টি বেদনার্ত হয়ে উঠবে মুহূর্তের জন্যে। নাকি আমার ফটোগ্রাফে একটি টিকটিকি আসা-যাওয়া করবে, কেউ সেই দিকে লক্ষই করবে না। শুধু টিকটিকি কিম্বা কোনো প্রজাপতি আর কিছু কালিঝুল আমার ফটোগ্রাফের কানে কানে বলবে—তুমি নেই, তুমি নেই।

নাদিম চায়ের খালি কাপটা লীনার হাতে দেয়। ওর ছোট বোন। বয়েস সতেরো বছর। ইডেন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। আর্টস-এর ছাত্রী।

'আরেক কাপ দেব', লীনা নাদিমকে জিজ্ঞেস করে। সে জানে, ওর নাদিম ভাইয়া চা একটু বেশি খায়।

'থাকলে দাও।'

'তুমি খাবে কিনা বল।'

'দাও।' লীনা চা আনতে গেল। নাদিমের আম্মা তাহেরা খাতুন হাতের কাপটা চৌকিতে নামিয়ে রাখলেন। নাজমা রান্নাঘরে, চা বানাচ্ছে। বুমা ওর আব্বুর কাছে এসে বসেছে; চা খাওয়ার লোভে। আলাদাভাবে চা দেওয়া হয় না ওকে। মাঝে-মাঝে নাদিমের সঙ্গে শেয়ার করে। এ ব্যাপারে নাজমার পছন্দ নয়। তাই মায়ের চোখের আড়ালে বাপবেটিতে এই কাজটি সেরে ফেলে। লীনা নাদিমের জন্যে চা নিয়ে এল। ভায়ের হাতে কাপটা দিয়ে বলল, 'দেখ, মিঠা ঠিক হয়েছে কিনা।'

'একেবারে পারফেক্ট। ঠিক যেমনটি আমি চাই' একটা ছোটো চুমুক দিয়ে নাদিম বলল। তারপর অল্প একটু চা পিরিচে ঢেলে রুমার হাতে দিল। রুমা ফুঁ দিয়ে দিয়ে পিরিচের চা শেষ করল। 'আজ তোমার আব্বা যদি থাকতেন, তাহলে কত খুশিই না হতেন,' তাহেবা খাতুন বললেন ঠান্ডা শ্বাস ফেলে। যদি থাকতেন — কথাটায় রুসমতের আভা ছিল, শাহ নজরের ঝিলিক ছিল, বেনারসীর ঝলসানি ছিল, দর্পণের স্বচ্ছতা ছিল, বাসরঘরের উজ্জ্বলতা ছিল, সুদূর সোহাগের বিহ্বলতা ছিল, ভাঁড়ারের গন্ধ ছিল, উনুনের ধোঁয়া ছিল, প্রসব বেদনার যন্ত্রণা ছিল; শিশুর মুখের ঘ্রাণ ছিল। নাদিম ওর আম্মার দিকে সামান্যক্ষণ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। অবিশ্যি আজ আব্বা থাকলে পরিবেশ অধিকতর আনন্দ মুখর হত। তার তদারকিতে সবকিছু — স্মুথলি চলতো, অন্য কারুর তেমন বেগ পেতে হত না। তাহেরা খাতুন নিশ্চিত হতে পারতেন। পলাশতলীতে স্বাভাবিকভাবেই মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর অনুপস্থিতি আরো প্রবল হয়ে বাজে ওদের মনে। ওর মৃত্যুর পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে, তবু শোকের তীব্রতায় ভাটা পড়ে না। সত্যি কি ভাটা পড়ে না? নাদিমের মন জিজ্ঞাসু হয়। পড়ে বৈ কি। না পড়লে জীবনযাপনই অসম্ভব হয়ে পড়ত। নাদিমের সব সময় ওর আব্বার কথা মনে পড়ে না। নানা কাজে ভুলে থাকে। মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিশেষ কোনো কারণে নয়, এমনিতেই। এখানে আসা অব্দি অবশ্য বার বার মনে পড়ছে। এর প্রধান কারণ, আব্বাকে ছাড়া পলাশতলীর তেমন উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিকতা নেই নাদিমের কাছে। তাহেরা খাতুনের কাছে। হাসান জামিল, জাভেদ কায়সার ও লীনার কাছে।

চা খাওয়ার পর নাদিমের সিগারেট না হলে চলে না। আম্মার সামনে নাদিম কখনো সিগারেট খায় না, যদিও তাহেরা খাতনু জানেন যে, তাঁর এই পুত্রটি পয়লা নম্বরের সিগারেটখোর। নাদিম সিগারেট খাওয়ার জন্যে বারান্দায় গেল। বারান্দার যে জায়গায় নাদিম এসে দাঁড়াল, সে জায়গাটা কর্নারের ঘর থেকে দেখা যায় না। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল। দুই আঙুলের ছোটো সাঁড়াশিতে সিগারেট। সিগারেট ধরিয়ে নাদিম মনে মনে বলল, 'আব্বা সিগারেট খেতেন না, তবু তাঁর লাংস-এ ক্যান্সার হল।' জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী তাঁর যৌবনকালে সিগারেট খেতেন। সে অনেক আগেকার কথা। সিগারেট ছেড়ে হুঁকো ধরেছিলেন। পরে সেটাও ত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি ধূমপান থেকে বিরত ছিলেন। তবু তাঁর ফুসফুস রেহাই পেল না। কর্কট রোগ কব্জা করে ফেলল তাঁকে। নাদিম তার আব্বার তখনকার শরীর স্বাস্থ্যের কথা মনে করতে চেষ্টা করে। ভয়াবহভাবে শুকিয়ে গিয়েছিলেন জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী। লম্বা-চওড়া মানুষ ভীষণ কুঁকড়ে গেলেন। অবিশ্বাস্যরকম অস্থিচর্মসার। ক্যান্সার সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা ছিল নাদিমের। সে জানত, এই রোগটি ভয়ংকর। যাকে এই রোগ ধরে তার আর নিস্তার নেই। মৃত্যু তাকে শিকার করে নিয়ে যায়। ওর আব্বা এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সে বুঝল কী ভয়ংকর এই ব্যাধি। মারাত্মক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে রোগী ক্রমশ এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী পুরো তিনমাস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছিলেন। আট নম্বর কেবিনে। কেবিনের নম্বর আজো মনে আছে নাদিমের।

আট নম্বর কেবিনে পুরো তিনমাস। আম্মা আব্বার সঙ্গে ছিলেন, নাদিমের মনে পড়ে। নাদিম ও হাসান রাতে থাকত পালা করে। জাভেদ কায়সার তখন বিলেতে। ব্যারিস্টারি পড়ছে। ফাহিম সাদেক পলাশতলীতে। পলাশতলী স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সেই তিন মাস নাদিম ও তার অসুস্থ পিতার মধ্যে এক আশ্চর্য অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। এর আগে নাদিম ও জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীর সম্পর্কে এক ধরনের দূরত্ব ছিল। ওর আব্বা নাদিমের সঙ্গে খুব কম কথা বলতেন, নাদিমও এড়িয়ে চলত তাঁকে। নাদিম পিতাকে হতাশ করেছিল। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী আশা করেছিলেন যে, নাদিম সিএসপি হবে। তাঁর ছেলে একজন জাঁদরেল আমলা হবে। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি। সিএসপি হওয়া তো দূরের কথা, নাদিম এম এ-টাও কমপ্লিট করল না।

এরপর থেকেই মন ভেঙে গিয়েছিল জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীর। নাদিমের এই ব্যর্থতার জন্যে তিনি কাব্যলক্ষ্মীকেই দায়ী করেছিলেন। পুত্রের কাব্যচর্চাকে তিনি কখনো ভালো চোখে দেখেননি। নাদিমকে তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলতেন না, তবে আকারে ইঙ্গিতে এ-কথা বুঝিয়ে দিতেন যে, নাদিম ইউসুফের কাব্যপ্রয়োগের প্রতি তাঁর অনুমোদন নেই। পিতা- পুত্রের মধ্যে যে নীরব অন্তর্বিরোধ তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল তার ঝাপটা সামলাতে হত তাহেরা খাতুনকে। 'এভাবে কি দিন যাবে তোমার ছেলের? কবিতা লিখলে কি ভাত জুটবে সাহেবের? কে ওকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে চিরকাল?'—এ ধরনের প্রশ্নবাণে তাহেরা খাতুনকে বিদ্ধ করতেন জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী। তিনি পুত্রের ওপর রাগ করতেন ঠিকই, কিন্তু সেই রাগ দীর্ঘস্থায়ী হত না। স্বামীর উষ্মার তাপকে শীতল করার জন্যে তাহেরা খাতুনকে ঢের কাঠখড় পোড়াতে হত। তাহেরা খাতুন ছেলের হয়ে মাঝে মাঝে ওকালতি করতেন।

'আপনি ওর সঙ্গে খামোখা রাগ করছেন। ওর তো নামডাক হয়েছে আজকাল। ওর লেখার তারিফ করছে সবাই,' তাহেরা খাতুন স্বামীকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলতেন।

'রাখো তোমার নামডাক। কত দেখেছি এসব, পরে না খেয়ে মরতে হয়। কেউ ফিরেও তাকায় না তখন,' জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীর সাফ জবাব।

সিগারেটের ধোঁয়া গিলল নাদিম। আকাশে উড্ডীন পাখির মালা। সে দেখল সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঢাকা শহরেও এখন সন্ধ্যা। সেখানকার সন্ধ্যা অবশ্য এখানকার সাঁঝবেলার মতো নয়, নাদিম ভাবে। ঢাকার সন্ধ্যা জল্লাদের বেশে এসেছে। সন্ত্রাসের রাজত্ব সেখানে। নাদিমের মন খারাপ হয়ে গেল। 'আমরা আপাতত নিরাপদে আছি এখানে' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মনে মনে বলল নাদিম। এখানে হায়নার পদধ্বনি নেই, চিৎকার নেই মানুষখেকোদের। ঢাকার বাসিন্দারা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হল নাদিমের। আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই ঢাকায় রয়ে গেছে। ওরা এখানে আসতে পারেনি, অন্য কোনো নিরাপদ জায়গাতেও যেতে পারেনি। আর সে এই মুহূর্তে আকাশে পাখির মালা দেখছে, গাছ-গাছালির শোভা দেখছে, সিগারেট ফুঁকছে মৌজ করে, একে স্বার্থপরতা বলে না তো কাকে বলে।

মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এল। মাগরেবের আজান। যিনি আজান দিচ্ছেন তাঁর কণ্ঠস্বর ভালো না। আজানটা মধুর মনে হচ্ছে না নাদিমের কাছে। অথচ কারো কারো আজান অনেকক্ষণ ধরে শুনতে ইচ্ছে করে। আজান আকর্ষণীয় হওয়া দরকার, নাদিমের স্পষ্ট অভিমত। মুয়াজ্জিনকে হতেই হবে সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। হযরত বেলালের আজান প্রবাদের মতো ব্যাপ্ত মুসলিম জাহানে, নাদিমের মনে পড়ে। নাদিম সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিল। আম্মা এখন নামাজ পড়তে বসবেন, নাজমাও। মসজিদে নামাজীদের ভিড়। বড়ো চাচাও আসবেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। বড়ো চাচার বয়স কত হল? নাদিম আন্দাজ করতে চেষ্টা করল। সাতাশি আটাশি তো হবেই। নব্বইও হতে পারে। মাশাল্লা, এখনো উনি দিব্যি চলাফেরা করতে পারেন। লাঠি ব্যবহার করতে হয় না। অবিশ্যি তিনি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও আসা-যাওয়া করেন না। বড়ো চাচা লম্বা চওড়া মানুষ। একসময় তাঁর গলার আওয়াজ ছিল দারুণ গমগমে। কাউকে জোরে ডাক দিলে, অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যেত। নামাজ শেষ হলে বড়ো চাচার সঙ্গে দেখা করব, নাদিম মনস্থির করল। আগেই দেখা করা উচিত ছিল। আম্মা ওরা, নাদিম শুনেছে, সকালবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। হাসান আর জাভেদও দেখা করে এসেছে। শুধু নাদিমই যায়নি। ভুল হয়ে গেছে, বেয়াদবি হয়ে গেছে, নাদিমের মনে হল। কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল—বড়ো চাচার গাফিলতির জন্যে আব্বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেননি। বড় চাচা আব্বাকে পরীক্ষার ফিস পাঠাননি, কথাটা আব্বা গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন। এ মুহূর্তে নাদিমের এই পুরোনো কথা মনে পড়ল কেন। কথাটা মনে পড়ায় নাদিমের খারাপ লাগল। এ ধরনের কথা মনে হতে নেই। মনে হতেই মনের ভেতর একটা কাঁটা খচখচ করে। একটু পরে গিয়ে বড়ো চাচাকে কদমবুশি করে আসবে সে। মাগরেবের নামাজটা শেষ হোক।

নাদিম বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে। আরেকটা সিগারেট ধরাল সে। ইঁদারার কাছে লীনা দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে স্মিতার সঙ্গে। কী আলাপ করছে ওরা? লীনা ভীষণ ভয় পেয়েছিল ঢাকায়, সে-রাতে। মর্টারের আওয়াজে সে সারারাত থরথর করে কেঁপেছে। সকালবেলা ওর ফিট হবার যোগাড়। অনেক কষ্টে সামলে সুমলে রাখা হয়েছিল ওকে। ভ্যালিয়াম খাইয়ে আম্মা ওর নার্ভকে শান্ত রেখেছিলেন। অথচ এখন সে নির্ভয়ে সন্ধ্যায় ইঁদারার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেক বছর আগে, নাদিমের মনে পড়ে, এমনি এক সন্ধেবেলা এই ইঁদারারই পাশে একা দাঁড়িয়েছিল সামিনা। কত বছর আগে? তখন স্মিতা লীনা কেউই পৃথিবীতে আসেনি। তখন নাদিম ইউসুফ বিশ বছরের যুবা, জ্বলজ্বলে আর শাণিত। সামিনার তখন সেই বয়স, যাকে বলা হয় মায়াবি আঠারো। সামিনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নাদিম। ওর পরনে সালোয়ার, কামিজ আর দোপাট্টা। সামিনা ফর্সা, ওর চোখ বড়ো কিন্তু নাক ওর চেহারার স্ট্রং পয়েন্ট নয়। না, সামিনাকে কোনোমতে সুন্দরী বলা চলে না। তবে ওর স্বাস্থ্যে ডাগরতা আছে। তাছাড়া আঠারো বছর বয়সের আছে এমন এক ইন্দ্রজাল যা সহজেই যে কোনো মানুষকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। সামিনাকে ভালো লেগেছিল নাদিমের চোখে। এই ভালো লাগার পেছনে সামিনার ভূমিকা ছিল মুখ্য।

নাদিম কি ভালোবাসতো সামিনাকে? অনেকেই মনে করত যে, ওদের মধ্যে ভালোবাসাবাসি আছে। খালাতো বোনের সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে কোনো রোমাঞ্চ নেই, নাদিম এক সময়ে মনে করত। নাদিম, ওর নিজের ধারণা, সামিনাকে কখনো ভালোবাসেনি। তবে সামিনার প্রতি সে অ্যাট্রেকটেড ফিল করত। সামিনা, নাদিম লক্ষ করেছে, ছেলেবেলা থেকেই নাদিমকে পছন্দ করত। নাদিমের প্রতি বরাবরই একটা টান ছিল ওর। নাদিম তখন ক্লাস সিক্স কিম্বা সেভেনের ছাত্র। তখন সামিনা প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই নাদিমের সঙ্গে কাটাত। এই অষ্টপ্রাহরিক ঘেঁষাঘেঁষি নাদিমের ভালো লাগত না। মাঝে মাঝে সে রাগ করত, বকত সামিনাকে। সামিনা ওর রাগারাগি কিম্বা গালমন্দ কিছুকেই আমল দেয়নি। নাদিম যত রাগ করে, সামিনা তত বেশি কাছে এসে যায় ওর। একবার সামিনা বায়না ধরল যে, সে নাদিমের সঙ্গে স্কুলে যাবে। নাদিম কিছুতেই ওকে স্কুলে নিয়ে যাবে না। ছেলেদের স্কুলে কোনো মেয়ে যায় নাকি কোনোদিন? না, সামিনার যাওয়া চলবে না। ওকে কষে ধমক লাগাল নাদিম, সামিনা কিন্তু একটুও দমল না তাতে। নাদিম যখন বইখাতা নিয়ে স্কুলের পথে রওয়ানা হল, তখন সামিনা তার ধারেকাছে ছিল না। সামিনা লুকিয়ে ছিল কোথাও। নাদিম বাড়ি থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিল সামিনা লুকিয়ে-চুকিয়ে। নাদিম একটুও টের পায়নি। মাঝপথে সামিনা ধরা পড়ে গেল। সামিনাকে দেখে নাদিমের মেজাজ একেবারে খাপ্পা। এটি মেয়ে না ছেলের বাবা! ওর ইচ্ছে হল এক থাপ্পড়ে সামিনার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ঘুসি লাগাবে নাকি একটা। নাকি লাথি মারবে কষে। কী করবে নাদিম বুঝে উঠতে পারল না। সামিনার কাণ্ড দেখে নাদিমের নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। চোখ পাকিয়ে সে তাকাল সামিনার দিকে। 'আমার পেছনে পেছনে কেন এসেছ? এখুনি ভাগ, নইলে মার লাগাব,' নাদিম ধমকের সুরে বলল। সামিনা কিন্তু একটুও দমল না। সে নাদিমের সঙ্গে যাবেই। নাদিম ওর কান মলে দিল, বেশ জোরেই। সামিনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কেমন করে বাড়ি যাব? রাস্তা চিনি না। আমার ভয় লাগছে।' কী আর করে নাদিম, সামনাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। রাগে আর কথা বলে না নাদিম। সারাটা পথ সামিনার চোখ ছলছল করছিল।

নাদিম অনেকবার সামিনার ছলছলে চোখ দেখেছে। অনেক মেয়ে আছে যাদের চোখের ছলছলানি কোনোদিন থামে না। সামিনা তাদেরই একজন। নাদিম দেখল, সামিনা দাঁড়িয়ে আছে ইঁদারার কাছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। সামিনাকে আবছা দেখা যাচ্ছে। একটু সরে গেল সে, ইঁদারার লাগোয়া পেয়ারা গাছের নীচে। সামিনা নাদিমকে ডাকছে না তো? বিশ বছর বয়সের নাদিম এগিয়ে যায় পেয়ারা গাছের দিকে। একটা হোঁচট খেল ইঁদারাটার সামনে, পরমুহূর্তেই সামলে নিল। অন্ধকারে সামিনার চোখ দামি রত্নের মতো জ্বলছে বলে মনে হল নাদিমের। যেন বেড়ালের চোখ জ্বলজ্বল করছে। সামিনার স্তনের ঔদ্ধত্য শাসন করছে সন্ধ্যার অন্ধকারকে। নাদিম ওকে ভালোবাসে না, তবু এগিয়ে গেল—যেন নিজের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই নাদিমের। সামিনা তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, কিছু বলে না। নাদিম সামিনার ঠোঁট স্পর্শ করে নিজের ওষ্ঠ দিয়ে। থরথরিয়ে

ওঠে সামিনার নরম, ঈষদুষ্ণ ঠোঁট। সে নাদিমকে আঁকড়ে ধরে। সামিনার জিভ চলে যায় নাদিম-এর মুখের ভেতর, এক শিহরন খেলে যায় ওর শিরায় শিরায়। নাদিম সামিনার ঠোঁট চুষতে থাকে। ওদের যে-কোনো মুহূর্তে কেউ দেখে ফেলতে পারে, ওরা এই বোধের বাইরে তখন।

নাদিম দেখল, ইঁদারার লাগোয়া পেয়ারা গাছের নীচে সামিনা নেই। সেখানে কোনো পেয়ারা গাছও নেই। ইঁদারার সামনে দাঁড়িয়ে তখনো কথা বলছে লীনা আর স্মিতা। ওদের হাসিতে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে সন্ধ্যার ঝালর। নাদিম সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বড়ো চাচার সঙ্গে আজ আর দেখা করব না, কাল সকালেই যাব, নাদিম এই সিদ্ধান্ত নেয় মনে মনে। মসজিদের বারান্দায় বড়ো চাচার দেখা পাওয়া যেতে পারে কিছুক্ষণ পর। কিন্তু সে মসজিদে কিম্বা মসজিদের কাছে ওর বড়ো চাচার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। তাঁর ঘরে গিয়েই দেখা করা উচিত। আজ থাক, কাল সকালে যাওয়া যাবে। সে অনেকদিন বড়ো চাচাকে দেখে না। শুনেছে, তিনি আর আগেকার মতো শক্ত সমর্থ নন। শরীর ভেঙে গেছে। নব্বুই বছর বয়েস হয়েছে। আর কত বছর থাকবে শরীর। আমরা তো সত্তরেও পৌঁছতে পারব না, তার আগে টেঁসে যাব, নাদিম নিজেকে শোনায়। এইতো কিছুকাল আগেও বড়ো চাচা খুব সোজা হয়ে হাঁটতেন, অনেক জায়গায় আসা যাওয়া করতেন লাঠি ছাড়াই। এখনো, এই নব্বুই বছরেও, লাঠি ব্যবহার করেন না তিনি। হাঁটা-চলার সময় তিনি কারো সাহায্য নেন না। তবে ইদানীং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটেন। নাদিম হাসান জামিলের কাছে শুনেছে। সারাদিন কোরান-হাদিস পড়ে কাটান নাদিমের বড়ো চাচা। আল্লাবিল্লার মধ্যেই তিনি জীবনের পরমার্থ খুঁজে পেয়েছেন।

ধর্মের প্রতি নাদিমের কোনো টান নেই। অনেক বছর থেকেই নেই। মানুষকে সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ হিসেবে দেখে না, দেখতে চায় না। একজন মানুষ, মানুষ হিসেবেই মূল্যবান। নাদিম মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী। ধর্ম মানুষের একান্ত প্রাইভেট অ্যাফেয়ার। ধর্ম অর্গেনাইজড হলেই ফ্যাকড়া বাধে। তখনই হাঙ্গামা হুজ্জত মাথাচাড়া দেয়। নাদিম গডের অস্তিত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। অন্ধভাবে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে পারে না নাদিম। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে প্রতিটি জিনিস যাচাই করে দেখতে আগ্রহী।

বিশ্বাসের ব্যাপারে সে নিজেকে ফাঁকি দিতে চায় না। নিজের সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করে নিতে চায়। শুধু আবেগের তাঁবেদার হলে চলে না, যুক্তির দাবিকেও স্বীকার করে নেয়া দরকার। যুক্তিকে বিসর্জন দিলে অন্তর্গত আইয়ামে জাহেলিয়াত কখনো আলোয় উদ্ভাসিত হবে না। নাদিমের চিন্তাধারার সঙ্গে বড়ো চাচা কিছুটা পরিচিত। পলাশতলীর অনেকেই নাদিমের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কাহিনি জানে। ঢাকার কথা শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে নাদিম কিছু রেখে ঢেকে বলে না। ওর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা সে বেশ জোর দিয়েই বলে। তার এই স্পষ্টবাদিতাই ওকে নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছে।

নাদিম চাইলে দিব্যি ভণ্ডামি করে দুকূল রক্ষা করতে পারত। কিন্তু নাদিম ভণ্ডামি করতে পারে না। যা বলার তা বেশ জোর দিয়েই বলে। নিজের বিবেকের কাছে সে পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়। তাই ওর শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। কেউ কেউ নাদিমকে নাস্তিক বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। হয়তো আরো অনেক আছে, যারা নাদিমের মানসসঙ্গী কিন্তু তারা কনফ্রনটেশন এড়িয়ে চলে মুখ না খুলে। মুখ খুললেই বিপদ। ধরা পড়ে যাবে। নাদিম গিভস এ ড্যাম টু দেম। সে নিজস্ব ধারণা ও বিবেচনাগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করাকেই মুনাসিব মনে করে। সে কাউকে বাতেলা দিতে পারে না। নিজেকে তো নয়ই।

পলাশতলীর একটা বৈশিষ্ট্য যে, এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে। পাক সেনারা বাঙালি নিধনে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি ওদের বিদ্বেষ ডিনামাইটের মতো ফেটে পড়ে। একে বাঙালি, তার ওপর হিন্দু, তাহলে তার রক্ষে নেই। হিন্দুরা কোথাও নিরাপদ বোধ করছে না। কিন্তু পলাশতলী থেকে কোনো হিন্দু অন্য কোনোখানে পালিয়ে যাচ্ছে না। পলাশতলীতে বেশ কিছু ঘর কৈবর্তের বাস। ওদের সঙ্গে মুসলমানদের যথেষ্ট সদ্ভাব রয়েছে। বিপদের সময় মুসলিমরা কৈবর্তের পাশে দাঁড়ায়, লক্ষ রাখে যাতে ওদের কোনো অসুবিধা না হয়। পলাশতলীর মুসলিম লিগাররাও অসাম্প্রদায়িক।

পাকসেনাদের বন্দুকের নল থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি, নাদিম স্বগতোক্তি করে। বাঙাল মুলুকে নাকি সবাই হিন্দু। যারা মুসলমান তারাও নাকি হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই এখন প্রশান্ত চৌধুরী। নাদিমের প্রশান্ত চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীর কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন প্রশান্ত চৌধুরী। অনেক বছর আগে রায়টের সময় প্রশান্ত চৌধুরী নাদিমদের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন প্রায় এক মাস। তাকে নাদিমের আব্বা লুকিয়ে রেখেছিলেন গুণ্ডাদের খুনি দৃষ্টি থেকে। প্রশান্ত চৌধুরী চব্বিশ ঘন্টা একটা ছোটো ঘরের ভেতর আত্মগোপন করে থাকতেন। ঘরটার দরজা জানালা সবসময় বন্ধ থাকত। সেই ঘরে যে একজন মানুষ আছে তা কাকপক্ষীও টের পেত না। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী নাদিম ও অন্যান্য সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে ওরা প্রশান্ত চৌধুরীর আত্মগোপনের গল্প না করে। দরজায় সামান্য খুট শব্দ হলেও ভদ্রলোক ভয়ানক চমকে উঠতেন। তার চেহারা ভয়তরাসে একেবারে কুঁকড়ে যেত। প্রশান্ত চৌধুরীর সেই ভয়ার্ত মুখ নাদিম কখনো ভুলতে পারবে না।

নাদিম যা ভেবেছিল ঠিক তাই দেখল। ওর বড়ো চাচা অন্ধকার ঘরে কোরান শরীফ পড়ছেন। বাইরে সকালের রোদ জ্বলজ্বল করছে। ঘরের ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে, হ্যারিকেনের আলোয় তিনি কোরানের আয়াত পড়ছেন নিবিষ্ট মনে। দিনের আলো ঘরে প্রবেশ করতে পারছে না। নাদিম বড়ো চাচাকে কদমবুশি করল। কোরান শরীফের পাতা থেকে চোখ তুলে তিনি নাদিমের দিকে তাকালেন। ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে চিনতে যেন একটু কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

'নাদিম না?'

'জী।'

'ক্যামন আছ?'

'জী ভালোই আছি আপনার দোয়ায়। আপনি কেমন আছেন চাচা?'

'এই আছি আর কী। শরীরডা বেশি ভালা না। আইজ এইডা, কাইল হেইডা লাইগাই আছে। তোমার রঙুডা একটু ময়লা অইয়া গ্যাছে বইলা মনে অয়।'

'রৈদে জ্বইলা গ্যাছে। আর যা' পেরেশানি চাচা, কী কইবাম। বাঁইচা যে আছি, আল্লাহর লাখ শুকুর।'

'আল্লাহ-র বড়ো মেহেরবানী। তোমরা হগলে সহিসালামতে আইসা পৌচছো দেইখা পরানডায় চইন আইছে। ডাহার খবর যা হুনছি,' নাদিমের বড়ো চাচা বাক্যটি শেষ করলেন না। ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুল।

'ডাহার খবর মুখে বয়ান করা যায় না,' নাদিম বলল।

'পাকিস্তান আর থাকব না। যা জুলুম ওরা করতেছে, এই জুলুমের পর পাকিস্তান থাকতে পারে না। অগ উপর আল্লাহর গজব পড়ব।'

ক্র্যাক ডাউনের পর পাকিস্তান থাকতে পারে না, বাঙালিরা স্বাধীন হবেই, এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে নাদিমের মনে। অবশ্য এ কথা এখনো কাউকে সে বলেনি। বড়ো চাচার মুখে তার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনে নাদিম বেশ অবাক হয়েছে। এটা ওর প্রত্যাশার বাইরে। বড়ো চাচা, নাদিম জানে, বরাবরই মুসলিম লিগের কট্টর সাপোর্টার। পাকিস্তান ভেঙে গেলে তিনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবেন। তবু তিনি ধিক্কার দিলেন হানাদার বাহিনীকে, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কর্তৃত্বের ওপর থুথু ছিটালেন।

নাদিম একদৃষ্টিতে তকিয়ে রইল বর্ষীয়ান চাচার দিকে, নব্বুই বছর বয়সের দিকে। শ্রদ্ধায় নুয়ে এল ওর মাথা। বড়ো চাচার ঘরে ঢোকার পর থেকে নাদিম একটা গন্ধ পাচ্ছিল। পুরোনো আসবাবপত্রের গন্ধ? বার্ধক্যের গন্ধ? নাকি আসন্ন মৃত্যুর গন্ধ! এই গন্ধ নাদিমের অচেনা নয়। ওর মনে পড়ে, বড়ো চাচার ঘরে এর আগে, কয়েক বছর আগে, যখন ঢুকেছিল তখনো এরকম একটা গন্ধ পেয়েছিল সে। বড়ো চাচাকে কদমবুশি করে নাদিম সেখান থেকে রোকসৎ হল।

বড়ো চাচার ঘর থেকে বেরিয়ে নাদিম যখন পুকুরপাড়ে এসে পৌঁছলো, তখনো ওর নাকে সেই গন্ধটা লেগে ছিল। নাদিমের খালাম্মা, ওর আম্মার একমাত্র বোন, সেই ঘরেই ইন্তেকাল করেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সেই যে বিছানা নিলেন তারপর আর বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। খালাম্মার চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করল নাদিম। স্পষ্ট মনে পড়ছে না। কেমন আবছা-আবছা লাগছে। চোখ দুটো স্পষ্ট মনে পড়ে নাদিমের। ওর খালাম্মার চোখ দুটো বড়ো আর স্নেহময় ছিল। নাদিমকে খুব আদর করতেন। ভালো কিছু রাঁধলে নাদিমকে ডেকে নিয়ে খাওয়াতেন। খালাম্মা আম্মার মতো ফর্সা ছিলেন না, ওঁর গায়ের রং ছিল শ্যামলা। নাদিমের নানা বলতেন, আবিদার সুরতে নিমক আছে। ওঁর ছোটো মেয়ে লাবণ্যময়ী, এ কথাটাই বোঝাতে চাইতেন নানাজান। নিজস্ব ধরনে। নাদিম দেখছে, আবিদা খালা বসে আছেন কাঠের পালঙ্কে। পিঠে ছড়ানো রয়েছে ঘন দীর্ঘ কালো চুল। পরনে শাদা শাড়ি, শাড়িটার পাড় খয়েরি। সদ্য গোসল সেরে এসেছেন। ওর গা থেকে মৃদু একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। মিষ্টি গন্ধ। পিয়ার্স সাবানের আবছা ঘ্রাণ। সেই ঘ্রাণ বেশি করে শুঁকতে ইচ্ছে করত নাদিমের।

আবিদা খালা যখন মারা যান, তখন ওঁর বয়স কত ছিল? পঁচিশ বছর? নাকি আরো কম। সন তারিখের ব্যাপারে নাদিম খুবই ক্যালাস। কিছু মনে থাকে না ওর। গোলমাল হয়ে যায়। নাদিম সিগারেট ধরাল। অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি সে। বেশ খানিকটা সময় বড়ো চাচার ঘরে কাটাতে হল। সেখানে তো আর সিগারেট খাওয়া যায় না। পুকুরপাড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত অটোম্যাটিকেলি হাওয়াই শার্টের বুক পকেটে চলে গেল সিগারেটের প্যাকেট বের করার জন্যে। সিগারেটে ছোটো একটা টান দিয়ে সে গোরস্তানে চোখ রাখল। আবিদা খালার কবরটা দেখল। ঠান্ডা শ্বাস ফেলল সে। নাদিম দেখল ওর আব্বার করব, দাদার কবর। দাদীর কবর। নানার কবরের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে সে দেখছিল। কয়েকটি জীবন সেখানে ঘুমিয়ে আছে, মৃত্যু আছে জেগে। মৃত্যুর পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে জীবনস্রোত। আবিদা খালার কবরের পাশে ছাগলের খুঁটি পুঁতল ছোটো একটা মেয়ে। ছাগলটা ঘাস খেতে শুরু করল। আবিদা খালার কবরের এত কাছে ছাগলটাকে বাঁধার কোনো মানে হয় না। নাদিমের খারাপ লাগে। মেয়েটাকে বলবে নাকি ছাগলটাকে অন্য কোথাও বাঁধার জন্যে। মেয়েটার বয়েস দশ-এগারো বছর হবে। কার মেয়ে? মাস্টার চাচার মেয়ে না? মাস্টার চাচার কবরটা কোথায়? নাদিমের দৃষ্টি এখন সন্ধানী। জনাব তৈয়বউদ্দীন চৌধুরী বি-এ পাস করেননি, কিন্তু টিচার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। পলাশতলী স্কুলের হেড মাস্টারের কথা আশেপাশের বহু গ্রামের লোকজনই জানত। এখনো জানে অনেক ছেলে মানুষ হয়েছে তার হাতে, যদিও তার নিজের কোনো ছেলেকে তিনি মনের মতো করে গড়েপিটে নিতে পারেননি। একদিকে তিনি সাকসেসফুল টিচার, অন্যদিকে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা তাঁর জীবনটাকে একটা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত করেছিল। অবিশ্যি তাঁর একটি ছেলে টেনেটুনে আই. এ. পাস করতে পেরেছিল। ছোটো-খাটো একটা চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছিল সে। জনাব তৈয়বউদ্দীন চৌধুরীর দারুণ মেঘলা আকাশে এটাই একমাত্র রূপালি ঝিলিক, যদি একে রুপোলি ঝিলিক বলা যায়।

জনাব তৈয়বউদ্দীন চৌধুরী নাদিমের আব্বার ইমিডিয়েট বড়ো। দুই ভায়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল মহব্বত ছিল। তিনি কোনো কাজে ঢাকা গেলে তমিজউদ্দীন চৌধুরীর বাড়িতেই উঠতেন। নাদিমের বাপ-চাচারা সবাই লম্বা-চওড়া মানুষ। জনাব তৈয়বউদ্দীন চৌধুরীর বেলাতেও কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভরাট গলা ছিল নাদিমের মাস্টার চাচার। তাঁর একটি প্রিয় ফ্রেজ ছিল 'অ্যাজ এ হেড মাস্টার'। তিনি যে পলাশতলী স্কুলের হেড মাস্টার, একথা তিনি কখনো ভুলতে পারতেন না। অন্যকেও ভুলতে দিতেন না। স্মরণ করিয়ে দিতেন কথায় কথায়।

মাস্টার চাচা, নাদিমের মনে পড়ে, নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন। ইংরেজি ফ্রেজ ও ইডিয়মের অর্থ জিগ্যেস করতেন, কোনো কোনো বাংলা বাক্য ইংরেজিতে তরজমা করতে বলতেন। 'বলত সে চাছিয়া পুছিয়া খাইয়াছে — ইংরেজি কী? নতুন জুতা মচ মচ করে — এই সেন্টেন্সটার ইংরেজি কী অইব?' গায়ে আচকান চাপাতে চাপাতে কিংবা তাঁর বিবর্ণ রুমি টুপিটা পরার সময় জিগ্যেস করতেন তিনি। মাস্টার চাচা এসব প্রশ্ন খুব ক্যাজুয়েলি জিগ্যেস করতেন। কিন্তু নাদিম প্রশ্নগুলির জবাব ইজিলি ক্যাজুয়েলি দিতে

পারত না। মাস্টার চাচা কোনো প্রশ্ন করলেই নাদিমের মুখে অটোম্যাটিক তালা লেগে যেত। অধিকাংশ প্রশ্নেরই কোনো জবাব ছিল না নাদিমের কাছে। দু'একটা ফ্রেজের মানে সে বলতে পারত কিন্তু বলার সময় একটু তোতলাত নাদিম। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ত। কখন মাস্টার চাচা কোন্ বেমক্কা প্রশ্ন করে বসেন, সে কথা ভেবে সে তটস্থ হয়ে থাকত সবসময়। অবশ্য এভাবে অনেক ফ্রেজ আর ইডিয়ম নাদিমের শেখা হয়ে যেত।

নাদিম সেসব দিনের কথা মনে করেএকটু হাসল। ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়ার প্রেরণা কি মাস্টার চাচার কাছে পেয়েছিল নাদিম? হতেও পারে। হয়তো তিনি নাদিমের অবচেতন মনে প্রেরণার একটা ক্ষীণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের এবং নাদিমের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। নাদিম অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত এম. এ. পরীক্ষা দেয়নি। মাস্টার চাচা মাঝে মধ্যে বলতেন, 'নাদিম তুমি আর এম. এ-টা দিলানা। পরে পস্তাইবা,' অত্যন্ত দুঃখিতকণ্ঠে জনাব তৈয়বউদ্দীন চৌধুরী, পলাশতলী স্কুলের রিটায়ার্ড হেড মাস্টার, এ-কথা বলতেন। নাদিম তাঁর মাস্টার চাচার অন্যান্য অনেক প্রশ্নের মতো এ-কথারও জবাব দিতে পারেনি।

মাস্টার চাচার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। এম. এ. পরীক্ষা না দেয়ার জন্যে বার বার পস্তাতে হয়েছে নাদিমকে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। আম গাছতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে একবার ওর ইচ্ছে হল মরহুম তৈয়বউদ্দীন চৌধুরীর কবরের পাশে গিয়ে বলতে, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন মাস্টার চাচা, পস্তাতে আমাকে হয়েছে। এখনো হচ্ছে।' নাদিম আম গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না। গরম পড়েছে। কিন্তু হাওয়ার জোর থাকায় গরম লাগছিল না তেমন। একে গা-সওয়া গরম বলা চলে। এখানে একটু বসতে পারলে ভালো ছিল। ঠিক আম গাছের নীচে বসা যাবে না। ঘাস নেই। একটু এগিয়ে বসলেই দবিজ ঘাস পাওয়া যাবে। ছায়া থেকেও একবারে বঞ্চিত হবে না।

নাদিম ঘাসের ওপর বসল। ওর ছেলে রাশেদ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মাছ ধরার ছিপ তৈরি করেছে। ফাৎনা ও বড়শি লাগিয়ে নিয়েছে কারোর সাহায্যে। পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছে। ওর সঙ্গে আছে রুমা এবং আরো কয়েকজন। নাদিম একবার সাবধান করে দিল ওদের, যাতে পানিতে না নামে। বিশেষ করে রুমাকে। অনেক আগে রমনার লেকের ধারে, নাদিম ভাবে, ওরা দুজন বসেছিল পুরু ঘাসের ওপর। নাদিম আর শাকিলা। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল ওরা দুজন। বিকেলের নরম রোদ খেলা করছিল শাকিলার চুলে, চোখে-মুখে। শাকিলা ওর পাশে বসে আছে এমন নিবিড় হয়ে, এইসত্য ওর শিরায় শিরায় খুশির ঢেউ বইয়ে দিচ্ছিল। শাকিলা ওকে ভালোবাসে। শাকিলার হৃদয় দখল করার আনন্দে নাদিম বিভোর। নাদিম শাকিলাকে প্রথম দেখেছিল ইউনিভার্সিটির এক সাহিত্যসভায়। সেই সাহিত্যসভায় নাদিম একটা কবিতা পড়েছিল। আর্টস বিল্ডিং-এর একটা বড়ো ক্লাস রুমে সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়েছিল সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে। দর্শকদের প্রথম সারিতে ছিল শাকিলা। প্রথম দুই সারিতে বসেছিল মেয়েরা। সকলের মাঝখানে শাকিলা কেমন একটু আলাদা। লালচে ফর্সা রং। বড়ো বড়ো চোখ। চোখ কিছুটা নীলাভ যেন, পাতলা ঠোঁট। শাকিলা তন্ময় হয়ে শুনছিল নাদিমের কবিতা, কবিতা পড়ার ফাঁকে লক্ষ করেছিল সে। যখন নাদিমের নাম ঘোষণা করা হল তখন বুক

টিপ টিপ করছিল নাদিমের। বেঞ্চ থেকে উঠতে পারছিল না প্রথমটায়। কোনোমতে উঠে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় সেখানে শাকিলা ছিল বলেই। পকেট থেকে কবিতার পাণ্ডুলিপি বের করে একটু কাশল সে। তারপর কবিতা পড়তে শুরু করল। গোড়ার দিকে গলাটা খানিক কেঁপে গেল। নিজের পা দুটোকে নড়বড়ে মনে হচ্ছিল ওর। যেন দু'পায়ে ঠোকাঠুকি হয়ে যাবে। কিন্তু দু'চার সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিল। ভালোই পড়ল নাদিম। করতালির মধ্য দিয়ে নিজের জায়গায় সে ফিরে এল। কে একজন ওর কবিতাটা দেখতে চাইল। নাদিম খুশিমনে পাণ্ডুলিপিটা সেই ছাত্রের হাতে তুলে দিল। সাহিত্যসভা শেষ হওয়ার পর শাকিলার সঙ্গে নাদিমের দেখা হল করিডরে। শাকিলা এগিয়ে এল ওর দিকে। সুন্দর, হালকা নীলাভ চোখ তুলে বলল, 'আপনার কবিতা খুব ভালো লেগেছে। আপনি চমৎকার লেখেন কিন্তু।' 'ধন্যবাদ,' শাকিলার চোখে চোখ রেখে কোনোমতে বলতে পারল নাদিম। কী সুন্দর তুমি, মনে মনে বলল। সেই মুহূর্তে, পরিচয়ের প্রথমদিনে নাদিমের কাছে শাকিলাকে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতো মনে হল। কেমন সুদূর এবং রূপসি। শাকিলা আহমেদ পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী। সেকেন্ড ইয়ার অনার্স। কবিতা সাঁকো হিসেবে কাজ করল দু'জনের মধ্যে। এক মাসের মধ্যে নাদিমের মোটাসোটা খাতাটা ভরে উঠল কবিতায়। ওর সকল কবিতাই তখন শাকিলা আহমেদকে লক্ষ্য করে মঞ্জরিত হচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, তখন থেকেই নাদিম ইউসুফের প্রেমের কবিতা লেখার ঝোঁক বেড়ে যায়।

নাদিমের কবিতা লেখার জোয়ার এল ঠিকই, কিন্তু ভাটা পড়ল ক্লাসের পড়াশোনায়। বাগ্দেবী এবং শাকিলা আহমেদ-এই দুজনই ওকে দখল করে রাখল অষ্টপ্রহর। তখন অন্য আর কিছুতেই মন নেই ওর। একটি বছর কেটে গেল এক মোহন উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে। নীল কাগজে লেখা চিঠি, লেডিজ কমন রুমের পর্দাদেয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিটের কথাবার্তা, মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা, আমতলায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গোল হয়ে বসে চা খাওয়া, কবিতা আওড়ানো, শাকিলার সঙ্গে রমনা লেকের ধারে, রেসকোর্সের মাঠে কিংবা কোনো ভাঙা মন্দিরের ধার ঘেঁষে বৈকালিক ভ্রমণ, রাতে জেগে কবিতা লেখা —এই ছিল তখনকার নাদিম ইউসুফের জীবনযাপন। সেই সময়টাকে যেন সে মুঠোর ভেতর ধরে রেখেছিল।

পরীক্ষার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল নাদিম। রোগশয্যায় শাকিলার একটা চিঠি পেল সে—

মিতা,

তোমার অসুখের খবর পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। শুনেছি, তুমি নাকি পরীক্ষা দেবে না। লক্ষ্মীটি, অমন কোরো না। পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। তুমি এম এ পাস না করলে, সিএস পি হতে না পারলে, আমি মুশকিলে পড়ব। আমাদের বিয়েতে কাউকে রাজি করাতে পারব না। যে করেই হোক তুমি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হও।

তোমার অসুখের খবর পাওয়া অব্দি আমার মন ভালো নেই। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। আশা করি আমার অবস্থাটা তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করবে। জীবন যে শুধু লেকের ধারে কৃষ্ণচূড়ার নীচে কিম্বা ভাঙা মন্দিরের ছায়ার ঘুরে বেড়ানো নয়, কাঁচা রোমান্টিসিজম নয়—এটা যত শিগগির আমরা উপলব্ধি করতে পারি ততই মঙ্গল আমাদের জন্যে। জানি না, তুমি আমার এ চিঠি পেয়ে ক্ষুণ্ণ হবে কিনা। হলে আমি নিরুপায়। আমি চাই তুমি একটু প্র্যাকটিক্যাল হও। তোমার মেঘমহল থেকে মাটিতে নেমে এস তুমি। ভেব না আমি তোমাকে উপদেশ খয়রাত করছি। আমি সামান্য প্র্যাগমেটিক হতে চেষ্টা করছি মাত্র। ভালোবাসা।

শাকিলা

শাকিলার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছিল নাদিম। জ্বোরো চোখ নিয়ে বার কয়েক পড়ল সে চিঠিটা। চিঠিটার সুর যেন কেমন, নাদিম ভাবল। শাকিলাকে কিছুটা হেডমিস্ট্রেস হেডমিস্ট্রেস বলে মনে হয় নাদিমের। কী বলতে চায় শাকিলা? নিশ্চয়ই এটা শাকিলার মনের কথা নয়, নাদিম নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইল। জ্বরটা হয়তো বেড়ে গিয়েছে, নাদিমের মনে হল। থার্মোমিটার কোথায়?

প্যারাটাইফয়েডে নাদিম বেশ কয়েকদিন ভুগল। তাই এম এ পরীক্ষা দেয়া হল না ওর। শরীরটা একটু মজবুত হওয়ার পর নাদিম তার আম্মাকে জানাল যে, সে শাকিলাকে বিয়ে করতে চায়। তাহেরা খাতুন যখন তমিজউদ্দীন চৌধুরীকে ব্যাপারটা বললেন, তখন তিনি রীতিমতো গর্জে উঠলেন। পরীক্ষা না দেয়ায় তিনি পুত্রের প্রতি আগেই চটে ছিলেন, বিয়ের কথা শুনে তাঁর মেজাজ আরো তিরিক্ষি হয়ে গেল। এমন বেআক্কেলে কাণ্ড হয় আর। বিয়ে করবেন। বললেই হল আর কি। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। অর্থাৎ তমিজউদ্দীন চৌধুরী নাদিম ইউসুফের চোখে তাঁর অভিজ্ঞ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, বিয়ে করার মুরোদ ওর নেই। এসব বেহায়াপনা তিনি বরদাস্ত করবেন না। পরে অবিশ্যি তাহেরা খাতুনের অনুরোধে আর পুত্রের মায়ুসিময় চেহারার কথা ভেবে তিনি ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ বিয়েতে মত দিলেন।

কিন্তু ভাগ্য নাদিম ইউসুফের সঙ্গে মাজাকি করছিল। এক সন্ধ্যাবেলা জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী নাদিমকে ডেকে পাঠালেন তাঁর আফিস কামরায়। পুত্রের হাতে একটা এনভেলাপ দিয়ে বললেন, তোমার চিঠি। এখানেই পড়। এনভেলাপটা খোলা। নাদিমের আব্বাই খুলেছেন। চিঠিটা তিনি পড়েওছেন বলে মনে হল নাদিমের, আব্বা কাজটা ঠিক করেননি। অন্যের চিঠি পড়াটা এক ধরনের অপরাধ, এ-কথা আব্বার অজানা নয়। কথাটা সে, যদ্দূর মনে পড়ে, ওর আব্বার কাছেই শুনেছিল। অথচ আজ আব্বা জেনেশুনে অপরাধটা করলেন। নাদিমের চেহারায় বিরক্তি। চিঠিটা পড়ে নাদিম পাথরের মূর্তি। ওর বুকের রক্ত কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। শাকিলা আহমেদের চিঠি। নিজের চোখ দুটোকে নাদিম বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ চিঠি কি শাকিলাই লিখেছে? ভেবেচিন্তে লিখেছে? এই চিঠি পড়লে মনে হয় নাদিম ও শাকিলার

মধ্যে কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি, নাদিমের জন্য একরত্তি ভালোবাসাও নেই শাকিলার মনে। তবে কি এতদিন বোকার স্বর্গে বাস করছিল নাদিম? সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। নাদিম কিছুই দেখতে পারছে না। ওর চোখ ঝাপসা। ওর আব্বা তমিজউদ্দীন চৌধুরী একটা আগুনের গোলার মতো ঘূর্ণমান, চেয়ার টেবিলের যেন পাখা গজিয়েছে। ওর আব্বার অফিস কামরাটা যেন কোনো ঘর নয়, একটা মরুভূমি। একসময় টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল নাদিম। তারপর মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ওর আব্বাকে কিছু না বলে।

শাকিলা আহমেদ লিখেছে, সে যেন শাকিলাকে ভুলে যায়। নাদিমের সঙ্গে ভবিষ্যতে সে আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না, তার সঙ্গে ওর আর দেখা হবে না কোনোদিন। সাফ-সুতরো কথা। কাটা কাটা। সেন্টিমেন্টের বাষ্প মাত্র নেই। এ এক তেলেসমাতি রূপান্তর। শাকিলা এ-ও ঘটাতে পারল? জগৎ সংসারে কত কিছুই তো ঘটে। এতে তাজ্জব হবার কী আছে। মেনে নাও। কার কাছে নালিশ করবে? ঝগড়া করবে? ঝগড়া করবে কার সঙ্গে? আব্বার কাছে আজ বড়ো ছোটো হয়ে গেলে তুমি। এজন্যে তুমি ব্যথিত হতে পার, লজ্জিত হতে পার। তার বেশি আর কি-ই বা করতে পার তুমি। শাকিলার সঙ্গে রাগ করবে? কুৎসা ছড়াবে ওর নামে? কোনো ফায়দা নেই। ওতে তুমিই কষ্ট পাবে সবচেয়ে বেশি। যে প্রতিমা তুমি গড়ে তুলেছ তিল তিল করে তাকে ভেঙে ফেলে কী লাভ তোমার? প্রতিমার গায়ের খড়মাটি বেরিয়ে পড়েছে? পড়ুকগে। তুমি স্থির হও, ঠান্ডা মাথায় কাজ করো। তোমাকে অবশ্যই সংযত, সংহত হতে হবে। নাদিম, তুমি ছেলেমানুষি কারো না। শাকিলাকে দোষ দিও না। তোমার মতো একটা পরীক্ষাছুট ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে শাকিলা আহমেদ তার দামি জীবন চিরদিনের মতো জড়াতে যাবে কোন দুঃখে। তুমি এম এ পরীক্ষা দাওনি, তুমি সি এসপি হতে পারনি। তুমি তার যোগ্য নও। এ-কথা শাকিলা তোমাকে ঠোঁটকাটা ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে। ভালোই, শাকিলা তোমার সঙ্গে কোনোরকম ছলচাতুরি করেনি। ভালোই শাকিলা তোমার সঙ্গে ভকবাজি করেনি। সে তোমাকে চিরদিন একটা মিথ্যা করুণ সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দি করে রাখতে পারত। তা সে করেনি। বরং সে তোমাকে মোহমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। যা হকিকত তা-ই তুলে ধরেছে তোমার সামনে। নাদিম ইউসুফ, তোমার তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত শাকিলা আহমেদের কাছে। সেই শাকিলা যে খুব প্র্যাকটিক্যাল, যে বড়ো নির্ভাজ প্র্যাগমেটিক। বাস্তবের দয়িতা সে, তোমার না।

সে-রাতেই দিশেহারা নাদিম পাশের ঘর থেকে ওর আব্বার একটি বাক্য শুনতে পেয়েছিল। আব্বা যে এমন চোখা, রসোত্তীর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারেন, নাদিমের তা জানা ছিল না। আব্বার সঙ্গে সে কথাই বলত কম। আব্বা তাঁর ব্যবসায়ের তবিলদারি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর নাদিমের ছিল অন্যরকম তবিলদারি। অনেকটা রামপ্রসাদী—এতে টাকাকড়ির ঝনৎকার নেই, আছে শব্দের সময়-পেরুনো সংগীত। নাদিম শুনতে পেল, ওর আম্মাকে আব্বা বলছেন, 'তোমার নবাবজাদা ছেলের জন্য ঢাকা শহরের হগল মাইয়া ফুলের মালা লইয়া খাড়াইয়া আছে, বুঝলানি নাদিমের আম্মা!' জনাব তমিজউদ্দীন-উচ্চারিত বাক্যটিতে বোলতার রাগী হুল ছিল, কিছু কৌতুক ছিল।

আড়ালে হয়তো অবসাদ এবং বিষণ্ণতাও ছিল। পুত্রের পরাজয়ের জন্য বিষণ্ণতা। হয়তো শাকিলা আহমেদের চিঠি জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীর সযত্ন-লালিত অহমিকাকেও আঘাত করেছিল, পুত্রের পরাজয়কে হয়তো তিনি নিজের পরাজয় বলে সনাক্ত করেছিলেন।

আব্বার এই বাক্যটি শুনে নাদিম রাগ করতে পারত। কিন্তু করেনি। বরং নিজের ওপরই রাগ হল ওর। আব্বার সঙ্গে যেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আব্বাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে নাদিম, এম এ পরীক্ষা না দিয়ে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি শাকিলার ঐ চিঠিটা পেয়ে। তমিজউদ্দীন চৌধুরীর ছেলে এ ধরনের চিঠির প্রাপক হতে পারে না। তার পৌরুষ আহত হয়েছে। নাদিম ওর আব্বার সঙ্গে একটা সহমর্মিতা অনুভব করেছিল সে রাতে।

শাকিলাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল নাদিম। সে ভালোবাসায় প্রচুর উচ্ছলতা ছিল, কিন্তু কোনো খাদ ছিল না। নাদিম তার দিনগুলি, রাতগুলি উৎসর্গ করেছিল ওর দয়িতার প্রতি। সেই নিবেদনে ছিল বৈষ্ণব ও শাক্ত অনুভূতির মিশেল। সামিনাকে নাদিম ভালোবাসতে পারেনি, যদিও সামিনার প্রবল অনুরাগ ছিল ওর প্রতি। নইলে কেন সামিনা নিজেকে বারবার সমর্পণ করত নাদিমের কাছে? কেন সে তার শরীরে স্বেচ্ছায় শোষণ করে নিত নাদিমের যৌনঝটকা? আবার সিগারেট ধরাল নাদিম। নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করল খানিক। এখন এক কাপ চা হলে ভালো লাগত। এখান থেকে উঠতে ভালো লাগছে না। ধারেকাছে কেউ নেই। থাকলে নাজমাকে খবর পাঠাত। আপাতত শুধু সিগারেটই চলুক। একদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরে নাদিম দেখে ওর ঘরের কপাট আলগোছে লাগান। আস্তে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। চমকে উঠল নাদিম। চমকে উঠেছিল সামিনাও। সামিনা ওর ড্রেস চেঞ্জ করছিল। ওর গায়ে কোনো জামা ছিল না, শুধু ব্রা শাসন করছিল স্তন দুটোকে। আলগোছা শাড়ি। নাদিমের অস্তিত্বময় ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক। ঘরে ফিকে অন্ধকার। বাইরের একফালি আলো বিছানায়। ব্যাপারটা ঘটে গেল এক নিমেষে। নাদিম ঘরে ঢুকেই হুড়কো লাগিয়ে দিল। এগিয়ে গেল সামিনার দিকে। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। সামিনা বাধা দিল না। নাদিম ওকে বিছানায় নিয়ে গেল, সামিনার শাড়ি পড়ল মাটিতে, যেমন সাপের গা থেকে ঝরে পড়ে খোলস। ব্রা-র হুক খুলে ফেলে সে, ফিকে অন্ধকারে স্তনদ্বয় উন্মীলিত ফুল। যুগল ফুল নাদিমের মুঠোয় বিহ্বল, মৃদু আর্তনাদরত, সুখশিহরিত। সামিনার নগ্ন ঊরুতে বাইরের এক ফালি আলো লুটোচ্ছে। সামিনার ঊরু মেঘনার রূপালি মাছ। সামিনা নাদিমকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে।' 'এ কী করছ,' সামিনার গলায় কষ্ট পাওয়ার আওয়াজ। নাদিম বুঝল, ওর ভুল হচ্ছে। সামিনা চোখ বন্ধ করে সাহায্য করল ওকে। নাদিমকে বুকের উপর টেনে নিল সামিনা। দুই শিল্পীর মতো এক মোহন যুগলবন্দিতে ওরা তখন আন্দোলিত, ঝংকৃত—মীড়ে গমকে; ঝালায়।

নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সামিনা এখন কোথায়? নাদিম জানে না। জানার চেষ্টাও করেনি কোনোদিন। এটুকু জানে যে, সে পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন্ শহরে আছে তা' নাদিমের জানা নেই। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বাঙালি আছে। অনেকেই আটকা পড়ে গেছে সেখানে ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো। কেমন আছে সামিনা

এই উনিশ শো একাত্তরে? ও দেখতে কেমন হয়েছে এখন? বয়স বেড়েছে, আগের মতো তন্বী নেই আর নিশ্চয়ই। অবাঙালি স্বামীর ঘর করছে। একটা ছেলেও হয়েছিল। স্বামীর ঘর করছেত? সামিনা কি বেঁচে আছে? আছে, বেঁচে আছে, বেঁচে থাক। ওর ছেলের বয়স এখন কত? রাশেদের বড়ো না ছোটো ? নাদিম সন তারিখ ভালো মনে রাখতে পারে না। কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

সামিনা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। শত দুঃখ কষ্ট, শত বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে, বেঁচে থাকে। সহজে হাল ছাড়ে না। মানুষের সারভাইভ করবার ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষ মরতে চায় না, নব্বুই বছর বয়সের বুড়োও মরতে চায় না। বড়ো চাচা কি মরতে চান? এখনো যেরকম মাছের মুড়ো আর মুরগির রান চোষেন তা দেখলে একবারও মনে হয় না যে, তার জীবন -তৃষ্ণায় ভাটা পড়েছে। নাদিম নিজে অবিশ্যি একবার মরতে চেয়েছিল, শাকিলার শেষ চিঠি পাওয়ার পর। যে-চিঠিটা ওর আব্বা আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিলেন। অনেকগুলি ঘুমের বড়ি কিনেছিল সে। একটা বাহারি করুণা উদ্রেককারী চিঠির মুসাবিদাও করেছিল। অন্তিম চিঠি। কিন্তু শেষ অব্দি সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেনি। সিদ্ধান্ত পালটে ফেলেছিল। এজন্যে সে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়। বরং সময়মতো শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল বলে নিজের পিঠ চাপড়ে দিত মাঝে মধ্যে!

একসময়ে নাদিমের মনে হয়েছিল শাকিলাকে না পেলে সে বাঁচবে না। প্রথমদিকে ওর কাছে বেঁচে থাকাটা নিরর্থক মনে হয়েছিল। শাকিলাকে বাদ দিয়ে তার জীবনের কোনো প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায়নি নাদিম। নোঙরহীন জাহাজের অবস্থা হয়েছিল তার। মৃত্যু ওকে সুদর্শনা গণিকার মতো চটুল আমন্ত্রণ জানাত বারবার। সেই আমন্ত্রণে নাদিম সাড়া দিয়ে ফেলেছিল প্রায়। পরে নাদিম বুঝতে পারল শাকিলা আহমেদ নাম্নী তরুণীই জীবনের সবকিছু নয়। ক্লিশের মতো শোনালেও নাদিমের শেষ অব্দি মনে হয়েছিল যে, জীবন অনেক বড়ো। শাকিলা কি এতই অপরিহার্য তার জীবনে যে তাকে গেরস্থালীর ঘেরাটোপে আনতে না পারলে নিজেকেই ফৌত করে দিতে হবে? শাকিলা যে তার জীবনে অপরিহার্য নয়, এই সত্য উপলব্ধি করতে নাদিমের বেশি দেরি হয়নি।

আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, আত্মহননে আমার মুক্তি নেই, একদিন নিজেকে দৃঢ় কণ্ঠে শোনাল নাদিম। আমার স্বপ্ন আছে, সাধ আছে, কবিতার প্রতি ভালোবাসা আছে — এসবের মধ্যেই খুঁজতে হবে বাঁচার সার্থকতা। যতদিন আমার স্বপ্ন আছে, কবিতা আছে, ততদিন কোনো কিছুই আমাকে জীবন থেকে বিপথগামী করতে পারবে না। একমাত্র দুর্ঘটনা কিংবা ব্যাধি আমাকে হনন করতে পারে, কেউ আমাকে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করতে পারবে বলে মনে হয় না। নাদিমের মধ্যে জীবনতৃষ্ণা প্রবল। শুধু কিছুদিনের জন্যে এই তৃষ্ণা কমে গিয়েছিল। এই সাময়িক বিতৃষ্ণা তাকে আরো বেশি জীবননিষ্ঠ করে তুলেছে। নাদিম মরতে চায় না, আর চায় না বলেই সে তার প্রিয় ঢাকা শহর থেকে পালিয়ে এসেছে আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মীর মতো এই অজ পাড়াগাঁয়ে। পলাশতলীতে। শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারবে কিনা জানে না।

মাস্টার চাচা ঠিকই বলেছিলেন, 'এম এ পরীক্ষাটা দিলা না, পস্তাইতে অইব একদিন।' তাঁর এই বাক্যটি ধ্রুব পদের মতো ঘুরে ফিরে আসে নাদিমের মনে। হ্যাঁ, পস্তাতে তাকে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এম এ পাস করলে হয়তো শাকিলাকে হারাতে হত না। একেক সময় আবার মনে হয়, প্রেম কি কখনো কলেজ ভার্সিটির পরীক্ষা নির্ভর করে হয়? অবিশ্যি যুগটাই এখন পুরোপুরি বৈশ্যশাসিত। স্বর্ণের নাম সুন্দরী আর মাইনের নাম কার্তিক। কে লিখেছিলেন এই ধারালো পঙক্তি? অন্নদাশঙ্কর রায়? শাকিলা যদি প্রকৃতই নাদিমকে ভালোবাসত তাহলে সে নাদিমের পাস করা, সিএসপি হওয়া না হওয়ার ওপর কোনো গুরুত্ব দিত না। কোনো রকম সংস্কারই ওকে নাদিমের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত না।

এম এ পাস করলে, নাদিম ভাবে, হয়তো খবরের কাগজে কাজ করতে হত না। কোনো কলেজে একটা অধ্যাপনার চাকরি জুটিয়ে নিলে চলত। অধ্যাপনার দিকেই ঝোঁক ছিল নাদিমের। অধ্যাপক হতে হলে এম এ ডিগ্রি থাকতে'ই হয়। অবিশ্যি মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন শুধুমাত্র বি এ। অনার্সও ছিল না তাঁর। কিন্তু তা বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে তাঁর আটকায়নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তও এম এ পাস করেননি। কিন্তু তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হতে পেরেছিলেন। এজন্যে অবিশ্যি বুদ্ধদেব বসুকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। নাদিম ইউসুফ মোহিতলাল মজুমদার নয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তও নয়। তাই এম এ না হয়ে তার পক্ষে অধ্যাপক হওয়া অ্যাবসার্ড। কোনোরকম চেষ্টাও করেনি সে। অধ্যাপক হলে হয়তো সে চাকরিটা খানিক এনজয় করতে পারত। পড়াতে তার ভালোই লাগত বলে নাদিমের ধারণা। পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারত সারাক্ষণ। আবার এতো সত্যি যে, তার বন্ধু রাজীব আহসান কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দৈনিক পদাতিকে জয়েন করেছে। এমনিতে খবরের কাগজে কাজ করাটা খারাপ কিছু নয়। ভালো, বেশ ভালো। সাংবাদিকদের একটা আলাদা মর্যাদা আছে সমাজে।

কিন্তু দৈনিক পদাতিকে কাজ করতে নাদিমের ভালো লাগে না। প্রায় রোজই কলম ঠেলতে হয় নাদিমকে। সে একজন সহকারী সম্পাদক। তাই না লিখে তার গত্যন্তর নেই। রোজ দশ-বারো স্লিপ তো তাকে লিখতেই হয়—কখনো কখনো অনিচ্ছায়। তবে প্রায়শ অনিচ্ছার জুলুমই সইতে হয়। নাদিম নিরানন্দ মনে কাজ করে। অনেকে অবিশ্যি কাজ করে আনন্দ পান। যেমন পান তাঁর সহকর্মী দৈনিক পদাতিকের সহকারী সম্পাদক নঈম আহমেদ। প্রতি পদে দক্ষতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে না পারলে তিনি স্বস্তি পান না। কাজটা তাদের মনের মতোই বলে তাঁরা আনন্দিত মনে কাজ করতে পারেন। নাদিমের কাজ তার মনের মতো নয়। কাজের সঙ্গে বিবাদ তার লেগেই থাকে। কখনো বিরক্তি বোধ করে, কখনো রাগারাগি করে। নিজের সঙ্গেই। মনে মনে গজরাতে থাকে। একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু মন থেকে বিরাগ ঝেড়ে ফেলতে পারে না। কোনো কোনোদিন সে চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়, কলম ফেলে রাখে টেবিলেব ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে আবার হাতে তুলে নিতে হয় কলমটাকে। নইলে চাকরিটাই খোয়াতে হবে।

যদি সাহিত্যকর্মের প্রতি নাদিমের অনুরাগ না জন্মাত, যদি সে কবিতা না লিখত, তবে এই জীবিকার সঙ্গে হয়তো তার তেমন বিরোধ বাধত না। তখন হয়তো এ কাজ করে নাদিমও আনন্দ পেত। যে পেশায় নাদিম নিয়োজিত তা সাহিত্যের মহাশত্রু। নাদিম এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কলম চালাতে নাদিম ভালোবাসে। লেখার টেবিল তাকে প্রচুর আনন্দ জোগায়। সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে লেখার টেবিল ঘেঁষে বসতে। কিন্তু তাকে রোজ কয়েকটা ঘন্টা ধরে যা লিখতে হয় সেসব লিখতে সাধারণত তার রুচি হয় না। মিলিটারি ডিক্‌টেটর আইয়ুব খান আর ইয়াহিয়া খানের অবিরল গুণকীর্তন করতে কোন বাঙালির ভালো লাগে? কার ভালো লাগে তথাকথিত উন্নয়ন দশকের গীত গাইতে? নাদিমের 'প্রভু নয় বন্ধু' বইটির কথা মনে পড়ে, ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস্। এ বইয়ের ধারাবাহিক তরজমা বেরিয়েছিল দৈনিক পদাতিকে। সরকারি পত্রিকায় বেরুনোটাই স্বাভাবিক। ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস-এর তরজমা করার জন্যে নাদিমের বন্ধু এবং সহকর্মী কবি রাজীব আহসান অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। রাজীব সম্পাদক আবুল জামাল নাজিমুদ্দিনকে বলল, 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস-এর অনুবাদ আমাকে করতে দিতে হবে।' অনুবাদের জন্যে একটা আলাদা দক্ষিণা বরাদ্দ ছিল। রাজীব আহসান অবিশ্যি বেশ খেটেখুটে অনুবাদ করেছিল। ক্ষমতার ঝলক ছিল সেই অনুবাদে। ব্যাপারটা নঈম আহমেদ, শোয়েব চৌধুরী এবং নাদিম ইউসুফের ভালো লাগেনি। বাধ্য হয়ে কোনো কাজ করা এবং যেচে সেই কাজ করতে যাওয়ার মধ্যে একটা তফাত আছে বৈকি। গায়ে পড়ে কাজটা না করলেই কি রাজীবের চলত না?

নাদিমের নিজের হাতও অকলঙ্কিত নয়। ওকে লিখতে হয়েছে বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী অনেক কথা। আওয়ামি লিগ ও ছয় দফার বিরুদ্ধে তাকে কলম ধরতে হয়েছে। প্রগতিশীল আন্দোলনের বিপক্ষে কথার পর কথা সাজাতে হয়েছে নাদিম ইউসুফকে। এ কাজ সে স্বেচ্ছায় করেনি, বাধ্য হয়ে করেছে। না করে উপায় ছিল না। নাদিম অনেকবার পদত্যাগ করার কথা ভেবেছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা পত্র নষ্ট করে ফেলেছে। দৈনিক পদাতিকে কাজ করার গ্লানিবোধ থেকে সে কখনো মুক্ত হতে পারেনি।

তবে রাজীব আহসান, নঈম আহমেদ, শোয়েব চৌধুরী এবং নাদিম ইউসুফ যে সবসময় বাঙালি জাতির স্বার্থবিরোধী লেখা লিখেছে, তা নয়। সীমিত সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সতর্ক চোখের পাহারা এড়িয়ে প্রগতি ও মানবিক কল্যাণের সপক্ষে কলম চালিয়েছে। কখনো কখনো স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে কমবেশি লেখা লিখতেও দ্বিধা করেনি। যখন পূর্বপাকিস্তানে রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন বেশ জোরদার, তখন যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন, নাদিম স্মৃতিমগ্ন হয়। সরকারি পত্রিকা দৈনিক পদাতিকের পাতাতেই সরকারকে খোঁচা দিয়ে লিখেছে রাজীব আহসান। নাদিম ইউসুফ খাজা শাহাবুদ্দিনের ঘোষণার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে কয়েকটি কলাম লিখেছিল। শুধু একটুকু সান্ত্বনা ওদের।

॥ ৪ ॥

'বাথরুমে যাওয়া যায় না', ভোরবেলা নাজমা নাদিমকে বলল। বাথরুমের ব্যাপারে নাজমা একটু খুঁতখুঁতে। ভুল করে ফিনাইল আনা হয়নি। কোনোমতে জান নিয়ে পালানোই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে খুঁটিনাটি জিনিস মনে রাখা অসম্ভব। কত লোক কত কিছু ফেলে এসেছে, শুধু প্রাণ সম্বল করে পালিয়েছে দিগ্বিদিক। কেউ কেউ আবার লটবহরসুদ্ধই ছুটে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। তাই, পলাশতলীতে ফিনাইল না আনাটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। তবে এটা ঠিক, একটা বাথরুম এতজন ইউজ করলে দুর্গন্ধ তো হবেই। প্রচুর পানি ঢেলেও বিশেষ ফায়দা হয় না। তাছাড়া সকালবেলা বাথরুম করার জন্যে কিউ লেগে যায়। এ এক দারুণ অসুবিধা। অবিশ্যি কিছু দূরে একটা খাটা পায়খানা আছে। সেখানেও সেরে আসা যায়। খাটা পায়খানায় অনেকেই যেতে চায় না। কেউ কেউ পায়খানা চেপে রাখতে না পারলে খাটা পায়খানাতেই যায় শেষ পর্যন্ত। কী আর করা। এ এমন জিনিস যে ত্যাগ না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

বাথরুম করতে নাদিমেরও কষ্ট হয়। আসলেই বাথরুমে যাওয়া যায় না, এমন দুর্গন্ধ। নাড়িভুঁড়ি উলটে আসতে চায়। খাটা পায়খানার অবস্থা আরো খারাপ। দুঃসময়ে বাথরুম নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটাও অশোভন। তাই সবাই চুপচাপই থাকে। নাজমা নাদিমকে কথাটা না বলে পারেনি। পাছে কেউ কিছু মনে করে এটা ভেবে নাজমা অত্যন্ত গোপনে কথাটা বলেছে ওর স্বামীকে।

এখানকার বাজারে ফিনাইল পাওয়া যাবে না। কেউ ভৈরবে গেলে তাকে দিয়ে দু'টি ফিনাইল আনিয়ে নিলেই হবে। ভৈরবে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কী পাওয়া যাবে না? পাওয়া যেতে পারে। এত বড়ো বাজার, পাওয়া যাবেই। হঠাৎ নাদিমের কানে ভেসে এল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' গানটি আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হচ্ছে। এই গান নাদিম এর আগেও শুনেছে বার কয়েক। কিন্তু আজকের মতো এত ভালো লাগেনি কোনোদিন। রেডিওর চারদিকে গোল হয়ে বসেছে সবাই। খুব মন দিয়ে গানটা শুনছে। নাদিমের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। চশমাটা মুছল লুঙ্গির খুঁট দিয়ে। ওর চোখে পানি। কান্না ঠেলে ঠেলে আসছে ভেতর থেকে। কমবেশি সবাই একটা চাপা কান্না বয়ে বেড়াচ্ছে বুকের মাঝখানে। এই কান্না স্বদেশের জন্যে, সোনার বাংলাকে শ্মশান বানানোর মতলব এঁটেছে ওরা। ওদের থাবা এখন গ্রামেও প্রসারিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হানাদারদের হাতে বন্দি হয়েছেন। গোড়ার দিকে এ খবর কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। তাঁর ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, কেউ কেউ বলল। খবরের কাগজও নিয়ে এল। ছবি দেখেও কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না। বলল 'এই ছবি, খবর সবই বানোয়াট।' নাদিম ইউসুফও বানোয়াট ভাবতে চাইল। কারণ, এটা ভাবতেই ইচ্ছে হয়, ভালো লাগে। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে জানে, বুঝতে পারে যে, ছবি এবং খবর কোনোটাই মিথ্যে নয়। ওরা বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। সেখানে তাঁর বিচার হবে।

'বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করলে কী হবে, স্বাধীনতা যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেছে' জাভেদ কায়সার বলল। দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর। লীনা চুপচাপ বসেছিল। সে এবার মুখ খুলল, 'এই মুক্তিযুদ্ধে সবারই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, 'এ কথাটা বলার সময় লীনা নাদিমের দিকে তাকাল, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি।

'সবার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়,' তাহেবা খাতুন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন। হয়তো তিনি বুঝতে পেয়েছিলেন লীনা কী বলতে চায়। নাদিম চোখ নামিয়ে রাখে। কারুর দিকে তাকায় না। লীনা কী বলতে চায় তা নাদিমও বুঝতে পেরেছে। লীনা চায় ওর ভাইদের এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে নাদিম সম্পর্কে ওর প্রত্যাশা অনেক। নাদিম ইউসুফ, লীনার মতে, আর দশজনের মতো নয়। সে কবি আর সাংবাদিক। সমাজের সবচেয়ে সচেতন মানুষদের একজন। সে যদি এভাবে পলাশতলীর পুকুরপাড়ে গোরস্থানের আশেপাশে, বাজার হাটে ঘুরে ঘুরে সময় কাটিয়ে দেয়, আলস্য স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয, তাহলে অন্যেরা কী করবে?

নাদিম লীনার দিকে তাকায় না। পারিবারিক আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পা বাড়ায় বাইরের দিকে। ঘরের ভেতর কিছু অস্বস্তি লাগছিল ওর। খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ থাকতে পারলে অস্বস্তির ভার নেমে যাবে, নাদিম ভাবে। এই দুঃসময়ে কী করতে পারে নাদিম? নীরব দর্শক ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকার কথা সে ভাবতে পারে না। সে নির্বিবাদী মানুষ, কারো সাত-পাঁচে থাকে না। বইয়ের জগতেই ওর বসবাস। লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক আছে। লীনার কী প্রত্যাশা এ ধরনের একজন মানুষের কাছে? একচল্লিশ বছরের নাদিম ইউসুফ কি লড়াই করতে পারবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে? সে তো ভালো করে বন্দুকও ধরতে শেখেনি। লীনা হয়তো বলবে, তাতে কী? ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিলেই হয়। নাদিমের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ নয়। শরীর বেশ মজবুতই বলা যায়। ট্রেনিং পেলে নাদিম বন্দুক চালাতে পারবে, হাতবোমা ছুঁড়তে পারবে, ক্রল করতে পারবে, পারবে গেরিলা হামলা চালাতে। দু'চারজন হানাদারকে তো খতম করতে পারবে। হয়তো তার বেশিও পারবে।

নাদিম পুকুরপাড়ে এসে বসল। জায়গাটা ভালো লাগে ওর। চারদিকে জ্যোৎস্নার মায়াবি জাল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল, কিন্তু তখুনি ধরাল না। দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে রাখল আলগোছে। আমি রাজনীতি-করা লোক না, আমার পক্ষে চট করে লড়াই করা মুশকিল। আমি মোটেই লড়াকু নই, নাদিম স্বীকার করে। তবে রাজনীতি সম্পর্কে আমি ভাবি, এ বিষয়ে কিছু পড়াশোনাও করেছি। ব্যস, এই পর্যন্ত। সক্রিয় রাজনীতিতে কখনো জড়িয়ে পড়িনি। আমার কি কোনো দর্শন আছে? আমি কি কোনো পার্টিকুলার দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী?

আমি মার্কসবাদী নই। রাজীব আহসান মার্কসবাদী। রাজনীতি সে ভালো বোঝে। স্বদেশের প্রতি টান ওর কারুর চেয়ে কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে রাজনীতি করেছে, পরেও রাজনীতিচ্যুত হয়নি। তবে কখনো ভুলও করেছে রাজীব। ভুল কে না করে? আমি ফান্ডামেন্টালিস্ট না। আমি চাই, দেশে গণতন্ত্র কায়েম হোক। সর্ব মানবের কল্যাণ

হোক। আমি নিজেকে, নাদিম স্বগতোক্তি করে, লিবার‍্যাল হিউম্যানিস্ট মনে করি। অন্তত বছর দুয়েক আগে তা-ই মনে করতাম। এখন লিবার‍্যালিজম নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করি না। লিবার‍্যালিজমের কথা বললেই সতেরো শতকের শেষ পাদের ইউরোপের কথা মনে পড়ে। লীনা এখনো কি কোনার ঘরটায় বসে আছে? নাকি বারান্দায় এসেছে জ্যোৎস্না দেখার জন্যে? বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সতেরো শতকের শেষ পাদ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতায় লিবার‍্যালিজমের নিশান উড়েছে সগৌরবে। কেউ বলবে না কোনো কুমতলব নিয়ে এই দার্শনিক মতবাদের জন্ম হয়েছিল। মধ্যযুগের চেহারাটা একবার ভাবা যাক। তখন সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের জঙ্গী রোওয়াবে টেকাই মুশকিল। তখন ব্যক্তি মানুষের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; এই পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে লিবার‍্যালিজমের জন্ম হয়। কিন্তু এই দার্শনিক মতবাদের গলদ ধরা পড়তে বেশি দেরি হল না। আম্মা রান্নাঘরে গেলেন হয়তো, নাজমা সেখানে আগে থেকেই আছে। হাসান জামিলের স্ত্রী আছে। বলশালীরা তাদের মাসল দেখিয়ে জোর-জুলুম করে বেঁচে বর্তে থাকবে আর দুর্বলেরা কর্পূরের মতো উবে যাবে—এ নীতির ভিত্তি কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে গ্রাহ্য হতে পারে না। সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে—রুমা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েনি তো? তানজিম ওর মায়ের কাছে না স্মিতার সঙ্গে বসে গল্প করছে। সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে যে, ভদ্রতা, সংস্কৃতি, নীতিপরায়ণতা মনুষ্য সমাজকে বসবাসযোগ্য করে তোলে। সেই সমাজই সভ্য বলে গ্রাহ্য, যে সমাজে শক্তিধরদের নয়, দুর্বলের অধিকার সবার আগে স্বীকৃত। দাঁত-নখ-বের করা প্রতিযোগিতাকে বাদ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার স্নিগ্ধ পথে এগিয়ে গেলেই আমরা সভ্য মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে পারি। আজ বেঁচে যাই তা'হলে। এই সত্যটিকে পাত্তা দেওয়া হয়নি বলেই লিবার‍্যাল দর্শন ভীষণ এক গাড্ডায় মুখ থুবড়ে পড়ল। ইদানীং লিবার‍্যালিজমের নাম মুখে তেমন আনি না আর। ভৈরবে ফিনাইল পাওয়া যাবে তো? নাজমা ঠিকই বলেছে, বাথরুমে আর যাওয়া যায় না। ঢাকা কেমন আছে এখন, লিবার‍্যালিজম কথাটাই যেন কেমন মিনিংলেস হয়ে গিয়েছে। এই বিরূপ বিশ্বে লিবার‍্যালিজমকে পঙ্গু ও ইমপোর্টেন্ট ব্যক্তির মতো মনে হয়। কত লোক এখান থেকে সীমান্তের ওপারে গেছে? অনেকেই গেছে। উদ্বাস্তু শিবিরে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ডায়েরিয়া, কলেরা। যিনি লিবার‍্যাল তিনি খুবই অসহায়। তার ওপর আঘাত আসে সব দিক থেকে। ডানপন্থী, বামপন্থী, উভয়পন্থীদের হাতেই লিবার‍্যাল ব্যক্তি নাকাল হয়। লিবার‍্যাল ব্যক্তি চরমপন্থীদেরও বিপক্ষে হাত তুলতে নারাজ। কিন্তু চরমপন্থীরা তাকে স্পেয়ার করেনা, ছেড়ে কথা বলে না। এমন কি তাকে জীবনের তল্লাট থেকে ভিক্ষুকের মতো তাড়িয়ে দিতেও কসুর করে না। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা লিবার‍্যাল ছিলেন। ওরা খুন হলেন পাক পশুদের হাতে। লিবার‍্যালরা এভাবেই মার খান বারবার।

নাদিম ইউসুফ হাঙ্গামা-হুজ্জত থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। আসলে সে শান্তিবাদী মানুষ। কিন্তু পাকসেনারা ওর ধ্যান-ধারণাকে পালটে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন হানাদারদের তাণ্ডবলীলায় এদেশের শহর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, তখন শান্তির বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতোই বটে। এখন নাদিমও মূলত যে

যুদ্ধবিরোধী বুদ্ধিজীবী, বিশ্বাস করে যে, বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। বন্দুক ধরতে না পারলে মাতৃভূমিকে রাহুমুক্ত করা যাবে না। নাদিম অবিশ্যি বন্দুক ধরতে জানে না, ওর পক্ষে জানা সম্ভবও নয় কখনো। অন্যেরা ধরবে। নাদিম সেসব তরুণ তরুণীর কথা ভাবছে, যারা নতুন সমাজ গড়ার নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এদের শিরায় শিরায় গুঞ্জরিত হচ্ছে নতুন যুগের গান। অতীতের প্রেতায়িত, প্রতিধ্বনিময় এক অলীক জগতের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে এরা দাঁড়িয়েছে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। এদেশকে তার আপন বলে জেনেছে, ভালোবেসেছে এর প্রতিটি ধূলিকণা। আরব কিম্বা পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশ থেকে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা এসেছেন, এ সংবাদ রটিয়ে তারা পুলকিত বোধ করে না। বরং তারা মনে করে, তাদের আত্মিক শেকড়-বাকড় মধ্যপ্রাচ্যে নয়, এই বাংলারই শ্যামল মাটিতে ছড়ানো। তাই এদেশের আকাশে যখন মেঘের পর মেঘ করে আসে, মেঘনার উদ্দাম বুক পাল তোলা নৌকা চলে দাঁড়ের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, রৌদ্র ঝলসে ওঠে ফসলের মাঠে কিম্বা রাঙা মাটির পথে, চারণভূমিতে, যখন বৃষ্টি নামে তিমিরনিবিড় রাতে, তখন তারা প্রাণের সবদেশকে খুঁজে পায় তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এদের অনুরাগ অপরিসীম, এদেশের সংস্কৃতির প্রতি এদের শ্রদ্ধা অবিচল। এ সমাজকে তারা গভীরভাবে ভালোবাসে বলেই এর নতুন রূপের স্বপ্ন দেখে। এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে রয়েছে তাদের প্রাণের গভীর সংযোগ। জনগণকেই এরা শক্তির উৎস বলে মনে করে। সমাজ ও দেশকে বদলাবার ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছে এরা। এদেরই পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে বাংলার দিগন্তে দিগন্তে।

নাদিম সিদ্ধান্ত করল যে সে সীমান্তের ওপরে যাবে, শরিক হবে মুক্তিযুদ্ধে। কোনার ঘর থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল চোখ নামিয়ে। লীনার দিকে সে তাকাতে পারেনি। এখন থেকে সে আর চোখ নামিয়ে রাখবে না। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে হাঁটবে সে। নাজমা ওরা এখানেই থাকবে। হয় ঢাকায় নয়তো পলাশতলীতে। এ-কথা মনে হতেই একটু দমে গেল নাদিম। এদের কী হবে? এক ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে এদের রেখে চলে যেতে হবে। সে হয়তো ভারতে নিরাপদেই থাকবে। এরা? নেকড়েদের ভিড়ে এদের রেখে চলে যাব একা একা? এই প্রশ্ন নাদিমকে বিচলিত করে। সিগারেট ধরাল নাদিম। সন্ধ্যাবেলা থেকে এ নিয়ে চারবার। ধোঁয়া ছাড়ল। দেশলাইটা হাত থেকে মাটিতে পড়ল। ওটা কুড়িয়ে নিল পরমুহূর্তেই। এ সময়ে একটা দেশলাইকেও অবহেলা করা চলে না। মানিব্যাগের প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে। এখন একটি পয়সাও মূল্যবান। দেশলাইয়ের একটি কাঠিও দামি। আস্তে আস্তে মানিব্যাগ হালকা হয়ে আসবে, যদি এখানে বেশিদিন থাকতে হয়। যেখানেই থাকি না কেন, নাদিম ভাবে, টাকা ফুরিয়ে আসবে ক্রমান্বয়ে। তখন টাকা পাব কোথায়? আম্মারও পুঁজিও বেশি নেই। একমাত্র ভরসা হাসান জামিল। সে হিসেবি আর সফল ব্যবসায়ী। জাভেদ কায়সার এখনো স্ট্রাগলিং ব্যারিস্টার। পসার তেমন জমেনি। তাই বলে একবারে ব্রিফলেসও নয়। হঠাৎ যেন জ্যোৎস্না নিভে গেছে, নেমে এসেছে অন্ধকার, নাদিমের মনে হল। শুধু ওর সিগারেটের আগুন জোনাকির মতো জ্বলছে। আসলেই কি জ্যোৎস্না উধাও, না ওর দৃষ্টিবিভ্রম। এইতো আবার জ্যোৎস্না ফুটেছে। মরা জ্যোৎস্না। মরা জ্যোৎস্নায় গোরস্তানকে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হচ্ছে। কী

শান্তিতে ওরা ঘুমিয়ে আছেন মাটির নীচে। মৃত্যু কি এই মরা জ্যোৎস্নার মতো ? মৃত্যুর মধ্যে একটা বিরাট 'না' ব্যাপ্ত হয়ে আছে। একটা নবজাতক চিৎকার করে পৃথিবীতে তাদের আগমন বার্তা ঘোষণা করল, আস্তে আস্তে বেড়ে উঠতে লাগল। শৈশব থেকে কৈশোর ছুঁয়ে যৌবন। তারপর প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং সবশেষে মৃত্যু। চির অবসান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কত হৈ-হুল্লোড়, হাঙ্গামা-হুজ্জত, সংসারের ঝামেলা, টাকা থাকা না থাকার ভাবনা, বাড়ি বানানো না বানানোর চিন্তা, চাকরিতে গ্রেড থেকে গ্রেডান্তরে পৌঁছানোর রেস, ব্যবসায়ে তেজী মন্দা, ছেলেমেয়ের ঝক্‌কি-ঝামেলা, বিয়ে-শাদি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা; দ্বিধা দ্বন্দ্ব, হাইপারটেনশন, বাতের ব্যামো, ডায়াবেটিস; হাঁপানি; নাভিশ্বাস ওঠা; পথে বসা। করবে যারা শুয়ে আছেন তাদের আর কোনো চিন্তাভাবনা নেই। অসুখ-বিসুখ নেই। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। কোনোরকম দায়-দায়িত্ব নেই। বেঁচে থাকার জন্যে, দু'মুঠো অন্নের জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলম ঠেলার প্রয়োজন নেই। কোনো বাতেলা, বাকতাল্লা নেই; বাকওয়াস নেই। ভককিবাজি, গব্‌বাবাজি নেই। প্রাণের দায়ে ঢাকা থেকে পালাবার প্রয়োজন নেই। চাকরিতে আবার যোগ দেব কি দেব না, মুক্তিযুদ্ধে যাব কি যাব না—এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কেউ তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না। এখন সবকিছুরই পরপারে ওঁরা।

সিগারেটে ছোটো টান দিয়ে নাদিম ভাবে, আব্বার ডেড বডি এই মসজিদের সামনে রাখা হয়েছিল। ঢাকা থেকে মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর ডেডবডি পলাশতলীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁর এরাদা অনুসারে। ফুলবাড়িয়া স্টেশনে জড়ো হয়েছিল ওরা সবাই। হাসান জামিল, নাদিম, শাহেদ আখতার এবং আরো অনেকে। জাভেদ কায়সার ছিল না। ও তখন বিলেতে, লিঙ্কনস ইনে পড়াশুনা করছে আব্বার দিলি খায়েশ পূর্ণ করার জন্যে। আব্বা চেয়েছিলেন ওর একজন ছেলে ব্যারিস্টার হোক। তাঁর সাধ পূর্ণ হবার আগেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। মরহুম তমিজউদ্দীনের ডেডবডি নিয়ে শুরু হল ওদের ট্রেনযাত্রা। এপ্রিল মাস। ভ্যাপসা গরম। বেশি করে চায়ের পাতা দেয়া হয়েছে কফিনের ভেতরে। এবার ওরা মেথিকান্দায় না নেমে ভৈরবে নামল। আকাশে মেঘের জটলা। কালো মোষের চামড়ার মতো মেঘ। জোর হাওয়া বইছে। মাঝি নৌকা ছাড়তে রাজি নয়। অথচ এখন নৌকা না ছাড়লে মুশকিল। বিকেল। একটু পরেই সন্ধ্যা। লাশ বেশিক্ষণ এভাবে রাখা যাবে না। উচিত নয়। এপ্রিল মাস। ভ্যাপসা গরম। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বেশি ভাড়া দেয়ার কড়ারে মাঝিকে আখেরে রাজি করান গেল। ফাহিম সাদেক, নাদিমের বড়ো ভাই, পলাশতলী থেকে আগেই ভৈরবে এসে পৌঁছেছিল। ফাহিম সাদেক পলাশতলী স্কুলের শিক্ষক। জনপ্রিয় শিক্ষক। মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর কথামতো তাঁকে এই চাকরি নিতে হয়েছিল। দেশবাড়ি খালি পড়ে থাকবে, নাদিমের আব্বা তা চাননি। ফাহিম সাদেক তখন বেকার। কোনো কিছুই করছিলেন না। তাই তমিজউদ্দীন চৌধুরী ফাহিম সাদেককে সপরিবারে পলাশতলীতে পাঠিয়ে দিলেন, একটা চাকরিও জুটিয়ে দিলেন স্কুলে। ফাহিম সাদেকের তদারকিতে ডেডবডি নৌকায় ওঠানো হল। আকাশে ঘন কালো মেঘ, মাঝেমাঝে বিদ্যুচ্চমক, কফিন, বুক ঠেলে আসা কান্না; গলায় কী একটা দলা, ফোলা ফোলা লালচে চোখ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লাশীরিকা ..... মাঝির বৈঠা,

লগি, ছই, পানির ছলছলানি; মেঘনার ফোঁস-ফোঁসানি; ঝড়ের মুখে ঘাট ছেড়ে নৌকাযাত্রা—শোকার্ত মুহূর্তেও নাদিমের কাছে পুরো ব্যাপারটা একটা পরাবাস্তব কবিতার মতো মনে হয়েছিল। এরকম ঢেউ মেঘনার বুকে এর আগে আর কখনো দেখেনি কেউ। পাশাপাশি চলেছে দুটো নৌকা। উথালপাতাল ঢেউয়ের ওপর নৌকাযুগলকে দেশলাইয়ের খোলের মতো লাগছিল। যে নৌকায় তমিজউদ্দীন চৌধুরীর কফিন, সে নৌকায় নাদিম ছিল না। পাশের নৌকা থেকে সে দেখছে কফিনটাকে। কতবার এই মেঘনা নদী পাড়ি দিয়েছেন আব্বা, নাদিম ভাবে। আজও চলেছেন তিনি নৌকায় চড়ে, মেঘনার বুক চিরে। কিন্তু আজ তাঁর পরনে নেই সাদা ভয়েলের পাঞ্জাবি কিম্বা শেরওয়ানি। আজ তাঁর শরীর সাদা কাফনমোড়া, চায়ের পাতার গন্ধে ভরা। তিনি আজ একটা কফিনের ভেতর ঘুমন্ত, চলেছেন তাঁর বাপ-দাদার ভিটায়, তাঁর প্রিয় পলাশতলীতে।

এই এখানেই নামানো হয়েছিল তার কফিন। যখন কাফন খুলে তার মুখ সবাইকে দেখানো হয়, তখন কান্নার সে কী রোল। নাদিমের গলায় আবার নতুন করে কী একটা দলা পাকিয়ে উঠল, বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল ওর। রুমাল দিয়ে চশমা মুছল। আব্বার মুখ আর কোনোদিন দেখবে না, এই শেষবারের মতো দেখে নাও, যার ইচ্ছে-চশমা পরতে পরতে ভাবল নাদিম। জাভেদ কায়সার তো এই শেষ দেখাটুকুও দেখতে পেল না। আব্বাকে সে কতদিন দেখে না। ওকে এখনো তমিজউদ্দীন চৌধুরীর মৃত্যুর খবর পাঠানো হয়নি। ওর পরীক্ষা চলছে। এই মুহূর্তে খবর পাঠানোটা সমীচীন হবে না। পরে পাঠালেই চলবে। জাভেদ অবশ্য দারুণ শক্‌ড হবে। কিন্তু কী করা যায়। চিঠিটা হয়তো শেষ পর্যন্ত নাদিমকেই লিখতে হবে.। বাড়ির সবাই তাই এক্সপেক্ট করে। কারণ নাদিম লেখে। তাই এই দায় তারই বহন করা উচিত। আব্বার মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন পরে জাভেদকে নাদিম চিঠি লিখেছিল। ততদিন জাভেদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়েছিল কি? বোধহয় শেষ হয়নি। তার আগেই সেই চিঠি লেখা হয়েছিল। খবরটা জাভেদকে জানাতে খুব বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে বলেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে, এখন ওকে চিঠি পাঠানো দরকার। আর দেরি করা ঠিক হবে না। জাভেদ ছেলেমানুষ নয়। সে ম্যাচিউর। সে সামলে নিতে পারবে। বিদেশে জাভেদ একা। তার সেই একাকীত্বে আব্বার মৃত্যুসংবাদ তাকে আরো বেশি একা করে দেবে। গোড়ারদিকে সে ভেঙে পড়বে। শেষতক সামলে নিতে পারবে নিজেকে। নাদিমও তো ম্যাচিউর। একচল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে ওর। বয়েস বেশি হলেই যে ম্যাচিউরিটি আসে, এমন নয়। নাদিমের মানসিক গড়নে এখন ম্যাচিউরিটির ছাপ। তবু সে মুসড়ে পড়েছে। ভীষণ ভেঙে পড়েছে ভেতরে ভেতরে। ওর পরিণত মানসিকতাতো নাদিমের কান্না থামাকে পারছে না। বার বার মুছতে হচ্ছে চোখ আর চশমা। নাদিম জানে, মৃত্যু অনিবার্য। যে একবার জন্ম নিয়েছে মরতে তাকে হবেই, মৌতের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। আব্বা হলে বলতেন মালেকুল মৌত। মৌতের অনিবার্যতা জেনেও নাদিম ওর আব্বার মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি। লাইফ ইজ শর্ট, আর্ট ইজ লঙ, সেই কবে সে পড়েছিল। সব কিছুই আব্বার মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে নাদিমকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

একবার আব্বার সঙ্গে, নাদিমের মনে মড়ে, মৃত্যু সম্পর্কে সামান্য আলোচনা হয়েছিল। আসলে সে আলোচনা করছিল আম্মার সঙ্গে। আম্মার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করত এক সময়। তর্কও করত মাঝে মাঝে। এখন নাদিমের সেই প্রবণতা কমে গিয়েছে। ওদের আলোচনার মাঝখানে জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী এসে পড়েছিলেন। আলোচনা চলছিল মৃত্যু সম্পর্কে। পাপপুণ্য বিষয়ে কিছু কথা এর আগে হয়ে গিয়েছিল। নাদিমের প্রতিপাদ্য ছিল যে, মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই। দোজখ বেহেশ্‌ত ইত্যাদি মনগড়া গল্প। অবিশ্যি এই গল্পের প্রতীকী মূল্য সে স্বীকার করে। কিন্তু মৃত্যুর পর সব শেষ। ডেড ফুলস্টপ। পূর্ণ দাঁড়ি। ডাস্ট আনড্ ডাস্ট। মাটির শরীর মাটিতেই মিশে যায়। সেই মাটির আর গোশত-হাড় হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী পুত্রের এই সিদ্ধান্ত তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দিলেন। সেদিন তার মেজাজ ভালোই ছিল, নইলে তিনি কোনো আলোচনার ধারই ধারতেন না। পুত্রকে ধমকে দুরস্ত করে দিতেন। এসব বেদীনী কথায় কান করতে তিনি আদৌ উৎসাহী নন। এসব নাসারা কথা শুনলেও গুনাহ হয়।

বেহেশ্‌ত-দোজখ বিষয়ক চলতি পপুলার গল্পগুলিকে খণ্ডন করতে চেস্টা করছিল নাদিম। কিন্তু ওর আব্বা তা হতে দিলেন না। নাদিম বেহুদা পণ্ডিতি ফলাচ্ছে, এসব কুশিক্ষার ফল, খ্রিস্টান লেখকদের বই পড়ে পড়ে ওর ছেলের মাথাটা শয়তানের কারখানা হয়ে গেছে, ইত্যাদি কথা বলে নাদিমকে থামিয়ে দিলেন। নাদিম কথা বলার সুযোগ পেল না আর। তাহেরা খাতুন চুপচাপ বসেছিলেন। একটি কথাও বলেননি। তিনি পুত্রের এসব কথা মেনে নিতে পারেন না, তাবলে তিনি নাদিমের কথা শুনে অসন্তুষ্টও হন না। এসব কথা বলিস না নাদিম, গুনাহ হবে, বড়োজোর একথা বলতেন। তবে কি তিনি নাদিমকে এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দিতেন? না। পুত্রের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিতেন একটি কি দুটি ছোটো বাক্যে। তাঁর ধরনই এই। আস্তে আস্তে কথা বলেন, অন্যের কথা শোনেন। অন্যপক্ষের যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে, এটা তিনি স্বীকার করেন। ওর কথা মেনে নেয়া কিংবা না নেয়ার অধিকার যেমন আমার কাছে, তেমনি ওর মন প্রকাশেরও অধিকার আছে। তাই আলোচনার সময় তাহেরা খাতুনের কণ্ঠস্বরের পর্দা কখনো চড়ত না। ওর আম্মা, নাদিম ভাবে, বেশি পড়াশোনা করেননি। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু তার চিন্তাভাবনার মান বেশ উঁচুই বলতে হবে। অনেক স্বচ্ছ আম্মার মন। এই ধর্ম ছাড়া অনেক বিষয়েই ওর মতের সঙ্গে আম্মার মতামতের সখ্য আছে। আম্মার মধ্যে কখনো কখনো মুক্তবুদ্ধির স্ফুরণ নাদিম লক্ষ করেছে। তিনি তো বইপত্র বেশি পড়েননি। অবিশ্যি সংবাদপত্রের মনোযোগী পাঠিকা তিনি। কিছু নাটক-নভেলও পড়েছেন। এই মুক্তবুদ্ধির ঝিলিক আসে কোত্থেকে? যে সমাজের অধিকাংশ লোক এখনো মধ্যযুগে বসবাস করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ডিগ্রিধারী হয়েও যারা পড়া-পানি, তাবিজ-তাগা অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়, সে, যে-সমাজে তাহেরা খাতুনের বিচার বিবেচনা, তা সে যতই সীমিত হোক, নাদিমকে বিস্মিত করে। এখনো আমাদের সমাজে মুক্তবুদ্ধির প্রকৃত বিকাশ হল না। একটা নতুন জেনারেশন অবিশ্যি গড়ে উঠেছে, যারা প্রগতির সপক্ষে। কিন্তু সংখ্যায় তারা নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়; সাত কোটি লোকের মধ্যে ওরা কজন?

নাদিম নামাজ পড়ে না বলে ওর প্রতি জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী অসন্তুষ্ট ছিলেন। একবার তিনি এত রেগে গিয়েছিলেন যে নাদিম নামাজ পড়া শুরু না করলে তিনি নাদিমের বাসায় যাবেন না, গেলেও সেখানকার খাদ্যবস্তু গ্রহণ করবেন না। এতে নাদিম মর্মাহত হয়েছিল। মনে মনে সে-ও জেদি কম নয়। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীরই সন্তান সে। নাদিম নামাজ পড়া শুরু করেনি। ওর আব্বা নাদিমের বাসায় আসা ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবে মাস দুয়েক কাটল। হঠাৎ তানজিম অসুস্থ হয়ে পড়ল। তানজিমের অসুখের খবর শুনে ওর দাদা তার পণ ভাঙতে বাধ্য হলেন। তানজিমকে দেখতে গেলেন তিনি। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীকে দেখে সবাই খুশি। স্মিতা ওর দাদার জন্যে আম কেটে আনল একটা প্লেটে। কী আর করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আম খেতেই হল তাঁকে। তিনি আম শখ করে খান বলে নয়, স্মিতা আঘাত পাবে ভেবে। তখন স্মিতার খুশি দেখে কে? সেই দৃশ্য দেখে নাদিমের চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

মরা জ্যোৎস্নায় নাদিমের চোখ ঝাপসা হয়ে এল এই পুকুরঘাটে। ওর চোখের নার্ভগুলো কি দুর্বল হয়ে পড়েছে? বার বার পানি এসে যায় কেন? চোখটা ডাক্তারকে দেখানো দরকার। কিন্তু এখানে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ভালো ডাক্তার পাবে কোথায়? চশমাটা ভালো করে মুছে আবার পরল নাদিম। মসজিদ থেকে নেমে কে যেন বড়ো চাচার বাড়ির দিকে গেল। নাদিম ঠাওর করতে পারল না। বড়ো চাচা কী করছেন এখন? জিকির করছেন? এখনো কি করেন? শরীরে কুলোচ্ছে? আগে বড়ো চাচার জিকিরের আওয়াজ অনেকদূর থেকে শোনা যেত। জজবার ব্যাপারে তাঁর একটা খ্যাতি আছে।

শরীর ক্লান্ত তবু ঘুম আসছে না নাদিমের। আজ গরম একটু বেশি মনে হচ্ছে। স্মিতা এপাশ-ওপাশ করছে। তানজিমও ছটফট করছে। ঘুমোচ্ছে রাশেদ আর রুমা। নাজমা হাতপাখা দিয়ে কখনো ওদের হাওয়া করছে, কখনো নাদিমকে। নাদিম অবিশ্যি মুখে বলেছে, 'থাক, আমার হাওয়া লাগবে না।' কিন্তু হাওয়া খেতে ভালো লাগছিল ওর। নাজমা একটানা হাওয়া করে চলেছে অনেকক্ষণ। নাদিমের খারাপ লাগে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর যদি রাতেও ঘুমোতে না পারে নাজমা, তাহলে শরীর টিকবে কী করে? নাজমাকে সব কাজ একা করতে হয় না। আম্মাতে আছেনই সব সময়, আরো কেউ কেউ আছেন। সকাল বেলায় নাস্তা, দুপুরের খাওয়া; বিকেলের নাস্তা; রাতের খাওয়া; তার ওপর ঘন ঘন চা—যথেষ্ট খাটুনির কাজ। নাজমাকে মাঝে-মাঝে মশলাও বাটতে হয়েছে। মশলা বাটতে অভ্যস্ত নয় নাজমা। ইউনুসের মাকে ওরা ঢাকায় রেখে এসেছে। ফাহিম সাদেকের বাসায়। তাড়াহুড়োর মধ্যে মৃত্যুভয়ের আতঙ্কিত বিহ্বলতার মধ্যে নাদিম ইউনুসের মার কথা একবারে ভুলে গিয়েছিল। ওকে পলাশতলীতে নিয়ে আসার কথা মনেই হয়নি নাদিমের। এতদিনের পুরোনো পরিচারিকা। আপন মানুষের মতো হয়ে গিয়েছে। অথচ ওকে ফেলে এসেছে ঢাকা শহরে। নাজমাও কিছু বলেনি। নাজমাতো নাদিমকে বলতে পারত। ইউনুসের মা তানজিম, রাশেদ আর রুমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। প্রচুর দেখভাল করেছে ওদের। এমন একটা মানুষকে কিনা ফেলে এসেছে ঢাকায়। মানুষ কী স্বার্থপর! নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল নাদিমের। পলাশতলীতে

পৌঁছে অবিশ্যি নাজমা নাদিমকে ইউনুসের মার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। নাজমা বলেছিল, কাজটা ভালো হয়নি। আমার মনে হয়, ইউনুসের মার ইচ্ছে ছিল আমাদের সঙ্গে আসে। বাচ্চাদের ছেড়ে সে থাকতে পারেনা। বাচ্চারাও ওর ন্যাওটা।

কাজটা বাস্তবিকই ভালো হয়নি। নাদিম হাতপাখাটা নাজমার হাত থেকে নিতে চায়। এতক্ষণে নাজমার হাত নিশ্চয়ই ব্যথা করছে। ওর একটু রেস্ট নেয়া দরকার। 'দাও পাখাটা আমাকে দাও। পরে আবার কোরো,' নাদিম বলল। নাজমা সহজে রাজি হয় না। প্রায় জোর করেই হাত পাখাটা নিল নাদিম। এই সামান্য পাখা চালনাটাও কম কষ্টের কাজ নয়। কিছুক্ষণ হাওয়া করার পর হাত অবশ হয়ে আসতে চায়। আব্বার অসুখের সময়, নাদিমের মনে পড়ে, আব্বার মাথায় প্রায় সারারাত পাখা করত সে। কত রাত নাজমাও পাখা করেছে। স্মিতা এখনো জেগে আছে। ও নাজমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আম্মা, আমি বাইরে যাব।' বোধ হয় ওর বাথরুম পেয়েছে।

নাজমা হ্যারিকেনের সলতেটা উসকে দিল। তারপর মা ও মেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাত অবিশ্যি বেশি হয়নি। নাদিম হাতপাখাটা ঘোরাতে থাকে। কখনো তানজিম, বুমা আর রাশেদকে হাওয়া করে, কখনো নিজেকে। বেশিক্ষণ ওদেরই করে। হঠাৎ কিছু শব্দ নাদিমের মনে ফুটে উঠল, যেন অন্ধকারে একটি কি দুটি তারা। শব্দগুলি ঝিকমিক করছে। বহুবার এরকম হয়েছে নাদিমের কবিতা লেখার আগে। তাহলে কবিতার টোকা পড়েছে ওর মনের কপাটে? হয়তো। একটা বাক্য আসি-আসি করেও আসছে না। এইতো এসে গেল, একটা সুর ছড়িয়ে পড়ল নাদিমের শিরায় শিরায়। তারপর আরেকটি বাক্য। কী করে এল? এই মুহূর্তে আসার কথা ছিল না। অথচ এসে গেছে। পঙক্তির পর পঙক্তি সাবলীল গতিতে এগিয়ে আসছে নাদিমের দিকে, যেমন পাখির ঝাঁক আসে নিঝুম চরে। এই পঙক্তিগুলো ধরে রাখতে হবে এখুনি, নইলে লাপাত্তা হয়ে যাবে। কাগজ কলম দরকার। স্মিতা বাথরুম থেকে ফিরে আসুক, নাজমাকে বলবে কারো কাছ থেকে কাগজ কলম নিয়ে আসার জন্যে। এখন লিখে না রাখলে আর মনে থাকবে না। এই পঙক্তিমালা হারিয়ে ফেলা উচিত হবে না কিছুতেই। কী যেন একটা আছে লাইনগুলির মধ্যে, একটা নতুন স্পন্দন আছে, জোর আছে।

নাজমা আর স্মিতা ফিরে এল। নাজমা হ্যারিকেনটা ঘরের এক কোণে রাখল। আলোটা খানিকটা ধিমে করে দিল সে।

'হ্যারিকেনটা একটু এদিকে দাও,' নাদিম বলল।

'কেন?'

'দাওই না। কাজ আছে।'

'এই রাতে আবার কী কাজ?' পর মুহূর্তেই কাজের ধরনটা বুঝতে পারল নাজমা। নাদিমের চোখমুখ দেখে টের পেয়েছে। নাদিমের এই চেহারা এর আগে অনেকবার দেখেছে নাজমা। কবিতা লেখার আগের মুহূর্তে নাদিম কেমন পালটে যায়। ওর চোখমুখ একটু অন্যরকম হয়ে যায়, নাজমা লক্ষ করেছে। নাজমার ভাষায় কে যেন ভর করে নাজিমের ওপর। নাদিম নাজমাকে কাগজ কলম দিতে বলল। লীনার কাছে পাওয়া যেতে

পারে। লীনা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? পাশের ঘরে আম্মার সঙ্গে আছে লীনা। নাজমা পাশের ঘরে গেল। কিছুক্ষণ পর নাজমা একটা এক্সারসাইজ খাতা আর একটা ইউথ ফাউন্টেন পেন নিয়ে এল। হ্যারিকেনের আলো একটু উসকে দিয়ে বুকের তলায় বালিশটা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল। সেই গরমের মধ্যে ঘন্টা তিনেক জেগে নাদিম পর পর দুটি কবিতা লিখে ফেলল প্রেরণামোহিত হয়ে। যেন কেউ তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল এই যুগল কবিতা। এই কবিতার থিম কোনো নারীপ্রেম নয়, নিসর্গপ্রীতিও নয়, তবে প্রেমেরই কবিতা। এই প্রেম নাদিমের দেশের জন্যে, যে-দেশ এখন বিদেশি জেনারেলদের শক্ত বুটের তলায় থেঁতলে গেছে, যে দেশের হৃদয় থেকে ঝরছে রক্ত।

খাতা বন্ধ করল নাদিম। ফাউন্টেন পেনটা হল ক্যাপবন্দি। আজ রাতে আর নাদিমের ঘুম হবে না। অনেক রাত জেগে কবিতা লিখলে সে রাতে ওর আর ঘুম হয় না। ঘুমের বড়ি খেলে অবশ্য ঘুম এসে পড়বে। কিন্তু সাধারণত নাদিম স্লিপিং পিল অ্যাভয়েড করে। স্লিপিং পিলের মদত ছাড়াই সে ঘুমোতে চেষ্টা করে। ঘুম এলে এল, না এলে চোখ খুলে পড়ে থাক বিছানায়। রাত আস্তে আস্তে কাবার হয়ে যাবে। ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেল নাদিম। চোখ দুটো জ্বালা করছে, তবু আরাম অনুভব করছে। কোনো ভালো কবিতা লেখা হওয়ার পর এরকম অনুভূতি হয় ওর। কোনো গুণী অনেকক্ষণ ধরে তার বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পর যে রেশমুখর স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে, সে স্তব্ধতা এখন নাদিমের ভেতর ভাস্কর্য হয়ে আছে।

নাদিম দেখল, নাজমা ঘুমিয়ে আছে। স্মিতা, রাশেদ, তানজিম, বুমা, সবাই ঘুমিয়ে আছে। নাজমার কপালে কয়েকটা চুল এসে পড়েছে। মায়া লাগল নাদিমের। আলগোছে সে ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। নাজমা টের পেল না। নাদিম নাজমার কোমরে হাত রাখল আলতোভাবে, যাতে সে জেগে না ওঠে। নাজমাকে একটা বিয়ের উৎসবে প্রথম দেখেছিল নাদিম। নাজমা তখন চশমা পরত। দেখতে বেশ অ্যাট্রাকটিভ ছিল। এখন সে আগের মতো নেই। ওর সৌন্দর্যে ভাটা পড়েছে। নাজমাকে দেখে খুব ভালো লেগেছিল নাদিমের। নাজমাও, যদ্দুর নাদিমের মনে পড়ে, ওকে পছন্দ করেছিল। অন্তত একরম একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল নাদিমের মনে।

যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হল, তখন জনাব আহাদ মনসুর, নাজমার আব্বা, সেই প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দিলেন। ছেলে চাকরি বাকরি কিছু করে না, এ ছিল তাঁর প্রধান আপত্তি। এতে জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী আহত হলেন, হয়তো একটু রেগেও গেলেন মনে মনে, যদিও মুখে কিছু বললেন না। নাদিম ইউসুফ স্পোর্টিংলি নিল ব্যাপারটা। তারপর কী করে যেন জনাব আহাদ মনসুর নাদিমের হাতে তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে রাজি হয়ে গেলেন। নাদিমের অহমিকা কিছুটা তৃপ্ত হল এতে।

শাকিলা আহমেদের বিয়ের এক বছর পর, নাদিম নাজমার দিকে তাকিয়ে ভাবে, নাদিম ও নাজমার বিয়ে হয়। একটা গ্লেসিয়ার প্রতিক্রিয়া কি ছিল এই বিয়ের পেছনে? ছিল। ছিল বৈকি। অন্তত নাদিম ভালো করেই জানে যে, এত তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে

হওয়ার কথা ছিল না। না, শেষ পর্যন্ত সে এফ এ পরীক্ষা দেয়নি। চাকরি ছিল না, যে জন্যে জনাব আহাদ মনসুর, যিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, তাঁর কন্যার পাণি নাদিম কর্তৃক পীড়িত হোক চাননি। ঠিক ডিসিশনই নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ কেন যে আবার রাজি হয়ে গেলেন, এটা একটা রহস্য থেকে গেছে নাদিমের কাছে। এ বিয়ে করে কি কোনো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে? কীসের জন্যে এই প্রতিশোধ? কার উপর প্রতিশোধ?

নাজমাকে বিয়ে করে খুশি হয়েছিল নাদিম। সুখের এক চঞ্চল পাখি বাসা বেঁধেছিল ওর ঘরে। স্মিতা যখন এল, স্মিতার ঘুমন্ত মুখের দিকে চোখ পড়ল নাদিমের, তখনো কোনো চাকরি জোটাতে পারেনি সে। আব্বার বিজনেসে ঢুকে পড়া সহজ ছিল ওর পক্ষে। কিন্তু জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী জানতেন, তাঁর এই পুত্র বিজনেস করার জন্য জন্মায়নি। ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে সে পুরোপুরি মহরুম। ওকে দিয়ে কস্মিনকালেও বিজনেস টিজনেস হবে না। নাদিম ইউসুফ হাসান জামিল নয়। একটা চাকরি না করলেই নয়, এভাবে আর কতদিন চলবে? জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী তাকে প্রায় রোজই এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

এখনো রাত বাকি আছে। আকাশে একটি কি দুটি তারা। নাদিমের ঘুম উধাও। কাচের জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেল সে। বাথরুমে যাওয়া দরকার। পেশাব চেপেছে। বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। হাতে হ্যারিকেন। একটা হোঁতকা ইঁদুর দৌড়ে পালাল, নাদিম লক্ষ করে। আরেব্বাস কত বড়ো ইঁদুর দৌড়ে পালাল, নাদিম লক্ষ করে। আরেব্বাস কত বড়ো ইঁদুর-রে বাবা। বেড়ালের মতো। নাজমা দেখলে ভীষণ ভয় পেত। স্মিতা দেখলেতো কথাই নেই। খোদ নাদিমেরই গা কেমন শিরশিরিয়ে উঠল। নাজমা ঠিকই বলে, বাথরুমে আর যাওয়া যায় না। দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উলটে আসতে চায়। কত আর পানি ঢালা যায়? ভৈরব থেকে এখনো ফিনাইলের টিন আনান হয়নি। প্রথমে পেশাব হতে চাইল না। এ এক ফ্যাসাদ। মাঝে-মাঝে এরকম হয়। একটু পরে অবিশ্যি বেশ খোলসাভাবে বেরুতে থাকে। একটু জ্বালা করল যেন। বেশি রাত জাগার জন্যে হতে পারে। তিন চার মগ পানি ঢালল নাদিম।

ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরাল। ঘুম যখন আসবেই না তখন সিগারেট খাওয়া যাক। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া গিলল নাদিম। আকাশে এখনো তারা দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাতে তার ভালো লাগল। কিছুক্ষণ পর একটা শূন্যতাবোধ হঠাৎ পেয়ে বসল ওকে। পাস্কলের কথা মনে পড়ল নাদিমের। আসলে ভয় পাওয়ারই কথা, সীমাহীন শূন্যতার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে ভয় সঞ্চারিত হয় অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নাদিমের ভয় করছে। আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় সে। সিগারেটে টান দেয় বার কয়েক। ধোঁয়া গিলতে গিয়ে পারল না, গলায় ধোঁয়া আটকে গেল। কাশতে থাকল দমকে দমকে। কাশিটা চাপতে চেষ্টা করে। সে কারো ঘুম ভাঙাতে চায় না। কাশি চাপতে গিয়ে বেশি কষ্ট হল ওর, চোখ দুটো ওদের যথাস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। বুকে সামান্য ব্যথা হল। স্মিতা যখন এল ওদের সংসারে, তখনো কোনো নিয়োগপত্র আসেনি নাদিমের

হাতে। অবিশ্যি সে কোনো দরখাস্ত করেওনি কোথাও। পিতার সরাইখানায় খানাপিনা ঠিকই চলছিল। কিন্তু মাঝে-মাঝে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। সব সময় প্রতিটি জিনিসের জন্যে বাপমায়ের মোহতাজ হয়ে থাকা যায় না। এমন কিছু খুঁটিনাটি জিনিস আছে যেমন ব্রেসিয়ার, জাঙ্গিয়া, সফটেক্স ইত্যাদি—যার জন্যে আব্বার কাছে হাত পাতা যায় না ঘন ঘন। একটা চাকরি জোটাতেই হবে।

কী খেয়াল হল, একদিন সে দৈনিক দ্য সেন্টিনালের আফিসে গিয়ে হাজির হল। দুপুর বেলা। তবে লাঞ্চ আওয়ার তখনো হয়নি। নাদিম ইউসুফ সোজাসুজি সম্পাদকের কামরায় ঢুকে পড়ল 'মে আই কাম ইন' বলে। পিয়ন বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে তার এক পা সম্পাদকের কামরার ভেতর। সম্পাদক একরামউদ্দীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নাদিমের দিকে তাকালেন। 'আই নিড এ জব। আই নিড এ জব ভেরি ব্যাডলি', নিজেকে একটা ভিক্ষুকের মতো মনে হল নাদিমের। সে চাকরিপ্রার্থী হয়ে এসেছে এখানে। একটু পরে সম্পাদকের রুমে এক দীর্ঘদেহী যুবক প্রবেশ করলেন। এই যুবক নাদিমের পরিচিত। উর্দু কবি আখতার জামিল। খ্যাতিমান সাংবাদিক। সাংবাদিক ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা। ভদ্রলোক অত্যন্ত অ্যাসারটিভ। ব্যক্তিত্বের আভা ছড়িয়ে পড়ে তার সত্তা থেকে। 'হ্যাল্লো, নাদিম সাব। হাও কাম ইউ আর হেয়ার,' আখতার জামিল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে বলে। প্রথমে নাদিম কিছু বলতে পারে না, আমতা আমতা করে। পরে সামলে নিয়ে বলে, 'আই অ্যাম লুকিং ফর এ জব।'

'এ কোই বড়ি বাত নেহি। জব আপকো জরুর মিলেগা', আখতার জামিল বললেন। নাদিমকে সম্পাদকের কাছে ইনট্রোডিউস করে আখতার বললেন, 'মিস্টার নাদিম ইউসুফ ইজ এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট পোয়েট অব ইস্ট পাকিস্তান। ইনকো নাওকরি জরুর মিলনা চাহিয়ে।' জনাব একরামউদ্দীন একবার আখতার জামিল এবং আরেকবার নাদিম ইউসুফের দিকে তাকালেন। সম্পাদকের দৃষ্টি দেখে মনে হল নাদিমের চাকরি হয়ে গেছে প্রায়। একটু পরে জনাব একরামউদ্দীন নাদিমকে কাল থেকে আফিসে আসতে বললেন। দু'তিন দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু হয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিলেন।

দ্য সেন্টিনালে নাদিমের চাকরি হল। জুনিয়র সাব-এডিটর। দেড়শো টাকা মাইনে। সাংবাদিকতার সটুকু সে জানে না। তবু যে সে নিয়োগপত্র পেল তার কারণ দুটো। প্রথমত সে পূর্ব পাকিস্তানের, আখতার জামিলের ভাষায়, ভেরি সিগনিফিকেন্ট পোয়েট। দ্বিতীয়ত, আখতার জামিলের সুপারিশ। আখতার জামিল দ্য সেন্টিনালের একজন শিফট-ইন-চার্জ। সম্পাদক একরামউদ্দীন আখতার জামিলকে বেশ খাতির করেন, বোঝা গেল।

নাদিম ইউসুফের দ্য সেন্টিনালে কাজ করতে তেমন কোনো অসুবিধা হল না। আখতার জামিল তাঁকে আগলে রাখলেন প্রাথমিক বিরূপতা থেকে, নাদিমকে কাজ শেখার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করলেন। মুনিম আতাউল্লাহ এবং আলিমুজ্জামান খানের সহযোগিতায় নাদিম অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একজন দক্ষ সাবএডিটর বনে গেল।

দ্য সেন্টিন্যালে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি স্বর্গীয় উপহার সে পেল আকস্মিকভাবে। রুমানার সঙ্গে ওর দেখা হল, আলাপ হল সেই একই মাসে, যে-মাসে দৈনিক দ্য সেন্টিনালে সে জয়েন করল। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের মতোই কখনো একা আসে না। নাদিম মনে মনে উচ্চারণ করল। নাদিমের বন্ধু মোসাদ্দেক একদিন নাদিমকে বলল, 'তুমিতো ইংরেজির ছাত্র ছিলে। আমার এক কাজিনকে কয়েক মাসের জন্যে ইংরেজি পড়াতে হবে। বাংলাটাও একটু দেখিয়ে দেবে আব কি। আমার কাজিন আই এ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী।' নাদিম বলল, 'পড়াতে পারি এক শর্তে। আমি এজন্যে কোনো টিউশন ফি নেব না' মোসাদ্দেকের জন্যেই নাদিম কোনো ফি নিতে রাজি হয়নি।

রুমানাকে দেখেই চমকে উঠল নাদিম। একে এর আগে কোথায় দেখেছে যেন। ঠিক মনে করতে পারছে না। রুমানাকে ওর চেনা চেনা লাগছে, যদিও ওর সঙ্গে নাদিমের কখনো দেখা হয়নি। এমন সুন্দর চেহারা এর আগে নাদিম দেখেনি। হয়তো কখনো স্বপ্নের ভেতরে রুমানাকে দেখেছিল সে। কোনো তন্বী গ্রিক দেবীর মতো মনে হল রুমানাকে। আয়ত চোখ তুলে রুমানা যখন তাকায়, তখন নাদিমের মনে হয় এই দৃষ্টির জন্যে বহু যুগ সে অপেক্ষা করতে পারে। সোনালি ওর গায়ের রং, পাতলা ঠোঁট, সরু শিল্পিত আঙুল, ঘন কালো চুল; উন্নয়নশীল স্তন। এমন টেন্ডার রূপ নাদিমের চোখে পড়েনি কখনো। কোনো-কোনো মুহূর্তে হঠাৎ সে শাকিলাকে মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু রুমানা দেখতে শাকিলার চেয়ে অনেক সুন্দর। রীতিমতো সুন্দরী সে। রুমানা, নাদিমের বিবেচনায় ঢাকার সেরা সুন্দরীদের একজন। আর ওর কণ্ঠস্বর—যেন জ্যোৎস্না-উচ্ছ্বসিত হ্রদের ধ্বনি।

গোড়ার দিকে নাদিম ওর মনকে প্রবলভাবে শাসন করেছে। রুমানার প্রতি কিছুতেই সে আকৃষ্ট হবে না, এমন একটা শপথ নিয়েছিল মনে মনে। ভালো করে রুমানার দিকে তাকাত না পর্যন্ত। নাদিম সংবাদপত্র অফিসের নিউজ ডেস্কে কাজ করে, তাই ওর শিফট ডিউটি। শিফট-এর সঙ্গে সংগতি রেখে সে রুমানাকে পড়াতে আসত। মাঝে মাঝে আসতে পারত না। এমনি করে দু'তিন মাস কেটে গেল। দু'জনের মধ্যে ডাইরেক্ট্ কোনো আলাপ হয় না। গদ্য-পদ্যের টীকা, ব্যাখ্যা আর মর্মার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ওদের কথাবার্তা। রুমানা যখন ওর অতল সুন্দর চোখ তুলে তাকাত নাদিমের দিকে, তখন নাদিমের শিরায় শিরায় ধ্বনিত হত পুষ্পবিকাশের সুর। তখন সে ভুলে যেত যে তার স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে; সংসার আছে। পরমুহূর্তেই সতর্ক হয়ে পড়ত নাদিম। নিজের মনকে চাবকে শায়েস্তা করত।

একদিন রাতে ঘুম আসছিল না নাদিমের, যেমন আজ আসছে না। সে কি রুমানার কাছে নিজের গোপন কথাটি প্রকাশ করবে? সে কি রুমানার হৃদয়ের কাছে বসে উচ্চারণ করবে সেই শব্দটি যা অতিব্যবহারেও জীর্ণ হয় না কখনো। না, উচিত হবে না। নিজেকে সংযত করে নাদিম। রুমানাকে বলতে হবে সে-কথা, যে-কথা বলার জন্যে ব্যাকুল তোমার হৃদয়। না, তুমি বলতে পার না সে কথা। মোসাদ্দেকের কথা একবার ভাব, একটি তন্বীর নিষ্পাপ মনকে ডিস্টার্ব করার অধিকার তোমার নেই। তুমি দূরে সরে এস ওর কাছ

থেকে। কোনোরকম জটিলতা সৃষ্টি করতে যেও না নাদিম। একটি পরিণামহীন জিনিসকে জন্ম দিয়ে কী লাভ; এভাবে শাসন কোরো না আমাকে। ওকে একদিন না দেখলে আমার ভালো লাগে না। আমি অস্থির হয়ে যাই। শুধু একবার ওকে বলতে দাও সেই কথা, যে-কথা আমি বলতে চাই ওকে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে মনকে ক্ষতবিক্ষত করে শেষ পর্যন্ত রুমানাকে একটি চিঠি লিখে ফেলল নাদিম। দীর্ঘ চিঠি। চিঠিটা রুমানার পোয়েট্রি সিলেকশনের ভেতরে রেখে নাদিম বলল, 'এটা তোমার জন্য। আজ আমি চললাম। কাল আসব আবার। আজ পড়াতে ইচ্ছে করছে না,' এলোমেলোভাবে বলে বিদায় নিল।

পরদিন নাদিম রুমানাদের বাসায় গেল দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, দ্বিধাদীর্ণ মনে নিয়ে। রুমানা নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছে চিঠি পেয়ে। কাউকে বলে দেয়নি তো? চেয়ার টেনে কোনোমতে বসল নাদিম। ওর বুক টিপটিপ করছে। কী মারাত্মক ভুলই না সে করেছে চিঠি লিখে। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, রুমানা আসছে না। কী দরকার ছিল চিঠি লেখার? আমি একটা আস্ত ইডিয়েট, নাদিম মনে মনে উচ্চারণ করল। দশ মিনিট কেটে গেল, রুমানা এখনো এল না। সে কি আজ পড়তে আসবে না? একটা সিগারেট ধরাল নাদিম। ভীষণ নার্ভাস লাগছে। হাতের সিগারেট মেঝেতে পড়ে গেল। সিগারেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

কাজের মেয়েটি এলে বলল, "আপা আইজকা পড়ব না। কাইলকা আসত বলছে।' চিঠি পেয়ে রুমানা রেগে গিয়েছে নিশ্চয়। নইলে এল না কেন? রুমানার কোন দোষ নেই। রাগ করাটাই স্বাভাবিক। নাদিমের নিজের ওপর ভীষণ রাগ হল। এমন আহাম্মকি করার কোনো মানে হয়? আস্ত উজবুক। চকিতে আব্বার গম্ভীর মুখ ভেসে উঠল নাদিমের চোখের সামনে।

পরদিন রুমানাদের বাসায় যথারীতি হাজির হল নাদিম। আসামীর মতো। যে কোনো শাস্তি ওকে দেয়া হোক, সে মাথা পেতে নেবে। নাদিম কাঠের চেয়ারে বসে একটা সস্তা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগল। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, রুমানা আসছে না। দশ মিনিট কেটে গেল, রুমানা এখনো এল না। উসখুস করছে নাদিম। আবার সিগারেট ধরাল। অত্যন্ত নার্ভাস লাগছে ওর। বারো মিনিট, তেরো মিনিট, চৌদ্দ মিনিটের মাথায় দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রুমানা। একটু পরে এসে চেয়ারে বসল, টেবিলের ওপারে নাদিমের মুখোমুখি, রোজ যেমন বসে। ওকে দেখে নাদিমের রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ল—কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে। রুমানাকে দেখে মনে হল, বাস্তবিকই একটা ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। আজ ওকে ভারি উসকো-খুসকো লাগছে। মনে হয় চুলে চিরুনি পড়েনি। মুখ একটু শুকনো শুকনো লাগছে না? তবু খুব সুন্দর লাগছে ওকে। ও যেন একটু বড়ো হয়ে গেছে। নাদিম ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শরীর ভালো নেই? আমার ওপর রাগ করেছ রুমানা? আমার কাছে আর পড়বে না?' রুমানা কোনো উত্তর দিল না। একবার শুধু তাকাল, তারপর চোখ নামিয়ে নিল। ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে নাদিমের দিকে এগিয়ে দিল। কাগজটা দেয়ার সময় রুমানার হাত কাঁপছিল, নাদিম লক্ষ করল।

নাদিমের জন্য রুমানার চিঠি। প্রথম চিঠি। রুমানার হাতের স্পর্শ পেল নাদিম চিঠি নেয়ার সময়। একটু বিদ্যুৎ বয়ে গেল ওর শিরায়। রুমানা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আজ সে পড়বে না। নাদিম কিছুক্ষণ একা বসে থাকল সেখানে। সেখানে বসেই বার কয়েক পড়ল চিঠিটা। মেয়েলি হাতের নধর অক্ষরগুলি গান হয়ে গুঞ্জরিত হল নাদিমের মনে। রুমানা ওকে ভালোবাসে। অক্ষরগুলো এই জরুরি কথাটাই গান হয়ে জানাল নাদিমকে। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। বৃষ্টি এল। নাদিম আর অপেক্ষা করল না। বৃষ্টি মাথায় করে পথে নামল।

এখনো ভোর হয়নি, হব-হব করছে। অন্ধকার অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না আর। এখুনি ফুটে উঠবে সকালবেলার আলো। হালকা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নাজমার বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। ওর বুকের লাল তিলটা দেখা যাচ্ছে। নাজমার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা না হলেও বেশ ঝকঝকে। ওর স্তন আরো একটু পুরুষ্ট হয়েছে, যদিও ওর সৌন্দর্য আগের মতো নেই আর। কিছুটা ম্লানিয়ে গেছে। নাদিম নাজমাকে বুকের কাছে টেনে নেয। নাজমা ঘুমের মধ্যেই আলগোছে জড়িয়ে ধরে নাদিমকে। বিছানার চাদরটা চটকানো। বাইরে পাখির মৃদু কিচিরমিচির। তানজিম ঘুমের ভেতর কী একটা কথা বলল। অস্পষ্ট। নাদিম বুঝতে পারল না। বেলফুলের গন্ধ ভেসে আসে। রুমানাকে, নাদিমের মনে পড়ল, সে রোজ একটা করে গোলাপ উপহার দিত। রুমানা খুব খুশি হত গোলাপ পেয়ে। সে সময়ের একটা কবিতায় নাদিম লিখেছিল—গোলাপ তুমিতো গোলাপের হাতে পেয়েছ অন্য মানে। রুমানার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ওদের বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিল নাদিম। বন্ধ করতে বাধ্য হল। এখন কোন অছিলায় সে যাবে ঐ বাসায়? সে যেতে চায়, যেতে পারে না। রুমানা অভিমান করে একটা চিঠি লিখেছিল নাদিমকে। নাদিমকে সে ভীরু কাপুরুষ ও নিষ্ঠুর বলেছিল সেই চিঠিতে। রুমানা কেন ওকে এই অপবাদ দিয়েছিল নাদিম তা বুঝতে পারেনি কোনোদিন। রুমানাকে চিঠি দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। রুমানার অপবাদ নাদিম মাথা পেতে নিল। এতটুকু নালিশ করল না।

ঘর ভরে ভোরের আলো। নিদ্রাচ্ছন্নতায় নাদিমের চোখ বুজে এল হঠাৎ।

॥ ৫ ॥

কোন্ পথ দিয়ে স্কুটার চলেছে পথ চেনা যায় না রাস্তাঘাটে গাছপালা নেই ট্রাফিক আইল্যান্ড নেই পানি চাই অনেক তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ কোথায় যেন এলাম কতদিনের জন্যে যাচ্ছে পরে আসব বাস পাওয়া যাবেত বেলাবেলি রওয়ানা হলে আশা আছে গাছপালা নেই আগুনের তাপ যেন মুখে এসে লাগছে আমি যেতে চাই না পানি থই থই করছে বাস নেই দাঁড়াও আরেকটু সবুর কর গ্লাস নেই থই থই পানিতে মানুষের লাশ আচ্ছা আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে হাসপাতালের করিডরে কার যেন একটা শাল পাওয়া গেছে এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় সারাদিন গুলির শব্দ শুনে আমি আর এখন গুলির শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না হাতঘড়িটা ঠিকমতো

সময় দিচ্ছে না বাস কখন আসবে লাশগুলি কখন থেকে ভাসছে আমরা পরে আসব হগলে মায়া লইয়া খাড়াইয়া আছে আমি পস্তাচ্ছি মুড়ি গুড় আমরা দিতে পারতাম ওকে-রেখে যেতে পার অনেক হাঙ্গামা কী করে খবর দেব কারফিউ ভাঙা মন্দিরের ছায়া পুরোনো হয়ে গেছে আস্তে আস্তে নামও ভালো করে ধর কফিনটা এখানে নামাও আহা কী মানুষডা আছিল এমন দরাজ দেল আইজকাইল আর অয়না মায়া আছিল দ্যাশ বাড়ির লাইগ্যা ট্রেন ছেড়ে দেবে সবাই উঠেছে তো কাঁটা ফুটে গেল আঙুলে আচ্ছা ইডিয়ট আমি গোলাপ ফুল তুলতে শিখলে না এখনো কোন্ কবিতাটা পড়বে তুমি দেরি কোরো না কিন্তু ঠিক সময় মাফিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে গোলাপ তুমিতো গোলাপের হাতে পেয়েছ অন্য মানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লুসিকে মানে লুসি গ্রেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম আমি প্রাকটিক্যাল প্রাগমেটিক হতে চাই আকাশমহলে থাকলে চলে না মাটিতে নেমে আসা দরকার তানজিমের পেট ফেঁপে গিয়েছে হরিপদ বাবুর ওষুধে কাজ হচ্ছে না আব্বা তো সিগারেট খেতেন না তবু ওঁর লাংস জখম হল আমি মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী তোমার লিবার্যালিজমের নিকুচি করি স্যার টমাস ব্রাউনের আর্ন ব্যারিয়াল পড়েছ টমাস ব্রাউনের সদ্য কাব্যধর্মী আকাশে মেঘ জমছে ঘন হয়ে কালো হয়ে বৃষ্টি এল এখন আমাকে যেতেই হবে আই নিড এ জব আই নিড এ জব ভেরি ব্যাডলি এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমরা সবাই শহিদ মিনারে শপথ করব বিক্ষুব্ধ লেখক সমাজের কর্তব্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না ভাইয়া তোমার কবিতা দুটি পড়লাম ভালো লাগল কিন্তু শুধু কবিতা লিখলেই কি সব দায়িত্ব চুকে গেল। তোমার বর্ডার ক্রস করা উচিত পুকুর পাড়ে মরা জ্যোৎস্নায় পরি দেখা যায় সোনা পাগলা অনেক আগে এই পুকুরপাড়ে পরি দেখতে পেয়েছিল কথিত আছে একলা নিশুত রাতে পথ হাঁটতে সোনা মিয়া একদিন মাঝরাতে পরির গোসল দেখতে পেল সোনা মিয়া অনেক পরি ওদের পাখায় জ্যেৎস্না চলকে পড়েছিল সোনা মিয়ার বয়ান বুমানাকে দেখতে তন্বী গ্রিক দেবীর মতো পড়াতে পারি এক শর্তে টাকা পয়সা নেব না ভাই তোমার কাজিন আমার প্যারাটাইফয়েড হয়েছে ইনহে জবুর নাওকরি মিলনা চাহিয়ে একরামউদ্দীন সাব ভাসানী সাহেব মৌলানা ভাসানী এখন ভারতে বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে বন্দি মজলুম নেতা পল্টনের মাঠে বললেন ওদের আসতে দেয়া হবে না আখতার জামিল মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক রাজীব আহসান হলফ করে বলতে পারে ওর সঙ্গে হুশিয়ার হয়ে মেলামেশা করবে জানি না আমার মনে হয় না এমন প্রগ্রেসিভ লোক কী করে সম্ভব একরামউদ্দীন তো একটা ভোন্দাগাজি এম এ পরীক্ষাটা না দিলে পস্তাতে হবে দ্যা সেন্টিনালে ঢুকে ভালো করিনি আই নিড এ জব ভেরি ব্যাডলি ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছি মুক্তি নেই এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা জয় বঙ্গাবন্ধু।

বাঙালিদের চিরদিনের জন্যে পশ্চিমাদের পায়ের তলার রাখার ষড়যন্ত্র চলছে শেষ অব্দি কী হয় জানি না এত অন্ধকার পথ খুঁজে পাচ্ছি না অন্ধের মতো চলতে হচ্ছে শহরে কি প্লেগ লেগেছে আমি মেজর জিয়া বলছি আমি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের

নির্দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করছি বাস কটায় আসবে একটু আগে তারাবোতা অপারেশন হয়ে গেছে থই থই পানিতে লাশ ভাসছে তাকান যায় না নাজমাকে এবার উনিশ টাকার শাড়ি কিনে দেব ওর মন ভেঙে যাবে না তো এক গ্লাস পানি দিন প্লিজ ভারি পিয়াসা লেগেছে আমরা বাঁচব তো ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মুখের হাসি ভোলা যায় না উন্নয়ন দশক না ছাই কালো দশক নাইম আহমেদ বলল জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাই না ইদানীং মার্কসবাদী নাঈম আহমেদের কণ্ঠে এমন উক্তি বেমানান আসলে সে ইনট্রোভার্ট কিন্তু মনে হয় এক্সট্রোভার্ট আখতার জামিল জোরালো কবিতা লেখে উর্দু ভালো জানি না তবু ওর আবৃত্তি শুনে মনে হয় ওর কবিতায় জোর আছে ইউ আর টু ফাইট ফর এভরি ইঞ্চ নাদিম সাব ওয়রনা মুশকিল হ্যায় রাজীব আহসান পান চিবোতে চিবোতে ঘরে ঢোকে ঝোড়ো হাতে লেখে বলে ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে ইয়াহিয়া একটা পাঁড় মাতাল গবেট নাঈম আহমেদের মন্তব্য আইয়ুব বাঙালিদের বরদাস্ত করতে পারে না ওর একটা কনটেম্পট আছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে এজন্যে আইয়ুবকে আমি ঘৃণা করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ চাকরি যেতে পারে গেলে যাবে পরোয়া করি না এরকম উপসম্পাদকীয় লিখলে কেউ জামাই আদরে রাখে না রাজীব আহসান ও শোয়েব চৌধুরী কবিতা শোনালেন দু'জনের কবিতা দু'রকম দুটোই ভালো আমি নানা ধরনের কবিতা পছন্দ করি শোয়েব চৌধুরী সুদর্শন বলিষ্ঠ প্রেমিক প্রেমের কথা বলতে ভালোবাসে একটু উচ্ছল কোথায় যেন একটা চিপনেস আছে নামি আহমেদ লম্বা নাইম কি আসলেই ইনট্রোভার্ট ওকে ঠিক বোঝা যায় না কোথায় যেন একটা অস্পষ্টতা আছে ওকে ঘিরে চেহারায় ব্যক্তিত্বের দীপ্তি রাজীব আহসান মাই ডিয়ার লোক রাজীব ইজ এ বান্ডল অব কনট্রাডিকশনস দিলদার মানুষ দিমাগি পছন্দ করে প্রাণ খুলে ভালোবাসে আবার শুধু ফণা তুলে ক্ষান্ত হয় না ছোবল দিতে জানি ট্রু আর্টিস্ট নাঈম বলে বন্দুকের নলই শক্তির উৎস অথচ সে ইনট্রোভার্ট দৈনিক পদাতিকে কাজ করতে ভালো লাগছে না আর কতদিন এই ক্রুর যন্ত্রণা সহ্য করব টকস ফেইল দ্য সেন্টিনালে হাবভাব সুবিধার নয় আব্বা আইয়ুব খানকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেচ্যুলেট করে আবার আব্বাই দু-চোখে দেখতে পারতেন না আইয়ুব খানকে বেঙ্গালি হেটার ডিক্টেটরের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠতেন আফটার আল কৃষক প্রজা পার্টির লোক এক সময়ের রাজনীতিক লোক ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছিলেন মুসলিম লিগ ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছিলেন নিজের এলাকার লোকজনদের দ্বিচারিতার জন্যে বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনরাই ডুবিয়েছিলেন ওঁকে নবাব ফ্যামিলির খাজা সেলিমের জয় হয়েছিল তারপর থেকে জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরী পলিটিক্স ছেড়ে দেন।

কলকাতার টাওয়ার হোটেল আমজাদিয়া রেস্টুরেন্ট রক্সি সিনেমা হল কিসমাৎ অশোক কুমার মমতাজ শান্তি মেরা বুলবুল সো রাহা হ্যায় টাওয়ার হোটেলের মুচমুচে বাটারটোস্ট এগ ফ্রাই থালায় ভাত এক সারি বাটি অড়হরের ডাল ভৈরব থেকে ফিনাইলের টিন আনান দরকার তারপর সোনা মিয়া ঘুরতে লাগল দিগ্বিদিক পরির গোসল দেখার পর পাগল হয়ে গেল ডাক্তার কবিরাজের ওষুধ কোনো কাজে লাগল না। হাসান জামিলের

প্রতি আম্মার একটু বেশি টান লীনা বলে আরো অনেকে বলে আম্মা হাসান জামিলের স্ত্রীকে বেশি খাতির করেন করতে পারেনই তো দোষের কিছুই নয় হাসান জামিলের চেহারায় আব্বার মুখের সিকি আদল আছে বলে মনে হয় এ জন্যেই কি ওর প্রতি আম্মার বেশি টান ওরা চারজন এসেছিল চারজন তরুণ নাদিম চেনে ওদের মকসুদ একটা লিটল ম্যাগাজিনের জন্যে কবিতা চাইতে গিয়েছিল নাদিমের কাছে লিটল ম্যাগাজিনটির নাম প্রতিরোধ ওরা চারজন বর্ডার পেরিয়ে আগরতলা যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে নাদিমকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল রাজিও হয়ে গিয়েছিল সে ওর যাওয়ার কথা শুনে আম্মার মুখ মেঘাচ্ছন্ন আম্মার বয়েস বেড়েছে আব্বার মৃত্যু আম্মাকে অনেকখানি ক্ষইয়ে দিয়েছে আম্মার গলায় অনেক ভাঁজ মুখে রেখার চিৎকার নাজমা মোটেই রাজি নয় আহাদ মনসুর শুনলে চটে যাবেন হাসান জামিল বলল আমাদের সবাইকে বিপদের মুখে রেখে চলে যাবেন জাভেদ কায়সার কিছুই বলল না লীনার মতে অবশ্যই ওর যাওয়া উচিত শুধু কবিতা লিখলেই দায়িত্ব চুকে যায় না ভাইয়া আজ গাছে একটা গোলাপ নেই বন্দুকের নলই শক্তির উৎস তুমি আর পড়বে না ওরা চারজন চলে গেল বর্ডার ক্রস করে ওরা আগরতলা যাবে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলে ওরা ঘরে ঢুকে বই দেখে সামিনা ড্রেস চেঞ্জ করেছে ওর উরু মেঘনা নদীর মাছের মতো চকচকে রুমানার ঠোঁট পাতলা ভেজা ভেজা ওর মুখের ঘ্রাণ কী মদির শাকিলার নীলাভ চোখে বাস্তবতার চতুরালি নাজমা ওকে বিরক্ত করে না তেমন গোলাপ তুমিতো গোলাপের হাতে পেয়েছ অন্য মানে নাজমা বড়ো উর্বরা চার বছরে চারটি সন্তান আমিও চূড়ান্ত ক্যালাস জীবনে কত ব্লান্ডার করলে দৈনিক পদাতিকে চাকরি করতে একটুও ভালো লাগে না ওরা চলে গেছে ওরা চারজন তরুণ নতুন জেনারেশন ওদের হাতে হাতিয়ার বন্দুকের নলই শক্তির উৎস মজলুম নেতা ভারতে নাদিমের যাওয়া হল না শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নাদিম পড়ে রইল পলাশতলীতে লীনা শুধু লীনা চেয়েছিল আমি চলে যাই ভাইয়া তোমার যাওয়া দরকার কারো কথায় কান দিও না আমার যাওয়া হল না লীনার চোখে হাসি অন্যরকম হাসি আত্মায় জ্বালা-ধরানো হাসি সোনা পাগলা বিড় বিড় করে কী যেন বলে গেল।

ইঁদারার লাগোয়া পেয়ারা গাছের নীচে সামিনা ওর জিভ পিছল মুখে চায়ের গল্প অনেকের কানাঘুষা বিয়ের উৎসবে নাজমা কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে দাঁড়ান ওকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছে আমি বসে আছি শেরওয়ানি পাগড়ি পরে আহাদ মনুসর তদারকি করে গেলেন গেস্টদের খাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা আজকের গোলাপটা বেশ বড়ো আর টকটকে ঘ্রাণ নিতে ভালো লাগছে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতিক্রম করেছেন বারবার না মুখস্থ করার দরকার নেই জিনিসটা ভালো বুঝতে পারলে আর ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর দখল থাকলে বেশি নম্বর পাবেই তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে আমার আর হাসপাতালে থাকতে ভালো লাগছে না আব্বা বললেন কোরবানির জন্য ভালো দুইটা গরু কিনতে অইব হাসানরে বইলা দিছি আব্বা আমার কাঁধে হাত রেখে হাসপাতালের করিডারে হাঁটছেন লেকের পানি কেমন টলটলে ইচ্ছে করছে নেমে পড়ি পারবে তো কেন পারব না আব্বাকে রক্ত দিতে হবে আইজ ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করতে হবে রুমানার

চোখে পানি আকাশে ঘন কালো মেঘ বৃষ্টি এল শরীর ভেজে তো ভিজুক আমি আর মুকুটহীন রাজা নৌকা নরসিংদীর ঘাট ছাড়ল বিকেলবেলা মেঘনার পানি কী ঠান্ডা নৌকাগুলো হাঁসের মতো।

নাদিম স্বপ্ন দেখছিল না জেগে ছিল সে ঠিক বুঝতে পারল না। ওর চোখ জ্বালা করছে। সারারাত ঘুমাতে পারেনি। ওর মাথার কাছে এক্সারসাইজ খাতা আর ইয়ুথ ফাউন্টেন পেনটা পড়ে আছে। খাতার পাতায় সদ্য লেখা দুটি কবিতা। নাদিম সেই খাতা স্পর্শ করল আলগোছে, যেন দয়িতার শরীর ছুঁল। যেন সে স্পর্শ করল স্বাধীনতাকে।

॥ ৬ ॥

পলাশতলীর এই প্রাকৃতিক শোভার কেমন যেন একটা মায়া আছে। শুধু চোখই জুড়ায় না, মনের ভেতরও স্নেহশীল এক নক্‌শা তৈরি করে, পুকুরপাড়ের গাছতলার দিকে তাকিয়ে ভাবে নাদিম। এই আম কাঁঠালের গাছ, বনতুলসী, লিচু গাছের পাতার ঝিলিমিলি, বাঁশঝাড়, পাখির ওড়াউড়ি যেন পৃথিবীর শান্ত কল্যাণের কথকতা করে। তবু শহরই ওকে টানে বেশি। যখনই সে পলাশতলীতে এসেছে এর আগে, তখনই কয়েকদিন এখানে কাটানোর পর সে ঢাকা ফিরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। অথচ এবার ঢাকায় ফেরার জন্যে নাদিমের কোনো তাড়া নেই, কোনো ব্যাকুলতা নেই।

দেড় মাস হয়ে গেল ওরা পলাশতলীতে এসেছে। নানাদিক থেকে অনেকেই জড়ো হয়েছিল পলাশতলী ও আশেপাশের গ্রামে। নানা পেশার লোকজন। ব্যবসায়ী, চাকুরে, রাজনৈতিক কর্মী, পলাতক সৈনিক। অনেকেই ফিরে যেতে শুরু করেছে ঢাকায়, চাকরিতে যোগ দেয়ার জন্যে। রেডিও পাকিস্তান থেকে বার বার তাগিদ দেওয়া হচ্ছিল। বাধ্য হচ্ছে, নিরুপায় হয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছে একে একে; কেউ আগে, কেউ পরে। নাদিম জানে, ঢাকায় ফিরে গেলে সে ফাঁদে পড়বে। ওর শ্বশুর জনাব আহাদ মনসুর নাদিমকে শিগগিরই ঢাকায় চলে আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছেন। দেরি করা ঠিক হবে না। ঢাকায় যেতে চাইছে না নাদিম, গেলেই দৈনিক পদাতিকে জয়েন করার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন জনাব আহাদ মনসুর। আব্বা বেঁচে থাকলে কি ওকে চাকরিতে জয়েন করতে বলতেন? কে জানে, হয়তো বলতেন।

টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছে। এভাবে অনির্দিষ্টকাল গ্রামে বসে থাকাও যায় না। কী করবে নাদিম ইউসুফ? কোনোদিকে যাবে? দৈনিক পদাতিকে যেতে ওর ইচ্ছে করছে না। একবার জয়েন করলেই আটকা পড়ে যাবে সে। এমন কিছু লিখতে হবে যা পড়ে ওর নিজেরই ঘেন্না হবে, ধিক্‌কার দিতে হবে নিজেকে।

শেষ পর্যন্ত ঢাকায় ফিরতে হল নাদিমকে। ওর সঙ্গে নাজমা, স্মিতা, রাশেদ, তানজিম, রুমা। বিদায় নেবার সময় লীনার সঙ্গে চোখাচোখি হল নাদিমের। নাদিম কোনো কথা বলতে পারল না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর দিকে। নীলার চোখে হাসি। এই হাসিখুশির নয়, কৌতুকেরও নয়। এ হাসি একটু অন্যরকম। ঘেন্না মেশানো রাগের হাসি। যেন সে বলতে চাইছে 'বাহ ভাইয়া, তুমিও চললে সুবোধ বালকের মতো চাকরিতে

জয়েন করার জন্যে?' নাদিম চোখ নামিয়ে নিল। পলাশতলী ছেড়ে যাওয়ার আগে নাদিম গোরস্তানের কাছে এসে দাঁড়াল; ভালো করে দেখল বাপ দাদার কবর, নানা ও আবিদা খালার কবর। মাস্টার চাচার কবরের দিকেও তাকাল সে। মাস্টার চাচার কথা আবার মনে পড়ল 'ওই এম এ পরীক্ষাটা দিলা না, পস্তাইতে অইব।' মিথ্যা বলেননি মাস্টার চাচা। নাদিম পস্তাচ্ছে। তার পস্তানোর শেষ নেই। এই তো ওকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে ঢাকায়। সে জানে, ঢাকায় গেলে সে কিছু না কিছু করবে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে না। সংসার চালাতে হলে চাকরি তাকে করতেই হবে। বাঁচোয়া নেই।

খুব সকাল সকালে নৌকা ছাড়ল। প্রথমে যাবে নরসিংদী। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে পৌঁছুতে পারলে ভালো হয়।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে নাদিমের। পথে কোনোরকম বিপত্তি ঘটেনি। চেকিং হয়নি, আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে হয়নি। কলমাও পড়তে হয়নি নিজের মুসলমানিত্ব প্রমাণ করার জন্য।

নাদিম যখন সপরিবারে ঢাকা পৌঁছাল, তখন বেলা অনেকটা কাত হয়ে পড়েছে। শ্বশুর বাড়িতে উঠল নাদিম। সেখানেই থাকবে কিছুদিন। পরে নিরাপদ মনে করলে নিজেদের বাসায় যাবে। ঢাকা শহরে পা রেখেই নাদিমের মনে হল সে যেন এক বেগানা শহরে এসে পড়েছে। প্রায় কোন কিছুই চেনা মনে হচ্ছে না। তারাবো, ডেমরা, যাত্রাবাড়ি, বাসস্ট্যান্ড, স্কুটার, দোকানপাট, গাছপালা, সবকিছুই যেন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। অকুপাইড সিটির কথা বিদেশি উপন্যাসে পড়েছে নাদিম। এবার অকুপাইড সিটির চেহারা স্বচক্ষে দেখল। গা ছমছমে ভাব চারদিকে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল তেমন নেই। ঢাকাশহরের হৃদয় থেকে ঝরছে এক বিরতিহীন নিঃশব্দ মাতম।

জনাব আহাদ মনসুর বললেন, 'কালই আফিসে যাবেন। তাড়াতাড়ি জয়েন না করলে বিপদ হবে।' নাদিম মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলল না। কারণ, সে জানে, বললে কিছু লাভ হবে না তার। জনাব আহাদ মনসুর অন্য কথা শুনতে চান না। নাদিমকে দৈনিক পদাতিকে জয়েন করতে হবেই। অলরেডি সে টোপ গিলে ফেলেছে, ঢাকা চলে এসেছে।

তবু টালবাহানা করে নাদিম আরো দু'চারদিন কাটিয়ে দিল। দৈনিক পদাতিকে গেল না। এমনকি টেলিফোনও করল না কাউকে। কেমন আছে সবাই? সবাই আছে তো? নাদিম যাতে শিগগিরই দৈনিক পদাতিকে যায়, সেজন্যে ওর পেছনে লেগে রইলেন জনাব আহাদ মনসুর। অনেক বোঝালেন নাদিমকে। অন্যকিছু সিদ্ধান্ত নেয়া নিছক হঠকারিতা হবে নাদিমের পক্ষে—একথাটা তিনি জামাতার মগজে সরাসরি ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন। নাদিম কোনো কথা বলে না, চুপ করে শুনে যায়। নাদিম যা বলতে চায়, তা' তিনি শুনবেন না, শুনলেও বুঝতে পারবেন না। সে কী করে বোঝাবে যে কাজে জয়েন করলে সে এতটুকু স্বস্তি পাবে না, ওর সর্বক্ষণ মনে হবে যে হানাদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। জনাব আহাদ মনসুর নাদিমের মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

নবাবপুর রোড দিয়ে হাঁটছে নাদিম। একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। একটা এগারো বারো বছরের মেয়েকে দেখল। মেয়েটির পরনে সালোয়ার, কামিজ আর দোপাট্টা। কাঁখে পানির কলস নিয়ে যাচ্ছে। কাপড়-চোপড় ময়লা, দু'এক জায়গায় ছেঁড়া, কিন্তু ফুটফুটে মেয়ে। চেহারায় লাবণ্য আছে। এই অবাঙালি মেয়েটিকে দেখে স্মিতার কথা মনে পড়ল নাদিমের। এদেশ যখন স্বাধীন হবে, নাদিম ভাবল, এই মেয়েটি কী হবে তখন, দেশতো স্বাধীন হবেই, আজ না হোক কাল। এই মেয়েটি কি বেঁচে থাকবে শেষ পর্যন্ত? মেয়েটির ভবিষ্যৎ জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ল নাদিম। যারা বাঙালিদের হত্যা করেছে, বাঙালি রমণীদের মর্যাদা লুট করেছে, তাদের শাস্তি হোক। তাদের ক্ষমা নেই। কিন্তু নিরপরাধ নিরীহ যারা, যাদের গণহত্যার সঙ্গে, বাঙালি উৎপীড়নের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, তাদেরও কি শাস্তি পেতে হবে? সেই সালোয়ার কামিজ দোপাট্টা পরা কলসি-কাঁখে রাস্তা পেরুনো মেয়েটির ভবিষ্যতের ভাবনায় নাদিমের মন খারাপ হয়ে গেল।

সেদিনই আরেকটা দৃশ্য চোখে পড়ল নাদিমের। একজন পাকিস্তানী সোলজার একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের ফ্রক দেখছে। ছোটো, কমদামি ফ্রক। কিন্তু রঙিন। সৈন্যটিকে পাঠান বলে মনে হল। ফ্রকটিকে উল্টেপাল্টে দেখছে সে। হয়ত কিনে পাঠাবে ওর মেয়ের জন্যে। নাদিমের মনে হল, সে বুমার জন্যে ফ্রক কিনছে। মুহূর্তের জন্যে একরম চিন্তা হল তার। একটু পরেই সে নিজের মনকে চাবকে দুরস্ত করে ফেলল। এই সৈনিকের হাত হয়তো বাঙালির রক্তে রঞ্জিত আছে। আচ্ছা। এই পাঠান সৈনিক যদি আটকা পড়ে আমাদেব দেশে আর কোনদিন যেতে না পারে স্বগ্রামে, যদি এই ফ্রক ওর মেয়ের কাছে না পৌঁছায় কোনদিন? এই সৈনিক ও তার মেয়ের ভবিষ্যৎ জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে সে। কে বলে দেবে নাদিমকে এদের ভবিষ্যতের কথা?

হাঁটতে হাঁটতে নাদিম দৈনিক পদাতিকের গেটের কাছে এল। ওর অবচেতন মন কি ওকে এ পথেই চালিত করছিল? সে এখানে আসতে চায়নি আজ। এসে যখন পড়েছেই, ঢুকে পড়া যাক। অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। অনেকদিন পর ভালোই লাগবে।

প্রথমেই নিউজ ডেস্কে গেল নাদিম। সবাই ঘিরে ধরল ওকে। 'এতদিন কোথায় ছিলেন? আগে আসেন নি কেন? বসুন। চা-খান। এই চা নিয়ে এস।' 'এখন চা খাব না, ' বলে নাদিম পা বাড়ায় সহকারী সম্পাদকের কামরার দিকে। নাঈম আহমেদ এবং শোয়েব চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল মোহাম্মদ নজিউল্লাহ এবং জাহেদ আবদুল্লাহর সঙ্গে। সবাই খুশি হল নাদিম ইউসুফকে দেখে। রাজীব আহসান কোথায়? ওর চেয়ার শূন্য। রাজীব আহসান হয়তো জয়েন করবে না।' নাদিমের মনে হল, রাজীবের সঙ্গে। শোয়েরের যোগাযোগ রয়েছে।

নাদিম সিগারেট ধরাল। অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খাচ্ছিল না সে। সে-ও জয়েন করবে না। নাঈম আহমেদ নাদিমকে জিগ্যেস করল, 'কেমন আছেন?'

'এই আছি আর কি? আপনি কেমন আছেন?'

'রোজ বাইরে বেরুনোর আগে আয়নায় নিজের চেহারাটাকে স্যালিউট করি। বলি, বিদায় বন্ধু, কাল হয়তো দেখা না-ও হতে পারে,' নাঈম আহমেদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল।

'ভালোই বলেছেন।'

রাজীব আহসানের মতো আরো কেউ কেউ জয়েন করেনি। আমিও করব না, নাদিম মনস্থির করল। এই দাসত্ব আর করা যাবে না। ঢের হয়েছে। সে সম্পাদক জনাব আবুল জামাল নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। একাই ছিলেন তিনি। যথারীতি পান চিবোচ্ছেন। হাসি-খুশি মুখ। তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকে। আরেকটু বুড়িয়ে গেছেন, মনে হল।

'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

'ওলায়কুমউস্‌সালাম।'

'কেমন আছেন?

'এই চলে যাচ্ছে কোনোমতে। আপনি কেমন আছেন?'

'কী বলব? বলার কিছু নেই।'

'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

'গ্রামে।'

'জয়েন কববেন না?'

'জী না।

'কেন?'

'ভালো লাগছে না। এই চাকরি আর করব না ভাবছি।'

'চট করে কোনো ডিসিশন নিয়ে নেবেন না যেন। ভেবে চিন্তে কাজ করবেন, নইলে পস্তাবেন।' জনাব আবুল জামাল নাজিমুদ্দিন বললেন। নাদিমকে সিগারেট অফার করলেন তিনি। নাদিম সিগারেট নিল। সম্পাদকের শেষ বাক্যে নাদিম মাস্টার চাচার গলা শুনল যেন।

'আমি আসি এবার, রায়হান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাই।' রায়হান নাসির দৈনিক পদাতিকের ম্যানেজিং এডিটর। দরজায় নক করে ম্যানেজিং এডিটরের ঘরে ঢুকল নাদিম।

'কী খবর তোমার? এতদিন পর?' রায়হান নাসিরের কণ্ঠস্বর ঠান্ডা।

'গ্রামে ছিলাম।' হঠাৎ কী মনে হল নাদিমের সে প্রায় নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'আমি কাজে জয়েন করতে চাই।' ওর মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল বাক্যটি। নিজের কানকেই নাদিম বিশ্বাস করতে পারল না। এই বাক্য উচ্চারণ করার কথা ছিল না।

'অনেক দেরি করে ফেলেছ নাদিম। তোমাকে জয়েন করতে দেয়া সম্ভব নয় আর,' জনাব রায়হান নাসিম তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানালেন। নাদিম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, বাঁচা গেল। জয়েন করতে হবে না। নাদিম ইউসুফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটে ছোট্ট একটা টান দিয়ে দরজায় দিকে এগিয়ে গেল।

'দাঁড়াও,' জনাব রায়হান নাসির ডাকছেন নাদিমকে, 'বোস এখানে। আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও।' নাদিম কী বলবে ঠিক করতে পারল না। ওর উচিত স্পষ্ট না করে দেয়া। ফাঁদে পা দেবে আখেরে? অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল নাদিম। 'নো থ্যাঙ্কস', এই দুটো বিদেশি শব্দ উচ্চারণ করা জরুরি। এই মুহূর্তে, এখুনি। নইলে দেরি হয়ে যাবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সময় সে বলতে চাইল 'নো থ্যাঙ্কস,' কিন্তু ওর গলা থেকে বেরুল, 'আজ আমি খুব টায়ার্ড, কাল জয়েন করব।' এরপর নাদিম আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সেখানে। সে হ্যান্ডকাফের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে গ্রেফতার।

কারো সঙ্গে না দেখা না করে পলাতকের মতো দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নাদিম। কারো সঙ্গে ওর কোনো সংযোগ নেই। কাউকে কিছু বলার নেই। নিজেই শিকার, নিজেই শিকারি সে। দৈনিক পদাতিকের গেট পেরিয়ে সে হাঁটতে শুরু করল। একটু পা চালিয়ে ভাই, নিজেকে বলল নাদিম। রাস্তা ফাঁকা। রাজীব আহসানের মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। রাজীব ওকে দেখে যেন হাসছে। এই প্রথমবারের মতো নাদিম রাজীব আহসানকে ঈর্ষা করল। রাজীব আহসান সত্যি বড় মাপের মানুষ। কাজে জয়েন না করে সে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে সবার কাছে। অন্তত নাদিমের কাছে তো বটেই। নিজেকে ভয়ানক বেঁটে মনে হলো নাদিমের আর রাজীব আহসানের মাথা ঢাকার আকাশকে ছুঁয়েছে। দুপুরেই সন্ধ্যা নেমে এসেছে বলে ওর মনে হল। ভয়ানক আন্ধার। রাস্তায় কিছু চোখে পড়ছে না। নাদিম হাঁটছে। ডি আইটি অ্যাভিনিউ পেরিয়ে, গুলিস্তানের মোড়ে পেরিয়ে রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে এল। নিজের কাছে নিজেকে কেমন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে নাদিমের। দেশ স্বাধীন হবে, কিন্তু সেই স্বাধীনতায় তার কোনো অংশ থাকবে না। লজ্জা একটা বিষাক্ত ফুলের মতো গেঁথে থাকবে ওর মনের ভেতর। দুনিয়া বদলে যাবে, কিন্তু এই পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা থাকবে না ওর । নাদিম হাঁটছে কোনো মৃত আত্মার মতো । অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, অথচ সন্ধ্যা হওয়ার অনেক বাকি। ছয় ঘন্টা বাকি। কাজী আলাউদ্দীন রোডে এসে গেল নাদিম।

হঠাৎ নাদিমের কানে ভেসে এল, 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াদাহু লাশারিকা।' সে চমকে উঠল। কয়েকজন লোক মসজিদের খাটে একটা লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। থমকে দাঁড়াল নাদিম। অন্ধকারে সে পথ পাচ্ছে না। এমন অদ্ভুত অন্ধকার সে দেখেনি কখনো। সেই অদ্ভুত অন্ধকার ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো গিলে ফেলছে ওকে। কী আশ্চর্য. টুপিপরা শোকার্ত লোকগুলো নাদিম ইউসুফের লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর নাদিম বিস্ময়বিহ্বল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে নিজের কাফন-মোড়া শরীর। একটা তীব্র দুর্গন্ধ এসে লাগে ওর নাকে, গোলাপ পানির ঘ্রাণেও চাপা পড়ছে না সেই উৎকট গন্ধ।

# ছোটগল্প



# সে, একটি ব্লেড এবং সুরভি

সে (বয়স পঁয়ত্রিশ, থুতনিতে কাটা দাগ, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, কপালের কাছে পাতলা হয়ে আসা চুল) ঘরে ঢুকেই ধাক্কা খায়। চৌকাঠে নয়, টেবিলের পায়ায় নয়, চেয়ারেরও নয়। ধাক্কাটা নাকেই লাগে, ঝাঁঝ-ঝাঁঝ ধাক্কা, একটা গন্ধের ধাক্কা। বড্ড বেশি চেনা গন্ধ, গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত এই গন্ধ সিঁদ কাটছে ওর নাকে। বিছানার দিকে দৃষ্টি দেয়, যেখানে ঘুমিয়ে আছে কয়েকটি প্রাণী — হ্যাঁ, প্রাণী বলেই চিনতে শিখেছে সে নিজেকে আর এদের, এখন যারা ঘুমিয়ে আছে। হ্যারিকেনের আলোটা বুড়ো মানুষের দৃষ্টির মতো, তাই ঘরের সব জায়গায় আলোর বদান্যতা নেই। বিছানাটাও কেমন ছায়া-ছায়া।

বুঝতে পারে সে ওটা কবিতারই কাজ। মেয়ের নাম রেখেছে শখ করে কবিতা। কোন এক আদ্যিকালে কবিতা ভালোবাসত, তার জের রয়ে গেছে কন্যার নামকরণে। আজকাল কিছু নাম ও-রকম, শোনা যায়। সে জানে, এটা কবিতারই কাজ। মেয়েটা হিসি করবেই বিছানায়—বিছানাটাকে পচিয়ে দিয়েছে একেবারে। কবে করেছে, কে জানে। এখন তো বেশ রাত হয়েছে। মেয়েটার ঠান্ডা লেগে যাবে হয়তো। তার মা, স্নেহের জননী, এমন নিটোল ঘুমোতে পারেন যে, মেয়ে জবজবে কাঁথায় পড়ে থাকলেও উঠবেন না। 'আচ্ছা ঘুমকাতুরে স্ত্রীলোক', এ রকম একটা বাক্য যে, জামিল আহম্মদ, মনে মনে আওড়ায়। বাক্যটি যেন কাতুকুতু দেয় ওকে, হয়তো ফিক করে হেসে ফেলবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে দেখে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটি রমণীর দিকে, তার স্ত্রীর দিকে, ফাতেমার দিকে। ফাতেমা নামটার সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারেনি আজ পর্যন্ত। নিজের নামটাও এমন বলিহারি কিছু নয়, তবু। ক'বছর হলো? সে, জামিল আহম্মদ, মনে মনে হিসবে করে। ক'বছর হলো ফাতেমাকে ঘরে আনার? আট বছর। দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেছে কিন্তু একদিনেও ফাতেমা নামটা জুৎসই ঠেকেনি তার কাছে, বড্ড আটপৌরে নাম, বড্ড সেকেলে—যেন নামটাকে হাজার বছর সবুজ একটা ডোবায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ফাতেমাকে দেখে তার স্বামী, আট বছর ধরেই দেখে আসছে। আট বছর, হ্যারিকেনের বিষণ্ণ আলোর দিকে তাকিয়ে সে, জামিল আহম্মদ ভাবে — আট বছর নাম শব্দটিকে চেখে, মুখের ভেতর, জিভের ডগা দিয়ে যেন ঠেলে ঠেলে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দেয় একটু একটু করে। আট বছর কেটে গেল—কত সহজে উচ্চারিত হয় বাক্য; কিন্তু এই আট বছর সে যেভাবে ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলোকে (একটা ইংরেজি বাক্যের, যা সে স্কুলজীবনে শিখেছিল, অনুবাদ করল) দরজায় বাইরে রেখেছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। প্রথমে সে রীতিমতো ভড়কে গিয়েছিল, কিন্তু সেই রক্তাক্ত লড়াইকে জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছিল শেষ অবধি। তাই কেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে। আট বছরে ফতেমা তাকে চারটি সন্তান উপহার দিয়ে

প্রায় ফৌত হতে চলেছে। সে, জামিল আহম্মদ, বিছানার দিকে এগোয়। পা টিপে টিপে, যেন সে এ বাড়ির কেউ নয়, যেন সে চোর, কিছু নিয়ে সট্‌কে পড়াই যার উদ্দেশ্য।

সে বিছানার দিকে, ফাতেমার দিকে, সন্তান চতুষ্টয়ের দিকে যায়, থামে, উসখুস করে, ভাবে, দেখে, উসখুস করে, ভাবে, দেখে। সে, জামিল আহম্মদ, দেখে তার ছায়া পড়েছে দেয়ালে। আবার সেই ঝাঁঝালো গন্ধ সিঁদ কাটে নাকে। কবিতার কাছে যায়, বদলায়, জবজবে কাঁথাটা নিজেই বদলায়। হঠাৎ রাগ চাপে, মাথায় রক্ত উঠল নাকি? তার ইচ্ছে হয়, লাগায় এক থাপ্পড় কবিতা নাম্নী মেয়েটিকে, তার সত্তা থেকে উদ্ভুত মেয়েটিকে। ইচ্ছে হয়, ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় মেয়েটার। বড়ো হলে মায়ের মতোই ঘুমকাতুরে হবে হয়তো। অন্য কাঁথা খোঁজে জামিল আহম্মদ। কাছে ধারে নেই; বেশি খোঁজার ধৈর্যও নেই আর। তাই আলনা থেকে নিজের প্রায় বাতিল (মধ্যে মধ্যে পরে) লুঙ্গিটা দু'ভাঁজ করে বিছিয়ে দেয় মেয়ের কচি নিতম্বের নীচে। কবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রাগটা ঢিমে হয়ে আসে। মেয়টা ভালোই হয়েছে দেখতে, পুতুলের মতো, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, গায়ের রঙও দিব্যি ফরসা। ফাতেমা কি শৈশবে এমন ছিল, এমনি ফুটফুটে? মেয়েটা দেখতে ভালো, জ্বালাতনও করে না তেমন — দোষের মধ্যে বড্ড বেশি হিসি করে, এই যা। ভেজা জবজবে কাঁথাটা ঘরের বাইরে ছুঁড়ে দেয় জামিল, ফলে ঝাঁঝালো গন্ধ উধাও। হঠাৎ মনে পড়ে, রাতের খাওয়া হয়নি এখনো। ফাতেমা নিশ্চয়ই খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছে টেবিলের ওপর। হ্যারিকেনটা এদিকে নিয়ে এলে আলোয় বসে ভাত খাওয়া যাবেখন। টেবিলের কাছে যেতেই খুট করে কী একটা শব্দ হলো। একটা ধূসর লেজ বাসন ছুঁয়ে কোথায় অদৃশ্য হলো। সে টের পায়, ইঁদুর ব্যাটা ভাগ বসাতে এসেছিল। ধূসর লেজটা তার, জামিলের সমস্ত ক্ষুধা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে ইতোমধ্যে। ও-ভাত আর কিছুতেই মুখে তোলা যাবে না। দেখি কী রেঁধেছে ফতেমা? ওহ! কী চমৎকার নলা মাছ আর মুখীকচু! এ তরকারিটা ফাতেমা, তার স্ত্রী, বেশ রাঁধে। কিন্তু এ হতচ্ছাড়া ধূসর লেজটা সব মাটি করে দিয়েছে। একটুকরো মাছ দেখবে নাকি চেখে? মাছ তাকে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রি থেকে সকালে, কাকডাকা ধোঁয়া ধোঁয়া সকালে, একটা দিঘির দিকে। মাছ, রুপোলি মাছ, তাকে, জামিল আহম্মদকে নিয়ে যাচ্ছে জামিলের দিকে, জামির দিকে (আম্মা ডাকতেন ঐ নামে আদর করে) অনবরত। আম্মা যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে, একরাশ শুকনো পাতার ওপর দাঁড়িয়ে জ'মি ... ই ..... ই ..... ই..... বলে ডাকতেন, জামি অর্থাৎ জামিল ভয়ানক খুশি হতো। ঐ ডাক একটা রূপোলি ঝালরের মতো ওকে ঘিরে ধরত, ঝালর চুমু খেত ওর গালে ঠোঁটে, মুখে, চুলে, বগলের নীচে, নাভিমূলে, হাঁটুতে, পায়ের গোড়ালিতে। ইচ্ছে করেই জামি সাড়া দিত না আম্মার ডাকে, ঐ ডাক বারবার শুনবে বলে। আম্মা কোঁচড়ে ফিকে-সবুজ, কেমন ভরাট ভরাট কুল নিয়ে ডাকতেন, উঠোনে একরাশ খসখসে পাতার ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু জামি কুলের লোভকে জয় করে অনবোলা থাকত অনেকক্ষণ ঐ 'জামি....ই....ই....ই' ডাকে আদর খাবে বলে। মাছ, আস্ত একটা মাছ, ছিপছিপে, রূপোলি, সুকান্ত মাছ তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সে, জামি, যায়, খসখসে পাতার ওপর দ্রুত পা চালিয়ে (হাতে ছিপ, একটা খালুই) হাতে কাগজের ঠোঙ্গা, আম্মা দিয়েছেন, ওতে ছাতু আর আখের গুড় মেশানো, ভেজা ভেজা। যদি খিয়ে পায় খাবে।

ছিপটা দীঘির পাড়ে মাটিতে শুয়ে থাকবে; ফাৎনা ঐ কাজলা পানিতে ভেসে থাকবে, একটু-একটু কাঁপবে; সে, জামি, সূর্য যখন হাট করা আকাশে জ্বলজ্বলে ফেরেস্তার মুণ্ডুর মতো (জামি ফেরেস্তা দেখেনি কোনোদিন, শুনেছে ঢের, মধ্যে মধ্যে কল্পনা করেছে, ফেরেস্তার যদি মুণ্ডু থাকে তবে সেটা সকাল বেলার সূর্যের মতোই হবে হয়তো) সূর্য রোদ্দুর বিলোবে কাজলা পানিতে, পদ্মের পাতায়, জামির কৈশোরিক চুলে, আর সে খাবে ছাতু আর আখের গুড় মেশানো মণ্ডের মতো, একটু একটু করে, চেটেপুটে সাফ করবে, শূন্য পড়ে থাকবে ঠোঙাটা বুনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে। একবার বড়ো একটা মাগুর মাছ গেঁথেছিল বড়শিতে, বেঁকে গিয়েছিল, পাতলা ছিপ। দিঘিটার কাজলা পানিতে ছুপ করে ডুবে গিয়েছিল ফ্যাৎনাটা, বুক ধক্ করে উঠেছিল জামির। হাত, ছিপ, ঝাঁকুনি, চোখ, কাজলা পানির কাঁপুনি, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ— ছিপটা বেঁকে গিয়েছিল। অনেকখানি। খালইয়ের ভেতর মাগুর মাছ খলবল করছিল। খুশিতে ঝলমল জামি। আম্মা বড্ড খুশি হবেন মাছটা পেয়ে ...... অ্যাত্ত বড়ো মাগুর মাছ দেখে খুশি না হয়ে কেউ পারে? একটু পরেই আসবে, সে আসবে, স্ত্রীলোকের মতো, অথচ গালে দাড়ি কামানোর দাগ। সবুজ সবুজ, হালকা দাগ। যেন রবার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলতে পারবে জামি। কয়েকদিন লক্ষ করেছে জামি, উপর্যুপরি কয়েকদিন; সে এসেছে শাড়ি পরে, ব্লাউজ আছে। আর বুকে টেনিস বলের মতো, কয়েতবেলের মতো যুগল পিণ্ড, অমন মনোহারী পিণ্ডের অধিকারিণী ও-বাড়ির জরিনা আপা, আরো অনেকে। বড়শিতে কেঁচো গাঁথতে-গাঁথতে জামি দেখে আড়চোখে, যে সাহস নেই চোখ তুলে দেখার। কেমন লজ্জা করে জামির। শাড়ি-জড়ানো ঢ্যাঙা শরীর কোমর দোলানো গালে সবুজ-সবুজ হালকা দাগ এক জোড়া টেনিস বল, ঠোঁটে রং গালে—সবকিছু সুড়সুড়ি দেয় জামির বগলের নীচে। কানের চৌহদ্দিতে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, গা কেমন করে। সে দৃষ্টি হেনে চলে যায় নিতম্ব দোলাতে, দোলাতে, ওর নিতম্ব যেন বেহায়ার মতো চেল্লাচ্ছে, জামি আড়চোখে দেখে। কোথায় যায় সে? যদি সে এসে চেপে ধরে জামিকে? যদি মুচড়ে দেয় হাতটাকে, দেয় ঘাড় চাপা কিম্বা রং-করা ঠোঁট যদি চেপে ধরে মুখের ওপর, তাহলে মরে যাবে না জামি? দম বন্ধ হয়ে যাবে ওর, মিহি শ্যাওলার মতো হালকা সবুজ সবুজ দাগ যদি মিশে যায় জামির গণ্ডদেশে, তবে ভাবি ঘেন্না করবে। কেঁচোটা গাঁথা হয়ে যায়, ফাৎনা ভাসে পুরোনো দিঘির কাজলা পানিতে। একদিন — জামির মনে পড়ে (ছিপ ধরা হাতটা কেঁপে ওঠে এক ফাঁকে, পাখি ডাকে, পাখিটাকে চেনে জামি, কিন্তু নাম বলতে পারবে না) যাত্রা দেখতে গিয়েছিল অনেকদূরে হেঁটে। সারা রাত যাত্রা দেখার অনুমতি চেয়ে নিয়েছিল আব্বা আম্মার কাছে বহু কষ্টে, আর কখনো যাবে না এই কড়ারে।

যাত্রার মাঝখানে সে, জামি, প্রস্রাব করার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল। বেছে নিয়েছিল নির্জন একটা জায়গা। যা শব্দ হয়, কেউ শুনলে লজ্জা পাবে, এই ভেবে সে বেশ কিছু দূরে এসে পড়েছিল— যাতে কেউ না দেখে। আকাশ-ভরা তারার দিকে চেয়ে খোলা মনে প্রস্রাব করল জামি। শব্দ হোক, ক্ষতি নেই। আশেপাশে তো কেউ আর কান পেতে রাখেনি। পাতার ওপর শব্দ হয়, শুকনো শব্দ হয়। প্রস্রাব করা তো হয়ে গেছে, তবু শব্দ কেন? তাছাড়া শুকনো পাতায় প্রস্রাব করলে যে শব্দ হয়, এই শব্দের সঙ্গে তার কোনো

মিল নেই। এই শব্দের উৎসের দিকে রওয়ানা হয় জামি— গায়ে কাঁটা দেয়, তবু এগোয়, আস্তে-আস্তে। ফিকে অন্ধকারে চমকে ওঠে সে, ভূতটুত নয় তো? দু-জন এক জন হতে পায়, এত জড়াজড়ি, জাপ্টাজাপ্টি। দু'জনেরই পরনে যাত্রার ঝলমলে পোশাক। একজন পুরুষ অন্যজন — যদিও গায়ে শাড়ি জড়ানো, কিশোর, গালে রং, চোখে কাজল, মাথায় ভাড়া-করা চুলের বোঝা, জাপ্টাজাপ্টিতে শিথিল। পুরুষটিও রঙিন, যাত্রায় পার্টের দৌলতে। সে তার ঠোঁট (পুরু, থলথলে) বেদম চেপে ধরেছে কিশোরের (আপাতত নকল নারী) ওষ্ঠদ্বয়ে, যেন কুকুরের মতো ছিঁড়ে নেবে মাংস। জামি হকচকিয়ে যায় ঐ দৃশ্যের দর্শক হিসেবে, যাত্রার আড়ালে অন্য যাত্রা দেখে। জামির এক জোড়া পা কেউ যেন পুঁতে দিয়েছে মাটিতে; আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সে এই দৃশ্য ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। এমন হয়, আরও হয়েছে জামির —স্বপ্নে, বহুবার। স্বপ্নে সে প্রায়শই হুট করে দৌড়াতে চায় কিন্তু পারে না। দেখে সাপ ওকে তাড়া করেছে, কিন্তু তার পা মাটিতে পোঁতা, কিছুতেই পালাতে পারে না। লজ্জা পায় জামি (স্বপ্নে নয়, ফিকে অন্ধকারে ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে) জাপ্টাজাপ্টি দেখে। পুরুষটি জোরালো হাতে বস্ত্রহরণ করতে চাইছে নকল নারীর, কিশোর বাধা দিচ্ছে না; মনে হয় অভ্যস্ত সে। আর পারে না, জামি আর সহ্য করতে পারে না দৃশ্যটির অত্যাচার, প্রাণপণে দৌড়ে পালায়, মেশে দর্শকের ভিড়ে। মন বসে না যাত্রায়, সকালের অনেক আগেই সে বাড়ি ফিরে আসে, একা বাড়ি ফিরতে ভয় পাবে, এতদসত্ত্বেও জামি হনহনিয়ে রওয়ানা দেয় বাড়ির দিকে। ওর রক্তে অজস্র তারা ফুটছে টগবগিয়ে, তারাগুলো গা ফুঁড়ে বেরুতে চায়, হাফপ্যান্টটা যেন গেঁথে গেছে জানুর ভাঁজে ভাঁজে। ইঁদারা থেকে পানি ঢালে মাথায়, ছিটিয়ে দেয় চোখে মুখে, ছপ্‌ছপ্। আম্মা, জেগেছিলেন, বুঝি ছপ্‌ছপ শব্দ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কে ইন্দারার কাছে?' 'আমি', কোনোমতে আওয়াজ বেরুল জামির কণ্ঠনালি ভেদ করে। আব্বা কাশেন। জামি জন্মেই এই কাশির শব্দ শুনে আসছে নিয়মিত। গামছা দিয়ে ভালো করে মুখ রগড়ায় সে, তবু তাপ কমে না। কিছুদিন আগে বোলতা হুল ফুটিয়ে দিয়েছিল জামির ঘাড়ে, সেই স্মৃতি ফিরে আসে। প্রকৃতই বোলতা হুল ফুটিয়েছে আবার; এবার সারা গায়ে। চৌকিতে গা এলিয়ে জামি চোখ বন্ধ করতে চেষ্টা করে। বন্ধ চোখের অন্ধকারে ঝোপের সেই দৃশ্যটা, লাফিয়ে ওঠে, যেমন লাফিয়ে উঠেছিল যাত্রার রাজার টিনের তালোয়ার। দুটো রঙিন মুখের মাখামাখি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না এই মুহূর্তে, চৌকিতে শুয়ে, বালিশে মাথা রেখে। বালিশের ওয়াড়ে নিদ্রাদেবীর উদ্দেশে নিবেদিত একটি পঙক্তি শোভা পাচ্ছে সূচিকর্মে। আম্মা সাধ করে রঙিন সুতো দিয়ে বালিশের ওয়াড়ে লিখেছেন তা নিদ্রাদেবীর উৎসর্গীকৃত কিছু কথা। কিন্তু আম্মার সূচিকর্ম, যা স্পষ্ট বালিশের ওয়াড়ে, ঘুম আনতে পারছে না জামির চোখে।

এপাশ-ওপাশ করে কাটে অনেকক্ষণ। রাত কাবার হওয়ার জোগাড়, অথচ ঘুম আসছে না। হাফপ্যান্টটা তখনও টান টান, উরুর মাংসের ওপর গাঁথা। ক্লান্তিতে বুঁজে আসে জামির চোখ একসময়, ভোর হওয়ার কিছু আগে। ঘুমোতেই স্বপ্ন দেখে—একটা বড়ো সাদা মোমবাতি, আর সেই মোমবাতির দিকে সটান যাত্রা করেছে একটা কালো কুচকুচে পাখি, ডানা ঝাপটিয়ে।

সে জামিল আহম্মদ, কখন একটুকরো নলা মাছ মুখে দিয়ে ফেলেছে টের পায়নি। নলা মাছের টুকরো নয়, একটা ধূসর লেজ কামড়ে ধরেছে, মনে হলো তার। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরটা ঘুলিয়ে এল, আন্দোলিত হলো উদরের যাবতীয় অস্ত্র। 'ওয়াক, থুঁ,' ইঁদুরের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে সে বেরিয়ে যায় চৌকাঠ পেরিয়ে। নলা মাছের টুকরো উগড়ে ফেলে চটপট কুলি করে মাটির খুড়িতে পানি দিয়ে। ছপছপ শব্দ হয় 'কে ওখানে?'—ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কণ্ঠস্বর, ঘুমে জড়ানো, কিছুটা ভয় পাওয়া। জামি কোনো উত্তর দেয় না। কুলি করে আরো কিছুক্ষণ, যেন ইঁদুরের ধূসর লেজ বাস্তবিকই মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। 'এত ইঁদুর আসে কোত্থেকে? আমার ঘরেই যত রাজ্যের ইঁদুরের আড্ডা। নিশ্চিন্তে চাট্টি ভাত খাওয়াও মুশকিল ঐ শালাদের জন্য।' এই কটু-কাটব্যে মন ভরে না জামিল আহম্মদের। গালিগালাজের একটা অভিধান থাকলে মন্দ হতো না, জুৎসই কয়েকটা শিখে রাখলে সময়ে কাজ দেয়, সাধ মিটিয়ে গাল পাড়া যায় তাহলে। ইঁদুরকে স্ত্রীর-ভ্রাতা বানিয়ে সুখ পায় না সে।

ফাতেমা ঘুমে মজ্জমান, ঘরে ঢুকে জামিল দেখতে পায়; মনেই হয় না একটু আগে এই নিদ্রিতা মহিলা কোনো শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। নিজের স্ত্রীকে ঈর্ষা করে জামিল, এই মুহূর্তে, যখন রাত অনেক হয়েছে। তার চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই, অথচ ফাতেমা, তার স্ত্রী দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, সম্পূর্ণ বেখেয়াল হয়ে। কোথাকার কাপড় কোথায় , যদি উঠে দেখে, নিজেই লজ্জায় মরে যাবে। সত্যি কি নাক ডাকছে ফাতেমার? আসলে ফাতেমার নাসিকা-রন্ধ্র থেকে এমন শব্দ বেরুচ্ছে না, যাতে দূর থেকে শোনা যাবে। জামিল, ফাতেমার স্বামী, শরিকে হায়াৎ (কথাটা সে শুনেছিল একটা উর্দু ছায়াছবিতে)। রাগের মাথায় নাক ডাকার প্রসঙ্গ টেনে এনেছে। টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে যায়, ইত্যবসরে সন্তান চতুষ্টয়ের অন্যতম ঘুমে কেঁদে ওঠে। একটু কঁকিয়েই চুপ মেরে যায়। ঘুমের ভেতর ভয়ানক কিছু দেখেছে হয়তো। ভাবে জামিল আহম্মদ, সে জামি, আম্মা বলতেন, প্রায়শই ঘুমের ভেতর কেঁদে উঠত। ব্যাপারটা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল আম্মাকে। তাই, কিছুদিনের মধ্যে, অনেক জোগাড়-যন্তর করে তিনি এক বান্ডিল তাগা-তাবিজ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ঘুমের ভেতর ভয় পেতে থাকা ছেলের গলায়। কিন্তু ঘুমের ভেতর কেঁদে ওঠার পালা তার শেষ হয়নি। আজো নাকি সে ঘুমের ভেতরে বিচ্ছিরি সব শব্দ করে। ফাতেমা বলে, ঘ্যাঙরায়। জামিল হাসে ফাতেমার মন্তব্য স্মরণ করে। ছেলেটা জামিলের ধাত পেয়েছে বলা যায়। 'কিন্তু এখন কাঁদার আছে কী? যেতে দাও কয়েক বছর, তারপর টের পাবে বাছাধন কত ধানে কত হয় চাল। আমাদের দ্যাখো, হ্যাঁ এই আমি, জনাব জামিল আহম্মদ, এ দেশের স্বাধীন নাগরিক, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন তর্জমা করে কিছু পয়সা কামাই আর সেই পয়সা দিয়ে ছয়টি (নিজেকে নিয়ে) প্রাণীর অন্ন জোগাই। লগি ঠেলে চলেছি, জানি না কোথায় ভিড়বে সংসারের ভেলা। তোমরা বড়ো হবে, মানে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বাড়বে (বাড়বে তো শেষ পর্যন্ত?) আর আমি বুড়ো হব, ইতোমধ্যে বুড়ো হইনি কি? আরো বুড়ো হব। তোমাদের মানুষ করতে পারব কি না জানি না, অন্তত এখনো জানি না। দুত্তোর, জাহান্নামে যাক সব ......' জামিলের লাটাইয়ের সুতো কেটে যায়, বাকাট্টা।

টেবিলের এক কোণে হাত রেখে দাঁড়ায়, যেন ভরসা রাখতে চায় টেবিলের ওপর। 'ওরে মন, নিশিদিন ভরসা রাখিস,' গানের একটা কলি মনে পড়ে। নড়বড়ে টেবিল চাপ পড়তেই নড়ে ওঠে, তবু হাত সরায় না জামিল। ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে টেবিলের কোণে হাত রেখে। এভাবে যে দাঁড়িয়েছিল আরেকদিন, ঠিক এমনি অন্ধকার—যেদিন তাকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয় নাসিমার বাড়ি থেকে। নাসিমার আব্বা, বৃষস্কন্ধ, হঠাৎ পাওয়া টাকার ঝংকারে আহ্লাদিত, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে; দারোয়ান ডাকতে বাকি রেখেছিলেন শুধু। আশ্চর্য, নাসিমা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রয়িংরুমের চেঁচিয়ে ওঠা আলোয়, জামিলকে, প্রিয়তম জামিলকে, বেতখাওয়া কুকুরের মতো অপমানিত হতে দেখেছিল মুখ বুজে। যেন সে অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি ছিল এমন একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখার লোভে। সত্যি সেদিন ড্রয়িং-রুমের আলোয় লোভ চকচকিয়ে উঠেছিল নাসিমার চোখে। সেই দৃশ্যটি প্রাণভরে দেখবে বলে হয়তো বারবার মহড়া দিয়েছে মনে মনে। সেই বৃষস্কন্ধ, স্থূলকায় পুরুষ বাংলা ইংরেজির খিচুড়ি পাকিয়ে কী সব শব্দরাজি উদ্‌গিরণ করেছিলেন কিছুটা শুনতে পায়নি জামিলের ঝাঁ-ঝাঁ কান। কেবলমাত্র দুটো শব্দ—বামন আর চাঁদ—তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়েছিল। এই শব্দ দুটো আজো ভুলতে পারেনি জামিল। বুঝি তাই নড়বড়ে টেবিলের এক কোণে হাত রেখে দণ্ডায়মান অবস্থায় হাসি পেল তার। হো হো করে হেসে উঠলে খুব ভালো লাগবে, এই মতো ধারণার বশবর্তী হয়ে সে, জামিল আহম্মদ, বাসি প্রেমের উৎকট গন্ধে চেঁচাল, হেসে উঠতে চাইল। কিন্তু পারল না, আর পারল না বলে ঘেন্না করল নিজেকে। কী লাভ অতীতের আস্তাকুঁড়ে গড়াগড়ি দিয়ে।

হাতে ঠান্ডা স্পর্শ। চমকে ওঠে। কী লাগল হাতে ঠান্ডা-ঠান্ডা? সরিয়ে আনে হাত এক লহমায়। ভালো করে চেয়ে দেখে, তাই বলো—ব্লেড। সকালে দাড়ি কামিয়ে ব্লেডটা ভুলে টেবিলের ওপরেই রেখে গিয়েছিল সে। পড়েছিল এক কোণে, ফাতেমার চোখে পড়েনি নিশ্চয়ই। পড়লে কি আর তুলে রাখত না? নিজের অজান্তেই জামিল হাত বুলোয় গালে। কী অবাক কাণ্ড, এরই মধ্যে আবার ফুটে উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক। থুতনিতে হাত বুলোয়; থুতুনির তেচ্ছা কাটা দাগটা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, ভাবে জামিল। বন্ধু-বান্ধবেরাও তাই বলে। থুতনির কাটা দাগ ওর মুখমণ্ডলে পৌরুষ এনে দিয়েছে, নইলে মেয়েলি মনে হতো জামিলের চেহারা। সামান্য একটা দাগো কত হেরফের হয়ে যায়। নাসিমার মুখমণ্ডলে কোনো তিল ছিল না। কিন্তু সে নকল তিল তৈরি করত থুতনির নীচে। কোনো এক বিকেলে চুম্বন-পর্ব সমাধা হওয়ার পর সে, জামিল আহম্মদ, দেখে তার নাসিমার, থুতনির নীচেকার সুন্দর তিলটি একদম লাপাত্তা। এবং সেই তিলহীনতায় নাসিমার থুতনির বৈধব্য অবলোকন করে জামিল সেদিন কষ্ট পেয়েছিল। খুব।

সে ব্লেডটা তুলে নেয় হাতে। এটা দিয়ে দাড়ি কামানো চলবে না। আজ সকালেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। পরপর তিনদিন দাড়ি কামানোর পর ব্লেডের ধার বহাল থাকবে —এটা আশা করা যায় না। তাই চতুর্থ দিন সকালে গ্লাসের দেয়ালে খুব ভালো করে ঘষে ঘষে পুরোনো ব্লেডটাকে তেজী করেছে এই আশায় দাড়িতে যখন সেফটি রেজর চালাল

জামিল, তখন খড়খড় করে উঠল গাল। বহু কষ্টে দাড়ি কামাতে পারল সে, সবচেয়ে কষ্ট হলো থুতনি এলাকায় রেজর চালাতে হয় বারবার। মোদ্দা কথা, ব্লেডটা ভোঁতা হয়ে গেছে। আচ্ছা যদি সে কব্জির শিরায় ব্লেড বসিয়ে দেয় সবেগে? ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে? নাকি চুইয়ে চুইয়ে পড়বে টেবিলের উপর, মেঝেতে? দেখবে নাকি চালিয়ে? দিলে সব ফ্যাকড়া চুকে যায় চিরদিনের মতো। না, নিজেকে ফৌত করা চলবে না এই ব্লেডে। বড়ো বেশি ভোঁতা হয়ে গেছে চার বার দাড়ি কামানোর পর। যদি সে আত্মহত্যা করে আজ রাতে, তবে কী এসে যাবে এই দুনিয়ার? একদিন পর হয়তো দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় অত্যন্ত সংকুচিত একটা খবর প্রকাশিত হবে '............ পত্রিকার কর্মচারী, জনাব জামিল আহম্মদ বৃহস্পতিবার রাত্রে ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে ........... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। মরহুম তার স্ত্রী ও চার সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।' ব্যস, এইটুকু। আর হত্যা করলে খবর ঠিক এরকম প্রকাশিত হবে না, বাড়তি দু-এক লাইন থাকবে হয়তো। অফিস ছুটি হবে না, একটা বিনীত শোকসভা হলেও হতে পারে।

স্ক্যান্ডল হবে? চটি জুতোর আবার ফিতে। এসব স্ক্যান্ডাল-ফ্যান্ডাল তো ঝকঝকে ড্রইংরুমবাসী বৃষস্কন্ধদের একচেটে ব্যাপার। জামিল আহম্মদ, যার নামের অগ্রভাগে জনাব ব্যবহার করতেও অনেকের বাধে — এই জামিল আহম্মদ নামক ব্যক্তিটির আবার স্ক্যান্ডাল কী? তবে ধকল পোয়াতে হবে ফাতেমাকে, তার স্ত্রীকে, আর চারটি সন্তানকে, যদি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে সবগুলো। ব্লেডটার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় জামিল, আঙুল দিয়ে পরখ করে ধারে, তারপর রেখে দেয় যথাস্থানে।

আজ সকালে দাড়ি না কামালেও চলত, কিন্তু একটা ভালো চাকরির উমেদার হতে হয়েছিল অদ্য বেলা এগারো ঘটিকায়। উমেদার হতে হয়নি যদিও শেষ পর্যন্ত, তবু গিয়েছিল সেই খাস উদ্দেশ্যেই। বড় দপ্তরের পাপোষে পা ঘষে অফিসারের কামরায় ঢুকেছিল ঠিকই, বসেছিল চেয়ারে, পরিষ্কার কামানো মুখে হাতে-কাচা, বিছানার নীচে রেখে ইস্ত্রি করা কামিজ গায়ে, দুরু দুরু বুকে, চেয়ারের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে বসেছিল ঠিকই। ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেলেও বাইরে দুরন্ত দেখাচ্ছিল তাকে, জামিলকে—অন্তত জামিলের তা-ই ধারণা। অফিসারটির মুখেরই মতোই চকচকে ঘরের সবকিছু—টেলিফোন, কার্পেট-মোড়া মেঝে, পর্দা, চেয়ার-টেবিল, সোফা, ইজিচেয়ার ইত্যাকার সামগ্রী। সেই ঠান্ডা, নিঝুম কামরায় বসে নিজের ছারপোকা অধ্যুষিত আসনটির কথা মনে পড়েছিল জামিলের। অফিসারটির সুদর্শন, ছিমছাম, সমস্ত শরীর যেন মাখন দিয়ে তৈরি। এঁকে দেখলেই মনে হয়, সুখী তিনি, জীবনের কানা উপচে পড়েছে সুখ—দেবতা-ভোগ্য সুধায় তিনি আকণ্ঠ মগ্ন। সত্যি এঁকে দেখলেই মনে হয়, জামিল ভাবে, সুন্দরী স্ত্রী আছে ঘরে, আছে একটি কি দুটি সন্তান, স্বাস্থ্যবান, পরনে ধবধবে শৌখিন জামা-কাপড়, বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে বানানো। অফিসারটির আঙুলগুলো দেখে (চমৎকার কায়দায় ধরে আছেন দামি ফাউনটেন পেন) জামিলের মনে হলো ভদ্রলোকের বেহেস্ত মার্কা বাসায় নিশ্চয়ই শিয়ামিজ বেড়াল আছে, যাদের উনি নিজের হাতে খাওয়ান, আদর করেন নিয়মমাফিক দুবেলা। আর শিরামিজ বেড়ালের মতো নিজের স্ত্রীর নগ্ন শরীরটাকেও

আদর করেন মধ্যরাতে। স্ত্রী (যদি তিনি অন্য কারুর প্রেমে ইতিমধ্যে পাগল না হয়ে থাকেন) বেড়ালের মতোই সুখে ঘরগর শব্দ করেন মৃদু-মৃদু। কেমন একটা খসখসে শব্দ বেরোয় গলা থেকে, নাভিমূল থেকে। হঠাৎ খেয়াল হয় জামিলের যে, সে সিনেমা হলে বসে কোনো ছবি দেখছে না, এসেছে চাকরির উমেদারি করতে।

কথায় ধাক্কায় সে, জামিল আহম্মদ জেগে ওঠে। অফিসারটি কী যেন বলছেন। ইনি কি হিব্রু ভাষায় কথা বলেন? 'আরে আপনি এখানে? কী মনে করে বলুন তো? এত ব্যস্ত আছি যে, আপনাকে চিনতেই পারিনি প্রথমটায়। আপনি জামিল আহম্মদ না?' জামিল আমতা-আমতা করে যেন ভুলে-যাওয়া নামটা মনে করার চেষ্টা করেছে। এতক্ষণে সে-ও চিনতে পারল অফিসারটিকে, অর্থাৎ কলেজের সহপাঠী রেহান চৌধুরীকে। চা এল, পেস্ট্রি এল, চোখ-ঝলসানো সিগারেট কেস খোলা হলো (না, খাই না), কথাবার্তা হলো। অফিসার, রোহন চৌধুরীই বল্লেন বেশি, সারাক্ষণ শ্রোতাব পার্ট ছিল জামিলের। মধ্যে-মধ্যে 'হ্যাঁ, না' করছে শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে। পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরমুহূর্তেই জামিল মনস্থির করে ফেলে, চাকরির প্রসঙ্গই ওঠাবে না আর। আরেকদিন আসব, বলে একসময় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে জামিল। কেন জানি, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয়নি তখন। অফিসে যাওযারও কথা ওঠে না। একদিনের ছুটি নিয়েছিল চাকরির তদ্বির করার জন্যে। সত্যি বলতে কি, এরকম একটা ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিল সারা দিন, চিনেবাদাম চিবিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। সন্ধ্যেটা কাটায় সিনেমার ঠান্ডা ঘরে, তারপর বাড়ি ফিরল বেশ রাত করে সদরঘাটের খোলা হাওয়া খেয়ে। বিকেলে মনে হয়েছিল, সূর্যটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে, এত ভাঙছে যে কাল সকালে আর ওকে আস্ত দেখা যাবে না। সত্যি যদি কাল সূর্য না ওঠে!

জামিল বিছানার দিকে, ফাতেমার দিকে এগোয়। ফাতেমার পাশে এসে যায়। শোওয়ার চেষ্টা করে ঠেলেঠুলে। দুটো চৌকিতেও জায়গা হয় না সবার। ছোটো ছোটো চৌকি। আরেকটি আনলে ঘরে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। তাছাড়া তৃতীয় চৌকি কেনার মতো সাধ্য নেই আপাতত। ঘুমন্ত ফাতেমাকে জড়িয়ে শোয়, অভ্যস্ত হাত কলম্বাস হয়, তার হাত ঘোরে স্তনে, নিতম্বে, তলপেটে। মুখ রাখে বুকে, কেমন টকটক, দুধেল গন্ধ। সরিয়ে আনে মুখ বুক থেকে, স্তনের বোঁটা নাকে লাগে, আবার সেই টক-টক, দুধ-দুধ গন্ধ। ঘুমন্ত ফতেমাকে, এভাবে ব্যবহার করতে কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পায় জামিল।

'এই শুরু হয়ে গেল আবার, তোমার জ্বালায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি না একটু। শুধু তুমি এটাই বোঝ।' ফাতেমার ঘুম ততক্ষণে চটে গেছে। জামিল অপরাধীর মতো ব্যবহার করে আর নিজের ব্যবহারকে রীতিমতো উপভোগ্য মনে হয় ওর । হাত সরিয়ে দেয় জামিল, ক্ষিপ্রগতিতে ব্লাউজের বোতাম আঁটে ফাতেমা। চোখ বন্ধ করে। তারপর ঘুমে ভরা কণ্ঠে বলে, 'ভাত খেয়েছ? আজ নলা মাছ আর মুখীকচু রেঁধেছিলাম। পছন্দ হয়েছে তো তরকারি?' জামিল চুপ মেরে যায়। অনবোলা; কেমন ঘোলা ঘোলা লাগে চতুর্দিক। ফাতেমাকে, নিজের স্ত্রীকে, পুরোনো ব্লেডের মতো লাগে, ঠান্ডা আর ভোঁতা।

'এই শোন' ফাতেমা জামিলের একটা হাত ধরে নিজের বুকের দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'ও বাড়ির ছুড়িটা না পালিয়েছে ....... সেই যাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দ্যাখো তুমি।'

অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা না করে জামিল বলে, 'পালিয়েছে? কার সঙ্গে?' কার সঙ্গে পালিয়েছে, এটা জানা যেন একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে জামিল আহম্মদের পক্ষে। যেন ঐ ব্যক্তিটির পরিচয়ের ওপর নির্ভর করছে জামিলের বাঁচা-মরার সমস্যা।

'পালাবে আবার কার সঙ্গে? ঐ যে ছোঁড়া কবুতর ওড়াত রোজ, ওর সঙ্গেই ভেগেছে। কেন, কোনো আপত্তি আছে নাকি তোমার?' মেয়েটাকে অনেক বার দেখেছে জামিল। হ্যাঁ, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে কখনো-সখনো। তারই খোঁটা খেতে হলো রাতদুপুরে চার সন্তানের জননীর কাছে। মেয়েটাও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাত জামিলের দিকে, যখন সে আস্তে আস্তে পেরুত গলিটা। কেমন ফাজিল-ফাজিল দৃষ্টি, কোথায় যেন একটু বেহায়াপনা আছে। তবে দেখতে মেয়েটি ভালোই, বিশেষত শরীর বেজায় চটকদার। তানপুরার খোলের মতো পাছা চোখে ঘোর লাগায়, এই বয়সেই বুক ডবগা-ডবগা। শেষ পর্যন্ত ঐ গোল্লায়-যাওয়া, কবুতর উড়িয়ে বেড়ানো, ঘাড়-মোটা ছেলেটার সঙ্গেই গোটা সংসারকে কলঙ্কিত করে পগার পার হলো সে?

কিন্তু কৈ, বাড়িটার পাশ দিয়ে আসার সময় তো জামিলের ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি যে ঐ চুপচাপ বাড়িটায় এত বড়ো সর্বনাশ হয়ে গেছে ভরসন্ধ্যেয়। খোঁজাখুঁজি করেনি ওরা? স্টেশনে যায়নি কেউ? নাকি সোমত্ত মেয়ে, যেভাবে হোক, বিদায় হয়েছে ভেবে হাড্ডি হাওয়া খেল ওদের? চুলোয় যাক, তাতে আমার কী? আমি জামিল আহম্মদ, আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, মস্তকের অগ্রভাগের চুল পাতলা হয়ে এসেছে, আমি চার সন্তানের জনক, অর্থাৎ ছা-পোষা মানুষ—একটা যুবতি এই শয়তানের অন্ত্রের মতো গলি ছেড়ে পালালে আমার কী এসে যায়? নিজেকে বড়ো রকমের একটা ঝাঁকুনি দেয় জামিল। গন্ধ লাগে তার, সমস্ত গলিটা যেন পচা অন্ত্রের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে সবখানে। এক্ষুনি 'ওয়াক থু' করে উঠবে হয়তো। সেই দুর্গন্ধ ময়লা বিছানা থেকে, ঘরের মেঝে থেকে, ফাতেমার শরীর থেকে, হয়তো তার নিজের শরীর থেকেও উঠে আসছে। একটু সেন্টটেন্ট মাখলেও তো পারে ফাতেমা, একটু আতরটাতর। নাই-বা-হলো দামি সেন্ট, শস্তা সুরভিই বা মন্দ কি? না, কালই এক শিশি আতর এনে দিতে হবে তাকে, ফাতেমাকে। চোখ বন্ধ করতে চেষ্টা করে জামিল, সাত-পাঁচ ভাবে; হ্যারিকেনের আলো নিবু নিবু, সুরভি ভেসে আসে কোত্থেকে, মনে পড়ে, কবে কে যেন রজনীগন্ধার ঝাড় তুলে দিয়েছিল জামিলের হাতে, ফাতেমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে মনে করতে চেষ্টা করে তাকে, যে রজনীগন্ধার ঝাড় উপহার দিয়েছিল; সেই সুরভি সারা ঘরে, প্রাণভরে ঘ্রাণ নেয় সে, মনে হয় সেই সুরভি থেকে যেন জন্ম নিচ্ছে একটি তরুণী, ফাতেমাকে জড়িয়ে শোয়, মধ্যে এক ফাঁকে তাকায় স্ত্রীর মুখের দিকে, কিন্তু সামনে ফাতেমার মুখ নেই আর, সেখানে কখনো নাসিমার মুখ, কখনো ও-বাড়ির ডবকা, আপতত উধাও ছুড়িটার ফাজিল-ফাজিল মুখ, রাজ্যের মেঘ এসে জড়ো হয় জামিলের চোখে, সে, জামিল আহম্মদ, আট বছরের চেনা, পুরোনো, ব্লেডের মতো শরীর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে দেখে, বহুদিন পরে একটা বড়ো সাদা মোমবাতির দিকে কালো কুচকুচে এক পাখি অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে আসছে, আসছে তুমুল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে।

## সাযযাদ আমিনের কথা

হঠাৎ একটা চিঠি সবকিছু কেমন ওলট পালট করে দিল। ভালোই ছিলাম। রোজ সকালে দাড়ি কামিয়ে, নাস্তা খাওয়ার সময় খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে কখনো-কখনো আকাশ দেখে, আপিস করে (আমি, একটা ব্যাংকের একজন সোজা কর্মচারী) সপ্তায় পাক্কা দু'দিন থ্রিলার পড়ে, মাঝে মাঝে সগিন্নি সিনেমা দেখে সময় কেটে যাচ্ছিল। কখনো কখনো ছন্দপতন যে হতো না, এমন নয়। মাস না ফুরুতেই বাজার খরচে টান, বিমার কিস্তি যোগাতে না পারার উদ্বেগ, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি আমাদের মতো মধ্যবিত্ত লোকের জীবনযাত্রায় আমাশয়ের মতো লেগেই থাকে। ভালো-মন্দর যুগলবন্দিতে দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল, হাপিত্যেশ না করে। মনের অন্ধকার কোণে খেদটেদ পুষে রাখা কিংবা নিজের ভাগ্য নিয়ে খুব বেশি নালিশ করার মানসিকতা আমার নেই। কারণ, আমি ভালো করেই জানি যে, বাংলাদেশ নামক দুঃখী ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের তুলনায় নিজেকে রীতিমতো স্বচ্ছলই লাগে। বাংলাদেশের ক'লাখ শিশু না পুষ্টিহীনতায় ভুগছে? এই তো সেদিন খবরের কাগজে পড়েছিলাম। সঠিক সংখ্যা মনে পড়ছে না। না, ব্যাংকে আমার টাকা গচ্ছিত নেই, বরং ধারেব অঙ্ক বাজারদরের মতোই দিন দিন হু হু বেড়ে চলেছে। তবু বলব, চারপাশের ভিখিরি, রিকশাচালক, আর মুটে-মজুরের কথা ভাবলে আমার নিজস্ব নালিশের বীজ অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন; নিজেকে নিয়ে, অনেকক্ষণ বকবক করলাম, মাফ চাইছি, কেননা, এ কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু আমি নই। আমাকে গল্পের সূত্রধর হিসেবে গণ্য করা যায় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তো, যা বলছিলাম। একটা চিঠি মফস্বল শহর থেকে পাঠানো , আমার ভেতর মহলের নকশাটাকে উলটা-পালটা করে ফেলেছে। চিঠিটা লিখেছেন আমার বন্ধু সাযযাদ আমিনের পিতা। শোকার্ত চিঠিটাকে বিশ্বাসঘাতকের মতো মনে হলো আমার। কালো অক্ষরগুলো নরমুণ্ডের নাচ। এই জ'য়মান, স্পন্দমান দুনিয়ায় সাযযাদ আমিন আর নেই—এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। ওর পিতার হন্তারককেই-বা অস্বীকার করি কী করে? এ রকম একটা কিছু যে হতে পারে, সেজন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

সাযযাদ মারা গেছে পাবনা মানসিক হাসপাতালে। না, সে আত্মহত্যা করেনি; মৃত্যু তাকে জ্বরের ছদ্মবেশে হরণ করেছে। দু'দিনের সামান্য জ্বর। এমন একটি ছুটকো কারণে সাযযাদ মারা যাবে, ভাবাই যায় না। মৃত্যু যে কত ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে, কে তার হিসাব রাখে। নিশ্ছিদ্র সতর্কতার লোহার ঘরেও মৃত্যু এক প্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষী অতিথি। মৃত্যু শব্দটিতে এমন নিঃসীম স্তব্ধতা আছে, আগে এভাবে কখনো অনুভব করিনি। যেন আমি

জনশূন্য এক ঠান্ডা মরুভূমি অতিক্রম করে চলেছি। আমার চতুর্দিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিস্তব্ধতা। শুধু মাঝে মাঝে পৌরাণিক কোনো পাখির চিৎকারে ক্ষণিকের জন্যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটে। সেই অন্তহীন মরুভূমিতে সায যাদের মুখ একটা কাটা ঘুড়ির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এ-বালিয়াড়ি থেকে ও-বালিয়াড়িতে। আমি সেই ভাসমান, কাটা ঘুড়িটাকে ছুঁতে চাই, অনুভব করতে চাই একটি মানুষের সজীবতা।

সাযযাদ আমিন, আমার বন্ধু সাত বছর মানসিক হাসপাতালে বাস করেছে। সাত-সাতটি বছর। কীভাবে কেটেছে ওর সেই সাত বছর? মনে হয়, সেদিন ওকে পাঠানো হলো হেমায়েতপুরে। আমি তার সঙ্গে যেতে পারিনি। আপিস থেকে ছুটি পাওয়া যায়নি আকুল আবেদন সত্ত্বেও। এই ছুটি না পাওয়ার কথাটা বানিয়ে বললাম নাতো? হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে। আসলে আমি ছুটির দরখাস্তই করিনি। অন্তত নিজের কাছে কবুল করতে দোষ নেই, আমি সাযযাদের সঙ্গে যাবার ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। তখন এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম যে, হেমায়েতপুরে সাযযাদকে মানসিক হাসপাতালে রেখে আসার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব না। এই সাত বছরে একবারও আমি সাযযাদকে দেখার জন্যে হেমায়েতপুরে যেতে পারিনি। প্রকৃত উদ্যোগ কি নিয়েছিলাম কখনো? যে-কোনো কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। গোড়ার দিকে ওর পিতার কাছ থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতাম। কিছুদিন পর সেই উদ্যমেও ভাটা পড়ে। সাযযাদ আমাকে একটি কি দুটো চিঠি লিখেছিল, কিন্তু আমি নিরুত্তর। সাযযাদ চমৎকার বাংলা লিখতে পারত। লেখা-লেখা খেলা সে কোনোদিন খেলেনি। মানে সে গল্প-কবিতা ইত্যাদি কখনো লেখেনি। তবে সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল ওর, বিশেষত আধুনিক কথা-সাহিত্য ছিল ওর নখ-দর্পণে। সাযযাদের লেখার অভ্যেস, যদ্দূর জানি, চিঠিপত্রেই সীমিত ছিল। ঢাকার বাইরে গেলেই সে আমাকে চিঠি লিখত। যেমন সুশ্রী তার হস্তাক্ষর, তেমনি সুন্দর ভাষা। সাযযাদের বাক্যগুলো ঝরনার মতো তিরতিরিয়ে চলত, এমন সাবলীল গতি ছিল ওর বাক্য-ছন্দে যে অতি নিন্দুকও তার প্রশংসা না করে থাকতে পারত না। আমি আবার চিঠি লেখার ব্যাপারে জন্ম অলস। কস্মিনকালেও সহজে চিঠি লেখা সম্ভব হয় না আমার পক্ষে। যদি কালভেদে বাধ্য হয়ে চিঠি লিখতে বসি তাহলে, রাজ্যের বিরক্তি এসে জড়ো হয় মগজে, আঙুলের ডগায়। বিরক্তিটুকু ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হলেও সাদা পাতায় অক্ষর সাজাতে ভয়ানক হিমসিম খেতে হয়। লগি ঠেলে ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়ে কলম। অথচ সাযযাদ কী সহজেই না পাতার পর পাতা থরে থরে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলত! আমাকে তাক লাগিয়ে সে কত চিঠি-না লিখেছে। হয়তো নতুন কোনো জায়গায় বেড়াতে গেছে, সে জায়গাটা চিত্ররূপময় হয়ে উঠত ওর চিঠিতে। ওর চিঠি পড়ে মনে হতো, আমিও যেন সেই জায়গা থেকে সদ্য বেড়িয়ে এসেছি; সত্যি, সাযযাদ অসাধারণ লিপিকুশলতা অর্জন করেছিল। আমি বহুবার অবাক হয়ে ওর বর্ণনা লক্ষ করেছি। মুগ্ধ হয়েছি কিছুই-নয় থেকে অনেক কিছু বানিয়ে তোলার ক্ষমতায়। আমার বিশ্বাস, উদ্যোগী হলে, সাযযাদ আমিন, আমার বন্ধু একজন ভালো লেখক হতে পারত। কিন্তু সে লেখক হয়নি, হতে চেষ্টা করেনি, তবে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সে ছিল সাহিত্য-প্রেমিক। তার সাহিত্য প্রেমে কোনো খাদ ছিল না।

ইতোমধ্যে কখন যে আমার স্ত্রী আমার পাশে এসে বসেছে, আমি খেয়ালই করিনি। একটা চেনা গন্ধে তার উপস্থিতি টের পেলাম। আমার স্ত্রীর প্রশ্ন, কি, অমন মেঘলা মুখ করে বসে আছ কেন? আমি কোনোমতে বলতে পারলাম 'সাযযাদ মারা গেছে।' কী বললে? সাযযাদ ভাই মারা গেছেন? ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাহে রাজেউন। কবে? কোত্থেকে খবর পেলে?

'চার দিন আগে মারা গেছে। ওর আব্বা চিঠি লিখেছেন', আমি সাযযাদের পিতার চিঠিটা আমার জরিনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম। জরিনা আমার স্ত্রীর নাম।

'ভারি দুঃখ হয় সাযযাদ ভায়ের অমন ভালো মানুষের নসিবে এই লেখা ছিল ভাবতেই কেমন লাগে।'

আমি কোনো জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরানোর জন্যে দেশলাই খুঁজতে শুরু করলাম। সিগারেট ধরাতে প্রায় চার-পাঁচটি কাঠি ফৌত হয়ে গেল, সাধারণত এ রকম হয় না। তবে কি আমি খুব নার্ভাস হয়ে গেছি?

জরিনা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন বন্ধু তুমি? সাত বছরে একবারও মানুষটাকে দেখতে যাওনি? আগে তো বন্ধুকে একদিন না দেখলেই প্রাণ ছটফটিয়ে উঠত। কী নিষ্ঠুরই না হতে পার তোমরা।'

সত্যিই তো এক ধরনের নিষ্ঠুরতাকেই সাতটি বছর প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছি। কেন জানি জরিনার ঠোঁটকাটা মন্তব্যের পরে আমার সাযযাদের কবরের কথা মনে পড়ল। যে কবর আমি এখনো দেখিনি, হয়তো আর কোনোদিনই দেখব না, সেই উটের পিঠের মতো একখণ্ড মাটি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। কী রং সেই কবরের মাটি? কাজলা? গেরুয়া? নাকি বেজীর গায়ের রং? এবং নিশ্চয়ই ওর শরীরে কীটের নাছোড় অভিযান। এখন ওর মায়াময় চোখ দুটো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, চোখের বদলে দুটো গর্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। আর এই যে এখন বাইরে শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরছে অবিরল ধারায়, এই বৃষ্টি কি সাযযাদের কবরের ভেতরেও পড়ছে? ওর শরীরের গলে যাওয়া মাংস কি আরো বেশি গলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতে? একসময়ে মনে হলো, আমি নিজেই কবরের ভেতরে শুয়ে আছি, আমার ওষ্ঠে, করোটিতে শ্রাবণ চুমো খাচ্ছে তীব্র হিংস্রতায়। জরিনার ডাক শুনে মৃত্যুর সম্মোহন থেকে জেগে উঠলাম। এখুনি খেতে যেতে হবে। খাব না কথাটা বলতে পারলাম না। খাবার টেবিলের দিকে পা রাখলাম। শিক্ষিত রবটের মতো। খেতে বসে ভালোই লাগল। মুরগির গোশতের রান্নাটা চমৎকার হয়েছে। জরিনা আমার পাতে মুরগির একটা রান দিল, আমি বারণ করলাম না। বরং বেশ উৎসাহিত ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে রানের গোশ্‌ত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু একটু করে খেলাম, হাড় চিবোলাম অনেকক্ষণ ধরে, যতক্ষণ না হাড় থেকে সবটুকু রস নিংড়ে নেয়া হলো। জিভ আর টাকরার সংযোগে একটা শব্দ হলো, আহারের তৃপ্তিসূচক এই শব্দ। তারপর হাতমুখ ধুয়ে সুপুরির কুচি চিবোতে চিবোতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আমার পাশেই জরিনা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে আবার মনে পড়ল সাযযাদের মুখ। ওর সিগারেট ধরার ভঙ্গি। দেশলাইয়ের বাক্সে সিগারেট ঠোকার অভ্যেস ছিল ওর, মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরি করত সহজ নৈপুণ্যে। আমি কি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম?

জরিনা হয়তো নিজের অজান্তেই আমার খুব কাছে ঘেঁষে আসে। ওর নিশ্বাস আমার চোখে মুখে। আমি ওকে বুকের কাছে টেনে নেই। ওর চোখে স্নিগ্ধ আদিমতা, আমি অসমর্থ পুরুষের মতো ওর দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। আমার চোখের নীচে ওর চোখ, যুগ্মতার স্বপ্নে বিভোর দুটি সত্তা উথাল-পাথাল ঢেউয়ে ভাসমান। তারপর বিচ্ছিন্নতার চঞ্চু দু'দিকে দুজনকে সরিয়ে দেয়, শরীরে ক্লান্তি নামে। অন্য সময়ে এ অবস্থায় চোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়, কিন্তু আজ ঘুম নেই আমার। জরিনা এরই মধ্যে ঘুমের নির্জন দ্বীপে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ মনে হলো, সাযযাদ আমাদের দুজনের মাঝখানে শুয়ে আছে, আপন মনে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরি করছে।

সাযযাদ কি কখনো কোনো রমণীকে বিছানায় নিয়ে গেছে? জানি না। বস্তুত আমরণ সঙ্গমসুখ থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে সে। ওর এই বঞ্চনার কথা ভেবে মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে মনে হলো মস্ত অপরাধী। এই যে সদ্য রমণতৃপ্ত আমি, এই আমি চিরদিন অপরাধী থেকে যাব সাযযাদের কাছে। স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করাটাকেই এই মুহূর্তে একটা বড়ো রকমের অন্যায় বলে মনে হলো আমার। সাযযাদ কখনো কোনো নারীদেহের স্বাদ নিয়েছে কি না, তা আমি জানতে পারিনি। অন্তত, সাযযাদ কখনো আমাকে বলেনি।

কিন্তু সে আমাকে ওর কাহন কাহন প্রেমকথা শুনিয়েছে অনেকদিন। নানা রঙের কাহিনি। কারো প্রেমের কথা শোনা সাধারণত খুবই বোরিং ব্যাপার। কিন্তু সাযযাদের প্রেমকথা শুনতে আমি কোনোদিনই ক্লান্ত বোধ করিনি। বরং আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই শুনেছি। ওর বলার ধরনে ছিল জাত কথকের গুণাবলি।

আজো মনে পড়ে, ওর প্রথম প্রেমের কথা শোনার মুহূর্তগুলো। সেদিন সে আমাকে ওর প্রথম প্রেমের কাহিনি জানিয়েছিল প্রায় ঘন্টাদেড়েক ধরে। ঘটনার পরতের পর পরত সে আমার সামনে তুলে ধরল স্মরণীয়ভাবে, প্রত্যেকটি ডিটেল নিখুঁত ফুটে উঠল। কখনো ওর কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় কখনো আবার নীচু খাদে। কণ্ঠস্বরে কখনো শরতের প্রীতিবিনিময়কারী রোদ, কখনো কোজাগরী জ্যোৎস্না। কাহিনির যিনি নায়িকা, হাসার সময় তার গালে কতটুকু টোল পড়ে, কিংবা চোখের তারা কী রকম নেচে ওঠে, বিস্ময় প্রকাশের সময় নেই সুন্দরীর (সাযযাদের প্রেমিকারা সবই কমবেশি রূপসি) থুতনির তিল কতটা কেঁপে ওঠে—কোনোকিছুই বাদ পড়ত না গল্প থেকে। লক্ষ করেছি, নিজের প্রেমিকাদের রূপ বর্ণনার সময় আমার বন্ধু ওদের গায়ের রঙের কথা বলত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওর প্রিয়তমাদের প্রত্যেকেই গৌরী। সাযযাদের নিজের গায়ের রং শ্যাম-শ্যাম বলেই হয়তো গৌরীদের প্রতি ছিল ওর দুর্নিবার পক্ষপাত।

সাযযাদ যখন ওর প্রেমের কথা বলত, সত্যি বলতে কি তখন আমি যেন কোনো যাদুবলে রীতিমতো মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। সেই মুহূর্তেই ওর প্রেমিকার সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছে করত, ইচ্ছে করত আলাপ করতে। কিন্তু সাযযাদ কস্মিনকালেও ওর প্রেমিকাদের নামধাম প্রকাশ করত না। আমি প্রচুর পীড়াপীড়ি করতাম, তবুও না। ওর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার কথা তুললেই সে বলত, 'হবে, হবে। কয়েকদিন যাক, একদিন দুম করে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'কিন্তু সেই একদিন আর কোনোদিনই আসবে না। অমন করছিস কেন? আমি কি তোর প্রেমিকাকে খেয়ে ফেলব, অ্যা? নাকি আমার নজর লাগবে ভাবিস?'

এ কথা শুনে সাযযাদ চুপচাপ থাকত। মৃদু হেসে তাকাত আমার দিকে। ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠত একটা এড়িয়ে যাওয়া অভিব্যক্তি, কেমন রহস্য-রহস্য ভাব।

শেষের দিকে প্রায় রোজই আমাকে ওর প্রেমকথা শুনতে হতো। না, শুনতে হতো বলাটা ঠিক হলো না। ওর বলার আগ্রহ যেমন জিরাফ-গলা বাড়িয়ে দিত, তেমনি আমার কৌতূহল-শুঁড়টিও চঞ্চল হয়ে উঠত। মনের ভেতর এক মোহন ঈর্ষা লালন করতে করতে শুনতাম ওর কাহিনি। আগের নায়িকার পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন সাযযাদ ব্যাকুল হয়ে উঠত পরবর্তী নারীর কাহিনি শোনানোর জন্যে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি সাযযাদ বসে আছে আমার বৈঠকখানায়। সে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ওল্টাচ্ছিল আস্তে-সুস্থে।

'কখন এসেছিস? অফিসে অনেক কাজ। তাই এত দেরি হয়ে গেল। জরিনা কোথায়? চা-টা দিয়েছে তো?' বলে আমি ওর মুখোমুখি বসে পড়লাম।

'সব ঠিকঠাক আছে। একটু আগেই ভাবি উঠে গেছেন। চা-পর্ব চুকে গেছে। তুই বরং চেঞ্জ করে আয়। তাছাড়া নিজের সঙ্গ আমার একেবারে অসহ্য নয়।

হাতমুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পাল্টে কিছুক্ষণ পর এসে আমি আবার সাযযাদের মুখোমুখি।

নিজেকে বেশ ফ্রেশ লাগল, অফিসের ক্লান্তি ধুয়ে-মুছে গেছে বাড়ির ট্যাপের পানিতে। আমাদের দু'জনের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপের মতো টেবিলের ওপর জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকাটি রেখে সাযযাদ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস? অফিসের কাজ-কর্ম কেমন চলছে?'

'এই ঘানি টেনে চলেছি আর কি। দিন-দিন অফিসে যে পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তাতে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কাজ করাই মুশকিল। কয়েকজন লোক যাচ্ছেতাই করে বেড়াবে আর তার জন্যে খেসারত দিতে হবে সবাইকে। সবখানে কাজ না করে বেতন গোনার টেন্ডিন্সি বেড়ে যাচ্ছে। কাজ নয় বেতন বাড়াও—এটাই আজকের শ্লোগান। যাকগে, এখন তোর কী খবর, শুনি।'

'আমার আর কী খবর। যথা পূর্বং তথা পরং।'

'ক্যাসানোভার মুখে এমন উক্তি শোভা পায় না, বন্ধু।'

'তুই আমাকে লম্পট মনে করিস নাকি?' সাযযাদের কণ্ঠে আগুনের আঁচ।

'রাগ করলি? আর যাই হোক, তোকে আমি কখনো লম্পট ভাবতে পারি না। অতি নিন্দুকেও তোকে এই অপবাদ দিতে পারবে না।'

'তাহলে যে বড়ো ক্যাসানোভা ক্যাসানোভা করছিলি।'

'যে যাই বলুক, ক্যাসানোভার প্রতি আর দশজনের মতো আমি অন্তত অবিচার করতে পারব না। বেচারি কয়েক ডজন নারীসঙ্গ করেছে বটে, তা বলে নির্ভেজাল লম্পট তাকে বলা যায় না।'

জরিনা এসে আলোচনার খাত অন্যদিকে বইয়ে দিতে সাহায্য করল। ওর হাতে চায়ের ট্রে। ক্যাসানোভা পর্ব সাঙ্গ করে আমরা চা-বিস্কুটের প্রতি মনোযোগী হলাম।

জরিনা একটা কাজে বৈঠক ছেড়ে উঠে গেল। সাযযাদকে চটানোর জন্যে মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে আমি জানি, ও কখনো রমণীর শরীরের উষ্ণতার স্বাদ চাখেনি। অন্তত আমাকে সে তেমন কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলেনি। এবং ওকে এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করার মতো কোনো কিছু ঘটেনি আজ পর্যন্ত।

'তো ইদানীংকার হৃদয়ঘটিত সংবাদ কী?'

কয়েকদিন হলো একটা নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বাংলা একাডেমিতে এক সাহিত্য সভায় দেখা হলো। দারুণ সুন্দরী, আশ্চর্য কণ্ঠস্বর, অপূর্ব কথা বলার ভঙ্গি। প্রচুর পড়াশোনা করে। গল্প লেখে। একটি কি দুটি ছাপাও হয়েছে।'

তারপর প্রায় এক ঘন্টা জুড়ে ময়নার মতো এগিয়ে গেল সাযযাদ আমিনের সপ্তম প্রেমকথা। আমি বালকের মতো তন্ময় ও মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। কী করে যে ষাট মিনিট কেটে গেল টেরই পেলাম না।

সাযযাদের চেহারা কিছু চোখে পড়ার মতো নয়। চেহারার দিক থেকে বিচার করলে তাকে মাঝারিদের দলেই ফেলতে হবে। কিন্তু সে যখন কথা বলে, তখন ওকে অত্যন্ত রূপবান মনে হয় আমার কাছে। সত্যি, বলার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মেছে। ওর বর্ণনার গুণে খুব গাদ্যিক ঘটনাও রোমান্টিক হয়ে যায়। রাস্তা অন্য পথ, গাছ ভিন গাছ, নদী অন্য কোনো নদী হয়ে যায়। আশপাশের প্রত্যেকটি জিনিস হয়ে ওঠে অনন্য ও মূল্যবান।

সাযযাদ যখন বিদায় নিল, তখন রাত এগারোটা। ওর চলে যাবার পরও আমি বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সাযযাদের আজকের প্রেমকথা শুনে আমার মনে কিঞ্চিৎ খটকা লেগেছে। সাযযাদ নিজের কথাই বলেছে, অথচ কাহিনীটা আমার চেনা-চেনা লাগছে। এমন একটা গল্প এর আগে কোথায় যেন শুনেছি। শুনেছি না বলে পড়েছি বলাই উচিত। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখকের গোড়ার দিকের একটি নিটোল প্রেমের গল্প। সাযযাদের কণ্ঠে সেই গল্পেরই পুনরাবৃত্তি। গল্পটিতে যতদূর মনে পড়ে, বাংলা একাডেমির উল্লেখ নেই। তাছাড়া বাকি সবকিছুর মধ্যে মাছি-মারা মিল রয়ে গেছে, বলা যায়। তাহলে কি সাযযাদ .....? না, অমন কথা মনে ঠাঁই দিতে নেই। সাযযাদ অন্যের গল্প নিজের জীবনের অংশ হিসেবে চালিয়ে দেবে, এ কথা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয়। না, আসলে আমার মনেই পাপ। সাযযাদ নির্দোষ। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মিল তো থাকতেই পারে, থাকেই। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ খচ করতে থাকে। সে রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না।

পরদিন অফিসের কাজে যথারীতি ডুবে গেলাম, ভুলে গেলাম সবকিছু। এমনকি আমার যে সুখী পরিবার গোছের ছোটো একটি সংসার আছে, সেই সংসারে একজন নারী ও একটি শিশু আছে, সে কথাও বিস্মৃত হলাম ফাইল আর লেজারের ভিড়ে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজ-বিরতির সময় মনে পড়ল সাযযাদের কথা। মনে ভিড় করে এল ওর প্রেমিকাদের (যাদের আমি কখনো দেখিনি, যাদের মুখ কল্পনাশক্তির ভরসায় আন্দাজ করেছি মাত্র) মুখ। একের পর এক। একসঙ্গে। সেসব মোহিনীর কথা কোনো সম্মোহিনী

ধূপের ধোঁয়ার মতো ছুঁতে যায় আমাকে, বারবার। সেই ধোঁয়ার জাল ছিঁড়ে যত বেরিয়ে আসতে চাই, ততই জড়িয়ে যাই পাঁকে পাঁকে। সেই জাল আমার বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে থাকে। এক সময় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ি, কাজে মন বসাতে চেষ্টা করি। এ এমন একটা ব্যাপার যা কাউকে বলা যায় না, এমনকি জরিনাকেও নয়।

পরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে আমার সংশয়ের মেঘের রং আরো গাঢ় হয়ে যায়। সে সাযযাদ আমিন লেখক হলেও হতে পারত, অথচ হয়নি, সেই সাযযাদ নিজের কল্পনা শক্তি খাটিয়ে কিছু গল্প (গল্পগুলি আমাকে বলেছে এমন বিশ্বাসে যে, সেগুলি যেন তারই জীবনের কাহিনি) তৈরি করেছে, গড়েছে কিছু মানস-পুতুল। যখন কল্পনায় ভাটা পড়েছে, তখন বিখ্যাত লেখকের গল্প তুলে নিয়েছে নিজের কণ্ঠে।

তার এই গল্প-গল্প খেলা নিয়ে আমি সাযযাদকে কখনো কোনো প্রশ্ন করিনি। সে বিব্রত হবে বলেই হয়তো এড়িয়ে গেছি। সাযযাদ কি ব্যাপারটিকে খেলা হিসেবে নিয়েছিল সত্যি-সত্যি? অন্তত ওর কথা শুনলে ওর হাবভাব লক্ষ করলে কিছুতেই মনে হতো না যে গল্প-গল্প খেলার নেশায় সে মেতেছে। প্রকৃত প্রেমিক ছাড়া কণ্ঠে অমন সুর খেলানো যায় না। পরম বিশ্বাসীর আবেগ ও নিষ্ঠা নিয়ে সে আমাকে দিন-মাস-বছর বলে গেছে তার প্রেমকথা। অন্য কাউকে বলেছে কি না, এ তথ্য আমার কাছে অজ্ঞাত।

সেই যে আমার মনে খটকা-জাগানো প্রেমকাহিনি শুনিয়ে গেল সাযযাদ, তারপর ওর সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা নেই। মাঝে-মধ্যে ওর কথা মনে পড়েছে। আমার বৈঠকখানায় ওর অনুপস্থিতি মনকে ভারাক্রান্ত করেছে, ওর প্রেমকথা শোনার জন্যে মন তৃষিত হয়েছে বারবার। তবুও ওর কোনো খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব হয়নি। দু-একবার ওর আস্তানায় গিয়ে পাইনি। সে-ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। অফিস, সংসার, থ্রিলার, মাঝে-মধ্যে সিনেমা, আমার সত্তাকে জড়িয়ে রেখেছে অক্টোপাসের মতো। কিছুদিনের জন্যে সাযযাদ আমার বৃত্তের বাইরে রইল, যদিও মনের গভীরে ওর মুখ জেগে উঠেছে প্রায় প্রতিদিনই।

দেখতে দেখতে কেটে যায় তিন মাস। এই তিন মাসের মধ্যে সাযযাদের সঙ্গে দেখা হয়নি একবারও। আমাদের বন্ধুত্বের বয়সে এরকম কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার পর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, বিশেষত বসবার ঘরটাকে বড়ো নিষ্প্রাণ মনে হয়। বড়ো বেশি উদাস, নিঝুম। বাড়িতে জরিনা আছে, আমার মেয়ে তিনা আছে, তবু আমি একা। যেদিন জরিনা তিনাসমেত পিতৃগৃহে যায়, ফেরে রাত করে, সেদিন সন্ধ্যেবেলা বৈঠকখানার দেয়ালগুলো যেন আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমাকে গিলে ফেলতে চায়। প্রেতের মতো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তখন অনেকক্ষণ পায়চারি করে ছটফটানি কিছুটা কমিয়ে আনতে চেষ্টা করি। আজব চিড়িয়া এই সাযযাদ। এমন ডুব দিতে হয় কখনো? পথ ভুলেও কি এইদিকে আসা যায় না একবার? কি ভায়া, আমার ঠিকানাটাই ভুলে যেতে বসে আছ নাকি। কামঅন ডোন্ট বি সিলি। না, সাযযাদের ওপর রাগ করা যায় না কিছুতেই মেজাজ বিগড়ে গেলেও, যে মুহূর্তে ওর সেই মন-মাতানো হাসি ঝলমলিয়ে ওঠে স্মৃতিতে, সেই মুহূর্তে রাগটাগ একেবারে উবে যায়। তখন নিজের অজান্তেই হেসে ফেলি আমি, যদিও আমার হাসি মধুর-টধুর কিংবা স্মরণীয় কিছু নয়।

ঢাকা শহরে শকুনের পাখার রঙের সন্ধ্যা নেমে আসে। আমি বসে আছি বৈঠকখানায়। একা জরিনা তিনাকে নিয়ে বাইরে। ঘরবাড়ি চুপচাপ ঘুমন্ত। আমার চোখ জর্জ সিমেননের পাতায়। হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে। তাহলে কি আখেরে সাযযাদ এল? মনে খুশির হরিণের লাফ। প্রায় ছুটে গেলাম দরজার কাছে। দরজা খুলতেই দেখি আমার বিস্ময়ের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। চোখ-ধাঁধানো রূপ নেই তার, তবে সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। চট করে চোখে পড়ে, এমন চেহারা। শরীরে লাবণ্যময় স্বাস্থ্যের বান। নার্ভাসনেস আমার শিরদাঁড়ায় পারদের মতো চঞ্চল। কোনোমতে থতমতো ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললাম, ভেতর আসুন। সাবলীল ভঙ্গিতে এল সে। 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

'আপনি নিশ্চয়ই আসিফ আহমেদ?'

'জী, ওটা আমারই নাম।'

'আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

'আমাকে চেনেন কী করে। আমি তো নামজাদা কেউ নই।'

'আপনি আমার খুব চেনা মানুষ। আপনার বন্ধু সাযযাদের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'তাই বলুন'।

'আমার নাম শারমিন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, 'মেয়েটি ভরাট চোখ রাখল আমার চোখে। লক্ষ করলাম, ওর চোখে বড়ো মায়া। দূর শতাব্দীর ছায়া।

'সে হবেখন, তার আগে একটু চা খাওয়া যাক।'

'না, ওসবের কিছু দরকার নেই। আমি চা খাই না।'

'তাহলে শরবত দিতে বলি।'

'জী না। এখন আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আমার খুব তাড়া আছে। এক্ষুনি বাসায় ফিরতে হবে।'

'কিছুই যখন মুখে দেবেন না, তাহলে আপনার কথাই শোনা যাক।'

শারমিন কখনো আমতা আমতা করে কখনো-বা স্পষ্ট ভাষায় যা বলল তার মোদ্দা কথা হলো যে, সে আমার বন্ধু সাযযাদ আমিনকে ভালোবাসে। তিন মাস আগে ওদের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এই তিন মাসেই শারমিন প্রবলভাবে, গভীরভাবে সাযযাদকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু সাযযাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাচ্ছে না সে। সাযযাদ যেন তুষারিত। 'তুষারিত' শব্দটি তরুণীর ঠোঁট থেকেই ঝরেছে। কোনো কোনো কথা শারমিন এমন ফ্রাঙ্কলি বলল যে, অবাক হতে হয়। ওর কথা বলার ধরনে একটা সহজ-সুন্দর স্পষ্টতা আছে। প্যাচপেচে, ন্যাতা-ন্যাতা কিছু নেই। শরতের রোদ্দুরের মতো অনেকটা। মাই ওল্ড বয় সাযযাদ, তুমি ভাষায় বেশ খেল দেখালে, যা হোক। স্রেফ মাদারি কা খেল। কতদিন কত কিস্‌সা-কাহিনি শোনালো, আর এই জ্বলজ্যান্ত শারমিন-পর্বটি গাপ মেরে বসে আছ। সাধে কি তোমাকে আমি আজব চিড়িয়া বলি। দোস্ত! এই যে শারমিনের কথা তুই চেপে গেলি, তা কীসের জন্যে? কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে কি প্রেম-কথার অগ্নিমান্দ্য হলো তোর?

একটা খাপছাড়া অভিমান হলো সাযযাদের ওপর। যেন সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মনে হলো। সে আমাদের বন্ধুত্বকে বলত দস্তানা-দোস্তি। অথচ সে নিজেই কিনা সত্যি সত্যি প্রেম নিয়ে লুকোচুরি খেলল আমার সঙ্গে? আমাকে নাকি বেকুব বানিয়ে মজা লুটছে অতিচালাক সাযযাদ আমিন। জবাব নেই এমন মজার। 'আপনি শুনছেন তো আমার কথা?' শারমিনের প্রশ্নে আমার ভাবনার স্রোত থমকে যায়। শারমিনের দিকে তাকাই, মৌন, আমি অ্যাডমায়ার করি ওকে, মনে মনে। অবাক লাগে, এমন একটি মেয়ের প্রতি সাযযাদ উদাসীন, নিঃসাড়। অথচ এই সাযযাদই আমাকে দিনের পর দিন উদ্বেলিত প্রেমিকার মতো ওর নানা প্রেম কাহিনি শুনিয়েছে। যা, আমার মতে, পুরোপুরি বানোয়াট। অথচ সে জানে না যে, তার এই মোহন জোচ্চুরি ধরা পড়ে গেছে আমার কাছে।

'আপনি যদি আপনার বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে বলেন, তাহলে ভালো হয়, শারমিনের কণ্ঠস্বরে অনুনয়। শারমিন জানাল, ইদানীং সাযযাদের আচরণ কেমন খাপছাড়া ধরনের। কম কথা বলে, মাঝে-মধ্যে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকায়, থামোকা কাগজ ছিঁড়তে থাকে। নিজেকে নিজের ভেতর গুঁজে রাখে সব সময়। তুষারিত সাযযাদের ভেতর মহলে বসন্তের স্পন্দন জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে শারমিন আমার সাহায্যপ্রার্থিনী। এ কী করে সম্ভব? যেখানে শারমিনের মতো মেয়ে ব্যর্থ সেখানে আমার সাফল্যের নিশ্চয়তা মরীচিকার মতোই অলীক। তবু শারমিনকে বললাম, 'আপনি যখন এত করে বলছেন, দেখি কী করা যায়।' আমার কথায় শারমিন কতটুকু আশ্বস্ত হলো, বোঝা গেল না। তবে ওর অস্তিত্বের ভাঁজে ভাঁজে আশার ঝিলিক ফোটে। কালো চামড়ার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্মিত হেসে বিদায় নেয় শারমিন। হাসির মাধুর্য সত্ত্বেও ওকে সেই মুহূর্তে কেমন দুখিনী-দুখিনী মনে হলো।

পরদিন রাতে আমি সাযযাদের বাসায় গেলাম। বরাত ভালো আমার, ওকে পাওয়া গেল ওর ডেরায়। শারমিনের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম আমার অনেকদিনের চেনা বন্ধু সাযযাদকে। যেন নতুন করে দেখছি। আজ ওকে একটু অচেনা মনে হলো। হাসি আগের মতোই আছে, চুল কিছু এলোমেলো, গালে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি। এর ফলে, ওকে দারুণ দার্শনিক দার্শনিক লাগছিল।

'কেমন আছিস,' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই তো আছি।'

'এই মিয়া, ডুব সাঁতারে শারমিনের ব্যাপারটা চেপে গেছিস কেন রে?'

সাযযাদ আমার দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টিতে সময়-অতিক্রমকারী আলো। সেই আলো বড়ো বেশি উজ্জ্বল। হাতে একটা খাতা তুলে নিয়ে বলে, 'শারমিন তোর ওখানে গিয়েছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা হলো।'

'তোর সঙ্গে দেখা করার কথা কিছুদিন থেকে বলছিল,' বলে সে নিশ্চুপ। দেখি, সাযযাদ খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে মেঝেতে ফেলল। দেখতে দেখতে কাগজের অনেকগুলো ডেলা জমে যায়।

'এই সাযযাদ, তুই শারমিনকে খামোকা কষ্ট দিচ্ছিস কেন বল তো? বরাত জোরে এমন একটা মিষ্টি মেয়ের দেখা পেয়েছিস। ও তোকে সত্যি ভালোবাসে। আর কত বোহেমিয়ানি করবি? একটা ঘর-টর বাঁধ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না রে।'

'আমি ওকে ভালোবাসি না।'

'এ কী বলছিস তুই?'

'আমি জানি, শারমিন আমার মনের মতো মেয়ে। যে-কোনো যুবক ওকে পেলে বর্তে যাবে। সত্যি বলছি, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওকে ভালোবাসতে পারিনি। ওকে আমি ভালোবাসতে চাই, এই প্রথমবারের মতো কাউকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসতে চেয়েছি, কিন্তু যখনই তার কাছে যাই, আমার শিরায়, রাশি রাশি তুষারকণা ঢুকে পড়ে। আমি রূপকথার সেই পাথর-মূর্তি হয়ে যাই। আসিফ, আমি ভালোবাসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বাস কর, আমি কোনোদিন আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। কাউকেই না।'

এ কোন সাযযাদের মুখোমুখি বসে আছি আমি? ক্রমাগত কাগজ ছিঁড়ে দলা পাকাচ্ছে আর মেঝেতে ছিড়ে ফেলছে। কখনো কখনো যেন আমার অস্তিত্বসুদ্ধ ওর কাছে ঘোর অমাবস্যা। মনে হলো, আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমার কাগজের ডেলার স্তূপে ডুবে যাব। সাযযাদের চোখে সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আমি দেখতে পেলাম, যে-দৃষ্টির কথা শারমিন বলছিল। এই দৃষ্টি কোনোদিন ভুলব না, ভুলতে পারিনি।

# গাঙচিল

কফি রঙের সুটকেসটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। বেশি কিছু নেয়ার ইচ্ছা ছিল না নেসার আহমেদের। তিন-চারটি পাঞ্জাবি, দুটো ট্রাউজার, একটি কি দুটি শার্ট, একটা লুঙ্গি আর দুটো গেঞ্জি। অবশ্যি কয়েকটি বই তাকে নিতেই হবে, কির্কে গার্ডের 'ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং' বইটা হাতে নিয়ে নেসার ভরে ওঠা সুটকেসের সামনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। এ বই সদ্য কেনা, এখনো একটি লাইনও পড়া হয়ে ওঠেনি। বেঁচে থাকলে একদিন পড়বে। 'বেঁচে থাকা' শব্দ দুটো যেন অচিন কোনো পাখির মতো গান গেয়ে ওঠে নেসারের মনের ভেতর। সে শব্দযুগলকে জিভের ডগায় নাচায় বাঁচার স্বাদ নিতে নিতে।

নেসার বেঁচে থাকতে চায়। তার মধ্যে মৃত্যুবিলাস নেই। তিরিশ বছর বয়স হয়েছে ওর, চাকরির বয়স পাঁচ বছর। চাকরি তার ভালো লাগে না; মনে হয়, সকল সময় গলায় একটা বকলেস আঁটা রয়েছে। কিন্তু চাকরি ছাড়া আর কী-ইবা করতে পারত সে? ব্যবসা করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কোনো একদিন তুখোড় কিংবা চটকদার ব্যবসাপাতি করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করবে, এ রকম ইচ্ছাটিচ্ছা হয়ইনি নেসারের। এম. এ. পাস করে চুপচাপ বসে থাকা বেমানান। নানাজন নানা কথা রটায়। এই যে এত বয়স অব্দি সে শাদিটাদি করেনি, এ নিয়েও তো অনেকের জিভ বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোনো কথাকেই শেষ পর্যন্ত সে আমলে আনে না।

তবে পাঁচ বছর আগেই নেসার আহমেদ একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছিল। মাইনে মোটামুটি ভালোই পায়। খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্যে, বলা যায় যথেষ্ট। আব্বার সঙ্গেই সে থাকে। তাই বাড়িভাড়া গুণতে হয় না মাসে মাসে, চাল-ডাল-নুন-মাছ-তরকারি কেনার জন্যে বাজারে গিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে হয় না। এইসব ঝক্কি-ঝামেলা নেই বলে সে তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায়। আসলে ভাগ্যফাগ্য কিছুই নেই। ওসব কথার কথা। ওসব কথা বলতে হয় বলেই মানুষ বলে, নেসার কির্কে গার্ডের 'ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং' সুটকেসে রাখতে রাখতে ভাবে। অনেকে আবার বিশ্বাসও করে প্রচণ্ডভাবে। 'আমার আপিসের সব্বাই করে', নেসার ঘরের চার দেয়ালকে শোনায়। এই প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করবার কথা নয় তার, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পড়িয়ে দিন কাটিয়ে দেবারই কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার শখ ছিল। হতে পারত, যদি না এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট নেসারকে দাগা দিত। মফস্‌সলের কোনো কলেজে ঢুকে পড়া খুব কঠিন হত না। কিন্তু ঢাকা শহর ছেড়ে মফস্বলের শ্যাওলাময় জীবনযাপন করবার লোভ তাকে কোনোদিন কাবু করেনি।

অথচ আজ তাকে, ভাগ্যের কী পরিহাস, ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে! আবার সেই ভাগ্য! আচ্ছা, মানুষ কি এসব ক্লিশে বর্জন করে কোনো কথা বলতে কি ভাবতে পারে না —নেসার নিজেকে প্রশ্ন করে। যাকগে। মোদ্দা কথা, ঢাকা ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। চাকরি থেকে রিজাইন করেছে। অন্য কোথাও কোনো চাকরি জোটাতে পারেনি এখনো। চেষ্টা চরিত্তিরও করেনি। 'দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে কি ভালো করেছি? ভালো-মন্দ জানি না, নেসার মনে মনে বলে, ঢাকা শহর ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে হবে, শুধু এটুকু জানি।' ভিন্ন জায়গায় আলাদা পরিবেশে রোজগারহীন জীবন কীভাবে কাটবে? বেশ কয়েক মাস বিনা উপার্জনে চালিয়ে যাবার মতো রেস্ত তার আছে। একেবারে পানিতে পড়বে না।

ঝট করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে নেসারকে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত, সে জানে, চটজলদি নিতে হয়। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখলে সিদ্ধান্তের ভরাডুবি হয়। আব্বার সঙ্গে কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি। বাড়ির অন্য কারো সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে নাকি — এ কথাও বলা যাবে না। আব্বার সঙ্গে নেসারের সম্পর্ক খুবই ভালো, দু'জনের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুতাও আছে। নেসারের আম্মা নেই। সে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওর আম্মার মৃত্যুর পরে তৌফিক আহমেদ, নেসারের আব্বা, আবার বিয়ে করেন। এজন্যে নেসারের মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। আব্বার দিকটি সে বরাবর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখেছে আর বিমাতাকেও গ্রহণ করেছে খোলো মনে। ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করবার মতো আজ অব্দি সে কিছুই খুঁজে পায়নি। জনাব তৌফিক আহমেদের সংসারে পা রাখার পর থেকেই তিনি স্নেহের এক মনোরম চাদর জড়িয়ে দিয়েছেন নেসারের সত্তায়। নেসারের বয়স তখন খুবই কম। আম্মার জন্যে মন কেমন করে, বুকের ভেতর হুহু করে ওঠে, চোখ ফেটে কান্না আসে। জনাব তৌফিক আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী মা-হারা ছেলেটিকে আদর-যত্ন দিয়ে প্রায় ভুলিয়ে দিলেন ওর মাতৃশোক। নিজের ছেলেমেয়ে হবার পরও সেই মমতায় ভাটা পড়েনি। কে বলবে তিনি নেসারের আপন মা নন।

রাত কত হলো? নেসার বাঁ কব্জিতে চোখ রাখে। দেড়টা বাজে। এ বাড়িতে সবাই বেশ রাত করে ঘুমোতে যায়। তাছাড়া টেলিভিশন চলে সাড়ে এগারোটা কি পৌনে বারোটা পর্যন্ত। বাইরে কালো রাত, রাতের শরীরে একটা আদিমতা জড়িয়ে রয়েছে যেন, আদিকালে এরকম রাত্তিরেই হয়তো কুমারীদের বলি দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হতো কর্কশ বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে, হরিণের শিং আটকে যাওয়া লতাপাতার পাশ দিয়ে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হলো। কোথাও বোমা ফাটল নাকি? আজকাল যা বোমাবাজি চলছে!

আব্বা-আম্মা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছোটো ভাই এজাজ পপ গান শুনতে শুনতে ইতিমধ্যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, এ রকম একটা অনুমান করা চলে। দীবা, ওর ছোটো বোন, কী করছে এখন? ঘুমুচ্ছে? হয়তো। শুধু আমি নিজে অনিদ্রার কাঁটায় বিঁধে আছি, নেসার স্বগতোক্তি করে মৃদু ম্যাকবেথের মতো। হ্যাঁ, সেও খুন করেছে নিজের ঘুমকে। যদি সে স্বাভাবিকতার পথ ধরে চলতে পারত, তাহলে আজ সে আরামে ঘুমোতে পারত

পরিচ্ছন্ন বিছানায়। এত রাতে সুটকেস গোছাতে হত না। কতদিন যাবৎ একটা আগুন তাকে পোড়াচ্ছে, ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কিন্তু এই আগুনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে গোলাপ। এই আগুনের গোলাপ তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না।

না, নেসার উন্মাদ নয়। আর দশজনের মতোই সে সুস্থ, স্বাভাবিক। আবার পুরো স্বাভাবিকও বলা যাবে না ওকে। অন্য সবাই ওকে সুস্থ, স্বাভাবিক বলেই জানে। চমৎকার স্বাস্থ্য, শরীরে কোনো ব্যাধি বাসা বাঁধেনি। তবে কি মানসিক ব্যাধি আলতো ছুঁয়ে গেছে তাকে? ঠিক তা নয়। মানসিক রোগী বলে নেসারকে কেউ শনাক্ত করতে পারবে না। সে-রকম কোনো উপসর্গ অনুপস্থিত অথচ নেসার আহমেদ নিজে জানে যে আর দশজনের মতো হয়েও সে তাদের মতো কেউ নয়। তার মনের খবর যদি কেউ রাখত তাহলে টের পাওয়া যেত, কী রকম আলাদা মানুষ সে, কতটা যন্ত্রণাবিদ্ধ।

রাতের অন্ধকার চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে ওর মনের ভেতর। কাচের জাগ থেকে পানি ঢেলে খেল। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে লক্ষ করে, কয়েকটা গাঙচিল ঢুকে পড়েছে ওর ঘরে। তবে সে একটুও বিস্মিত হয়নি। কারণ, আজই প্রথম নয়, এই ঘটনা এর আগে বহুবার ঘটে গেছে। গত তিন-চার মাস ধরে কয়েকটি গাঙচিল প্রায় রোজই আসা-যাওয়া করছে এখানে। এইটে মস্ত রহস্য মনে হয় নেসারের কাছে। তার ঘরে এত রাতে গাঙচিল আসে কোত্থেকে? কাছেধারে কোনো বিরাট নদী নেই যে, সেখান থেকে পথ ভুলে গাঙচিল এসে হাজির হবে এই ধানমন্ডির একটা বিশেষ ঘরে। সে কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে? তা হতে পারে না। এই স্বপ্ন দিনের পর দিন কেউ দেখবে কী করে? একই স্বপ্ন বড়ো জোর দু-তিন বার একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে পারে হয়তো। তার বেশি অসম্ভব। তাছাড়া সে তো ঘুমোচ্ছে না, দিব্যি জেগে আছে। সুটকেস গোছাচ্ছে, এই তো একটু আগে কির্কে গার্ডের 'ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং' বইটা সুটকেসের ভেতর রেখেছে। একটু আগে পানি খেয়েছে এক গ্লাস। কাচের জগটাও রয়েছে টেবিলে। না, চিমটি কেটে দেখতে হবে না। সে জেগে আছে। সে যেমন প্রকৃত জাগ্রত নেসার আহমেদ, গাঙচিলগুলোও তেমনই প্রকৃত জাজ্বল্যমান গাঙচিল। গাঙচিলগুলোও নিঃশব্দে আসে, আবার নিঃশব্দে চলে যায়। তবে ওরা যতক্ষণ ঘরের ভেতর থাকে, ততক্ষণ নেসারের মনের ভেতর ভয়ানক আলোড়ন চলতে থাকে। এই গাঙচিলগুলোর কথা সে কাউকে বলে নি। কেন বলবে? কেউ বিশ্বাসই করবে না। দীবা তো হেসে লুটিয়ে পড়বে খাটে। বলবে, 'তোমার মাথাটা এক্কেবারে বিগড়ে গেছে ভাইয়া।' এখন, এই মুহূর্তে, আনবে নাকি ডেকে দীবাকে? এসে নিজের চোখে একবার দেখে যাক গাঙচিলগুলোকে। কিন্তু এত রাতে একজন যুবতিকে, হোক না সে তার বোন, ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে নিজের ঘরে ডেকে আনা খুব বাড়াবাড়ি।

নেসার গাঙচিলগুলোর দিকে তাকায়। ওরা যেন নেসার আহমেদকে সম্মোহিত করে রেখেছে। 'ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং' বইটার ভেতর কী আছে এখনো সে জানে না, কিন্তু সে নিজের ভেতর ভয় আর কাঁপুনি অনুভব করছে। একটু পরে গাঙচিলগুলো উড়ে চলে গেল ঘরে শূন্যতা সৃষ্টি করে, নেসারের বুক খালি করে। এ-ও এক অদ্ভুত কাণ্ড। যতক্ষণ গাঙচিলগুলো ঘর জুড়ে বসে থাকে, ততক্ষণ নেসারের অস্বস্তির অন্ত নেই, একটা খাপছাড়া

ঝড় ওকে ক্রমাগত ছোবলাতে থাকে আর ওরা চলে গেলেই বুকটা কেমন খালি খালি লাগে, খাঁখাঁ করে গোরস্তানের মতো। দীবা যখন ওর কাছে এসে দাঁড়ায়, পাশে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প বলে, হাসাহাসি করে, গানের কলি গুনগুনিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, সে নেহাৎ মন্দ গায় না, তারপর চলে যায় — তখন প্রায় এ ধরনের অনুভূতিরই জন্ম হয় নেসারের মধ্যে। দীবা তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে নেসারের বুক শূন্য হয়ে যায়, একটা হাহাকার ঘিরে থাকে তার সত্তাকে।

কী এর নাম দেবে নেসার? এই অনুভূতির কথা, দীবা বিষয়ে তার ভাবনার কথা কাউকে বলা যায় না, এমনকি নিজেকেও নয়। দীবা, ইংরেজি সাহিত্যের ভালো ছাত্রী, সুন্দরী। বেশিরভাগ সময় নেসারের মনে থাকে না যে, দীবা ওর পিতার ঔরসজাত সন্তান, সম্পর্কে ওর বোন। সকল সম্পর্কের বাকল ফুঁড়ে যে নগ্ন, অমলিন, সুন্দর গাছটি বেরিয়ে আসে, সে দীবা নয়, ওর বোন নয়, এক চিরকালীন নারী, বন্দনীয় যার রূপ। যে ভাবনার জালে নেসার দীবাকে বন্দি করে রেখেছে সেই জালটিপ সম্পর্কে দীবা সম্পূর্ণ বেখবর। সে যখন হঠাৎ নেসারকে স্পর্শ করে কোনো কথার ফাঁকে, তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে না। সহজ স্বচ্ছন্দভাবে সে নেসারের হাত ধরে, কখনো কখনো ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'ভাইয়া, কী সুন্দর তোমার চুল।' দীবার কোনো আচরণে এতটুকু মালিন্য নেই। নিজের বিষয়ে এ কথা বলতে পারবে না নেসার। সে দীবাকে ভালোবাসে, একজন পুরুষ যেমন একজন নারীকে। সে জানে, এ কথা উচ্চারণযোগ্য নয়। কাউকে কোনোদিন এ কথা বলা যাবে না, 'দীবাকে তো নয়ই — অমন সুন্দর একটি মুখকে ম্লান করে দেবার অধিকার তার নেই। দীবাকে ঘিরে আমার মনে যে বিষাক্ত ফুল ফুটেছে', নেসার ভাবে, 'তাকে নিয়ে আমি কী করব'? ওর ভারি ইচ্ছে করে দীবাকে স্পর্শ করতে, আদর করতে। ওর সে অধিকার আছেও, তবু দীবাকে ছুঁতে ওর সাহস হয় না। কেননা সে জানে, ওর কামনা সেই স্পর্শে জড়িয়ে থাকবে সাপের মতো। যদি সেই সাপ ফণা তুলে ফুঁসে ওঠে কোনোদিন।

নেসার তিন বছর ধরে নিজেকে শাসন করে চলেছে, মনে মনে নিজেকে চাবকাচ্ছে প্রতিদিন। কয়েকদিন আগে মন্ত্রচালিত নেসার মধ্যরাতে দীবার ঘরের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জানলা খোলা। দীবা ঘুমিয়ে আছে মশারির ভেতর। ওর বুকের আঁচল সরে গেছে অনেকখানি। নিদ্রিতার সৌন্দর্য দেখে চমকে ওঠে নেসার। চোরের মতো পা টিপে টিপে এসেছে সে এখানে; হঠাৎ কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে, এই বোধও লুপ্ত হয়েছে তার। এমন বেপরোয়া সে কোনোদিন হয়নি। এ সময়ে দীবা যদি জেগে ওঠে, তাহলে সে ভয়ে চিৎকার করে উঠবে। হয়তো 'ভাইয়া, ভাইয়া' বলে তাকেই ডাকবে। নিজের বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস নেসার নিজেই শুনতে পায়। দীবা স্বপ্নের অভ্র-সরোবরে ডুবে আছে, থাক। তাকে মিছেমিছি ভয় পাইয়ে দিয়ে কী লাভ? জানলার কাছ থেকে এক ঝটকায় সে নিজেকে ছিনিয়ে নেয়। নিজের ঘরে ফিরে এসে ডোর-নব এঁটে দেয়। একটা চিতাবাঘ যেন নিজেই পুরে দেয় খাঁচার ভেতর। ফিরে এসে দেখে, গাঙচিলগুলো তখনো বিদায় নেয়নি।

সে রাতে নেসারের এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। চোখ জ্বালা, বুকের ভেতর কীসের হাহাকার। ভোরবেলা পানি খেতে খেতে সে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর মাঝে মাঝে একটি দোকান থেকে একটি-দুটি করে ঘুমের বড়ি কিনতে শুরু করে। জীবনে চূড়ান্ত ছেদ টানার মতো সংগৃহীত হবার পর পাঁচদিন আগে সে মধ্যরাতে, সে রাতেও গাঙচিলগুলো হাজির হয়েছিল, একটি ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলল চটজলদি। দ্বিতীয় বড়ি হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচার তীব্র সাধ তার ভেতর জেগে ওঠে, মাটি ভেদ করে একটা জোরালো ডগডগে উদ্ভিদ মাথা তোলে। একদিকে দুর্বিষহ জীবনাবসানের ইচ্ছা, অন্যদিকে প্রবল জীবনতৃষ্ণা। দোটানায় আত্মহত্যা করা হয়ে ওঠেনি নেসারের।

বেঁচে থাকতে হলে এ বাড়িতে থাকা চলবে না, নেসার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এখানে থাকলে তার ভেতর যে ক্লেদাক্ত কুসুম ফুটে উঠেছে তার গন্ধে সে দিশেহারা হয়ে ভুল কোনো পদক্ষেপ নিয়ে ফেলবে, কিংবা সারাক্ষণ হাঁসফাঁস করবে ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো। তাই গৃহত্যাগেই, তার উদ্ধার। উদ্ধার কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করার সময় সে হাসে, হাসতে গিয়ে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। গৃহত্যাগী হলেই তো আর দীবাকে মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। তাই উদ্ধার শব্দটি তার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। তবু তাকে চলে যেতে হবে। আবার একচিলতে বিষণ্ণ হাসি খেলে যায় নেসারের ঠোঁটে, যখন তার চোখ গ্রাহাম গ্রিনের আত্মজীবনী 'ওয়েজ অব স্কেপ'-এর ওপর পড়ে। তার পলায়ন গ্রাহাম গ্রিনের পলায়ন নয়। লেখার মধ্যেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রিন, আর তাকে পালাতে হবে বন্ধ্যা এক জীবনযাত্রায়, যেখানে থেকে ফেরার উপায় নেই আর।

গাঙচিলগুলো একে একে উড়ে আসে নেসারের ঘরের ভেতর। কেউ বসে জানলার গ্রিলে, কেউ আলনায়, কেউ-বা বিছানায়, কেউ কেউ মেঝেতে ঠাঁই করে নেয়। নেসার সুটকেসটা বন্ধ করে। কী খেয়াল হলো ওর সাইড ব্যাগে গ্রাহাম গ্রিনের 'ওয়েজ অব স্কেপ'টাও নিয়ে নিল। হাতে সুটকেস তুলে নেয় নেসার। এক্ষুনি বেরুতে না পারলে আর এই বাড়ির মায়া কাটিয়ে উঠতে পারবে না। সে পা বাড়ায়। পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করে, গাঙচিলগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত, না মৃত ওরা? নেসার ঝুঁকে একটা গাঙচিল হাতে তুলে নেয়। এত হিমঠান্ডা বস্তু সে এর আগে কখনো স্পর্শ করেনি। মৃতদের যে ঠান্ডা বাক্সে রাখা হয়, সে রকম শীতল মনে হলো গাঙচিলটাকে। ওর হাত থেকে পাখিটা মেঝেতে পড়ে যায়। নেসার বুকের ভেতর একটা বিষাক্ত ফুল নিয়ে মৃত গাঙচিলদের ডিঙিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে, হাত রাখে ডোর-নবে।

## প্রৌঢ়ের প্রব্রজ্যা

এ-ও এক পথ, অন্তহীন, আমন্ত্রণে নিস্পৃহ। দু'পাশে কোথাও কোথাও একরোখা গাছ, কোথাও কোথাও হাহাকারের মতো বন্ধ্যা জমি। তবু সে এই পথে হেঁটে চলেছে বিরামহীন, খুব ভোরবেলা থেকে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে। তার শরীর থেকে রাত্রির ঘুম ক্রমাগত ঝরে যাচ্ছে ধানের খোসার মতো। কোথায় যাবে, সে জানে না। ঘোড়া নেই, গায়ে বর্ম নেই, ঢাল-তলোয়ার-বল্লম — কিছুই নেই। একেবারে একা সে, সম্বলহীন। হয়তো কোনো কিছুর সন্ধানী, হোলি গ্রেল লোলুপ নাইট বুঝি-বা। যৌবন তাকে অনেক আগেই ছেড়ে গেছে, চুলে কাশফুলের গাঢ় প্রভাব, মুখমণ্ডলে সময়ের ধাবমান নালের আঁচড়। লোকটা পায়দল চলেছে নাছোড় খেয়ালে। কতদূর গেল, হাঁটা হলো কত ক্রোশ — হিসাব মেলাতে বসে না গাছতলায় কিংবা পুকুরপাড়ে। হাঁটতেই থাকে। পথের শেষ কোথায়, এই প্রশ্নকে কখনো আমল দেয় না। তেষ্টা পেলে কোনো গেরস্তবাড়ির কাছে গিয়ে ইঁদারার পানি চেয়ে নেয়। কেউ কেউ অচেনা অতিথিকে চিড়ামুড়ি খেতে দেয় তার চেহারায় ক্লান্তি পাঠ করে।

॥ দুই ॥

প্রৌঢ় পথিক প্রচুর গাছপালা-ঘেরা এক জায়গায় এসে জিরোয় কিছুক্ষণ। সূর্য মধ্য আকাশে বদরাগী রাজার মতো শব্দহীন গর্জন করছে। গাছতলায় বসে প্রৌঢ় কপালের ঘাম মোছে। চারপাশে কোথাও জনমানুষের সাড়া নেই। একসময়ে তন্দ্রায় চোখ বুজে আসে। হঠাৎ চটকা ভেঙে যায়। কানের পাশে সুড়সুড়ি অনুভব করে, হাতে নরম, পিছল একটা কিছুর স্পর্শ লাগে। মনুষ্যঘ্রাণপিপাসু এক কীট লোকটার রোদে-পোড়া ত্বকের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে এরই মধ্যে। নিজের ত্বক থেকে কীটটিকে বিচ্ছিন্ন করে সে ওকে কিছু দূরে রাখে। চোখ ফেরাতেই দেখে, একজন বালিকা তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দাঁড়ানো। ওর কচি, পাপস্পর্শরহিত একটি আঙুল গোলাপসদৃশ ঠোঁটে স্থাপিত। পরির মেয়ে এল নাকি এই জনবিরল বনবাদাড়ে? 'কে তুমি?' — এই প্রশ্নে অবিচল বালিকা দূরে তো সরলই না, বরং আরো একটু কাছে এগিয়ে এল। এবার তার ঠোঁটে আঙুল নেই। বালিকাটি বুঝে গেল, এই প্রৌঢ় বিপজ্জনক কেউ নয়। বালিকার বয়স পাঁচ-ছয় হবে। ঈষৎ কোঁকড়া, সোনালি চুল হাওয়ায় নড়ছে, বড়ো বড়ো চোখে দিঘি, শস্যের মাঠ আর বাঁশবনের ছায়া। সে, পথশ্রান্ত প্রৌঢ় ওর দিকে মুগ্ধাবেশে তাকায়। ওকে কাছে ডাকে, 'এই মেয়ে এদিকে এসো।' বালিকা অসঙ্কোচে চলে আসে। বালিকাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে সে, 'কোথায় থাক।' নির্বাক বালিকা আঙুল দিয়ে দিকনির্দেশ করে। প্রৌঢ় আন্দাজ করে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে, 'এখানে এসেছ কী করে?'

‘খেলতে খেলতে।’

‘খেলতে খেলতে এতদূর?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার ভয় করে না?’

‘না।’

‘তোমাকে তোমার বাবা-মা খুঁজবে না?’

‘না, খুঁজবে না।’

‘কেন? ওরা চিন্তা করবে না?’

‘কেন করবে? আমি তো রোজই আসি এখানে।’

‘তাই নাকি!’

‘আমি কি মিথ্যা কথা কই?’

প্রৌঢ় একটু হকচকিয়ে যায়।

‘চলো, ওখান থেকে বেড়িয়ে আসি’, বালিকার স্বচ্ছ, নির্মল প্রস্তাব।

‘চলো।’

প্রৌঢ় বালিকার হাত ধরে পথ চলে। বালিকা গাছের নাম বলে, পাখির নাম বলে। অবাক হয় প্রৌঢ়, বালিকারা বয়সবহির্ভূত কথাবার্তা, আচরণ তাকে ঢোক গেলায়। কিছুক্ষণ পর বালিকা প্রৌঢ়কে বলে, ‘তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ফুল নিয়ে আসি।’ চোখের পলকে সে উধাও। প্রৌঢ় গাছগাছালির ঘ্রাণে উন্মন, আশপাশে তাকায়। হঠাৎ বনবাদাড়কে কাঁপিয়ে, কান্নার রাগিণী বাজিয়ে, একটি নাবালিকার আর্তনাদ তাকে টলিয়ে দেয়। আর্তস্বর লক্ষ করে সে ছুটতে থাকে, গাছের প্রসারিত ডালপালার প্রতিরোধের প্রতি উদাসীন। বালিকার আর্তনাদ তাকে টলিয়েছে, ছুটিয়েছে নিশ্চয়। সে দৌড়ুতে দৌড়ুতে থমকে দাঁড়ায় একটি দৃশ্যের মুখোমুখি। এই বিষণ্ণতার মোকাবিলা করার সাধ্য কি প্রৌঢ়ের আছে। পরির কন্যাসদৃশ বালিকা নিমজ্জিত-প্রায়। সে ডুবছে। সংশয়াতীত এক চোরাবালি বালিকাটিকে টানছে নৃশংসতায়। প্রৌঢ় অলস, নিষ্ক্রিয়, তার মাথার ভেতর যেন এক রাশ কুয়াশা ঢুকে পড়েছে। এখানে চোরাবালি ছিল, বালিকা কি জানত না? প্রৌঢ় দড়ি পাবে কোথায় এই খাপছাড়া জায়গায়! শক্ত লতাপাতা দিয়ে দড়ি বানাবার মতো সময় নেই হাতে। সে অসহায় চেয়ে থাকে ডুবন্ত বালিকার দিকে। আর্ত চিৎকার থেমে গেল একসময়ে;চোরাবালি এখন ঢোঁড়া সাপ।

প্রৌঢ় এই গুপ্তঘাতক জায়গা ছেড়ে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। নিশ্চয় কেউ দেখেনি তাকে, কেউ দেখছে না। সূর্যের চড়ে ওর মাথা হয়তো সাময়িকভাবে বিগড়ে গিয়েছিল, আসলে বালিকা আর তার মৃত্যুদৃশ্য একটি মুখোশ নৃত্যের সামিল —সে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওর হাতে এখনো সেই বালিকার স্পর্শ লেগে আছে, এখনো এক কচিকণ্ঠ তার কানে স্মৃতিকে বাজিয়ে চলেছে। সে হাঁটে, যেন একটি পদক্ষেপে পেরিয়ে যাবে এক ক্রোশ পথ। এখান থেকে যত দূরে চলে যায় তত ভালো।

## ॥ তিন ॥

তার গালে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি, পাঞ্জাবি পাজামায় টোকা দিলে ধুলোমাটি ঝরে পড়বে। তবু তার গৌরবর্ণ, চোখের চাউনি, কথার অনায়াস বর্ণালি সবাইকে বুঝিয়ে দেয় এই গাঁয়ে সে এক আগন্তুক। বেঁচে থাকতে হলে তার আহার্য দরকার। বসিয়ে বসিয়ে তাকে খাওয়াবে কে? এখানে অনেকেই খেতি করে সে খেতমজুর হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে চটজলদি। স্বেচ্ছায় শ্রেণিচ্যুত হয়ে ঘোরাফেরা করে দু-চার দিন এখানে-সেখানে। তারপর ছুটে যায় এক কৃষক পরিবারের আশ্রয়ে। শ্রম দেয় কৃষকের খেত-খামারে।

খেতে ফসল কাটার ফাঁকে, কিংবা সাঁঝবেলা গোরু নিয়ে ঘরে ফেরার পথে অন্তহীন এক পথের কথা মনে পড়ে, বুকের ভেতর একটা চোরাবালি নড়ে ওঠে জন্তুর পিঠের মতো, এক জোড়া বড়ো বড়ো চোখ, ঈষৎ কোঁকড়া সোনালি চুল,ঠোঁটে পাপস্পর্শরহিত আঙুল ওকে বিচলিত করে। ভুলে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সে কতকাল পালিয়ে বেড়াবে সেই দৃশ্য থেকে?

এই দুশ্চিন্তা ছাড়া ওর দিন ভালোই কাটে এই অজ পাড়াগাঁয়ে। শাক-ভাত, মাঝেমধ্যে গুঁড়ো মাছ আর ঘরে পাতা দই খেতে মন্দ লাগে না। খেতে সারা দিন খেটেখুটে যখন বাড়ি ফিরে চাটাইয়ে গা এলিয়ে দেয় তখন নিজেকে শতকরা একশো ভাগ কিষান মনে হয়।

একদিন খেতে কাজ করতে করতে গায়ে জ্বর এল ঝেঁপে। গা খরার জমির মতো পুড়ে যাচ্ছে। সে ফিরে আসে কৃষকের কুটিরে। ওর পক্ষে সেদিন কাজ করা আর সম্ভব ছিল না। নিঝুম কুটির, কৃষকের বউ শুয়ে আছে দাওয়ায় দামাল হাওয়ার স্পর্শের লোভে। জ্বরতপ্ত প্রৌঢ় দেখে, কিষানীর মধ্যযৌবন লুটিয়ে আছে পাটিতে, চোখ দুটি খোলা কি বন্ধ বোঝা যাচ্ছে না, লালপেড়ে শাড়ি উরুর ওপর উঠে এসেছে, বুকের কাপড়ও স্খলিত, সুগঠিত দুটি স্তন নগ্নতায় ঈষৎ বিচলিত যেন। প্রৌঢ় পুড়তে-থাকা শরীর নিয়ে এগোতে থাকে কিষানীর কপট নিদ্রার দিকে।

কিষানী প্রৌঢ়কে আগেভাগেই লক্ষ করেছিল। জ্বরতপ্ত লোকটা ওর পাশে বসে। অদূরে গাছে একটি পাখি ডেকে ওঠে। পাখির ডাক কিষানীর শুয়ে থাকা আর প্রৌঢ়ের ঝুঁকে থাকায় আঁচড় কাটে। কিষানীর চোখ খোলা, ওর বুকের ভেতর টগবগে, ফুটন্ত লাল চালের ভাত। ওর বিস্রস্ত যৌবন ওরকমই থাকে। প্রৌঢ় উঠে পড়তে চায় নিঃশব্দে। কিষানী খপ করে ধরে ফেলে জ্বরতপ্ত হাত। লোকটা কিষানীর স্তনে হাত রাখে, ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর। ওর নিশ্বাসের হল্‌কা কিষানীকে বিহ্বল করে। কিষানী হঠাৎ উঠে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে তড়াক করে, বলে, 'এই হানে না, ঘরের বিতরে চলেন।' জ্বরতপ্ত পুরুষ রমণীকে অনুসরণ করে।

কৃষক-কিষানী নিঃসন্তান। কিষানী কেন যে এই ভিনদেশি লোকটাকে, যার বয়স হয়েছে, এত পছন্দ করে, ওর প্রতি বেলাগাম টান অনুভব করে, সে নিজেই বুঝতে পারে না। এতদিন রমণীসঙ্গ-বঞ্চিত পুরুষ তার প্রৌঢ়ত্বের ভার মাঝে মধ্যে কিষানীকে

অর্পণ করে নিজের খরাধূসর জীবনকে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ করে তোলে। এই অবৈধ সংগমকালে প্রৌঢ়ের চোখে অনিবার্যভাবে ভেসে ওঠে একটি বালিকার মুখ। আর কী এক অবোধ্য প্রক্রিয়ায় বালিকার মুখ যুবতির মুখ হয়ে যায়। তখন সংগম হয়ে ওঠে বেপরোয়া।

কিষানীর গোপন, নিশ্ছিদ্র শুশ্রূষায় প্রৌঢ় সুস্থ হয়ে ওঠে। আবার লেগে যায় খেতির কাজে। সে মাঝে মাঝে লক্ষ করে, কৃষক ওর ওপর অকারণ চটে যায়, এভাবে তাকায় যেন সে মস্ত কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। তাহলে কি কৃষক টের পেয়েছে ওর আর কিষানীর অকাম্য অন্তরঙ্গতা?

একদিন রাতে চাটাইয়ে শুয়ে সে আকাশের তারা দেখছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল স্বামী স্ত্রীর তুমুল ঝগড়া। পুরুষকণ্ঠের গর্জনই বেশি। প্রমাদ গোনে সে. কী যে হয়! একসময় ঝগড়ার ঝড় থেমে আসে। সেও ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে সে জেগে ওঠে কিষানীর স্পর্শে। কেন জানি সে ভয় পায়। কিষানীকে সে চলে যেতে বলে, কিন্তু রমণী অনড়, কিষানী দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে। হয়তো কৃষকের ভর্ৎসনা ওর কামনাকে আরো প্রবল করে তুলেছে আজ তারাভরা রাতে। প্রৌঢ় কিষানীর স্তনে মুখ গুঁজে যৌবনের ঘ্রাণ নিতে চায় যেন। চূড়ান্ত মিলনের পর দুটি ক্লান্ত শরীর দুদিকে এলিয়ে পড়ে। অকস্মাৎ মালেকুল মৌতের ছায়া প্রবেশ করে হতচ্ছাড়া ঘরের ভেতর। কৃষক তার স্ত্রীর চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। কৃষককে বাধা দেওয়ার সাহস হল না ওর। তবে ক্রুদ্ধ কৃষকের পেছনে পেছনে গেল সে। কী করবে সে কিছুই ভেবে পেল না। ঘরে উঁকি দিতেই দেখে কৃষক দা দিয়ে কুপিয়ে মারছে কিষানীকে, কিষানীর মুখ বাঁধা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটির ভিটা।

প্রৌঢ় কৃষকের বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে পালায় নক্ষত্রের রাতে, দিশেহারা দৌড়ুতে দৌড়ুতে খটখটে রোদে কোথায় এসে পৌঁছয়, বুঝতে পারে না। সে পড়ে থাকে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে। একেই তো বট-পাকুড় বলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে। একটা গল্প বলতে হবে ওর। কাকে বলবে?

## ॥ চার ॥

শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কাছের থানায় যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলে সে। থানায় যাওয়া খুবই জরুরি। এত মনোভার বওয়া আর সম্ভব নয়। ওকে বলতেই হবে বালিকার মৃত্যুর কথা, কিষানীর খুন হওয়ার কথা। এই দুটি মৃত্যুর জন্যে সে নিজে তেমন দায়ী নয়, অথচ বারে বারে নিজেকেই অপরাধী মনে হয় ওর। ক্ষুৎকাতর প্রৌঢ় ছেঁড়া, মলিন পোশাকে রওয়ানা হয় থানার দিকে।

দূর থেকে থানার দিকে তাকিয়ে ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। কী বলবে সে? কেমন করে বলবে? সে যে নিরপরাধ, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? না-ই করুক, তবু সত্যি কাহিনি ওকে বলতেই হবে। থানার উঠোনে পা রাখতেই ওর গা ছম ছম করে। কেউ কোথাও নেই। কোনো পাহারাদার নেই। থানার ভেতর পুলিশ, দারোগা কেউই নেই। আসামির শিকঅলা ঘরও খাঁ খাঁ। চেয়ার-টেবিল ছুঁয়ে দেখল, পুরু ধুলো জমেছে

সবখানে। কিছু ধুলো ওর গায়ে লাগে। একটা ছুঁচো ওর পা ঘেঁষে পালায়। ধুলোর গন্ধে হাওয়া ভারী। সেই বিরান জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে পথের দিকে পা বাড়ায়। থানার ধূসর ছাদে তিনটি দাঁড়কাক। দাঁড়কাকের গলার আওয়াজ এমন উদাস, ওর জানা ছিল না। পরিবেশে বাউল কবির মরমি ছায়া, এক ধরনের আধ্যাত্মিক ব্যাপকতা।

## ॥ পাঁচ ॥

চোখ খুলে সে দেখতে পায়, টুপি-পরা এক ভদ্রলোক ওকে হাত-পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। এখন সে কোথায়, জানতে চাইল। একটি মসজিদের পাশের এক ঘরে শুয়ে আছে সে। ঘরটি ইমাম সাহেবের। তিনি ওকে ধূলিধূসর পথ থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। প্রৌঢ়ের মনে পড়ে, পথ চলতে চলতে ক্ষুৎপিপাসাকাতর সে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। ইমাম সাহেব কয়েক দিন পর ওকে নামাজ আদায় করতে বললেন। কারণ, তিনি কোনো বেনামাজীর সঙ্গে একঘরে থাকতে পারেন না। তিনি দয়ালু এবং প্রকৃত ধার্মিক। ধর্মে জোরজবরদস্তি অচল, এ কথা তিনি জানেন। প্রৌঢ়কে ঘরে রাখতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। পাড়ার মাতব্বর গোছের লোকজন, যারা নিজেরা পুরো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, নানা কথা বলছে। এ ধরনের লোককে ঠাঁই দেওয়া নাকি গুনাহ্‌র কাজ। প্রৌঢ় ইমাম সাহেবকে বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক। তাই, ইমাম সাহেবের প্রীতি এবং দুদিনের আশ্রয় ছেড়ে সে আবার পথে পা বাড়ায়।

## ॥ ছয় ॥

কয়েক মাস এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সে একদিন একটি পাহাড়ি এলাকায় এসে পড়ে। এই এলাকাটিকে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছে। এখানে জীবন কাটিয়ে দেয়ার কথা ভাবে সে। দু'বেলা আহার জুটিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা সে করে নিতে পারবে। এখানে সবুজের মাঝখানে সাদা রঙের একটি চর্চা তার স্পষ্টতা ফুটিয়ে রেখেছে। এখানকার অধিকাংশই খ্রিস্টান। নেটিভ খ্রিস্টান। এক নিঃসঙ্গ, সহৃদয় পাহাড়ি, যে নেটিভ খ্রিস্টানও বটে, তাকে থাকতে বলে তার বাড়িতে। পাহাড়ি ওকে পেয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গতার ছায়া থেকে কিছুটা সরিয়ে আনতে পেরেছে। প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলে আরাম পায় পাহাড়ি। কিন্তু পাহাড়ি বুঝতে পারে, কিছু কথা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এই চালচুলোহীন লোকটা। প্রৌঢ় ভাবে চোরাবালিতে ডুবে-মরা বালিকার কথা, স্বামীর দায়ের কোপে ভিটেময় রক্তস্রোতে লুটিয়ে পড়া কিষানীর শরীরের কথা। দু'জনকে কি সে বাঁচাতে পারত — এই প্রশ্ন তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিদ্রাহীন করে। মনের এই অস্বাভাবিক চাপ পড়ে শরীরের ওপর। সে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে থাকে স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও সুস্বাদু খাদ্য সত্ত্বেও।

সে একদিন পাহাড়ির সঙ্গে দুধসাদা চার্চের ভেতরে যায়। চার্চের ভেতরে কেমন একটা প্রাচীন ঘ্রাণ, যা মোম ও আবদ্ধ জায়গার শীতল গুমোটের সংমিশ্রণ তৈরি। ওদের দিকে এগিয়ে আসেন মিশনারি পাদরি। তার ঢোলা পোশাকের শুভ্রতায় কিছু সম্মোহন

আছে। পাদরি প্রৌঢ়কে আচমকা প্রশ্নে অপ্রস্তুত করেন, 'তুমি কি খ্রিস্টান হইবে?' প্রৌঢ়ের ছন্নছাড়া দৃষ্টিতে 'না' পাঠ করে যিশুর একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁর মিশনারি উদ্দীপনা সংযত করলেন। ঢোলা সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তির সংযমে প্রৌঢ় সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ হলো।

যিশুর একটি বৃহদাকার ছবির দিকে নজর পড়ল প্রৌঢ়ের, যে ছবিতে মরিয়মের পুত্র ক্রুশবিদ্ধ। সে নিজেকে যিশুর জায়গায় দেখতে পেল সেই চিত্রটিতে এবং এক ইন্দ্রজালে প্রৌঢ় নিঃসঙ্গ ক্রুশবিদ্ধ এক পাথুরে জায়গায় খোলা প্রান্তরে। ওকে তুলে দেয়া হয়েছে ক্রুশকাঠে, ঠোকা হচ্ছে পেরেক। ওর বুক চিরে বেরুচ্ছে গৃহহারা আর্তনাদ। একটি বালিকা যার ঈষৎ কোঁকড়া, সোনালি চুল, বড়ো বড়ো চোখ, একটি পাপস্পর্শরহিত আঙুল ঠোঁটে স্থাপিত, অদূরে দাঁড়ানো। ওর আর্তনাদ আর চোরাবালিতে নিমজ্জমান বালিকার আর্তস্বর একাকার। একজন কিষানী রক্তস্নাত শাড়ি দিয়ে চেপে ধরেছে প্রৌঢ়ের শরীর থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত। কিষানীর রক্তস্রোত মিশে যেতে থাকে ক্রুশবিদ্ধ লোকটার নির্জন রক্তধারায়। রক্ত একটি গল্প বলতে শুরু করে। 'আমেন' — কারা যেন উচ্চারণ করল, সে শুনতে পায় চরম আচ্ছন্নতায়।

# বর্ষারাতে নূপুর-ধ্বনি

বিছানাটা যেন তাকে খোঁচাচ্ছে, হয়তো অলক্ষ্যে অনেকগুলো কুশ গজিয়েছে ডোরাকাটা চাদরে। আশেক চৌধুরী উসখুস করছিলেন। কতক্ষণ? অনেকক্ষণ কি? না, কিছুক্ষণ, দু-চার মিনিট হবে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর। কী একটা স্বপ্ন দেখছিলেন, এখন আর মনে নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আশেক চৌধুরী। স্ত্রী নাসিমার নাক ডাকছে ঘন ঘন। আশেক চৌধুরীর মুখে বিরক্তির ছায়া। তিনি আস্তে আস্তে টেবিলের কাছে গিয়ে হাত-ঘড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বাতি জ্বালালেন। ঘড়িতে একটা বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ রাতদুপুর, তিনি মনে মনে বললেন। টেবিলে রাখা পানি ভরা জগটির দিকে তাকালেন তিনি, জগের পাশে তৃষিত চাতক গ্লাস। আশেক চৌধুরীব তেষ্টা পেল, গলা শুকিয়ে আসছে তার। পুরো এক গ্লাস পানি তিনি ঢক ঢক করে খান। বাতি নিভিয়ে চেয়ারে এসে বসেন। সিগারেটের প্যাকটটা কোথায়? আলো জ্বেলে খুঁজতে হয় কিছুক্ষণ, আখেরে প্যাকেট আবিষ্কৃত হলো টেবিলে রাখা একগাদা এলোমেলো বইয়ের পেছনে। সিগারেট ধরিয়ে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করেন, দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন বাইরে। গাঢ় অন্ধকার। পাশের বাড়ি নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত। কার্নিসের নীচের পায়রা দুটোও সম্ভবত ঘুমে কাদা। আবার বাতি নিভিয়ে দেন আশেক চৌধুরী।

ঠান্ডা হাওয়া আশেক চৌধুরীকে ছুঁয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টির শব্দ, অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। জানলা বেশিক্ষণ খোলা রাখা যাবে না, ঘর ভিজে যাবে পানির ঝাপ্টায়। আশেক চৌধুরী অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানালা বন্ধ করে দেন। ঠান্ডা হাওয়া আর বৃষ্টি বেশ উপভোগ করা যাচ্ছিল। নাসিমার ঘুম ভাঙেনি। নাসিমা ইদানীং, আশেক চৌধুরী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভাবেন, মুটিয়ে গেছে। নাসিমাকে মাঝারি সুন্দরী বলা চলে, আগে অন্তত তাই মনে হতো। ওর চেহারায় এখনো লাবণ্য ছড়ানো। আশেক চৌধুরীর নিজেরও ঈষৎ মেদবৃদ্ধি হয়েছে, ভুঁড়িটি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কিছুদিন থেকে। উদরের এই স্ফীতি নিজের কাছেই বিরক্তিকর ঠেকে। হঠাৎ 'নবজাতক' সাহিত্যপত্রের সম্পাদকের ভুঁড়িটিও আশেক চৌধুরীর দৃষ্টিপথে। মেধাবী, কৃতী সম্পাদকটির নেয়াপাতি ভুঁড়ি আজকাল চোখে পড়ার মতোই। এই সম্পাদক নাছোড়বান্দা, শহরের কুঁড়েতম লেখকের কাছ থেকেও লেখা আদায় করে ছাড়েন। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আশেক চৌধুরীকে একটি ছোটোগল্প দিতে হবে 'নবজাতক' সম্পাদককে। গল্পটি চাই বিশেষ সংখ্যার জন্যে। গল্প দিতেই হবে, অথচ এখনো এক বর্ণও লেখা হয়নি।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। সম্ভাব্য গল্পের কথা ভাবছেন চল্লিশোর্ধ্ব আশেক চৌধুরী। যিনি ইতিমধ্যেই দেশের একজন খ্যাতিমান কথাশিল্পী। গল্পের কোনো আভাসও ফুটে উঠছে

না মগজের কোণে। সবকিছু কেমন ধোঁয়াশায় নিমজ্জিত। বৃষ্টির শব্দ কি ঝিমিয়ে এল? বোধহয়, এখন শুধু রিমঝিম বৃষ্টি। একটু পরেই হয়তো থেকে যাবে, রাস্তায় জমবে পানি। আশেক চৌধুরী জানেন, খুব শিগ্‌গিরই ঘুম আসবে না তার অনেকক্ষণ জেগে থাকতে হবে। রাত গড়িয়ে ভোরও হতে পারে। সম্প্রতি তার উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়েছে। নির্ঘুম রাত কাটালে রক্তচাপ বাড়তে পারে, এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশেক চৌধুরীর ঘুম আরো বেশ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিনি আবার এক গ্লাস পানি খেলেন। ঘুম আসে না। কী একটা শব্দ কানে ভেসে এল তার। সামান্য শব্দ নয়। এই শব্দের নিজস্ব একটা সুর আছে, আশেক চৌধুরীর মনে হয়। শব্দ বারান্দার দিক থেকে আসছে। নাসিমা গাঢ় ঘুমে অচেতন। তিনি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। ঠান্ডা ভেজা হাওয়া তাকে জড়িয়ে ধরে। চোখের সামনে একজন তরুণীকে দেখে চমকে ওঠেন। তরুণীর বয়স অন্ধকারেও আঁচ করা যায়, আটাশ-তিরিশ হবে সম্ভবত। পরনে ধানি রঙের ম্যাজেন্টা পেড়ে শাড়ি। ম্যাজেন্টা রঙের ব্লাউজ, নিতম্ব-ছোঁয়া কালো চুলের ঝরনাধারা। হঠাৎ ভেসে-আসা শব্দ, যার সন্ধানে বারান্দায় এসেছেন আশেক চৌধুরী, আরো একবার কানে আসে এবং তিনি বুঝতে পারেন শব্দটির উৎস তরুণীর দুটি পা। রাঙা পায়ে রুপোলি নূপুর, যা অন্ধকারেও উদ্ভাসিত।

না, বৃষ্টি থামেনি। বৃষ্টি আরো জোরদার হয়েছে, তবে অন্ধকারে বেশ কিছুটা তরল এখন। বিস্মিত আশেক চৌধুরী প্রশ্ন করেন, 'কে আপনি?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি একজন নারী', তরুণীর জবাব।

'তা' অবশ্য দেখতে পাচ্ছি? এটা কোনো পরিচয় নয়, নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

আপনার নাম কী? কী করেই-বা এলেন এখানে এত রাতে?'

'আমার কোনো নাম নেই, আমি বেনামি।'

'রহস্য বাদ দিয়ে বলুন আপনার কী নাম। আমার এই বারান্দায় এলেন কীভাবে।'

'ধরুন আমার নাম তাহেরা। আর এখানে কী করে এলাম জানতে চান? হাওয়ায় ভেসে এসেছি কাটা ঘুড়ির মতো।'

'ভারি মুশকিলে পড়লাম দেখছি। হেঁয়ালি ছেড়ে সাফ সাফ কথা বলুন।'

'আমি স্পষ্ট কথা বলছি, আপনার সঙ্গে কোনো তামাশা করছি না। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি আমি, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে না। তাছাড়া সবাই আমাকে দেখতেও পায় না, যদি আমি দেখা না দিই। এই যে আপনার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছেন তিনি কিন্তু জেগে উঠলেও আমাকে দেখতে পাবেন না।'

'আপনি জানলেন কী করে যে আমি বিবাহিত? তাছাড়া আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছেন, এটাই বা জানলেন কীভাবে?

'আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি।'

'কী জানেন আমার বিষয়ে?'

আপনি একজন বিখ্যাত লেখক, সংবাদে কাজ করেন। আপনি পিতৃমাতৃহীন এক নিঃসন্তান। ভীষণ আড্ডাবাজ লোক আপনি, আলসেমি করার প্রবণতা আপনাকে কখনো কখনো সমস্যায় ফেলে। আপনি প্রচুর সিগারেট খান, হুইস্কি খুব পছন্দ করেন। ভালো ফিল্মের অনুরাগী আপনি। আপনাকে ঘরকুনোই বলা যায়, তবে কখনো কখনো শহরের বাইরে চলে যান বেড়াতে। সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে হলে অনেক দূর যেতেও আপনি কুণ্ঠিত নন। প্রথমে 'না' করলেও অনুষ্ঠানের আয়োজকরা পীড়াপীড়ি করলে রাজি হয়ে যান শেষ পর্যন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্প্রতি আপনি একটি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন। ঠিক বলেছি?'

আশেক চৌধুরী বিস্ময়-বিহ্বল। এ কী করে সম্ভব? নতুন উপন্যাস লিখতে যে তিনি শুরু করেছেন, এ খবর কারুরই জানার কথা নয়। কাউকে তিনি বলেননি। নাসিমা তো তার লেখালেখির কোনো খবরই রাখে না। রান্নাবান্না আর বাংলা ফিল্ম নিয়েই আছে। মাঝে-মাঝে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে পুরো এক মাস।

'আমার সম্পর্কে এত খবর রাখে কী করে এই তরুণী' নিজেকেই প্রশ্ন করেন আশেক চৌধুরী। তিনি তাহেরা অর্থাৎ তরুণীটির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আশ্চর্য, আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি, কোনো কথা হয়নি, অথচ আপনি আমার ভেতরকার কথাসুদ্ধ জানেন দেখছি। এটা কী করে সম্ভব?'

'এই দুনিয়ায় অনেক কিছুই সম্ভব।' তরুণীর চোখেমুখে হাসি।

'হয়তো; আমার জানা নেই।'

'কই, আপনি তো আমাকে বসতেও বললেন না একবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলব কতক্ষণ? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

'চলুন, ভেতরের ঘরে গিয়ে বসা যাক।'

'চলুন, আরেকটি কথা। আপনার গিন্নিকে জাগাবার চেষ্টা করবেন না। ওকে ঘুমোতে দিন সকাল পর্যন্ত। তাছাড়া ভোরের আগে ওর ঘুম ভাঙবেও না।'

আশেক চৌধুরী তাহেরার কথা শুনে ক্রমাগত বিস্মিত হয়ে চলেছেন। বিস্ময়ের ঘোর এতটুকু কাটেনি।

লেখার টেবিলের কাছ ঘেঁষে আশেক চৌধুরী আর তাহেরা মুখোমুখি বসেন। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটি ছাইদানিতে গুঁজে প্যাকেট থেকে আবার সিগারেট ধরান গৃহকর্তা। ঘরে ঢোকার সময় তাহেরার নূপুরের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয় একটু জোরে। নিদ্রিতা নাসিমা পাশ ফিরে শোয়, কিন্তু ওর নিদ্রায় কোনো আঁচড় পড়ে না। ঘরের পাতলা অন্ধকারে সম্পূর্ণ অচেনা এক নারীর মুখোমুখি বসে আশেক চৌধুরীর নিজেকেও কেমন রহস্যময় কোনো প্রাণী মনে হয়। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে কোনোদিনই হতে হয়নি। তিনি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেছেন এই অচেনা, আশ্চর্য অতিথির কাছে।

'আপনি মেহেরবানি করে আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। আপনার ঘুম কেড়ে নিয়েছি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার সঙ্গে আজ এই বর্ষার রাতে মন খুলে কথা বলতে না পারলে আমি শান্তি পাব না। আমার এই উৎপীড়ন আপনাকে একটু সইতেই হবে। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।'

'না, আমি কিছুই মনে করছি না। আপনি যা খুশি বলুন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগছে। আপনার বাচনভঙ্গি চমৎকার।'

'ধন্যবাদ। তাহলে শুনুন আমার কাহিনি। আমার বাবা-মা আমাকে বড়ো শখ করে বিয়ে দেন তাঁদের পছন্দের এক ছেলের সঙ্গে। ছেলে দেখতে ভালো, মোটামুটি ভালো চাকরি করে, স্বভাব চরিত্রও সব ঠিকঠাক, কিন্তু কিছুটা অমার্জিত, যা আমার বাবা-মা বুঝতে পারেননি। সবাই চটজলদি বুঝতেও পারে না। গোড়ার দিকে আমাদের দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব ছিল। ওকে আমি পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ওর স্বভাবের স্থূলতা ধরা পড়তে শুরু করে আমার কাছে। তার মুখে কখনো কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হতে শুনিনি, গান-বাজনার প্রতি ওর কোনো ঝোঁকও লক্ষ করিনি। এমনিতে ব্যবহার খারাপ নয় ওর, কিন্তু কোথায় যেন তার মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা লুকানো ছিল বেড়ালের থাবার মতো। শুরুতে টের পাইনি। বিয়ের কয়েক মাস পরে পর্যায়ক্রমে সেটা প্রকাশিত হয়। আমাকে পীড়ন করে যেন সুখ পেত সে। প্রথমে আমল দিইনি। আমল দেয়ার মতো ছিলও না তেমন। কিন্তু বেশ কিছুকাল পর পীড়নের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। বিছানায় সে এ রকম আচরণ করত যাতে মনে হতো ও একজন সুবিবেচক, প্রেমপ্রবণ, মধুর স্বভাবের মানুষ। আদর করার সকল কলা ওর আয়ত্তে, অথচ বিছানার বাইরে ওর কোমলতা কোথায় উবে যেত। সামান্য ত্রুটি হলেই খিটিমিটি। আসল বিরোধ শুরু হয় একজোড়া নূপুর নিয়ে। আমার যখন বালিকা বয়স তখন থেকেই নূপুর পরে কিছুক্ষণ কাটানো আমার শখ। নাচ শেখা হয়নি, কিন্তু নূপুরের প্রতি টান কেন জানি দিনের পর দিন, বছরের পর পর বাড়তেই থাকে। বাবা-মা কিছুই বলতেন না, বরং প্রশ্রয় দিতেন আমাকে। আমার নূপুরপ্রীতি, ধরে নিতে পারেন, নেশায় পরিণত হয়। একদিন পায়ে নূপুর না বাঁধলে নিজেকে খাপছাড়া লাগত।'

এটুকু বলে হয়তো দম নেয়ার জন্যে তাহেরা থামলেন।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, নাসিমা ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে ওর। তাহেরা জানলার বাইরে মদির দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন কিছুক্ষণের জন্যে। ওকে ভারি সুন্দর লাগছে আশেক চৌধুরীর কাছে। তিনি সেই উদাসীন সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন, ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়। নিজেকে সংযত রেখে গল্পপিপাসু বালকের মতোই জিজ্ঞেস করেন—'তারপর? তারপর কী হলো? আশেক চৌধুরীর ঔৎসুক্য তাহেরাকে আবার কথা বলায়—

'আমার নূপুর আস্তে আস্তে ওর চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। প্রথমে ঠাট্টা-মশকরা, পরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, গালিগালাজ শেষে নূপুর কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা। আমারও জেদ চেপে

যায়। কিছুতেই নূপুর জোড়া হাতছাড়া করি না, রোজই একবার পায়ে নূপুর বেঁধে হাঁটি। কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি আয়নার সামনে। আমার নূপুর কারো বাড়া-ভাতে ছাই দেয়নি। ঘরের সব কাজ সেরে দশ-পনেরো মিনিট শুধু আমি নিজের মতো থাকতে চাইতাম। আমার স্বামী সহ্য করতে পারত না, আমার এই হয়ে-ওঠা, শেষের দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে মারধর শুরু করে। আমি অপমানে, ক্ষোভে, অভিমানে একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে নিজেকে চিরঅন্ধকারে বিলীন করে দিই। সেই মুহূর্তেও নূপুর জোড়া বুকে চেপে রেখেছিলাম, যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে।'

এই অচেনা হঠাৎ-অতিথির কাহিনি আশেক চৌধুরীকে বেদনার্ত করে তোলে। তিনি কখনো তাহেরার দিকে তাকান, কখনো ওর নজর পড়ে বুক শেল্‌ফে, কখনো ঘুমন্ত নাসিমার শয়নভঙ্গিতে, কখনও-বা পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশে। তখনো বৃষ্টি থামেনি।

কথাশিল্পী আশেক চৌধুরী কোনো কথা খুঁজে পান না। তবে তাহেরার চোখের পানি ওর দৃষ্টি এড়ায় না।

'আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। কথা দিন, আমার অনুরোধ রাখবেন' — তাহেরার কণ্ঠস্বরে আকুলতা।

'কী অনুরোধ? সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব।'

'আমার কাহিনি আপনাকে লিখতে হবে, আজ-কাল-পরশুর মধ্যেই লিখতে হবে। এজন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

'এই শহরে আমার চেয়েও উঁচুদরের লেখক আছেন, তাঁদের একজনের কাছে গেলেই তো পারতেন। আমার কাছে এলেন কেন?'

'কারণ, অন্য কেউ আপনার মতো আমাকে বুঝতে পারবেন না। লিখবেন তো আমার কাহিনি?'

'চেষ্টা করব।'

'শুধু চেষ্টা নয়, লিখতেই হবে আপনাকে। না লিখলে আবার আসব আমি, বারবার আসব। আপনার রাতের ঘুম নষ্ট হবে, শরীর খারাপ হবে। আপনার তো আবার হাই ব্লাড প্রেসার। রাত শেষ হয়ে আসছে, আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। আমার কাহিনি লিখবেন কিন্তু।'

আশেক চৌধুরী মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন অতিথির কথা। সিগারেটের প্যাকেট নেয়ার জন্যে টেবিলে চোখ রাখলেন। দৃষ্টি ফেরাতেই দ্যাখেন সামনের চেয়ার শূন্য। একটু আগে সেখানে কেউ ছিল, মনেই হচ্ছে না। বাইরে রিমঝিম শব্দও লুপ্ত। তাহেরা চলে গেল, কিন্তু নূপুর তো বেজে ওঠেনি। সিগারেটের ধোঁয়ায় মুহূর্তের জন্যে যেন তরুণীর মুখ ভেসে ওঠে। 'সত্যিই কি কেউ আমার ঘরে এসেছিল', কথাশিল্পী নিজেকে প্রশ্ন করেন। নাকি কোনো স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। সাতপাঁচ ভাবছেন তিনি, এরই মধ্যে চেনা নূপুর-ধ্বনি শুনতে পান ঘরময়।

ভোরের আলোয় ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নাসিমা কখন উঠে রান্নাঘরে চলে গেছে আশেক চৌধুরী টের পাননি। বাথরুমের কাজ সেরে আবার লেখার টেবিলে এসে বসেন,

বারান্দায় তিন-চারটি চড়ুই চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে, আকাশে মেঘ জড়ো হতে শুরু করে। হয়তো একটু পরেই জলধারা নামবে এই গলিতে, বাড়ির ছাদে, গাছের ওপর। কথাশিল্পী আশেক চৌধুরী লেখার কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করেন প্রতিশ্রুতি গল্প। দু-একটি লাইন কাটাকুটি করে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন তিনি, একটি প্যারা ইতিমধ্যে লেখা হয়ে যায়। কিন্তু কী মনে করে তিনি কলমের গতি থামিয়ে দেন রাতের অতিথিকে আরো একবার দেখবার, ওর সঙ্গে কথা বলবার একটা ইচ্ছা হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে। লেখার কাগজে নূপুর বাজতে থাকে, আশেক চৌধুরীর চোখ যেন কীসের প্রত্যাশায় চশমার পুরু কাচের পেছনে বড়ো জ্বলজ্বলে। নাশতা খাওয়ার তাগিদ আসে ডাইনিং স্পেস থেকে। নাসিমা ডাকছে তাকে। তাই তো, বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আমাদের লেখক, তার কানে নূপুর-ধ্বনি। বৃষ্টির শব্দ আর নূপুর-ধ্বনি যুগ্মতায় জড়িয়ে ধরে তাকে।

## না রোদ, না জ্যোৎস্না

আবিদ আলি আজ পড়ন্ত বিকেলের বেশ কিছু আগেই বাসায় ফিরলেন রোজ যেভাবে ফিরে আসেন, ঠিক সেভাবে নয়। তাঁর অফিসের দু'জন সহকর্মী তাঁকে নিয়ে এসেছেন ধরাধরি করে। বাসে চেপেই এসেছেন তারা। কম বেতনের চাকুরে। অন্য কোনো যান ব্যবহারের সামর্থ্য নেই। আবিদ আলির স্ত্রী হামিদা বেগম রীতিমতো হকচকিয়ে, ঘাবড়ে গেলেন। কী হয়েছে ওর স্বামীর? অসুখ করেছে? কী ধরনের অসুখ? এর আগে কোনোদিন এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি হামিদা বেগমকে। তিনি খুব বিচলিত হলেন। তার দু'চোখে একটি আতঙ্কিত প্রশ্ন। আবিদ আলির সহকর্মীদ্বয় হামিদা বেগমকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। তাদের একজন বললেন, 'ঘাবড়াবেন না ভাবি, এমন কিছু নয়। আবেদ ভাই কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেজন্যেই তাকে আমরা নিয়ে এসেছি। একটু রেস্ট নিলেই তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

হামিদা বেগম কতটা আশ্বস্ত হলেন তা ওর মুখ দেখে বোঝায় উপায় নেই। বড়োই কষ্ট-সওয়া মুখ। এক ধরনের বিষণ্নতা সেই মুখে প্রায় নিয়ত পর্যটক। আবেদ-আলির সহকর্মীদ্বয় তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ছোটো একতলা বাড়ির ততোধিক ছোটো ঘর। খুপরির মতো ঘরে একটি মাঝারি চৌকি পাতা রয়েছে। আবেদ আলি ফ্যালফ্যাল করে তাকান সহকর্মীদের দিকে। কী বলবেন ভেবে পান না। একজন সহকর্মী, যিনি খর্বকায়, যার গায়ের রং কালো, আবেদ আলির কপালে হাত রাখেন। আশ্বাসবাণী শোনান অসুস্থ সহকর্মীকে। আবেদ আলির চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এই দৃষ্টি বিশ্লেষণ করা মুশকিল। তার সহকর্মী সামান্য বিচলিত এবং অস্বস্তি বোধ করেন। আসলে কী হয়েছে এই সহকর্মীর! কেন এই হাল। এ ধরনের প্রশ্ন জেগে উঠছে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটির মনে। মাঝারি গড়নের সহকর্মীটি বেশ লাজুক এবং স্বল্পবাক। তিনি চুপচাপ, একটি কথাও বলছেন না এই বাসায় আসা অব্দি।

আবেদ আলির স্ত্রী কিছুটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে, মনে হল। স্বামীর চোখের দিকে চোখ রেখে কী ভাবলেন বোঝা দায়। যে মানুষ ইতিমধ্যে বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে হেঁটে এসেছে দিনের পর দিন, সে বোধ হয় এ রকমই হয়ে যায়। যে-কোনো দুঃখের মুখোমুখি হতে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। স্বামীর সহকর্মীদের বিদায় দিয়ে, হামিদা বেগম স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু খাবে? চা দেব?' আবেদ আলি নিরুত্তর। শুধু তাকিয়ে থাকেন স্ত্রীর দিকে। হামিদা স্বামীর এরকম দৃষ্টি কখনো দেখেননি। কী হয়েছে ওর, তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেন। সওয়ালের কোনো সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পেলেন না মনের

কোনো কোনায়। একটা আশঙ্কা মনের ভেতর উঁকি দেয়। কিন্তু এই উঁকিঝুঁকিকে আমল দিতে ইচ্ছে হল না তাঁর। তিনি আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন বিছানার পাশে। কিছুক্ষণ পর স্বামীকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখে সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ করলেন। ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে আছে। মেয়ের বয়স ছয় বছর আর ছেলেটি পাঁচ বছরের কোঠায়। অভাবের সংসার। বাচ্চাদের সাধ-আহ্লাদ মেটানো সাধ্যাতীত। কোনোমতে সলতে ঠেলেঠুলে অস্তিত্বের ক্ষীণ শিখাটুকু জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটো দেখতে সুশ্রী হয়েছে, হামিদা বেগমের মতোই। অবশ্যই ইতিমধ্যে হামিদার রূপ সংসারের টানাপোড়েনে বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে।

একটু পরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে হামিদা বেগম ছুটে যান পাশের ঘরে। চমকে-দেয়া গলার আওয়াজ। আবেদ আলির দু'চোখ খোলা, চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি। এই দৃষ্টি অচেনা তার জীবনসঙ্গিনীর কাছে। স্বামীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে 'কী হবে, কী হবে' শব্দগুচ্ছ। অফিসে আজ বারবার এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করছিলেন আবেদ আলি, দপ্তরের একজন কেরানি। গৌণ কর্মচারী বৈকি যার চোখে আশার কোনো ঝাড়লণ্ঠন জ্বলজ্বল করে না। তিনি স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুদিন ধরে অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলাই ঠিক।

হামিদা যখনই জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে', তখনই উত্তর আসে আবেদ আলির কাছ থেকে 'কী হবে? কী হবে?' প্রশ্ন না করলেও তিনি 'কী হবে, কী হবে' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। তাঁর এই প্রশ্নের ভেতর সীমাহীন উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিৎকার ধ্বনিত হয়। এই ধ্বনিতে উন্মত্ততার আভাস আছে বলে মনে হয় হামিদার কাছে। অথচ তিনি এই অসম্ভব, দিশেহারা সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। না, এ রকম হতে পারে না, নিজেকে প্রবোধ দেন তিনি।

আজ সকাল থেকেই আবেদ আলির সহকর্মীরা লক্ষ করেছেন এক ধরনের আবছা অস্বাভাবিকতা দখল করে ফেলেছে গৌণ কেরানিটিকে। তিনি বারবার অফিসের একটা লম্বাটে খাতার পাতা ওলটাচ্ছেন আর ক্রমাগত বিড়বিড় করছেন। কখনো কখনো বিড়বিড় ধ্বনি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে 'কী হবে, কী হবে' শব্দজোড়া। ক'দিন আগে থেকেই একটি দুশ্চিন্তা আবেদ আলিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। নির্দয় এই পৃথিবীর পথে কী অসহায় এক পথিক তিনি। যদি এই পথিকটি একা হতেন, তাহলে এত দুশ্চিন্তার, এমন দুঃস্বপ্নের কারণ ছিল না। কিন্তু আবেদ আলির জীবনের সঙ্গে আরও তিনটি জীবন জড়িত। হঠাৎ যদি তার মৃত্যু হয়, তবে ওদের কী হবে—এই ভয়ংকর প্রশ্ন তাকে ভীষণ কাবু করে ফেলেছে ইদানীং। নিজের মৃত্যুচিন্তা এবং প্রাসঙ্গিক দুর্ভাবনা অফিসে, বাসায়, বাসে চেপে আসা-যাওয়ার পথে তাকে বারবার হামলা করছে অবিবেচক, নিষ্ঠুর দস্যুর মতো।

দপ্তরের খাতায় জরুরি কিছু লেখার সময় রুল-টানা পাতায় ভেসে ওঠে একটি প্রশ্ন, 'হঠাৎ আমার মৃত্যু হলে ওদের কী হবে?' এরপর শুধু 'কী হবে, কী হবে' তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে। আজই প্রথমবারের মতো প্রায় অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে ঢলে পড়েন আবেদ আলি। তখন অফিস ছুটি হওয়ার আগেই ওর দু'জন সহকর্মী আবেদ আলির চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে ওকে কিছুটা সুস্থ করে তুলে বাসায় নিয়ে আসেন।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আবেদ আলি ভাবেন, তাকে কারা যেন কবরে নামিয়ে দিচ্ছে, কবরের ভিতর তার সারা শরীর ছিঁড়ে খাচ্ছে পোকাপতঙ্গেরা। তার যা হবার তা তো হলই, তাকে কবরস্থ করার পর হামিদা আর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে দুটির কী হবে? অনাহারে মরে যাবে না তো ওরা? নিরাশ্রয় হয়ে চরম দুর্দশার কবলে পড়বে না তো? মধ্যরাতে হামিদার ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখতে পায়, বিছানায় কিংবা ঘরে আবেদ নেই। শিউরে উঠল হামিদা। চটজলদি বিছানা থেকে উঠে সে বাইরে এসে দেখে, তার স্বামী কুঁজো হয়ে কী যেন খুঁজছে।

'এত রাতে একা-একা এখানে উঠোনে কী করছ তুমি?'

'জ্যোৎস্না কুড়াচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না আমার মুঠোয় কী চমৎকার চাঁদিনী?' উঠোনময় ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও জ্যোৎস্নার লেশমাত্র নেই। শঙ্কায় হামিদার অস্তিত্ব তুমুল বাতাসে লুটোপুটি-খাওয়া কাগজের মতো কম্পমান। সকাল সাড়ে ন'টায় যথারীতি গায়ে পা'জামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে কোনো কিছু মুখে না দিয়েই আবেদ আলি ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ালেন।

'কোথায় যাচ্ছ গোসল না করে, কিছু না খেয়ে?'

'অফিসে যাচ্ছি, আমার খিদে নেই। তোমরা খেয়ে নাও।' এ তো স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের উক্তি। তাহলে ভয় পাচ্ছি খামোকাই, মনে মনে উচ্চারণ করেন হামিদা বেগম। ছেলেমেয়ে দুটোকে নাশতা দেয়া যাক।

নাশতার পর্ব চুকে যাওয়ার পর হামিদা বেগম গতরাতের ঘটনাটি স্মরণ করলেন। কী অদ্ভুত একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তার স্বামী, সে নাকি জ্যোৎস্না কুড়াচ্ছিল। অথচ একরত্তি জ্যোৎস্না ছিল না কোথাও। জ্যোৎস্না কুড়োতে কেউ কখনো যায় নাকি! যতসব সৃষ্টিছাড়া কথা। দুপুরের ভাত রাঁধার জন্যে চাল বাছতে বসেন তিনি। কিছু চাল বাছা হয়ে গেলে গলির ভেতর ছেলেপুলেদের হৈ-হল্লা শুনতে পেয়ে তিনি দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলেন। দৃশ্যটি দেখে তিনি হতবাক। কতোগুলো ডাকাবুকো ছেলে আবেদ আলির পিছু নিয়েছে আর তিনি এগিয়ে আসছেন বাসার দিকে।

হামিদা আবেদের হাত ধরে ওকে ভেতরে নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আবেদ আলি স্ত্রীর দিকে প্রায় ভুতুড়ে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বলেন,

'আমি রোদ কুড়োচ্ছি, আমার পকেটে রোদ রাখছি, কিন্তু ওরা আমাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে, আমাকে ঢিল মারছে।' উদভ্রান্ত আবেদের গৃহিণী, হামিদা বেগম কোথাও না রোদ, না জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছে, শুধু তার চোখে পড়ছে ওদের দিকে চারদিক থেকে তেড়ে আসছে রাগী পশুর মতো দম-বন্ধ-করা অদ্ভুত অন্ধকার।

# নাটক



অনুবাদ

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

# হ্যামলেট

## চরিত্রলিপি

| | | |
|---|---|---|
| হ্যামলেট | : | ডেনমার্কের যুবরাজ |
| ক্লডিয়াস | : | ডেনমার্কের রাজা, হ্যামলেটের পিতৃব্য |
| প্রেতাত্মা | : | ডেনমার্কের প্রাক্তন রাজা, হ্যামলেটের স্বর্গত পিতার প্রেতাত্মা |
| গারট্রুড | : | ডেনমার্কের রানি, হ্যামলেটের জননী, ক্লডিয়াসের স্ত্রী |
| পলোনিয়াস | : | রাষ্ট্রের প্রধান সচিব |
| লেয়ার্তেস | : | পলোনিয়াসের পুত্র |
| ওফেলিয়া | : | পলোনিয়াসের কন্যা |
| হোরেশিও | : | হ্যামলেটের বন্ধু |
| রোজেনক্রানজ | \| | হ্যামলেটের প্রাক্তন সহপাঠী |
| গিল্ডেনস্টার্ন | \| | ” |
| ফর্টিনব্রাস | : | নরওয়ের রাজকুমার |
| ভল্টিমণ্ড | \| | ডেনমার্কের সচিব, নরওয়ের রাজদূত |
| কর্নেলিয়াস | \| | ” |
| মার্সেলাস | : | রাজরক্ষী |
| বার্নার্ডো | \| | ” |
| ফ্রান্সিসকো | \| | ” |
| অসরিক | : | অসার বাবুবিলাসে মত্ত অমাত্য |
| রেনাল্ডো | : | পলোনিয়াসের ভৃত্য |

অভিনেতাবৃন্দ
দরবারের এক ভদ্রলোক
পুরোহিত
গোরখোদক
গোরখোদকের একজন সঙ্গী
ফর্টিনব্রাসের সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন
ইংরেজ রাজদূতগণ
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাগণ, নাবিকবৃন্দ, বার্তাবহ এবং পরিচারকগণ

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ দু'জন প্রহরী বার্নার্ডো এবং ফ্রান্সিসকোর প্রবেশ ]

| | | |
|---|---|---|
| বার্নার্ডো | : | কে ওখানে? |
| ফ্রান্সিসকো | : | কে তুমি উত্তর দাও, আগে দাঁড়াও ওখানে, দাও পরিচয়। |
| বার্নার্ডো | : | মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন। |
| ফ্রান্সিসকো | : | কে, বার্নার্ডো? |
| বার্নার্ডো | : | ঠিক তাই। |
| ফ্রান্সিসকো | : | আপনি দেখছি ঠিক সময়ে হাজির। |
| বার্নার্ডো | : | এখন বারোটা বাজে, ফ্রান্সিসকো, তুমি ঘুমোওগে যাও। |
| ফ্রান্সিসকো | : | এই বদলির জন্যে আপনাকে ঢের ধন্যবাদ। |
| বার্নার্ডো | : | কী দারুণ শীত, আর বুক যেন জমে যেতে চায়। কোনো কিছু চোখে পড়ে নি তো? |
| ফ্রান্সিসকো | : | একটি ইঁদুরকেও নড়তে দেখিনি। |
| বার্নার্ডো | : | এসো তবে, শোনো,<br>যদি আমার এ পাহারার অংশীদার হোরেশিও<br>আর মার্সেলাসকে কোথাও দেখতে পাও, তবে বলো<br>তারা যেন এখানে সত্বর চলে আসে। |
| ফ্রান্সিসকো | : | বোধ হয় তাঁরাই আসছেন।<br>[ হোরেশিও এবং মার্সেলাসের প্রবেশ। ]<br>কে তোমরা বলো, দাঁড়াও ওখানে। |
| হোরেশিও | | শত্রু নই, মিত্র এই মৃত্তিকার। |
| মার্সেলাস | : | আর অনুগত প্রজা সে দিনেমারের। |
| ফ্রান্সিসকো | : | শুভ রাত্রি। |
| মার্সেলাস | : | রাত্রির শুভেচ্ছা নাও হে বিশ্বস্ত সেনা। বদলিতে কে এল এখন? |
| ফ্রান্সিসকো | : | বার্নার্ডো এসেছে আমার জায়গায়। শুভ রাত্রি।<br>[প্রস্থান] |
| মার্সেলাস | : | বার্নার্ডো শুনছো তো? |

বার্নার্ডো : বলো, কী ব্যাপার? হোরেশিও না কি?
হোরেশিও : এসেছে নমুনা কিছু তার।
বার্নার্ডো : স্বাগতম হোরেশিও, স্বাগত সজ্জন মার্সেলাস।
মার্সেলাস : আজ রাত্রিতেও ওটা এসেছিল নাকি পুনরায়?
বার্নার্ডো : কিছুই দেখিনি আমি।
মার্সেলাস : হোরেশিও বলে ওটা আমাদের মনের অলীক
অসার কল্পনা বৈ কিছু নয় এবং সে নিজে
করে না বিশ্বাস তাতে — যে ভীষণ দৃশ্য দু' দু'বার
আমরা দেখেছি, তা-ই ঢের অনুনয় করে তাঁকে
দেখাতে এসেছি নিয়ে যা-যা সব ঘটবে এ-রাতে।
যদি সে প্রেতাত্মা আসে আবার তাহলে আমাদের
কথা ঠিক মেনে নেবে, বলবে সে কথা তার সঙ্গে।
হোরেশিও : আরে রাখো রাখো। আসবে না।
বার্নার্ডো : এখানে দু'দণ্ড বসো,
তারপর কান খুলে শোনো, যে-কান রেখেছো তুমি
সুরক্ষিত আমাদের গল্পের বিরুদ্ধে — শোনো বলি,
আমার দু'রাত্রি ধরে কী দেখেছি।
হোরেশিও : বেশ, বসা যাক,
শুনি বার্নার্ডো কী কী বলে আর।
বার্নার্ডো : শেষবার কাল রাত্তিরেই
ঐ যে তারা দেখা যায় - দূর ধ্রুবতারার পশ্চিমে
ঘুরতে ঘুরতে ঠিক এখন যেখানে আকাশের
যে অংশে ছড়াচ্ছে আলো, সেখানে সে জ্বলছিল —
তখন ছিলাম আমি আর মার্সেলাস, দুইজন;
ঘড়িতে বাজল ঘণ্টা রাত একটার, —
[ প্রেতাত্মার প্রবেশ ]
মার্সেলাস : এই চুপ, চুপ, সরে দাঁড়াও — তোমরা দ্যাখো আসছে
আবার।
বার্নার্ডো : মৃত সেই রাজার আকার নিয়ে এসেছে হুবহু।
মার্সেলাস : তুমি তো পণ্ডিত হোরেশিও, কথা বলো তার সঙ্গে।
বার্নার্ডো : দেখতে রাজার মতো নয়? লক্ষ করো, হোরেশিও।
হোরেশিও : অবিকল। ভীতিতে বিস্ময়ে বড়ো কণ্টকিত আমি।
বার্নার্ডো : কথা বলতেই হবে তার সঙ্গে।
মার্সেলাস : তাকে প্রশ্ন কর, হোরেশিও।

হোরেশিও : কে তুমি রাত্রির এই প্রহরে দিয়েছো হানা এই
অপরূপ বীরবেশে, যে সাজে স্বর্গত মহারাজ
ঘুরতেন মাঝে-মাঝে? দোহাই বিধির কথা বলো।

মার্সেলাস : মর্মাহত হয়েছে সে।

বার্নার্ডো : দ্যাখো, চলে যাচ্ছে।

হোরেশিও : যেও না, দোহাই শোনো, কথা বলো তুমি।

[ প্রেতাত্মার প্রস্থান ]

মার্সেলাস : চলে গেছে, দেবে না উত্তর।

বার্নার্ডো : কী ব্যাপার? কাঁপছো যে? কেন ফ্যাকাশে তোমার মুখ
হোরেশিও? একি কল্পনার চেয়ে বেশি কিছু নয়?
এখন কী বলো তুমি?

হোরেশিও : ধর্ম সাক্ষী, যা কিছু দেখেছি তা' স্বচক্ষে না দেখলে,
এমন অকাট্য কোনো প্রমাণ না পেলে এ ঘটনা
করতাম না বিশ্বাস।

মার্সেলাস : দেখতে রাজার মতো নয়?

হোরেশিও : যেমন স্বয়ং তুমি তোমার মতোই;
এই একই বর্ম পরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নরওয়ে রাজের
সঙ্গো লড়েছেন তিনি। যেদিন ভীষণ ক্রোধে মেতে
স্লেজারোহী পোলদের অস্ত্রাঘাতে দিলেন শুইয়ে
তুষারে সন্ধির বাক্য বিনিময় কালে, এইমতো
সেদিনও ভ্রূকুটি ছিল মুখে, কী আশ্চর্য!

মার্সেলাস : এমনি দু'বার আরো এসেছেন তিনি ঠিক
এই নিস্তব্ধ প্রহরে রণসাজে আর বীর পদভারে
আমাদের পাহারার পাশ দিয়ে গেছেন মিলিয়ে।

হোরেশিও : বস্তুত সঠিক কী ব্যাপার জানি না তা; তবে বলি,
মোটামুটি আমার ধারণা; এর ফলে আমাদের
এ রাজ্যে আসবে নেমে ঘোর অমঙ্গাল।

মার্সেলাস : যদি ইচ্ছে হয় বোসো এবং যে জানো বলো, কেন
এই কড়া পাহারা সর্বত্র? কেন যে রাত্রির পর
রাত্রি খেটে মরছে প্রজারা এ রাজ্যের, কেনই বা
পিতলের কামান ঢালাই হচ্ছে ছাঁচে প্রতিদিন,
ভিনদেশী সামরিক সাজ-সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে
কেন আর কেনই বা এই জাহাজমিস্ত্রীরা সব
বাধ্যতামূলক কাজে লিপ্ত যাদের দুরূহ কাজ
পুরো সপ্তাহের থেকে পারে না আলদা করতে

রবিবারকেও? কী এমন ঘটল যাতে এ ঘর্মাক্ত
তাড়াহুড়া রাত্রিকে করেছে শ্রমে দিনের শরিক —
কে আছে এমন বলে দেবে আমাকে?

হোরেশিও : তা পারি আমি;
অন্তত এ রাজ্যে ফিসফিসে কানাকানি হচ্ছে এই :
আমাদের মৃত রাজা, একটু আগেই যাঁর
প্রতি-মূর্তি হয়েছিল উপস্থিত আমাদের খুব কাছে,
তোমরা সবাই জানো, নরওয়ের ফর্টিনব্রাসের
সঙ্গো দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে বাঁধিয়েছিলেন
যুদ্ধ, যাতে আমাদের বীর হ্যামলেট, এজন্যেই
নাম যাঁর খ্যাত আমাদের পরিচিত পৃথিবীর
এই ভাগে, নিহত করেন সেই ফর্টিনব্রাসকে;
সিলমোহরাঙ্কিত সামরিক শর্তাবলি অনুসারে
নিহত নৃপতি তাঁর নিজের জীবনসহ সব
ভূসম্পত্তি, যা ছিল দখলে তাঁর, বিজেতার কাছে
করলেন সমর্পণ — আমাদের রাজা সমতুল্য
বিত্ত রেখেছিলেন জামিন — যা ঐ ফর্টিনব্রাসের
নিশ্চিত দখলে যেত, যদি তিনি হতেন বিজেতা।
অনুরূপ যুক্ত চুক্তি, দলিলের শর্ত মোতাবেক
বিষয়-আশয় পড়ল হ্যামলেটের ভাগে।
বর্তমানে তরুণ দুর্ধর্ষ অনভিজ্ঞ সে ফর্টিনব্রাস
নরওয়ের প্রান্তদেশে জুটিয়েছে কিছু উচ্ছৃঙ্খল
দুর্বৃত্তের দল যারা অন্ন লোভে ঘোরে — যার মানে
অন্য কিছু নয় — সুস্পষ্ট তা আমাদের এ রাজ্যের
সবার কাছেই — জনকের হৃতরাজ্য বাহুবলে
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এবং এটাই মনে করি
আমাদের প্রস্তুতির প্রধান উদ্দেশ্য, উৎস এই
পাহারার; এজন্যেই রাজ্যে এত হই চই, তাড়াহুড়া।

বার্নার্ডো : মনে হয়, এ কারণ ছাড়া অন্য আর কিছু নয়।
এই যে অশুভ মূর্তি আমাদের পাহারার কালে
বর্মাবৃত হয়ে আসে আমাদের রাজার ধরনে
এটা খাপ খেয়ে যায় এতক্ষণ ধরে যা শুনেছি
তার সঙ্গো; তিনিই তো উৎস সব যুদ্ধ বিবাদের।

হোরেশিও : বস্তুত মনের চোখে ধূলিকণা যন্ত্রণা বাড়ায়।
সর্বাধিক উন্নত সমৃদ্ধিশালী রোমে, পরাক্রান্ত
জুলিয়াস সিজারের পতনের কিছুকাল আগে

বাসিন্দাবিহীন হয়ে পড়েছিল সকল কবর,
কাফনাবৃত মৃতেরা রোম নগরীর পথে পথে
জুড়েছিল তীক্ষ্ণ, খোলা, অস্পষ্ট চিৎকার;
নীলাকাশে অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু দিয়েছিল দেখা,
ঝরেছিল রক্তের শিশির, সূর্যে ছিল সর্বনাশ;
এবং চন্দ্রমা, যার ওপর সমুদ্র দেবতার
সাম্রাজ্য নির্ভরশীল, এমন অসুস্থ রাহুগ্রস্ত
হয়ে পড়েছিল, যেন এসে গেছে রোজ কেয়ামত;
এবং প্রচণ্ড ঘটনার অনুরূপ পূর্বাভাস,
অগ্রদূত যেমন রটায় ক্রমাগত দুর্দশার
অশুভ পূর্বলক্ষণ, তেমনি স্বর্গমর্ত্য একযোগে
আমাদের দেশ ও দশের কাছে করেছে প্রকাশ।

[ প্রেতাত্মার প্রবেশ ]

এই চুপ। দ্যাখো, দ্যাখো এসেছে আবার। অশুভের
প্রভাবে আচ্ছন্ন হই হব, তবু আগলে দাঁড়াব

[ প্রেতাত্মা বাহু মেলে ধরে ]

তার পথ। দাঁড়াও কুহক। যদি কোনো ধ্বনি থেকে
থাকে, যদি জানো তুমি তোমার স্বরের ব্যবহার,
কথা বলো তবে :
এমন সৎকাজ যদি করতে হয় যার ফলে তুমি
শান্তি পাবে আর আমারও মঙ্গল হবে
সে-কথা আমাকে বলো তবে।
তোমার দেশের নিয়তির গুপ্তকথা যদি জানো
আগেভাগে জানলে যা সম্ভবত মিলবে নিস্তার,
তবে বলে দাও।
অথবা জীবদ্দশায় ভূগর্ভে গচ্ছিত রেখে থাকো
যদি ধনরত্ন, যার জন্যে, লোকে বলে, তোমরা মৃত
আত্মারা অশান্ত ঘুরে মরো প্রায়শই—
তাহলে সে-কথা বলো; দাঁড়াও, যেও না, কথা বলো!
[ মোরগ ডেকে ওঠে ]
মার্সেলাস বাধা দাও তাকে।

মার্সেলাস : বর্শা দিয়ে হানব আঘাত ওকে?

হোরেশিও : যদি না দাঁড়ায় তবে করবে আঘাত।

বার্নার্ডো : প্রেতমূর্তি এই তো এখানে।

হোরেশিও : এই যে এখানে। [ প্রেতাত্মার প্রস্থান ]

মার্সেলাস : হায়, চলে গেছে।
এত সোরগোল করে আর এমন উগ্রতা

দেখিয়ে আমরা তার প্রতি
করেছি অন্যায় খুব। কেননা সে হাওয়ার মতোই
অনাক্রমণীয় আর আমাদের নিষ্ফল আঘাত
বিদ্বেষপ্রবণ বিদ্রূপেরই নামান্তর।

বার্নার্ডো : বলতে যাচ্ছিল কথা, তক্ষুনি মোরগ উঠল ডেকে।

হোরেশিও : তারপরই যেন কোনো ভীষণ নির্দেশে অপরাধী
ভাবল নিজেকে। আমি শুনেছি, মোরগ,
প্রত্যুষের সেই তো নকিব, তার কর্কশ, সুতীক্ষ্ণ
কণ্ঠস্বরে জাগায় দিনের দেবতাকে আর তার
সাবধান বাণী শুনে সমুদ্রে, আগুনে কিংবা এই
মর্ত্যের ধুলায় কিংবা বাতাসে যেসব আত্মা ঘোরে,
তারা সব উর্ধ্বশ্বাসে ঢুকে পড়ে নিজের বিবরে;
এ সত্যের এই মাত্র প্রেতমূর্তি দিয়েছি প্রমাণ।

মার্সেলাস : মোরগের ডাক শোনামাত্র মিলিয়ে গিয়েছে। কেউ
কেউ বলে, আমাদের পরিত্রাতার পবিত্র জন্মোৎসবে
প্রত্যুষের পাখি গান গায় সারারাত; লোকে বলে,
তখন প্রেতাত্মা কোনো পারে না ঘেঁষতে লোকালয়ে;
আর সেই শুভ রাতে কোনো গ্রহ ফেলে না অশুভ
ছায়া কিংবা কোনো পরী পারে না ছড়াতে মোহজাল,
ডাইনির মন্ত্র হয় কুহকরহিত, এত পুণ্য
জ্যোতির্ময় সেই ক্ষণ।

হোরেশিও : আমিও শুনেছি তাই আর
অংশত বিশ্বাস করি তাতে, কিন্তু ঐ দ্যাখো, ভোর
আটপৌরে ধূসর পোশাক পরে পুবের পাহাড়ে
শিশিরের ওপরে বেড়ায়; এসো পাহারার কাজ
শেষ করি; এবং আমার পরামর্শ অনুসারে
চলো যাই বলিগে তরুণ হ্যামলেটকে তা-ই, যা-যা
আমরা দেখেছি আজ রাতে; প্রাণের দোহাই, সেই
প্রেমমূর্তি আমাদের কাছে মূক হয়ে থাকলেও
তাঁর কাছে খুলবে মুখ। এতে সায় আছে তোমাদের?
এই সব কিছু তাঁকে সঠিক জানাব, তাঁর প্রতি
এই তো কর্তব্য আমাদের, সম্প্রীতির নিদর্শন।

মার্সেলাস : চলো, তা-ই বলা যাক, আর আমি জানি, এ সকালে
আমরা কোথায় তাঁকে পাব খুঁজে অতি সহজেই।

[ প্রস্থান]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ তূর্যধ্বনি। ক্লডিয়াস (ডেনমার্ক অধিপতি), রানি গারট্রুড, ভল্টিমন্ড ও কর্নেলিয়াসসহ সভাসদবর্গ, পলোনিয়াস ও তার পুত্র লেয়ার্তেস, হ্যামলেট (কালো পোশাক পরিহিত) এবং অন্যদের প্রবেশ ]

রাজা : যদিও এখনো আমাদের প্রিয় ভ্রাতা হ্যামলেটের
মৃত্যুস্মৃতি সজীব, তদনুযায়ী সমীচীন আজ
হৃদয় শোকার্ত হওয়া, আমাদের সব রাজ্যপাট
দুঃখের ভ্রূভঙ্গে সংকুচিত হওয়া, তবু এ যাবত
বিবেচনা স্বভাবের বিপক্ষে লড়েছে, তাই আমরা
তাঁর কথা ভাবি প্রাজ্ঞতম দুঃখে মজে; এই সঙ্গে
নিজেদেরও রাখি মনে, অতএব একদা ভগিনী
আমাদের, বর্তমানে রানি, যিনি এই যুদ্ধমগ্ন
রাজ্যের যুগ্ম অধিশ্বরী, তাকে বিনষ্ট আনন্দে,
এক চোখে পুলক এবং অন্য চোখে নিয়ে আমি
গাঢ় বিষাদের ছায়া অন্ত্যেষ্টিতে উৎফুল্ল, বিবাহে
শোকাতুর, সমপরিমাণ আনন্দ ও শোকে তাকে
পত্নীরূপে করেছি গ্রহণ; আপনাদের বিচক্ষণ
মতামতও করিনি অগ্রাহ্য, এ ব্যাপারে বরাবর
সায় ছিল আপনাদের, সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ।
এখন শুনুন, আপনারা সবাই জানেন সেই
তরুণ ফর্টিনব্রাস আমাদের সামর্থ্যকে খুব
অপ্রতুল ভেবে কিংবা ভেবে আমাদের প্রিয় বীর
গতায়ু ভ্রাতার মৃত্যুতে এ রাজ্য নড়বড়ে আর
বিশৃংখল বর্তমানে আর আত্মগরিমার স্বপ্নে
মগ্ন হয়ে বারবার বার্তা দিয়ে উত্যক্ত করতে
আমাদের করেনি কসুর। তার জনকের হৃত
রাজ্যপাট, যা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবে কর–
তলগত হয়েছিল আমাদের সাহসী ভ্রাতার,
প্রত্যর্পণ করতে হবে, সে বার্তায় রয়েছে নির্দেশ।
এটুকু যথেষ্ট তার প্রসঙ্গে, এখন আমাদের
এবং এ সভার বিষয়ে আলোচনা করা যাক।
আসলে ব্যাপার এই : ফর্টিনব্রাসের পিতৃব্যের
নিকট পাঠাচ্ছি পত্র, নরওয়েরাজ, যিনি আজ

অসমর্থ; শয্যাশায়ী বলে জানতেও পান না তাঁর
ভ্রাতুষ্পুত্রটির কী যে মতিগতি, তাই জানিয়েছি
তাঁকে, যেন তিনি ওর অগ্রগতি রোধ করে দেন,
যেন তাঁর প্রজাদের মধ্য থেকে যুদ্ধের বেবাক
সরঞ্জাম, সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ বন্ধ করে দেন।
সুজন কর্নেলিয়াস আপনাকে আর আপনাকেও
ভল্টিমন্ড পাঠাচ্ছি প্রবীণ নরওয়ে রাজের কাছে
পৌঁছে দিতে শুভেচ্ছার বাণী আর লিপিবহির্ভূত
বিষয়াদি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার কোনো
ব্যক্তিগত ক্ষমতা দিইনি; আচ্ছা, আসুন তাহলে
এবং আপনাদের ত্বরায় কর্তব্য ধন্য হোক।

কর্নেলিয়াস ও | এতে আর অন্য সব বিষয়েই কর্তব্যবোধের
নিশ্চিত প্রমাণ দেব।

রাজা : বিন্দুমাত্র করি না সন্দেহ;
আন্তরিক শুভেচ্ছায় জানাই বিদায়

[ ভল্টিমন্ড ও কর্নেলিয়াসের
প্রস্থান ]

লেয়ার্তেস, এবার তোমার কী খবর বলো? তুমি
বলেছো প্রার্থনা আছে, কীসের প্রার্থনা লেয়ার্তেস?
যুক্তযুক্ত হলে জেনো তা' কখনো নিষ্ফল হবে না;
কী এমন চাও তুমি, লেয়ার্তেস, যা না চাইতেই
তোমাকে পারবো না দিতে? মস্তক যেমন হৃৎপিণ্ডের
সহজাত আর এই হাত যেমন মুখের তাবেদার,
ডেনমার্কের সিংহাসনও তেমনি তোমার পিতার
কাছে, তার কম নয়। কী তোমার যাচঞা, লেয়ার্তেস?

লেয়ার্তেস : সভয়ে করছি নিবেদন প্রভু, আমাকে আবার
অনুগ্রহ ক'রে ফ্রান্সে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।
আপনার অভিষেকে যোগ দিতে আপনার প্রতি
কর্তব্য জ্ঞানেই আমি এসেছিলাম সেখান থেকে
নিজ অভিলাষে, এখন কবুল করি, সে কর্তব্য
যেহেতু হয়েছে সুসম্পন্ন, আমার ভাবনা, ইচ্ছা,
পুনরায় ঝুঁকেছে ফ্রান্সের দিকে এবং ওদের
করছি আনত আপনার সদয় আজ্ঞার কাছে।

রাজা : তোমার পিতার অনুমতি পেয়েছো কি? কী বলেন
সচিব পলোনিয়াস?

পলোনিয়াস : প্রভু, পরিশ্রমী প্রার্থনায় নিয়েছে আদায় করে
আমার মন্থর অনুমতি এবং আখেরে আমি
তার সে ইচ্ছার প্রতি অনিচ্ছুক সম্মতি দিয়েছি;
আমার মিনতি তাকে আপনিও দিন অনুমতি।

রাজা : শুভক্ষণে যাত্রা করো লেয়ার্তেস; সময় তোমার
হোক আর শোভন মাধুর্যে তুমি নিজ ইচ্ছামতো
কাটাও সময়; কিন্তু এখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র
হ্যামলেট, এবং আমার পুত্র, কী সংবাদ বলো?

হ্যামলেট : আত্মীয়ের চেয়ে কিছু বেশি, আত্মজের চেয়ে কম।

রাজা : কী ব্যাপার? এখনো এমন মেঘাচ্ছন্ন কেন তুমি?

হ্যামলেট : তা নয় রাজন, আমি বড়ো বেশি সূর্যালোকে আছি।

রানি : হ্যামলেট, বৎস ঐ কালো বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলো
এবং তোমার চোখ হোক উন্মীলিত সুহৃদের
মতো ডেনমার্ক নৃপতির দিকে। সর্বক্ষণ বুজে-
আসা চোখে খুঁজো নাকো মহামতি পিতাকে তোমার
মর্ত্যের ধুলায় আর তুমি তো জানোই সাধারণ
এই রীতি, প্রাণী মাত্রই মরণশীল, এ পৃথিবী
ছেড়ে সবাই তো চলে যাবে শেষে অনন্তের দিকে।

হ্যামলেট : হ্যাঁ রানিমা, এই সাধারণ রীতি।

রানি : যদিও তা-ই হয়
তবে কেন তোমার বেলায় সবিশেষ মনে হয়?

হ্যামলেট : শুধু মনে হয়, ভদ্রে? না, না, এযে সত্য; মনে হওয়া
কাকে বলে আমি তা জানি না। শুধু আমার কালো
জমকালো জোব্বা দিয়ে হে সুশীলা জননী আমার
অথবা আনুষ্ঠানিক কোনো কালো বেশভূষা কিংবা
অবিরত রুদ্ধ-হয়ে আসা অতি কষ্টের নিশ্বাস
অথবা অশ্রুপ্লাবিত দু'চোখের নদী কিংবা এই
নিরানন্দ আর্ত মুখ দিয়েও কখনো নয় আর
প্রচলিত লোকাচার আর ব্যবহারের সকল
কড়ি ও কোমল কিংবা শোকের বহিঃপ্রকাশ, এই
সব কোনো কিছু দিয়ে আমাকে যাবে না ঠিক চেনা;
এইসব কিছুই তো বাহ্যিক ব্যাপার বাস্তবিক,
কেননা এসব কিছু এরকম কাজ যা বস্তুত
একজন অভিনয় করে ফুটিয়ে তুলতে পারে —

অথচ আমার মধ্যে আছে একটা কিছু যা কখনো
হয় না দৃষ্টিগোচর দুঃখশোকের পোশাকে কোনো।

রাজা : তোমার পিতার জন্যে এই শোক, সত্যি, হ্যামলেট,
তোমার মহৎ সুমধুর স্বভাবেরই পরিচয়;
কিন্তু এ-ও জানো তুমি তোমার পিতাও একদিন
হারিয়েছিলেন তাঁর জনককে; সে জনক তাঁর
জনককে; আর মৃত পিতার উদ্দেশে কিছুকাল
সশ্রদ্ধ শোকপালন সন্তানের অবশ্য কর্তব্য;
কিন্তু শোক নিয়ে একগুঁয়ে বাড়াবাড়ি অধর্মের
নামান্তর; এই শোক পুরুষকে সাজে না কখনো!
এই মনোভঙ্গি অতিশয় অশুদ্ধ বিধির কাছে,
এতে আছে অরক্ষিত হৃদয়, অধৈর্য মন আর
অশিক্ষিত অমার্জিত বিচারবুদ্ধির পরিচয় :
কেননা আমরা যা' জানি তা নিশ্চয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
যে কোনো মামুলি জিনিসের মতো অতি সাধারণ,
তবে কেন আমরা বৃথা বিকৃত বুদ্ধির তাড়নায়
বিরোধিতা ক'রে হব মর্মাহত? ছিঃ! ছিঃ! বিধাতার
বিরুদ্ধাচরণ এ যে, মৃতদের আর প্রকৃতির
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আদি শব থেকে আজকের মৃত
ব্যক্তি অব্দি 'এমন হতেই হবে' বলে চিরকাল
যে-সত্য রটায়, পিতাদের মৃত্যু যার সাধারণ
মূল সুর, এতো তারও বিরুদ্ধাচরণ সুনিশ্চিত।
আমার একান্ত অনুরোধে, এ নিষ্ফল দুঃখ তুমি
মর্ত্যের ধুলায় দাও বিসর্জন, আমাকে তোমার
পিতা বলে মনে করো, জগৎ জানুক, তুমিই যে
এ সিংহাসনের সবচে' নিকটবর্তী আর জেনো
সর্বাধিক স্নেহময় যে-পিতা মহান ভালোবাসা
নিজের পুত্রের প্রতি করেন অর্পণ, তারই মতো
আমিও তোমার প্রতি করি আচরণ। তোমার ঐ
উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার বাসনা
আমার ইচ্ছার জেনো দারুণ বিরোধী, অনুরোধ
করি এখানেই থাকো আমাদের দৃষ্টির আনন্দে,
থাকো সেরা সভাসদ হয়ে, ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্র হয়ে।

রানি : তোমার মায়ের এ প্রার্থনা যেন বিফল না হয়
হ্যামলেট : আমার মিনতি রাখো, আমাদের সঙ্গে
থাকো তুমি এখানে, যেও না উইটেনবার্গে আর।

হ্যামলেট : মহারানি,
আপনার আজ্ঞা আমি যথাসাধ্য করব পালন।

রাজা : বেশ, বেশ, কী সুন্দর মধুর উত্তর : ডেনমার্কে
থাকবে তুমি আমাদেরই মতো। এসো রানি হ্যামলেটের
অমায়িক স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে আমার হৃদয়
উদ্‌ভাসিত হাসির ছটায়; তারই প্রতি নিবেদিত
হবে আজ আনন্দমুখর লগ্নে আমার প্রতিটি
স্বাস্থ্যপান আর এই বার্তা রটাবে কামানরাজি
দূর মেঘমালায় এবং নৃপতির পানোল্লাস
আবার প্রতিধ্বনিত করবে আকাশ দেশান্তরে
পার্থিব বজ্রের পুনরুচ্চারণে। চলো যাই রানি।
[ তূর্যধ্বনি। হ্যামলেট ছাড়া সকলের প্রস্থান।]

হ্যামলেট : এই অতিশয় কলুষিত দেহ তুষারের মতো
গ'লে যদি শিশিরে বিলীন হত কিংবা চিরঞ্জীব
বিধি যদি আত্মসংহারের বিরোধী না হত; হায়
ঈশ্বর, ঈশ্বর চলমান এ জগত-সংসারের
সব রীতিনীতি কি নিষ্ফল, বাসি এবং অসার
মনে হয় আমার নিকট। ধিক একে ধিক, হায়
ধিক; এ পৃথিবী আগাছায় ভরা পতিত বাগান
এক, প্রকৃতিতে যারা ইতর এবং স্থূল শুধু
তারাই দখল করে একে পুরোপুরি। এরই মধ্যে
এই হল? তাঁর মৃত্যু হয়েছে দু'মাস আগে, না, না
অত বেশি হয়নি তো, দু'মাসও হয় নি; কী মহান
সেই রাজা, যাঁর তুলনায় বর্তমান রাজা সে তো
সূর্যদেবতার পাশে নরপশু। কখনো হাওয়াকে
খুব জোরে আমার মায়ের মুখ স্পর্শ করতে দিতে
চাইতেন না তিনি, এত ভালোবাসতেন জননীকে।
হা স্বর্গ মর্ত্যের অধীশ্বর! এইসব কথা মনে
করলে বড়ো ব্যথা বাজে বুকে। এইতো সেদিনও মাতা
তাঁর পিছু পিছু ঘুরতেন, যেমন ভোজ্যবস্তুর
আকর্ষণে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, তেম্নি; অথচ একটি
মাসের মধ্যেই, না ভাবব না সেকথা কখনো;
দুর্বলতা, তোর নাম নারী। একটি সংক্ষিপ্ত মাস;
যে জুতো পায়ে মা নায়োবীর মতো অশ্রুময় চোখে
সেদিন আমার দুঃখী জনকের শবানুগমন

করেছেন, সেই জুতো জোড়া জীর্ণ হবার আগেই
তিনি, হায়, এমনকি তিনি, হা ঈশ্বর, অবোধ,
চিন্তাশক্তিহীন কোনো পশুও এরচে' বেশি কাল
করতো শোক, করলেন বিয়ে আবার পিতৃব্যকে।
আমার পিতার ভ্রাতা, অথচ সে আদপেই নয়
আমার পিতার মতো, যেমন আমিও নই বীর
হার্কুইলিসের মতো : এক মাসও হয় নাই, তাঁর
কপট অশ্রুর নুন শুকোয় নি, কমেনি চোখের
ফোলা, কিন্তু বেজে উঠল বিয়ের সানাই। হায় কী-যে
খল ক্ষিপ্রতায় তিনি অজাচারী শয্যায় গেলেন।
এতো শুভ নয়, এর ফল ভালো হতেই পারে না;
ফাটুক আমার বুক, তবুও তো মুখ ফুটবে না।
[ হোরেশিও, মার্সেলাস এবং বার্নার্ডোর প্রবেশ।]

হোরেশিও : আমার প্রভুর জয় হোক।

: তুমি ভালো আছ দেখে আমি খুশি : আমার ভুল না হয়ে থাকে যদি তবে তুমি হোরেশিও।

হোরেশিও : আমি সেই একই লোক, প্রভু। আপনার চির অনুগত দাস।

দাস নও, তুমি প্রিয় বান্ধব আমার। আমি নিজে বরং সে-পদ পালটে দিতে চাই। তারপর বলো উইটেনবার্গ থেকে কেন এলে হোরেশিও? আরে মার্সেলাস —

মার্সেলাস : সদাশয় প্রভু, —

হ্যামলেট : এখানে তোমাকে দেখে আমি আনন্দিত; (বার্নার্ডোকে) শুভ সন্ধ্যা।

কিন্তু সত্যি বলো তো কী মনে করে এখানে এসেছ উইটেনবার্গ থেকে?

হোরেশিও : এ আমার বাউণ্ডুলেপনা, প্রিয় প্রভু।

হ্যামলেট : তোমার শত্রুও বলবে না সে কথা, অথবা তুমি নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েও আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবে না তা'। আমি জানি, বাউণ্ডুলে তুমি নও। কিন্তু এলসিনোরে তোমার কী এমন কাজ বলো? তোমার যাবার আগে মদে চুর হওয়া কাকে বলে, তোমাকে সে তালিম ভালোই দিয়ে দেব।

হোরেশিও : আপনার স্বর্গত পিতার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে এসেছি কুমার।

হ্যামলেট : দোহাই তোমার ব্যঙ্গ করো না সতীর্থ, বলে দাও
আমার মাতার শাদি মুবারকে এসেছিলে তুমি।
হোরেশিও : বাস্তবিক ব্যাপারটা সাত তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে।
হ্যামলেট : এত অপচয় নিবারণ, হোরেশিও, অপচয় নিবারণ;
অন্ত্যেষ্টির ঠান্ডা ভোজ সুচারু পরিবেশিত হল
বিবাহের মজলিশে। সেদিন দেখার আগে আমি
আমার চরম শত্রুকেও বেহেস্তে দেখাটা বেশি
কাম্য মনে করতাম, হোরেশিও। আমার পিতাকে,
মনে হয়, আমার পিতাকে আমি দেখতে পেয়েছি।
হোরেশিও : কোথায় কুমার?
হ্যামলেট : আমার মনের চোখে, হোরেশিও।
হোরেশিও : একবার তাঁকে দেখেছিলাম, সত্যই তিনি এক
সুমহান নৃপতি ছিলেন।
: প্রকৃত পুরুষ তিনি ছিলেন, সকল দোষগুণ
মিলিয়ে দেখলে তাঁর মতো কাউকেই দেখবো না।
হোরেশিও : যুবরাজ, মনে হয় কাল রাত্তিরে দেখেছি তাঁকে।
হ্যামলেট : কাকে?
হোরেশিও : প্রভু, আপনার পিতা, রাজাকে দেখেছি।
হ্যামলেট : স্বর্গত রাজাকে বলো আমার পিতাকে?
হোরেশিও : কিছুক্ষণ বিস্ময় দমন করে সেই অলৌকিক
ঘটনার কথা খুব মন দিয়ে শুনুন তাহলে;
এই ভদ্রলোকদের সাক্ষী মেনে বলছি সে-কথা।
হ্যামলেট : দোহাই ধর্মের, বলো, শুনি।
হোরেশিও : পরপর দু'রাত্রি এই দুই ভদ্রলোক, মার্সেলাস
এবং বার্নার্ডো পাহারার কালে দেখলেন তারা
ছমছমে মধ্যরাতে হা-হা শূন্যতায় : আপনার
পিতার মতন এক মূর্তি আপাদমস্তক বর্মা -
বৃত হয়ে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত। রাজসিক
ভঙ্গিতে গেলেন হেঁটে ধীরে সুস্থে শান্ত সমারোহে
তাঁদের পাশ দিয়ে; তিনি তিনবার দু'জনের
বিস্ময়-বিহ্বল, ভয়সচকিত দৃষ্টির সম্মুখে
করলেন আসা-যাওয়া তাঁর সামরিক দণ্ডটির
সমপরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে। তাঁরা ভয়ে
জমে গিয়ে রইলেন দাঁড়িয়ে কেবল মূক হয়ে,
তাঁর সঙ্গো বলেন নি কথা। এই গোপন কথাটি
ভয়ে-ভয়ে বললেন আমার কাছে তাঁরা আর আমি
তৃতীয় রাত্তিরে দু'জনের সঙ্গো হলাম শরিক

| | | |
|---|---|---|
| | | পাহারায়; তাঁরা যা-যা বলেছিলেন প্রতিটি কথা<br>অক্ষরে অক্ষরে হল সত্য, একই ক্ষণে অবিকল<br>সে-আকারে সেখানে সে মূর্তি এল। প্রভু, আপনার<br>জনককে জানতাম। এই দুটি হাত পরস্পর<br>দেখতে যেমন তেমনি সে মূর্তি এবং আপনার<br>স্বর্গত জনক। |
| হ্যামলেট | : | কিন্তু কোথায় ঘটল এই সব? |
| হোরেশিও | : | সে দুর্গ প্রাকারে প্রভু যেখানে পাহারা দিচ্ছিলাম। |
| হ্যামলেট | : | তোমরা বলো নি কেউ তাঁর সঙ্গে কথা? |
| হোরেশিও | : | প্রভু আমি<br>আমি বলেছিলাম, অথচ তার উত্তর পাই নি;<br>তবুও আমার মনে হল একবার তুললো সে<br>তার মাথা, নাড়ল এমন করে যেন সে বলবে<br>কথা, কিন্তু তক্ষুনি জোরালো স্বরে ভোরের মোরগ<br>উঠল ডেকে, আর সে আওয়াজ শুনে সে প্রেতমূর্তি<br>অতিশয় সংকুচিত হয়ে আমাদের দৃষ্টি থেকে<br>কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। |
| হ্যামলেট | : | অদ্ভুত ব্যাপার। |
| হোরেশিও | : | জামিন আমার প্রাণ, মান্যবর প্রভু, যা বলেছি<br>সত্যি সব কিছু; এই ঘটনার পরেই ভেবেছি<br>আপনাকে তা জানানো অবশ্য কর্তব্য আমাদের। |
| হ্যামলেট | : | তোমরা করেছো ঠিক কাজ, কিন্তু এত বিচলিত<br>আমি, বন্ধু। আজ রাতে দেবেন কি পাহারা আবার? |
| মাসেলাস ও বার্নার্ডো | | দেব প্রভু। |
| হ্যামলেট | : | বর্মাবৃত বললেন না আপনারা? |
| মার্সেলাস ও বার্নার্ডো | | বর্মাবৃত প্রভু। |
| হ্যামলেট | : | আপাদমস্তক। |
| মার্সেলাস ও বার্নার্ডো | | আপাদমস্তক, প্রভু। |
| হ্যামলেট | : | দেখতে পান নি মুখ তার? |
| হোরেশিও | : | হ্যাঁ প্রভু দেখেছি, তার শিরস্ত্রাণ ছিল খোলা। |
| হ্যামলেট | : | কী দেখলে? ভ্রুকুটি ছিল কি তার চোখে? |
| হোরেশিও | | ক্রোধের চাইতে বেশি দুঃখ ছিল সে মুখমণ্ডলে। |
| হ্যামলেট | : | বিবর্ণ না রক্তবর্ণ? |
| হোরেশিও | : | অত্যন্ত ফ্যাকাশে। |
| হ্যামলেট | : | আর দৃষ্টি তার তোমাদের<br>ওপর নিবদ্ধ রেখেছিলেন কি তিনি? |

হোরেশিও : একেবারে বিরতিহীন।

হ্যামলেট : আমি যদি থাকতাম সেখানে তখন।

হোরেশিও : বিস্মিত হতেন সুনিশ্চিত।

হ্যামলেট : স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। ছিল কি অনেকক্ষণ?

হোরেশিও : যতক্ষণ একশো পর্যন্ত আস্তে গোনা যায় ঠিক ছিল
ততক্ষণ।

মার্সেলাস ও বার্নার্ডো : বেশি, তার চেয়ে আরো বেশি।

হোরেশিও : ততক্ষণ আমি অবশ্য দেখি নি তাকে।

হ্যামলেট : দাড়ি তাঁর ধূসরিত ছিল নাকি?

হোরেশিও : ঠিক তাই। যেমন জীবিতকালে দেখেছি তেমনি
সাদায় কালোয় মেশা।

হ্যামলেট : আমিও পাহারা দেব আজ
রাতে, হয়তো ফের আসবে সে।

হোরেশিও : আমার বিশ্বাস আসবে।

হ্যামলেট : আমার মহান জনকের মূর্তি নিয়ে এলে তার
সঙ্গে বলব কথা; যদি নরক হাঁ ক'রে চুপ থাকতে
বলে, তবু, আমার একান্ত অনুরোধ, যদি তোমরা
এ যাবত একথা গোপন করে থাকো, তবে সেটা
গোপনই থাকতে দাও। মুখর নীরবতায়। আর
আজ রাতে যা কিছু ঘটবে শুধু চোখে দেখবে, বুঝবে
মনে মনে কিন্তু খুলবে না মুখ। তোমাদের এই
প্রীতির যথার্থ প্রতিদান দেব আমি সুনিশ্চিত।
তাহলে বিদায় বলি, রাত এগারোটা কি বারোটা
বাজলে করব দেখা পাহারার মঞ্চে তোমাদের
সঙ্গে ফের।

সকলে সমস্বরে : আপনার সম্মানার্থে কর্তব্য করব।

হ্যামলেট : দিন ভালোবাসা, আমিও আপনাদের ভালোবাসি।
তাহলে বিদায় বলি।

[ হোরেশিও, মার্সেলাস এবং বার্নার্ডোর প্রস্থান।]

আমার পিতার মূর্তি বর্মাবৃত। অশুভ লক্ষণ;
গোলমেলে খেল; সুনিশ্চয় নাজায়েজ কিছু হবে
উদ্‌ঘাটিত, এক্ষুণি নামত যদি রাত্রি, হে আমার
আত্মা ততক্ষণ শান্ত থাক, পৃথিবীর সব বাধা
ঠেলে ঠুলে দুর্নিবার অপরাধ. কাজ মানুষের চোখ
ঢেকে দেবে স্বমূর্তিতে, ফেলবে ছেয়ে এই মর্ত্যলোকে।

[ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ লেয়ার্তেস এবং তার বোন ওফেলিয়ার প্রবেশ। ]

লেয়ার্তেস : জাহাজে আমার সব মালপত্র ওঠানো হয়েছে।
তাহলে বিদায় বোন এবং যদ্দিন অনুকূল
হাওয়া বইবে, চলাচল করবে জাহাজ, ততদিন
আলসেমি না করে আমাকে চিঠিপত্র দিও কিন্তু।

ওফেলিয়া : তোমার সন্দেহ আছে না কি?

লেয়ার্তেস : আর যুবরাজ হ্যামলেটের বিষয়ে বলতে হয়,
প্রেম তো খেয়াল মাত্র তাঁর, সে এক ফ্যাশন শুধু,
ব্যাপারটা এ-ই ধরে নাও; তাঁব অনুরাগ যেন
বসন্তের প্রথম দিনের ফুল, তাজা সুমধুর;
অথচ সৌরভ তার দীর্ঘস্থায়ী নয়, মুহূর্তের
আনন্দ জোগায় বটে, তার বেশি কিছু নয়, বোন।

ওফেলিয়া : আর বেশি কিছু নয়?

লেয়ার্তেস : তাই; তার বেশি কিছু নয়।
শরীর পেশিতে আর গড়নে উঠলে বেড়ে, তারই
সঙ্গো সঙ্গো বৃদ্ধি পায় মনের ক্ষমতা, অন্তর্লোকে
চলে কাজ; হয়তো সে ভালোবাসে তোমাকে এখন,
হয়তো বা এখন শঠতা কিংবা কলঙ্ক কিছুই
আবিল করতে পারবে না প্রণয়কে তার, কিন্তু
তোমাকে সতর্ক হতে হবে, ভেবে দেখতে হবে তার
উচ্চ পদমর্যাদার কথা। কখনো স্ববশ নয়
নিজের ইচ্ছারা তাঁর; কেননা নিজেই তিনি তাঁর
জন্মের অধীন, পারেন না তিনি নগণ্য লোকের
মতো বেছে নিতে বধূ স্বেচ্ছায় কখনো। যুবরাজ
তিনি, তাই তাঁর জীবনসঙ্গিনী বাছাইয়ের সঙ্গো
রাজ্যের কল্যাণ আর নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গি জড়িত।
অতএব পছন্দ সীমিত তাঁর, সে রাজ্যই করে
নির্ধারণ তাঁর পছন্দের সীমারেখা তিনি যার
কর্ণধার; তারপর তিনি যদি বলেন তোমাকে
ভালোবাসেন, তাহালে স্থানকাল বুঝে তিনি তাঁর
কথামতো কাজ করছেন কিনা, সেটা বিবেচনা
করে দ্যাখো, যদি তুমি তাঁর প্রেমগীতিকায় ম'জে

আত্মহারা হয়ে যাও, হৃদয় হারাও কিংবা তাঁর
বাধাবন্ধনহীন প্রেমোচ্ছ্বাসে তোমার কৌমার্য করো
সমর্পণ, তাহলে তোমার সম্ভ্রমের কত হানি
হবে; ওফেলিয়া, হে প্রিয় ভগ্নী আমার, সাবধান
হও, অনুরাগে তুমি হয়ো না বিহ্বল, দূরে থেকো
কামনার ফাঁদ থেকে। চাঁদের নিকট রূপ তার
উন্মোচিত করে দিলে সবচে' সতর্ক কুমারীও
সাধে সর্বনাশ আপনার। সতীরও নিস্তার নেই
কুৎসার প্রহার থেকে; বসন্তের ফুল্ল প্রসূনেরা
প্রায়শই পাপড়ি মেলবার প্রাক্কালেই ক্রূর
পুষ্পভুক কীটের দংশনে জর্জরিত হয়, যৌবনের
কোমল শিশির স্নিগ্ধ প্রভাতেই ক্ষয়ের আশঙ্কা
বেশি, তাই সাবধান; ভীতিতেই নিরাপত্তা বোন,
শত্রু বিনা নিজেরই শত্রুতা সাধে বিদ্রোহী যৌবন।

ওফেলিয়া : থাকবে তোমার এই উপদেশ প্রহরীর মতো
সর্বক্ষণ অন্তরে আমার; কিন্তু হে সুশীল ভ্রাতা,
এমন অসৎ ধর্মযাজক আছেন, তুমি তাঁদের মতোই
আমাকে দেখাতে পারো স্বর্গের কণ্টকাবৃত রুক্ষ
পথ আর নিজে গর্বস্ফীত বেপরোয়া লম্পটের
মতো ছুটে যেতে পারো সম্ভোগের পুষ্পময় পথে,
অমান্য করতে পারো নিজেরই মন্ত্রণা।

লেয়ার্তেস : থাক, থাক,
আমার ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামিও না। বড়ো বেশি
দেরি হয়ে গেল এখানেই, ঐ যে পিতা আসছেন।

[ পলোনিয়াসের প্রবেশ। ]

দু'বার আশিস পাওয়া মানে দ্বিগুণ প্রসাদ লাভ,
আপনার কাছে ফের বিদায় নেয়ার আমি সুযোগ
পেলাম।

পলোনিয়াস : এখনো এখানে তুমি লেয়ার্তেস? কী লজ্জার কথা,
তাড়াতাড়ি যাও, হাওয়া লেগেছে তো পালে আর তুমি
এখানে দাঁড়িয়ে আছো! আশীর্বাদ করি পুনর্বার,
আর শোনো কয়েকটি নীতিকথা মনের ভেতর
সযত্নে খোদাই ক'রে রেখো। নিজ উপদেশ তুমি
নিজের কাছেই রেখো, কখনো মনের কোনো কথা
হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলবে না। অসঙ্গত
কোনো কাজ করবে না; অন্তরঙ্গ হবে বটে, কিন্তু

কিছুতেই স্থূলতাকে দেবে না প্রশ্রয়, শালীনতা
রাখবে বজায় আর প্রথমেই করবে পরখ
প্রকৃত সুহৃদ কারা, তারপর তাদের আঁকড়ে
ধরবে সুদৃঢ়ভাবে ইস্পাতী অংটার মতো, কিন্তু
যত্রতত্র যাকে তাকে ইয়ার বানিয়ে বসবে না;
হুঁশিয়ার থেকো যাতে কোনো বিবাদ না বাধে, যদি
একান্তই বেধে যায়, তবে বিরোধী পক্ষকে
বাতলে দেবে তোমার তাকত কত, যেন আর
কস্মিনকালেও কাছে ঘেঁষতে না পারে। শুনবে সবার
কথা, কিন্তু কাউকে কখনো যেচে দিও না মন্ত্রণা।
প্রত্যেকের মতামত নেবে, কিন্তু করবে না স্বমত
জাহির। আয় বুঝে ব্যয় কোরো, নিজের সামর্থ্য বুঝে
সুঝে বানাবে পোশাক, ভালো হওয়া চাই, কিন্তু
জমকালো হবার দরকার নেই; দামি হোক চমকিলা
নয়; কেননা সচরাচর পোশাকেই মেলে মানুষের
পরিচয় এবং ফরাসি দেশে, বিশেষত যারা
হোমরা-চোমরা তারা এ ব্যাপারে বড়ো খুঁতখুঁতে,
রুচিশীল, খরচিলা বড় বেশি। অধমর্ণ কিংবা
উত্তমর্ণ হবে না কিছুই তুমি, কারণ প্রায়শ
দেখা যায়, ধার দিলে অর্থ আর বন্ধু দুই-ই যায়
খোওয়া আর ধার নিলে মিতব্যয়িতার ধার ক্ষ'য়ে
যায়; সর্বোপরি আমার এ উপদেশ রেখো মনে;
থাকবে নিজের কাছে খাঁটি, তাহলে তোমার সবই
চলে যাবে ঠিকঠাক আর রাত্রি যেমন দিনের
অনুগামী তেমনি তুমি অন্যের ব্যাপারে পড়বে না
বিচ্ছিরি বিপাকে। এসো তবে, আশীর্বাদ করি আমি,
এসব সদগুণ যেন পুত্র তোমাতে পূর্ণতা পায়।

লেয়ার্তেস : তা'হলে আমাকে যেতে আজ্ঞা দিন, পিতা।

পলোনিয়াস : সময় তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, এখন যাও,
ক্ষণকাল কোরো না বিলম্ব আর তোমার ভৃত্যেরা
সেখানে অপেক্ষমাণ।

লেয়ার্তেস : আমি তবে ওফেলিয়া। আর আমি যা বলেছি সব
মনে রেখো কিন্তু।

ওফেলিয়া : আমার স্মৃতির অন্তঃপুরে রেখেছি অর্গল দিয়ে,
স্বয়ং তোমারই কাছে রইল তার চাবি।

| | | |
|---|---|---|
| লেয়ার্তেস | : | আমি তবে। [ প্রস্থান। ] |
| পলোনিয়াস | : | বলো, কী ব্যাপার? সে তোমাকে কী বলেছে, ওফেলিয়া? |
| ওফেলিয়া | : | শুনতে আগ্রহী হলে বলি, যুবরাজ হ্যামলেটের সম্পর্কে বলেছে কিছু কথা। |
| পলোনিয়াস | : | আচ্ছা, আচ্ছা; হ্যাঁ, মনে পড়েছে শুনতে পেলাম তিনি ইদানিং তোমার সান্নিধ্যে ঘন ঘন কাটান সময় আর তুমিও দর্শন দানে খুব অবাধ, বদান্য নাকি! যদি তা-ই হয়, যা আমাকে জানানো হয়েছে, তবে সতর্কতামূলকভাবেই তোমাকে আমার বলা উচিত যে, আমার দুহিতা হিসেবে আপনকার সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরেই কী রকম আচরণ শোভন তোমার পক্ষে, সেটা বুঝতে পারো না তুমি স্পষ্টভাবে। বলো তো তোমার আর হ্যামলেটের মধ্যে কী চলছে? সত্যি করে বলো। |
| ওফেলিয়া | : | পিতা, তিনি সম্প্রতি আমাকে দিয়েছেন বহুবার তাঁর অনুরাগের প্রসাদ। |
| | : | কী বললে, অনুরাগ? আরে তোবা করো তোবা, তুমি তেমন আনাড়ি খুকিটির মতোই বলছো কথা, যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি পারে না যাচাই করতে। তুমি কি বিশ্বাস করো তাঁর প্রীতি, যা বললে তুমি? |
| ওফেলিয়া | : | এ ব্যাপারে কী আমার চিন্তাধারা, পিতা, আমি নিজেই জানি না। |
| পলোনিয়াস | : | তাই নাকি? এসো তাহলে শিখিয়ে দিই, তুমি তাঁর প্রণয়কে, আসলে যা' তামা, খাঁটি সোনা ভেবে অর্বাচীন বালিকার মতো ব্যবহার করেছো বটে। নিজের দরটা আরো বাড়ানো উচিত; নইলে এই দরপত্র উৎপ্রেক্ষাটিকে মাত্রাধিক না টেনেই বলা চলে, আমার কদর তুমি কমিয়ে আমাকে বানাবে বেকুব। |
| ওফেলিয়া | : | পিতা, তিনি সদুদ্দেশ্য নিয়েই আমার প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন সম্মানিত কায়দায়। |
| পলোনিয়াস | : | বেশ, কায়দাই বটে; ব্যাপারটা বাজে, অতি বাজে। |
| ওফেলিয়া | : | এবং কথায় তাঁর ছিল প্রায় সকল পবিত্র শপথের সমর্থন। |

পলোনিয়াস : বোকা-সোকা পাখি ধরবার ফাঁদ বটে। আমি জানি,
যখন শিরায় জ্বলে রক্ত, তখন আত্মাও এক
প্রগলভ বদান্যতায় জিহ্বাকে জোগায় শপথের
বাণী; এসব লেলিহান শিখা, হে কন্যা আমার
যত আলো দেয় তত দেয় না উত্তাপ। এইসব
অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠার সঙ্গেই নিভে যায়। তাই একে
প্রেমানল বলে তুমি কখনো কোরো না ভুল, আর
এখন থেকেই থেকো অন্তরালে, তোমার কুমারী
সঙ্গ তাঁকে কমই দিও আর এই দেখা-শোনাটাকে
সামান্য বাক্যালাপের চেয়ে বেশি মূল্য দিও।
হ্যামলেট সম্পর্কে বলতে হয়, ভুলো না যে তিনি
তরুণ, তোমার চেয়ে তাঁর স্বাধীনতা ঢের বেশি।
মোট কথা, ওফেলিয়া, তাঁর অঙ্গীকারে ভুলক্রমে
কোরো না বিশ্বাস, ওরা দালাল বস্তুত জেনে রেখো,
ওদের পোশাক যে-রঙের সে-রঙ আসল নয়,
পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে অপবিত্র মিলনের
ওরা করে ঘটকালি। এসবই তোমাকে প্রতারিত
করবার ফন্দি আর মোদ্দা কথা হল, আমি সাফ
বলে দিচ্ছি, হ্যামলেটের সঙ্গো কথাবার্তা বলে
তোমার একটি অবসর মুহূর্তকেও কলঙ্কিত
করতে দেবে না, মনে রেখো, এটা হুকুম আমার।
চলো, যাওয়া যাক তবে।

ওফেলিয়া : যথা আজ্ঞা পিতা। [ প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ হ্যামলেট, হোরেশিও এবং মার্সেলাসের প্রবেশ ]

| | | |
|---|---|---|
| হ্যামলেট | : | কী দারুণ শীত, হাড়ে লাগে হিম হাওয়ার কামড়। |
| হোরেশিও | : | তীক্ষ্ণ কনকনে হাওয়া। |
| হ্যামলেট | : | বলতো এখন ক'টা বাজে? |
| হোরেশিও | : | বারোটা বাজেনি মনে হয়। |
| মার্সেলাস | : | না, বেজেছে। |
| হোরেশিও | : | তাই নাকি? শুনতে পাইনি আমি, তাহলে এখন<br>অশরীরী সে আত্মার আসবার সময় হয়েছে।<br>[ ভেরি বেজে উঠল, এবং দু'বার তোপধ্বনি হল ] |
| হ্যামলেট | : | আজ রাতে রাজা জেগে আছেন এবং তিনি এই<br>উৎসব-মুখর ক্ষণে পানোন্মত্ত, নাচে ঘূর্ণমান;<br>যখন আকণ্ঠ করছেন পান রাইনের মদ,<br>তখন কাড়া নাকাড়া আর ভেরির নিনাদ তার<br>সুকৃতির জয়বার্তা ঘোষণা করছে। |
| হোরেশিও | : | এখানে এই কি প্রথা? |
| হ্যামলেট | : | হ্যাঁ, প্রথাই, তবে<br>যদি জন্মেছি আমি এ দেশে এবং স্বদেশের<br>রীতিনীতি আমাতে বর্তেছে কিছু, তবুও আমার<br>মতে এই প্রথা পালনের চেয়ে অমান্য করাই<br>সম্মানীয় বেশি। এই নিরেট নির্বোধ<br>হইচই পানোৎসব রটিয়েছে আমাদের বদনাম<br>পূর্বে ও পশ্চিমে সবখানে। একারণে দুনিয়ার<br>অন্যান্য জাতির কাছে ধিক্কৃত, নিন্দিত আমরা আর<br>অকথ্য ভাষায় তারা গালমন্দ দেয় আমাদের<br>এবং মদ্যপ বলে আমাদের। আর বাস্তবিক<br>এই মাতলামি আমাদের সর্বোত্তম কীর্তি থেকে<br>আমাদেব বেবাক গুণের মেদমজ্জা শুষে নেয়।<br>তাই, প্রায় দেখা যায়, কোনো কোনো বিশেষ মানুষ,<br>তাদের ভেতরে আছে সহজাত কুপ্রবৃত্তি যথা<br>জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, তার জন্যে দায়ী নয় তারা,<br>কেননা স্বভাব উৎস বেছে নিতে পারে না কখনো।<br>আবার তাদের মধ্যে কোনো এক বিশেষ প্রবৃত্তি |

এমন প্রবল বেড়ে যায় যাতে ভেঙে পড়ে সীমা
আর দুর্গ যুক্তির অথবা থাকে এমন অভ্যাস,
যার ফলে নষ্ট হয় শোভন শালীন আচরণ।
এসব মানুষ বয় একটি দোষের ছাপ, সেই
দোষ হতে পারে আচরণগত কিংবা নসিবের
নক্ষত্রের মতো। কিন্তু তাদের অন্যান্য গুণাবলি
হতে পারে ঈশ্বরের মহিমার মতো অনাবিল,
মানুষের পক্ষে যত সম্ভব ততটা সীমাহীন
হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের বিচারে সেই
একটি দোষের জন্যে তাকে হতে হবে দোষী, এক
বিন্দু মন্দ মানুষের সব মহিমাকে করে তোলে
অপবাদে সন্দেহভাজন।

[ প্রেতাত্মার প্রবেশ। ]

হোরেশিও : এ যে দেখুন প্রভু, সে আসছে।

হ্যামলেট : শোনো হে দেবকুল, দেবদূতগণ রক্ষা করো
আমাদের। তুমি কি প্রশান্ত আত্মা, নাকি অভিশপ্ত
নারকী প্রেতাত্মা কোনো? এনেছো স্বর্গের হাওয়া নাকি
নরকের আঁধিঝড়? তোমার উদ্দেশ্য?
ভালো হোক, মন্দ হোক এরকম বিতর্কিত রূপে
আবির্ভূত হয়েছো যে আমাকে তোমার সঙ্গে কথা
বলতেই হবে; হ্যামলেট, পিতা, ডেনমার্ক-রাজ
বলে আমি ডাকব তোমাকে। দাও আমাকে জবাব
দাও তুমি। রেখো না আমাকে অজ্ঞতার চাপে, যাতে
চকিতে ফেটে না পড়ি। বলো কেন তোমার অন্ত্যেষ্টি-
ক্রিয়াসিদ্ধ অস্থিশুদ্ধ শবাধার চুরমার করে
তোমার কাফন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছো? যে-সমাধি
চৈত্যে আমরা তোমাকে নিঃশব্দে
শায়িত দেখেছিলাম, কেন সে ভারিক্কি তার সেই
মর্মর চোয়াল খুলে তোমাকে উগরে দিল ফের?
কী অর্থ দাঁড়ায় এর? তুমি, মৃত শব বর্মাবৃত
হয়ে পুরোপুরি কেন আবার দিয়েছো দেখা এই
মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকে রাত্তিরকে অধিক ভয়াল
করে তুলবার জন্যে? প্রকৃতির পুতুল আমরা,
কেন আমাদের আন্দোলিত করে তোলো আমাদের
বোধের অতীত সব ভাবনায়? কী এর কারণ

বলো, কেন এরকম হল? কী কর্তব্য আমাদের?
[ প্রেতাত্মা হ্যামলেটকে ইশারা করল ]

হোরেশিও : আপনাকে তার সঙ্গে যেতে ইশারায় ডাকছে সে;
যেন সে জানাতে চায় কেবল আপনাকেই একা
কিছু কথা।

মার্সেলাস : দেখুন কী সৌজন্যমূলক আচরণে
হাতছানি দিয়ে ডাকছে সে আপনাকে আরো দূর
স্থানে যেতে। কিন্তু ওর সঙ্গে যাবেন না।

হোরেশিও : না কুমার, কিছুতেই যাবেন না।

হ্যামলেট : বলবে না সে কথা; তাহলে আমি তার অনুগামী
হব।

হোরেশিও : যাবেন না যুবরাজ।

হ্যামলেট : কেন, ভয় কিসের বলো তো?
একটি কুটোর চেয়ে বেশি দাম ধরি না আমার
জীবনের। এবং আমার আত্মা? কী ক্ষতি সে করতে
পারে তার? সে তো তারই মতো অনশ্বর। হাতছানি
দিয়ে ঐ ডাকছে সে আমাকে আবার। আমি তার
পেছনে পেছনে যাব।

হোরেশিও : যদি সে ভুলিয়ে আপনাকে দুর্বার বন্যার দিকে
নিয়ে যায় কিংবা ধুধু সমুদ্রে আনত পাহাড়ের
ভয়ংকর চূড়ায়, যেখানে গিয়ে ভয়াবহ কোনো
ভিন্ন মূর্তি ধ'রে যদি আপনার যুক্তির আসন
টলিয়ে উন্মাদ করে ফেলে আপনাকে, তবে
কী হবে, ভাবুন একবার। এ এমন এক স্থান,
এখানে দাঁড়িয়ে কেউ নীচের অতল সমুদ্রের
দিকে দৃষ্টি দিলে, তার গর্জন শুনলে, অযৌক্তিক
চিন্তায় মরিয়া হয়ে ওঠে।

হ্যামলেট : এখনো সে হাতছানি
দিয়ে দূরে ডাকছে আমাকে, চল আমি
তোমার পেছনে যাব।

মার্সেলাস : যাবেন না প্রভু।

হ্যামলেট : ছাড়ো, হাত ছেড়ে দাও।

হোরেশিও : শান্ত হোন যুবরাজ, যাবেন না।

হ্যামলেট : আমার নিয়তি
আমাকে ডাকছে আর সে ডাকে আমার শরীরের
প্রতি শিরা উপশিরা নিমীয় সিংহের পেশি হয়ে

উঠেছে এমন দৃঢ়। এখনো আমাকে ডাকছে সে,
হাত ছেড়ে দাও, নইলে কসম খোদার যে আমাকে
বাধা দেবে তাকে আমি স্রেফ বানিয়ে ফেলব প্রেত।
বলছি তো সরে যাও। চলো, যাচ্ছি তোমার পেছনে।

[ প্রেতাত্মা ও হ্যামলেটের প্রস্থান।]

হোরেশিও : কল্পনার প্রজ্জ্বলনে তিনি অধীর মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

মার্সেলাস : চলো আমরাও তাঁর অনুগামী হই, তাঁর আজ্ঞা এখন তামিল করা সমীচীন নয়।

হোরেশিও : তাই হোক, কিন্তু এতে এমন কী ফল হবে, বলো?

মার্সেলাস : ডেনমার্ক রাজ্যে কীসে যেন খুব পচন ধরেছে।

হোরেশিও : খোদার যা ইচ্ছে তাই হবে।

মার্সেলাস : তা' না বলে চলো তাঁর পিছে যাই।

[ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য

[ প্রেতমূর্তি এবং হ্যামলেটের প্রবেশ। ]

হ্যামলেট : কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে বলো, আর দূরে যাব নাকো আমি।

প্রেতমূর্তি : কথা শোনো।

হ্যামলেট : হ্যাঁ, শুনছি।

প্রেতমূর্তি : আমার যাবার ক্ষণ এসে গেছে প্রায়। আবার নিজেকে ছুড়ে দিতে হবে সুতীব্র গন্ধকগান্ধী সেই অত্যাচারী অগ্নিকুণ্ডে।

হ্যামলেট : হায় হতভাগ্য অশরীরী।

প্রেতমূর্তি : করুণা করো না তুমি আমাকে বরং মন দিয়ে শোনো যা বলছি খুলে।

হ্যামলেট : বলো, শুনতেই হবে।

প্রেতমূর্তি : শুনলে তোমাকে অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে।

হ্যামলেট : কী বললে?

প্রেতমূর্তি : তোমার পিতার আত্মা আমি,
এই মতো কিছুকাল রাত্রির প্রহরে একা ঘুরে
বেড়ানোই নিয়তি আমার। আর দিনে সারাক্ষণ
উপবাসে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হচ্ছি, যদ্দিন আমার
ঘৃণ্য অপরাধ পুড়ে নিশ্চিহ্ন না হয় ততদিন
এভাবে পুড়ব আমি। সে কারাগারের
রহস্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, না হলে পারতাম
তোমাকে শোনাতে আমি এমন কাহিনি, যার কোনো
নগণ্য ঘটনা শুনলেও নিশ্চিত তোমার আত্মা
যন্ত্রণায় অত্যন্ত মুচড়ে যাবে, তোমার তরুণ
রক্ত জমে যাবে আর তোমার দু'চোখ নক্ষত্রের
মতো হবে কক্ষচ্যুত। তোমার বিন্যস্ত চুল হবে
এলোমেলো, রাগী শজারুর গায়ে কাঁটার মতো
তোমার প্রতিটি চুল খাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু এই
অনন্ত রহস্য রক্তমাংসের মানুষের কাছে
উন্মোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যদি তুমি প্রিয়
পিতাকে তোমার ভালোবেসে থাকো কখনো, তাহলে
শোনো, শোনো তুমি—

হ্যামলেট : হায় খোদা।

প্রেতমূর্তি : প্রতিশোধ নাও তার ঘৃণ্য অস্বাভাবিক হত্যার।

হ্যামলেট : হত্যা!

প্রেতমূর্তি : যদি কোনো মহত্তর কারণেও ঘটে, তবু হত্যা
অত্যন্ত জঘন্য, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে
অদ্ভুত জঘন্যতম এবং অস্বাভাবিক।

হ্যামলেট : আমাকে সত্বর বলো, বলো যাতে আমি প্রণয়ের
ভাবনার মতো, কল্পনার মতো ত্বরিত পাখায়
উড়ে গিয়ে তুমুল ঝাঁপিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারি।

প্রেতমূর্তি : তুমি সে কাজের যোগ্য মনে হয়, এ-কথা শুনেও
যদি তুমি শিহরিত না হতে, তা'হলে ভাবতাম
বৈতরণি তটে যে স্থূল আগাছা নির্বিবাদে বাড়ে,
তুমি তার চাইতেও অধিক অসার। তবে শোনো
হ্যামলেট, জনশ্রুতি আছে, যখন বাগানে আমি
ঘুমিয়েছিলাম ঠিক তখুনি আমার মৃত্যু হয়
সাপের কামড়ে আর বস্তুত তামাম ডেনমার্ক
অত্যন্ত কুৎসিতভাবে প্রতারিত হয়েছে আমার
মৃত্যু-সংবাদের রটনায়। কিন্তু হে মহান যুবা,
জেনে রাখো, যে-সাপের কামড়ে তোমার পিতা প্রাণ
হারিয়েছে, বর্তমানে সেই কালনাগ
পরেছে মাথায় তার আমারই মুকুট।

হ্যামলেট : হে আমার ভবিষ্যতদ্রষ্টা আত্মা। আমার পিতৃব্য!

প্রেতমূর্তি : হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত কামুক, পশু, তার
কুবুদ্ধির মোহকরী ছলাকলা আর প্রতারক
গুণপনা দিয়ে পুণ্যবতী রানিকে আমার
করেছে শিকার তার কামনার। হায় হ্যামলেট
কী-যে অধঃপতন, তা নইলে, এই আমি যার প্রেম
ছিল খুব মর্যাদাসম্পন্ন, বিবাহের শপথের
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে আমাকে ছেড়ে নেমে গেল
কিনা সে দুরাত্মার কাছে যার সহজাত গুণ
নিকৃষ্ট আমার চেয়ে।
লাম্পট্য স্বর্গীয় রূপ ধরে এলেও যেমন
সদ্‌গুণ হয় না স্থানচ্যুত, তেমনি লালসা দেদীপ্যমান
দেবতার সঙ্গে সহবাস করলেও, চোখ তার
থাকে আবর্জনাতেই।

কিন্তু চুপ, মনে হয় পাচ্ছি ভোরের হাওয়ার ঘ্রাণ,
সংক্ষেপে বক্তব্য সারি। বিকেলে অভ্যাস ছিলো সদা
আমার বাগানে ঘুমোবার। নির্বিঘ্ন প্রহরে সেই
যখন ছিলাম মগ্ন ঘুমে, তোমার পিতৃব্য ঠিক
চোরের মতন এসে ঘুমন্ত আমার কানে শিশি
থেকে হেবোনার রস দিল ঢেলে, যার বিষক্রিয়া
এমন শত্রুতা করে মানুষের শোণিতের সঙ্গে
যে নিমেষে কুষ্ঠ বিষ পারদের মতো অতি দ্রুত
শরীরের অলিগলি জুড়ে ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে।
অকস্মাৎ রক্ত জমে যায়, যেমন অম্লরসে
দুধ হয়ে যায় দধি। আমারও বেলায় হল তাই;
মুহূর্তে মসৃণ দেহে বালকের মতো মামড়িতে
ভরে গেল, জঘন্য কুষ্ঠের ক্ষত যেন।
এভাবেই ঘুমে আমি নিহত হলাম সোদরের
হাতে আর একযোগে জীবন, মুকুট, রানি থেকে
হলাম বঞ্চিত আর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করার আগেই দ্রুত আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল
ঈশ্বরের কাছে কোনো সৎকার ছাড়াই। যেতে হল
মাথায় পাপের ভরা ঘড়া নিয়ে। ওহ্ কী ভীষণ
বিভীষিকা, ভয়ংকর, সবচেয়ে ভয়ংকর। যদি
শিরায় রক্তের টান অনুভব করো, তবে তুমি
কখনো করো না সহ্য এই অনাচার,
আর ডেনমার্কের পবিত্র রাজশয্যাকে দিও না হতে
অজাচার আর অবৈধ প্রেমের লীলাভূমি।
এ গুরু দায়িত্ব পালনের কালে মনকে করো না
কলুষিত; জননীর বিরোধিতা করো না কখনো।
তাকে ছেড়ে দাও ঈশ্বরের হাতে, তার অন্তরের
অন্তস্থলে রয়েছে যে কাঁটা, তা-ই তাকে সারাক্ষণ
খুঁচিয়ে বিক্ষত করবে। তাহলে বিদায় বলি, দ্যাখো
জোনাকিরা দিচ্ছে সকালের পূর্বাভাস। হচ্ছে ম্লান
তাদের বিফল আলো। বিদায়, বিদায় হ্যামলেট,
আমাকে স্মরণে রেখো।

[ প্রেতাত্মার প্রস্থান। ]

হ্যামলেট : হে স্বর্গের দেবকুল। হে পৃথিবী। বলো আর কাকে
ডাকব এখন? নরককেও ডাক দেব? হায়, ধিক।

শান্ত হও হৃদয় আমার। আর তোমার আমার
পেশিপুঞ্জ এক্ষুনি হয়ো না অবসন্ন, শ্লথ, লোল,
আমাকে সুদৃঢ় রাখো। থাকবে তোমার কথা মনে।
হায় হতভাগ্য অশরীরী, যতদিন এ বিভ্রান্ত
মাথায় স্মৃতির ঠাঁই আছে ততদিন সুনিশ্চয়
তোমাকে রাখব মনে। হ্যাঁ আমার স্মৃতির ফলক
থেকে মুছে দেব সব তুচ্ছ, বোকা বিবরণী,
কেতাবের কচকচি, সব ছবি, সকল ধারণা
অতীতের, যা যৌবন আর নিরীক্ষণ টুকে রাখে;
তোমার আদেশ শুধু তুচ্ছতার মিশোলবিহীন
থাকবে মাথার পরিধিতে। খোদার কসম খেয়ে
বলি, ওরে কলুষ-হৃদয় নারী
হে দুরাত্মা, অভিশপ্ত দুর্বৃত্ত, দুর্জন, লিখে রাখি
স্মৃতির ফলকে — একজন স্মিত হেসে হতে পারে
দুরাচার, অন্তত নিশ্চিত আমি, এইটে সম্ভব
ডেনমার্কে : তাহলে পিতৃব্য তুমি দেখালে এ খেল

[লেখে]

এবং এখন থেকে সারাক্ষণ আমার জিগির
হল এই : বিদায়, বিদায়, 'মনে রেখো।'
শপথ নিয়েছি আমি।

[ হোরেশিও এবং মার্সেলাসের প্রবেশ। ওরা ডাকছে।]

হোরেশিও : প্রভু, প্রভু কোথায় আপনি?

মার্সেলাস : প্রভু হ্যামলেট!

হোরেশিও : ঈশ্বর বাঁচান তাঁকে।

হ্যামলেট : [ নেপথ্যে ] তাই হোক।

মার্সেলাস : ইল্লো হো, হো, প্রভু।

হ্যামলেট : ইল্লো হো, হো, খোকা। আয়, পাখি আয়।

মার্সেলাস : কী সংবাদ আমার মহান প্রভু?

হোরেশিও : কী সংবাদ বলুন কুমার।

হ্যামলেট : বিস্ময়কর।

হোরেশিও : আমাদের বলুন সে-কথা।

হ্যামলেট : না। তোমরা, ফাঁস করে দেবে সব।

হোরেশিও : ধর্ম সাক্ষী, আমি তা কখনো করব না।

মার্সেলাস : আমিও না প্রভু।

হ্যামলেট : কী করে সে কথা বলি? কোনো মানুষ কি
সে-কথা ভাবতে পারে? যা বলব, তোমরা গোপন
রাখবে তো ঠিক?

হোরেশিও
মার্সেলাস | খোদার কসম, আমরা বলব না কাউকে সে-কথা।

হ্যামলেট : সারা ডেনমার্কে আজ এমন দুরাত্মা নেই কোনো
যে-নয় সাক্ষাৎ প্রতারক।

হোরেশিও : আমাদের একথা বলার জন্যে কোনো প্রেতাত্মার
কবরের থেকে উঠে আসবার কোনো প্রয়োজন
পড়ে না কুমার।

হ্যামলেট : ঠিক তাই, তোমার কথাই ঠিক।
তাই এসো ভণিতা ছাড়াই বলি, আমাদের হাত
মিলিয়ে বিদায় নেয়াটাই সমীচীন মনে করি।
তোমাদের কাজ আর ইচ্ছা যেদিকে নির্দেশ করে
পথ, তা' সে যাই হোক, সেখানে তোমরা চলে যাও।
আর এই হতভাগ্য আমার কথাই যদি বলো,
আমি যাব প্রার্থনা করতে।

হোরেশিও : এইসব অর্থহীন, অসংলগ্ন কথা যুবরাজ।

হ্যামলেট : আমার কথায় যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকো, তবে
আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত : সত্যই অতিশয়
দুঃখিত, বিশ্বাস করো।

হোরেশিও : অসন্তুষ্ট হই নি কুমার।

: বিলক্ষণ, কিন্তু সন্ত প্যাট্রিকের শপথ, এ-কথা
শুনে ক্ষুব্ধ হবার কারণ আছে, যথেষ্ট কারণ আছে।
আর এই ছায়ামূর্তিটির প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায়, সেটা
সৎ প্রেত। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা যা হয়েছে
যদি তা' শুনতে চাও, তবে সে-বাসনা
যতদূর সম্ভব দমন করো। এবার শোনো হে
আমার সুহৃদগণ, তোমরা আমার বন্ধু আর
পণ্ডিত ও সৈনিক বলেই অতি সামান্য একটি
অনুরোধ করি। রাখবে তো?

হোরেশিও : বলুন কী অনুরাধ, রাখব নিশ্চয়।

হ্যামলেট : যা দেখেছো আজ রাতে কখনো তা বলো না কাউকে।

হোরেশিও
মার্সেলাস | বলব না কোনোদিন।

হ্যামলেট : না, না, তবুও শপথ করো।

হোরেশিও : বিশ্বাস করুন প্রভু আমি বলব না।

মার্সেলাস : আমিও না;
বিশ্বাস করুন।
হ্যামলেট : এই তরবারি ছুঁয়ে তোমরা শপথ নাও।
মার্সেলাস : আমরা তো শপথ নিয়েছি যুবরাজ।
হ্যামলেট : আমার এ তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করো।
প্রেতাত্মা : (মঞ্চের নীচ থেকে চেঁচিয়ে) শপথ গ্রহণ করো।
হ্যামলেট : হাঃ হাঃ বৎস। তুমিও বলছো তাই? হে সজ্জন তুমি আছো কি সেখানে? এসো, তোমরা মাটির নীচে থেকে শুনলে তো তার কথা। শপথ করতে রাজি হও।
হোরেশিও : তাহলে শপথ বাক্য উচ্চরণ করুন কুমার।
হ্যামলেট : যা দেখেছো তা কখনো বলবে না, এই অসি ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করো।
প্রেতাত্মা : শপথ গ্রহণ করো। [ ওর শপথ নেয় ]
হ্যামলেট : এখানে এবং সবখানে? তাহলে আমরা জায়গা বদল করব। এসো এখানে হে ভদ্র,
এবং আবার রাখো হাত এই অসির ওপর।
আমার এ তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করো
যা শুনেছো তা তোমরা বলবে না কস্মিনকালেও।
প্রেতাত্মা : এ তলোয়ার স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করো।
[ ওরা শপথ নেয় ]
হ্যামলেট : তোফা বলেছো হে বুড়ো গন্ধমূষিক; মাটির অত নীচেও তোমার ক্ষিপ্র গতি? বেড়ে খনিজীবী। এসো বন্ধুগণ আরো একবার জায়গা বদল করি।
হোরেশিও : সাক্ষী এই দিনরাত্রি, এ অত্যন্ত আশ্চর্য, অদ্ভুত।
হ্যামলেট : সুতরাং এই অদ্ভুতকে স্বাগত জানাও, শোনো,
স্বর্গে মর্ত্যে এরকম বহু কিছু আছে, হোরেশিও,
যা তোমার দর্শনশাস্ত্রেরও স্বপ্নাতীত। কিন্তু এসো
আগের মতোই ফের তোমরা শপথ নাও, যাতে
ঈশ্বরের করুণা সহায় হয় তোমাদের। এর
পর থেকে আমি যত অদ্ভুত, বেখাপ্পা আচরণই
করি, সম্ভবত আমি নিতে পারি খাপছাড়া কোনো
ছদ্মবেশ — তখন আমাকে দেখে হাতের ভঙ্গিতে
কিংবা মাথা নেড়ে কিংবা সন্দেহজনক কোনো কথা
যথা 'বেশ, বেশ, আমাদের জানা আছে সেই কথা
আমাদের ইচ্ছে হলে উন্মোচন করতে পারি এর
রহস্য অথবা অনুমতি থাকলে আমরা সেই

কাহিনি শোনাতে পারতাম' ইত্যাদি দ্ব্যর্থবোধক
কথা বলে এ-কথা দিও না ফাঁস ক'রে যে তোমরা
আমার বিষয়ে কিছু জানো। তোমাদের প্রয়োজনে
ঈশ্বরের করুণা সহায় হোক। এসো বন্ধুগণ
শপথ গ্রহণ করো।

প্রেতাত্মা : শপথ গ্রহণ করো। [ ওরা শপথ নেয় ]

হ্যামলেট : শান্ত হও, শান্ত হও হে অশান্ত আত্মা। ভদ্রমহোদয়গণ,
আমার সকল ভালোবাসা দিয়ে তোমাদের কাছে
নিজেকে অর্পণ করি। হতভাগ্য হ্যামলেট খোদার
কৃপায় ভালোবাসা ও বন্ধুতা প্রকাশ করতে কোনোদিন
দ্বিধা করবে না; তার সম্প্রীতিতে কমতি হবে না।
চলো একত্রেই যাই। আমার একান্ত অনুরোধ,
দয়া করে তোমাদের ঠোঁটে রাখো নিঃশব্দ তর্জনী।
বড়ো বিশৃংখলা চতুর্দিকে, গ্রন্থিচ্যুত দিনকাল;
আমি কি জন্মেছি সব শোধরাতে হা পোড়া কপাল!
না, না; চলো একত্রেই যাই।

[ প্রস্থান ]

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ বুড়ো পলোনিয়াস ও রেনাল্ডোর প্রবেশ ]

পলোনিয়াস : তাকে এই টাকা আর পত্র দিও, বুঝেছো রেনাল্ডো?

রেনাল্ডো : দেব প্রভু।

পলোনিয়াস : তার সঙ্গে দেখা করবার আগেভাগে যদি তার
চালচলনের খোঁজ নাও, তবে হে ভদ্র রেনাল্ডো,
তুমি বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে।

রেনাল্ডো : আমারও সেই ইচ্ছা প্রভু।

পলোনিয়াস : বিলক্ষণ। ওহে বেশ বলেছো, যাহোক। তবু বলি
প্রথমত জেনে নেবে প্যারিস শহরে দিনেমার
কারা আছে, কে কোথায় থাকে, কী রকমভাবে
জীবন যাপন করে, কী হাল ওদের? কী রকম
সঙ্গ করে, কী রকম খরচ পত্তর করে ওরা
প্রমোদের জন্যে, এই ধরনের পরোক্ষ প্রশ্নের
সাহায্যে যখন তুমি বুঝে নেবে আমার পুত্রকে
ওরা চেনে, তখন তোমার উদ্দেশ্যের কাছাকাছি
পৌঁছে যাবে তুমি, সরাসরি প্রশ্ন করে তা হাসিল
করা যাবে নাকো। এরকম ভান করো, যেন তাকে
দূর থেকে জানো তুমি, এই ধরো, স্রেফ বলা যায়,
'আমি তার জনককে জানি, তার বন্ধুদেরও
চিনি আর অংশত তাকে জানি।' বুঝেছো রেনাল্ডো?

রেনাল্ডো : বেশ ভালো করেই বুঝেছি।

পলোনিয়াস : "আর অংশত তাকে জানি, কিন্তু", বলতে পারো,
"ঠিক ভালো করে নয়, যদি এই ব্যক্তি সেই হয়,
তাহলে বলতে পারি, সে অত্যন্ত বেসামাল আর
নানা কদভ্যাস আছে তার" — তাকে যত ইচ্ছে মিথ্যা
অপবাদ দিতে পারো। কিন্তু সাবধান, যাতে তার
সম্মানের হানি হয়, এরকম কোনো দোষ-ত্রুটি
আরোপ করো না তার প্রতি। কিন্তু সেসব উদ্দাম,
উচ্ছৃঙ্খল, প্রথাসিদ্ধ স্খলনের কথা বলা যেতে
পারে যারা স্বাধীনতা আর যৌবনের সবচেয়ে
খ্যাত আর সুচিহ্নিত নিত্যসহচর।

রেনাল্ডো : যথা জুয়োখেলা, প্রভু?

: হ্যাঁ, অথবা পানাসক্তি, কিংবা
অসি খেলা, দিব্যি দেয়া, মেয়ে মানুষের
বাধাবন্ধনহীন সঙ্গ করা, কাজিয়া-ফ্যাসাদ করা
ব্যস, অতদূর যেতে পারো।

রেনাল্ডো : প্রভু, এতে তার ইজ্জতের হানি হবে।

: না, বিশ্বাস করো, তা হবে না। সে তো তুমি দোষারোপ
করবার অছিলায় বলবে : আর দেখো ব্যভিচারে
সে বেতালা খুব, এই দোষ তার ওপর অবশ্য
চাপাবে না। কথাগুলো সে অর্থে বলি নি।
বরং এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এরকম
কলাকৌশলের সঙ্গে বোলো তুমি, যাতে মনে হয়,
সেগুলি স্বাধীনতার খুঁত, টগবগে হৃদয়ের
ঝলসানি আর পোষ-না-মানা রক্তের আদিমতা,
যাতে যুবা মাত্রই আক্রান্ত।

রেনাল্ডো : কিন্তু হে আমার প্রভু, —

: এসব করবে কেন জানতে চাইছো?

রেনাল্ডো : জ্বি হুজুর, আমি তা' জানতে চাই।

পলোনিয়াস . বিলক্ষণ, এই হল আমার উদ্দেশ্য,
এবং বিশ্বাস করি আমি এটা সঙ্গত ফিকির।
আমার পুত্রের পরে সামান্য কালিমা লেপে দেয়া
কোনো কাজ করতে গিয়ে একটু নোংরা করবার
নামান্তর। এতে ফল পাওয়া যাবে। লক্ষ করো তুমি
এ-বিষয়ে যার সঙ্গে কথা বলবে, বাজিয়ে দেখে
নেবে, তিনি যদি উল্লিখিত দোষে অভিযুক্ত যুবককে
সে রকম কোনো কাজে লিপ্ত দেখে থাকেন, তাহলে
তোমার নিকটে এসে তোমার কথায় সায় দিয়ে
বলবেন, 'সুভদ্র' অথবা 'বন্ধু', 'ভদ্র মহোদয়',
যে দেশে অথবা সমাজে আছে সম্ভাষণের
যে রকম চল।

রেনাল্ডো : বেশ ভালো কথা, বুঝেছি হুজুর।

পলোনিয়াস : এবং তখুনি বুঝেছো হে, সে অমুক করেছে, সে
করেছে, কী যেন বলছিলাম, তাই না? ধর্ম সাক্ষী
আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম : কোথায় ছেড়ে গেলাম?
আপনি বলছিলেন, 'তোমার কথায় সায় দিয়ে
বলবেন সুভদ্র অথবা বন্ধু'।

পলোনিয়াস : হ্যাঁ আমি বলছিলাম, 'তোমার কথায় সায় দিয়ে'।
এভাবে দেবেন তিনি সায় : আমি সে ভদ্র লোককে
চিনি, আমি তাকে গতকাল দেখেছিলাম, অথবা
এই তো সেদিন কিংবা তার কিছুদিন পর, কারা
যেন সঙ্গো ছিল তার, সেখানে সে জুয়ো খেলছিল—
যেমন বলছো তুমি — মদে চুর হতেও দেখেছি,
ছিল মেতে টেনিস খেলায়, হয়তো বলবেন তিনি—
হ্যাঁ, আমি দেখেছি তাকে যেতে বেসাত-বাসায়, যথা
বেশ্যালয়ে কিংবা সে রকম কোনো স্থানে।
ব্যাপারটা বুঝলে এখন?
তোমার মিথ্যার টোপ গিলবে সত্যের পোনামাছ :
আর এভাবেই যারা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, তারা
পরোক্ষ উপায়ে, আঁকাবাঁকা পথে, বেদিশা জায়গায়
দিশা খুঁজে পায়। অতএব আমার আগের কথা
আর উপদেশ মতো কাজ করলে আমার পুত্রের
বিষয়ে সকল তথ্য পাবে। বুঝলে তো? কী বোঝো নি?

রেনাল্ডো : বুঝেছি হুজুর।

পলোনিয়াস : তাহলে বিদায় বলি।

রেনাল্ডো : বড় ভালো হুজুর আমার।

পলোনিয়াস : নিজের মনেই রেখো তার মতিগতি।

রেনাল্ডো : রাখব হুজুর।

পলোনিয়াস : আর তার হালে তাকে থাকতে দিও।

রেনাল্ডো : যথা আজ্ঞা, প্রভু।

পলোনিয়াস : তাহলে বিদায় বলি।
[ রেনাল্ডোর প্রস্থান, ওফেলিয়ার প্রবেশ ]
ওফেলিয়া! বলো কী ব্যাপার?

ওফেলিয়া : পিতা, পিতা, বড় ভয় পেয়ে গেছি আমি।

পলোনিয়াস : ঈশ্বরের নামে বলো কীসের সে ভয়?

: আমার নিভৃত কক্ষে সেলাইয়ের কাজে মগ্ন আমি,
সে সময় যুবরাজ হ্যামলেট আমার সমুখে
এসে দাঁড়ালেন; তার আঁটো জামাটার গেরেবান
খোলা আর মাথায় ছিল না টুপি, মোজাগুলো নোংরা,
পায়ের গোড়ালি তক বেড়ির মতন প'ড়ে থাকা;
তিনি তার পিরানের মতো পাণ্ডু, তার হাঁটু দুটো
পরস্পর ঠোকাঠুকি করছিল আর চোখে ছিল
এমন করুণ দৃষ্টি যেন তাকে হাবিয়া দোজখ
থেকে সদ্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেখানকার সব
ভীষণ আতঙ্ককর দৃশ্য বর্ণনা করার জন্যে।

পলোনিয়াস : উন্মত্ত তোমার প্রেমে?

ওফেলিয়া : জানি না তা পিতা, তবে আমি
সত্যি বড়ো ভীত তার হাল দেখে।

পলোনিয়াস : কী বললেন তিনি?

ওফেলিয়া : আমার কব্জিটা ধরে শক্ত করে চেপে ধরলেন
আমাকে, তারপর সরে গিয়ে পুরোপুরি তার নিজ
বাহুর দূরত্বে আর অন্য হাত ভুরুর ওপরে রেখে
এভাবে আমার মুখ দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
যেন তিনি আঁকবেন আমার মুখের ছবি। তিনি
বহুক্ষণ এভাবে ছিলেন। অবশেষে আমার এ
বাহুটা খানিক নেড়ে তিনবার তিনি তার মাথা
ওপরে ও নীচে নাড়লেন আর এমন করুণ
এবং গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, মনে হল
সমস্ত শরীর তার ভেঙে চুরে যাবে, যেন তার
অস্তিত্ব বিলীন হবে। এরকম করবার পর
আমাকে দিলেন ছেড়ে : তারপর মাথাটা ঘুরিয়ে
এগোলেন, যেন চোখ ছাড়া তিনি পথ পেয়েছেন—
দু'চোখের সাহায্য ছাড়াই ঘর থেকে বেরুলেন।
সারাক্ষণ তার দৃষ্টি ছিল ন্যস্ত আমার দিকেই।

পলোনিয়াস : এসো তো আমার সঙ্গে, রাজার নিকট আমি যাব।
এতো প্রণয়ের উন্মাদনা; যার প্রচণ্ড প্রকৃতি
নিজেকেই করে নাশ, ইচ্ছাকে তাড়িত করে যত
বেপরোয়া কাজে, এটা অন্য যে কোনো প্রচণ্ড
আবেগের মতোই, যা খুব যন্ত্রণা-কাতর করে
আমাদের অন্তরকে হামেশাই। আমি দুঃখিত।
তুমি কি সম্প্রতি কোনো কড়া কথা শুনিয়েছো তাকে?

ওফেলিয়া : শোনাই নি, পিতা; কিন্তু আপনার হুকুম মাফিক
ফিরিয়ে দিয়েছি তাঁর পত্রবালি, নিষেধ করেছি
আসতে আমার কাছে।

পলোনিয়াস : তিনি এর ফলেই উন্মাদ
হয়েছেন, আমি দুঃখিত যে তাকে আরো ভালো করে
দেখে-শুনে বিচার করিনি। ভয় ছিল, তিনি কিছু
লটঘট ক'রে তোকে নষ্ট করবার ফিকিরে আছেন।
হা নিপাত যাক এই সন্দেহ আমার। মনে হয়
আমরা যত বুড়ো তার স্বাভাবিকভাবেই বিচার
বিবেচনা করতে গিয়ে হামেশাই নিজেদের সীমা

অতিক্রম করে ফেলি, যেমন যুবকদের থাকে
প্রচুর ঘাটতি বিচক্ষণতায়। রাজার নিকট
চলো যাই। অবশ্যই এ-কথা জানাতে হবে তাঁকে।
এ-কথা প্রকাশ করলে যতটা দুর্ভোগ হবে, তার
চেয়ে ঢের বেশি হবে লুকিয়ে রাখলে। চলো যাই।

[ প্রস্থান]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ তূর্যধ্বনি, রাজা, রানি, রোজেনক্রান্‌জ, গিল্ডেনস্টার্ন এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ ]

রাজা : স্বাগত হে প্রিয় রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্ন।
বহুদিন থেকে তোমাদের দেখবার ইচ্ছা ছিল,
তাছাড়া একটা কাজে লাগাবার জন্যে তোমাদের
এত তাড়াহুড়ো করে ডেকে আনিয়েছি। হ্যামলেটের
রূপান্তর বিষয়ে কিছু কি কানে এসেছে? আমি তো
এ ব্যাপারটাকে তা-ই বলি। কেননা এখনকার
হ্যামলেটের সঙ্গো সত্যি বাইরে ভেতরে কোনো দিক
থেকেই আগের সেই আসল মানুষটার কোনো
মিল নেই। ওর জনকের মৃত্যু ছাড়া আর কী-যে
এমন বিক্ষিপ্ত করতে পারে তাকে, আমি তা স্বপ্নেও
ভাবতে পারি না। তোমাদের দুজনকে অনুরোধ
করছি, তোমরা কিছুদিন আমাদের দরবারে
থেকে যাও, তোমরা তো আশৈশব গলায়-গলায়
বন্ধু ওর, তার যৌবন ও মেজাজের সঙ্গো খুবই
পরিচিত। তাই ওকে আমোদে-প্রমোদে টেনে নিয়ে
যতটা সুযোগ বুঝে পারো তার কাছ থেকে ওর
আত্মপীড়নের কারণটা জেনে নেবে। আমরা তা
জানতে পারিনি। পারলে তার প্রতিকার করা যেত।

রানি : ভদ্রমহোদয়গণ, তোমাদের কথা খুব বলে
সে, নিশ্চিত জানি, দুনিয়ায় এমন দু'জন নেই
আর যারা তোমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় তার কাছে।
যদি আমাদের প্রতি সৌজন্য ও শুভেচ্ছা দেখাতে
আমাদের সঙ্গো কিছুকাল কাটাতে সম্মত হও,
প্রয়োজনে মদত জোগাও আর আশা পূর্ণ করো
আমাদের, তবে তোমাদের এই উপস্থিতি পাবে
রাজার স্মৃতির যোগ্য ধন্যবাদ।

রোজেনক্রান্‌জ : হে মহিমান্বিত
রাজা-রানি, আপনারা উভয়ে আপনাদের ইচ্ছা
পূরণের জন্যে আমাদের ওপর আপনাদের
একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বলে অনুরোধের বদলে
পারে না হুকুম দিতে।

গিল্ডেনস্টার্ন : আমরা দু'জনেই আজ্ঞাবহ,
আপনাদের চরণে স্বেচ্ছায় অর্পণ করি সব
সেবা আমাদের। আমরা আদিষ্ট হতেই চাই।

রাজা : ধন্যবাদ রোজেনক্রান্জ ও সুভদ্র গিল্ডেনস্টার্ন।

রানি : ধন্যবাদ গিল্ডেনস্টার্ন ও সুভদ্র রোজেনক্রান্জ।
এবং মিনতি করি, যাও, অত্যন্ত বদলে-যাওয়া
আমার পুত্রের কাছে এ-মুহূর্তে যাও। তোমরা এই
ভদ্রলোকদের হ্যামলেটের নিকটে নিয়ে যাও।

গিল্ডেনস্টার্ন : খোদার ফজলে আমাদের উপস্থিতি আর এই
কাজের পদ্ধতি তার পক্ষে আনন্দদায়ক আর
সহায়ক হতে পারে।

রানি : হ্যাঁ, প্রার্থনা করি, তাই হোক।
[ রোজেনক্রান্জ, গিল্ডেনস্টার্ন এবং একজন অনুচরের
প্রস্থান। পলোনিয়াসের প্রবেশ।]

পলোনিয়াস : প্রভু, নরওয়ে থেকে রাজদূতদ্বয় খুশি মনে
ফিরে এসেছেন।

রাজা : আপনি দেখছি সর্বদাই সুসংবাদের জনক।

পলোনিয়াস : তাই কি রাজন? তবে নিশ্চন্ত থাকুন হে আমার
সার্বভৌম প্রভু, আমার এ আত্মা বিধাতার প্রতি
যেমন নিষ্ঠায় অবিচল, তেমনি সদয় রাজার
প্রতি আমার একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। আমি মনে করি,
হ্যামলেটের উন্মত্ততার প্রকৃত কারণ বের
করতে পেরেছি; নইলে বুঝব আমার মগজটা
রাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ব্যাপারে আগের মতো
অত সড়গড় নয়।

রাজা : বলুন, বলুন, কী কারণ? সেটা শোনার জন্যেই
অত্যন্ত উদগ্রীব আমি।

পলোনিয়াস : আগে রাজদূতদের আসতে আজ্ঞা দিন, শুনে নিন
তাদের সকল কথা। বিরাট ভোজের পর হবে
ফলাহার আমার সে-কথা।

রাজা : আপনি স্বয়ং অভ্যর্থনা করে আনুন তাদের।
[ পলোনিয়াসের প্রস্থান।]
শুনেছো গারট্রুড প্রিয়ে, তিনি বলেছেন তিনি নাকি
জেনেছেন তোমার পুত্রের অসুখের মূল উৎস।

রানি : আমার তো মনে হয়, তার জনকের মৃত্যু আর
আমাদের অতি ত্বরান্বিত বিয়েটাই হল গিয়ে
প্রধান কারণ, অন্য কিছু নয়।

রাজা : উত্তম, পরখ করে দেখা যাবে তাকে।

[ভল্টিমণ্ড ও কর্নেলিয়াসের সঙ্গে পলোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ।]

স্বাগতম

হে প্রিয় সুহৃদ্দ্বয়, এই যে বলুন ভল্টিমণ্ড
কী সংবাদ আমাদের ভ্রাতা নরওয়ে নৃপতির?

ভল্টিমণ্ড : আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন
তিনি আর আমাদের অভ্যর্থনা করার পরেই
ফর্টিনব্রাসের সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করবার
ত্বরিত নির্দেশ পাঠালেন। এই সৈন্য সমাবেশ
পুরোটাই পোলান্ডের বাজার বিরুদ্ধে করা হচ্ছে,
এমন ধারণা ছিল তাঁর। কিন্তু এটা
খুঁটিয়ে দেখার পর তিনি ধরে ফেলেছেন
এ যুদ্ধ প্রস্তুতি আপনারই বিরুদ্ধে রাজন। তাই
তাঁর অসুস্থতা আর বার্ধক্য এবং অক্ষমতা
ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে জেনে তিনি ক্ষুব্ধ মনে
ফর্টিনব্রাসকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন।
ফর্টিনব্রাস তা মেনে নিয়ে পিতৃব্যের দ্বারা ঢের
তিরস্কৃত হয়ে নরওয়ে অধিপতির নিকটে
আখেরে প্রতিজ্ঞা করলেন, আপনার বিরুদ্ধে তিনি
আর কোনোদিন অস্ত্র ধরবেন না, এতে বৃদ্ধ রাজা
আনন্দে বিহ্বল হয়ে ফর্টিনব্রাসকে বাৎসরিক
ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা আর পোলদের বিরুদ্ধে
আগের মতোই সৈন্য সংগ্রহের কর্তৃত্ব দিলেন।
আর এই প্রমাণপত্রের মারফত অনুরোধ

[এক খণ্ড কাগজ দিলেন]

করেছেন যাতে এই অভিযান চালাবার জন্যে
আপনার রাজ্যের ভেতর দিয়ে সে সৈন্যবাহিনী
শান্তিপূর্ণভাবে চলে যেতে পারে। এ-ব্যাপারে তিনি
আপনার সানুগ্রহ অনুমতি চান। আমাদের
নিরাপত্তা বিধানের শর্তাবলি ও প্রমাণপত্রে
উল্লিখিত আছে।

রাজা : আমি অতিশয় আনন্দিত এতে।
অবসর মতো মনোযোগ সহকারে এটা পড়ে
ভেবেচিন্তে সদুত্তর দেব। ইতিমধ্যে আপনারা
যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, সেজন্যে জানাই
ধন্যবাদ : এখন বিশ্রাম করুনগে, যান। নৈশভোজে
দেখা হবে। স্বাগত জানাই।

পলোনিয়াস : সুসম্পন্ন হল কাজ।
হে আমার প্রভু, ভদ্রে, রাজপদ কী রকম হবে,
কাকে বলে কর্তব্য এবং দিন কেন দিন কিংবা
রাত কেন রাত আর সময় সময় কেন হল,
এ বিষয়ে তর্কাতর্কি করা মানে শুধু দিনরাত
এবং সময় নষ্ট করা। সুতরাং সংক্ষিপ্ততাই
যেহেতু প্রজ্ঞার আত্মা, আর ক্লান্তিকর বাইরের
এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অলঙ্কার। অতএব
সংক্ষেপে সারব কথা। আপনার সুমহান পুত্র
উন্মাদ, উন্মাদই বলিআমি তাকে, কেননা প্রকৃত
উন্মত্ততা সংজায়িত করা মানেই উন্মাদ হওয়া,
তা ছাড়া কী-ই বা হতে পারে আর? তবে, মহারানি
সে প্রসঙ্গ থাক।

রানি : কুশলী ভণিতা ছেড়ে সারকথা বলুন সত্বর।

পলোনিয়াস : হে ভদ্রে, শপথ করে বলছি, মোটেই কোনো কলা -
কৌশলের আশ্রয় নিইনি আমি! তিনি যে উন্মাদ,
এটা সত্য; এটা সত্য, আফশোশ; আর আফশোশ
যে এ কথা সত্য। নির্বোধ এ বাক্যালঙ্কার; কিন্তু
এখন সেকথা থাক, আমি কোনো অলঙ্কার
এস্তেমাল করব না। ধরে নিচ্ছি তিনি বাস্তবিকই
উন্মাদ; এখন বাকি থাকে এমন ফলের কী যে
কারণ তা খুঁজে নেয়া। বরং এ-কথা বলা যায়,
এ দোষের কী কারণ, কেননা এই দুষ্ট ফল হয়
কারণ থেকেই। আজ্ঞে এ হল ব্যাপার, আর কী বাকি
থাকে, ভালো করে ভেবে দেখুন এখন :
আমার একটি কন্যা আছে, যতদিন সে আমার
এক্তিয়ারে আছে ততদিন সে আমারই — সে আমার
প্রতি তার কর্তব্য এবং আনুগত্যবশত, লক্ষ করুন,
আমাকে দিয়েছে এই পত্রখানি। পড়ছি, শুনুন, —
শুনে আপনারা শেষে সিদ্ধান্তে আসুন।

[ পাঠ ]

আমার আত্মার প্রতিমা, দিব্যলোকচারিনী
সবচেয়ে বেশি রূপে-মোড়া ওফেলিয়ার উদ্দেশে —
ওটা একটা গর্হিত শব্দ, বেহুদা জবান রূপে-মোড়া
এ যে বড়ো বেহুদা জবান। তবু শুনুন আপনি —
এইসব; তার সুন্দর শুভ্র বুকে, এসব ইত্যাদি।

রানি : হ্যামলেট এ পত্র দিয়েছে তাকে?

পলোনিয়াস : অপেক্ষা করুন, মহারানি, আমি হুবহু পড়ছি।
তারাগুলো সব অগ্নিকণা
হোক তাতে সংশয়;
সূর্যটা ঘোরে, কোরো সন্দেহ
সত্যকে ভেব মিথ্যাবাদী
কিন্তু আমার এ প্রেম, জেনো
কখনো মিথ্যা নয়।
হে প্রিয়তমা ওফেলিয়া, এই পদ্য রচনার ব্যাপারে আমার দক্ষতা নেই। আমার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করার শিল্পকলা আমার অজানা। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সবচেয়ে বেশি। বিদায়। যতদিন আমার এই দেহযন্ত্র অটুট থাকবে, ততদিন আমি তোমারই একান্ত হ্যামলেট।
আমার নিকট আনুগত্যবশত এ-চিঠিখানি
দেখিয়েছে আমাকে আমার কন্যা আর উপরন্তু
যখন যে অবস্থায় যেভাবে যেকালে যুবরাজ
প্রেম নিবেদন করেছেন, সবকিছুই সে আগাগোড়া
দিয়েছে আমার কানে।

রাজা : কিন্তু সেই প্রেম আপনার কন্যা কীভাবে নিয়েছে?

পলোনিয়াস : আমার সম্পর্কে কী ধারণা আপনার?

রাজা : আপনি বিশ্বস্ত আর সম্মানীয় ব্যক্তি।

পলোনিয়াস : সানন্দে প্রমাণ করব তা'। উত্তপ্ত এ প্রেম-পাখা
মেলবার কালে, আপনারা একথা নিশ্চিত জেনে
রাখুন; আমার কন্যা বলার আগেই আমি সেটা
বুঝতে পেরেছি। যদি সে মুহূর্তে আমি অবিকল
লেখার টেবিল আর ফলকের মতো নিঃসাড়
হয়ে থাকতাম, তবে আপনারা কী ভাবতেন? কিংবা
যদি আমি হৃদয়কে চোখ ঠেরে বোবা আর কালা
সেজে থাকতাম, কিংবা এই প্রেমলীলাটিকে খুব
অলস দৃষ্টিতে দেখে বেখেয়াল হয়ে থাকতাম,
তাহলে আপনি আর আমাদের প্রিয় মহারানি
আমাকে কী ভাবতেন, বলুন তো? তা না করে আমি
তক্ষুনি আমার কাজে লেগে গেছি সরাসরি আর
আমার তরুণী কন্যাটিকে বলেছি, 'খেয়াল রেখো,
হ্যামলেট যুবরাজ; তোমার ভগ্যের নক্ষত্রের আওতায়

পড়েন না তিনি। তাই এ ব্যাপার চলতে পারে না।'
তারপর তাকে কিছু নসিহত করলাম, যাতে সে নিজেকে
কুমারের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখে, যাতে কোনো দূত
তার কাছে ঘেঁষতে না পারে, যাতে কবুল না করে
প্রণয়ের নজরানা। আমার উপদেশের ফল
গ্রহণ করল সে আর ফলত কুমার প্রতিহত
হয়ে খুব, সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিষণ্ন হলেন,
তারপর উপবাস, তারপর হলেন নির্ঘুম,
তারপর দুর্বল এবং লঘুমতি আর এই
অবনতির দরুন ক্ষিপ্ত উন্মাদ হলেন তিনি,
যে জন্যে এখন আমরা সকলেই শোকাতুর।

রাজা : তুমিও কি তাই মনে করো?

রানি : হতে পারে, খুব সম্ভব, তাই হবে।

প : আমার জানতে ইচ্ছে করে,একবারও কি এ রকম
হয়েছে, যে আমি জোর দিয়ে বলেছি, 'এটাই হবে' আর
তার অন্যথা হয়েছে?

রাজা : আমার তা জানা নেই।

পলোনিয়াস : অন্য কিসিম যদি হয়, তবে গর্দান হাজির।
[ মাথা ও কাঁধের দিকে নির্দেশ করে ]
এক-আধটু প্রমাণ পেলেই আমি সত্য
ঘটনাকে খুঁজে বের করব, যদি তা পৃথিবীর
মধ্যস্থলে গুপ্ত থাকে, তবুও পারব।

রাজা : এর বেশি কী করে পরখ করে দেখব আমরা?

পলোনিয়াস : জানেন তো, এখানে এ বারান্দায় কুমার কয়েক
ঘন্টা পায়চারি করে কাটান নিভৃতে।

রানি : করে বই কি।

স : সে সময় আমার কন্যাকে তার কাছে দেব
পাঠিয়ে এবং আমরা পর্দার আড়াল থেকে সেই
মোলাকাত লক্ষ করব। আমার কন্যার প্রতি যদি
তার প্রণয়ের প্রমাণ না পান, আর সে কারণে
যদি তিনি উন্মাদ না হয়ে থাকেন, তাহলে আমি
এ রাষ্ট্রের সচিব হবার যোগ্য নই, তার চেয়ে
করব খেতখোলা, হব গাড়োয়ান।

রাজা : পরখ করেই দেখা যাক।
[ বই পড়তে পড়তে হ্যামলেটের প্রবেশ।]

রানি : ওই দ্যাখ বেচারি কী বিষণ্ণ মুখে বই পড়তে পড়তে এদিকে আসছে।

পলোনিয়াস : আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা দু'জনেই লুকিয়ে পড়ুন। আমি তাকে সামলাই গিয়ে।

[ রাজা, রানি এবং অনুচরবর্গের প্রস্থান ]

যুবরাজ হ্যামলেট, কেমন আছেন?

হ্যামলেট : বিলক্ষণ, খোদার রহম।

পলোনিয়াস : আপনি কি আমাকে চেনেন যুবরাজ?

হ্যামলেট : খুব ভালো করে চিনি। তুমি তো নিকেরি।

পলোনিয়াস : আমি তা নই যুবরাজ।

হ্যামলেট : যদি তুমি নিকেরির মতো সৎ মানুষ হতে!

পলোনিয়াস : সৎ মানুষ বললেন কুমার?

হ্যামলেট : জ্বি জনাব, এই দুনিয়ায় এক হাজার লোকের মধ্যে একজন সৎ মানুষ মেলে।

পলোনিয়াস : এ অতি সাচ্চা কথা কুমার।

: যদি মরা কুকুরের শরীরে সূর্য কীটের জন্ম দেয় — সূর্যের চুমু খাওয়ার জন্যে বেড়ে মাংস বটে - তোমার কোনো কন্যা আছে?

পলোনিয়াস : আছে যুবরাজ।

হ্যামলেট : তাকে রোদে হাঁটতে দিও না। গর্ভ ধারণ করা আশীর্বাদ। কিন্তু লক্ষ রেখো ইয়ার যাতে তোমার কন্যা গর্ভ ধারণ না করে।

পলোনিয়াস : (স্বগত) এতে কী বুঝলে তুমি? এখনো আমার কন্যাই তার জপমালা। অথচ প্রথমে আমি চিনতে পারি নি। আর বলে কিনা আমি নিকেরি। মাথাটা একেবারেই বিগড়ে গিয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কী, যৌবনে ভালোবাসার জন্যে আমাকেও কম ধকল পোয়াতে হয়নি, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছিল, প্রায় এরকমই। আবার তার সঙ্গে কথা বলব। — কী পড়ছেন, যুবরাজ?

হ্যামলেট : বাকোয়াস, বাকোয়াস, বাকোয়াস।

পলোনিয়াস : বিষয়টি কী যুবরাজ?

হ্যামলেট : কাদের ভেতর?

পলোনিয়াস : মানে আপনি যা পড়ছেন সে বিষয়টি কী যুবরাজ?

হ্যামলেট : স্রেফ কুৎসা, জনাব। এই ব্যঙ্গপরায়ণ নচ্ছারটা বলছে যে, বুড়োদের আছে শুধু পাকা দাড়ি, কোঁচকানো ওদের মুখ, ওদের চোখ দিয়ে চুইয়ে পড়ে রজন আর তালের রস আর ওরা একেকটা বুদ্ধির ঢেঁকি; হাঁটু বেজায় নড়বড়ে — যদিও এই সবকিছুই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তবু বলব, ওসব কথা এভাবে লেখা মুনাসিব হয়নি। আপনার কথাই ধরুন না জনাব, কাঁকড়ার মতো পেছন দিকে চলতে পারলে আপনি আমার সমানবয়সি বুড়োই হবেন।

পলোনিয়াস : (স্বগত) এটা পাগলামি হলে কী হবে, এতে আছে একটা শৃঙ্খলা।
আপনি কি খোলা হাওয়া থেকে চলে আসবেন কুমার।

হ্যামলেট : কোথায়? আমার কবরে?

পলোনিয়াস : হ্যাঁ, তাইতো, সেখানে হাওয়া নেই বটে। (স্বগত) মাঝে-মাঝে
কী অর্থপূর্ণ মনে হয় তার জবাব। — পাগলামিতে এমন কিছু আছে যা প্রায়শই সুন্দর কথা বলাতে পারে। এরকম কথা বলার পক্ষে যুক্তি এবং সুস্থ-বুদ্ধি অতটা দড় নয়। ওর কাছ থেকে বিদায় নেব আর এখুনি ওর সঙ্গে আমার কন্যার মোলাকাতের একটা তরকিব বের করতে হবে। — এখন তাহলে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিই, কুমার।

হ্যামলেট : আমি যা স্বেচ্ছায় দেব সবই তো নিতে পারবেন আপনি, কেবল আমার জীবন ছাড়া, আমার জীবন ছাড়া, আমার জীবন ছাড়া।

পলোনিয়াস : বিদায়, কুমার।

হ্যামলেট : যতসব ক্লান্তিকর বুড়োর দল।

[ রোজেনক্রান্‌জ এবং গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ। ]

পলোনিয়াস : কী, যুবরাজ হ্যামলেটকে খুঁজছেন না কি? যান তাঁকে ওখানে পাবেন।

রোজেনক্রান্‌জ : খোদা আপনার মঙ্গল করুন, জনাব।

[ পলোনিয়াসের প্রস্থান।]

গিল্ডেনস্টার্ন : আমার সদাশয় কুমার।

রোজেনক্রান্‌জ : আমার প্রিয়তম যুবরাজ।

| | | |
|---|---|---|
| হ্যামলেট | : | আমার চমৎকার বন্ধুরা। কেমন আছো গিল্ডেনস্টার্ন? আহ্ রোজেনক্রান্‌জ। সুবোধ খোকার সব, কেমন আছো তোমরা? |
| রোজেনক্রান্‌জ | : | ধরিত্রীর সাধারণ সন্তানের মতো। |
| গিল্ডেনস্টার্ন | : | অতিমাত্রায় খুশি নই বলেই আমরা খুশি। ভাগ্যদেবীর টুপির বোতাম তো নই আমরা। |
| হ্যামলেট | : | তার জুতোর শুকতলিও নও? |
| রোজেনক্রান্‌জ | : | না, তা-ও নই কুমার। |
| হ্যামলেট | : | তাহলে তার কোমরের কাছাকাছি কোথাও<br>আছো, হতে পারে তার মেহেরবানির মধ্যখানে<br>আছো। |
| গিল্ডেনস্টার্ন | : | কসম খোদার, আমরা তার<br>খাস তালুকের রায়ত মাত্র। |
| হ্যামলেট | : | বলা যায়, ভাগ্যদেবীর গোপনাঙ্গে আছো। খুবই খাঁটি কথা; তিনি তো বারাঙ্গনা। তারপর, কী খবর? |
| রোজেনক্রান্‌জ | : | খবর কিছুই নেই, কুমার। তবে দুনিয়াটা বেশ সাধু হয়েছে ফিলহাল। |
| হ্যামলেট | : | তাহলে তো রোজকেয়ামত নজদিক এসে গেছে। কিন্তু তোমার খবর সত্য নয়। তাহলে আদত প্রশ্নটাই করা যাক।<br>আমার<br>প্রিয় বন্ধুগণ, বলতো তোমরা কী এমন অপরাধ করলে যে ভাগ্যদেবী তোমাদের এখানে এই কারাগারে পাঠালেন? |
| গিল্ডেনস্টার্ন | : | কারাগারে বললেন, কুমার? |
| হ্যামলেট | : | ডেনমার্ক তো কারাগারই। |
| রোজেনক্রান্‌জ | : | তাহলে তামাম দুনিয়াই তাই। |
| হ্যামলেট | : | বেশ খাসা বড়ো এক কয়েদখানা — যেখানে আছে ঢের খুপরি, কারাকুঠুরি আর তয়খানা। ডেনমার্ক সবচেয়ে জঘন্য কারাগার। |
| রোজেনক্রান্‌জ | : | আমরা তা মনে করি না কুমার। |
| হ্যামলেট | : | তোমরা তা না-ও মনে করতে পারো; কারণ, ভালো-মন্দ বলে এমনিতে কিছুই নেই। সে তো শুধু ভাবনার ফল। আমার কাছে ডেনমার্ক কারাগার বই তো নয়। |

রোজেনক্রান্‌জ : তাহলে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই একে কারাগার বানিয়ে তুলেছে! আপনার মনের পক্ষে এটা খুবই সংকীর্ণ।

হ্যামলেট : ও খোদা, একটা বাদামের খোসায় বন্ধ
থেকেও আমি নিজেকে অনন্ত মহাকাশের
অধিরাজ ভাবতে পারতাম, যদি না আমাকে
দুঃস্বপ্ন দেখতে হত।

গিল্ডেনস্টার্ন : আদতে এই স্বপ্নগুলোই হচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা; কেননা উচ্চাকাঙ্ক্ষীর সারবত্তা স্রেফ স্বপ্নের ছায়া।

হ্যামলেট : স্বপ্ন নিজে ছায়া বই তো নয়।

রোজেনক্রান্‌জ : ঠিকই বলেছেন, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে
আমি অত্যন্ত বায়বীয় এবং হাল্কা মনে করি।
এটা আমার কাছে ছায়ারও ছায়া মনে হয়।

হ্যামলেট : তাহলে আমাদের ভিখিরীর শরীর, আমাদের সম্রাট আর ফেঁপে-ফুলে-ওঠা বীরগণ হলেন ভিখিরীর ছায়া মাত্র। আমরা কি এখন রাজ-দরবারে যাব? দোহাই খোদার, আমি আর তকরার করতে পারছি না।

রোজেনক্রান্‌জ
হিল্ডেনস্টার্ন | আমরা আপনার খেদমতে থাকতে চাই।

হ্যামলেট : না, তা হয় না। আমি তোমাদের আমার খেদমতগারদের দলে ভেড়াতে পারি না। কারণ, সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভয়াবহভাবে পরিবৃত হয়ে আছি। কিন্তু, একজন বন্ধু হিসেবে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা এলসিনোরে এসেছো কেন?

রোজেনক্রান্‌জ : আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে, কুমার। আর কোনো কারণ নেই।

হ্যামলেট : আমি তো ভিখিরি মাত্র। সামান্য ধন্যবাদ জানানোর মতো সামর্থ্যটুকু নেই আমার, তবু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে নিশ্চিত জেনো হে প্রিয় বন্ধুরা, আমার এ ধন্যবাদের কানাকড়ি মূল্য নেই। তোমাদের ডেকে আনানো হয়নি? তোমরা কি স্বেচ্ছায় এসেছো? নিজের মর্জিতে এসেছো, বলতে চাও? আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না, বলো, সত্যি কথা বলো।

গিল্ডেনস্টান : কী বলব, কুমার?

হ্যামলেট : যা হোক একটা কিছু বলো। কিন্তু সে কথায় দিশেহারা হলে চলবে না। তোমাদের ডেকে আনানো হয়েছে
তোমাদের চেহারায় এক ধরনের স্বীকারোক্তি

ফুটে উঠেছে। এটা লুকানোর চাতুর্য তোমাদের সারল্যের জানা নেই। আমি জানি সদাশয় রাজা আর রানি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

রোজেনক্রান্‌জ : কিন্তু কীসের জন্যে যুবরাজ?

হ্যামলেট : সে কথাই তো তোমরা জানাবে আমাকে। দোহাই আমাদের বন্ধুত্বের অধিকারের, দোহাই যৌবনের বিশ্বস্ততার, দোহাই আমাদের হামেশা-সংরক্ষিত ভালোবাসার বন্ধনের, দোহাই সেই আবেদনের যা যোগ্যতর বক্তার বদৌলতে অধিকতর আবেদন সৃষ্টি করতে পারত — আমার একান্ত মিনতি, কোনো ঘোরপ্যাঁচ না করে আমার সঙ্গে অকপট কথা বলো। কী, তোমাদের ডেকে আনানো হয়নি?

রোজেনক্রান্‌জ : (নেপথ্যে গিল্ডোনস্টার্নকে) তুমি কী বলো?

হ্যামলেট : তোমাদের ওপর নজর রাখছি আমি। যদি আমাকে তোমরা ভালোবাসো, তাহলে কোনো কথা লুকিও না।

গিল্ডেনস্টার্ন : হ্যাঁ, কুমার। আমাদের ডেকে আনানো হয়েছে।

হ্যামলেট : আমি বলছি কেন তোমাদের আনা হয়েছে। আমার এই অনুমানের ফলে তোমাদের আর রহস্য আবিষ্কার করতে হবে না, রাজা ও-রানিকে দেয়া তোমাদের গোপন প্রতিশ্রুতির একটি পালকও খসবে না। ইদানিং কেন জানিনা, আমি মনের সব আনন্দ খুইয়ে ফেলেছি, খেলাধুলা সব ছেড়ে দিয়েছি। আমার মনে বিষণ্নতা এমন জেঁকে বসেছে যে এই চমৎকার কাঠামো — এই পৃথিবী আমার কাছে বন্ধ্যা পাহাড়ি জমিন মনে হয়। দ্যাখো, দ্যাখো এই চমৎকার চাঁদোয়া, হাওয়া, এই অপূর্ব ঝুলন্ত আকাশ, এই সোনালি আগুন ভরা রাজকীয় ছাদ, একে মারাত্মক বিষাক্ত বাষ্পপুঞ্জ ছাড়া কিছুই মনে হয় না আমার। কী অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি এই মানুষ। বুদ্ধিবিবেচনায় কী ধীর, মানসিক ঐশ্বর্যে অশেষ, আকৃতিতে সুগঠিত, চলায় ফেরায় বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়, কাজে ফেরেশতার মতো, বোধশক্তিতে দেবতার মতো; সারা জাহানের সৌন্দর্য সে, জীবজগতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অথচ আমার কাছে স্রেফ এই ধূলির সারাৎসারের মূল্য কী? পুরুষ আমাকে আনন্দ দেয় না — না, না, নারীও দেয় না; যদিও তোমার ঐ হাসি দেখে মনে হচ্ছে তুমি অন্য কিছু মনে করছো।

রোজেনক্রান্‌জ : না কুমার, আমার চিন্তায় এমন কোনো ধারণা নেই।

হ্যামলেট : তাহলে যখন আমি বললাম, 'পুরুষ আমাকে আনন্দ দেয় না', তখন হাসলে কেন?

রোজেনক্রান্‌জ : যদি মানুষ আপনাকে আনন্দ জোগাতে না পারে, তাহলে এই অভিনেতারা খুব কম অভ্যর্থনা পাবে আপনার কাছে। এ-কথা ভেবেই হাসি পেল। ওদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল আমাদের। আপনার মনোরঞ্জনের জন্যে ওরা এদিকেই আসছে।

হ্যামলেট : যে-অভিনেতা রাজার ভূমিকায় অভিনয় করবে তাকে স্বাগত জানাব; বাদশাহ-নামদার পাবেন আমার বন্দেগি; অভিযানপ্রিয় বীর যোদ্ধাকে তার ঢাল আর ভোঁতা তলোয়ার চালাতে দেয়া হবে; প্রেমিক প্রবর পুরস্কার বিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না; কৌতুক-অভিনেতা নির্বিঘ্নে তার অভিনয় শেষ করতে পারবে; যাদের ফুসফুস একটুখানি সুড়সুড়িতেই কেলিয়ে ওঠে ওদের হাসিয়ে মারবে ভাঁড়; প্রেমিকা তার মনের কথা খুলেই বলবে, নইলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ খাবে হোঁচট। ওরা কী ধরনের অভিনেতা?

রোজেনক্রান্‌জ : যাদের নাটক দেখে আনন্দ পেতে অভ্যস্ত আপনি, এই শহরের বিয়োগান্ত পালায় অভিনয় করবে যারা তারাই।

হ্যামলেট : তারা এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? এটা কী করে হল? এখানেই তো তারা খ্যাতি ও সচ্ছলতা, দুটোতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

রোজেনক্রান্‌জ : আমার মনে হয়, হালের অভিনয়-শিল্পের জন্যে দর্শকদের খ্যাপামির দরুন তাদের কদর কমে গেছে।

হ্যামলেট : আমি যখন রাজধানীতে ছিলাম, তখন তাদের যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এখনো কি সে রকম আছে? এখনো তারা অমন জনপ্রিয়?

রোজেনক্রান্‌জ : না, তারা অত জনপ্রিয় নয় আর।

হ্যামলেট : কেন এমন হল? ওদের শিল্পকলায় মরচে পড়ে গেছে নাকি!

রোজেনক্রান্‌জ : না, তা নয়। ওদের প্রচেষ্টা প্রচলিত তালেই চলেছে। কিন্তু কুমার, সম্প্রতি বাচ্চা বাজ পাখির ঝাঁকে নীড় ভরে গেছে। ওরা খুব উঁচু গ্রামে চেঁচায় আর ওতেই হাততালির ধুম পড়ে যায়।

আজকাল এই এক ফ্যাশন হয়েছে। তারা এভাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়ে ও মাতিয়ে রাখে যে সশস্ত্র নাগররাও কলমবাজদের ভয়ে সে পথ মাড়াতে চায় না।

হ্যামলেট : এই ছোকরারা কারা, কারা ওদের দেখভাল করে? কীভাবে ওদের বেতন দেয়া হয়? ওদের গানের গলায় ভাঙন ধরার পরেও কি ওরা এই পেশায় থাকবে? আয়ে না কুলোলে পরে তারা সাধারণ অভিনেতাদেরই পথ ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। তখন কি ওরা বলবে না যে ওদের এই লেখকরা সাধারণ অভিনেতাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে উৎসাহ জুগিয়ে আসলে ওদেরই ক্ষতি করেছে?

রোজেনক্রানজ : সত্যি বলতে কী, দু'পক্ষেরই দোষ আছে; আর জাতি ওদের বাকবিতণ্ডাকে উস্কে দেয়াটাকে এমন কিছু অপরাধ মনে করে না। এমন এক সময় গেছে যখন রঙ্গমঞ্চের মালিকরা যে নাটকে নাট্যকার আর অভিনেতাদের মধ্যে কোনো বচসা না থাকত, সেই নাটকের জন্যে এক পয়সাও খরচ করতে চাইতেন না।

হ্যামলেট : তা-ও কি সম্ভব?

গিল্ডেনস্টার্ন : কী-বলবো, এক সময় বুদ্ধির বহস হয়েছে।

হ্যামলেট : এতে কি ছোকরাদের জিত হয়েছে?

রোজেনক্রানজ : হ্যাঁ কুমার, হয়েছে বই কি। খোদ হারকিউলিস আর তার বোঝা ঐ দুটিও ওরা বয়ে বেড়াচ্ছে।

হ্যামলেট : এ আর আশ্চর্য কী; কেননা, আমার পিতৃব্য হলেন গিয়ে ডেনমার্ক রাজ, আর আমার পিতার জীবদ্দশায় যারা পিতৃব্যকে মুখ ভেংচাত তারাই আজ তার ছোট্ট একটা ছবির জন্যে কুড়ি, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশো মোহর দিয়ে দিচ্ছে। কসম খোদার, এতে স্বাভাবিকতার বাড়তি কিছু আছে। দর্শনই তা আবিষ্কার করতে পারে।

[ সঙ্কেত ভেরীর আওয়াজ ]

ডিল্ডেনস্টার্ন : এই যে অভিনেতারা এদিকেই আসছে।

হ্যামলেট : ভদ্রমহোদয়গণ, এলসিনোরে আপনাদের স্বাগত জানাই। আসুন, আসুন, হাত বাড়িয়ে দিন। স্বাগতমের আনুষঙ্গিক হল কেতা আর অনুষ্ঠান। আপনাদের করমর্দন করে এই আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে চাই। মনে হতে পারে, তোমাদের চেয়ে অভিনেতাদের প্রতি আমার অভ্যর্থনার মাত্রাতে বাড়াবাড়ি হয়েছে। যাকগে,

তোমাদেরও স্বাগত জানাই। কিন্তু আমার পিতৃব্য-পিতা, মাসি-মাতা আমার ব্যাপারে প্রতারিত হবেন।

গিল্ডেনস্টান : কী করে যুবরাজ?

হ্যামলেট : হাওয়া উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে বইলেই আমি পাগল হই, দখিন হাওয়ায় বাজপাখি আর সারসের তফাতটা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারি।

[ পলোনিয়াসের প্রবেশ]

পলোনিয়াস : ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মঙ্গল হোক।

হ্যামলেট : শোনো গিল্ডেনস্টার্ন, তুমিও শোনো — তোমরা দু'জন আমার দু'কানের দিকে ঘেঁষে দাঁড়াও। ঐ যে ধেড়ে খোকাটিকে দেখছো উনি তাঁর গা থেকে এখনো পয়দায়েশের পোশাক ছাড়েন নি।

রোজেনক্রান্জ : সম্ভবত এটা তার দ্বিতীয় শৈশব। লোকে বলে, বুড়ো মানুষ দু'বার শিশু হয়।

হ্যামলেট : আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তিনি আমাকে অভিনেতাদের খবর দিতে এসেছেন। লক্ষ করো। তোমরা ঠিকই বলেছো, সোমবার সকালে ব্যাপারটা ঘটেছে।

পরোনিয়াস : প্রভু, আপনার জন্যে খবর আছে।

হ্যামলেট : প্রভু, আপনার জন্যে খবর আছে। রোসিয়াস যখন রোম নগরে অভিনেতা ছিলেন—

পলোনিয়াস : যুবরাজ, অভিনেতারা এসে গেছে।

হ্যামলেট : আরে তোবা, তোবা।

পলোনিয়াস : আমার ইজ্জতের দোহাই, —

হ্যামলেট : তাহলে প্রত্যেক অভিনেতা তার গাধায় সওয়ার হয়ে এসেছে।

পলোনিয়াস : এরা পৃথিবীর সেরা অভিনেতা। কী বিয়োগান্ত, কী মিলনান্ত, কী ঐতিহাসিক; গ্রাম্য যাত্রা বলুন, গ্রাম্য যাত্রা-কৌতুকী, ঐতিহাসিক - গ্রাম্য যাত্রা, বিয়োগান্ত-ঐতিহাসিক, বিয়োগান্ত-কৌতুকী-ঐতিহাসিক- গ্রাম্য পালা, একটানা দৃশ্য বলুন কিংবা অন্তহীন কবিতা — সবকিছুতেই সমান দক্ষ এরা। সেনেকা এদের কাছে তেমন গুরুগম্ভীর নয়, প্লুটাসও নয় খুব হালকা। ধ্রুপদী কিংবা রোমান্টিক — যে কোনো ধরনের নাটকেই এরা দড়।

হ্যামলেট : হে জেফথা, ইসরায়েলের বিচারক, কী রত্নই না ছিল তোমার!

পলোনিয়াস : কী রত্ন ছিল তার, কুমার?

হ্যামলেট : জানেন না?
ঘর-আলো-করা মেয়ে ছাড়া তার ছিল না কিছুই,
যাকে সে বড্ড ভালোবাসতো।

পলোনিয়াস : (স্বগত) এখনো আমার মেয়ের কথাই জপছে।

হ্যামলেট : কী ঠিক বলি নি, বুড়ো জেফথা?

পলোনিয়াস : কুমার, আমাকে যদি জেফথা বলেন তাহলে আমার এক মেয়ে আছে যাকে আমি খুব ভালোবাসি

হ্যামলেট : না, তারপরের কথা তো এটা নয়।

পলোনিয়াস : তাহলে তারপরের কথাটা কী, যুবরাজ?

হ্যামলেট : কেন,
বিধিলিপি অনুযায়ী, বিধাতার জানা মতে ...
আর তারপর আপনি তো জানেন,
যা কিছু ঘটার কথা ছিল, ঠিক ঘটল তাই
পূণ্য গাথার প্রথম পর্বে আরো বেশি কিছু পাবেন আপনি।
দেখুন কারা আমার বক্তব্য ছেঁটে ফেলল।

[ অভিনেতাদের প্রবেশ]

স্বাগত হে ওস্তাদেরা। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সুস্থ দেখে প্রীত হলাম। স্বাগত হে সদাশয় বন্ধুরা। এই যে প্রবীণ বন্ধু আমার, আপনার গালে দাড়ি গিজগিজ করছে, দেখছি। আমাকে দাড়ি দিয়ে অভিবাদন জানানোর জন্যেই ডেনমার্কে এলেন নাকি? আমার তরুণী রঙ্গিনীর কী খবর? আরে, আপনি তো দেখছি উঁচু খুর-অলা জুতোর বদৌলতে আকাশকে ছুঁতে চলেছেন। কই, আগে এতটা লম্বা ছিলেন না তো। দোহাই মেরীর, অচল মোহরের মতো আপনার গলার স্বর যেন বেসুরো না বাজে। স্বাগত হে ওস্তাদেরা। ফরাসি বাজপাখি-পালকরা যেমন যে-কোনো পাখির দিকে বাজ লেলিয়ে দেয়, তেমনি আমরা এখুনি একটি আবৃত্তি শুনতে চাই। আসুন, আপনাদের শিল্পকলার কিছু স্বাদ পেতে দিন। একটা আলোড়নকারী আবৃত্তি হোক।

প্রথম অভিনেতা : কোন্‌টা শুনতে পছন্দ করবেন, যুবরাজ?

হ্যামলেট : একবার একটা নাটকের কিছু অংশ আপনি শুনিয়েছিলেন। সেই নাটকটি কখনো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। আর হলেও একবারের বেশি হয়নি নিশ্চয়। মনে পড়ে, নাটকটি দেখে দর্শকরা খুশি হন নি। সাধারণ দর্শকদের রুচির পক্ষে এটা বেশ উঁচু মানের ছিল। অথচ আমার মতে, আরএ বিষয়েআমার চেয়েও যাদের অভিমতের মূল্য অনেক বেশি, তারা বলেছেন, এটি একটি চমৎকার নাটক। দৃশ্যাবলি সুবিন্যস্ত, রচনা অনাড়ম্বর ও কুশলী। মনে পড়ছে, কেউ একজন বলেছিলেন, চটকদার করবার জন্যে নাটকের কোনো পংক্তিতে চাটনির মতো কিছুই ব্যবহার করা হয় নি। শব্দ ব্যবহারেও এমন কিছু ছিল না যাতে লেখককে কৃত্রিম বানোয়াট বলে অভিযুক্ত করা চলে। তিনি বলেছিলেন, এটা একটা সৎ রীতি, সুস্থ ও মধুর; জমকালোর চাইতে অনেক অনেক বেশি সুন্দর। এর একটি অংশ আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিলাম — সেটা ছিল ডিডোর প্রতি ঈনিয়াসের কাহিনি —আর তার মধ্যে বিশেষ করে সেই জায়গাটা যেখানে প্রায়াম হত্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি আপনার মনে থাকে তাহলে এই পংক্তি থেকে শুরু করুন দেখি; দেখি আমি মনে করতে পারি কিনা, দেখি মনে করতে পারি কিনা —

রূঢ় পাইরাস শার্দুলের মতো
না, হল না, পাইরাস দিয়ে এর শুরু;
"রূঢ় পাইরাস যার বাহু তার দুরভিসন্ধির
মতো কালো, দেখতে রাত্রির মতো নিজে,
যখন সে অশুভ ঘোড়ার অভ্যন্তরে শুয়ে ছিল,
মাথা নীচু করে, তখন সে শরীরের ভয়াবহ
কালো রঙ আরো বেশি কালো রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে।
এখন সে আপাদমস্তক রক্তবর্ণ; পিতাদের,
মাতাদের, কন্যাদের, পুত্রদের শোণিতে রঞ্জিত
ভয়ঙ্করভাবে, সে রক্তের ধারা শুকিয়ে জমাট
বেঁধেছে শরীরে তার পথের রৌদ্রের তাপে আর
তাতে ক্রূর নারকীয় আলো পড়ে তাদের রাজার

মৃত্যুর ওপর। ক্রোধে আর আগুনের হুঙ্কায়
তেতে পুড়ে। চাপ-বাঁধা রক্তের দরুন তাকে আরো
অতিকায় মনে হল। রক্তমণির মতন দুটি
চোখ দিয়ে নারকীয় পাইরাস বৃদ্ধ পিতামহ
প্রায়ামকে খোঁজে।
এরপর আপনি বলুন।

পলোনিয়াস : মাশাল্লাহ্ যুবরাজ, তোফা আবৃত্তি। চমৎকার উচ্চারণ,
নিয়ন্ত্রিত স্বরগ্রাম।

প্রথম অভিনেতা : "সত্বর সে খুঁজে পেল তাঁকে,
গ্রিকদের প্রতি আক্রমণে ব্যর্থ, হাতে কোনো মতে
আছে ধরা পুরাতন তরবারি, তাঁর আজ্ঞাবহ
নয় আর, যেখানে পড়ছে থেমে যাচ্ছে সেখানেই।
অসম সে যুদ্ধে প্রতিযোগী পাইরাস প্রায়ামের
দিকে ছুটে গিয়ে তরবারি চালাল এলোপাথাড়ি,
এবং সে অসি চালনার ফলে যে দমকা হাওয়া
বয়ে গেল তাতেই দুর্বল পিতা চকিতে হলেন
ধরাশায়ী। নিশ্চেতন ট্রয় সে আঘাত অনুভব
করে তার লেলিহান মিনার সমেত ধসে গেল
ভিত্তিমূলে, সেই পতনের ভয়ংকর শব্দ শুনে
পাইরাসের কানে লাগে তালা; ফলে তার তরবারি,
যা ছিল উদ্যত শ্রদ্ধাস্পদ প্রায়ামের দুধসাদা
মাথার ওপর, দ্যাখো, শূন্যে ঝোলে আর পাইরাস
কারুকাজময় পর্দায় আঁকা স্বৈরাচারী যেন,
থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, তার ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের
প্রতি নিরপেক্ষ আর পারল না করতে কিছুই;
যেমন আমরা দেখি প্রায়শ ঝড়ের আগে স্তব্ধ
হয়ে যায় আকাশ এবং মেঘপুঞ্জ স্থির আর
দুরন্ত বাতাস মূক আর নীচে পৃথিবী ভীষণ
নিশ্চুপ মৃত্যুর মতো। আর সত্বর উঠলে ঝড়
ভয়ংকর বজ্রপাতে যেমন বিদীর্ণ হয় দিক,
তেমনি পাইরাস ক্ষণ বিরতির পর পুনরায়
জেগে-ওঠা প্রতিহিংসা নিয়ে লেগে যায় নিজ কাজে;
সাইক্লপ যেমন প্রচণ্ডভাবে মার্সের বর্মে
হাতুড়ির কর্কশ আঘাত হানে তেমনি পাইরাসও
হানে তার রক্তস্নাত তরবারি প্রায়ামের প্রতি।

দুরহ গণিকা ভাগ্য! দেবকুল তোমরা সবাই
মিলে কেড়ে নাও তার শক্তি, ভাঙো তার চক্রনেমি,
ছুঁড়ে ফেলে দাও চক্রনাভি বেহেশতের ঢাল থেকে
নীচে দোজখের এলাকায়।

পলোনিয়াস : অতিশয় দীর্ঘ এ ভাষণ।

হ্যামলেট : আপনার লম্বা দাড়ির সঙ্গো এটাকেও হাজামের কাছে
পাঠানো হবে। দোহাই আপনার, থামবেন না, বলে
যান, ওঁর চাই ঠাট্টা মস্করা, খিস্তিখেউড়, নইলে ঘুমে
ঢলে পড়েন উনি। বলে যান, হেকুবার কাহিনি বলুন।

প্রথম অভিনেতা : কিন্তু যারা, হায়, ওড়নায় মোড়া রানিকে দেখেছে —

হ্যামলেট : ওড়নায় মোড়া রানি?

পলোনিয়াস : এ কথাটা ভালো।

প্রথম অভিনেতা : যিনি খালি পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক,
আর যার চোখের অঝোর অশ্রুপাতে যেমন নিভে
যেতে চাচ্ছে লেলিহান অগ্নিশিখা, এখন মাথায়
যাঁর লগ্ন শুধু একখণ্ড বস্ত্র, অথচ এই তো
সেদিনও সেখানে শোভা পেত সোনার মুকুট; যাঁর
অত্যধিক সন্তান ধারণে ক্ষয়া দেহে মূল্যবান
পোশাকের পরিবর্তে একখানি কম্বল জড়ানো,
তিনি এ নগণ্য পোশাকেই শয্যা ছেড়ে আতঙ্কিত
বেরিয়ে পড়েছিলেন; যদি কেউ তাঁকে এ মুহূর্তে
দেখে থাকে, তবে সে-ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ
দ্রোহী হয়ে বিষবাক্য করত উচ্চারণ। যখন পাইরাসকে
ভয়ানক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে স্বামীর সকল
অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে
দেখলেন, তিনি বুকফাটা আর্তনাদ করলেন, আতঙ্কিত
সে চিৎকার যদি কানে যেত স্বর্গের দেবতাদের,
তাহলে তারাও, যারা কালেভদ্রে বিচলিত হন
মর্ত্যবাসীদের দুঃখযন্ত্রণায়, আবেগ বিহ্বল
হয়ে খুব তাদের প্রোজ্জ্বল চোখ নিমেষে ভরিয়ে
ফেলতেন অশ্রুজলে।

পলোনিয়াস : দেখুন তার মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর চোখে
জল টলটল করছে। দোহাই আপনার, আর নয়।

হ্যামলেট : চমৎকার আবৃত্তি। বাকি অংশটুকু আপনার কাছ থেকে
পরে শুনে নেবো'খন। মান্যবর, নজর রাখবেন যাতে
অভিনেতাদের আরাম-আয়েশে কোনো ঘাটতি না হয়।

শুনেছেন তো? ওদের সঙ্গে যেন ভালো ব্যবহার করা হয়। কেননা, এরাইতো সময়ের সারকথা, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মৃত্যুর পরে আপনার বরাতে যদি ছেঁদো সমাধিলিপি জোটে, ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার জীবদ্দশায় যদি আপনার সম্পর্কে ওদের খারাপ ধারণা হয় তাহলে সমূহ ক্ষতি।

পলোনিয়াস : কুমার, আমি তাদের গুণের যোগ্য ব্যবহারই করব।

হ্যামলেট : যিশুর প্রিয় শরীরের দোহাই, ওতে কাজ চলবে না। প্রত্যেকে যদি তার যোগ্যতা অনুসারে ব্যবহার পায় তাহলে কার সাধ্যি চাবকানি এড়ায়? আপনার নিজের সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করুন। তাদের যোগ্যতা যত কম হবে, আপনার দাক্ষিণ্যের গুণপনা তত বেশি জাহির হবে। এদের ভেতরে নিয়ে যায়।

পলোনিয়াস : আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ।

হ্যামলেট : বন্ধুগণ ওঁর সঙ্গে যান। কাল আমরা নাটক দেখব। [ প্রথম অভিনেতার প্রতি ] শুনছেন পুরানো বন্ধু? 'গঞ্জাগো বধ' অভিনয় করতে পারবেন?

প্রথম অভিনেতা : পারব, কুমার।

হ্যামলেট : তাহলে কাল রাতে সেই নাটকই দেখব। দরকার হলে আমার লেখা বারো কি ষোলো ছত্রের একটা অংশ মূল নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেব। সেটা মুখস্থ করতে পারবেন, আশা করি। কী, পারবেন না?

প্রথম অভিনেতা : পারব, প্রভু।

: বেশ, বেশ। [ সকল অভিনেতার প্রতি ] আপনারা ঐ মান্যবরের সঙ্গে যান। আর দেখুন, ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করবেন না কিন্তু।

[ পলোনিয়াস ও অভিনেতার প্রস্থান]

[ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রতি ] হে আমার সদাশয় সুহৃদ্দ্বয়, এখন বিদায় বলি, আবার রাতে দেখা হবে। এলসিনোরে স্বাগত জানাই তোমাদের।

রোজেনক্রান্‌জ : সদাশয় প্রভু, আসি তাহলে। [ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান]

: তাই হোক, বিদায় হে বন্ধু। এখন নিঃসঙ্গ আমি,<br>হায় কী দুর্জন আমি, কী নীচ নগণ্য ক্রীতদাস!<br>এই যে এখন এই অভিনেতা শুধু কাহিনির

রূপকল্পে, আবেগের স্বপ্নে তার হৃদয়কে এত
বেশি অভিভূত করতে পারে, যে আবেগে তার মুখ
নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ জলে ভেসে যায়,
যন্ত্রণায় বেঁকে ওঠে শরীর এবং কণ্ঠস্বর
ভেঙে যায়, আর এভাবেই তার প্রতিটি ভঙ্গিতে
কী বিশ্বস্ত রূপায়ন ঘটে নাটকের চরিত্রের —
এটা কি বিস্ময়কর নয়? নয় কি অস্বাভাবিক?
এই সব কিছুই বা কীসের তাগিদে? কার জন্যে?
হেকুবার জন্যে!
হেকুবা তার কে? কিংবা হেকুবার সে কে, যার জন্যে
তাকে কেঁদে ভাসাতেই হবে বুক? আমার ভেতর
যে প্রচণ্ড অন্তর্জ্বালা, যে উদ্দেশ্য আছে, যদি তার
থাকত তেমন কিছু তবে সে কী করতো? তাহলে সে
রঙ্গমঞ্চ ভাসাত চোখের জলে, দর্শকের কান
নিশ্চিত ফাটিয়ে দিত ভয়ংকর ভাষণের তোড়ে,
অপরাধীদের করত পাগল এবং মুক্তমনা
মানুষকে আতঙ্কিত, অজ্ঞদের বিমূঢ় এবং
চোখ ও কানের ক্ষমতায় বেবাক লাগাত ধন্দ।
অথচ স্বয়ং আমি
বিবর্ণ ধাতুর মতো ভোঁতা, নিরুদ্যম নরাধম,
কেবলি কাটাই কাল বৃথা স্বপ্নে, সংকল্প-রহিত,
পারি না বলতে কিছু, না পারি না সে বীর রাজার জন্যেও
লুণ্ঠিত সর্বস্ব যাঁর, বিষয়-আশয়, প্রিয়তম
জীবন। তবে কি কাপুরুষ আমি? কে তোমাকে বলে
দুরাচার? কে ভাঙে মাথার খুলি? কে আমার দাড়ি
ছিঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে দ্যায় আবার আমারই মুখে নাকে
খামচি কে দ্যায়, গলা দিয়ে ফুসফুস তা মিথ্যা
ঠেসে দ্যায়। কে আমাকে এ রকম নাজেহাল করে?
হাঃ হাঃ
যেশাসের ক্ষতের শপথ, মেনে নিতে হবে সবই :
কেননা আমি যে ভীরু কপোতের মতো, পীড়নকে
তিক্ত করবার মতো জ্বালা নেই যকৃতে আমার।
নয়তো ঢের আগেই সে দুরাত্মার নাড়িভুড়ি দিয়ে
পুষ্ট করতাম আকাশের বাজ পাখিদের। খুনি
দুরাচার, নিষ্করুণ, বিশ্বাসঘাতক, কামাচারী,
নির্দয়, দুর্বৃত্ত! কী গর্দভ আমি। বলিহারি যাই,
যোগ্য পুত্র বটে আমি প্রিয়তম নিহত পিতার।

স্বর্গ আর নরকের নির্দেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি
প্রতিশোধ গ্রহণে, অথচ গণিকার মতো শুধু
করছি উজাড় হৃদয়ের কথার পসরা আর
শাপ দিচ্ছি বারবণিতার মতো, রাঁধুনির মতো
ছিঃ ছিঃ ধিক। মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়, এ-কথা শুনেছি
কোনো কোনো অপরাধী নাটক দেখতে গিয়ে কোনো
শিল্পিত দৃশ্যের সম্মোহনে বিবেক-পীড়িত হয়ে
তৎক্ষণাৎ নিজেদের অপরাধ করেছে স্বীকার।
হত্যাকাণ্ড রসনাবিহীন বলে থাকে না নীরব,
রটায় গোপন কথা অলৌকিক ইন্দ্রিয় মাধ্যমে।
আমি এই অভিনেতাদের আমার পিতার হত্যা—
কাণ্ডের মতোই কোনো পালা পিতৃব্যের সম্মুখে
অভিনয় করতে বলব। লক্ষ করব তাকে, দেখে
নেব তার অন্তরের অন্তস্থল; যদি তার মুখ
ভয়ে সংকুচিত হয়, সে মুহূর্তে জেনে যাব আমি
আমার কী পথ। দেখেছি যে প্রেতাত্মাকে,
হতে পারে শয়তান সে, আর শয়তানেরই
সহজে মোহন রূপ পরিগ্রহ করার ক্ষমতা
আছে জানি। সম্ভবত আমার বিষাদ,
আমার মনের দুর্বলতার সুযোগে সে প্রেতাত্মা
আমাকে চালিতে করছে নরকের পথে।
কেননা এমন মানুষের মতিভ্রম সহজেই
ঘটাতে নিপুণ তারা। এর চেয়ে বাস্তব কারণ
আমাকে সন্ধান করতে হবে। নাটকই তো সেই ফাঁদ,
সেখানে ধরব আমি চকিতে রাজার অপরাধ।

[ প্রস্থান ]

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ রাজা, রানি, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া, রোজেনক্রান্জ, গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ। ]

রাজা : তোমরা কি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠারে ঠোরে
বের করতে করতে পারলে না কেন সে উদ্‌ভ্রান্ত, কেন
তার শান্ত দিনগুলি এরকম কর্কশ কঠোর করে
তুলেছে বিক্ষুব্ধ বিপজ্জনক উন্মত্ততা দিয়ে?

রোজেনক্রান্জ : তার বিভ্রান্তির কথা নিজেই স্বীকার করেছেন,
কিন্তু কী যে উৎস তার কিছুতেই বলেন না তিনি।

গিল্ডেনস্টার্ন : বাজিয়ে দেখতে গেছি তাঁকে, কিন্তু কিছুতেই
কুমার দেন না ধরা। যখনই প্রকৃত হাল তার
জানতে চেয়েছি তিনি তখনই নিপুণ পাগলামি
দিয়ে দিব্যি এড়িয়ে গেছেন।

রানি : তোমাদের বেশ ভালোভাবে অভ্যর্থনা করেছে তো?

রোজেনক্রান্জ : অতি ভদ্রজনোচিত।

গিল্ডেনস্টার্ন : তবে সেই আচরণে যেন ছিল না মনের সায়।

রোজেনক্রান্জ : প্রশ্নে গররাজি বটে, কিন্তু আমাদের সওয়ালের
অকুণ্ঠ জবাব দিয়েছেন মুক্তকণ্ঠে।

রানি : তোমরা কি
জানতে চেয়েছো চিত্তবিনোদনে সে কতটা ইচ্ছুক?

রোজেনক্রান্জ : হে ভদ্রে ঘটনাক্রমে কজন অভিনেতার সঙ্গে
আমাদের দেখা হয়ে গেল পথে। তাঁকে
সে কথা বলায় তিনি খুশি হয়েছেন, মনে হল।
ওরা দরবারের কোথাও আছে আর আমি মনে
করি আজ রাতে ওরা কুমারের সামনে কোনো পালা
অভিনয় করবার হুকুম পেয়েছে।

পলোনিয়াস : অতি সত্যি
কথা, আর আমাকে স্বয়ং তিনি বলেছেন যাতে
রাজারানি দুজনকে নাটক দেখার জন্যে আমি
অনুরোধ করি।

রাজা : আমরা সানন্দে যাব আর এ আমোদে তার
এই ঝোঁক দেখে আমি হয়েছি অত্যন্ত তুষ্ট। তাকে
তোমরা উৎসাহ দিয়ে এই মতো আমোদ প্রমোদে
আরো বেশি মাতিয়ে রাখো হে।

রোজেনক্রান্‌জ : তা রাখব মহারাজ।

[ রোজেনক্রান্‌জ এবং গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান ]

গারট্রুড প্রিয়ে, তোমাকেও

রাজা : এখন বিদায় নিতে হবে। কেননা হ্যামলেটকে
এখানে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছি, যাতে সে হঠাৎ
যাতে সে ওফেলিয়ার মুখোমুখি হয়ে পড়ে, যেন
ব্যাপারটা খুবই আকস্মিক।
ওর পিতা আর খোদ আমি, দুই বৈধ গুপ্তচর,
নিজেদের দৃষ্টির আড়ালে রেখে লক্ষ করব
তাদের সাক্ষাৎ, কুমারের আচরণ, তারপর
করব বিচার, জেনে নেব যথার্থই প্রেম না কি
অন্য কিছু উৎস তার যন্ত্রণার।

গারট্রুড : রাজ আজ্ঞা করব পালন।
আর ওফেলিয়া আমি একান্ত প্রার্থনা করি, যেন
তোমার মধুর রূপই তার খ্যাপামির যথাযথ
কারণ বলেই গণ্য হয়; তাই আমি আশা করি,
তোমার সদগুণ তাকে আনবে ফিরিয়ে পুনরায়
তার স্বাভাবিক পথে, তোমাদের দুজনেরই মান
তাতে রক্ষা পাবে।

ওফেলিয়া : রানি, আমিও প্রার্থনা করি তাই।

[ রানির প্রস্থান ]

পলোনিয়াস : ওফেলিয়া, পায়চারী করো এখানে, শ্রদ্ধেয় প্রভু,
যদি সানুগ্রহ অনুমতি দেন তাহলে আমরা
দুজন আড়ালে চলে যাই। এই বইটায় চোখ
আলতো বুলিয়ে যাও, এই ধর্মকথা হবে বটে
তোমার নিঃসঙ্গতার অজুহাত, আমাদের এই
দোষ, ঢের সাবুদ রয়েছে —"আমরা ভক্তির ভড়ং
এবং ধর্মাচরণে স্বয়ং শয়তানকেই করে
তুলি মনোহর।"

রাজা : [ স্বগত] হায়, এ যে নিদারুণ সত্য কথা,
এ কথায় তীক্ষ্ণ চাবকানি খেলো আমার বিবেক।
প্রসাধন কলায় সুন্দর গণিকার গাল সেই
প্রসাধন সামগ্রীর চেয়ে যতটা কুৎসিত, তার
চেয়ে বেশি কুৎসিত আমার রঙকরা কথাদের
অত্যন্ত আড়ালে থাকা আমার দুষ্কৃতি সমুদয়।
হায়, কী দুর্বহ বোঝা!

পলোনিয়াস : এ যে তিনি আসছেন। আসুন আমরা সরে পড়ি।

[ রাজা ও পলোনিয়াসের প্রস্থান। হ্যামলেটের প্রবেশ। ]

হ্যামলেট : থাকব কি থাকব না, প্রশ্ন হল তা-ই।
বিরূপ ভাগ্যের শরাঘাত সয়ে যাওয়া নাকি দুঃখ -
সমুদ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা বিরোধিতা করে
ওদের বিলীন করা, কোনটা মহত্তর? মৃত্যু : ঘুম,
হয়তো ঘুম ছাড়া বেশি কিছু নয়; আর তারপর
বলা এরকম ঘুমে লুপ্ত হয় হৃদয়ের ব্যথা,
জীবনের অগণিত দুর্দশা যা প্রাপ্য মানুষের,
এই অবলুপ্তি বাস্তবিকই একান্ত কাঙ্ক্ষিত। মৃত্যু,
ঘুম; ঘুম। কিন্তু ঘুমে আমরা দেখতে পারি স্বপ্ন,
হ্যাঁ, এইতো মুশকিল, কেননা যখন জগতের
সব কলরব থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব এই
নশ্বর নির্মোক আমরা, তখন জানিনা সেই ঘুমে
কী স্বপ্ন আসবে, তাই ভেবে আত্মহননের আগে
থমকে দাঁড়াই। এই বিবেচনাই তো
দীর্ঘকাল জীবনের দুঃখকষ্ট সইতে বাধ্য করে
আমাদের, নইলে কে সইতে চায় পৃথিবীর যত
গঞ্জনা এবং কশাঘাত, অত্যাচারীর অন্যায়,
গর্বান্ধের অপমান আর অবহেলিত প্রেমের
অন্তর্জ্বালা, আইনের কালহরণ এবং পদাধিকারীর
দুর্বিনয়, নির্গুণের হাতে ধৈর্যশীল
গুণীর অবমাননা কে সইবে, যখন একটি
ছোটো, নাঙা খঞ্জরের ঘায়ে সে নিজেই পারে সব
হিসেব চুকিয়ে দিতে? গুরুভার?
ক্লান্তিকর জীবনের ভারে কায়ক্লেশে কে চায় ঘর্মাক্ত
হতে, যন্ত্রণায় কাতরাতে? চাইত না, যদি না থাকত
মৃত্যুর পরের ভয় - সে চির অনাবিষ্কৃত লোক,

যার প্রান্তসীমা থেকে কখনো আসে না ফিরে কোনো
পর্যটক; সেই ভয়ে সংকল্প বিভ্রান্ত হয়, তাই
আমরা অন্য অজ্ঞাত দুঃখের পেছনে না ছুটে সয়ে
যেতে বাধ্য হই যথারীতি উপস্থিত দুঃখকেই।
ফলত বিবেক আমাদের কাপুরুষ করে তোলে,
এবং এভাবে সংকল্পের সহজাত লাল রঙ
পাণ্ডুর চিন্তার ছাপে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়,
আর নষ্ট হয় ঢের মহান উদ্যম, এভাবেই
বাঁকা পথে বয়ে যায় স্রোত, হারায় কর্মের নাম
সকল উদ্যোগ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এমন নিশ্চুপ
হত তুমি; এই তো সুন্দরী ওফেলিয়া! হে কুমারী,
আমার সকল পাপ মোচনের মিনতি তোমার
প্রার্থনায় মূর্ত হোক।

ওফেলিয়া : কেমন আছেন মান্যবর?
আপনাকে কতদিন দেখি না কুমার।

হ্যামলেট : জানাই বিনীত ধন্যবাদ; ভালো, বেশ ভালো আছি।

ওফেলিয়া : আপনার স্মৃতি নিদর্শনগুলি বহুদিন থেকে
ভাবছি ফিরিয়ে দেব; আমার একান্ত অনুরোধ
এগুলি এখন নিন।

হ্যামলেট : না, না, নই, সেতো আমি নই।
তোমাকে কখনো আমি দিইনি কিছুই।

ওফেলিয়া : মান্যবর, বিলক্ষণ জানেন আপনি দিয়েছেন,
আর তার সঙ্গে দিয়েছিলেন এমন মধুর
কথা, যার ফলে আপনার স্মৃতিচিহ্ন সমুদয়
হয়েছে সমৃদ্ধতর। তাদের সুবাস নেই আজ,
এবার ফিরিয়ে দিন; দাতা হলে কঠোর নির্দয়
সজ্জনের কাছে তার ঋদ্ধ দান তুচ্ছ মনে হয়।
এই নিন, প্রভু।

হ্যামলেট : হাঃ হাঃ। তুমি কি সাধ্বী?

ওফেলিয়া : কী বলছেন যুবরাজ?

হ্যামলেট : তুমি কি সুন্দরী?

ওফেলিয়া : কী বলতে চাইছেন প্রভু?

হ্যামলেট : আমি বলতে চাইছি যে, তুমি যদি সাধ্বী ও সুন্দরী হও,
তাহলে তোমার সতীত্বের সঙ্গে তোমার সৌন্দর্যের
সংযোগ সমীচীন নয়।

ওফেলিয়া : সৌন্দর্যের সঙ্গে সতীত্ব ছাড়া আর কার লেনদেন বেশি সমীচীন, কুমার?

হ্যামলেট : হ্যাঁ, যথার্থ বলেছো। কেননা, সৌন্দর্যের এমন শক্তি আছে যাতে সতীত্বকে কলুষিত করে তুলতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যকে নিজের আদলে বদলে ফেলার মতো অত শক্তি সতীত্বের নেই। এক সময় এটা কূটাভাস বলে মনে হত। কিন্তু সময়ে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। একদা তোমাকে আমি ভালোবাসতাম।

ওফেলিয়া : যথার্থ বলেছেন কুমার। আপনি আমাকে সেকথা বিশ্বাস করিয়েছিলেন।

হ্যামলেট : আমাকে বিশ্বাস করা তোমার উচিত হয়নি। কেননা, আমাদের ভেতর সদগুণ যতই ভরে দেয়া হোক না, আদি পাপের ছাপ থেকে আমাদের রেহাই নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি নি।

ওফেলিয়া : আমিই বেশি প্রতারিত হয়েছি।

হ্যামলেট : কোনো মঠে চলে যাও। কেন পাপীদের জন্ম দেবে তুমি? আমি খোদ বেশ সজ্জন; তবু আমি নিজেকে এমন সব অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারি যে মনে হবে আমার মা আমাকে জন্ম না দিলেই ভালো করতেন। আমি অত্যন্ত অহংকারী প্রতিশোধ - পরায়ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এত অসংখ্য আমার অপরাধ যে ভাবনা তাদের বাগে আনতে পারবে না, কল্পনার সাধ্যি নেই তাদের রূপায়িত করার। ওদের কার্যকর করতে আমার সময়ে কুলোবে না। আমার মতো মানুষ, যারা স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে গুঁড়ি মেরে চলে তারা একবারে বেহুদা। আমরা সবাই পাকা প্রতারক, সব্বাই। আমাদের কাউকেই বিশ্বাস কোরো না। যাও, সোজা মঠে চলে যাও। তোমার পিতা কোথায়?

ওফেলিয়া : গৃহে, কুমার।

হ্যামলেট : তাকে দরজায় খিল দিয়ে থাকতে বলোগে, যাতে নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও তাকে বোকা সাজতে না হয়।
বিদায়।

| | | |
|---|---|---|
| ওফেলিয়া | : | হে দয়াময় তাকে রক্ষা করো। |
| হ্যামলেট | : | যদি তুমি বিয়ে করো, তাহলে তোমাকে যৌতুক হিসেবে শুধু এই অভিশাপ দিতে পারি যে, তুমি বরফের মতো সতীসাধ্বী হতে পারো, হতে পারো তুষারের মতো পবিত্র, কিন্তু তা বলে কলঙ্কের হস্তাবলেপ থেকে বাঁচোয়া নেই তোমার। মঠে চলে যাও, যাও। বিদায়। আর যদি একান্ত বিয়ে করতেই হয় তাহলে কোনো বোকা-সোকা লোককেই বিয়ে করো। কারণ, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ভালো করেই জানে তোমরা বানোয়াট খেলা খেলে ওদের কী শিং-অলা ভেড়ুয়াই না বানাতে পারো। এখুনি কোনো মঠে চলে যাও। বিদায়। |
| ওফেলিয়া | : | স্বর্গের দেবতারা, ওর বোধশক্তি ফিরিয়ে দিন। |
| হ্যামলেট | : | তোমাদের মেয়েদের প্রসাধনের কথা প্রচুর শুনেছি। খোদা তোমাদের সবার এক ধরনের মুখ দিয়েছেন আর তোমরা খোদকারি করে দু'চার পোঁচ বুলিয়ে অন্য মুখ তৈরি করে ফেলো। তোমরা হেঁটে যাও, যেন খেমটা নাচ নেচে বেড়াও, ঠমক মেরে চলো, আর আধো আধো কথা বলো, আর ঈশ্বরের জীবদের বোকা-বোকা ভুল নামে ডাকো, আর তোমাদের রঙঢঙকে অজ্ঞানতার অজুহাত হিসেবে চালিয়ে দাও। যাও, যাও, আমি আর এসবে নেই। এসব আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আমি বলে দিচ্ছি, আর বিয়ে টিয়ে হবে না। ইতিমধ্যে যারা বিয়ে করে ফেলেছে, তাদের ভেতরে একজন ছাড়া বাদবাকি সবাই বেঁচে যাবে। একজন ছাড়া বাকি সবাই যেমন আছে তেমনি থাকবে। যাও, মঠে চলে যাও। |
| ওফেলিয়া | : | হায় কী মহানুভব মানুষের এ কী বিপর্যয়।<br>রাজপুরুষের বাক্, বৈদগ্ধ এবং পণ্ডিতের<br>দৃষ্টি আর যোদ্ধার বীরত্ব; এই সব গুণে তিনি<br>সুন্দর রাজ্যের আশা, প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ,<br>কেতাব মুকুর তিনি, রাজদরবারে আচরণে<br>মধুর স্বভাব, আর সকল নিবিষ্ট দর্শকের<br>কাছে দর্শনীয়, হায় আজ তাঁর একি অধঃপাত।<br>আর আমি রমণীকুলের মধ্যে সবচে' দুঃখিনী, |

অভাগিনী, আমি তো নিয়েছি শুষে তার অপরূপ
শপথ-নীতির সুধাটুকু, এখন শুনেছি আমি
সে মহান, সার্বভৌম যুক্তির মধুর কণ্ঠস্বর
বিদীর্ণ ঘণ্টার মতো বাজে শুধু বেসুরো, কর্কশ।
প্রস্ফুটিত যৌবনের অনুপম পরিপূর্ণ রূপ
বিনষ্ট উন্মত্ততার প্রবল ঝাপটায়; হা কপাল
একদা দেখেছি যাঁকে আজ দেখি তাঁর একী হাল!
[ রাজা এবং পলোনিয়াসের প্রবেশ। ]

রাজা : আপনি তো বলেছেন প্রেমই এর মূলে, কিন্তু তার
মনোভাব দেখে মনে হয় না তা, যা বলল তাতেও
নয়; কথাবার্তা অসংলগ্ন বটে, কিন্তু তাতে নেই
কোনো পাগলামি; তার অন্তরেব অন্তস্থলে আছে
এমন গোপন কোনো যন্ত্রণা যা তাকে ক্রমাগত
করছে বিষাদগ্রস্ত। আর আমার আশংকা হল,
সেই রহস্যের খোল ভেঙে গেলে পর দেখা দেবে
সমূহ বিপদ, তার সেটা রোধ করবার জন্যে
ত্বরিত করেছি মনস্থির — আমাদের অনাদায়ী
খাজনা উসুল করতে তাকে শিগগিরই যেতে হবে
ইংল্যান্ডে, সম্ভবত সমুদ্র এবং ভিনদেশী
দৃশ্যাবলি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিচিত্র অভিনব
সামগ্রীসম্ভার তার অন্তরে প্রোথিত বিষাদের
গুরুভার করবে লাঘব। এ বিষাদই কুরে কুরে
খাচ্ছে তার মস্তিষ্ককে; যার ফলে তার
আচরণ এমন অস্বাভাবিক। এখন বলুন,
এ ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য অমাত্যপ্রবর?

পলোনিয়াস : বিলক্ষণ ভালো হবে এতে। তবু আমার বিশ্বাস
প্রত্যাখ্যাত প্রেমই তাঁর উপস্থিত দুঃখের কারণ
এবং সূচনা। এই, শোনো ওফেলিয়া, যুবরাজ
হ্যামলেট যা যা বলেছেন তা তোমাকে আমাদের
শোনাতে হবে না আর। সবই আমরা শুনতে পেয়েছি।
প্রভু, আপনি যা ভালো বোঝেন করুন, আর যদি
ঠিক মুনাসিব মনে করেন তাহলে, নাটকের
পরে তাঁর রানিমাকে বলুন একান্তে কুমারকে
ডেকে এনে যেন তিনি তাঁর কাছ থেকে ওঁর এই
বিষাদের প্রকৃত কারণ জেনে নেন। তাঁকে সব

সাফ সাফ জিজ্ঞেস করতে বলবেন। প্রভু যদি
অনুমতি দেন তবে আমি ধারে কাছে আড়ি পেতে
শুনব তাঁদের সব কথোপকথন; যদি রানি
কুমার সম্পর্কে সত্য কথা বের করতে ব্যর্থ হন
তবে তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিন অথবা যেখানে
সমীচীন সেখানেই আটকে রাখুন।

রাজা : হবে তাই।
মহৎ ব্যক্তির উন্মত্ততা অবহেলা করতে নাই।

[ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ হ্যামলেট এবং তিনজন অভিনেতার প্রবেশ। ]

হ্যামলেট : অনুরোধ জানাই, আমি যে-ভাবে উচ্চারণ করছি ঠিক তেমনি সংলাপ বলুন। সহজ, স্বাভাবিক হালকা ঢঙে। অনেক অভিনেতা যেভাবে চেঁচান অমন করলে আমি চাইব যে আমার লেখা নগর-নকিবরাই আওড়াক। না, অত বেশি হাত নেড়ে বাতাসকে করাত-চেরা করবেন না। সবকিছুই আস্তে সুস্থে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে করুন; কেননা, বানডাকা আবেগের তোড়ে, ঝড়ে ঘূর্ণিতে মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখা দরকার। তাহলেই বাণীতে আসবে সুষমা। যখন দেখি, একটা পরচুলা পরা হড়বড়ে নটবর আবেগকে ন্যাকড়ার মতো ফালি ফালি করে নীচু তলার দর্শকদের কান ঝালাপালা করে ফেলছে, যে দর্শকদের অসার মূক-পালা আর হট্টগোল ছাড়া আর কিছুই রোচে না, তখন আমার আত্মা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। এই ধরনের অভিনেতা যারা হল্লাবাজ হালাকুর ভূমিকায় অতি অভিনয় করে তাদের চাবকাতে ইচ্ছে হয় আমার। হেরডের ভূমিকায় এরা হেরডকেও হার মানায়। আমার অনুরোধ, এদের পথ পরিহার করুন।

প্রথম অভিনেতা : আশ্বাস দিচ্ছি, তাই হবে প্রভু।

হ্যামলেট : দেখবেন অভিনয় যেন আবার খুব ধিমে না হয়। এ ব্যাপারে আপনাদের বিচারবুদ্ধিই হোক আপনাদের শিক্ষক। বাণী অনুযায়ী অভিনয় হওয়া চাই আর অভিনয় অনুযায়ী বাণী। ভালোভাবে নজর রাখবেন যাতে স্বাভাবিকতার গন্ডি ডিঙিয়ে না যান। কেননা, বাড়াবাড়ি মাত্রই নাটকের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। সর্বকালেই নাটকের মূল লক্ষ্য হল প্রকৃতির সামনে আয়না তুলে ধরা —যেখানে প্রতিবিম্বিত হবে সদগুণের যথার্থ রূপ, ঘৃণার প্রকৃত স্বরূপ, যুগের সত্যিকারের প্রতিকৃতি আর দৃষ্টিভঙ্গি। এই অতি-অভিনয় কিংবা ধিমে-তেতালা ভঙ্গি অজ্ঞদের হাসাতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞেরা এতে মর্মাহত হন। এমন একজন দর্শকের অভিমত প্রেক্ষাগৃহের সকল

লোকজনের মতামতের চেয়ে ঢের বেশি ওজনদার। আমি খোদ অনেক অভিনেতার অভিনয় দেখেছি, অনেকে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমার বলাটা হয়তো অবজ্ঞার মতো শোনাতে পারে, সেজন্যে মার্জনা চাই, তাদের উচ্চারণ ও চালচলন আদৌ খ্রিস্টানদের মতো নয়, পৌত্তলিকদের মতো নয়, এমনকি মানুষের মতোও নয়, ওরা এমন লাফায় ঝাঁপায় আর ষাঁড়ের মতো চেঁচায় যে মনে হয় ওরা প্রকৃতির ভাড়াটে কারিগরের হাতে গড়া। কারণ ওরা মানবপ্রকৃতিকে জঘন্য ভাবে অনুকবণ করে।

প্রথম অভিনেতা : আমার বিশ্বাস, আমাদের অভিনয়ের দোষত্রুটি আমরা বেশ কিছুটা শোধরাতে পেরেছি।

হ্যামলেট : একেবারে শুধরে ফেলুন। আর আপনাদের মধ্যে যারা ভাঁড়ের অভিনয় করে তাদের বলে দিন তারা যেন নাটকের সংলাপের অতিরিক্ত মনগড়া কিছু না বলে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই হাসাহাসি করে আকাট মূর্খ দর্শকদের হাসায়। এর ফলে হয়তো নাটকের জরুরি বক্তব্যই মাঠে মারা যায়। এটা একটা গর্হিত কাজ, এতে ভাঁড়ের করুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ধরা পড়ে। যান, আপনারা চটপট তৈরি হয়ে নিন।

[ অভিনেতাদের প্রস্থান। পলোনিয়াস, রোজেনক্রান্জ এবং গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ ]

এই যে অমাত্যপ্রবর কী খবর? রাজা কি এই পালা দেখতে আসবেন?

পলোনিয়াস : তাঁর সঙ্গে রানিও আসবেন। ওঁরা এলেন বলে।

হ্যামলেট : অভিনেতাদের তাড়াতাড়ি করতে বলুন। [পলোনিয়াসের প্রস্থান ] তোমরা দু'জন কি ওদের চটজলদি তৈরি হতে সাহায্য করবে?

রোজেনক্রান্জ : করব বইকি কুমার। [ রোজেনক্রান্জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান ]

হ্যামলেট : আরে, হোরেশিও না?

হোরেশিও : মধুর কুমার আমি আপনার খেদমতগার।

হ্যামলেট : হোরেশিও, কত না লোকের সঙ্গে দেখাশোনা হল, অথচ তোমার মতো খাঁটি আমি কাউকে দেখিনি।

হোরেশিও : সত্য বলেছেন যুবরাজ?

হ্যামলেট : না; ভেব না তোষামোদ
করছি তোমাকে, কেনই বা করব বলো? কোনো কিছু
পাওয়ার প্রত্যাশা আমি করি না তোমার কাছে; জানি,
তোমার নিজস্ব কোনো রোজগার নেই। প্রাণোচ্ছল
আনন্দই খোরপোষ জোগায় তোমাকে। অতএব
দরিদ্রকে তোষামোদ করবার হেতু নেই কোনো।
বরং মধুরভাষী যারা তারা জাঁকজমকের ঠাটে
মশগুল বিত্তশালীদের পদলেহন করুক,
প্রণতিপ্রবণ জানু নত হোক সেখানে, যেখানে
চাটুবাক্যে ঘটে প্রাপ্তিযোগে। শুনছো তো?
যেহেতু আমার প্রিয় আত্মা তার পছন্দের কর্ত্রী
এবং সক্ষম বুঝে নিতে মানুষের ভেদাভেদ,
তাই তার নির্বাচিত তুমি; কেননা সকল ক্লেশ
সহ্য করো তুমি, কিন্তু সব ক্লেশ তোমার নিকট
তুচ্ছ মনে হয়, তুমি হলে সে মানুষ, যে ভাগ্যের
তিরস্কার আর পুরস্কার দুটোই গ্রহণ করে
সমান সহজ মনে। ধন্য তারা যাদের আবেগ
আর বুদ্ধি বিবেচনা এমন সুসমন্বিত। তারা
বাঁশি নয়, যাতে ভাগ্য চালাবে আঙুল খুশিমতো
যখন যে ছিদ্রে ইচ্ছে তার। এমন একটি লোক
এনে দাও আমাকে যে নয় আবেগের ক্রীতদাস।
আমি তাকে হৃদয়ের মাঝখানে একান্ত আমার
অন্তরের অন্তস্থলে দেব ঠাঁই। যেমন তোমাকে
দিয়েছি; যাকগে এ ব্যাপারে বড়ো বেশি বলা হয়ে
গেল বটে; আজ রাতে রাজার সম্মুখে অভিনীত
হবে সেই পালা যার এক দৃশ্যে একটি ঘটনা
হুবহু আমার জনকের মৃত্যু দৃশ্যের মতো।
তোমাকে বলেছি আমি সে কথা আগেই। এ আমার
অনুরোধ, যখন সে দৃশ্য অভিনীত হবে, তুমি
তোমার সমস্ত মনোযোগ দিয়ে সতর্ক নজর
রাখবে আমার পিতৃব্যের ওপর যদি সে পালা
দেখে, তার একটি সংলাপ শুনে তার গুপ্ত সেই
অপরাধ প্রকাশিত না হয়, তাহলে বুঝে নেব
যে-প্রেতাত্মা দেখেছি আমরা সে নারকীয় অভিশপ্ত
শয়তান ছাড়া কিছু নয়। আর আমার কল্পনা
বিশ্বকর্মার নেহাইয়ের মতো কালিমালিপ্ত,

ভালো করে দৃষ্টি রেখো তার প্রতি, আমিও আমার
নজর রাখব তার মুখে, পরে আমরা দু'জন
তার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে তার মনোভাব
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব।

হোরেশিও : বেশ, তাই হবে; নাটকের
অভিনয়কালে যদি তিনি এতটুকু ধুলো দিতে
পারেন আমার চোখে তবে শাস্তি নেব মাথা পেতে।
[ ভেরি-ধ্বনি, ডেন-অভিযান সংগীত ও বাদ্য বাদন ]

হ্যামলেট : ঐ যে তাঁরা নাটক দেখতে আসছেন। হতে হবে
ন্যালাখ্যাপা আমাকে এখন। দেখে শুনে বসে পড়ো।
[ রাজা, রানি, পলোনিয়াস, রোজেনক্রান্‌জ, গিল্ডেন-
স্টার্ন এবং অন্যান্য অমাত্য ও রাজার মশালবাহী
রক্ষীদের প্রবেশ। ]

রাজা : আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র হ্যামলেটের কী খবর?

হ্যামলেট : জবর উপচার, বিশ্বাস করুন : বহুরূপী গিরগিটির
খোরাক। ওরই মতো হাওয়াখোর হয়ে বেঁচে আছি।
প্রতিশ্রুতি-ঠাসা আমি, এই খোরাকিতে খাসি করা
মোরগের চলে না।

রাজা : তোমার জবাব আমার কাছে অর্থহীন, হ্যামলেট।
তোমার এই কথার সঙ্গে আমার প্রশ্নের কোনো
সম্পর্ক নেই।

হ্যামলেট : না, এখন আমার সঙ্গেও নেই। [ পলোনিয়াসকে ]
মান্যবর, খোদ আপনার কাছেই শুনেছি আপনি
একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় করেছিলেন, তাই না?

পলোনিয়াস : তা করেছিলাম বইকি, প্রভু। আমাকে বেশ ভালো
অভিনেতা বলেই লোকে জানত।

হ্যামলেট : বলুন তো আপনি কী সেজেছিলেন?

পলোনিয়াস : আমি জুলিয়াস সিজার সেজেছিলাম। আমি
নগর-পরিষদে নিহত হয়েছিলাম। ব্রুটাস আমাকে হত্যা
করেছিল।

হ্যামলেট : এমন একটা নধর বাছুরকে জবাই করা ওর পক্ষে
খর্বোরোচিত কাজই হয়েছিল। অভিনেতারা কি প্রস্তুত?

রোজেনক্রান্‌জ : জ্বি, কুমার, ওরা প্রস্তুত। শুধু আপনার অনুমতির
অপেক্ষায় আছে।

রানি : এসো প্রিয় হ্যামলেট, আমার এ পাশে এসে বসো।

হ্যামলেট : না, মা, থাক; ঐ পাশটাই আরো বেশি আকর্ষণীয়।

[ ওফেলিয়ার দিকে তাকিয়ে ]

পলোনিয়াস : [ রাজাকে ] ও হোঃ! লক্ষ করলেন তো?

হ্যামলেট : [ ওফেলিয়ার পায়ের কাছে শুয়ে ] ভদ্রে, আমি কি তোমার কোলে শোব?

ওফেলিয়া : না, কুমার।

হ্যামলেট : বলছিলাম কি, তোমার কোলে মাথা রাখব কি?

ওফেলিয়া : রাখুন, প্রভু।

হ্যামলেট : আমি প্রাকৃত কিছু বলছি ভেবেছিলে?

ওফেলিয়া : আমি কিছুই ভাবিনি কুমার।

হ্যামলেট : কুমারীর দু'পায়ের ফাঁকে শোওয়া তো মধুর ভাবনা।

ওফেলিয়া : কী বললেন কুমার?

হ্যামলেট : কিছুই না।

ওফেলিয়া : আপনাকে বেশ রঙিলা মনে হচ্ছে।

হ্যামলেট : কাকে, আমাকে?

ওফেলিয়া : হ্যাঁ, কুমার।

হ্যামলেট : হা, খোদা। আমি তো তোমার খেদমতে সবেধন নীলমণি এক পদ্যকার। রঙ্গ-তামাশা না করে মানুষ করবেই বা কী? ঐ দ্যাখো না, আমার মা খুশিতে কেমন ডগমগে হয়ে উঠেছেন। অথচ মাত্র দু'ঘণ্টা হল আমার পিতা মারা গেছেন।

ওফেলিয়া : না তো, দু'দুগুণে চার মাস হল, কুমার।

হ্যামলেট : এতদিন হয়ে গেল? তাহলে শয়তানই কালো পোশাক পরুক, বরং আমি পরব জমকালো পোশাক-আশাক। হা খোদা, দু'মাস আগে মারা গেছেন, অথচ এখনো তাঁকে ভুলতে পারা গেল না। তাহলে আশা করা যায়, মহৎ ব্যক্তির স্মৃতি তাঁর মৃত্যুর আদ্ধেক বছর পরও বেঁচে থাকবে। কিন্তু মাতা মরিয়মের দোহাই, তিনি যদি গির্জা তৈরি করে যেতে পারেন তবেই সেটা সম্ভব। নইলে তার কপালে জুটবে বিস্মৃতি যেমন বিস্মৃত সেই নাচের রঙিন কাঠের ঘোড়া, যার সমাধিলিপি হল — 'হায় ভুলে-যাওয়া রঙিন কাঠের ঘোড়া।'

[ তুর্যধ্বনি। মূকাভিনয় শুরু হল। পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ রাজা ও রানি প্রবেশ। রানির নতজানু হয়ে রাজার প্রতি তার প্রেম প্রকাশ করেন। রাজা

রানিকে হাত ধরে তুলে নিয়ে তার কাঁধে মাথা রাখেন। তারপর রাজা ঘুমিয়ে পড়েন ফুলবাগানের পাশে। তাঁকে ঘুমন্ত দেখে রানি সেখান থেকে চলে যান। তারপরই একজন আগন্তুক সেখানে এসে রাজার মুকুট খুলে নিয়ে মুকুটে চুমো খায়, ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে চলে যায়। রানি ফিরে এসে দ্যাখেন যে রাজা মৃত; গভীর শোক প্রকাশ করেন তিনি। তিন চার জন লোক নিয়ে বিষপ্রয়োগকারীর প্রত্যাবর্তন। ওরা রানির শোকপ্রকাশে শরিক হয়। লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার পর বিষপ্রয়োগকারী নানা উপহার দিয়ে রানির প্রতি প্রেম নিবেদন করে। কিছুক্ষণের জন্যে রানি তার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেন, কিন্তু আখেরে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। [ প্রস্থান। ]

ওফেলিয়া : এর অর্থ কী যুবরাজ?

হ্যামলেট : এ হল গোপন বেহদ বদিয়াতি, স্রেফ বদিয়াতি ছাড়া কিছু নয়।

ওফেলিয়া : সম্ভবত এ দৃশ্য মূল নাটকের প্রস্তাবনা।

[ নান্দীকারের প্রবেশ ]

হ্যামলেট : এই লোকটার কাছ থেকে জানা যাবে। অভিনেতারা কিছুই গোপন রাখতে পারে না ; ওরা সবই ফাঁস করে দেবে।

ওফেলিয়া : এই দৃশ্যের অর্থ কী সে বলবে?

হ্যামলেট : এই দৃশ্যের অর্থ বলবে বইকি, কিংবা যে-কোনো দৃশ্য তুমি ওকে দেখাবে, তারও। তুমি যদি দেখতে শরম না পাও, তাহলে সে তার মানে বলতেও লজ্জা পাবে না।

ওফেলিয়া : আপনি ভারি দুষ্টু, আমি বরং নাটক দেখি।

নান্দীকার : এখন আপনাদের কাছে নতজানু হয়ে এই অভাজন আমাদের জন্যে আমাদের ট্রাজেডির জন্যে করি নিবেদন দেখুন করুণা করে, ধৈর্য ধরে করুন শ্রবণ। [ প্রস্থান ]

হ্যামলেট : এটা কি নান্দীপাঠ নাকি আংটিতে লেখা নীতিবাক্য?

ওফেলিয়া : এটা সংক্ষিপ্ত, কুমার।

হ্যামলেট : নারীর প্রেমের মতো।

[ রাজা ও রানির সাজে দু'জন অভিনেতার প্রবেশ ]

অভিনেতা : প্রণয়ের পবিত্র বন্ধনে আমরা হয়েছি আবদ্ধ আর প্রজা
— পতির নির্বন্ধে আমাদের দুটি হাত সম্মিলিত

হয়েছে অনেক আগে। তারপর সূর্যদেবতার
রথ পুরো ত্রিশবার বরুণদেবের জলরাশি,
ধরিত্রী মাতার ভূপৃষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করে গেছে
আর বারোগুণ ত্রিশবার চন্দ্রকলা ধার-করা
আলো তার বিকিরণ করেছে ধরার দশদিকে।

অভিনেত্রী রানি : আমাদের প্রণয়ের সমাপ্তির আগে চন্দ্রসূর্য
আরো ততবার প্রদক্ষিণ করে যাক।
কিন্তু রাজা, দুর্ভাগ্য আমার ইদানিং
আপনি অসুস্থ খুব, এবং হারিয়ে ফেলেছেন
আপনার আগেকার প্রফুল্ল মেজাজ, তাই আমি
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি আপনার জন্যে; মনে শঙ্কা
যদিও বেঁধেছে বাসা, তবু চাই না অশান্তি হোক
আপনার। রানির প্রণয় আর ভয় পরস্পর
অত্যন্ত সঙ্গাতিময়। হয় তাদের অস্তিত্ব নেই,
নয়তো ছাড়িয়ে যায় সীমা বহুদূর। আপনার
প্রতি কী রকম ভালোবাসা আমার সেটাতো আগে
নিশ্চিত হয়েছে প্রমাণিত। আমার ভেতরে ভয়
আর ভালোবাসা সমপরিমাণ; যেখানে গভীর
ভালোবাসা যেখানেই তিলার্ধ সন্দেহ আনে ভয়,
যেখানে সন্দেহকণা বেড়ে বেড়ে অতিকায় হয়,
সেখানেই প্রণয়ের গভীরতা হয় প্রমাণিত।

অভিনেতা রাজা : বিশ্বাস করো হে প্রিয়, আমাকে তোমাকে ছেড়ে যেতে
হবে, শীঘ্র যেতে হবে। আমার শরীর
হয়েছে বিকল, আর তুমি এরপরও থাকবে বেঁচে
এ সুন্দর পৃথিবীতে সসম্মানে, ভালোবাসা নিয়ে
হয়তো আমারই মতো সহৃদয় স্বামী পাবে —

রানি : না, না
ও কথা বলো না আর। এমন প্রণয় যদি পায়
আমার অন্তরে ঠাঁই, তবে আমি বিশ্বাসঘাতিনী
ছাড়া কিছু নই, যদি আমি হে রাজা, বরণ করি
কখনো দ্বিতীয় স্বামী, তবে যেন অভিশপ্ত হই,
প্রথম স্বামীর খুনি ছাড়া হয় না দ্বিতীয় স্বামী।

হ্যামলেট : [ নেপথ্যে ] বিষলতা, বিষলতা।

রানি : নীচ মিতব্যয়িতার নজির দ্বিতীয় পরিণয়
সুনিশ্চিত, কখনো তা আন্তরিক প্রণয়ের নয়।

যখন দ্বিতীয় স্বামী চুমো খাবে তোমাকে শয্যায়,
তখন প্রথম স্বামী হবেন নিহত পুনরায়।

রাজা : এ-কথা বিশ্বাস করি, এখন যা বলছো তোমার
ব্যক্তিগত প্রত্যয় থেকেই তুমি বলছো, অথচ
আমরা যত সংকল্প করি সেটা ভেঙে ফেলি প্রায়শই,
সংকল্প তো স্মৃতির গোলাম; অকস্মাৎ জন্ম হয়
এর, কিন্তু তার টিকে থাকবার মতো শক্তি নেই।
অপক্ব ফলের মতো গাছে লেগে থাকে, পলকেই
খসে যায় ঝাঁকুনি ছাড়াই। এটা অবধারিত যে,
আমরা আমাদের নিজেদের ঋণ করবার
কথা ভুলে যাই; আবেগের তাড়নায় যে প্রতিজ্ঞা
করে বসি, আবেগ ফুরিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা-ও
বেবাক হারিয়ে যায়। আনন্দ কি শোক সীমারেখা
ছাড়িয়ে যাবার পর ওরা নিজেরা উধাও হলে,
ওদের সংকল্পকেও সেই সঙ্গে ধ্বংস করে যায়।
আনন্দ যেখানে অতি উচ্ছ্বসিত সেখানে শোকের
বিলাপ সপ্তমে চড়ে; আর অতি সামান্য ঘটনা
আনন্দকে শোকে আর শোককে আনন্দে পরিণত
করে; এ জগত চিরস্থায়ী নয়, তাই এটাও তো
তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে আমাদের
প্রেমও আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে
সহসা বদলে যাবে। সৌভাগ্য প্রেমের অনুগত
নাকি প্রেম সৌভাগ্যের, এ প্রশ্নের কোনো ফয়সালা
হয়নি এখনো; দেখা গেছে, যখন মহৎ কোনো
ব্যক্তির পতন ঘটে, তখন নিমেষে তার প্রিয়
অনুচরবর্গ তাঁকে ছেড়ে আড়ালে সট্‌কে পড়ে।
যখন দরিদ্র কেউ উন্নতির উঁচু ধাপ বেয়ে
ওঠে দ্রুত, তখন শত্রুরা তার মিত্র বনে যায়।
এই দিক থেকে ভালোবাসা সৌভাগ্যেরই অনুগামী।
অর্থাৎ দরকার নেই যার তার চারপাশে জোটে
বহু বন্ধু আর যাঁর প্রয়োজন সে পায় না কোনো
বন্ধু কিংবা তার একজন কপট মিত্রও হয়ে
ওঠে বড়ো বেশি দক্ষ শত্রু। যাকগে, যেকথা দিয়ে
শুরু করেছিলাম সে কথাতেই ফিরে গিয়ে বলি;
আমাদের অভিলাষ আর ভাগ্য পরস্পর এত
ভিন্নমুখী যে আমরা যা ভাবি অথবা কোনো কিছু

পরিকল্পনা করি, তা প্রায়শ ব্যর্থ হয়ে যায়।
আমরা নিজেরা ভাবি অথচ সে ভাবনার ফল
আমাদের বশবর্তী নয়। এখন ভাবছো তুমি
আর করবে না বিয়ে পুনরায়। তোমার প্রথম
স্বামীর মৃত্যুর পরে সে চিন্তারও মৃত্যু হবে জানি।

রানি : যদি আমি একবার বিধবা হবার পর ফের
বিয়ে করি, তাহলে ধরনী যেন আমাকে আহার্য
না জোগায়, যেন আলো না দেয় আকাশ, যেন আমি
আমোদপ্রমোদ আর বিশ্রাম, এসব কিছু থেকে
সর্বদা বঞ্চিত হই; আমার সকল আশা আর
বিশ্বাস নিমেষে সমাহিত হোক ঘোর হতাশায়;
নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দি কৃচ্ছক্লিষ্ট কোনো সন্ন্যাসীর
যৎসামান্যই যেন জোটে আমার কপালে; আর
আনন্দের শত্রু যেন আমার সকল আনন্দের
স্মিতমুখ ম্লান করে দেয়, যা কিছু আমার পক্ষে
একান্ত কল্যাণকর, তাকে যেন অচিরাৎ ধ্বংস
করে দেয়; ইহকাল পরকাল সর্বত্রই যেন
আমার জীবনে বিরোধিতা বারবার হানা দেয়।

হ্যামলেট : তিনি কি এখন তার ওয়াদার বরখেলাফ করবেন?

নাটকের রাজা : জাঁকালো শপথ বটে; প্রিয়তমা, এখন আমাকে
কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও। খুব ক্লান্ত আমি, ঘুম
পাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে, ক্লান্তিকর দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই।
[ নিদ্রা ]

নাটকের রানি : দুলুক তোমার মাথা ঘুমের দোলায়,
অশুভ কিছুই যেন আমাদের মধ্যে না দাঁড়ায়। [ প্রস্থান]

হ্যামলেট : রানিমা, এ নাটক কেমন লাগছে আপনার?

রানি : আমার মনে হয়, মহিলাটি বড়ো গলায় শপথ করছেন।

হ্যামলেট : ওহ্ কিন্তু তিনি তার কথা রাখবেন।

রাজা : কাহিনিটা কি তুমি জানো? এতে রুচিবিগর্হিত ক্ষতিকর
কিছু নেই তো?

হ্যামলেট : না, না, ওরা তো শুধু অভিনয় করছে। স্রেফ তামাসা।
একটা দৃশ্যে তামাসা করেই বিষ দেবে। এ নাটকে
ক্ষতিকর কিছু থাকতে পারে না।

রাজা : এ নাটকের নাম কী?

হ্যামলেট : ইঁদুর ধরার ফাঁদ। কী পছন্দ হচ্ছে না আপনার? এটাতো রূপক মাত্র। এই নাটক ভিয়েনার এক হত্যাকাহিনির রূপায়ণ; ডিউকের নাম গঞ্জাগো আর তার স্ত্রী হলেন বাপ্তিস্তা; শিগগিরই দেখতে পারেন। এটা একটা বদিয়ারিতর কাহিনি? কিন্তু তাতে কী? আপনি মহারাজ আর আমরা যাদের বিবেক পরিষ্কার, এটা তাদের স্পর্শ করবে না। যে ঘোটকীর ঘাড় জখম হয়েছে সে কাতরে উঠুক, আমাদের ঘাড়ে কোনো জখম নেই।
[ লুসিয়ানসের প্রবেশ ] এই হল লুসিয়ানাস, ডিউকের ভাইপো।

ওফেলিয়া : আপনি তো দেখছি ব্যাখ্যানে ধুরন্ধরদের মতোই দড়।

হ্যামলেট : যদি পুতুলের কেলি দেখতে পাই, তাহলে তোমার ও তোমার প্রেমিকের ভালোবাসাবাসির ব্যাপারটাও ব্যাখ্যা করতে পারব।

ওফেলিয়া : ক্ষুরধার আপনার রসনা কুমার, ক্ষুরধার।

হ্যামলেট : আমার এই ধার ভোঁতা করতে চাইলে তোমাকে গোঙাতে হবে।

ওফেলিয়া : তা বেশ ভালোও বটে, খারাপও বটে।

হ্যামলেট : এভাবেই স্বামী-সংগ্রহ করো তোমরা —
শুরু করে দাও খুনি। জঘন্য মুখভঙ্গি ছেড়েছুড়ে শুরু করে দাও। এসো, সরাসরি শুরু করো : 'কর্কশ দাঁড়কাক প্রতিশোধের জন্যে চেঁচাচ্ছে।"

লুসিয়ানাস : নরকের মতো কালো আমার ভাবনা, দড় হাত,
যথার্থ ভেষজ দ্রব্য এবং সময় অনুকূল,
এই ঋতু ষড়যন্ত্রকারী, সাক্ষী শুধু একজন।
মধ্যরাতে সংগৃহীত গুল্ম থেকে তৈরি প্রাণঘাতী
হে বিষাক্ত রস, তিনবার হেকাটির মন্ত্রে সিদ্ধ,
তিনবার অভিশপ্ত, তোমার ভীষণ ইন্দ্রজাল,
কালান্তক শক্তি সুস্থ জীবনকে ধ্বংস করে দিক।
[ ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দেয়। ]

হ্যামলেট : তালুকের লোভে বাগানে সে ওকে বিষ দিয়েছে। গঞ্জাগো ওঁর নাম। এ কাহিনি এখানো চালু আছে। আর এটা লেখা হয়েছে চোস্ত ইতালীয় ভাষায়। একটু পরেই দেখতে পাবেন কী করে এই খুনি গঞ্জাগো-পত্নীর ভালোবাসা উসুল করছে।

ওফেলিয়া : রাজা উঠে দাঁড়িয়েছেন।

| | |
|---|---|
| হ্যামলেট | কী ব্যাপার, এ যে দেখছি ফাঁকা আওয়াজেই পিলে চমকায়? |
| রানি | কেমন বোধ করছেন, মহারাজ? |
| পলোনিয়াস | নাটক থামাও। |
| রাজা | আমাকে আলো দেখাও। চলে এসো। |
| পলোনিয়াস | আলো, আলো, আলো। |
| | [ হ্যামলেট ও হোরেশিও ব্যতীত সকলের প্রস্থান] |
| হ্যামলেট | জখমি হরিণ কাঁদুক গিয়ে ঝোপেঝাড়ে,<br>অক্ষত যে খেলুক সে তার খুশি মতো।<br>কেউ বা জাগবে, কেউ ঘুমোবে অন্ধকারে—<br>এমন চালেই দুনিয়া চলে অবিরত।<br>ভাগ্য যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে এই নাটকের পর, আমার মাথাজোড়া পালক, খসে-যাওয়া জুতোয় সাজানো দুটো ফিতের গোলাপ নিয়ে কি আমি এই যাত্রাদলের অংশীদার হতে পারব না? |
| হোরেশিও | আধখানা অংশ পেতে পারেন। |
| হ্যামলেট | আমি বলি পুরোটাই পাব।<br>কেননা তোমাকে বলছি শোনো হে প্রিয় বলরাম,<br>ধ্বংসপ্রাপ্ত এ রাজ্য ছিল একদা স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের।<br>এখন এখানে তাঁর জায়গায় রাজত্ব করে<br>জাঁকালো, অসার, পাজির পা-ঝাড়া বর্বর একজন। |
| হোরেশিও | মিল দিলেও পারতেন। |
| হ্যামলেট | প্রিয় হোরেশিও, এখন আমার কাছে প্রেতাত্মার কথার দাম লাখ টাকা। নাটকের প্রতিক্রিয়া তুমি লক্ষ করেছিলে তো? |
| হোরেশিও | ভালোভাবেই কুমার। |
| হ্যামলেট | দেখলে তো বিষ দেয়ার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কীভাবে উঠে পড়লেন? |
| হোরেশিও | আমি তাঁকে বেশ ভালো করেই লক্ষ করেছি। |
| হ্যামলেট | আহ্! এসো কিঞ্চিৎ গান-বাজনা শোনা যাক। বাদ্যকরদের আসতে বলো।<br>নাটুকে তামাসা যদি এ রাজার বাহবা না পায়,<br>নাই পাক তাতে, খোদার কসম, কীবা আসে যায়?<br>গান-বাজনা হোক। |
| | [ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ। ] |

গিল্ডেনস্টার্ন : সদাশয় প্রভু, অনুগ্রহ করে একটা কথা বলার অনুমতি দিন।

হ্যামলেট : ভদ্র, শুধু একটা কথা কেন, একটা গোটা ইতিহাস বলে যাও।

গিল্ডেনস্টার্ন : প্রভু, মহারাজ—

হ্যামলেট : হ্যাঁ, তাঁর কী হল আবার?

গিল্ডেনস্টার্ন : তিনি তাঁর কক্ষে বিশ্রাম করছেন। তাঁর মেজাজ বেশ চড়া মনে হল।

হ্যামলেট : কীসে? মদ্য পান করে?

গিল্ডেনস্টার্ন : জ্বি না প্রভু, রাগে।

হ্যামলেট : যদি তুমি ব্যাপারটা তাঁর চিকিৎসককে জানাতে তাহলে অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে, যদি আমি তাঁর রক্তমোচন করি তাহলে তার মেজাজ আরো বেশি খিচড়ে যাবে।

গিল্ডেনস্টার্ন : সদাশয় প্রভু, আপনার বক্তব্যকে বল্গাহীন করবেন না, আমার কথা শোনা মাত্রই দিশেহারা, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বেন না।

হ্যামলেট : আমি এখন পোষ মেনেছি ভদ্র। বলো, কী বলতে চাও।

গিল্ডেনস্টার্ন : মহারানি, আপনার মা, অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

হ্যামলেট : তোমাকে স্বাগত জানাই।

গিল্ডেনস্টার্ন : না, কুমার, আপনি আমাকে যে সৌজন্য দেখাচ্ছেন তা সমীচীন নয়। যদি অনুগ্রহ করে আপনি সঠিক উত্তর দেন তাহলেই আমি আপনার মাতার আজ্ঞা পালন করতে পারি; নচেৎ আপনার ক্ষমা আর আমার প্রত্যাবর্তনই হবে আমার কাজের সমাপ্তি।

হ্যামলেট : আমি পারি না।

রোজেনক্রান্‌জ : কী পারেন না যুবরাজ?

হ্যামলেট : তোমাদের যথার্থ উত্তর দিতে পারি না। আমার বুদ্ধি এখন অসুস্থ। কিন্তু ভদ্র আমি যে জবাব দিতে পারি তা তুমি কিংবা তোমার কথানুসারে আমার মাতা পেয়ে যাবেন। তাই, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সরাসরি কাজের কথা শুরু করা যাক। তুমি আমার মায়ের কথা বললে না?

রোজেনক্রান্‌জ : তিনি বলে পাঠিয়েছেন : আপনার আচরণে তিনি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত।

হ্যামলেট : বিস্ময়কর পুত্র বটে আমি, যে মাকে এমন বিস্মিত করতে পারে। মায়ের এই বিস্ময়ের পরে কি আরো কিছু আছে? বলে ফেলো।

রোজেনক্রান্‌জ : আপনি ঘুমোনোর আগে তিনি তাঁর খাস কামরায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

হ্যামলেট : তিনি যদি আমাদের মাতার চেয়ে দশগুণ বেশিও হন, তবু তাঁর কথা আমরা মান্য করব। আমাদের সঙ্গে তোমাদের আরো কোনো কাজ-কারবার আছে?

রোজেনক্রান্‌জ : কুমার, একদা আপনি আমাকে ভালোবাসতেন।

হ্যামলেট : আমার এই চোর-ছ্যাচ্চড় দুই হাতের কসম, আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি।

রোজেনক্রান্‌জ : আপনার এই অসুস্থতার কারণ কী, কুমার? যদি আপনি বন্ধুদের কাছে আপনার কষ্টের কথা না বলেন তাহলে আপনার স্বাধীনতাকেই আটক করবেন।

হ্যামলেট : ভদ্র, আমার উন্নতির পথ বন্ধ।

রোজেনক্রান্‌জ : কী করে এটা সম্ভব, যখন খোদ মহারাজ ডেনমার্কের সিংহাসনে আপনার উত্তরাধিকারের কথা ঘোষণা করেছেন?

হ্যামলেট : হ্যাঁ, ভদ্র, কিন্তু যখন গজায় ঘাস—প্রবাদটিতে কিছু ছাতা পড়ে গেছে।

[ বাদ্যযন্ত্রসহ অভিনেতাদের প্রবেশ।]

আহ বাঁশি। একটা দিন দেখি। এখানে সরে এসো। আচ্ছা বলো তো তোমরা এভাবে আমার পেছনে লেগে আছো কেন? আমাকে কি কোনো ফাঁদে ফেলতে চাও?

গিল্ডেনস্টার্ন : কর্তব্যবোধের সাহসিকতাই আমার ভালোবাসাকে এমন অশিষ্ট করেছে।

হ্যামলেট : মাথায় ঢুকল না। এই বাঁশিটা একটু বাজাবে?

গিল্ডেনস্টার্ন : আমি বাজাতে পারি না, কুমার।

হ্যামলেট : আরে বাজাওই না।

গিল্ডেনস্টার্ন : বিশ্বাস করুন, আমি বাজাতে পারি না।

হ্যামলেট : আমি মিনতি করছি, বাজাও।

গিল্ডেনস্টার্ন : বাঁশি আমি ভালো করে ধরতেই জানি না, যুবরাজ।

হ্যামলেট : এটা তো মিথ্যা কথা বলার মতোই সহজ। এই ফুটোগুলো আঙুল আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বাগ মানাবে, এখানে মুখ দিয়ে ফুঁ দেবে আর তক্ষুনি বেরিয়ে আসবে সুমধুর, সুরেলা সংগীত। দ্যাখো, এগুলো হচ্ছে ফুটো।

গিল্ডেনস্টার্ন : কিন্তু এগুলোকে বাগ মানিয়ে কোনো সুর তুলতে পারব না। সেই হিকমত আমার নেই।

হ্যামলেট : তাই, তাহলেই দ্যাখো আমাকে কী রকম নগণ্য ভাব তোমরা। তোমরা আমাকে তোমাদের খেয়ালখুশি মাফিক বাজাবে; যেন তোমরা আমার সবগুলো ফুটোই জেনে ফেলেছ। তোমরা আমার গোপন রহস্যের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে চাও, তোমরা আমাকে বাজাবে ষড়জে নিখাদে, আর এই খুদে যন্ত্রে রয়েছে প্রচুর সংগীত চমৎকার স্বর, অথচ তুমি এটা বাজাতে জানো না। পবিত্র শোণিতের শপথ, আমাকে বাজানো কি একটি বাঁশি বাজানোর চেয়েও বেশি সহজ? আমাকে যন্ত্রের নামেই ডাকো না কেন, শত নাড়াচাড়া করলেও আমাকে বাজাতে পারবে না।

[ পলোনিয়াসের প্রবেশ ]

করুণা বর্ষিত হোক আপনার ওপর, মান্যবর।

পলোনিয়াস : কুমার, মহারানি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, এখুনি।

: আপনি কি অদূরে একটা মেঘ দেখতে পাচ্ছেন যা অবিকল উটের মতো?

পলোনিয়াস : যিশুর পবিত্র নৈশ ভোজের শপথ, অবিকল উটের মতোই বটে।

হ্যামলেট : আমার মনে হচ্ছে ওটা একটা নেউলের মতো।

পলোনিয়াস : নেউলের পিঠের মতো বইকি।

হ্যামলেট : অথবা তিমির মতো?

পলোনিয়াস : হুবহু তিমির মতো।

হ্যামলেট : তাহলে আমি এক্ষুনি আমার মায়ের কাছে যাচ্ছি। (স্বগত) আমার খামখেয়ালি ওদের কাছে চরম আশকারা পাচ্ছে। আমি এখুনি যাচ্ছি।

পলোনিয়াস : তাই বলি গিয়ে। [ প্রস্থান ]

হ্যামলেট : এখুনি কথাটা বলা চলে সহজেই। বন্ধুগণ
তাহলে বিদায় বলি।

[ হ্যামলেট ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ]

এখন রাত্রির সবচেয়ে মোহিনী সময়, যবে
গির্জার প্রাঙ্গণে সব কবরের মুখ খুলে যায়,
নরক উগরে দেয়, ছড়ায় দূষিত বিষবাষ্প।
এখন আমিও পারি পান করতে উষ্ণ রক্তধারা,
এবং করতে পারি এরকম ভয়াবহ কাজ
যা দেখলে আতঙ্কিত হবে দিবালোক। ধৈর্য ধরো,
এখন মায়ের কাছে যাওয়া যাক। হে হৃদয় তুমি
হারিয়ে ফেলো না আজ প্রকৃত প্রকৃতি। যেন ঠাঁই
না পায় নীরোর আত্মা এই দৃঢ় বুকে; আমি যেন
বস্তুত নির্দয় হই, অথচ অস্বাভাবিক নয়।
তাঁর প্রতি আমার কথারা হবে শাণিত ছোরার
মতো, কিন্তু আমি করব না কখনো প্রকৃত ছোরা
ব্যবহার। এ ব্যাপারে আমার হৃদয় আর জিহ্বা
করুক ভণ্ডামি: দিই কথায় ধিক্কার তাকে শত,
কিন্তু কথা যেন কাজে কখনো না হয় পরিণত।

## তৃতীয় দৃশ্য

[ রাজা, রোজেনক্রান্‌জ আর গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ ]

রাজা : তার ভাবগতি আর আমার তেমন সুবিধের
ঠেকছে না। তার পাগলামি এমন লাগামহীন
হতে দেওয়া নিরাপদ নয় আমাদের পক্ষে, তাই
তৈরি থেক তোমরা, এখুনি আমি তৈরি করে দিচ্ছি
তোমাদের জরুরি নিয়োগনামা, তাকেও পাঠাচ্ছি
ইংল্যান্ডে তোমাদের সঙ্গে। আমাদের এ রাষ্ট্রের
পক্ষে তার পাগলামি, যা প্রতি মুহূর্তে যাচ্ছে বেড়ে,
এত কাছাকাছি থাকা কখনো কল্যাণকর নয়।

গিল্ডেনস্টার্ন : আমরা এখুনি তৈরি হচ্ছি। আপনার রাজকীয়
আশ্রয়ে নির্ভর করে বেঁচে আছে অগণিত যারা,
তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আপনার এই
আশঙ্কা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পবিত্র মানি।

রোজেনক্রান্‌জ : যে কোনো একাকি ব্যক্তিমানুষকে আত্মরক্ষা
করার তাগিদে তার মনের সকল কৌশলাদি
প্রয়োগ করতে হয়; কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি
সজাগ থাকতে হয় তাকে, যার ওপর নির্ভর
করে অগণিত মানুষের জীবন। রাজার মৃত্যু
মানে নয় শুধু একজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু,
এ মৃত্যু ঘূর্ণি স্রোতের মতো কাছের সকলকেই
করে গ্রাস। এ যেন সুউচ্চ পাহাড়ের শিখরের
একটি বিশাল চক্র যার সঙ্গে লগ্ন আরো বহু
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, সেই চক্র পড়ে গেলে পর,
তার সঙ্গে যুক্ত সব ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশও পড়ে যায়।
যখন রাজার বুক চিরে বের হয় দীর্ঘশ্বাস—
প্রজারাও আর্তনাদ করে ওঠে, আমার বিশ্বাস।

রাজা : তাহলে জানাই অনুরোধ। এ যাত্রার জন্যে খুব
তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, কেননা এখন এই
মুহূর্তেই বড়ো বেশি মুক্ত পদক্ষেপে ছুটে-যাওয়া
ভয়কে পরাতে হবে বেড়ি।

রোজেনক্রান্‌জ : আমরা তৈরি হচ্ছি দ্রুত।

[ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান। পলোনিয়াসের প্রবেশ। ]

পলোনিয়াস : প্রভু, যুবরাজ তাঁর জননীর খাস কামরায়
যাচ্ছেন এখন : আমি পর্দার আড়ালে থেকে চুপে
শুনব তাঁদের কথা; আমি সুনিশ্চিত রানি তাঁকে
খুব কড়া কথা বলবেন, আর আপনি যেমন
বলেছেন, বিচক্ষণ মানুষের যোগ্য কথা বটে,
যেহেতু মায়েরা স্নেহময়ী এবং পুত্রের প্রতি
অশেষ তাদের পক্ষপাত, তাই তাদের আলাপ
দূর থেকে অন্য কারো শোনাই অধিক দরকারি।
তাহলে বিদায় মহারাজ, আপনার ঘুমোবার
আগে ফের মোলাকাত করব আর যা যা শুনলাম
সঠিক জানিয়ে যাব।

রাজা : ধন্যবাদ, প্রিয় মান্যবর [ পলোনিয়াসের প্রস্থান ]
জঘন্য আমার পাপ, স্বর্গকেও স্পর্শ করে এর
দুর্গন্ধ; জড়িত এতে আদিতম পাপ, ভ্রাতৃহত্যা
যদিও ইচ্ছা ও প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল তবু
প্রার্থনায় অপারগ আমি; এখানো আমার পাপ
বেশি শক্তিধর, তাই দৃঢ় সংকল্পের পরাজয়
ঘটে আর পরস্পর বিরোধী কর্মের মুখোমুখি
মানুষের মতো আমি কোত্থেকে করব শুরু ভেবে
দ্বিধাদীর্ণ, পরিণামে দুটোকেই করি অবহেলা।
আমার এ অভিশপ্ত হাত যদি ভ্রাতৃরক্তে আরো
পুরু হয়ে থাকে, তবে আকাশে কি এমন মধুর
বৃষ্টিধারা নেই যাতে একে ধুয়ে তুষারসফেদ
করে দেবে? পাপের মূর্তির মুখোমুখি না দাঁড়ালে
করুণার সার্থকতা কোথায় এবং পতনের
আগে যদি সেটা রোধ করা না যায় অথবা যদি
পতনের পরে ক্ষমা সম্ভব না হয়, এই দুটি
ক্ষমতা ব্যতীত প্রার্থনার আর কী থাকতে পারে?
তাহলে তাকাতে পারি ঊর্ধ্বলোকে। আমার পাপ তো
অতীতের ব্যাপার; জানি না কী রকম প্রার্থনায়
আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। আমার জঘন্য
হত্যাপরাধ ক্ষমা করো — আমি কি বলব এটা?
আমার উদ্দেশ্য এতে হবে না সফল এতটুকু;

কেননা যে কারণে করেছি হত্যা, তার ফলগুলো
উপভোগ করছি এখনো — এই মুকুট আমার,
আমার উচ্চাভিলাষ, এবং আমার প্রিয় রানি।
পাপের সুফল ভোগ করেও কি পাওয়া যায় ক্ষমা?
এই জগতের দুর্নীতির খরস্রোতে অপরাধ
তার নিজ গিল্টি-করা সোনালি হাতের মহিমায়
ন্যায়বিচারকে ফাঁকি দিতে পারে আর প্রায়শই
দেখা যায়, আইনের সাজা খুব সহজে বিকোয়
বস্তুত পাপের ধনে। কিন্তু স্বর্গলোকে ব্যাপারটা
আলাদা, সেখানে সব চালাকি অচল, সেখানে তো
প্রতি কর্ম প্রকাশিত প্রকৃত স্বরূপে, আর আমরা
আমাদের পাপের সকল খুঁটিনাটি বিবরণ
তুলে ধরে আমাদের নিজেরদের বিপক্ষে সঠিক
সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হই। তাহলে কী করি আমি? তবে
কী রইল বাকি? দেখব কি অনুতাপে কিবা ফল
লাভ হয়? এমন কিছু কি আছে জগত সংসারে
অলভ্য যা অনুতাপে? কিন্তু যদি কেউ অনুতাপ
করতে না পারে, তবে? হায়, পড়েছি কী দুর্বিপাকে।
মৃত্যুর মতোই ঘোর অন্ধকার অন্তর আমার,
হায় ফাঁদে-পড়া আত্মা আমার সতত মুক্তিকামী,
অথচ কেবলি যাচ্ছে ভীষণ জড়িয়ে। দেবকুল,
আমার সহায় হও, এবং সচেষ্ট হও মুক্ত
করতে আমাকে; নত হও দুর্বিনীত জানুদ্বয়।
হৃদয় তোমার ইস্পাতের মতো তন্তুগুলি হোক
নমনীয় নবজাতকের কোমল পেশির মতো।
শুভ হোক সব।
[ রাজা নতজানু হন, হ্যামলেটের প্রবেশ ]

হ্যামলেট : এখুনি আঘাত হানবার যথার্থ সময় বটে,
এখন সে প্রার্থনায় রত আর এ মুহূর্তে আমি
আঘাত হানতে পারি।
[ অসি কোষমুক্ত করে]
তাহলে সে যাবে স্বর্গলোকে;
এবং আমার প্রতিশোধ নেয়া হবে। ব্যাপারটি
ভালো করে ভেবে দেখা যাক — আমার পিতাকে
হত্যা করেছে দুরাত্মা এক, সেই হেতু আমি, একমাত্র

পুত্র তাঁর সেই দুর্জনকে স্বর্গলোকে পাঠালাম।
না, এটা তো
ভাড়াটে, বেতনভুক মানুষের কাজ, প্রতিশোধ
বলে না কখনো একে। হেনেছে সে আমার পিতাকে
স্থূলভাবে, যখন ছিলেন তিনি আহারে বিহারে
তৃপ্ত অতিশয় আর তাঁর পাপ-সমুদয় ছিল
বসন্তের পুষ্প বিকাশের মতো; হিসেবনিকেশ
তাঁর কে রাখতে পারে দেবতা ব্যতীত? আমাদের
ধারণা ও চিন্তাধারা বলে, তাঁর সেই হিসেবের
বোঝা ছিলো বেশ ভারি। আত্মশুদ্ধিরত সে যখন
এবং প্রস্তুত স্বর্গযাত্রার উদ্দেশ্যে যোগ্য পাথেয় সমেত,
তখন করলে হত্যা তাকে তৃপ্ত হবে কি আমার
প্রতিশোধ? না, কখনো নয়।
ফিরে এসো তরবারি; আরো ভয়ংকর মুহূর্তের
অপেক্ষায় থাকো, যখন সে কড়া মদে চুর হয়ে
ঘুমোবে বেঘোরে কিংবা রাগে ফেটে পড়বে অথবা
শয্যায় উঠবে মেতে অজাচারে, জুয়ায় মজবে,
কিংবা অধর্মের বাক্য উচ্চারণে হবে সে তৎপর,
অথবা এমন কাজে লিপ্ত হবে যাতে নেই তার
আত্মার মুক্তির কোনো সম্ভাবনা, তখনই আঘাত
হোনো তাকে, যাতে তার পায়ের গোড়ালি উঁচু হয়ে
থাকে বেহেশতের দিকে আর দোজখের মতো কালো,
আর কদাকার আত্মা জাহান্নামে সোজা চলে যায়।
মা অপেক্ষা করেছেন, এই পরিত্রাণ, মনে হয়,
তোমার যন্ত্রণাকেই দীর্ঘায়িত করবে নিশ্চয়।

[প্রস্থান]

রাজা : আমার কথারা ঊর্ধ্বে উড়ে যায়, চিন্তা থাকে পড়ে
নীচে, অনান্তরিক প্রার্থনা পৌঁছয় না স্বর্গদোরে।

## চতুর্থ দৃশ্য

[ রানি ও পলোনিয়াসের প্রবেশ ]

পলোনিয়াস : উনি সোজাসুজি এখানেই চলে আসছেন। তাঁকে
সাফ বলে দিন তাঁর রঙ্গতামাসার মাত্রা ঠিক
সহ্যের বাইরে চলে গেছে। আপনি অনেক কষ্টে
কুমারকে রাগের উত্তাপ থেকে রক্ষা করেছেন।
এখানে খামোশ আমি থাকব, আমার অনুরোধ
স্পষ্ট করে বলবেন সব।

রানি : কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে
উদ্বেগের কিছু নেই; আপনি আসুন, ঐ তার
পায়ের আওয়াজ শোনা যায়।
[ পলোনিয়াস পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। ]
[ হ্যামলেটের প্রবেশ ]

হ্যামলেট এবার বলুন মাতা, কী ব্যাপার?

রানি তোমার পিতাকে তুমি বড়ো বেশি বিক্ষুব্ধ করেছো।

হ্যামলেট আমার পিতাকে তুমি বড় বেশি বিক্ষুব্ধ করেছো।

রানি থাম থাম, তুই যা তা কথা বলছিস।

হ্যামলেট রাখো রাখো তোমার সওয়াল ভারি নোংরা।

রানি বলতো কী হলো তোর, হ্যামলেট?

হ্যামলেট কী হবে আমার?

রানি তুই কি আমাকে ভুলে গিয়েছিস?

হ্যামলেট ক্রুশের কসম,
মোটেও ভুলিনি; তুমি হলে রানি, তোমার স্বামীর
সহোদর ভ্রাতার সাক্ষাৎ পত্নী, তা যদি না হত —
আমার জননী তুমি।

রানি : না, না, এরকম করো যদি তাহলে তাদের আমি
মোতায়েন করব, যাদের সঙ্গো ভালো করে কথা বলবে
তুমি।

হ্যামলেট : থাক, থাক, বসে পড়ো, একটুও নড়বে না তুমি,
যতক্ষণ না তোমার সামনে তুলে ধরছি আয়না,
ততক্ষণ তুমি যেতে পাবে না, — এ আয়নায় আমি
তোমার ভেতরকার রূপ দেখাব তোমাকে।

রানি : কী করবি? আমাকে কি খুন করে ফেলবি? কে আছ? বাঁচাও আমাকে।

পলোনিয়াস : [ পর্দার আড়াল থেকে ] কী হল, কী? বাঁচাও বাঁচাও।

হ্যামলেট : কী ওটা? ইঁদুর নাকি। মরবে সে, এক মোহরের বাজি, ওটা মরবে নির্ঘাৎ।

[ পর্দার ভেতর দিয়ে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেয়। ]

পলোনিয়াস : [ পেছন থেকে ] হায় আমি নিহত হলাম।

রানি : হায়, হায়, এ কী করলে তুমি?

হ্যামলেট : সেতো কিছুই জানি না।
মহারাজ নাকি। [ পর্দা তুলে মৃত পলোনিয়াসকে দ্যাখে। ]

রানি : হায়, কী ভীষণ হঠকারী আর খুনোখুনি কাণ্ড।

হ্যামলেট : খুনোখুনি কাণ্ড বললে না? রাজাকে খতম করে তার সহোদরকে বিবাহ করবার মতো ঠিক তেমন খারাপ কাজ? তাই না মা?

রানী : রাজাকে খতম করা?

হ্যামলেট : হ্যাঁ ভদ্রে, আমারই কথা এটা—
হে বদনসিব, হঠকারী, সব ব্যাপারেই নাক —
গলানো বুড়বক বুড়ো, বিদায়, তোমার জায়গায়
তোমার উপরআলা আছে ভেবেছিলাম, এখন
তোমার নসিবকেই মেনে নাও : অতি তড়বড়ি
কী রকম বিপজ্জনক, টের পেয়েছো তো? হাত
কচলানি থামাও এবার। শান্ত হয়ে বসো তুমি,
এসো মুচড়ে দিই আমি তোমার হৃদয়, আমি তাই
করব যদি তা ভেদ করা যায়, যদি তা জঘন্য
অভ্যাসের ফলে, অতিশয় শক্ত অনুভূতিহীন
এখনো হয়ে না থাকে।

রানি : কী আমি করেছি যার জন্যে তুই এরকম রূঢ় কর্কশ ভাষায় কথা বলছিস?

হ্যামলেট : করেছো এমন
কাজ, যা নিমেষে শালীনতার সুষমা, মধুরতা
মুছে ফেলে, ধর্মকে কপট বলে, নিষ্পাপ প্রেমের
সুন্দর ললাট থেকে গোলাপ উপড়ে নেয়, আর
সেখানে জ্বলন্ত দাগ বানায় এবং বিবাহের
শপথকে জুয়াড়ির অসার শপথ করে দেয়।

হায়, এরকম কাজ বিবাহের পবিত্র চুক্তির
সারসত্য ধ্বংস করে ফেলে, মধুর ধর্মকে শুধু
ফাঁকা সব শব্দের ঝংকারে পরিণত করে আর
আকাশের মুখ রাগে লাল হয়ে যায় আর এটা
এরকম কাজ যা কঠিন ঘনসন্নিবিষ্ট পৃথিবীকে শেষ
বিচারের দিনটির ভাবনায় বিমর্ষ ফ্যাকাশে
করে তোলে।

রানি : হায়, এমন কী কাজ যার ভূমিকায়
এরকম বিকট গর্জন আর বজ্রের নিনাদ শোনা যায়?

হ্যামলেট : তাহলে তাকাও এই ছবিটির দিকে, আর দ্যাখো
এটা; দুই ভায়ের যুগল প্রতিকৃতি। দ্যাখো এই
ভুরুতে কেমন সৌন্দর্যের ছটা, সূর্যদেবতার
কুঞ্চিত কেশের ঘটা, দেবরাজ ইন্দ্রের ললাট,
কার্তিকের রাজসিক চোখ, যা দেখায় ভয় আর
বাধ্যতা আদায় করে, দেবতুল্য কী ক্ষিপ্র ভঙ্গিমা
শরীরের, যেন তিনি দাঁড়ানো আকাশচুম্বী ঐ
পাহাড়ে হেলান দিয়ে। যেন সব দেব-দেবতার
অংশ দিয়ে গঠিত শরীর তাঁর : এই জগতের
আদর্শ পুরুষ এক। ইনিই ছিলেন আপনার
স্বামী, আর চেয়ে দ্যাখো, এ তোমার বর্তমান স্বামী;
রোগগ্রস্ত শস্যের শিষের মতো দেখতে সে, তার
সুস্থকায় ভাইকে করেছে গ্রাস। খেয়েছো চোখের
মাথা? তুমি কী করে অমন অপরূপ পাহাড়ের
কোল ছেড়ে এসেছো পঙ্কিল জলাশয়ে খুঁটে খেতে,
পুষ্ট হতে? তোমার কি চোখ আছে বাস্তবিক? তুমি
একে প্রেম বলতে পরো না ঠিক, কেননা তোমার
এ বয়সে রক্ত তার আথালি পাথালি ভুলে যায়,
শান্ত হয়ে মেনে চলে যুক্তি বিবেচনা,; আর কী সে
যুক্তি এটা ছেড়ে ওটা বেছে নিতে বলে? অনুভূতি
তোমার নিশ্চয় আছে, নইলে পারতে না আবেগের
প্রকাশ ঘটাতে; কিন্তু সেই অনুভূতি পক্ষাঘাতে
স্থবির নিশ্চয় : উন্মাদনাতেও এমন প্রমাদ
ঘটে না কখনো; উন্মাদনায় বিস্তৃত অনুভূতি
ক্রীতদাস নয়; এ রকম পার্থক্যের মধ্যে থেকে
কিছু নির্বাচন করবার ক্ষমতা বজায় রাখে।

কী রকম শয়তানের পাল্লায় তোমাকে কানামাছি
খেলায় বিকিয়ে দিতে হল নিজেকে? এবং
অনুভূতিহীন দৃষ্টি, দৃষ্টিহীন অনভূতি আর
স্পর্শহীন দৃষ্টিহীন শ্রুতি; সব ছাড়া ঘ্রাণ
অথবা প্রকৃত কোনো ইন্দ্রিয়ের রোগকবলিত
অংশও এরকম বিভ্রম ঘটাতে পারত না জানি।
হায় লজ্জা, কোথায় লুকালো বলো তোমার লালিমা?
বিদ্রোহী নরক,
যদি তুই বয়সিনী মহিলার শরীরে বিদ্রোহ
করতে পারিস তবে লেলিহান যৌবনের তাপে
পুণ্য হোক গলন্ত মোমের মতো, যাক, গলে যাক
নিজেরই আগুনে। যদি তুষারেও চকিতে আগুন
জ্বলে ওঠে, যদি যুক্তি দূতিয়ালি করে কামনার,
তাহলে যৌবন লেলিহান হয়ে উঠলে, অপবাদ
দেয়া তাকে সাজে না কখনো।

রানি : ওরে হ্যামলেট, তুই
আর কিছু বলিস না। আমার দৃষ্টিকে দিয়েছিস
ঘুরিয়ে আমার মর্মমূলে, আর সেখানে দেখছি
এমন জঘন্য ঘন কালো দাগ, যাদের কলঙ্ক
ঘুচবে না কোনোদিন।

হ্যামলেট : না, না, থাকো তুমি ব্যাভিচারে
স্বেদাক্ত পঙ্কিল বিছানায়, নষ্টামিতে টগবগে,
শুয়োরের কদর্য খোঁয়াড়ে মেতে থাকো সুমধুর
প্রিয় সম্ভাষণে আর ক্লেদাক্ত সঙ্গমে।

রানি : বলিস না।
আর, তোর এই কথা শাণিত ছোরার মতো এসে
বিঁধছে আমার কানে। প্রিয় হ্যামলেট, বলিস না
কিছু আর, হে বাছা আমার।

হ্যামলেট : খুনি আর দুরাচার,
ক্রীতদাস যোগ্যতায় যে তোমার প্রাক্তন স্বামীর
দুই শতাংশও নয়; রাজা নামের কলঙ্ক এক,
সাক্ষাৎ পকেটমার, রাজ্য ও শাসনভার দুই-ই
দামি মুকুটের মতো চুরি করে রেখেছে পকেটে —

রানি : আর নয়।

হ্যামলেট : ছেঁড়াখোঁড়া তালি-দেওয়া পোশাকের নটবর রাজা —

[ প্রেতাত্মার প্রবেশ। ]

হে স্বর্গলোকের প্রহরীরা আমাকে বাঁচাও আর তোমাদের পাখা দিয়ে ঢেকে রাখো আমাকে। মহান আত্মা, আপনি কী চান?

রানি : হায়, সে উন্মাদ হয়ে গেছে।

হ্যামলেট : আপনি কি আপনার এ মন্থরমতি পুত্রটিকে তিরস্কার করতে এসেছেন, যে শুধু নিষ্ক্রিয় থেকে বৃথা কালক্ষেপ করে আপনার ভীষণ আদেশ পালনে হয়েছে ব্যর্থ? বলুন।

প্রেতাত্মা : যেও না ভুলে, ভোঁতা হয়ে-যাওয়া লক্ষ্যকে তোমার ফের শাণিত করার উদ্দেশ্যে আমার এই আবির্ভাব। দ্যাখো, তোমার মা বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তার আর তার অনুতাপ দীর্ণ অন্তরের মাঝখানে এসে দাঁড়াও; দুর্বল যারা সবচেয়ে বেশি তারাই তো সহজে শিকার হয় ভয়ংকর কল্পনার। বলো হ্যামলেট, তার সঙ্গে কথা বলো।

হ্যামলেট : রানিমা কী হল আপনার?

রানী : হায়, তোমার কী হল যে তোমার দৃষ্টি এরকম শূন্য? আর অশরীরী বাতাসের সঙ্গে কেন মিছেমিছি করছো আলাপ? তোমার দু'চোখ দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সবিস্ময়ে বন্যতা এবং শুনে বিপদ সংকেত ঘুম থেকে জেগে উঠে যেমন সেনারা, তেমনি দাঁড়িয়ে পড়েছে তোমার বিন্যস্ত চুল, প্রিয় পুত্র, তোমার তাপিত উদ্‌ভ্রান্তির ওপর ছিটিয়ে দাও ধৈর্যের সুস্নিগ্ধ জল, ওরে বল তুই তাকাচ্ছিস কোন দিকে?

হ্যামলেট : তাঁর দিকে, তাঁর দিকে। দ্যাখো তিনি কেমন ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। তাঁর আকৃতি এবং উদ্দেশ্য উভয়ে মিলে নিরেট পাথরকেও পারে করতে অনুভূতিময়। এরকমভাবে তাকিও না রানিমা আমার দিকে, পাছে তোমার করুণ দৃষ্টি আমার কঠোর উদ্দেশ্যকে নিমেষে গলিয়ে দেয়। তাহলে আমার কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে; রক্তের বদলে আমি শুধু ঝরাব চোখের পানি।

রানি : কার সঙ্গে বলছিস কথা?

হ্যামলেট : তুমি কি ওখানটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছো না?

রানি : কিছুই না। শুধু যা রয়েছে তা-ই দেখেছি সেখানে।

হ্যামলেট : কিংবা কোনো কথাবার্তা শুনতে পাওনি?

রানি : আমাদের নিজেদের কথা ছাড়া কিছুই শুনিনি।

হ্যামলেট : সেকি, দ্যাখো তিনি কী রকম চুপিসারে হেঁটে চলে
যাচ্ছেন আমার পিতা, তিনি বেঁচে থাকতে প্রায়শ
যে পোশাক পরতেন সেই বেশে এখনো যাচ্ছেন।
ফটক পেরিয়ে।

[ প্রেতাত্মার প্রস্থান ]

রানি : এ তোমার মস্তিষ্কের আবিষ্কার ছাড়া কিছু নয়।
পাগলামি এ রকম বিভ্রমপ্রবণ হয়ে ওঠে।

হ্যামলেট : তোমার মতোই নাড়ি আমার চলছে স্বাভাবিক
তালে-লয়ে, আর এটা সুস্বাস্থ্যের সংগীত নিশ্চয়।
যা বলেছি কখনো তা নয় উন্মাদের উচ্চারণ,
আমার পরীক্ষা নাও, আমি ফের আগের মতোই
হুবহু সেসব কথা বলে যাব, যা কখনো সাধ্যে
কুলোব না উন্মাদের। ঈশ্বরের করুণা তোমার
প্রিয় হলে এ বলে আত্মাকে তুমি করো না তোষণ
যে, তোমার অধঃপাত নয়, আমার উন্মত্ততাই
আমাকে বলাচ্ছে কথা এই মতো। এ সান্ত্বনা শুধু
তোমার আত্মার জখমকে ওপরে ওপরে কিছু
বুলোবে প্রলেপ, কিন্তু নীচে নীচে থাকবে সক্রিয়,
সংক্রমণ, ফুটে দিয়ে ছড়াবে অদৃশ্যভাবে বিষ।
কবুল করুন পাপ ঈশ্বরের কাছে, যা ঘটেছে
তার জন্যে অনুতাপ করুন, এড়িয়ে যান পাপ
আগামীর, আর আগাছায় ছিটিয়ে বিমিশ্র সার
ওদের জঘন্যতর করবেন না। এই ধর্মকথা
শোনানোর জন্যে ক্ষমা করুন আমাকে। কেননা এ
অনাচারময় স্থূল কালে ধর্মেরই তো অধর্মের
কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়, নতজানু হয়ে তার
মঙ্গলের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়।

রানি : হায় হ্যামলেট, তুই আমার হৃদয়টাকে কেটে
দু'টুকরো করে ফেলেছিস।

হ্যামলেট : মন্দতর অংশটিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিন আর
শুধু শ্রেয়তর অংশটিকে নিয়ে নিষ্পাপ জীবন
যাপন করুন। শুভরাত্রি, কিন্তু আমার কাকার

বিছানায় যাবেন না। যদি পুণ্যবতী না-ও হন,
অন্তত করুন ভান। প্রথা হল একটি দানব,
যা ইন্দ্রিয়চেতনাকে করে ক্ষয়, অভ্যাসে সাক্ষাৎ
শয়তান, কিন্তু এ ব্যাপারে যেন দেবদূত, শুভ
আর সদাচরণকে সাজায় ধর্মের যোগ্য সাজে।
আজ রাতে সংযত থাকুন, তাতে পরের না-যাওয়া
অনেক সহজ হবে, তারপর হবে আরো বেশি
সহজ; কেননা অভ্যাসের ফলে স্বভাব বদলে
যায় পুরোপুরিভাবে এবং আশ্চর্য শক্তি বলে
হয় শয়তানকে বাগ মানায় নয়তো দূরে ছুঁড়ে
ফেলে দেয়। তাহলে আবার বলি শুভরাত্রি, আর
যখন আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ করবেন
কামনা, তখন আমি আপনার কাছে আশীর্বাদ
চেয়ে নেব। এ অমাত্য প্রবরের জন্যে অনুতাপ
হচ্ছে; কিন্তু এতো হল বিধিরই বিধান — একে দিয়ে
আমাকে এবং অন্যদিকে আমাকে দিয়েই একে
শাস্তি দান; যেন আমি এক ঐশ্বরিক দণ্ডধর।
আমি তার হিল্লে করে দেব কোথাও এবং
মেনে নেব এ মৃত্যুর পরিণাম, যা ঘটেছে আমারই
হাতে; তাই পুনরায় বলি শুভরাত্রি, হতে হবে
নির্দয় আমাকে শুধু সদয় হবার জন্যে। শুরু
হল অশুভের খেলা এবং অধিকতর কোনো
অশুভের পালা রয়ে গেছে বাকি, ভদ্রে আরেকটি
কথা বলবার আছে আপনাকে।

রানি : কী করব আমি?

হ্যামলেট : আপনাকে যা করতে বলছি তা নয়, কিছুতেই
নয়; মদে চুর হয়ে আপনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে
রাজা ফের বিছানায় নিয়ে যাক, আপনার গালে
বুলাক আদর লালসার। ডাকুক ময়না বলে,
আর তার একটি কি দুটি নোংরা চুমো দিয়ে কিংবা
আপনার গলায় বুলিয়ে তার নারকী আঙুল
আপনার মুখ থেকে বের করে নিক এ কথা যে,
আদতে উন্মাদ নই আমি, এই উন্মত্ততা শুধু
আমার কৌশল মাত্র। অবশ্য ভালোই হত তাকে
ব্যাপারটা জানাতে দিলে; কেননা এমন একজন
সুন্দরী, প্রশান্ত বিজ্ঞ রানি কি পারেন এইসব

প্রিয় কৌতূহল-উদ্দীপক কথা একটি বাদুড়,
এই কোলাব্যাং আর হুলো বেড়ালের কাছ থেকে
লুকিয়ে রাখতে? এরকম করবেই বা কে? না, না,
কাণ্ডজ্ঞান আর গোপনতা বিসর্জন দিয়ে, ছাদে
নিয়ে ঝুড়ি খুলে দিন ঝাঁপি, পাখিগুলি উড়ে যাক,
আর সেই নামজাদা বনমানুষের মতো স্রেফ
পরীক্ষা করতে গিয়ে ঝুড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে
লাফিয়ে পড়ুন ছাদ থেকে, ভাঙুন নিজের ঘাড়।

রানি : নিশ্চিন্ত থাকিস তুই, শব্দ যদি তৈরি হয়ে থাকে
নিশ্বাসের হাওয়া দিয়ে এবং নিশ্বাস প্রাণ দিয়ে,
তাহলে আমার প্রাণ থাকতে কখনো বলব না
তোর এইসব কথা।

হ্যামলেট : আমাকে ইংল্যান্ডে যেতে হবে। আপনি কি তা
জানেন?

রানি : হায়, আমি ভুলে গেছি। এরকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হ্যামলেট : চিঠিপত্র হয়েছে মোহরাঙ্কিত, আমার দু'জন
সহপাঠী, যাদের এখন আমি দুটি বিষধর
সাপের মতোই করি বিশ্বাস, তারাই সনদ
করবে বহন, অবশ্যই ওরা পথ সাফ করে
আমাকে নিশ্চিত পৌঁছে দেবে বজ্জাতির আস্তানায়।
তাই হোক; কারণ মজার খেলা হল, বিস্ফোরণে
কারিগর নিজেই গোলার সঙ্গে উড়ে গিয়ে যদি
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়, কিন্তু আমি ওদের বিস্ফোরকের
আর দুই হাত নীচে মাটি খুঁড়ে রেখে দেব আর
ওদের উড়িয়ে দেব চাঁদে। আহ্, যুগল চক্রান্ত
যখন মিলিত হয় একটি বিন্দুতে তখন তা
কী মধুর মনে হয়। এই ভদ্রলোকের জন্যেই
যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে আগেভাগে। এ মাংসের
ঢেলা আমি পাশের ঘরেই টেনে নেব। শুভরাত্রি
মাতা; এই অমাত্য প্রবর বড়ো বেশি স্থির, বড়ো
সংযত, গম্ভীর, ধীর। অথচ যখন তিনি বেঁচে
ছিলেন তখন তিনি ছিলেন নেহাত বুড়বক
হড়হড়ে প্রতারক। এই যে আসুন মহোদয়,
আপনার একটা হিল্লে করি'খন; শুভরাত্রি, মাতা।

[ পলোনিয়াসকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে হ্যামলেটের
প্রস্থান। রানি থেকে যান। ]

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ রাজা, রানি, রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ।]

রাজা : যথেষ্ট তাৎপর্য আছে এ দীর্ঘশ্বাসের, এইসব
গভীর হৃদয় বেদনার; এর অর্থ ব্যাখ্যা করো,
আমাদের বোঝা দরকার; কোথায় তোমার পুত্র?

রানি : কিছুটা সময় আমাদের একলা থাকতে দাও।

[ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান।]

আহ্ মহারাজ, আজ রাতে আমি একি দেখলাম।
কে অধিক শক্তিধর তা দেখার জন্যে যে-রকম
উন্মাদনা পেয়ে বসে সমুদ্র ও বাতাসকে, তেমনি
উন্মত্ত হয়ে সে তার উচ্ছৃংখল আচরণে মেতে
পর্দার আড়ালে তরবারি তখুনি চালিয়ে দিয়ে
ইঁদুর ইঁদুর বলে চেঁচিয়ে উঠল, মস্তিষ্কের
নাছোড় অসুস্থ কল্পনায় বুড়ো ভালো মানুষকে
খুন করে ফেলল।

রাজা : হায়, কী ভীষণ ভয়াবহ কাজ।
ওখানে থাকলে আমি আমারও তো একই দশা হত।
তার ঐ অবাধ গতিবিধি সকলের পক্ষে এক
বিরাট হুমকি হয়ে উঠেছে, তোমার পক্ষে আর
আমাদের পক্ষে, প্রত্যেকের পক্ষে হায়, এই
হত্যার জবাবদিহি কে করবে? এই অপরাধ
আমাদের ওপর চাপানো হবে। কেননা উচিত
ছিল আমাদেরই দূরদৃষ্টি খাটিয়ে উন্মাদ এই
যুবাকে আটকে রাখা, সবার নাগাল থেকে দূরে
রাখা; কিন্তু আমাদের ভালোবাসা এমনই প্রবল,
আমরা বুঝিনি কী কর্তব্য আমাদের, নোংরা রোগে,
আক্রান্ত লোকের মতো রোগের কথাটা চেপে রেখে
ক্ষইয়ে দিয়েছি শুধু জীবনীশক্তিকে। কোথায় সে?

রানি : যাকে সে করেছে খুন তার লাশ সরাতে তৎপর,
আর সেই লাশের উপর তার উন্মত্ততা যেন
অসার ধাতুর খনিজের মধ্যে আকরের মতো
ভাস্বর পবিত্রতায়। নিজের কৃতকর্মের জন্যে
সে কাঁদছে।

রাজা : হায় গারট্রুড, চলে এসো।
পর্বতচূড়াকে সূর্যরশ্মি স্পর্শ করার আগেই
আমরা ওকে জাহাজে চাপিয়ে দেব, আর এই পাপ
কাজটিকে আমাদের রাজকীয় মর্যাদা এবং
শক্তি নিয়ে মেনে নেব, ঢেকে দেব সব অপরাধ।
কই হে গিল্ডেনস্টার্ন?

[ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ]

ক'জন মদতগার সঙ্গী নিয়ে তোমরা দু'জন
চলে যাও; হ্যামলেট তার প্রচণ্ড উন্মত্ততায়
পলোনিয়াসকে খুন করে ওর মায়ের কামরা
থেকে টেনে হিঁচড়ে করেছে বের। যাও, ওকে খুঁজে
বের কর — ভালোভাবে কথা বোলো — আর
লাশটিকে জলদি ভজনালয়ে নিয়ে এসো, আমার
একান্ত অনুরোধ, এ ব্যাপারে বিলম্ব করো না।

[ রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান।]

এসো গারট্রুড, আমাদের বিজ্ঞতম বন্ধুদের
ডাকা যাক, তাঁদের জানিয়ে দিই, কী আমরা করতে
চাই, আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অসময়ে।
তাহলো হয়তো যে অপবাদ কামানোর ধাবমান
গোলার মতোই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য
প্রান্তে ছোটে, করে লক্ষ্যভেদ, লাগবে না আমাদের
গায়ে, শুধু অভেদ্য হাওয়ায় হেনে নিষ্ফল আঘাত
ফিরে যাবে। চলে এসো, আমার হৃদয় আজ, হায়,
বড়োই বেতালা, আমি আচ্ছন্ন উদ্বেগে, হতাশায়।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ হ্যামলেটের প্রবেশ]

হ্যামলেট : অন্তত নির্বিঘ্নে ওটা সরানো গিয়েছে।

[ নেপথ্যে কেউ ডাকছে। ]

কিন্তু চুপ, এ কীসের গোলমাল? কে হ্যামলেটকে
নাম ধরে ডাকে? আহ্, এই যে আসছে ওরা।

[ রোজেনক্রান্‌জ, গিল্ডেনস্টার্ন এবং অন্যান্যদের প্রবেশ।]

রোজেনক্রান্‌জ : মৃতদেহ নিয়ে কী করেছেন কুমার?

হ্যামলেট : মিশেয় দিয়েছি ওটা ধুলায়, কেননা আত্মীয়তা
আছে তার ধুলোর সঙ্গেই।

রোজেনক্রান্‌জ : বলুন কোথায় লাশ, আমরা সেখান থেকে ওটা
উপাসনালয়ে নিয়ে যাব।

হ্যামলেট : বিশ্বাস করো না।

রোজেনক্রান্‌জ : কী বিশ্বাস করব না?

হ্যামলেট : একথা যে আমি তোমাদের কথা গোপন রাখতে
পারি আর নিজেরটা পারি না। তাছাড়া একটা
স্পঞ্জ প্রশ্ন করলে একজন রাজপুত্রের কী জবাব
হওয়া সমীচীন?

রোজেনক্রান্‌জ : কুমার, আপনি আমাকে স্পঞ্জ বলছেন?

হ্যামলেট : জ্বি জনাব, ওটা শুষে নেয় রাজার অনুগ্রহ দয়াদাক্ষিণ্য, ইনাম
আর কর্তৃত্ব। কিন্তু এ ধরনের কর্মচারী আখেরে রাজার খুব
কাজে আসে; বনমানুষের মতো তিনি ওদের চোয়ালের
এক ধারে রেখে দেন, প্রথমে মুখে পোরেন এবং শেষে
গিলে ফেলেন। তুমি যা সংগ্রহ করেছো তা ওঁর প্রয়োজন
হলেই তিনি তোমাকে নিংড়ে বের করে দেবেন, তারপর
স্পঞ্জ তুমি আবার শুকনো, ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

রোজেনক্রান্‌জ : আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, কুমার।

হ্যামলেট : শুনে প্রীত হলাম। চালাক কথা আহাম্মকের কানে ঘুমে ঢলে
পড়ে :

রোজেনক্রান্‌জ : যুবরাজ, আপনাকে বলতেই হবে মৃতদেহ কোথায়, আর
আমাদের সঙ্গে রাজার কাছে যেতে হবে।

হ্যামলেট : দেহ আছে রাজার কাছে. কিন্তু রাজা নেই দেহে। রাজা তো
একটা চিজ —

গিল্ডেনস্টার্ন : চিজ বলেছেন, কুমার?

হ্যামলেট : একেবারে ফাঁকা। তার কাছে নিয়ে চলো।

[ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ রাজা এবং দু'তিনজন অমাত্যের প্রবেশ]

রাজা : আমি ওকে আর লাশটাকে খুঁজে বের করবার
জন্যে লোক পাঠিয়েছি। এতো খুবই বিপদের কথা,
এ রকম লোক বাধাবন্ধহীন চলাফেরা করে।
তবু তার ওপর রাষ্ট্রের কড়া আইন-কানুন
যাবে না প্রয়োগ করা : মূঢ় জনগণ ভালোবাসে
ওকে; তারা কখনো বিচারবুদ্ধি দিয়ে নয়, শুধু
দৃষ্টি দিয়ে ভালোবাসে। যেখানে ব্যাপার এরকম,
সেখানে অপরাধীর দণ্ডটাই মাপা হয় বেশি
করে, কিন্তু তার অপরাধ নয়। সবকিছু বেশ
সহজ স্বচ্ছন্দ করতে হলে তার এই আকস্মিক
বিদেশযাত্রাকে ধীর, সুচিন্তিত বিরতি হিসেবে
দেখানো দরকার; রোগ চরম আকার নিলে তার
নিরাময় চরম ওষুধে হয়, নয়তো সেই রোগ
সারে না কস্মিনকালে।

[ রোজেনক্রান্‌জ, গিল্ডেনস্টার্ন এবং অন্যান্যদের
প্রবেশ।]

কী ব্যাপার? কী ঘটেছে, বলো?

রোজেনক্রান্‌জ : প্রভু, মৃতদেহ তিনি কোথায় সরিয়ে রেখেছেন,
তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতে পারিনি।

রাজা : সে কোথায়?

রোজেনক্রান্‌জ : বাইরে প্রহরাধীন তিনি, আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়
রয়েছেন, প্রভু।

রাজা : আমার সামনে নিয়ে এসো।

রোজেনক্রান্‌জ : কুমারকে নিয়ে এসো

[ হ্যামলেট ও প্রহরীর প্রবেশ। ]

রাজা : এই যে হ্যামলেট, পলোনিয়াস কোথায়?

হ্যামলেট : নৈশভোজে।

রাজা : নৈশভোজে? কোথায়?

হ্যামলেট : যেখানে তিনি আহার করেন সেখানে নয়, বরং যেখানে
তাকে আহার করা হচ্ছে, সেখানে। ধূর্ত কীটদলের এক
পরিষদ তাকে নিয়ে কাজে লেগে গিয়েছে। আপনার

এই কীটই তো আপনার আহার্যের সম্রাট। আমাদের পুষ্টির জন্যে আমরা অন্য প্রাণীদের পুষ্ট করি। আর আমরা নিজেদের পুষ্ট করি কীটের জন্যে। পেটমোটা রাজা আর রোগাপটকা ভিখারি, একই ভোজের ভিন্ন ভিন্ন পদ, এক টেবিলে দু'ধরনের খাবার। এটাই পরিণাম।

রাজা : হায়, হায়।

হ্যামলেট : যে কীট রাজাকে খেয়েছে তাকে দিয়ে কেউ মাছ ধরতে পারে আর খেতে পারে সেই মাছটিকে যে টোপ হিসেবে গিলেছে কীটকে।

রাজা : এ কথা দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাইছো?

হ্যামলেট : কিছুই নয়, শুধু আপনাকে দেখাতে চাই কী করে ভিখারির নাড়িভুড়িতে চলে রাজার শোভাযাত্রা।

রাজা : পলোনিয়াস কোথায়?

হ্যামলেট : স্বর্গে। সেখানে খুঁজতে লোক পাঠিয়ে দিন। যদি আপনার দূত তাকে সেখানে না পায় তাহলে অন্য জায়গায় খোদ আপনি গিয়ে তালাশ করুন। আর যদি বাস্তবিকই এ মাসের ভেতর তার কোনো হদিস না পান, তাহলে সিঁড়ি দিয়ে অলিন্দে যাবার পথে নাকে তার গন্ধ পাবেন।

রাজা : (পরিচালকবৃন্দের প্রতি) যাও, সেখানে তালাশ করো গে।

হ্যামলেট : আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকবেন।

রাজা : হ্যামলেট, তোমার বিশেষ নিরাপত্তার কথা
ভেবেই করছি এই কাজ; তুমি যা করেছো তার
জন্যে মর্মাহত আমরা, সেজন্যেই সাত তাড়াতাড়ি
তোমাকে এখান থেকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে আমি
বাধ্য হচ্ছি, তাই তৈরি হয়ে নাও, জাহাজ প্রস্তুত,
হাওয়া অনুকূল আর সঙ্গীরা অপেক্ষমান আর
সব কিছু ইংল্যান্ডের জন্যেই প্রস্তুত।

হ্যামলেট : ইংল্যান্ড।

রাজা : হ্যাঁ, হ্যামলেট।

হ্যামলেট : উত্তম।

রাজা : ঠিক তাই, যদি আমাদের উদ্দেশ্য তোমার জানা থাকে।

হ্যামলেট : আমি দেখছি এক দেবদূতকে যে সেসব নজর করছে। কিন্তু, থাক, ইংল্যাণ্ডের পথে যাত্রা করা যাক। বিদায় প্রিয় জননী আমার।

রাজা : আমি তোমার স্নেহশীল পিতা, হ্যামলেট।

হ্যামলেট : আমার মাতা। পিতা আর মাতা হল স্বামী আর স্ত্রী; স্বামী আর স্ত্রী হচ্ছে একই দেহ। তাই, আপনি আমার মাতা। ইংল্যান্ডে যাওয়া যাক।

[ প্রস্থান ]

রাজা : পায়ে পায়ে তার অনুগামী হও। খুব তাড়াতাড়ি জাহাজ ধরার জন্যে প্ররোচিত করো তাকে। আর বিলম্ব করো না। আজ রাতেই এখান থেকে ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব। যাও, এ ব্যাপারে সবকিছু তৈরি আছে। আমার মিনতি, তাড়াতাড়ি চলে যাও।

[ রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ]

আর ইংল্যান্ড, যদি আমার মৈত্রীর কোনো মূল্য
থেকে থাকে তোমার নিকট, আর আমার প্রবল
প্রতাপ সম্পর্কে যদি সচেতন থাকো, এখনো তো
এই ডেনমার্কের অসির ক্ষত লাল দগদগে
হয়ে আছে তোমার শরীরে,আর এখনো তোমার
ভীতি আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, — তবে
তুমি এই রাজকীয় নির্দেশকে ঠান্ডা নিস্পৃহতা
দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখো না। বিশেষত পত্রে লেখা
আছে, নির্দেশের সারকথা হল হ্যামলেটের
মৃত্যুদণ্ড ত্বরিত পালিত হোক। ইংল্যাণ্ড, তাই
করো তুমি; কারণ আমার রক্তে সে জাগায় জ্বর।
তুমিই আমাকে করবে নিরাময়। যতক্ষণ আমি
না জানি যে সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ততক্ষণ
যা কিছু ঘটুক, পাব নাকো আনন্দের শিহরণ।

[ প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ ফর্টিনব্রাস ও সৈন্যদলের মার্চ সহকারে প্রবেশ।]

ফর্টিনব্রাস : যাও হে ক্যাপ্টেন, ডেনমার্ক অধিপতিকে জানাও
আমার অভিবাদন। তাঁকে বলো, পূর্ব প্রতিশ্রুতি
অনুযায়ী তার এই রাজ্যের ওপর দিয়ে সৈন্য
চালনার অনুমতি চাইছেন ফর্টিনব্রাস।
আমাদের মিলিত হবার স্থান তুমি তো জানোই;
যদি তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবার কোনো
অভিলাষ প্রকাশ করেন, তবে আমরা রাজার
সম্মুখে হাজির হয়ে করব নিবেদন আমাদের
শ্রদ্ধার্ঘ, এ-কথা বলো তাঁকে।

ক্যাপ্টেন : আমি তা বলব প্রভু।

ফর্টিনব্রাস : ধীর পদক্ষেপে যাও। [ ক্যাপ্টেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ]

[ হ্যামলেট, রোজেনক্রান্জ, গিল্ডেনস্টার্ন এবং অন্যান্যদের প্রবেশ।]

হ্যামলেট : ভদ্র, কার এ সৈন্যবাহিনী?

ক্যাপ্টেন : নরওয়ের জনাব।

হ্যামলেট : জানতে পারি কি, জনাব, কী উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে?

ক্যাপ্টেন : এই অভিযান পোল্যান্ডের একটি অংশের বিরুদ্ধে।

হ্যামলেট : ভদ্র, কার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে এই অভিযান।

ক্যাপ্টেন : বৃদ্ধ নরওয়েরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্টিনব্রাসের।

হ্যামলেট : অভিযানের লক্ষ্য কি পোলান্ডের মূল ভূখণ্ড না কোনো সীমান্ত?

ক্যাপ্টেন : কথা না বাড়িয়ে সত্যি কথা বলি, আমরা এমন
ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমি দখল করতে যাচ্ছি, যাতে
কোনো লাভ নেই, আছে শুধু দখলের খ্যাতিটুকু।
পাঁচ, মাত্র পাঁচ মোহরের বিনিময়ে সে জমিতে
হাল দিতে যাবে না কখনো; এটা নরওয়ে কিংবা
পোলদের কাউকেই এর বেশি দাম চুকাবে না।

হ্যামলেট : তবে কি পোলরা এই অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না?

ক্যাপ্টেন : অবশ্যই দাঁড়াবে, সীমান্তে সেনাদল মোতায়েন।

হ্যামলেট : দু'হাজার প্রাণ আর বিশ হাজার মোহরে এই
খড়ের কুটোর মতো তুচ্ছ বিবাদের ফয়সলা
হবে না। প্রচুর ধনরত্ন আর দীর্ঘ অবসর
সৃষ্টি করে এরকম ফোঁড়া, যা ভেতরে ফেটে যায়,
অথচ বাইরে থেকে বোঝাই যায় না মানুষটা
কেন মারা গেল; আপনাকে ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন : তাহলে বিদায় বলি, ভদ্র।

[ প্রস্থান]

রোজেনক্রান্‌জ : অনুগ্রহ করে যাবেন কি, প্রভু?

হ্যামলেট : খানিক বাদেই তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি, তোমরা
এগোও।

[ হ্যামলেট ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ]

সকল ঘটনা শুধু আমারই বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে
আর শ্লথ প্রতিশোধ স্পৃহাকে আমার তীক্ষ্ণ ঘায়ে
জাগিয়ে তুলছে। এ কেমন মানুষ প্রধান কাজ
যার শুধু আহার ও নিদ্রা? সে তো পশুর চাইতে
বেশি কিছু নয়; সৃষ্টিকর্তা আমাদের আলোচনা
করবার মতো ভাষা আর ভূত-ভবিষ্যত বিচারের
যে মনন-শক্তি, দেবোপম বুদ্ধি দিয়েছেন, তাতে
মর্চে পড়ে যাক বিনা ব্যবহারে, তা তিনি চান না
অবশ্যই। এখন পশুর মতো বিস্মরণ কিংবা
কাপুরুষজনোচিত বিশদ চিন্তার জন্যে হোক —
যে চিন্তার একভাগ কেবল বিজ্ঞতা, তিনভাগ
ভীরুতা, জানি না আমি এ সত্ত্বেও কেন এইটুকু
বলার জন্যেই বেঁচে আছি যে, একাজ করতে হবে;
অথচ এ কাজ করবার যথেষ্ট কারণ, ইচ্ছা,
শক্তি আর উপায় আমার আছে। খুব সাধারণ,
সুস্পষ্ট, পার্থিব স্থূল উদাহরণ আমাকে বলে —
দ্যাখো এই সুবিশাল, ব্যয়বহুল সৈন্যবাহিনী,
যার সেনাপতি একজন তরুণ, কোমলমতি
রাজপুত্র এবং চেতনা যার স্বর্গীয় উচ্চাভিলাষে
স্ফীত হয়ে ভেংচি কাটে অদৃশ্য পরিণতিকে,
এমন কী একটি ডিমের খালি খোলের জন্যেই
যত ঝুঁকি, বিপদ এবং মরণের মুখোমুখি
হয়, বাস্তবিক কোনো মহৎ কারণ ছাড়া কেউ

আলোড়িত হলে তাকে সাজে না মহৎ আখ্যা; তবে,
সম্মান হানির সম্ভাবনা দেখা দিলে, অতি তুচ্ছ
কারণেও বিরাট সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যেতে পারে।
তাহলে আমার হাল কী দাঁড়ায়, যখন আমার
জনক নিহত, মাতা কলঙ্কিত, — যে জন্যে আমার
যুক্তিবোধ আর রক্ত ভীষণ উত্তপ্ত হতে পারে —
অথচ ওদের আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি? কিন্তু
লজ্জার বিষয়, এই আমার চোখের সামনে বিশ
হাজার মানুষ যারা অলীক খ্যাতির মোহে ছুটে
চলেছে মৃত্যুর দিকে, কবরকে শয্যা মনে করে,
লড়তে এমন এক খণ্ড জমিনের জন্যে যার
ওপর সবাই ওরা একত্রে দাঁড়াত পারবে না,
যেখানে হবে না ঠাঁই বেবাক নিহত সেনাদের
কবরের। আহ্, এ মুহূর্ত থেকে হবে রক্তমাখা
আমার সকল চিন্তা, নয়তো হবে মূল্যহীন ফাঁকা।

[ প্রস্থান]

## পঞ্চম দৃশ্য

[ রানি, হোরেশিও এবং জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ।]

রানি : আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক : সে বড়ো নাছোড়
ভীষণ বিক্ষিপ্ত চিত্ত। তার হাল দেখে কৃপা হয়।

রানী : কী চায় সে?

ভদ্রলোক : সে তার পিতার কথা বড়ো বেশি বলছে, বলছে
সে শুনেছে দুনিয়ায় ঢের ছলচাতুরী রয়েছে;
বলতে বলতে থেমে যাচ্ছে, বুকে করছে আঘাত,
খড়কুটো দেখে লাথি ছোঁড়ে, সন্দেহজনকভাবে
বলছে এমন কথা যার অর্ধেকের অর্থ নেই।
তার কথাবার্তা অর্থহীন, তবু সেই হিজিবিজি
কথা শুনে শ্রোতারা নিজের মতো সব অর্থ করে
নিচ্ছে; তারা থ হয়ে শুনছে কথা আর নিজেদের
খেয়াল মাফিক শূন্যস্থান করছে পূরণ, তার
চলার ঠমক, নড়াচড়া আর চোখের ইশারা
দেখে অনেকেই ভেবে নিচ্ছে যে এর পেছনে কিছু
একটা ব্যাপার আছে, হয়তো খুব দুঃখের ব্যাপার।

হোরেশিও : ওর সঙ্গে কথা বললে ভালো ছিলো, কেননা সে বদ,
সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিদের মনে বিপজ্জনক
ধারণার জন্ম দিতে পারে।

রানি : ওকে নিয়ে আসুন গে। [ ভদ্রলোকের প্রস্থান। ]
[ স্বগত ]
আমার অসুস্থ মনে প্রতিটি মামুলি ঘটনাকে
অশুভের পূর্বাভাস বলে বোধ হয়, পাপের প্রকৃত
স্বভাবই এমন; অপরাধ এমন কৌশলহীন
সন্দেহে ভরা যে, ধরা পড়ার আগেই এলেবেলে
ভয় পেয়ে অকস্মাৎ নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে।
[ ওফেলিয়ার প্রবেশ ]

ওফেলিয়া : কোথায় ডেনমার্কের সুদর্শনা রানি?

রানী : কী খবর ওফেলিয়া?

ওফেলিয়া : (গান)
কী করে বুঝব তফাৎ কোথায় সত্যিকারের

প্রেমিক এবং ঝুটা প্রেমিকের মাঝে?
এক লহমায় চিনে নেব তাকে তীর্থ পথের
টুপি, ছড়ি আর পায়ের চটির সাজে।

রানি : হায়, মধুর মেয়ে, এ গানের অর্থ কী?

ওফেলিয়া : কী বলেছেন আপনি? না, মিনতি জানাই, শুনুন।
(গান)
তিনি মৃত আর গত হে মহিলা,
তিনি মৃত আর গত।
শিয়রে যে তাঁর ঘাসের চাপড়া
পায়ের তলায় পাথর।

রানি : না, না, কিন্তু ওফেলিয়া।

ওফেলিয়া : মিনতি জানাই, ভালো করে শুনুন।
পাহাড়-চূড়ার তুষারের মতো
সফেদ কাফনে তাঁর —
[ রাজার প্রবেশ ]

রানি : হায়, লক্ষ করুন, প্রভু।

ওফেলিয়া : ছড়ানো রয়েছে মিষ্টি মধুর
পুষ্প, পাতাবাহার।
ঝরিয়েছি আমি কান্নার জল
সত্যি ভালোবাসার।

রাজা : কেমন আছো মধুর মেয়ে?

ওফেলিয়া : ভালো, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল মরুন। লোকে বলে, রুটিওয়ালার মেয়েকে পেঁচা বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রভু, আমরা কী তা আমরা জানি, কিন্তু কী আমরা হতে পারি তা জানি না। আপনার খাবার টেবিলে ঈশ্বরের প্রসাদ বর্ষিত হোক।

রাজা : ওর পিতার কথাই বলছে।

ওফেলিয়া : মিনতি জানাই, এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলবেন না, যদি ওরা এর অর্থ জানতে চায় তাহলে বলতে পারেন : কালতো সন্ত ভ্যালেন্তিনের দিন
আর আমি এক কুমারী দাঁড়াই এসে
খুব ভোরবেলা তোমার জানলা-ধারে।
আমি যে তোমার দয়িতা ভ্যালেন্তিন।
বিছানাটা ছেড়ে পরল সে হেসে
পোশাক এবং খুলল ঘরের দ্বার,

ঘরের ভেতরে কুমারীকে নিল ডেকে।
বেরুল কন্যা, কুমারী সে নয় আর।

রাজা : সুন্দরী ওফেলিয়া।

ওফেলিয়া : সত্যি বলছি, শপথ না করেই আমি আমার গান শেষ করব
যিশুর দোহাই, দোহাই দাতার,
ধিক্ তোকে ধিক, আহা মরি একি লজ্জা।
এরকমই হয় যুবকেরা আর
তেজী কুঁকড়োর শপথ কসুর ওদেরই;
বলল সে মেয়ে, 'বিয়ের কথাটি বলে
আমার সঙ্গে
লদকালদকি করেছো তোমার শয্যায়।'
জবাবে ছেলেটা বলে,
'ঐ সূর্যের শপথ, বলছি, তাই করতাম,
যদি না আসতে এভাবে আমার বিছানায়।'

রাজা : কয়দিন ধরে ওর এই হাল হয়েছে?

ওফেলিয়া : আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু একথা ভাবলে আমি না কেঁদে থাকতে পারি না যে, ওঁকে ঠান্ডা জমিনে শুইয়ে রেখেছে। আমার ভাই এ'কথা জানতে পারবে। আর তাই আমি সৎ পরামর্শের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার গাড়িকে আসতে বলো। শুভরাত্রি। মধুর মহিলারা, শুভরাত্রি, শুভরাত্রি।

[ প্রস্থান]

রাজা : ওর পিছু পিছু যাও, দোহাই নজরে রাখো ওকে।

[ হোরেশিওর প্রস্থান ]

হায়, এ যে গভীর শোকের বিষক্রিয়া : এর উৎস
ওর জনকের মৃত্যু। এবং এখন দ্যাখো তুমি—
হায় গারট্রুড, গারট্রুড,
যখন বিপদ আসে, একা একা আসে না কখনো,
আসে দল বেঁধে। প্রথমত নিহত জনক ওর;
তারপর তোমার পুত্রের চলে-যাওয়া, যদিও সে
নিজেই বিষম দায়ী তার এই বিদায়ের জন্যে
এবং সজ্জন পলোনিয়াসের মৃত্যুর ব্যাপারে
লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে সন্দেহজনক নানা কথা

কানাকানি করছে এবং তাকে আমরা তাড়াহুড়ো
করে মাটি দিয়ে খুব কাঁচা কাজ করেছি; বেচারি
ওফেলিয়া বঞ্চিত বিচারবুদ্ধি থেকে, যার বিনে
মানুষ ছবির মতো নয়তো পশুর মতো হয়ে
যায়, তার আর সর্বশেষ, অথচ গুরুত্বের সবগুলো
কারণের সমান, তা হচ্ছে, ওর ভাই ফ্রান্স থেকে
গোপনে এসেছে চলে, উদ্ভট চিন্তায় ভরপুর,
শুনছে আজব গালগল্প, রেখেছে আড়ালে তার
উদ্দেশ্যকে, আর ওর পিতার মৃত্যুর নোংরা কথা
বলে তার কানে বিষ ঢালবার মতো মানুষের
মোটেই কমতি নেই; যেহেতু ওদের কাছে নেই
সঠিক প্রমাণ কোনো, তাই বেবাক কসুর ওরা
আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না
আর কান থেকে কানে রটাবে কুৎসা। প্রিয়তমা
গারট্রুড আমার, এ হচ্ছে মারাত্মক সে কামান—
একটি গোলার ঘায়ে যার চকিতে আমার মৃত্যু
হতে পারে; এ মৃত্যু সহজে এড়ানো যেত।
[নেপথ্যে কলরব।]
হুঁশিয়ার!
আমার সুইস দেহরক্ষীরা কোথা? ওরা দ্বারে
মোতায়েন থাক। [একজন দূতের প্রবেশ]
কী ব্যাপার?

দূত : আত্মরক্ষা করুন রাজন।
সমুদ্র যেমন কূল ছাপিয়ে ত্বরিত গ্রাস করে
বালুময় তটভূমি, তার চেয়ে দ্রুত বেপরোয়া
বেগে আসছেন ছুটে এদিকে তরুণ লেয়ার্তেস।
দাঙ্গাবাজ জনতার পুরোভাগে তিনি, আপনার
রক্ষীরা বেবাক পর্যুদস্ত। উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলো
প্রভু বলে সম্বোধন করছে তাঁকে আর যেন এই
পৃথিবী নতুন করে শুরু হয়েছে আবার, যেন
বিস্মৃত প্রাচীন কাল, লুপ্ত পুরানো আচরণবিধি—
ফলে এই চেলাচিল্লি। 'আমরা করেছি নির্বাচন,
লেয়ার্তেস হবে রাজা', এমন গুরুত্ব পাচ্ছে,
যেন সবকিছু শুধু ওদের অনুমোদন আর
সমর্থনের মুখাপেক্ষী। শূন্যে টুপি ছুঁড়ে, জোর

হাততালি দিয়ে বারংবার আর তুমুল চেঁচিয়ে
দূর আকাশকে খান খান করে ঘোষণা করছে—
'লেয়ার্তেস হবে রাজা আমাদের, লেয়ার্তেস রাজা।'

রানি : ভুল পথে উল্লাসিত চিৎকার করছে ওরা সব —
ভুল পথে গন্ধ শুঁকছিস ওরে ডেনিশ কুকুর।
[নেপথ্যে কোলাহল।]

রাজা : দ্বারগুলো ভেঙে গেল।
[ অনুচরদের সঙ্গে লেয়ার্তেসের প্রবেশ।]

লেয়ার্তেস : কোথায় সে রাজা? আপনারা সব বাইরে দাঁড়ান।

অনুচরবৃন্দ : আমাদের ভেতরে আসতে দিন।

আমার একান্ত
মিনতি, আমাকে একা যেতে দিন।

অনুচরবৃন্দ : দেব, তাই দেব।

লেয়ার্তেস : ধন্যবাদ, দ্বার সামলান। [অনুচরবর্গের প্রস্থান।]
ওরে নরাধম রাজা,
আমার পিতাকে ফিরিয়ে দে।

রানি : [তাকে ধ'রে] শান্ত হও লেয়ার্তেস।

লেয়ার্তেস : আমার ভেতরে যদি এক বিন্দু রক্ত শান্ত থাকে,
তাহলে তা আমাকে জারজ বলে করবে ঘোষণা,
আমার পিতাকে ভ্রষ্টা রমণীর ভর্তা আখ্যা দেবে,
এবং আমার সাধ্বী জননীর নির্মল ললাটে
গণিকার ছাপ এঁকে দেবে।

রাজা : কী কারণে, লেয়ার্তেস,
তোমার এমন তীব্র বিপুল বিদ্রোহ? গারট্রুড,
ছেড়ে দাও ওকে, ভয় পেয়ো না আমার জীবনের
নিরাপত্তার কথা ভেবে। রাজার অস্তিত্ব ঘিরে
থাকে এক দৈব রক্ষাকবচ যা বাঁচায় তাকে,
রাজদ্রোহী সেদিকে তাকিয়ে থাকে শুধু, পারে না সে
মেটাতে মনের সাধ ইচ্ছে মতো। বলো লেয়ার্তেস,
কেন তুমি এত ক্রুদ্ধ? ওকে ছেড়ে দাও গারট্রুড —
বল হে যুবক।

লেয়ার্তেস : কোথায় আমার পিতা?

রাজা : হত।

রানি : কিন্তু তাঁর হাতে নয়।

রাজা : ওকে প্রাণ খুলে প্রশ্ন করতে দাও।

লেয়ার্তেস : কী করে হলেন তিনি হত? কোনো ন্যাকা,
ধোঁয়াটে জবাব আমি শুনতে চাই না। আনুগত্য
আর বিশ্বস্ততার শপথ জাহান্নামে যাক, আর
বিবেক, করুণা সব মিশে যাক অতল গহ্বরে।
জাহান্নামে যেতে রাজি আছি। কিন্তু কী করে নিহত
হলেন আমার পিতা, এ-কথা জানতে আমি আজ
বদ্ধপরিকর। ইহকাল পরকাল তুচ্ছ সব
এ মুহূর্তে আমার নিকট। যা হবার হোক শুধু
পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাই পুরোপুরি
মিটিয়ে মনের আশা।

রাজা : কে তোমাকে বাধা দেবে, বলো?

লেয়ার্তেস : আমার সংকল্প ছাড়া দুনিয়ার কিছুই আমাকে
পারবে না বাধা দিতে। এবং আমার সামর্থ্যকে
এভাবে করবো ব্যবহার যাতে খুব অল্পতেই
উদ্দেশ্য হাসিল হয় ভুরি পরিমাণ।

রাজা : হে সজ্জন
লেয়ার্তেস, শোনো যদি তুমি তোমার একান্ত প্রিয়
পিতার মৃত্যুর সত্যিকার কারণ জানতে ইচ্ছে
করো, তবে তুমি কি এখন বেপরোয়া জুয়াড়ির
মতো যে খেলায় হার-জিৎ দুটোকেই তুড়ি মেরে
বাজি ধরে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কে শত্রু কে মিত্র
পরখ না করেই নির্বিচারে সবাইকে আক্রমণ
করবার ঝুঁকি নেবে?

লেয়ার্তেস : শত্রু ছাড়া কাউকেই নয়।

রাজা : তুমি কি তাদের চিনে নেবে?

লেয়ার্তেস : তার মিত্রদের দিকে আমার দু'বাহু মেলে দেব,
এবং জীবনদাত্রী পেলিক্যান পাখির মতোই
রক্ত দিয়ে করব তাদের সেবা।

রাজা : এই তো সুশীল
বালক এবং সত্যকার ভদ্রলোকের মতন
এখন বলছো কথা। বাস্তবিক তোমার পিতার
মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো দোষ নেই আমার, বরং
অত্যন্ত শোকার্ত আমি সেজন্যে, একথা অচিরেই
দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হবে তোমার নিকট।

[নেপথ্যে কোলাহল। ওফেলিয়াকে গান গাইতে শোনা
যাচ্ছে।]

রাজা : ওকে আসতে দাও।

লেয়ার্তেস : কী ব্যাপার? এ কীসের কোলাহল?

[ ওফেলিয়ার প্রবেশ। ]

হে আগুন, আমার মস্তিষ্ক শুষ্ক হোক, সাতগুণ
লোনা অশ্রু আমার চোখের দীপ্তি, শক্তি মুছে দিক,
ঈশ্বরের দোহাই, তোমার এ উন্মত্ততার আমি
প্রতিশোধ নিতে থাকব ততক্ষণ, যতক্ষণ ন্যায়-
বিচারের তুলাদণ্ড এ দিকে না ঝুঁকে পড়ে। হায়
বসন্ত ঋতুর স্নিগ্ধ গোলাপ, কুমারী, স্নেহময়ী
ভগ্নী, সুভাষিনী প্রিয় ওফেলিয়া, হা ঈশ্বর এও
কি সম্ভব যে তন্বীব বোধশক্তি বৃদ্ধের সংক্ষিপ্ত
জীবনের মতোই ভঙ্গুর? প্রেমেই তো মানুষের
প্রকৃতি সুবেদী হয়ে ওঠে সূক্ষ্মভাবে, এরকম
হয় বলে তার মূল্যবান কোনো অংশ নিদর্শন
রূপে প্রিয়পাত্রটির অনুগামী হয়।

ওফেলিয়া : (গান)

খোলা মুখে তাকে ওরা বয়ে নিয়ে গেল কালে
শবযানে,
বৃষ্টির মতো অশ্রু ঝরল কবরের মাঝখানে।
হে আমার কপোত, বিদায়।

লেয়ার্তেস : তোমার চেতনা যদি সুস্থ থাকত এবং প্রতিশোধ
গ্রহণে আমাকে প্ররোচিত করত তাহলেও আমি
হতাম না এত বিচলিত।

ওফেলিয়া : তোমাকে গাইতেই হবে 'মাটির নীচে নামাও তাকে,
ডাক দাও তাকে, মাটির নীচে'।
আহ্, গানের ধুয়া মানিয়েছে খুব। অসাধু দেওয়ানটাই
মালিকের মেয়েকে চুরি করেছে।

লেয়ার্তেস : এই অর্থহীন কথাগুলো কত বেশি অর্থময়।

ওফেলিয়া : এই তো দোলনচাঁপা, স্মৃতির উদ্দেশে মিনতি করি, মনে
রেখো প্রিয়। আর এই তো ভুঁইচাপা, এটা হল ভাবনার
জন্যে।

লেয়ার্তেস : ওর উন্মত্ততার মধ্যেও সে শেখাচ্ছে : স্মৃতি আর
ভাবনার প্রতীক পরস্পর দিব্যি খাপ খেয়ে গেছে।

ওফেলিয়া : এইতো আপনার জন্যে গন্ধরাজ আর টগর। আর এই
বকুল আপনার জন্যে। আর এগুলো আমার জন্যে

এগুলোকে স্বর্গীয় করুণাগুল্ম নাম দিতে পারি। এই বকুল ফুলের মালা আপনাকে একটু অন্যরকম করে পরতে হবে। এটা তারাফুল। তোমাকে কিছু বেগুনি ফুল দেব, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুর সময় ওরা শুকিয়ে গেছে। লোকে বলে উনি খুব শান্তিতে মারা গেছেন—
[গান]
কেননা সুশ্রী মধুর দোয়েল আমার সকল খুশি।

লেয়ার্তেস : বিষাদ এবং মনোকষ্ট, ভাবাবেগ, নরকের যন্ত্রণাকেও মনোরম সুন্দর করে তুলেছে।

ওফেলিয়া : [গান]
সে কি কভু আর আসবে না ফিরে?
সে কি কভু আর আসবো না ফিরে?
না না, সে যে মৃত হায়,
গেলেও তোমার মৃত্যুর শয্যায়,
সে তো কভু আর আসবে না ফিরে।
দাড়ি ছিল তার তুষারধবল
মাথাটা শণের নুড়ি অবিকল
সেতো চলে গেছে, গেছে চলে
কাঁদব না আর সবে মিলে।
ঈশ্বর তার আত্মাকে দিন শান্তি।
ঈশ্বর সকল খ্রিস্টানের আত্মাকে শান্তি দিন, বিদায়।
[প্রস্থান]

লেয়ার্তেস : তুমি কি দেখছো এই সব, হে ঈশ্বর?

রাজা : লেয়ার্তেস, তোমার গভীর শোকে আমাকে শরিক হতে দাও, তা না হ'লে আমাকে আমার অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত করবে। যাও, গিয়ে বেছে নাও তোমার আপন বিজ্ঞতম মিত্রদের, তাঁরা সব কিছু শুনে আমার তোমার মধ্যে করুন বিচার— যদি তারা এ ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ অপরাধ খুঁজে পান, তবে আমার এ রাজ্য আর মুকুট, জীবন আর যা কিছু আমার আছে, সবই ত্যাগ করবো তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে; যদি প্রমাণিত না হয় আমার অপরাধ, তবে তুমি ধৈর্য ধরে শুনবে আমার কথা : এবং আমরা উভয়ে একাট্টা হয়ে তোমার আত্মার যথাযোগ্য সন্তোষের জন্যে কাজ করে যাবো।

লেয়ার্তেস : তবে তাই হোক।

কীসে তাঁর মৃত্যু হল, কেন অজ্ঞাত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
তাঁর — কেন যুদ্ধজয়ের স্মারক আর তাঁর
তরবারি, যুদ্ধবর্ম অর্পণ ছাড়াই,যথাযোগ্য
তর্পণ ও সমারোহবিহীন এমন হেলাফেলা
ক'রে তাকে সমাহিত করা হল, এই প্রশ্ন আমি
করছি কাঁপিয়ে স্বর্গমর্ত্য।

রাজা : সেতো তুমি করবেই।
পড়ুক কুঠার জোরে অপরাধ আছে যেখানেই।
অনুরোধ জানাই আমার সঙ্গে এসো।

[প্রস্থান]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[হোরেশিও এবং একজন ভৃত্যের প্রবেশ]

হোরেশিও : ওরা কারা যারা কথা বলতে চায় আমার সঙ্গে?

ভৃত্য : হুজুর নাবিক ওরা। বলে আপনার চিঠি আছে।

হোরেশিও : ওদের আসতে দাও। [ভৃত্যের প্রস্থান।] যুবরাজ হ্যামলেট ছাড়া এই দুনিয়ার কোন অংশ থেকে কে আমাকে শুভেচ্ছা পাঠাবে, জানি না তা।

[নাবিকের প্রবেশ]

প্রথম নাবিক : খোদা আপনার মঙ্গল করুন জনাব।

হোরেশিও : আপনাদেরও মঙ্গল করুন।

প্রথম নাবিক : তাঁর কৃপা হলে, তিনি তাই করবেন জনাব। আপনার জন্যে একটা পত্র আছে। যে রাষ্ট্রদূত ইংল্যান্ডে যাচ্ছিলেন তাঁর কাছ থেকেই এই পত্র এসেছে — যদি আপনার নাম হোরেশিও হয়ে থাকে। আমাকে তা-ই বলা হয়েছে।

হোরেশিও : [পত্রপাঠ] হোরেশিও, এই পত্রপাঠের পর তুমি এদের রাজার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা কোরো। ওদের কাছে তাঁকে লেখা চিঠি আছে। সমুদ্রপথে দু'দিন যেতে না যেতেই আমাদের তাড়া করে লড়াকু জলদস্যু দল। আমাদের জাহাজ চলছিল মন্থর গতিতে, ফলে আমরা বাহাদুরি দেখাতে বাধ্য হই। ওরা যখন লোহার আঁকশি দিয়ে আমাদের জাহাজ আঁকড়ে ধরে তখন আমি জলদস্যুদের জাহাজে লাফিয়ে পড়ি। নিমেষে ওরা আমাদের জাহাজের কাছ থেকে সরে যায়, তাই আমি একাই বন্দি হই ওদের হাতে। ওরা আমার সঙ্গে দয়াবান তস্করের মতোই আচরণ করেছে। তাদের নিজেদের কাজ-কারবার সম্পর্কে ওরা ওয়াকিবহাল, তাই ওরা এর বদলে আমাকে দিয়ে ভালো কিছু করিয়ে নেবার আশা রাখে। আমার পাঠানো চিঠিগুলো রাজাকে পৌঁছে দিও। আর মৃত্যু থেকে যে গতিতে পালাতে চাও তার চেয়েও দ্রুতগতিতে তুমি আমার কাছে চলে এসো। তোমাকে

কানে কানে বলবার মতো অনেক কথা আছে, শুনে
তুমি থ হয়ে যাবে; তবু আমার বক্তব্যের গুরুত্ব বিচার
করলে কথা কত লঘু মনে হয়। এই সজ্জন নাবিকেরা
আমি যেখানে আছি সেখানে নিয়ে আসবে তোমাকে
রোজেনক্রান্‌জ আর গিল্ডেনস্টার্ন ইংল্যান্ডের পথে
রওয়ানা হয়েছে; ওদের সম্পর্কে তোমাকে অনেক
কথা বলবার আছে আমার। বিদায়।"
"তুমি যাকে তোমার বলে জানো, হ্যামলেট।"
এসো, তোমাদের এইসব চিঠিপত্র পৌঁছোনোর
ব্যবস্থা করছি; কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি
পারো যার কাছ থেকে এগুলো এনেছো বয়ে, তার
কাছেই আমাকে নিয়ে চলো।

[প্রস্থান]

## সপ্তম দৃশ্য

[রাজা ও লেয়ার্তেসের প্রবেশ।]

রাজা : এখন নিশ্চয় তুমি তোমার জাগ্রত বিবেকের
নির্দেশে আমাকে আর অপরাধী বলে
মনে করছো না। আর অবশ্যই তুমি ঠাঁই দেবে
আমাকে সুহৃদ রূপে তোমার হৃদয়ে,
যেহেতু শুনেছো তুমি স্বকর্ণে তোমার জনকের
হন্তারক আমারও জীবন নাশে লিপ্ত।

লেয়ার্তেস : স্পষ্ট তাই
মনে হচ্ছে। কিন্তু বলুন তো, আপনার প্রজ্ঞা আর
নিরাপত্তা বোধ আর অন্যান্য বিষয় আপনাকে
উদ্বেলিত করার পরেও কেন আপনি এমন
অপরাধমূলক এবং ভয়ানক দুষ্কর্মের
বিরুদ্ধে নেননি কোনো ব্যবস্থা এখনো?

রাজা : হায়, দুটি
বিশেষ কারণে, যা তোমার কাছে মনে হতে পারে
অত্যন্ত অসার কিন্তু আমার নিকট সারবান।
বানি, তার মাতা, শুধু তাঁর মুখ চেয়ে বেঁচে আছে,
আর এই আমার কথাই বলি—দোষ কি সদগুণ,
যাই বলা যাক, রানি আমার একান্ত মনপ্রাণ
এমন নিবিড়ভাবে সংলগ্ন রয়েছে তার সঙ্গে,
যে নক্ষত্র যেমন আপন কক্ষপথ বিনা স্রেফ
নিশ্চল, আমিও তেমনি তাকে ছাড়া চলতে অক্ষম।
আরেক কারণ হল, কাঙ্ক্ষিত ছিল না জনতার
বিচার, কেননা ওরা তাকে বড়ো বেশি ভালোবাসে।
ওরা হল সেই নির্ঝরের মতো, যার স্পর্শে কাঠ
পাথরে রূপান্তরিত হয়, তাই তার সব দোষ
ওরা প্রীতিধারায় সিঞ্চিত করে তার কলঙ্ককে
ভূষণে বদলে দিত। এরকম প্রবল হাওয়ার
বিরুদ্ধে ছুঁড়লে শর, পুনরায় সেসব আমার
নিজের ধনুকে ফিরে আসত নিশ্চয়, অভীষ্ট সে
লক্ষ্যভেদ হত না কখনো।

লেয়ার্তেস : আর তাই এভাবেই আমার মহান জনককে
হারিয়েছি এবং আমার ভগ্নী হলো উন্মাদিনী
যার গুণাবলি, যদি স্তুতি তুলে ধরতে সক্ষম
হয় অতীতের ওকে, সর্বকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
বলে উদ্‌ভাসিত হবে। অবশ্যই নেব প্রতিশোধ।

রাজা : তা বলে কোরো না নষ্ট ঘুম। ভেব না যে আমি
এমন নিস্তেজ, স্থূল ধাতু দিয়ে গড়া যে আমার
দাড়ি বিপদের ঝাঁকুনিতে কাঁপবে এবং আমি
সেটাকে তামাসা ধরে নেব। সত্বর শুনবে তুমি আরো
বেশি কথা। তোমার পিতাকে আমি ভালোবাসতাম,
আর নিজেকেও ভালোবাসি, আর এতে আশা করি
কিছুটা কল্পনা করে নিতে শিখে যাবে —

[চিঠি নিয়ে দূতের প্রবেশ।]

দূত : এটা আপনার জন্যে মহারাজ, এটা মহারানির উদ্দেশে।

রাজা : হ্যামলেট পাঠিয়েছে বলছো! এগুলো কে এনেছে?

দূত : ওরা বলে, নাবিকেরা, প্রভু। আমি ওদের দেখিনি।
এগুলো ক্লডিও দিয়েছেন আমাকে; স্বয়ং তিনি
পত্রবাহকের কাছ থেকে পেয়েছেন।

রাজা : লেয়ার্তেস,
চিঠিটা পড়ছি, শোনো। তুমি যেতে পারো।

[দূতের প্রস্থান।]

[পত্রপাঠ]

'পরম প্রতাপশালী, শক্তিমান; আপনার রাজ্যে আমাকে
নগ্ন, কপর্দকহীন করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে,
জানবেন। আগামীকাল আপনার রাজসিক দৃষ্টির
সম্মুখে নিজেকে হাজির করবার অনুমতি ভিক্ষা করব,
আর প্রথমেই আপনার মার্জনা প্রার্থনা করে আমার
আকস্মিক, অদ্ভুত প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণনা করব।'
'হ্যামলেট।' এর অর্থ কী দাঁড়াতে পারে? বাকি সবাই
কি ফিরে এসেছে? এটা কি প্রতারণা ছাড়া অন্য কি কিছু
নয়?

লেয়ার্তেস : এই হস্তাক্ষর চেনেন কি?

রাজা : এটা হ্যামলেটের
হস্তাক্ষর, 'নগ্ন' লিখে
আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে এখানটায় 'একা।'
তুমি কি বুঝিয়ে কিছু বলবে আমাকে?

লেয়ার্তেস : কিছুই যে বুঝছিনে প্রভু। তবে ওকে আসতে দিন।
এখন এ-কথা ভেবে আমার নিজের মর্মপীড়া
বেড়ে গেছে, বেঁচে থেকে আমি তার মুখের উপর
ঠিক বলে দিতে পারব যে 'তুমি এটা করেছিলে'।

রাজা : যদি তাই হয়, লেয়ার্তেস — কী করে তা হতে পারে,
অন্য কোনোকিছুই বা কী করে সম্ভব? — তাহলে কি
তুমি মেনে চলবে আমার কথা?

: মানব রাজন,
তবে তার সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আমাকে কোনোদিন
বাধ্য করবেন না।

রাজা : শুধুমাত্র তোমার শান্তির জন্যে। যদি সে ভ্রমণ
থামিয়ে এখানে ফিরে এসে থাকে, যদি সে আবার
ভ্রমণে বের না হয় তবে আমি এমন একটি
কাজ তাকে দিয়ে বেমালুম চকিতে বাগিয়ে নেব —
যাতে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এ মুহূর্তে সে কৌশল
আমার মগজে স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। তার মৃত্যু হলে
কোনো অপবাদের সামান্য হাওয়াটুকু বইবে না,
এমন কী তার জননীও এই কৌশলের আঁচ
পাবে না কখনো, ধরে নেবে দুর্ঘটনা বলে।

লেয়ার্তেস : প্রভু,
আপনার পরামর্শ মেনে চলব নিশ্চিত, যদি
প্রতিশোধ গ্রহণের যন্ত্রী আমি হই।

রাজা : ঠিক তাই
হবে, তুমি বিদেশে যাবার পর লোকজন ঢের
বলেছে তোমার কথা, সে-কথা শুনেছে হ্যামলেটে।
তোমার একটি সিদ্ধি কুড়িয়েছে প্রচুর তারিফ।
তোমার সকল গুণ একযোগে মিলে জাগায় নি
ঈর্ষা তার মনে যত এই সিদ্ধি জাগিয়েছে।
আর এই উৎকর্ষ আমার বিবেচনায় জেনো
তুচ্ছ অতিশয়।

: কোন উৎকর্ষের কথা বলছেন?

রাজা : যৌবনের টুপিতে নগণ্য পালকের শোভা — তবু বেশ
দরকারি; যেমন বৃদ্ধের পক্ষে তার স্বাস্থ্য আর
গাম্ভীর্য রক্ষার জন্যে কালো, ভারি পশমি পোশাক
সুশোভন, তেমতি যুবককে মানায় খেয়ালি আর
জমকালো সাজ। দুই মাস আগে নরমাণ্ডি থেকে

একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে, আমি
স্বয়ং ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়েছি, কাছ থেকে
দেখেছি নিজের চোখে ওরা ঘোড়সওয়ারিতে কত
দড়, কিন্তু এ ব্যাপারে এই বীরপুরুষটি যেন
জাদুকর একজন। তিনি থাকেন ঘোড়ার পিঠে
মিশে আর দেখান এমন সব কলাকৌশল যে
মনে হয়, তিনি যেন প্রকৃতিতে ঘোড়ারই মতন,
সেই প্রাণীটির সঙ্গে আছেন একাত্ম হয়ে। তাই
এ-ব্যাপারে আমার সকল ধারণাকে বহুদূর
ছাড়িয়ে গেছেন তিনি, তার কলাকৌশল আমার
কল্পনাকে মানিয়েছে হার।

লেয়ার্তেস : তিনি নর্মান, তাই না?

রাজা : হ্যাঁ, নর্মান।

লেয়ার্তেস : জান কবুল, ইনি নিশ্চয় লামর্ড।

রাজা : ঠিক সেই ব্যক্তি।

লেয়ার্তেস : আমি তাকে ভালো করে চিনি। তিনি এক অলংকার
বাস্তবিক, সমগ্র জাতির মণিহার।

রাজা : তোমার বিষয়ে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকার করেছেন,
দিয়েছেন চমৎকার বিবৃতি যে তুমি অতিশয়
দক্ষ প্রতিক্ষার কৌশলে, বিশেষত তরবারি
চালনায়; তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, যদি কেউ
তোমার সমান দক্ষ হয়ে কখনো তোমার সঙ্গে
অসিযুদ্ধ করে তবে সেটা খুবই দর্শনীয় হবে।
তিনি তো শপথ উচ্চারণ করে বলেছেন, তাঁর
স্বদেশের তলোয়ারবাজরা তোমার বিরুদ্ধে
তলোয়ার খেলায় হামলা, আত্মরক্ষা কিংবা কড়া
নজর রাখতে ব্যর্থ হবে। তাঁর এই বিবরণে
হ্যামলেট ঈর্ষার জহরে এরকম জর্জরিত
হয়ে পড়েছিল যে, সে শুধু চাইছিল তুমি যেন
হঠাৎ এখানে এসে পড়ো, যাতে সে তোমার সঙ্গে
তলোয়ার খেলায় লড়তে পারে প্রতিযোগী হয়ে।
এখন এ-কথা থেকে —

লেয়ার্তেস : এ কথা থেকে কী মহারাজ?

রাজা : লেয়ার্তেস, তোমার পিতা কি প্রিয় ছিলেন তোমার?
নাকি তুমি কেবলি শোকের ছবি, হৃদয়বিহীন
মুখচ্ছদ এক?

লেয়ার্তেস : কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন?

রাজা : তোমার পিতাকে তুমি ভালোবাসতে না, বলছি না,
কিন্তু আমি জানি কালক্রমে শুরু হয় ভালোবাসা
আর আমি এমন প্রমাণও প্রাপ্ত হয়েছি যে কাল
প্রীতির উত্তাপ আর স্ফুলিঙ্গকে ক্রমশ স্তিমিত
করে ফেলে আর এই ভালোবাসার শিখায় আছে
এমন পলিতা যাতে পুড়ে সে নিজেই ক্ষয়ে যায়।
কোনো কিছু একই রূপে ভালো থাকে না কখনো।
ভালো বেশি পরিমাণে বেড়ে গেলে, তার বৃদ্ধিরই দরুন
পরিণামে উবে যায়। আমরা যা করার সংকল্প
করি, সেই সংকল্প অটুট থাকে যখন, তখনই
উচিত সে-কাজ করা। কেননা সংকল্প বদলাতে
থাকে ক্রমে, রদ হয়ে যায় নানা বিলম্ব, বাধায়,
যথা অপরের উপহাসে, অথবা তাদের কোনো
কঠিন বিরোধিতায় অথবা দুর্ঘটনায়; তাই
এ কর্তব্যবোধ হল অমিতব্যয়ীর দীর্ঘশ্বাস—
যা নির্গত হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।
এখন নজর করা যাক প্রকৃত সে ক্ষতস্থানে :
হ্যামলেট এখানে আসছে ফিরে; কেবল কথায়
নয় বলো কী কাজে প্রমাণ দেবে তুমি যে পিতার
উপযুক্ত পুত্র তুমি?

লেয়ার্তেস : গির্জায় কাটব তার গলা।

রাজা : কোনো স্থানই ঘাতকের পবিত্র আশ্রয় নয়, আর
প্রতিশোধ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু সাধু
লেয়ার্তেস, তুমি কি আমার কথা শুনে অগোচরে
রাখবে নিজেকে ঘরে? হ্যামলেট ফিরে এসে জেনে
যাবে তুমি বাড়িতে এসেছো; আমি তোমার কৃতির
প্রশংসা করার জন্যে কিছু লোক করব নিয়োগ;
ফরাসি সে ভদ্রলোক তোমাকে যে খ্যাতি দিয়েছেন
তাতে ওরা চড়িয়ে দ্বিগুণ রং আরো চকমকে
করবে, আখেরে তোমাদের দু'জনকে সরাসরি
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করিয়ে ধরব বাজি। জানি,
সে অন্যমনস্ক আর অত্যন্ত উদার, ফন্দি-টন্দি
থেকে শত হস্ত দূরে, তাই সে পরখ করবে না
তলোয়ারগুলি, ফলে তুমি সহজেই কিংবা কিছু
ছলছুতো করে বেছে নিতে পারবে ধারালো এক
আগাখোলা তরবারি; প্রতারক সে অসি খেলায়
নেবে তুমি পিতার মৃত্যুর ইন্তেকাম।

লেয়ার্তেস : তা আমি নেবই।
এ উদ্দেশ্যে আমার অসিতে আমি জহর মাখিয়ে
নেব; একজন হাতুড়ের কাছ থেকে এরকম
মারাত্মক মলম কিনেছি, তাতে ছুরি ডোবালেই,
সামান্য আঁচড় লেগে তার আহত যে হবে, তাকে
চন্দ্রালোকে আহরিত গাছগাছড়া অথবা কোনো
সর্বরোগহর ঔষধি দিয়েও বাঁচানো যাবে না।
সংক্রামক এই বিষ আমি তরবারির ডগায়
মেখে নেব, ফলে তার গায়ে কোথাও একটু খোঁচা
লাগলেই মৃত্যু হবে তার।

রাজা : এ বিষয়ে আরো কিছু
ভেবে দেখা যাক বিবেচনা করে দেখি সময় ও
উপায় উভয়কেই আমাদের উদ্দেশ্যে কতটা
সুবিধা মাফিক ব্যবহার করা চলে। এ ব্যবস্থা
যদি ব্যর্থ হয় আর আমাদের কিছু ভুলচুক
এবং ত্রুটির ফাঁক ফোকর ধরিয়ে দেয় মূল
উদ্দেশ্যকে আমাদের, তবে এটা কাজে লাগানোর
চেষ্টা না করাই সমীচীন। সুতরাং এই পরি-
কল্পনার বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে
এটা কেঁচে গেলে অসময়ে অপরটি কাজে লাগে।
বোসো, ভেবে দেখা যাক, তোমাদের কলাকৌশলের
ওপর ধরব বড়ো রকমের বাজি; পেয়ে গেছি!
যখন তোমরা অসিখেলার সময় ঘেমে যাবে,
তৃষ্ণায় কাতর হবে, সেজন্যে অবশ্য তলোয়ার –
খেলাটিকে বেশ জোরদার করতে হবে, তখন সে
পানীয় চাইবে, আমি আগেভাগে একটি পাত্তরে
পানীয় রাখব তৈরি, যাতে সে তোমার চকচকে
বিষাক্ত অসির ডগা এড়িয়ে গেলেও পরে সেই
পানীয়ে চুমুক দিলে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল
হবে; কিন্তু দাঁড়াও, কীসের কলরব শোনা যায়?

[ রানির প্রবেশ। ]

রানি : একটি দুঃখের পায়ে পায়ে অন্য দুঃখ আসে সাত
তাড়াতাড়ি, লেয়ার্তেস, ডুবে মরেছে তোমার বোন।

লেয়ার্তেস : ডুবে সে মরেছে? হা, কোথায়?

রানি : সেখানে উইলো গাছ নুয়ে পড়ছে নদীর ধারে,
নদীর স্ফটিক জলে ভাসে তার সাদা সাদা পাতা,
সেখানে সে বনশিউলি, বিছুটি লতা, বুটিফুল

এবং দীঘল ভূঁইচাপা, যাকে মুক্তকণ্ঠ মেষ -
পালকেরা অন্য কোনো অমার্জিত নামে ডাকে, কিন্তু
আমাদের শান্ত কুমারীরা বলে মৃতের আঙুল —
এইসব দিয়ে গাঁথা ছিল নানান খেয়ালি মালা।
গাছটির নুয়ে-পড়া ডালে ভর দিয়ে ওঠে লতা
পাতা আর কুসুমের তাজ যখন পরাতে গেল
তখনই হিংসুটে ডাল ভেঙে যায়। সে তার ফুলের
মালাসহ কান্না-পাওয়া নদীবুকে পড়ে যায়; তার
পোশাক ছড়িয়ে পড়ে তাকে জলকন্যার মতন
খানিক ভাসিয়ে রাখে জলের উপর, সে সময়
গাইছিল সে অনেক পুরানো গানের কোনো কলি,
তখন সে নিজের সকল দুঃখ বুঝতে সম্পূর্ণ
অপারগ, কিংবা মনে হচ্ছিল যে অমন বিজন
স্থানেই বসত তার খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এতো
বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না কখনো, ফলে তার
পোশাক আশাক জলে ভিজে ভারি হয়ে ওঠে সেই
অভাগিনী কুমারীকে তার গানের ভুবন থেকে
নদীর জলের নীচে কর্দমাক্ত মরণের দিকে
টেনে দিয়ে গেল।

লেয়ার্তেস : হায় তাহলে সে ডুবে মরে গেছে।

রানি : ডুবে গেছে, ডুবে গেছে।

লেয়ার্তেস : পেয়েছো অনেক পানি তুমি, হায়, ওফেলিয়া, আর
তাই থামিয়েছি অশ্রুধারা। কিন্তু তবু আমাদের
স্বভাব এমনই, যদি আমার আপন দুর্বলতা
এখন আমাকে লজ্জা দেয় দিক, প্রকৃতি তো তার
কাজ করে যথারীতি। অশ্রু ঝরে গেলে রমণীর
স্বভাব বিদায় নেবে আমার ভেতর থেকে। প্রভু,
তাহলে বিদায় বলি। আমার ভেতরে অগ্নিবর্ষী
কথা আছে, সুযোগ পেলে যা লেলিহান হয়ে উঠত,
কিন্তু সে আগুন নিভে গেছে অঝোর চোখের জলে,
যা' নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। [ প্রস্থান। ]

রাজা : গারট্রুড, চলো ওর
পেছনে পেছনে যাই। ওর ক্রোধ সামলাতে আমি
কীই না করেছি! ভয় হয়, হয়তো আবার শুরু
হয়ে যাবে, তাই তার পেছনে পেছনে চলো যাই।

[ প্রস্থান ]

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

দু'জন ভাঁড়ের প্রবেশ। [ একজন গোরখোদক এবং অন্য একজন ]

গোরখোদক : যেউগা আপনা জান আপনে লইছে অরে কি খেরেস্টানদের রহম কব্বর দেওয়া লাগব?

অন্যজন : হ, তাই অইব; জলদি কব্বর খুইদ্যা ফালাও। হাকিমরা হুকুম দিছে, অবে খেরেস্টানদের নাহানই কব্বর দিতে অইব।

গোরখোদক : এইডা কী কইরা হয় — হে যদি আপন জান বাঁচাইবার লিগা ডুইবা মইরা না থাকে।

অন্যজন : আরে হেইডাই তো সাবিত অইছে।

গোরখোদক : এইডা তাহলে হামলার ওয়াস্তে অইছে। এইডা বাদে আর কিস্‌সু অইবার পারে না। আর মামলাডা অইল এই হানে : আমি যদি জাইনা হুইনা আপনারে ডুবাইয়া মারি, হেইডা একটা কাম বইলাই সাবিত অইব; আর হগল কামেরই তিনটা ডালি আছে — এইডা অইল, কামে লাইগা পড়া, কাম করা আর তামাম করা। তাহলে উনি জাইনা হুইনা আপনারে ডুবাইয়া মারছেন।

অন্যজন : আরে হোনো ভালা মানু খোরখুন্দ -

গোরখোদক : আমারে কইবার দাও। এই যে এইহানে অইল পানি — ভালা। এই হানে খাড়াইয়া আছে মানুডা — ভালো। আগর মানু ডা পানির নজদিক যায় আর আপনে আপনে ডুইবা মরে, তাহলে হে আপনা মর্জিতে অউক আর না-ই অউক, হে ডুইবা মরলো - ভাইবা দ্যাহ। মগর পানি অর নজদিক আছে আর অরে ডুবাইয়া ফালায়, তাহলে হে আপনারে ডুবাইল না। এই লেইগা কই, হে আপনা মৌতের লাইগা দায়িক না, হে আপনা জান খতম করে নাইক্যা।

অন্যজন : তয় এই ডা কি কানুন?

গোরখোদক : হ, বিবি মরিয়মের কসম, মুর্দা পরখ-করনে-ওয়ালার কানুন।

অন্যজন : এই ব্যাপারে হাচা কথা হুনবার চাও? হে আগর শরিফ আওরত না অইত, তাহলে হের কব্বর খেরেস্টানদের গোরস্তানের বাইরে অইত।

গোরখোদক : এইডা জব্বর কইছো। আরো আফসোসের কথা অইলো, বড়লোকগুলান নিজেগো ডুবাইয়াই মারুক আর ফাঁসিতে লটকাইয়াই মারুক, হেরা মযহবের মদত অন্য খেরেস্টান ভাই থিকা বেশি পাইতেছে। আয়রে আমার কোদাল। মালী, খানাখুন্দ আর গোরখুন্দের রহম পুরানো শরিফ আদমি আর নাইক্যা—এই লোকগুলান আদমের কায়কারবার করবার লাগছে।

[ কবর খুঁড়তে শুরু করে। ]

অন্যজন : উনি কি শরফি আদমি আছিলেন?

গোরখোদক : উনি আছিলেন পরথম মাটি খুদনে-ওয়ালা।

অন্যজন : ইনার হেই কাম করবার রাস্তা আছিলো না।

গোরখোদক : আরে, কই কি? তুমি বেটা কাফের নাকি? মযহবী কেতাব পইড়া বোঝোডা কী? হেইখানে সাফ লেখা আছে — আদম মাটি খুদতেন। হাত না থাকলে উনি মাটি খুদতেন কি দিয়া? তোমারে আরেকডা সওয়াল করুম। আগর ঠিকঠাক জবাব দিবার না পারে, তয় কবুল কইরা ফালাও —

অন্যজন : আরে যাও, যাও।

গোরখোদক : কও দেহি ওস্তাগার, জাহাজ মিস্তিরি আর কাঠমিস্তিরির থিকা মজবুত কইরা জিনিস বানাইবার পারে কেঠা?

অন্যজন : ফাঁসির তক্তা বানানে-ওয়ালা: হাজার মানুকে লটকাইবার পরেও ফাঁসির তক্তা টিইক্যা থাকে।

গোরখোদক : সাচমুচ তোমার আক্কল আমার বহুত পসন্দ লাগে। ফাঁসির তক্তা বহুত ভালাকাম করে। মগর কেমনু ভালা কাম করে? খারাপ কাম যারা কইরা আহে, হে অগো ভালা করে। মগর তুমার এই বাত কওয়া দুরস্ত হয় নাইক্যা যে ফাঁসির তক্তা গির্জা থিকাও পোক্ত কইরা তৈয়ারি। তয় ফাঁসির তক্তা তুমার ভালাই করবো। লও, আবার জবাব দিবার কোশিশ কর।

অন্যজন : ওস্তাগার, জাহাজ-মিস্তিরি আর কাঠমিস্তিরি থিকা কেউগা জেয়াদা মজবুত জিনিস বানায়?

গোরখোদক : হ, অহন তুমি হেই বাত কইয়া তুমার চাপা খুলবার পারো।

অন্যজন : হাচা কই, এহন আমি কইবার পারমু।

গোরখোদক : কইয়া ফালাও।

অন্যজন : ঈশার খানাপিনার দোহাই লাগে, কইবার পারুম না।

গোরখোদক : হের লিগা তুমি ম্যাজে দরমুজ পিটাইও না। তুমার রহম ভোদাই গাধারে চাবুক মাইরা বি সিজিল করণ যাইব না। হেরপর আগর কেউ তুমারে এই সওয়াল করে, তয় জবাব দিও, 'গোরখুন্দ'। যেসব মাকান হে বানায়, হেইগুলান রোজ হাসরের দিন তক টিইক্যা থাকে। যাও, এহন যোহানের নজদিক গিয়া আমার লিগা এক গেলাশ শরাব লইয়া আহো।

[ অন্য ভাঁড়ের প্রস্থান। প্রথম ভাঁড় মাটি খোঁড়ে আর গান গায়।]

পরথম জোওয়ানিতে আমি
পেয়ার কইরা ছিলাম।
ভাইবাছিলাম পেয়ার বহুত মিঠা,
বহুত এইডার দাম।
কালেরে ভাই আমার রহম
কইরা ভাইবাছিলাম —
আর কিছুই অয় না এমুন
এমুন ভালো কাম।

[ ওর গান গাওয়ার সময় হ্যামলেট ও হোরেশিওর প্রবেশ।]

হ্যামলেট : কবর খোঁড়ার সময় গান গাইছে — লোকটার কি নিজের কাজ সম্পর্কে কোনো অনুভূতি নেই।

হোরেশিও : অভ্যাসে এটা ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে।

হ্যামলেট : ঠিক তাই, যার হাতে কাজ কম তারই অনুভূতি প্রবল।

হোরেশিও : [ গান ]

মগর বয়স আহে চুপচাপ,
ধরলো চাইপা মুঠির বিত্‌রে,
জান যাইবার চায়।
মাটির তলায় দিলো পাঠাইয়া,
য্যান কোনোকালে ছিলাম না আমি
এমুনতরো হায়।

[ একটা মড়ার খুলি তুলে ফেলে দেয়। ]

হ্যামলেট : ঐ খুলির একটা জিহ্বা ছিল, এবং কোনোকালে সেটা গান

গাইতে পারত। বদমাশটা কেমন দাঁত খিঁচিয়ে ওটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল, যেন ওটা কাবিলের চোয়ালের হাড়। সেইতো দুনিয়ার প্রথম খুনি। এটা হতে পারে কোনো রাজনীতিবিদের মাথা, যেটাকে এখন এই গর্দভ কেমন ঝাঁকাচ্ছে দেখ — এই ভদ্রলোকের অভিলাষ ছিল ঈশ্বরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। কী বলো, এরকম হতে পারে না?

হোরেশিও : হতে পারে, কুমার।

হ্যামলেট : কিংবা কোনো রাজসভাসদের, যে বলত 'সুপ্রভাত প্রিয় প্রভু। কেমন আছেন মেহেরবান প্রভু? হতে পারে এই খুলি রইস অমুকের, যিনি রইস তমুকের ঘোড়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন শুধু সেটা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নেয়ার জন্যে। কী, এরকম হতে পারে না?

হোরেশিও : আলবৎ হতে পারে, কুমার।

হ্যামলেট : হয়তো এমন হতে পারে; আর এখন এটা মাননীয়া কীট-বেগমের এখতিয়ারে, চোয়ালবিহীন, ছিটকে পড়েছে গোরখোদকের কোদালের ঝটকা খেয়ে। এখানেই তো চমৎকার সময়ের আবর্তন, যদি দেখার মতো হিকমত আমাদের থাকে। এই হাড়গুলো নিয়ে এভাবে খেলার জন্যেই কি এগুলোকে লালন-পালন করা হয়েছিল? ভাবতেই আমার হাড় টনটনিয়ে উঠেছে।

গোরখোদক : [ গান ]

চাই শাবল, চাই কোদাল
চাই কোদাল, চাই কাফন চাই।
ওহে এমুন মেহমানের
লিগা গাড়া খুইদ্যা যাই।

[ আরেকটা খুলি ছুঁড়ে দিল।]

হ্যামলেট : এই যে আরেকটা। এই খুলি কি একজন উকিলের হতে পারে না? এখন কোথায় গেল তার মারপ্যাঁচ, বাকচাতুরী, বারফট্টাই, তার মামলা-মোকদ্দমা, ভোগদখল, আর তার কেরদানি? এই যে জংলি পাজির পা ঝাড়াটা নোংরা কোদালের ধাক্কায়, তার খুলিটাকে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ঠেলে দিচ্ছে, এতে

সে লোকটার বিরুদ্ধে হামলাসংক্রান্ত মামলা ঠুকে দিচ্ছে না কেন? হুম! হয়তো সে ছিল ওর সময়কার জমির তুখোড় খরিদদার। আইন-কানুন, মুচলেক। জরিমানা, দু'রকমের রসিদ, পুনঃপ্রাপ্তির দলিল দস্তাবেজ নিয়ে সে ছিল ভরপুর। ওর সুন্দর খুলিটাকে মসৃণ ধূলিকণায় ভরাট করে তোলার জন্যেই কি এই দখলীস্বত্ব, আদালতের চূড়ান্ত রায়? এই কি ওকালতির কৃতিত্বের পরিণাম? ওর জমির দলিল-দস্তাবেজ, রসিদপত্তর, যা দু'রকম ভাবে করা হয়েছিল, এসব কিছুই আজ সামান্য এক জোড়া চুক্তিনামা বৈ তো নয়। জমির স্বত্বাধিকারের দলিলগুলো হয়তো এই বাক্সে আঁটবে না। আর এত কিছু যার ভোগদখলে, সেই মালিকের নসিবেও এর বেশি কিছু জুটবে না। হাঃ।

হোরেশিও : এক রত্তিও বেশি নয়, যুবরাজ।

হ্যামলেট : দলিলের কাগজপত্তর ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি হয়, তাই না?

হোরেশিও : হ্যাঁ কুমার, বাছুরের চামড়া দিয়েও তৈরি হয়।

হ্যামলেট : এতে যারা দখলীস্বত্বের নিশ্চয়তা তালাশ করে বেড়ায় তারা ভেড়া আর বাছুর ছাড়া কিছু নয়। আমি এই লোকটার সঙ্গে কথা বলব। ও মিয়া, এটা কার কবর?

গোরখোদক : আমার হুজুর।

[ গান গায় ]

ওহে এমুন মেহমানের
লিগা গাড়া খুইদ্যা যাই।

হ্যামলেট : হ্যাঁ, বাস্তবিকই এটা তোমার মনে হচ্ছে। কারণ, তুমি এখানে ডেরা গেড়েছো।

গোরখোদক : আপনে এই ডার বাইরে ড্যারা গাড়ছেন, হেই লিগা এইডা আপনের না। আগর আমার কথা কন, তাহলে আমি এহানে ড্যারা গাড়ি নাইক্যা, তবু এইডা আমার।

হ্যামলেট : তুমি সেখানে ডেরা গেড়ে বলছো ওটা তোমার; এটাতো বেহুঁশদের জন্যে, হুঁশিয়ারদের জন্যে নয়। তাই ওটা তোমার ডেরাই বলা যায়।

গোরখোদক : হুঁশিয়ার আস্তানা জনাব; আমারে ছাইড়া ফিরে আপনের নজদিকে চইলা যাইবার পারে।

হ্যামলেট : কোন ভদ্রলোকের জন্যে কবর খুঁড়ছো?

গোরখোদক : কুনো ভদ্দর লোকের লিগা না, জনাব।

হ্যামলেট : তাহলে কোন বিবি সাহেবার জন্যে?

গোরখোদক : কুনো বিবি সাবের লিগা বি না।

হ্যামলেট : তবে এখানে কাকে কবর দেয়া হবে?

গোরখোদক : এমুন একজনের, যে একসময় বিবিসাব আছিলো। তয় অর রুহের মাগফেরাত চাই, হে ইন্তেকাল করছে।

হ্যামলেট : লোকটা মোক্ষম কথা বলছে। আমাদেরও যথার্থ কথা বলতে হবে শব্দকোষ দেখে, নইলে দু'মুখো কথার ঠেলায় আমরা মাঠে মারা যাব। প্রভুর শপথ হোরেশিও, এই তিন বছর যাবত আমি লক্ষ করছি — এই যুগটা এমন চোস্ত হয়ে উঠেছে যে চাষাভুষোর জুতো রাজসভাসদের গোড়ালি ছুঁয়ে যায় যে তার গায়ের হাজা ছড়ে যেতে পারে। তুমি কদ্দিন যাবত গোরখোদকের কাজ করছো হে?

গোরখোদক : আমার মনে অয়, যেই রোজ আমাগো আগের রাজা হ্যামলেট ফর্টিনব্রাসরে লড়াইয়ে হারাইয়া দিছিলেন অক্করে হেই রোজ থিকা এই কামে লাগছি।

হ্যামলেট : তা কদ্দিন হল?

গোরখোদক : কেলা, আপনে কইবার পারেন না? একডা বুরবকও এইডা কইতে পারে। হেই দিনেই তো, যেদিন রাজকুমার হ্যামলেট পয়দা অয়; যেউগা এহন পাগলা অইয়া গ্যাছে; যারে ইংল্যান্ডে পাঠাইয়া দিছে।

হ্যামলেট : জিজ্ঞেস করতে পারি, ওকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হল কেন?

গোরখোদক : কেলা আবার? হে পাগলা বইলা। হে ঐহানে অর আক্কল পসন্দ ফিরা পাইব। আগর না পায়, তয় ঐহানে এইডা কুনো বড় বাত না।

হ্যামলেট : কেন?

গোরখোদক : ঐ স্থানে অরে পাগল বইলা চেনাই যাইব না ঐ স্থানে অর রহম হগল হালাই পাগলা।

হ্যামলেট : কী করে সে পাগল হল?

গোরখোদক : ওরা কয়, বড়ো আজব রহম।

হ্যামলেট : কী রকম আজব?

গোরখোদক : খোদার কসম, আক্কল টাক্কল হগ্খাইয়া আজব।

হ্যামলেট : কোন জায়গায়?

গোরখোদক : কেলা এইহানে, এই ডেনমার্কে। আমি এহানে বাচপন থিকা তিরিশ বচ্ছর ধইরা কব্বর খোদনের কাম করতাছি।

হ্যামলেট : গলে-পচে যাবার আগে একজন লোক কদ্দিন মাটির তলায় শুয়ে থাকতে পারে?

গোরখোদক : মযহবের দোহাই, শরীরডা আগর মৌতের আগেই পইচা
গিয়া না থাকে, — আমরা আইজকাইল বসন্ত
বিমারীর লাশ পাইতাছি যেগুলান
দাফন-কাফনের আগেই পইচা গইলা যায়, —
ঐ রকম না অইলে আট নয় বচ্ছর টিঁইক্যা
থাকবার পারে। একডা চামার হালায় নয় বচ্ছর টিঁইক্যা
থাকবার পারে।

হ্যামলেট : সে অন্যের চেয়ে বেশি কেন টেকে?

গোরখোদক : এই লিগা জনাব, হের কায়-কারবারে হের আপনা শরীলের চামড়া এমুন পাক্কা অইয়া যায় যে, পানি ওর শরীলের বইবারই পারে না। আর আপনের পানিই তো আপনার শরীলরে পচাইয়া ফালায়। এই যে এহানে এক হালার মাথার খুলি; এই খুলিডা মাটির বিতরে হান্দাইয়া আছিলো এক কুড়ি তিন বচ্ছর।

হ্যামলেট : এটা কার খুলি?

গোরখোদক : এক হালা পাগলা জাউড়ার। আপনে ভাবতাছেন কার?

হ্যামলেট : না, আমি জানি না।

গোরখোদক : হেই বজ্জাত পাগলটার উপরে গজব পুড়ুক। একবার ঐ হালায় আমার মাথায় এক সোরাই শরাব ঢাইলা দিছিল। এই খুলিডাই, জি হাঁ, এইডাই আছিল রাজদরবারের ভাঁড় ইয়োরিকের মাথার খুলি।

হ্যামলেট : এটা? [ খুলি তুলে নেয়। ]

গোরখোদক : অক্করে এইডাই।

হ্যামলেট : হায়, দুর্ভাগা ইয়োরিক। আমি ওকে চিনতাম হোরেশিও। অশেষ রসবোধ ছিল লোকটার, কল্পনাশক্তি ছিল চমৎকার, সে আমাকে হাজার বার ওর পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে; আর এখন – সেই লোকটাকেই আমার কল্পনায় কেমন বীভৎস ঠেকছে। দুর্গন্ধে আমার বমি আসছে। এখানে ঝুলে থাকত ওর

ঠোঁট, যেখানটায় কতবারই না আমি চুমো খেয়েছি। এখন কোথায় তোমার ঠাট্টা-মস্করা? কোথায় তোমার তিড়িং-তিড়িং নাচ, গান, আমোদ-ফুর্তির ঝলসানি, — যা আবার টেবিলে হাসির তুফান বইয়ো দিত। তোমার নিজের এই ভেংচি-কেটে হাসা দেখে তুমি একটিবারও উপহাস করতে পারবে না। তুমি এখন বেজায় মনমরা হয়ে গ্যাছো? যাও, এখন কোনো বনেদি মহিলার ঘরে গিয়ে বলে যাও, তিনি মুখে যত পুরু করেই রঙ মাখুন না কেন, একদিন এই পরিণামই তাঁর হবে। এ-কথা বলে তাঁকে হাসাতে পারো কি না দ্যাখো। —মিনতি জানাই হোরেশিও, আমাকে একটা কথা বলো।

হোরেশিও : কী কথা, যুবরাজ?

হ্যামলেট : তোমার কি মনে হয় কবর দেয়ার পর আলেক-জান্ডারেরও এমন সুরৎ হয়েছিল?

হোরেশিও : অবিকল এরকমই।

হ্যামলেট : ওর খুলিতেও কি এরকম দুর্গন্ধ ছিল? থুঃ। [ খুলি ফেলে দিল। ]

হোরেশিও : অবিকল এরকমই যুবরাজ।

হ্যামলেট : আমাদের কী মর্যাদা-হানিকর পরিণতিই না হয়, হোরেশিও। কেন, আমরা এ-ও তো কল্পনা করে নিতে পারি যে আলেকজান্ডারের মরদেহের মহান ধুলো দিয়ে মদের পিপের ছ্যাঁদা বন্ধ করা হয়েছে।

হোরেশিও : বিবেচনা করে দেখলে এরকম খতিয়ে কল্পনা করা খুবই মুশকিল।

হ্যামলেট : না, ধর্মের দোহাই, একরত্তিও নয়। কল্পনাকে বহুদূর প্রসারিত না করে এবং সকল সম্ভাব্যতা যথার্থ অনুসরণ করলে দাঁড়াবে — আলেকজান্ডার মারা গেলেন, আলেকজান্ডারকে কবর দেয়া হল, মাটি আর মাটি থেকে আমরা তৈরি করতে পারি কাদা। আর তাই যদি হয় যে কাদায় তিনি রূপান্তরিত হলেন তা' দিয়ে কি বন্ধ করা যাবে না মদের পিপের ছ্যাঁদা?
উদ্ধত সিজার মৃত, যিনি রূপান্তরিত কাদায়,
বন্ধ করে রাখছেন ছিদ্রমুখ উত্তুরে হাওয়ায়

বাতাস ঠেকাতে; আহা যে মাটি একদা পৃথিবীকে
কাঁপাত, আজ তা বন্ধ করে প্রাচীরের ছিদ্রটিকে।
কিন্তু চুপ, চুপ থাকো কিছুক্ষণ। রাজা আসছেন,
সঙ্গে রানি, সভাসদগণ।
[ কফিন নিয়ে শববাহীগণ, ধর্মযাজক, রাজা, রানি,
লেয়ার্তেস সহচরবৃন্দের প্রবেশ।]
কার অনুগামী ওরা?
কার জন্যে এরকম পঙ্গু অনুষ্ঠান? মনে হয়,
যার এই শবানুগমন, সে মরিয়া হয়ে তার
স্বহস্তে করেছে নাশ নিজের জীবন। সম্ভবত
উচ্চবংশে জন্ম তার। এসো লক্ষ করি চুপচাপ
অন্তরাল থেকে।

। : আর কী কী অনুষ্ঠান বাকি?

হ্যামলেট : এই হল লেয়ার্তেস, মহান যুবক। লক্ষ করো।

লেয়ার্তেস : আর কী কী অনুষ্ঠান বাকি?

ধর্মযাজক : আমাদের ক্ষমতায় যতটা কুলায় ততটাই
করেছি পালন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান।
সন্দেহজনক মৃত্যু তার; আর যদি ঐ রাজ
নির্দেশে আচারবিধি পালটানো না হতো তবে তাকে
শেষ বিচারের শিঙাধ্বনি বেজে না ওঠা পর্যন্ত
অশোধিত সমাধিতে ঠাঁই পেতে হত : আর তার
কবরের উপর করুণাময় পূত প্রার্থনার
বদলে কাঁকর, নুড়ি আর পাথর বর্ষিত হত।
অথচ এখানে সে পেয়েছে কুমারীর ফুলমালা
পুষ্পের তর্পণ আর ঘন্টধ্বনিসহ যথাযোগ্য
সমাধির অন্তিম আশ্রয়।

লেয়ার্তেস : এর বেশি কিছুই করার নেই আর?

ধর্মযাজক : এর বেশি
কিছুই করার নেই। শান্তিতে যেসব আত্মা গত
হয়েছে, তাদের যোগ্য স্তবগান যদি গাই তারও
আত্মার সদগতি আর শান্তি বিধানের জন্যে, তবে
আমরা করবো হেয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে।

লেয়ার্তেস : তবে ওকে
কবরে শুইয়ে দাও। আর তার সুশ্রী, নিষ্কলুষ
নিষ্পাপ দেহাবশেষ থেকে মল্লিকা উঠুক ফুটে।

অসভ্য যাজক শোনো, বলি তোমাকে, যখন তুমি
নরকে চেল্লাবে শুধু তখন আমার সহোদরা
দেখা দেবে দেবদূতী রূপে।

হ্যামলেট : হা, সুন্দরী ওফেলিয়া।

রানি : [ ফুল ছড়িয়ে ] মধুরের জন্যে এই মাধুর্য তর্পণটুকু থাক।
বিদায়, আমার আশা ছিল তুমি হবে
আমার হ্যামলেটের বধু : মধুর কুমারী, ভেবে-
ছিলাম তোমার এই কবরের উপর ফুল না
ছড়িয়ে তোমার আলোকিত বাসরের ফুলশয্যা
সাজাবো সযত্নে আমি।

লেয়ার্তেস : হায়, তিনগুণ দুঃখ ত্রিশ
গুণ হয়ে নামুক ত্বরিত অভিশপ্ত সে মাথায়,
কুটিল বজ্জাতি যার করেছ বঞ্চিত তোকে তোর
অত্যন্ত তৎপর সুচেতনা থেকে। ক্ষণকাল বন্ধ থাক
মাটি ফেলা, আমি তাকে আরো একবার এই দুটি
বাহুতে জড়াতে চাই। [ কবরে লাফিয়ে নামে। ] এখন
তোমরা ছুঁড়ে দাও
মাটি জীবিতের আর মৃতের উপর, যতক্ষণ
পর্যন্ত না গড়ে ওঠে একটি পাহাড় যা প্রাচীন
বিন্ধ্য পর্বতের চূড়া কিংবা দূর নীল কৈলাসের
আসমান-ছোঁয়া শৃঙ্গকেও সহজে ছাড়িয়ে যায়।

হ্যামলেট : কার শোক এমন প্রবল হয়ে উঠেছে? এ কার
বেদনার ভাষা জাদুবলে বিস্ময়-আহত শ্রোতাদের
মতো নক্ষত্রের সঞ্চরণ স্তব্ধ করে দিচ্ছে? সে তো
আমি। দিনেমার হ্যামলেট।

: [ তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি ]
শয়তান কব্জায় নিক তোর আত্মা

হেমল্যাট : তোমার প্রার্থনা।
সমীচীন নয়; অনুরোধ করি, তোমার আঙুল
সরাও আমার গলা থেকে; যদিও বদমেজাজি,
হঠকারী নই আমি, তবুও আমার মধ্যে আছে
এমন খতরনাক কিছু, বুদ্ধিমান হলে তুমি
তাকে ভয় পাবে অবশ্যই, সরাও তোমার হাত।

রাজা : ওদের ছাড়িয়ে দাও।

রানি : হ্যামলেট! হ্যামলেট!

সকলে : প্রভু, প্রভু, কুমার, কুমার।

হোরেশিও : সহৃদয় যুবরাজ, শান্ত হোন।

হ্যামলেট : যতক্ষণ আমার চোখের পাতা কাঁপতে থাকবে
ততক্ষণ এ বিষয়েআমি তার সঙ্গে লড়ে যাব।

রানি : হে আমার পুত্র, কোন সে বিষয়?

হ্যামলেট : ওফেলিয়াকে ভালোবাসতাম আমি। চল্লিশ হাজার
সহোদর তাদের সমস্ত ভালোবাসা নিয়েও তো
সমতুল্য হবে না আমার। বলো, তার জন্যে কী করবে
তুমি?

রাজা : আহা লেয়ার্তেস, সে উন্মাদ হয়ে গেছে।

রানি : ঈশ্বরের প্রেমের দোহাই, ওকে বিরক্ত করো না।

হ্যামলেট : জান কবুল, দেখাও আমাকে কী করতে পারো তুমি।
কাঁদবে? লড়বে? করবে কি উপোস, নিজেকে টুকরো
টুকরো করে ফেলবে? একটা নদী শুষে নেবে? না কি
গিলবে কুমির? আমি তা করব। তুমি কি এখানে
নাকী সুরে কাঁদতে এসেছো? ওর কবরে ঝাঁপিয়ে
পড়ে তুমি আমার উপর টেক্কা দিতে এসেছো কি?
ওর সঙ্গে জিন্দা কবরস্থ হও, আমিও তা হব।
আর যদি পাহাড়-টাহাড় নিয়ে কথায় তুবড়ি
ছোটাও, তাহলে ওরা লক্ষ লক্ষ বিঘা জোড়া মাটি
ছুঁড়ে দিক আমাদের উপর যতক্ষণ না এই
মাটি সূর্যে ঠেকে গিয়ে হিমালয়কেও একরত্তি
আঁচিলের মতো করে দেয়। তুমি যত
বেসামাল বেধড়ক তর্জন গর্জন করে যাবে
আমিও ততই করে যাব।

রানি : এ নিছক পাগলামি,
আর এই হাল ওর ওপর থাকবে ভর করে
কিছুক্ষণ। তারপর এক অবসন্ন নীরবতা
তাকে ছেয়ে ফেলবে যেমন বনকপোতীকে তার
ডিম ফুটে যুগল সোনালি শাবকের বেরুনোর
ঠিক পর পর।

হ্যামলেট : শুনছেন মহাশয়, কী কারণে
আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যাভার করছেন?
আপনাকে আমি ভালোবেসে এসেছি সর্বদা, কিন্তু
এতে কিছু এসে যায় নাকো। খোদ হারকিউলিস

যা করার করুনগে, বেড়াল তো চেঁচাবেই আর
কুকুরের অন্তত একটিবার আসবে সুদিন।

[ প্রস্থান ]

রাজা : অনুরোধ করি শান্ত হোরেশিও, তার সঙ্গো থাকো।

[ হোরেশিওর প্রস্থান। ]

[ লেয়ার্তেসকে ] আমাদের গত রাত্তিরের আলাপ
স্মরণে রেখে
দৃঢ়তার সঙ্গো ধৈর্য ধরো : ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি
আমরা ফেলব সেরে। গারট্রুড, তোমার পুত্রের
উপর নজর রেখো। এ কবরে একটি জীবন্ত
স্মৃতিসৌধ হবে, শীঘ্র আসবে শান্তির দিনক্ষণ,
এসো ধৈর্য ধরে কাজ করে যাই আমরা ততক্ষণ।

[ প্রস্থান। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ হ্যামলেট এবং হোরেশিওর প্রবেশ ]

গোরখোদক : এ ব্যাপারে এটুকুই যথেষ্ট, এখন অন্য কথা বলা যাক।
সমস্ত ঘটনা মনে আছে তো তোমার?

হোরেশিও : মনে আছে যুবরাজ!
আমার অন্তরে চলছিলো এক ধরনের যুদ্ধ,
যা আমাকে ঘুমোতে দেয়নি। মনে হয়েছিল আমি
কঠিন শেকলে-বাঁধা বিদ্রোহীর চেয়েও অনেক
বেশি কষ্টে পাটাতনে পড়েছিলাম, হঠাৎ ক'রে —
আর হঠকারিতার প্রশংসাই প্রাপ্য : আমাদের
জেনে রাখা দরকার, যখন গভীর ষড়যন্ত্র —
গুলি আমাদের ব্যর্থ হয়, তখন অবিবেচনা
মাঝে মাঝে খুব কাজে আসে আমাদের; আর এর
থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত যে আমরা যত
এলেবেলে ভাবে চলিই না কেন একটি অদৃশ্য
শক্তি আমাদের পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করে —

হোরেশিও : খুবই ঠিক কথা।

হ্যামলেট : জাহাজের কক্ষ থেকে
উঠে এসে গায়ে শুধু সামুদ্রিক কামিজ জড়িয়ে
অন্ধকারে চুপিসারে তাদের খুঁজছিলাম; শেষে
পূর্ণ হল আমার বাসনা, আমি হাতিয়ে ওদের
চিঠির মোড়ক অবশেষে এলাম নিজের কক্ষে
ফিরে পুনরায়, আমি তখন নিজের নিরাপত্তা
বিষেয় উদ্বিগ্ন হয়ে শিষ্টাচার ভুলে অনেকটা
সাহস সঞ্চয় করে সিলমোহর ভেঙে টেঙে খুলে
ফেললাম ওদের সনদপত্র; হোরেশিও, ওতে
দেখতে পেলাম কী ভীষণ রাজকীয় বদিয়াতি! -
সুস্পষ্ট নির্দেশ, যেন আমার মাথাটা ধড় থেকে
ছিন্ন করা হয় পত্রপাঠ কাল বিলম্ব না করে,
এমন কী কুঠার শাণিত করবার মহলত
না দিয়েই। সে নির্দেশে নানা যুক্তির ভিয়েন ছিল,
ছিল ডেনমার্ক আর ইংল্যান্ড উভয়ের
কুশল কামনা, বলা ছিল আমার জীবন নাকি
জুজু আর ভূতপ্রেতে ভরপুর।

| | | |
|---|---|---|
| হোরেশিও | : | এও কি সম্ভব? |
| হ্যামলেট | : | এই সে নির্দেশনামা, অবসর মতো পড়ে নিও।<br>এখন শুনবে তুমি এরপর কীভাবে হলাম অগ্রসর? |
| হোরেশিও | : | আমার একান্ত অনুরোধ, বলুন কুমার। |
| হ্যামলেট | : | এভাবে জড়িয়ে গিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বজ্জাতির জালে —<br>আমার বুদ্ধির কাছে নিবেদন করার আগেই<br>তার খেলা শুরু হয়ে গেল — আমি বসে পড়লাম,<br>নতুন সনদপত্র মুসাবিদা করে পুনরায়<br>স্পষ্টাক্ষরে লিখলাম — আমাদের রাজনীতিবিদদের<br>মতো ঠিক আমিও একদা মনে করতাম, সুশ্রী<br>হস্তাক্ষর অভিজাত ঘরানার পরিচয়বাহী<br>নয়, আর তাই সেই কেতা ভুলে যেতে ঢের শ্রম<br>করতে হয়েছে, কিন্তু এখন সে শিক্ষাই আমার<br>খুব কাজে দিল, বলো, তুমি কি জানতে চাও আমি<br>কী মর্মে তা লিখলাম? |
| হোরেশিও | : | হ্যাঁ, জানতে চাই যুবরাজ। |
| হ্যামলেট | : | রাজার সাগ্রহ অনুরোধ, যেহেতু ইংল্যান্ড তাঁর<br>বিশ্বস্ত করদরাজ্য, যেহেতু দু'দেশের সম্প্রীতি<br>বেড়ে যাবে তমাল গাছের মতো, যেহেতু শান্তির<br>শস্যময় মালা সদা থাকবে সংযোগ-চিহ্ন হয়ে<br>দু'দেশের বন্ধুতার, আর এরকম আরো আরো<br>তাবৎ ওজনদার যেহেতু একত্র করে বলা<br>যে এই নির্দেশনামা পাঠে বিষয়টি অবগত<br>হওয়া মাত্র এতটুকু কালক্ষেপ না করে এবং<br>ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকারের সময় না দিয়ে<br>ইংল্যান্ড রাজ যেন পত্রবাহীদের অকস্মাৎ<br>কতল করেন। |
| হোরেশিও | : | এতে কী করে মোহর লাগালেন? |
| হ্যামলেট | : | এমনকি এতেও দৈবের সহায়তা পেয়ে গেছি।<br>আমার টাকার থলেটাতে ছিল আমার পিতার<br>ছোটো সিলমোহরাঙ্কিত আংটি যা ডেনমার্কের<br>রাজকীয় মোহরের মতো অবিকল। এ পত্রটি<br>আগেকারটির মতো ভাঁজ করে নিয়ে করলাম<br>স্বাক্ষর এবং সিলমোহরের ছাপএঁকে সেটা<br>নিরাপদে আবার দিলাম রেখে। পরিবর্তনের |

কথা কাকপক্ষীতেও টের পায়নিকো। পরদিন
সমুদ্রে বাধল যুদ্ধ আর তার পূর্বাপর তুমি
ইতিমধ্যে জেনে গেছো।

হোরেশিও : তাহলে গিল্ডেনস্টার্ন এবং রোজেনক্রান্‌জ গেছে
মৃত্যুলোকে।

হ্যামলেট : কেন বন্ধু, ওরা একাজটা দিব্যি ভালোবেসে করেছিল।
ওরা তো আমার বিবেকের ত্রিসীমায় নেই, আর
ওরা ধ্বংস হয়েছে ওদের নিজেদের চক্রান্তের
পরিণামে। যখন প্রবল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মেতে
ওঠে যুদ্ধে, তখন তাদের অতিশয় বেপরোয়া
তীক্ষ্ণধার অসির ফলার মাঝখানে অধমের
প্রবেশ বিপদ ডেকে আনে।

হোরেশিও : বলো, এ কেমন রাজা?

হ্যামলেট : এখন তোমার মনে হচ্ছে না কি আমার কর্তব্য
এ মুহূর্তে এই বাহু দিয়ে তাকে শেষ করে দেয়া—
এবং এটাই হবে বিবেকের পূর্ণ পরিচয় —
যে আমার রাজাকে করেছে হত্যা, মাকে কলঙ্কিত,
দাঁড়িয়ে রয়েছে সিংহাসন আর আমার মাঝখানে,
এবং আমার প্রাণ গেঁথে ফেলতে চেয়েছে তার
বড়শিতে কী ভীষণ ফন্দি এঁটে। যদি আমি এই
দুষ্ট ক্ষতটিকে আরো বিষ ছড়াবার অবকাশ দিই তবে
অভিশপ্ত হব না কি?

হোরেশিও : ইংল্যান্ডে সেই ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়িয়েছে
সে খবর তাঁর কাছে শীঘ্র পৌঁছে যাবে।

হ্যামলেট : তা শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। মধ্যবর্তী সময়টুকুই
আমার, এবং মানুষের জীবন তো শুধু এক
গুণতে যতক্ষণ লাগে তার বেশি নয়। কিন্তু প্রিয়
হোরেশিও, আমি খুবই দুঃখিত যে লেয়ার্তেসের
সমুখে নিজেকে ভুলে গেছিলাম; কেননা আমার
উদ্দেশ্যের মধ্যে আমি দেখি তার লক্ষ্যের প্রচ্ছায়া।
আমি তার অনুগ্রহ কামনা করব; তবে সত্য,
তার শোকপ্রকাশের বারফট্টাই আমাকে রাগে
এমন উতলা করেছিল।

হোরেশিও : চুপ, কে যেন আসছে।
[ অসরিকের প্রবেশ]

অসরিক : যুবরাজকে ডেনমার্কে খোশ আমদেদ জানাই।

| | | |
|---|---|---|
| হ্যামলেট | : | আপনাকে বিনীত ধন্যবাদ জানাই। [ হোরেশিওকে আড়ালে ]<br>এই জলফড়িংটিকে চেন? |
| হোরেশিও | : | [ হ্যামলেটকে আড়ালে] না, যুবরাজ। |
| হ্যামলেট | : | [ হোরেশিওকে আড়ালে] তোমার বরাত আমার চেয়ে ভালো। কারণ, একে চেনাও একটা পাপ। ওর অনেক জমি-জিরেত আছে — উর্বর জমি। কোনো পশু যদি পশুদের রাজা হয়ে যায় তাহলে তার খাবারের থালাটিও রাজার ভোজনালয়ে চলে যাবে। এটা একটা দাঁড়কাক; কিন্তু যা বলেছি, এর দখলে প্রচুর জমি-জিরেত আছে। |
| অসরিক | : | প্রভু, যদি আপনার অবসর থাকে তাহলে আপনাকে মহারাজের একটা কথা জানাতে পারি। |
| হ্যামলেট | : | আমি সাগ্রহে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনব, জনাব। আপনার টুপিটা কেতামাফিক এস্তেমাল করুন, ওটাতো মাথার জন্যেই। |
| অসরিক | : | ধন্যবাদ প্রভু, বড্ড গরম। |
| হ্যামলেট | : | না, বিশ্বাস করুন, খুব ঠান্ডা; উত্তুরে হাওয়া বইছে। |
| অসরিক | : | বাস্তবিক, কিঞ্চিৎ ঠান্ডাই বটে। |
| হ্যামলেট | : | কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার শরীরের পক্ষে খুবই গুমোট আর গরম। |
| অসরিক | : | অত্যাধিক প্রভু, বেজায় গুমোট — বলা যায় — কী রকম তা বলা যাচ্ছে না। প্রভু, মহারাজ আপনাকে এ কথা জানানোর জন্যে আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি আপনার ওপর মস্ত বাজি ধরেছেন। কুমার, ব্যাপার হলো এই — |
| হ্যামলেট | : | [ তাকে মাথায় টুপি পরার ইশারা করে] আমার একান্ত অনুরোধ, মনে রাখবেন — |
| অসরিক | : | নাহ্, সহৃদয় যুবরাজ, বিশ্বাস করুন, এটা আমার আরামের জন্যে। প্রভু, লেয়ার্তেস দরবারে সদ্য ফিরে এসেছেন — বিশ্বাস করুন, তিনি নিখুঁত ভদ্রলোক, অসাধারণ গুণে গুণান্বিত, আচার আচরণে নম্র, সুশোভন, সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্বভাবের অধিকারী। বাস্তবিক, তাঁর সম্পর্কে যথার্থ বলতে গেলে তিনি হচ্ছেন ভদ্রসমাজের আদর্শ দৃষ্টান্ত; কারণ, কোনো ভদ্রবরের |

যেসব গুণাবলি থাকা দরকার, সেসবই আপনি তাঁর মধ্যে চাক্ষুস দেখতে পারেন।

হ্যামলেট : জনাব, আপনার বয়ানে তাঁর গুণপনা এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যদিও আমি জানি তাঁর গুণাবলির তালিকা আলাদাভাবে তৈরি করতে গেলে স্মৃতির গণিত তালগোল পাকিয়ে যাবে, দ্রুতগামী স্মৃতির সাধ্য নেই তাঁর গুণাবলির সঙ্গে তাল রেখে চলে। কিন্তু তাঁর বিষয়ে যথার্থ তারিফ করতে গেলে বলতে হয়, তিনি মহৎপ্রাণ; তাঁর মধ্যে এমন দুর্লভ গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে যে তা বয়ান করা মুশকিল;
তাঁর আয়নায় প্রতিফলিত তাঁর যথার্থ প্রতিচ্ছবি, যে তাকে অনুকরণ করতে যাবে সে হবে শুধু ছায়া, তার বেশি কিছু নয়।

অসরিক : যুবরাজ তাঁর সম্পর্কে নিখুঁত বয়ান দিলেন।

হ্যামলেট : কিন্তু এসবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে কী? আমরা কেন সেই ভদ্রবরকে আমাদের ইতর নিশ্বাসপ্রশ্বাসে জড়িয়ে ফেলছি?

অসরিক : কী বললেন কুমার?

হোরেশিও : আপনি দেখছি মাতৃভাষাও বোঝেন না, আচ্ছা লোক তো!

হ্যামলেট : সেই ভদ্রলোকের নাম উচ্চারণ করার মানে কী?

অসরিক : লেয়ার্তেসের?

হোরেশিও : এরই মধ্যে ওর পুঁজিপাটা ফুরিয়ে গেছে; সোনার মতো চকচকে সব কথা তিনি খরচ করে ফেলেছেন।

হ্যামলেট : তাঁর সম্পর্কেই জনাব।

অসরিক আমার জানা আছে ওটা আপনার অজানা নয় —

হ্যামলেট : জনাব, যদি আপনি জানতেন। বিশ্বাস করুন, আপনি যদি জানতেনও তাতে আমার সুনাম বাড়বে না। বেশ বলুন, তাহলে।

অসরিক : লেয়ার্তেসের কৃতিত্বের কথা আপনার অজানা নয় —

হ্যামলেট : সে কথা স্বীকার করতে আমার সাহস হচ্ছে না, পাছে আমি কৃতিত্বের ব্যাপারে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে বসি; কিন্তু একজন মানুষকে ভালো করে জানা মানে নিজেকেই জানা।

অসরিক : যুবরাজ, আমি বোঝাতে চাইছি তার হাতিয়ারের ব্যাপারে; কিন্তু লোকে বলে, অসিখেলায় তার কোনো জুড়ি নেই।

হ্যামলেট : তার হাতিয়ার কী?

অসরিক : তলোয়ার আর ছোরা।

হ্যামলেট : দেখা যাচ্ছে তার হাতিয়ার দুটো। তা বেশ।

অসরিক : প্রভু, মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছয়টি আরবি ঘোড়ার বাজি ধরেছেন আর আমি যদ্দুর জানি লেয়ার্তেস বাজি ধরেছেন ছয়টি ফরাসি তলোয়ার আর ছয়টি খঞ্জর আর সেগুলোর আনুষঙ্গিক কোমরবন্ধ, চামড়ার বন্ধনী ইত্যাদি। বিশ্বাস করুন, ধারকগুলোর তিনটি অতীব চমৎকার হাতলের সঙ্গে মানানসই, দেখতে খুবই সুশ্রী, মার্জিত কারুকাজময়।

হ্যামলেট : ধারক বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

হোরেশিও : [হ্যামলেটকে আড়ালে] আমি জানতাম এবং বয়ান শেষ হবার আগে আপনি ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করবেন।

অসরিক : প্রভু ধারক হচ্ছে চামড়ার বন্ধনী।

হ্যামলেট : কথাটা খুবই খাটত যদি আমরা আমাদের কোমরে কামান ঝুলিয়ে রাখতাম। সেটি যখন হবার নয়, তাহলে চামড়ার বন্ধনী ধরে নেয়াই ভালো। আচ্ছা বলে যান। ছ'টি আরবি ঘোড়ার বদলে ছ'টি ফরাসি তলোয়ার, তাদের আনুষঙ্গিক আর তিনটি মার্জিত কারুকাজময় ধারক। এটাই হচ্ছে দিনেমার আর ফরাসি বাজি। আচ্ছা বলুন তো, এই বাজি ধরার কারণ কী?

অসরিক : মহারাজ, প্রভু, তার সঙ্গে বাজি ধরেছেন, প্রভু, যে আপনার আর তার মধ্যে অসিখেলা হলে বারো বারের মধ্যে তিনি তিনবারও আপনাকে চোট লাগাতে পারবেন না, আর লেয়ার্তেস নয় খেপের বদলে বারো খেপ অসিখেলা চাইছেন। আর যদি অনুগ্রহ করে রাজি হন তাহলে এক্ষুনি এর একটি ফয়সালা হতে যেতে পারে।

হ্যামলেট : আমি যদি বলি না, তাহলে?

অসরিক : প্রভু, আমি বলছিলাম, এই নৈপুণ্যের পরীক্ষায় আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না।

হ্যামলেট : জনাব, এখন আমি এই মহলে পায়চারি করব। মহারাজকে অনুগ্রহ করে জানান, এটা আমার দৈনিক কসরৎ-এর সময়। তলোয়ারগুলো এখানে আনা হোক, যদি সেই ভদ্রবর রাজি না হন এবং মহারাজের খায়েশ অটুট থাকে, তাহলে যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, আমি মহারাজের জন্যে এই খেলা জিতব। যদি তা না হয়, তাহলে লজ্জা আর কয়েকটা বাড়তি চোট ছাড়া আমার কিছুই জুটবে না।

অসরিক : আপনার এই জবাবই কি তাঁদের জানাব?

হ্যামলেট : জনাব, আমার আমার জনাব এটাই: অবশ্যি আপনার স্বভাব অনুযায়ী ওতে যত খুশি পালিশ লাগাতে পারেন।

অসরিক : কুমার, আমি আপনার প্রতি আমার খেদমত নিবেদন করছি।

: আমি আপনার প্রতি। [ অসরিকের প্রস্থান।]
সে নিজেকে নিবেদন করে ভালোই করেছে; ওর উদ্দেশ্য হাসিল করবার মতো রসনা আর কারোরই নেই।

হোরেশিও : টিটির চিড়িয়াটা ভাঙা ডিমের খোল মাথায় নিয়েই দৌড় লাগিয়েছে।

হ্যামলেট : মায়ের স্তন পান করার আগে নিশ্চয়ই সে মহাসমারোহে পর্ব পালন করত। এমনিভাবে সে এবং একই পালকের আরও অনেকে শুধু সময়ের সুর এবং সামাজিক সৌজন্যের বারফট্টাই শিখেছে। আমি জানি, এরা এই ইতর সময়ের প্রিয়পাত্র। এরা হল সেই ফেনার সমাহার যা জনসাধারণের মতামতের কুলো আর চালুনির ফোকর দিয়ে সহজেই বেরিয়ে যায়। ওদের ফুঁ দিয়ে যাচাই করে দেখা বুদবুদগুলো ফেটে যাবে।
[ জনৈক সভাসদের প্রবেশ]

সভাসদ : যুবরাজ, মহারাজ তরুণ অসরিকের মারফত আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে বলেছেন যে, আপনি তাঁর সঙ্গে মহলে দেখা করবেন। তিনি আমাকে জানতে পাঠালেন, লেয়ার্তেসের সঙ্গে অসিখেলার সিদ্ধান্তে আপনি এখনো অবিচল কিনা, নাকি আপনি আরো কিছু মহলত চান।

হ্যামলেট : আমি আমার উদ্দেশ্যে অবিচল আছি, তা মহারাজের সানন্দ ইচ্ছার অনুগামী। এই সময়ই যদি তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহলে আমিও তৈরি আছি। এখন কিংবা অন্য যেকোনো সময়ে, তখনো যদি আমি এখনকার মতোই সমর্থ থাকি।

সভাসদ : রাজা, রানি এবং অন্যান্য সবাই এ দিকটায় আসছেন।

হ্যামলেট : ভালো সময়েই আসছেন তাঁরা।

সভাসদ : রানি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অসিখেলায় আপনি যেন লেয়ার্তেসের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

হ্যামলেট : তিনি আমাকে ভালো নির্দেশ দিয়েছেন। [ সভাসদের প্রস্থান।]

হোরেশিও : আপনি হেরে যাবেন, কুমার।

হ্যামলেট : আমার তা মনে হয় না। ওর ফরাসি দেশে যাবার পর আমি লাগাতার অনুশীলন চালিয়ে গেছি। এ খেলায় আমি জিতে যাব। আমার অন্তর যে কী রকম বিষণ্ণ হয়ে আছে তা তুমি ভাবতেই পারবে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

হোরেশিও : নাহ্ সদাশয় যুবরাজ।

হ্যামলেট : এটা বোকামি বই তো নয়, কিন্তু এটা এমন এক ধরনের আশঙ্কা যা শুধু একজন নারীকেই বিচলিত করতে পারে।

হোরেশিও : যদি কোনো কিছুতে আপনার মন না সরে, তবে মনের নির্দেশই মেনে চলুন। আমি তাঁদের এখানে আসা আগেভাগেই বন্ধ করে দেব, বলবো যে আপনি এখনো পুরোপুরি তৈরি নন।

হ্যামলেট : একরত্তিও না। আমি অশুভ পূর্বাভাসকে আমল দিচ্ছি না। একটা চড়ুইয়ের পতনের মধ্যেও আছে বিধির বিশেষ বিধান। এটা যদি এখন হয় তাহলে এটা ভবিষ্যতে ঘটবে না; যদি এটা এখন না ঘটে, তবে আগামীতে ঘটতে পারে। আসলে প্রস্তুতিই সব। যেহেতু মানুষ সঙ্গে নিজের বলতে কিছুই নিয়ে যেতে পারে না, তাই অকালে ছেড়ে গেলে কী এসে যায়? যা হবার তাই হোক।

[ টেবিল প্রস্তুত। তূর্য, দামামা আর কুশন নিয়ে রাজকর্মচারীদের প্রবেশ। রাজা, রানি; লেয়ার্তেস (অসরিক), সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও তরবারি ও ছোরাসহ অনুচরবর্গের প্রবেশ।]

রাজা : এসো হ্যামলেট, আমার হাত থেকে এ হাত তুমি গ্রহণ করো।

[ লেয়ার্তেস-এর হাতে হ্যামলেটের হাত রাখে।]

হ্যামলেট : মার্জনা করুন মহাশয়। আমি আপনার প্রতি অন্যায় করেছি; কিন্তু যেহেতু আপনি ভদ্র; তাই আমাকে করুন ক্ষমা। এই উপস্থিত সমাবেশ জানে আর আপনি নিজেও শুনে থাকতে পারেন মানসিক উদ্‌ভ্রান্তিতে কী বকম উৎপীড়িত আছি; এই আমি ঘোষণা করছি, আমি যা করেছি, যাতে আপনার স্বভাব বিক্ষুব্ধ, আর সম্মান আহত আর বিরাগ হয়েছে প্রজ্জ্বলিত, তার জন্যে আমার এ উন্মত্ততা ছাড়া অন্য কিছু দায়ী নয়। লেয়ার্তেস-এর প্রতি যে অন্যায় করা হল তা কি হ্যামলেট করেছে? কখনো হ্যামলেট তা' করেনি। যদি হ্যামলেট তার নিজের সত্তার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, আর যখন সে নিজের ভিতর নেই আর তখন সে লেয়ার্তেস-এর প্রতি অন্যায় করলে, সেটা হামলেট করে না এবং হ্যামলেট তা নিশ্চিত অস্বীকার করে। তা'হলে তা কে করেছে? তার সেই উন্মত্ততা। যদি তাই হয়, তবে হ্যামলেটও অন্যায়ের হয়েছে শিকার; তার উন্মত্ততা বেচারী হ্যামলেটের শত্রু। মহাশয়, এই সভাসদের সমুখে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্দ কাজ অস্বীকার করছি এবং আপনার সহৃদয় বিবেচনা খাটিয়ে আমাকে দোষমুক্ত করে এ-কথা বলতে দিন, আমি নিজ গৃহে তির ছুঁড়ে আমার নিজের ভাইকেই জখম করেছি।

লেয়ার্তেস : স্বাভাবিক আবেগের দিক থেকে সন্তুষ্ট হয়েছি আমি, যদিও আমার উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাটাই তীব্র হওয়া ছিল সমীচীন। কিন্তু আত্মসম্মানের তাগিদে এখন আমি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকব এবং যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত, প্রাজ্ঞ জ্যেষ্ঠদের অনুমোদনে আমার মান রক্ষা এবং আমার নাম কলঙ্কমুক্ত রাখবার ব্যবস্থা না হয় ততক্ষণ আমি মানব না কোনো

রফা, তবে সে সময় অব্দি আপনার ভালোবাসা
ভালোবাসা বলেই গ্রহণ করব, তার অসম্মান
ঘটতে দেব না।

হ্যামলেট : আমি মুক্তমনে গ্রহণ করছি
আপনার কথা, আর একে ভায়ে-ভায়ে বাজি বলে
খেলে যাবো খোলা মনে। আমাদের তরবারি দাও।

লেয়ার্তেস : একটা আমাকে দাও।

হ্যামলেট : আমি আপনার পটভূমি হব লেয়ার্তেস, যাতে
আপনার নিপুণতা আমার অদক্ষতার পাশে
সবচেয়ে অন্ধকার রাতে নক্ষত্রের আগুনের
মতো চমকাবে।

লেয়ার্তেস : আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন।

হ্যামলেট : না, আমার হাতের শপথ।

রাজা : দাও হে তরুণ অসরিক দু'জনকে তরবারি
দাও। হ্যামলেট, বাজি কী তা জানো তো?

হ্যামলেট : তা জানি বইকি।
দুর্বল পক্ষের ওপরেই বাজি ধরেছেন, প্রভু।

রাজা : আমার সে ভয় নেই; আমি তোমাদের উভয়কে
দেখেছি, যেহেতু ইতিমধ্যে তার দক্ষতা বেড়েছে,
তাই আমি তোমাকে উপরে রেখে এ-বাজি ধরেছি।

: এটা বড়ো বেশি ভারি। আরেকটা দেখি।

: আমার এতেই হবে। সবগুলো দৈর্ঘ্য সমান তো?

অসরিক : হ্যাঁ আমার ভালো যুবরাজ। [ ওরা অসি খেলার জন্যে
তৈরি হয়।]

[ মদের সুরাইসহ ভৃত্যদের প্রবেশ।]

রাজা : ওই মেজে পানপাত্রগুলি সযত্নে সাজিয়ে রাখো।
যদি হ্যামলেট প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাত দেয়
অথবা তৃতীয়বারের আগেকার চোটের জবাব
দেয়, তবে দুর্গপ্রাকারের সকল কামান দাগা
হবে, আর রাজা হ্যামলেটের বর্ধিত শক্তির
উদ্দেশে সানন্দে করবেন পান আর এই পাত্রে
ফেলবেন সে অমূল্য মুক্তো যা ডেনমার্কের চার
চারজন প্রাক্তন রাজার মুকুটের রত্নটির
চেয়েও অধিক মূল্যবান। আমার নিকট সেই
পানপাত্রগুলি আনো — আর কাড়া নাকাড়ার ধ্বনি

থেকে তূর্য, তূর্য থেকে গোলন্দাজ এবং কামান
থেকে আসমানে আর আসমান থেকে মৃত্তিকায়
এ আওয়াজ ব্যাপক ছড়িয়ে যাক, 'এখন নৃপতি
পান করছেন হ্যামলেটের উদ্দেশে।' খেলা শুরু
করে দেয়া হোক, আর বিচারকগণ, আপনারা
সাবধানে নজর রাখুন।

হ্যামলেট : এই যে আসুন, ভদ্রবর।

লেয়ার্তেস : আসুন কুমার। [ তারা খেলা শুরু করে।]

হ্যামলেট : একবার।

লেয়ার্তেস : না।

হ্যামলেট : বিচারে কী বলে?

অসরিক : একটি আঘাত, দিব্যি স্পষ্ট এক চোট।

লেয়ার্তেস : তা বেশ আবার শুরু হোক।

রাজা : বোসো, সুরাপাত্র দাও আমাকে, এই যে হ্যামলেট এ
মুক্ত তোমার আর সুরাপান তোমার উদ্দেশে। [ দামামার
আওয়াজ, তূর্যধ্বনি, তোপধ্বনি] ওকে পানপাত্র দাও।

হ্যামলেট : আগে এই খেপ শেষ করে নিই। এই পাত্তরটা
আপাতত সরিয়ে রাখুন; আচ্ছা, আসুন এবার
আরেকটা চোট; কী বলেন?

[ তারা আবার খেলা শুরু করে।]

লেয়ার্তেস : স্বীকার করছি আমি।

রাজা : আমাদের পুত্রই বিজয়ী হবে।

রানি : সে তো ঘেমে গেছে,
দমও ফুরিয়ে গেছে ওর, এসো হ্যামলেট, এই
রুমালটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলো, রানি
তোমার সৌভাগ্য কামনায় সুরাপান করেছেন।

হ্যামলেট : ধন্যবাদ; রানি মাতা।

রাজা : গারট্রুড, না পান কোরো না।

রানি : আমি পান করবই প্রভু, ক্ষমা করুন আমাকে।
[ রানি পান করেন এবং হ্যামলেটের দিকে পানপত্র
এগিয়ে দেন।]

রাজা : [ স্বগত] এই পাত্রে বিষ আছে। বড়ো বেশি দেরি হয়ে
গেল।

হ্যামলেট : এখনো সাহসে কুলোচ্ছে না, ভদ্রে, পরে হবে' খন।

রানি : এসো আমি তোমার মুখটা মুছে দিই।

লেয়ার্তেস : প্রভু, আমি এখন আঘাত করব তাকে।

| | | |
|---|---|---|
| রাজা | : | মনে হয়, পারবে না। |
| লেয়ার্তেস | : | [ স্বগত] আর এটা তবুও আমার বিবেকের প্রায় বিরুদ্ধেই হচ্ছে। |
| হ্যামলেট | : | তৃতীয়বারের জন্যে তৈরি হোন, লেয়ার্তেস। বড়ো ঢিমে তাল আপনার। আমার বিনীত অনুরোধ, হামলায় আপনার সর্বশক্তি প্রয়োগ করুন। মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে স্রেফ পুতুল ঠাউরে খেলছেন। |
| লেয়ার্তেস | : | আপনি কি তাই মনে করেছেন? তাহলে আসুন। [ খেলা শুরু হল।] |
| অসরিক | : | কোনো পক্ষেই কোনো চোট হয়নিকো। |
| লেয়ার্তেস | : | এবার পেয়েছি বাগে। [ লেয়ার্তেস হ্যামলেটকে জখম করে; তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি করার ফলে ওদের তরবারি অদল বদল হয়ে যায়। ] |
| রাজা | : | ওদের ছাড়িয়ে দাও; ওরা খেপে গেছে। |
| হ্যামলেট | : | না, না, ফের শুরু হোক। [ সে লেয়ার্তেসকে জখম করে। রানির পতন] |
| অসরিক | : | আরে থামো, দেখো রানিমাকে দেখো। |
| হোরেশিও | : | হা, তাঁদের দু'জনের শরীর থেকেই রক্ত ঝরছে, এইটে কী করে সম্ভব হল প্রভু? |
| অসরিক | : | এ কী হল, লেয়ার্তেস? |
| লেয়ার্তেস | : | কী হবে আবার? সারসের মতো আমি নিজ ফাঁদে আটকা পড়েছি, অসরিক। সঙ্গাতভাবেই আমি নিজের চক্রান্তে আজ মরতে বসেছি। |
| হ্যামলেট | : | কেমন আছেন রানি? |
| রাজা | : | রক্ত দেখে বেহুঁশ হচ্ছেন। |
| রানি | : | না, না, সুরা, ঐ সুরা ও আমার প্রিয় হ্যামলেট, ঐ সুরা, ওতে বিষ, আমি বিষ পান করেছিরে। [ মৃত্যু] |
| হ্যামলেট | : | শয়তানি। ওরে তোরা দ্বার বন্ধ কর। হা, বিশ্বাসঘাতকতা কোথায়, সন্ধান করো। [ অসরিকের প্রস্থান।] |
| লেয়ার্তেস | : | এইতো এখানে, হ্যামলেট। তুমিও নিহত হতে যাচ্ছো হ্যামলেট, দুনিয়ার কোনো ভেষজবিদ্যার সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায়, আর আধঘণ্টা আয়ু তা-ও নেই তোমাতে কুমার; আগা-খোলা, বিষমাখা বিশ্বাসঘাতক অস্ত্র এখন তোমারই হাতে আছে। |

আমার চক্রান্ত আজ আমাকেই করেছে ঘায়েল।
দ্যাখো আমি পড়ে আছি, উঠব না আর কোনোদিন।
তোমার মাকেও বিষ দেয়া হয়েছে, আমি তো আর
পারছি না। এই রাজা, এই রাজাই এজন্যে দায়ী।

হ্যামলেট : অসির ডগাও বিষমাখা! তবে বিষ তোর কাজ করে চল।

[ রাজাকে জখম করে।]

সকলে : রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!

রাজা : আপনারা আমাকে এখনো রক্ষা করুন, বন্ধুরা, আমি শুধু জখমি হয়েছি।

হ্যামলেট : তাহলে এই যে ব্যাভিচারী, হত্যাকারী, অভিশপ্ত দিনেমার,
এ জহর পান কর। তো মুক্ত কি এখানে আছে?
হ তুই আমার জননীর অনুগামী?

[ রাজার মৃত্যু। ]

লেয়ার্তেস : সমুচিত
শাস্তি হল ওর, এ জহর সে নিজেই মিশিয়েছে।
আসুন আমরা পরস্পর ক্ষমা-বিনিময় করি হে মহান
হ্যামলেট। আমার মৃত্যুর জন্যে এবং আমার জনকের
মৃত্যুর দরুন তুমি দায়ী নও, যেমন আমিও
নই দায়ী তোমার মৃত্যুর জন্যে।

[ মৃত্যু ]

হ্যামলেট : বিধাতা তোমাকে এই দায়ভাগ থেকে মুক্তি দিন।
আমিও তোমার অনুগামী হচ্ছি। আমি মারা যাচ্ছি
হোরেশিও। হায়, অভাগিনী রানি, বিদায়, এবং
আপনারা যারা এ দৃশ্যের মূক, বিস্ময়বিমূঢ়
দর্শক, অথবা শ্রোতামাত্র, যারা এই আকস্মিক
ঘটনায় বিবর্ণ এবং কম্পমান, যদি আমি
সময় পেতাম — কারণ মৃত্যু তো নির্দয় পেয়াদা,
পরোয়ানা যার খুবই কঠোর — তাহলে অবশ্যই
আপনাদের বলতে পারতাম কিছু, কিন্তু থাক,
হোরেশিও, আমি মারা যাচ্ছি।
জীবিত থাকবে তুমি, যারা অনবহিত তাদের
শুনিও আমার কথা এবং আমার উদ্দেশ্যের
কথা যথাযথভাবে।

হোরেশিও : এমন বিশ্বাস অনুচিত।
আচরণে আমি নই দিনেমার, বরং প্রাচীন
রোমানই আমাকে বলা চলে। এখনো তো রয়ে গেছে
কিছুটা পানীয়।

হ্যামলেট : যদি তুমি পুরুষ মানুষ হও,
তাহলে আমাকে এই পাত্তরটা দাও, দিয়ে দাও।
স্বর্গের দোহাই, এটা আমাকে নিতেই হবে,
হা ঈশ্বর, হোরেশিও, যদি এসব ঘটনাবলি এরকম
বেবাক অজানা থেকে যায়, তবে আমার মৃত্যুর
পরে আমার এ নাম কী দারুণ কলঙ্কিত থেকে
যাবে, যদি ঠাঁই দিয়ে থাকো
কখনো আমাকে তুমি তোমার হৃদয়ে, তবে এই
স্বর্গসুখ থেকে ক্ষণকাল নিজেকে আড়ালে রাখো,
এবং আমার এই কাহিনি বলার জন্যে এ বিরূপ বিশ্বে
কষ্টে শ্বাস টেনে বেঁচে থাকো। —
[ দূরে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও নেপথ্যে কামানের
আওয়াজ। ]
কীসের এ রণ কোলাহল শুনি? —

অসরিক : তরুণ ফর্টিনব্রাস পোল্যাণ্ডে বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তনের
পথে ইংল্যান্ডের রাজদূতদের কামানের ধ্বনি
দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন।

হ্যামলেট : ওহ্ আমি মারা যাচ্ছি
হোরেশিও। এই মারাত্মক বিষ আমার জীবনী -
শক্তিকে অত্যন্ত কাবু করে ফেলেছে এবং আমি
ইংল্যান্ডের খবর শোনার জন্যে বেঁচে থাকব না।
কিন্তু আমি আগেভাগে বলে যাচ্ছি, ফর্টিনব্রাসই
নির্বাচিত হবেন নৃপতি। মৃত্যুকালে আমি তাঁকে
জানিয়ে গেলাম সমর্থন। তাই তাঁকে বোলো, আর
ছোটো বড়ো যা কিছু ঘটেছে, আর যা কিছু আমাকে
এ-কাজে করেছেন প্ররোচিত — বাকি শুধু নিস্তব্ধতা।
[ মৃত্যু।]

হোরেশিও : একটি মহৎ প্রাণ দীর্ণ হল। বিদায়, হে প্রিয় যুবরাজ,
উড়ন্ত দেবদূতের গান তোমাকে পাড়াক ঘুম।
[ নেপথ্যে সামরিক সংগীত।]
দামামার শব্দ এখানে আসছে কেন?

[ ফর্টিনব্রাস, ইংল্যান্ডের রাজদূত ও অন্যান্যের প্রবেশ। সঙ্গে
দামামা আর রঙিন পতাকা। ]

ফর্টিনব্রাস : কোথায় সে দৃশ্য?

হোরেশিও : কী দেখতে চান? যদি শোক কিংবা
বিস্ময়ের দৃশ্য, তবে এখানেই থামুক সন্ধান আপনার।

ফর্টিনব্রাস : এই সারি সারি মৃতদেহ হত্যার তাণ্ডবলীলা
করছে ঘোষণা; হে গর্বিত মৃত্যু, তোমার শাশ্বত
গুপ্ত কক্ষে এ কেমন মোচ্ছবের এন্তেজাম, যার
ফলে তুমি একটি আঘাত এতগুলি রাজকীয়
রক্তাপ্লুত শিকারকে করেছো ঘায়েল?

প্রথম রাজদূত : ভয়ংকর
এই দৃশ্য; আর আমরা ইংল্যান্ড থেকে বড়ো বেশি
দেরি করে এনেছি খবর। তাঁর আজ্ঞা পুরোপুরি
হয়েছে পালিত; রোজেনক্রান্‌জ ও গিল্ডেনস্টার্ন যে
মৃত, এ খবর শোনাবার কথা ছিল যে কানে, তা
এখন বধির; কার কাছে পাব ধন্যবাদ?

হোরেশিও : নয়
তাঁর মুখ থেকে, এমনকি যদি তিনি থাকতেন
বেঁচে, তাহলেও নয়। যুবরাজ তাদের মৃত্যুর
নির্দেশ দেননি কোনোদিন। এবং যেহেতু এই
রক্তাক্ত ঘটনার ঠিক পর পর এসেছেন
আপনি পোল্যান্ড থেকে যুদ্ধে জয়ী হয়ে, আপনারা
ইংল্যান্ড থেকে, তাই আদেশ করুন যাতে এই
লাশগুলি সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উঁচু এক
মঞ্চের ওপরে রাখা হয়, এবং এখন যারা
অবগত নয় আমি তাদের জানাব সবিস্তারে
কী করে ঘটল এই সব। আপনারা শুনবেন
কামজ, রক্তাক্ত আর অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড,
দুর্ঘটনামূলক বিচার, আকস্মিক হত্যা, ছল -
চাতুরী এবং ধূর্ততার দ্বারা সংঘটিত মৃত্যু
আর পরিণামে অভিসন্ধিগুলি কী করে ওদের
উদ্ভাবকের নিজেদের মাথায় পড়ল গিয়ে।
এসকল ঘটনার অবিকল বিবরণ আমি
দিতে পারি।

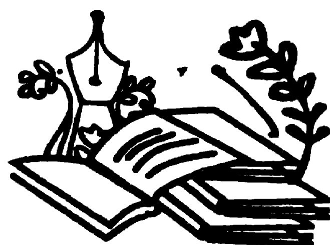
ফর্টিনব্রাস : আসুন সত্বর এ কাহিনি শোনা যাক;
এবং শোনার জন্যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেই
খবর পাঠানো হোক। আর আমার ব্যাপার হলো, —
শোকের মধ্যেই আমি বরণ করছি আমার এ
সৌভাগ্যকে। এ রাজ্যের ওপর আমার অবিস্মৃত
অধিকার আছে আর সে কারণে সেই অধিকার
দাবি করবার অনুকূল সুযোগ পেয়েছি আমি।

হোরেশিও : সে ব্যাপারে আমারও বলার কিছু আছে। সে দাবির
কথা তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যাঁর প্রতি
সমর্থন জানাবে অনেকে, কিন্তু মানুষের মন
উত্তেজিত থাকতেই অবিলম্বে কর্তব্য সমাধা
করা যাক, যাতে আরো দুর্ঘটনা, আরো ভুলচুক
ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ঘটতে না পারে।

ফর্টিনব্রাস : যাক,
চারজন ক্যাপ্টেন হ্যামলেটকে সেনানীর মতো
মঞ্চে বয়ে নিয়ে যাক। কেননা, হতেন যদি রাজা,
তবে তিনি সর্বোত্তম রাজকীয় গুণের প্রমাণ
দিতে পারতেন; আর তাঁর অন্তিম যাত্রার পথে
সৈনিকের সংগীত ধ্বনিত হোক, আর রণবাদ্য
তাঁর হয়ে সে যোগ্যতা ঘোষণা করুক।
লাশগুলি তুলে নিন। এ রকম দৃশ্য শুধুমাত্র
যুদ্ধক্ষেত্রকেই সাজে; কিন্তু এখানে ভীষণ বেমানান।
যান,
সৈন্যদের কামান দাগতে বলুনগে।

[ সৈনিকের মতো পদক্ষেপে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে
সকলের প্রস্থান। সামরিক শোকসংগীত। কিছুক্ষণ পর
ক্রমাগত তোপধ্বনি। ]

# প্রবন্ধ



# আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ

## পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতা

পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। সমসাময়িক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার একটা বিপদ আছে। একথা প্রায়ই শোনা যায় যে সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি যথাযথ সুবিচার করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কথাটাকে সহজেই উড়িয়ে দিতে পারতাম যদি-না সমালোচক ধুরন্ধর ডক্‌টর জন্‌সনের মতো বিখ্যাত উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত থাকতো। স্বয়ং জন্‌সনও তাঁর যুগের অন্যতম সৎকবি গ্রে-র কবিতার প্রতি বড়ো একটা সুবিচার করেননি। বলাবাহুল্য তিনি একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন এ বিষয়ে। তবু যে, সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে ভরসা পাচ্ছি তার কারণ, সমালোচনার কোনো কথাই শেষ কথা নয়। তারপরও কথা থাকে।

বহুবর্ণিত কবিতার দেশ বাংলা রাজনৈতিক কারণে আজ বিভক্ত। কিন্তু দেশের মানচিত্র বদলেছে ব'লেই দুই বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি, সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়নি। দেশ ভাগ হয়ে গেছে ব'লে পূর্ব বাংলার মানুষ বাংলা ভাষা ভুলে যায়নি। আমাদের এ-বাংলাভাষা আমাদের যে কত প্রিয় সে-কথা আমরা এই সেদিনও প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছি। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, আলাওল এবং নজরুল ইসলামের ভাষাকে আমরা ভালোবাসি, চিরদিন ভালোবাসব, জীইয়ে রাখব আমাদের রক্তের প্রবহমান স্রোতে। বাংলা সাহিত্যে পূর্ব বাংলার প্রাক্তন দান কিছু নগণ্য নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যদিও প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তবু পূর্ব বাংলার সাহিত্য-কর্মের উজ্জ্বল বিশিষ্টতায় বহুকাল সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে বাঙালি জাতি, গঠিত হয়েছে সৎ সাহিত্যের বলিষ্ঠ শরীর। ভবিষ্যতেও যে পূর্ব বাংলা সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করবে তার প্রতিশ্রুতি বহন করছে বর্তমান। হ্যাঁ, বর্তমানে কিছু সংখ্যক প্রবীণ এবং তরুণ সাহিত্যিকের মিলিত উদ্যমে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের চেহারা বেশ কিছুটা উজ্জ্বলই মনে হচ্ছে অনেকের বিবেচনায়।

আমার এ আলোচনা মূলত বিভাগোত্তর পাঁচ বছরের কবিতাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হবে। প্রাক-বিভাগ যুগে কবিতা লিখে আমাদের যে কয়জন কবি বিখ্যাত হয়েছেন কাব্যক্ষেত্রে, তাঁদের প্রায় সবাই এখন পূর্ব বাংলায় আর সুখের বিষয়, তাঁদের কবিকর্ম সম্বন্ধে বলতে গেলে অতীতের দিকে একটু আধটু চোখ ফেরাতেই হবে। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা কয়েকটি সুস্পষ্ট ধারায় এগিয়ে চলেছে, এ এগিয়ে চলার পথে মাঝে-মাঝে যে ছন্দপতন ঘটছে না এমনও নয়। এই বিভিন্ন ধারার পরিণতি শেষ পর্যন্ত

কী দাঁড়াবে তাও আপাতত বোঝা যাচ্ছে না। তবু আমি পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতার পরিচয় যদ্দুর সম্ভব তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষই গ্রামবাসী আর সেজন্যে এখানকার সাহিত্য পুরোপুরি গ্রাম-কেন্দ্রিক হবে বলেই অনেকে ভাবছেন; সত্যি বলতে কি, এ ধরনের উক্তির ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। স্বীকার করছি, এ-দেশের মানুষ প্রধানত পল্লিকেন্দ্রিক সাহিত্য তৈরি করবে, কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা আমাদের সাহিত্যের আসর থেকে নির্বাসিত করবো না। আর কোনো সাহিত্যিক যদি শহরকে কেন্দ্র করে সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাহলে তাঁকে 'শহুরে' বলে তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দেবার দুর্মতি হওয়া উচিত নয় কোনোমতেই। শহরকে আমরা নির্বাসিত করতে পারি না, কেননা আমাদের বর্তমান জীবনে শহরে কিছু কম প্রভাবশালী নয়। ধরতে গেলে শহরই আধুনিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়েছে। একথা খুবই সত্যি—শহরে রয়েছে নোংরামি, কুশ্রীতা, হিংসা, লালসা আর কালো ধোঁয়া, কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না, তারও একটা স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, সৌন্দর্য রয়ে গেছে। পল্লিকে নিয়ে আমরা বেশ বাড়াবাড়িই করে আসছি চিরকাল। পল্লি অপরূপ সুন্দর,আশ্চর্য তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পল্লিকে আমরা ভালোবাসি, খুবই সত্য। কিন্তু এ ভালোবাসা যদি রীতিমতো শুচিবাইতে পরিণত হয় তা হলেই এর বিরুদ্ধে কিছু বলা একটি কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। পল্লি-প্রেমের দোহাই দিয়ে যে সব অক্ষম প্যাঁচপ্যাঁচে রচনায় সাময়িকীর পাতাগুলো ভরে ওঠে তা দেখলে বিবমিষা হয় রীতিমতো। গ্রামকে কেন্দ্র করে ভালো সাহিত্য গড়ে উঠেছে এখানে, কিন্তু শহর-কেন্দ্রিক কোনো উল্লেখযোগ্য লেখা আমার চোখে, দুঃখের বিষয়, খুব কমই পড়েছে। পল্লি সাহিত্যের কথা উঠলেই সবচেয়ে আগে যাঁর নাম মনে আসে তিনি জসীমউদ্দীন। লোককবি হিসেবে জসীমউদ্দীন একক। তাঁর 'নক্সীকাঁথার মাঠ' বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল বই, একথা আশা করি অনেকেই স্বীকার করবেন। তিনি যখন প্রথম আমাদের সোজন বাদিয়ার ঘাট, হলদে পাখির ছা, কাজল দীঘির কালো জল আর বউ-টুবানীর মেঠো পাঁচালি শোনালেন তখন আমরা বাংলা কবিতার আসরে একজন প্রকৃত নতুন কবির সন্ধান পেয়ে খুশি হলাম, মুগ্ধ হলাম। তাঁর কবিতার সহজ স্বচ্ছন্দ রূপকে আমরা ভালোবাসলাম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা চুরি করে বলতে ইচ্ছে করে, জসীমউদ্দীনের কবিতা সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা, তাঁর কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লিজীবন আশ্চর্য সুন্দর ছবির মতো ধরা দিয়েছে। আবার বলছি, পল্লিকবি হিসেবে তিনি পূর্ব বাংলার একক কবি-কর্মী। 'মাটির কান্না' জসীমউদ্দীনের সাম্প্রতিক কবিতার সংকলন। যদিও এ কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো পংক্তি কিংবা উপমায় জসীম উদ্দিনের কবিত্বশক্তি বিদ্যুতের মতো ঝিকিয়ে ওঠে, তবু বলবো তিনি ক্রমেই তাঁর পূর্বের প্রসাদগুণ হারিয়ে ফেলেছেন ইদানীং। আধুনিক হয়ে ওঠার ঘর্মাক্ত চেষ্টায় তাঁর বর্তমান কবিতাগুলো ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত। তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চাইছেন দেখে আহত হয়েছেন তাঁর ভক্ত পাঠকগোষ্ঠী। তিনি যখন শাপলা লতা, বিলের কাজল জল, নিঝুম রাতের বাঁশির সুর, ধান-কাউনের অথই রঙের মেলা, বাউ কুড়ানী আর উড়ানীর চর নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিতার এ

পরিমণ্ডলেই তিনি সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। আর যখন তিনি এ পরিবেশ ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে পা বাড়িয়েছেন তখনই তাঁর কাব্য-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু আশার কথা, যদিও তিনি এখন প্রৌঢ় তবু সময়ের ধুলো তাঁর কবিত্বশক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, তাঁর লেখনী এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কে জানে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরো উন্নত কবিতা উপহার দেবেন আমাদের। তাঁর কবিকর্মকে অনুসরণ করে দু-একজন পল্লি কবি কবিতা লিখতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁরা নিজেদের চেহারা উপস্থিত করতে পারছেন না; সেগুলো অনুকরণও নয়, রীতিমতো অনুলিখন।

আজকাল আমাদের সাহিত্যের বাজারে একটা কথা বেশ সরবেই উচ্চারিত হচ্ছে যে, পূর্ব বাংলার সাহিত্য কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য হবে না, অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা থেকে স্বতন্ত্র হবে এখানকার সাহিত্য। আমি কিন্তু এ ধরনের কথা অত আড়ম্বরে চেঁচিয়ে বলার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। এটা তো খুবই সত্য যে দেশ ভাগ না হলেও আমাদের সাহিত্য পশ্চিমবাংলার সাহিত্য থেকে আলাদা হত, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাহিত্য স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে এগিয়ে যেত। কেননা, অতীতের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে এটা প্রমাণিত করা এমন কোনো কঠিন কাজ নয় যে বরাবরই পূর্ব বাংলার সাহিত্য পশ্চিমবাংলার সাহিত্য থেকে অনেকাংশে পৃথক, স্বতন্ত্র। কেননা, পূর্ব বাংলার 'আত্মা'র একটা আলাদা সত্তা রয়েছে। এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ, পদ্মাপারের মানুষের সংগ্রামী জীবন, আকাশ, রোদ, হাওয়া, গাছ, ফুল, পাখি সবকিছুই ছায়া ফেলবে পূর্ব বাংলার কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে। স্বভাবতই পূর্ব বাংলার মাটি, আলো আর হাওয়ার গন্ধ লেগে থাকবে এখানকার কাব্যে আর যে কবিতায় এসব কিছু থাকবে না তা এমনিতেই ঝরে পড়বে, তার জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কোনো মানে হয় না আদপেই। কয়েকজন কবি যাঁরা ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী তাঁরা পূর্ব বাংলার কবিতাকে স্বতন্ত্র চেহারা দেবার জন্যে কাব্যের পরমার্থ খুঁজছেন সাহারার ধু-ধু করা বালির সমুদ্রে, আলবোর্জ পাহাড়ে, আখরোটের বনে, বাদাম-খুবানির বনে। এ পরিবেশেও সুন্দর কবিতা সৃষ্টি হয়েছে, স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলছি, এসব কবিতায় পূর্ব বাংলা অনুপস্থিত। অথচ এঁরাই যখন আবার জোর গলায় পূর্ব বাংলার সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের কথা জাহির করেন তখন হাসির উদ্রেক হয় শুধু। সাহিত্যে ধর্ম একাধিক বার বিষয়বস্তু হয়েছে, হতেও পারে। বহুবার বিশ্বাস কবিতায় একটা আশ্চর্য দীপ্তি পেয়েছে, পেয়েছে কারুকলার সৌকর্য—কিন্তু বিশ্বাস, যে কোনো বিশ্বাসই হোক, প্রাণকেন্দ্র থেকে স্বচ্ছ ঝর্ণার মতো উৎসারিত না হলে সৎ কবিতার জন্ম হ'তে পারে না। ধর্ম যদি একটা খোলস হয়ে দাঁড়ায় কিংবা জোর করে চাপানো হয় মানবিক সত্তায়, তাহলে তার কোনো আবেদন থাকবে না জনসাধারণের মনে। কবিতা অধঃপতিত হবে একটা নীরক্ত বিশীর্ণতায়। পূর্ব বাংলার কবিতায় আমরা, আরব নয়, পূর্ব বাংলাকেই পেতে চাই। এখানকার নাড়িস্পন্দনই ধ্বনিত হবে আমাদের সাহিত্যে —তা না হলে জনসাধারণের মনে শিকড় মেলতে পারবে না তথাকথিত ইসলামি কবিতা। ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী যেসব কবি তাঁদের পুরোধা, high priest হলেন ফররুখ আহমদ। নজরুলের 'জিঞ্জির'-এর উত্তরাধিকার ফররুখ আহমদের অধুনাতম কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনিরা'। আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার ক'রে, পুঁথি সাহিত্য থেকে

উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটা পরিমণ্ডল এবং [illegible] তৈরি করতে পেরেছেন। আরবি-ফারসির সুদক্ষ ব্যবহার করে তিনি জাঁকালো ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন, সে ধ্বনি ব্যক্তিগতভাবে আমি উপভোগ করেছি; কিন্তু যখন তিনি মুদ্রাদোষের খপ্পরে প'ড়ে মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছেন, তখনই তাঁর কবিতা রীতিমতো পীড়িত করেছে আমাদের চেতনাকে। ফররুখ আহমদ সেসব বিরল কবিদের অন্যতম যাঁরা খুব অল্পদিনেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর অক্ষম অনুকারকদের হাতে বাংলা কবিতা রীতিমতো বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাঁদের প্রগলভ রচনা আর যাই হোক কবিতা তো নয়ই, এমনকি বাংলাও নয়; ফররুখ আহমদের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' সত্যিকারের সাড়া তুলেছিলো। সর্ব প্রথম হলেও সাতসাগরের মাঝিই এখন পর্যন্ত ফররুখ আহমদের সবচেয়ে পরিণত গ্রন্থ। এ বইয়ে এমন কতকগুলো উজ্জ্বল কবিতা রয়েছে যার দীপ্তি ফররুখ আহমদের সাম্প্রতিক কবিতায় অনুপস্থিত। ইদানীং তিনি সে ধরনের কবিতা আর লিখছেন না, লিখলেও প্রকাশ করছেন না। আজকাল তাঁর কলম দিয়ে যা বেরুচ্ছে তাকে কবিতা বলতে অন্তত আমি রাজি নই কোনোমতেই। আমার মতে সেগুলো হলো পদ্যে লেখা কাঁচা রাজনীতি। আশা করি, কেউ আমার এ কথার কোনোরকম কদর্থ করবেন না। আমি অবিশ্যি এ কথা বলতে চাইনি যে কবিতায় রাজনীতি থাকবে না। রাজনীতিকে আশ্রয় ক'রেও ভালো কবিতার জন্ম সম্ভব। আমার এ উক্তির সাক্ষ্য দেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চটি বই 'পদাতিক'। কবি হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য হলো ভালো কবিতা লেখা, সৎ কবিতা লিখতে পারলেই কবিদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত হবে সমাজ। কবিরা যদি কবিতা না লিখে শুধু রাজনীতিতেই মেতে থাকেন তা হলে সমাজের আর যে-দিক-ই উজ্জ্বল হোক কবিতা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ফররুখ আহমদ যদি কবিতা লেখায় অধিক মনোযোগী হন তা হলেই আমরা উপকৃত হবো। তাঁর শক্তিতে বিশ্বাসী ব'লেই এসব কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি।

যাঁদের কবিতার শরীরে রবীন্দ্রকাব্যের জলবায়ু লেগে রয়েছে চিরকাল, রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে যাঁরা কোনোদিনই মুক্তি পাননি, শাহাদাৎ হোসেন তাঁদের অন্যতম। অন্যান্য অনেক কবির মতোই তিনি আজ পাঠক-সমাজে অগ্রাহ্য। ডোডো পাখির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাঁর কাব্যকে। দিন দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সুদূরের ধূসরতায়। যদিও তিনি কিছু ভালো কবিতা লিখতে পেরেছিলেন যৌবনে, বর্তমানে তাঁর কবিকর্মে উপকৃত হচ্ছেন না কোনো তরুণ কবি কিংবা শাহাদাৎ হোসেন নিজেও লাভবান হতে পারছেন না তেমন। রবীন্দ্রকাব্যের ছায়ায় আজীবন লালিত হয়ে বিকশিত হতে পারেনি তাঁর কবিতা, বরং রবীন্দ্র-প্রভাব গ্রাস করছে তাঁর শক্তিকে। আজ তিনি বার্ধক্যের অন্ধকারে ম্লান। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায়, সেগুলো সংস্কৃত ঐতিহ্যে লেখা ইসলামি কবিতা। অনেক সময়ই এসব প্রচেষ্টা কবিতা হয়ে উঠতে পারছে না। তবু তাঁর পূর্বের ছন্দের প্রবহমান গাম্ভীর্য এখনও কতকটা রয়ে গেছে। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের সবগুলো রচনা পড়া উচিত নয়, পড়লে তাঁদের উপর অবিচার করা হয়। তাই তাঁদের

ভালো কবিতাগুলো নিয়ে একটা সংকলন প্রকাশিত হলেই পাঠক উপকৃত হন। শাহাদাৎ হোসেন, আমার মনে হয়, এ ধরনের কবি। সম্প্রতি 'রূপছন্দা' বলে তাঁর কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছে।

॥ দুই ॥

মহাযুদ্ধ শুধু ইউরোপের সমাজ-মানসকেই বিধ্বস্ত করেনি, সারা পৃথিবীর ভিত নড়ে উঠেছে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে। হতাশায় কালো হয়ে গেছে মানুষ। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে মার্কস-ফ্রয়েড-পড়া দুই যুদ্ধের মাঝখানে গঠিত মন। তাই তিরিশের কবিদের কাব্যে ধরা পড়েছে এই সময়ের বিষণ্ণতা, ক্লান্তি,হতাশা আর ধূসরতা। আবুল হোসেন এবং আহসান হাবীবের কাব্যোদ্যমে মধ্যবিত্ত হতাশা আর ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে, ক্রমশ একটা স্পষ্টতায় এগিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা মূলত প্রেরণা পেলেন তিরিশের বিখ্যাত বাঙালি কবিদের কাব্য থেকেই। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির ছায়ায় বেড়ে উঠেছে আবুল হোসেন এবং আহসান হাবীবের কবিতা। যদি বলি যে এ দুজন কবি তিরিশের কবিদের ছায়ামাত্র, তাহলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। পূর্বসূরিদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা স্বতন্ত্র।

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিছু কবিতা দিয়ে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল আবুল হোসেনের প্রথম কবিতার বই 'নব-বসন্ত'। যে কারণেই হোক আমরা সেই বসন্তকে উপেক্ষিত হতে দেখলাম। তবে প্রথম থেকেই আবুল হোসেন সচেতন কবিমনের অধিকারী। তিনি যদ্দূর সম্ভব কবিতাকে চলতি ভাষার আওতায় আনতে চেষ্টা করেছেন, আর এ বিষয়ে তিনি বিশেষ করে অমিয় চক্রবর্তীর কাছেই পাঠ নিয়েছেন। যদিও আবুল হোসেন অধিকাংশ সময় সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন তবু ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোর অনুরাগী। বিভাগোত্তর যুগে তিনি অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখতে পেরেছেন—শেষ যুক্তি, বন্ধুর জন্য, স্বদেশী কোরাস। তবে আবুল হোসেন পাঠকসমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান এখনো পাননি, অথচ তিনি আমাদের একজন প্রধান কবিকর্মী।

আবুল হোসেনের মতো আহসান হাবীরের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি অতট' মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না, সাধারণত তাঁর কবিতা হাওয়া দেয় অনুভূতির নীলাভতম উৎস-কেন্দ্রে। কিন্তু অসৎ সময়ের ধুলোয় তিনি বিষণ্ণ। হ্যাঁ, একটা বিষণ্ণতা তাঁর কবিতায় কুয়াশার মতো ব্যাপ্ত। আর এখানেই তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য। চিন্তার গভীরতা হয়তো পাওয়া যাবে না আহসান হাবীবের কবিতায়, প্রগাঢ় ইতিহাস-চেতনাও অনুপস্থিত—তবে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক পরিচ্ছন্ন ভালো কবিতা লিখেছেন। পরিচ্ছন্ন সুরেলা কবিতা লিখতে পারাটাও কিছু কম নয়। এই পাঁচ বছরে তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন সেগুলোর ভেতরে অধিকাংশই ব্যঙ্গ-কবিতা। একটা জিনিস লক্ষ করে আহত হয়েছি যে ইদানীং তিনি প্রেমের কবিতা আর লিখছেন না। প্রেমের কবিতা না লেখার পেছনে একটা বিকৃত

মনোভাব কাজ করছে আজকাল। এটা এক ধরনের অসুস্থতার লক্ষণ বলেই আমি মনে করি। যাই হোক, লিরিকের ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম সর্বজনস্বীকৃত।

উল্লিখিত দুজন কবির প্রায় সমসাময়িক আরো দুজন কবি প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সানাউল হক এবং হাবিবুর রহমান। এঁদের কারুরই কোনো কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি--ভয় হয়, হয়তো শেষ পর্যন্ত এঁরা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির চিহ্ন হয়ে থাকবেন। কিছুকাল পর সানাউল হক এবং হাবীবুর রহমানের পাশে এসে দাঁড়ালেন আশরাফ সিদ্দিকী। তিনি প্রথমেই বেশ কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অনেকের। ছন্দের টুং-টাং ধ্বনি দিয়ে তিনি পাঠকদের মন ভুলিয়েছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম আশরাফ সিদ্দিকী ভবিষ্যতে হয়তো আরো পরিশ্রমী এবং মনোযোগী হবেন। হয়তো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে তাঁর নিজের গলার আওয়াজ। কিন্তু আমাদের প্রায় হতাশ করেই তাঁর কবিতা উত্তরোত্তর বিরক্তিকর তারল্যে অধঃপতিত হলো। অত্যধিক অনুকরণপ্রিয়তা তাঁর সমূহ ক্ষতি করেছে। বিভিন্ন কবিকণ্ঠের ধ্বনিতে আশরাফ সিদ্দিকীর গলা কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ যখন বাংলা কবিতা প্রৌঢ়ত্বের হেমন্তরোদ পোহাচ্ছে তখন কোনো বয়স্ক কবির কবিতায় শিশু-সুলভ তারল্য অমার্জনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হলো। তবু উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থে কিছু ভালো কবিতা ছিল, কিন্তু ইদানীং তাঁর কবিতাগুলো প্রগল্‌ভতায় অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্তিকর। এরও এক বছর পরে আবদুল রশীদ খান তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্র' : মানুষ : মন' নিয়ে উপস্থিত হলেন। বইয়ের একটি কি দুটি ছাড়া অধিকাংশ কবিতাই তরল ভাবালুতার এলোমেলো প্রকাশ।

এই বেশ কিছুদিন আগে আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে তেরোজন তরুণ কবির কবিতার সংকলন 'নতুন কবিতা'। যদিও বইটির নাম 'নতুন কবিতা' দুঃখের বিষয় প্রকৃত অর্থে নতুন কোনো কবিতাই ছিল না সংকলনটিতে। তবে কয়েকজন কবির অস্পষ্ট বিশিষ্টতা প্রথম থেকেই চিহ্নিত হয়ে রইল। এই তরুণ কবিদের সপক্ষে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁদের নিবিড় আন্তরিকতার কথা। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখলে অবিশ্যি অনেক দুর্বলতাই ধরা পড়বে এঁদের রচনায়; আর কবি হিসেবে যাঁদের বয়স চার কিম্বা পাঁচ বছরের বেশি নয় তাদের কাছে দোষত্রুটিহীন পরিণত কবিতা আশা করাটা, আমার মনে হয়, খুব বড়ো প্রত্যাশা। কেননা, এঁরা অনেকদিন থেকেই প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাব্যসাধনা করছেন। তবে আশার কথা যে, এঁদের অনেকেই ক্রমশ কুশলতার পরিচয় দিচ্ছেন। যদিও তিরিশের বিখ্যাত কবিরা এঁদের কবিতায় খুব বেশি আনাগোনা করছেন, তবু একটা উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এই তরুণ কবিদের কাব্যোদ্যমে। আর এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ। মধ্যবিত্ত হতাশার অন্ধকার নেই এ তিনজনের কবিতায়, বরং একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ অনুরণিত হচ্ছে এঁদের প্রত্যেকটি রচনায়। কেননা, মানুষের অপরিমেয় শক্তির প্রতি এঁরা বিশ্বাসী, পৃথিবীর সম্ভাবনায় এঁরা আস্থাশীল; শুধু এই নয়, কাব্যরীতি সম্বন্ধেও এঁরা মনোযোগী এবং পরিশ্রমী। তরুণ কবিরা একাধারে প্রতিশ্রুতিশীল এবং পরিশ্রমী ব'লেই আশা করা যায় যে এঁদের কবিকর্মে

উত্তরোত্তর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে আমাদের কবিতার ধারা। মোটামুটিভাবে গত পাঁচ বছরের পূর্ব বাংলার কবিতা সম্বন্ধে বলতে চেষ্টা করছি—আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয়নি বলে আমি নিজেই সবচেয়ে বেশি পীড়িত। তবু এটুকু সান্ত্বনা যে আপনাদের সাম্প্রতিক কবিতার আংশিক পরিচয়ও আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

## বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হৈ হৈ করে উপস্থিত হননি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, এসেই তিনি পাঠকসমাজের মন দখল করতে পারেননি। এই কবির আবির্ভাবের মুহূর্তটি চিহ্নিত ছিল না। তাঁর অন্যান্য সমকালীনের মতো ঝাঁঝালো রবীন্দ্রদ্রোহিতার। কোনো বিপ্লবের নিশেন তিনি উড়াননি, উচ্চারণ করেননি কোনো বিদ্রোহের ভাষা; মোটকথা, তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে ছিল না কোনো চমক। অবশ্য এক হিশেবে তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন বিদ্রোহী; বহুরূপী ভক্তিবাদে ভরপুর বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান একজন সনাতন প্রথাবিরোধী বিদ্রোহীরই স্বাক্ষর বলে বিবেচিত হবে। তিনি বাংলা কাব্যের আসরে এসেছিলেন সৌম্য, নিঃশব্দ ভঙ্গিতে, রবীন্দ্রনাথের হাত ধ'রে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' পাঠ করলে অমনোযোগী পাঠকেরও বুঝতে দেরি হয় না যে, উক্ত গ্রন্থপ্রণেতা আর যাই হোন না কেন রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী নন। এই কবি এমনই বিনয়ী যে, কবিজীবনের সূচনায় তিনি প্রাতিস্বিকতা জাহির করবার লোভ সংবরণ তো করলেনই, এমনকি বাগ্‌দেবীর আরাধনা করলেন কবিগুরুর অসীম বাগান থেকে পুষ্প চয়ন ক'রে। কিন্তু তা বলে তিনি কবি সার্বভৌমের ভুবনভোলানো সুরে মজে নিজের স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দেননি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল চারিত্র্য তেজের মতোই অন্তর্গত বিচ্ছুরণ এক, আরোপিত কিছু নয়। সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা' প্রকাশিত হবার পর রসজ্ঞ পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন একজন প্রকৃতই নতুন কবির উপস্থিতি, এই কবিতাবলিতে দৃষ্টিগোচর হলো এমন কিছু লক্ষণ যা' এতদিন বাংলা কাব্যে অনুপস্থিত ছিল। কাব্যরসিকদের এটা বুঝতে বাকি রইল না যে, এই কবির সুর ঐকতানে বিলীন হবার নয়, বরং একক ঝংকারে প্রবল। অবশ্য তখনও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, এমনকি বুদ্ধদেব বসুর মতো বিদগ্ধ, অনুকম্পায়ী সমালোচকও তখনকার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যে ভালো লাগার মোহন উত্তাপ তেমন সঞ্চার করতে পারেননি। সেই আলোচনায় প্রচুর প্রশংসার কথা ছিলো সত্য, সত্য সুধীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বুদ্ধদেব বেশ জোরালো কণ্ঠেই উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষপাত যে জীবনানন্দ দাশের প্রতিই বেশি, একথা সেকালে বুঝতে কারও ভুল হয়নি। পরবর্তীকালে, আমরা জানি, তিনি সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন অধিকতর অনুরাগ নিয়ে, অর্জন করেছিলেন তাঁর সখ্য। শেষের দিকে এই দুই কবির মধ্যে একটি নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

'পরিচয়ে'র আড্ডার আদিপর্বে বুদ্ধদেব বসু উপস্থিত থাকতেন মাঝে মাঝে; তাঁর ভালো লেগেছিল গোষ্ঠীপতি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'চোখে পড়ার মতো সজ্জা-বিলাস..... সুস্বন

কণ্ঠ ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি।' কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি সরে এসেছিলেন 'পরিচয়ে'র আড্ডা থেকে। বুদ্ধদেব তাঁর 'আমার যৌবন' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনাটিতে লিখেছেন, "পরিচয়ের প্রথম সংখ্যায় আমার কবিতা ছিলো, দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিলো 'বন্দীর বন্দনা' ও 'অভিনয়, অভিনয় নয়', এই দুটোর সহৃদয় ও সাধু সমালোচনা, আমি জেনেছি এঁরা আমার প্রতি অনুকূল; তবু এঁদের মজলিসে ঠিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ পাইনি সে-কথা আমাকে মানতেই হবে। যেন একটু অধিক মাত্রায় সুচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান; যেন আড্ডা নয়, আয়োজিত এই অধিবেশন— এমনি মনে হয়েছিলো আমার। আরো অস্বস্তি এইজন্য যে সকলেই যেন বড়ো বেশি বিদ্বান ও পরিপক্ব, তত্ত্বালোচনায় এঁদের যতটা দক্ষতা, সাহিত্য ততটা নয়—এঁদের মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখক দু'জন মাত্র; সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। তখনও 'কল্লোল' 'প্রগতি' আমার মনের সন্নিকট; তাই সেই প্রথম ধাক্কায় আমি বুঝিনি যে তরুণ কণ্ঠের কলরোল-মুখর উচ্ছ্বাসের পর, প্রয়োজন ছিল আত্মপরীক্ষার ও নবমূল্যায়ণের, আর সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনা-প্রধান বুদ্ধিজীবী-নির্ভর 'পরিচয়' পত্রিকায় তা-ই সাধন করেছিলেন। আমার স্বভাব এবং সেই মুহূর্তের প্রয়োজন আমাকে 'পরিচয়' থেকে দূরে সরিয়ে নিলো — সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলাম শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগতভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জমে অনেক পরে, আর তা' যখন ফুলে-ফলে পূর্ণ-বিকশিত, ঠিক তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটল।'

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন, সুধীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক সারস্বত সভায় যাঁরা আসতেন তাঁরা নানাবিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন, হতে পারেন মনস্বিতায় ভাস্বর, কিন্তু সৃষ্টিশীল ক্ষমতা থেকে তাঁদের অধিকাংশই বঞ্চিত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া বিষ্ণু-দের কথা বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন সেই মজলিশের একমাত্র ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গত আরো একজনের কথা বলতে পারতেন যাঁর প্রতি কাব্যদেবী কিছুটা ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, 'পরিচয়ে'র আড্ডায় এক প্রধান সদস্য এবং সুধীন্দ্রনাথের সুহৃদ, ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। অবশ্য জাঁদরেল বুদ্ধিজীবী ও চিত্রকলার রসজ্ঞ সমালোচক হিসেবেই তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন, লাভ করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। সৃষ্টিশীলতার শ্রীক্ষেত্র থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও নির্বাসিত করা যায় না। বাংলা উপন্যাসে মননশীলতা ও চৈতন্য-প্রবাহ রীতির প্রবর্তক তিনি; এখানে স্মরণীয় তার বিখ্যাত উপন্যাস-ত্রয়ী 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা'। তাঁর এই সৃষ্টিশীল ভূমিকা সাহিত্য-রসপিপাসুদের সাধুবাদ কুড়াবে চিরদিন।

যাই হোক, সুধীন্দ্রনাথ যে মজলিশের গোষ্ঠীপতি সেখানে সৃষ্টিশীল লেখকরা অনুপস্থিত—এটাএকটা অস্বস্তিকর তথ্য আমাদের পক্ষে। তবে কি তিনি নিস্পৃহ কিংবা বিরূপ ছিলেন তাঁর সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি? সুধীন্দ্রনাথের উদার আতিথেয়তা ও অসামান্য সৌজন্যের কথা যখন শুনি, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা মানতে আমাদের বাধে যে তিনি তাঁর সমকালীন সৃজনশীল লেখকদের সঙ্গ পছন্দ করতেন না। তা হলে বিষ্ণু দে কী করে অবিরাম গ্রহণ করেছেন 'পরিচয়ে'র শুক্রবাসরীয় সন্ধ্যার স্বাদ? কী করে তিনি হতে পেরেছিলেন সুধীন্দ্রনাথের সুহৃদ? বুদ্ধদেব বসুর জন্যেও উন্মুক্ত ছিল সেই

মজলিশের প্রবেশপথ। তিনি নিজেই যে সেখান থেকে সরে এসেছিলেন এটা তো আমরা তাঁর জবানিতেই জেনেছি।

এ বিষয়ে এত বাক্য ব্যয় করেছি এজন্যে যে, 'পরিচয়ে'র আড্ডায় সৃষ্টিশীল লেখকদের অনুপস্থিতি সেকালের একটি সাহিত্যিক প্রবণতাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সেই প্রবণতা বর্তমানে স্তিমিত, এ কথা বলতে পারলে খুশি হতাম। কী সেই প্রবণতা? উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এবং আবেগের বাধাবন্ধহীন তুরঙ্গ-গতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য রবীন্দ্রানুসারী কবি তাঁদের কাব্যে সযত্নে লালন করেছেন উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতা। গুরুদেবের কাছ থেকে তাঁরা ভুল শিক্ষা নিয়েছিলেন নিজেদেরই স্বভাবদোষে, তাই তাঁদের ঝিমানো ঐকতানে যে সুরটি বাজলো, তা প্রকৃত রাবীন্দ্রিকও নয়। কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি বাংলাকাব্যে কিছু নতুন জমি-জিরেত সংযোজন করলেন, সুবিশাল রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্ত রইলেন বটে, কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আবেগের তোড়ে নিজে তো ভাসলেনই, অগণিত পাঠককেও ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। কবিতার পক্ষে আবেগ খারাপ কিছু নয়। কে না জানে, আবেগের স্পন্দন অনুভব না করলে কাব্যলক্ষ্মী কখনো কবির চৌকাঠ মাড়ান না। কিন্তু শুধু আবেগের তুর্কি-নাচন বাগ্‌দেবীকে একেবারে আলুথালু করে দেয় এবং এই দারুণ দশা তার না-পসন্দ।

অধিকাংশ বাঙালি লেখক উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং মনন-লাজুক ব'লেই হয়তো তাঁরা 'পরিচয়ে'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তর্কমুখর, মনস্বিতা-জাগর পরিবেশ এড়িয়ে চলতেন কিংবা তাঁদের জন্য অবারিত ছিলো না 'পরিচয়ে'র কুলীন দ্বার। বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সীমাহীন ঔদাসীন্যের কথা সুবিদিত, এমনকি বঙ্গভাষী লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই বুদ্ধির চেয়ে আবেগ দ্বারাই চালিত হন বেশি। এবং যেহেতু মাত্রাজ্ঞানের অভাব বাঙালি জাতির পরিচয়পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই আবেগের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই বেসামাল হয়ে পড়ি। ফলে প্রখর মননশীলতায় ঋদ্ধ বাঙালি কবি কিংবা গদ্যলেখকের ভাগ্যে পাঠকদের তো বটেই, এমনকি সচরাচর খোদ লেখকদেরও অনুকম্পা জোটে না। এজন্যেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি প্রধানত বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভরসা ক'রে তাঁর কাব্যশরীর গঠন করেছেন, যিনি উত্তর-রৈবিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণে প্রায় ব্যর্থ! এখনো তাঁর অনুরক্ত ভক্ত পাঠকের সংখ্যা তেমন বাড়েনি এবং এটা, আমার বিবেচনায়, আমাদের মানসিক দৈন্যেরই পরিচায়ক। এতে সুধীন্দ্রনাথের কিছু এসে যায় না, শুধু তাদেরই লোকসানের পাল্লা ভারী হয় যারা তার কাব্যসংগ্রহের পাতা ওলটাতে আলস্য করেন। তবে আধুনিক বাংলা কাব্যে ও প্রবন্ধ সাহিত্যে এই ধীমান কবির প্রভাব অনস্বীকার্য। অনেকে অবশ্য তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশের প্রভাবকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, সুধীন্দ্রনাথের সংক্রাম তাদের নজর এড়িয়ে যায়। তরুণ কবিগোষ্ঠী শুধু জীবনানন্দের কবিতার বুড়ি ছুঁয়ে শিক্ষানবিশী করেছেন, এমন একটি ধারণা সুপ্রচলিত। তবে কি তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার থেকে আহরণযোগ্য কিছুই খুঁজে পাননি? আসলে তা নয়, কবিতাকে যারা পেশল ও দার্ঢ্য দেখতে আগ্রহী, বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগের হরগৌরী মিলনে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা তাঁর কাব্য থেকে ইতিমধ্যে উপকারী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব আজ সুদূরপ্রসারী।

সত্য, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ দুষ্প্রবেশ্য; কিন্তু একবার সেখানকার ছাড়পত্র পেলে যে কোনো অনুসন্ধিৎসু যাত্রীই পুরস্কৃত হবেন অসামান্য দৃশ্যাবলি দেখে। তার দৃষ্টিপথে চকিতে জেগে উঠবে মোহন ভাস্কর্য, কান্তিমান স্থাপত্য। দেগার ব্যালে নর্তকীদের মতো স্বাস্থ্যল, কিন্তু নির্মেদ, নৈপুণ্যে ভরপুর লীলায়িত তার পংক্তিমালা পাঠকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে, মনকে করে বয়স্ক। আমাদের পরম সৌভাগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভাটিয়ালী কিংবা কীর্তনের সুরে বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে ভজাতে চাননি, আজীবন ভেজেছেন ধ্রুপদী সুর। এই বাক্যটি লিখে আমাকে একটু থমকে দাঁড়াতে হলো। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি ধ্রুপদী ভঙ্গি এনেছেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু তা বলে তাঁকে তথাকথিত ধ্রুপদী কবি হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর কাব্যসংগ্রহ তাকে উঠিয়ে রাখলে ঘোরতর অন্যায় হবে। সত্যি বলতে কি, অন্তরের অন্তস্তলে সুধীন্দ্রনাথ একজন রোমান্টিক, মহৎ রোমান্টিকদের অন্যতম। এই অভিমত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বুদ্ধদেব বসু যিনি নিজে আমৃত্যু ছিলেন দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে তিনি সুধীন্দ্রনাথের কবিতাবলি থেকে দু'টি প্রমাণ দাখিল করেছেন—"প্রথমত, তাঁর প্রেমের কবিতায় অবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চিৎকার—যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাই না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে। দ্বিতীয়ত, ভগবানের অভাবে তাঁর যন্ত্রণাবোধ—এটিও একটি খাঁটি রোমান্টিক লক্ষণ।" তবে আজ তাঁর মৃত্যুর দুই দশকেরও বেশি সময়ের পর তিনি একজন ধ্রুপদী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ধ্রুপদী লেখক হবার একটি বিড়ম্বনা এই যে, সহজে কেউ তাকে পড়তে চায় না; কিন্তু তিনি অগ্রসর পাঠকদের মনে স্থিত হতে থাকেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানসের ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে তার কাজ, আমরা ঋদ্ধ ও সতেজ হই তাঁর শিল্পকর্মে, যেমন সজীব থাকি চিরকালীন রৌদ্রকিরণে। যা হোক, বুদ্ধিবৃত্তিকে আবেগ-মণ্ডিত ক'রে তিনি এক নতুন কাব্যরীতির জন্ম দিলেন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে; তাঁর স্বরচিত খেতের ফসলের জাত আলাদা। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ পুরুষ; একমাত্র বিষ্ণু দে তাঁর যোগ্য সহযাত্রী।

বস্তুত সুধীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জনপ্রিয়তার পথে প্রধান অন্তরায়। আমার এই মন্তব্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এক পরাক্রান্ত প্রবাদের মতো; দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কান্তিবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের কথা এতই প্রচারিত যে সাধারণ পাঠক তাঁর কাব্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষার সাহসই সঞ্চয় করতে পারেন না। তাঁর কবিতার কাছে সাধারণ পাঠকদের বোধশক্তি শোচনীয়ভাবে পরাভূত হবে ভেবে তাঁরা দোরগোড়া থেকেই সরে পড়েন, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতর মহলে ঢুকতে ভরসা পান না। অথচ প্রাথমিক বাধা উজিয়ে গেলেই তাঁরা বিলক্ষণ বুঝতে পারবেন যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যে কোনো সৎ কবিতার মতোই মনকে রসাপ্লুত করে তোলে, বোধের কপাটে টোকা দেবার আগেই।

আমি কবিদের গায়ে লেবেল এঁটে দেওয়ার পক্ষপাতী নই। কবিদের শ্রেণিভুক্ত করতে পারলে সমালোচকদের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এর ফলে অনেক সময় কোনো কোনো

কবির পরিচয় সীমিত হয়ে পড়ে। তাই সুধীন্দ্রনাথকে আমি নাস্তিক্যবাদী, নৈরাশ্যবাদী কিংবা ক্ষণবাদী ব'লে চিহ্নিত করতে উৎসাহিত বোধ করি না, যদিও এর প্রত্যেকটিই তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য। আমি মনে করি, এ ধরনের চিন্তা সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তার ব্যাপকতাকে খর্ব করে। আমি তাঁর কাব্যের একটি প্রধান সুর সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করবো। এই সুর নিঃসঙ্গতার। নৈঃসঙ্গ্য-বোধ আধুনিক সাহিত্যের কুললক্ষণ বলা যেতে পারে। সুধীন্দ্রনাথের মতো আধুনিক মানুষের অস্মিতায় এই সুর প্রবল বেজে উঠবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তিনি তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "........ এমন অভিমত পোষণীয় নয় যে এই অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের জন্যে দায়ী আধুনিক কবি। সে তো দূরের কথা, বরং আমার মনে হয় যে সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আর কখনও এত শ্রদ্ধেয়রূপে দেখা দেয়নি। এতদিন ধরে স্থানে অস্থানে তার অতিমানুষিকতার যে-ঘোষণা শোনা গেছে, সে-দাবির প্রথম প্রমাণ এইবার হয়তো মিললো। কারণ চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙেচুরে সভ্যতার স্টিম রোলার আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর ক'রে, কবি আছে সৌন্দর্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা; যাদের জন্যে তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর, তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টায় ত্রুটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে গান হয়তো আনন্দের নয়। তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ! ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য; রাহুগ্রস্ত হ'লেও, সে আমাদের নমস্য।' এই প্রাজ্ঞ উক্তি যে স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য, তা' অবশ্যস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথের নৈঃসঙ্গ্যবোধ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বিশ শতকের আধুনিক চৈতন্যের স্বরূপটি উপলব্ধি করা দরকার। আধুনিক ধনতন্ত্র এমন এক ধরনের মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদের মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম বলেছেন -the automation, the alienated man—অর্থাৎ এ যুগের অনেকেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবুদ্বুদ। এই পরিস্থিতিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, আধুনিক ধনতন্ত্রের সন্তানের ক্রিয়াকাণ্ড এবং শক্তি তার নিজেরই আয়ত্তের বাইরে অপসৃত; সেগুলো যে আর তার শাসনাধীন থাকছে না শুধু তা-ই নয়, এমনকি তার বিরুদ্ধাচরণ পর্যন্ত করছে। বস্তুত তারা শাসিতের ভূমিকা ছেড়ে খোদ শাসকের সিংহাসন আগলে রয়েছে। ধনতন্ত্রের সন্তানের জীবনধারা মূলত বস্তু ও প্রতিষ্ঠানের দিকেই প্রবাহিত। এবং এসব বস্তুর উপচার তার কাছে অধিষ্ঠিত দেবতার মতোই পরাক্রমশালী। সেগুলো নিজের বিলাসের প্রসূন হয়ে তার অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত হচ্ছে না, বরং মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। একে সে পূজো করে, আত্মসমর্পণ করে এরই কাছে। এই বিচ্ছিন্ন মানুষ তার স্বহস্তে তৈরি বস্তুর সামনেই মাথা নত করতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। অ্যালিনিয়েটেড্ অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাস্পৃষ্ট মানুষের কাছে প্রেমও অর্থহীন। কেননা, যন্ত্র-চালিত মানুষ ভালোবাসতে পারে না, বিচ্ছিন্ন মানুষের কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এই পরিবর্তমান বিশ্বে এখন

প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি সুবিধাজনক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত, হয়তো নৈঃসঙ্গ্যের থাবা থেকে নিস্তার পাওয়ার অন্যতম উপায়মাত্র।

পরিবর্ধমান উৎপাদন শক্তি ও জীবন উপভোগের রকমারি উপকরণ সত্ত্বেও মানুষ আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলছে। বুঝি তাই গোটা জীবনটাই তার কাছে ঠেকে অর্থহীন। অবশ্য এ ধরনের অনুভব অনেকাংশেই আনাগোনা করে অচেতনতার অন্ধকার পথে। উনিশ শতকের অন্যতম সমস্যা ছিলো ঈশ্বরের মৃত্যু, যা রটিয়েছিলেন দিব্যোন্মাদ নিট্শে, কিন্তু বিশ শতকের সমস্যা আরো মারাত্মক; কেননা, এই শতক ঈশ্বর নয়, মানুষেরই মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করলো। উনিশ শতকে অমানুষিক ছিলো নির্দয়তার নামান্তর। অন্যপক্ষে, বিশ শতকে এর অর্থ দাঁড়ালো আত্মবিনাশী উন্মত্ততা। সে ক্রীতদাস হয়ে যাবে, অতীতে এমন শঙ্কা দানা বেঁধেছিলো মানুষের মনে। ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো যন্ত্রমানবে পরিণত হবে, এই আশঙ্কার ছায়া বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরই মনে নেমে এসেছে গাঢ় হয়ে। যন্ত্রমানবের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ নেই সত্য, কিন্তু তাদের যান্ত্রিক সত্তায় যদি দৈবক্রমে মানব-প্রকৃতির ছোঁয়া লাগে, তাহলে তারা আর সুস্থ মস্তিষ্কে বাঁচতে পারবে না; তারা রূপান্তরিত হবে বিপজ্জনক দানবে। তখন তারা তাদের পৃথিবীকে ধ্বংস ক'রে দুহাতে ওড়াবে ভস্মরাশি, মেতে উঠবে আত্মসংসারে। কারণ, ফাঁপা, অর্থহীন জীবনে একঘেয়েমি তাদের কাছে দারুণ অসহনীয় ঠেকতে বাধ্য। আমরা জানি, আদিম মানুষ খেয়ালি প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় লীলাক্ষেত্রে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করতো, ঠিক তেমনি আধুনিক মানুষও তার নিজের গড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমপরিমাণ অসহায় বোধ করে। স্বহস্তে গড়া বস্তুকেই অর্ঘ্য দেয় সে, সূর্য ও বৃক্ষ বন্দনার প্রাক্তন অভ্যাস ছেড়ে নতুন দেবমণ্ডলের নিকট নত করে মাথা।

এই নিরীশ্বর, বিপন্ন, নিঃসঙ্গ মানুষ প্রায় এই প্রথমবারের মতো হতাশায় এলিয়ে যেতে যেতে দেখলো যে তার জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রম-বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘ প্রক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। জন্মলগ্নে যে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় তার সমগ্র জীবনই এক ক্রমিক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। শৈশবে অচেনা জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের বাসনা এবং ভয় তাকে তার চেনা জগতের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনে। বয়স বাড়লে সে দ্যাখে, যে আত্মলোপী প্রতিবেশীকে এতদিন সে বড়ো একটা লক্ষ করে নি, জীবিকার ক্ষেত্রে হয়তো সে-ই তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বার্থের সংঘাতে, সেই তীব্র প্রতিযোগিতার মুহূর্তে বাইবেলের বিখ্যাত অনুজ্ঞা 'লভ দাই নেবার' অসহ্য ও উপহাস্য মনে হয়। জীবিকার পেছনে জিভ বের করে ছুটতে ছুটতে সে এক সময় বার্ধক্যের বুড়ি ছোঁয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পুত্রকন্যার জীবন থেকে। বন্ধুবান্ধবের পরিমণ্ডল থেকে। বার্ধক্যের নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে অতীত জীবনের জাবর কাটে এবং এই সঙ্গে ভাবে মৃত্যুর শূন্যতার কথা। মৃত্যুকে সে তার সৌভাগ্যবান পূর্বপুরুষের মতো নতুন এক জীবনের দ্বার ভেবে সান্ত্বনার কণা কুড়িয়ে বেড়ায় না। কেননা, ইতিমধ্যে এই বিরূপ বিশ্বে তার

পায়ের তলা থেকে নিশ্চিত বিশ্বাসের ভূমি অপসৃত। তাই নিরীশ্বর, নৈঃসঙ্গ্যভারাতুর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই আর্তনাদ আমাদের আস্তিত্বসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয় :

অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই,
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্ব-ধর্মেই,
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

এখানে স্মরণীয় এলিয়টের 'দি ককলেট পার্টি'র সেই চরিত্রটির উক্তি যাতে ধ্বনিত হয়েছে নিঃসঙ্গতারই স্বর :

'........ What has happened has made me aware
That I've always been alone.
That one always is alone.
...... it isn't that I want to be alone.

But that every one's alone--or so it seems to me.
They make noises and think they are talking to each other;
They make faces, and think they understood each other
And I'm sure that they don't .........."

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৈঃসঙ্গ্যবোধ আমাদের চেতনায় মুকুরিত হয়, আমরা উপলব্ধি করতে পারি কেন তিনি নিখিল নাস্তির মৌনে নিমগ্ন, কেন তিনি উচ্চারণ করেন নৈরাশ্যের পদাবলি, যা' স্বর্গচ্যুতির আর্তনাদের মতোই সুতীব্র গভীর। প্রশ্ন উঠতে পারে, যেকালে অন্যান্য বাঙালি কবির রচনাতেও নিঃসঙ্গতার পরিচয় রয়েছে, তখন বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথের কথা বলা হচ্ছে কেন? অন্যান্য বাঙালি কবির কবিতায় নিঃসঙ্গতার ছাপ নেই, এ-কথা বলি না; কিন্তু নিঃসঙ্গতার ধ্বনি সবচেয়ে প্রবল এবং ব্যাপক সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরই কাব্যে, আর কারও কবিতায় নয়।

ব্যক্তিজীবনে সুধীদ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ। তিনি নির্বান্ধব ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন নিঃসন্তান। সামাজিকতায় সুচারু দক্ষতার অধিকারী ছিলেন ব'লে তাঁর সঙ্গীর অভাব হবার কথা নয়, কিন্তু তবু তিনি সত্তায় আজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন নিঃসঙ্গতার জরুল। তাঁর অসামান্য মনীষা, পরিশীলিত রুচি ও মানসিক আভিজাত্যই তাঁকে উপহার দিয়েছিলো এই নিঃসঙ্গবোধ। উপরন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীন মতাবলম্বী এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশে সর্বদাই অকুণ্ঠ। যে-কালে বহু মনস্বী লেখকও স্বমত বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মতবাদে সায় দিয়েছেন সানন্দে, তখন এভাবে নিজের ধ্যানধারণা এলাকায় অটল দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়। এটা সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এক অসাধারণ গুণ, সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রেও তার সহমর্মী সঙ্গী বেশি ছিলো না। যূথচারিতায় কখনো মজেননি তিনি, তাই অপবাদের ঝুঁকি নিয়েও অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,— 'সহেনা সহেনা আর জনতার জঘন্য মিতালী।' কারণ, তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে নানা যুগের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছেন যে,

'কেবল আদিম জাড্য প্রাথমিক মাৎস্যন্যয়ে মিলে
সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।'

নৈঃসঙ্গ্য-কবলিত এই কবি বারবার নৈরাশ্যময় উক্তি করেছেন। ইচ্ছে করলেই তিনি সহজিয়া আশবাদের সুললিত স্তবে পাঠকদের তুষ্ট করতে পারতেন, পারতেন পাঠকের সনাতন অভ্যাসকে পরিতৃপ্ত করে বিশ্বাসের ধরতাই বুলি আওড়াতে। তাহ'লে হয়তো তার ভক্তের সংখ্যা অতিদ্রুত বেড়ে যেতো, কিন্তু অসম্মান হতো তার কবিসত্তায়। যাঁরা মার্কসবাদে সমর্পিত, যাঁরা জনগণের উত্থান এবং বিজয়ের পথেই ইতিহাসের সার্থকতা খোঁজেন, যাঁদের ধারণাও ইতিহাস হয়ে ওঠে প্রশ্নাতীত ঈশ্বর। যাঁদের বিবেচনায় সমষ্টির হাতে ব্যষ্টি নিগৃহীত হ'লেও ক্ষতি নেই — তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন, সমালোচনায় জর্জরিত করতে পারেন তাঁকে। তার যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে, কিন্তু তারাও এই কবির সততা স্বীকার করতে বাধ্য। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন কমিউনিজমের সমালোচক, অন্যদিকে যাঁরা এই মতবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কম্যুনিস্ট-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে সময়, তাঁদের পথও তিনি তেমনি পরিহার করেছেন। তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না, যদিও ক্ষণকালের জন্যে উক্ত মতবাদের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিলেন, কিন্তু তা বলে মার্কসবাদ-বিরোধী প্রচারণায় কণ্ঠ মেলাননি তথাকথিত মোহমুক্ত মার্কসবাদীদের মতো। সুধীন্দ্রনাথ নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত এবং স্বমত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৎ ছিলেন ব'লেই তিনি শূন্যকুম্ভের মতো বেজে ওঠেননি যত্রতত্র। বরং তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই নিঃসঙ্গ পথ, যার ধুলো গায়ে মাখতে হলে চাই অসম সাহস। সরলীকরণের প্রলোভন তিনি বরাবরই এড়িয়ে গেছেন; মানুষের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মানবজাতির নিয়তি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে জটিল থেকে জটিলতর সূত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে। এসব সমস্যার কোনো সহজে সমাধানে তাঁর আস্থা ছিল না। সরলীকরণ মানুষকে প্রায়শ অপ-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্ররোচিত করে, এই ধারণাই তাঁর অনুসন্ধিৎসাকে উজ্জীবিত করেছে সব সময়। তিনি লিখেছেন —

'কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত,
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।'

কিংবা অন্যত্র এই কবিকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে এভাবে:

'অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়
দেখিতেছি ভ্রমি ভ্রান্ত চোখে
গতাসু আলোয় প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে।'

এই বোধই সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে দিয়েছে ট্রাজিক নায়কের মহিমা। ট্রাজিক নায়ক জানে যে তার ধ্বংস অনিবার্য; পারিপার্শ্বিক দুর্বিপাকে এবং তার নিজেরই অন্তর্গত কোনো ত্রুটির দরুন সে এগিয়ে যাচ্ছে লুপ্তির দিকে; কিন্তু তা'বলে সে কোনো সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে না, অসম-সাহসে দাঁড়ায় অনিবার্যতার মুখোমুখি। বিরূপ বিশ্বে সান্ত্বনা হিসেবে কোনো কিছুই আঁকড়ে ধরবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি সুধীন্দ্রনাথের কাছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রগতির প্রতি সমপরিমাণ আস্থাহীন তিনি, তাঁর দর্শন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ; প্রেমকেও ক্ষণিক ও অলীক বলে জেনেছেন। ফলে নিখিল নাস্তির মৌনে ছিলো তাঁর বসবাস, ভ্রমণ করেছেন সন্দেহ ও হতাশার কণ্টকাবৃত চৌহদ্দিতে। তবে তিনি মনে করতেন যে, ত্রাতাহীন অনাথ পৃথিবীতে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মানুসন্ধানের মধ্যেই হয়তো নিহিত মানুষের মূল সত্তাসার। আর এ-কথাই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যে এক আশ্চর্য বাণীঋদ্ধতায়। অকপট, প্রগাঢ় নিহিলিজমে নিমজ্জিত কারুর পক্ষে কাব্যচর্চায় নিয়োজিত থাকাও সপ্রেম সাহসিকতার পরিচায়ক। এই সাহসের অধিকারী ছিলেন বাংলা কাব্যের নিঃসঙ্গ পুরুষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

## কালবেলায় রূপদক্ষ কবি

আমাদের দেশে সাধারণ সেসব বিদেশি লেখকই বেশি আলোচিত হন, যাঁদের ললাটে নোবেল পুরস্কারের টীকা জ্বলজ্বল করে। যেন ঐ আন্তর্জাতিক পুরস্কারটি একটি চোখ-ধাঁধানো ভিসা যেটা হাতে নিয়ে একজন বিদেশি সাহিত্যিক—তা তিনি যে শ্রেণির লেখকই হন না কেন—অনায়াসে আমাদের মনের দেউড়ি পেরিয়ে যান। সেই অলৌকিক ভিসা যাঁদের কারায়ত্ত নয় তাঁর সচরাচর আমাদের সাহিত্যিক আড্ডার কোনো স্বাদু খোরাকে পরিণত হন না, সাধারণ্যে তাঁরা নাম থাকে একেবারেই অনুচ্চারিত। আর যাঁদের লেখায় থাকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপক ছাপ, তাঁরাও প্রধানত আমাদের উপেক্ষা কুড়ান। এমনকি কোনো মননশীল লেখকও বাঙালি পাঠকদের কাছে আমল পান না সহজে। যাঁরা আমাদের আবেগের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যান, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সেডাক্সন খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন, আমরা তাঁদের বন্দনা করেই তৃপ্ত হই। তাই নিমাই-মার্কা একজন গৌণ কবিকে নিয়ে হৈ-চৈ করতে আমরা যতটা এগিয়ে আসি, বস্তুত ততটাই পেছিয়ে যাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো একজন কবির ত্রিসীমানা থেকে। আসলে অধিকাংশ পাঠক সেই কবিরই পাশ কাটিয়ে চলেন যিনি আমাদের মানসিক আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ।

দুর্ভাগ্যবশত, ইউনস্টাইন হিউগ অডেন, যিনি সম্প্রতি লোকান্তরিত, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী কোনো লেখক নন এবং ভাববিলাসেও তিনি নন উন্মাতাল। তাঁর রচনাবলী বুদ্ধিবৃত্তির আভায় সমুজ্জ্বল। তাই তিনি যদি বাংলাদেশের পাঠক সমাজে অপরিচিত থাকেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিশ শতকী ইংরেজি কাব্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ, অডেন, মারা গেছেন ৬৬ বছর বয়সে। যখন তিনি একটি সভায় নিজের কাব্য বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক তক্ষুনি মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো কবিতার

আসর থেকে। কিন্তু ইংরেজি কাব্যের শ্রীক্ষেত্র থেকে কেউ তাঁকে হটাতে পারবে না কোনোদিন। শ্রেষ্ঠ কবিদের পাশেই তিনি পাবেন তাঁর সম্মানিত আসন।

তাঁর মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো ইংরেজি কবিতা এবং আরো যাথার্থ্যের দিকে ঝুঁকলে বলতে হয়, মার্কিন কবিতা। কেননা, ১৯৩৯ সালে বত্রিশ বছর বয়সে অডেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কবিগোষ্ঠী ও সমালোচকবৃন্দ তাঁকে মার্কিন সারস্বত সমাজেরই একজন বলে মনে করতেন, তাই তিনি প্রচুর নন্দিত হয়েছিলেন সেখানে। মার্কিন কবিকুল বহিরাগত অডেনকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দিত ও ধন্য হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, অডেন যখন শ্বেতদ্বীপ ত্যাগ করলেন, তখন ইংল্যান্ডের কবিকুল ও কাব্যরসিকরা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই বলেছিলেন যে, তাঁর এই স্বদেশত্যাগ ইংরেজি কাব্যকে অনুজ্জ্বল করে তুলবে। কথাটা অতিশয়োক্তির মতো শোনায় বটে, কিন্তু তাতে সত্যের বেশ খানিকটা শাঁসই ছিলো, বলা যায়। ইংল্যান্ড থেকে অডেনের প্রস্থানের পরে বাস্তবিকই, যাকে বলে প্রধান কবিপুরুষ, তেমন কেউ রইলেন না শ্বেতদ্বীপে। ইয়েটস্ মৃত, টি.এস.এলিয়ট অবশ্য তখনো জীবিত, কিন্তু তখন তিনি স্বকীয় কীর্তির মহিমার অসামান্য রোদ পোহাচ্ছেন। এলিয়েটের উত্তরাধিকারী হিসেবে তখন সমালোচকদের দৃষ্টি অডেনের দিকেই নিবদ্ধ। কবি হিসেবে তিনি টি. এস. এলিয়টের সমকক্ষ তো বটেই, এমনকি সিদ্ধিলাভে সেই যুগপ্রবর্তক কবি-সমালোচকেরও অগ্রগণ্য তিনি, এরকম উক্তি করতেও কেউ কেউ পিছ-পা হয় না। নানা বাকবিতণ্ডা সত্ত্বেও কবি হিসেবে এলিয়টের পরেই অডেনের স্থান। আমি তাঁর সুহৃদ স্টিফেন স্পেন্ডার এবং তিরিশের অন্য দু'জন প্রধান কবি সি ডে ল্যুইস এবং ল্যুই ম্যাকনীসের সুকৃতির কথা বিস্মৃত হইনি, বিস্মৃত হইনি সেই শব্দমাতাল কিন্নরকণ্ঠ ডিলান টমাসকে, এম্পসন, রবার্ট গ্রেভস, এডউইন মুর এবং জর্জ বার্কারের কথাও আমার মনে আছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এরা কেউ, আমার বিবেচনায়, অডেনের সমকক্ষ নন।

একটু দেরিতেই অডেনের কবিজীবন শুরু হয়েছিলো। পাবলিক স্কুলে কিছুকাল কাটানোর পর তিনি বাগদেবীর মায়াবী সংকেতে সাড়া দিয়েছিলেন। এর আগে সাহিত্যের প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ প্রকাশ পায়নি ব'লে ক্রিস্টোফার ইশারউড জানিয়েছেন। একজন খনি-প্রকৌশলী হতে চেয়েছিলেন অডেন। তাঁর আদি কবিতাবলিতে দক্ষতার পরিচয় ছিলো ঠিকই, কিন্তু সেসব কবিতা প'ড়ে সহজেই বোঝা যেতো যে, হার্ডি এবং ফ্রস্ট তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি। অডেন গোড়ার দিকে নাকি খুবই আলসে ছিলেন। একটি কবিতা লেখা হয়ে গেলে তিনি সেই কবিতার কোনো অংশ পরিমার্জনা করতে চাইতেন না। যেমন লেখা হতো ঠিক তেমনি রেখে দিতেন। যদি কোনো কবিতা ইশারউডের অনুমোদন লাভে বঞ্চিত হতো তবে তিনি সেটি ফেলে দিতেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে। পুরোনো কবিতাটির অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে নিয়োজিত হতেন নতুন কবিতা রচনায়। বাতিল কবিতার যে পংক্তিগুলো ইশারউডের তারিফ কুড়াতো, সেগুলো অবশ্য অডেন ভালো করেই মনে রাখতেন। ইশারউড-প্রশংসিত বিভিন্ন পংক্তি ব্যবহৃত হত পরবর্তী কোনো কবিতায়। এর ফলে তাঁর কিছু কিছু কবিতা দুর্বোধ্য ঠেকত পাঠকদের কাছে।

তিরিশের ইংরেজি কাব্য বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই সেই জেসুইট পাদ্রি জেরাড ম্যানলি হপকিন্সের কথা এসে পড়ে অবধারিতভাবে। হপকিন্সের কাব্যের আঙ্গিকের কাছে তিরিশের কবিগোষ্ঠী অত্যন্ত ঋণী। হপকিন্সের জীবদ্দশায় তাঁর কোনো কবিতাই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তার দুই সুহৃদ ক্যানন ডিক্সন এবং রবার্ট ব্রিজেস-এর কাছে তিনি যেসব পত্র লিখতেন, সেগুলোয় কবিতা-বিষয়ক আলোচনা থাকতো। তিনি ব্রিজেস-এর কাছে তাঁর কবিতাও পাঠাতেন। ব্রিজেস সেই আশ্চর্য কবিতাবলি পেয়ে এবং তাদের অসামান্যতা বুঝতে পেরেও কেন যে সেসব প্রকাশের জন্যে বন্ধুকে পেড়াপীড়ি করেননি, এটা আমরা ভেবে পাই না। অবশ্য ব্রিজেস হপকিন্সের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে তাঁর কয়েকটি কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন একটি পিঠ-চাপড়ানো ভূমিকা। ভূমিকায় হপকিন্সের প্রতিভা ও মৌলিকত্বের গুণগান করা হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তাঁর কবিতা বিষয়ে দুর্বোধ্যতা ও বেখাপ্পা ধরণের কথাও রটানো হয়েছিল ঘটা ক'রে। ব্রিজেস হপকিন্সের বাজে মিলের কথা উল্লেখ করতেও ভোলেননি। সেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ফুরোতে লেগেছিল দীর্ঘ দশ বছর। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় সংস্করণ। হপকিন্স তাঁর মৃত্যুর একচল্লিশ বছর পরে তিরিশের নবীন কবিদের হৃদয় হরণ করলেন; তাঁর আঙ্গিক এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল তাঁদের কাছে। হপকিন্সের 'স্প্রাং রিদমে' মুগ্ধ এই কবিকুল স্বকালে অবহেলিত কিন্তু অসামান্য প্রতিভাধর সেই অগ্রজ কবির কাছ থেকে শিখে নিলেন অপূর্ব সংগীতময় বাক্‌ভঙ্গী। কিন্তু হপকিন্স শুধু তাঁর আঙ্গিকের মোহন রূপেই পাঠকদের ভোলান না, তিনি অসাধারণ কবিদৃষ্টির অধিকারী। তিরিশের তরুণ কবিগোষ্ঠী সেই গভীর বীক্ষা থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করেননি। যা হোক, অডেন কিন্তু হপকিন্সের কাব্যভাণ্ডারের দিকে হাত প্রসারিত ক'রে নিজের কাব্যের পুঁজি বাড়িয়ে নিলেন অনেকখানি। তিনি নিজের কবিতার আঙ্গিকের পক্ষে উপকারী জিনিশগুলো হপকিন্সের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, হপকিন্সের স্প্রাং রিদমের স্পন্দন আধুনিক বাংলা কবিতাতেও অনুভূত হয়েছিলো। হপকিন্সের এই ছন্দ অমিয় চক্রবর্তীকে আন্দোলিত করেছিল, এর ফলে তিনি বাংলা কাব্যে স্প্রাং রিদম প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। এই উদ্যোগ বৃথা যায়নি; এতে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অভিনব ছন্দঃস্পন্দ ধ্বনিত হতে শুনলাম আমরা এবং তাঁর উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় স্প্রাং রিদম ব্যবহারে প্রয়াসী হন।

যা হোক, অডেন অক্সফোর্ডে এসে পড়লেন এলিয়টের কবিতা। এলিয়টের 'পোড়ো জমি' পড়ার পরই অডেন কবিতার নতুন বাঁকের সন্ধান পেলেন, বলা যায়। এলিয়টী বলয়ে ভ্রাম্যমাণ তরুণ অডেন যে পাথেয় সঞ্চয় করলেন তা' তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টাকে করে তুললো সাহসী এবং আশ্চর্যরকম ফলপ্রসূ। ইশারউড বলেছেন, গোড়ার দিকে এই প্রভাব খুবই ভীতিপ্রদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে অবশ্য অডেন এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছেন স্বকীয়তারই বিকাশে। এ-কথা প্রায় সবাইকে স্বীকার করতে হলো যে, অডেন এলিয়টের পরে একজন প্রকৃত নতুন কবি। এই কবি অন্য কোনো কালের নয়, তাঁর স্বকালেরই কবি। অডেন যখন কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন ইংল্যাণ্ডে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা।

বেকার সমস্যাও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দানবের মতো। অর্থনৈতিক সংকটে বিপন্ন বেকারের দল কোনো একটা আশার বাণী শোনার তৃষ্ণায় নিয়মিত ওল্টাচ্ছিলো সংবাদপত্রের পাতা। কিন্তু আশা তখন বাস্তবিকই সোনার হরিণ। দু'জন মানুষ তখন একটি সিগারেটে ভাগ বসিয়ে একে অন্যের দৃষ্টিতে খুঁজতো সান্ত্বনার ভাষা কিংবা মাঝে মধ্যে সেখানে নৈরাশ্যের ছায়া দেখে চমকে উঠতো। অর্থনৈতিক মন্দা, ফ্যাসিস্ট পশুর ক্রমউত্থান, নতুন যুদ্ধের অশুভ ছায়া—এই সবকিছুই তখন তিরিশের কবিকুলের মানসমণ্ডলের গভীরে রেখাপাত করেছিলো। অডেনও দলছুট ছিলেন না, বরং তাঁকেই দলপতি বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন অন্যান্যরা। তিরিশের তরুণ কবিগোষ্ঠী আসন্ন বিপদ ও সমকালের আততি সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এবং তাঁরা কবিতা রচনার সময় একথাও ভোলেননি যে, তাঁরা আসলে যন্ত্রযুগেরই মানুষ। সমকালীন বিশ্বের সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা, দুটোই ফুটে উঠেছিল তাঁদের কাব্যে।

চলতি মতবাদের প্রতি তরুণরা একটি সহজ আকর্ষণ বোধ করেন বলেই তিরিশের কবিদের প্রায় সবাই কমবেশি মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। যাকে বলে কট্টর মার্কসবাদী অডেন তা কোনো দিনই ছিলেন না; এবং ধার্মিকতার একটি সুর বরাবরই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে, যদিও তাঁর গোড়ার দিকের কবিতায় সে-সুর ছিল খুবই প্রচ্ছন্ন, ছিল প্রেমে লীন।

আমাদের দেশের অসহিষ্ণু সমালোচকরা কোনো কবির রচনায় অন্য কোনো কবির প্রভাব লক্ষ করলেই কেমন ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে ওঠেন, যেন সেই কবির পুরো কাব্যগ্রন্থটাই অশুদ্ধ হয়ে গেলো। কোনো কবিই ভুঁইফোঁড় কিছু নন। একজন কবিকে তাঁর স্বদেশের কাব্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে দেখা সম্ভব নয়, এ-কথা এলিয়ট বলেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে। প্রত্যেক কবির কবিতা তাঁর অগ্রবর্তীদের কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। শুধু নিজের দেশেরই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাব্যধারা সম্পর্কে অবহিত হতে হয় তাঁকে; তিনি গ্রহণ করেন যা-কিছু গ্রহণীয়। বুঝি এজন্যেই এলিয়ট তাঁর কবিতায় সচেতনভাবেই ব্যবহার করেন দেশি-বিদেশি কবিদের নানা পংক্তি, স্মরণ করেন নতুন আঙ্গিক সৃষ্টির প্রয়োজনে, অনুকরণের অন্ধ তাড়নায় নয়। তাই যখন কোনো সমালোচক বলেন যে, অডেনের কবিতায় রাইনার মারিয়া রিল্‌কে, ইয়েটস, এলিয়ট, হপকিন্স, অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতা, ল্যাংল্যান্ড, জন স্কেলটন, বায়রন, উইলিয়াম ব্লেক, ব্রাউনিং, কাফকা প্রমুখের প্রভাব রয়েছে, তখনো অডেনের কাব্যগৌরবে কোনো ম্লানিমা লাগে না। তিনি তাঁদের শিল্পনির্যাস এভাবে শুষে নিয়েছেন যে, তা তাঁর কবিসত্তারই একটি অংশ হয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত।

গোড়ার দিকে অডেন যেমন সারস্বত সমাজে সাড়া জাগিয়েছেন তেমনি সমালোচনার প্রচুর ঝড়-ঝাপটাও সইতে হয়েছে তাঁকে। এফ আর লীভিস তো তাঁর ওপর ছিলেন রীতিমতো খড়্গহস্ত। তিনি অডেনকে একজন গৌণ কবি হিশেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অকালমৃত মার্কিন কবি-সমালোচক, যাঁর কবিতাবিষয়ক আলোচনা যথার্থই রসগ্রাহী এবং গুরুত্বপূর্ণ, র‍্যান্ডাল জারেলও অডেনের কাব্যের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, লিখেছিলেন একটি বিরূপ সমালোচনা। অবশ্য জারেল পরে এই সমালোচনার সারবত্তা

সম্পর্কে নিজেই কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়েন। ফলে সেই প্রবন্ধ তাঁর কোনো গ্রন্থ ঠাঁই পায়নি। রিচার্ড হোগার্টও তাঁর অডেন-বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনায় এই ধীমান কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তো হনইনি, বরং নিন্দা-ই ভর করেছিল তাঁর লেখনীর ডগায়।

অডেন মানুষ ও সমাজের দিকে তাকিয়েছিলেন চিকিৎসকের চোখে। ব্যাধির উৎস খুঁজে বের করে নিরাময়ের পথ বাতলে দিয়েছেন। বুঝি তাই, অডেনের কবিতায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলো চিকিৎসা শাস্ত্রেরই আওতাভুক্ত। মানবসমাজের গলদের দিকে তাঁর চোখ হরহামেশাই পড়েছে, কিন্তু তা ব'লে তিনি কখনো মানুষের প্রতি বিরূপ হননি। তাঁর কবিতায় ল্যান্ডস্কেপ কখনো মানব-বর্জিত নয়। অডেন মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তিনি উচ্চারণ করেন, 'We must love one another or die.' এই প্রেম ব্যক্তিগত প্রেম নয় ; এই প্রেমানুভূতি সর্বমানবের জন্যেই। প্রথমে প্রেম, তারপর মার্কসবাদ এবং সর্বশেষে খ্রিস্টধর্মেই মুক্তি খুঁজেছেন অডেন। স্মর্তব্য, তিনি জন্মেছিলেন একটি অ্যাঙ্গলিকান পরিবারে। তবে কি পরিবেশ ও শৈশব-স্মৃতিই তাঁকেই নিয়ে গিয়েছিলো ধর্মের পথে? কিন্তু অডেনের মতো তুখোড় ও মেধাবী ব্যক্তি এই সামান্য কারণে ধর্মের দিকে ঝুঁকবেন, এই সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অন্তত আমার পক্ষে মুশকিল, ভেবেচিন্তেই তিনি ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন মুক্তির পথ হিসেবে। এটা নিঃসন্দেহে কৌতুকপ্রদ যে, অডেন, যিনি পিংক লিবারেল বলে নিজেকে অভিহিত করেছিলেন একদা, যিনি মার্কসবাদে আস্থাবান ছিলেন, তিনিই কি না শেষ পর্যন্ত নিদান খুঁজলেন ধর্মে। যা হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমি অডেনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আগ্রহী নই, আমার কাছে তাঁর কবিসত্তাই গ্রাহ্য। তার কবিতাবলি পড়ে আমি শুধু আনন্দিতই হইনি, উপকৃতও হয়েছি। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কী করে একটা আপাত-তুচ্ছ ব্যাপারকে চিত্তহারী করে তোলা যায় কাব্যগুণে কবি যে তার স্বকালেরও ভাষ্যকার, এ-কথা অডেনের কবিতা পড়েই আমি বুঝেছি।

স্পেন্ডার বলেছেন, যদি অডেনকে ট্যুথপেস্ট বিষয়ে কবিতা লিখতে অনুরোধ করা হয়, তবে তিনি কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই দন্তমার্জনকারী বস্তুটি নিয়ে একটি চমৎকার ব্যালাড লিখে ফেলবেন অবলীলাক্রমে। কাব্যরচনার এই দক্ষতার প্রতি কেউ কেউ হয়তো কটাক্ষ করতে পারেন। এ ধরনের অনায়াস দক্ষতা একজন কবিকে যে-কোনো বিষয়ে পদ্য লিখতে প্ররোচিত করতে পারে যা' শেষ পর্যন্ত কবিতার পক্ষে অপকারী। কিন্তু এ-কথায় সায় দিতে আমার বাধে। অডেনের মতো আমিও মনে করি, সবকিছুই কবিতার বিষয় হতে পারে। কবিতার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত কোনো এলাকা নেই। আধুনিক কবিগোষ্ঠী এ-কথা সপ্রমাণ করেছেন যে, কোনো কিছুই কাব্য-বহির্ভূত নয়। প্রকৃতপক্ষে একটি যুগের নান্দনিক ও কাব্যিক সংস্কার দ্বারাই সেই যুগের কবিগোষ্ঠী মূলত শাসিত হন, কেউ কেউ স্বায়ত্তশাসনের তাগিদে দলছুট হয়ে পড়েন, এমন নজিরও রয়েছে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন যে, সব কিছু নিয়ে কবিতা লেখা যায় না। বুঝি তাই তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন যে, মোরগ সম্পর্কে কবিতা লিখতে পারলে তিনি তাঁকে শিরোপা দেবেন। মোরগের কথা শুনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু পিছু হটেননি, 'কুক্কুট' নামক কবিতাটি রচনা করে তিনি দেখালেন যে, কাব্যে ব্রাত্যদের জন্যেও রয়েছে অকৃপণ ঠাঁই।

অডেন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি শুধু কবিতা রচনাতেই অসামান্য পারদর্শী নন, কাব্যনাট্য ও প্রবন্ধ রচনাতেও রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি কবিতা লিখেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি আমৃত্যু ছিলেন অনলস। এমন কি ব্যালাড, সনেট এবং ওড প্রভৃতি লিখেও তিনি দেখিয়েছেন যে কাব্যক্ষমতার পুঁজি থাকলে এসব সনাতনী ফর্মের মাধ্যমেও কবিতার শরীরে নব্য লাবণ্যের ঢল বইয়ে দেয়া সম্ভব। একদিকে যেমন ভাবগম্ভীর কবিতায় তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন অন্যদিকে তেমনি খ্যাতি অর্জন করেছেন হালকা কবিতা লিখে। যদিও তাঁর কোনো কোনো হালকা কবিতায় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে, তবু সেগুলো খুবই উপভোগ্য।

আমি এখানে 'Miss Gee' শীর্ষক চমৎকার গাথাটি স্মরণ করছি, যেটি শেষ হয়েছে এভাবে :

They took her off the table
    They wheeled away Miss Gee
Down to another department
    Where they study Anatomy.

They hung her from the ceiling
    Yes, they hung up Miss Gee.
And a couple of Oxford Groupers
    Carefully dissected her knee.

একজন ক্যান্সার রোগাক্রান্ত চিরকুমারীকে নিয়ে এই রসিকতা নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুরতারই পরিচায়ক। যাহোক অডেনের হালকা কবিতা পড়ার পরেই আমি যথার্থভাবে এ ধরনের কবিতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। এডওয়ার্ড লিয়ারের লিমেরিক, দুঃখের বিষয়, আমি পড়েছি অনেক পরে। অবশ্য শিশুদের চিত্তহরণকারী সুকুমার রায়, যাঁর আবোল-তাবোল পাঠ করে আমার মানসে একটি মোহন আজব জগৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো, আমাকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন হালকা কবিতার রসাস্বাদনের জন্যে।

বুদ্ধিচর্চাতেই ছিলো অডেনের আনন্দ। তাই মননশীলতা তাঁর কাব্যের একটি প্রধান সুর। সারাজীবন তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিলো তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি শুধু জ্ঞান অর্জন করেই তৃপ্ত থাকেননি, সেই জ্ঞান কাজেও লাগিয়েছেন। তাঁর মানসে সহাবস্থান করেছেন, মার্কস, ফ্রয়েড, কীর্কেগার্ড — সবাই। স্টিফেন স্পেন্ডার যখনই অডেন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন তখনই সেই বিদগ্ধ কবির বইময় ঘরে কথা বলেছেন। যখন অডেন অক্সফোর্ডের ছাত্র তখনই তিনি সেই একুশ বছর বয়সে, একজন অসাধারণ পাঠক এবং মননশীল কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। স্পেন্ডার প্রমুখের কাছে তখন অডেন এমন এক ব্যক্তিসত্তা যার কাছে যেতে হয় অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে, কথা বলতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। অডেন বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রকৌশল ও কারিগরি বিদ্যার বহু শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেই ব্যবহার পদ্ধতিতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন তিনি। পণ্ডিতদের মতো তিনি সেসব শব্দ ব্যবহার না ক'রে মিল্টন যেমন

তাঁর কাব্যে প্যাগান দেবতাদের নাম ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি অডেন নিপুণ প্রয়োগ করেছেন অর্থনীতি কিংবা মনস্তত্ত্বের কোনো বিশেষ শব্দ।

অডেনের কাব্যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে সত্য, কিন্তু তা ব'লে তিনি হৃদয়বত্তাকে খারিজ করেননি। করেননি ব'লেই তাঁর কবিতা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি যে সমাধান তাঁরে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন তা' অবশ্য মানব-হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে না। কালবেলায় যে-বিচ্ছিন্নতা আমাদের দখল ক'রে ফেলে, সেই বিচ্ছিন্নতার কথা তাঁর কাব্যে উচ্চারিত হয়েছে ব'লে, সেই সুরে আধুনিক মানুষ সচকিত হয়ে ওঠে এবং নিজের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে কবিতার ধ্বনিপুঞ্জের মিল দেখে সেই কবিকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করে। এজন্যে অডেন স্মরণীয় অবশ্যই, এবং ইংরেজি কাব্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্যেও বরণীয়। কাব্যখ্যাতির ওঠা নামা আছেই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির খ্যাতি বাড়ে কিংবা কমে। এমন কবি বিরল যাদের প্রতিপত্তি সর্বকালেই অবিচল। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত কবি কোনো কালেই তাঁদের পাঠকের অভাব হয় না। অডেন সে জাতের কবি যাদের পাঠক সংখ্যা কখনো খুব বেশি হয় না, তবে যাঁরা তাঁর কবিতা পড়বেন তাঁরা প্রকৃতই সৎ পাঠক। সত্যিকারের দীক্ষিত তাঁরা, একটি গুপ্ত গোষ্ঠীর মতো প্রায়, কবিতায় আজীবন সমর্পিত।

## বুদ্ধদেব বসু, তাঁর সৃষ্টির তীর্থে

আমি তখন সদ্য কৈশোর পেরিয়েছি, সাহিত্য আমাকে দূর থেকে হাতছানি দিচ্ছে। সাহিত্য কী, এ বিষয়ে তখনও আমার মনে কুয়াশাময় ধারণাও ছিল গরহাজির। সাহিত্য সৃষ্টির অসম্ভব কথা মনেই আসেনি। আমরা ধারণা ছিল, যাঁরা এই কাজটি করেন তাঁরা মর্ত্যবাসীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আমাদের মতো লোকজনের পক্ষে চর্মচক্ষে তাঁদের দেখা অসম্ভব। এই অমূলক ধারণা অবশ্য কিছুকাল পরেই উধাও হল। আমার পিতার একজন লেখকবন্ধু ছিলেন। তাঁকে অনেকেই আব্দুল মজিদ সাহিত্যরত্ন নামে চিনত। তিনি আমাদের বাসায় প্রায়শই আসতেন তাঁদের সুহৃদের কাছে। তিনি প্রচুর পান চিবোতেন রসিয়ে রসিয়ে, হুঁকোও টানতেন অনেকক্ষণ ধ'রে। খোদ সাহিত্যিক আব্দুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এবং তাঁর সাধারণ মর্ত্যবাসীর মতোই কিছু কাজ আমি তো চর্মচক্ষেই দেখতে পেয়েছি। তাঁকে কেশে কেশে বুকের রক্ত মুখে তুলতে দেখেছি ভয়ার্ত চোখে। যক্ষ্মা রোগে ভুগে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সেকালে আমার প্রিয়তম শহর ঢাকায় পটুয়াটুলি এলাকার শেষ প্রান্তে বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স নামে একটি ছোটো কিন্তু সুন্দর বইয়ের দোকান ছিল। এই বইয়ের দোকানই, বলা যেতে পারে, প্রথম আমাকে আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেখান থেকেই লোভী বালকের মতোই একসঙ্গে চারটি কাব্যগ্রন্থ কিনে ফেলি — মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী', 'কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা।' চারটি কাব্যগ্রন্থই আমি দ্রুত পাঠ করে যেন

মুক্তিস্নান সেরে উঠি মুগ্ধতায়। তবে আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার চিত্ত সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি পড়ে। বারবার পড়ার পরেও এতটুকু ক্লান্তি ঘেঁষতে পারেনি আমার মানস-সীমানায়।

এরপর বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য বই পড়ার জন্য তীব্র উৎসুক হয়ে পড়ি। ইতিমধ্যে তাঁর বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য জেনে গেছি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। বি. এ. অনার্স এবং এম. এ.-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন তো বটেই, তিনি যে নম্বর পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন সেকালে তা আজ অব্দি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বুদ্ধদেবের পরীক্ষার খাতা পড়ে একজন ডাকসাইটে ইংরেজ অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, 'ছেলেটি হয় উন্মাদ নয়ত জিনিয়াস।' হ্যাঁ, কিংবদন্তীপ্রতিম সেই ছাত্র জিনিয়াসই ছিলেন, ছিলেন অসাধারণ। অন্য কিছু নয়।

বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভা, বলা নিষ্প্রয়োজন, শুধু পরীক্ষার খাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর প্রতিভা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকেও বিভিন্ন ভাবে ঋণী, ঋদ্ধ করেছে। 'বন্দীর বন্দনা' পড়ার পর বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য বই পড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। তখন থেকে তাঁর যে-বই দোকানে দেখি, চটজলদি কিনে ফেলি এবং বাড়ি ফিরেই পড়তে শুরু করি প্রেমে-পড়া যুবকের বাধাবন্ধহীন আবেগময় অনুরাগ নিয়ে। ক্রমান্বয়ে আমার হাতে আসতে থাকে 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদ্রীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর', 'যে আঁধার আলোক অধিক', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এর মতো কবিতার বই। বস্তুত আমার এই একান্ত প্রিয় লেখকের সব ধরনের প্রায় প্রতিটি লেখাই গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ও কাব্যনাট্য, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, সমালোচনা, ছোটোগল্প, ভ্রমণ কাহিনি, বোদলেয়ার, রিলকে, হোল্ডার্লিন-এর কবিতা, কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ কিছুই বাদ দিইনি। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেবের মতো বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অন্য কোনও সাহিত্যিকের আবির্ভাব এখনও হয়নি। ক'জন লিখতে পারেন 'মহাভারতের কথা'র মতো অসাধারণ বই। করুণা করি সেসব পাঠক-পাঠিকাদের, যারা আজ অব্দি বইটি পড়েননি। আমি নিজেকে হতভাগ্য মনে করি এ ভেবে যে, বইটির দ্বিতীয় খণ্ড আমার কস্মিনকালেও পড়া হবে না। কেননা, পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডটি শুরু করার আগেই বুদ্ধদেব বসুকে অবিবেচক, নির্দয় মৃত্যু হরণ ক'রে নিয়ে যায় আমাদের সবার কাছ থেকে। তবে তাঁকে আমাদের চিত্ত, সত্তা ও স্মৃতি থেকে অপসারণের ক্ষমতা মৃত্যুরও নেই। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সৃষ্টিক্ষম ছিলেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান কীর্তি 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা। এই পত্রিকাটির জন্ম না হ'লে, আমি বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি, আধুনিক বাংলা কবিতার লালন ও পরিবর্ধন আজকের মতো হত না। এজন্যে আমরা যারা কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছি, তারা তো বটেই, কবিতার নিবেদিতচিত্ত পাঠক-পাঠিকারাও কবি-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। প্রসঙ্গত নিজের বিষয়ে সামান্য কথা উল্লেখ করতে চাই। আমি কবিতা লেখা শুরু করার চার বছর কেটে যাওয়ার পরও বুদ্ধদেব বসুর কাছে 'কবিতা'-র জন্যে আমার

কোনও রচনা পাঠানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি, যদিও আমার অকৃত্রিম বন্ধু কবি-সম্পাদক কায়সুল হক এই কাজটি করার ব্যাপারে বহুবার অনুরোধ করেছেন। একবার আমার 'রূপালী স্নান' কবিতাটি দু'চারটি আপত্তিকর শব্দের কারণে দৈনিক 'সংবাদ'-এর সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। শব্দ ক'টি বদলে দিলে দয়াপরবশ হ'য়ে ছাপতে পারেন ব'লে জানিয়েছিলেন। এই প্রস্তাব কোনও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন তরুণ কবিও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করতে অপারগ। তাই, লাল কালি-চিহ্নিত কবিতাটি ফেরত নিয়ে চলে আসি। বাড়ি ফিরে আসার পর কায়সুল হকের কথা মনে পড়ল। সাহস সঞ্চয় করে দুরু দুরু বুকে 'রূপালী স্নান' কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর কাছে ২২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউর কবিতাভবনে পাঠিয়ে দিলাম। শিগগিরই আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে মহীশূর থেকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি এসে পৌঁছল ঢাকায় আমার ঠিকানায় (৩০ আশেক লেনে)। তাঁর মতো একজন অসামান্য কবি এবং আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের কিংবদন্তী প্রতিম অন্যতম স্থপতি আমার মতো একজন প্রায়-অজ্ঞাত তরুণ পদ্যরচয়িতার কবিতা নির্বাচিত হওয়ার সানন্দ খবর জানাবার জন্যে বাক্য ব্যয় করবেন, এটা আমার পক্ষে ছিল আশাতীত। আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান এবং শ্রদ্ধাভাজন বুদ্ধদেব বসুর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করেছি। তাঁর চিঠিতে 'দুরন্ত দুপুর'-এর কবি নরেশ গুহের উল্লেখ ছিল। সেই সূত্রে নরেশ গুহের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। এ খবর সর্বপ্রথম বন্ধু কায়সুল হককে রংপুরে চিঠি লিখে জানাতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিনি।

তারপর 'কবিতা'য় আমার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। একবার আমার দুটি কবিতা দিয়ে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনুরোধে (বুদ্ধদেব আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন) ত্রৈমাসিক 'কবিতা' শুরু হয়েছিল। 'পূর্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিবেচনায় সেই সংখ্যায় বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী এবং খোদ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার উপস্থিতি সত্ত্বেও তরুণ শামসুর রাহমানের কবিতা দু'টি শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ঔদার্যের কাছে সেদিন মাথা নত করেছিলাম। তিনি 'পূর্বাশা'য় আমার বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। একবার 'পূর্বাশা'ও শুরু হয় আমার কবিতা দিয়ে।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে কোনও কলেজে অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র হিসেবে শিক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবু দূর থেকে প্রায় একলব্যের মতোই মনেপ্রাণে শিক্ষাগুরু জ্ঞান করেছি তাঁকে। সাহিত্য যে ভালোবাসার বিষয়, এই শিক্ষা তিনি আমাকে মুখে না বললেও তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। কবি হিসেবে আমি কোন্ পর্যায়ের জানি না, তবে আমি নিজেকে একজন দীক্ষিত, উঁচুদরের সাহিত্যপ্রেমিক ব'লে দাবি করি এবং এটি বুদ্ধদেবেরই দান। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' কাব্যসংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর যুগপৎ আনন্দিত এবং ব্যথিত হই। আশা করেছিলাম, সেই সাড়া-জাগানো কাব্যসংকলনে পূর্ববাংলার (তখনও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেনি) আমাদের দু চারজনের কবিতা থাকবে। আমার আশা ভঙ্গ হয়েছিল এবং অন্তত আমি কয়েকজনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শিকারও হয়েছিলাম, মনে পড়ে। পরবর্তীকালে কবিবন্ধু তারাপদ রায় একদিন বলেছিলেন, নতুন একটি সংস্করণে আমাদের দু'তিন জনের কবিতা গ্রহণ করবেন ব'লে মনস্থির করেছিলেন

বুদ্ধদেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী কারণে যেন সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সে কারণে আমার শিক্ষাগুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র অপ্রসন্নতা অবচেতন মনের কোনও কোণেও ঠাঁই দিইনি।

বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং তিনিই ছিলেন সেই নতুন বিভাগের যোগ্যতম প্রধান। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণ বি. এ.-পাস কাউকেই অধ্যাপক হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। যতদূর জানি, শুধু দু'জনের নিয়োগের বেলায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা হয়। অনেক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন কবি-সমালোচক বি. এ. পাস মোহিতলাল মজুমদার এবং সেই অসামান্য ঘটনার বহু পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন কবিবন্ধু বুদ্ধদেব বসুর একক জেদী প্রচেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অদম্য লড়াইয়ের ফলে। তাঁর সৃষ্ট তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের জন্যে বুদ্ধদেবের অসীম মমতার কথা আমরা অবগত আছি। তিনি একজন পরিশ্রমী, প্রাজ্ঞ, সৃজনশীল মালীর পরিচর্যা দিয়ে এই বিভাগটিকে গড়ে তুলেছিলেন একটি সুন্দর, উদ্যান রূপে। তাঁর উদ্যোগেই এই উদ্যানে যুক্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান অনতিতরুণ এবং তরুণ সুশিক্ষিত, সৃষ্টিমুখর অধ্যাপক- অধ্যাপিকা।

আগেই উল্লেখ করেছি দূর থেকে আমি বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর অজ্ঞাতসারেই আমার একজন শিক্ষক হিসেবে সবিনয় শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিলাম। 'কবিতা'য় আমার ছয়-সাতটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর আমার তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মতো একজন নতুন কবির দোষত্রুটি দেখিয়ে, নানা পরামর্শ দিয়ে প্রকৃত গুণী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কালজয়ী স্থপতি। শুধু আমাকেই নয় আরও কিছুসংখ্যক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণকে তিনি সস্নেহ পরামর্শ দিয়ে দুর্বলতা শুধরে নিতে সাহায্য করেছেন। আমার এ-কথার সঙ্গে, আশা করি, কবিবন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও সুর মেলাবেন।

মনে পড়ে রংপুরের একজন বিদগ্ধ পাঠক এবং ছান্দসিক তাপসকুমার ভৌমিক একদা আমার বিষয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি আমার একলব্যসুলভ সশ্রদ্ধ অনুরাগ লক্ষ ক'রে আমাকে 'বৌদ্ধ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, যদিও তরুণ শামসুর রাহমানের আদি পর্বের কবিতায় জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। আমি নিশ্চিত, তাপস কুমার ভৌমিকের মতো বিদগ্ধ, কিন্তু অত্যন্ত অলস প্রাবন্ধিকের আমার সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব ছিল না। বন্ধু কায়সুল হকের নাছোড় তাগিদের ফলেই সেই প্রায়-অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন হতে পেরেছিল। কী সুন্দর, বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রবন্ধ শ্রদ্ধেয় তাপসদা লিখেছিলেন একজন তরুণ কবি সম্পর্কে। প্রবন্ধটি একটি পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, সেটি অনেক কিছুর মতোই হারিয়ে ফেলেছি। বিরলপ্রজ তাপস কুমার ভৌমিকের ছন্দ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ বুদ্ধদেব সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল গুরুত্বের সঙ্গে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এতই কম লিখেছেন তিনি,

তাঁর মতো একজন লেখকের একটি বইও প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘকাল হল তিনি রংপুর ত্যাগ করে দেশান্তরী হয়েছেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তা পর্যন্ত জানি না।

আমার পরম সৌভাগ্য, শুধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যতীত তিরিশের সকল প্রধান কবির দেখা পেয়েছি। বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের দু'জনেরই স্নেহধন্য হতে পেরেছিলাম। দু'জনের জীবনাবসান আমাকে কাঁদিয়েছে। তাঁদের সমপর্যায়ের না হ'লেও ভালো কবি, ঔপন্যাসিক এবং 'পূর্বাশা'র মতো উঁচু মানের পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো আমার সত্যিকারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে কখনও আমার দেখা হয়নি। বহুবার দেখা হয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং অরুণ মিত্রের সঙ্গে। এই দু'জনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি, নানা জনের বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রদ্ধাভাজন অন্নদাশঙ্কর রায়ের অটল সিদ্ধান্ত এবং বন্ধু কায়সুলের একগুঁয়ে প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫৩ সালে আমি হেন অর্বাচীন, অখ্যাত কবিকর্মী শান্তিনিকেতনের প্রথম সাহিত্যমেলায় একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তখন 'কবিতা' পত্রিকায় সবেমাত্র একটি কবিতা এবং 'পূর্বাশা'য় দু'তিনটি কবিতা ছাপা হয়েছে। কেবল এটুকু পুঁজি নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, লীলা মজুমদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিখ্যাত ব্যক্তির পাশে একই মঞ্চে ঠাঁই পেয়েছিলাম, এই গৌরবময় স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়। আজও মনে পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অপূর্ব উচ্চারিত ভাষণ, বুদ্ধদেব বসুর সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ঈষৎ ক্ষিপ্ত দীপ্ত ভাষণ। আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ক একচক্ষু, বিশেষত জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে দীর্ঘ নিন্দাসম্বলিত স্নেহাস্পদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঝাঁঝালো প্রবন্ধের প্রতিবাদে বুদ্ধদেব বসু পাঁচ মিনিটের জন্য ঝলসে উঠেছিলেন ক্রুদ্ধ দেবদূতের মতো। তরুণ অধ্যাপক এবং বুদ্ধিজীবী অম্লান দত্ত একটি বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা করেছিলেন একটি অধিবেশনে। আজও, এত বছর পরেও, ভুলতে পারিনি সেসব ভাষণ ও বক্তৃতার কথা। অর্বাচীন আমিও পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা বিষয়ে একটি সামান্য নিবন্ধ পাঠের সুযোগ পেয়েছিলাম। মাইক্রোফোনের মুখোমুখি দাঁড়াবার মুহূর্তেই এমন বিচলিত বোধ করলাম যে আমার কম্পমান শরীরটি যেন তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা যাবে। কিন্তু খানিক পরেই সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রবন্ধটি অকম্পিত কণ্ঠস্বরেই পড়ে ফেললাম। চতুর্দিক থেকে উচ্চারিত হতে শুনতে পেলাম 'সাধু সাধু' শব্দ। নিজের কর্ণকুহরকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। অনেকেই প্রশংসা করলেন আমার লেখার। ছাত্রছাত্রীরা তো পারলে, কায়সুল হক সাক্ষী, আমাকে কাঁধে নিয়ে নাচে। তবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম গৌরী দত্তের উক্তি শুনে। তিনি স্মিত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'You have a wise head on your young shoulder.' তখনও তিনি গৌরী আইয়ুব হননি, তখন চলছিল আবু সয়ীদ আইয়ুব আর তাঁর প্রণয়ের কাল।

যাই হোক, শান্তিনিকেতনে বুদ্ধদেব বসুর ক্রুদ্ধ এবং স্নেহশীল দু'টো রূপই দেখতে পেয়েছি। আমার যখন 'রতন কুঠি'র সামনে দাঁড়িয়ে-ব'সে বুদ্ধদেব বসুর কথা শুনছিলাম, তখন দেখলাম তিনি শক্তিমান কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অত্যন্ত

স্নেহপ্রবণ। তিনি সেই ঘরোয়া আসরে তাঁর প্রিয় সুভাষের একটি শব্দের অপপ্রয়োগও শুধরে দিলেন, মনে পড়ছে আজও। আমিও সবার অজ্ঞাতসারে শব্দের অপপ্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে উঠি, যা আমাকে সতর্ক করে তুলবে অদূর ভবিষ্যতে।

বুদ্ধদেব বসু, অনেকেই জানেন, একদা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কখনও কমিউনিজমে দীক্ষিত হননি, বরং তিনি সেই আদর্শবিরোধী ছিলেন। সেজন্যে অবশ্য তিনি কখনও বিষ্ণু দের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ থেকে বিচ্যুত হননি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে স্নেহ গুটিয়ে নেননি। এমনই উদার চিত্তের সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। শুধু একবার প্রিয় নরেশ গুহকে অথবা কন্যা রুমিকে লেখা একটি চিঠিতে, ঠিক মনে পড়ছে না, একটি উক্তিতে বুদ্ধদেবের অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছিল। তিনি সন্তোষকুমার ঘোষের প্রচুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন শ্রী ঘোষ খুবই ভালোমানুষ, কিছু কারণের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কালের কথাশিল্পীর কমিউনিজম-বিরোধিতার মধ্যে ভালোত্বের সন্ধান করেছিলেন ব'লে আমার মতো একলব্যও ঈষৎ মন খারাপ করেছিল আত্মার আত্মীয়, দূরবর্তী শিক্ষাগুরুর উপর্যুক্ত মন্তব্যের জন্যে। আমিও ভালোবাসতাম প্রতিভাবান কথাশিল্পী এবং ভালো মানুষ ব'লে সন্তোষ দা'কে, কিন্তু কখনও সেই ভালোত্বের অন্যতম কারণ হিসেবে তাঁর কমিউনিজম-বিরোধিতাকে বিবেচনাযোগ্য মনে করিনি। তবে এটাও মনে রাখতে হবে সেটি ছিল ব্যক্তিগত চিঠিতে কোনও আপনজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা, প্রকাশকের জন্য তা তিনি লেখেননি।

যখনই নাকতলায় বুদ্ধদেবের বাসভবনে অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু লালিত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যাই আমার হৃদয় হু হু ক'রে ওঠে এক শূন্যতায়। যেদিন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট ডিগ্রি নিতে গিয়েছিলাম সেদিন বারবার মনে পড়েছিল তাঁর কথা। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, তিনি জীবিত থাকলে অত্যন্ত আনন্দিত হ'তেন। আমাদের সবার দুর্ভাগ্য, মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মৃত্যু তাঁকে চুরি ক'রে নিয়েছে। তবে মৃত্যুর এই তস্কর বৃত্তি নিরর্থক, নিষ্ফল। কারণ, বুদ্ধদেব বসুর মরদেহ চুরি করা সম্ভব হলেও প্রকৃত সৃজনশীল বুদ্ধদেবের মৃত্যু নেই। তিনি মহিমান্বিত অমরদের একজন। তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার আমরা তো আজীবন পাঠ করবই, আমাদের পরবর্তী অগণিত প্রজন্মের লেখক এবং সাহিত্যরসিক বারবার যাবে তাঁর সৃষ্টির তীর্থে অপরূপ রস-সরোবরে অবগাহনের উদ্দেশ্যে।

# শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ

## নিঃসঙ্গতা নির্মাণে যিনি অক্লান্ত, মননে অগ্রসর

স্মৃতি এখন আর খুব প্রখর নয়। বিশেষ ক'রে সন তারিখ ঠিক মনে থাকে না। প্রায়শই গোলমাল করে ফেলি। এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনা দিনক্ষণ সুদ্ধ গড়গড়িয়ে ব'লে যেতে পারেন। আমি তাদের ঈর্ষা করি। কোন সালে প্রথম দেখেছিলাম শওকত ওসমানকে? বলতে পারব না। তবে মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকের গ্রীষ্মকালে এক বিকেলে তাঁকে দেখেছিলাম ঢাকা শহরে। হয় বাংলাবাজারে কোনও বইয়ের দোকানে নয়তো পাটুয়াটুলীতে সওগাত আফিসে। বরেণ্য কথাশিল্পী শওকত ওসমানের পরনে ছিল সাদা ফুল সার্ট আর সাদা ট্রাউজার। নির্মেদ, ছিপছিপে শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, এক মাথা কালো চুল। তাঁকে বেশ চটপটে এবং ছটফটে মনে হল। তিনি সেদিন আমাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না জানি না। চেনার কথাও নয়। আমার সঙ্গে তাঁর কোনও কথাবার্তা হয়নি সেদিন। দূর থেকে লক্ষ করেছি শুধু। স্বভাবে লাজুক আমি, ভেতরে গুটিয়ে থাকা তরুণ কবিকর্মী। কারও সঙ্গে যেচে কথা বলতে অক্ষম। কে যেন বলেছিলেন, 'ঐ যে দেখছেন দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন ভদ্রলোক, উনি শওকত ওসমান। বনি আদম-এর লেখক।' বনি আদম-এর কথা জানা ছিল। কলকাতার দৈনিক আজাদ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। বনি আদম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগে পাঠকসমাজে। সেকালে অনেকেই সেই উপন্যাস প'ড়ে মুগ্ধ হন। বনি আদম বহু বছর বই হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। বনি আদম-এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেন শওকত ওসমান। হারিয়ে-যাওয়া পাণ্ডুলিপির ভগ্নাংশ উদ্ধার করতে পেরেছেন তিনি বহুকাল পরে সিকানদার আবু জাফরের সৌজন্যে। সেই ভগ্নাংশের সঙ্গে স্মৃতির উপর নির্ভর করে লেখা কিছু অংশ জুড়ে বনি আদম-এর নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন শওকত ওসমান। বহুবছর পরে ১৯৯৪ সালে পুস্তকাকারে বনি আদম প্রকাশিত হয়। শওকত ওসমানকে যখন প্রথম দেখি, তখন তিনি চট্টগ্রামে একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। এর আগে কলকাতার কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে অধ্যাপনা করতেন তিনি। দেশবিভাগের পর আরও অনেকের মতোই শওকত ওসমানও পূর্ব বাংলায় এসে পড়েন। অবশ্য কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো অনেক বরেণ্য লেখক কলকাতা ত্যাগ করেননি। কাজী নজরুল ইসলাম তখন বোধশক্তিরহিত, রুদ্ধবাক। যদি তিনি সুস্থ থাকতেন, তাহলে কখনও তিনি এখানে বাস করতে আসতেন কি না, এ ব্যাপারে আমি সন্দেহ পোষণ করি। সৈয়দ মুজতবা আলী গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে এসে জব্দ হয়ে ফিয়ে যান কলকাতায়। কিছু সংখ্যক

কূপমণ্ডূক, সাম্প্রদায়িক লোকের উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যেতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি স্বস্তি পেতেন। শেষের দিকে ঈষৎ ক্লান্ত, অসুস্থ সৈয়দ মুজতবা আলী পরিবারিক টানে ঢাকায় আসেন।

যা হোক, শওকত ওসমান, আমাদের শওকত ভাই, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার প্রেমে পড়লেন গভীরভাবে। এই প্রেমের পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাঁর বহু রচনায়। এই প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী মানুষটি আটাত্তর বছর বয়সেও সৃজনশীল। কয়েক মাস আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বাড়ির বাইরে বেরুনো বারণ, সর্বক্ষণ চিকিৎসকের বিধান মেনে চলতে হচ্ছে। যিনি ছিলেন কর্মচঞ্চল, অস্থির চিত্ত, যখন-তখন বাইরে বেরিয়ে পড়া বন্ধুবৎসল মানুষ, তিনি আজ স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে আছেন, ভাবলেও খারাপ লাগে। শওকত ওসমানের স্নেহধন্য আমি। সব সময় তিনি আমার খোঁজ-খবর রাখেন। প্রায়শই টেলিফোনে আমার কুশল জানতে চান, কথা বলেন নানা বিষয়ে। আমার কোনও সদ্য প্রকাশিত কবিতা ভালো লাগলে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে জানান আমাকে। আমাদের গদ্যলেখকদের মধ্যে তাঁর মতো কাব্যবোদ্ধা আমি অন্তত দেখিনি। দেশ-বিদেশের বহু কবিতার পঙ্‌ক্তি তাঁর মুখস্থ। মনে পড়ে, বেশ কিছুকাল আগে তিনি শহিদ কাদরী সম্পর্কে ইংরেজিতে এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ বিষয়ে বাংলায় দু'টি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ লেখেন হলিডে এবং সমকাল-এ। এই দু'টি আলোচনা পড়লে বোঝা যায়, কাব্যসমালোচক হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট। তরুণতম লেখকদের রচনাও তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। তাঁর ভালো-লাগার কথা জানাতে ভোলেন না। এক সময় যাদের লেখা তাঁর মন কেড়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের পতন তাঁকে ব্যথিত, ক্ষুব্ধ করেছে।

শওকত ওসমান তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করে মাদ্রাসায়। যে কিশোর পরে শওকত ওসমান হবে সে মাদ্রাসার সংকীর্ণ, পশ্চাৎপদ শিক্ষার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। মাদ্রাসায় থাকা অবস্থাতেই তিনি আধুনিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এম. এ পাস করেন তিনি। অবসর নেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করেছেন। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর বেশ কয়েকজন গুণমুগ্ধ ছাত্রের মুখে তাঁর পড়াশোনার প্রশংসা শুনেছি। শওকত ওসমানের ক্লাসের বক্তৃতা শুধু পাঠ্য কেতাবেই সীমাবদ্ধ থাকত না। সাহিত্য তো আছেই, তা'ছাড়া দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়েও কথা বলতেন ক্লাসে, যা শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে সহায়ক। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করেছি তাঁর মধ্যে। একেই সম্ভবত ফড়িং-মন বলে। এই প্রবণতা সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক আস্‌হাব উদ্দীন আহমদ-এর মধ্যেও ছিল।

চল্লিশ দশকের মুসলমান লেখকদের মধ্যে শতকত ওসমান, আমার ধারণা, সবচেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন। তিনি জননী, রাজসাক্ষী, সমাগম, ক্রীতদাসের হাসি এবং পতঙ্গ পিঞ্জর-এর মতো সফল উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর জননী উপন্যাসটির অনুবাদ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থা হাইনেম্যান প্রকাশ করেছে। রাজসাক্ষীর অনুবাদ

প্রকাশ করেছে লিডস্-এর পিপল ট্রি পাবলিশার্স। দু'টি উপন্যাসই অনুবাদ করেছেন ওসমান জামাল। ওসমান জামালের সুদক্ষ অনুবাদ জননী এবং রাজসাক্ষীকে বিদেশি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ইংরেজ আলোচকবৃন্দ শওকত ওসমানের প্রচুর তারিফ করেছেন। তাঁর চরিত্র-চিত্রণ, সামাজিক পরিবেশের বর্ণনা, নিপুণ ব্যঙ্গময় প্রতীকধর্মী লেখা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে মুদ্রিত রচনায়। শওকত ওসমান ছোটোগল্প রচনাতেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। থুতু এবং ইলেম-এর মতো অসামান্য ছোটোগল্পের রচয়িতা তিনি।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে শওকত ওসমান বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। পাঠক সমাজের কাছে তিনি মূলত একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর অর্জন সামান্য নয়। এখন আর তিনি নাটক লেখেন না। কিন্তু চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে তিনি নাটক রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দেন। আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর, কাঁকরমণি, বাগদাদের কবি, ডক্টর আবদুল্লার কারখানা প্রভৃতি নাটকে তাঁর নাট্যক্ষমতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লিখেছেন, 'সমাজের নানা অনাচার ও অন্যায়, ভণ্ডামি ও শোষণলিপ্সা, জীবনযাত্রায় মূল্যবোধের বিপর্যয়, আত্মোন্নতির বেদিমূলে সব শ্রেয়কে বিসর্জন দেওয়া, হাস্যকর চরম অসঙ্গতিকে বল্গাহীন প্রশ্রয় দান এসবকে শওকত ওসমান শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে তাঁর নাটকে চিত্রায়িত করেছেন। তাঁর মানস গঠনে বেন জনসন, মলিয়েরে এবং বার্নার্ড শ'র প্রভাবের চিহ্ন সচেতন পাঠকের নজরে পড়তে পারে।'

প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ পড়লে মনে হয়, আমরা একজন যুক্তিবাদী অগ্রসর সেক্যুলার ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছি। তাঁর রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা সহজেই পাঠকের মনোগোচর হয়। শওকত ওসমানের এই মানস উদ্ভাসিত নিঃসঙ্গ নির্মাণ এবং চূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা বই দু'টিতে। কখনও কখনও পদ্য রচনাতেও তাঁর শক্তি ঝলসে ওঠে। পদ্য দিয়েই তাঁর লেখকজীবন শুরু হয়। তখন তিনি সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তাঁর আদি পদ্যে সাম্প্রদায়িকতার কালো ছায়া ছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই ছায়া অপসৃত হয়। তিনি কবিতা লেখার কুশলতার পরিচয় না দিলে তাঁর দু'টি কবিতা কবি এবং ছন্দশাস্ত্রী আবদুল কাদিদের কাব্য মালঞ্চ সংকলন গ্রন্থে ঠাঁই পেত না। শওকত ওসমানের একটি কবিতার শিরোনাম ছিল 'দিনের কবিতা'। বহুকাল হল তিনি কবিতাকে ছুটি দিয়েছেন। তবে মাঝে মধ্যে সামাজিক দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছোটো ছোটো পদ্য লেখেন। এক বছর আগে তিনি লিখেছিলেন—

বড় অসহায় রসুল ও আল্লা,
যে দেশে খোদ সরকার মোল্লা।

তিনি অসুস্থ শরীরেও রাহনামা নামে আত্মজীবনী লিখে চলেছেন। তাঁর এই আত্মকথায়, আমার বিশ্বাস, অতীতের এবং বর্তমানের একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকৃতি ফুটে উঠবে।

## বাংলাদেশের উর্দু লেখক সম্প্রদায়

সেদিন প্রেসক্লাবে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে। আমাদের দেখা সাক্ষাৎ বেশি না হলেও আমরা বন্ধুতার বন্ধনে আবদ্ধ। অন্তত আমি তা-ই মনে করি। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন থেকেই এই বন্ধুতার সূত্রপাত। আমি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মননশীলতায় মুগ্ধ। তিনি একজন খাঁটি মার্কসবাদী এবং তেজী বুদ্ধিজীবী। বেশ কিছুদিন পর উমরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালো লাগছিল। প্রেসক্লাবের লনে আড্ডা জমে উঠল। কথাচ্ছলে উমর আমাকে ইকবালের একটি কবিতার কয়েকটি শব্দের মানে জিজ্ঞেস করলেন। শব্দার্থ আমার জানা আছে কিনা তা পরখ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর জিজ্ঞাসা। উর্দু শব্দাবলির অর্থ আমি বলে দিতে পারায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি ইকবালের 'শাহীন' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন। মনে হল, উমর এখন উর্দু সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। কথাচ্ছলে তিনি বললেন, 'রেডিও টেলিভিশনে এখানকার উর্দু লেখকদের জন্যে অন্তত মাসে একবার কিছু সময় বরাদ্দ করা দরকার।' তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনও অবকাশ নেই। এটা আমারও মনের কথা। উমর প্রসঙ্গটি উত্থাপিত করলেন বলে খুশি হলাম।

বাংলাদেশে কয়েকজন উর্দু লেখক আছেন, যাঁরা এখনও সাহিত্যচর্চায় নিবেদিতচিত্ত। কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল। তাঁদের লেখা ছাপা হবে কোথায়? কোনও পত্রিকা নেই। উর্দু বই প্রকাশ করার মতো প্রকাশকও এখানে নেই। তাই তাঁরা ভারত ও পাকিস্তানের পত্রপত্রিকার মুখাপেক্ষী। হয়তো কেউ কেউ ইতিমধ্যে লেখার আগ্রহ এবং উদ্যম হারিয়ে ফেলেছেন। একজন লেখকের মানসিক মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক, সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের উর্দু লেখকদের উৎসাহিত করার জন্যে রেডিও, টেলিভিশনের এগিয়ে আসা উচিত। এই উর্দু লেখকেরা বাংলাদেশের নাগরিক। উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনা ক'রে তাঁরা কোনও অপরাধ করেননি। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের কোনও আক্রোশ নেই। আসলে কোনও বিদেশি ভাষারই বিরোধিতা করতে চাই না আমরা। অতীতে, পাকিস্তান আমলে গোড়ার দিকে আমরা উর্দু ভাষার বিরোধিতা করেছি; কারণ, পাকিস্তানের শাসকচক্র উর্দুকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাঙালিরা বাংলা ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি, গড়ে তুলেছিল উর্দুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। তা বলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কোনও জাতক্রোধ ছিল না বাঙালিদের। অনেক আগেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমাদের উপর উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। যে সব বাঙালি উর্দু সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী তাঁর সোৎসাহে উর্দু ভাষা লিখতে পারেন, কেউ বারণ করবে না। জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। আমরা ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, মার্কিন ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্য কী হচ্ছে তা কম বেশি জানি, জানার চেষ্টা করি, তথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাহিত্য বিষয়ে অনাগ্রাহী। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনও ধারণা নেই। পাকিস্তানের কবিতা বলতে আমরা ইকবাল এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা-ই বুঝি। পাকিস্তানে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের পরেও যে ভালো কবিতা লেখা হয়েছে, সে খবর আমাদের কাছে

পৌঁছে না। আমরা জানতেও চাই না। হিন্দি কবিতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নই। কারণ, এ বিষয়ে আমরা অনীহ। এই অনীহার উৎস আমাদের এক ধরনের অহংবোধ। আমরা মনে করি, ওসব পড়ে কোনও লাভ নেই। আমরা নিজেরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো লিখি। ফরাসি কিংবা জার্মান ভাষা শেখার মধ্যে যে গ্ল্যামার আছে, সেটি উর্দু কিংবা হিন্দি শেখার মধ্যে কোথায়? সুতরাং এসব ভাষাকে আমল না দেওয়াই ভালো! কিন্তু আমাদের কোনও ফায়দা হয় না, বরং ক্ষতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

আমাদের সকলের পক্ষে পৃথিবীর সবগুলো ভাষা শেখা অসম্ভব। সুতরাং বিদেশি সাহিত্য পড়তে চাইলে আমাদের অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হবে। তাছাড়া গত্যন্তর নেই। আবু সায়ীদ আইয়ুব মির্জা গালিব ও মীর তকিমীরের উর্দু কবিতা বাংলা ভাষায় তর্জমা করেছেন। উর্দু আইয়ুবের মাতৃভাষা। বাংলা তিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মূল ভাষায় পড়ার জন্যে। আবু সয়ীদ আইয়ুবের চমৎকার গদ্য প'ড়ে বলা মুশকিল যে বাংলা তার মাতৃভাষা নয়। রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ এবং পান্থজনের সখা-র মতো বই।

বাংলাদেশে কখনও কখনও কোন উর্দু লেখকের বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গালিব এবং ইকবাল অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত আমাদের কাছে। মনিবুদ্দিন ইউসুফ গালিবের কবিতা তর্জমা করেছেন। ইকবালের কবিতা অনুবাদ করেছেন ফররুখ আহমদ, আব্দুল হোসেন এবং সৈয়দ আলী আহসান। যতদূর মনে পড়ে, সৈয়দ আবদুল মান্নান ইকবালের আসরারো খুদী তর্জমা করেন বহু বছর আগে। ইকবালের শেকওয়া এবং জবাবে শেকওয়া-ও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে সাদত হাসান মান্টো, কৃষণ চন্দর, প্রেমচন্দ এবং কুররাতুল আইন হায়দার পরিচিত নাম। এঁদের লেখা পড়েছেন অনেকেই। আমরা জানি, বাংলাদেশের এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা উর্দু এবং হিন্দি ভালো জানেন। এ সম্পর্কে বশীর আল হেলাল বিশদ বলতে পারবেন। তাঁর মরহুম অগ্রজ নেয়ামল বশীর উর্দু থেকে প্রচুর অনুবাদ করেছেন। সেসব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না।

বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে এখানকার উর্দু লেখকদের বিষয়ে কথা হচ্ছিল, কথা হচ্ছিল তাদের অসুবিধা সম্পর্কে। এই অসুবিধা-তাড়িত উর্দু লেখকদের সঙ্গে এদেশের পাঠকের যোগসূত্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ফরহাদ মজহার। তাঁর এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে, মনে হয়, ভাটা পড়েছে। তিনি উদ্যমী, কর্মচঞ্চল, চিন্তাশীল পুরুষ। আশা করি, এই ভাটা স্থায়ী হবে না। বাংলাদেশের উর্দু লেখক সম্প্রদায় এবং আমাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান একান্ত জরুরি, উভয় পক্ষের জন্যেই উপকারী। তাঁর নিঃসঙ্গ এবং অসহায় নন, এই বোধ তাঁদের মধ্যে জাগ্রত করার দায়িত্ব আমাদের। তবে তাঁদের মুখচোরা হয়ে থাকলে চলবে না, এগিয়ে আসতে হবে সম্প্রীতি এবং আস্থা নিয়ে। বদরুদ্দীন উমর উর্দু সাহিত্যচর্চার একটু সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সেদিনের সান্ধ্য আলাপে। এই প্রসঙ্গেই এসেছিল রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকার কথা। টেলিভিশন যদি প্রতি মাসে, নিদেন পক্ষে তিন মাসে একটি অনুষ্ঠান করেন, সেখানে উর্দু লেখকেরা নিজেদের লেখা পড়বেন, আলোচনা করবেন, অনুবাদকগণ তাঁদের তর্জমা পড়ে শোনাবেন, তাহলে উর্দু সাহিত্যচর্চার একটি আবহাওয়া তৈরি হয়ে যেতে পারে। এই পদক্ষেপকে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অভিনন্দন জানাবেন, সন্দেহ নেই।

# একজন স্নিগ্ধ কবি

আমরা, পঞ্চাশের দশকের কবিগোষ্ঠী, যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন চল্লিশের দশকের চারজন কবি আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। আমি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং গোলাম কুদ্দুসের কথা বলছি। সৈয়দ আলী আহসান, তাঁর চাহার দরবেশ কবিতা সত্ত্বেও, তখন কবি হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করেননি। আরও অনেক পরে তিনি আমাদের কাব্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেনসহ আরও অনেকে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। কিন্তু গোলাম কুদ্দুস, কবি এবং কমিউনিস্ট, কলকাতা ত্যাগ করেননি। সেকালে গোলাম কুদ্দুসের কবিতা বহু কাব্যরসিকের প্রশংসা লাভ করে। বিদীর্ণ কাব্যগ্রন্থে তাঁর কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি, আহসান হাবীবের রাত্রিশেষ এবং আবুল হোসেনের নব বসন্ত আমরা পড়েছি নিবিষ্টচিত্তে। যদিও আমরা কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্বে তিরিশের কবিদের প্রভাববলয়ে আটকে ছিলাম, তবু এই চারজন কবির কবিতাকে দূরে সরিয়ে রাখিনি।

ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি পড়ে বিমুগ্ধ হয়েছি, বহুদিন আবৃত্তি করেছি সেই সাড়া-জাগানো বইয়ের কয়েকটি কবিতা। কাজী নজরুল ইসলামের 'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে আকাশের নীল গাঙে'র মতো পঙ্‌ক্তির স্মৃতিবহ ফররুখীয় পঙ্‌ক্তিমালা আমাকে আন্দোলিত করেছে বহুদিন। ফররুখ আহমদের অনুরাগী ছিলাম গোড়া থেকেই—তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি, তাঁর কথা শুনেছি মুগ্ধ হ'য়ে; কিন্তু তাঁর মতাদর্শকে গ্রহণ করতে পারিনি। ফলে তাঁর ও আমার মধ্যে ক্রমশ একটু দূরত্ব রচিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছেন ব'লে পীড়িত হয়েছি, মনে মনে উষ্মা প্রকাশ করেছি, কিন্তু কোনও দিন অশ্রদ্ধা করিনি তাঁকে।

আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেনের সঙ্গে, পরবর্তীকালে সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে। মানসিক গঠন এবং মতাদর্শের দিক থেকে এঁরা ছিলেন, অনেকাংশে আমাদের কাছের মানুষ। আহসান হাবীব রুচিবান, প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর মতবাদ নিয়ে কখনও চেঁচামেচি করতেন না, তবে সবসময় মানবতাবাদী পন্থাকেই অনুসরণ করেছেন। এই পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি।

আহসান হাবীব কত বড়ো কবি ছিলেন, এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হ'তে পারে, কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি ছিলেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথম কবিতার বই রাত্রিশেষ আজ আর তেমন আবেদন সৃষ্টি করে না; শুধু 'কাশ্মীরী মেয়েটি' শীর্ষক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়। আহসান হাবীবের স্বভাবে নম্রতা ছিল, কথা বলতেন অনুচ্চ স্বরে—স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতাতেও প্রতিফলিত। যদিও রাত্রিশেষ-এ আমরা উদ্ধত মুঠি, ইস্পাত কঠিন, মশাল, প্রতিরোধ, সীমান্ত, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি যুগগন্ধী শব্দ পাই, তবু মনে হয় না, আহসান হাবীব চড়া গলার কবি। রাত্রিশেষ-এর পর প্রকাশিত হয়েছে ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, এবং বিদীর্ণ দর্পণে মুখ। দু'হাতে দুই আদিম পাথর প্রকাশিত হওয়ার পর আহসান হাবীবের কবিতার বিষয়ে

অনেকে নতুন ক'রে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তখন, কিছু সংখ্যক পাঠক, বিশেষত তাঁর স্নেহধন্য কতিপয় তরুণ কবি আহসান হাবীবের কবিতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন সঙ্গত কারণে। সম্ভবত দু'হাতে দুই আদিম পাথর-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার বই।

আহসান হাবীবের সমকালীন একজন কবি, আবুল হোসেন, লিখেছেন, "তাঁর লেখার ভঙ্গি বদলেছে, সুর বদলেছে, বলার বিষয় বদলেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনিও সমসাময়িক থাকতে চেয়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার লেখা যারা প্রথম থেকে আগাগোড়া ভালো করে পড়েছেন, তারা অবশ্যই লক্ষ করেছেন তাঁর স্বভাব অথবা প্রকৃতি খুব পাল্টায়নি। তাঁকে তাঁর গলার স্বরে ঠিকই চেনা যায়। এবং সে স্বর তিনি পাল্টাবার চেষ্টাও করেননি। স্বর পাল্টানোও খুব সহজ নয়। স্বভাবের মতো স্বরও প্রকৃতির দান। কঠিন অধ্যবসায়ে, কঠোর পরিশ্রমে স্বভাবের পরিবর্তন, রূপান্তর সম্ভব। নতুন স্বরও অর্জন করা যায়। তখন সেই স্বভাব ও স্বরই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। হাবীব তাঁর স্বাভাবিক স্বরকে বদলাতে চান নি। তাঁর বেলা যা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আপন প্রবণতাকে তিনি ভিন্ন পথে চালাতে চাননি, নিজের জমি আঁকড়ে থাকতেই চেয়েছিলেন। এখানেই হয়তো তাঁর বৈশিষ্ট্য।"

আহসান হাবীব আমৃত্যু সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আমাদের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক রশীদ করীমও কিছুদিন সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আমার ধারণা, হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'পুনর্বাসিত' আহসান হাবীবই প্রকাশ করেন ইত্তেহাদ-এ। যা হোক, পরবর্তীকালে যখন 'দৈনিক ইত্তেহাদ' ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, তখন আহসান হাবীবই ছিলেন এর সাহিত্য সম্পাদক। সেই সময় আমরা যখন তরুণ লেখক ছিলাম তার অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি তার কাছ থেকে। তাঁকে অবশ্য আগে থেকেই চিনতাম, পেয়েছিলাম তাঁর স্নেহস্পর্শ। আমার কবিতা তিনি পছন্দ করতেন। শুধু একবার তিনি আমার একটি কবিতা ছাপতে রাজি হননি। একটি প্রেমের কবিতা আমি তাঁকে বিবেচনার জন্যে দাখিল করি। আমার বেশ কিছুটা কবিখ্যাতিও তখন হয়েছে। সেই কবিতা আহসান হাবীবের ভালো লাগেনি বলে সেটি তিনি আমাকে ফেরত দেন। আমার ঈষৎ অভিমান হয়েছিল সেদিন, কিন্তু তাঁর উপর রাগ করিনি। তাঁর রায় বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলাম। পরে সেই কবিতা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় ছাপা হয়। তা ব'লে সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে আহসান হাবীবকে কস্মিনকালেও খাটো ক'রে দেখিনি। একটি লেখা সকল সম্পাদকেরই মনঃপূত হবে, এটা বলা যায় না। একজনের কাছে যে লেখা গ্রহণযোগ্য, অন্যের কাছে তা অগ্রাহ্য ঠেকতে পারে। তা ব'লে কোনও সম্পাদকের মেধা কিংবা বিচারবুদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করা অসমীচীন।

আহসান হাবীব যেহেতু দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল, তাই লেখকদের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ ছিল। নবীন লেখকদের তিনি উৎসাহিত করতেন, যাদের মধ্যে লেখার ক্ষমতা লক্ষ করতেন তাদের লেখা বেশি ক'রে ছাপাতেন—এ-কথা

আজকের অনেকে প্রতিষ্ঠিত লেখকই স্বীকার করবেন। তিনি সহজেই সত্যিকার প্রতিশ্রুতিশীল লেখককে শনাক্ত করতে পারতেন। তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নতুনদের পক্ষে যেমন তেমনি তাঁর পক্ষেও উপকারী হয়েছে ব'লে মনে করি। চল্লিশের দশকের বিশিষ্ট কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ লিখেছেন, "তরুণ লেখকদের সঙ্গে নিকট সংযোগের ফলে তাঁর লেখাতেও তিনি সর্বদা এক ধরনের নবীনতা ও আশাবাদ বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের কবিকণ্ঠও কখনও স্তব্ধ হয়নি। ব্যঙ্গের ভদ্র লেবাস প'রে তিনি সহজেই কাব্যের পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়তেন ও তাঁর বিশেষ কবিকণ্ঠের কোনও বিঘ্ন না ঘটিয়ে জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বশীল উক্তি করতে সক্ষম হতেন।'

আহসান হাবীব শুধু ভালো কবি এবং দায়িত্ববান সম্পাদকই ছিলেন না, গদ্যকার হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, প্রচুর বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদসমূহ থেকে একটি চয়নিকা প্রকাশ করলে ভালো হয়। তাছাড়া শিশুতোষ রচনায় তিনি বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন রুচিস্নিগ্ধ কবি। কোনো প্রকাশক তাঁর রচনাসমগ্র মুদ্রণে উদ্যোগী হ'লে তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন পাঠকদের।

আমার সৌভাগ্য, আমি আহসান হাবীবকে আমার সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম 'দৈনিক পাকিস্তান-এ (পরবর্তী সময়ে দৈনিক বাংলা) ১৯৮৫ পর্যন্ত। অনেক সুখকর ঘন্টা কেটেছে তাঁর বিশ্রামপ্রতিম সাহচর্যে। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তাঁর সঙ্গে অসংকোচে। তাঁর সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মতান্তর হয়েছে। কিন্তু কোনও দিন মনান্তর হয়নি। *না, ঠিক বলিনি, মনান্তর হয়েছে একবার, রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক বিতর্ক* উপলক্ষে। ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশজন লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের অন্যতম ছিলেন আহসান হাবীব, যা আমাদের অনেকের পক্ষে ছিল মর্মবিদারক। অথচ আমরা জানতাম প্রতিক্রিয়াশীল স্বাক্ষরদাতাদের মানসিকতার সঙ্গে আহসান হাবীবের মানসমণ্ডলের কোনও মিল ছিল না। তিনি তাদের অবাঞ্ছিত আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হন সেদিন। তিন-চার মাস পরে আবার আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহারে আমার মন থেকে তিক্ততা মুছে যায় সত্য, কিন্তু সেই ঘটনার ছায়া আজও রয়ে গেছে মনের এক কোণে। এতে কিছু এসে যায় না। তাঁর মৃত্যুর আট বছর পরেও তিনি আমার আপনজন, যেমন ছিলেন মৃত্যুর আগে।

## তিনি বেঁচে আছেন অন্যদের সময়ে

তিনি, হুমায়ুন আজাদ, সর্বতোভাবে সাহিত্যনিষ্ঠ। সাহিত্যই তাঁর জপ তপ। তিনি সাহিত্য পড়ান, সাহিত্য রচনা করেন; ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন, সাহিত্য বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা লেখেন। হুমায়ুন আজাদ ছোটোদের জন্যে বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি অসাধারণ বই লিখেছেন, আব্বুকে মনে পড়ে নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেছেন। এখন একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল নামে একটি উপন্যাস লিখছেন ধারাবাহিকভাবে, যা ইতিমধ্যে অনেকের দৃষ্টি এবং চিত্ত আকর্ষণ

করেছে। নারী তাঁর একটি বহু আলোচিত, বহু-বিক্রিত বই। একটি গবেষণাধর্মী, গুরুত্বপূর্ণ বইও যে এদেশে বেস্ট সেলার হতে পারে নারী তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হুমায়ুন আজাদও শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা যে সবসময় খারাপ কিছু নয়, আশা করি, এ-কথা তিনি এখন বিশ্বাস করেন।

হুমায়ুন আজাদ কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কবিতার বই অলৌকিক ইস্টিমার আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একজন নতুন কবির আবির্ভাব লক্ষ করলাম। ষাটের দশকের এই উজ্জ্বল কবির লেখায় যুগপৎ বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়বত্তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম আমরা। জ্বলো চিতোবাঘ, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে মুদ্রণালয় থেকে বেরিয়ে বইয়ের বাজারে আসার পর হুমায়ুন আজাদকে আমাদের একজন প্রধান কবি হিসেবে স্বীকার করতে আর কোনও বাধা রইল না। সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, বলা যায়, এক নষ্ট সময়ের বিশ্বস্ত, নান্দনিক কবিতালেখ্য। হুমায়ুন আজাদের এই শব্দগুচ্ছ প্রায় প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। এই শব্দগুচ্ছকে কোনও কোনও লেখকের প্রবন্ধের শিরোনামও হ'তে দেখেছি।

হুমায়ুন আজাদের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে। এই বই প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের বইমেলায়। এরপর তাঁর কোনও বই বেরিয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। বইয়ের প্রথম কবিতাই জোরে ধাক্কা দেয় আমাদের—

> আমার সব কিছু পর্যবসিত হয়েছে ভবিষ্যতের মতো ব্যর্থতায়,
> ওরা ভরে উঠেছে বর্তমানের মতো সাফল্যে।
> ওরা যে-ফুল তুলতে চেয়েছে, তা তুলে এনেছে নখ দিয়ে ছিঁড়েফেড়ে।
> আমি শুধু স্বপ্নে দেখেছি আশ্চর্য ফুল।
> ওরা যে-তরুণীকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে, তাকে জড়িয়ে ধরেছে দস্যুর মতো।
> আমার তরুণীকে আমি জড়িয়ে ধরেছি শুধু স্বপ্নে।
> চুম্বনে ওরা ব্যবহার করেছে নেকড়ের মতো দাঁত।
> আমি শুধু স্বপ্নে বাড়িয়েছি যুগল ওষ্ঠ।
> আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
> আমার চোখ যা দেখতে চেয়েছিল, তা দেখতে পায়নি।
> তখনো আমার সময় আসেনি।

হুমায়ুন আজাদ প্রথম কবিতাতেই, বলা যেতে পারে, তাঁর কাব্যগ্রন্থের মূল সুর বেঁধে দিয়েছেন। তাঁর কথা অনেকের মনের কথা হয়ে উঠেছে। যারা আশুচেতন, সংবেদনশীল, অগ্রসর মানুষ তারা মনে করেন যে, তাদের জন্ম হয়েছে ভুল সময়ে। এই পশ্চাৎপদ, নষ্ট শসার মতো সমাজ যাদের পদশব্দে প্রকম্পিত, যাদের মূর্খ বাচালতায় ভরপুর, তাদেরই দখলে এই সময়। তাই স্পর্শকাতর কবিকে বলতে হয় ক্ষুব্ধ, বেদনার্ত স্বরে, 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।' তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সময় এখনও আসেনি। সেই সময়েব আগেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এই উচ্চারণ একজন অগ্রসর মানুষের হৃদয় থেকেই উৎসারিত।

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে আদ্যোপান্ত পড়লে মনে হবে এই বইয়ে সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে কাব্যগ্রন্থের রেশই যেন বাজছে ভিন্ন সুরে। কথা দিয়েছিলাম কবিতার শেষ স্তবক এরকম—

তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি নোংরা বস্তি সৈন্যাবাস
বর্বর চিৎকার বুট রাষ্ট্রধর্ম তেলাপোকা মধ্যযুগ অন্ধ শিরস্ত্রাণ
মৌলবাদ রেখে যাচ্ছি মারণাস্ত্র আততায়ীর উল্লাস পোড়া ঘাস সন্ত্রাস
মরচে-পড়া মাংস রেখে যাচ্ছি কালরাত্রি সান্ধ্যআইন অনধিকার
সমূহ পতন খাদ তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি অসংখ্য জল্লাদ

কোনও কোনও পঙ্‌ক্তিতে কবি চমৎকার অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন এই যতিচিহ্নহীন কবিতায়। কবি স্বৈরাচার এবং জঙ্গী শাসনের ঘোরবিরোধী, এ কথা তিনি বারবার বলেছেন নানাভাবে।

'তৃতীয় বিশ্বের একজন চাষীর প্রশ্ন' কবিতায় আমরা পড়ি—

এতো ঘামে, নিজেকে ধানের মতোই
সিদ্ধ করে, ফলাই সামান্য, যেনো একমুঠো, গরিব শস্য।
মূর্খ মানুষ, দূরে আছি, জানতে ইচ্ছে করে
দিনরাত লেফ রাইট লেফ রাইট করলে ক'মণ শস্য ফলে
এক গন্ডা জমিতে?

হুমায়ুন আজাদ এই কবিতায় লেফট রাইটের জায়গায় লেফ রাইট কেন ব্যবহার করলেন, বুঝতে পারলাম না। চাষীর জবানীতে প্রশ্ন করেছেন বলেই কি? কিন্তু যে চাষী বলতে পারেন, 'অবশেষে মেঘ ও মাটির দয়া হ'লে/খেত জুড়ে জাগে প্রফুল্লসবুজ কম্পন' তিনি দিব্যি 'লেফট রাইট'ও বলতে পারেন। আমার তো তাই মনে হয়। অবশ্য এতে কবিতাটির উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয় না। লক্ষ্যভেদী এই কবিতার বিদ্রুপ। বস্তুত তীক্ষ্ণ শ্লেষ হুমায়ুন আজাদের কবিতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অবলীলাক্রমে শ্লেষোক্তি করতে পারেন কবিতার পর কবিতা। যে তুমি ফোটাও ফুল কবিতার কথাই ধরা যাক। কবিতাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না কী নিদারুণ শ্লেষ অপেক্ষা করছে পাঠকদের জন্যে—

যে তুমি বইয়ে দাও মধুদুগ্ধ গাভীর ওলানে
খড় আর ঘাস থেকে, যে তুমি ফোটাও মাধবী
আর অজস্র পুত্রকে দাও ছন্দ—করে তোলো কবি,
যে তুমি ফোটাও ফুল বনে বনে গন্ধ ভরপুর—
সে তুমি কেমন ক'রে, বাঙলা, সে তুমি কেমন ক'রে
দিকে দিকে জন্ম দিচ্ছ পালে পালে শুয়োর কুকুর।

এই কবিতাটি শুরু হয়েছে আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্তের দু'টি পঙ্‌ক্তি দিয়ে। অধিকাংশ পঙ্‌ক্তিতে এই ঝোঁক বিদ্যমান। কিন্তু মাঝে-মধ্যে কোনও কোনও পঙ্‌ক্তিতে হোঁচট খেতে হয়, যেমন 'কুমড়োর সুস্বাদ, যে তুমি ফলাও শাখে ফজলি আম' কিংবা 'খড় আর ঘাস থেকে, যে তুমি ফোটাও মাধবী।' এই ছন্দপতন কি কবির ইচ্ছাকৃত? হুমায়ুন আজাদ ছন্দ বিষয়ে অসতর্ক, এ ধরনের উক্তিতে আমার সায় নেই। অক্ষরবৃত্তের চালে বৈচিত্র্য সৃষ্টির

অভিপ্রায়ে তিনি ছন্দছুট পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেন কি না জানতে ইচ্ছে করে। তাঁর গদ্যকবিতার সংখ্যা অনেক। গদ্যকবিতায় তিনি এক ধরনের নিজস্বতা আয়ত্ত করেছেন বলে মনে করি 'তুমি হেঁটে যাচ্ছো, আমি বহু দূর থেকে দেখেছি, তোমার স্যাণ্ডেল/ থেকে পুঞ্জপুঞ্জ জোনাকি শিখার মতো গ'লে পড়ছে আলো,/কংক্রিট, ধুলোবালি, ঝরা পাতা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অলৌকিক হীরে-মুক্তো—/সোনা-প্রবাল-পান্নায়। তোমার স্যাণ্ডেলের ছোঁয়ায় সোনা-হয়ে-যাওয়া/এক টুকরো মাটি আমি সেই কবে থেকে বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি দিনরাত।' যারা মনে করেন তাঁর গদ্যকবিতা প্রবন্ধগন্ধী, তারা অন্তত এই কবিতা পড়লে নিজেদের মত পাল্টাতে বাধ্য হবেন।

হুমায়ুন আজাদের একটি ছোট, ব্যঙ্গনিপুণ কবিতা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না, কবিতাটির নাম রঙিন দারিদ্র্য—

আমি ঠিক জানি না
কোন স্বাপ্নিকের কালে বাঙলাদেশে
টেলিভিশন রঙিন হয়েছে।
যার কালেই হোক, তাকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন
ব'লে মানতেই হবে। টেলিভিশনে
এখন আমাদের দারিদ্র্যকে
কী সুন্দর, রঙিন, আর মনোরম দেখায়।

এই নিরাভরণ, দারিদ্র্যের মতোই নগ্ন কবিতায় ব্যঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে বেদনাবোধ। 'পার্টিতে' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ঝলসে ওঠে স্মৃতিতে—'রঙিন একটি গর্দভকে নিয়ে ব্যস্ত পাঁচটি/মাংসবতী গাভী, একটি ভাঁড়ের গায়ে ঝুলে আছে/গোটা দুই আধাপণ্য নারী, দশটি বালিকা আর /দুটি খোঁজা চুমু খায় নপুংসক নিমাইয়ের গালে।/পা ঘষছেন রবীন্দ্রনাথ, তবু কেনো যেনো এই/ অট্টালিকা খড়ের গাদার মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে না।' গায়ে জ্বালা ধরানো চাবুকের প্রহারের মতো এই কবিতা। যেখানে রবীন্দ্রনাথকে কেউ চিনতে পারছে না, সেখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংকুচিত এবং আড়ষ্ট উপেক্ষায়, কম্পমান বুদ্ধদেব বসু এবং কাজী নজরুল ইসলাম, সেখানে ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্যকে নিয়ে আদিখ্যেতা এবং মাতামাতি, রঙিন গর্দভতোষণের চিত্র এঁকে কবি শস্তা, স্থূল সাহিত্য-রুচিকে আঘাত করেছেন। তবে 'খোজা'র বানান 'খোঁজা' দেখে মর্মাহত হয়েছি।

হুমায়ুন আজাদের আরও একটি সার্থক শ্লেষাত্মক কবিতা 'গোলামের গর্ভধারিণী'। এই সাড়া জাগানো কবিতা কয়েক বছর আগে ছাপা হয় একটি সাপ্তহিক পত্রিকায়। তখনই কবিতাটি পড়ি। কবিতাটিতে যিনি কবির চাঁদমারি তিনি এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি খোদ পত্রিকার অফিসে ছুটে এসে 'গোলামের গর্ভধারিণী' ছাপার জন্যে কবি রফিক আজাদের বিরুদ্ধে মালিকপক্ষের কাছে নালিশ করেন। রফিক আজাদ, যিনি সেই পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন, তার নোকরি খোয়াতে বসেছিলেন! যা হোক, হুমায়ুন আজাদের অমোঘ শব্দযুক্ত, উপমা ও চিত্রকল্পসমৃদ্ধ গোলামের গর্ভধারিণী, আমার বিশ্বাস, একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকবিতা হিসেবে দীর্ঘায়ু হবে। সম্পূর্ণ কবিতাটিই উদ্ধৃতিযোগ্য। কিন্তু

এই কবিতা দীর্ঘ ব'লে সেই প্রয়াস থেকে বিরত রইলাম। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে কবিতার অঙ্গাহানি হবে।

অনেকের মনে হতে প্যারে, সমাজ সচেতন ও প্রগতিশীল কবি হুমায়ুন আজাদ সম্ভবত শুধু এ ধরনের তীক্ষ্ণ, শ্লেষধর্মী কবিতাই লেখেন। ভ্রমাত্মক এই ধারণা। হার্দিক, নিটোল প্রেমের কবিতা লেখার ব্যাপারেও তিনি পারঙ্গম। তাঁর প্রেমের কবিতার সংখ্যাও কম নয়। আমি হুমায়ুন আজাদের আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে কাব্যগ্রন্থটি কাব্যরসিকদের পড়তে অনুরোধ জানাই। শুধু তাঁর এই বই নয়, প্রতিটি কবিতার বইই অবশ্যপাঠ্য। কারণ, সবগুলো বই না পড়লে একজন কবির সঙ্গে ঠিকমতো জানাশোনা হয় না। হুমায়ুন আজাদের নতুন কবিতার বইয়ের প্রতীক্ষায় আছি।

## আকাশের আড়ালে আকাশ

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল কাব্যপ্রয়াসে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে মনে হয়, কবিতার রহস্যের অনেক গিটই খুলতে ব্যর্থ হয়েছি। প্রকৃত কবিতা কী আজও ঠিক বুঝতে পেরেছি ব'লে মনে হয় না। কখনও কখনও হৃদয়ঙ্গম করি, এই মতো ধারণা নিজের কাছে প্রতিভাত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই কবিতা মায়াবিনীর মতো ক্ষণিকের জন্যে রূপ দেখিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায় যেন। তবে বুঝতে পারি, সেই রূপের ঝলক থেকে যায় আমার বোধে, স্মৃতিতে। আজ নতুন করে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়তে গিয়ে, বহুদিন পর আবার পড়ছি তাঁর কবিতা মনোনিবেশ সহকারে, আমার এ উপলব্ধি হচ্ছে। তবে কি ইতোপূর্বে আমি কখনও মনোযোগী পাঠক ছিলাম না জীবনানন্দর? জীবনানন্দ দাশ বাঙালি কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় আমার। রবীন্দ্রনাথকে আমি একটু স্বতন্ত্র স্থানে রাখতে চাই। সেখানে তিনি তাঁর বহুমুখী বিশালতায় এবং বিপুল মহিমায় সমাসীন। আমি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লালন শাহ্, কাজী নজরুল ইলাম প্রমুখের কথা বিস্মৃত হচ্ছি না, বৈষ্ণব পদাবলি এবং মঙ্গালকাব্যের গুরুত্বের কথাও আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত রয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র আমি মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ পাঠক। কিন্তু এ-কথা কবুল করতে আমার দ্বিধা নেই যে, জীবনানন্দ দাশের মতো কেউই আমাকে তীব্র, অপ্রতিরোধ্যভাবে আকর্ষণ করতে পারেন না।

আগেও আমি তন্ময় হ'য়ে পড়েছি জীবনানন্দর কবিতা, তাঁর অনুপম পঙ্ক্তিমালায় কী সম্পূর্ণই না ছিল আমার নিমজ্জন। ডুব দিয়েছি সত্য, কিন্তু সেই ডুবসাঁতার অনেকটাই ছিল উপরিস্তরে, নিঃসীম গভীরতায় কিংবা তাঁরই ভাষায় 'অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে' পৌঁছতে সক্ষম হইনি। যে ভাষায় প্রসাদের কথা জীবনানন্দ বলেছেন তার সেই ভাণ্ডার থেকে কিছু কণা আমার কবি জীবনের আদি পর্বে কুড়িয়েছি সত্য,কিন্তু সেই প্রসাদের তাৎপর্য সেকালে আমার বোধাতীত ছিল। এখনও যে ষোল আনা আমার বোধের সীমানায় ধরা পড়েছে, এমন দাবি করব না, তবে আগের তুলনায় জীবনানন্দর কবিতার ভাষার প্রসাদের সৌন্দর্য, গভীর চেতনাপ্রসূত দ্যুতি, বিষয়ের সাদৃশ্যের আড়ালে নিহিত অন্য আদল ইত্যাদি এখন অনেক বেশি আমাকে ভাবিত করে, সমৃদ্ধ করে, নিয়ে যায় কবির কাব্যকৃতির আকাশের ওপারে আকাশে, জলের গভীরে জলে, সামগ্রিক জীবনবোধের ভাস্বর নীলিমায়।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গে আকস্মিকভাবেই আমার প্রথম পরিচয় হয়। ঈষৎ ধূসর হয়ে গ্যাছে সেই সময়; সম্ভবত ১৯৪৮ সালের কথা, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য ছাত্র এবং তরুণ। এক হরিদ্রাভ বিকেলে আমার মেধাবী সহপাঠী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর হাতে একটি বাংলা বই দেখতে পাই। বইয়ের রং, যতদূর মনে পড়ে, খাকি; মলাটে মুদ্রিত ধূসর পাণ্ডুলিপি এবং জীবনানন্দ দাশ। সহপাঠীকে জিগ্যেস ক'রে জানলাম যে এটি একটি কবিতার বই। জীবনানন্দ দাশের অস্তিত্ব বিষয়ে এই সর্বপ্রথম অবহিত হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ির কাছে। ধূসর পাণ্ডুলিপি নামের মধ্যে কী এক জাদু ছিল যেন যা স্বভাব-লাজুক আমাকে প্রলুব্ধ করল বইটি নেড়ে চেড়ে দেখার জন্যে, ধার চাওয়ার জন্যে। আড়ষ্ট কণ্ঠে ধূসর পাণ্ডুলিপি ধার চাইলাম জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর কাছে। তিনি একবার সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন এবং কর্জ-চাওয়া যুবকটির চোখে মুখে আগ্রহের আভা লক্ষ করেই হয়তো বললেন, 'দিতে পারি এক শর্তে, কাল ক্লাসে এসেই ফেরত পাই যেন'। এরকমই কিছু একটা বলেছিলেন তিনি। আমি চটজলদি রাজি হয়ে গেলাম। সেইমুহূর্তে সিদ্দিকী এবং আমি কেউই জানতাম না তার করধৃত পুস্তকটি এক রাতেই আমার মানসে এক বিরাট পরিবর্তন আনবে, আমার সামনে খুলে দেবে অলৌকিক এক দরজা। পরের দিন ফেরত দেওয়ার কড়ারে পেয়ে গেলাম জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপি, কবির প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম কবিতার বই ঝরা পালক—এর কয়েকটি কবিতা পড়ার সুযোগ পাই অনেক পরে, যখন জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয়। বস্তুত পুরো ঝরা পালক পড়ি আরও অনেক পরে, এই তো কিছুকাল আগে আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র বাজারে বেরোবার পর।

ধূসর পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে আবেগ-স্পন্দিত হৃদয়ে সারা রাত জেগে বইটি আদ্যোপান্ত পড়লাম। ইতিপূর্বে এরকম কবিতা পড়িনি; এই কবিতাবলি একেবারে নতুন আমার পক্ষে। কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা, রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও কবিতা, মোহিতলাল মজুমদারের বিস্মরণী, এমনকি বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনাও পড়া ছিল আমার, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মতো কোনও কবিই আমাকে এমন অভিভূত করেননি। সেই যে 'কয়েকটি লাইন' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলেছেন—

> কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
> আমি বহে আনি;
> একদিন শুনেছি যে-সুর—
> ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
> আছে প্রয়োজন,
> তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
> আর নাই কেউ!

তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাস্তবিকই তাঁর মতো কেউ নয়, সকলের চেয়ে আলাদা তিনি। জীবনানন্দ নিজেই লিখেছেন 'বোধ'-এর মতো কবিতায়—

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি এক হতেছি আলাদা?

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি?—তাহাদের মন
আমার মনের মতো নাকি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!

যে কবির মনে, 'হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়', যে-বোধের হাতে হাত রেখে 'সব কাজ তুচ্ছ হয়'—পণ্ড মনে হয়, /সব চিন্তা-প্রার্থনার সকল সময়/শূন্য মনে হয়, /শূন্য মনে হয়!—তার কণ্ঠেই উচ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক—

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে?
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর!—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর?—শরীরে স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর?—প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার!

যে-বোধ সৃষ্টি হয়েছে কবিচিত্তে তার প্রভাবে তিনি সহজ লোকের মতো ভাষা কথা ব্যবহারে অপারগ, কোনও নিশ্চয়তাও তাঁর মধ্যে নেই। এই উক্তি আধুনিক কবিতার একটি লক্ষণকেই স্পষ্ট ক'রে তোলে, পরিস্ফুট করে আধুনিক মনের ব্যাকুলতা। ধূসর পাণ্ডুলিপি-র একটি বিখ্যাত কবিতা 'অবসরের গান'। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, —চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়?
বিকেলের আলো এসে (হয়তো, বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়!
চারিদিকে এখন সকাল,—
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল!
মাঠের ঘাসের পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান!

বাংলায় এ ধরনের কাব্যপঙ্ক্তি এর আগে আমি পড়িনি। এরকম উপমা, শব্দ প্রয়োগ আমার কাছে এতই অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত যে আমি কবিতাটি পড়তে গিয়ে বার বার

চমকিত হয়েছি, যেমনটি ঘটেছে 'ক্যাম্পে' কবিতা পাঠের সময়। অবসরের গান-এর শুরুতেই অক্ষরবৃত্তের আলস্যময় একটা ঠাট পেয়ে যাই, যা পুরো কবিতাটিতেই বজায় থাকে। ধূসর পাণ্ডুলিপি সে-রাতে আমার চেতনায় এক নতুন কাব্য-জগৎ উন্মোচিত করে। কাব্যগ্রন্থটি আমার মনে পড়ে খড়-নাড়া, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, বাঁশ-পাতা, মরা ঘাস, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা, পাখির ডিমের খোলা, শসাফুল, মাজড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়সা, ইঁদুর, পেঁচা, ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ, কার্তিকের মিঠা রোদ, পেঁচার পাখার মতো অন্ধকার, চাঁদের আলোয় ঘাই হরিণীর ডাক, পাখিদের ডানার ঘ্রাণ, আকন্দ ধুন্দুল, বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম, নরম জলের গন্ধ, ম্লান ধূপের শরীর।

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ-ঝরা পালক-এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে বটে, কিন্তু তেমন গুরুত্ব নেই,যদিও ধূসর পাণ্ডুলিপি-র কবির ক্ষীণ আভাস সেই বইটিতেও মুদ্রিত। আধুনিক বাংলা কবিতার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার ঝরা পালক কাব্যগ্রন্থে আমরা কাজী নজরুল ইসলাম এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর মতো তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কবিদ্বয়ের প্রভাব-রেখা লক্ষ ক'রে বিস্মিত হই। ধূসর পাণ্ডুলিপিতেই সম্পূর্ণ নতুন জীবনানন্দর আবির্ভাব, যিনি ক্রমান্বয়ে মেধা, কল্পনাশক্তি, মনন এবং ভাষার প্রসাদগুণে এক মহান কবির গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠবেন। জীবদ্দশায় যাঁর বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আরও কোনও কোনও মুষ্টিমেয় বোদ্ধা পাঠক ছাড়া তেমন কদরদান জোটেনি, মৃত্যুর পরে তিনিই পরিগণিত হলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তম কবি হিসেবে। কাব্যের ইতিহাস এ-এক কৌতুকপ্রদ কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ঘটনা। আরেকটি কারণে ঘটনাটিকে কৌতুক প্রদ বলতে হল। জীবনানন্দকে কেউ আখ্যা দিয়েছেন 'নির্জনতম কবি' কেউবা চিহ্নিত করেছেন 'শুদ্ধতম কবি' বলে। এ ধরনের কবির পক্ষে এমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা, যা কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার ওপরও ছায়া ফেলে, কৌতুকেরই উদ্রেক করে বটে। সুতরাং আমার বিবেচনায় 'নির্জনতম' ও 'শুদ্ধতম' বিশেষণ দুটি জীবনানন্দর নামের আগে প্রয়োগ না করাই কাঙ্ক্ষণীয়। কোনও কবির গায়ে লেবেল এঁটে দেওয়া অনুচিত। জীবনানন্দ দাশ কোনও বিশেষ কোটারির কবি হ'তে চাননি, বহু পাঠকের কাছেই তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কবিতাকে। সাধারণ মানুষকে গৌণ ভাবেননি বলেই তিনি বলেছেন, 'তার (কবির) আনীত অভিজ্ঞতা কতখানি সার্বিক, কতখানি তার নিজের এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায় — সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায় — এ দায়িত্ব কবির।' নিজেকে তিনি কি শুধু ঘাস, শিশির, চাঁদ ও অঘ্রাণের খেত-প্রান্তরে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন? তা-তো নয়; তিনি তার কবিতায় ধারণ করেছেন ইতিহাসচেতনা ও যুগমানস। সত্য, জীবনানন্দ বাংলা ভাষার সবচেয়ে জটিল কবি, তাঁর বনলতা সেন পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি সহজবোধ্য নয়; তবু তাঁর অধিকাংশ কবিতাই বুঝে উঠতে পারার আগেই আমাদের মনে অনুরণন সৃষ্টি করে, সাঁকো রচনা ক'রে দেয় পঙ্ক্তিমালা এবং পাঠকদের বোধের মধ্যে। আমি ভুলে যাচ্ছিনা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার দুরূহতার প্রসঙ্গ, কিন্তু কিছু ধ্রুপদী পরোক্ষ উল্লেখ, শব্দার্থ পাঠকের জানা থাকলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আর দুরধিগম্য মনে হয় না। জীবনানন্দের কবিতার দুর্বোধ্যতা অন্য ধরনের। তাঁর কবিতা পড়ার জন্যে

বুক শেলফ থেকে অভিধান টেনে আনতে হয় না বার বার, বলতে গেলে অভিধানের প্রয়োজনই হয় না তেমন। কিন্তু আপাত-সহজ পঙ্‌ক্তির আড়ালে এমন অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকে যা সহজে ধরা পড়ে না পাঠকের কাছে। জীবনানন্দ অন্তঃপ্রেরণায় বিশ্বাসী, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ ছিল না, যদিও তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয় ঐহিক আধ্যাত্মিকতাকে তিনি খারিজ করেননি। জীবনানন্দ দাশের প্রাতিস্বিকতা-ভাস্বর বহু পঙ্‌ক্তিতে এই আধ্যাত্মিকতার আভা ফুটে থাকে জলের আলো, পাখির বুকের রং, কিংবা ফুলের সৌরভের মতো। তিনি অন্তঃপ্রেরণার বিশ্বাসী ছিলেন ব'লে যদি পাঠকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জীবনানন্দ শুধু ঘাসের দিকে, নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি মেলে ব'সে থাকতেন কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে, প্রশ্রয় দিতেন শ্রম-বিমুখতাকে তাহ'লে ভুল করবেন। একটি কবিতাকে অন্বিষ্ট সুঠাম ডৌল, চেতনা সঞ্চারী, ভাবসমৃদ্ধ করে তোলায় কী রকম প্রয়াসী ছিলেন তিনি তা তাঁর কোনও কোনও কাটাকুটি পরিকীর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করলেই বোঝা যায়। জীবনানন্দ নিসর্গের গূঢ় সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মহিমায় অভিভূত ছিলেন, কিন্তু মানুষকে উপেক্ষা ক'রে নয়। তাই 'বনলতা সেন'-এই কবির লেখনী থেকেই নিঃসৃত হয়েছে 'দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত/ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে; / পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'-এর মতো কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। এরকম আরও পঙ্‌ক্তির সন্ধান আমরা পাবো '১৯৪৬-৪৭' শীর্ষক কবিতায়—

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি? আমার বুকের, 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাব, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর—
কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া-জুতো পায়ে
বাজারের পোকা কাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এই সব প্রাণকণা জেগেছিলো—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এই অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।

অমানবিক রাজনীতির বলি বিপুল লোকসমাজের ট্রাজেডি জীবনানন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন উপর্যুক্ত পঙক্তিমালায়। এই বাক্যটি লেখার পর মনে পড়েছে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দর অকৃত্রিম অনুরক্ত সহযাত্রী, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন-এর কবির কাব্যপ্রতিভার নিরলস

ক্রুসেডারপ্রতিম ধীমান প্রচারক, মহাপৃথিবীর দু'তিনটি কবিতা ছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে রচিত কবিতাবলির অকুণ্ঠ কদর করতে পারেননি। মহাপৃথিবী প্রকাশিত হওয়ার পর বুদ্ধদেব যে সমালোচনাটি তাঁর সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় লেখেন তাতে জীবনানন্দকে আত্মানুকরণে বন্দি ব'লে নালিশ করেন। মজার ব্যাপার হল এই, তিনি যদিও তাঁর সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন গ্রন্থে রূপসী বাংলা থেকে একটিও কবিতা নির্বাচিত করেননি, কিন্তু 'মহাপৃথিবী'-পরবর্তী পর্যায়ে রচিত বেশ কয়েকটি কবিতা গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু কি এই সংকলন করে কোনও কোনও অনুজ সহযাত্রীর পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন? শুনেছি, আধুনিক বাংলা কবিতার শেষ দিকের সংস্করণে কবি- সমালোচক জ্যোতির্ময় দত্ত কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হন বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের সমালোচককে মূল্য দিতেন জীবনানন্দ, তাই তিনি হয়তো চাপা অভিমানের সুরেই একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি (বুদ্ধদেব) 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে-'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি। 'নিরুক্ত' ও 'পূর্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু আরো দু'চার রকম চেতনা আছে, আগে যাদের কবিতায় শুদ্ধ করে নিয়ে নির্ণয় ক'রে দেখতে আমি ভালোবাসি। সমাজ যত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃত হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনও ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি? ঐকান্তিক কবি জীবনানন্দর জীবনে যে ঘটেনি, সে-কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন উদ্ধৃত চিঠিতেই। আমি জীবনানন্দ দাশের পরবর্তী পর্যায়ের কবিতাবলি বিষয়ে এত কথা বলছি এজন্যে যে, এসব কবিতার তাৎপর্য অনেকখানি।

অনেক আগে যখন জীবনানন্দর সাতটি তারার তিমির এবং আরও অনেক কবিতা পড়ি, তখন সেসব কবিতার সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হইনি। এটা আবছা অর্থ দাঁড় করিয়েছি মনে মনে, চেষ্টাশীল হয়েছি বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির মানে খোঁজার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অঘ্রান-রাত্রির কুয়াশার ভেতর ঘুরে ঘুরে দিশা পাইনি সে-সময়। আজ সেই কুয়াশা আগেকার মতো তেমন ঘন নয়—একটা অর্থ কখনও কখনও মোমের আলোর মতো জ্ব'লে আমার পক্ষে তৃপ্তিকর হ'য়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর জীবনানন্দ গ্রন্থটির উল্লেখ করতে চাই। জীবনানন্দ কৃশকায় বই, কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। কবি-সমালোচক অলোকরঞ্জন জীবনানন্দ দাশের কবিকর্মের যে আলোচনা করেছেন তাতে তার মেধা ও মননের সঙ্গে গভীরতাও যুক্ত হয়েছে। জীবনানন্দর কবিতা পড়তে যারা আগ্রহী, যারা এই অসামান্য কবিকে বুঝতে সচেষ্ট, তাদের এই বই অবশ্যপাঠ্য ব'লে মনে করি। জীবনানন্দ পাঠ করলে একজন কবি বিষয়ে শুধু অভিজ্ঞ হওয়াই নয়, আধুনিক কবিতা সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায়। বইটি অপঠিত থাকলে জীবনানন্দর

কোনও কোনও কবিতা আমার কাছে এখনও অস্পষ্ট থেকে যেত। এজন্যে আমি অলোকরঞ্জনকে একজন উপকৃত পাঠক হিসেবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এখানে আমাকে উল্লেখ করতে হবে আরও একজনের কথা। আমি আব্দুল মান্নান সৈয়দের কথা বলছি। এই কবি-গবেষক কয়েক বছর আগে জীবনানন্দ বিষয়ে শুদ্ধতম কবি নামে একটি ভালো বই রচনা করেছেন। তখন বইটি সম্পর্কে 'একটি মেধাবী গ্রন্থ' শিরোনামে সপ্রশংস আলোচনা লিখেছিলাম, মনে পড়ে। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও সংকলিত জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্রের কথা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। তিনি নিজে জীবনানন্দ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখে ক্ষান্ত হননি, একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন আদর্শিক শ্রম ও নিষ্ঠায়। জীবনানন্দচর্চার ক্ষেত্রে তিনি, বলা যেতে পারে, প্রায় নিঃসঙ্গ গুণী। প্রত্যেক বাঙালি কবিতাপ্রেমিকের আরেকটি অবশ্যপাঠ্য বই জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সারবান, তথ্যবহুল বইটি সম্পাদনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে সংকলিত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি আলোচনা পড়েছি, 'জীবনানন্দের ভাষা আমাদের সচেতনতায় সব সময়ই বেঁচে আছে—এ ভাষা নিয়ে কাব্য রচনা করা যায় কিনা তারই পরীক্ষা করেছেন জীবনানন্দ। একেক ক্ষেত্রে তিনি অপূর্ব সাফল্য দেখাতে পেরেছেন— আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাষা পরীক্ষাই বড়ো হয়ে উঠে কবিতাকে জটিল বা ম্লান করে তুলেছে। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না—কবিতার ভাষাকে আধুনিক হয়ে উঠতে গেলে জীবনানন্দর পরীক্ষার পথেই তাকে যেতে হবে। মনে হয় জীবনানন্দর অপরিপূর্ণতা বা অচরিতার্থতা যিনি পরিপূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারবেন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবির খ্যাতি তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছে।'

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই উক্তি তাঁর দূরদৃষ্টি এবং কাব্যবিচারের তীক্ষ্ণতার পরিচয় বহন করে, সন্দেহ নেই। জীবনানন্দর পরবর্তী অনেক কবিই তাঁর বাকরীতি অনুসরণ করেছেন, কেউ কেউ কিছুটা মোচড় এনে স্বকীয়তা অর্জনে সচেষ্ট হয়েছেন, হয়তো সফলও হয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবির বরমাল্য কার গলায় দোল খাবে, তা কেবল ভাবীকালই বলতে পারে।

জীবনানন্দর কবিতা সমগ্রের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনেক পুরোনো কবিতার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল, কোনও কোনও কবিতা আমাকে সময় থেকে সময়হীনতায় নিয়ে গেল; কত নক্ষত্রের রাত, কত নদী জল ছুঁয়ে উড়ে-যাওয়া হাঁসের ভিড়, রাতের মেঘের কালো রেখা, অরুণিমা সান্যালের মুখ, জ্যোৎস্নায় ভাসমান মৃণালিনী ঘোষালের শব, আমলকীর গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিখ, সুর্যের চপ্পল, হাইড্রান্ট খুলে কুষ্ঠরোগীর জল পান, মহীনের ঘোড়ার স্মৃতিকে চঞ্চল করে তুলল। আরও বেশি করে বারবার জীবনানন্দর কবিতা পড়ার স্পৃহা জেগে ওঠে মনে। আমার হৃদয় ও মন দুর্বার বেগে ছুটে যেতে চায় জীবনানন্দীয় কাব্যজগতে, গভীর মনোনিবেশ সহকারে প্রবেশ করতে ইচ্ছে হয় প্রতিটি সার্থক চিত্রকল্পে, খুঁজে নিতে আগ্রহী হ'য়ে উঠি তাঁর প্রতীক ব্যবহারের চমৎকারিত্ব। মহান কবির কাছে আমাদের ফিরে যেতে হয় বারবার। নিজেদের মানসিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির তাগিদেই একান্ত জরুরি এই প্রত্যাবর্তন আকাশের আড়ালে আকাশে।

# আমাদের সমাজ এবং লেখকের স্বাধীনতা

শুরুতেই ব'লে রাখা ভালো, আমি কোনও গবেষক কিংবা পণ্ডিত নই। বস্তুত আমি একজন সামান্য লেখক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এই বিদ্বৎসমাজে কিছু বলবার যোগ্যতাবঞ্চিত ব্যক্তি আমি। আপনাদের ঔদার্যের প্রশ্রয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা বলার ভরসা পেয়েছি। আমর বয়স এখন সত্তর বছর। কলম চালাচ্ছি অর্ধশতাব্দী যাবৎ। আমার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচিত হয়েছে। এই নিবন্ধের বক্তব্য আপনাদের অজানা, এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শন আমার সাজে না। সবই আপনারা জানেন। শুধু অভিজ্ঞতাটুকু আমার নিজস্ব।

এখন আমরা যে-সমাজে বসবাস করছি, বলা নিষ্প্রয়োজন, তা একদিনে গ'ড়ে ওঠেনি। নানা বাঁক ঘুরে, বেশ কিছু টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক রূপ পেয়েছে আমাদের সমাজ। কিছু সংকীর্ণমনা, প্রথাপ্রিয়, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি সমাজকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কখনও কখনও সফলও হয়েছেন তাঁরা, কিন্তু এমন কয়েকজন ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সহজ ছিল না তাঁদের কাজ। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরোধিতার ফলে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁদের, বাধাগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের কার্যক্রম। তবে তাঁরা তাঁদের মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হননি। পেছনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে জানা চাই। নইলে মনে নানা ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হতে পারে। কেমন ছিল অতীতের বাঙালি মুসলিম সমাজ? তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের স্বরূপই বা ছিল কী? এমন এক সমাজ ছিল বাঙালি মুসলমানরা ইংরেজি ভাষাতে তো নয়ই, এমন কি বাংলা ভাষা লিখতে পড়তে চাইতেন না। বিভ্রান্ত বাঙালি মুসলমানেরা আরবি, ফার্সি আর উর্দুর মোহেই মজেছিলেন। উর্দুতে চিঠিপত্র লেখা, উর্দুতে কথা বলাই ছিল সেকালের রেওয়াজ। তদানীন্তন একজন সরকারি আমলা এবং বঙ্গীয় মুসলমান গ্রন্থের রচয়িতা নওসের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী, তাঁর প্রবন্ধটি অবশ্য ইংরেজি ভাষায় লেখা,

> When persian was first ostracised from our public schools and replaced by Bengali, the Mussalmans, fond as they were of their own national languages, such as Arabic, Persian and Urdu, could hardly bring themselves to swallow Bengali, which they looked down on for ages as a tongue of a subject race.

নওসের আলী খাঁ ইউসুফজয়ীর বক্তব্যে সেকালের বাঙালি মুসলমানদের বাংলা ভাষা-বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে। যদিও তিনি প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে বাংলা ভাষাকে কখনও খাটো করে দেখেননি, বাংলা ভাষাতেই বই লিখেছেন। বাঙালি মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা করার প্রবণতা ক্রমশ কমতে থাকে। গবেষক এবং প্রগতিশীল লেখক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর সাময়িক পত্রে জীবন এবং জনমত গ্রন্থে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর 'নূর অল-ইমাম সমাজ'-এ প্রকাশিত একট আবেদন উদ্ধৃত করেছেন,

আমাদের বঙ্গীয় মুসলমানদের কোনও ভাষা নাই।.... শরিফ সন্তানেরা এবং তাহাদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন, বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করেন, কিন্তু সেই উর্দু জবানে মনের ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পশ্চিমা লোকের গিলিত চর্বিত শব্দগুলিও অনেকে যথাস্থানে শুদ্ধ আকারে যথার্থ অর্থ প্রয়োগ করিতেও অপারগ। অথচ বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলেও ঘৃণা করিয়া তাহা হইতে বিরত হন। সতেজ স্বাভাবিক বাংলা ভাষা স্বাধীনতা পাইলে, তৎসঙ্গে পল্লীবাসী মোসলমান সমাজের উন্নতির যুগান্তর উপস্থিত হইবে। .....বঙ্গের মুসলমান ভ্রাতাভগ্নিগণ! ...... বাংলা ভাষাকে হিন্দু ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।

পরে উর্দুপ্রীতি কমতে শুরু করে এবং বাঙালি মুসলমান লেখকগণ বাংলা ভাষার প্রতি পক্ষপাত দেখাতে শুরু করেন, যা'খুবই স্বাভাবিক। নবনূর পত্রিকার মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান শীর্ষক নিবন্ধে লেখা হল,

বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করেন মাত্র।..... যাঁহাদের সহিত শহরের বাহিরে কোনই সম্পর্ক নেই, এরূপ নগরবাসী সমাজনেতাগণ বঙ্গভাষাকে 'ভীরুর ভাষা' বলিয়া আখ্যাত করিয়া উর্দুর সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন; ইহার ফলস্বরূপ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রতি যে পরিবর্ধমান টান অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের বক্তব্যে, সন্দেহ নেই, একজন প্রকৃত বাঙালির তাঁর মাতৃভাষার জন্যে আন্তরিক ব্যাকুলতা ও দরদ প্রকাশিত হয়েছে। এই উচ্চারণ একজন *প্রেমিকের বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশ শতকের গোড়াতেই বাংলাদেশের ধীমান* মুসলমানগণ মাতৃভাষা বিষয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত এবং ভ্রান্ত মানসিকতা থেকে নিজেদের অনেকখানি মুক্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেকালে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি বাঙালি মুসলমান সারস্বতসমাজের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। সে জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের লেখকদের আবির্ভাবের আলোকিত ক্ষণ পর্যন্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনই প্রথম মুসলমান যিনি গদ্যশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এমন নয় যে তাঁর আগে কোনও মুসলমান গদ্য রচনা করেননি, কয়েকজন মুসলমান গদ্যলেখকের কথা জানা গেলেও তাঁদের লেখা স্রেফ গদ্যের উদাহরণ ব'লে ধরা যেতে পারে, কিন্তু সেসব রচনা শিল্পের মর্যাদা পাবে না। মীর মশাররফ হোসেন বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা, তাঁর শ্রেষ্ঠ বই অবশ্য বিষাদসিন্ধু। বিষাদ-সিন্ধু আমার হাতে প্রথমে আসে, যখন আমি শৈশবের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে

গিয়েছি। বইটি আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম কয়েকদিনের মধ্যে। জোরে জোরে পড়তাম, আমার একমাত্র শ্রোতা ছিলেন নানী। বিষাদ-সিন্ধু পড়তে খুবই ভালো লেগেছিল আমার। আর এটাও বুঝতে পেরেছিলাম নানী বিষাদ-সিন্ধুকে ধর্মগ্রন্থেরই কোনও সহযোগী পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আমার পাঠ শুনে তিনি পুণ্য অর্জন কবেছেন বলেই ভেবেছিলেন হয়তো।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর গো-জীবন বইটির জন্যে ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। গো-জীবন-এর শুরুতেই বলা হয়েছে,

আমাদের মধ্যে 'হালাল' এবং 'হারাম' দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। একথাও স্বীকার্য যে গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। ...... খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া যাইতে পারে-খাইতেই হইবে, গো-মাংস না খাইলে মোসলমান থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে .... একথা কোথাও লিখা নাই।.....

> ...... এই বঙ্গারাজ্যে হিন্দু-মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক—সংসার কার্যে, ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে, বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। ..... এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গো, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কী?
>
> ..... আরবে কেহই গরু কোরবাণী করে না। ধর্মের গতি বড় চমৎকার। পাহাড় পর্বত, মরুভূমি সমুদ্র, নদ-নদী ছাড়াইয়া মোসলমান ধর্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গো সঙ্গো কোরবাণী আসিয়াছে। এদেশে দোম্বা নাই-দোম্বার পরিবর্তে ছাগল, উটের পরিবর্তে গো, এই হইল শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা।.... গরু কোরবাণী না হইয়া ছাগলও কোরবাণী হইতে পারে। তাহাতেও ধর্ম রক্ষা হয়।....

কী উদার, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী বক্তব্য মীর মশাররফ হোসেনের। মনে হয় বর্তমান কালের কোনও আধুনিক ব্যক্তি এসব কথা বলছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি যে কল্যাণকর, এ-কথা তিনি খুব সুন্দর এবং জোরালোভাবে উচ্চারণ করেছেন, ফলে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনারই পরিচয় পাই আমরা। যদি তাঁর মতো ব্যক্তি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বেশি সংখ্যায় থাকতেন, তা হ'লে এই উপমহাদেশে এত রক্তপাত এবং ঐতিহাসিক ট্রাজেডি ঘটত না। যা হোক, বিষাদ-সিন্ধুর অমর স্রষ্টাকে এই বক্তব্যের জন্যে বেশ খেসারত দিতে হয়েছে, সইতে হয়েছে অপমান। রক্ষণশীল, গোঁড়া মুসলমানরা খেপে গিয়ে গো-জীবন-এর ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ তো করেইছে, ধর্মসভা ডেকে মীর মশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে 'কাফের' ও স্ত্রী 'হারাম' ফতোয়া জারি করে। লেখককে 'তওবা' করতেও বলা হয়। অপমানিত বিষণ্ন লেখক ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। আখেরে ব্যাপারটি চুকে-বুকে যায়, মীর মশাররফ হোসেন বলেন যে তিনি গো-জীবন পুনর্বার ছাপাবেন না।

গো-জীবন পুনর্বার না ছাপার আশ্বাস দিয়ে বিষাদ-সিন্ধুর লেখক কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা বজায় রাখতে পারেননি। নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ, ভগ্নহৃদয় মীর মশাররফ হোসেন ফতোয়াবাজদের প্রদর্শিত পথে হাঁটতে শুরু করেন, রুদ্ধ হয়ে যায় তাঁর সৃজনশীল লেখনীর গতি। এরপর তাঁর লেখনী থেকে যা নিঃসৃত হল তাতে আর মীরের শৈল্পিক ঝলক রইল না। আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হল বটে। কিন্তু আত্মিক মৃত্যু ঘটল লেখকের। শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিভাবান লেখক মুনীর চৌধুরী তাঁর মীর-মানস গ্রন্থে লিখেছেন,

> ১৮৯২ থেকে ১৯০২ এই দশ বৎসরে একমাত্র রচনা গাজী মিয়ার বস্তানী। এটি পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর-মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর। ১৯০৩ থেকে ১৯১০। রচনার সংখ্যাধিক্যে উর্বরতম এই অন্তিম পর্বে মীর-মানস, শিল্পবিচারে অবসন্ন ও উদাসীন। মানব-জীবনের রহস্য আর তাঁকে শিল্পানুপ্রেরণা যোগায়নি, ধর্মজীবনের গভীরতর উপলব্ধি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেনি। বেশিরভাগ রচনাই অলৌকিকতামণ্ডিত, কিংবদন্তীপূর্ণ, অসংস্কৃত পুঁথি সাহিত্যে ইসলামের পুনর্নির্মাণ। আংশিক ব্যতিক্রম 'এসলামের জয়', আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমাদের জীবন'.....।

মীর মশাররফ হোসেনের মতো গদ্যলেখক নন তাঁরা, কবি হিসেবেই খ্যাত তাঁর সমসাময়িক কায়কোবাদ এবং মোজাম্মেল হক। এই দু'কবি তাঁদের লেখায় মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলতে, বারবার বলতে কার্পণ্য করেননি সত্য, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথা প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনও রকম বিদ্বেষকে প্রশ্রয় তো দেনইনি বরং ঔদার্য ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল না তাঁদের মন। কায়কোবাদ-রচিত মহাশ্মশান কাব্য রক্ষণশীল মুসলমানদের তেমন মনঃপূত হয়নি। তারা এই কাব্যের বিরুদ্ধে ইসলামবিরোধিতা এবং অশ্লীলতার অভিযোগ আনে। আসলে মহাশ্মশান কাব্যে কবির হিন্দু-মুসলমানদের সুসম্পর্কের জন্যে ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করেই গোঁড়া মুসলমানরা নাখোশ হন। তবে সুখের বিষয় কবিকে এজন্যে মীর মশাররফ হোসেনের মতো অপমানিত হতে হয়নি। এখানে আমি কায়কোবাদ সম্পর্কে রক্ষণশীল মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের লেখার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

> খোদাতায়ালার সহিত রসুলের এবং রসুলের সহিত সাধারণ মানবের পার্থক্যটুকুও যাহার নাই তিনি আবার মুসলমান—তিনি কবি! এরূপ কবির পক্ষে 'জাতীয় মহাকাব্য' লিখিবার স্পর্ধা হৃদয়ে পোষণ করা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ও অনধিকারচর্চ্চা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

তবে সুখের বিষয়, কায়কোবাদকে তওবা করার জন্যে কোনও রকম নির্দেশ অথবা জোরজবরদস্তি করা হয়নি। কিছু শব্দের ধিক্কার জানিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ মধ্যযুগীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন; তাই মুসলিম-হিতৈষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেঠিক পথের পথিকে পরিণত হন। এবং সেজন্যেই

শুধু কায়কোবাদই নন, তরুণ নজরুল ইসলামের দিকেও তিনি ছুঁড়ে দেন নিন্দাময় বাক্যশর —

> যখন 'ধূমকেতু' প্রথম উদয় হয়, এবং বসরা-প্রত্যাগত উদ্দাম যুবক 'হাবিলদার' কাজী নজরুল ইসলামকে উহার 'সারথি' বলিয়া জানিতে পারি, তখন বুঝিয়া ছিলাম, ধুমকেতু মোসলেম গগনে প্রকৃত ধুমকেতুরূপেই উদয় হইতেছে। মোসলেম-ভারতের 'বিদ্রোহী' কবিতায়ই কাজীর কেরামৎ জাহির হইয়াছিল। তারপর ধুমকেতু প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে গরল উদগীরণ করিতেছে। এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ।

মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সমকালে নজরুল ইসলাম বইটি পড়লে জানা যাবে মুসলমানরা, সব মুসলমান নয়, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কত কঠোর নিন্দাবাক্যই উচ্চারণ করেছেন। তাঁকে, যিনি বাংলা কাব্যকে স্বতন্ত্র সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন, কতভাবেই না উৎপীড়িত করেছে কিছু সংখ্যক অপরিণামদর্শী, স্থূলবুদ্ধি, কূপমণ্ডুক, ধর্মান্ধ ব্যক্তি। এটা ঠিক, কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই তিনি অগণিত পাঠকের চিত্ত জয় করেন, একটু পরেই স্নেহধন্য হন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড়ও বয়ে গেছে পুরোমাত্রায়। ফতোয়া জারি করার ভঙ্গিতে বলা হল,

> খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চিয়।
>
> একজন লেখক, মওলানা আকরাম খাঁর মাসিক মোহাম্মাদীতে লিখলেন,
>
> সুতরাং বর্তমান যুগে তিনি যে এছলামের সর্বপ্রধান শত্রু তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।
>
> এমন কি নজরুলকে কাফের আখ্যাও দেয়া হয়।

শুধু রক্ষণশীল মুসলমানরাই নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন লেখকও নজরুলকে বেশ গালাগাল করেছেন। নজরুলবিরোধিতার সবচেয়ে বেশি মেতেছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক রজনীকান্ত দাস(যিনি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক কবি-সাহিত্যিককে বড়ো বেশি আক্রমণ করেছেন), কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। খোদ সজনীকান্ত দাস তাঁর আত্ম-স্মৃতি গ্রন্থে বলেছেন,

> নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি' কম গালি দেয় নাই; সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন।

দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন নজরুল। তাঁর এই অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্যে একাধিক কাব্য-সমালোচক তাঁকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তখন নজরুল তিরিশ বছরের তরুণ। কলকাতার আলবার্ট হলে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা দেওয়া

হল বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বক্তার তালিকাও অসামান্য—এস. ওয়াজেদ আলী, সুভাষচন্দ্র বসু, জলধর সেন এবং আর কজন। সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য ছিল আবেগদীপ্ত—

> আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখন তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্বদাই ঘুরে বেড়াই।.... নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ-মাতানো গান শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তার নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালি জাতির। সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষণ ছিল এরূপ, ফরাসী বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইতে সেদিন পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক-একটি অতি-মানুষে পরিণত হইবে।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম, ধূমকেতুর মতোই যাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে, সমকালে যেমন অন্যায়ভাবে নিন্দিত হয়েছেন তেমনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিপুল নন্দিত হয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের আগে কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা সবাই প্রথার বিরুদ্ধে নিশান ওড়াননি বটে কিন্তু শুভবাদী বক্তব্য পেশ করেছেন খোলামেলাভাবে। আমি প্রথমে শেখ ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর কথা বলতে চাই। তাঁরা দুজনই মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন। তাঁদের লিখতে হয়েছে এজন্যে যে সেকালে, শেখ ফজলুল করিমের ভাষায়,

> *একদল সেকেলে গোঁড়া মুসলমান* আছে, তাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা উর্দুতে আলাপ করেন, পার্শীতে পত্র লেখেন। অথচ বাঙ্গালাদেশের ভাত না খাইলে তাঁহাদের জীবন ধারণ করা চলে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহারাও বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, যে দেশের পনের আনা লোক উর্দু পার্শীর ধার ধারে না, মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই যে দেশের মুসলমান বাঙলা বলিতে আরম্ভ করে, সেদেশের মুসলমানদের বাঙ্গালা না শিখিলে পরিণাম কি হইবে?

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীও বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলেছেন। এই পারদর্শী গদ্যলেখক বাংলাদেশের উর্দু চালু করার প্রচেষ্টাকে আকাশে ঘর বাঁধবার সামিল বলেছেন। বাংলা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলবীদের বিদ্যা ও বাংলাদেশে উর্দু পত্রিকার ব্যর্থতার কথা বলতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। শেখ ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর সমকালীন আরও ক'জন মুসলমান লেখকের কথা আমরা জানি, যাঁদের মানবিক বোধ ছিল প্রখর। মানবিক চেতনায় দীপ্ত এই সাহিত্যিকদের বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন,

.... বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দশকে বাংলার মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশে নতুন চেতনাও জাগে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা মুসলমানদের মধ্যে দেখেছি যে ওহাবী-চেতনা প্রধানত তারই উত্তরাধিকার বিংশ শতাব্দীর মুসলিম রাজনীতিতে এবং সেই রাজনীতির একজন বড়ো মন্ত্রদাতা কবি ইকবালে লক্ষণীয়। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের যে ক্ষুদ্র সাহিত্যিক দলের কথা আমরা বলতে যাচ্ছি তাঁর উদার মানবিক। কেমন করে যে তাঁরা ওহাবীত্বের পাশ কাটাতে পেরেছিলেন তা ভালো জানা যায়নি। মনে হয় বাংলার আকাশে বাতাসে ইংরেজি সাহিত্যের,বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের, যে উদার-মানবিক প্রভাব অনুভূত হচ্ছিল, আর স্বদেশী অন্দোলনের সূচনায় বাংলা জাগরণ যেভাবে উদার বীর্যবন্ত জাতীয়তার রূপ গ্রহণ করেছিল, তাঁদের প্রেরণা লাভ হয়েছিল সেই সব থেকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিক দল বলতে আমরা বুঝেছি তিনজন—বেগম রোকেয়া (সাধারণত মিসেস আর. এস. হোসেন নামে পরিচিতা, কাজি ইমদাদুল আর লুৎফর রহমান।

এই তিনজনের সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ যদি মিয়া তরিকুল আলমেরও নাম করতেন। সত্য, তাঁর রচনার সংখ্যা বেশি নয়। বেশি হওয়ারও কথা নয়। কারণ অকালে মৃত্যু তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে জীবনের সকল উদ্দীপনা, কলরব এবং সাধনা থেকে। কিন্তু এই ক্ষীণায়ু লেখক, প্রবন্ধকার ছিলেন তিনি, যা-ই লিখেছেন তাতেই প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। তাঁর ওমর খৈয়াম বিষয়ক একটি প্রবন্ধ সাহিত্যপত্র সওগাত-এ প'ড়ে মুগ্ধ হন প্রমথ চৌধুরীর মতো একজন প্রধান এবং সাহিত্যের পাকা জহুরি। আসলে প্রবন্ধটি ছিল কান্তিচন্দ্র ঘোষের ওপর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম অনুবাদ-গ্রন্থের সমালোচনা। এই সমালোচনা, প্রমথ চৌধুরীর মনে এমন দাগ কেটেছিল যে তিনি এটি তাঁর বিখ্যাত সবুজপত্রে আবার ছাপেন একটি ভূমিকাসহ। সেই ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী উল্লেখ করেন,

.... উক্ত পত্র (সওগাত) হতে ওমরখৈয়াম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'সবুজপত্রে' পুনঃপ্রকাশিত করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। এই প্রবন্ধটি যিনি পাঠ করবেন তিনিই প্রমাণ পাবেন যে বাঙলা ভাষা শুধু আলাদা নয়, বাঙলা সাহিত্যের ভাঁড়ারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের দানের মূল্য কোনো অংশে কম হবে না। উদ্ধৃত প্রবন্ধের বিশেষ মর্যাদা এই যে, এর লেখক একজন ফরাসী-নবীশ। ওমরের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরেজি অনুবাদের মারফৎ।

সবুজপত্রে তরিকুল আলমের আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'আজ ঈদ'। প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পর বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বিতর্কের ঝড় উঠেছিল প্রবন্ধের বক্তব্য মামুলি, প্রথাসিদ্ধ ছিল না বলে। তরিকুল আলম স্পষ্টতই কোরবাণীকে 'নিষ্ঠুরতার অভিনয়' বলতে দ্বিধা করেননি। তিনি লিখেছিলেন,

..... আজ এই আনন্দ-উৎসব আনন্দের চেয়ে বিষাদের ভাগই মনের উপর চাপ দিচ্ছে বেশি করে। যেদিকে তাকাচ্ছি সেই দিকেই কেবল নিষ্ঠুরতার অভিনয়। অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস চোখের সামনে অগণিত জীবনের রক্তে ভিজে লাল হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই লাল রং আকাশে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে — যেন সমস্ত প্রকৃতি তার রক্তনেত্রের ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবী বিভাষিকাময় করে তুলেছে। প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। আর এক- একবার হতাশ নেত্রে তাকিয়ে দেখছি, এ বিভীষিকার মধ্যে এমন কোথাও কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিনা যা মনকে একটু অভয় দিতে পারে—এমন কোনও আলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে কি না যার বিমল জ্যোতি এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে পারে।

কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্‌ফর আহমদ মননশীল প্রাবন্ধিক তরিকুল আলম সম্পর্কে বলেছেন,

তরিকুল আলম সাহেবের পক্ষে পশুবলি বর্বরতা বলা মোটেই অসম্ভব ছিল না। তিনি উদারচেতা পণ্ডিত ব্যক্তি শুধু ছিলেন না, সাহসী লেখকও ছিলেন।

সন্দেহ নেই, 'আজ ঈদ'-এর লেখক যুক্তিবাদী, মানসিক চেতনার দীপ্ত এবং নির্ভীক। নিজের চিন্তা এবং মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সৎ, বুদ্ধিকে চোখ ঠারায় বিশ্বাসী নন। তাঁর প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও তাঁকে সেকালের গোঁড়া মুসলমানরা লাঞ্ছিত করেনি, তাঁকে 'তওবা' করতে নির্দেশ দেয়নি।

আজি বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে আমি বাংলা সাহিত্যের একজন সামান্য সেবক হিসেবে যখন বেগম রোকেয়ার কথা ভাবি তখন বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। সেকালে মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং একজন নারী হয়ে যে সাহস এবং মুক্তচিন্তার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে কুসংস্কার কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, অবশ্য অসি দিয়ে নয়, মসীর সাহায্যে, তা বিস্ময়কর নয়তো কী? তিনি সেকালে যে-কথা দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন তা কি আজকের কোনও মননশীল লেখক লিখতে পারবেন? ভাবতে অবশ্যই পারবেন, ভাবেনও অনেকে। কী সেই কথা? বেগম রোকেয়া লিখেছেন,

আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই, তাহার প্রধান কারণ এই বোধ যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের রচনারূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহার পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি। ......

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কোন বিশেষ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইন্ কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব; সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকে বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্ত দেখা যায়। তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যেকথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রীমুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুনিঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হৌক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না।..... আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। ..... যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।

এই বক্তব্য আমি বেগম রোকেয়ার 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করেছি। প্রবন্ধটি মোল্লাদের এবং রক্ষণশীল, গোঁড়া মুসলমানদের দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র তারা চ্যাঁচামেচি শুরু করে। বেগম রোকেয়া প্রবন্ধের বই প্রকাশ করার সময় নিবন্ধটির কিছু অংশ বাধ্য হয়ে বর্জন করেন। রোকেয়া রচনাবলির সম্পাদক কবি-সমালোচক এবং 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একজন সদস্য আবদুল কাদির, যতদূর মনে পড়ে, সেই প্রবন্ধের বর্জিত অংশের কয়েকটি বাক্য একটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করেন। যাঁরা লেখক তাঁরা জানেন একটি লেখার কিছু অংশ, যা রচনাটির জন্যে অপরিহার্য, যদি বাদ দেওয়া হয় তাহ'লে অঙ্গহানি হবেই। নিজের লেখার এই অঙ্গহানি সহ্য করা যে কত বেদনাদায়ক এবং অপ্রীতিকর তা সেই লেখকের চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করতের পারবেন না। বেগম রোকেয়াকে সেই বেদনা এবং গ্লানি মুখ বুজে সইতে হয়েছে, যেমন সহ্য করতে হয়েছিল মীর মশাররফ হোসেন কে, নিজের বই গো-জীবন আবার না — ছাপার প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল কতগুলো গোঁড়া মুসলমানের কাছে।

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক আরেকজন লেখিকাছিলেন, যিনি বেগম রোকেয়ার মতোই পথিকৃৎ বিখ্যাত নারীবাদী হিসেবে পরিচিত। ভুল বললাম। না, তিনি অন্যজনের মতো এত বিখ্যাত নন। তাঁর নাম বেশি উচ্চারিত হয় না, আবুল মকসুদ তাঁকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন। এর আগে তাঁর সম্পর্কে কোনও বই আমার চোখে পড়েনি। তিনি

একজন কংগ্রেসকর্মী ছিলেন বলেই হয়তো তাঁর খ্যাতি একটু আড়ালে পড়ে গিয়েছিল, অনুমান করি। সাহিত্য রচনা এবং নারী-শিক্ষা-বিস্তার ও নারীর প্রগতির ক্ষেত্রে বেগম সাখাওয়াত হোসেনের প্রায় সমপর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও তিনি অবহেলিত রয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এই মহিলার সতীর পতিভক্তি বইটিতে খুব প্রশংসিত হয়েছিল উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা 'নব্যভারত'—এ। সেই সাহিত্যপত্রে বলা হয়,

> মুসলমান সমাজের মহিলা এমন সুন্দর প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতে পারেন, পূর্ব ধারণা ছিল না।

এর আগে বলেছি তরিকুল আলমের কথা, যাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলির কথা মনে পড়ল। কারণ তাঁর ও দুটি প্রবন্ধ সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দুটির নাম 'সভ্যতার কষ্টিপাথর' এবং 'অতীতের বোঝা'। জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর প্রমথ চৌধুরী গ্রন্থের পরিশিষ্টে সবুজপত্রের সকল সংখ্যায় যে লেখকসূচি দিয়েছেন তাতে লেখকের নাম কেবল ওয়াজেদ আলি, 'এস' গরহাজির। এতে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক ওয়াজেদ আলিই এস. ওয়াজেদ আলি কিনা। তবে যতদূর জেনেছি, প্রমথ চৌধুরী এস. ওয়াজেদ আলিকে প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। তাই এস-হারা ওয়াজেদ আলি এবং এস. ওয়াজেদ আলি একই লেখকের নাম, সন্দেহ নেই। এস. ওয়াজেদ আলি একজন মননশীল, অগ্রসর ধ্যানধারণার লেখক ছিলেন। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল সমাজসেবাই ধর্মসাধনের একমাত্র পথ। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক যুগের মানুষ ধর্মকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবে। কে না জানে নতুন দৃষ্টিতে দেখা যাচাই করে দেখা, অন্ধের মতো অনুসরণ করা নয়। তিনি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধতাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি; উপরন্তু ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনও রকম আপোস করেননি। তাঁর মতে,

> ভারতীয়দের পক্ষে—তথা বাঙালিদের পক্ষে, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই একমাত্র সম্ভবপর, এবং বাঞ্ছনীয় আদর্শ। ..... ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখেই আমাদের জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে।
>
> তবে দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে একথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইসলাম রাষ্ট্রের উন্নতির পথে, রাষ্ট্রের নিজস্ব আদর্শের উপলব্ধির পথে, কোনও বিঘ্নের সৃষ্টি করে না। (সাহিত্য: জীবনের শিল্প)
>
> ধর্ম্মে আমি একান্তভাবে আস্থা রাখি, আর ধর্ম্মকে আমি জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে মনে করি। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার উপর ধর্ম্মের পূর্ত্তি ও পুষ্টি বলা যায়।
>
> ..... ধর্ম্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক না করলে, ধর্ম্মই থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়, এবং ধর্ম্ম ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ার মানেই হল মৃত্যু। কেননা, সে অবস্থায় ধর্ম্মের নামে যে-সব জীগীর ছাড়া হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের বুলি নয়, স্বার্থের উদ্বমন। (রাষ্ট্রের রূপ : ভবিষ্যতের বাঙালী)

এস. ওয়াজেদ আলি সব রকম রক্ষণশীলতা এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন যুক্তিপূর্ণভাবে। কারণ তিনি যুক্তিবাদী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক ছিলেন। আবেগের চেয়ে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর বেশি আস্থা ছিল তাঁর। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

> আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি বাঙালী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। (সাহিত্য : জীবনের শিল্প)।

এই উচ্চারণ নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত মানবতাবাদীর বোধদীপ্ত উক্তি। আমাদের কী মনে পড়ে যায় না কবি চণ্ডীদাসের কবিতার সেই অমর পঙ্‌ক্তি 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'? রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রীদের অন্যতম মনে হচ্ছে এস. ওয়াজেদ আলিকে। বাংলাদেশের জন্মের অনেক আগেই তিনি যে-কথা বলেছিলেন তাতে অনাগত ভবিষ্যতের রূপের প্রগাঢ় আভাসই যেন আমরা দেখতে পাই। আমরা বিস্মিত হই তাঁর দূরদর্শিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি দেখে। বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক এক রাষ্ট্র, যা বাংলাদেশেই বটে, রাষ্ট্রটির জন্মলগ্নই যেন তিনি, ভাবতে অবাক লাগে, দেখতে পেয়েছিলেন আগে ভাগে। তিনি বলেছেন,

> পূর্ববঙ্গই হচ্ছে বঙ্গের আশা ভরসার স্থল। .... বাঙ্গালীর, তা সে হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক, ভবিষ্যৎ আশা কেন্দ্র হচ্ছে এই পূর্ব্ববঙ্গ। যথাসময়ে প্রকৃত বাঙ্গালী রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন যে পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বর ভূমিতেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। (বাঙ্গালী মুসলমান : জীবনের শিল্প)

আমার প্রবন্ধের শুরুর দিকে বলতে চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সময়ে একটি সমাজ বাঁক নেয়। বাঁক তো আর এমনি তৈরি হয় না। কয়েকজন ব্যক্তির, তাঁদের মধ্যে লেখকও রয়েছেন, প্রচেষ্টাতেই সমাজের চেহারা কিছু না কিছু পাল্টাতে থাকে। আমি লেখকদের কথাই এতক্ষণ বলছি এবং আরও বলব। কখনও কখনও একজন লেখক সমাজকে বড়ো রকমের একটা ঝাঁকুনি দেন, যেমন কাজী নজরুল ইসলাম দিয়েছিলেন কিংবা একটু আলাদাভাবে বেগম রোকেয়া দিয়েছেন। আগে বেগম রোকেয়ার নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল। এবার কখনও কখনও একটি বিশেষ লেখক গোষ্ঠী সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। এই বাক্যটি লেখার সময়ে আমার মনে পড়ছে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের লেখকদের কথা। কাজী আনোয়ারুল কাদীর, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আদুর কাদির, মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রমুখ লেখকের সংগঠনই মুসলিম সাহিত্য-সমাজ বলে খ্যাত। এই 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' সমার্থক। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত লেখকগণ মুসলমান সমাজে নতুন করে সাড়া জাগান। তাঁরা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা প'ড়ে অনুপ্রাণিত তো হয়েইছিলেন, পাশ্চাত্য-সাহিত্যও তাঁদের চিন্তাকে প্রখর ও দীপ্তিমান এবং চেতনাকে উদার মানবতাবাদী করেছিল। তাঁরা ছিলেন

অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল। এখানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের নামও স্মরণীয়। তবে একথাও বলা দরকার, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গোঁড়া মুসলমান না হলেও মুক্তিবুদ্ধির চর্চা তেমন করেননি। এটা মুহাম্মদ এনামুল হকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

অধ্যাপক এবং গবেষক খোন্দকার সিরাজুল হক মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম শীর্ষক একটি তথ্যসমৃদ্ধ, উপকারী বই লিখেছেন। এই গবেষণা-গ্রন্থে ডক্টর হক বিশদভাবে 'বুদ্ধির মুক্ত আন্দোলনে'র পটভূমি এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর এই বই পড়ে আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। আমাদের তরুণ লেখকদের সবাইকে বইটি পড়তে অনুরোধ জানাই। এই বই পড়তে পড়তে বারবার আমার মনে হয়েছে আমাদের সমাজে পুরনো লেখকদের বিষয়ে আমরা কত কম জানি, এমন কি আমাদের নিকট-অগ্রজ লেখকদেরও আমরা অন্যায়ভাবে অবহেলা করে থাকি।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় পুরুষ কবি আবদুল কাদির এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> ...... নজরুলের 'লাঙল' বের হয় সম্ভবত ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর। পর পর পনেরোটি সংখ্যা বের হয়ে ১৯২৬ সালের পনেরো এপ্রিল বন্ধ হয়ে যায় ..... 'লাঙলে' নজরুল মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে আন্দোলনকে সামনে রেখে আমরা ভাবলাম, বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে নজরুলের আর্থিক ও সামাজিক আন্দোলন সফলও হবে না, স্থায়িত্বও পাবে না।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের আগে মুসলমান লেখকদের সংঘবদ্ধ করে তাদের সাহিত্যের রচনার ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি। এটাই মুসলমান লেখকদের প্রথম সাহিত্যিক সংগঠন। বেশ কিছু সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংগঠনের উদ্যোগে। এসব সাহিত্য-সম্মেলনে তরুণ, অনতিতরুণ এবং বয়স্ক অনেক সাহিত্যিকই অংশগ্রহণ করেন। পরে ঢাকায় গড়ে তোলো হয় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ। এই সংগঠনের নামের আগে মুসলিম শব্দটি যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এটি ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ অর্থাৎ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে সমর্পিত লেখকদের সমাজের জাগরণের জন্যে প্রথাবিরোধী বক্তব্য, যা সনাতনপন্থী ব্যক্তিদের উষ্মার কারণ হয়েছিল, উপস্থিত করেন সাময়িক পত্রে। ডিরোজিও, আমরা জানি, বাঙালি ছাত্রদের মনে নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে কূপমণ্ডুক, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর বেলায যা ঘটেছিল মুসলিম সাহিত্য-সমাজের লেখকদেরও সে-রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। বিশেষ করে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের ওপর কোপদৃষ্টি পড়ে রক্ষণশীল মুসলমানদের, তাঁদের মধ্যে লেখক এবং সাংবাদিকও ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' এবং আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ও 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধ দুটির জন্যে ঢাকার রক্ষণশীল সমাজ

বিচলিত এবং অপ্রসন্ন হয়ে বলিয়াদির জমিদার খান বাহাদুর মৌলবী কাজেমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর বৈঠকখানায় মিলিত হন। সেখানে আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণের জন্যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সেই দুই নেতাকে আসতে হয়। কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেনের প্রসন্ন হওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি। তাঁরা দু'জনই বিরক্ত হয়ে, অপ্রসন্নচিত্তে দুটি ঘোষণাপত্র লেখেন। আবুল হুসেনকে স্পষ্ট ভাষায় সমাজের কাছে অপরাধ স্বীকার ক'রে মার্জনা ভিক্ষা করতে হয়। কাজী আবদুল ওদুদকেও বলতে হয়,

> .....ঘটনাক্রমে আমার লেখা মুসলমান সমাজে এক বিষম অসন্তোষ ও মনঃক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এর জন্য কি কথা বলে যে আমি নিজের দুঃখ, লজ্জা ও ব্যাথা প্রকাশ করব তা ভেবে পাই না ....
>
> আবুল হুসেন নিজের একটি 'কৈফিয়ৎ' ও প্রকাশ করেন, যাতে বলা হয়, .... বলাবাহুল্য, আমরা কোরাণকে খোদার বাণী বলে স্বীকার করি ও বিশ্বাস করি এবং আরো বিশ্বাস করি যে. ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে কোরাণ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং হজরত মুহম্মদ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক ও সকল ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর পর কোন ধর্ম প্রবর্তনের আবির্ভাব হবে না অর্থাৎ হওয়ার দরকার হবে না কারণ তার প্রচারিত ধর্ম ও নীতিকথা মানবসমাজের পক্ষে যথেষ্ট। যতদিন মানুষের সমাজ থাকবে ততদিন কোরাণ ও হাদিসের যুগধর্মসঞ্জাত নব নব ব্যাখ্যা মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সহজ করতে সক্ষম হবে একথা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করি। ..... হজরতকে আমরা ধর্ম ও নৈতিক জীবনে যাপনে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে বিশ্বাস করব, কিন্তু আধুনিক ও ভবিষ্যৎ জীবন-ধারার সকল বিষয়েও তাঁকে চরম গুরু বলে ধরলে আমরা নব-নব সমস্যার নব নব সমাধান উদ্ভাবন করতে পারব না। কারণ, আর্থিক, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক প্রয়োজন প্রতিদিন পরিবর্তন লাভ করছে। সে-প্রয়োজন মিটাতে হবে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু তা না খাটিয়ে তার সমাধান যদি আমরা তাঁর মহাজীবনে খুঁজতে যাই তাহলে বিফল-মনোরথ হবই।

আবুল হুসেনের 'কৈফিয়ৎ' পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল ব্যক্তিদের খানিকটা হলেও সন্তুষ্ট করেছিল। কিন্তু ঢাকার প্রগতিশীল তরুণগণ অসন্তুষ্ট হন। তাঁদের কাছে এটা অনাবশ্যক মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে ভুল করেন নিযে, আবুল হুসেন এক সীমাহীন অভিমানে আন্দোলিত হয়েই 'কৈফিয়ত' প্রকাশ করেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, এখন আর রক্ষণশীল মুসলমানরা তাঁদের জন্যে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তা হবার নয়। আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরেই প্রতিক্রিয়াশীল শোরগোল শুরু করে দেয়। ঢাকার নবাববাড়ি আহাসান মঞ্জিলের আঞ্জুমান অফিসে বসবাসকারী সবাই উর্দুভাষায় কথা বলেন। বাংলা জানেন না তাঁরা। অন্তত সেকালে জানতেন না। তাঁদের কী উল্টোপাল্টা বোঝানো হয়েছিল, তা যাঁরা

এবং যাঁদের বোঝানো হয়েছিল শুধু তারাই বলতে পারতেন। অন্য কেউ নয়। সভায় যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁদের হম্বিতম্বির দরুন আবুল হুসেনকে একটি ক্ষমাপত্র লিখতে হল বাধ্য হয়ে। তাঁকে কয়েকটি বাক্যের সঙ্গে একথাও লিখতে হল,

> ঐ প্রবন্ধের ('আদেশের নিগ্রহ') ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়েছি, সে জন্য আমি অপরাধী।

এই অপমান মেনে নেয়ার পর আবুল হুসেন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। ইস্তফা-পত্রে তিনি লেখেন,

> এই পদত্যাগ করার আসল উদ্দেশ্যটি এই প্রসঙ্গে ব'লে দেওয়া দরকার মনে করি। 'সাহিত্য-সমাজে'র উদ্দেশ্য ছিল চিন্তা করা। কিন্তু বর্তমান মুসলমান সমাজের চিন্তা-চর্চা করা অসম্ভব বলে মনে করি। আর সম্ভব হলেও যে উপায়ে চিন্তা চর্চা করলে বর্তমান মুসলমান সমাজের বাহবার পাত্র হওয়া যায়, তাকে প্রকৃতপক্ষে চিন্তা-চর্চার মূল উদ্দেশ্যটি সার্থক হয় না, বরং তাতে চিন্তা-চর্চাই রুদ্ধ হয়। সম্প্রতি আমার 'আদেশের নিগ্রহ' নিয়ে যে -আন্দোলন হয়েছে তাতে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, সমাজের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী দার্শনিকের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না, বরং তার কথায় উল্টা অর্থ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। আমার Position ঠিক দার্শনিকের নয়, আমার Position কতকটা কল্যাণপিপাসু সামান্য কর্মীর। কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য। সেজন্যই আমার চিন্তা-চর্চা করা। এখন আমার চিন্তার ফল যদি জনসাধারণকে কর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত না করতে পারে, বরং তার প্রতি আরও বেশি উদাসীন করে তোলে, তা হলে আমার উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে।
>
> গতকল্য সন্ধ্যার পর 'আহসান-মনজিলে' একটি ছোটখাট মজলিস হয়েছিল। ঢাকার মুসলমান সমাজের representative লোক অনেক সেখানে ছিলেন। তাদের নিকট উর্দুতে 'আমাদের নিগ্রহ' প্রবন্ধটির অর্থ করা হয়েছে। তাকে সমবেত ব্যক্তিবর্গ একবাক্যে যে রায় দিলেন, সেটা এই,—
>
> 'আমি ইসলামের (?) শত্রু। ইসলামকে নিয়ে উপহাস করেছি। মুসলমানের কল্যাণ আমি চাই না। অন্য সম্প্রদায়ের নিকট মুসলমান সমাজকে ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখেছি, তা না হলে 'শান্তি'তে, সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাস, ঐ লেখাটি প্রকাশিত হবে কেন?
>
> এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরর্থক। কালই এর পুনর্বিচার করবে। তবে এখন মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকে যখন আমি কাজ করতে চাই, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই রায় মাথা পেতে নিতে হবে এবং আমি নিয়েছি। আমি বলেছি —'আমি অপরাধী (?)'। এর পর আমি

আর সাহিত্য সমাজে'র সম্পাদক থাকা ত দূরের কথা, সভ্য থাকাও আমি সঙ্গত মনে করি না। বর্তমান মুসলমান সমাজকে নিয়ে কি উপায়ে কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা যায়, তারই চিন্তা করা ছাড়া গত্যন্তর কি?

আবুল হুসেনকে যেভাবে অপমানিত এবং নিগৃহীত হ'তে হয়েছে তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় অতীতের আরেকটি ঘটনা। মীর মশাররফকে গো-জীবন লেখার অপরাধে তওবা করতে বলেছিল গোঁড়া মুস্বলমানরা। ধর্মসভার আয়োজন ক'রে তাঁর স্ত্রী-তালাকের প্রস্তাব করেছিল। এভাবেই মুসলমান সমাজে বারবার লেখকের স্বাধীনতার ওপর কালো থাবা বসানো হয়েছে। বেগম রোকেয়াকে যে তাঁর একটি বিশেষ প্রবন্ধের কিছু অংশ বর্জন করতে হয়েছিল রক্ষণশীল, গোঁড়া মুসলমানদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে—এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও আমরা ভুলিনি।

শিখা ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র। এজন্যেই যাঁরা সাহিত্য-সমাজের লেখক ছিলেন, যাঁরা বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন করেছেন তাঁদের 'শিখা'-গোষ্ঠীও বলা হত। শিখা-র বেশি সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি, মাত্র পাঁচটি সংখ্যা বেরিয়েছে। প্রতিসংখ্যায় এক বিশেষ জায়গায় ছাপা হত এই তাৎপর্যপূর্ণ বাণী—'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা-সাহিত্যিক শিখা-বিষয়ে বলেছেন,

> .....সাধারণত বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত রচনাগুলি দিয়েই 'শিখা'র কলেবর ভর্তি করা হ'ত। .... সম্পাদক হিসেবে যাঁর নামই মুদ্রিত হউক না কেন আসলে সম্পাদনা করতেন কর্মবীর আবুল হুসেন সাহেব। বেশিরভাগ খরচও বহন করতেন তিনি। 'শিখা'র টাইটেল পৃষ্ঠায় একটি ক্ষুদ্র রেখা-চিত্র ছিল, শুনেছি তাও এঁকেছিলেন আবুল হুসেন সাহেব। একটি খোলা কোরাণ শরীফ .... মানব বুদ্ধির আলোর স্পর্শে কোরাণের বাণী প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, এ-ছিল রেখাচিত্রটির মর্ম। কিন্তু এর একটা কদর্থ বের করতে বিরুদ্ধবাদীদের বেগ পেতে হয়নি। তাঁরা এর অর্থ রটালেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের সমর্থকরা কোরাণকে পুড়িয়ে ফেলে শুধু মানব বুদ্ধিকেই দাঁড় করাতে চাচ্ছে। বলাই বাহুল্য গোড়া থেকেই গোঁড়ারা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বিরোধী ছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের বুনিয়াদ সবচেয়ে শক্ত। এরপর এরা রীতিমত বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন সমাজের।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সদস্য কিংবা উপদেষ্টা ছিলেন না কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু এই সাহিত্য-সংগঠনটি নজরুলের কবিতায় অনুপ্রাণিত ছিল। এটা অস্বাভাবিক ছিল না। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র বার্ষিক শিখার পাঁচটি সংখ্যার মধ্যে প্রথম দু'টি সংখ্যাতেই ছিল নজরুলের গান। সাহিত্য-সমাজের পক্ষ থেকে তাঁদের আয়োজিত প্রথম

বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করার অনুরোধ জানিয়ে বিদ্রোহীকবির কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। নজরুল তখন অসুস্থ। কিন্তু এই সাহিত্য-সংগঠনটির সঙ্গে আত্মিক সংযোগ অনুভব করতেন বলে তিনি অসুস্থ শরীরেই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে আলোচনা শেষ হওয়ার পর কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দৃপ্ত সানন্দ কণ্ঠস্বরে বললেন,

আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখেছি এখানে মুসলমান নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটি কথা, —এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে মোঃ আনোয়ারুল কাদীর প্রমুখ গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।

কিন্তু মুসলিম সাহিত্য-সমাজই বলি আর শিখা-গোষ্ঠীই বলি, এই গোঁড়ামি এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার ভিত-কাঁপানো সংগঠনটি বেশিদিন টেকেনি। কয়েকটি দীপ্র, সুন্দর পাখি এক জায়গায় সমবেত হয়ে সৌন্দর্য ছড়াবার কালে হিংস্র শিকারির গুলির ধমকে যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তেমনি রক্ষণশীল মুসলমানদের উৎপীড়নে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র নায়করা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। দুঃখের বিষয়, আবুল হুসেনের মতো সক্রিয়, সজীব, প্রগতিশীল লেখককে মৃত্যু অকালে ছিনিয়ে নিল। কাজী আবদুল ওদুদ এবং কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির চলে গেলেন কলকাতায়। অনেকদিন পর আবদুল কাদির এলেন ঢাকায়, পাকিস্তান আমলে সরকারি চাকরি করার উদ্দেশ্যে। তিনি 'মাহে নও' পত্রিকার সম্পাদক হন। আবুল ফজল এবং মোতাহের হোসেন চৌধুরী চট্টগ্রামের বাসিন্দা আর লেখক এবং অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন রয়ে গেলেন ঢাকায়। অবসান হল সাহিত্য-সমাজ অর্থাৎ শিখা-গোষ্ঠীর মিলিত তৎপরতার। তবে যে আলো তাঁরা আমাদের সমাজে, বিশেষ করে লেখক-সমাজে জ্বেলে গেলেন তা নিভে যায়নি। সেই আলো নিভে যাওয়ার মতো নয়। কারণ তা জ্ঞানের আলো, মানবতার আলো। পরবর্তী কালের তরুণ,প্রগতি-পিপাসু লেখকগোষ্ঠী জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে সেই আলো থেকে নিজেদের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলেন অন্ধকারে পথ চলার জন্যে।

বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের নায়কদের প্রদর্শিত পথে অনেকদূর এগিয়ে যান শক্তিশালী লেখক শওকত ওসমান। প্রথা-বিরোধী, প্রগতিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীলতার ভিত-কাঁপানো অনেক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ-পর্ব পর্যন্ত। 'শিখা' গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতিবশতই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ যখন গঠিত হল তখন পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল তরুণ লেখক সম্প্রদায় সেই সাহিত্য সংগঠনের কর্ণধার হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন নজরুল-সখা কাজী মোতাহার হোসেনকে। যতদিন পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ ছিল ততদিন তিনিই ছিলেন সভাপতি।

আজ যখন স্মৃতির কড়া নেড়ে সেকালের, আমি ১৯৫২ সালের কথা বলছি, দিনগুলিকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকছি, তখন আমরা ছিলাম তারুণ্যে ঝলমলে। মনে নতুন কিছু সৃষ্টির

প্রেরণা, চোখে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন। সমাজকে প্রগতির পথে পরিচালনা করার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল আমাদের প্রাণে। আমাদের সহযাত্রী ছিলেন অনতিতরুণ কেউ কেউ, কাজী মোতাহার হোসেন তো ছিলেনই। তখন সওগাত ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সওগাত এবং সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের প্রগতিশীল ভূমিকার সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম। সওগাত যখন ঢাকায় চলে যান, এক পর্যায়ে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনার কাজে নিয়মিত সাহায্য করতেন হাসান হাফিজুর রহমান। হাসান হাফিজুর রহমান এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে আমরা তরুণ লেখকরা সওগাত কার্যালয়ে আড্ডা দিতে শুরু করি। হাসান লিখেছেন,

> ......... সওগাতে আমার বসার জায়গা মিললো, সেই সুযোগে সাহিত্যকর্মীদের ভিড় জমে উঠতে লাগলো সওগাতকে কেন্দ্র করে। সওগাতে তরুণদের যাতায়াত নিয়মিত হয়ে উঠলো। ভিড়ও বাড়তে লাগলো।
>
> ..... নাসিরউদ্দিন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সওগাতের প্ল্যাটফর্মে একত্র হয়েছিলেন, এটাই বড় কথা। নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিল। আমরা পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সালেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দীন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব সভাপতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফিয়া কামাল, অজিতকুমার গুহ, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, লায়লা সামাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।
>
> সেই সময় সাহিত্য সভায় প্রতিটি তেই পায় দু'শো আড়াইশো লোক জমায়েত হতেন। নাসিরউদ্দীন সাহেবের অবারিত আতিথ্য, প্রত্যেক সভাতেই চা-মিষ্টির ব্যবস্থা থাকতো। অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকও উৎসাহের সঙ্গে এই সভায় যোগ দিতেন। তরুণদের নতুন চেতনায় সঙ্গে তাঁদের পরিণত মনোভাবের গভীর যোগাযোগ ঘটেছে। যা অগ্রসর চিন্তার অনুকূল, তারই একটি স্থায়ী আসন পাকাপোক্তভাবে দ্রুত গড়ে উঠতে পারলো। প্রতিক্রিয়ার কাছে এদেশের সাহিত্য যে আত্মসমর্পণ করে নি বা পরাজিত হয়নি, পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের ভূমিকাই তার জন্য সর্বতো কৃতিত্বের দাবীদার, এ এক ঐতিহাসিক সত্য।

নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে তাই এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী, মুক্তকণ্ঠে এখন তা বলা যায়।

শুধু সংগঠনের জন্য আশ্রয় দেয়াই নয়, প্রগতিশীল সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে ঢাকা থেকে সওগাতের পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও আরেক অসীম উপকার নাসিরউদ্দীন সাহেব আমাদের করেছিলেন। পাকিস্তানের আগেও যেমন, তেমনি পাকিস্তানের পরেও সওগাত-ই এই দেশের প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এই সত্যের পুরো তাৎপর্য বোঝা এখন হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যারা তখন মাটির উপর শক্ত পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, তাদের কাছে এই সত্য আজও অমলিন। একথা ভাবলে আজ আমাদের মাথা নত হয়ে আসে নাসিরউদ্দীন সাহেবের প্রতি।

হাসান হাফিজুর রহমান খুব স্পষ্টভাবে আমাদের সবার হয়ে সওগাত-সম্পাদকের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। আমরা যারা সওগাতের সঙ্গে, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এ ব্যাপারে কোনও দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। হাসান হাফিজুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম ছিলাম আমি। তাঁর সঙ্গে কত যে আড্ডা দিয়েছি, কত জায়গায় যে ঘুরে বেড়িয়েছি, চট করে তা বর্ণনা করা মুশকিল। আমি তাঁকে খুব থেকে বহুদিন বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখেছি। আমরা সেই দূর অতীতে যারা তরুণ লেখক ছিলাম তারা সবই হাসান হাফিজুর রহমানের কাছে ঋণী পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের সকল কার্যক্রমের জন্যে। তিনি প্রচুর শ্রম স্বীকার করেছেন সংগঠনটির জন্যে। এটি যে একটি প্রাণবন্ত, প্রভাবক্ষম, সার্থক সংগঠনের স্বীকৃতি পেয়েছে তার পেছনে রয়েছে হাসানের অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা। আমার মতো একজন দলছুট সামান্য লেখককেও যে তিনি সংগঠনমুখী করতে পেরেছিলেন সেকালে, এটা তাঁরই যোগ্যতায়। আজ এই যে আমি পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম বলে গৌরবের রোদ পোহাচ্ছে। সেজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বিশ্বাস, আরও অনেকেই জানাবেন। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূলে হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকার এই সংগঠনকে কমিউনিস্টদের আখড়া ঠাউরে বসে। মাঝে-মাঝে এর কর্মীরা হামলারও শিকার হয়েছেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাফ-সাফ লিখেছেন—

১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ তখন শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর সাওগাত ছিল উক্ত সাহিত্য সংসদের মুখপাত্র। কিন্তু উর্দুপন্থী প্রগতি-বিরোধীরা এই তরুণ লেখকগোষ্ঠীর উত্থান এবং বাংলা ভাষা সাহিত্যে তাদের অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারলেন না। তরুণ দলের গোঁড়ামীমুক্ত জীবনবাদী কবি-সাহিত্যিকরা উর্দুর দ্বারা বাংলা ভাষাকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে দিলেন। তাঁদের মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত লেখনী উর্দুপন্থীদের কায়েমী স্বার্থের দুর্গে আঘাত হানলো।

সাহিত্য সংসদের বিরুদ্ধাচারী দলের কে বা কারা স্বরাষ্ট্র বিভাগে এই

মর্মে অভিযোগ করে যে, সওগাত আফিসে একদল লেখক একটি সংঘ স্থাপন করেছে এবং এই সংঘ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য-কলাপ পরিচালনা করা হয় এবং সওগাত প্রেসে তাদের প্রচারপত্র ইত্যাদি ছাপা হয়।

আচমকা এক গভীর রাতে গেস্টাপো ধরনে পুলিশ হানা দেয় সওগাত অফিসে, অত রাতে জনাব নাসিরউদ্দিনকে বাড়ি থেকে পটুয়াটুলীর অফিসে আসতে হয়। রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারপত্র আর পুস্তিকা তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সওগাতের ফাইল মেলে ধরেন পুলিশ কর্মকর্তার সামনে, অমুদ্রিত ফর্মা দেখাতেও কসুর করননি তিনি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে লুপ্ত হয়ে যায় বটে, কিন্তু এক বিশেষ সময়ে যখন রক্ষণশীল ইসলামপন্থী লেখকদের দাপটে সাহিত্যক্ষেত্র কম্পমান তখন মাত্র কয়েক বছরে এদেশে কিছুসংখ্যক বয়েসি এবং তরুণ লেখকের উদ্যমে প্রগতিশীল, মানবতাবাদী সাহিত্যের ধারা প্রবল হয়ে বিরোধীদের মনে সাহিত্যের আসরে নিজেদের আসন সম্পর্কে কিছু সন্দিহান করে তোলে। এখানেই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ভূমিকার আংশিক গুরুত্ব। এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে যথার্থই প্রগতিশীল রূপ দেয়ার ব্যাপারে এই সংগঠনের অবদান কখন খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এই সঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন, গভীর রাতে একটি সাহিত্যপত্রের অফিসে পুলিশী খানাতল্লাশি কি লেখকদের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ নয়?

কিন্তু মাসিক মোহাম্মদী অথবা তমদ্দুন মজলিশের অফিসে কোনও দিন পাকিস্তান সরকারের পুলিশ হানা দেয়নি, কারণ, সরকারের কাছে সেই দুটি প্রতিষ্ঠানকে বিপজ্জনক মনে হয়নি; কারণ সেই প্রতিষ্ঠানদুটির প্রায় সবাই উচ্চকণ্ঠে ইসলামের কথা বলতেন, যদিও নিরক্ষরতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের সদস্যরা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মোহাম্মদীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রক্ষণশীল মওলানা আকরম খাঁ, দৈনিক আজাদ এবং তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয়, যদিও পরের দিকে মওলানা আকরম খাঁর সুর ঈষৎ বদলে গিয়েছিল। তমদ্দুন মজলিশের মধ্যে ভালো কিছু না থাকলে বদরুদ্দীন উমর এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতো বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ সেই সংগঠনটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন না জীবনের প্রথম পর্যায়ে। সুখের বিষয়, অচিরেই তাঁরা দুজন নিজেদের ভ্রান্তি বুঝতে পেরে প্রতিক্রিয়ার পথ ছেড়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। এখন তাঁরা দেশের দুই প্রধান প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃত। বদরুদ্দীন উমর একটি সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলেরও প্রধান। তাঁরা দুজনই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। বদরুদ্দীন উমরের কয়েকটি বইয়ের নাম হল : (১) Society and Politics in East Pakistan (২) সাম্প্রদায়িকতা—আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ এটি (৩) সংস্কৃতির সংকট (৪) সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (৫) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-বিষয়ক বড় বইটির কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনেক বই লিখেছেন, সেগুলির কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি : (১) অন্বেষণ (২) তৃতীয় ভুবন (৩) আরণ্যক দৃশ্যাবলী (৪) অনতিক্রান্ত বৃত্ত (৫) স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি।

প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে ডক্টর আহমদ শরীফ বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। বিতর্কিত হওয়া খারাপ কিছু নয় বলে মনে করি। সাধারণত, গুরুত্বপূর্ণ লেখকগণই বিতর্কিত হন। পাকিস্তান আমলে তাঁর লেখনী থেকে উৎসারিত হয়েছে (১) বিচিত্র চিন্তা (২) স্বদেশ-অন্বেষা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর (৩) কালিক ভাবনা (৪) জীবনে সমাজে সাহিত্যে (৫) যুগ-যন্ত্রণা (৬) প্রত্যয় ও প্রত্যাশা (৭) মানবতা ও মুক্তি। ডক্টর আহমদ শরীফের কোনও কোনও উক্তি মৌলবাদীদের বরদাশ্‌ত হয়নি। তারা জনসভা করে তাকে মুরদাত আখ্যা দেয়। ওরা এমন বাড়াবাড়ি শুরু করে যে আহমদ শরীফ অনেকদিন বাড়ি ছেড়ে পথে বের হতে পারেননি। তাঁর বাড়িতে বোমা ছুঁড়ে মারা হয়,যদিও কেউ আহত হয়নি। এর আগে কামরুল হাসানের একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে মৌলবাদীরা শোরগোল জুড়ে দেয় এবং আমাদের সবার প্রিয় চিত্রকর কামরুল হাসানের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁর কয়েকটি ছবি নষ্ট করে। আবার আমাদের মনে পড়ে, অতীতের কোনও কোনও ঘটনা। মনে পড়ে মীর মশাররফ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেনের কথা। জাতীয় অধ্যাপক, সফল অনুবাদক ও পণ্ডিত কবীর চৌধুরীকেও মুরতাদ আখ্যা দিয়েছে মৌলবাদীরা। আমাকেও উপহার দেয়া হয়েছে এই বিশেষ আখ্যাটি। ১৯৯৫ সালে সিলেটের প্রগতিশীল বিদ্বজ্জন ও সাহিত্যপ্রেমীগণ কর্তৃক আমাকে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়। দিনক্ষণও ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গাবাজ মৌলবাদীরা সংবর্ধনার জায়গাটিকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলায় শেষ পর্যন্ত আমার সিলেট যাওয়া হয়নি। নিজের দেশের একটি শহরে যেতে না পারার মানসিক যন্ত্রণাও আমাকে ভোগ করতে হল। এসব ঘটনা নিঃসন্দেহে শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত।

মুক্তবুদ্ধি-চর্চার ক্ষেত্রে ডক্টর খান সারওয়ার মুরশিদের নাম স্মরণ না করলে অন্যায় হবে। তিনি পাকিস্তান আমলে New Values নামে একটি ইংরেজি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এই পত্রিকায় কখনও কোনও প্রতিক্রিয়াশীল লেখা মুদ্রিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ডক্টর মুরশিদ বরাবরই প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতি সংসদের জন্মলগ্ন থেকে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আজ অব্দি নিজের অগ্রসর চেতনাকেই জাগ্রত রেখেছেন। New Values-এর কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে গেল আবদুল গণি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী সম্পাদিত মুকতি সাহিত্যপত্রের কথা। বলব না, মুকতির মান New Values-এর সমতুল্য, তবে কিছুটা কাছাকাছি ছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। এঁরা প্রত্যেকেই আলোকিত মানুষ ছিলেন এবং সমাজকে আলোকিত করার আকাঙ্ক্ষায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তাঁরা।

বাংলাদেশের সাহিত্যপত্র বিষয়ে কথা বললে অবধারিতভাবে এসে পড়ে সমকালের প্রসঙ্গ। সমকাল মানেই সিকানদার আবু জাফর এবং সিকানদার আবুজাফর মানেই সমকাল। সমকালের সম্পাদক ছিলেন তিনি, কবি তো ছিলেনই। তাঁর মতো সম্পাদক বিরল। নিভৃতচারী, শক্তিশালী, প্রগতিশীল প্রাবন্ধিক আবদুল হক এই পত্রিকায় কয়েকটি

প্রবন্ধ লেখেন। কোনও কোনও প্রবন্ধ লেখেন ছদ্মনামে। আবদুল হক পাকিস্তান সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। সরকারের পক্ষে সেসব প্রবন্ধ গিলতে পারা এবং হজম করা দুটোই ছিল অত্যন্ত কঠিন। এজন্যেই লেখককে আত্মরক্ষার জন্যে ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সরকারের লোকজন লেখকের নাম ঠিকানা সংগ্রহের জন্যে সমকাল অফিসে হানা দিতে শুরু করে। সম্পাদক সিকানদার আবু জাফর প্রচণ্ড ঝুঁকি সত্ত্বেও কিছুতেই ছদ্মনামের আড়ালে যে নামটি রয়েছে তা প্রকাশ করেননি। সমকালের দু'টি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়। প্রায় বাজেয়াপ্ত হতে চলেছিল আরও একটি সংখ্যা ১৯৬৬ সালে। এই ঘটনা সম্পাদক হিসেবে সিকানদার আবু জাফরের চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তার প্রমাণ করে। হায়, এখন সেই সম্পাদকও নেই, সেই সমকালও নেই। শুনছি সিকানদার আবু জাফরের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী বহু গুণে গুণান্বিত ইসমাইল মোহাম্মদ অর্থাৎ উদয়ন চৌধুরী সমকাল আবার প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছেন। তাঁর উদ্যোগ সফল হোক, আমরা কামনা করি। সমকাল প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করছি একদা রাজশাহী থেকে প্রকাশিত একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা পূর্বমেঘের কথা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতো কৃতী এবং অগ্রসর মনের মানুষ। পূর্বমেঘের অবদানকে কোনওমতেই অবহেলা করা চলে না। এই পত্রিকাটিও মুক্তি এবং সমকালের মতো এদেশের বহু পাঠক-পাঠিকার সাহিত্যরুচির গঠনে এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণার দিকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে। হাসান আজিজুল হকের মতো প্রতিভাবান কথাশিল্পী এবং প্রাবন্ধিক পূর্বমেঘেরই আবিষ্কার। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী দুজনই মুক্ত মনের মানুষ এবং উজ্জ্বল প্রাবন্ধিক। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এবং আবুল হোসেন সম্পাদিত উন্নতমানের ক্ষীণায়ু সাহিত্যপত্র সংলাপ-এর ভূমিকাও ভুলিনি।

এখন আবদুল হকের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তিনি এক সময় কবিতাও লিখতেন। সে ব্যাপারে কিছু বলব না। তিনি আমাদের কিছু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন, এটাই প্রধান বিবেচ্য। এছাড়া তিনি যে দুটি ডায়েরি রেখে গেছেন সেগুলো আমাদের স্বকাল এবং সমাজের গতিপ্রকৃতি বোঝার পক্ষে সহায়ক। আমি তাঁর একটি প্রবন্ধের একটি ক্ষুদ্রাংশ উদ্ধৃত করছি—প্রবন্ধের নাম 'পাকিস্তানী সংস্কৃতির তাৎপর্য', ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত।

> পূর্ব-পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু-সংস্কৃতিকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে পারি না, এবং এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপরও আমরা জোর করে ইসলামী সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারি না। আমরা তাদের বলতে পারি না, 'আমরা যেমন ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলছি তেমন আপনারাও ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলুন এবং আপনাদের এতদিনকার অনৈসলামিক সংস্কৃতি বর্জন করুন।' এই সাংস্কৃতিক জবরদস্তি যদি সম্ভব না হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানে এতদিন যেমন অনৈসলামিক সংস্কৃতি ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে, এবং ইসলামী

সংস্কৃতি ও সংখ্যালঘু সংস্কৃতির যে সামগ্রিক যোগফল তাই তবে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির চেহারাটা পুরোপুরি ইসলামানুগ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। রোমান্টিক কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং যুক্তি ও বাস্তবজ্ঞান বর্জন করা সব যুগের সব মানুষেরই একটা বড় দুর্বলতা। একমাত্র এরকম কল্পনার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলে তবেই ভুলে থাকা সম্ভব যে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে; এবং এই কারণে এ-প্রদেশের সংস্কৃতি পুরোপুরি ইসলামী সংস্কৃতি হওয়া সম্ভব নয়।

এই বক্তব্য বৈপ্লবিক কিছু নয়, ঈষৎ সাবধানী, কিন্তু সেই সময়ের পক্ষে সাহসীও বটে। পাকিস্তানি আমলে যারা ইসলামী তমদ্দুনে মশগুল তারা এরকম বক্তব্য সহ্য করবেন না, নাখোশ হবেনই। কিন্তু আবদুল হক যা বিশ্বাস করেছেন তা অসংকোচে বলেছেন। আবদুল হকের কয়েকটি বইয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি—(১) ক্রান্তিকাল (২) সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ (৩) বাঙালি জাতীয়তাবাদ (৪) নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

পঞ্চাশের দশকে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। এখানে আমি তাঁদের কবিতা, গল্প উপন্যাস, নাটকের বিষয় বিবেচনায় আনছি না। সেসব ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু এখানে আমি তাদের প্রবন্ধের গুরুত্বকেই স্মরণ করছি। কিন্তু এর আগে তাঁদের অগ্রজ ক'জন লেখকের নাম উল্লেখ করা দরকার। মনে পড়ছে পারস্য প্রতিভা এবং মানুষের ধর্ম-খ্যাতি মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন; সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সালাহউদ্দীন আহমদ, মমতাজুর রহমান তরফদার, কামরুদ্দিন আহমদ, অর্থনীতিবিদ মোশরফ হোসেন, ডক্টর জহুরুল হক, সৈয়দ নাজিমুদ্দীন হাশেম, এ. আর. মল্লিক এবং আরও কারও কারও কথা। কথাশিল্পী রশীদ করীম তার সাহিত্যকর্মে, বিশেষত প্রবন্ধে অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন। বলতে ভুলে গেছি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং রণেশ দাশগুপ্ত-সম্পাদিত প্রগতিশীল পত্রিকা ক্রান্তির কথা। সম্ভবত ক্রান্তির তিনটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনটিই ছিল অসাধারণ। পিছিয়ে-থাকা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাতে চেষ্টাশীল ছিল সেই সাহিত্যপত্রটি। ক্রান্তি দেখার সুযোগ আমার সেকালেই হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি শুধু কবিতা, গল্প এবং প্রগতিশীল প্রবন্ধই লেখেননি, দাঙ্গার পাঁচটি গল্প গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, সম্পাদনা করেন ঐতিহাসিক সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েক খণ্ডের বৃহৎ গ্রন্থ। তাঁর নিজের কয়েকটি প্রবন্ধ-গ্রন্থের নাম হল —(১) মূল্যবোধের জন্যে (২) সাহিত্য প্রসঙ্গ (৩) আলোকিত গহ্বর। আলাউদ্দীন আল আজাদের কবিতা, গল্প এবং উপন্যাস রচনায় সিদ্ধি আমাদের অজানা নয়; প্রবন্ধরচনাতেও যে তাঁর দক্ষতা

রয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই শিল্পীর স্বাধীনতা ও সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু বই দু'টিতে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের অগ্রসর চিন্তার পরিচয় পেয়েছি আমরা।

পেশায় চিকিৎসক অথচ একজন মননশীল লেখক, যিনি যৌবনের শুরুতেই যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল আন্দোলনে, আমি আহমদ রফিকের কথা বলছি। কবিতা লিখেছেন তিনি, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কয়েকটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন, পাঠকদের উপহার দিয়েছেন সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন ও জাতিসত্তার আত্ম-অন্বেষার মতো মননধর্মী বই। নজরুল-গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন থেকেই প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃতি সংসদের সক্রিয় সদস্য তো ছিলেনই, পরে অগ্রসর লেখকদের সংগঠন পাকিস্তান-সংসদেরও একজন সুহৃদ ছিলেন। তার লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম — (১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (২) ভাষা আন্দোলন ও শহিদ মিনার (৩) নজরুল প্রসঙ্গে (৪) ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলি। শহীদ আনোয়ার পাশা, আলী আনোয়ার এবং আবুবকর সিদ্দিকের কথা উল্লেখ করা দরকার। ফয়েজ আহমদ এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী দুজনই বিখ্যাত সাংবাদিক। এই খ্যাতি তাঁদের সাহিত্যিক খ্যাতিকে কিছুটা ম্লান করেছে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী অল্প বয়সে সম্রাটের ছবির মতো ছোটগল্পের বই উপহার দিয়েছেন সমাজকে। একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে স্মরণীয় গানের রচয়িতা তিনি। ফয়েজ এবং গাফ্ফার দুজনই প্রগতিশীল প্রাবন্ধিক। ফয়েজ আহমদ কিছুদিন আগেও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ছিলেন। ডক্টর আনিসুজ্জামানও পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে শুধু যুক্ত ছিলেন বললে কিছুই বলা হয় না; তিনি এই সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাও ছিলেন। মূলত তিনি একজন বিশিষ্ট গবেষক, কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর তিনটি বইয়ের নাম উল্লেখ করছি — (১) স্বরূপের সন্ধান (২) Identity, Religion and Recent History (৩) আমার একাত্তর।

ময়মনসিংহের খালেকদাদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রামের মাহবুব আলম চৌধুরী ও আবুল মোমেনের নামও উল্লেখযোগ্য। সন্তোষ গুপ্ত, দ্বিজেন শর্মা, সৈয়দ শামসুল হক, হায়াৎ মামুদ, শামসুজ্জামান খান, শফি আহমেদ, করুণাময় গোস্বামী, মফিদুল হক, তানভীর মোজাম্মেল, আবদুল হালিম, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, নাজমা জেসমিন চৌধুরী, মালেকা বেগম, আনোয়ারা সৈয়দ হক, শাহরিয়ার কবির, আনু মুহাম্মদ, হুমায়ুন আজাদ, মুনতাসীর মামুন, অজয় রায়, বিনোদ দাশগুপ্ত, আবুল কাশেম ফজলুল হক, সৈয়দ আবুল মসুদ, আহমদ ছফা, ফরহাদ মজহার ও তসলিমা নাসরিন সবাই কমবেশি প্রগতিশীল ধারার লেখক। আবুল কাসেম ফজলুল হকের কয়েকটি বইয়ের নাম হল (১) মুক্তি সংগ্রাম (২) কালের যাত্রার ধ্বনি (৩) যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা (৪) রাজনীতি ও দর্শন (৫) আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে। শক্তিশালী কবি, কথাশিল্পী এবং গবেষক হুমায়ুন আজাদের লেখনী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে (১) প্রতিক্রিয়াশীলতার নিচে দীর্ঘ ছায়া (২) নিবিড় নীলিমা। সৈয়দ আবুল মকসুদের তিনটি বইয়ের নাম — (১) যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা (২) ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র (৩) চিন্তা ও চেতনা। লেখক হিসেবে আহমদ ছফা এবং ফরহাদ মজহারের ক্ষমতা অনস্বীকার্য, কিন্তু কখনও কখনও তাঁদের দুজনের কোনও কোনও বক্তব্য বিভ্রান্তিবিলাসী।

আহমদ ছফার প্রবন্ধের দুটি উল্লেখযোগ্য বই — (১) বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (২) বাঙালি মুসলমানের মন।

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আয়োজিত সম্মেলনে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লেখকগণ সমবেত হয়েছিলেন, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আবুল হাসনাত, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, এমনকি এম. এন. রায়ের মতো ব্যক্তিও শরিক হন। রেনেসাঁ সোসাইটিতে, বোঝা যাচ্ছে, একটা উদারনৈতিক হাওয়া বইত।

ঢাকায় ১৯৫৮ সালে মোহম্মদ বরকতউল্লাহর আগ্রহে এবং আবুল কালাম শ্যামসুদ্দীনের উদ্যোগে রওনক সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থায় তাঁর দুজন তো ছিলেনই, আরও ছিলেনই, আরও ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ, কবি মঈনুদ্দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, আশরাফউজ্জামান খান, শামসুল হুদা চৌধুরী, তালিম হোসেন, কবি-গীতিকার আজিজুর রহমান এবং কবি-প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। রওনক সাহিত্য সংস্থার কনিষ্ঠতম সদস্য মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহই ছিলেন। এই সংস্থায় কোনও রকম গোঁড়ামি ছিল না, কিন্তু রক্ষণশীলতা ছিল। সে কারণেই মানে রক্ষণশীলতাহেতু, তরুণ লেখকদের তেমন ভিড় জমেনি সেখানে। রওনকের সদস্যদের মধ্যে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর মধ্যে রক্ষণশীলতা ছিল বটে, কিন্তু ওর ছাপ গাঢ় হতে পারেনি। সেজন্যেই তিনি আধুনিক সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক এবং যুগবদলের হাওয়াকে তেমন অপছন্দ করেন না। রওনকের প্রধান সদস্য রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর চিত্তে ঔদার্য এবং সহনশীলতা ছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর সাহসী ভূমিকার ঔজ্জ্বল্য কখনও ম্লান হওয়ার নয়। ১৯৫২ সালে নিরস্ত্র মিছিলে পুলিশি জুলুম ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে আবুল কালাম শ্যামসুদ্দীন বিধান পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এতক্ষণ আমি এই প্রবন্ধের কোথাও সৈয়দ আলী আহসানের নাম উল্লেখ করিনি। এটা অসূয়াবশত নয়। প্রবন্ধটির কোনও অংশে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সুযোগ ছিল না। তিনি একজন উৎকৃষ্ট আধুনিক কবি, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, মুক্তিযুদ্ধেও তিনি শরিক হয়েছেন, —কিন্তু কখন তিনি কোনও নিম-প্রগতিশীল মন্তব্য করবেন, আবার কখন যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল উক্তি করে বসবেন তা বলা মুশকিল। একবার তিনি প্রয়োজনবোধে ইসলামি ঐতিহ্যের খাতিরে রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিতে নিজে তো প্রস্তুত ছিলেনই, অন্যদেরও শলা-পরামর্শ দেন, আরেকবার রবীন্দ্রকাব্যের প্রশস্তিমূলক গ্রন্থ রচনা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। আরেকটি ব্যাপারে তিনি অসামান্য তৎপরতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে সেটা স্বনামে নয়, ছদ্মনামে। তিনি নিজে একজন 'মুক্তিযোদ্ধা' হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে বেহুদা, না-হক কাব্য লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। অবিরাম কুৎসা বমন করেছেন। তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং আধুনিকতার দীপ্তি লক্ষ করেছিলাম বলেই এ কয়েকটি বাক্য খরচ করেছি, নয়তো নীরবই থাকতাম।

এবার একজন সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের প্রকৃতই আধুনিক, প্রগতিশীল ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করব। তিনি স্বশিক্ষিত, চিরজিজ্ঞাসু, অগ্রসর চেতনার অধিকারী অসামান্য এক মানুষ। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে একটি সুপরিচিত নাম আরজ আলী মাতুব্বর। থাকতেন বরিশালে এক অজ পাড়াগাঁয়। জন্মেছেন অভাবের সংসারে। শৈশবেই পিতৃহীন হয়ে পড়েন। অসহায়, গরিব মা কোনও মতে পাঁচ সন্তানের মুখে অন্ন জোগান। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া আদর্শলিপি কিশোর আজর আলীর মনে এক নতুন আলোর জন্ম দিল। এই আলো অজানাকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। একেই বলে জ্ঞানস্পৃহা। তিনি একটি-দুটি করে বই সংগ্রহে মন দিলেন, জমিয়ে রাখার জন্যে নয়, পড়ার জন্যে। এভাবেই গড়ে ওঠে ছোটো এক গ্রন্থাগার। তাঁর মার মৃত্যুর পরে আরজ আলীর জীবনে এক পরিবর্তন এসে যায়। তাঁর মার লাশের ছবি তোলার ব্যাপারে চরমোনাইয়ের পিরের ফতোয়া আর কয়েকজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের জানাজার নামাজ না হতে দেয়ার অপতৎপরতায় তিনি বিরক্ত তো হলেনই, তাঁর জীবন এক নতুন মোড় নিলেন। প্রশ্নাকুল হয়ে উঠলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তিনি নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে করলেন। তাবলীগ জামাতের আমীর এবং রবিশালের ম্যাজিস্ট্রেট আরজ আলী মাতুব্বরের সঙ্গে যুক্তিতর্কে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। ম্যাজিস্ট্রেট রটিয়ে দিলেন যে, আজ আলী মাতুব্বর একজন কমিউনিস্ট। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে ব্যাখ্যা দাবি করেন। আখেরে মামলায় জয়ী হন আরজ আলী। সত্যের সন্ধ্যানে শুরু হয়েছে যাঁর যাত্রা, কোনও বাধা বিপত্তি তাঁর চলার পথ রোধ করতে পারে না। আরজ আলী মাতুব্বরের মতো দর্শন ও বিজ্ঞান-চেতনার উদ্ভাসিত ব্যক্তি আমাদের সমাজে বিরল। তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন এই পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মৌলবাদপীড়িত দেশে। মুক্তবুদ্ধি-চর্চার ক্ষেত্রে প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব'লে তাঁকে মৌলবাদীরা তো বটেই, আরও অনেকে উৎপীড়ন করেছে। আবার এই লেখকের স্বাধীনতার ওপর নিগ্রহের থাবা।

পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও লেখকের স্বাধীনতাহরণের চেষ্টা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে আবুল ফজলের মানবতন্ত্র এবং বদরুদ্দীন উমরের সাড়া জাগানো বই সাম্প্রদায়িকতা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। বজলুর রহমানের জিজ্ঞাসা এবং অশ্লীলতার কারণ দেখিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ সত্যের মতো বদমাশ নিষিদ্ধ করা হয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ফজল শাহাবুদ্দীনের একটি উপন্যাস অশ্লীলতার কারণে বাজেয়াপ্ত হয়। উপন্যাসটি *মৃদঙ্গ* পত্রিকায় ছাপা হয়। ফজল শাহাবুদ্দিন আটক হন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার হাতে। আমি জামিন হয়ে তাঁকে ছাড়য়ে আনি। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর আমলে কবি রফিক আজাদ ভাত দে হারামজাদা নামে একটি কবিতা ছাপানোর অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার গন্ধ পেয়ে কয়েকদিন পালিয়ে বেড়ান। শেষে অবশ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এরশাদের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবেককে তীব্র দংশন করার মতো গ্লানি নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হলে সেটি নিষিদ্ধ করা হয়। রবীন্দ্র গোপ ১৯৯১ সালে একটি কবিতা লেখেন তখনকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে। সেই কবিতা ছাপা হওয়ার পর থেকে দুর্যোগ নেমে আসে

রবীন্দ্র গোপের জীবনে। সরকারি কর্মচারী তিনি। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে ঢাকা থেকে খুলনায় বদলি করা হল। তিনি খুলনায় যাওয়ার কয়েকদিন পরেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের সরকারি বাসা থেকে বের করে আক্ষরিক আর্থে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়। বহু কষ্ট সয়ে তাঁরা খুলনায় যান শেষ পর্যন্ত। সরকার বদল হওয়ার পর রবীন্দ্র গোপ সপরিবারে ঢাকার ফিরে আসেন। এখানে নতুন চাকরিতে বহাল হন।

মোট কথা, নানাভাবে আমাদের দেশে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে লেখকের স্বাধীনতা। যে-পাখি উড়তে জানে, মেঘে মেঘে, আকাশের উদার নীলিমায় পাখা বিস্তার করা যার সাধ এবং বৈশিষ্ট্য তার পাখা ছেঁটে ফেললে সে আর সত্যিকারের পাখি থাকে না। তাই, লেখকের স্বাধীনতা হরণ করলে, তার লেখার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তিনি তাঁর সৃজনশীলতা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেন না। একজন লেখক, অনেকের অপছন্দ হবে, বেশির ভাগ মানুষের মত ও বিশ্বাসের বিরোধিতা করবে, এমন লেখা নাও লিখতে পারেন। তবে সেটা লেখার অধিকার তার থাকতে হবে। তার সেই লেখা পছন্দ না হলে, অনুমোদনযোগ্য না হলে লেখাটির জোর প্রতিবাদ অবশ্যই করা যাবে কলম দিয়ে, লাঠিসোটা দিয়ে, জনসভা ডেকে, লেখকের ফাঁসি দাবি করে নয়। এই প্রবন্ধে আমি সেকালের কয়েকজন লেখকের নিগৃহীত হওয়ার কথা বলেছি। তখনও রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমান ছিলেন আমাদের সমাজে। তাঁরা তাদের মতে আপত্তিকর লেখার বিরুদ্ধে কখনও কখনও লিখে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং মুখের কথার জোরও খাটিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামকে কাফের আখ্যা পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যেসব লেখক করেছেন তাঁদের কাউকে কাউকে ডেকে নিয়ে ক্ষমা চাইয়ে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের একেবারে ভিন্ন দেশে গিয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য করেন নি, কাউকে ফাঁসির মঞ্চে পাঠাবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেননি। ওঁরা এখানকর মোল্লা এবং মৌলবাদীদের মতো হিংস্র এবং অমানবিক ছিলেন বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের প্রতিটি সরকারও অধিক মোল্লা এবং মৌলবাদী তৈরির কারখানা মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ানো এবং সেগুলোর জন্যে বেশি অর্থ বরাদ্দ করার ব্যাপারে উৎসাহী অর্থাৎ মোল্লাতন্ত্র ও মৌলবাদীদের তোয়াজ করে চলাই যেন সরকারের প্রবণতা। অথচ এই মাদ্রাসার তালিবে ইলিমরাই বিভিন্ন জায়গায় ধর্মশিক্ষার চেয়ে অস্ত্র-এস্তেমালের শিক্ষাই বেশি নিচ্ছে। ওদের শ্লোগান হচ্ছে 'আমরা হব তলেবান, বাংলাদেশ হবে আফগান'। অর্থাৎ এ দেশের সাধারণ মানুষের টাকায় বাংলাদেশকে একটি মধ্যযুগীয় বর্বর দেশে পরিণত করার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সরকারও না বুঝে মদত জোগাচ্ছে।

যা হোক, দেশ ও জাতিকে আধুনিকতা ও মঙ্গালের পথে পারিচালিত করার উদ্দেশ্যেই লেখকের স্বাধীনতা বজায় থাকা জরুরি। কারণ, অগ্রসর চিন্তা ও চেতনাশ্রয়ী লেখকরাই প্রত্যেক দেশে মানুষের আধুনিকতা ও কল্যাণের পথ-পরিক্রমায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এই সত্য যে-জাতি বিস্মৃত হয় সে-জাতি ক্রমাগত আলো নয়, অন্ধকারের দিকে যাত্রা করে।

# একান্ত ভাবনা



# শিউলি ও কাদের নেওয়াজ

এখন আশ্বিন মাস। সোনালি আশ্বিন। আকাশে শারদ মেঘের ভেলা। গরমের তেজ যদিও কমে নি এখনও, তবু সকাল বেলার হাওয়া সুন্দর একটা আমেজ ছড়িয়ে দেয় স্নায়ুর রাজ্যে। গাছের পাতায় ঘাসের ডগায় শিশিরের ছোঁয়া। নিশ্চয়ই শিউলি ফুল ফুটেছে কোথাও। অবশ্য এখনো চোখে পড়ে নি। 'শিউলি' শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমার মনে পড়ে কৈশোরের ভোরবেলা আর একটি পাঠ্য পুস্তকের কথা। ক্লাস নাইনে আমাদের একটি কাব্য সংকলন পড়তে হতো। বইটির নাম 'কাব্যমঞ্জুষা'। সম্পাদক কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল মজুমদারের শিউলিবিষয়ক একটি কবিতা ছিল কাব্যমঞ্জুষায়। এখানে সেই কবিতার শেষ দুটো পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে।

সকাল বেলায় ঘুমটি ভেঙে সবাই
দেখে আসি—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর
শিউলি-ফুলের হাসি।

মন কেমন করা অনুভূতি। আমাকে দখল করে নেয় কিছুক্ষণের জন্যে। কাব্যমঞ্জুষার মৃদু মেটে রঙের মলাট ভেসে ওঠে চোখের সামনে, মনে হয়, কয়েকটি সেই কবেকার শিউলি ফুল ছড়ানো মলাটের ওপর—সেই ফুলগুলো আবার যেন উড়ে চলে যায় সবুজ ঘাসের বুকে, একটা মাঠের উপকণ্ঠে। নষ্টালজিয়া। শরৎ আমাকে কেমন অতীত-কাতর করে ফেলে। বার বার পেছনে তাকাতে ইচ্ছে করে। চোখে পড়ে কতো অবলুপ্ত দৃশ্য, কতো মুখ ভিড় করে আসে সুস্নিগ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জের মতো।

কাব্যমঞ্জুষায়, মনে পড়ে, কবি কাদের নেওয়াজেরও একটি কবিতা ছিলো। সেটি ছিলো একটি মর্মস্পর্শী বিলাস। একটি হারিয়ে যাওয়া টুপি-ই কাদের নেওয়াজকে স্বরমাত্রিক ছন্দে সেই কবিতাটি লিখিয়েছিলো।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হলেই কেন জানি সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। নিজের অজান্তেই মনে মনে আওড়াতে শুরু করি, "টুপি আমার হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ভাইরে।" কাদের নেওয়াজকে দেখেছিলাম বাংলা একাডেমীতে এক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে। পুরস্কার গ্রহীতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তাঁর নাম ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে—একটু তাড়াহুড়ো করেই যেন। দৃষ্টি বিহ্বল, চলন অগোছালো— সেই মুহূর্তে আমার বোদলেয়ারের 'আলব্যাট্রস' কবিতাটি মনে পড়েছিলো। তারপর কাদের নেওয়াজকে আর দেখি নি। তাঁর কোন লেখাও চোখে পড়ে না অনেক দিন থেকে। তিনি কি বেঁচে আছেন এখনো? এই তথ্যটুকু আমার অজ্ঞাত বলে নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

*২রা অক্টোবর ১৯৭২*

## অলভ্য বই

বই কিনতে ভালো লাগে। নতু বইয়ের প্যাকেট বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়ার তুলনারহিত আনন্দ আমি জেনেছি বহুবার। আমার বই পড়বার আগ্রহ পৈতৃক না হলেও এই প্রবণতা আমার মধ্যে কেমন করে যেন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিলো যৌবনের উষাকালেই। আমার পাঠস্পৃহা এখনো অদম্য, বলা যায়। বই কেনার আগ্রহেও ভাটা পড়ে নি কিন্তু সব সময় মনের মতো বই ঢাকার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। স্বর্গত ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখায় মনস্বী, ইতিহাস-লেখক ব্লকের 'হিস্টোরিয়ান'স ক্রাফট' নামক বইটির কথা পড়েছিলাম। সেই বই কেনার দুর্বার ইচ্ছা সত্ত্বেও আজো সেটি সংগ্রহ করতে পারি নি। পাবলো নেরুদার একটি কাব্য সংগ্রহ কেনার বাসনা বহুকাল থেকে লালন করে চলেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এমন গ্রন্থ ঢাকায় অলভ্য। অথচ সস্তা বিদেশী উপন্যাসের কমতি নেই এখানকার বইয়ের দোকানে। কলকাতার বই এখনো ঢাকায় আসছে না। একদম আসছে না বললে সত্যের অপলাপ হবে। একটা দুটো বই আসছে প্রায় জাদু বলে। সেই আমার মধ্যে কোনো মেথড নেই। বাংলাদেশের মাছ যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বই যাচ্ছে না। বই দেয়া-নেয়া শুরু হবে কখন?

*৪ঠা অক্টোবর ১৯৭২*

## শুদ্ধতম কবি

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ-ছোঁয়া। কাগজের দাম চড়া, মুদ্রণজনিত খরচাও নেহাত কম নয়। এসব প্রতিকূলতা উজিয়েও সুখের বিষয়, কিছু কিছু বই প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি হাতে এলো একটি সুদৃশ্য বই—'শুদ্ধতম কবি।' এই গ্রন্থের প্রণেতা আবদুল মান্নান সৈয়দ নিজে খ্যাতিমান কবি, কথাশিল্পী এবং নিবন্ধকার। তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্য-পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'শুদ্ধতম কবি' গ্রন্থে। এই নিষ্ঠাবান তরুণ লেখক জীবনানন্দ দাশের কবি-চারিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে কাব্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এলিয়টের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে লোভ হয়—কবিদেরই কবিতার সমালোচনা করা সাজে! একথা অবশ্য মান্য যে এ যাবৎ কবিতা বিষয়ে সত্যিকার রসগ্রাহী জরুরী বক্তব্য কবিরাই রাখতে পেরেছেন! এলিয়টের এই উক্তিতে সি এস লুইস সাহেব চটে গিয়ে এক তুখোড় জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কবিতার সমালোচনা কবি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবেন না, এ কেমনতরো কথা? তাহলে তো এলিয়টের কবিতার সমালোচনা স্বয়ং এলিয়টকেই করতে হয় কিংবা তাঁর সগোত্রের কোনো একজনেরই কলম বাগানো দরকার। তা কবিদের অনধিকার চর্চা তো আর এলিয়ট বরদাশত করবেন না। লুইস কুপিত হয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে অন্য কবিদের পক্ষেও কবিতার

সুসমালোচক হওয়া সম্ভব। আসলে পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এলিয়ট ও লুইস উভয়েরই দল ভারী।

যাহোক, আবদুল মান্নান সৈয়দের 'শুদ্ধতম কবি' পড়ে আনন্দ পেয়েছি। সে জন্যে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এ সঙ্গে মনে পড়ছে অকালমৃত তরুণ কবি হুমায়ুন কবিরের কথা। তিনি জীবনানন্দ দাশের সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কাজ কতটুকু এগিয়েছে জানি না। তিনি বেঁচে থাকলে সেই কাজ সম্পন্ন হতো এবং সেটি অত্যন্ত তৃপ্তিকর হতো আমাদের পক্ষে। তাঁর জীবানন্দ দাশ বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নি। কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিজের কবিতার বই 'কুসুমিত ইস্পাত'। তবে তিনি বইটি দেখে যেতে পারেন নি।

হুমায়ুন কবির ঝাঁঝালো রাজনীতিতে আসক্ত ছিলেন। তাঁর কথাবার্তাতেও প্রচুর ঝাঁঝ ছিলো। কিন্তু তাঁর কবিতা রয়ে গেছে আশ্চর্য রকম ঝাঁঝমুক্ত। কবিতায় তিনি জীবনানন্দীয় পরিমণ্ডলেই যেন সবচেয়ে বেশী স্বস্তি পেতেন। শেষের দিকে অবশ্য তিনি ভিন্ন সুর ভাজাতে চাইছিলেন তাঁর কবিতায়— অনেকটা জোর করেই যেন। হুমায়ুন কবির আমাদের কাব্যক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতির বাঁক নিয়ে এসেছিলেন তা সিদ্ধির ভাস্বর বৃত্তে পরিণত হওয়ার আগেই তাঁর জীবন অস্তমিত হলো হিংসার প্রান্তরে। এই দুঃসংবাদে আমাদের পীড়িত হতে হবে চিরদিন।

*৫ই অক্টোবর ১৯৭২*

## কামিনী ফুলের সুরভি

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো। কামিনী ফুলের গন্ধ। ফুলের গাছটিই আমার উঠোনের এক কোণে দাঁড়ানো আর এক রাশ কালচে সবুজ পাতা আর শ্বেতবিন্দুর মতো ফুল নিয়ে। এখন বাইরে গেলেই, মানে উঠোনে এসে দাঁড়ালেই তাকে দেখা যাবে। শুধু তাকেই নয়, আরো কিছু ছোটো মাঝারি ফুলের গাছকেও। আমার বাড়ির উঠোনটা তেমন প্রশস্ত নয়। প্রায় একরত্তিই বলা চলে। তবু যে এই সংকীর্ণ উঠোন ফুলের নানান চারায় শোভিত, তবু যে এই জায়গাটুকু আমার কাছে এতো আকর্ষণীয়, তার জন্যে অবশ্য আমার স্ত্রীর শ্রম ও পুষ্প-চর্চাই দায়ী। এজন্যে আমি কণামাত্র কৃতিত্বের দাবিদার নই।

আমরা যারা শহরে থাকি তাদের সচরাচর প্রশস্ত উঠোনের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয় না। শহরে জমি তেমন দরাজ নয়। এখানে জমির কার্পণ্য আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই। অবশ্য যারা বিত্তশালী তাদের অনেকের বাসভবনের সামনে চোখে পড়ার মতো খোলা জায়গা থাকে। সেই উঁচকপালে জায়গাকে গৃহস্বামীরা উঠোন বলেন না, আদর করে বলেন লন। আমার লন নেই, আছে একরত্তি উঠোন। এবং এই উঠোনে এসে দাঁড়াতে ভালো লাগে, ভালো লাগে আমার স্ত্রীর যত্নে লালিত ফুলের গাছগুলোয় দৃষ্টি বুলোতে। এখন আমি টেবিলের ওপর ঝুঁকে লিখছি আর কামিনী ফুলের গাছটা মৃদু সুরভিটুকু আমার ঘরের ভেতর পাঠিয়ে তার অস্তিত্ব জাহির করছে। বলছে, 'তুমি যেমন আছো,

তেমনি আমিও আছি।' ভাবি, যদি কামিনী ফুলের এই সুরভি আমার লেখায় ছড়িয়ে দিতে পারতাম। নাকি নিজস্ব রচনায় মিস্টত্ব আমার কাম্য নয় আর?

*১০ই অক্টোবর ১৯৭২*

## এই আমার নিয়তি

প্রায় রোজ আমার কলম ঠেলতে হয়। জীবিকার তাগিদে আমি কলম চালাই। কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়। তবে অনিচ্ছার জুলুম সইতে হয় হরহামেশা। কবলু করতে দ্বিধা নেই, আমি নিরানন্দ মনে কাজ করি। অনেকে অবশ্য কাজ করে আনন্দ পান। তারা সৌভাগ্যবান। কাজ করে তারা আনন্দিত কারণ, সেই কাজটি তাঁদের মনের মতো। তাই কাজের সঙ্গে তাদের বিরোধ নেই। আমার কাজের সঙ্গে আমার বিবাদ কিন্তু লেগেই আছে। অনেকবার বোঝা পড়ার চেষ্টা করি, মনকে প্রবোধ দিই, কিন্তু মন থেকে বিরাগ ঝেড়ে ফেলতে পারিনে। চুল ছিঁড়ি, হাত কামড়াই। কলম ফেলে রাখি টেবিলের উপর, তবু কূলকিনারা অদৃশ্য থেকে যায়। তারপর ক্লান্ত হয়ে আবার হাতে তুলে নেই কলম। লেখনীকে বলি, লজ্জা দিও না। অর্থাৎ সক্রিয় হও তুমি, নইলে চাকরীটাই খোয়াতে হবে।

যদি সাহিত্য কর্মের প্রতি আমার অনুরাগ না জন্মাতো, যদি সাহিত্য সৃষ্টির অদম্য বাসনায় আমি প্লাবিত না হতাম, তবে জীবিকার সঙ্গে হয়তো আমার কোনো বিরোধ বাধতো না। হয়তো তখন এই কাজ করে আমিও আনন্দ পেতাম। যেহেতু আমার জীবিকা আমার অধিকাংশ সময় দখল করে রাখে, তাই আমি কাজের প্রতি বিরূপ। অনেকেই বলেন এবং আমি নিজেও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, যে পেশায় আমি নিয়োজিত তা সাহিত্যের মহাশত্রু। কলম চালাতে আমি ভালোবাসি। লেখার টেবিল আমাকে প্রচুর আনন্দ জোগায়, আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি লেখার টেবিল ঘেঁষে বসতে। কিন্তু আমাকে প্রত্যহ কয়েক ঘন্টা ধরে যা লিখতে হয়ে, সে সব লিখতে সাধারণতঃ আমার রুচি হয় না। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, আমি যে কাজ ভালোবাসি সে কাজ করতে গেলে আঠারো ঘন্টা খাটতে রাজি আছি। কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে যেন আমার সংসার চালানোর সংস্থান দেওয়া হয়, নয়তো আমাকে বাধ্য হয়ে এমন কিছু করতে হবে যাতে সংসার চালানোর মতো অর্থ আসে। কিন্তু তা যদি আমি করি তাহলে আমি যে কাজ করতে ভালোবাসি সে কাজ করা হয় না, করা হয় এমন কোনো কাজ যে কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। অধিকাংশ সময় তো তেমন একটি কাজে খরচ হয়। তাহলে আমার মনের মতো কাজ করবো কখন।

অন্নদাশংকর রায় মহাশয় আমার মনের কথাটি বলেছেন।

আমি যে কাজ করছি সেটি আমার পছন্দমাফিক না হওয়া সত্ত্বেও চট করে ছেড়ে দিতে পারিনে। আমার মনে এমন কোনো সংগতি নেই যে পদত্যাগপত্র দাখিল করলে আমার সংসার তরীটি তর তর করে বয়ে যাবে। বরং চড়ায় ঠেকে হয়ে যাবে খান খান।

অর্থাৎ কাজটি ছেড়ে দিলে আমি অকূলে ভাসবো। আমার সংসারের তো কোনো কূলকিনারা হবেই না, সাহিত্যচর্চাও যাবে ভেস্তে। অতএব, আমার পেশার প্রতি আমি যত বিরূপই হই না কেন তার গলগ্রহ হয়েই আমাকে থাকতে হবে। এই ভালো না-লাগা কাজের উজান বেয়েই আমাকে করে যেতে হবে আমার মনের মতো কাজ। জীবিকার খুঁটিটি শক্ত রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় সময় খরচ করে বাকী যে সময়টুকু তা সে যত অল্পই হোক না কেন উৎসর্গ করতে হবে সাহিত্যের উদ্দেশে। কতো ভালই না হতো, যদি আমি আমার সবটুকু সময় অর্পণ করতে পারতাম কাব্যলক্ষ্মীর অঞ্জলিতে। কিন্তু তা হবার নয়। আমি জানি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি আমি পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারি না বলে তার করুণার কণামাত্র আমার ভাগ্যে জোটে কালেভদ্রে। এজন্যেই আমার ভাণ্ডারে এতো অনটন। কিন্তু আমি পাচার, চোরাচালানকারী নই যে নানা ভেল্কি দেখিয়ে রাশিরাশি সময় পাচার করে দেব কাব্যলক্ষ্মীর অন্তঃপুরে।

চাকরি না করলে সংসার চালানোর মতো অর্থও কেউ আমাকে দেবে না। যেহেতু উপোসী স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ দেখে নিথর হয়ে বসে থাকা কোনো পাষণ্ডের পক্ষেও দুষ্কর, তাই কাব্যলক্ষ্মীর ধিক্কার সয়েও আমাকে তেল. নুন, লাকড়ির জোগান দিতে হবে সংসারে। এই আমার নিয়তি।

*১৪ই অক্টোবর ১৯৭২*

## রুটি চাই গোলাপও চাই

অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আজকাল অহরহ শোনা যাচ্ছে এই শ্লোগান। দেয়ালে দেয়ালে লেখা হচ্ছে একটি কথা, মানুষের মুখে মুখে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হচ্ছে একটি কথা। সত্যি তো, অন্ন-বস্ত্র ছাড়া আমাদের চলে না। জঠরে প্রেরণ করার জন্যে যেমন দু'বেলা অন্নের দরকার, তেমনি অষ্টপ্রহর অঙ্গে ধারণ করার জন্যে দরকার বস্ত্রের। এক জঠর ক্ষুধা নিয়ে যেমন থাকা যায় না তেমনি ভদ্র সমাজে চলাফেরা করা যায় না দিগম্বর হয়ে।

মোট কথা, বাঁচতে হলে রুটি আমাদের চা-ই। তবে আবার রুটি-সর্বস্ব জীবনও আমাদের কাম্য নয়। এ কথা ঠিক মানুষ অন্যান্য জীবের মতই আহার-নিদ্রা এবং মৈথুনের চৌহদ্দিতে বাঁধা। বোধ হয় এজন্যেই মানুষ তার পশুত্বের খেতাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। তাই মানুষ নিজের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে নিজেই নিজেকে র‍্যাশনাল এ্যানিমেল, থিংকিং এ্যানিমেল ইত্যাদি খেতাব দিয়েছে। কিন্তু মানুষ পশু নয়। দৈহিক প্রয়োজনীয়তার চৌহদ্দি পেরুনোর এক দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে মানুষ। গণ্ডীর নিষেধ না মেনে সে সীতার মতো ছুটে যায় স্বর্ণমৃগের পেছনে। বস্তু জগতে স্বর্ণমৃগের কোনো উপযোগিতা নেই। উপযোগিতা নেই জেনেও মানুষ সোনার হরিণ চায়। চিরকালই চাইবে। কারণ,

শুধুমাত্র কোনো বস্তুর উপযোগিতা দিয়েই মানুষ কার গুণাগুণ বিচার করে না। ফুল কিংবা পাখির গানের কী উপযোগিতা রয়েছে মানুষের জন্যে? তবু মানুষ ফুল ভালোবাসে, আত্মহারা হয় পাখির গান শুনে। পশুরা প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে রাত্রি-দিন বিচরণ করেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অচেতন, উদাসীন। পশু ফুলের গাছের নিচে শুয়ে থাকে কিংবা মানভঞ্জন করে তার প্রেমিকার, কিন্তু ফুলের দিকে সে ফিরেও তাকায় না, ফুলের মাধুর্য বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না কখনও। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করে না কোনো ঘাই হরিণ, করেন একজন জীবনানন্দ দাশ, 'আরণ্যক' গ্রন্থ রচনা করে না কোনো বেবুন, করেন একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুল ভোজ্যবস্তু নয় বলেই সে পশুকুলের কাছে অগ্রাহ্য। কিন্তু ফুলতো মানুষের জঠর-জ্বালা জুড়োনোর কাজে লাগে না। তবু কেন মানুষ ফুল ভালোবাসে? সৌন্দর্য চেতনাই মানুষকে করেছে কুসুমপ্রিয়। এই সৌন্দর্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ তার ভোজ্য বস্তুকেও সুন্দর করে তুলতে চায়। তাই এমন কি গ্রাম্য মহিলারাও পিঠার শরীরে ছড়িয়ে দেন শিল্পসুষমা। তৈরী হয় নানাধরনের নকশী পিঠা। যেনতেন প্রকারের পিঠা তৈরী করলেই তো তারা দায়িত্ব চুকিয়ে ফেলতে পারেন, তবু কেন তারা এতো শ্রম স্বীকার করেন পিঠার গায়ে নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্যে! যে বস্তু ব্যবহৃত হবে শুধু উদরপূর্তির কাজে, কী দরকার তাকে সুশোভন করে তোলার? প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠি দিয়ে সবকিছু বিচার করে না বলেই মানুষ আজ মানুষ হতে পেরেছে।

রুটি-সর্বস্ব জীবনের আমি পক্ষপাতী নই। স্বীকার করি, রুটি বাদ দিলে জীবন অচল। বেঁচে থাকতে হল উনুনে হাঁড়ি চাপাতেই হবে তাওয়ায় সেঁকতেই হবে রুটি। তবে সারাক্ষণ শুধু রুটি-রুটিই করতে হবে— এ-ও আমি মানি না। রুটি আমি চাই-ই, এই সঙ্গে আমি গোলাপও চাই।

*১৫ই অক্টোবর ১৯৭২*

## জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার চাদর

'তাঁর চাদরটা হাতে পেয়েই কেমন এক অনুভূতিতে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেলাম', সেদিন বলছিলেন এখলাসউদ্দিন আহমদ। কার চাদর? ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার চাদরের কথা বলছিলেন তিনি। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা উনিশ শো একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ নিহত হন হানাদার পাক-সেনাদের হাতে। এখলাসউদ্দিন আহমদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন তাঁর খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখেন সব শেষ। একজন নার্স ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার চাদরটি এনে দিয়েছিলেন এখলাসউদ্দিন আহমদের হাতে। নার্সটি তাঁকে সেই নিহত শিক্ষকের কোনো আত্মীয় মনে করেছিলেন হয়তো। এখলাসউদ্দিন আহমদ ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার অনাত্মীয় নন। যাঁরা সেই ধীমান

শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা কেউই অনাত্মীয় ছিলেন না তাঁর। সহজেই কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে আপন করে নিতে পারতেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। তিনি শুধু একজন উজ্জ্বল শিক্ষক ছিলেন না, ইনটেলেকচুয়েল হিসেবেও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। ডক্টর গুহ ঠাকুরতা মানবিক বাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিলো অগাধ। যদিও ভক্তিবাদে আস্থা ছিলো না তাঁর কোনোদিনই।

ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা কোনো ধরনের গোড়ামীর প্রশ্রয় দিতেন না। খোল মন চোখ নিয়ে তাকিয়েছেন জগৎ সংসারের দিকে। যেহেতু তিনি যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী ছিলেন, তাই সব কিছুকেই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে চাইতেন। নিজের বক্তব্য যেমন রাখতেন দৃঢ়তার সঙ্গে, মনোযোগ দিয়ে শুনতেন অন্যের কথা। একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমি তাঁর কোনো কোনো বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলাম, মনে পড়ে। তিনি কিন্তু বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নি। আরেক দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যক্ষের একটি উক্তি সম্পর্কে আমি ঝাঁঝালো মন্তব্য করেছিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তাঁরও তো একটা ভিউ পয়েন্ট থাকতে পারে। এবং সেটি আমার মতের সঙ্গে মিলবে এমন কথা নেই। তাঁর সেই ভিউ-পয়েন্ট সবার সামনে তুলে ধরার অধিকার আছে।' এই পরমত সহিষ্ণুতা ইদানীং বিরল হয়ে পড়েছে বলেই বার বার মনে পড়ে আমার শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার কথা।

আজো ভেসে আসে তাঁর স্বর। সময়ের করিডোরে পুরোনো গাঢ় এক স্বর। বুদ্ধদেব বসুর 'গোলাপ কেন কালো' বইটি তোমার পড়া দরকার। তোমার ভালো লাগবে। এ বইয়ে ঢাকার কথা প্রচুর লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু।' আমার ঢাকা-প্রেম ড: জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার অজানা ছিল না। তিনি আমাকে 'গোলাপ কেন কালো' বইটি পড়তে দিয়েছিলেন। তখন ঢাকায় পশ্চিমবঙ্গের বই একদম পাওয়া যেত না।

আমার কাছে তাঁর চাদর নেই। তিনি যখন নিহত নহ, তখন আমি এমন ভীত সন্ত্রস্ত যে, মুহূর্তের জন্যেও পথে পা বাড়াই নি। আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেতে পারি নি, তাঁর মৃতদেহ দেখবার জন্য যাই নি আমি সেদিন। তাই কোনো নার্স তাঁর রক্তমাখা চাদর এনে দেয়নি আমার হাতে। না, তাঁর চাদর নেই আমার কাছে। আছে শুধু কিছু টুকরো-টুকরো স্মৃতি।

*২১শে অক্টোবর ১৯৭২*

## লিবার্য়ালিজমের ফাঁক-ফোকর

আমি নিজেকে লিবার্য়াল বলে থাকি। অন্তত বছর দুয়েক আগে তাই বলতাম। এখন লিবার্য়ালিজম নিয়ে কোনো উচ্চ-বাচ্য করি না। লিবার্য়ালিজমের অধঃপাত ইতিহাসে

ভালো করেই দেখেছি। লিবার‍্যালিজমের কথা বললেই সতেরো শতকের শেষ পাদের ইউরোপের কথা মনে পড়ে। সেই সময় থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার লিবার‍্যালিজমের নিশান উড়ছে সগৌরবে। এই দার্শনিক মতবাদের উদ্দেশ্য সৎ-ই ছিলো গোড়ার দিকে। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের দাপটে ব্যক্তি-মানুষের আত্মবিকাশের কোনা অবকাশই ছিলো না। ঐ যুগ্মতন্ত্রের দৌরাত্ম্যে ব্যক্তি মানুষের নাভিশ্বাস উঠছিলো সর্বক্ষণ। ব্যক্তি মানুষকে এই অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই লিবার‍্যালিজমের আবির্ভাব হলো। ব্যক্তিকে তার নিজস্ব স্বতন্ত্রের আসনে বসানোর তাগিদেই লিবার‍্যালিজম তার ধ্বজা উড়িয়েছিলো, বলা যায়। কিন্তু এই দার্শনিক মতবাদের গলদ ধরা পড়লো ক্রমান্বয়ে। লিবার‍্যালিজমের দৌলতে ধনতান্ত্রিক নৈরাজ্য ও শোষণ দিব্যি জাঁকিয়ে বসলো। জাতীয়তাবাদ এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হরিহর-আত্মা হতেও বেশী দেরী হলো না। এর ফলে বহু মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হলো, নিশ্চিহ্ন হলো অগণিত মানুষ। ইউরোপের শ্রীবৃদ্ধি হলো ঠিকই, কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বলি হলো সংখ্যাহীন অমৃতের সন্তান।

লিব্যার‍্যাল দর্শনের ফাঁক-ফোকর দিয়েই এসেছিলো. এই সর্বনাশ। গোড়ার দিকে লিবার‍্যালিজমে দীক্ষিত হয়ে ব্যক্তি অস্বীকার করলো রাজার ঐশ্বরিক অধিকার। ডিভাইন রাইটস অব কিং-এর মুখে লাথি মেরে ব্যক্তি তার জন্মগত স্বাভাবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করলো। মানুষের সবদিক দিয়েই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হওয়ার বাসনার জোয়ারে ভেসে গেলো রাজ্যপাট, যাজক সম্প্রদায়ের দাপট গেলো গুঁড়িয়ে। ভূ-দাসদের হাড়ে লাগলো হাওয়া। গড়ে উঠলো সকল মানুষের সমান অধিকারের বুনিয়াদ।

কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার যে চুক্তিপত্রে সই করা হয়েছিলো সোৎসাহে তাতে প্রতিযোগিতার ছায়া পড়লো। এক আপোসহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠলো মানুষ। শুধুমাত্র শক্তিমানরাই জীবনের সব উপকার পাবেন, যারা দুর্বল তারা চেয়ে থাকবে ফ্যালফ্যাল করে, তাদের সরে দাঁড়াতে হবে পথ থেকে। অর্থাৎ বসুন্ধরাকে হতে হবে বীরভোগ্যা। জন্তুজগতের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে যে, সেখানে কেউ কারো অধীন নয়, সবাই নয়, সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই পর্যন্ত বেশ ভালোই মনে হয়, কিন্তু তার পরেই ফ্যাঁকড়া। বন্যপশুরা সর্বজনগ্রাহ্য কোনো রীতিনীতির ধার ধারে না। বনে সবলরাই আধিপত্য বিস্তার করে, দুর্বলেরা পরিণত হয় তাদের শিকারে। মনুষ্য সমাজও জন্তু-জগতের ছাঁচে গড়ে উঠলো।

উনিশ শতকের শেষ পাদে এলো ডারউইনবাদ। তিনি দেখালেন, জন্তুজগতে যে অবিরাম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান তাতে বলবানরাই টেকে শেষ পর্যন্ত, যারা হীনবল তারা পড়ে মারা। অর্থাৎ এই জগৎ-সংসারে শুধু যোগ্যতমদেরই ঠাঁই আছে, অন্য কারুর নেই। ডারউইনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো এক অমোঘ বাণী 'সারভাইবল অব দি ফিটেস্ট'। সেকালের শক্তিধররাই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেন— তাদের কারো কারো সাম্রাজ্যে আবার সূর্যদেবের অস্ত যাওয়াও বারণ হয়ে গেলো।

এই সব সাম্রাজ্য-লোলুপ শক্তিমানদের কাছে ডারউইনের মতবাদ বেশ বরণীয় ঠেকলো। যেন তাদের ফায়দার জন্যেই ডারউইন অনেক মাথা খাটিয়ে সারভাইবল অব দি ফিটেস্ট নীতি প্রবর্তন করলেন। আসলে কিন্তু ডারইনের মনের আনাচে-কানাচে কোথাও এমন কোনো কথা ছিলো না। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই জন্তুজগত নিরীক্ষণ করেছিলেন। তাঁর সেই নিরীক্ষারই ফল সারভাইবল অব দি ফিটেস্ট নীতি। এই নীতি মনুষ্য সমাজেও অনুসৃত হবে, এটা তিনি চান নি। ডারউইনের পক্ষে সম্ভব ছিলো না সেই নীতিকে কোনো নৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রচার করা।

হারবার্ট স্পেনসারের মতো দার্শনিকেরা কিন্তু ডারউইনবাদের সুযোগ নিতে ছাড়লেন না, তাঁরা ডারউইনের মতবাদকে জন্তুজগতে সীমিত রাখতে রাজী হলেন না কিছুতেই, তাকে মনুষ্য সমাজে খাটানোর জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। এই নীতি যে মনুষ্য সমাজে অচল, এ কথা তাদের মুখ থেকে বেরুলো না। কেউ কেউ অবশ্য মুখ খুলছিলেন, কিন্তু স্পেনসারী তর্জনে-গর্জনে তাঁদের ক্ষীণ স্বর কোথায় মিলিয়ে গেলো—প্রায় শোনাই গেলো না।

বলশালীরা তাদের বিক্রমের বহরেই বেঁচে থাকবেন আর দুর্বলেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এই নীতির ভিত্তির ওপর মনুষ্য সমাজ বেশী দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতিপরায়ণতাই মনুষ্যসমাজকে বসবাসযোগ্য করে তোলে। সেই সমাজেই সভ্য বলে গ্রাহ্য যে সমাজে শক্তিধরদের নয়, দুর্বলদের অধিকার সর্বাগ্রে স্বীকৃত। দাঁত-নখ বের করা প্রতিযোগিতাকে পরিহার করে পারস্পরিক সহযোগিতার স্নিগ্ধ পথে এগিয়ে গেলেই আমরা সভ্য মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারি। এই সত্যটিকে পাত্তা দেয়া হয় নি বলেই লিবার‍্যাল দর্শন ভীষণ এক গাড্ডায় মুখ থুবড়েই পড়ল।

আজকাল লিবার‍্যালিজমের নাম মুখে তেমন আনি না আর। লিবার‍্যালিজম কথাটাই যেন কেমন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুত লিবার‍্যালিজমকে এই বিরূপ বিশ্বে মনে হয় বিষম পঙ্গু, নপুংশক। যিনি লিবার‍্যাল তিনি তো অসহায়, তাঁর ওপর আঘাত আসে সব দিক দিয়ে। লিবার‍্যাল ব্যক্তি চরমপন্থীদের বিপক্ষে হাত তুলতে নারাজ। কিন্তু চরমপন্থীরা তাঁকে ছেড়ে কথা বলে না। এমন কি তাকে জীবনের তল্লাট থেকে তাড়িয়ে দিতেও কসুর করে না। মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী—এরা আমার বিশ্বাস, ছিলেন লিবার‍্যাল। কিন্তু কতকগুলো ধর্মান্ধ উগ্রপন্থীর হাতে তাঁরা নিহত হলেন। লিবার‍্যালরা এভাবেই মার খান বার বার।

*১৯ই নভেম্বর ১৯৭২*

## সন্তোষকুমার ঘোষের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য

**সারাদিন সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে কাটলো। কখন যে সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যায় লীন হয়ে গেলো টেরই পেলাম না। সন্তোষকুমার ঘোষ দিলখোলা আড্ডাবাজ মানুষ। কথা বলতে ভালোবাসেন এবং বলেনও ভালো। লঘু-গুরু দুটো সুরই চমৎকার খেলে তাঁর**

কথাবার্তায়। তিনি হাসতে জানেন, হাসাতে পারেন। হঠাৎ কখনো কখনো লক্ষ করেছি, একটা বিষণ্ণতা তাঁকে ছুঁয়ে যায়। মুহূর্তের জন্যে এই শিল্পী মানুষটি কেমন খাপছাড়া হয়ে যান, একটু বিব্রত হয়তোবা। সেই মুহূর্তে তাঁকে অসহায় বলে মনে হয় আমার। অসাধারণ সাহিত্যিক, জাঁদরেল সন্তোষকুমার ঘোষও যে এক নিমিষে হু হু বিষাদ আলবাট্রস হয়ে পড়েন, সেই বিশেষ মুহূর্তে তাঁকে না দেখলে বোঝা যায় না। তবে সেই বিষণ্ণতা থেকে তিনি নিজেকে আবার সহজেই মুক্ত করে নেন। আবার মুখর হয়ে ওঠেন। বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যে সচকিত তৃপ্ত করেন শ্রোতাকে। মাঝে মধ্যে এমন কৌতুক ছড়িয়ে দেন কথাবার্তায়, অনেক বুঝতেই পারে না যে তাঁর কোনো দুঃখ আছে, বুঝতে পারে না কোনো ভূত জানালার ধারে এসে উত্যক্ত করে তাঁকে।

এই যে আমি আমার ডায়েরীতে সন্তোষকুমার ঘোষ নামটি বার বার লিখছি, এতে আমি জানি তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। খুব মাইন্ড করবেন। তিনি চান তাঁকে আমি সন্তোষদা বলে ডাকি। এই বাক্যটি লেখার সময় সন্তোষদা-র স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি ভেসে উঠলো আমার সামনে। এমনিতে তাঁর চক্ষুদ্বয় বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু তিনি যখন সস্নেহে তাকান, তখন তাঁর চোখ দুপুরের পুকুর হয়ে ওঠে যেন—এক উজ্জ্বল স্নিগ্ধতার প্রলেপ লাগে সেখানে। তিনি কৌতুকপ্রবণ হয়ে উঠলে তাঁর দৃষ্টি রূপান্তরিত হয় এক দুষ্টুমিময় কৈশোরিক চঞ্চলতায়।

নানা কথার ফাঁকে সন্তোষদা বলেন তাঁর জন্মস্থান রাজবাড়ির কথা। এবার ঢাকায় এসেই ছুট দিলেন রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়ির গাছপালা, ঘর-বাড়ি, মাটি-ঘাস-এসব কিছুই যেন খেলা করছিলো তাঁর সত্তায়। রাজবাড়িকে তিনি কখনো ভুলতে পারেন না। জন্মস্থানকে কেউ কি ভুলতে পারে কখনো? সন্তোষদা তাঁর বহু রচনায় রাজবাড়ির কথা লিখেছেন—এমনকি অন্য কোনো জায়গার কথা লেখার সময়েও রাজবাড়ির রূপ অবৈধ প্রেমের মতো হানা দিয়েছে তাঁর মানসে। রাজবাড়ির কথা বলতে বলতে তিনি চলে যান অন্য প্রিয় প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে সন্তোষদা এতো উৎসাহী যে গানের পর গান তিনি আবৃত্তি করে যান একটুকু হোঁচট না খেয়ে, কখনো গুনগুনিয়ে ওঠেন আশ্চর্য মুগ্ধতায়। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রকৃত সমঝদার। গানে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে সংযমের যে দুর্লভ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তার বিশ্লেষণে সন্তোষদা অনলস। অনলস তিনি কবিতা আবৃত্তিতে। দেশ-বিদেশের কবিতা অনর্গল আউড়ে যান আর আবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে করেন বিদগ্ধ মন্তব্য।

সন্তোষকুমার ঘোষ মূলত গদ্য লেখক। আমি তাঁর গদ্য শিল্পের অনুরক্ত ভক্ত। 'শেষ নমস্কার' উপন্যাসে তিনি যে ভাষা রচনা করেছেন তা তাঁর প্রতিভার যোগ্য স্বাক্ষর হয়ে রইলো। মনে পড়ে 'কিনু গোয়ালার গলি'র পাঠের অভিজ্ঞতা। তখন আমি সবেমাত্র কুড়ির জ্বলজ্বলে কোঠায় পা দিয়েছি। জানি না সেই সাড়া-জাগানো উপন্যাসটি এখন আবার পড়লে কেমন লাগবে। একদা 'কিনু গোয়ালার গলি'তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভ্রমণ করেছিলাম—সেই স্মৃতি আজো আমার প্রিয় হয়ে আছে। সেই যে সন্তোষকুমার ঘোষ

নামটির সঙ্গো আমার পরিচয় হলো তা আর কোনো দিন ম্লান হলো না। যে সন্তোষকুমার ঘোষ বঙ্গা সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক, যে সন্তোষকুমার ঘোষ এমন কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন, যেগুলো বিশ্ব সাহিত্যে আদরণীয় হওয়ার যোগ্য, তাঁর এবং আমার মধ্যে পরিচয়ের একটি ব্যক্তিগত সাঁকো গড়ে উঠবে, এ আমি কোনো দিন ভাবি নি। উনিশ শো একাত্তর সালের ডিসেম্বরের আগে কখনো দেখি নি তাঁকে। বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হওয়ার কয়েকটি দিন পরে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় এসে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে আমার সঙ্গো যোগাযোগ করলেন। যখন টেলিফোনে শুনলাম, 'আমি সন্তোষকুমার ঘোষ বলছি', তখন, সত্যি বলতে কি, স্বকর্ণকে বিশ্বাস করতে পারি নি। এ-ও কি সম্ভব? কেন সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি আমার সঙ্গো দেখা করার জন্যে এমন ব্যাকুলতা প্রকাশ করবেন? আমার কবিতা তাঁর ভালো লাগে, জানালেন। এবং সেজন্যেই তিনি আমার সঙ্গো দেখা করতে চান। আলাপ করতে চান। কবুল করতে দ্বিধা নেই কবিতা লিখি বলে সেদিন একটি তীব্র সুখানুভূতির জন্ম হয়েছিলো মনে। প্রথম সাক্ষাতেই বুঝেছিলাম, যিনি অসাধারণ লেখক, মানুষ হিসেবেও তিনি অসামান্য।

এবার সন্তোষদা কথায় কথায় বলছিলেন যে তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। এক ধরনের ঝাঁঝালো অসন্তোষও তাঁকে দখল করে রাখে কখনো-সখনো। এটা খুবই স্বাভাবিক, লেখক হিসেবে তিনি তাঁর যোগ্য সম্মান পান নি। এতে অবশ্য আমি খুব বিস্মিত হই না। নিমাইয়ে পাওয়া দেশে সন্তোষকুমার ঘোষের মতো বিদগ্ধ মননশীল লেখক বারো ভাজা প্রিয় পাঠক সমাজের কাছে কখনো বরণীয় হতে পারে না। তাই তিনি আউট-সাইডার। আমি তাঁকে বললাম এ কথা। তিনি নিজে জানেন না, এমন নয়। তবু আমাদের অনেক জানা কথা বলতে হয়, শুনতে হয়, নইলে আলাপের যোগসূত্র হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হতে হতে শূন্যে মিলিয়ে যেতো। বোবা হয়ে যেত মানুষ।

কোনো কোনো সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর কাছে যাই। সন্তোষদা বললেন, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গো তাঁর কাছে অত্যন্ত আনন্দময় এবং উপকারী মনে হয়। রচনারীতিতে সন্তোষকুমার ঘোষ বুদ্ধদেবীয় নন, তবে তিনি বুদ্ধদেব বসুর অকৃত্রিম অনুরাগী। বুদ্ধদেব বসুও তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সন্তোষদা বুদ্ধদেবের 'প্রেমপত্র' নামক গ্রন্থটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বুদ্ধদেব এটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। দ্যাখো, যদিও আমার এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রচুর, তবু তিনি আমার নামের পাশে বন্ধুবরেষু শব্দটি বসিয়েছেন, কল্যাণীয়েষু কিংবা স্নেহভাজনেষু ইত্যাদি নয়।' লক্ষ করলাম, এ-কথা বলার সময় সন্তোষদা-র কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে এলো। সহমর্মিতার স্পর্শ পেলেই হয়তো গলা এমন মেদুর হয়ে আসে। সন্তোষকুমার ঘোষকে আমার মনে হয়েছে সেই গুণী যন্ত্রীর মতো,—যিনি চকিতে সৃষ্টি করেন এক মোহন সুরজাল, কিন্তু প্রায়শই যাঁর যন্ত্রের তার ছিঁড়ে যায়। কেন ছিঁড়ে যায়?

*২রা ডিসেম্বর ১৯৭২*

# আত্মজীবনী লেখার সাহস

আমাকে প্রায়শই লোকে ভুল বোঝে। আমিও যে বুঝি না, এমন নয়। আসলে ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক। ভুল বোঝাবুঝি অনেকদূর পর্যন্ত গড়ালে পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে চিরদিনের মতো। আমি জ্ঞানত কাউকে আঘাত দিতে চাই না। আমার দরুন কারুর কোনো কষ্ট হোক, কোনো ক্ষতি হোক, এ আমি চাই না কোনোদিন। আমার কোনো কোনো প্রিয়জনের কোনো কোনো দুর্ব্যবহারে আমি কুপিত হই, ক্ষুব্ধ হই সত্য, কিন্তু ক্রুদ্ধতার মুহূর্তেও আমি তাদের কোনো অনিষ্ট কামনা করি না। কি জানি, বানিয়ে বললাম না তো?

যদি বানিয়েও বলি তাতে ক্ষতি কি? কোনো এক সাংঘাতিক মুহূর্তে একজনের অনিষ্ট কামনা করলেও অনেক সময় তার মঙ্গল কামনাও তো করে থাকি। একটার জন্যে কি আরেকটি মিথ্যে হয়ে যাবে? এটা ঠিক, কখনো কোনো কুস্থ চিন্তার খপ্পোরে পড়লে আমরা তো অস্বীকার করতে চাই, প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, বলতে চাই, না, এমন কোনো চিন্তা আমার মনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে নি কখনো। কেউ কেউ অবশ্য স্বীকার করে ফেলেন চটপট। যেমন রুশো, বেশ চড়া সুরেই তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন। তাঁর বিস্ময়কর অকপটতা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু সেই বিখ্যাত স্বীকারোক্তির কোনো কোনো অংশ কেমন যেন একটা দেখানো-পনা হয়ে ফুটে উঠেছে প্রকটভাবে।

এই হলো আত্মজীবনী লেখার বিপদ। আত্মকথা লিখতে গিয়ে কেউ নিজের অন্ধকার দিকটিকেই বড় করে তোলেন, কেউ আবার আত্মগরিমাময় মঞ্চে নিজের মাহাত্ম্য প্রচারে মশগুল হয়ে পড়েন। এই দুই শ্রেণীর আত্মজীবনীকারই নিজেকে প্রতারিত করেন এবং সত্যের সঙ্গে করেন বিশ্বাসঘাতকতা। আমি কি কোনোদিন সৎ আত্মজীবনীকার হতে পারবো? সত্য এবং সততার প্রতি নিবেদিত আত্মজীবনী লেখার জন্যে অসীম সাহসিকতার প্রয়োজন। এবং খুব কম লোকই এই সাহসের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের মতো মহান প্রতিভাও আত্মজীবনী লিখতে পারলেন না। 'জীবনস্মৃতি' অসাধারণ গ্রন্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অলোকসামান্য কৃপণ আত্মকথায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের কবিত্বের অন্দর মহলের সংবাদই আমরা বেশী পাই। অস্থিমজ্জা মাংসে গঠিত মানুষ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ কোনো পরিচয় পাই না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন ইচ্ছে করেই তাঁর সেই পরিচয় আড়াল করে রেখেছেন অজস্র কৌতূহলপ্রিয় দৃষ্টি থেকে। তিনি তাঁর জীবনকে বে-আব্রু করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত বোধ করেন নি। এ ধরনের কাজ তাঁর রুচিতে বেধেছে নিশ্চয়ই। কিংবা রবীন্দ্রনাথের ততটা সাহস ছিলো না যতটা সাহস একটি বিশ্বস্ত আত্মজীবনীর পক্ষে জরুরী।

*৩রা ডিসেম্বর ১৯৭২*

# যখন ভেঙে গেলো কাঁটাতারের বেড়া

প্রথমেই বুঝতেই পারি নি। আনন্দ একটা ধাক্কার মতো যেন দখল করলো আমাকে। জানতাম, জয় আমাদের হবেই। তবে ডিসেম্বরের ষোল তারিখেই যে বাংলাদেশের রক্তাক্ত ললাট শোভিত হবে জয়তিলকে, বুঝতে পারি নি। ষোলই ডিসেম্বরের প্রায় দুপুর পর্যন্ত আমরা বন্দী ছিলাম এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার বৃত্তে। আমরা যারা ডিসেম্বর মাসে রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে পারি নি, যারা আটকা পড়েছিলাম ঢাকা নামক ইঁদুরের ফাঁদে, তারা প্রমাদ গুণছিলাম মুহূর্তে মুহূর্তে। সবার চোখে মুখে শুধু একটা প্রশ্ন—কি হবে? কি হবে? আমরা বাঁচবো তো শেষ পর্যন্ত। যদি নিয়াজী আত্মসমর্পণ না করে, যদি পাক হানাদাররা হাতিয়ার না ফেলে, তবে কি হবে? মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে গুঁড়িয়ে যাবে আমাদের প্রিয় ঢাকা শহর। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিলো, আমাদের মতো হতভাগ্য লোকদের কথা ভেবে তারা হয়তো ঢাকার উপর এমন সর্বনাশা আক্রমণ চালাবেন না। মিত্রবাহিনীর বিমান হামলার ধরন থেকেই এই ধারণার জন্ম হয়েছিলো আমাদের মনে, কিন্তু কতদিন তারা এভাবে ঢাকার বাসিন্দাদের কথা ভেবে হামলার এলাকা সীমাবদ্ধ করে রাখবেন?

আমাদের বন্দীদশার ঢাকাকে আমার প্রায়ই মনে হতো কাম্যুর 'প্লেগ' উপন্যাসের ওরান শহরের মতো। যেন প্লেগের বীজাণু ছড়িয়ে পড়েছে ঢাকার অলিতে-গলিতে। শহরটিকে চতুর্দিক থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে—বেরুনোর কোনো পথ নেই। আমরা অনেকেই তখন সেই ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডাকা ছেড়ে গেলাম না বলে পাগলের মতো চুল ছিঁড়েছি। দেরী হয়ে গেছে, বড়ো দেরী হয়ে গেছে। বেরুনোর পথ নেই আর। আমরা সবাই প্লেগ কবলিত। দেয়ালে মাথা খুঁড়লেও অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ডিসেম্বরের দশ তারিখে স্বগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছি। এক বাড়ীতে অনেক বাসিন্দা। এককাট্টা হয়েছি চরম দুর্যোগে। ডিসেম্বরের দশ তারিখে সেই গা-ঢাকা দিয়েছি, তারপর এক মুহূর্তের জন্যেও পা বাড়াই নি বাইরে। সারাক্ষণ বন্দী হয়ে আছি ঘরে। রেডিও শুনি : পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। বারান্দায় পায়চারি করি। নানা ভাবনা মনে ওড়াউড়ি করে। কোনো কোনা ভাবনা আমার মগজে ধাবালো নখ বসিয়ে দেয়।

বোমা পড়ছে। মনে হলো, কাছে ধারেই পড়েছে। জানালা থেকে দেখলাম, দূরে ধোঁয়া আর অজস্র কাক। কাক আর ধোঁয়া। শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম। আমার ভাগনে জাফর, লক্ষ করলাম, এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও ডায়েরী লিখছে। অনেকদিন ধরেই সে ডায়েরী লিখছিলো—উনিশ শো একাত্তরের মার্চ মাসের গোড়া থেকেই। ইতিমধ্যে লিখে লিখে চারটে একসারসাইজ খাতা ভরিয়ে ফেলেছে সে। একটা খাতার মলাটের উল্টো দিকে জাফর লিখেছে, 'যদি এই ধ্বংসলীলায় আমরা মরে যাই, তবে এই খাতাগুলো যেন দয়া করে নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।' ঠিকানাটি অবশ্য তার পিতামহের, যিনি

থাকেন কুমিল্লার এক সুদূর নিভৃত গ্রামে। সে, জাফর, সেই আতংকগ্রস্ত প্রহরে হয়তো ভেবেছিলো যুদ্ধে ঢাকা শহর বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। আমাদের সবার মৃতদেহ ঢাকা পড়বে ধ্বংসস্তূপে। মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করবে, এ বিশ্বাস তার ছিলো। কেউ হয়তো ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করবে তার খাতাগুলো। এই সম্ভাবনার কথা মনে করেই সে খাতার মলাটের উল্টোদিকে সেই দারুণ কথা কটি লিখেছিলো।

জাফর যখন তার খাতার পাতায় নানা কথার মিছিল সাজাচ্ছিল, তখন মনে পড়ে, আমি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম ছায়াচ্ছন্ন ঘরে। আমি ভাবছিলাম, আমরা বাঁচবো তো? হবে কি আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার? তখনো জানি না, পাক-হানাদারদের অনুচর আল-বদরের নরপিশাচরা আমাদের বহু বন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সে মুহূর্তে আমি বারান্দায় পায়চারি করছি, সেই মুহূর্তেই হয়তো মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে, যখন আমি ঘরের এক কোণে বসে আছি চুপ করে তখনই হয়তো শহীদুল্লাহ কায়সার চিরদিনের জন্যে ছেড়ে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর সন্তানকে। যে মুহূর্তে ভয়ে বুক দুরুদুরু করছিলো আমার, সেই মুহূর্তেই হয়তো নরঘাতকরা উপড়ে নিচ্ছে ডাঃ ফজলে রাব্বীর তাজা হৃৎপিণ্ড। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আবুল খায়ের, আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান এবং তাঁদেরই মতো আরো বহুজনের ওপর যখন আল-বদরের হিংস্র থাবা উদ্যত, তখন আমি কি পাগলের মতো ঘুরিয়ে চলেছিলাম রেডিয়োর নব? নতুন কোনো সংবাদের জন্যে কোনো আশ্বাসবাণীর জন্যে? অথচ ঢাকায় তখন বহু শোক সংবাদ তৈরী হচ্ছিলো, আমরা জানতে পারি নি।

পনেরোই ডিসেম্বরের সন্ত্রস্ত বিকেল। আমাদের স্তব্ধ গলি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। পরে হানাদার ও তাদের অনুচররা ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের খতম করার প্ল্যান এঁটেছে, এমন একটা খবর রটে গেলো। আমি যে পাড়ায় ছিলাম সেখানকার যুবকেরা সবাই উঠে পড়লো ছাদে। ছাদের ওপর জমে উঠলো ইট, যে যা পারলো তুলে নিলো হাতে। অস্ত্র নেই কারুর হাতেই। বেশির ভাগই লাঠিসোটা। আমিও হাতে একটা লাঠি তুলে নিয়েছিলাম, মনে পড়ে। ভয়ে আমি ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম একেবারে—নানা বীভৎস দৃশ্যাবলী ভেসে উঠেছিলো আমার চোখের সামনে। এবার আর নিস্তার নাই। পাড়ার বহু মহিলা ছুটে এলেন, আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে। বাড়িটা দোতলা ছিলো বলেই হয়তো। হয়তো নিরাপত্তার কিছুটা নিশ্চয়তা বহন করেছিলো সেই বাড়ি। আমি ভাবছিলাম যদি পশুরা আসেই তবে এই দালান এবং পাশের খোলা ঘরে তা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে একই রকম। কোনো তফাৎ হবে না নিশ্চয়ই। তবু আশ্চর্য মানুষের মন। তাছাড়া ক্লান্ত মানুষ খড় আঁকড়েই বেঁচে থাকতে চায়। অসহায় হাতে একটা সামান্য লাঠি ধারণ করে আমি ভাবছিলাম, আমরা বাঁচবো তো? হিংস্র বর্বরের দল আসে নি সেই সন্ধ্যায়। সারা রাত কাটলো এক অবর্ণনীয় আতংকের মধ্যে।

আমরা বেঁচে গেলাম শেষ পর্যন্ত। আমাদের চোখ-মুখ থেকে অপসারিত হলো কাঁটাতারের বেড়া। ঢাকার বুক থেকে প্লেগের বীজাণু নির্মূল হলো। শহরের পথে পথে ন মাস পর আবার ধ্বনিত হলো বাঙালীদের জয়ধ্বনি—'জয় বাংলা'। প্রথমে বিশ্বাস হলো

না। ভুল শুনছি না তো? প্রায় বারই কি ভুল শুনবো? সংশয়ের কুয়াশা ছিন্ন করে সেই ধ্বনি প্রবল হতে প্রবলতর হতে লাগলো। পাষাণপুরীতে আবার সঞ্চারিত হল প্রাণ।

আবার আমি পথে। নতুন করে হাঁটতে শিখেছি যেন। চোখে আলো কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। তাহলে কি এতোদিন চোখ-বাঁধা ছিলো আমার? এইতো আবার আমি পথ হাঁটছি। আমি আর স্বাধীনতা হাঁটছি। পাশাপাশি।

*১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২*

## মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত স্বদেশ

বেশ ধুমধামে বিজয় দিবস উদযাপিত হল। এই যে, আমি আজ নিঃশ্বাস নিতে পারছি, লেখার টেবিলে ঝুঁকে রোজনামচা লিখতে পারছি, চোখ মেলে দেখতে পারছি আমার ছেলেমেয়েদের— এর কোনটাই করতে পারতাম না হয়তো, যদি না বাংলাদেশ বিজয়ীর বেশে উপস্থিত হতো ১৬ই ডিসেম্বর। বুঝি তাই কুর্নিশ করতে ইচ্ছে হয় এ দিনটিকে। এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে ওঠে।

যদি আমাদের দেশ রাহুমুক্ত না হতো, যদি বর্বরের দল এখনো আমাদের পদানত করে রাখতো, তবে কী পরিণাম হতো আমাদের? ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। শিরদাঁড়াব্যাপী এক শীতল প্রবাহ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে সব দিনরাত্রির কথা, সময়ের সে সব ভগ্নাংশ, যে গুলো বার বার পরখ করেছে আমার পৌরুষ। সে সব দিন রাত্রি আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলতে বাধ্য করেছিলো, মনে পড়ে। মনে পড়ে, হতাশ জুয়াড়ীর মতো জীবনকে বাজি রেখে আমরা তখন কালযাপন করতাম। সেই অবিশ্বাস্য ভয়াবহতা যে একদা আমাদের দখল করে রেখেছিলো একথা আজ কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। হঠাৎ কখনো ভাবি, সত্যিই কি আমরা প্রবেশ করেছিলাম দুঃস্বপ্নের সেই বিভীষিকা শাসিত বলয়ে? সত্যিই কি এই আমি সর্বক্ষণ অপেক্ষা করতাম মৃত্যুর জন্যে? সত্যিই কি এই আমি ঊনিশ শো একাত্তরের এপ্রিলের এক শোকার্ত দুপুরে নরসিংদীর ঘাটে একটি নৌকার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম? এই আমিই কি আবার রাতারাতি উজবুক হয়ে যাওয়া অস্তিত্বের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি অধিকৃত ঢাকা শহরে? কী দারুণ প্রলয় উজিয়ে আমরা আজো টিকে আছি, তা আমরা অন্য কাউকে বোঝাতে পারবো না। নিরাপত্তার ছাউনিতে বসবাস করে আজ আমার নিজেরাও হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারবো না। যদি বিজয় আমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতো তাহলে আমি হয়তো বেঁচে থাকতাম না শেষ পর্যন্ত। আমার মতো আরো অনেকেই লীন হয়ে যেতো সীমাহীন অন্ধকারে। যদি কোনোমতে প্রাণ রক্ষা পেতো, আমার মধ্যে যে লোকটি রয়েছে তার মৃত্যু হয়তো রোধ করা যেত না। আমি তো আমার কোনো লেখা প্রকাশ করতে পারতাম না, করতামও না। লিখলেও সেগুলো লুকিয়ে রাখতে হতো এতদিন, যতদিন না মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত হতো স্বদেশ।

অধিকৃত বাংলাদেশে সংবাদপত্র কিংবা কোনো কোনো তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো সত্য, কিন্তু কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কোনো লেখকের লেখা দেখা যেতো না।

কোনো নামজাদা লেখক তখন সেসব পত্রিকায় রচনা পাঠালে ছাপা নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু কোনো বিখ্যাত লেখকই তা করেন নি। সবাই কি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলো? কারো কারো কলমের গতি রুদ্ধ হয়েছিলো সত্য, কিন্তু কেউ কেউ আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লিখেছেনও লুকিয়ে-চুরিয়ে। কিন্তু সে সব লেখা তাঁরা ছাপান নি, ছাপা বোধগম্য কারণেই সম্ভব ছিলো না। তবু কেউ কেউ নিজের লেখা মুক্তিযোদ্ধার মারফতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কালো কাঁটাতারের ঘেরা বুট-নিষ্পেষিত, বেয়নেটবিদ্ধ বাংলাদেশের বাইরে। সেগুলো ছাপাও হয়েছে কলকাতার পত্রিকায়। মোট কথা সেই শত্রু কবলিত ন'-মাসে বাংলাদেশের লেখক-গোষ্ঠী নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিলেন মৌনে। এই মৌন ছিলো এক ধরনের প্রতিরোধ। জানি না, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করবেন, তাঁরা এই প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করবেন কিনা। অন্তত আমি এটা উল্লেখযোগ্য মনে করি।

১৭ *ডিসেম্বর* ১৯৭২

## আনন্দ ও দুঃখের হাত ধরাধরি

বিজয় দিবসের আনন্দের রেশ আজো বাজছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা বিড়ম্বনা, জিনিসপত্রের চড়া দাম সত্ত্বেও সবাই আনন্দিত। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও কারো কারো মানসিক এলাকায় বিষাদ পা বাড়িয়ে দেয়। শবাকীর্ণ পথ এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মৃত্যু হানা দিয়েছে উনিশ শো একাত্তরে। মৃত্যু উজাড় করে দিয়েছে কতো বুক। যখন নিজেরই ঘরে আপনজন হারানোর শোক উথলে উঠতে দেখি, তখন, হৃদয় হয়ে যায় মন্থর। আমি আমার এক নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছি। আমার বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান হারিয়েছেন তাঁর দুই ভাই। এই হারানোর তালিকা যে কী সুদীর্ঘ তা আজ আর কারুর অজানা নেই।

আমি মাঝে মধ্যে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকি সেই তালিকার দিকে। কতো চেনা মুখ ভেসে ওঠে সেই তালিকায়। হিসেব রাখতে ইচ্ছে হয় না, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। ক্ষুব্ধ হই, ক্রুদ্ধ হই। আবার এক সময় ভেসে চলি দিনানুদৈনিকতায়। ভাবি, ক্ষোভের শিকার হয়ে কী লাভ? আনন্দ আর দুঃখ তো পরস্পর হাত ধরাধরি করে পথ হাঁটে।

১৯৭২

## কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে উদ্যোগে বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে বসেছে আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা। মেলা বেশ সরগরম মনে হলো। প্রবীণ, নবীন—সবাই এসেছেন বক্তৃতা শোনার জন্যে, বই দেখার জন্যে, বই কেনার জন্যে। বিদেশী বই অবশ্য কেনার উপায় নেই। তবে

বাংলাদেশের বই বিক্রির বন্দোবস্ত রয়েছে। ভারতীয় স্টল থেকে নাকি অর্ধেক বাংলা বই-ই উধাও। বিক্রি করা হয় নি, তবু। বইয়ের তো আর পাখা গজায় নি। বোঝাই যাচ্ছে যাকে বলে অদৃশ্য হাতের কারসাজি। শাদা কথায়, বইগুলো চুরি করা হয়েছে। গ্রন্থ প্রেমিকরাই এই কাজটি করেছেন, সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তারা লোভ সামলাতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গের বই এখানে আসে না বলেই পুস্তক-তস্করেরা তৎপর হয়ে উঠেছেন ভারতীয় স্টলে। অন্য কোনো স্টল থেকে বই চুরি হওয়ার খবর পাওয়া যায় নি।

এই গ্রন্থ মেলা উপলক্ষে কলকাতা থেকে এসেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় এবং তাঁর সহধর্মিণী লীলা রায়। কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যও এসেছেন। অন্নদাশংকর রায় আমাকে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলেন। কায়সুল হকও ছিলেন সঙ্গে। অনেক কথাবার্তা হলো। বইয়ের প্রসঙ্গ উঠলো। কী করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে বাংলা বইয়ের লেনদেন হতে পারে; এ সম্পর্কে তাঁকে চিন্তিত দেখলাম। তিনি বললেন, শীগগীরই এ ব্যাপারে কিছু একটা হওয়া একান্ত জরুরী। আর কতদিন আমরা পরস্পরের সাহিত্য পাঠ থেকে এভাবে বঞ্চিত থাকবো—এই প্রশ্ন তাঁর বয়েসী মুখে রেখায়িত হয়ে উঠলো কেমন এক বিষণ্ণতায়। আমিও বলি, এ ব্যাপারে কিছু একটা হওয়া দরকার।

অন্নদাশংকর রায় তাঁর দুটো বই আমাকে উপহার দিলেন। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে এক সময় লীলা রায় প্রশ্ন করলেন, কফি খেতে ভালোবাসেন? তিনি হঠাৎ এ কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন বুঝতে পারলাম না। তবু তাঁকে আমি আমার কফি প্রীতির কথা জানালাম। একটু পরে তিনি আমার দিকে এক কৌটো নেসকাফে কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটি আপনার জন্যে।'

উঠি উঠি করছি, এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আরো কিছুক্ষণ বসতে বলেন অন্নদাশংকর রায় ও তাঁর সহধর্মিণী। গুলির শব্দ শোনার পর এক্ষুনি আমাকে যেতে দিতে নারাজ ওঁরা। আবার শুরু হলো কথা বলার পালা। আমার আলাপ করছি আর লীলা রায় অদূরে বসে অসুস্থ স্বামীর জন্যে ওষুধ তৈরী করছেন। তখন মনেই হচ্ছিলো না, এই লীলা রায়ের লেখনীর দাক্ষিণ্যে ঘটে বাংলা কবিতার ভাষান্তরণ।

যখন ঘরে ফিরছি, তখন বাইরে অন্ধকার। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনের ভেতর ঝরছিলো আলোর ফুলকি—কথাশিল্পী অন্নদাশংকর রায়ের কথার ফুলকি।

*২১শে ডিসেম্বর ১৯৭২*

## শীতের পিঠে

এবার একটু দেরী করেই শীত নামলো। শীত আমার ভালোই লাগে। যদিও কোনো কোনো শীত-বিকেলে মন ভারি খারাপ হয়ে যায়, একটা নিবিষ্টতা তার সমস্ত শৈত্য দিয়ে মুড়ে রাখে আমাকে, তবু ঋতু হিসেবে শীত আমার কাছে নন্দিত। গ্রীষ্ম আমাকে পীড়িত করে। বর্ষা আমাকে ক্লান্ত করে, কিন্তু কি আশ্চর্য আমি উজ্জীবিত হই শীতকালে। আমার কর্ম-ক্ষমতা অন্যান্য ঋতুর চেয়ে এই ঋতুতেই বেড়ে যায়।

এবং শীত আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ছেলেবেলার কয়েকটি মধুর সকাল। মনে পড়ে কুয়াশা-মোড়া ভোরে উনুনের ধারে বসে পিঠে খাওয়ার কথা। চমৎকার পিঠে তৈরি করতে পারতেন আমার নানী। রকমারি সব পিঠে। ছেলেবেলার সেই পিঠে খাওয়ার স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে। এখন নানীর কালও নেই, পিঠে খাওয়ার ধুমও নেই। আমার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে দুঃখ হয় আমার। পিঠে খাওয়া কাকে বলে, বেচারীরা তো জানলোই না। একটু-আধটু পিঠে যে তারা খায় না এমন নয়, কিন্তু আমার নানী যেসব পিঠে তৈরি করতেন, সেসব সুস্বাদু পিঠের স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেল। তাছাড়া সাধ মিটিয়ে তারা পিঠে খেতে পেলোইবা কই? পাবেই বা কী করে? পিঠে বানানোর জন্য যে সব দ্রব্য প্রয়োজন সেগুলোর দামও এত চড়া যে রোজ সকালে সেই বিশেষ খাদ্যদ্রব্যটি জঠরে পাঠানো মুশকিল। আজকাল ঢাকা শহরে পিঠে খায় ক'জন? পিঠের পাট প্রায় উঠে গেছেই বলা যায়। বছর দুয়েক আগে ঢাকায় পিঠের একটা আধুনিক দোকান খোলা হয়েছিলো। সেখানে নানারকম পিঠে বিক্রি করা হতো। বেশ ভিড় জমতো সেখানে। বাড়িতে পিঠে তৈরি হয় না, তাই দোকানে গিয়েই রসনাকে তৃপ্ত করতেন অনেকেই। কিন্তু সেই দোকানটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

*২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭২*

## বেদনার পরপারে নজরুল

ভাবতে অবাক লাগে, কাজী নজরুল এখন ঢাকায় আছেন। তিনি আছেন অথচ কোনো সাড়াশব্দ নেই। এত নীরব কী করে থাকতে পারেন তিনি? ঢাকা তো তাঁর অচেনা কোনো শহর নয়। একদা এই শহরকে নজরুল মাতিয়ে রেখেছিলেন। শুধুই কি এই ঢাকা শহরকে? সারা বাংলাদেশই উৎসব হয়ে উঠতো তাঁর পদধ্বনি শুনে।

কাজী নজরুল ইসলাম এক পরাক্রান্ত কিংবদন্তী। সেই মোহন কিংবদন্তীর মায়াঞ্জন এখনো বাংলাদেশের চোখে লেগে রয়েছে। এই মায়াঞ্জন সহজে মোছার নয়। যিনি এক সময় কবিতায়, গানে-গজলে, আড্ডায় মশগুল হয়ে থাকতেন, গেরুয়া বসন অঙ্গে ধরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন সদলবলে। আজ তিনি মৌন, অতি মৌন—একথা ভাবলেই ভীষণ খারাপ লাগে।

শুনেছি, নজরুল সর্বক্ষণ বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে থাকতেন। এই দরাজ শিল্পী মানুষটির সঙ্গ নিশ্চয়ই অতীব কাঙ্ক্ষনীয় ছিলো। নইলে তাঁর আসর কেন সারাক্ষণ থাকবে সরগরম? বহু দিন আগেই নজরুলের বিখ্যাত আসর ভেঙে গেছে। এখন তাঁকে ঘিরে যদি কোনো আসর সাজানো হয়, তিনি হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল চালিয়ে গেয়ে উঠবেন না কোনো গজল, কিংবা হো হো করে হেসে উঠবেন না কোনো প্রাচীন দেবতার মতো।

বর্তমান সময় থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন বলে আমরা ব্যথিত হই কখনো-সখনো, কিন্তু কোনো বেদনার ভারে তিনি অবনত নন। নজরুল আজ বেদনার পরপারে। তিনি কি ব্রাদার এ্যাসের দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করেন, নাকি শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন শুধু।

*৯ ই জানুয়ারি ১৯৭৩*

## অনিদ্র রাতের জন্য বড় সাধ

রাত্রির প্রতি আমার একটা জন্মে গেছে বহুকাল থেকে। এখন রাত্রি জাগা আমার পক্ষে প্রায় আত্মহত্যার শামিল। তবু এখনো আমি রাত জাগি; আমার কোনো কোনো প্রিয় কাজ, যেমন লেখা, নৈশ প্রহরেই সারি। এমন কি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ চিহ্নিত করে রাখি রাতে পড়বো বলে। ধ্যান-ট্যান সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই। ধ্যানী কোনো সিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎলাভ আজো আমার ভাগ্যে জোটে নি। বস্তুবাদে পুরোপুরি আত্মলোপ করতে যেমন পারি নি তেমনি প্রথাসিদ্ধ আধ্যাত্মিকতার চৌহদ্দি থেকেও নিজেকে সরিয়ে রেখেছি বরাবর।

এতদসত্ত্বেও আমার মাঝে-মধ্যে মনে হয়েছে রাত্রির পরতে পরতে এমন কিছু জড়িয়ে রয়েছে যা ধ্যানের পক্ষে অনুকূল। এখানে ধ্যান বলতে আমি নিবেদিত চিত্ততাকেই বোঝাতে চাই। রাত্রি থেকে নিঃসরিত যে তন্ময়তা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় অলক্ষ্যে তা নিবেদন করা চলে, প্রেম কিংবা শিল্পকর্মের প্রতি।

কোনো কোনো রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। ভেড়া গুণে গুণে যতই অনিদ্রার বেড়া ডিঙাতে চাই ততই একটা একরোখা ঘুমহীনতা অস্তিত্বকে দখল করে রাখে। এই অনিদ্রা অনেক সময় অত্যন্ত জুলুম করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনো কখনো আবার এমনও হয় যে অনিদ্রার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ রুজু করতে ইচ্ছে হয় না। বরং তখন ঘুমহীনতা উপভোগ্য ঠেকে আমার কাছে। এই তো সেই প্রহর, যখন আমার মগ্ন চৈতন্যের সমুদ্র থেকে আফ্রেদিতির মতো জেগে ওঠে কোনো কোনো কবিতা; এই তো সেই প্রহর, যখন আমার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় এমন একটি মুখ—সে মুখ রাত্রির মতোই রহস্যময়, যে মুখ আমার করতলে শিহরিত হয় ক্ষণে ক্ষণে, যে মুখ একবার দেখার জন্যে আমি হাজার হাজার মাইল পথ হাঁটতে পারি। কী করে আমি ভুলবো সেই চন্দ্রলোকিত মুহূর্তগুলোর কথা, যখন সে জানালার ধারে বসে মৃদু মৃদু হাসছিলো আমার দিকে চেয়ে? কী করে মুছে ফেলবো তার সেই হাসির রেখা? সে তখন সুখী—সুখ তার সমগ্র সত্তায়, আমি বুঝতে পারছিলাম, আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিলো। সেই স্পর্শে তার প্রতিটি রোমকূপ তখন উৎফুল্ল, চোখ দুটো অত্যত পেলব-সজল হয়ে উঠেছিলো। তার চুলে, উন্মোচিত বুকে, চিবুকে রাত্রি যেন মুখ হয়ে খেলা করছিলো জ্যোৎস্নাভেজা তরঙ্গের মতো। এমনকি একটি রাতের জন্যেই বেঁচে থাকতে বড়ো সাধ হয়।

*১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩*

## স্মৃতির রত্নভাণ্ডার

স্মৃতির কি কোনো স্পষ্ট চেহারা আছে? মনে পড়ে, এই কথাটি বলে আমরা স্মৃতিকেই উজ্জীবিত করি। কি মনে পড়ে? কোনো একটা জিনিস কি মনে পড়ে আমাদের? অনেক কিছুই—ছেঁড়া-ছেঁড়া, কখনো সংলগ্ন, কখনো অসংলগ্ন—আমাদের মনে পড়ে। যদি স্মৃতি না থাকতো? ভাবতেই পারি না তেমন কোনো অবস্থার কথা। স্মৃতি আছে বলেই তো বেঁচে আছি, স্মৃতির কৌটায় জমা আছে এমন এক কস্তুরী যার সৌরভে উন্মন হয়ে যাই। মানস-নাবিক আমাকে নিয়ে যায় সে সব আলোকিত, অনালোকিত দূর বন্দরে, যেখানে একদা পড়েছিলো আমার পায়ের ছাপ।

এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে একটা সকালের কথা। ফুটফুটে রোদ হাসছে চতুর্দিক। আমি একা বসে আছি আমার ঘরে। প্রতীক্ষা করছি তার জন্যে, কান পেতে রয়েছি তার পদধ্বনি শোনার জন্যে। যে কোনো মুহূর্তে সে প্রবেশ করবে আমার ঘরে। তখন আমার সমস্ত সত্তা একটা গান হয়ে ঝরছিলো, 'এসো, এসো আমার ঘরে।' আমি তাড়াতাড়ি পায়চারি শুরু করলাম, আমার মনে তখন এক মোহন অস্থিরতা। দরজার দিকে নিবদ্ধ আমার দৃষ্টি। হঠাৎ দেখি, সে তার চুড়ির শব্দ করে, কালো বেণী দুলিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে চৌকাঠে। জানি না, কখন সে এলো আমার আলিঙ্গনে, কখন আমার ওষ্ঠ-নৌকো তার ঠোঁটের মোহনায় হয়ে উঠলো মাতাল। সে, যুবতী, লজ্জারক্তিম, কোনো কথা না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। তার শরীরের ঘ্রাণ ক্ষণিকের জন্যে জেগে রইলো হাওয়ায়। ঘোর কেটে যাওয়ার পর দেখি, মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে একটা সোনার দুল। ওর কানের দুল। সেই নিঃসঙ্গ দুল কুড়িয়ে নিলাম। ঝোড়ো মুহূর্তে সেই দুল তার কান থেকে খসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর সেই স্বর্ণলতিকা তাকে ফিরিয়ে দিতে গেলাম। হারানো দুল ফেরত পাওয়ার মতো অবস্থা হয়তো তার ছিলো না তখন। সেই সকালবেলায় তার সমস্ত সত্তায় লজ্জা একটা সঞ্চারিণী স্বর্ণলতিকার মতোই কাঁপছিলো ঘন ঘন। সেই মুহূর্তে আমরা দু'জনই নির্বাক, নিশ্চল। প্রায় একযুগ আগের এই ঘটনা, অথচ মনে হচ্ছে যেন গতকাল জন্ম হয়েছিলো এই দৃশ্যের। স্মৃতির মায়াঞ্জন লুপ্ত করে দেয় সময়ের ব্যবধান।

স্মৃতি আছে বলেই তো বেঁচে আছি। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিলাম, স্মৃতি ছাড়া শিল্পীদের তো একদণ্ড চলে না। কেননা, স্মৃতি শিল্পীর হাতে তুলে দেয় সেই অলৌকিক চাবি যা দিয়ে খোলা যায় শিল্পের ভুবনের রূপালি দরোজা। রিলকে কোনো এক তরুণ কবির উদ্দেশে লেখা একটি পত্রে বলেছেন, 'মনে করো তুমি কারাগারে আছো, যার দেয়াল পেরিয়ে পৃথিবীর কোনো শব্দই তোমার চেতনায় পৌঁছায় না—তবু, তবুও নিয়ত তোমার শৈশব তোমার সম্পদ হয়ে নেই, সেই মূল্যবান, রাজকীয় ঐশ্বর্য, স্মৃতির সেই রত্নভাণ্ডার?'

হ্যাঁ, স্মৃতির রত্নভাণ্ডার জ্বলজ্বল না করলে শিল্পী কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েন। শৈশবস্মৃতি না থাকলে শাগাল কি আঁকতে পারতেন তাঁর অমন আশ্চর্য সুন্দর স্মৃতিবহ চিত্রাবলী, সেসব স্বপ্নমেদুর রহস্যঘন নানা রঙের ছবি? আঁদ্রে মলরো অবশ্য তাঁর

এ্যান্টি-মেমোরিয়ার্সে নিজের শৈশব স্মৃতিকে খারিজ করতে চেয়েছেন তাঁর ছেলেবেলা মজাদার নয় বলে। কিন্তু তবু সেই বইয়ের বেশ কিছু পাতা জুড়ে রয়েছে শৈশব-স্মৃতির আলো-আঁধারি। কি নিপুণ ভঙ্গিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নানা ঘটনা, কথকতার মাহাত্ম্যে আমাদের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকবে মলরোর পিতামহের সেই বুড়োটে তোতা পাখির কথা, সে তার প্রভুর মৃত্যুর পরেও আওড়াতো 'ডু ইয়র ডিউটি, ডু ইয়র ডিউটি।' এই বাক্যটি সে শিখেছিলো তার প্রভুর কাছ থেকেই।

শৈশব-স্মৃতি না থাকে আমরা কি বঞ্চিত হতাম না বহু আলোকসামান্য কবিতা পাঠের সুযোগ থেকে? আমরা কি পেতাম 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিংবা 'পথের পাঁচালী'র মতো উপন্যাস? আমাদের অনেকের পক্ষেই স্মৃতির অসংলগ্ন ভগ্নাংশমালাকে জড়ো করে কোনো চিত্তহারী চিত্র আঁকা সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না কোনো ভিলানেল কিংবা রঁফেল রচনা করা। কিন্তু তবু স্মৃতির রত্নভাণ্ডারে আমাদেরও হাত বাড়াতে হয়, সেসব রত্নরাজি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে হয়। তা না হলে জীবন তো একটা শুকনো কাঠের টুকরো হয়ে উঠবে। আমাদের চাই সজীব ডাল, যেখানে থাকবে সবুজ পাতার ভিড়, রোদ আর পাতার গলাগলি, দুধের জ্যোৎস্নার মোহন ক্রীড়া, বাতাসের দুলুনি আর পাখির গান। তা না হলে কি নিয়ে বাঁচবো আমরা? কি নিয়ে ভাসবো অকূলের ভেলায়? পাল নেই, দাঁড় নেই, খাদ্যের টিন নেই, কিছুই নেই যে-ভেলায়, সেখানে অন্তত স্মৃতির রত্নভাণ্ডারটি থাক। সেই রত্নভাণ্ডারের বর্ণচ্ছটায় আলোকিত হবে সামনের পথ, দিগন্ত-ছাওয়া কুজ্ঝটিকার জাল যাবে ছিঁড়ে, দূরে জেগে উঠবে পাখির পদচিহ্ন-আঁকা মাটি। যে পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলাম সে হয়তো ফিরবে, ঠোঁটে নিয়ে আসবে একখণ্ড শ্যামলিমা।

*২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩*

## গালিবের কাব্যমৃগ

**একটি ধ্বংসস্তূপের ওপর বিদায়ী সূর্যের আলোর বিনম্র গজল গুঞ্জরিত হচ্ছে এক সীমাহীন শব্দহীনতায় আর তিনি নিরীক্ষণ করছেন সেই বিষণ্ন শোভা। যখন মির্জা আসাদুল্লা খান গালিবের কথা ভাবি, তখন, কেন জানি না, এই চিত্রটি ভেসে ওঠে আমার সামনে, বার বার। আমি মোহাবিষ্ট হয়ে দেখি সেই দীর্ঘদেহী, কান্তিমান পুরুষকে যিনি তাঁর সাধনায় উর্দু কবিতায় শরীরে অর্পণ করেছেন অসামান্য কান্তি। আমি গালিবের কবিতা খুব বেশী পড়ি নি। কিন্তু তাঁর যে ক'টি কবিতা পাঠের সৌভাগ্য আমার হয়েছে তার প্রত্যেকটিই আমাকে যুগিয়েছে অশেষ আনন্দ। উর্দু ভাষার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, এমন দাবি আমি করি না। তবে উর্দু আমার একেবারে গ্রীকও নয়। উর্দু ভাষা একটু-আধটু বোঝার ক্ষমতা রাখি। অবশ্য এই সঙ্গে এটাও স্বীকার করা সমীচীন যে এই সামান্য ক্ষমতা নিয়ে আর যাই হোক গালিবের গজল পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যেহেতু ছোটবেলাতেই জেনেছি যে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, তাই খঞ্জ হয়েও গিরি-**

লঙ্ঘনের দুঃসাহসে মেতেছি। অর্থাৎ আধো-আধো উর্দু-জ্ঞান সম্বল করেই ছুটেছি গালিবের কাব্য মৃগের পেছনে। গালিবের কবিতা আমার হৃদয় হরণে ব্যর্থ হলে নিশ্চয়ই আমি এই অসম্ভব মৃগয়ায় মজতুম না।

মূলত তর্জমার তরী বেয়েই আমি গালিব-কাব্যের মোহনায় পৌঁছুতে চেষ্টা করেছি। মনিরউদ্দিন ইউসুফকে ধন্যবাদ, তাঁর কল্যাণে সক্ষম হয়েছি গালিবের কিছু কবিতার রসাস্বাদনে। তাঁর অনুবাদে মূল কবিতার সৌন্দর্য ও সৌকর্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে এমন অসম্ভব দাবী অবশ্য মনিরউদ্দিন ইউসুফও করবেন না। তবু আমাদের কবুল করতেই হবে যে, তিনি শ্রম স্বীকার না করলে আমরা দুধের স্বাদ ঘোলেও মেটাতে অসমর্থ হতাম। শুধুমাত্র এ কারণেই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞভাজন।

গালিব কবিতা লিখতে শুরু করেন খুব অল্প বয়সে। মাত্র দশ কি পনেরো বছর বয়সে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর হাতেখড়ি। শৈশবেই তিনি তাঁর পিতাকে হারিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে পিতামহের তত্ত্বাবধানেই আরম্ভ হয় তাঁর জীবনযাত্রা। আমীরের পুত্রের মতোই ভরণপোষণ চললো গালিবের, ক্রমশই তিনি হয়ে উঠলেন আলালের ঘরের দুলাল। নানা ধরনের খেলা খেলে এবং ঘুড়ি উড়িয়েই কাটে সারাবেলা। প্রায় বখে যাওয়া বালকের জীবনযাপন করেও যে তিনি জ্ঞানের বুড়ি ছুঁতে পেরেছিলেন, এ এক চরম বিস্ময়। তাঁর ভবিষ্যতের ভাবনা আমল না দিয়েই তাঁকে মাত্র তেরো বছর বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হলো। এক মজাদার পত্রে গালিব এই বিবাহ ব্যাপারটিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর ভাগ্যে জুটেছিলো পদ-বেড়ীর পদবী। গালিবের বিবাহ-জীবন বড়ো সুখের হয় নি। এই বরেণ্য কবির একজন আধুনিক জীবনচরিতকার অবশ্য বলেছেন যে গালিব তাঁর গৃহিণীকে পছন্দই করতেন। কিন্তু একথাও সত্যি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মেজাজমর্জির মধ্যে ছিলো দুস্তর ব্যবধান। গালিব ছিলেন মদিরা বিলাসী এবং তাঁর চোখে টাকাকড়ি ছিলো খোলামকুচি। এমন কর্তাকে নিয়ে ঘর করা অধিকাংশ গৃহকর্ত্রীরাই সাধ্যাতীত। গালিবের স্ত্রী তাঁকে মদ ছাড়ানোর বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। যিনি মদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি কি করে দূরে সরিয়ে রাখবেন সুপারাত্র? উমরাও বেগম, কবিপত্নী, স্বামীর বাসনকোসন আলাদা করে দিয়েছিলেন। কেন, তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। স্বামীকে তাঁর নিজের হাতে ছেড়ে দিয়ে উমরাও বেগম আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরলেন ধার্মিকতার খুঁটি। এতদসত্ত্বেও গালিব সত্যি সত্যি বিবাহকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলে মনে করতেন—একথা ঠিক নয়। তাঁর এই উক্তিকে একটা রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। রসিকতার খাতিরে তিনি বহু মজাদার মন্তব্য করতেন বেলা-অবেলায়। এমন কি আকণ্ঠ দেনায় ডুবে, চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও তিনি অনেক সরস বাক্য উচ্চারণ করতেন। একবার খোরপোশের জন্যে গালিব তাঁর কিছু পোশাক-আশাক বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালেন, অন্যে রুটি খেয়ে বাঁচে আর আমি বেঁচে আছি নিজের কাপড়-চোপড় খেয়ে।

গালিবের মজাদার কথাবার্তা শোনার লোভে কবির বাসভবনে তাঁর বন্ধু-বান্ধব এসে আড্ডা জমাতেন সোৎসাহে। ঘুরে বেড়ানো গালিবের ধাতে ছিলো না। ভ্রমণ বিমুখ এই বাক্যশীল, নাগরিক কবি বাসায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার স্রোতে গা ভাসাতে প্রচুর আনন্দ পেতেন। গালিব ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল— তাঁর কাছে বন্ধুত্বের স্থান ছিলো খুবই উঁচুতে। বন্ধুদের সঙ্গে পত্রালাপে তিনি কখনো কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা সাজার চেষ্টা করেন নি। মেতে উঠেন নি গুরুত্বপূর্ণ জনসেব্য রাজনৈতিক আলোচনায়। বন্ধুদের মধ্যে বিশ্বাস ও মতবাদের মিল থাকতেই হবে—এমন কোনো ধারণা ঠাঁই পায় নি তাঁর মনে। মানবিক সম্পর্কের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং মানুষকে মানুষ বলেই গ্রহণ করতে শিখেছিলেন গালিব। মানুষের মধ্যে ধর্ম, জাতি কিংবা গোত্র সন্ধানে তিনি কখনো ব্যস্ত হয়ে পড়েন নি। পড়েন নি বলেই তিনি নিজে ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। স্মর্তব্য, প্রকৃতি তাঁকে কখনো গভীরভাবে আকর্ষণ করে নি; তাঁর কাব্যে প্রকৃতি এসেছে মানবের পটভূমি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মানবই তাঁর কবিতার কেন্দ্রবিন্দু। এই যে নিসর্গ বন্দনায় তিনি কখনো উচ্ছ্বসিত হলেন না, এটা তাঁর স্বকীয় প্রকৃতির সঙ্গে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ, সন্দেহ নেই।

কবি বেদিলকে গালিব গুরু হিসেবে স্বীকার করেছিলেন। এই অসামান্য শিষ্য তাঁর গুরুর গুণকীর্তনে ছিলেন অকুণ্ঠ। নিজের বংশগৌরব সম্পর্কে গালিব ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, কারুর কাছে মাথা নোয়ানোর মানসিকতা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি।

তিনি এক সময় সরকারী চাকরি পেয়েছিলেন। কর্মস্থলে তিনি গিয়েছিলেন পালকিতে চড়ে। নিয়োগকর্তা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অফিসকক্ষ ছেড়ে আসেন নি বলে গালিব সেই চাকরি গ্রহণ করেন নি শেষ পর্যন্ত। একটি সুন্দর অহংকারকে তিনি লালন করেছিলেন, অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতের মতো। তাঁর চরিত্রে মোগলী সূর্যাস্তের করুণ আভা সঞ্চারিত হয়েছিলো হয়তো-বা। যা হোক, এই শোভন অহঙ্কার কিন্তু বেদিলের কাব্য মালঞ্চে প্রণতি হয়ে ফুটে উঠতো স্নিগ্ধ সুষমায়। বুঝি তাই বেদিলের কাব্যকে জেনেছিলেন সমুদ্ররূপে এবং তার পাশে তাঁর নিজের কবিতাকে মনে হতো শিশির বিন্দু মতো। বিস্মিত হতে হয় গালিবের এই গুরুদক্ষিণা দেখে।

*২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩*

## বঙ্গীয় শব্দকোষ

অবশেষে হাতে এলো হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। আমি সর্বপ্রথম এই শব্দকোষের প্রতি আকৃষ্ট হই বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি পড়ে। একবার বুদ্ধদেব বসুর অনেকগুলো বই চুরি হয়ে যায়। সে-সব চোরাই বইয়ের মধ্যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'ও ছিলো। অপহৃত গ্রন্থগুলো ফেরত পাওয়ার জন্যে

বুদ্ধদেব বসু আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন সংবাদপত্রে। ফুটপাত থেকে যদি উৎসাহী পাঠকবৃন্দ বুদ্ধদেবের সে-সব গ্রন্থ কিনে থাকেন, তবে তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে হলেও শ্রী বসু হৃত গ্রন্থাবলী পুনরুদ্ধার করতে প্রস্তুত— এ-কথা বলা হয়েছিলো সেই পত্রে। বিশেষ করি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষটি ফিরে পাওয়ার জন্যে বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর পরিমল গোস্বামীর 'যাঁদের দেখেছি' নামক গ্রন্থে পড়ি পণ্ডিতপ্রবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সেই বিখ্যাত অভিধানের কথা। সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছরের নিরলস সাধনার ফল এই বৃহদাকার অভিধান। পাশ্চাত্যে এ ধরনের গ্রন্থ বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বিত শ্রমেই রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বাংলাভাষার সর্ববৃহৎ অভিধানটি রচনা করেছিলেন নিঃসঙ্গ সাধনায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি এই শব্দকোষ রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, নিজেকে ক্ষইয়ে দিয়েছিলেন এক কঠোর তপস্যাতুল্য শ্রমে। তাঁর তপস্যা সার্থক হয়েছে; কেননা তিনি এমন একটি অভিধান রেখে গেছেন বাংলাভাষীদের জন্যে যার রচয়িতা হতে পারলে পৃথিবীর যে-কোনো অভিধানকারই গর্বিত বোধ করবেন।

*৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩*

## রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুর মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন অন্য এক জ্ঞানতাপস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার এটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাঁকে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ বলে মনে করতেন তাঁর বিষয়ে আজকের পাঠকগোষ্ঠী কতটুকু আগ্রহী। আমার আশঙ্কা, অনেকে হয়তো রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর নামও শোনেন নি। কিংবা শুনলেও তাঁর রচনাপাঠে উৎসাহিত বোধ করেন নি হয়তো। অথচ বাংলা মননশীল সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অবদান অবিস্মরণীয়। এই বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের রচনাবলী পাঠ না করলে তাঁর সুকৃতির কিছু হেরফের হবে না, আমরাই বঞ্চিত থেকে যাবো। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন—এসব বিচিত্র বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো অগাধ। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন না শুধু মাত্র গ্রন্থকীট, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা বিলিয়েও গেছেন অপরূপ দাক্ষিণ্যে।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'আকাশের গল্পের' ভূমিকায় লিখেছেন, 'পাঠশালার বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একেবারেই নাই কি? পঞ্চাশ বছর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাও নাই কি? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ মনস্বীরা যাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এমন নিষ্ফল হইল কেন?' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার দৈন্যে পীড়িত হয়েই তিনি এমন প্রশ্নাকুল

হয়েছিলেন। এই দৈন্য মোচনের গুরু দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করেতে হয়েছিলো। বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে আমাদের একটা ভীতি আছে। বিজ্ঞানের নুন খেতে ভালোবাসি, তার গুণও গাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় আমরা অনেকেই আগ্রহী নই। বিজ্ঞান কাঠখোট্টা ব্যাপার বলে সে পথ মাড়াতে চাই না সহজে। অথচ বিজ্ঞান চর্চা না করলে আজকের যুগে কেউ নিজেকে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে দাবী করতে পারেন না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞানকে বাঙালী মানসের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রচুর শ্রম স্বীকার করেছেন আজীবন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলো পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য, সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিলেন। এক কথায়, অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি।

মাতৃভাষার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অসামান্য অনুরাগ ছিলো। বুঝি এজন্যেই তিনি বাংলাভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কার কামনা করেছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতি সাধনকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আনুগত্য কতো খাঁটি ছিলো তা একটি ঘটনা সপ্রমাণ করে। একবার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ার জন্যে অনুরুদ্ধ হন। তখন সেখানে ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ করাই ছিলো রেওয়াজ। কিন্তু সেই প্রথার কাছে মাথা নত করতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রাজী হন নি। দু'দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে বাংলাভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের জেদ তাঁদেরই থাকে যাঁদের আছে অসামান্য চারিত্র্যতেজ।

*৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩*

## আমার স্কুলের মাস্টারমশাই

আজকাল প্রায়শই আমার স্কুলের মাস্টারমশাইদের কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে একজনের কথা কখনো ভুলতে পারি না।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সোমের স্মৃতি এখনো আমার মনে অত্যুজ্জ্বল। তিনি ক্লাশ নাইন-টেনে আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। পড়াতেন এতই চমৎকার যে সারা পিরিয়ডে দৃষ্টি একবারও ক্লাশরুমের দরজা-জানালা ডিঙিয়ে বাইরে যেতো না। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তাঁর কথা। তিনি কখনো চেয়ারে বসতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতে ভালোবাসতেন। তাঁর পড়ানোর গুণে ব্যাকরণের মতো একটা নীরস ব্যাপারও আশ্চর্য সরস হয়ে উঠতো।

ক্লাশরুমে কোনোদিন তাঁকে চেয়ারে বসতে দেখি নি, দেখি নি ক্লাশরুমের বাইরেও। অন্যান্য শিক্ষকরা যে-ঘরে বসতেন, সে-ঘরে তাঁকে বড় একটা দেখা যেতো না। যখন

কোনো ক্লাশ থাকতো না তখন তিনি একটু আড়ালে, চেয়ারে নয়, বাক্সের মতো একটা আসনে বসে বসে বই পড়তেন। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ মানুষ। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হতো, সেই অল্প বয়সেই।

আমি ছিলাম তাঁর স্নেহধন্য। এজন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করতাম। তিনি আমাকে ক্লাশরুম বহির্ভূত অনেক কথা বলতেন। সেসব উক্তি যে কতো মূল্যবান তা আজ পদে পদে টের পাই। সত্যিকারের চরিত্রবান পুরুষ না হলে অমন কথা কেউ বলতে পারে না। তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে ছিলো এক সুশোভন, দৃঢ়, ঋজুতা। প্রকৃতপক্ষে এই দৃঢ় ঋজুতা ছিলো তাঁর চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। আমি একথা নির্দ্বিধায় বলবো, আমার মাষ্টারমশাই, চিন্তাহরণ সোমের মতো আদর্শবান শিক্ষক দুর্লভ।

আজো যখন তাঁর কথা ভাবি, দেখি তিনি আমার একরাশ স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন—সহজ, ঋজু। দেখি, তাঁর হাতে 'পাথ অব পীস' নামক একটি পাঠ্যপুস্তক। জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন। বেঁচে আছেন কি না তা-ও জানি না। ভারি জানতে ইচ্ছে করে, এখন তিনি কেমন করে কাটাচ্ছেন তাঁর দিন? যিনি আমাদের 'পাথ অব পিস' পড়াতেন, তিনি কি শান্তি পেয়েছেন পরবর্তী জীবনে। তাঁর যে পুত্রটি সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, যে পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিলো, সে কি মানুষ হয়েছে শেষ পর্যন্ত? এসব কথা আমার জানতে ভারি ইচ্ছে করে। কেমন চঞ্চল হয়ে উঠি মাঝে-মধ্যে। কিন্তু এ-ও জানি, এসব কথা আজ আমার জানার উপায় নেই আর। হয়তো কোনোদিনই জানতে পারবো না। কে বলে দেবে আমাকে সেসব কথা?

*৪ঠা মার্চ ১৯৭৩*

## সাহিত্যিক আড্ডা ও কবিকণ্ঠ

গ্রীষ্মসন্ধ্যা। নিসর্গ পরিবেষ্টিত এক রেস্তোরাঁয় আড্ডায় মেতে উঠেছিলাম আমরা চারজন। ফজল শাহাবুদ্দীন, আলমগীর কবীর, বেলাল চৌধুরী এবং আমি। বেলাল চৌধুরী আজই এসেছেন কলকাতা থেকে, এক দশক পরে। তিনি কলকাতার অনেক কথা শোনালেন, খোঁজখবর নিলেন এখানকার অনেকের। বেলাল চৌধুরী কবিতা, গল্প লেখেন। বললেন, উপন্যাস লিখছি আজকাল। তিনি এক সময় কলকাতার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদন করতেন। চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক আলমগীর কবীর তাঁর দ্বিতীয় ছবি নিয়ে ব্যস্ত। কবি ফজল শাহাবুদ্দীন আলমগীর কবীরের ছবির জন্য গান লিখছেন। কবীরের কথা শুতে শুনতে মনে হলো, আমি শুনছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজী সংবাদভাষ্য। অতি পরিচিত এই কণ্ঠ, যে কণ্ঠ সেই দারুণ দুর্দিনে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে কোনো কোনো প্রহরে।

এবার কবিকণ্ঠ আরো মনোযোগ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে, ফজল শাহাবুদ্দীন জানালো। মনে পড়ে, আমরা দু'জন প্রায় আঠারো বছর আগে 'কবিকণ্ঠ' প্রকাশ করেছিলাম। বাংলাদেশের প্রথম কবিতা পত্রিকা। সেই পত্রিকার খুঁত ছিলো অনেক, তবু তার উপস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো সেদিন। অনেকে প্রশংসা করেছিলেন, অনেকে নিন্দা দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন কবিকণ্ঠকে। আজো আমরা সেই উৎসাহী পাঠকদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

প্রথম সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পরেই 'কবিকণ্ঠ' স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। 'কবিকণ্ঠ' আবার সোচ্চার হলো এক দশক পরে, ১৯৬৭ সালে। সুখের বিষয়, সেবারও প্রচুর সাড়া তুলেছিলো কবিকণ্ঠ। কবিতার অনুরক্ত পাঠক এবং কবি সম্প্রদায় আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই সঙ্গে বলেছিলেন, 'দেখবেন, কবিকণ্ঠের তৃতীয় সংকলনটি যেন আবার দশ বছর পরে প্রকাশিত না হয়।'

আমার কথা দিয়েছিলাম এখন থেকে 'কবিকণ্ঠ' নিয়মিত প্রকাশিত হবে। কিন্তু আমরা কথা রাখতে পারি নি। ফজল শাহাবুদ্দীনের কর্মক্ষমতা প্রচুর, এতদসত্ত্বেও 'কবিকণ্ঠ' নীরব থেকে গেল। এজন্যে অবশ্য আমি কিছুটা দায়ী। আমার আলস্য, 'কবিকণ্ঠের' পথে একটা কাঁটা—এই কাঁটা তুলে না ফেললে নবপর্যায়ে 'কবিকণ্ঠের' আত্মপ্রকাশের তারিখ পিছিয়ে যাবে। 'কবিকণ্ঠের' খামখেয়াল সম্পর্কে মনে পড়ছে, হায়াৎ মামুদ তাঁর একটি প্রবন্ধে মজাদার টিপ্পনি কেটেছিলেন। তাঁর ঠাট্টা আমাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা সেটি উপভোগ করেছিলাম।

'কবিকণ্ঠ' আবার প্রকাশিত হবে ভাবতেই ভালো লাগছে। যদি কবিকণ্ঠকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্যিক আড্ডা জমে ওঠে তবে ভালো হয়। একটি আড্ডা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এতদিন পর আড্ডা জমবে তো? কে জানে।

*৩১শে মার্চ ১৯৭৩*

## সার্তর আত্মচরিত

সার্তর আত্মচরিত 'লে মটস' আবার পড়লাম। 'লে মটস' অর্থ শব্দাবলী। একজন লেখকের আত্মজীবনীর নাম এর চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে? সার্তর তাঁর আত্মচরিতের এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি কোনোদিন বিশ্বাস করি নি আমার কোনো প্রতিভা আছে। আমার একমাত্র চিন্তা নিজেকে রক্ষা করা—হাতে বা পকেটে কিছুই না নিয়ে শুধু কাজ আর আন্তরিকতা দিয়ে। আমার এই পথ নির্বাচন আমাকে কারুর ওপরেই জায়গা করে দেয় নি। কোনো যন্ত্র, কোনো অস্ত্র ছাড়াই আমার সমগ্র অস্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি।' বলা বাহুল্য একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই নিষ্কম্প কণ্ঠে বলা সহজ যে তাঁর প্রতিভা নেই। যাদের ক্ষমতায় গলদ, তারাই নিজেদের প্রতিভার কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হাটে-ঘাটে প্রচার করে থাকেন। যিনি এসব কথা অনায়াসে

বলতে পারেন, স্বাধীনতা রক্ষা অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার বাসনা প্রকাশ করেন দ্বিধাহীন চিত্তে, শুধু তিনিই পারেন নিজের মধ্যে সেই পবিত্র আগুন সঞ্চয় করে রাখতে, যার দীপ্তি পুড়িয়ে ফেলে ক্ষুদ্রতার আবর্জনা, সস্তা খ্যাতি ও প্রলোভনের জঞ্জাল। শুধু তিনি পারেন নোবেল পুরস্কারের সাড়া কাটাতে। 'লে মটস'-এ সার্তরের জীবনের প্রথম বারো বছরের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিভাবান লেখকের আত্মচরিত পড়ার ঔৎসুক্য অনেকেরই থাকে—থাকাটা স্বাভাবিক। বিশেষত সেই লেখক যদি হন সার্তর তাহলে তো কথাই নেই। এক অভূতপূর্ব সাড়ায় জেগে ওঠে পাঠকগোষ্ঠী। তাই 'লে মটস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আত্মচরিতটি কেনার ধুম পড়ে যায়। এর আগে কোনো আত্মকথা এত বেশী বিক্রি হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

অবশ্য বইয়ের কাটতির ওপর কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল নয়। সেরা লেখকরা জনপ্রিয়তা যেমন কামনা করেন, তেমনি তাকে ডরান দুঃস্বপ্নের মতো। কেননা, জনপ্রিয় গ্রন্থের সারবত্তা সম্পর্কে সুধী সমাজ প্রায়শই সন্দেহপ্রবণ হয়ে থাকেন। যে বই বাজারে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিলুট লেগে যায় তার ভালোত্বটুকু সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এমন গ্রন্থ কালেভদ্রে রচিত হয়, যা যুগপৎ ভালো এবং জনপ্রিয়। তবে সুখের কথা সার্তর সাধারণত রেখে ঢেকে কিছু বলেন না। যিনি বেজন্মা হওয়াটা গৌরবের বিষয় মনে করেন এবং নিজে 'আধা বেজন্মা' (সার্তরের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে) বলে দুঃখিত তিনি যে অসাধারণ স্পষ্টবাক, সে তো জানা কথা। জ্যঁ জেনে বেজন্মা বলে সার্তর তাঁকে ঈষৎ ঈর্ষা করেন, এ তথ্য আমরা 'লে মটস'-এর রচয়িতার জবানীতেই জেনেছি। ঠোঁটকাটা ভাষায় সার্তর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'জ্যঁ বাতিস্ত (সার্তরের পিতা)-এর মৃত্যু আমার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর ফলে আমার মা সংসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হন আর আমি খুঁজে পাই আমার মুক্তি।' অর্থাৎ পিতার অকালমৃত্যুতে তিনি মোটেই দুঃখিত নন। উপরন্তু পিতৃ বিয়োগ তাঁকে মুক্তি দিতে পেরেছে বলে তিনি মৃত পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ। বলা অনাবশ্যক, এ ধরনের উক্তি যার তার মুখে সাজে না এবং যে-সে এ রকম প্রথাবিরুদ্ধ কথা বলতেও পারে না। এমন উক্তি করার জন্যে যে সাহসিকতার প্রয়োজন তা দুর্লভ। শুধু মাত্র একজন প্রতিভাবান লেখকের সাহসিকতার নিদর্শন হিসেবেই সার্তরের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য নয়, ওতে কিছুটা সত্য ও নিহিত আছে। কেননা, অধিকাংশ পিতাই সন্তানকে নিজের ধাঁচে গড়ে তুলতে চান, নিজের ব্যক্তিত্বকে চাপিয়ে দেন পুত্রের ওপর। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের নিজস্ব ব্যক্তিত্বটুকু বিশকিত হতে পারে না। পিতার ব্যক্তিত্বের দাসত্ব করেই মানব জন্ম ধন্য করে পিতৃতন্ত্রের সেসব উৎপীড়িত, অসুখী প্রজা।

সার্তর পিতৃ বিয়োগের মধ্যে নিজের মুক্তি খুঁজে পেলেও তাঁর শৈশব একেবারে পুরুষ-প্রভাব বর্জিত হতে পারে নি। সার্তর বলেছেন, তাঁর শৈশব আবর্তিত হয়েছে একটি

পুরুষ ও দুটি নারীকে কেন্দ্র করে। তাঁরা হলেন সার্তর মাতামহ, মাতামহী ও মা। চার্লস সোয়াইৎজার (সার্তর মাতামহ) নিঃসঙ্গ ছিলেন বলেই নাতিকে নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন এবং নাতির পড়াশোনার ঝোঁক লক্ষ্য করে গর্ববোধ করতেন। মাতামহের মূল্যবান গ্রন্থাগারে ছিলো সার্তর অবাধ গতি। সেই গ্রন্থাগারে তিনি গড়ে তুললেন এক নিজস্ব জগৎ। মাতামহের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি এবং পারেন নি বলে তিনি মর্মাহত নন। বরং আত্মচরিতে মাতামহের প্রতি তাঁর অনুরাগ নানা জায়গাতেই উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে।

মাতামহের গ্রন্থাগারে বই ছিল প্রচুর। সেসব বই যখন তখন সার্তর নাড়াচাড়া করতেন, পড়তেনও। নানা ধরনের বইয়ের বিচিত্র জগতে ডুবে যেতো সাত-আট বছরের বালক। সব রকম বই তাঁর পড়া চাই। একদিন পুত্রের হাতে ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' উপন্যাসটি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন সার্তরের জননী। একটি বালকের পক্ষে ও ধরনের বই পড়া বিস্ময়কর ঘটনা বৈ কি। শুধু বই পড়েই তৃপ্ত রইলেন না সার্তর, তাঁর মনে জেগে উঠলো লেখক হওয়ার দুর্জয় বাসনা। লেখা লেখা খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। কিন্তু লিখতে চাইলেই কি চট করে কিছু লেখা যায়? রাতারাতি যুগান্তকারী কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, বিশেষত একজন বালকের পক্ষে। তাই শুরু হলো নকলনবিশীর পালা। অর্থাৎ মাতামহের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাবলীর নানা কাহিনীর সমাবেশ গড়ে তুললেন এক কিম্ভূতকিমাকার কথাসরিৎ সাগর। সেই জগাখিচুড়ি সম্পর্কে পরিহাসচ্ছলে সার্তর যা-ই লিখুন না কেন, তাঁর সেই 'স্টিল নিব'-এর গুণগানে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ আজ আশ্চর্য রকম মুখর। এবং সেই 'স্টিল নিবে'র কল্যাণেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছেন।

*১৪ই জুন ১৯৭৩*

## মধুসূদনের সমাধি

আমার খুব ইচ্ছে করে সেই বুনো ঘাসবহুল সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াই কিছুক্ষণ, পাঠ করি সেই নিরভিমান সমাধিলিপি—"দাঁড়াও পথিকবর। জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল/এ সমাধিস্থলে (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম)/মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন।/যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে/জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি/রাজ নারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী।"

ভাবতে অবাক লাগে মাইকে মধুসূদন দত্ত, যিনি যৌবনের ঊষাকালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে আপাদমস্তক সাহেব বনে গিয়েছিলেন, যিনি বাংলা কবিতাকে তরজাওয়ালাদের দখল থেকে সরিয়ে এনে দান করেছিলেন আধুনিক স্বত্ব, যিনি বাগদেবীর বরপুত্র, যিনি

বাংলা কাব্যে বহু নতুন প্রকরণ আমদানী করেছিলেন, সেই পরাক্রান্ত পুরুষ তাঁর সমাধিলিপি রচনায় কি অসামান্য বিষয় প্রকাশ করে গেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ছিলো তাঁর নখদর্পণে, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তিনি। ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা করে প্রশংসিতও হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডী' সম্পর্কে বলা হয়েছিলো, এ গ্রন্থে এমন বহু জায়গা আছে যা বায়রন কিংবা স্কট নিজের বলে স্বীকার করতে লজ্জিত হতেন না। গোড়ার দিকে সাহেবিয়ানায় মজেছিলেন তিনি। কিন্তু সমাধিলিপিতে তাঁর খ্রীষ্টান নাম 'মাইকেল' পরিহার করেছিলেন। যে কবি একদা বাংলা ভাষায় কিছু লিখবেন না বলে স্থির করেছিলেন, মাদ্রাজে বসবাসকালীন বংলা ভাষা ভুলতে বসেছিলেন, মিল্টনকে দেবতা বলে মনে করতেন, তিনি কিন্তু তাঁর কবরের পাশে তাদের দাঁড়াতে অনুরোধ করেছেন ক্ষণকাল যাদের জন্ম বঙ্গাদেশে। দীর্ঘশ্বাসের মতোই তাঁর এই আকুল আবেদন। তিনি যে ব্যারিস্টার ছিলেন, ছিলেন ইয়ং বেঙ্গালের এ উজ্জ্বল পুরুষ একথা তিনি কোনো পথিকবরকে জানাতে চান নি, তিনি পরিচিত হতে চেয়েছেন কবি হিসেবে শুধুই কবি বলে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাঙালী জাতি কবি হিসেবেই স্মরণ করছে, করবে। যতদিন বাংলা কবিতা বেঁচে থাকবে ততদিন মধুসূদনের ভক্তমণ্ডলীর অভাব হবে না। একথা ঠিক, কোনোকালেই তাঁর কাব্যতীর্থে বেসামাল ভিড় হবে না; কিন্তু সেই তীর্থ সলিলে যারা স্নানার্থী তাঁরা অবশ্যই হবেন সুনির্বাচিত। লজ্জার বিষয়, আজকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া মধুসূদনের রচনাবলী সচরাচর পঠিত হয় না, এমনকি কবিকুলও মাইকেল চর্চায় উৎসাহী নন তেমন। তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী লেখকের নাম সংকীর্তনে আমাদের জিহ্বা আদৌ আড়ষ্ট হয় না, অথচ মধুসূদনের কাব্য সংগ্রহের পাতা ওল্টাতে আমরা সীমাহীন আলস্য বোধ করি। যিনি আমাদের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য উপহার দিয়েছেন, যার লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে বীরাঙ্গানার মতো কাব্যপত্র, বহু উজ্জ্বল চতুর্দশপদী, যিনি বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, তাঁর কাব্য সম্ভারের ঐশ্বর্য থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে থাকি— এ যে আমাদের কি মূঢ়তা তা আমরা ভেবেও দেখি না একবার।

অবশ্য মধুসূদনের অনুরক্ত পাঠক সে কালে ছিলো, একালেও সংখ্যায় নগণ্য তাঁরা। মধুসূদনের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। যদিও তাঁদের পক্ষে তাঁর অবদানের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের অসমান্যতা হৃদয়ঙ্গাম করা সম্ভব ছিলো না, তবু মধুসূদনকে একজন প্রতিভাধর কবি হিসেবে তাঁরা শনাক্ত করেছিলেন ঠিকই। এই শনাক্তীকরণে তাঁরা কোনো কার্পণ্য করেন নি। পরবর্তীদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত অনেকেই মধুসূদনের আলোকসামান্য কীর্তি সম্পর্কে উদ্দীপক আলোচনা তো করেছেনই, নিজেরাও উপকৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কৈশোরেই নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন মাইকেল ঘাতকরূপে। এক ঝাঁঝালো প্রবন্ধ লিখে তরুণ রবীন্দ্রনাথ মদুসূদনের কবি খ্যাতির প্রতি হেনেছিলেন প্রবল আঘাত। সেই

প্রবন্ধে তারুণ্যের স্পর্ধা যতটা প্রকাশিত হয়েছিলো, পরিণত কাব্যবুদ্ধি ততটা নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই কৈশোরিক পাপ স্খলন করেছিলেন আরেকটি প্রবন্ধ লিখে। অন্য কিছুর তাড়নায় নয়, মধু-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়েই তিনি সানন্দে তাঁর মত পাল্টেছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার শ্রী মধুসূদন বন্দনায় ছিলেন বরাবরই অনলস। তাঁর মাইকেল ভক্তি শুধুমাত্র ওষ্ঠসেবা কিংবা একটি কি দুটি ছুটকো প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ নয়, তা পরিব্যাপ্ত একটি বৃহদাকার সমালোচনা গ্রন্থে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অবস্য মধুসূদন দত্ত বিষয়ে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি, সেই মহাকবি সম্পর্কিত তাঁর উক্তি মনস্বিতায় ভাস্বর। তিনি নিঃসন্দেহে মধুসূদনের গুণমুগ্ধ, কিন্তু তাঁর দোযত্রুটি সম্পর্কেও সচেতন। মধুসূদনের শব্দ সম্ভার থেকে কোনো কোনো দরকারী শব্দ তিনি আহরণ করেছিলেন তাঁর কাব্য শরীরের পুষ্টির জন্যে। কে না জানে সুধীন দত্ত 'সুর-সুন্দরী', 'অনীকিনী' ইত্যাদি শব্দ মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পেয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় স্থাপত্যসুলভ ঘনবন্ধ দৃঢ়তা অংশত অগ্রজ কবির কাব্য পাঠের সুফল, একথা বললে অত্যুক্তি হবে কি?

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তারা নিশ্চয়ই তাঁর কবিতায় নাটকীয়তা লক্ষ্য করেছেন। জানি না, এই নাট্যগুণ মধুসূদনের মাধ্যমেই তাঁর ওপর বর্তেছিলো কিনা। যা হোক, বঙ্গ সাহিত্যে নাট্যে কাব্যের প্রবর্তক হিসেবেও যে মধুসূদন স্মরণীয় হতেন, তার প্রমাণ 'পদ্মাবতী' নাটকেই বিদ্যমান। আজকাল কথনছন্দের কথা ওঠে প্রায়শই। কথনছন্দের প্রতি আধুনিক কবিদের পক্ষপাত প্রবল। এবং এই কথনছন্দে মধুসূদন যে বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সেকালে তা আজকের কবির পক্ষেও উপকারী নিশ্চয়ই। এখানে মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গের রাবণের খেদোক্তি স্মরণীয় :

"কুসুম-দাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে/উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সমরে আছিল/এ মোর সুন্দরপুরী। কিন্তু একে একে/শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী।/নীরব রবাব, বীণা সুরজ, মুরলী;/তবে কেন আর আমি থাক রে এখানে?/ কার রে বাসনা, বাস করিতে আঁধারে।"

বার বার 'রে' শব্দের ব্যবহার আজকের দিনে বেখাপ্পা শোনালেও এই পঙ্‌ক্তিমালায় যে নাটকীয় উপাদান বিদ্যমান তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এই অসামান্য কবির শেষ জীবন কিন্তু সুখের হয় নি। বাংলা কাব্যে যাঁর অবদান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে, প্রাক-রবীন্দ্র যুগের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তিনি এক নিদারুণ নিঃস্বতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন হাসপাতালে। একথা স্মরণে মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছে হয়, সেই বুনোঘাসবহুল সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াই ক্ষণকাল এবং কোনো ভজনালয় থেকে প্রদীপ চুরি করে এনে তা জ্বালিয়ে দিই দত্তকুলোদ্ভব কবির সমাধিতে।

*২৮শে জুন ১৯৭৩*

# তিতাস একটি নদীর নাম

তখন 'সাওগাত' অফিসে আড্ডা দিতাম। আমাদের সেই সওগাত কেন্দ্রিক আড্ডাই সেকালে ঢাকা শহরে রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। সেই আড্ডাতেই প্রথম শুনলাম স্বর্গত অদ্বৈতমল্ল বর্মণের কথা। তিনি এক সময় সওগাতে কাজ করতেন। দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই তিনি হেঁটে গেছেন বারবার, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর মনে বিস্তার করতে পারে নি দৈন্যের মালিন্য। চরম দারিদ্রের মধ্যেও তিনি ছিলেন সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী; সব প্রতিকূলতা উজিয়ে তিনি লিখেছেন 'তিতাস একটি নদীর নামে'র মতো উপন্যাস। দুঃখের বিষয় উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ এখনো আমার হয় নি।

উপন্যাসটি পড়ি নি কিন্তু দেখেছি ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এই অসামান্য চিত্র পরিচালক অদ্বৈতমল্ল বর্মণের উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে আমাদের সবার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাণিজ্যসফল নয়, কিন্তু চলচ্চিত্র হিসেবে অসাধারণ। এই ফিল্মটি বেশীদিন চলেনি। বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই একে বিদায় নিতে হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে। আমরা দর্শকদের চলচ্চিত্র রুচির শোকাবহ পরিচয় পেয়ে বিলাপ করতে পারি। এমন কি দোষীও করতে পারি তাদের কিন্তু তাতে কি লাভ? তাদের রুচি বিকাশের জন্যে আমরা কি কোনো কিছু করতে পেরেছি এ যাবৎ? শুধু পয়সা লোটার ফিকিরে বহু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী একের পর এক শস্তা রদ্দি ফিল্ম তৈরী করে গেছেন, ভালো ফিল্ম তৈরীর কোনো চেষ্টাই করেন নি। কেউ কেউ অবশ্য অত্যন্ত ক্ষীণভাবে হলেও ভালো ফিল্ম তৈরী করতে গিয়ে লোকসানের ভয়ে পিছিয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত। এজন্যেই আমাদের দেশে এ যাবৎ আর্ট ফিল্মের কোনো ধারা সৃষ্টি হয় নি। তাই আমাদের চলচ্চিত্র জগৎকে এক ধু ধু মরুভূমি গ্রাস করেছে। কোনো কোনো সমালোচক বলতে পারেন, আমাদের দেশে আর্ট ফিল্ম তৈরী করার মতো প্রতিভাবান পরিচালক নেই। মনে পড়ে, একজন পরিচালক একবার আমাকে বলেছিলেন, আসলে কোনো পরিচালক ইচ্ছে করে বাজে ফিল্ম তৈরী করেন না। যার যেটুকু ক্ষমতা সেই অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেন। ইচ্ছে করলেই কিন্তু আর্ট ফিল্ম তৈরী করা যায় না।

'তিতাস একটি নদীর নামে'র বাজার কদর হয় নি সত্য কিন্তু অল্প সংখ্যক দর্শকদের কাছে এর যথেস্ট কদর হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখে ব্যক্তিগতভাবে আমি আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে সমৃদ্ধতর। ছিদ্রান্বেষীরা ফিল্মটিতে অবশ্যই কিছু খুঁত খুঁজে পাবেন, বিশেষ করে এডিটিং-এর দুর্বলতা মাঝে-মধ্যে পীড়া দিয়েছে আমাকেও। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ফিল্মের অসামান্যতা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না।

সত্যি বলতে কি ঋত্বিক ঘটক সেলুলয়েডে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। এই দীর্ঘজীবী সৃষ্টিতে তিনি সুদক্ষ সহযোগিতা পেয়েছেন ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলামের কাছ থেকে। ফটোগ্রাফি এই ফিল্মের একটি সম্পদ। বাংলাদেশের নানা চেনা দৃশ্য নতুনভাবে

প্রস্ফুটিত হয়েছে আমাদের সামনে নিবিড়তায়, অন্তরঙ্গতায়। রাত্রিময় নদীর এবং বৃষ্টির যে রূপ ধরা পড়েছে সেলুলয়েডে তা সহজে ম্লান হওয়ার কথা নয়। আমার স্মৃতিতে সেসব দৃশ্য বার বার আসা-যাওয়া করবে, একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই। শব্দ-নৈঃশব্দ্য এবং সঙ্গীতের ব্যবহারে অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। কে না জানে, এই সংযমই হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকের কুললক্ষণ। একজন প্রথম শ্রেণীর পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলে অভিনেত্রীরাও যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, তা বাংলাদেশের শিল্পীরা প্রমাণ করেছেন।

'তিতাস একটি নদীর নামে'র প্রযোজক এবং তাঁর সহকর্মীদের সাধুবাদ জানাই। তাঁরা একটি প্রথাছুট সমৃদ্ধ ফিল্ম উপহার দিয়েছেন বলেই নয়, এই ফিল্ম তৈরীর দুর্লভ সাহসিকতার জন্যেও। এই ফিল্ম তৈরী করতে প্রচুর খরচ হয়েছে। এর ভাগ্যে বাণিজ্যিক সাফল্য জোটে নি বলে প্রযোজক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই ক্ষতির ফলে ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় যদি তিনি নিরুৎসাহিত হন, তাহলে তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারি না। 'তিতাস একটি নদীর নামে'র বাণিজ্যিক অসাফল্যের দরুন অন্যান্য প্রযোজকগণও সত্যিকারের ভালো ফিল্ম তৈরীর ব্যাপারে প্রচেষ্টা-লাজুক হয়ে পড়বেন, সন্দেহ নেই।

সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু একটি করা দরকার। আর্ট ফিল্মকে যদি করমুক্ত করা হয় তাহলে প্রযোজকরা ভালো ফিল্ম তৈরী করতে পেছপা হবে না। 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে করমুক্ত করা হোক, এই দাবী জানানো একান্ত জরুরী। প্রযোজক আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের দুর্ভিক্ষে এমন একটি ফিল্ম তৈরী করার ঝুঁকি নিয়েছেন, তাঁর ক্ষতির ভার কিছুটা লাঘব করা উচিত নয় কি?

*১৮ই আগস্ট ১৯৭৩*

## মোহিতলাল মজুমদার বিষয়ে

মোহিতলাল মজুমদার প্রবন্ধাবলী পড়ছি। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো থেকে জেগে ওঠে জোরালো গভীর কণ্ঠস্বর। মনে হয় প্রাজ্ঞ এক ধর্মযাজক তন্ময়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে চলেছেন তাঁর বাণী। সেই বাণী যুক্তিসিদ্ধ, উপদেশপ্রবণ। তাঁর কণ্ঠস্বরে কখনো ফুটে উঠেছে তথ্যের কৌলীন্য, কখনো জেহাদী ক্রোধ, কখনো বা আবেগমণ্ডিত পাণ্ডিত্যের প্রাখর্য। সর্বোপরি সেই স্বর সাহিত্য রসিকের স্বর।

মোহিতলাল মজুমদারের সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া মুশকিল। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কার সব বক্তব্যের প্রতিই বা আমরা পুরোপুরি সায় দিই। আমরা মোহিতলাল মজুমদারের সব বক্তব্য মেনে নিতে পারি না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে মনোযোগী হতেই হয়। উদাসীন হওয়ার কোনো সুযোগই তিনি আমাদের দেন না।

তিনি ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যসেবী, সাহিত্য বিলাস তাঁর কাছে কখনো তেমন আমল পায় নি। তিনি মনেপ্রাণে হাই-সিরিয়াসনেসে সমর্পিত ছিলেন। আজীবন তিনি সাহিত্যসেবা

করে গেছেন। অন্য কিছু করেন নি। বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি। শেষ জীবনে নৈঃসঙ্গ্য ঘিরে রেখেছিলো তাঁকে। কিন্তু কখনো সাহিত্যের প্রতি হন নি বীতশ্রদ্ধ। এখানে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মিল রয়েছে তাঁর। সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণায় এঁরা দু'জন অবস্থান করেছেন দুই বিপরীত মেরুতে, কিন্তু সাহিত্যসেবী হিসেবে এঁরা উভয়েই অসাধারণ নিষ্ঠাবান।

শুনেছি নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শুনতে ভালোবাসতেন। কেউ শুনতে চাইলে খুশি হতেন খুবই। মোহিতলাল মজুমদার চমৎকার আবৃত্তি করতেন। এই কবি সমালোচকের কথা প্রচুর শোনা যায় শ্রদ্ধেয় আবদুল কাদিরের মুখে। মোহিতলালের প্রতি তাঁর অবিচল ভক্তি লক্ষ্য করেছি। দেখেছি, মোহিতলালের কথা বলতে বলতে কেমন আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়তেন তিনি। তাঁর চোখে-মুখে তখন দুলে ওঠে বিগত যুগের রৌদ্রছায়া। মোহিতলাল মজুমদার বিষয়ে কোনো গ্রন্থ তিনি লিখবেন কি ভবিষ্যতে? ছান্দসিক আবদুল কাদিরের খ্যাতি প্রবাদতুল্য, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ বিষয়েও তাঁর কোনো গ্রন্থ আজো প্রকাশিত হলো না।

*১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩*

## পাবলো নেরুদা, তাঁর মনোজ সওগাত

চিলি, এই নামটি সর্বপ্রথম আমার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠেছিলো পাবলো নেরুদার জন্য। যে চিলি ছিলো আমার কাছে শুধু একটি ভৌগোলিক নামমাত্র, যে চিলিকে আমি কোনোদিন দেখি নি, সেই চিলির কথাই আমি বারবার ভেবেছি, ভেবেছি তার প্রকৃতির কথা। তার বাসিন্দাদের নিজের অজান্তেই কখন যেন ভালোবেসে ফেলেছি। আর সেই সবকিছুই হতে পেরেছে পাবলো নেরুদা সেই ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই। চিলিতে আজ রক্তগঙ্গা বইছে, চলছে গণহত্যা। সান্টিয়াগো পরিণত হয়েছে প্রেতায়িত শহরে। জেনারেলদের বুটে দলিত হচ্ছে কতো প্রাণ, পথে পথে গর্জে উঠছে আগ্নেয়াস্ত্র। প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে নিহত। নিহত অনেকে। চিলির প্রিয় কবি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বনন্দিত কবি পাবলো নেরুদা আজ অন্তরীণ। তিনি ইসলা নেগ্রায় তাঁর বাসভবনে অন্তরীণ! বহির্জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে দেয়া হচ্ছে না তাঁকে। তাঁর বাড়ির চৌদিকে পুলিশের কড়া পাহারা। কাউকে সেখনে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না, অকেজো করে দেয়া হয়েছে তাঁর টেলিফোন। যে ফ্যাসিস্ট শক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে বার বার উচ্চারিত হয়েছে নেরুদার ধিক্কার, তাদের হাতে আজ তিনি বন্দী।

পাবলো নেরুদা, এই নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে আসে মাথা, কলকলিয়ে ওঠে আত্মার জল। আশ্চর্য এক মমতার স্রোত বয়ে যায় সমগ্র অস্তিত্বে। পাবলো নেরুদা পৃথিবীর মহৎ কবিদের অন্যতম এক অসামান্য হৃদয়বান পুরুষ। তিনি সর্বমানবের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সকল ভাবনা, কল্পনার ঐশ্বর্য, সৃজনশক্তি ও

প্রগাঢ় ভালোবাসা। মানুষকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতে না পারলে যে মহান কবি হওয়া যায় না, তা পাবলো নেরুদার জীবন ও কাব্য সপ্রমাণ করে।

চিলির এই মহান কবি গজদন্তমিনারবাসী নন। তিনি জন্মেছেন এক সামান্য রেল শ্রমিকের ঘরে। যদিও তিনি নিজে পরবর্তীকালে চিলির রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত হয়েছিলেন, তবু শ্রমিকদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে সর্বক্ষণ বহন করেছেন নিজের মধ্যে। বস্তুত সাধারণ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে তিনি জড়িত করেছেন নিজের ভাগ্যকে। বুঝি তাই তাদের প্রত্যেকের দরোজায় পৌঁছে দিতে চেয়েছেন মনোজ সওগাত, তার কবিতাবলী। বাস্তবিকই তাঁর কবিতা মানবতার জন্যে এক পবিত্র উপঢৌকন।

পাবলো নেরুদা 'শৈশব এবং কবিতা' নামক গদ্য রচনায় তাঁর জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা একটি সুন্দর আখ্যানের মতোই মনে হয়। নেরুদার শৈশবের কথা। তাঁদের বাড়ির পেছন দিকে থাকতো বালক নেরুদার নানাবিধ খুঁটিনাটি সামগ্রী। একদিন নেরুদা বাড়ির পেছন দিককার বেড়াটায় একটা ফোকর লক্ষ্য করলেন। আর সেই ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগিয়ে এলো তাঁর সমবয়সী এক বালকের ছোট্ট একটি হাত। নেরুদা প্রথমে ভড়কে গিয়ে কয়েক কদম পেছনে সরে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখনে ফোকরে সেই হাতটি নেই, রয়ে গেছে আশ্চর্য সাদা মেষ। উলের তৈরী মেষ। উলের রং হালকা হয়ে এসেছিলো। তিনি কখনো অমন মেষ দেখেন নি। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তিনি ঢের উঁকিঝুঁকি দিলেন, কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।

বালক নেরুদা তাঁর একটা অত্যন্ত প্রিয় খেলনা এনে রাখলেন বেড়ার ফোকরে। কিন্তু আর কখনো তিনি সেই হাত কিংবা সেই বালকের দেখা পান নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সাদা মেষ, না-দেখা বালকের উপহার তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু নেরুদা কখনো সাদা মেষটির কথা বিস্মৃত হন নি; এমনকি পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সেই অপরূপ খেলনা, একটা সাদা মেষ।

পাবলো নেরুদা বলেছেন, সৌভ্রাতৃত্বের অন্তরঙ্গতা জীবনের এক পরমাশ্চর্য দান। আমরা যাদের ভালোবাসি, তিনি তাঁর স্নেহময় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, তাদের ভালোবাসা অনুভব করা হচ্ছে সেই আগুনের মতো, যে আগুন আমাদের জীবনকে যোগায় খাদ্য। কিন্তু যাদের আমরা কোনোদিন দেখি নি, যাদের চিনি না, যারা দূর থেকে লক্ষ্য করে আমাদের নিদ্রা আর নিঃসঙ্গতা, আমাদের বিপদ আর দুর্বলতা— তাদের স্নেহলাভ আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আরো বেশী সুন্দর। কারণ সেটা আমাদের সত্তার সীমানাকে প্রসারিত করে এবং সকল প্রাণীকে করে ঐক্যবদ্ধ।

নেরুদা শৈশবের সেই ঘটনা থেকে একটা মূল্যবান শিল্প গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি জেনেছিলেন যে পৃথিবীর সব মানুষ এক সূত্রে বাঁধা। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে এসেছিলো আরো গভীরভাবে, আরো প্রবলভাবে বিপন্ন মানুষের সংকট ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে। একটি নির্জন বাড়ির পেছন দিককার উঠোনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তিনি ব্যর্থ হন নি। সেই যে দুটি বালক, যারা একে অন্যের কাছে ছিলো পরিচিত, খেলনা বিনিময়ের এক খেলা খেলেছিলো, সে খেলা আপাত

দৃষ্টিতে সামান্যই বটে। কিন্তু এই সামান্য খেলাই এক অসামান্য কবির কাব্য রচনার উৎসের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই তো পাবলো নেরুদা তাঁর কবিতাগুচ্ছ পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের সেই বিপুল মানবগোষ্ঠীর কাছে, যাদের তিনি চেনেন না, তিনি সেই অনুপম সওগাত পৌঁছে দিয়েছেন বন্দীদের কাছে, ফেউতাড়িত মানুষের কাছে, নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে।

নেরুদার কাব্যজীবনের গোড়ার দিকে তাঁর কবিতার দর্পণে ভেসে উঠেছে আত্মকায়া—তিনি বার বার বলেছেন নিজের কথা, নিজের প্রেমের কথা, হতাশার কথা। প্রথম দিকের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম যথার্থই রেখেছিলেন, 'প্রেমের বিশটি কবিতা ও হতাশার একটি গান।' তখন তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ফরাসী প্রতীকবাদের প্রতি। পরাবাস্তববাদী কবিতা রচনায় তিনি অর্জন করেছিলেন অসাধারণ সিদ্ধি। তাঁর স্যুররিয়ালিস্ট কবিতায় এমন একটি সজীবতা ছিলো যার কাছে আদ্রেঁ ব্রেতোঁ এবং অন্যান্য ফরাসী স্যুররিয়ালিস্ট কবিদের কবিতা মনে হয় প্রায় নিস্তেজ নিষ্প্রাণ। কিন্তু পাবলো নেরুদা বার বার নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন, দক্ষিণ আমেরিকার কাব্যক্ষেত্রেকে বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন কাব্যজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে। নেরুদার সৃষ্টির প্রাচুর্যে বিস্মিত হয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার কবিকূল। কবিতা রচনায় নেরুদা চিরদিনই অনলস, তাঁর লেখনী হার মানে নি কোনো কিছুর কাছেই। কবিতার পর কবিতা রচিত হয়েছে—যেন এক ফেরেশতা দু'হাতে চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে নক্ষত্রমালা—প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থের পর গ্রন্থ। দক্ষিণ আমেরিকায় একটি নতুন আইডিয়া ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন একজন তরুণ কবি সে বিষয়ে লিখতে সক্ষম হন, তখনই দেখা যায় সে বিষয়ে নেরুদা একটি নয়, দুটি নয়, লিখে ফেলেছেন রাশি রাশি কবিতা। আর কী সব কবিতা—কী বিষয়-গৌরবে, কী কাব্যসৌন্দর্যে, নেরুদা বারবার তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তরুণ কবিদের। নেরুদার কবিতা চিরসজীব, অক্ষয়, মহীয়ান।

নেরুদা বলেছেন, চিলির প্রায় সব লেখকই বামপন্থী। ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে। এই বামপন্থী লেখকদের পেছনে রয়েছে বিপুল গণসমর্থন। নেরুদা নিজে কম্যুনিস্ট, মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রকে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি বলে বিশ্বাস করেন বলেই তিনি সেই দুনিয়া কাঁপানো মতবাদে হন সমর্পিত। জনসাধারণের কাছের মানুষ পাবলো নেরুদা—স্বদেশের কাছে বারো মাসে তেরো পার্বণে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক শহরে, বছরের পর বছর তিনি কবিতা পড়েছেন তাঁর আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে। সবাই তন্ময় হয়ে শুনেছে সেই কাব্যপাঠ। নেরুদা এই কাজটিকে কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এতে ক্লান্তিও বোধ করেছেন মাঝে-মধ্যে; কিন্তু কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য। তিনি স্বদেশবাসীর এত দুর্গতি দেখেছেন, দারিদ্র্য দেখেছেন যে এসব থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া তাঁর পক্ষে ছিলো অসম্ভব। তাই পাবলো নেরুদার পরবর্তী কবিতাবলীর অধিকাংশই রাজনৈতিক চৈতন্যে ভাস্বর, মানবিক সহমর্মিতায় আপ্লুত। যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতার প্রবক্তা, তাঁরা হয়তো নেরুদার এসব কবিতার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবেন। খাটো করে দেখতে

চেষ্টা করবেন তাঁর কাব্যকৃতিকে। এমনকি তাঁর রাজনীতি-নির্ভর কবিতাবলীকে খারিজ করে দিতে প্রলুব্ধ হবেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, নেরুদার বহু কবিতা রাজনৈতিক বিষয়ভিত্তিক হলেও সেগুলো কাবগুণে এতই গরীয়ান যে বিশুদ্ধবাদী সমালোচকেরাও সহজে নেবার সুযোগ পান না। যিনি 'কান্টোস জেনারেলে'র মতো কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, তাঁর কবিতাকে রাজনৈতিক ছুঁতো ধরে উড়িয়ে দেয়া মুশকিল। নেরুদার সব কবিতাই যে উৎকৃষ্ট তা অবশ্য বলা যায় না; কিন্তু যিনি অজস্র উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন মহাকাব্য গুণান্বিত কবিতা, তিনি যদি কোনো কোনো কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে ব্যর্থ হন, তাতে তাঁর অসামান্য কাব্যকৃতির গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগে না। তিনি তাঁর কবিতা চিলির জনসাধারণের দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন সর্বমানবের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। তাই পাবলো নেরুদা চিলির কবি হয়েও বিশ্বকবি। নেরুদা আজ বন্দী। কিন্তু তাঁর কবিতা বাধা-বন্ধনহীন পাখির মতো উড্ডীন, সর্বদেশে উড্ডীন, চৈতন্যের আকাশে আকাশে। তাঁর কবিতার প্রাণবন্ত জীবনঘনিষ্ঠ মহিমান্বিত সুর ভেসে আসছে চিলির ফ্যাসিস্টদের হেলমেটের ওপর দিয়ে, আসছে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে। তাঁর কবিতাকে বন্দী করবে এমন সাধ্য নেই চিলির ফ্যাসিস্ট জেনারেলদের। আমরা নেরুদার কবিতার মতোই মুক্ত দেখতে চাই তাঁকে। তাঁর মুক্তির দাবী আজ শুধু পৃথিবীর প্রতিটি কবিকণ্ঠেই ধ্বনিত হবে না, ধ্বনিত হবে সকল শুভবাদী মানুষের কণ্ঠে।

*২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩*

## বুদ্ধিবৃত্তির বলয়ে এক সুদক্ষ কবি

বিশ শতকী ইংরেজী কাব্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ ডব্লিউ এইচ অডেন মারা গেছেন। তিনি মারা গেছেন মাত্র ৬৬ বছর বয়সে। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইংরেজী কবিতা এবং আরো যথার্থের দিকে ঝুঁকলে বলতে হয়, মার্কিন কবিতা। কেননা; পরবর্তী জীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কবিকুল এবং সমালোচকবৃন্দ অডেনকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করতেন, তাই তিনি অবলীলাক্রমে সম্মানিত ঠাঁই পান মার্কিন কবিদেরই প্রথম সারিতে। মার্কিন সারস্বত সমাজ বহিরাগত অডেনকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে বেশ কিছুটা কৃতার্থই বোধ করতেন বলা যায়। পক্ষান্তরে অডেন যখন শ্বেতদ্বীপ ত্যাগ করলেন, তখন ইংল্যান্ডের কবিকুল ও কাব্যরসিকরা এ বলে আক্ষেপ করেছিলেন যে তাঁর এই স্বদেশত্যাগ ইংরেজী কাব্যকে শেষ পর্যন্ত অনুজ্জ্বল করে তুলবে। এটা অতিশয়োক্তি বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। ইংল্যান্ড থেকে অডেনের প্রস্থানের পর বাস্তবিকই ইংরেজী কবিতাকে কিছুটা ম্লানিমার গ্লানি সইতে হয়েছে। বহু বাকবিতণ্ডা সত্ত্বেও কবি হিসেবে এলিয়টের পরেই অডেনের স্থান। আমি তাঁর সুহৃদ স্টিফেন স্পেন্ডার এবং তিরিশের অন্য দুজন প্রধান কবি সি ডে ল্যুইস এবং ল্যুই ম্যাকনীসের

অবদানের কথা ভুলে যাই নি। ভুলে যাই নি সেই শব্দমাতাল কিন্নর কণ্ঠ ডিলান টমাসের কবিতাবলীর কথা, এম্পসন ও জর্জ বার্কারের কথাও আমার মনে আছে—কিন্তু এঁরা কেউ ঠিক অডেনের সমকক্ষ নন।

গোড়ার দিকে অডেনের ওপর দিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। লীভিস তো তাঁর ওপর ছিলেন রীতিমতো খড়্গহস্ত। অডেনকে তিনি একজন গৌণ কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অকালমৃত মার্কিন কবি-সমালোচক, যাঁর কবিতাবিষয়ক আলোচনা যথার্থই রসগ্রাহী, র‍্যাডাল জারেলও অডেনের কবিতার একটি কড়া সমালোচনা লিখেছিলেন। অবশ্য জারেল পরে সেই প্রবন্ধটির সারবত্তা সম্পর্কে নিজেই কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। ফলত সেই প্রবন্ধ তাঁর কোনো গ্রন্থে ঠাঁই পায় নি। রিচার্ড হোগার্টও তাঁর অডেন-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থটিতে সেই ধীমান কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তো হনই নি, বরং প্রচুর নিন্দাই করেছেন।

প্রথমে প্রেম, তারপর মার্কসবাদ এবং সবশেষে খৃষ্টধর্মেই মুক্তি খুঁজেছিলেন অডেন। স্মর্তব্য, তিনি এ্যাঙ্গলিকান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে কি পরিবেশ ও শৈশব-স্মৃতিই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো ধর্মের পথে? কিন্তু অডেনের মতো তুখোড় ও মেধাবী ব্যক্তি এই সামান্য কারণে ধর্মের দিকে ঝুঁকবেন, এই সহজ সিদ্ধান্ত পৌঁছানো মুশকিল। ভেবে-চিন্তেই তিনি ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন মুক্তির পথ হিসেবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অডেনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে উৎসাহী নই,আমার কাছে তাঁর কবিসত্তাই গ্রাহ্য। এবং আমার কবুল করতে দ্বিধা নেই, অডেন আমার একজন প্রিয় কবি। তাঁর কবিতাবলী পড়ে আমি শুধু আনন্দিতই হই না, প্রচুর উপকৃতও হই। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, কিভাবে একটা আপাততুচ্ছ ব্যাপারকে চিত্তহারী করে তোলা যায় কাব্যগুণে। স্পেন্ডার বলেছেন, যদি অডেনকে টুথপেস্ট বিষয়ে কবিতা লিখতে অনুরোধ করা হয়, তবে তিনি কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই দন্তমার্জনকারী বস্তুটি নিয়ে একটি চমৎকার ব্যালাড লিখে ফেলবেন। কাব্যরচনার এই দক্ষতার প্রতি কেউ কেউ হয়তো কটাক্ষ করতে পারেন, বলতে পারেন এটি প্রকৃত কবির পক্ষে অপরিহার্য কোনো গুণ নয়। এই দক্ষতা একজন কবিকে যে-কোনো বিষয়ে কবিতা লিখতে প্ররোচিত করতে পারে যা শেষ পর্যন্ত কবিতার পক্ষে অপকারী। অবশ্য এ-কথায় সায় দিতে আমার বাধে। কবিতার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় আছে বলে মনে করি না। অন্ততঃ আধুনিক কবিগণ একথা এতদিনে সপ্রমাণ করেছেন যে কোনোকিছুই কাব্যবহির্ভূত নয়। আসলে একটি যুগের নান্দনিক ও কাব্যিক সংস্কার দ্বারাই সে যুগের কবিগোষ্ঠী মূলতঃ শাসিত হন। কেউ কেউ অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের তাগিদে সেই কাব্যগণ্ডীর বাইরে আনাগোনা করেন। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন সব বিষয়ে কবিতা লেখা যায় না। একবার সেই কবি সার্বভৌম সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন যে মোরগ সম্পর্কে কবিতা লিখতে পারলে তিনি তাঁকে শিরোপা দেবেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে, কয়েকদিনের মধ্যেই লেখা হয়ে গেলো "কুক্কুট" নামক কবিতাটি।

যা হোক, অডেনের প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। তিনি শুধু কবিতা রচনাতেই অসামান্য পারদর্শী নন, কাব্যনাট্য ও প্রবন্ধ রচনাতেও রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। বিভিন্ন আঙ্গিকে

তিনি কবিতা লিখেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি আমৃত্যু ছিলেন অনলস। এমন কি ব্যালাড, সনেট এবং ওড ইত্যাদি লিখেও তিনি দেখিয়েছেন তাঁর কাব্যক্ষমতার পুঁজি। এসব সনাতনী কাব্য শরীরেও নব্য লাবণ্যের ঢল বইয়ে দেয়া সম্ভব। বলা দরকার, হালকা কবিতার প্রতি আমি প্রথম আকৃষ্ট হই অডেনের হালকা কবিতা পড়ে। এবং হালকা কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন সম্পাদনা করা তাঁকেই সাজে।

বরাবর বুদ্ধিচর্চাতেই ছিলো তাঁর আনন্দ। বুঝি তাই মননশীলতা অডেনের কাব্যের একটি প্রধান সুর। সারা জীবন তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিলো তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিহার। সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি শুধু জ্ঞানই অর্জন করেন নি, সেই জ্ঞানকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে। স্টিফেন স্পেন্ডার যখনই অডেন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন তখনই সেই মননশীল কবির বইময় ঘরের কথা বলেছেন। যখন অডেন অক্সফোর্ডের ছাত্র তখনই তিনি, সেই একুশ বছর বয়সে, একজন বিদগ্ধ পাঠক এবং মননশীল কবি হিসেবে পরিচিত। স্পেন্ডার প্রমুখের কাছে অডেন তখন ছিলেন অক্সফোর্ডের মধ্যমণি, যাঁর কাছে যেতে হয় অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। যিনি এমন ধীমান এবং প্রতিভাবান, তাঁর সামনে হঠাৎ বেমাক্কা কী বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়েই তাঁরা তটস্থ। অডেনের কাব্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য পেয়েছে সত্য, কিন্তু তা বলে তিনি হৃদয়বত্তাকে খারিজ করেন নি একেবারে।

তাঁর কবিতাকে বলা হয়েছে নিদানিক। আসলে অডেনের মধ্যে ছিলো একজন জাতশিক্ষক। সেই শিক্ষকের নির্দেশ তিনি কোনোদিন অবজ্ঞা করতে পারেন নি। এই নীতিমন্যতা থেকে এমন কি তিনি কিপলিং-এর মতো কখনো সখনো উচ্চারণ করেছেন কোনো না কোনো পঙ্ক্তি। তিনি মননশীল ছিলেন, তিনি প্রচুর কারিগরি শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, তিনি শিক্ষক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর পড়াশুনোর প্রাবাদিক ব্যাপ্তি—এসবের কোনো কিছুর জন্যেই নয়, তিনি একজন প্রকৃত কবি বলেই আমরা তাঁর সামনে নতজানু হই। কাব্য-খ্যাতির ওঠা-নামা আছেই। একেক সময়ে একেকজনের খ্যাতি বাড়ে কিংবা কমে। কিন্তু যারা প্রকৃত কবি তাঁরা সর্বকালেই পাঠক পান—হয়তো সংখ্যায় তারা খুব বেশী নয়—কিন্তু সত্যিকারের দীক্ষিত তারা, কবিতার প্রতি সমর্পিত। অডেন সে জাতের কবি।

*৬ই অক্টোবর ১৯৭৩*

## কত ঘরে ওঠে হাহাকার

শ্বেতদ্বীপের রাজকন্যার বিয়ে হচ্ছে আগামী মাসে। ছেলেবেলাতেই রাঙা রাজকন্যাদের প্রতি একটা পক্ষপাত জন্ম নিয়েছিলো আমার। নানীর মুখে রূপকথা শুনতে শুনতেই আমি রাজকন্যাদের অনুরাগী হয়ে পড়ি। তাই সংবাদপত্রে যখন রাজকুমারী এ্যানের বিয়ের

খবর পড়লাম, সেই মুহূর্তে আমি আবার রূপকথার দেশে পাড়ি জমালাম। মনে মনে। মনে পড়লো পাষাণপুরীর কথা। সিংহাসন, হাতীশাল, ঘোড়াশাল, পক্ষীরাজ, আরো কতো কি! মনে পড়লো ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা, যার শিয়রে রূপোর কাঠি, শৈথানে সোনার কাঠি অদল-বদল করলেই রাজকন্যার ঘুম ভেঙে যায়। ঘোড়া ছুটিয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে রাজকুমার আসেন পাষাণপুরীতে। রাজকন্যার ঘুম ভাঙান, মায়াবী পানি ছিটিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলেন পাথরের মূর্তিকে।

ছেলেবেলায় মায়াবী গণ্ডী অতিক্রম করে একদিন আমরা সবাই পৌঁছে যাই এমন এক ক্ষেত্রে, যেখানে বাস্তবতার সমস্ত ছলা-কলা নিয়ে অপেক্ষা করে আমাদের জন্যে। আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই যে রাজকন্যা চিরদিনই রূপকথার এলাকায় বিচরণ করেন, বাস্তবে তার দেখা মেলে না। ভুল বলে ফেললাম। এই মরলোকেও রাজকন্যারা বসবাস করেন, তবে তারা যে-জগতের বাসিন্দা আসলে আমাদের পক্ষে সেটা রূপকথারই জগৎ। চোখ রগড়ে দেখতে হয়, ঠিক দেখছি কি না।

কালক্রমে রাজকন্যাদের ধরন-ধারণও বিলক্ষণ পাল্টে যায়। আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা সবকিছুই যায় বদলে। যে রাজকন্যা পাষাণপুরীর সোনার পালংকে ঘুমোতেন, তিনি যে পোশাক পরতেন, সে পোশাক আজকালকার রাজকন্যারা তাদের সোনার অঙ্গে ধারণ করেন না আর। তারা রাজকুমারের সঙ্গে পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হন না, কেউ কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ান অবশ্য, তবে তাদের পরনে থাকে আঁটো প্যান্ট আর লম্বা বুট। কোনো কোনো রাজকুমারীর আবার জীনস আর মিনি পোশাকেই আনন্দ।

আমাদের দেশের মেয়েরা, যারা বাল্যকালে রূপকথা শুনে কাটিয়ে দিয়েছে অনেক প্রহর, জীবনের শুরুতে সচরাচর রাজকুমারদের স্বপ্নই দেখে থাকে। ভাবে, বড় হয়ে ওরা পাবে রাজকুমারের মতো বড় বর। কারো কারো ভাগ্যে ঠিক রূপকথার রাজকুমারের মতো না হলেও কান্তিমান বর জোটে বটে, কিন্তু অধিকাংশ কন্যারই স্বপ্নভঙ্গ হয়। তা বলে তারা যে সবাই রাগ করে বাপেরবাড়ি চলে যান, এমন নয়, অনেকেই রাঁধেন, বাড়েন এবং স্বামীর পাশে বসে খানও। অর্থাৎ অধিকাংশ মেয়েকেই বাস্তবের সঙ্গে আপোস করে চলতে হয়। এই আপোসটা অবশ্য দুপক্ষই করেন।

বিয়ের বাজারটাও অদ্ভুত। কোথাও বরের দর অস্বাভাবিক চড়া, কোথাও আবার কনের দর আকাশছোঁয়া। সাধারণত বরের দরই চড়া আমাদের সমাজে। বরপক্ষের তাই মাটিতে পা পড়ে কি পড়ে না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কথা বহু শুনেছি। বহু আগেই নাটক-নভেলে পড়েছি, শুনেছি আত্মীয়স্বজনদের মুখে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কথা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠতো অত্যন্ত করুণ ও নিরীহ একজন মানুষের ছবি। তাঁর ওপর যত জোর-জুলুমই হোক, তিনি টু শব্দটি পর্যন্ত করবেন না, মুখ বুঁজে সয়ে যাবেন সবরকম নিগ্রহ। তবু ছেলেমানুষ ছিলাম বলেই তখন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মনোবেদনা ঠিক বুঝতে পারতাম না। এখন বয়স হয়েছে; সাত ঘাটের পানি খেয়ে, ঠেকে ঠেকে অনেক কিছু শিখেছি। স্বচক্ষে দেখেছি কোনো কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুরবস্থা। দেখেছি যৌতুক দিতে গিয়ে নবলব্ধ জামাতাকে খুশি করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় একজন মধ্যবিত্ত মানুষ কেমন সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। ভালো বর পেতে হলে ঢালতে হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বর

দেখতে আহা মরি কিছু নয়; কিন্তু চাকরি করে ভালোই; তাই এই আকাশের চাঁদটিকে হস্তগত করতে হলে অঢেল টাকা ঢালা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেকের পক্ষেই অত বেশী টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলেই তারা বাধ্য হয়ে যেমন তেমন বরের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে কন্যাদায়মুক্ত হন। এমন অনেক বর আছেন যারা কনের রূপে না ভুলে কনের পিতার ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান অঙ্কের জৌলুসে মজেন। পাত্রী যত কুরূপাই হোক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না, শ্বশুরের ঐশ্বর্য হাতাতে পারলেই হলো। অন্নদাশংকর রায় যথার্থই ছড়া কেটেছেন, 'স্বর্ণের নাম সুন্দরী আর মাইনের নাম কার্তিক।'

প্রত্যেক পিতাই চান তার মেয়ে ভালো ঘরে যাক, পাক ভালো বর। কিন্তু চাইলেই তো আর সব কিছু পাওয়া যায় না। টাকার জোর না থাকলে ভালো বর মেলা ভার। অনেক মধ্যবিত্ত পিতা কন্যার সুখের কথা চিন্তা করে অশেষ দুঃখ ডেকে আনেন নিজের ঘরে। জমানো টাকা-পয়সা খরচ করে, ধার করে মেয়ে পার করে পথে বসেন।

আসলে পণপ্রথা ছদ্মবেশে আমাদের সমাজে জাঁকিয়ে বসেছে। বরের এটা চাই, ওটা চাই, ঐ বিশেষ জিনিসটা বরের ভারি পছন্দ—এসব কথা বিয়ের আগে বর পক্ষের মুখে খইয়ের মতো ফোটে। বরের চা-ই চাই-এর ফর্দ দ্রৌপদীর শাড়ীর মতোই অন্তহীন। বরের খাঁই শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয় না বলে কোনো কোনো বর পাগড়ি খুলে বিয়ের আসর ত্যাগ করেন রেগে-মেগে। কোনো কোনো বর হয়তো বিয়েটা পণ্ড হোক তা চান না, কিন্তু ময়-মরুব্বীদের ঠেলায় কনের পিতার মাথায় বজ্রাঘাত করতে বাধ্য হন।

হ্যাঁ, এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা হরহামেশাই ঘটছে আমাদের সমাজে, তাই ঘরে ঘরে ওঠে কান্নার রোল। এভাবে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ফলে অনেক মেয়ের ভাগ্যে বরই জোটে না শেষ পর্যন্ত। এমনও হয়, প্রেম করে বিয়ে করতে গিয়েও কোনো কোনো বর যৌতুকের আবদার করে বসেন; শ্বশুরের মেয়ের প্রতি নজর থাকে ঠিকই কিন্তু তাঁর সামর্থ্যের দিকে দৃকপাত করার কথা চিন্তাই করেন না। এই ছদ্মবেশী পণপ্রথা শেকড়-বাকড় ছড়াতেই থাকে, তবে কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত পিতার মুখের অন্ধকার কখনো ঘুচবে না, থামবে না তার ঘরের হাহাকার।

*২০শে অক্টোবর ১৯৭৩*

## লেখকের জীবিকা

সরস্বতীর বন্দনা করে যাদের বেলা যায়, সচরাচর তাদের ভাগ্যে জোটে লক্ষ্মীর গঞ্জনা। যুগ যুগ ধরে এই দুই দেবীর বিবাদ চলছে, আজো তা ভঞ্জনের লক্ষণ তেমন সুস্পষ্ট হচ্ছে না। যিনি লেখক হওয়ার জন্য জন্মেছেন তিনি আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য হন। মানুষকে আনন্দ দেয়ার জন্য যারা আমৃত্যু গাধার খাটুনি কাটেন তাদের অনেকেরই জীবন শেষ পর্যন্ত নিরানন্দ চড়ায় এসে ঠেকে। বালজাকের মতো বিশ্ববরেণ্য লেখককে এক সময় জঠর-জ্বালা জুড়াতে হয়েছে কাল্পনিক আহারে।

বালজাককে মাঝে-মধ্যেই সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় কাটাতে হতো। হাতে পয়সা নেই বলে তো ক্ষুধা ঝিমোয় না, অন্ত্রনালীতে দাঁত বসায় ঠিকই। ক্ষুৎকাতর বালজাক চক দিয়ে মেঝেতে একটা ডিশ এঁকে সেখানে তার প্রিয় খাদ্যগুলোর নাম লিখতেন এবং এমন ভঙ্গিতে হাত ও মুখ নাড়াতেন যেন তিনি সত্যিকারের খাবার খাচ্ছেন। বালজাকের জীবনের এই ঘটনাটির কথা মনে পড়লেই ভারি দুঃখবোধ হয় আমার। যিনি এক পরাক্রান্ত ঔপন্যাসিক, যাঁর গ্রন্থাবলী পৃথিবীর প্রত্যেকটি সেরা গ্রন্থাগারের শেলফ-এ শোভা পাচ্ছে, তিনি ক্ষুধা নিবারণের জন্য খেয়ালী খাদ্য খাচ্ছেন—এই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্যের লেখকদের অবস্থার ঢের উন্নতি হয়েছে। বালজাকের প্রতিভার সিকি ভাগের অধিকারী না হয়েও ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লেখক দিব্যি খোস হালে আছে। এমন কি কোন কোন তৃতীয় শ্রেণীর জনপ্রিয় লেখকও বাড়ি করছেন, গাড়ি হাঁকছেন, গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন জৌলুসের সয়লাবে। সে সব দেশের লেখকদের জীবনযাত্রার চটক দেখে আমাদের চক্ষুস্থির হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁদের কাহিনী শুনলেও ভালো লাগে। তবে কবিদের অবস্থা সেখানেও তেমন ঈর্ষাযোগ্য কিছু নয়। শুধু কবিতা লিখে বাড়ি গাড়ি করা, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেখানেও প্রায় অসম্ভব। অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা আলাদা। সেখানে শুধু কবিতা লিখেও একজন কবি জীবন ধারণ করতে পারেন, বেশ ভালোভাবেই করতে পারেন। কিন্তু সেই কবিকে হতে হবে ইভতেশেংকো কিংবা ভজনেসেনেস্কোর মতো প্রতিভাবান। নইলে কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার অন্য পথ দেখতে হবে।

আমাদের দেশে শুধু কবিতা লিখে তো দূরের কথা, উপন্যাস লিখেও জীবিকা নির্বাহ করা চলে না। কবিতার জন্য সাধারণত যে সম্মানী কবিকুল পেয়ে থাকেন তা ভদ্র সমাজে উচ্চার্য নয়। যখন কোনো প্রবীণ কবিকে এই সামান্য ক'টি টাকার জন্য বার বার যেতে হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার আপিশে তখন খুব কষ্ট পাই। তাঁর তো ঘরে বসেই সম্মানী পাওয়ার কথা। কিন্তু ঘরে বসে থাকলে সেই কবি জানেন, তাঁর প্রাপ্য টাকা তিনি হয়তো পাবেনই না।

আজ কাল সব কিছুরই দাম বেড়েছে। দাম বাড়ে নি শুধু লেখার। কোনো কোনো সম্পাদক এমন ভাব দেখান যে লেখার জন্য টাকা দিয়ে তাঁরা লেখকদের কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছেন। তাঁরা চড়া দামে কাগজ কিনছেন, চড়া দামে পত্রিকা ছাপাচ্ছেন। কিন্তু শুধু লেখকদের বেলায় তাঁদের কার্পণ্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যদি লেখকদের একটি পয়সাও দিতে না হতো তাহলে তাঁরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেতেন, এ-কথা হলফ করে বলতে পারি।

না, শুধু লিখে টিকে থাকা অসম্ভব এদেশে। শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো লেখক শুধু বই লিখেই জীবন ধারণ করছেন। সমরেশ বসু নিজের বই বিক্রির উপর ভরসা করেই বেঁচে আছেন। তাঁর বইয়ের প্রচুর কাটতি। বাজারে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সবই ফুরিয়ে যায় গরম পিঠার মতো। সমরেশ বসু শুধু উপন্যাস লেখেন, চাকরী-বাকরি

করেন না। সন্দেহ নেই সমরেশ বসু অত্যন্ত শক্তিমান লেখক। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে তিনি আবার নতুন সঞ্চারিত হয়েছেন। কিন্তু শুধু লেখার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয় বলে তাঁকে লিখতে হয় বিস্তর। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তিনি নাকি লিখে যান প্রায় প্রতিদিন। কখনো কখনো দুটো উপন্যাস শেষ করতে হয় এক মাসের মধ্যে। এ জন্যও এক ধরনের ক্ষমতার দরকার, স্বীকার করি। কিন্তু এভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে প্রতিভাবানের ভাণ্ডার এক দিন হঠাৎ ফুরিয়ে আসে। যেহেতু সমরেশ বসু একজন সচেতন কথাশিল্পী, তাই তিনি নিজেই জানেন যে তাঁকে এমন অনেক উপন্যাস লিখতে হচ্ছে যেগুলো রচিত না হলেই তিনি খুশি হতেন। কিন্তু না লিখে তাঁর উপায় নেই। একটি উন্নতশীল দেশে জন্মগ্রহণ করে একজন লেখক শুধু লেখাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং গুটিকয় কালোত্তীর্ণ বই লিখে পার পাবেন তা হতে পারে না। দরিদ্র দেশে জন্মানোর মাশুল তাঁকে দিতেই হবে।

*৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩*

## অসাধারণ বিনয়ী গোপাল হালদার

গোপাল হালদার আজ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে এসেছিলেন। ঘরোয়া পরিবেশ তাঁকে দেখে খুব ভালো লাগলো। ছোটোখাটো মানুষ, ধীরেসুস্থে কথা বলেন। কথা বলার সময় ঠোঁটে লেগে থাকে লাজুক হাসি। ঢের বয়স হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে কাবু করতে পারে নি। তাঁর দৈহিক কাঠামোয় একটা দৃঢ়তা রয়েছে বলে মনে হলো। কেউ কেউ তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন, সব প্রশ্নেরই জবাব দিলেন তিনি সহজ-সরল ভাষায়। বলার ঢঙে কোনো কৃত্রিমতা নেই, গালভারি শব্দ ব্যবহারের দিকেও নেই কোনো ঝোঁক। অথচ গোপাল হালদার বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এই মণীষাদীপ্ত লেখকের নাম জানেন না এমন পাঠকের সংখ্যা বাংলাদেশে কম। যারা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী, বাঙালী সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী তাদের সবার কাছে গোপাল হালদার একটি অত্যন্ত পরিচিত, প্রিয় নাম।

কথা বলার ফাঁকে এক সময় নিজের চেহারা নিয়ে মৃদু ঠাট্টাও করলেন গোপাল হালদার। একটি দৈনিক পত্রিকার ফটোগ্রাফার তখন ছবি তুলছিলেন সেই ঘরোয়া আড্ডার। শওকত ওসমান গোপাল হালদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাদার চেহারাটা কিন্তু খুবই ফটোজেনিক। পত্রিকায় বেশ আসে।' গোপাল হালদার একটু হেসে একটা গল্প বললেন। গল্পের নায়ক অবশ্য তিনি নিজেই। একবার একটি পত্রিকার একজন প্রতিনিধি তাঁর লেখা এবং একটি ফটোগ্রাফ চাইলেন। লেখা দিতে তিনি রাজি হলেন, কিন্তু নিজের কোনো ফটোগ্রাফ দিতে চাইলেন না। তিনি রসিকতা করে বললেন, 'যদি আপনারা নীরেন্দ্রনাথ রায়ের ছবি ছেপে তার তলায় লিখে দেন গোপাল হালদার, তবে আমি রাজী

আছি।' গল্পটি শুনে আমরা সবাই হাসলাম। স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায়, বলা নিষ্প্রয়োজন, সুদর্শন ছিলেন।

গোপাল হালদারের কথা শুনতে শুনতে আমি যাত্রা করলাম অতীতের দিকে। মনে পড়লো প্রথম যৌবনের টাটকা, তেজী দিনগুলোর কথা। তখন সবেমাত্র কৈশোরের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পা রেখেছি যৌবনের প্রান্তরে। সাহিত্যের স্বাদ একটু একটু করে পেতে শুরু করেছি, বইয়ের খোঁজে ঘুরছি এদিক-ওদিক। সেকালে রামমোহন লাইব্রেরীকে মনে হতো রত্নদ্বীপের মতো। প্রচুর বই ছিলো সেই প্রাচীন গ্রন্থাগারে। আমি চট করে সেই লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে গেলাম। একদিন অনেক বইয়ের ভিড়ে দেখলাম একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির নাম 'একদা', লেখক গোপাল হালদার। তখন গোপাল হালদার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। তবু বইটি পড়ার জন্যে ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলাম সেদিন। 'একদা' ইস্যু করিয়ে রওয়ানা হলাম বাড়ীর দিকে, হনহনিয়ে—যেন বাড়ীতে পৌঁছেই উপন্যাসটি পড়া শুরু না করলে স্বস্তি পাবো না কিছুতেই। কোনো মতে দুপুরের খাওয়া সেরেই মগ্ন হলাম 'একদায়'। সেই উপন্যাসটির নায়ক অমিতের সকাল বেলার ঘুম ভাঙার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছে কাহিনী। গোটা উপন্যাসটিই প্রতিফলিত হয়েছে একটি দিনের দর্পণে। প্রুস্তীয় টেকনিকে লেখা হয়েছিলো 'একদা'। বাংলা কথাসাহিত্যে চেতনা-প্রবাহের এই বিশেষ রীতিটি যে-দু'জন কথাশিল্পী প্রথম শুরু করেছিলেন, তাঁরা হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার। গোপাল হালদার কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'এই বিশেষ রীতির উপন্যাস আমার আগে ধূর্জটিবাবুই লিখেছেন।' এই বাক্যটি উচ্চারণ করতে লক্ষ করলাম, তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তিনি তো এ বিষয়ে নীরবই থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি নীরব থাকেন নি, সত্য ভাষণেই উদ্বুদ্ধ হলেন। বড় লেখকরা বুঝি এমনই হন।

'একদা'র নায়ক অমিতকে খুব চেনা মনে হয়েছিলো সেদিন। অমিতের একটি বাক্য আজো আমি ভুলতে পারি নি, 'মা বড় বাধা, মা বড় জ্বালা, মরেও না।' এই বাক্যটি কত সত্য ও হৃদয়বিদারক তা তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা একটি আদর্শের জন্য আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত; অথচ মায়ের মমতা যাদের পিছু-ডাক দেয় বার-বার। 'একদা' সেকালে চিহ্নিত হয়েছিলো একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী উপন্যাস হিসেবে। এই একটি মাত্র উপন্যাস লিখেই গোপাল হালদার সাড়া তুলেছিলেন বিদগ্ধ পাঠকসমাজে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র চার-পাঁচটি উপন্যাস লিখেই তিনি সেপথ থেকে সরে এলেন। তাঁর মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্যপিপাসু যে ব্যক্তিটি রয়েছে তিনি কি তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন কথাশিল্পীর ভূমিকা ত্যাগ করতে? আমি জানি, 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাংলা সংস্কৃতির রূপরেখা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তিনি প্রণেতা; তিনি যে বাবু কালচার ও মিয়া কালচারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিয়ে একদা আমরা তুমুল আলোচনা করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেও তিনি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। সরস, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখেও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কথাশিল্পী গোপাল হালদার অন্তরালে চলে গেছেন বলে একটা খেদ সবসময় আমার মনে আছে। তাঁকে সে-কথাটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলতে পারি নি। হয়তো সে-কথা শুনে তিনি একটু কৌতুক অনুভব করতেন, হয়তো তাঁর বয়সী বুকে জেগে উঠতো একটা দীর্ঘশ্বাস। হয়তো

সবিনয়ে কিছু একটা বলতেন, হয়তো নিজেকে শোনানোর জন্যেই, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। গোপাল হালদার একজন অসাধারণ বিনয়ী ব্যক্তি, এ-কথাটা না লিখলে অন্যায় হবে। এ বিনয় ফলসমৃদ্ধ বৃক্ষের বিনয়। একে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না।

*৩১ শে জানুয়ারি ১৯৭৪*

## ট্রেড মার্ক সৈয়দ মুজতবা আলী

এগারোই ফেব্রুয়ারি। কিঞ্চিৎ আড্ডা দেয়ার লোভে নিজের কর্মস্থলে আসার আগে গেলাম রশীদ করীমের অফিসে। অবশ্য রশীদ করীমের দফতর আড্ডাখানা নয়, ঠিক অফিসের মতোই অফিস। কাজকর্ম নিয়মমাফিকই হয়, ঢিলেমি প্রশ্রয় পায় না কখনো। দ্বিপ্রাহরিক আহারকালীন বিরতির সুযোগ নিয়ে আমি মাঝে-মধ্যে সেখানে উপস্থিত হই, আরো কেউ কেউ আসেন। সেদিন আবুল হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। ঘড়িতে দুপুর বয়ে যাচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের আওয়াজেই কী যেন একটা ছিলো, আবুল হোসেন এবং আমি দুজনই উৎকর্ণ হয়ে তাকালাম রশীদ করীমের দিকে। রশীদ করীমের চেহারা, যা' দিব্যি চালাক-চালাক, সেই মুহূর্তে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখের মতো মনে হচ্ছিলো। ভয়ানক চমকে ওঠা সেই মুখ। ক্রেডলে রিসিভার ফেরত যাওয়ার আগেই কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছি, পরে রশীদ করীম কোনো মতে আমাদের জানাতে পারলেন সেই ভীষণ সংবাদ যা' শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'সৈয়দ মুজতবা আলী মারা গেছেন', রশীদ করীম উচ্চারণ করলেন কেমন বোকা বোকা স্বরে, অসংলগ্নভাবে। যেন খবরটি নিজেকেই শোনাচ্ছিলেন তিনি। আমি জানতাম, সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আবুল হোসেন এবং রশীদ করীমের পরিচয় দীর্ঘকালের। এঁরা দুজনেই তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুতরাং সৈয়দ মুজতবা আলীর মৃত্যু-সংবাদে এঁরা যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। 'মর্মাহত' বললে যেন কিছুই বলা হয় না—এঁদের শোক বড় ব্যক্তিগত, বড় গভীর। আড্ডাপতির মৃত্যু-সংবাদ আমাদের আড্ডাকে বিরান করে দিয়ে গেলো একবারে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার পরিচয় অমন পুরনো নয়। মাত্র কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, তাই তাঁকে খুব কাছে থেকে জানার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে যে ক'বার তাঁর মুখোমুখি হয়েছি সে ক'বারই বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছি। আলী সাহেবকে আমি প্রথম দেখি ১৯৫৩ সালে, কলকাতায়। শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলা সাঙ্গ করে কায়সুল হক ও আমি চার-পাঁচদিন কলকাতায় ছিলাম। নরেশ গুহ-র অতিথি হয়েছিলাম আমরা গৃহকর্তার একান্ত অনুরোধে।

একদিন নরেশ গুহ, কায়সুল হক ও আমি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ৫নং পার্ল রোড গেলাম। তখনো আমি আবু সয়ীদ আইয়ুবকে দেখি নি। পার্ল রোডে গিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবের দেখা পেলাম না, কিন্তু দৈবক্রমে দেখা হয়ে গেলো

সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে। আমরা কবি গোলাম মোস্তফার পুত্র ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কামরায় বসে কথাবার্তা বলছিলাম। ক্যাপ্টেন আনোয়ার বললেন, 'আবু সয়ীদ আউয়ুব হাসপাতালে। যক্ষ্মায় ভুগছেন।' দীর্ঘকায় স্মার্ট ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো। দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর সদালাপী ব্যক্তিটি যৌবনের জ্বলজ্বল প্রহরেই নিহত হন এক বিমান দুর্ঘটনায়।

আমরা কথা বলছিলাম ঢিমা-চালে। এমন সময় গৃহে প্রবেশ করলেন রূপবান এক পুরুষ। ফর্সা রঙ, চোখে-মুখে দীপ্তি, পরনে ধবধবে পোশাক। একটা সোফায় গা এলিয়ে বসলেন। তারপর শুরু হলো তাঁর সেই বিখ্যাত কথকতা।

কতো কথাই না তিনি বললেন। তখন তাঁর মাথায় 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসটির প্ল্যান খেলা করছিলো। সেই উপন্যাসে কী কী থাকবে তা-ও মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের জানানো হয়ে গেলো এক ফাঁকে। হয়তো তাঁর তাড়া ছিলো, তাই বেশিক্ষণ তিনি বসেন নি। তবে অল্প সময়েই কথার যে ফুলঝুরি ঝরিয়ে গেলেন তাতে সেই ঘর হয়ে উঠলো দীপান্বিতা। পরে কথায় কথায় এই হঠাৎ সাক্ষাতের কথা তাঁকে বলেছিলাম একদিন। তাঁর মনে ছিলো না। মনে থাকার কথাও নয়। তখন তিনি আমার নাম জানতেন না। একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান লেখকের পক্ষে কোনো নগণ্য পদ্য-লিখিয়ের নাম না জানাই স্বাভাবিক।

পাকিস্তানী আমলে তিনি কালেভদ্রে এখানে আসতেন। কিন্তু তখন তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে ঢাকায় তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। পরপর কয়েকবার। একদিন আমার নামে একটি চিঠি এলো। পত্রলেখক স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী। চিঠিটি, বলা নিষ্প্রয়োজন, সবুজ কালিতে লেখা। চিঠির ভাষাও মজলিশি, সরস যা' আলী সাহেবেরই ট্রেড মার্ক। মায় 'ব্রাদার' শব্দটি ছিলো সেই চিঠিতে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি কবিতা পড়ে তিনি এই পত্র লিখেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর চিঠি পেয়ে, বলা নিষ্প্রয়োজন, খুব খুশি হয়েছিলাম। চিঠি পেয়েই তাঁর কাছে আমার যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু যাই যাই করে বহুদিন যাওয়া হয় নি নানা ঝামেলার দরুন। বন্ধুবর রশীদ করীমের তাগিদেই একদিন হাজির হলাম সৈয়দ মুজতবা আলীর ধানমণ্ডির সেই বাড়িতে যা এতদিনে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে আশা করি। গিয়েই পেলাম কথার সেই আশ্চর্য ভোজ। অবশ্য যথারীতি চা-ও এলো। তখন আমি ভীষণ সর্দিতে ভুগছিলাম। সর্দিতে আমাকে নাজেহাল দেখে তিনি আমার দিকে ভিক্স বাড়িয়ে দিলেন, তারপর টোবাকোর সঙ্গে কী একটা ওষুধ মিশিয়ে বিশেষ সিগারেট বানিয়ে আস্তে আস্তে ফুঁকতে বললেন। সেই সিগ্যারেট ফুঁকে খানিকটা আরাম পেয়েছিলাম বৈকি। এটা এমন কিছু ঘটনা নয় যা ঘটা করে বলা চলে। তবে এই সামান্য ঘটনাটি একজন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরে বলে আমি মনে করি। তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যা' মানুষ তার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গেই করে থাকে।

সৈয়দ মুজতবা আলীকে শেষবার দেখি হাসপাতালে। তিনি যখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে অসুস্থতাকে তুড়ি মেরে কিংবা কথায় ভেজিয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু লিখেছিলাম 'একান্ত ভাবনায়।' লেখাটি তাঁর চোখে পড়েছিলো।

শুনেছি তিনি খুশি হয়েছিলেন। লেখাটির কথা অনেককেই বলেছিলেন তিনি। আমার এই সামান্য নিবেদনে সৈয়দ মুজতবা আলী খুশি হবে, এতটা আমি আশা করি নি। যিনি আজীবন অসংখ্য পাঠককে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁকে এই ক্ষণিক-আনন্দ দিতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

তিনি এত শীগগীর তাঁর কথার ফোয়ারা বন্ধ করে এক অস্বস্তিকর নীরবতার জন্ম দিয়ে চলে যাবেন—আমরা কেউ-ই ভাবতে পারি নি। যদি বেঁচে থাকি, কোনোদিন তাঁর বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখবো—এমন একটা ইচ্ছা আছে আমার। যদি লিখি, তিনি সেটা পড়বেন না—এই খেদ এখনই আমাকে পীড়িত করছে। তবে এই মুহূর্তে তাঁকে হারানোর দুঃখই বড় বাজছে পাঁজরে পাঁজরে।

*১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪*

## বুদ্ধদেব বসু, তাঁর বাক্যের বাগান

তিরিশের যুগে বাংলা সাহিত্যে যে উজ্জ্বল ব্যক্তিটি চিহ্নিত হয়েছিলেন 'ইনফ্যান্ট টেরিবল' বলে সেই বুদ্ধদেব বসু অজস্র গ্রন্থ পেছনে রেখে চলে গেলেন মৃত্যুলোকে। এই ইন্দ্রপতনে সাহিত্যমনস্ক ব্যক্তিমাত্রই শোকাহত হয়েছেন। আমি এক ব্যক্তিগত শোক লালন করছি হৃদয়ের গভীরে। আমরা যারা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, আমরা যাঁরা তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত ছিলাম দীর্ঘকাল, তাঁদের কাছে তাঁর মৃত্যু পিতৃবিয়োগতুল্য। তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেলেন এমন এক শূন্যতা যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। এই উক্তি কোনো কথার কথা নয়, এটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য।

বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলেন স্বাতন্ত্র্যের নিশান উড়িয়ে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যিকারের সাড়া পড়ে গিয়েছিলো পাঠকসমাজে। শুধু কবি হিসেবেই নয় কথাশিল্পীরূপেও তিনি তরঙ্গায়িত করছিলেন সেকালের বাঙালী চৈতন্যকে। সে যুগে তাঁর একটি গল্প পড়ে এক পাঠিকা লেখককে আতুঁড়ঘরে কেন নুন খাইয়ে মেরে ফেলা হয় নি—এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। আঁতুড়ঘরে যে কোনো শিশুই লেখক হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে না কিংবা কলম ধরে না—এই সামান্য বোধটুকুও সেই পাঠিকা হারিয়ে ফেলেছিলেন উষ্মার প্রকোপে।

গোড়ার দিকে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন রবীন্দ্রদ্রোহীদের অন্যতম। তখন বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রলোকে কী ব্যাপক উদ্ভাসিত। কল্লোল যুগের লেখকগোষ্ঠী নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যেই রবীন্দ্রদ্রোহিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তা' বলে রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করতে মেতে ওঠেন নি তাঁরা। পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের কথা জাহির করতেন। বেশি করে বিরোধিতা করতেন রবীন্দ্রনাথের। তরুণ বুদ্ধদেব স্বয়ং উতলা রজনীর মধ্যযামে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতেন আর দুপুরে প্রবন্ধ লিখতেন কবি সার্বভৌমের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-গ্রাস থেকে

আত্মরক্ষার জন্যেই তিনি এই পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, বলা যায়। তবে তিনি পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্র প্রভাবকে ফলপ্রসূ করেছিলেন নিজের সাহিত্য সাধনায় এবং এই ঋণ অনেকাংশে মিটিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিভিন্ন সার্থক গ্রন্থ রচনা করে। অরুণ কুমার সরকার লিখেছিলেন, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য রচনার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল রবীন্দ্রচর্চার ফসলে পরিব্যাপ্ত। এই বিচিত্র নয়নাভিরাম উদ্যানে মালি ও মালাকে পৃথক করে দেখা শক্ত, এখানে রবীন্দ্রনাথকে যতটা পাচ্ছি বুদ্ধদেবকেও ততটা। লক্ষ্য করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে বুদ্ধদেব অল্পই মাথা ঘামিয়েছেন। একজন কারিগর সমধর্মী অন্য কারিগরের শিল্পকর্মকে যেভাবে দেখে থাকে, একান্ত কাছ থেকে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কারখানার উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে, বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-দর্শন অনেকটাই সেরকম। নামকরণে বা জাতি-বর্ণ-নির্ণয়ে তাঁর আগ্রহ নেই, রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দ নিয়ে যে ফুলটি ফুটে উঠেছে, তাঁর দৃষ্টি সেই সমগ্রতায় একাগ্র।'

বুদ্ধদেব বসু আমৃত্যু ছিলেন রাজনীতি-লাজুক। সাহিত্যে রাজনৈতিক মতামতের মাতামাতি তিনি কখনো পছন্দ করতেন না। তাই শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেই তিনি সর্বক্ষণ সন্ধান করেছেন বিশুদ্ধ শিল্প-সুষমা। সত্য তিনি রাজনীতি বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। কারুর মতামত নিয়ে তেমন মাথা ঘামান নি, কিন্তু তা' বলে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী কোনো লেখকের প্রাপ্য মূল্য দিতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—দু'জনই মার্কসবাদে দীক্ষিত। এই বিশেষ মতাদর্শের প্রতি নিঃস্পৃহ থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু এই দুই কবির প্রশংসায় ছিলেন অকৃপণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিখ্যাতি যখন খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো, যখন তিনি কাব্যপাঠকদের কাছে প্রায় অপরিচিত ছিলেন, তখন বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন 'কবিতা' পত্রিকায়। সেই সমালোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো, সন্দেহ নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎসাহী পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে উপেক্ষিত, আত্মলোপী জীবনানন্দ দাশের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। জীবনানন্দের জনপ্রিয়তার পেছনে বুদ্ধদেবের অবদান অনেকখানি। বস্তুত, আধুনিক বাংলা কবিতাকেই অনেকাংশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সমসাময়িক বাঙালী কবিদের বিষয়ে তিনি অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন বার বার, আধুনিক কাব্য আন্দোলনকে লালন করেছেন তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায়। বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় যদি 'কবিতা' প্রকাশিত না হতো তাহলে আধুনিক বাংলা কবিতা এতখানি প্রসার লাভ করতো কি না, এ সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান।

সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যা পুষ্পিত হয়ে ওঠে নি বুদ্ধদেব বসুর শিল্পিত প্রয়াসে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর এমন বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে কোনো লেখক জন্মান নি। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর মর্যাদা পাবেন চিরকাল, কবি হিসেবে তাঁর উজ্জ্বলতা কখনো ম্লান হওয়ার নয়। অসাধারণ কিছু ছোটগল্প লিখেছেন তিনি, রচনা করেছেন মননশীল সজীব উপন্যাস। বাংলা নাটকে এনেছেন অসামান্য শিল্পসম্মত ভিন্নতা। কী শিল্প সাহিত্য বিষয়ক গুরু প্রবন্ধ, কী লঘু প্রবন্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি রেখেছেন মেধা ও লিপিকুশলতার স্বাক্ষর। তিনি সেই বিরল গদ্য লেখকদের অন্যতম যিনি নিজস্ব স্টাইলের অধিকারী। বুদ্ধদেব বসুর কোনো এক উপন্যাসের নায়ক স্যুইনবর্ণের কবিতাকে তুলনা করেছিলেন সন্দেশের সঙ্গে। আমি

নিজে বুদ্ধদেবের গদ্যকে সুখাদ্যের সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসি। তাঁর যে কোনো গদ্যরচনা শুরু করলে শেষ করতেই হবে পাঠককে—এমনই সম্মোহনী শক্তি সেই গদ্যরীতির।

বার্ধক্য তাঁর শরীরে বাসা বাঁধলেও নিজস্ব কোনো ছাপ পড়ে নি তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর লেখা সব সময়ই অত্যন্ত তরতাজা। ঈর্ষাযোগ্য মানসিক তারুণ্যের অধিকারী ছিলেন এই শিল্পী মানুষটি। আমৃত্যু লিখে গেছেন তিনি, এক বিরতিহীন উৎসবে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। নিজস্ব রচনায় তো তিনি অনলস ছিলেনই, অনুবাদেও ছিলেন অক্লান্ত। বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে কালিদাসের 'মেঘদূত' বোদলেয়ার, রিলকে ও হোল্ডার্লিনের কবিতাবলী। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদকর্ম আশ্চর্য উপকারী হয়েছে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার পক্ষে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ভূগোলে যে পরিবর্তন এসেছে তার মূলে রয়েছে বুদ্ধদেবের অনূদিত গ্রন্থাবলী। এই উক্তিটি অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও সত্য।

বুদ্ধদেব বসু আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। আমরা তাঁর জীবনের দুটি পর্যায়ের কথা জেনেছি 'আমার ছেলেবেলা' ও 'আমার যৌবন' নামক রচনাদ্বয়ে। 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে; 'আমার যৌবন' এখনো মুদ্রিত হয় নি। জানি না, জীবনের শেষ পর্যায়ের কথা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন কিনা। না করে থাকলে, আমরা যারা তাঁর অনুরক্ত ভক্তপাঠক তারা বঞ্চিত হলাম এক অসামান্য ভোজ থেকে।

যদিও কলকাতায় থাকতেন তিনি, তবু ঢাকার প্রতি ছিলো তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাঁর অসংখ্য রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে ঢাকার কথা। একবার সেই বিখ্যাত ২০২ রাসবিহারী এভেনিউর দোতালায় বসে তিনি ঢাকা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন মনে পড়ে। তিনি আমাকে পুরানা পল্টনের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রায় শিশুর ঔৎসুক্য নিয়ে। যে ঢাকাকে তিনি এতো ভালোবাসতেন, সেই ঢাকায় তিনি আসতে পারেন নি আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আমন্ত্রণে তাঁর ঢাকা আসার কথা ছিলো এপ্রিল মাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাঁর আগেই তিনি লোকান্তরিত হলেন।

*১৯শে মার্চ ১৯৭৪*

## নিঃসঙ্গ গোধূলিতে অসামান্য বন্দী

কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি ফটোগ্রাফ দেখলাম সংবাদপত্রে। এখনকার ফটোগ্রাফ, সেই বিখ্যাত জ্বলজ্বল একজোড়া চোখ, কিন্তু দৃষ্টি উদভ্রান্ত। যেন তিনি এই পৃথিবীকে দেখছেন না, অন্য কোন গ্রহের রূপ দেখে তিনি দিশেহারা। এই রূপ বর্ণনা করার ভাষা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। স্বাভাবিকতার গণ্ডির বাইরে তিনি। ভয়ানক নিঃসঙ্গ এই অসামান্য শিল্পী-পুরুষ অথচ নিজের নিঃসীম নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন, দিনানুদৈনিক টানাপোড়েন থেকে বিচ্ছিন্ন। যখন তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দেন, তাকান গাছপালার দিকে, তখন কি অনুভূতির জন্ম হয় তাঁর ভেতর তা কোনো দিনই জানবো না আমরা। যখন একটি কি দুটি পাখি চোখে পড়ে তাঁর, কিংবা যখন দেখেন তাঁর

কোনো আপনজনকে, অনেক দিনের চেনা কাউকে, তখন কী ভাবেন তিনি? অতল অন্ধকারে কি পাখা ঝাপটায় স্মৃতির কোনো ধূসর পাখি? জানার উপায় নেই আমাদের।

শোনা যায়, লোকজন দেখলে কবি খুশি হন। একদা যিনি হৈ হৈ জীবন যাপন করেছেন, হাসি হল্লা—মজলিশে মাতিয়ে রেখেছেন সবাইকে, আসর গুলজার করে রাখাই ছিল যে দিলদরাজ কবি-পুরুষের স্বভাব, এখনো এক ক্ষমাহীন স্তব্ধতার মধ্যেও তিনি লোকজন দেখলে কিছুটা আনন্দ-চঞ্চল হয়ে ওঠেন জানতে পেরে আমাদের মনের গুলবাগিচার ফুলশাখা দোলায়িত হয়ে ওঠে। কখনও আবার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে নিজেরই অজান্তে। একদিন যিনি অল্প চেনা কোনো ব্যক্তিকেও সানুরাগ আলিঙ্গানে বাঁধতেন, অনর্গল কথা বলতেন হাসিমুখে, তিনি আজ একান্ত প্রিয়জনদের দেখেও নিঃসাড় হয়ে থাকেন, থাকেন নিশ্চুপ হয়ে।

মানুষের প্রতি নজরুলের ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই মানবপ্রেম তাঁর কাব্যের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। তিনি নিজেকে সর্বহারাদেরই একজন বলে মনে করতেন। সর্বহারাদের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর লেখনীকে। নজরুল-লেখনী থেকে পুষ্প ও অগ্নি দুই-ই ঝরেছে অবিরল। শিল্পসুষমার সঙ্গো তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর কিছু কবিতা এবং বহু গান অসামান্য শিল্প গুণান্বিত, একথা কঠোরতম সমালোচকও স্বীকার করবেন।

কিন্তু এই অসাধারণ শিল্পী মাঝে মাঝে অশিল্পকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন, 'অমর কাব্য' লেখার লোভ জয় করে। তিনি তাঁর বহু কবিতাকে খাটাতে চেয়েছেন নিপীড়িত, নির্যাতিত, শৃঙ্খলিত মানুষের কাজে। এজন্য শিল্পগুণকে খর্ব করতেও তিনি দ্বিধান্বিত হন নি। কিন্তু এসত্ত্বেও আমরা পেয়েছি বিদ্রোহীর অবিনাশী গান। হ্যাঁ, তাঁর বহু গান বাঙালীর মুখে মুখে ফিরবে চিরদিন।

সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠী নজরুল কাব্যে নিজেদের কাব্যকলার পক্ষে জরুরি কোনো উপাদান তেমন খুঁজে পান না সত্য, কিন্তু তিনি যে বাংলা কবিতার সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছেন এই সত্যটি তাঁরা ভোলেন না কখনো।

কাজী নজরুল ইসলামের বর্তমান জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিশ্ববরেণ্য জার্মান কবি ফ্রীডরীশ হ্যোল্ডার্লিনের কথা। দীর্ঘকাল তার, কেটেছিলো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। উন্মত্ততা তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো আমৃত্যু। টমাস মান বলেছেন, শিল্পীর সঙ্গো অসুস্থতার একটি সংযোগ রয়েছে। কী ভয়ংকর সত্য যে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি বোদলেয়ারের জীবনী পাঠ করে। পল গঁগা, ভ্যান গগ, মিজিনিস্কি, নীটশে প্রমুখের জীবনও সাক্ষ্য দিচ্ছে টমাস মানের উক্তির স্বপক্ষে। এঁদের যন্ত্রণার কথা জেনে আমাদের মন বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যারা অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠায় মানুষকে আনন্দলোকে ভ্রমণের ছাড়পত্র দেন, তাঁরাই অনেক সময় কাটান যন্ত্রণাদগ্ধ নিরানন্দ জীবন। যে নজরুল একদা সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে আনন্দ বানে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সারা বাংলাকে, এখনো যাঁর গান শুনে স্পন্দিত হয় আমাদের বুক, সেই কবির জীবনে আজ কোনো আনন্দ নেই, তাঁর একান্ত গুলবাগিচার সব ফুল, শাখা-ই আজ শূন্য।

অস্বাভাবিকতার এক ধোঁয়াটে, গোধূলিময় নিস্তব্ধপুরীতে তিনি বন্দী। আমরা এই অলোকসামান্য বন্দীকে বন্দনা করে ধন্য, ধন্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

*২৭শে মে ১৯৭৪*

## মেঘের পরে মেঘ জমে, আঁধার করে আসে

ধান মেপে দেয়ার আর দরকার নাই; বৃষ্টি বেশ ঝেঁপেই এসেছে। কেন বৃষ্টি হচ্ছে না এ নিয়ে আর খেদোক্তি করার আর অবকাশ রইল না। দিনে বৃষ্টি, রাতে বৃষ্টি, ঢাকা শহর এখন বৃষ্টিময়। বর্ষার আকাশে নবীন মেঘের আনাগোনা দেখলেই আমাদের মনে পড়ে কালিদাসের মেঘদূতের কথা, বৈষ্ণব পদাবলীর কথা, রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের কথা। বর্ষার সঙ্গে বিরহের নিবিড় সংযোগ রয়েছে বলেই কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যের নায়ককে করেছে বিরহী। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতিও ভরা বাদরে শূন্য মন্দিরের কথা বলে বর্ষার অবিরল জলাধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন বিরহেরই সুর। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কাব্যেও ফুটে উঠেছে এক আকুল বিরহ। 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়', কিন্তু দু'জন মুখোমুখি বসে থাকলেও বুকে জেগে থাকে এক অজ্ঞাত গভীর দুঃখ, যা গহন নদীর মতোই অন্তর্লীন। এ কি বিচ্ছেদ বেদনা? ভাবতে অবাক লাগে, প্রেমিক ও প্রেমিকা এক সঙ্গে রয়েছে, তবু কেন তাদের সত্তায় নেমে আসে মেঘের ছায়া? কী বোঝাতে চান রবীন্দ্রনাথ? দু'জন মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, রয়েছে যে নিঃসঙ্গতা তার কথাই বলেছেন তিনি। এই বিরহ অন্তহীন এবং এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তোর পাশেই আছি তবু একা।'

যা হোক, এবার ঢাকায় বর্ষাবরণ বেশ ভালোভাবেই করা হয়েছে দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই দুটি অনুষ্ঠানেরই উদ্যোক্তা সৎ সঙ্গীত প্রসার সমিতি। সত্যি, এই নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির কাছে আমাদের প্রচুর ঋণ জমে উঠেছে। যে রাতে, 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানটি হলো, সে রাতে বৃষ্টি নেমেছিলো রিমঝিম সুরে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য ভাণ্ডারী শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রী এবং বিখ্যাত গায়িকা নীলিমা সেন। এই অনুষ্ঠানটির কয়েক দিন পরে নীলিমা সেনের একক গানের একটি অনুষ্ঠান হল চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গান গাইলেন সে-রাতে একঘর শ্রোতার সমানে। ঘর উপচে পড়েছিলো লোকে। অনেকে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান শোনার জন্যে। বর্ষার গান শোনার নীলিমা সেনের কণ্ঠে। এই অসাধারণ শিল্পীর কণ্ঠ থেকে সুর হয়ে ঝরলো গীতবিতানের কয়েকটি পাতা। অবাক হয়ে শুনলাম। সেদিন তাঁর গলা খুব ভালো ছিলো না, গাইতে কিছুটা কষ্টও হচ্ছিল বলে আমার মনে হয়েছিলো। কিন্তু একজন সত্যিকারের শিল্পীর মতোই তিনি সব কষ্ট উজিয়ে পর পর শোনালেন কয়েকটি গান। শ্রোতাদের বঞ্চিত করেন নি তিনি। বিশেষ করে তাঁর 'বন্ধু রহ সাথে' কোনোদিন ভোলার নয়। এই সুর চিরদিন গুঞ্জরিত হবে আমার স্মৃতিতে।

নীলিমা সেনের কণ্ঠে একটা মেদুর বিষণ্ণতা রয়েছে যা আমার চৈতন্যে ছেয়ে আসে মেঘের মতো, মনের ভেতর জেগে ওঠে এক অবর্ণনীয় দুঃখবোধ। খামোখাই আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'দুঃখের গান' নামক প্রবন্ধটি নীলিমা সেনকে উৎসর্গ করেন নি।

বর্ষা আমার ভালো লাগে। কিন্তু যখন পুরোনো ঢাকার কথা ভাবি, আমার বাসস্থানের কথা ভাবি, যখন ভরা বর্ষায় ঢাকার নীচু এলাকার বাসিন্দা হওয়ার খেসারত দিতে হয় পদে পদে, তখন আবার বর্ষাবিমুখ হয়ে পড়ি। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, সেই একটানা সুর শুনতে কার না ভালো লাগে? কার না ভালো লাগে বৃষ্টির জালে আটকে-পড়া শহরের রূপ দেখতে? অন্ধকার মধ্যদিনে ছাদে, উঠোনে, রাস্তায়, বাগানে, পার্কে, গলিতে বৃষ্টি ঝরে অবিরল—এ-ও তো দেখার মতো দৃশ্য। সেই মুহূর্তে আমাদের মনের মাটিতেও পড়ে বৃষ্টি এই অনুভূতি আমাদের অনেকেরই, কিন্তু একে বাঙ্ময় করে তোলার প্রয়োজন হয় একজন অমিয় চক্রবর্তীর। 'কেঁদেও পাবে না তারে বর্ষার অজস্র জলধারা'—বর্ষা সম্পর্কিত এই আশ্চর্য পঙক্তিটিরও রচয়িতা অমিয় চক্রবর্তী।

বর্ষা এবং বর্ষার গানের সম্মোহীন শক্তির কথা আমি ভুলি নি। কিন্তু যখন পুরোনো ঢাকার নোংরা পানি ঠেলে বাড়ি ফিরতে হয়, যখন ঢাকার নিচু এলাকার বাসিন্দাদের বর্ষাজনিত দুঃখ-দুর্দশা দেখতে হয়, অংশীদার হতে হয় সেই দুর্ভোগের, তখন চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, 'বৃষ্টি তুই থাম।'

দুর্ভোগের সময় বৃষ্টির ওপর যত রাগই করি না কেন, মন যত বিষিয়েই উঠুক না কেন, তবু যখন কানে আসে 'মেঘের পরে মেঘ জমে আঁধার করে আসে', কিংবা 'বাদর মেঘে মাদল বাজে', অতবা 'গগনে গগনে ডাকে দেয়া, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে' গানের সুর, তখন আমার কী যে ভালো লাগে। হায় আমার বৈরী ভালো লাগা।

*৬ই জুলাই ১৯৭৪*

## মনে রেখো, তবু মনে রেখো

কয়েক দিন আগে তাঁর বিষয়ে লিখেছিলাম। কমল দাশগুপ্তের কথা বলছি। কোনো বিশেষ উপলক্ষ ছিল না, এমনিতেই এই অসামান্য গায়ক ও সুরকারের কথা উত্থাপন করেছিলাম সেদিন। অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার তাঁর সম্পর্কে লিখতে হবে, আশা করি নি। তাঁর মতো শিল্পীর কথা বারবার বললেও কম বলা হয়। তাই কমল দাশগুপ্ত বিষয়ে আবার লিখছি বলে কোনো খুঁতখুঁতানি নেই আমার। লিখতে গিয়ে যখনই ভাবছি তিনি নেই, তখনই মনে একটা বিষণ্ণ সুর বেজে উঠছে। লোকান্তরিত কমল দাশগুপ্তের কথা লিখতে হচ্ছে বলেই খারাপ লাগছে আমার।

তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি। একবারই শুধু দেখেছি তাঁকে। তা-ও দূর থেকে। কয়েক বছর আগের কথা। বিখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয়, ওস্তাদ নাজাকাত আলী ও সালামত আলী, কয়েক দিনের জন্য এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকার রসজ্ঞ ব্যক্তিরা তখন পুণ্যস্নান করছেন সেই প্রতিভাবান শিল্পীদ্বয়ের সুরের ঝর্ণাধারায়।

তাঁদেরই একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে আমি কমল দাশগুপ্তকে দেখি। বয়সের ছাপ তাঁর সার শরীরে। বেশ কিছুটা নিস্তেজই মনে হলো। একজন হেরে যাওয়া মানুষকেই যেন দেখলাম। ভাবলাম, এই কি সেই কমল দাশগুপ্ত যাঁর কণ্ঠসুরে আন্দোলিত হয়েছি বার বার? এই কি সেই সুরকার যাঁর সুরবন্যায় ভেসে গেছে অসংখ্য হৃদয়? আমার মনের শিল্পীর সঙ্গে এই ম্রিয়মাণ মানুষটিকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না সেদিন। কিন্তু যখন তানপুরা উঠলো, ঝংকৃত হলো সুরমণ্ডল, নাজাকাত আলী ও সালামত আলীর কণ্ঠে লতিয়ে উঠলো সপ্তসুর, তখন কী এক জাদুবলে কমল দাশগুপ্ত রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক আভা— মনে হলো, একজন তরুণ জেগে উঠেছে তাঁর ভেতর। গুণীর সান্নিধ্যে উদ্দীপিত হলেন আরেক গুণী—যেমন একটি দীপ থেকে জ্বলে ওঠে অন্য এক দীপ। আমি তাঁকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

তিনি কমল দাশগুপ্ত, সংগীতে সমর্পিত ছিলেন আজীবন। সুরের ভুবনে তিনি প্রবেশ করলেন মাত্র বারো বছর বয়সে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার ব্রত নিলেন কৈশোরেই। প্রথমে বাড়িতেই শুরু হলো সঙ্গীত সাধনা বড় ভাইয়ের সুরের ছায়ায়। তিনি অগ্রজের কাছে শিখলেন খেয়াল। সেদিন বড় ভাইয়ের কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে তিনি যে অনুজ শিল্পীকে গান শেখাচ্ছেন, তিনি বাস্তবিক সুদূরের পথিক, সেদিনই অগ্রজ তাঁকে পরামর্শ দিলেন বড় ওস্তাদের দীক্ষা গ্রহণের জন্যে। কারণ, মাত্র কয়েকদিনেই কমল দাশগুপ্ত পুরোপুরি শোষণ করে নিয়েছেন অগ্রজের সুরের ভাণ্ডার। পরবর্তীকালে কমল দাশগুপ্ত অসাধারণ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে গান শেখেন, গুরু হিসেবে পান ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁকে। অবশ্য ওস্তাদ জমীরুদ্দীনের শাগরেদী হাসিল করার জন্যে কমল দাশগুপ্তকে ঘুরতে হয়েছিলো তিনটি বছর। শাগরেদ সত্যি সঙ্গীত চর্চায় আগ্রহী কিনা তা পরখ করে নেয়ার জন্যই ওস্তাদ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন বার বার। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানে বিন্দুমাত্র অবদমিত হন নি সুরপিয়াসী কমল দাশগুপ্ত। যখনই এই জেদী যুবার অধ্যবসায় সম্পর্কে ওস্তাদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, তখন খাঁ সাহেব তাঁকে শাগরেদ হিসাবে গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করলো যে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ তাঁর ঘরনার পুঁজি অপাত্রে দান করেন নি। কমল দাশগুপ্ত শুধু একজন প্রতিভাবান গায়ক বলেই পরিচিত হলেন না, প্রতিষ্ঠা পেলেন সুরকার হিসেবেও। চিরদিন তিনি রাগরাগিনীর সময় ভোলানোর খেলায় মেতেছিলেন। যদিও মার্গসঙ্গীতেই ছিল তাঁর অপার আনন্দ, তবু আধুনিক গানকে তিনি কুনজরে দেখেন নি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার ছিল বলে তিনি হতে পেরেছেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার। বস্তুত তিনি অমরদের একজন।

কাজী নজরুল ইসলামের তিন শ' গানের সুর দিয়েছেন কমল দাশগুপ্ত। স্বয়ং কাজী নজরুল অসামান্য এক সুরস্রষ্টা, সুতরাং তাঁর বাণী বাঙময় হয়ে উঠবে অন্য আর যাঁর সুরের স্পর্শে তাঁকে হতেই হবে অসাধারণ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ নজরুল যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, কম পুঁজি নিয়ে আসরে নামা তাঁর সাজে না। কমল দাশগুপ্ত সত্যিকারের সুরসাধক, তাই সুরস্রষ্টা নজরুলের যোগ্য প্রতিযোগী হতে পেরেছিলেন। নজরুল যিনি স্বভাবতই উদার

পুরুষ, সানন্দ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্তকে। অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সুরকার তিনি। এখনো অনেকে সে সব গান গুন গুন করেন কোনো কোনো কাজ ভোলানো মুহূর্তে। যাদের কণ্ঠে সেই গানগুলি গুঞ্জরিত হয় তারা কেউই যুবক নন আর। তাঁদের ঢের বয়স হয়েছে। তাঁরা এখন অবসন্ন—কিন্তু মাঝে মাঝে অতীত দিনের কোনো কোনো গানের কলি হয়তো তাদের অজান্তেই গুনগুনিয়ে ওঠেন তাঁরা। হয়তো তাঁদের মনেও পড়ে না যে তাঁদের এই প্রিয় গানগুলোর সুরকার কমল দাশগুপ্ত। যিনি অজস্র মানুষকে আনন্দ যুগিয়েছেন দিনের পর দিন। তাঁর শেষ জীবন কি খুব সুখের ছিল? জানি না। না, আমি তাঁরএকান্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলছি না। তিনি সহধর্মিণী হিসেবে পেয়েছিলেন বিখ্যাত গায়িকা ফিরোজা বেগমকে। তাঁরা দুজনেই ছিলেন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, প্রেমস্নিগ্ধ জীবনযাপন করেছেন তাঁরা। কিন্তু একজন প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে যে মর্যাদা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পান নি। পারিপার্শ্বিক চরম ঔদাসীন্য দেখে ও অবহেলা দেখে তিনি তাঁর নিজস্ব খোলে গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে, নিজেকে সব সময় আড়াল করে রেখেছিলেন এক দারুণ অভিমানে। সঙ্গীত শিল্পীকে যখন জীবিকার জন্যে মণিহারী দোকান খুলে বসতে হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চরিত্রে দেখা দেয় রুক্ষতা, কোনো সাংবাদিক তাঁর খবরাখবর নিতে গেলে নাকি রুক্ষ হয়ে উঠতেন সেই শিল্পী মানুষটি। তাঁকে দোষ দেয়া চলে না। এটুকু অভিমানতো তিনি করতেই পারেন। আরেক জন অভিমানী গুণী আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন নীরবে। তাঁর কাছের মানুষদের তিনি প্রায়শই বলতেন, 'মাঝে মাঝে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।' 'আমি নীরব রয়েছি, একদিন নীরবে চলে যাবো, তারপর হয়তো তোমরা আমাকে স্মরণ করবে'। কমল দাশগুপ্তের একটি গানে আছে 'মম স্মৃতি মনে রেখো।' হ্যাঁ, তিনি জীবিত থাকবেন লোকস্মৃতিতে। সবাই হয়তো মনে রাখবে না তাঁকে, কিন্তু চিরদিন মনে রাখবে তারা, যারা তাঁর সুরের ভুবনে আশ্রয় খুঁজে পাবে, সঙ্গীতে যারা সমর্পিত।

*২৩শে জুলাই ১৯৭৪*

## নাটক নাটক আরো নাটক

রোববারের সকালটা নিয়ে কী করা যায়, অনেকে ভেবে পান না। ছুটির সকাল, অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই, রিকসা কিংবা বাস ধরার গরজ নেই। দাড়ি কামালে চলে, না কামালেও চলে। অফিসে তো আর যেতে হবে না যে না কামালে দাড়ি নিয়ে কেউ ফোড়ন কাটবেন। কিন্তু তা বলে তো রোববারের একটা ফুরফুরে সকাল কিছু না করে বইয়ে দেয়া যায় না? আর কোনো ব্যাপারে আমার প্রতিভা না থাক, কিছুই না করে সময় কাটানোর অশেষ ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মেছি। তাই, রোববার সকাল নিযে আমার তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণে গুণে, দেয়ালকে স্বপ্নের এক অনুপম রাজ্য বানিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু আমার মতো জাতকুঁড়ে তো আর সবাই নয়। অনেকেই রোববারের সকালটা উপভোগ করতে চান একটু অন্যভাবে। বাইরে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে, ভালো কিছু দেখে-টেখে। যারা বিত্তবান, যাদের গাড়ি আছে, তাদের অবশ্য কোনো ঝক্কি-ঝামেলা নেই। ইচ্ছে হলেই তারা হুট করে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে চলে যেতে পারেন জয়দেবপুর কিংবা চন্দ্রায় পিকনিক করতে। অর্থাৎ লাল রোববারকে লালর করে তুলতে তাদের খুব কাঠ-খড় পোড়াতে হয় না, কিছু পেট্রোল পোড়ালেই চলে।

যত মুশকিল এই মধ্যবিত্তদের, যাদের সাধ আছে ষোল আনা, অথচ সাধ্য নেই এক রত্তি। ভালো কাপড়-চোপড় পরার ইচ্ছা আছে, গাড়ি চড়ার স্বপ্ন আছে, আছে অন্য ধরনের আরো সাধ-আহ্লাদ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে চন্দ্রার দিকে ধাবিত হওয়ার দুরন্ত বাসনা তাদের মনের ভেতরও উথাল-পাতাল করে। নিদেন পক্ষে সপরিবারে একটা মর্নিং শো দেখার ইচ্ছা অনেক মধ্যবিত্তের মনেই সুড়সুড়ি দেয়। সপরিবারে মর্নিং শো দেখার সামর্থই বা ক'জনের আছে? সবকিছুর মতো সিনেমার টিকেটের দামের মেজাজও এখন বেজায় শরীফ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফাঁকি দিয়ে কালেভদ্রে মর্নিং শো কেউ কেউ দেখতে পারেন হয়তো। কিন্তু ভালো ছবি কোথায়? ফিল্ম দেখার ব্যাপারে যাদের রুচি উন্নতমানের তারা গাঁটের পয়সা খরচ করে খামোকা দু-তিন ঘণ্টাব্যাপী বিরক্তি কিনতে যাবেন কেন? অনেক আগে মর্নিং শো-তে উঁচু দরের বিদেশী ফিল্ম দেখা যেত। তখন দেখেছিও। কিন্তু আজকাল সে গুড়ে বালি।

কয়েকটি নাট্যসংস্থাকে ধন্যবাদ, আজকাল কোনো কোনো রোববারের সকাল আমাদের ভালোই কাটে। আমরা নাটকে দেখার সুযোগ পাই রোববারের সকালে। আস্তে-সুস্থে বেশ জমে উঠেছে নাটকের আসর। থিয়েটার, নাগরিক, ঢাকা থিয়েটার এবং বহুবচন প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর শ্রম ও নিষ্ঠার ফলে আমরা কিছু ভালো নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছি। প্রত্যেকটি নাট্যগোষ্ঠীতেই রয়েছেন কয়েকজন নিবেদিত-চিত্ত কুশলী নাট্যমাতাল কর্মী। তাঁরা জানেন, পরিবেশ প্রতিকূল, নাটক-পছন্দ লোকের সংখ্যা কম, ভালো কোনো স্টেজ, থিয়েটার-হল নেই। কিন্তু কিছুই তাঁদের নিরুৎসাহিত করতে পারে না, নিরস্ত করতে পারে না নাটক মঞ্চস্থ করা থেকে। তাঁরা কাজ করে চলেছেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে—তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময়ের একটি বিরাট অংশ তারা নিবেদন করেছেন নাট্যকলার প্রতি। তাঁদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই যে সফল হচ্ছে, একথা বলি না; তবে তাঁরা দর্শক তৈরি করে চলেছেন, জীইয়ে রাখছেন নাট্য আন্দোলনকে। ব্যতিক্রমী নাটক মঞ্চস্থ করার দিকেই এদের ঝোঁক এবং এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এই মুহূর্তে আমার অন্য একটি নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ছে। এখানকার নাট্যমোদীদের ড্রামা সার্কেলের ঐতিহ্য ভোলার কথা নয়। স্মৃতি যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে, তবে আমি বলব, ঢাকায় প্রথম ব্যতিক্রমী নাটক মঞ্চস্থ করেন ড্রামা সার্কেলের শিল্প সচেতন কর্মীরা। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁরা এ্যাবসার্ড রীতিতে লেখা 'কালবেলা' নামক নাটকটি উপহার দিয়েছিলেন দর্শকদের। দুঃখের বিষয় ড্রামা সার্কেল এখন নিষ্ক্রিয়। আমরা কবে আবার দেখবো ড্রামা সার্কেলের নাটক?

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে ঢাকার নাট্য-আন্দোলন আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো মূলত ঢাকা থিয়েটার ও বহুবচনের উদ্যমে। এরপরে হঠাৎ আলো ঝলকানির মতো ঝলমল করে উঠলো থিয়েটার ও নাগরিক নাট্যগোষ্ঠীর প্রচেষ্টাগুলো।

এই সেদিন দেখলাম থিয়েটার প্রযোজিত নাটক 'এখন দুঃসময়'। সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত এই নাটক। এ ধরনের নাটক উপযুক্ত মঞ্চে অভিনীত হওয়া দরকার, যাতে বেশীসংখ্যক দর্শক দেখার সুযোগ পায়। যাদের জীবন কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য, তারা কেন দেখতে পাবেন না এমন নাটক? বেশী করে তাদেরই তো দেখা উচিত। তাদের দেখাতে পারলে, একটা কাজের মতো কাজ হয়। প্রচুর অসুবিধা রয়েছে জানি, কিন্তু যাঁরা প্রতিকূল পরিবেশে নাটক নিয়ে মেতে আছেন তাঁরা অনেক কষ্টই স্বীকার করেছেন,—সাধারণ দর্শকদের কথা ভেবে তাঁরা না হয় আরেকটু কষ্ট ভোগ করলেন। এই মুশকিল তাঁদেরই আসান করতে হবে। শীতের মওসুমে আমরা উন্মুক্ত মঞ্চে নাটক দেখতে পাবো কি?

থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর একটি বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করতে ভারি ইচ্ছে করছে। তাঁরা নিয়মিত প্রকাশ করছেন 'থিয়েটার' নামক নাট্যসর্বস্ব একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি রুচিশীল এবং সুদৃশ্য। পত্রিকাটির সম্পাদক এবং কর্মীরা বলতেই হয়, এক অসাধ্য সাধন করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা নাটকপ্রিয় পাঠকদের মন জয় করেছেন, তাঁদের বেঁধেছেন কৃতজ্ঞতাপাশে। এই পত্রিকাটি এখনকার নাট্য আন্দোলনকে জোরদার ও বয়স্ক করে তুলবে, সন্দেহ নেই।

*১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪*

## ডিসেম্বর মানেই এক গভীর দীর্ঘশ্বাস

ডিসেম্বর মানেই এক গভীর দীর্ঘশ্বাস, ডিসেম্বর মানেই এক সুতীব্র হাহাকার। ডিসেম্বরের শরীরে শুধু চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগে নেই, ডিসেম্বরের চোখেও জমাট বেঁধে আছে অজস্র অশ্রুকণা। সত্য, উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বর আমাদের জন্যে নিয়ে এসেছিলো মুক্তির সনদ, কিন্তু এ মাসেই আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের কতিপয় মেধাবী সন্তানকে। তাই ডিসেম্বর আমাদের বেদনার্ত করে তোলে, আমাদের সত্তার শেকড়সুদ্ধ নাড়িয়ে দেয় প্রবলভাবে।

ডিসেম্বর আবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় কিছু ভয়াবহ ঘটনা, আবার আমরা যাত্রা করি এক দুঃস্বপ্নের রাজ্যে। কয়েকটি মুখ মনে পড়ে নতুন করে। মনে পড়ে তাঁদের কথা যারা আমাদের অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। আমরা বার-বার দেখেছি তাঁদের, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, আলাপ করেছি নানা সমস্যা নিয়ে। বুদ্ধিজীবী তাঁরা—কেউ লেখক, কেউ সাংবাদিক, কেউ চিকিৎসক, কেউবা অধ্যাপক। কী করে ভুলবো মুনীর চৌধুরীকে? মুনীর চৌধুরীর সুহৃদ শহীদুল্লাহ কায়সারকেই বা ভুলি কী করে? মোফাজ্জল

হায়দার চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, নিযামুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নাজমুল হক, আ-ন-ম গোলাম মোস্তফা, আলীম চৌধুরী, ফজলে রাব্বী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান, গিয়াসউদ্দীন আহমদ, মোঃ আবুল খয়ের—এঁদের প্রত্যেকের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে, জীবনের প্রখর মধ্যাহ্নে এঁরা নিহত হয়েছিলেন মানববিরোধী এক অশুভ শক্তির হাতে। আল বদরদের যুগে বলি হয়েছিলেন বাংলাদেশের কয়েকজন কৃতী পুরুষ। বেছে বেছে এঁদের হত্যা করা হয়েছিলো, কারফিউ-ছাওয়া, কাঁটাতার ঘেরা ঢাকা শহরে। কিভাবে তাঁদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, কিভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছিলো, সেদিন ঢাকাবাসীরা জানতে পারেন নি। শহীদদের পরিবারবর্গরা শুধু জানতেন যে তাঁদের প্রিয়জনদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা তাঁরা এখনো জানতে পারে নি। জানতো শুধু কারফিউ-ছাওয়া ঢাকা শহরের ভীষণ বিষণ্ন পথ আর কিছু গাছপালা। পরে পাওয়া গেলো তাঁদের সন্ধান। তখন তাঁরা শহীদ। তখন বাংলাদেশের মেধাবী সন্তানেরা একেকটি গলিত লাশ—শেয়াল কুকুরের খোরাক। কয়েকজনকে শনাক্ত করা গেলো, কারো কারো লাশ শনাক্তই করা গেলো না শেষ পর্যন্ত। লাশ না পেয়ে ফিরে এলেন তাঁদের শোকার্ত আত্মীয়স্বজন, অনুরাগীগণ।

কেন এঁদের হত্যা করা হয়েছিলো? কেন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এঁদের চিহ্নিত করেছিলো সংহারের জন্যে। এই প্রশ্নের জবাব মিলবে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারায়, তাঁদের জীবন দর্শনে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার ও দুর্ধর্ষ গোড়ামির বিরুদ্ধে সব সময় কথা বলেছেন তাঁরা, লড়েছেন প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে। যারা প্রতিক্রিয়াশীল তারা ভয় পায় বুদ্ধিজীবীদের। পাকিস্তানী শাসকচক্র বুদ্ধিজীবদের ভয় পেতো বলেই আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলো তাদের সাঙাৎ আল বদর গোষ্ঠীকে। ওরা সুপরিকল্পিতভাবেই মেতে উঠেছিলো বুদ্ধিজীবী হননে। সময় পেলে ওরা আরো কতো বুদ্ধিজীবীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতো কে জানে।

সৎ বুদ্ধিজীবীরা শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ থাকতে পারেন না; তাঁরা অন্তর তাগিদেই জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান, বেড়ার ওপর বসে থাকতে পারেন না নিশ্চিন্ত মনে। এজন্যে সব রকম বিপদের ঝুঁকি তাদের নিতে হয়? এমনকি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয়ে। তাই আল বদরের হাত রঞ্জিত হয় বুদ্ধিজীবীদের রক্তে। প্রতিক্রিয়াশীলচক্র বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে তাদের দুর্বলতাকেই তুলে ধরেছিলো সবার সমানে। তারা মনে মনে পরাজিত হয়েছিলো শুভবাদী চিন্তার কাছে প্রগতিশীল জীবনদর্শনের কাছে। তারা এটা ভালো করেই জানতো যে আইডিয়ার লড়াইয়ে তারা কখনো প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তারা বেছে নিয়েছিলো হিংসার পথ।

একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বরকে ওরা রক্তাক্ত করেছিলো তাঁদের রক্তে যাঁরা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেন নি, তাঁদের কলমই অস্ত্র হয়ে ঝলসে উঠেছে। তাঁদের সময় কাটতো গ্রন্থাগারে, লেখার টেবিলে, সংবাদপত্রের টেলিপ্রিন্টার-মুখর কামরায়। তাদের কেউ কেউ জীবনের

অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন আর্ত মানবতার সেবায়। এইসব নিরীহ শান্ত মানুষকে ওরা ভয়ে পেয়েছিলো। সেই ভয় তারা লুকিয়ে রাখতে পারে নি। সেই ভয় নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আর শহীদ বুদ্ধিজীবীরা বর্বরদের হিংসার আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্বলতাকেই। এই সঙ্গে তাঁরা আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন যাতে আমরা কখনো বিভ্রান্ত না হই, মাথা নত না করি কুসংস্কার ও গোড়ামির সামনে। তাঁরা কয়েকটি উজ্জ্বল দীপ। এই দীপমালা চিরদিন আমাদের পথে ছড়িয়ে দেবে আলো। আমরা তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা।

*১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৪*

## ব্যাকরণ মানা না-মানার ভাবনা

সুকুমার রায় বলেছেন—

হাঁস ছিলো, সজারু (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু, কেমনে তা জানি না।

শিশুতোষ রচনার সেই অসাধারণ যাদুকর আমাদের আবোল-তাবোলের আশ্চর্য জগতে নিয়ে গিয়েছেন যা-ই বলুন, ব্যাকরণ আমাদের মানতেই হয়। ছেলেবেলা থেকেই ব্যাকরণ বইয়ের পাতা খুলে বসতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। ব্যাকরণ শিক্ষার বুনিয়াদ পাকাপোক্ত না হলে ভাষার ওপর দখল জন্মায় না, এ-কথা বৈয়াকরণ মাত্রই মানবেন। যাঁরা নিপুণ বৈয়াকরণ তাঁরাই যে ভাষার সুদক্ষ কারিগর তা অবশ্য বলা যায় না। ব্যাকরণের পাতায় পাতায় ভাষাশিল্পের বহুমুখী সৌকর্য সন্ধান করা পণ্ডশ্রম, — যেমন নিরর্থক, নিঃস্ব, খটখটে কংকালের মধ্যে মেদ, মজ্জা ও ত্বকের লাবণ্য খোঁজা। ভাষার সৌন্দর্যের পরিচয় পেতে হলে অবশ্যই সৃজনশীল লেখকদের রচনাবলীর ঘনিষ্ঠতা অর্জন একান্ত জরুরী। তবে যিনি শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করতে আগ্রহী তাঁকে হাত বাড়াতেই হবে ব্যাকরণের দিকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সব লেখকই কি সর্বক্ষণ ব্যাকরণের প্রতি অনুগত হয়ে থাকেন? না, থাকেন না। সৃজনশীল লেখকদের অনেকেই কখনো-সখনো ব্যাকরণদ্রোহিতার পরিচয় দেন। অর্থাৎ একটি বাক্যকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্যে তাঁরা মাঝেমধ্যে ব্যাকরণের সুদৃঢ় বেড়া টপকে বেরিয়ে পড়েন, হয়তো এমন কোনো শব্দ তৈরী করেন যা আদৌ ব্যাকরণসম্মত নয়, যা দেখলেই খুঁতখুঁতে বৈয়াকরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হবে। ব্যাকরণের সঙ্গে এ ধরনের মোহন বেয়াদবি সচরাচর কবিরাই বেশী করেন বলে জানি। ফরাসী কবি র‍্যাঁবো তো বারবার কান মলে দিয়েছেন ব্যাকরণের। যে কবি স্বরবর্ণের নিজস্ব রঙ খুঁজে পান এবং সুযোগ পেলেই বৈয়াকরণের মাথায় চাটি মেরে আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় কাব্য-পঙ্‌ক্তি রচনা করেন তাকে অধিকাংশ ব্যাকরণবিদই সুনজরে দেখবেন না, আশা করি। তা না

দেখুন, তাতে র‍্যাঁবোর কিছু আসে যায় না, আসে যায় না র‍্যাঁবো-ভক্তদের। র‍্যাঁবোর রচনাবলী সারাক্ষণ ব্যাকরণের তাবেদারী করলো কি না তা নিয়ে র‍্যাঁবো-ভক্তরা মাথা ঘামাতে নারাজ, তাঁরা 'নরকে এক ঋতু'র কাব্য সম্ভোগ করেই খুশি। কবিতায় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যদি কোনো কবি মাঝে মাঝে ব্যাকরণের পাশ কাটিয়ে কিংবা সার্বভৌম অভিধানের এলাকার বাইরে পা বাড়ান তাহলে ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বজায় থাক আর না-ই থাক, নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। যাঁরা কবিতার প্রকৃত সমঝদার, যাঁরা ভাষাশিল্পের রসজ্ঞ, তাঁরা ব্যাকরণ-দ্রোহিতার জন্যে কোনো প্রতিভাবান লোককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আগ্রহী নন কস্মিনকালেও, বরং ভাষাশিল্পের পরিধি বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে তাঁরা সেই লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন আজীবন।

এতক্ষণ ধরে যা বললাম তাতে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে আমি গোড়ার দিকে, 'ব্যাকরণ আমাদের মানতেই হয়' বলেও যেন আমি মনে মনে সমর্থন জানাচ্ছি সুকুমার রায়ের প্রতি। অর্থাৎ আসলে আমিও ব্যাকরণ-ট্যাকরণ মানি না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, 'ব্যাকরণ জানি না'—একথা এখনো জোর গলায় বলতে শিখি নি। এমন কথা জিভের ডগায় আসতে চাইলেও সংযত হয়ে পড়ি। বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাবটা ঝিমিয়ে আসে। কারণ, 'আমি ব্যাকরণ জানি না'—এ বাক্যটি উচ্চারণ করতে গেলেই ইস্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটি এখনো স্মৃতিতে পাকা বেতের মতো লাফিয়ে ওঠে; মনে পড়ে যায়, বাক্যর সংজ্ঞা শেখানোর সময় কেমন কটমটে চোখে তিনি তাকাতেন আমাদের দিকে, মনে পড়ে, ক্লাসে বহুব্রীহি সমাসের জুতসই উদাহরণ দিতে পারি নি বলে কেমন লাগসই একটা বাড়ি মেরেছিলেন তেল চকচকে বেতের।

কবুল করতে দ্বিধা নেই, এখনো কোনো বাঙলা ব্যাকরণ বই দেখলে তার মলাটে ভেসে ওঠে আমাদের খটমটে সেই পণ্ডিতমশাইয়ের মুখ। তিনি নিঃসন্দেহে আমার ব্যাকরণ ভীতিকে চিরস্থায়ী করার ব্যাপারে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই বাক্যটি রচনা করার পরমুহূর্তেই মনে হলো, এজন্যে আমাদের সেই পণ্ডিতমশাইকে পুরোপুরি দায়ী করলে সত্যের অপলাপ হবে। ছেলেবেলায় ব্যাকরণ যে আমার কাছে মূর্তিমান এক বিভীষিকা ছিলো, সেজন্যে খোদ ব্যাকরণ পুস্তকও কম দায়ী নয়। ব্যাকরণ পুস্তক থেকে আর যাই হোক রস নিঃসরিত হয় না। চোখ অশ্রুসিক্ত করেই ব্যাকরণের তালিম নিতে হয়েছে আমাদের। আমার পুত্রকে এখন বেশ নাকানি-চুবানি খেতে দেখেছি ব্যাকরণ বইয়ে। ব্যাকরণের কথা বললে সে-ও আঁতকে ওঠে। কিন্তু তা হলে তো আর আদর করে ছেলেকে বলতে পারি না, 'আহা বাছা তোর ভারি কষ্ট হচ্ছে, থাক, থাক, ব্যাকরণ পড়ে কোনো কাজ নেই।' মম ব্যাকরণ যত শুষ্কং কাষ্ঠং-ই হোক, ব্যাকরণ বই পড়তেই হবে, মানতেই হবে বৈয়াকরণের নিয়ম-কানুন। ব্যাকরণ না জানলে মাতৃভাষা লিখতে গেলেও পদে পদে হোঁচট খেতে হবে, ভুল-ভ্রান্তির খানা-খন্দে পড়তে হবে বার বার। ভুল কণ্টকিত ভাষা লেখা যে গৌরব-জনক কিছু নয় তা ব্যাকরণের কাঁচা ছাত্রও স্বীকার করবে।

ব্যাকরণ কি চিরদিন এক বিভীষিকা হয়ে থাকবে অধিকাংশ বালক-বালিকার কাছে? লেখা যায় না কি এমন ব্যাকরণ বই—যে বই দেখে সরলমতি বালক-বালিকারা আঁৎকে

উঠবে না, দূরে সরিয়ে রাখবে না সব সময়, যে বই কাছে ডেকে নেবে তাদের কোনো মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মতো? পাশ্চাত্য দেশে 'ম্যাথমেটিক্স উইদাউট টিচার্স' জাতীয় নানা বই লেখা হয় ছেলেমেয়েদের জন্যে। সে সব বই ছাত্রছাত্রীদের জন্যে রীতিমতো এক আনন্দ-ভোজ। আমাদের দেশে কি কখনো লেখা হবে এমন কোনো ব্যাকরণ বই যে বই পড়তে গিয়ে ছেলেমেয়েরা চোখের পানি ফেলবে না। যে বই ওরা পড়বে হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে—খেলাচ্ছলে ওরা শিখে নেবে ব্যাকরণের নানা বিধি। তখন হয়তো তারা ব্যাকরণ মানতে চাইবে হাসিমুখে। তাদের মধ্যে যারা হবে সৃজনশীল লেখক তারা যেমন ব্যাকরণ মানবে তেমনি প্রায় খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে অমান্য করবে হাসিমুখে (যদি কখনো হয়) দাদু ব্যাকরণকে।

*৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫*

## তিনি, তাঁর লেখায়, আচরণে

দেখা হওয়া মাত্রই তিনি, গৌরকিশোর ঘোষ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন না, লৌকিকতার কোনো ধার না ধেরে 'তুমি' বলে ফেলেন। লুকিয়ে লাভ নেই, একটু অবাকই হলাম। তা বলে এতটুকু খারাপ লাগে নি, বরং খুব ভালো লাগলো। এভাবে আলাপ শুরু করলেন যেন অনেক দিনের চেনা কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। খুব বেশী কথা সেদিন বলেন নি তিনি, কিন্তু মৃদু হাসি এবং টুকরো টুকরো কিছু কথা দিয়ে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎটিকে আমার কাছে স্মরণীয় করে তুললেন। পরে এক তরুণ লেখক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে কি আপনার দীর্ঘকালের পরিচয়?' 'কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?' আমার পাল্টা প্রশ্ন। তরুণ লেখক জবাব দিলেন, 'ওঁরা কথা শুনে মনে হলো আপনাদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা রয়েছে এবং এই অন্তরঙ্গতা দু'-এক দিনে হয় না।' একটু থেমে আমি বললাম, 'লেখক গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের, কিন্তু ব্যক্তি গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে এবারই প্রথম দেখা হলো।'

প্রথম সাক্ষাতেই অচেনা কাউকে এমন আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমি নিজে এই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। যাঁরা অল্প সময়ে নিজের এবং অপরের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্কের সাঁকো গড়ে তুলতে পারেন তাঁরা আমার ঈর্ষাভাজন। এই যে দেখা হওয়া মাত্রই গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হলো এর প্রায় পুরো কৃতিত্ব তাঁরই। আমার মধ্যে একটা আড়ষ্টতা রয়েছে, কেউ যদি তাঁর মনের উষ্ণতা দিয়ে তা গলিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমিও ক্রমশ সহজ হয়ে উঠতে পারি আমার আচরণে। তাই গৌরকিশোর ঘোষ যখন আমার করমর্দন করে বললেন, 'আমি তোমার অন্ধ ভক্ত', তখন ক্ষণিকের জন্য ভড়কে গেলেও মানুষটিকে চিনতে আমার দেরি হলো না। হেসে বললাম, 'আমিও আপনার অনুরক্ত ভক্ত।'

থাক, পরস্পর পিঠ চুলকানি বাদ দিয়ে এসো ঠিক করে ফেলি কখন কোথায় একটু বেশী সময় নিয়ে বেশী জমিয়ে আড্ডা দেয়া যায়। গৌরকিশোর ঘোষ বললেন, এখন তাঁর তাড়া আছে, আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছি জরুরী একটা কাজে। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেয়া হয় নি। তাঁর যখন ফুরসৎ তখন আমি ব্যস্ত, আমি যখন মুক্ত বিহঙ্গ, তখন তিনি এনগেইজমেন্টের খাঁচায় বন্দী। তবে আমরা চট্টগ্রামে কয়েক দিন নরক গুলজার করেছিলাম, বলা যায়।

কথাশিল্পী গৌরকিশোর ঘোষ রাঙামাটির পথে আশ্চর্য সুন্দর নিসর্গ থেকে চোখ ফিরিয়ে বলেছেন, 'আমি বেশী কথা বলতে পারিনা, কেউ কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতে পারেন অনর্গল।' গৌরকিশোর ঘোষ কেন হঠাৎ সে কথা বলেছিলেন, জানি না, তবে খুব বেশী না হলেও কথা তিনি বলতে জানেন। কথা বলে শ্রোতার মুখে হাসি ফোটাতে পারেন, পারেন বুদ্ধির ঝলকে আসর অলোকিত করে তুলতে। গৌরকিশোর ঘোষ, যিনি 'রূপদর্শী' হিসেবেও বিখ্যাত, ব্যঙ্গনিপুণ লেখক। ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ হুলটি তিনি অকৃপণভাবে ব্যবহার করেন তাঁর লেখায়, হুলবিদ্ধ হয়ে তাঁর পরিচিতরা ছটফটাক এটা তিনি চান না। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে রূপদর্শীর ভক্ত-পাঠক অসংখ্য। আমি নিজেও প্রচুর উপভোগ করেছি রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য। তাঁর 'সোচ্চার চিন্তা' নামক-কলামটির একনিষ্ঠ পাঠক আমি, গৌড়ানন্দ কবি যা ভনেন তা-ও শুনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। 'রূপদর্শী'র সব কথাই অমৃত সমান, একথা বলবো না। কখনো কখনো তাঁর একদেশদর্শিতা আমাকে পীড়িত করে। কিন্তু তাঁর অসাধারণ রচনাশৈলী মুগ্ধ করে আমাকে। তাঁর কোনো লেখা চোখে পড়লে না পড়ে উপায় নেই আমার।

আমার ধারণা, যাঁদের তিনি হুলবিদ্ধ করেন, তাঁরাও গোগ্রাসে পড়েন তাঁর লেখা, হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতেই তারিফ করে ফেলেন। এখানেই 'রূপদর্শীর জিৎ। রূপদর্শী'র কলম অক্ষয় হোক, কিন্তু যখন ভাবি, 'রূপদর্শী' আড়ালে গৌরকিশোর ঘোষ দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন, তখন বিষণ্ণ বোধ করি। একদা এমনি 'এই কলকাতায়' এবং 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'র মতো উপন্যাস লিখেছেন তিনি কি তাঁর সৃজনশীলতা ক্ষইয়ে দেবেন শুধুমাত্র সংবাদভাষ্য রচনা করে? আমি তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মের কথা ভুলে যায় নি, ভুলে যাই নি তাঁর সাগিনা মাহাতোর সাফল্যের কথা। তলিয়ে যাবার আগে এবং 'কলকাতা এক প্রমোদ তরণী, হা হা' ইত্যাদি সাড়া জাগানো লেখার কথাও আমার মনে আছে, কিন্তু তবু বলবো, গৌরকিশোর ঘোষের মতো প্রতিভাবান লেখকের সৃজনশীলতা এই বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তিনি কি স্বেচ্ছাবন্দী এই বৃত্তে? শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা কি গ্রাস করবে এই শক্তিশালী লেখককে? সিরেল কনোলী তাঁর একটি গ্রন্থে সাংবাদিকতাকে সৃজনশীল লেখকের এক প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত এক চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বলেছিলেন, 'সাংবাদিকতা সাহিত্যের মহাশত্রু'। এক সময় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই নিদারুণ সত্য। বুদ্ধদেব বসু নিজে কিছুকাল নিয়মিত 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার তৃতীয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এই কাজটি, বলা নিষ্প্রয়োজন, সৌখিনতার বশে করেন নি।

আর্থিক অনটন ঘোচানোর তাগিদেই তিনি স্বল্পকালের জন্য সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু সেই অল্প সময়েই তিনি টের পেয়েছিলেন সাংবাদিকতা কি মারাত্মক জখম করতে পারে সাহিত্যকে। সাহিত্য রচনার ক্ষতি হবে ভেবে বুদ্ধদেব বসু দৈনিক পত্রিকার তুখোড় সম্পাদকীয় লেখার কাজটিও ঝটপট ত্যাগ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য যে বুদ্ধদেব বসুকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে হয় নি সাংবাদিকতায়। তাঁকে যদি আজীবন সম্পাদকীয় লিখে যেতে হতো তাহলে তাঁর কাছ থেকে সাহিত্যের এমন রাশি রাশি সোনালী ফসল হয়তো আমরা পেতাম না। বুদ্ধদেব বসু ভাগ্যবান, তিনি সাংবাদিকতা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, অন্য কাজ করে সংসার চালাতে পেরেছিলেন তিনি।

কিন্তু গৌরকিশোর ঘোষ কি পারবেন সাংবাদিকতার মায়া ত্যাগ করতে? তিনি যে মনের আনন্দে সংবাদপত্রে কাজ করেন, একথা মনে হয় না। ঘরে রোজ উনুন তপ্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি সংবাদপত্রে কাজ করছেন, লিখছেন এমন অনেক কিছু যা হয়তো লিখতেন না। যে সব ঘন্টা তিনি ব্যয় করছেন সংবাদপত্রের জন্য সেগুলি যদি অর্পণ করতেন সাহিত্যকে তাহলে হয়তো আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতাম আরো কিছু উজ্জ্বল উপন্যাস। গৌরকিশোর ঘোষ এখন সাংবাদিকতা নিমজ্জিত—দীর্ঘকাল সংবাদপত্রে কাজ করলে অন্য কোনো চাকরি করা মুশকিল হয়ে পড়ে। বোধহয় এজন্যই তাঁকে আজীবন কলাম লিখতে হবে সংবাদপত্রে, বছরের পর বছর। আরেকটু অবসর পেলেই বড়োসড়ো একটা উপন্যাসে হাত দেওয়া যাবে—এই ভাবনা তাঁকে সচকিত করবে মাঝে-মধ্যে। কখনো লেখা হবে কি সেই উচ্চাভিলাষী উপন্যাস? হয়তো হবে কে জানে! এটুকু জানি, গৌরকিশোর ঘোষ সংগ্রামী মানুষ। বহু সংগ্রাম করে তিনি এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। বহু কষ্ট তাঁকে পেতে হয়েছে জীবনে, এক সময় থাকতে হয়েছে পরিত্যক্ত ওয়াগানে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী এই মানুষটিকে মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিলো একটা গোটা সংসার। উদাসীন পিতার খামখেয়ালের ফল ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তা বলে তাঁর বিন্দুমাত্র অভিমান নেই, বিরূপতা নেই তাঁর প্রতি। তিনি যখন তাঁর জনকের কথা বলেন তখন মনে হয় তিনি তাঁর কোনো বয়সী অবাধ্য সুহৃদের গল্প শোনাচ্ছেন। বড় ভালো লাগে তাঁর গল্প বলা মুহূর্তটি।

যা বলছিলাম, সংগ্রামী মানুষ এই গৌরকিশোর ঘোষ। সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া লোক তিনি নন। তাই, আশা করি, বহু বাধা-বিপত্তি উজিয়ে তিনি তাঁর সৃজনশীল লেখনীকে আরো বেশী চঞ্চল করে তুলবেন। তিনি নিরাশ করবেন না তার ভক্ত পাঠকদের।

কয়েকদিন পরে গৌরকিশোর ঘোষ ফিরে যাবেন কলকাতায়। দুঃখের বিষয় এমন একজন বিশিষ্ট লেখককে ঢাকায় সংবর্ধনা দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। তিনি নিজে অবশ্য সংবর্ধনা-টংবর্ধনা প্রত্যাশী নন, তেমন পছন্দ করেন না এসব। তবু কেউ ডাকলে সাড়া দিতেন নিশ্চয়ই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কোনো নোট বই রচয়িতাকে নিয়ে মাতামাতি করতে আমরা পিছপা হই না। সংবর্ধনার বান ডাকে তাঁর বেলায়। বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণে তিনি বার বার আসেন ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে। গৌরকিশোর ঘোষ অবশ্য বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন নি, তিনি এসেছিলেন

স্বেচ্ছায় নিজের খরচে। যা হোক, গৌরকিশোর ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সংবির্ধত না হলেও তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন এখানকার অনেক সাহিত্য রসিকের মনে, এবং আমার বিশ্বাস, এধরনের সংবর্ধনারই পক্ষপাতি গৌরকিশোর ঘোষ।

*৫ই মার্চ ১৯৭৫*

## নীল মাছি, স্মৃতি, অভিনয় ইত্যাদি

হাসপাতালের কেবিন। সাদা দেয়াল, সাদা বেডের চাদর। রোগীর গায়ে যে চাদরটা রয়েছে তারও রং সাদা। সাদা পোশাক-পরা নার্স একটু আগে রোগীকে ওষুধ খাইয়ে গেছে। রোগী একজন যুবক, সাদা রং তার মনকে দখল করে রেখেছে। সাদা যা আসলে কোনো রংই নয়, তা-ই যে তাকে এতখানি ভাবিয়ে তুলবে, হাসপাতালের বেডে তা কে জানতো। অন্তত সেই রুগ্ন যুবকটি জানতো না। আচ্ছা, সে ভাবলো মৃত্যুর রং কি সাদা? মৃত্যুর কোনো রং আছে কি বাস্তবিক? দূর ছাই, মৃত্যুর কোনো রং আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?

সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে খুব বিষাদ বোধ করলো সেই যুবক। হঠাৎ একাট নীল মাছিকে সে দেখতে পেলো তার গায়ে সাদা চাদরের ওপর। এরপর শুরু হলো বীজাণু আক্রান্ত যুবকের মনে নীল মাছি-কেন্দ্রিক চিন্তাপ্রবাহ। এই 'নীল মাছি' গল্পটি আমি পড়েছিলাম বহু বছর আগে। পুরো গল্পটি মনে নেই। আবছা-আবছা মনে পড়ছে, ধূসর একটা ছায়া আমার সামনে দুলে উঠছে যেন। এই লেখার শুরুতে আমি 'নীল মাছি' গল্পের পরিবেশ বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি। এই গল্পের লেখক ফতেহ লোহানীর মতো দক্ষতায় আমি সেই পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে পারি নি, একথা কবুল করতে আমার দ্বিধা নেই। তাছাড়া যে-গল্পের সবটুকু আমার মনে নেই তার পরিচয় তুলে ধরা, বলা নিষ্প্রয়োজন, আমার সাধ্যাতীত। আমার বর্ণনায় ফতেহ লোহানীর গল্পের কোনো কোনো বাক্য আছে কি না তাও বলতে আমি অপারগ। আগাগোড়া হয়তো আমি আমার মতো করেই বলেছি সামান্য কটি কথা। এমনও হতে পারে সেই গল্পে যা নেই তেমন কথাও বলে ফেলেছি প্রতারক স্মৃতি প্ররোচনায়।

তবে একথা ঠিক, অনেক বছর আগে 'নীল মাছি' গল্পটি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। 'নীল মাছি' আমার ওপর এক আশ্চর্য মোহ বিস্তার করেছিলো সেকালে। তখন আমার স্বাস্থ্য ছিলো টগবগে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে গল্পের অসুস্থ নায়কটির সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। ফতেহ লোহানী যেন আমার কথা লিখেছেন আর লিখেছেন এমন ছিপছিপে, তাজা ভাষায় সে তারিফ না করে উপায় নেই। সেই একটি গল্প দিয়েই তিনি আমাকে তাঁর অনুরক্ত পাঠকে পরিণত করেছিলেন। 'ক্যানভাস' নামে তাঁর আরো একটিগল্প পড়েছিলেম প্রায় একই সময়ে। 'ক্যানভাস'ও আমাক আনন্দ দিয়েছিলো মনে পড়ে।

তখন ফতেহ লোহানীকে দেখি নি। আমার বন্ধু হামিদুর রহমানের সঙ্গে ফতেহ লোহানীর গল্প নিয়ে প্রায়শই আলোচনা করতাম। কে এই ফতেহ লোহানী? তাঁর বিষয়ে একটা জল্পনা-কল্পনা চলতো আমার মনে। হামিদুর রহমান, বাংলাদেশের প্রথম সারির চিত্রকরদের একজন, একদিন আমাকে বললেন, ফতেহ লোহানী এসেছেন। হামিদের বাসায় প্রথম দেখলাম ফতেহ লোহানীকে। হামিদের অগ্রজ নাজির আহমেদের আকর্ষণেই সেই বাসায় আসতেন ফতেহ লোহানী এবং বিখ্যাত সুরকার আবদুল আহাদ। বৈঠকখানায় তুমুল আড্ডা জমাতেন ওঁরা তিনজন। আরো কেউ কেউ আসতেন সেই আড্ডায়। কিন্তু আমাদের ঠাঁই ছিলো না সেখানে। মাঝে মাঝে তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম, নাজির আহমেদ ও ফতেহ লোহানী দু'জনেরই কণ্ঠস্বর আশ্চর্য সুন্দর, শুধু শুনতেই ইচ্ছে করে। দুঃখের বিষয়, নাজির আহমেদের কণ্ঠস্বর বহুকাল শুনি না আর ফতেহ লোহানীর কণ্ঠ তো চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গেলো।

পরে অবশ্য আমার জানতে দেরী হয় নি ফতেহ লোহানীর পরিচয়। জানলাম, তিনি শুধু লেখকই নন, অভিনেতা ও রেডিওর খবর-পড়ুয়া হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। একদা তাঁর এবং নাজির আহমেদের অভিনয় শুনেই রেডিওর বহু সাধারণ নাটক হয়ে উঠতো অসাধারণ। আমরা কান পেতে শুনতাম সে সব নাটক। কি করে ভুলবো এই দুই প্রতিভাবান অভিনেতার সেই কৃতিত্বের কথা। সে সব নাটকের মামুলি সংলাপও মনে মনে আওড়াতাম তাঁদের বাচনভঙ্গির মোহন ফাঁদে পড়ে। আর কী সুন্দর আবৃত্তি-ই না করতেন ওরা দু'জন।

নাজির আহমেদ আমাদের সাংস্কৃতিক ভুবন থেকে দূরে সরে গেলেন; বলা যায়, হারিয়ে গেলেন। আজ কে মনে রেখেছে তাঁকে? কিন্তু ফতেহ লোহানী পরিশ্রমী কৃষকের মতোই আঁকড়ে থাকলেন সাংস্কৃতিক জমি, নড়লেন না এতটুকু। প্রচুর ঝড়ঝাপটা সইতে হয়েছে তাঁকে, বিরূপতার ঢেউ তাঁকে আছড়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু তিনি অবিচল নিষ্ঠায় সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে গেলেন আমৃত্যু।

শক্তিশালী অভিনেতা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তাঁর মতো ক্ষমতাবান অভিনেতার সন্ধান আমরা হয়তো বহুকাল পাবো না। চিত্র পরিচালকও ছিলেন তিনি, তাঁর পরিচালনা সমঝদারদের সাধুবাদ কুড়িয়েছিলো। এই রুচিশীল শিল্পী মানুষটিকে শেষের দিকে তাঁর অযোগ্য কোনো কোনো ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে। এজন্য অত্যন্ত পীড়িতবোধ করতেন তিনি—কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে কোনো চরিত্রের মেক-আপ তাঁকে নিতে হতো। একটা অভিমান তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। কারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ রুজু না করেই তিনি বিদায় নিলেন সবার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে।

ফতেহ লোহানীর একটি ছোটগল্প দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম। গল্পের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। তিনি যদি নিয়মিত ছোটগল্প লিখতেন তাহলে আমাদের অগ্রগণ্য ছোটগল্প রচয়িতাদের একজন বলে তিনি সমাদৃত হতেন সন্দেহ নেই। জানি না, কেন সেই অপশক্তি যা তাঁর মতো প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের হাত থেকে ছল করে ছিনিয়ে নিয়েছিলো লেখনী। লেখনীকে তিনি একেবারে ত্যাগ করেন নি, কিছুকাল নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন

অনুবাদ কর্মে। অধুনালুপ্ত 'রমনা' পত্রিকায় তিনি কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। তাঁর কোনো ছোটগল্পের বই ছাপার জন্যে কোনো উৎসাহী প্রকাশক এগিয়ে আসবেন কি?

আরেকটি প্রশ্ন, ফতেহ লোহানীকে বিস্মৃতির অতলে সঁপে দিতে আমাদের কদিন লাগবে?

*১৯শে এপ্রিল ১৯৭৫*

## স্বল্পায়ু লেখক ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কলকাতার পথে একজন লেখক আর হাঁটবেন না কোনোদিন, আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে আর কখনো যাবেন না একজন কর্মরত সাংবাদিক। একজন লেখক তাঁর লেখার টেবিল থেকে, প্রিয়জনদের কাছ থেকে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মারা গেছেন। মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তিনি প্রস্থান করলেন। একজন লেখকের জন্যে কী ভয়ানক অল্পায়ু, এই আটান্ন বছর। এমন স্বল্পজীবী হলে একজন লেখকের কত কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র দীর্ঘজীবী হলে হয়তো আরো কিছু অবিস্মরণীয় ছোটগল্প লিখতেন। অবিস্মরণীয় ছোটগল্প লিখেছেন। হয়তো এমন কোনো উপন্যাস রচনা করতেন তিনি যা বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ হয়ে থাকতো। সত্য, শেষের দিকে তাঁর লেখা একালের পাঠকদের তেমন আকর্ষণ করতো না। তিনি তাঁর ঔজ্জ্বল্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জীবনে যে কোনো পর্যায়ে দেখা দিতে পারে অসাধারণ সৃষ্টি ঋতু। তাই শিল্পীর মৃত্যু সর্বদাই অকালমৃত্যু। কখনো-কখনো আবার মনে হয়, পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোক কী অনাবশ্যক রকম দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, প্রায় কিছু না করে পৃথিবীকে কিছু না দিয়ে। অথচ যাঁরা অকৃপণ হাতে পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়ে যান, তাঁদের অধিকাংশই কী স্বল্পায়ু। কীটস-এর মৃত্যু হয় ছাব্বিশে বছর বয়সে। তিরিশের কোঠা পেরুতে পারেন নি শেলী আর বোদলেয়ার দর্পণে নিজের মুখকে কোনো অতিথির মুখ মনে করে নিজেকেই টুপি খুলে অভিবাদন জানাতে জানাতে প্রস্থান করেন জীবনের ভর দুপুরেই।

মনে পড়ে, একদা সারারাত জেগে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ' নামক উপন্যাসটি পড়েছিলাম। তাঁর চেনা মহলে আমি বাস করেছি দীর্ঘকাল। যিনি 'রস' এবং 'দ্বিচারিণীর' মতো ছোটগল্প লিখতে পারেন, তাঁর আসন সব সময় পাতা থাকবে প্রথম শ্রেণীর গল্পকারদের পঙ্‌ক্তিতে। এক সময় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বাংলা সাহিত্যে হীরের মতো ঝলসে উঠেছিলো। হীরের দীপ্তির যে ধার তা-ই বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছে তাঁর বহু গল্পে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর অতিথি হিসেবে তাঁরা এসেছিলেন। তখনই নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে প্রথম দেখি। ছোটখাটো মানুষ। চোখে অত্যন্ত পুরু লেন্সের চশমা। লেখায় তিনি যেমন সুদক্ষ কথা বলায় তেমন অপটু।

আদৌ চোখে পড়ার মতো নয় তার উপস্থিতি। অত্যন্ত লাজুক এবং স্বল্পভাষী বলে মনে হলো তাঁকে। বুঝি তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে নি। অবশ্য সেজন্য কোনো ক্ষোভ জাগে নি আমার মনে, ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তো হনই। তা নিয়ে নালিশ করার কোনো মানে হয় না। যাঁর রচনা আমাকে অজস্র আনন্দ দিয়েছে, সাড়া জাগিয়েছে আমার মনে, তাঁর রসনা যদি কিছুটা নিঃসাড় থাকেই, তাতে ক্ষতি কী?

*১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫*

## এই জেনারেশনের গ্যাপ

আজো একটি দৃষ্টি আমার স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করে। আমার পিতার দৃষ্টি। তখন সবেমাত্র কৈশোরের মাঠ পেরিয়ে যৌবনের প্রান্তরে পা বাড়িয়েছি। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। আমার গায়ে ছিলো একটা নতুন পাঞ্জাবী। সেকালের পক্ষে পাঞ্জাবীটা ছিলো একটু ব্যতিক্রমী। কাপড় এবং ছাঁট দুটোই ছিলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দূর থেকে আব্বা আমাকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর দৃষ্টি আমার পাঞ্জাবীর দিকে নিবদ্ধ, আমি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলাম সেই মুহূর্তে। পিতৃদৃষ্টি থেকে মনে হলো আমার নতুন পাঞ্জাবী তাঁর অনুমোদন লাভ করে নি। কিন্তু তিনি সেদিন আমাকে কিছুই বলেন নি। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলেও মনে হলো না। তিনি কুপিত হলে অবশ্যই কিছু মন্তব্য করতেন, তা যত অপ্রীতিকরই ঠেকুক আমার কাছে। আমি তাঁর মতই পোশাক-আশাক পরি, আব্বা হয়তো মনে মনে তা চাইতেন অথচ আমি তাঁর পছন্দকে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে পড়ছিলাম অন্য ধরনের পোশাকের দিকে। তা বলে আব্বার পোশাকের প্রতি আমি কখনো বাঁকা চোখে তাকাই নি। আব্বা যখন সেরওয়ানী, পাজামা, মখমলের কালো টুপি আর পামসু পরে বেরোতেন, তখন মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতাম। সেই পোশাক আব্বাকে চমৎকার মানাতো। অবশ্য আমার মনে কেড়েছিলো হাই কলারের পাঞ্জাবী আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপহার, ঝোপ শার্ট।

শুধু বেশভূষাতেই নয়, শব্দ ব্যবহারেও আব্বা আর আমার মধ্যে একটা পার্থক্য গড়ে উঠেছিলো ক্রমান্বয়ে। আব্বা কথাবার্তায় যেসব শব্দ উচ্চারণ করতেন, সেই শব্দাবলীর একটি অংশ আমার কথাবার্তায় উঁকি ঝুঁকি দিলেও অমন কিছু শব্দ আমি ব্যবহার করতাম যা আমার পিতার মুখ থেকে বেরোয় নি। আমাদের দু'জনের বাকভঙ্গির মধ্যেও একটি ভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। যদি আমার পিতামহ সে সময় বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি তাঁর পৌত্রের পোশাক দেখে এবং কথা শুনে হয়তো নিজের নিষ্ঠাবান পুত্রের চেয়েও বেশি অবাক হতেন। কিছুটা হকচকিয়ে যেতেন নিশ্চয়ই। একেই বলে জেনারেশন গ্যাপ বা বংশ ব্যবধান।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই জেনারেশন গ্যাপের সৃষ্টি হয়। প্রবীণ সাহিত্যিকদের লেখা সাধারণত নবীনদের তেমন আকর্ষণ করে না, প্রবীণদের কাছে অসহ্য ঠেকে নব্য লেখকদের রচনা। শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ও নবীনের মতান্তর পরিণত হয় মনান্তরে। কখনো কখনো পরিবেশ বিষিয়ে ওঠে সাহিত্যিক কোন্দলে। এই কোন্দলের উৎস অবশ্যই পরমত অসহিষ্ণুতা। একদল বলেন, 'আমরা যা বলি তা-ই ঠিক, সেটাই মেনে নিতে হবে সবাইকে', অন্য দল গর্জে উঠে জাহির করেন, ' তা হতেই পার না, আমরা যা বলছি তা-ই যথার্থ, আমাদের বক্তব্য যারা স্বীকার করে না তারা নির্বোধ অর্বাচীন।' অথচ সাহিত্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আজ ঘরে ঘরে যে বইয়ের কদর, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সেই বইয়ে গাঢ় হয়ে ধুলো জমবে কোনো গ্রন্থাগারের অন্ধকার সেলফ-এ। আজ যে গ্রন্থের দিকে কেউ তাকালো না ভবিষ্যতে সেই গ্রন্থই হয়তো প্রেরণা জোগাবে নবীন লেখকদের, সেই গ্রন্থের একটি কপির জন্যে হয়তো তখন অনেকে ভিড় করবেন দোকানে দোকানে।

অধিকাংশ প্রবীণ লেখক যেমন নবীনদের সাহিত্য সৃষ্টির সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিপাত করেন, আমল দিতে চান তাঁদের, তেমনি অনেক নবীন সাহিত্যকর্মী ও প্রবীণ লেখকদের মনে মনে উপহাস করেন, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের পুরোনো ফসলকে। এই মনোভাব সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। যা-কিছু নতুন তাই অগ্রাহ্য, যা-কিছু পুরোনো তা-ই বাতিল—এই দুটি মনোভাবই সমপরিমাণ পরিত্যাজ্য বলে মনে করি। এমন কিছু লেখক আছেন জরা যাদের ক্লান্ত করে না, সময় যাদের রচনাকে করে না অনুজ্জ্বল। তিরিশের নবীন কথাশিল্পীরা যখন মডার্ন উপন্যাস লেখা কী করে রপ্ত করতে হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' লিখে তরতাজা আধুনিকদের সামনে খুলে দিলেন নতুন পথ। রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করে একথাটি প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃত সচেতন শিল্পী কখনো পিছিয়ে পড়েন না, তিনি নিজে অগ্রসর হন, অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যান অনেকখানি। এ ব্যাপারে আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন উইলিয়াম বাটার ইয়েটস। ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে তিনি এক অজর, প্রবল উপস্থিতি। যখন তিনি নবীন ছিলেন, তখন তাঁর কবিতায় ছিল জরার চিহ্ন, যখন জরা তাঁর শরীরে আঁচড় কাটতে শুরু করল তখন থেকে তাঁর কবিতা হয়ে উঠলো তন্বী। প্রবীণ ইয়েটস-এর কবিতা বাস্তবিকই টাটকা, সতেজ, বুঝি তাই পরবর্তী, বহু নবীন কবি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর উপকৃত ভক্ত যাঁরা নতুনকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা সহজেই পশ্চাৎপদতার শিকার হয়ে পড়েন। এবং যাঁরা পূর্বসূরীদের সাধনার প্রতি অমনোযোগী ও উদাসীন, তাঁরা নিজেরাই বঞ্চিত হন।

হতে পারে কোনো প্রবীণ লেখক নতুন লেখকদের সাহিত্যকর্মের প্রতি অনুকম্পায়ী দৃষ্টিপাত করেন না, তা বলে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করার কোনো মানে নেই, মানে নেই তাঁর রচনার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করার। প্রবীণ কবি জসীমউদ্দিন যদ্দুর জানি, আধুনিক কবিদের বরদাশত করতে পারেন না। তাঁর কোনো ওয়াস্তা নেই নব্য কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে। এতে তার অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' কিংবা 'কাল সে আসিবে মুখখানি

তাঁর নতুন চরের মতো' আশ্চর্য সুন্দর পঙ্‌ক্তির উজ্জ্বলতা কখনো ম্লান হওয়ার নয়। এবং জসীমউদ্দীন স্বীকার করেন না বলেই সে আধুনিক কবিতা যাচ্ছেতাই—একথা মেনে নেয়ারও কোনো কারণ নেই। পুরোনো ও নতুনে টানাপোড়েনেই এগিয়ে যায় সাহিত্যের গতি।

জেনারেশন গ্যাপের কথা আগেই বলেছি। এক জেনারেশনের ভাষা অন্য জেনারেশনের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে, অকালের মতামত একালে পুরনো মুদ্রার মতো মনে হয়—এটা খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা প্রবীণ তাঁরা যদি নবীনদের ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ সহজ মনে গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে তাঁদের উচিত এমন পরিস্থিতিকে গ্রেসফুলি মেনে নেয়া। এ নিয়ে হৈ চৈ না করাই ভালো। আর নবীনদের পক্ষেও প্রবীণদের উপহাস কিংবা উপেক্ষা না করে বলিষ্ঠ ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা, সাহিত্য সৃষ্টি করা শোভনীয়। প্রত্যেকের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব জাগ্রত থাকলে পরিবেশ কখনো অপরিচ্ছন্ন হতে পারে না, অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে না কখনো।

১৯৭৫

## স্মৃতিতে ভাস্বর তিনি

আমরা এখনো কোনো কোনো মানুষের দেখা পাই যাদের মধ্যে একসঙ্গে বিভিন্ন কাজ করার প্রবণতা থেকে। এ ধরনের মানুষ ছিলেন জহির রায়হান। তিনি কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন গল্প ও উপন্যাস। চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিলো, একজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে তিনি এখনো ভাস্বর অনেকের স্মৃতিতে। চলচ্চিত্র জগতের দারুণ ব্যস্ততায় নিমজ্জিত হয়েও তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন পূর্ণ উদ্যমে। পঞ্চাশ দশকের মধ্য পথে 'প্রবাহ' নামে যে রুচিশীল সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকাটির আবির্ভাব হয়েছিলো তার সম্পাদক ছিলেন জহির রায়হান। তখনো তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন নি। জহির রায়হান যা কিছু করতেন তার মধ্যেই থাকতো সাফল্যের দীপ্তি। তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, সাহিত্যিক হিসেবে অর্জন করেছিলেন জনপ্রিয়তা। ১৯৬৫ সালে তিনি তাঁর 'হাজার বছর ধরে' নামক উপন্যাসটির জন্য আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পান। এবং কে না জানে এখানকার চলচ্চিত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা কখনো ম্লান হওয়ার নয়। বাংলাদেশের অসুস্থ, দরিদ্র চলচ্চিত্রাঙ্গনে তিনি এনেছিলেন কিছু স্বাস্থ্য আর ঐশ্বর্যের ঝলক। মাঝে মধ্যে তিনি যে বক্স-অফিস হিট ছবি তৈরি করার ফাঁদে পা দেন নি, এমন নয়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে জাগ্রত রেখেছেন, থেকেছেন আপোসহীন।

কী করে জহির রায়হানের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এখানকার চলচ্চিত্রের সীমাহীন রুচিহীনতা এবং স্থূলতার বিপরীত স্রোতে সাঁতার কাটা? যেহেতু সাহিত্য এবং অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিলো, যেহেতু তিনি ছিলেন গভীরভাবে সমাজ সচেতন,

তাই চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন তিনি। জহির রায়হান সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বরাবর; তিনি মনে করতেন কোনো গজদন্তমিনারই শিল্পীর আশ্রয় হতে পারে না, তাঁর স্থান বাস্তবের খোলা প্রান্তরে, সাধারণ মানুষের মধ্যে। শিল্পীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে জহির রায়হান অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই তিনি ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, করেন কারাবরণ। নির্যাতিত জনসাধারণের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন তিনি, কী করে তারা তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পেতে পারেন, সে ভাবনায় আন্দোলিত হতেন বার বার। এই দায়িত্ববোধই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো উনিশ শো একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে। সত্য তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নেন নি, কিন্তু তার ভাষা অস্ত্রের মতো ঝলসে উঠেছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে। কোনো বড় রকমের প্রত্যাশায় মজে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন নি। কোনো প্রলোভনের হাতছানি তাঁকে নিয়ে যায় নি সংগ্রামের পথে। বাংলাদেশের শ্যামল বুক থেকে যাতে হানাদার বাহিনীর ভারী বুট অপসারিত হয়, যাতে বাঙালিরা স্বাধীন হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারে, সে জন্যই সবকিছু পেছনে ফেলে তিনি সংগ্রামী হয়েছিলেন। জহির রায়হান দেশকে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন দেশের মানুষকে। এই ভালোবাসাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনগুলিতে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সইতে। তিনি তো আরো অনেকের মতো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারতেন, পারতেন ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে বড় করে দেখতে। কিন্তু যিনি আদর্শবান, যাঁর কাছে স্বাধীনতা সর্বাধিক প্রিয় তিনি কী করে নিমজ্জিত থাকবেন আত্মসুখে ? কী করে তিনি লিপ্ত থাকবেন আখের গোছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ? স্ত্রী, পুত্রের অসুস্থতা উপেক্ষা করে, দিনরাত পরিশ্রম করে তিনি তৈরি করেছেন সেই সাড়া জাগানো প্রামাণ্য চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'।

বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হওয়ার পর জহির রায়হান ফিরে এলেন ঢাকায়। একটি দুঃস্বপ্ন মুছে গেলো, চোখে নতুন স্বপ্ন নিয়ে তিনি ফিরে এলেন প্রিয়জনদের মাঝে। কিন্তু যে অগ্রজকে বুকে জড়িয়ে ধরার তাগিদ নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন তাঁকে আলিঙ্গন করা তো দূরের কথা, এক পলক দেখতেও পেলেন না। তাঁর অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার তখন মৃত্যুলোকে, আরো বহু বুদ্ধিজীবীর মতোই শহীদ তিনি আলবদরের অস্ত্রাঘাতে। অগ্রজকে খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজেই হারিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য। তাঁর এই হারিয়ে যাওয়া দিনটি ছিল ৩০শে জানুয়ারি।

*আজ এই ৩০শে জানুয়ারি—কথাশিল্পী জহির রায়হানের স্মৃতি দিবসে সন্ধানী প্রকাশনী* এই লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর 'উপন্যাস সমগ্র' প্রকাশ করে। তাঁর সাতটি উপন্যাস পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হবে এক সঙ্গে একটি সুদৃশ্য প্যাকেটে। দু'টি নতুন উপন্যাস জহির রায়হানের বন্ধু এবং প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ বহু শ্রম স্বীকার করে উদ্ধার করেছেন পুরোনো পত্রিকা থেকে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে এরকম উদ্যোগ বাংলাদেশের এই প্রথম।

*৩০শে জানুয়ারি ১৯৭৬*

# আনিসুজ্জামানের মুনীর চৌধুরী

ড: আনিসুজ্জামানের নতুন বই 'মুনীর চৌধুরী' পেয়েছি কয়েকদিন আগে। এতদিন বইটি পড়া হয়ে ওঠে নি। আজ পড়ে দেখলাম আগাগোড়া। বইটি পড়ে যুগপৎ আনন্দিত ও বেদনার্ত হলাম। আনন্দিত, কেননা আনিসুজ্জামান চমৎকার একটি বই উপহার দিয়েছেন আমাদের, বেদনার্ত,—কারণ বইটি পড়তে পড়তে নানা পুরোনো কথা মনে পড়লো, শ্রুতিতে ভেসে এলো মুনীর চৌধুরীর সেই বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর। স্মৃতি-ভারাতুর হয়ে পড়লাম। আনিসুজ্জামান আবার আমাকে নিয়ে গেলেন মুনীর চৌধুরীর কাছে, আমাদের মুনীর ভাইয়ের কাছে। দেখলাম সেই তাক লাগিয়ে দেয়া তরুণ মুনীর চৌধুরীকে। যিনি লিটন হলে কবিতা আবৃত্তি করেন, সভাসমিতিতে অসাধারণ বক্তৃতা দেন, কম্যুনিস্ট হওয়ার অপরাধে জেল খাটেন, গল্প পড়েন প্রগতি লেখক সংঘের সাহিত্য সভায়। দেখলাম সেই প্রৌঢ় মুনীর চৌধুরীকে, যিনি রাজনৈতিক তৎপরতা ছেড়ে নাটক রচনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কাতরতা বোধ করেন, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে সর্বক্ষণ মুগ্ধ করে রাখেন অননুকরণীয় বক্তৃতায়, ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচারসম্পর্কে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বিবৃতির খসড়া রচনা করেন এবং নিজেই প্রথম তাতে সই করেন। দেখলাম সেই মুনীর চৌধুরীকে যিনি নিন্দার হুলে জর্জরিত, বাংলা বর্ণমালা ও বানান-পদ্ধতির উদ্ভট সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ান, একাত্তরের পৈশাচিক তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হন, প্রতীক্ষা করেন স্বাধীনতার।

আনিসুজ্জামান ব্যক্তি ও লেখক মুনীর চৌধুরীকে পাশাপাশি এঁকেছেন দক্ষতার সঙ্গে। বইটি পড়লে বোঝা যায় লেখক মুনীর চৌধুরীর একজন অনুরক্ত ভক্ত। তাঁর এই অনুরাগের আভা ছড়িয়ে রয়েছে গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে। তিনি সযত্নে মুনীর চৌধুরীর গুণাবলী তুলে ধরেছেন, আবার কোনো কোনো অপ্রিয় তথ্য প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এ জন্যই বইটি মুনীর চৌধুরী-বিষয়ক একটি বিশ্বস্ত দলিল হতে পেরেছে।

একজন জেলা শাসকের সন্তান হিসেবে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন তিনি। পিতা আবদুল হালিম চৌধুরী বেশ কড়া মানুষ ছিলেন। তিনি সন্তানদের রেখেছিলেন কড়া শাসন ও শৃঙ্খলাবোধের গণ্ডিতে। সেই গণ্ডি পেরুনো খুব সহজ ছিলো না কখনো। তবে তিনি শুধুমাত্র একজন কর্মিষ্ঠ জেলা শাসক ও কঠোর গৃহকর্তা ছিলেন না; আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "পিতা আবদুল হালিম চৌধুরীর বিদ্যানুরাগ ছিল মজ্জাগত। আরবি, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের বিশাল সংগ্রহ ছিল। তাঁর ইংরেজী ও আরবিতে ছিল আবার অসাধারণ অধিকার। ছেলেমেয়েদের তিনি নিজেই পড়াতেন। কোন ইংরেজী বা বাংলা পাঠ্যবই তিনি সংশোধন করে না দিলে ছেলেমেয়েদের তা পড়বার হুকুম ছিল না। মুনীর চৌধুরীর যখন চৌদ্দ বছর বয়স, তখন বাবা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন 'এনসাইক্লোপিডিয়া বিট্রানিকা'র পুরো সেট।"

অসামান্য বিদ্যানুরাগ মুনীর চৌধুরী পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। যিনি চৌদ্দ বছর বয়সে উপহার পান এনসাইক্লোপিডিয়া বিট্রানিকা; তাঁর সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ এস এন রায় যে প্রাণ খুলে প্রশংসা করবেন তা খুবই স্বাভাবিক। পিতার বিদ্যানুরাগ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিলো সত্য, কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন পুত্রের মনে কোনো রেখাপাত করে নি। এ ব্যাপারে পিতাপুত্র দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন। তরুণ মুনীর চৌধুরী ছিলেন এক জ্বলজ্বলে বিদ্রোহী যাঁর কাছে প্রথামাত্রই ধ্বংসযোগ্য, অথচ তাঁর পিতা প্রথাগত ধ্যানধারণা ও জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। আনিসুজ্জামান একটি মজাদার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, "তিনি একদিন পুত্রকে ডেকে প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু তাঁদের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেহেতু মুনীর চৌধুরীর পক্ষে পিতার অর্থ সাহায্য গ্রহণ সঙ্গত বা সম্মানযোগ্য কিনা? পিতার যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে মুনীর চৌধুরী অঙ্গীকার করেন যে, আর তাঁর কাছ থেকে অর্থ প্রত্যাশা করবেন না। এ সত্ত্বেও পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। আবদুল হালিম চৌধুরীর কাছে পত্রযোগে তাঁর কোন সহকর্মীর কন্যা এই মর্মে অনুযোগ করেন যে মুনীর চৌধুরীর 'বাবা ফেকু' গল্পে পত্রলেখিকার পিতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। উত্তরে হালিম সাহেব নাকি লিখেছিলেন যে গল্পটি পড়ে তার মনে হয়েছিল যে মুনীর তাঁকে নিয়েই ব্যঙ্গ করেছে; কিন্তু অন্যেরাও যখন নিজেদেরকে ঐ ব্যঙ্গের উদ্দিষ্ট বলে বিবেচনা করেছেন, তখন তাঁর বিশ্বাস, এই সর্বজনীনতার গুণে গল্পটি সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে সফল হয়েছে।"

এই ঘটনায় আবদুল হালিম চৌধুরীর চরিত্রের একটি আকর্ষণীয় দিক উন্মোচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। মুনীর চৌধুরীর পারিবারিক পরিবেশ, তাঁর আনন্দ আর যন্ত্রণা, তাঁর সাহিত্যকর্ম— বস্তুত মুনীর চৌধুরী নামক মানুষটিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হলে উৎসাহী ব্যক্তিদের আসতেই হবে আনিসুজ্জামানের এই বইয়ের কাছে। ভবিষ্যতে মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে আরো বই লেখা হবে, হয়তো উৎকৃষ্টতর কোনো গ্রন্থ রচিত হবে—কিন্তু সেই গ্রন্থাকারকেও সেদিন খোঁজ নিতে হবে এই কৃশকায় বইটির। আনিসুজ্জামান একজন পথিকৃতের কাজ করেছেন। তাঁর এই উদ্যম অভিনন্দনযোগ্য। আর সাধুবাদ জানাতে হয় থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীকে যারা এমন একটি সুন্দর বই প্রকাশ করেছেন প্রকাশনার নানা সমস্যা সত্ত্বেও।

*৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬*

## রবীন্দ্রনাথ মনের মহলে

অতীত আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়, পাশে এসে বসে, পথ চলে পাশাপাশি। অতীত প্রাচীন জরির কাপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে আমার চতুর্দিকে। আমি জরির জমিন স্পর্শ করি, অতীত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

আমি প্রশ্ন করি, অতীত তুমি কার? অতীত দৃষ্টি হেনে বলেন, 'যে আমার দর্পণে মুখ দেখে আমি তার।' অতীত আমার হাত ছোঁয়, চোখ রাখে আমার চোখে। অতীত এক লহমায় বর্তমান হয়ে যায়। অতীতের ওষ্ঠে হাসি। রোদের মতো ঝলসে ওঠে অতীতের মুখ। আমি অতীতকে বলি, 'তুমি হ্রদ হতে পারবে? জ্যোৎস্নার জোয়ার হয়ে আমাকে

ভাসিয়ে নিতে?' অতীত হ্রদ হয়, হয় জ্যোৎস্নার জোয়ার। অতীত বাঁশি হয়ে বাজে, এক রহস্যময় ওয়েটিং রুম হয়ে কাঁপে অন্ধকারে। আমার গালে গাল রেখে, আমার নাকে আঙুল রেখে অতীত বলে আমাদের যেদিন গেছে তা কি চিরদিনের জন্যে গেছে? আমি অতীতের দিকে খানিক তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই রেলযাত্রীর মতোই উচ্চারণ করি, 'রাতের সব তারাই আছে, দিনের আলো গভীরে।' তারপর নিজের কাছেই কেমন বেখাপ্পা লাগে সেই উচ্চারণ। কে জানে বানিয়ে বললাম না তো? অতীত কখনো বর্তমান হয়, বর্তমান অতীত হয়। অতীত যেন মেঘ, যেন স্বপ্ন, কখনো সমুদ্রের ফেনা, কখনো গাঙচিল। অতীত আমার মনের ভেতরে খুব দীর্ঘ ছায়া ফেলে হেঁটে যায়। এক নির্জন বনশোভা আমার চতুষ্পার্শে, আমি একটি উদ্যানের ভেতরে হেঁটে চলেছি। রাজার উদ্যান? ফুলগুলি অসংখ্য চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে—কেন মনে পড়ে গেল এই পঙ্‌ক্তি? এক অতিশয় ক্লান্তিমান, রূপদক্ষ তস্করের মতো। কি মোহন সিঁদ কেটে যখন তখন রবীন্দ্রনাথ হানা দেন আমাদের মনের ভিতর মহলে, আমরা কুণ্ঠিত হয়ে ধন্য হই শুধু।

*৩রা মে ১৯৭৬*

## পঁচিশে বৈশাখ

আমি যখন লিখছি, তখন বাইরে প্রবল বৃষ্টি। আকাশ জোড়া, পথপ্লাবী বৃষ্টি। দর-দালান, গাছপালা, ত্রস্ত যান সব কিছু বৃষ্টিতে একাকার। এই মুহূর্তে খুব ভালো লাগছে আমার, মনে পড়ছে বহু বিস্মৃত কথা, প্রায় মুছে-যাওয়া দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে বিদ্যুতের মতো। নিজের অজান্তেই আমি গুনগুনিয়ে উঠলাম, আমার কণ্ঠ থেকে ঝরলো, 'যখন বৃষ্টি নামলো।' রবীন্দ্রনাথের গান। আমি গায়ক নই, তবু এই দিগন্ত ডোবানো বৃষ্টি আমাকে দিয়ে গান গাইয়ে নিলো। গান গাইয়ে নিলো বললে একটু বেশী বলা হয়ে যায়, আসলে আমার কণ্ঠ থেকে আদায় করে নিলো ক্ষণিকের গুনগুনানি।

বিকেলে কয়েক ঘণ্টা মূল্যবান হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের গানের জন্যে। সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ আমার অজস্র প্রহরের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন কবিতায়, গানে। তিনি আমার জন্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন এমন এক জগত, যেখানে নিঃশ্বাস নিতে পেরে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি।

প্রথম কখন রবীন্দ্রনাথ আমার মন কেড়েছিলেন? ছেলেবেলায়? না, আরো পরে। কৈশোরে আমি সর্বপ্রথম প্রবেশ করি রাবীন্দ্রিক বলয়ে। তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান আমাকে দখল করে নি, দখল করেছিলো তাঁর গদ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' আমাকে অভিভূত করে রেখেছিলো কয়েক মাস। একই গল্প বারবার পড়েছি, কখনো আনন্দে সকালবেলা হয়ে গেছে মন, কখনো চোখে জমেছে বেদনার গাঢ় মেঘ। 'গল্পগুচ্ছ' আমার জীবনের সীমানাকে বাড়িয়ে দিলো অনেকখানি; আমি বয়স্ক হয়ে উঠলাম, সচেতন

হয়ে উঠলাম ভাষার সৌন্দর্য বিষয়ে। সেই সুদূর কৈশোরে 'গল্পগুচ্ছের' পাতায় চোখ রেখে কত বার ভেবেছি সেই অসামান্য পুরুষের কথা যাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয় অমন অপরূপ ভাষা। 'গল্পগুচ্ছ'ই আমাকে টেনে নিয়ে গেলো রবীন্দ্র সাহিত্যের মহাপৃথিবীতে। কি অপার বিস্ময়ই না অপেক্ষা করেছিলো আমার জন্যে। কিন্তু সেই মহাপৃথিবীতে আমি পদচারণা করেছি আস্তেসুস্থে, এ ব্যাপারে আমার কোনো তাড়াহুড়ো ছিলো না। যত দিন যায়, তত মুগ্ধ হই সেই কবি সার্বভৌমের মহিমায়। অবশ্য আমার রবীন্দ্রানুগত্যে কখনো পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায় নি। রবীন্দ্রনাথকে এক পরাক্রান্ত বিগ্রহ হিসেবে দেখতে আমি অভ্যস্ত নই, রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখি একজন মহাকবি এবং মহান জীবনসাধক রূপে। এলিয়ট বলেছেন, 'মহৎ কবিমাত্রেই আপন রচনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের যুগকেই প্রকাশ করেন।' এভাবে দান্তে প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের কণ্ঠস্বর, শেক্সপীয়ার, প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ে উঠেছিলেন ষোড়শ শতকের প্রতিভূ। তেমনি রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর যুগকে। একটি বিরাট জনমানসে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য।

পৃথিবীর খুব কম কবি রবীন্দ্রনাথের মতো মগ্ন ছিলেন জীবন-সাধনায়। প্রকৃত জীবনশিল্পী ছিলেন বলেই তিনি শুধু শিল্প সৃষ্টকরেই তৃপ্ত থাকেন নি। নিজের জীবনকেও শিল্পের মতো রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা বলে শুধু সোনার তরীতে গা ভাসিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় আনন্দ আহরণ করেন নি, নিজের মুক্তি খুঁজেছেন ধুলার ধুলায় ঘাসে ঘাসে। বিশ্বমানবতার প্রতি সমর্পিত ছিলেন আজীবন—মানুষকে এক মহান সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন অন্তর্লোকে। যারা অবহেলিত অজ্ঞাত তারা তাঁর 'হৃদয় লাভ' করেছিলো। মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সংযোগকে বড় করে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ, তাই সারা বিশ্ব হতে পেরিছেলো তাঁর মনের নিজস্ব এলাকা। একদিকে যেমন বৈশ্বিক চেতনায় উদ্ভাসিত ছিলো তাঁর মানস, তেমনি দেশের মাটির রূপটিকেও তিনি ভালোবেসেছিলেন গভীরভাবে। এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বাদ দিলে জীবনবীক্ষা খণ্ডিত হতে বাধ্য—একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার স্বরূপের মাধ্যমে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একমুখী ছিলো না, তাঁর সৃজনী ক্ষমতা ব্যাপ্তি লাভ করেছিলো শিল্প সাহিত্যের নানা শাখায়, এমনকি শিল্প বহির্ভূত এলাকাতেও তাঁর কর্মস্পৃহা স্ফূর্তি লাভ করেছিলো নানারূপে। তবু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় যে তিনি কবি, এমন একজন কবি যিনি একা বহু প্রতিভাবান কবির দায়িত্ব পালন করে গেছেন অসাধারণ সৃজন নৈপুণ্যে। সাহিত্যের অগ্রগতির জন্যে বিভিন্ন যুগের কবি মিলিতভাবে যে কাজ করেন, রবীন্দ্রনাথ এককভাবে সে কাজ করেছেন বাংলা সাহিত্যের জন্যে। এ ধরনের কাব্যকৃতি বিশ্বসাহিত্যে বিরল। যিনি বাংলা সাহিত্যকে বয়স্ক করেছেন, অত্যন্ত কান্তিমান করেছেন, করেছেন ঐশ্বর্যবান, তাঁর প্রতি কতটুকু মনোযোগী আমরা? আনুষ্ঠানিকতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছি আমি, পঁচিশে বৈশাখের কিংবা বাইশে শ্রাবণে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেই কি আমাদের রবীন্দ্রানুগত্য প্রকাশ পায়? আমরা ক'জন রবীন্দ্র রচনাবলী পাঠ করেছি

একনিষ্ঠভাবে? রবীন্দ্রনাথ মহাকবি—এই ক্লিশে উচ্চারণ করেই আমরা খালাস, তাঁর কবিতায় প্রবেশাধিকার অর্জনে তেমন উদ্যোগী হই না। রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে ভাসাভাসা ধারণা নিয়েই তৃপ্ত থাকি আমরা অনেকে। যেদিন আমরা তাঁর সাধনার মূল্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শিখবো সেদিনই সার্থক হবে পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপন, নইলে বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে কবি সার্বভৌমের জন্মদিন।

*৮ই মে ১৯৭৬*

## বার্গম্যানের ছবিতে মানুষের শাশ্বত অন্বেষা

আজ ইংমার বার্গম্যানের 'দ্য সেভেনথ সীল' ফিল্মটি দেখলাম। এই ফিল্মের প্রচুর সুখ্যাতি শুনেছি। 'দ্য সেভেনথ সীল' দেখে বিস্মিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি, বার্গম্যানের অসামান্য সিদ্ধির কথা ভেবেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই প্রতিভাবান চিত্রপরিচালকের কোন ফিল্ম দেখতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। একটি শিল্প মাধ্যম হিসেবে ফিল্ম যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা এ ধরনের ছবি দেখলে বোঝা যায়। 'দ্য সেভেনথ সীল' দেখার পর আমার মনে হয়েছে, এই ফিল্ম না দেখলে বাস্তবিকই আমি বঞ্চিত হতাম। বার্গম্যান আমার অভিজ্ঞতার এলাকাটিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, একথা কবুল করতে দ্বিধা নেই। আমি বার্গম্যানের শিল্পের কাছে নতজানু হয়েছিলাম তাঁর 'দ্য ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ'-এর সামনে।

বার্গম্যান সেলুলয়েডে যা তুলে ধরেন তার আড়ালে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে অনেক কিছু। অন্তত 'দ্য সেভনথ সীল' এবং 'দ্য ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ' দেখে আমার তা-ই মনে হয়েছে। 'দ্য সেভেনথ সীল' ফিল্মটিতে মধ্যযুগীয় গল্পের মাধ্যমে এক অসামান্য বক্তব্য রেখেছেন বার্গম্যান। অবশ্য সেই বক্তব্য কখনো শিল্পরূপকে ছাপিয়ে ওঠে নি, দৃশ্যের খাঁজে খাঁজে, সংলাপের শিরায় শিরায় তিনি জীবনের নানা জটিলতা সঞ্চারিত করেছেন। মানুষের মৌল সমস্যাগুলি পরিস্ফুট হয়েছে সেলুলয়েডের সাদা-কালোয়। সাদা-কালো রঙের কী অসাধারণ শিল্পসম্মত ব্যবহারই না তিনি করেছেন। প্রশ্নশীল মানুষের শাশ্বত অন্বেষা, অমৃতের জন্যে মানবাত্মার হাহাকার, মৃত্যুর ব্যাপক নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক খেলা, জীবনব্যাপী শূন্যতা, যন্ত্রণা, আতংক, মধুর ভালোবাসা, বিমুখ সমাজে শিল্পীর দৃশ্য, কুসংস্কার, মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক অত্যাচার—এই সবকিছুই রূপায়িত হয়েছে সেলুলয়েডে। যদিও একটি মধ্যযুগীয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই ফিল্ম গড়ে উঠেছে, তবু এর আধুনিকতা উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হতে হয়। যেন এ যুগেরই এক অনন্য শিল্পভাষ্য 'দ্য সেভেনথ সীল'। বেশী কথা বললেই সবসময় বক্তব্য জোরালো হয় না, পরিমিতবোধ সার্থক শিল্পীর কুলক্ষণ। বার্গম্যান যে পরিমিতবোধকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন তা তাঁর ফিল্ম সপ্রমাণ করে।

'দ্য সেভেনথ সীল' একটি মহৎ কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা উপহার দেয় আমাদের। অবশ্য এই কবিতা কখনো চিৎকার করে বলে না—'এই যে এখানে, আমি, আমাকে —দ্যাখো।' কোনো অভিনেতার তাকানো এক টুকরো সংলাপ, অরণ্যের ভৌতিক জ্যোৎস্না,

এমনকি পাথুরে পথও আমাদের হৃদয়ের গভীরে কবিতার বিপুল অভিঘাত সৃষ্টি করে। ফিল্মের প্রতিটি চিত্রকল্প, প্রতিটি দৃশ্য দাবী করে আমাদের অখণ্ড মনোযোগ।

মৃত্যু ক্রুসেড প্রত্যাগত নাইটের মুখোমুখি বসছে, দাবা খেলছে, কাটা কাটা কথা বলছে, মুচকি হাসছে, হাঁটছে পাশাপাশি। আসলে ফিল্ম জুড়ে রয়েছে মৃত্যুর নিঃশব্দ, নিশ্চিত পদচারণা। হঠাৎ সে আসে—কখনো পুরোহিত, আবার কখনো কাঠুরে হয়ে। কখনো সে সরাসরি বলে ফেলে—'আমি মৃত্যু।' মনে হতে পারে, বার্গম্যান জীবনের অর্থহীনতা এবং নৈরাশ্যকেই চিত্রায়িত করেছেন, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে নতজানু হতেই হয়—একথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। শুধু একথা বড় হয়ে উঠলে আমরা কখনো 'দ্য সেভেনথ সীল'কে একটি মহৎ ফিল্ম বলতাম না। এই ছবি আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগায়, আমরা চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠি। প্লেগ কি 'দ্য সেভেনথ সীল'-এ একটি অসামান্য প্রতীক হয়ে ওঠে নি? আমারতো একবারও প্লেগকে শুধু একটি ব্যাধি বলে মনে হয় নি—এই মারাত্মক ব্যাধি শরীর ছাড়িয়ে মানুষের আত্মাকেও দখল করেছে, একথাই হয়তো বার্গম্যান বোঝাতে চেয়েছেন। এই ফিল্ম, অর্থবহ হয়েছে নানা স্তরে—কোনো একটি স্তরে সীমাবদ্ধ নয় 'দ্য সেভেনথ সীল'। তবে কি সাতটি স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ এই ফিল্ম? জানি না, তবে এটুকু জানি, 'দ্য সেভেনথ সীল'-এর আবেদন এমনই গভীর ও প্রবল যে আমাদের অস্তিত্ব শুধু আন্দোলিত হয়। এই ছবি দেখার পর জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করে, বেঁচে থাকা-ব্যাপারটি কেমন যেন অর্থময় ঠেকে।

অনেকের কাছে 'দ্য সেভেনথ সীল'কে ঘন কৃষ্ণবর্ণে লিপ্ত মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আমরা আকাশের নিচে একজন সাধারণ স্বপ্নচারী অভিনেতার সামান্য সংসারের ছবি দেখি, তখন সেই প্রশ্নশীল, অতিশয় ক্লান্ত নাইটের মতোই খোলা প্রান্তরের স্মৃতিটুকু দুধের বাটির মতো দু'হাতে ধরে রাখতে চাই। প্রভু মৃত্যু যখন নাইট তার সঙ্গীদের নিয়ে যান মৃত্যুলোকে, তখন সেই স্বপ্নচারী, সস্তা অভিনেতা, তার স্ত্রী এবং তাদের ফুটফুটে সন্তান যাত্রা করে জীবনের দিকে—যেখানে রৌদ্র আছে, টাটকা স্ট্রবেরী আর খাঁটি দুধের স্বাদ আছে, জ্যোৎস্নাস্নাত পথরেখা আর বৃক্ষ শ্রেণী আছে, আছে ভালোবাসা। ঝগড়া-ফ্যাসাদ, নোংরামি, ব্যাধিও আছে বৈকি। কিন্তু নারীর সোনালী হাসি, আর নিষ্পাপ শিশুর হামাগুড়ি মানুষকে সঞ্জীবিত করে, তার মধ্যে সঞ্চারিত করে বাঁচার তাগিদ। তাহলে জগজ্জীবনের হু হু প্রান্তরে ধ্বংসের কলরোলে ভালোবাসাই মানুষের রক্ষাকবচ? আমাদের মনে এধরনের নানা প্রশ্নের জন্ম দেয় ইংমার বার্গম্যানের 'দ্য সেভেনথ সীল।'

আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

*১২ই মে ১৯৭৬*

## ব্যথাবিষে নীলকণ্ঠ কবি

তিনি, কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই লিখেছেন—ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি? যে মুহূর্তে তিনি এই পঙ্‌ক্তিটি রচনা করেছিলেন হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল নাচিয়ে কিংবা আকাশের দিকে চোখ রেখে গুনগুনিয়ে, তখন কি সুরে সুরে আন্দোলিত কবি

জানতেন যে এই প্রশ্ন তাঁর উদ্দেশেই করা হবে বার বার? তিনি কি জানতেন লক্ষ লক্ষ মানুষের অবুঝ ব্যাকুলতা প্রকাশিত হবে এই প্রশ্নে? না, জানতেন না তিনি, জানার কথা নয় তাঁর? এই পঙ্‌ক্তি তিনি রচনা করেছিলেন অনুপ্রাণিত এক প্রহরে ভাবীকালের কোনো তোয়াক্কা না করেই। সেই পঙ্‌ক্তি আজ তার কবির দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক—কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না। সতেজ ফুলের স্তবক, হারমোনিয়ামের রীড, কাবেরী নদীর জল, গুবাক তরুর সারি, কোদালে মেঘের মউজ—সবাইকে ঐ একই প্রশ্ন—ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?

তাঁর চতুর্দিকে জীবনের কলবর, তিনি নীরব, মাঝে মাঝে তাঁর অস্তিত্ব ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে গীতধারা, তিনি নীরব, অনেকে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন কবিকে এক ঝলক দেখার জন্য, তিনি নীরব, তাঁর হাতে অর্পণ করা হচ্ছে পদক, তিনি নীরব। জানালার শার্শিতে ক্রমাগত পড়ছে বৃষ্টির আঁচড় তিনি নীরব, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে শহর, তিনি নীরব। আমাদের কাছে অসহ্য লাগে এই নীরবতা। একদা যাঁর কথা আর গানে গুলজার হয়ে উঠতো আসরের পর আসর, যাঁর হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো ঘরের চারদেয়াল, যাঁর পোষ-না-মানা আনন্দ কোলাহলে নববধূর মতো কেঁপে উঠতো দশদিক, কী ভীষণ নীরব তিনি আজ। তাঁর এই একরোখা নীরবতা আমাদের প্রহার করছে যেন। আড্ডা ছাড়া তাঁর এক দণ্ড চলতো না, হাসি তামাশায় আসর মাতিয়ে না রাখলে যিনি স্থির থাকতে পারতেন না, যাঁর প্রায় প্রতিটি প্রহর গুঞ্জরিত হতো গানে গানে—সেই আশ্চর্য প্রাণবন্ত, দিলদরাজ, গানে-পাওয়া মানুষই একদিন কী স্তব্ধ, নিরানন্দ, আর গানহীন হয়ে গেলেন।

যখন তিনি হারমোনিয়াম, তবলা, বেহালা কিংবা সেতার দেখেন তখন তাঁর নিস্তরঙ্গ বোধে কি ফুটে ওঠে কোনো মৃদু কম্পন? যখন কেউ তাঁর সামনে বসে গান গায় স্মৃতি-বিস্মৃতির রৌদ্র-জোৎস্না আর অন্ধকার ছড়িয়ে, তখন কি তাঁর মনে জেগে উঠতে চায় কোনো স্মৃতির মুকুল? যখন কেউ তাঁর গলায় পরিয়ে দেয় মালা, তখন কি তিনি ক্ষণিকের জন্য যাত্রা করেন বিগত সেই যুগের দিকে, যে যুগে সারা বাংলাদেশ একটি স্বর্গীয় মালা হয়ে দুলেছিলো নবীন এক কবির গ্রীবায়? জানি না, কোনোদিন জানবো না আমরা। একদা যিনি সারারাত জেগে একটি সুদীর্ঘ, আশ্চর্য, স্পন্দমান, দীর্ঘায়ু কবিতা—'বিদ্রোহী' যার নাম —লিখেছিলেন, যাঁর হাতে ঝলসে উঠেছিলো অগ্নিবীণা, যিনি আলো-বাতাস আর অন্ধকার থেকে অবলীলায় তুলে আনতেন গানের পর গান, তিনি এখন সকল গানের ওপরে বসে রয়েছেন অসম্ভব অভিমানে। কোনো কিছুই কি বিচলিত করতে পারে না তাঁকে? কোনো আনন্দ কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না? কোনো শোকেই কি তিনি কাতর হবেন না আর? যিনি নিজেই এক স্তম্ভিত শোক, শোক তাঁকে উন্মথিত করবে কী করে? যদি মৃত্যুলোক থেকে ফিরে আসে বুলবুল, প্রমীলা, কাজী অনিরুদ্ধ তাহলেও কি তিনি তাঁদের বুকে টেনে নেবেন না আর? এক ক্ষমাহীন ঔদাস্য নিয়েই কি তিনি বেঁচে থাকবেন দিনের পর দিন?

হায়, এই বেঁচে থাকা! সত্যিই কি তিনি বেঁচে আছেন? আড্ডায়, গানের আসরে, সাহিত্য সভায় ঝলসানোর কথা যাঁর সত্তা, কবিতা আর গানে শূন্য প্রহর ভরিয়ে তোলার

কথা যাঁর তিনি কী নির্বাক দিন যাপন করছেন হাসপাতালের এক নৈর্ব্যক্তিক কামনায়—জীবনের জ্বলজ্বলে প্রান্তরে ছুটে বেড়ানোর কথা যাঁর, তিনি শুয়ে আছেন নীরক্ত বেডে। ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে অন্য দেশের অন্য এক কবির কথা। আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে অন্য এক দুখী মুখ। বোদলেয়ারের মুখ জেগে থাকে নজরুল ইসলামের মুখের পাশাপাশি। দুই কবি—শুধু একটি ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে মিল নেই তাঁদের—আর কী ভয়ানক এই মিল। ফরাসী কাব্যের পাঠক মাত্রেই জানেন মৃত্যুর কিছুকাল আগে কবিদের রাজা বোদলেয়ার নির্বাসিত হয়েছিলেন, স্বাভাবিকতার রাজ্য থেকে। বিষাদগ্রস্ত সেই কবি নিজেকে চিনতে পারতেন না শেষ জীবনে। আপনার নিজের চেহারা দেখে টুপি খুলে নিতেন বিস্মিত অতিথিকে অভিবাদন জানানোর জন্য। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম এই বোধশক্তিটুকু থেকেও বঞ্চিত। ভীষণ বুজে থাকা মানুষ তিনি,—কাউকে ভুল করে অভিবাদন জানানোর মতো উদ্যম তাঁর নেই। তিনি নিজেকে তো নয়ই, কাউকেই চেনেন না। স্মৃতি তাঁকে ত্যাগ করে গেছে বহুকাল আগে, স্বাভাবিকতা তাঁর সঙ্গে নিদারুণ প্রতারণা করেছে। তিনি হয়তো আরো বহুদিন বেঁচে থাকবেন, আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন, স্মৃতিহীন, কাব্যহীন, সঙ্গীতবিহীন। এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ চায়, তিনি বেঁচে থাকুন। এখনো তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

তাঁর বিখ্যাত যে চোখ আজ মেঝেতে দেয়ালে নিবদ্ধ, আকাশের নীলিমায় উধাও। সেই চোখের জ্যোতি একদিন নিভে যাবে। নিঃস্পন্দ, নিঃসাড় হয়ে যাবে সেই শরীর—যে শরীর এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম নামক এক কালজয়ী কবিকে। একদিন তাঁর এই শরীর হারিয়ে যাবে সীমাহীন অন্ধকারে। সেই কবে ব্যথাবিষে নীলকণ্ঠ এই কবি লিখেছিলেন, যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে। কিন্তু আমরা কি বুঝি?

*২৫শে মে ১৯৭৬*

## সেই অসামান্য হাত

যিনি অত্যন্ত সজীব, হাসিখুশি, রসিকতায় ভরপুর, সর্বদা আলাপপ্রবণ, তিনি রোগশয্যায় শুয়ে রয়েছেন অসহায়ভবে, বহু কষ্টে উচ্চারণ করতে পারছেন একটি কি দু'টি বাক্য, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে—ভাবলেই মন কেমন খারাপ হয়ে যায়। আমাদের গৌরব, শিল্পী জয়নুল আবেদিন হাসপাতালে অস্তমিত হচ্ছেন এ খবর অনেকেরই জানা ছিলো। আমরা জানতাম তাঁর সত্তায় এমন এক ব্যাধি কামড় বসিয়েছে যার থাবা থেকে কেউ নিস্তার পায় না। তাই, জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুর আগেই তাঁর জন্য শোকার্ত হয়ে উঠেছিলেন অনেকে। তাহলে তিনি চলে যাবেন 'কে জানে আর ক'দিন আছেন' কী যন্ত্রণাই না ভোগ করছেন তিনি। একি সম্ভব নয় যে আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি, তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না আর—এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছিলো ক'দিন থেকে। এক

গভীর উদ্বেগ দখল করে ফেলেছিলো শিল্পীর অনুরাগীদের। এবং তাঁর অনুরক্ত ভক্তের সংখ্যা নগণ্য নয়।

অসুস্থ শিল্পীকে দেখার জন্যে কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম পিজি হাসপাতালে। হাসপাতালের করিডোর পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম ২৪২ নম্বর কেবিনের দিকে। বাইরে ছিলেন শফিউদ্দীন আহ্‌মদ, শফিকুল আমীন, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আবদুর রাজ্জাক এবং আরো কেউ কেউ। আমার সঙ্গে ছিলেন গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ। শুনলাম জয়নুল আবেদিন ঘুমিয়ে আছেন। দূর থেকে দেখলাম এক ঝলক, খুব খারাপ লাগলো। দারুণ অস্বস্তিবোধ করলাম সেই মুহূর্তে। একজন মানুষের শরীর যে কী ভয়ানক বদলে যেতে পারে ব্যাধির স্বৈরাচারে তা এর আগেও আমি দেখেছি তাই বিস্মিত হইনি, শুধু বিষণ্ণতায় মন আচ্ছন্ন হয়ে রইলো বহুক্ষণ।

সেদিন শিল্পাচার্যের সঙ্গে দেখা হয় নি। গত বুধবার আবার দেখতে গিয়েছিলাম তাঁকে। কেবিনে প্রবেশ করে দেখলাম বাংলাদেশের এক পরাক্রান্ত কিংবদন্তী শুয়ে আছে বেডে। চোখ অতিশয় নিষ্প্রভ, শরীরের বিভিন্ন অংশে পাউডারের ছোপ। মৃত্যুপথযাত্রী শিল্পীর পাশে তাঁর জীবনসঙ্গিনী সেবায় সমর্পিতা সারাক্ষণ। তিনি স্বামীর খুব কাছে গিয়ে আমার নাম উচ্চারণ করলেন মৃদু কণ্ঠে। জয়নুল আবেদিন হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, আমার হাত অনেকক্ষণ ছিলো শিল্পীর করতলে। হাত যে কি বাঙ্ময় হতে পারে তা নতুন করে জানলাম আবার। কথা বলতে পারছিলেন না বলেই হয়তো অন্তর্গত ভাষা উজাড় করে দিয়েছিলেন হাতে। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো তখন, কোনো কথাই নিঃসৃত হলো না মুখ থেকে। বোবার মতো বসেছিলাম শিল্পীর পাশে। মৃত্যুর শীতল ফুৎকার বয়ে যাচ্ছে কেবিনময়, সে মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো আমার। তবে কি এক্ষুনি সকল প্রাণকণা উড়ে যাবে শিল্পাচার্যের সত্তা থেকে?

এই প্রথমবার জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে ফিরে এলাম কোনো কথা না শুনে, কোনো কথা না বলে। এই হৃদয়বান শিল্পী মানুষটি কথা বলতে ভালোবাসতেন বলতেও পারতেন চমৎকার। এক অননুরণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতেন তিনি। মাঝে মাঝে বাক্যের মধ্যপথে থেমে গিয়ে মাথা ঝাঁকাতেন সুন্দরভাবে এবং সেই ঝাঁকুনি হয়ে উঠতো খুবই অর্থপূর্ণ। বলার চেয়েও বেশী বলা হয়ে যেতো অমন মৃদু তৃপ্তিকর শিরসঞ্চালনে। অসাধারণ প্রতিভাবান এই মানুষটি ছিলেন খ্যাতির অধিকারী, কিন্তু বিন্দুমাত্র অহমিকা ছিলো না তাঁর। অত্যন্ত সহজভাবে মিশতে পারতেন সবার সঙ্গে। সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন নিমেষে। তাঁর মনের ঔদার্যের ফলেই কেউ কখনো প্রতিহিত হতো না তাঁর কাছে এসে।

জয়নুল আবেদিন এমন আন্তরিকভাবে কথা বলতেন যে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হতো শিল্পাচার্যের সত্তায় ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই বালক, যে স্কুল পালিয়ে ঘুরে বেড়াতো বনবাদাড়ে, নদীর বাঁকে বাঁকে, যাঁর হাতের আঙুল চঞ্চল হয়ে উঠতো ছবি আঁকার জন্য, ছবি এঁকে লুকিয়ে রাখতো বিছানার নিচে, যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো গাছগাছালি আর পাখপাখালি দেখে। হ্যাঁ, সেই সবল-সুন্দর বালক যে লালিত হয়েছিলো গ্রাম বাংলার শান্ত মধুর পরিবেশে। যে সারল্য প্রকৃতির সন্তানদের মধ্যে দেখা

যায় সুস্পষ্টভাবে, সেই সারল্যের আভায় জ্বলজ্বল করতো ছবিতে-পাওয়া বালকের অস্তিত্ব। কতবার অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, জয়নুল আবেদিন কথা বললেই আমার দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে নদীর এক বাঁক, গুণটানা মাঝির চাঁদের মতো বাঁকা শরীর, ধানের সোনালী ঝিলিমিলি, টিয়ের ঝাঁক, ডুরে শাড়ি-পরা, ঘোমটা-টানা গ্রাম্য বধূ, হাঁটুতে মুখ গুঁজে থাকা কৃষক, ফুটপাতে পড়ে থাকা কঙ্কালসার মানব-মানবী, শিশু; আর দুর্ভিক্ষের মতোই কালো, ক্ষুধার্ত কাক। যিনি দেশের মাটি ও মানুষকে গভীর ভালোবেসেছেন, শুধু তাঁর মুখের রেখার করতলে কিংবা চোখের চাওয়ায় নিমিষে উদ্ভাসিত হতে পারে স্বদেশের আত্মা। কে না জানে, স্বদেশের প্রতি জয়নুলের ভালোবাসা ছিলো কী অকৃত্রিম, কী অপরিসীম, সেই ভালোবাসাই তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছিলো তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্কেচমালা, মনপুরা ৭০ নামক মৃত্যুগন্ধময় এক শিল্পিত স্ক্রল।

জয়নু আবেদিনের মধ্যে একজন কর্মিষ্ঠ পুরুষের অধিষ্ঠান ছিলো। এই কর্মঞ্চল পুরুষের প্রাবল্যে কখনো কখনো তাঁর শিল্পীসত্তা আহত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে তাঁকে এমন কিছু কাজে সময় ব্যয় করতে হয়েছে যা একজন শিল্পীর পক্ষে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর। দেশে আর্ট ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য তাঁকে বার বার ধরণা দিতে হয়েছে মন্ত্রীদের দরবারে। ফাইল নিয়ে ঘুরতে হয়েছে দফতর থেকে দফতরান্তরে। ক্যানভাসকে চিত্রময় করে তোলাই যাঁর কাজ তাঁকে যদি এভাবে শক্তি ক্ষয় করতে হয়, তাহলে তিনি ছবি আঁকবেন কী করে? তাই, আসল ছবি এখনো আঁকা হয় নি,—এই খেদোক্তি মাঝে মাঝে করতেন তিনি। এ কারণেই শেষের দিকে নতুন ছবি আঁকার ব্যাকুলতা প্রবল হয়ে উঠেছিলো তাঁর মধ্যে।

কিন্তু আজ তাঁর তুলিগুলি ভীষণ স্তব্ধ আর অলস। এখন ওরা ঘরের যে কোনো আসবাবের মতোই যেন,—যে হাতের স্পর্শে ওরা সপ্রাণ, চঞ্চল হয়ে উঠতো সেই অসামান্য হাত ঝরে গেছে শূন্যতায়, সেই হাত এখন তিন হাত মাটির নীচে—যে মাটির সোঁদা ঘ্রাণ এত ভালোবাসতেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন। সেই অবলুপ্ত হাতের জন্য আজ শোকার্ত শিল্পের ভুবন।

*৩০শে মে ১৯৭৬*

## অবিস্মরণীয় আগন্তুক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বইটি অনেক দিন আগে উপহার পেয়েছিলাম ভুঁইয়া ইকবালের কাছ থেকে। বইয়ের নাম 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম বিষয়ে বারোজন লেখকের প্রবন্ধাবলীর এই সংকলন—গ্রন্থটির সম্পাদক ভুঁইয়া ইকবাল। ভুঁইয়া ইকবালকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। এই কর্মিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান তরুণ অধ্যাপক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত। তাঁর এই অকৃত্রিম অনুরাগের ফসল 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' নামক সংকলন গ্রন্থ। আমি জানি, তিনি উদ্যোগ না নিলে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম না করলে বইটি প্রকাশিত হতো না। এই বইয়ের জন্ম ইতিহাস আমার জানা আছে বলেই এ কথা লিপিবদ্ধ করতে

পারছি। একেকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে যে শ্রম করতে হয়েছে, যে-ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি বারবার পত্রাঘাত করেছেন বিভিন্ন লেখককে, মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছেন প্রতিশ্রুত প্রবন্ধের জন্য। 'দিচ্ছি' 'দেবো' করে অনেক প্রাবন্ধিকই ভূঁইয়া ইকবালকে বসিয়ে রেখেছেন অপেক্ষমান মৎসশিকারীর মতো। এ ব্যাপারে আমার নিজের কসুর অপরিসীম। আমি বারংবার তাঁর কাছ থেকে সময় নিয়েছি আমার প্রতিশ্রুত প্রবন্ধটির জন্য। দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত আমি কথা রাখতে পারি নি। ভূঁইয়া ইকবাল জানেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার একটি সামান্য রচনা নিবেদন করতে পারলে আমি ধন্য হতাম। ইকবাল আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না। দায়সারা গোছের প্রবন্ধ লিখবো না, ভেবে-চিন্তে, ভালো করে লিখবো—এমন একটি সংকল্পে অটল থেকে প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করেছিলাম। সংকল্প অটুট থাকলো বটে, কিন্তু লেখাই হলো না।

বন্ধুবর আহমেদ হুমায়ুন তাঁর নাতিদীর্ঘ কিন্তু উজ্জ্বল প্রবন্ধটির নাম রেখেছেন 'অবিস্মরণীয় আগন্তুক।' এই আখ্যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সাজে। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রে তৃপ্ত, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর ফেনিল আন্দোলনে রোমাঞ্চিত উপন্যাস পাঠকদের পক্ষে ছিলেন বাস্তবিকই এক আগন্তুক, যাঁকে দেখামাত্রই মনে হয় স্বতন্ত্র। বাংলা কথাসাহিত্যকে বয়স্ক করেছেন তিনি, গভীরতা-অভিসারী। এই অবিস্মরণীয় আগন্তুক আজ যে কোনো রুচিশীল, বিদগ্ধ পাঠকের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত এক মহান অতিথি।

এই অসামান্য কথাশিল্পী আমৃত্যু লিখে গেছেন একজন শ্রমিকের মতো। তিনি নিজেই বলেছেন, 'লেখক নিছক কলমপেশা মজুর। কলম-পেশা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।' এবং এ কথা ঠিক, আজকের যেকোনো ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিককে কখনো না কখনো গভীর দৃষ্টিপাত করতে হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর প্রতি। হয়তো সবকিছু গ্রহণযোগ্য ঠেকবে না, তবু এমন বহু সম্পদ তাঁরা খুঁজে পাবেন মানিক ভাণ্ডারে যা তাদের সমৃদ্ধ করবে, উদ্বুদ্ধ করবে, সত্যিকারের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে।

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই নিষ্ঠা ও শ্রমের ফসল। তবে আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ রফিক, আহমেদ হুমায়ুন এবং আবুল মোমেনের প্রবন্ধ আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। এঁদের রচনা পাঠকদের প্রশ্নাকুল করবে, তাদের চেতনাকে বইয়ে দেবে অনভ্যস্ত খরস্রোতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি : 'কলম-পেশার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোশ জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো।' তাঁর মতো প্রতিভাবান লেখক যখন এ-কথা বলেন তখন বামনদের আস্ফালন দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয় বৈকি।

*১২ জুলাই, ১৯৭৬*

# সেই অলৌকিক কারখানা

একজন চিত্রকরের স্টুডিয়োতে কিছু সময় কাটানো এক সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। সমাপ্ত অর্ধসমাপ্ত সবেমাত্র—শুরু-করা ছবির ভিড়ে, রঙের ঘ্রাণে, চিত্রকরের ব্যক্তিত্বে ভরপুর একটি ঘরে কয়েক ঘণ্টা বসতে পারার সুযোগ সবাই পায় না। যারা পায় তারা রেখা ও রঙের এক অসামান্য জগতে প্রবেশ করে ধন্য হয়, পুরস্কৃত হয়। বারবার পুরস্কৃত হতে চায়। শিল্পী ছবি আঁকছেন, আঁকার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছেন, সিগারেট ফুঁকছেন, ক্যানভাসের কাছ থেকে একটু সরে এসে তন্ময় হয়ে দেখছেন নিজের ছবি কিংবা দৃষ্টিতে নিয়ে আসছেন সমালোচনার ভঙ্গী—এই দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে। একটা ক্যানভাস—কিছুক্ষণ আগে কিছুই ছিলো না সেখানে, শুধু ছড়ানো ছিলো খাঁ খাঁ শূন্যতা। চিত্রকর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ক্যানভাসের শূন্য জমিনে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ধ্যানীর মতো। তারপর ক্যানভাস থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন, ধরালেন সিগারেট। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরে, তিনি আবার গিয়ে দাঁড়ালেন ইজেলের সামনে। শূন্য ক্যানভাস একটা চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে তাকে। শূন্য ক্যানভাস যেন ব্যঙ্গ করছে শিল্পীকে, যেন বলছে—'দেখবো কী ক্ষমতা তুমি ধরো তোমার আঙুলে দেখবো কী যাদু আছে তোমার তুলিতে। পারবে না, তুমি পারবে না আমার শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে। তুমি ব্যর্থ, তুমি অসহায়'। শূন্য ক্যানভাসের তীক্ষ্ণ পরিহাস শিল্পীকে বিচলিত করবে কিছুক্ষণ, হয়তো ক্ষণিকের জন্য জমে যাবে তার আঙুলের রঙ, তিনি হয়তো মুষড়ে পড়বেন, পালিয়ে যেতে চাইবেন স্টুডিয়ো থেকে। মনে পরাজয়ের গ্লানি পুষে প্রস্থান করতে চাইবেন নিজস্ব শিল্পীশালা থেকে। এবং সেই মুহূর্তে তার প্রাক্তন চিত্রমালা গান হয়ে তার কানে কানে বলবে, 'তুমি এভাবে পালিয়ে যেও না, তাকাও আমাদের দিকে, দ্যাখো, এইতো আমরা তোমার প্রতিভার প্রসূন, তোমার ক্ষমতার নির্ভুল স্বাক্ষর। শূন্যতার চ্যালেঞ্জ তুমি গ্রহণ করো। তুলি তুলে নাও হাতে, রঙ ছড়িয়ে দাও ক্যানভাসে, শূন্যতায় আঁকো তোমার প্রতিভা।' চিত্রকর ফিরে দাঁড়াবেন এবার, মন থেকে মুছে ফেলবেন দ্বিধা, প্যালেটে তৈরী হতে থাকবে রঙ, চঞ্চল হয়ে উঠবে আঙুল। একজন ভয়-পাওয়া, প্রায় পরাজিত মানুষ এক নিমিষে শিল্পীতে রূপান্তরিত হবেন। রক্তমাংস হয়ে উঠবে জ্বলন্ত আতশবাজি, শূন্যতা ভীত হবে সেই রূপ দেখে, শূন্যতা পরাজিত হবে শিল্পীর আঙুলের কাছে, শূন্যতা শিল্পীত হবে রঙ ও রেখায়। একটি চিত্র ফিরিয়ে আনবে একজন শিল্পীর আত্মবিশ্বাস, তাঁর জন্য নিয়ে আসবে বেঁচে থাকার মান, এক অনন্য জয়।

যে-শিল্পী শূন্যতার দাপটে স্টুডিয়ো ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইবেন; তার পলায়নের মুহূর্তে পুরস্কার না-ও আসতে পারে। তক্ষুনি তাকে দখল না-ও করতে পারে অনুপ্রেরণা। তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো পরাজিত মানুষের মতো মাথা হেঁট করে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন ঘর থেকে। তার প্রাক্তন চিত্রমালার ব্যাকুল ডাক, রঙের টিউব আর তুলির চীৎকার তার কানে না-ও পৌঁছতে পারে সেই মুহূর্তে। আমি পারবো না, আমি হেরে গেছি একটি শূন্য ক্যানভাসের কাছে, বলে তিনি চলে যেতে পারেন অন্য কোথাও, হয়তো বালিশে মুখ গুঁজে ভুলতে চাইবেন পরাজয়ের গ্লানি। 'তাহলে কি আমি ফুরিয়ে গেছি?'—এই প্রশ্নের

ঠোকরে তিনি অস্থির হয়ে পড়বেন। ঘুমোতে চাইবেন তিনি, কিন্তু ঘুম আসবে না। ব্যর্থতা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছে তখনকার মতো। হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা তার কেটে যাবে ব্যর্থতার পাশাপাশি শুয়ে। একটু তন্দ্রা এসেছিলো, হঠাৎ ছিঁড়ে গেলো তন্দ্রার জাল। তিনি জেগে উঠলেন মধ্যরাতে, একা। আর কী আশ্চর্য, সে সম্ভাব্য চিত্র সন্ধ্যায় মারাত্মক ছলনা করেছিলো তার সঙ্গে, সে যেন দেখা দিলো হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো। শিল্পী ছুটে গেলেন স্টুডিয়োতে, দাঁড়ালেন ইজেলের সামনে, হয়ে উঠলো একটি ছবি—যে ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে শিল্প সমালোচক, যে-ছবি দেখে আনন্দ পাবেন দর্শকরা।

একজন শিল্পীর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জয়-পরজয়ের মুহূর্তগুলি কাটে আমাদের অগোচরে। একটি অসাধারণ চিত্রের পেছনে যে কী ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তা আমরা জানতে পারি না, যদি না শিল্পী নিজে কিংবা কোনো একজন সমঝদার আমাদের তা জানান। যাঁরা সাধারণ দর্শক, যাঁরা ছবি বুঝতে পারেন না তাঁদের পক্ষে একটি চিত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা মুশকিল। আমরা সাধারণত ছবির ওপর চোখ বুলিয়ে যাই, ছবি দেখি না। আমি এই 'দেখি' শব্দটির ওপর জোর দিতে চাই। যে ছবি আমাদের দৃষ্টিতে তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত নয় সেই ছবিই শিল্প-আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ফরাসী চিত্রকর ম্যানের 'ঘাসে মধ্যাহ্ন ভোজন' ছবিটি মনে পড়ছে। এই ছবিটি প্রথম যখন দেখেছিলাম একটি বইয়ে তখন আমার কাছে 'ঘাসে মধ্যাহ্ন ভোজন' যে-কোন একটি ভালো ছবির মতোই মনে হয়েছিলো, চিত্রটির অসাধারণত্ব পরিস্ফুট হয় নি আমার দৃষ্টিতে। অবশ্য পরে জেনেছি 'ঘাসে মধ্যাহ্ন ভোজন'কে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো সেকালে। অচেনা বিষয় ও আঙ্গিকের জন্য ম্যানের সেই চিত্র সংবাদপত্রের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। ম্যানে তাঁর ছবিতে ঐতিহ্য বিষয়ে জনসাধারণের ধারণাকে প্রশ্রয় দেন নি। অতীতকে সমকালীন ও আধুনিক করে তোলা যে সম্ভব তা ম্যানে প্রমাণ করেছিলেন 'ঘাসে মধ্যাহ্ন ভোজন' ছবিতে। সমকালীন জীবনযাত্রার একটি দিককে বাঙ্ময় করার উদ্দেশে তিনি রেনেসাঁর একটি চেনা কম্পোজিশনকে নতুন রূপে ব্যবহার করেছিলেন। এখানেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়।

একদা আমি পুরোনো সাহিত্যপত্রে অতি সাধারণ চিত্র দেখেও আনন্দিত হতাম। *পুকুর ঘাটে স্নানরতা রমণী, 'জলকে চল' ধরনের ছবি যাতে শিল্পীর সৃষ্টিশীল কাজের কোনো চিহ্ন নেই*—আমাকে যথেষ্ট পুলকিত করতো। রসিকদের ধিক্কার কুড়াবো, তবু আমার তখনকার সেই ভালো লাগাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। যদি আমার শিল্পবোধ শুধু রবি বর্মা কিংবা সেরকম আঁকিয়েদের ছবিতেই আটকে থাকতো তাহলে *আমার লজ্জিত হওয়ার কথা ছিলো বৈকি। কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন, আমার দৃষ্টি* মাসিক পত্রিকার সাধারণ রঙিন ছবিতে বন্দী হয়ে থাকে নি, আমার দৃষ্টি দেশ বিদেশের অসাধারণ ছবি থেকেই আনন্দ সংগ্রহ করতে সক্ষম। আমি চিত্রকলার সঙ্গে আমার কিছু সংযোগ রয়েছে, সেকাল ও একালের প্রতিভাবান শিল্পীদের ছবি দেখে আমি আনন্দিত ও পুরস্কৃত হই—একথা অংসকোচে বললে আশা করি কেউ অপরাধ নেবেন না। কখনো কারো সাধারণ, সস্তা ছবি দেখে ভালো লাগলে তাঁকে শিল্পভোক্তাদের সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখা অনুচিত। স্নানরতা রমণীর সাধারণ ছবি দেখে যে কিশোর একদা আনন্দ পেতো,

পরবর্তীকালে যদি সে বর্তিচেলীর 'ভেনাসের জন্ম' দেখে পুরস্কৃত বোধ করে কিংবা মদিলীয়ানীর আঁকা কোনো ন্যুড দেখে আনন্দিত হয়, তাহলে অদীক্ষিত বলে তাঁকে উপেক্ষা করা যায় কি? চিত্রকলার দর্শক হিসেবে তার এই উত্তরণকে স্বীকৃতি দেয়াই সমঝদারের শিল্পরুচির পরিচায়ক। ছবি দেখতে শিখি না বলেই আমরা আর্ট গ্যালারীতে কিংবা চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে হকচকিয়ে যাই। 'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না' বলে শিল্পীদের প্রতি কিছু প্রাকৃত বাক্য ছুঁড়ে নিজেদের অজ্ঞতার পিঠ চাপড়ে তৃপ্ত থাকি। অবশ্য সব দোষ দর্শকদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ নেই। আমাদের দেশে ছবি দেখাশোনার কোনো ব্যবস্থা আছে কি? যাতে ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই একটু আধটু ছবি দেখতে শিখতে পারে, কিশোর-কিশোরীরা চিত্রকলা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ কবতে পারে, ভালো ও মন্দ ছবির পার্থক্য বুঝতে পারে, তেমন উদ্যোগ কোথায়? কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী চিত্রকলা বিষয়ক কোনো বই এখানে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাই, যদি অধিকাংশ দর্শক কোনো চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসেন, কটুকাটব্য করেন আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে তাহলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই আপাতত।

ছবি দেখতে শেখার কেনো সহজ পদ্ধতি নেই। কাঠখড় পুড়িয়েই ছবি দেখতে শিখতে হয়। বেশী করে ছবি দেখা, বার বার ছবি দেখাই হচ্ছে ছবি দেখতে শেখার অন্যতম উপায়। চিত্রকলার ইতিহাসও জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে রঙ ও রেখার বহুস্তরী জগৎকে। একজন চিত্রকরের স্টুডিয়োতে কিছুকাল কাটাতে পারলে সেই জগতের রহস্য কিঞ্চিৎ উন্মোচিত হতে পারে বলে আমার ধারণা। কেননা, একজন সৃজনশীল চিত্রকরের ষ্টুডিয়ো সেই অলৌকিক কারখানা যেখানে স্বপ্নের পর স্বপ্ন জেগে ওঠে নানা অবয়বে, যেখানে দ্বীপ নিমজ্জিত হয়, দ্বীপ জাগে, দেয়াল গান গায়, চতুষ্কোণ সিম্ফনির মতো বাজে, রঙের কিছু ছোপ রমণীর মতো কমনীয় সৌন্দর্য হয়—যে সৌন্দর্য ত্রিলোকে কেউ দেখে নি, যেখানে মানুষের মুখ ভবিষ্যতের মতো অপেক্ষমান, একটি হাতের আভাস অনন্তের শুভ্রতার যাত্রা করে, একটি কি দু'টি রেখা। হয়তো পাখির ওড়াউড়ি, হয়তো অন্য কিছু, নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তর্লোকের আলাদা চিত্র হয়তো-বা, যেখানে জীবন বন্দনীয় হয়ে ওঠে নানা রূপে।

*২৩ই জুলাই, ১৯৭৬*

## একজন অযান্ত্রিক চিত্রকর

*'অযান্ত্রিক' গল্পের সেই জীর্ণ ট্যাক্সির মতো একটি মোটর কারের ভগ্নাংশের ওপর* এসে পড়েছে সকাল বেলার রোদ। একদিন যা ছিল সতেজ, চলমান যানের অত্যন্ত জরুরী অংশ এখন তো কেমন পরিত্যক্ত, বোকা-বোকা, অর্থহীন। কিন্তু যে-রোদ গাছপালায়, সুন্দর বাড়িঘরে ঝরেছে, সেই রোদই সীমাহীন ঔদার্যে আদর করছে মোটর কারের ভংগ্নাংশগুলিকে। এই দৃশ্য ঘুমভাঙা চোখে দেখলেন এক তরুণ; মুগ্ধভাবে দেখলেন রোদ আর কিছু লোহা-লক্কড়ের অন্তরঙ্গ মিলন। তাঁর মনে জেগে রইলো একটি নকশা। এবং সেই মুহূর্তেই জীর্ণ মোটর কারের ভগ্নাংশকে ক্যানভাসে তুলে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন

সেই আশুচেতন তরুণ যিনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল চিত্র। এভাবেই সেই তরুণ কালিদাস কর্মকার, নিজের এক আলাদা ছবির জগৎ গড়ে তুললেন ধাতু, কাঠ আর রঙের সমন্বয়ে। যদি বলি, হঠাৎ তিনি কিছু ফেলে-দেয়া যন্ত্রাংশকে শিল্পকর্মে পরিণত করেছেন, তাহলে ভুল হবে। তিনি বাংলাদেশের বড় বড় নৌকায় পেতলের নকশা দেখেছেন, দেখেছেন দরজায় ধাতুর নকশা। ধাতুর এই ব্যবহার তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া আধুনিক পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের উদাহরণও ছিলো তাঁর স্মৃতিতে। স্বদেশের লোকজ ধাতব নকশা আর পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের নিদর্শনই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে ধাতু, কাঠ আর বর্ণের সমন্বয়ে কোলাজ সৃষ্টিতে। বাংলাদেশে কালিদাস কর্মকারের আগে এ ধরনের কাজ এমন প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণভাবে কেউ করেন নি। কালিদাস কর্মকার অবশ্য তাঁর শিল্পসাধনাকে এই কোলাজ নির্মাণেই সীমিত রাখেন নি, তিনি কাজ করেন বিভিন্ন মাধ্যমে। এবং করেন এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে যে কৃপণ সমালোচককেও প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করতে হয়।

কালিদাস কর্মকার একজন বিনয়ী ও সৎ শিল্পী। তাঁর কথাবার্তায় কোনো দেখানোপনা নেই, বড় বড় বুলি তিনি এড়িয়ে চলেন, লক্ষ করেছি। নিজের শিল্পকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কথা বলেন, তিনি অগ্রজ শিল্পীদের সম্পর্কে যখন মন্তব্য করেন, তখন তাঁর উক্তিতে প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচয় পাই আমরা। যাঁর কাছে যেটুকু শিখেছেন তাঁর ঋণই স্বীকার করেন কৃতজ্ঞ চিত্তে। মোট কথা কোনো ভড়ং প্রশয় পায় না কালিদাসের আচরণে কিংবা শিল্পকর্মে। একজন আধুনিক শিল্পী হিসেবে তিনি বিমূর্ত রীতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন বটে, তবে বাস্তবতার জমিন তিনি পুরোপুরি ত্যাগ করতে চান না। আমাদের একজন প্রধান চিত্রকর কামরুল হাসান কালিদাস কর্মকারের একক চিত্র প্রদর্শনী সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'নানা রকম উপাদানান্বিত শিল্পকর্মের এই প্রদর্শনীতে নির্বাচিত বিষয়বস্তুগুলি বিমূর্ত হলেও বাস্তবতার ভিত্তিতে তা গঠিত। আমার এ মন্তব্যের স্বাক্ষর সকলেই প্রদর্শনীতে প্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন বলেই আমার ধারণা। একজন দক্ষ শিল্পী ছাড়া এই সমতা রক্ষা করা দুরূহ কাজ। নীরস কাষ্ঠগুচ্ছের পটভূমিতে রং এবং রেখার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতব দ্রব্য বা কোনো কোনো যন্ত্রের অংশবিশেষের সুনিপুণ সংযোজন শিল্পের রূপ নিয়ে যন্ত্রের যন্ত্রণা থেকে যে মুক্তি দিতে পারে, কালিদাস কর্মকারের শিল্পী সুলভ অনুভূতিই এর মূলে অবস্থিত।'

হ্যাঁ, গভীর অনুভূতিই কালিদাস কর্মকারের মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ তাঁর শিল্পকর্মে ছড়িয়ে দিয়েছে সেই আভা যা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড, ধাতু ও যন্ত্রাংশকে বাঙ্ময় করে তোলে, রঙ ও রেখাকে রূপান্তরিত করে গীতি কবিতায়। কালিদাসের ছবি দেখলে মনে হয়, তিনি হৃদয়বত্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তির পথ আগলে রেখেছেন যেন। তাঁর হৃদয়বত্তার প্রাবল্যেই বুঝি ভাঙাচোরা এক টিনের চেয়ার হয়ে ওঠে কোনো আর্ত মানুষ—যে তার সত্তার আশ্চর্য এক বিষাদ নিয়ে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গতার ক্রুশে।

কালিদাস কর্মকার বলেছেন, 'আমার ছবির গুণাগুণ কী তা আমি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলবো যে, আমি ফাঁকি দিই না।' সত্যি, তিনি ফাঁকি দেন নি, না নিজেকে না দর্শকদের। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান এই শিল্পী এক মোহন ভূতগ্রস্ততায় এঁকে যান ছবির পর ছবি। সেসব ছবিতে, সব সময় থাকে রেখার বলিষ্ঠতা, রঙের সুরেলা ঐক্যতান। কালিদাসের ড্রইং দুর্বল এ-কথা অতি নিন্দুকেও বলবে না। কামরুল হাসান, যিনি নিজে

ড্রইং-এ প্রায় প্রাবাদিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি বলেছেন, 'কালিদাসের বেশ কিছু সংখ্যক ড্রইং গ্রাফিকস ও জল রঙের কাজ এই প্রদর্শনীতে স্থান পাচ্ছে। ইদানিং বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক তরুণ শিল্পীদের মাঝে ড্রইং-এর প্রতি তীব্র অনীহা লক্ষ্য করে আসছিলাম যা শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যাধি বলে মনে করি আমি। তীব্র অনুভূতি দ্বারা নিরীক্ষণ ছাড়া এই রকম ড্রইং এবং জলরঙের কাজ সম্ভব নয়। যে কোনো সৃষ্টিধর্মী কাজের অনুশীলনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে তা আরো অধিক প্রয়োজন। আশা করি, তরুণ শিল্পীরা কালিদাসের এই প্রদর্শনীতে তা অনুধাবন করতে পারবে।'

উঁচুদরের শিল্পী হওয়ার জন্য কালিদাস ছবি আঁকেন না, আঁকেন মনের আনন্দে। এটা আমার উক্তি নয়, এ-কথা বলেছেন শিল্পী স্বয়ং। তিনি উঁচুদরের চিত্রকর হবেন কি না তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে। তবে ইতিমধ্যে তিনি প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে আমরা আশান্বিত এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে। যে শিল্পীর সাধনায় যন্ত্রাংশ হতে জানে আহত সূর্যমুখী, জীর্ণ লোহা হতে জানে নিঃসঙ্গ মানুষ তিনি আর যা-ই হোন সামান্য নন। এই যন্ত্রশাসিত যুগেও তিনি এক অযান্ত্রিক চিত্রকর তাঁর নিজস্ব স্বপ্ন, ভাবনা, নৈঃসঙ্গ্য, বৈফল্য, সাফল্য আর সংগ্রাম নিয়ে।

*১০ই আগস্ট ১৯৭৬*

## গোধূলির বন্দী এখন মুক্তির আকাশে

কাল দুপুরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম পিজি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। অনেক শোকার্ত মুখের ভিড়। কেউ কেউ ফিসফিস গলায় কথা বলছেন, কারো কারো চোখ কান্নায় ফোলা। দু-তিন ঘণ্টা পরে আবার আমি দাঁড়িয়েছিলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। লোকে লোকারণ্য এই ঐতিহাসিক উদ্যান। চারিদিক থেকে লোক আসছে তো আসছেই। আসছে সেই মানুষটিকে শেষ বারের মতো শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে যিনি একদা তাঁর স্বদেশকে মাতিয়ে রেখেছিলেন গানে, গল্পে, কবিতায়। এমন একদিন ছিলো যখন তাঁর অনুগামী হতো হাজার হাজার মানুষ তাঁর কবিতা আর গান শোনার জন্য, দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসতো অসংখ্য লোক। এসব গল্প শুনে আমার সেই মানুষটিকে মনে হতো হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো, যার বাঁশির সুর শুনলে কেউ ঘরে বসে থাকতে পারতো না, বেরিয়ে আসতো খোলা রাস্তায়। কাল তাঁর হাতে ছিলো না কোনো বাঁশি কিংবা হারমোনিয়াম, তবু তাঁর সান্নিধ্যে ছুটে এসেছিলো হাজার হাজার লোক। সারা ঢাকা বেরিয়ে এসেছিলো রৌদ্রজ্বলা দুপুরে, ছায়াম্লান বিকেলে। জীবনে যিনি আকর্ষণ করতে পারতেন সবাইকে। মরণেও তিনি নিজের কাছে টেনে আনলেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে। সূর্য যখন কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায়, রমনার ঘাসে, বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ও পাবলিক লাইব্রেরীর দেয়ালে জাফরানী রোদ ঝরিয়ে এলিয়ে পড়ছিলো পশ্চিম দিকে, তখন তাঁকে কাজী নজরুল ইসলামকে, নামানো হলো কবরে। একজন অস্তমিত কবির স্পন্দনরহিত শরীর মাটির গভীরে সমর্পিত হলো শেষ বিকেলে। 'বিদায় নজরুল', রমনার বুক চিরে বেরিয়ে এলো বেদনার্ত স্বর।

বিদায় নজরুল, ঐতিহাসিক ঢাকা নগরী গাঢ় বেজে উঠলো শোকার্ত বিউগলের মতো। 'বিদায় নজরুল', কান্নাপাওয়া সুরে কেঁপে কেঁপে উঠলো সারা বাংলাদেশ।

কাজী নজরুল ইসলামের কথা অনেকের মুখে শুনেছি। পড়েছি বহু স্মৃতিচারী রচনায়। যাঁরা কবির খুব কাছের মানুষ ছিলেন, তাঁদের কারো কারো কাছে থেকেও তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সে সব টুকরো টুকরো কথা থেকে যে মানুষটির ছবি পাওয়া যায়, তিনি এক অসাধারণ কবি তো বটেই। মানুষ হিসেবেও তিনি অসামান্য। আশ্চর্য বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। অসুস্থ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বেজেছেন জ্বলজ্বলে অগ্নিবীণার মতো। তারুণ্যে ভরপুর এক দরাজদিল মানুষ সারাক্ষণ আনন্দে মশগুল, ঝড়ের মতো উদ্দাম। যেখানে যেতেন সেখানেই বয়ে যেতো আড্ডার উচ্ছল ঢেউ। গানে গজলে নিমেষে রচিত হতো এক অলৌকিক গুলবাগ। ঘন ঘন পান পুরছেন মুখে, চা খাচ্ছেন বারংবার আর হারমোনিয়ামের রীডে রীডে নেচে চলেছে তাঁর নিপুণ আঙুল, কাগজে লিখছেন গানের কলি আর একই সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সৃষ্টি করেছেন গানের সুর, গান গাইছেন আর হাসিমুখে তাকাচ্ছেন সঙ্গীদের দিকে—এই দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে নানা লেখকদের রচনায়। একেই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন দেবভাগ্য দৃশ্য। এই 'দেবভোগ্য দৃশ্য' দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। জন-নন্দিত কাজী নজরুল ইসলাম যখন কবিতায় গানে সারা বাংলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা দুলে দুলে পড়ছি 'অ-আ', 'ক-খ'। কবিকে দেখি নি—এই অনুশোচনা কখনো আমাকে দংশন করবে না। কারণ, তাঁকে আমি দেখেছি, একবারই দেখেছি শুধু। কাজী নজরুল ইসলামকে দেখেছিলাম ১৯৭২ সালে কলকাতায়, একটি ছোট ঘরে। অসুস্থ কবির মুখোমুখি হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিলো, তাঁকে না দেখাই ভালো ছিলো। এক পরাক্রান্ত কিংবদন্তীর যে নায়কের কথা আমি শুনেছি তার সঙ্গে এই মানুষটির মিল কোথায়? কোথায় সেই মন মাতানো-গজল আর প্রাণ মাতানো আড্ডা? যাঁকে দেখছি তিনি এক দারুণ গোধূলিতে বন্দী, শুকিয়ে যাওয়া ফোয়ারার মতো নির্বাক। তবে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ—সেই প্রসিদ্ধ নজরুল চোখ, হীরের মতো জ্বলজ্বলে। অসুস্থতা হরণ করতে পারে নি সেই চোখের দীপ্তি। সেদিন তাঁর সামনে কিছু ফুল রেখে নিঃশব্দে চলে আসার মুহূর্তেই আমি মনস্থির করেছিলাম যে, যদি বেঁচে থাকি তবে কোনোদিনই কাজী নজরুল ইসলামকে দেখতে যাব না। যাইও নি আর। কবিকে ঢাকায় আনানোর পরও যাই নি—না তাঁর বাসভবনে, না পিজি হাসপাতালে। কাল পিজি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, কিন্তু কবিকে দেখি নি, দেখার জন্য প্রবল চেষ্টাও করি নি। ইচ্ছে করেই উদ্যমরহিত ছিলাম সারাক্ষণ। পিজি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বার বার শুধু হীরের মতো জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখের কথা মনে পড়েছে আমার। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সেই চক্ষুদ্বয় জেগে থাকবে আমার স্মৃতিতে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ফিরে এসে যখন লেখার জন্য নিউজপ্রিন্টের প্যাড টেনে নিলাম তখন একটি প্রশ্ন বার বার মাথা তুলতে শুরু করলো—কেন শেষ বিকেলে এই বিপুল জনসমাগম হলো রমনায়? যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই কি নজরুলের কবিতার

অনুরাগী? জানি না। তবে একথা ঠিক, যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই নজরুলভক্ত। নইলে কেন তাঁরা এভাবে ছুটে আসবেন চারদিক থেকে? কেন তাঁরা রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা? কাজী নজরুল ইসলামের আসন পাতা তাঁদের সবার হৃদয়ে। তিনি প্রকৃত বিপ্লবী কবি কি না, এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা হতে পারে, কিন্তু তিনি যে জনসাধারণের কবি তা তর্কাতীত। জনসাধারণ তাঁকে তাদের নিজেদের কবি বলে মনে করেছেন সব সময়। তাই বাংলার নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ একদা এই বাবরি-ঝাঁকানো,হৃদয়-মাতানো কবি-পুরুষটির পায়ে পায়ে ঘুরেছে, তাঁর প্রতি নিবেদন করেছে হৃদয়ের ভালোবাসা। তাদের দুঃখ মোচনের তাগিদে তিনি কবিতাকে ব্যবহার করেছেন ঝলসে-ওঠা অস্ত্রের মতো। সেই অস্ত্রের ঝনঝনায় কেঁপে উঠেছে কারার লৌহ কপাট, সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বরাভয়। কাজী নজরুল ইসলাম এখন ঘুমিয়ে আছেন রণক্লান্ত বিদ্রোহীর মতো। তিনি এখন ব্যাপ্ত হয়ে আছেন আকাশে আকাশে, সারা বাংলাদেশ জুড়ে আজ একটি দুঃখ জেগে উঠেছে বারংবার—এই মুখ কাজী নজরুল ইসলামের। আমরা সবাই আজ সেই মুখের সামনে নতজানু। সেই মুখ বার্ধক্যের আঁচড়ে দীন নয়, নয় অস্বাভাবিকতার দংশনে পীড়িত, সেই মুখ তারুণ্যের ভাস্বর, প্রতিভা দীপ্র, সৌন্দর্যে স্মিত, সে আমাদের চিরকালের নজরুল।

*৩০শে আগস্ট ১৯৭৬*

## এই শহরে বহু দিন

দীর্ঘকাল ঢাকা শহরে আছি। এই বাক্যটি লিখতে আমার মাত্র কয়েক সেকেন্ড লেগেছে, কিন্তু এর শরীরে আছে প্রচুর ধুলো, হাওয়া, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, ভেজা মাটির গন্ধ, ঘাসের স্পর্শ, ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, বিস্কুটের টক-টক ঘ্রাণ। এই বাক্যে রয়েছে পাখির গান, বাড়ি ফেরার টান, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানোর নেশা, গলির অন্ধকার-নেশা, হৈহল্লা। অনেক দিন অনেক কিছু নিয়ে আমার ঢাকায় থাকা। কখনো ছ্যাকড়া গাড়ির চাকায়, কখনো বা রিকশার ঘন্টির রিনধিন আওয়াজে ঢাকা ঝংকৃত হয়ে ওঠে আমার চেতনায়। আমার মনের ভেতরে সময় সময় এই শহর এক অর্কেস্ট্রা হয়ে যায়।

এই শহরের সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া করছি চার দশক ধরে। অথচ মনে হয়, এই তো সেদিন চোখ রেখেছিলাম তার চোখে। কী মোহময়ী চোখ তার। সেই চোখে চোখ পড়া মাত্রেই জেনেছিলাম আমার মুক্তি নেই, মুক্তি নেই তার মোহপাশ থেকে, মুক্তি আমি চাইও নি কখনো। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম প্রবলভাবে, আমার ভালোবাসার সেই তীব্রতায় আজো ভাটা পড়ে নি। এখন ঢাকা আর আগেকার ঢাকা নেই; তার বদল হয়েছে যথেষ্ট। এখন সে আর ক্ষীণাঙ্গী নয়, বেড়ে গেছে তার শরীরের সীমা। কিন্তু তার রূপ ক্ষয় হয় নি এতটুকু, বরং এক নতুন ধরনের সৌন্দর্যের অধিকারিণী সে। জানি না ওর এই পুরোনো প্রেমিকের এসব কথা সে কানে তুলবে কিনা। তুলুক আর না-ই তুলুক, আমি তার কানে কানে বলে যাবো অনেক কথা গহন দুপুরে, আর নিশীথ অন্ধকারে, কখনো কখনো গোধূলি রঙিন মুহূর্তে। ওর কানে কানে কথা বলতে না পারলে আমার স্বস্তি নেই, শান্তি

নেই। কতকাল আমি কথা বলছি ওর সঙ্গে, রাশি রাশি কথা নিবেদন করছি ওর প্রতি, কিন্তু আমার ক্লান্তি নেই এতটুকু। কখনো কখনো মনে হয় সে যেন বলে—তুমি বলো আর আমি শুনি।

ঢাকা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এই যে আমি আজ আমার নিজস্ব ধরনে গড়ে উঠেছি—এর পেছনে ঢাকার অবদান অনেকখানি। সে আমার সামনে তুলে ধরেছে উপহারের আশ্চর্য এক ডালা— আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেছি। সে আমাকে প্রেমিকে রূপান্তরিত করেছে। করেছে কবি। ঢাকার কাছে আমি চিরঋণী। এই ঋণ কখনো শোধ হওয়ার নয়, চিরদিন বয়ে বেড়াতে হবে এই ঋণের বোঝা।

ঢাকার প্রতি কখনো কখনো মন কেমন বিরূপ হয়ে ওঠে। বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায় আমাদের মধ্যে অত্যন্ত নিঃস্পৃহভাবে হাঁটি ফুটপাতে, যেন আমি ওকে চিনি না। এ-ই কি সে-ই যার চোখে চোখ পড়লে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যেতো আগে? না, এ আমার একেবারেই অচেনা। আমি ওর দৃষ্টি এড়িয়ে চলি। ওর রূপ একটি ব্যর্থ কবিতার মতো মনে হয় তখন।

কিছু দিন এভাবেই চলে বেসুরো গানের মতো অবিকল। মন শুধু হোঁচট খেতে থাকে বেতাল ধকলে নিজেকে ভীষণ নিষ্প্রাণ আর ক্লান্ত লাগে তখন। তখন আনন্দ আমাকে ত্যাগ করে যায়, আমি দম-দেয়া পুতুলের মতোই চলাফেরা করি। 'হয়তো আমি এ শহরের বাসিন্দা নই, আমি নেহাতই একজন আগন্তুক'—একথা বারবার মনে হয় তখন।

যখন ঢাকার সঙ্গে মানসিক সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম তখনই যেন ঢাকা এক নিপুণা লাস্যময়ীর মতো আমার দিকে দৃষ্টি হানে। আর সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে একধরনের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, পুনর্মিলন হয় আমাদের। তখন পুনরায় আমি ঢাকাময়। ঢাকার কত পথরেখা লিরিকের মতো জেগে ওঠে স্মৃতিতে, কত দৃশ্য ঝলসে ওঠে দৃষ্টিপথে। ভাবি, যে-পথে আমি হেঁটেছি, বসেছি সে লতাগুল্মময় জায়গায়, সেখানে হয়তো এখন জ্যোৎস্না টলমল করছে। হয়তো সেই জায়গা এখন খুবই নির্জন। হয়তো সেই জায়গা এখন আমার কিছু স্মৃতি নিয়ে খেলা করছে শুধু। শুধু কি আমারই স্মৃতি? না, আরো অনেকের স্মৃতি নিয়েই সেই পথরেখা আর লতাগুল্মময় নিরিবিলি জায়গা এখন জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকারে ক্রীড়াময়। আমি ঢাকার গালে গাল রেখে, ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, হাতে হাত রেখে কাটিয়ে দিয়েছি কত প্রহর। এখনো সে আমাকে ফিরিয়ে দেয় না, ওর আলিঙ্গনে আমি ফিরে পাই আমার অতীত, স্পন্দিত হয় আমার বর্তমান, চোখ মেলতে শুরু করে আমার ভবিষ্যৎ।

যখন মনে হয়, ওকে ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন চিরদিনের জন্যে, তখন বিষাদ আমাকে ঘিরে ধরে। মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। জেগে ওঠে নানা স্মৃতি। স্মৃতি যত প্রখর হতে থাকে, মন ততই বিষণ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু কী এক যাদু বলে সেই বিষাদের ঘোর কেটে যায় এক সময়। তখন অন্য কিছু নয়, শুধু সে, ঢাকা, আনন্দের মতো জেগে থাকে আমার চেতনায়। ওর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। এই দৃষ্টি আমার বহুদিনের

চেনা। এই দৃষ্টি আমার সত্তায় সব সময় সজীবতা সঞ্চারিত করে, আমি নতুন হয়ে উঠি ফিনিক্স পাখির মতো।

*১১ই অক্টোবর ১৯৭৬*

## আমার ছোট ঘর

বাড়ির শেষ প্রান্তে আমার ঘর। ছোট, পুরোনো, অত্যন্ত সহিষ্ণু। অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে এর ওপর দিয়ে, তবু টিকে আছে। নোনাধরা দেয়াল, দেয়ালে কিছু হালকা গর্ত। মেঝে এবড়ো-থেবড়ো, ছাদ ফুটোময়। ফুটোগুলি ভরাট করার চেষ্টা হয় মাঝে মাঝে হয়ও। কিন্তু বর্ষাকালে পানি ঘরের ভেতর ঠিকই ঝরে ফাটল চুঁইয়ে চুঁইয়ে। বিরক্ত হই, ছাদের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো ভাবি কিছুক্ষণ, তারপর ভুলে যাই। বর্ষাকাল কোনো মতে কেটে গেলে আমার এই ছোট ঘর বিষয়ে অভিযোগ করার প্রায় কিছুই থাকে না। ভালোই লাগে ঘরটিকে, এতদিনে এর প্রতি কেমন মায়া জন্মে গেছে। সর্বক্ষণ ঘরে থাকি না, তবে যতক্ষণ থাকি, একে খুবই আপনাপন লাগে।

ঘরটি তেমন সাজানো-গোছানো নয়। আমার গৃহিণী তাঁর সাধ্যানুযায়ী একে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই যেন বাগ মানতে চায় না এই ছোট ঘর। আমার স্বভাবের প্রশ্রয়ে বারবার এলোমেলো হয়ে যায় সবকিছু—তখন ঘরটিকে ভারি অগোছালো মনে হয়। তা বলে আমি অখুশি নই আদৌ। বরং অতিশয় ফিটফাট হাসপাতালী পরিবেশে আমি স্বস্তি পাই না। তাছাড়া ছোট ঘরের প্রতি আমার পক্ষপাত রয়েছে অনেকদিন থেকে। আমি যে বাড়িতে থাকি, সে বাড়িতে একটা বড়ো ঘরও আছে। ইচ্ছে করলে আমি সেই বড়ো ঘরে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি ছোট ঘরটিকেই। বড়ো ঘরে থাকতে আমি অস্বস্তি বোধ করি; আমি যেন হারিয়ে যাই বড়ো ঘরের জঠরে। অথচ ছোট ঘরে এমন একটা নিবিড়তা আছে যা আমাকে টানে। ছোট ঘরে আমার সত্তার পরিচয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিজের কাছে, মুক্তি ঘটে আমার মনের। আমার পুরনো খাট, টি-পয়, ড্রেসিং টেবিল, আলনা আর কিছু বই নিয়ে ছোট ঘরে ভালোই কাটে আমার সময়। সব সময় হাতের কাছে থাকে মনের মতো কয়েকটি বই, ইচ্ছে হলেই তুলে নিতে পারি আলগোছে, ডুবে যেতে পারি বইয়ের পাতায়।

টি-পয়ের ওপর আছে হালকা ধূসর রঙের টেলিফোন। মাঝে-মাঝে বেজে ওঠে টেলিফোন—কখনো কখনো টেলিফোনের ধ্বনি শুনে কেমন অদ্ভুত মনে হয়,—মনে হয়, স্বপ্নের ভেতরে বেজে চলেছে টেলিফোন। টেলিফোনকে খেলনার মতো লাগে, তবে এই খেলনা মাঝে মাঝে ভয়ানক বিরক্তিকরও হয়ে উঠতে পারে। রং নম্বরের ঝামেলা তো আছে। কখনো-সখনো মধ্যরাতেও টেলিফোন বেজে ওঠে, ঘুমভাঙা কানে রিসিভার চেপে ধরে টের পাই যে রং নম্বর। একদিন মধ্যরাতে হঠাৎ বেজে উঠলো টেলিফোন। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে শুনি এক বয়সিনী মহির আর্তস্বর। তিনি 'সুজা' নামের কোনো একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। আমি সেই মহিলার কণ্ঠস্বর আর

কথা বলার ধরন থেকে আন্দাজ করতে পারলাম যে তিনি খুবই অসুস্থ। আমাকে 'সুজা' ঠাউরে নিয়ে তিনি একটি কি দুটি কথা বললেন। তার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা ছিল, ছিল সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা। আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। কোনো কথা বললাম না, এমনকি 'রং নম্বর' শব্দ দুটিও উচ্চারণ করলাম না। না, বিরক্ত হয়ে আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকি নি। মহিলাকে কিছু বলে আমি তার ব্যাকুলতায় টোল পড়তে দিই নি সেই মুহূর্তে। টেলিফোন রেখে আমি অনেকক্ষণ জেগেছিলাম, জেগে জেগে ভেবেছিলাম অনেক কিছু? মহিলার কি সাংঘাতিক কোনো অসুখ হয়েছে? তিনি কি বাঁচবেন না? হাসপাতালের কথা কি বলেছিলেন তিনি? মনে পড়ছে না। আর সেই 'সুজা'ই বা কে? তার সঙ্গে মহিলার কী সম্পর্ক?

টেলিফোন বিষয়ে আরো বহু কিছু বলা যায়। আপাতত আমি আমার ছোট ঘরের কথা বলতে চাই। এই বাক্যটি লিখে ভাবছি, এই ঘর সম্পর্কে যত কথাই লিখতে চাই না কেন, সব কথা কি লেখা যাবে শেষ পর্যন্ত? বলা মুশকিল। আমার ঘরের দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র, বই ইত্যাদির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আরো কিছু খুঁটিনাটি বলা যেতে পারে নিশ্চয়ই। আমি বর্ণনা-নিপুণ কোনো লেখক নই সত্য, তবে কিছু শ্রম স্বীকার করলে আমার ঘরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনাদের সামনে একটু-আধটু তুলে ধরতে পারবো বৈকি! আমার মতে, দরজা, চৌকাঠ, জানালা, কড়িকাঠ, আসবাব ইত্যাদির বর্ণনা দিলেই ঘরের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে না। প্রত্যেক ঘরেই একটা আত্মা আছে বলে আমি মনে করি। অনেকের কাছে 'ঘরের আত্মা' কথাটি হেয়ালি মনে হতে পারে। আমার কাছে এটা আদৌ হেয়ালি কিছু নয়। অবশ্যই আমার এই ছোট ঘরের আত্মা আছে। নইলে সে উষ্মা প্রকাশ করে কেন, কেন থমথমে হয়ে যায় তার মুখ? যেদিন আমি বেশি রাত করে ঘরে ফিরি, সেদিন আমার ছোট ঘর অভিমানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। আমাকে স্বাগত জানায় না, ওর দিকে বার বার তাকালেও শোনে না কথা বলতে চায় না। ওর মান ভাঙতে ভাঙতে কখন ঘুমে অচেতন হয়ে যাই, খেয়াল থাকে না। আবার যেদিন বেলা না ফুরোতেই ঘরে ফিরে আসি, খুশিতে ঝলমলে করতে থাকে সে। বাহু বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে মিলনোন্মুখ প্রেমিকার মতো। 'এসো আমার পাশে বসবে এসো'—একথা গানের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ঘরের কণ্ঠে। এমন মুহূর্তে আমার ছোট ঘর চায় যে তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে শুধু সে আর আমি থাকি। আর কেউ নয়। আমাকে একলা পেতে চায় সে, আমার ঘরে। আমিও তাকে পেতে চাই নিটোল নির্জনতায়। কিন্তু সবাই একথা বোঝে না। আমাদের নির্জনতা ক্ষুণ্ণ হয় বার বার।

আমি মনে মনে জানি, আমার আনন্দে আনন্দিত হয় আমার ঘর, আমার দুঃখে দুঃখ পায় সে। এবং জানি, আমি যেখানে, যত দূরেই যাই না কেন, সে আমার জন্যে সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে। এজন্যই আমি বার বার ফিরে আসি তার কাছে। ওর হৃদয়ের কাছে বসে শান্তি পাই, খুশি হই ওর সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করে।

*২৯শে অক্টোবর, ১৯৭৬*

# কবিতা এক ধরনের আশ্রয়



# প্রেম এবং কবিতা

শীত-সকাল! এখনো কুয়াশা ফুঁড়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে নি রাস্তায়, আমার ঘরে। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙেছে। আমার নিজের শরীরের তাপে ঈষদুষ্ণ, আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। একটা ভালো-লাগা অনুভূতি ছড়িয়ে আছে মনে । কী এক বর্ণালি আমাকে আধো ঘুম আধো জাগরণের সীমান্তে মুগ্ধ করে রেখেছে। আমি জেগেই আছি। আমার মধ্যে যে ভালোবাসা তার অপরূপ রূপ নিয়ে বিরাজ করছে, তাকে আমি বাণীবন্ধ করবো কীভাবে? 'আমি ভালোবাসি', এই দুটি শব্দ মনে রেখে উচ্চারণ করে যে আনন্দ লাভ করছি শীত-সকালের এই মুহূর্তে, তার তুলনা নেই। হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি। বালিশে ঠোঁট চেপে 'আমি ভালোবাসি' শব্দদ্বয় বারবার আবৃত্তি করতে খুব ভালো লাগছে আমার।

জেনেছি কাকে চাই, কে এলে চোখে ফোটে
নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা।

কাকে চাই, জানি। এ-ও জানি, এ মুহূর্তে সে আসবে না এখানে। ইচ্ছে করলেও আসতে পারে না। সে এসে বসবে না আমার পাশে, মাথায় বুলিয়ে দেবে না ওর কোমল হাত। ওর চুলের কালো স্রোত নামবে না আমার মুখের ওপর। ওর ঠোঁটের উষ্ণতা এই মুহূর্তে আমি পাবো না। না-ই-বা পেলাম, না-ই-বা এলো সে। আমি ওকে ভালোবাসি, সে-ও আমাকে ভালোবাসে—এই সত্য এখন আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন। হতভাগ্য সেই মানুষ, যার ভালোবাসার ক্ষমতা নেই, যে ভালোবাসা পায়নি কখনো। নেমকহারামি করবো না। প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি এ জীবনে, বারবার প্রেমে পড়েছি আমি। আমার এই বারবার প্রেমে পড়া নিয়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা-তামাশা করেন, তবে আমাকে কুনজরে দেখেন না। বরং আমাকে খুবই পছন্দ করেন তিনি, যখন তাঁর কাছে যাই, তিনি সাময়িকভাবে নিজের দারুণ অসুস্থতার কথা ভুলে সজীব এবং সহৃদয় হয়ে ওঠেন। এখন আমি যাকে ভালোবাসি, যার কথা প্রায় প্রতি মুহূর্তে ভাবি, সে আমাকে চিরপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক আখ্যা দিয়েছে। না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে নয়। যতোদূর জেনেছি তাকে, তাতে মনে হয় না যে সে আমাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করতে তেমন আগ্রহী। আমার অনেক কবিতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। আমার কবিতাবলির মধ্যে আমার প্রেমিক জীবনের যে ইতিহাস বিধৃত রয়েছে তা, ওর মতে, একজন বালকও বুঝতে পারবে যে আমি বহুবল্লভ। তবে আমার এই প্রেমিকার মন পরিণত বলেই এ নিয়ে সে আমাকে খুঁটিয়ে ক্লান্ত করে না। এ জন্য আমি ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন হলো, কেউ কি এতোবার, এতোজনকে ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসতে পারে প্রায় বুড়ো বয়সে? অন্যের কথা বলতে পারবো না, তবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে

বলতে পারি, একজন মানুষের পক্ষে বারংবার প্রেমে পড়া সম্ভব, সম্ভব বহু নারীকে ভালোবাসা। কোনো প্রেমই মিথ্যে নয়, কোনো প্রেমেই ফাঁকি নেই। কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়েছে কি না বলতে পারবো না। তবে আমার দিকে থেকে কোনোরকম ফাঁকি ছিল না। 'ফুলের বনে যারে দেখি, তারেই লাগে ভালো' এই শব্দগুচ্ছ যে উচ্চারণ করে তাকে কি কেউ অপরাধী বলে শনাক্ত করবে? আর কাজী নজরুল ইসলামই তো বলেছেন—'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় সে কি মোর অপরাধ?'

প্রেমে আমি একনিষ্ঠ হতে পারি নি সত্য, কিন্তু আমার প্রেমে, এ কথা আমি জোর দিয়ে বলবো, কোনোদিন খাদ ছিল না, আজো নেই। আমি কখনো আমার কোনো প্রেমিকার অসম্মান করি নি। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 'এই বয়সে লোকটা এতো ভালোবাসতে পারে কী করে? কী করে প্রায় নিজের কন্যার সমান বয়সী তরুণীর প্রেমে পড়তে পারে?' বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ডবিউ.বি.ইয়েটস মড গন এবং তার কন্যা উভয়ের প্রেমেই পড়েছেন। ইয়েটসের বুড়ো হাড়েও জ্বলেছে প্রেমের বর্ণিল দেয়ালি। বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথ কারো প্রেমে পড়েছিলেন কি না জানি না, জানার উপায়ও নেই; তবে তিনি বেশি বয়সে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা এবং ভালোবাসার গান লিখেছেন।

কেউ প্রেমে না পড়ে কি কখনো প্রেমের কবিতা লিখতে পারে? প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একজন কবি ভালো প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন; কিন্তু যার মধ্যে প্রেমানুভূতি নেই, তিনি কী করে প্রেমের কবিতা লিখবেন? প্রেম যার মনের কপাটে এসে কখনো কড়া নাড়ে নি তার পক্ষে আর যা-ই হোক প্রেমের কবিতা লেখা সম্ভব হবে না। তিনি যদি লেখেনও তবে সেটি হবে খুবই কৃত্রিম, বানানো রচনা। যিনি প্রেমে পড়েছেন তিনিই লিখতে পারেন হীরকখণ্ডতুল্য এই পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু,
তবে হিয়ে জুড়ন না গেল।

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অনেক সময় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথার আবরণে নিজেদের মনের কথাই উচ্চারণ করেছেন এবং সেসব উচ্চারিত বাণী যুগ যুগ ধরে অম্লান হয়ে রয়েছে মানুষের স্মৃতিতে। আমি যাকে ভালোবাসি সে হয়তো অনেকের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়; তার ব্যক্তিস্বরূপ অনেকের কাছেই অজ্ঞাত, হয়তো তার কোনো দাম নেই অনেকের কাছেই; কিন্তু সে আমার হৃদয়ে তার ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদ্ভাসিত। সে আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, সে অতুলনীয়। তাই রবীন্দ্রনাথের সেই অনুপম, অসাধারণ কবিতা ধার করে বলতে সাধ হয়—

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

বহুবার প্রেমে পড়েছি, প্রেম আমার জীবনকে বর্ণিল, বৈচিত্রময়, ঐশ্বর্যবান করেছে; কিন্তু আজো আমি প্রেমের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি নি। চেষ্টাশীল হয়েও কোনো সুদত্তর পাই নি। শুধু বিস্মিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি, পুলকিত হয়েছি, বেদনার্ত হয়েছি। ভালোবাসার ঘায়ে কেঁদেছি, নিবিড় বেদনাতে গায়ে লেগেছে পুলক। যদি কেউ আমার কাছে প্রেমের সংজ্ঞা দাবি করে আমি শুধু বৈষ্ণব পদকর্তার সেই নায়িকার মতো বলতে পারি—

সখী, কী পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

হ্যাঁ, এছাড়া আর বিশেষ কিছু বলার থাকে না। এই তিনটি পঙ্‌ক্তি মৃদু স্বরে আবৃত্তি করে নীরবতার আশ্রয়ে চলে যেতে হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই প্রেমের কবিতার সংখ্যা অন্য ধরনের কবিতার তুলনায় অনেক বেশি। কোনো যুগেই কবিরা প্রেমের কবিতা লিখতে ক্লান্তি বোধ করেন না। কট্টর, বেরসিক সমালোচক অথবা পাঠক বিরক্ত হতে পারেন, ধমক দিতে পারেন কবিকে। কিন্তু প্রেমিক কবি ধমক এবং গালমন্দের পরোয়া না করে প্রেমের পদাবলী রচনা করে যাবেন। এতে অরসিক বিরক্ত, এমনকি ক্ষিপ্ত হতে পারেন; কিন্তু তুষ্ট হবেন প্রেমের অতনু দেবতা। আর এই সঙ্গে সমৃদ্ধ হবে কাব্যভাণ্ডার।

ধরুন, একজন বর্ষীয়ান কবি একজন তরুণীর প্রেমে পড়েছে। সেই একান্ত অনুরাগ অনেকের জিভের স্বাদু খোরাকে পরিণত হয়। তা নিয়ে ঠাট্টা, খোঁচা, টিটকারির অন্ত থাকে না। তারা বিব্রত করে সেই বর্ষীয়ান কবি এবং তরুণীকে। তখন অসহায় কবি কী করবেন? প্রেমের গোলাপ বাগান থেকে দূরে সরে দাঁড়াবেন? ভুলে যাবেন দয়িতাকে? না, তিনি বরং কবি জন ডানের ভাষায় বলবেন, 'For God's sake hold your tounge and let me love'—যার তর্জমা রবীন্দ্রনাথ করেছেন এভাবে—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।

যে প্রিয়তমার কথা আমি লিখলাম, যে আমার হৃদস্পন্দন, যে আমার স্বপ্ন, অন্নজল, অস্তিত্বের গান, সে একদিন আমাকে ভালো না-ও বাসতে পারে আর। যদি বেঁচে থাকি তাহলে সেই প্রেমহীন মুহূর্তে বেদনার্ত হবো সত্য; কিন্তু সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়ে বলবো, সে সুন্দর থাকুক, যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক।

রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা কবিতার নায়কের মতো হঠাৎই মনে হচ্ছে কী জানি এসব বানিয়ে বললুম না কি?

## কবিতা এক ধরনের আশ্রয়

কিছুদিন ধরে কবিতার বই আর তেমন বিক্রি হচ্ছে না। হঠাৎ করেই যেন কবিতার বইয়ের বাজার খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। অথচ এক সময়ে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরে, কাব্যগ্রন্থের বিক্রিতে জোয়ার এসেছিল। সেই সময়ে প্রচুর কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছ, বিক্রিও হয়েছে অনেক। এখন সেই জোয়ারে ভাটা লেগেছে। দু' তিনজন কবির কিছু বই বিক্রি হয় বটে, তবে তা জাঁক করে বলার মতো কিছু নয়। সামান্য কিছু বই বিক্রি হয়। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী একজন প্রকাশক আমাকে এই খবর দিয়েছেন। তিনি খামোকা মিথ্যা কথা বলবেন, আমি বিশ্বাস করি না। প্রকাশকগণ ইদানীং কবিদের এড়িয়ে চলেন, তাঁদের কাছে নাকি পাণ্ডুলিপি প্রার্থনা করেন না আর। এই উক্তি আমার পরিচিত এক কবির।

এই পরিস্থিতি কবিদের পক্ষে স্বস্তিকর তো নয়ই, কবিতার জন্যও কল্যাণকর নয়। আমি মনে করি না, একটি দেশের সব লোক কবিতার পাঠক হয়ে যাবে। বিশেষত আমাদের দেশে, যেখানে শিক্ষিতের হার, শোচনীয়ভাবে কম, কবিতার লক্ষ লক্ষ পাঠক হওয়া সম্ভব নয়। পাঠকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হবে, এটাতো আশা করে চলে। প্রশ্ন হলো, কবিতার বাজারে কৃষ্ণপক্ষ নেমে এলো কেন? ক্রেতাসাধারণ কাব্যগ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছেন কেন? পাঠকদের রুচিকে কটাক্ষ করে লাভ নেই। কিছুকাল আগেও বিভিন্ন কবির বইয়ের বেশ চাহিদা ছিল। সেসব পাঠক কোথায় গেলেন? তাদের আর্থিক অবস্থা কি এতোটা খারাপ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে যে কবিতার বই কেনার সঙ্গতি তাদের নেই আর? তরুণরাই সাধারণত কবিতার বই কেনে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় যারা তরুণ ছিল তারা তারুণ্য হারিয়েছে, অনেকেই জড়িয়ে পড়েছে সংসারযাত্রায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে হয়তো তাদের পাঠস্পৃহা অনেকখানি কমে গেছে। এটা স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয়, আজকের তরুণ-তরুণী কবিতার বই কেনা কমিয়ে দিলেন কেন?

এই সমস্যার গভীরে যাওয়া দরকার, কবিতার প্রতি পাঠকদের অনীহার কারণসমূহ চিহ্নিত করা একান্ত জরুরি। সমস্যাটির প্রতি উদাসীন, নিঃসাড় থাকা অনুচিত। আজকাল অধিকাংশ কবিতার বই সুমুদ্রিত, সুশোভন, খুবই আকর্ষণীয়। সুশোভন দুই মলাটের ভেতরে যে পাঠ্যবস্তু থাকে তা সম্ভবত পাঠককে টানে না। হয়তো সেসব বই কিনে পাঠকেরা নিজেদের প্রতারিত মনে করেন। কবিতার নিষ্ফলসন্ধানে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

লক্ষ্য করেছি, একুশের বইমেলায় বই প্রকাশ করার জন্য লেখক এবং প্রকাশকগণ বেচয়েন হয়ে ওঠেন। কার আগে কে বই প্রকাশ করবেন, এ নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। বড় তাড়াহুড়ো করে বই ছাপা হয়। বইমেলায় বই বেশি বিক্রি হয় বলেই এই তাড়াহুড়ো। কবিদের অনেকেই বইয়ের ফর্মা মেলানোর তাগিদে কোনো বাছবিচার না

করে কবিতা জুড়ে দেন, একটা কিছু লিখে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করেন। সেসব লেখায় অযত্নের ছাপ এতোই স্পষ্ট যে তা অমনোযোগী পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না। অনেক কবিযশপ্রার্থী নিজের খরচায় সুদৃশ্য বই ছেপে বইমেলায় নিজেদের উপস্থিত জাহির করেন। তারা যা প্রকাশ করলেন তা আসলেই কবিতাপদবাচ্য কি না ভেবে দেখলেন না। এই ধরনের বই কিনে পাঠক ঠকেন। ফলে কবিতার উৎসাহী পাঠক দমে যান, অনেকে সমকালীন কবিতার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেন সুস্পষ্ট ভাষায়।

আজকাল বাজারে আবৃত্তিকারদের ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। কবিতা আবৃত্তির ক্যাসেট ভালো বিক্রি হয় বলে শুনি। আবৃত্তিকারদের উদ্যোগ ও উদ্যমে কবিতা অধিকতর শ্রোতাপ্রিয় হয়ে উঠছে, এরকম দাবি করা হয়। এই দাবির যথার্থ অস্বীকার করার খায়েশ আমার নেই। ক্রেতাদের ক্যাসেটপ্রিয়তার ফলে কবিতার বই বিক্রি কমে যাচ্ছে কি না, এটা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে।

আমরা যারা কবিতা লিখি তারা চাই বেশি লোক কবিতা পড়ুক। কবিতার বই বেশি বিক্রি হোক। 'কেউ কবিতা বোঝে না' বলে কবিদের অভিমান করে বসে থাকলে চলবে না। পাঠকগোষ্ঠী যাতে আবার কবিতার দিকে ফিরে আসে, সেজন্য কবিদেরই উদ্যোগী হতে হবে। কবি বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে কাব্যবোধ সঞ্চারিত করতে পারলে আস্তে-আস্তে দুর্দিন কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

সবচেয়ে জরুরি কথা হলো, কবিদের উৎকৃষ্ট কবিতা লেখায় মনে দেওয়া দরকার। হেলাফেলা করে আর যা-ই হোক, ভালো কবিতা লেখা যায় না।

প্রত্যেক শিল্পের সঙ্গে সাধনার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সাধনা শব্দে কেউ কেউ বিরক্ত বোধ করতে পারেন। তারা বলবেন শব্দটি পুরানো। কিন্তু পুরানো বলেই বাতিল নয়। প্রাচীনকালের সাধু সন্ত, ঋষি আর দরবেশগণ বিভিন্ন ধারায়, তরিকায় সাধনা করতেন। তরিকায় যতো পার্থক্যই থাক তাদের মধ্যে একটি মিল রয়েছে। এই মিল শ্রম ও নিষ্ঠায়। শ্রম ও নিষ্ঠা ছাড়া সাধনা অচল। এই দুটি জিনিস প্রত্যেক কবির মধ্যে থাকতে হবে, নচেৎ সিদ্ধি সুদূরপরাহত। সৃজনশীলতার আভা যাকে স্পর্শ করে না, তার কবিসত্তা ঘুমন্ত থাকে। সৃজনশীলতার আভা যাতে বারবার কবিকে ছুঁয়ে যেতে পারে, সেজন্যই সাধনা এতো জরুরি। কোনো কোনো কবি অল্প বয়সে প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যর্থতার অন্ধকারে হারিয়ে যান। ব্যর্থতার নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো তিনি কবিতার চেয়ে অন্যান্য বিষয়ের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। কবিতা ঈর্ষাকাতর প্রণয়িনীর মতো। সে ক্ষণকালের অমনোযোগ কিংবা উপেক্ষা সহ্য করে না। তাকে ঘরে ধরে রাখতে হলে তার মন যুগিয়ে চলতে হবে সর্বক্ষণ, নইলে সে ত্যাগ করে যাবে কবিকে। তখন শূন্যতার হাহাকার হবে চিরসঙ্গী।

আমার মনে হয়, কবিতা এক ধরনের আশ্রয়। কবি এবং পাঠক উভয়ের জন্যই। আশ্রয়স্থল মনের মতো না হলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। যেখানে স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, সৌন্দর্যের স্পর্শ নেই, সেখানে কেউ বিশ্রামের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে না। ভালো কবিতা একটি উৎকৃষ্ট আশ্রয়। ভালো কবিতা কাকে বলবো?

এই সওয়ালের জবাব দেয়া সহজ নয়। যে কবিতা জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়, সত্য এবং মহত্ত্বের সন্ধান দেয়, নান্দনিক তৃষ্ণা মেটায়, মোটামুটি তাকেই ভালো কবিতা বলতে পারি আমরা। আমি জানি, আমার এই উক্তি অনেকের কাছেই অগ্রাহ্য ঠেকবে। আসলে এই বিষয়ে সবাইকে খুশি করার মতো বক্তব্য কেউ পেশ করতে পারবে না। আজ অবধি পারে নি কেউ।

কবিতা নানা ধরনের। মূলত আত্মপ্রকাশের তাগিদে কবি কবিতা লেখেন। তার কিছু বলার কথা আছে, সেগুলো তিনি নিজেকে শোনান, অন্যদের শোনাতে চান। বিভিন্ন কবির বলার কথা বিভিন্ন, বলার ভঙ্গি নানা ধরনের। একটি শর্ত প্রত্যেক প্রকৃত কবিকেই মেনে চলতে হয়। অর্থাৎ তার পঙ্ক্তিমালাকে কবিতা হয়ে উঠতে হবে, রসোত্তীর্ণ হতে হবে। কবিতায় এমন কিছু থাকতে হবে, যার জন্য পাঠক বারে বারে ফিরে যাবে সেই কবিতার কাছে। যে কবিতার আকর্ষণ একবার পড়লেই নিঃশেষিত হয়, সেই রচনা ক্ষীণায়ু হতে বাধ্য। ক্ষীণায়ু কবিতা কোন্ কবি লিখতে চান? দু'দিন বাজার গরম করেই যারা তৃপ্ত তাদের কথা আলাদা।

## আমার বনলতা সেন

আজ এই মুহূর্তে আমার মনে অনেক আগেকার রৌদ্রছায়া খেলা করছে। সেই রৌদ্রছায়ায়, জ্যোৎস্নায় আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে আমার চক্ষু মিলনের লগ্ন পরিস্ফুট। কৈশোর পেরিয়ে সদ্য যৌবনের জ্বলজ্বলে প্রান্তরে পা রেখেছি। একদিন হেঁটে হেঁটে পটুয়াটুলীর শেষ প্রান্তে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট বইয়ের দোকানে পৌঁছে যাই। সেই দোকান, বলা যেতে পারে, আমাকে আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেয়। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স থেকে একই দিনে পকেট উজাড় করে মোহিতলাল মজুমদারের *বিস্মরণী*, কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নিবীণা*, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *প্রথমা* এবং বুদ্ধদেব বসুর *বন্দীর বন্দনা* কাব্যগ্রন্থ চতুষ্টয়ের অধিকারী হয়ে যাই। তখনও জীবনানন্দের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি অজ্ঞ। তাঁর নাম এবং কবিতার হদিস পেতে অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। অনেক বছর আগে, এক ধূসর বিকেলে বন্ধু জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর হাতে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* নামে একটি বই দেখতে পাই। বইটির মলাটে লেখকের নাম মুদ্রিত—জীবনানন্দ দাশ। অপরিচিত নাম। কিন্তু বইয়ের নাম আমাকে ওর পাতাগুলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে প্রলুব্ধ করে। আমি এক রাতের জন্য *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নিই।

*ধূসর পাণ্ডুলিপি* আমাকে এক আলাদা, নিভৃত জগতে নিয়ে গেল। সে জগতের আবছা একটা রূপ আমার মনের অবচেতন স্তরেও ছিল, এমন উপলব্ধি হলে; কিন্তু আমি প্রকাশে অক্ষম। যখন প্রথম পড়ি—

ঐ দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,<br>
স্কাইলাইট মাথার উপর,<br>
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।<br>
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে?<br>
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।—

কিংবা 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে/অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে।'—অথবা 'স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন এক বোধ কাজ করে/মাথার ভিতর।/'সকল লোকের মাঝে ব'সে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?'—

তখন কেমন এক বোধ কাজ করেছিল রক্তের ভেতর, মগজের কোষে কোষে। এক ধরনের ঘুমে-পাওয়া আচ্ছন্নতা, যা আলাদা রকমে জাগিয়ে রাখে নিভৃত শিখার মতো।

সত্যি বলতে কী, সে রাতে জীবনানন্দ দাশের কবিতা প্রায় পাগলের মতো পড়ার পর যে অপরূপ মুগ্ধতাবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল আমার চেতনায় তাতে একদিনের জন্যও

ভাটা তো পড়েই নি, বরং আরো গভীর হয়েছে। আমার নিজের কবিসত্তার বিকাশের তাগিদে কখনও কখনও স্বেচ্ছায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার থেকে কিয়দ্দূরে থেকেছি কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা দেখাই নি কস্মিনকালেও। তাঁর মতো লিখবো না; কিন্তু তার কবিতাবলি পড়বো বারবার, যতোদিন বেঁচে আছি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা চিরকাল পড়ার মতো, ঘুরেফিরে পড়ে পড়ে নিজের মধ্যে ধারণ করার মতো সম্পদ। তাঁর বহু কবিতা আমার প্রিয়। একটির কথা উল্লেখ করলে বাকিগুলোর প্রতি অবিচার করা হবে। তবু শেষ পর্যন্ত যদি জীবনানন্দের একটি কবিতাকেই প্রিয় বলে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি 'বনলতা সেন'কেই পছন্দ করবো। এই কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত যে ব্যঞ্জনা রয়েছে তার আবেদন কখনও ফিকে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—উচ্চারণ করেই কবি পাঠকদের স্থাপন করেন সময়হীনতায়। কবিতায় যে ক্লান্তপ্রাণ পথিকের কথা বলা হয়েছে সে কোনো বিশেষ কালের নয়, সে সর্বকালের। এই পথিকটি বিম্বিসার, অশোকের ধূসর জগতে এবং আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে পথ হেঁটেছে। কিন্তু তাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। নাটোর এবং বনলতা সেনের উল্লেখ করে পর্যটক আমাদের নিয়ে আসে প্রাচীন কাল থেকে,হাল আমলে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর উষাকালে। পথচারী পরিশ্রান্ত, অশান্ত। তার অশান্তির দহনে নাটোরের একটি নারী, অনামা কেউ নয়, শান্তির দু'ফোটা শিশির ঝরিয়ে দিলো। নাটোরের নারী এই বনলতা সেন, যে আমাদের কাছেই অবাস্তব কেউ নয়। কিন্তু তার রূপ বর্ণনার জন্য কবি চলে গেলেন প্রাচীন কালে—

> চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য;

সেকাল এবং একালের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করে নাটোর এবং বনলতা সেন। এখানে কবি শুধু রূপ সৃষ্টিই করেন নি, তাঁর গভীর ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন, যা জীবনানন্দের কবিতার একটি কুললক্ষণ। যেদিন আমি প্রথম কবিতাটি পড়ি সেদিন আমি এমন মুগ্ধ, এমন বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। অনেকগুলো পঙ্‌ক্তিতেই এক ধরনের সম্মোহনী শক্তি আছে। কী করে ভুলবো সেই আশ্চর্য অভিঘাত, যখন পড়ে উঠলাম—

> বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখির নীড়েব মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

বনলতা সেনের চোখ দেখতে পাখির বাসার মতো বলতে কেউ কেউ নীড়ের আকার বুঝেছে। কিন্তু এটা হাস্যকর মনে হয়েছিল আমার কাছে সেকালেই। আমি বনলতা সেনের চোখ দুটোকে পাখির নীড়ের মতো স্নিগ্ধ আশ্রয় হিসেবেই ভেবেছিলাম। আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে আমি নিঃসঙ্গ নই, আমার সঙ্গীর অভাব হবে না।

একই কবিতায় 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' প্রথমবারের মতো জানলাম। চিলের ডানায় যে রৌদ্রের গন্ধ থাকে, সে কথাও জীবনানন্দ আমাদের জানিয়ে দিলেন অনায়াসে।

পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল,

নির্দ্বিধায় কবুল করছি, এই দুটি পঙ্‌ক্তির রহস্য আমার কাছে সেদিন অব্দি উন্মোচিত হয় নি। নানা ধরনের ভাবনা মাথায় ভিড় করেছে—সব পাখি, সব নদী কতোবার আসা-যাওয়া করেছে আমার চেতনায়, হয়তো সব চেতনাতেও, তবু পঙ্‌ক্তি যুগলের অর্থ ধরা পড়ে নি আমার কাছে, কবিতা হয়তো দুয়ে দুয়ে চারের মতো বোঝারও প্রয়োজন নেই। মনে বোঝে-না-বোঝার জ্যোৎস্নাছায়ার খেলা থাকলেই চলে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি লেখায় পড়েছি, এখানে মানে বনলতা সেন কবিতায় "ধূসর পাণ্ডুলিপির জোনাকি'র চাইতে সে বেশি কাজ করছে। এখানে সে যে গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে তুলবে তা হলে একটি অপার্থিব সময়-বৃত্তের নর-নারীর দৈহিক মিলনের বৃত্তান্ত, 'এ জীবনের সব লেনদেন' যাতে সমাপ্ত।" সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই মেধাবী ব্যাখ্যা রহস্যের নেকাব কিছুটা সরায় সম্ভবত, তবু রহস্য থেকে যায়।এবং সেজন্যই বনলতা সেন আমাদের এমন আকর্ষণ করে।

আমি ভালো করেই জানি *বনলতা* সেন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা। কেউ কেউ জনপ্রিয় কবিতাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। কেউ কেউ জীবনানন্দ দাশের এই কালজয়ী কবিতায় এডগার অ্যালেন পো'র *To Helen* কবিতার অনুকরণ সন্ধান করেছেন।অত্যন্ত ক্ষীণ ছায়া হয়তো আছে, কিন্তু সব দিক থেকে বনলতা সেন অনেক বেশি উঁচুদরের কবিতা। আরেকটি কথা ছিদ্রান্বেষীদের উদ্দেশে বলি, কোন কোনও গুণীজন বলেছেন, একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতার জন্ম হতে পারে। আর জনপ্রিয়তা অর্জন করলেই কোনও কবিতা নিকৃষ্ট হয়ে যায় না। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতাই জনপ্রিয়। একটি মহৎ কবিতাকে আমার প্রিয় কবিতারূপে নির্বাচিত করে আমি ধন্য।

১৬-৫-৯৯

# কী করে 'বন্দী শিবির থেকে' লিখেছি

উনিশ শ' একাত্তরের পঁচিশে মার্চের সারা দিন কেটেছিল এক ধরনের অস্থিরতার ভেতর। ছন্নছাড়া ঘুরেছি এদিক-ওদিক। অফিসে গেলাম, সেখানে মন বসলো না। প্রতিবেশী অফিস মর্নিং নিউজ-এর আবহাওয়া কেমন যেন মনে হলো। অফিসটির ভেতরে যেন কোনো ষড়যন্ত্র ঘাপটি মেরে রয়েছে। সেই পত্রিকায় বাঙালিদের পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিকর একটি চিঠি ছাপা হয় সেদিন। কেন এ ধরনের চিঠি ছাপা হলো তা জিগ্যেস করার জন্যই সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু সহ-সম্পাদক রহমত আলী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। রহমত আলী বললেন, 'অবাঙালি কেউ অফিসে আসেন নি।' মনে মনে অনুভব করলাম, কোথায় যেন গোলমাল রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে স্টেডিয়ামের একটি বইয়ের দোকানে গেলাম ক্লান্ত শরীরে। এতো ক্লান্ত ছিলাম যে রাতে বাসায় ফিরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় ঘুমে অচেতন। ঘর দু'তিনবার কেঁপে উঠলো, শব্দও শুনতে পেলাম ঘুমের আচ্ছন্নতায়। ক্লান্তি আমাকে এভাবে দখল করেছিল যে ঘুম থেকে জেগে ওঠার তাগিদ বোধ করি নি।

সকালে উঠে বুঝতে পারলাম কী সর্বনাশ হয়ে গেছে, হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ অন্যান্য জায়গায় কী পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। স্তম্ভিত, বিমূঢ় হয়ে গেলাম, যেন আমার বাকশক্তি লোপ পেয়েছে। তখন আমি সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে থাকি। কাছেই নয়া বাজার, ইসলামপুর আর শাঁখার গন্ধে ভরপুর শাঁখারিবাজার। ছাব্বিশে মার্চ কারফিউ। নয়াবাজারে আগুন লাগানো হলো, শাঁখারিবাজারে অবিরাম চললো গুলি। দুপুরবেলা জানালা থেকে দেখলাম তরুণী বুকে ছোট শিশু নিয়ে ছুটে যাচ্ছে, হয়তো আশ্রয়ের খোঁজে। পরদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করার পর দু'-একজন বন্ধু এলেন বাসায়। তাঁরা জানতে এলেন আমি কেমন আছি। যতোদূর মনে পড়ে এখলাসউদ্দিন আহমদ এবং কালাম মাহমুদ এসেছিলেন। তাঁদের মুখে ঢাকার রাস্তার দু' একটি দৃশ্যের কথা শুনে মাথার ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার ঢুকে গেল। আমি ছন্নছাড়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক নিহত হয়েছেন। গোবিন্দ চন্দ্রদেব এবং জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

তিন-চার দিন ঢাকায় ভীতসন্ত্রস্ত দিনযাপনের পর রওনা হলাম আমাদের গ্রামের উদ্দেশে। আমরা বাসে নরসিংদী পৌঁছলাম দুপুরে। নরসিংদী থেকে নৌকায় যেতে হবে পাড়াতলীতে, আমাদের গ্রামে। নৌকা পাবো কোথায়? ছোট নৌকা পেলেও কোনো লাভ নেই। যাত্রী আমরা অনেকজন। বড়সড় একটি নৌকা দরকার। এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়, অথচ নৌকার দেখা নেই। নরসিংদীতে সেদিন বেঝায় ভিড়। নিরাপত্তা সন্ধানী অনেকেই এসেছেন শহর থেকে। আখেরে একটি নৌকা পাওয়া গেল। রওনা হলাম

পাড়াতলীর পথে, মেঘনা নদীর পানি চিরে চললো নৌকা। নৌকায় চড়ে নিজেকে অনেক হালকা মনে হতো আর বাড়িতে পৌঁছে নাকে এলো বেলি ফুলের সুঘ্রাণ। প্রগাঢ় শান্তি আমার মাথা বুলিয়ে দিলো, বিলি কেটে দিল চুলে।

পাড়াতলীতে হানাদার বাহিনীর বুট কিংবা গুলির আওয়াজ নেই, ওদের জল্লাদপনা নেই। রক্তলিপ্সু শিকারি কুকুরদের দন্ত-নখর থেকে আমরা অনেক দূরে। এই অজপাড়া গাঁয়ে ওরা আসবে ভেবে স্বস্তি ও শান্তিতে আছি। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে এক দুপুরে একটি এক্সারসাইজ খাতায় দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে দুটি কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতা দুটিকে আমি যমজ কবিতা বলে থাকি —'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা।' কবিতা দুটি যে বাঙালিদের এতো প্রিয় হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে, এ-কথা সেদিন ভাবি নি। পাড়াতলীতে দু'মাস ছিলাম; কিন্তু এরপর আর্থিক কারণে থাকা সম্ভব হয় নি। ভয়ে ভয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। সেই হঠাৎ পাওয়া এক্সারসাইজ খাতা সঙ্গেই ছিল, আমার স্ত্রী জোহরা বেগমের হেফাজতে। তিনি সেটি শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যেন কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য। তিনি আমার কবিতাগুলোকে নয় মাস ধরে লুকিয়ে রেখেছেন এভাবে, কখনও মশাল ভাণ্ডে, কখনও ভাঙা, উপেক্ষিত বাক্সের ভেতরে।

ঢাকায় ফিরে কারো কারো পরামর্শে, বিশেষ করে আমার শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে *দৈনিক পাকিস্তানে* যোগ দিতে বাধ্য হলাম। নিঃসন্দেহে এটা ছিল ভুল কাজ। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ এমন পরিস্থিতি-বিড়ম্বিত, হতচকিত হয়ে পড়ে যে ভুল জায়গায় পা রেখে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আমি, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য প্রতীক্ষা-কাতর, অথচ খবরের কাগজে কর্মরত। এই বৈপরীত্য আমাকে পীড়িত করেছে; কিন্তু নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি যে, মনে-প্রাণে আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। দখলীকৃত দেশে সম্ভবত আমিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ে সর্বপ্রথম কবিতা লিখি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমি কবিতা লিখে গিয়েছি একের পর পর এক। সে সব কবিতাই আমার *বন্দী শিবির থেকে গ্রন্থে* সন্নিবেশিত হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি যে কবিতা লিখেছি সে-কথা জানতেন আত্মগোপনকারী হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক—তখনও তিনি বিদেশে পাড়ি জমান নি—এখলাসউদ্দিন আহমদ, শহীদ কাদরী এবং ফজল শাহাবুদ্দীন। তাঁদের আমি অনেকগুলো কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলাম। আর জানতেন ভুঁইয়া ইকবাল, শাহাদত চৌধুরী এবং বীরপ্রতীক হাবিবুল আলম। শাহাদাত চৌধুরী ও হাবিবুল আলম আমার কয়েকটি কবিতা কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। চিত্রকর আলভী আমার কয়েকটি কবিতা আবু সয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুবের কাছে নিয়ে যান। আবু সয়ীদ আইয়ুব কবিতাগুলো সাপ্তাহিক *দেশ পত্রিকায়* ছাপানোর উদ্যোগ নিলেন। তাঁর মনে হলো কবিতা ক'টি শিগিরই প্রকাশ করা দরকার লেখকের ছদ্মনামের আড়ালে। লেখকের নাম রাখা হলো 'মজলুম আদীব' অর্থাৎ নির্যাতিত সাহিত্যিক। এই নাম খোদ আইয়ুবই রাখলেন। কবিতাগুলো একে একে প্রকাশিত হলো প্রথমে লেখকের ছদ্মনামে, পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বনামে। সেসব কবিতা যাতে খুব শিগগিরই গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয়, সেজন্য আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং গৌরী আইয়ুব তাড়াহুড়ো করে *বন্দী শিবির থেকে* অরুণা প্রকাশনীকে ছাপাতে দিলেন। বইয়ের নাম আমিই রেখেছিলাম। কিন্তু অনেক কবিতাই তাঁদের কাছে পাঠানো সম্ভব হয় নি আমার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য। ফলে অরুণা প্রকাশনী থেকে অত্যন্ত শীর্ণকায় একটি বই প্রকাশিত হলো ১৯৭২ সালে।

*বন্দী শিবির থেকে*সময়ের ধোপে টিকবে কি না তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এই বইয়ের কবিতাবলি অমি লিখি ত্রাস-তাড়িত, মৃত্যু-শাসিত এক কৃষ্ণপক্ষে। আমার অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছি আন্তরিকভাবে, কবিতার শৈলীর যে একটি দিক রয়েছে সেদিকে তেমন নজর দিতে পারি নি। ঘাতকের মারণাস্ত্রের ছায়ায় নিত্যদিন বসবাস করে নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। ন'মাস নরকবাসের অনুভূতিমালা, কিছু চিত্র এই গ্রন্থে রইলো, এটুকুই আমার সান্ত্বনা। কোনো কোনো কবিতা পাঠকের মানসসঙ্গী হতে পারছে দীর্ঘ বিশ বছরের পরেও, এটা আমার জন্য কম পাওয়া নয়।

# আমার জন্মশহর, স্মৃতির শহর

এখন আমি পুরনো ঢাকা থেকে দূরে রাজধানীর এক কোণে থাকি। কালেভদ্রে যাওয়া হয় পুরনো ঢাকায়, অথচ আমার নাড়ির টান সেই এলাকার সঙ্গেই। আমি জন্মেছি পুরনো ঢাকায় এক সঙ্কীর্ণ গলিতে ১৯২৯ সালে। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হলো। সেকালের ঢাকার সঙ্গে একালের ঢাকার মিল বেশি নেই। ঢাকার চেহারা অনেকখানি পাল্টে গেছে। তবে পুরনো ঢাকা, কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও, আগেকার মতোই আছে। কোনো কোনো মহল্লায় হাইরাইজ দালান হয়েছে বটে, তবে পুরনো ঢাকার দৈন্য ঘোচে নি। বড়ো বড়ো বটগাছ নেই, আস্তাবল নেই, ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ে না বললেই চলে। আছে বাকরকানির হতশ্রী দোকান, তেহারির দোকান, অনুজ্জ্বল চা-খানা। আবেদ কিংবা পিঞ্জুর পাউরুটির দোকানের মতো কোনো দোকান, আছে কিছু হাল আমলের কনফেকশনারি। মনে পড়ে, আমাদের ছেলেবেলায় কুলফি বিক্রি হতো বিকেলে আর সন্ধ্যাবেলা। একজন ঢ্যাঙা লোক মাথায় জালা-ভর্তি কুলফি নিয়ে আসতো আমাদের গলিতে। সেই লোকটির 'চা-ই কুলফি বরফ' আওয়াজ শুনলেই আমার মনে চঞ্চল হয়ে উঠতো। একজন খর্বকায় অবাঙালি সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতো আইসক্রিম। একটি কাঠের বাক্সে সঞ্চিত থাকতো আইসক্রিম, হাতল ঘুরিয়ে বের করে আনতো ঠাণ্ডা, হলদে রঙের আইসক্রিম। কাগজে আইসক্রিম রেখে বিলি করতো ক্রেতাদের মধ্যে। জাফরান মেশানো হতো বলেই আইসক্রিমের রঙ ছিল হলদে। ক্রেতাদের অধিকাংশই ছিল বালক-বালিকা। বড়োরাও সেই চমৎকার আইসক্রিমের স্বাদ নিতেন। এখানো সেই হলদে রঙের আইসক্রিমঅলা সেই কবে হারিয়ে গেছে অতীতের কুয়াশায়। মাঝে মাঝে তার মুখ ভেসে ওঠে আরো অনেক কিছুর মতোই, আমার চোখের সামনে।

বুদ্ধদেব বসু স্মৃতিকাতর আবেগ নিয়ে রমনা ও পুরানা পল্টন সম্পর্কে লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর দেখা রমনা আর পুরনানা পল্টন আজ আর নেই। এমনকি আমার কৈশোরে দেখা রমনা আর পুরানা পল্টনও আগেকার মতো নেই। দিলকুশাও নয় আগেকার দিলকুশা। যখন ছোট ছিলাম, আব্বার সঙ্গে দু'-একবার গিয়েছি দিলকুশার নবাববাড়িতে। সেই বাড়িতে একটি বড়ো চৌবাচ্চায় কুমির ছিল। বালক আমি, কৌতূহল এবং বিস্ময়ে ভরপুর, উৎসুক চোখে কুমির দেখতাম। নবাববাড়ির ধারেই ছিল একটা ঝিল। তারই নাম মতিঝিল। বুদ্ধদেব বসুর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে ঢাকা। ঢাকার প্রেমে যে পড়েছে একবার তার আর ভোলার উপায় নেই এই স্মৃতির শহরকে। দশকে দশকে ঢাকার অবয়বে পরিবর্তন এসেছে। মোগল আমলের ঢাকা, বৃটিশ আমলের ঢাকা, পাকিস্তান আমলের ঢাকা আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মধ্যে পার্থক্য অনেক। আমার নানা মুন্সী আফতাবউদ্দিন আহমদ যদি আজ কোনো ইন্দ্রজালের মহিমায় মৃত্যুলোক থেকে ফিরে

আসেন ঢাকা শহরে, আমি নিশ্চিত, তিনি ভয়ানক ভড়কে যাবেন। পথ চিনে তাঁর পক্ষে নিজের মহল্লায় যাওয়াই মুশকিল হবে, যদি না তিনি বহু রাস্তা ঘুরে বহুজনক জিগ্যেস করেন।

ঢাকা আমার স্মৃতির শহর, আমার ভালোবাসার শহর। এ শহর ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে বেশিদিন থাকতে পারবো না। বড়ো জোর তিন চার মাস তার বেশি নয়। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বিদেশে কিছুদিন কাটানোর পর আমি হাঁফিয়ে উঠি। ঢাকায় ফিরে আসার জন্য ছটফট করতে থাকি। কোন ঢাকা আমার কাছে অধিক আকর্ষণীয়? নতুন না পুরনো ঢাকা? আমি বলবো, পুরনো ঢাকা। পুরনো ঢাকার চেয়ে নতুন ঢাকা নিঃসন্দেহে বেশি উন্নত এবং জৌলুসময়। নতুন ঢাকার শান-শওকত অনেক বেশি। অভিজাত ইমারত, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, সেনানিবাস, সুগন্ধা, সেক্রেটারিয়েট, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, প্রেসক্লাব, বেতার ভবন, টেলিভিশন ভবন, নাটক-মুখর বেইলি রোডের মহিলা সমিতি, গাউড হাউস, চারুকলা ইনস্টিটিউট, শিল্পকলা একাডেমী, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র—এই সবকিছুই তো নতুন ঢাকায় রয়েছে। আর পুরনো ঢাকায় আছে আহসান মঞ্জিল, নর্থব্রুক হল, লুণ্ঠিত লাঞ্ছিত রামমোহন লাইব্রেরী, লালবাগের কেল্লা, ছোটো ও বড়ো কাটরা, চকবাজার, বেগম বাজার, তারা মসজিদ, আরমানিটোলার আরমানি গির্জা, লুণ্ঠিত ভাঙাচোরা ঢাকেশ্বরী মন্দির, শাঁখারি বাজার, সদরঘাট—পাল্লা নতুন ঢাকারই ভারি হবে, যদিও ঐতিহ্যের দিক থেকে পুরনো ইতিহাসের সাক্ষ্যবহ পুরনো ঢাকাই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হবে। আমার এই খেয়ালি বিচারে পক্ষপাত থাকতে পারে, অস্বীকার করবো না। কিন্তু আশা করি, কেউ কেউ আমার সঙ্গে একমত হবেন। পুরনো ঢাকায় আমি পুরনো ইতিহাসের নিশ্বাস এবং দীর্ঘশ্বাস শুনতে পারি। দেখতে পাই আমার না-দেখা অনেক ঘটনার ছায়ার মিছিল। মোগল সেনাদের কুচকাওয়াজ, নায়েবে নাজিমের ঝলমলে পোশাক, শায়েস্তা খানের আসা-যাওয়ার পথের ধরে দাঁড়িয়ে থাকা শহরবাসী, আন্টাগড়ের ময়দানে ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত সিপাহীর লাশ, পগোজ স্কুল প্রাঙ্গণে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঢাকাবাসীদের উদ্দেশে কবিতা পাঠ, পাটুয়াটুলীর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে জীবনানন্দ দাশের বিবাহ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণসমাজে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা অনুষ্ঠান, আহসান মঞ্জিলের নবাবদের দরবার, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নায়কদের আসর আমাকে স্বপ্নময় করে তোলে। আমার স্মৃতিকে আলোড়িত করে শৈশবে দেখা মহররম ও জন্মাষ্টমীর মিছিল। তেমন জাঁকজমকপূর্ণ, বর্ণাঢ্য মিছিল আজকাল দেখা যায় না। তবে হাল আমলের বিজয় দিবসের এবং পয়লা বৈশাখের র‍্যালির কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিষয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম—

এ শহর টুরিস্টের কাছ পাতে শীর্ণ হাত যখন তখন,
এ শহর তালিমারা জামা পরে, নগ্ন হাঁটে, খোঁড়ায় ভীষণ।
এ শহর রেস খেলে, তাড়ি গেলে হাঁড়ি হাঁড়ি, ছায়ার গহ্বরে।
পা মেলে রগড় করে আত্মার উকুন বাছে, ঝাড়ে ছারপোকা।
কখনো-বা গাঁট কাটে, পুলিশ দেখলে

মারে কাট। টকটকে চাঁদের মতন চোখে তাকায় চৌদিকে,
এ শহর বেজায় প্রলাপ বকে, আওড়ায় শ্লোক,
গলা ছেড়ে গান গায়, ক্ষিপ্র কারখানায়
ঝরায় মাথার ঘাম পায়ে।
ভাবে দোলনার কথা কখনো সখনো,
দ্যাখে সরু বারান্দায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটির রূপ।

এ শহর জ্যৈষ্ঠে পুড়ে এবং শ্রাবণে ভিজে টানে
ঠেলাগাড়ি, রাত্রি এলে শরীরকে উৎসব করার
বাসনায় জ্বলে সাত তাড়াতাড়ি যায় বেশ্যালয়ে।
এ শহর সাদা হাসপাতালের ওয়ার্ডে কেবলি
এ-পাশ ও -পাশ করে, এ শহর সিফিলিসে ভোগে,
এ শহর পীরের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, বুকে-হাতে
ঝোলায় তাবিজ-তাগা, রাত্রিদিন করে রক্তবমি,
এ শহর কখনো হয় না ক্লান্ত শবানুগমনে।
এ শহর দারুণ দুক্ষোভে ছেঁড়ে চুল, ঠোকে মাথা
কালো কারাগারের দেয়ালে,
এ শহর ক্ষুধাকেও নিঃসঙ্গ বাস্তব জেনে ধুলায় গড়ায়,
এ শহর পল্টনের মাঠে ছোটে, পোস্টারের উল্কি-ছাওয়া মনে
এল গ্রেকোর ছবি হয়ে ছোঁয় যেন উদার নীলিমা,
এ শহর প্রত্যহ লড়াই করে বহুরূপী নেকড়ের সাথে।

হায়, সেই পল্টনের মাঠ, আমার বহু স্মৃতিবিজড়িত মাঠ আর নেই, যে-মাঠে কৈশোর কখনো নিস্তেজ রোদে বসে, কখনো বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলা দেখতাম চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে, যে পল্টনের মাঠে বসে অথবা দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আর মওলানা বাসনীর দীপ্তিমান, উদাত্ত বক্তৃতা শুনতাম কখনো-কখনো, আজ আর নেই। আজকাল পান্থপথে, জিরো পয়েন্টে, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে, প্রেসক্লাবের সামনে বক্তৃতা দেন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বায়তুল মোকাররমের মসজিদের উত্তর গেট তো বহুদিন থেকে দখল করে রেখেছে মৌলবাদীরা। আমি সেই দেনির প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদের উছিলায় মৌলবাদীরা সেখানে রাজনৈতিক বক্তৃতা আর দিতে পারবে না, সমাজে ছড়াতে পারবে না মধ্যযুগীয় অন্ধকার। আমার প্রিয় শহর, জন্মশহর ঢাকা যেন কখনো পরজীবী, ক্ষমতালিপ্সু ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদীদের খপ্পরে না পড়ে। আমি চাই ঢাকা হোক আমার সুন্দর স্বপ্নের শহর, মুক্তচিন্তার শহর, শিল্প-সংস্কৃতির অব্যাহত বিকাশের শহর, সৃজনশীল, প্রগতিশীল মানুষের শহর। ঢাকা তার সব গ্লানি মুছে ফেলে হয়ে উঠুক সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক, সুস্থ চেতনার, অপার গৌরবের শহর। হিংসার নয়, মানবপ্রেম এবং কল্যাণের শহর। এই মনের মতো শহর গড়ার দায়িত্ব মুক্তিমতি তরুণ সমাজের। আমি তাদের পদধ্বনি শোনার আশায় কান পেতে আছি।

# কবিতায় সমাজচিন্তা ও কাব্য-ভাবনা

প্রথমেই আমি টি এস ইলিয়টের একটি উক্তি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে চাই। এলিয়ট বলেছেন, "no poet, no artist of any art, has his comlete meaning alone." তিনি 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তি প্রতিভা' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন। কোনো কবি, কোনো শিল্পী অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো সম্পূর্ণ অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেন না। আমি বলি, কোনো কবি, কোনো শিল্পী তাঁর সামাজিক পরিমণ্ডল ও যুগকে এড়িয়ে কখনো পুরোপুরি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন না। আবার এলিয়টেরই কথা ধার করে বলি, মহৎ কবি মাত্রই নিজের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে স্বকালের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার রূপায়ণ যেমন ঘটে, তেমনি সমাজভাবনাও প্রশ্রয় পায় বহুলাংশে। কবির ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ঐতিহ্য, পারিপার্শ্বিক, যুগ ইত্যাদির টানাপোড়েনে কাব্য গড়ে ওঠে।

যুগচেতনা সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্বেতদ্বীপের ষোড়শ শতকের সাহিত্যের দিকে বিহঙ্গ দৃষ্টি দিলে। সেই উদ্দীপক শতকে শ্বেতদ্বীপের অভিযানপ্রিয় সেরা নাবিকেরা জাহাজ ভাসিয়েছিলেন সাত সমুদ্র, অজানার উদ্দেশে। তাদের দৃষ্টিতে ছিল সুদূরের তৃষ্ণা আর বীরভোগ্যা বসুন্ধরার গর্ভে লুকিয়ে থাকা রত্নরাজির ঝলসানি। পরাক্রান্ত নাবিকদের উদ্দীপনা, অন্বেষা, সাড়া জাগানো সাফল্য ষোল শতকী ইংরেজ কবিদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল প্রবলভাবে। শেক্সপিয়রসহ অনেকেই তাদের রচনায় সেসব সুদূরপ্রসারী ঘটনা ব্যবহার করেছিলেন। কিছু পরে, জন ডানও সেই ঐতিহাসিক সাগরাভিযান-কাহিনী ব্যবহার করেন তাঁর কবিতায়। যখন তিনি কবিতায় কম্পাস কিংবা নিউফাউন্ডল্যান্ডের কথা উল্লেখ করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে তরঙ্গ শীর্ষে আন্দোলিত জাহাজ আর নতুন সেই ভূখণ্ড যেখানে কোনো মানবের পা পড়ে নি। আর আমরা যখন এলসিনোর দুর্গে পায়চারিরত, আত্মমগ্ন, বাক্যে পাওয়া হ্যামলেটকে হঠাৎ অসি চালাতে দেখি ঈর্ষণীয় দক্ষতায়, তখন তাকে রেনেসাসেঁর সেই কৃতী পুরুষদের প্রতিভূ হিসেবে চিনতে ভুল হয় না।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব আন্দোলিত করেছিল প্রকৃতির দুলাল ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। তাঁর কবিতা পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই প্রধান রোমান্টিক কবি শিল্প বিপ্লব ব্যাপারটিকে সুনজরে দেখেন নি। ব্লেকের মতো মরমী কবিও যে শিল্প বিপ্লবের ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি, তা আমরা জানতে পারি তাঁর কোনো কোনো কবিতা পড়ে। এবং ফরাসি বিপ্লব যা পৃথিবীর ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে অনেকখানি, তার লেলিহান স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে রোমান্টিক কাব্যধারা- এও আমাদের জানা কথা। দু' দুটো মহাযুদ্ধ বিশ্ব সাহিত্যের অবয়বে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন—বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ব্যাপক

ছায়া ফেলেছে সাহিত্যে। ইউরোপীয় বহু কবি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, অর্জন করেছিলেন ট্রেঞ্চবাসের অভিজ্ঞতা, বুলেটবিদ্ধ, মৃত সঙ্গীদের পাশে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সময় যাপনের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর অর্থহীনতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল তাদের অনেকেরই কবিতায়।

বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা বিভিন্ন লেখকের মানসে সমাজচিন্তা ও যুগচেতনার স্বাক্ষর দেখতে পাবো। বৃটিশ আমলে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল, প্রবল হয়ে উঠেছিল অসহযোগ আন্দোলন তার ঝঙ্কার আমরা শুনতে পাই কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য মানবিকতাবোধ ও দেশপ্রেম শুধু তাঁকে ইংরেজের দেয়া *নাইট* খেতাব ত্যাগ করতেই উদ্বুদ্ধ করে নি, অনুপ্রাণিত করেছিল 'প্রশ্নে'র মতো সত্তার ভিত-কাঁপানো কবিতা রচনায়। জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যের সবচেয়ে আত্মমগ্ন, নির্জন কবি বলে খ্যাত; কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত বনলতা সেন, শঙ্খমালা ইত্যাদির স্বপ্ন বলয় থেকে সরে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল সেই পথে—যেখানে মোটরকার গাড়লের মতো কেশে ওঠে, কুষ্ঠরোগী হাইড্রান্ট থেকে জল চেটে নেয়, ভিখারিরা জটলা পাকায়, যেখানে সাম্প্রদায়িক আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে রক্তস্রোত বয়ে যায় এবং কবির আত্মআর্তনাদ করে ওঠে, তিনি প্রশ্ন করেন বিহ্বল কণ্ঠে : মধ্যযুগ এতো রক্ত দেখেছে কখনো!

পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে সত্তর দশকের মধ্যপাদ পর্যন্ত বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা কোনো কোনো দেশে গোটা এক শতাব্দীতেও ঘটে না। উনিশশো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনিশশো উনসত্তরের গণআন্দোলন, উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়—এ সবকিছু ঘটেছে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে, একটি জাতিকে প্রবল সচকিত, উদ্দীপিত সাহসদীপ্ত করে। এই অসামান্য সময়কে ধারণ করেছে বাংলাদেশের কাব্যধারা। পঞ্চাশ দশকে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় এক নতুন কবি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে—সেই কবিদের প্রধানাংশ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিতে সমর্পিত। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁরা তাদের কাব্যযাত্রা শুরু করেছিলেন। অবশ্য তাঁরা যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তা ক্ষীণভাবে হলেও তাঁদের কোনো কোনো অগ্রজ কবির মানসে উপস্থিত ছিল। পূর্বসূরি কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মনিরপেক্ষ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল বটে; কিন্তু সেই যুগস্রষ্টা কবির কাব্যদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন নি। কারণ, ইতোমধ্যে বাংলা কবিতা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার কবিগোষ্ঠীর চেতনাকেই শুধু সমৃদ্ধ করে নি, তদের কাব্যপ্রয়াসকেও নিয়ে যায় নতুন বাঁকে। ভাষা আন্দোলনের এই প্রভাব কারো কারো রচনায় সূক্ষ্মভাবে কাজ করে গেছে দীর্ঘকাল। বুঝি তাই উনিশশ উনসত্তরের গণআন্দোলনেও কবিদের মনে পড়েছিল সালাম আর বরকতের মুখ, আসাদের রক্তাপ্লুত শার্টের পতাকায় দেখতে পেয়েছিলেন একুশের শহীদদের রক্তভেজা কামিজ।

ষাট দশকের কবিসংঘকেও দখল করেছিল উনসত্তরের গণআন্দোলন, তাঁদের অনেক লেখায় সে সময়ের স্পর্শ রয়ে গেছে। যদিও কারো কারো অসূর্যম্পশ্যা কবিতা উনসত্তরের গণআন্দোলনকে এড়িয়ে চলেছে সযত্নে; কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রায় সবাইকে দিয়ে

লিখিয়ে নিয়েছে এমন কিছু কবিতা, যা সেকালের একটি প্রোজ্জ্বল দলিল হয়ে থাকবে চিরদিন। সেই কবিতাবলি আমাদের দুঃসময়ের উদ্ধার বলে নন্দিত হবে কি না জানি না, তবে বহু মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি, বেঁচে থাকার লড়াই আর প্রতিবাদের স্বাক্ষর হিসেবে বহুকাল পঠিত হবে বলে আমার ধারণা।

এই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে তরুণ, অনতিতরুণ ও প্রবীন কবিদের প্রধানাংশ নিবেদন করেছেন কবিতাবলি। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাব্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে, বলা যেতে পারে। কাব্য-অভিজ্ঞতার পরিসর তো বেড়ে গেছেই, কারো কারো বাক্-রীতিতেও এসেছে পরিবর্তন।

আমাদের কবিগোষ্ঠী এমন কিছু শব্দ এখন ব্যবহার করেন যা মুক্তিযুদ্ধেরই অবদান। কিভাবে একজন কবির কাব্যভাবনাকে সমাজচিন্তা ও যুগচেতনা প্রভাবান্বিত করে তা আমি মোটা দাগে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি আমার বক্তব্যে। কবি তাঁর সমাজ ও যুগ থেকে উপকরণাদি আহরণ করে নিজের কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি করেন। তিনি নিজে সমাজকে কতোটুকু প্রভাবান্বিত করতে পারেন—এই প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে। ডব্লিউ এইচ অডেন ইয়েটস স্মরণে যে কবিতাটি লেখেন তার সূচনায় বলা হয়েছে যে কবি আবহাওয়া কিংবা আয়ারল্যান্ড কিছুর ওপরই স্থায়ী দাগ কাটতে পারেন না। তবে সেই কবিতাতেই স্বীকার করা হয়েছে যদি কবিতার নিজস্ব শর্ত মেনে রেখে কেউ কবিতার কাছে যান তাহলে কবিতা তার মন বদলে দিতে পারে। অর্থাৎ সমাজ যেমন কবিকে নানাভাবে কাব্যোপকরণ জুগিয়ে চলে, তেমনি কবিও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন। এই উক্তির সমর্থনে আমরা সহজেই রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবিদের নাম উচ্চারণ করতে পারি। স্মরণ করতে পারি আরো কোনো কোনো কবিকে। যদি তাই না হবে, 'রূপসী বাংলার' কবি কেন অনুপ্রেরণা জোগাবেন আমাদের মুক্তি সংগ্রামে?

## সাম্প্রতিক কাব্যধারা ও বাংলা কবিতা

আমাদের উনিশ শতাব্দী অগ্রজেরা বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন একথা কেউ বলবে না। তারা তাদের মানসভেলা ভাসিয়েছিলেন ইংলিশ চ্যানেলে এবং ইংল্যান্ডকে ভেবেছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির রত্নদ্বীপ বলে। তাদের কৌতূহল অবশ্য মূলত মিলটন, শেক্সপীয়ার, শেলি, কিটস, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টেনিসনেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই ইংরেজ কবিদের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েই তারা মনে করতেন যে, বিদেশি সাহিত্য জানা হয়ে গেল। অবশ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিশ্বম্ভরিতা ছিল সুদুর-বিস্তৃত। ইংরেজি সাহিত্যের রস আকণ্ঠ পান করে তিনি তৃপ্ত থাকেন নি, গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের সঙ্গে তার আন্তরিক পরিচয় ছিল। তিনি লিখতে চেয়েছিলেন মিলটন এবং গ্রিকদের মতো।

উনিশ শতকে বাঙালি সারস্বত সমাজে সাহেবিয়ানার একটা জোয়ার এসেছিল। সেখানে কিছুসংখক তেজী যুবক গোঁড়ামি কবলিত প্রথাশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং এদের অনেকেই ছিলেন ডিরোজিয়ান। ডিরোজিওর শিক্ষকতায় তার ছাত্ররা সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। এই অসামান্য ইংরেজ শিক্ষকটি কবিতা রচনাতেও দক্ষ। বস্তুত তিনি তার ছাত্রদের মধ্যে এক প্রবল সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করেছিলেন। ডিরোজিও তার ছাত্রদের এমন প্রভাবিত করেছিলেন যে, তারা তাকে অনুসরণ করে প্রচুর আনন্দ লাভ করতেন। খোদ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো ডিরোজিওর হস্তাক্ষর পর্যন্ত নকল করতেন। যা হোক, ডিরোজিওর প্রভাব উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল উনিশ শতাব্দীর বাঙালি মানসের জন্য। এ কথা তো না বললেও চলে যে মাইকেল প্রধানত রিচার্ডসন ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসেই ইউরোপিয়ান হয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তার স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে অসামান্য জ্ঞান অবশ্য তার নিজস্ব মেধা ও নিষ্ঠারই পুরস্কার। বিদেশি সাহিত্য বিচারেও মাইকেল রেখে গেছেন তার প্রজ্ঞার পরিচয়। রঙ্গলাল সম্পর্কে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"He reads Byron, Scott & More, very nice poets in their way, no doubt, but by no means of the highest school of poetry, except perhaps Byron, now & them. I like Wordswoth better..."

আংশিকভাবে যে বায়রনের কাব্য বরণীয় একথা সাম্প্রতিক ইংরেজি সমালোচকগণ বলছেন। এবং মনে রাখা দরকার, ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি এই পক্ষপাত তিনি এমন এককালে দেখিয়েছেন, যে কালে শ্বেতদ্বীপেও ওয়ার্ডসওয়ার্থবাদীদের আবির্ভাব হয় নি। মাইকেলের ঐ মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁর অসামান্য কাব্যবুদ্ধির পরিচায়ক। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বদেশে ছিলেন নিঃসঙ্গ। মাইকেলের সাহেবিয়ানা তাঁর জীবনের দুঃখদুর্দশার জন্য কতোখানি-দায়ী তা নিয়ে হয়তো তর্ক চলতে পারে; কিন্তু সেটি যে বাংলা কবিতার

পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলাম এজন্য যে, আজকাল বাংলা কবিতায় সে বৈশ্বিক সুর হরহামেশা ধ্বনিত হচ্ছে, তার নান্দীকার সংশয়াতীতভাবে সেই আদি বিরাট পুরুষ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্য লেখেন।' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই বাক্যটিকে অতিশয়োক্তি হিসেবে চিহ্নিত করলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, রবীন্দ্র-মানসে একটি অন্তর্লীন স্রোত বয়ে গেছে যার উৎস ইউরোপ। রবীন্দ্রনাথ কি কি বই পড়েছেন, এ সম্পর্কে কোনো তালিকা আজো আমাদেরে হস্তগত হয় নি। তার পাঠাভ্যাস সম্পর্কে তিনি নিজে আশ্চর্য রকম মিতবাক। যদিও তার গদ্য রচনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস, টেনিসন প্রমুখের নামোল্লেখ কখনো-সখনো পাওয়া যায়। তবু একথা মানতে আমাদের বাধে যে, ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে তার উৎসাহ ঐ ক'জন ইংরেজ কবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভিক্টর হিউগোর যুগের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন তিনি। অথচ বোদলেয়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিস্পৃহ। তার বিজয়ার অনুরোধে তিনি বোদলেয়ারের কবিতা পড়েছিলেন; কিন্তু 'তোমাদের আসবাবের কবিকে ভালো লাগলো না' বলে তিনি কলমের এক খোঁচায় খারিজ করে দিলেন আধুনিক কবিতার জনকের অসামান্য কাব্যসম্ভারকে। ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথ, যার তৃতীয় নেত্র সদাভাস্বর, যাঁর মতো অগ্রসর ব্যক্তিত্ব সর্বকালে বিরল, এমিয়েলের জার্নাল সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হতে দ্বিধা বোধ করেন না, অথচ বোদলেয়ারকে ঠেলে সরিয়ে দেন চরম ঔদাসীন্যে। যে ইয়েটস ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ, যে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি পকেটে নিয়ে ঘুরতেন, তার কবিতাও রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ সহকারে পড়েন নি কোনোদিন। এলিয়টের *জার্নি অফ দি মেজাই* নামক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নয়। বিষ্ণু দের গদ্যছন্দ বিষয়ে এক জিজ্ঞাসার উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখলেন, 'আপনাকে এই সুযোগে বিষ্ণু এলিয়টের সাম্প্রতিক কবিতা পড়ালো।' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জবাব এলো, তাই বুঝি, এলিয়ট তো ভালো লেখে, তার প্রতি আমি অন্যায় করেছি। তুমি কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়েছো তো দেখা যাচ্ছে। এলিয়ট তো ভালো লেখে বলে রবীন্দ্রনাথ ওয়েস্টল্যান্ডের কবির পিঠ অনেকটা চাপড়ে দিলেন। আসলে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে ইউরোপীয় কবিতার প্রভাব খুঁজতে গেলে সাহিত্যিক গোয়েন্দারা কিছু কিছু হদিস অবশ্য পাবেন, এমনকি প্রতিধ্বনিও শ্রুত হবে। কিন্তু রাবীন্দ্রিক সৌরমণ্ডলে তা লীন হয়ে গেছে আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতায়। এখানে বলে রাখা দরকার অনেকে শিশুতীর্থ কবিতার ওপর *জার্নি অব দি মেজাই*-এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে পাণ্ডিত্য জাহির করে থাকেন। কিন্তু এলিয়টের ঐ কবিতাটি পড়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ *শিশুতীর্থ* লিখেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার—এরা সবাই বিদেশি সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যে প্রতীচ্যের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার স্বাক্ষর রয়েছে *তীর্থরেণু* গ্রন্থে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বোদলেয়ারেরও একটি অনুবাদ

করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের পাঠাভ্যাসের কোনো খ্যাতি না থাকা সত্ত্বেও তিনি শেলি-কিটসের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হুইটম্যানের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন তিনি।

তিরিশের দশকের যে পাঁচজন কবি সৎ কাব্য পাঠকদের কাছে বরণীয় তাঁদের প্রত্যেকেরই অন্তরঙ্গ পরিচয় রয়েছে দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে। জীবনানন্দ দাশের ওপর কীটস এবং ইয়েটসের প্রস্তাব লক্ষ করার জন্য পাণ্ডিত্যের তেমন প্রয়োজন হয় না। বিদগ্ধ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ছায়া ফেলেছেন মালার্মে এবং পল ভালেরি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেই বলেছেন, "মালার্মের কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট।" অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে হপকিন্সের প্রভাব লক্ষণীয়। এ আধুনিক বাউল তার কবিতার পক্ষে উপকারী কোনো কোনো জিনিস কামিংসের কাছ থেকেও গ্রহণ করেছেন বিষ্ণু দের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন তার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বিষ্ণু দে তার কাব্যে পাণ্ডিত্যের সার্থক রসোত্তীর্ণ প্রয়োগ করেছেন। এলিয়টের কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন, বলেছেন, 'আমি এলিয়টের উপকৃত পাঠক।' পল এলুয়ার, লুই আরাগ এই দুই ফরাসি কবির রচনার স্বাক্ষরও রয়েছে বিষ্ণু দের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর গোড়ার দিকের কবিতায় প্রি-র‍্যাফালাইট কবিদের এবং ডি এইচ লরেন্সের সুর ধ্বনিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বোদলেয়ার এবং রিলকের কাব্যসম্ভারকে তিনি নিজের কাব্যের কাজে লাগিয়েছেন সুচারুভাবে। এই দু'জন কবিরই কৃতী অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু। বোদলেয়ার এবং রিলকের সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের নিবিড় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমার তো মনে হয়, পঞ্চাশ দশকে বাংলা কবিতার যে ঋতুবদল হলো সেজন্য মূলত দায়ী বুদ্ধদেব বসুর সেই সাড়া জাগানো বই, *বোদলেয়ার — তার কবিতা*। এই বই প্রকাশিত না হলে আজকের বাংলা কবিতার যুগের একটি বিশেষ ভঙ্গি এভাবে উদ্ভাসিত হতো কি না, এ বিষয়ে আমি সন্দেহ পোষণ করি। এই ঋণ গ্রহণ নিন্দনীয় কিছু না। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহণের ইতিহাস প্রায় প্রত্যেক দেশেই বিদ্যমান। বাংলাদেশের কাব্যগোষ্ঠীও বিদেশি কাব্যপ্রবাহে স্নাত। নাবিক-বৃত্তিতে এরাও অগ্রজদের সহযাত্রী। এদের সবাই যে বিদেশি কবিতার মনোযোগী পাঠক এমন নয়; কেউ কেউ আধা-মনস্কতায় ভোগেন। কেউ কেউ গৌণ বীট কবিদের নিয়ে যতোটা মাতেন — ইয়েটস, পাবলো নেরুদা, সা জাঁ পার্স কিংবা অডেন নিয়ে ততোটা নয়। তাছাড়া একথাও আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে, বিদেশি সাহিত্য পরিক্রমায় আমরা যতো পারদর্শীই হই না কেন, স্বদেশের নানা পুরাণ, লৌকিক কাব্য এবং বিভিন্ন যুগের কাব্যস্মৃতির প্রতি আনুগত্য না থাকলে কাব্যক্ষেত্রে অসামান্য সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

## লেখকের শত্রুগণ

অনেক আগে সিরিল কনোলির *প্রতিশ্রুতি শত্রুগণ* নামে একটি বই পড়েছিলাম। কামড়ে-ধরা বই, একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত, বই রাখতে ইচ্ছে হয় না। মনে পড়ে, প্রায় নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে একদিনেই সেই বই পড়ে শেষ করেছিলাম। একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের শত্রু কারা? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সিরিলি কনোলি সেই গ্রন্থে। তাঁর মতে, সুরা, নারী এবং সাংবাদিকতা একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের শত্রু। অতিরিক্ত মদ্যপান শুধু শরীরকেই বিপন্ন করে না, মনের ভেতরেও ছড়িয়ে দেয় ক্লান্তির কুয়াশা। লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই যদি কোনো লেখক সবসময় মদে চুর হয়ে থাকে, তাহলে সে লিখবে কখন? কলম অলস, দেহমন ক্লান্ত—এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে থাকলে একজন নতুন লেখক, যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া সত্ত্বেও, একদিন নীরব হয়ে পড়বেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। তার পক্ষে যা লেখা, যতো ভালো লেখা সম্ভব ছিল তিনি তা আর লিখতে পারলেন না। এমন দুঃখজনক উদাহরণ প্রত্যেক দেশের সাহিত্যক্ষেত্র থেকে চয়ন করা যেতে পারে। প্রতিভাবান কবি ডিলান টমাসের কথা স্মরণ করা যাক। শব্দমাতাল এই কবি শেষের দিকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা মদে ডুবে থাকতেন। তাঁকে কখন কোন্ পানশালায় পাওয়া যাবে, এই খবর তাঁর পরিচিত সবাই রাখতেন। তবে, মনে রাখতে হবে যে, ডিলান টমাস এই মদসিক্ত জীবনে ইংরেজি কাব্যের বেশ কিছু স্মরণীয় কবিতা রচনা করে গেছেন। তিনি বেপরোয়াভাবে মদ খেয়েছেন, মদও তাঁকে খেয়েছে। মদ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে গিলতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু তাকে ক্ষীণায়ু করেছে। ফলে কাব্যপ্রেমীরা বঞ্চিত হয়েছে তাঁর আরও অনেক মোহসঞ্চারী, অসাধারণ কবিতা থেকে। শেষের দিকে তিনি এমন মদাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর লেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরনো কবিতা আবৃত্তি করে অর্থোপার্জন করতেন কিন্নরকণ্ঠ এই কবি।

আমেরিকায় গিয়ে ডিলান টমাস সেখানকার শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলে তাঁর আবৃত্তি দিয়ে। ভক্তরা সর্বক্ষণ ঘিরে রাখতো তাঁকে, সুরার সরবরাহ ছিল অব্যাহত। প্রবল হৈ-চৈ আর অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে ইংরেজি কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মৃত্যুর অন্ধকারে ঢলে পড়লেন অকালে। তবু সান্ত্বনা, মৃত্যুর আগে তিনি নিজেকে একজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন; কিন্তু অনেক তরুণ কবি ভালো কিছু লেখার আগেই কিংবা একটি কি দুটি চমৎকার কবিতা লিখেই সুরাসক্ত জীবনযাপন শুরু করেন, যার ফলে তা তাদের জন্য সুখকর, শুভ হয় না। ইংল্যান্ডের নব্বুইয়ের প্রতিশ্রুতিশীল ক'জন কবি ডাউসন, লায়নেল জনসন এবং সাইমন্স তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হন। তাঁদের কবিতা ইংরেজি কবিতার কোনো কোনা সঙ্কলনে দেখা যায়, তার বেশি কিছু নয়। অবশ্য আর্থার সাইমন্স ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতা বিষয়ে একটি

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এঁদের কাব্যক্ষমতা ছিল, কিন্তু এলোমেলো জীবনযাপন করে এঁরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাকেই আলিঙ্গান করেন। অথচ ডব্লিউ বি এয়টস এই কবিদের আসরে কিছুকাল ওঠা-বসা করে পরে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সেই সুরা-টলমল আড্ডা থেকে। এবং এ-কথা অবশ্যমান্য যে, ইয়েটস বিশ্বের সর্বকালের প্রধান কবিদের একজন। তিনি ডাউসন প্রমুখ কবিদের জীবনচর্যা বেছে নিলে সন্দেহ হয়, এতো বড় মাপের কবি হতেন কি না।

প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের অন্যতম শত্রু হিসেবে সিরিল কনোলি নারীকে চিহ্নিত করেছেন। নারীর প্রেমের জন্য যুবরাজ সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করেছেন, ইতিহাস এ-কথার সাক্ষী। নারীর ভালোবাসা ও মমতার স্পর্শে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে, কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এজন্য নারীকে দোষ দেয়া চলে না। ভালোবাসা জোর-জবরদস্তির সাহায্যে আদায় করা যায় না। নারী-সান্নিধ্যে কোনো কোনো কবির কবিতাকে মনোমুগ্ধকর এবং ঋদ্ধ করে তোলে। প্রেমে সফলতা, ব্যর্থতা—দুটিই উপকারী হতে পারে কারো কারো কবিতার পক্ষে। একজন কবি কোনো রমণীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ব্যক্তি হিসেবে যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে পারে, হয়তো সেই বঞ্চনা তার কবিসত্তাকে সমৃদ্ধ করে দেয় তার অজ্ঞাতসারেই। নারীর প্রতি ভালোবাসাই তো দান্তেকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় *নতুন জীবন*-এর মতো কাব্য। নারী-লোলুপতা ক্ষতিকর হতে পারে শেষ পর্যন্ত কিন্তু নারীর প্রতি ভালোবাসা অনেক লেখকের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয় বলে আমি মনে করি।

প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের তৃতীয় শত্রু, কনোলির মতে, সাংবাদিকতা। এক্ষেত্রে আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার মতো কারণ খুঁজে পাই না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাংবাদিকতা একজন লেখকের মহাশত্রু। একজন সাংবাদিক শব্দের প্রতি ভালোবাসা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে অক্ষম। তাকে এতো তাড়াহুড়ো করে লিখতে হয় যে, শব্দ নিয়ে বেশি ভাবতে সে পারে না। ফলে প্রথমে যে শব্দ তার মনে আসে তা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়। সাংবাদিকরা এক ধরনের কেজো ভাষা তৈরি করে ফেলে, যা একজন কবি অথবা কথাশিল্পীর তেমন কোনো কাজে লাগে না। খবরের কাগজে যারা সহ সম্পাদকের কাজ করে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু যারা রিপোর্টার অথবা সহকারী সম্পাদক, অর্থাৎ যাদের প্রায় রোজই কিছু না কিছু লিখতে হয় তাদের জন্য সাংবাদিকতা খুবই ক্ষতিকর। আমি সেসব কবি-সাহিত্যিকের কথা স্মরণে রেখে বলছি, যারা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একজন লেখক যখন সম্পাদকীয় এবং কলাম লেখেন তখন তিনি সৃজনশীল কাজ করার অনুরূপ আনন্দ কিংবা তৃপ্তি পান। কারণ, প্রত্যেক রচনার মধ্যেই সৃজনশীলতার কিছু ছায়া থাকে, যার ফলে লেখক-সাংবাদিকের এক ধরনের তৃপ্তি লাভ হয় প্রায় প্রত্যহ। এতে তার আসল কাজ—কবিতা, উপন্যাস, নাটক রচনা-ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক কিছু লেখাই হয় না। এজন্যই বুদ্ধদেব বসু *দ্য স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকার তৃতীয় সম্পাদকীয় লেখার কাজ কিছুদিন পরেই স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন। সেই একই পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব

পালন করেছেন। একবার বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা পত্রিকার জন্য লেখা প্রার্থনা করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। তিনি বুদ্ধদেবকে চিঠি লিখে জানালেন যে বহুদিন তিনি কিছু লিখতে পারছেন না। এই সঙ্গে তিনি একটি বাক্য যোগ করলেন, 'সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু।'

আরো দুটি শত্রু আছে লেখকের, যাদের উল্লেখ সিরিল কনোলি করেন নি তাঁর বইয়ে। এই শত্রু দুটির নাম ফ্যাসিবাদ এবং মৌলবাদ। ফ্যাসিবাদ এবং মৌলবাদ সৎ সাহিত্য বিকাশের পথে মস্ত অন্তরায়। লেখকেরা মূলত প্রথাবিরোধী, তাঁরা হুক্কা-হুয়া রবে কণ্ঠ মেলাতে পারেন না, অচলায়তনের গায়ে জোরে ধাক্কা দিতেই বেশি পছন্দ করেন। তাই অচলায়তনের পাহারাদারদের কাছে প্রথাবিরোধী, ভাঙচুরকামী লেখক অত্যন্ত অপ্রিয়। যেসব দেশে ফ্যাসিবাদ এবং মৌলবাদের উত্থান ঘটে, সেসব দেশে শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে আসে ঘোর অমাবস্যা। কখনও কখনও প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী লেখক নিহত হন, নিগৃহীত হন সেই কৃষ্ণপক্ষে, কখনও কখনও লেখকের কলম ক্যাপবন্দি করে বসে থাকেন বছরের পর বছর, লিখলেও সেসব লেখা প্রকাশ করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেন না। গর্দান যাওয়ার ভয় সবসময় অস্তিত্বের ওপর ঝুঁকে থাকে লেখক তাঁর মনের মতো লেখা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। এই পরিস্থিতি যে-কোনো বিবেকমান লেখকের জন্য ভয়ঙ্কর। তাঁর শিল্পীসত্তা সর্বক্ষণ কুঁকড়ে থাকে, তাঁর সৃজনশীলতার উৎস যায় শুকিয়ে। ফ্যাসিবাদী এবং মৌলবাদীরা মুক্তচিন্তার বিপক্ষে। যেখানে মুক্তমনে চিন্তা করার সুযোগ নেই সেখানে শিল্প-সংস্কৃতি বদ্ধ ডোবায় নিমজ্জিত হতে বাধ্য। যদি কোনো দেশ শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হয় তাহলে সেদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, দিতে হবে তাদের নিজেদের মতো করে লেখার ও আঁকার স্বাধীনতা। তাদেরে দিকে সন্ত্রাসের ডালকুত্তা লেলিয়ে দিলে চলবে না।

## জসীমউদ্‌দীন

এমন এক সময়ে জসীমউদ্‌দীনের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, যখন বাংলা কবিতার ধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না এবং এই কবির কাব্যকৃতি বিষয়েও ছিলাম অচেতন। অনেক বছর আগে, এক খেলাছুট কৈশোরিক বিকেলে পাঠ্যপুস্তকে সঙ্কলিত একটি কবিতা পড়েছিলাম তন্ময় হয়ে। সেই কবিতায় এমন একজন স্মৃতি-ভারাতুর বৃদ্ধের কাহিনী বলা হয়েছে, যিনি অনেক কিছু হারিয়ে বহু স্বজনের বিচ্ছেদে দূর বনে নেমে-আসা সন্ধ্যার ঘন আবীরের রাগেরে মতোই লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছুক। কবর-দেশের আন্ধার ঘরে পথ খোঁজার জন্য ব্যাকুল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে একজন জীবন-চঞ্চল কিশোরের নিবিড় সংযোগ ঘটে গিয়েছিল তার অজান্তেই। সেই কিশোর কোনো এক ডালিম গাছের তলে তিরিশ বছর ধরে চোখের পানিতে ভিজিয়ে রাখা একটি পুরনো কবরের পাশে নিজেকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়েছিল। একজন কিশোরের মন নিমিষেই দখল করে নিয়েছিল সেই কবিতা : তার দুটি চোখ ভিজে উঠেছিল উজান-তলীর গাঁ, শাপলার হাট, একছড়া পুঁতির মালা, পরীর মতোন মেয়ে আর গোরের কাফনের কথা ভেবে। সেই কিশোর কবিতাটি বারবার আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছি। কবিতা আবৃত্তি করার সময় তার মনে হয়েছিল, যেন সে খেতের আলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে আর দূর থেকে ভেসে আসছে একতারার করুণ সুর। সেই সুর আজো ভেসে আসে কখনো-সখনো, বইয়ের পাতায় রাখা শুকনো ফুলের বিলীয়মান ঘ্রাণের মতো।

সেই কিশোর তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করেছে বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে, বাংলা কাব্যে জসীমউদ্‌দীনের অবদানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। আমাদের কাব্যসাহিত্যে যখন কাজী নজরুল ইসলামের মোহন দামামা বেড়ে উঠেছে দিগ্বিদিক তুমুল কাঁপিয়ে, যখন অধিকাংশ মুসলমান কবি সেই পরাক্রান্ত বাদ্যরবে আন্দোলিত, সম্মোহিত, নজরুল কাব্যরচনায় প্রলুব্ধ, তখন অদ্ভুত দু'জন কবি—জসীম-উদ্‌দীন এবং আবদুল কাদির অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। এজন্য নয় যে, নজরুল ইসলামের কাব্যের প্রতি তাঁদের অনুরাগ কম ছিল, নিজস্ব কাব্যসত্তার বিকাশের জন্যই তাঁরা অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। একজন গ্রামীণ জীবনের হাসি-কান্না বিজড়িত অসামান্য গাথা শোনালেন আমাদের, অন্যজন উপহার দিলেন মননসমৃদ্ধ পেশল পদাবলী। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রাম্যজন খুঁজে পেলেন তাঁদেরে নিজেদের জীবনকথা, প্রেম-প্রীতি, কলহ-মিলন, আশা-নৈরাশ ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যে কবি লেখেন—

> এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
> মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদেরে আলো—

কিংবা—

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়,
পদ্মা নদীর উজান বাঁকে ছোট্ট ডিঙি নায়।
পদ্মা নদী—কাটা বারি, চাককুতে যায় কাটা,
তারির পরে জেলের তরী করে উজান ভাঁটা।

কিংবা,

উজানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরী।

কিংবা—

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের
ওপারের বালুচরে,
এপারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে করে
বুঝি তাই মনে করে,
বাউল বাতাস টানাটানি করে তালুর আঁচল ধরে
কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মতো,
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত—

তাঁর কবিতা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করবে। 'কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মতো'—পঙ্‌ক্তিটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভাব এবং সুর—দু'দিক থেকেই পঙ্‌ক্তিটি ধনী। জীবনানন্দ দাশের সেই আশ্চর্য উপমাটি স্মরণ করুন :

বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন? পাখির নীড়ের
মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

আমি মনে করি, 'মুখখানি তার নতুন চরের মতো' আর 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' সমশ্রেণীর উপমা।

জসীমউদ্‌দীনের কবিত্ব শক্তি এমনই প্রবল যে, তার স্পর্শে সর্বদা পথে-ঘাটে দেখা নানা সামান্য বস্তু অসামান্য হয়ে ওঠে। আরো নতুন করে সেসব জিনিস দেখতে শিখি বলা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি গাথাকাব্য রচনা করে বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যের এক শূন্যতা পূরণ করেছেন স্মরণীয়ভাবে। এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ তো বটেই, আজ অব্দি শ্রেষ্ঠ রূপকারও। এ-দেশে ভবিষ্যতে যারা গাথাকাব্য কিংবা ইংরেজিতে যাকে বলে narative verse রচনায় হাত দেবেন, তাঁদের অবশ্যই মনোনিবেশ করতে হবে জসীম উদ্‌দীনের *নকসী কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট-এ।* কেননা, এই দুটি গাথাকাব্য রচনা করে জসীমউদ্‌দীন আমাদের কাব্যক্ষেত্রে সম্ভাবনার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছেন তা আজো বড় বেশি নির্জন।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। জসীমউদ্‌দীন একদা *নকসী কাঁথার মাঠ* এবং আরো চার-পাঁচটি খণ্ড কবিতায় যে অসাধারণ সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তা অতিক্রম করতে পারেন নি। *মাটির কান্না* নামক গ্রন্থে যেসব পদ্য রয়েছে তা আমার বিবেচনায়, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যপ্রতিভার যোগ্য নয়। নিজস্ব কাব্যচারিত্র্য বর্জন করলে একজন অসামান্য প্রতিভাবান কবিরও যে কী পরিমাণ স্খলন হতে পারে তার দলিল *মাটির কান্না।* তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছু ছাপিয়ে যা থাকে তা এতোই মূল্যবান ও সমৃদ্ধ যে, এই কবি বিষয়ে অন্য কোনো নালিশ স্তব্ধ হয়ে যায় নিমেষে।

# রূপনারাণের কূলে কিছুক্ষণ

সাহিত্যমেলা উপলক্ষে ১৯৫৩ সালে আমি শান্তিনিকেতনে যাই। সাহিত্যমেলার আয়োজন করেন বরেণ্য, বর্ষীয়ান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। সেবার শান্তিনিকেতনে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববাংলার কয়েকজন লেখক মিলিত হন। পশ্চিমবঙ্গের লেখকগণই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। সেই লেখকদের মধ্যে গোপাল হালদারও ছিলেন। গোপাল হালদারের নামের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম, তার উপন্যাস *একদা* এবং প্রবন্ধের বই *সংস্কৃতির রূপান্তর* আমার পড়া ছিল। একদা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম *সংস্কৃতির রূপান্তর* পাঠান্তে। সেই বইয়ে আলোচিত 'বাবু কালচার' এবং 'মিয়া কালচার' শব্দ ক'টি আমাদের মুখে মুখে ঘুরতো। সংস্কৃতি বিষয়ক তার যুক্তিনির্ভর, মননশীল রচনা আমাদের আন্দোলিত করেছিল সেকালে। *একদা* উপন্যাসের আঙ্গিকে অভিনবত্বের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস প্রমুখ ঔপন্যাসিক-প্রবর্তিত চৈতন্যপ্রবাহরীতির অনুসরণে গোপাল হালদার *একদা* রচনা করেন। এই রীতি তখন বাংলা সাহিত্যে ছিল খুবই নতুন। এদিক থেকে গোপাল হালদার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় এবং স্মরণীয়।

সত্যি কথা বলতে কি, শান্তিনিকতনে গোপাল হালদারকে দেখে হতাশ হয়েছিলাম। দেখতে আদৌ সুশ্রী নন, কণ্ঠস্বর বিরক্তিকর। গোপাল হালদার তার আত্মজীবনী *রূপনারাণের কূলে* গ্রন্থে লিখেছিলেন, "...আমি যখন জন্মালাম তখন পাড়ায় একটা ঘড়ি পাওয়া যায় নি। গ্রামবৃদ্ধরা সময় ঠিক করলেন — কতোক্ষণ আগে কোরাল পাখি ডাক দিয়েছিল।...বিধাতা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন কোকিলের কণ্ঠ আর ময়ূরের রূপ। তার চেষ্টা ব্যর্থ করে আমি পেয়েছি ময়ূরের কণ্ঠ আর কোকিলের রূপ। 'গডস দ্যাট ফেলড' আমার কাছে একটুও নতুন কথা নয়।" আশা করি, কাউকে বলে দিতে হবে না যে, ময়ূরের কণ্ঠস্বর মোটেই শ্রুতিমধুর নয়, বরং অতিশয় কর্কশ। গোপাল হালদার নিজের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর নিয়ে যে ঠাট্টা-তামাশা করেছেন তাতেই মানুষটির ব্যক্তিত্বের একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। কে পারেন নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে? যিনি রুচিবান, সুসভ্য, শুধু তিনিই পারেন নিজের সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করতে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ মেতে উঠতে। নিজেকে ঠাট্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার মতো লোক সমাজে কম এবং কম বলেই উল্লেখযোগ্য।

শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা খুব জমেছিল; কিন্তু গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার আলাপ জমে নি। আমার বয়স তখন কম, তাছাড়া আমি স্বল্পভাষী। গোপাল হালদারের মতো খ্যাতিমান লেখকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর মতো যোগ্যতাও আমার নেই। তাই তার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা বলে নিশ্চুপ থেকেছি। তিনিও বেশি কথা

বলেন নি। তবে তাঁর কথায় ছিল আন্তরিকতা। মনে হয়েছিল, বিন্দুমাত্র অহমিকা নেই তাঁর মধ্যে, তাঁর মতো বিদ্বান, বিখ্যাত লেখক আমার মতো এক তরুণ কবিকে, যার কোনো লেখাই হয়তো তিনি পড়েন নি, কোনোরকম পাত্তা না দিলেও কিছু বলার থাকতো না। যদিও আলাপ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, তবু তিনি যে আমাকে একজন আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি। বলা নিষ্প্রয়োজন, রক্তসম্পর্কিত নয় এই আত্মীয়তা। এরকম ব্যক্তিকে আত্মার আত্মীয় বলে ভাবতেও ভালো লাগে। প্রত্যেক দেশের লেখকই আমার আত্মার আত্মীয়। বিশেষ করে আমরা যারা একই ভাষায় কথা বলি, সাহিত্য রচনা করি তাদের মধ্যে এই আত্মীয়তা সূত্র আরো নিবিড়, গভীর এবং টেকসই। আমি কস্মিনকালেও অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, অরুণ মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সমরেশ বসু, দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে অনাত্মীয় ভাবতে পারবো না। আরো অনেককেই আমার আত্মার আত্মীয়, তাঁরা হয়তো জানেনও না।

আমার আত্মার আত্মীয় গোপাল হালদারকে দ্বিতীয়বার দেখি ঢাকায়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে। আমার সৌভাগ্য, টেলিভিশনে তার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আমার ওপর। সেই অনুষ্ঠান আমার একটি উজ্জ্বল এবং প্রিয় স্মৃতি। গোপাল হালদারের সাক্ষাৎকার নেয়া সহজ কথা নয়। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যখন আমাকে প্রস্তাব দিলেন, তখন আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম। পরে হাজি হলাম গোপাল হালদারের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা করার লোভে। তার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল আমার। তিনি এমনই অমায়িক এবং মৃদুভাষী যে, কঠিন কাজটি সহজ হয়ে গেল। সেকালে, মনে পড়ে, অনেকেই সাক্ষাৎকারটির তারিফ করেছিলেন। গোপাল হালদারও খুশি হয়েছিলেন আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কথা হয়েছিল। এই টেলিভিশন অনুষ্ঠানের কিছুদিন পর গোপাল হালদার বাংলাদেশের এক বন্ধুর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে বলেন, 'বন্ধুবর শামসুর রহমানের গুণে যতো স্বচ্ছন্দভাবেই আলাপ চলুক না কেন, বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে ওরকম আলাপের একটু ভাবনা ও দায়িত্ব চেতনা না থাকলেই নয়, ভাববার সময় ও প্রস্তুতি প্রয়োজন।' তিনি যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন সেভাবে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলতে পারেন নি বলে তার মনে বেশ খুঁতখুঁতানি ছিল। তার ফলেই বন্ধুকে চিঠি লিখে তার বক্তব্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। গোপাল হালদারের সেই চিঠি অধুনালুপ্ত *গণসাহিত্য পত্রিকায়* ছাপা হয়।

সেই চিঠির শেষ অংশে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের সৃষ্টিক্ষণ বাঙালি সন্তানেরা এই নদী-নালা-সমুদ্র-জঙ্গল-পাহাড়ময় বাংলাদেশের রূপকে তার পরিশ্রমী, দুর্ধর্ষ, সরল, সাধারণ মানুষ, বাংলাদেশের মাঝিমাল্লা, চাষী, জেলে, জাহাজি, এই সাধারণ মানুষের জীবন-সত্যকে সৃষ্টিতে রূপায়িত করবেন—বাংলাদেশের সংস্কৃতি তবেই সত্য হবে এবং বাঙালির সংস্কৃতি সম্পূর্ণ হবে।' গোপাল হালদার জীবিকার সুরাহার উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে এম এ পাস করেন। আসলে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমে পড়েছিলেন বলেই ইংরেজি

পড়েছিলেন। ইংরেজি পড়লে কী হবে বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী হন গোপাল হালদার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে গুরু মেনে তিনি লোক-শব্দ, লোককাহিনী নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গোপাল হালদারের ভাষায়, 'লোক-শব্দ, লোককাহিনী, আমাকে নিয়ে চলতো লোকজীবনের দিকে, শেষে সমাজতন্ত্রে।'

গোপাল হালদার ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট। আমৃত্যু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, আদর্শচ্যুত হন নি কখনো। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে,অনুমান করি, বিচলিত হয়েছেন কিন্তু কমিউনিজম পরিহার করেন নি অনেক গাফেলের তো। জেল খেটেছেন কয়েকবার। *দৈনিক স্বাধীনতা* ও *পরিচয়* মাসিক পত্রের সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন।

প্রায় বিশ বছর তিনি *পরিচয়*-এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে তার লেখকসত্তাই আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। তার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, *একদা, অন্যালি, আর একদিন, ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের বেলার* মতো উপন্যাস। তিনি *সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতির* মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য এবং রুশ সাহিত্যের ইতিহাস লিখে পাঠক সমাজকে তিনি আলোকিত করেছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনাতেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তার রম্য রচনা সংবলিত বইগুলোর নাম *বাজে কথা, স্বপ্ন ও সত্য, আড্ডা, বনচাঁড়ালের কড়চা।*

সর্বোপরি তার আত্মীজীবনী রূপনারাণের কূলে প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু, সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির অবশ্যপাঠ্য। গোপাল হালদারের মতো লেখককে,তার সমকালকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হলে *রূপনারাণের কূলে* আমাদের যেতেই হবে।

## পান্থজনের সখা

আমাদের দেশের তরুণ কবিদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে, এ কথা বলতে পেরে আনন্দবোধ করি। কারো কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড়। তাদের আমি পছন্দ করি, তারাও হয়তো আমাকে অপছন্দ করেন না। তরুণ কবিদের কথা মন দিয়ে শুনি, কখনও কখনও আমিও কিছু বলি। কবিতাসহ নানা বিষয়ে আমাদের আলাপ জমে ওঠে। লক্ষ করেছি, এই কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হয়। আমার এ রকম ধারণা হয়েছে যে, আমাদের তরুণ কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তেমন উৎসাহিত নন। কেউ কেউ আমার এই উক্তিকে খণ্ডন করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। তাদের ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরে নেবো।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তরুণ কবিদের—সকলের নয়—শীতলতার জন্য তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাই না। আমার বয়স যখন কম ছিল, তখন আমি নিজেও রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে ছিলাম নিস্পৃহ, উদাসীন। তখন মহত্তম বাঙালি কবির কবিতা ভালো করে পড়ে দেখার গরজ অনুভব করি নি। আধুনিকতার আকর্ষণে তিরিশের কবিদের কবিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম; দিনরাত, কখনও নীরবে, কখনও স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করেছি উত্তররৈবিক কবিতা। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও ছিলাম নিরুত্তাপ, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর কোনো কোনো কবিতা এবং বেশ কিছু গানের অনুরাগী হয়েছি।

তাই তরুণ কবিদের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অমনোযোগ নিয়ে নালিশ করার অধিকার আমার নেই। তবে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু কথা বলতে চাই। এই যে আমি তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ রচনাবলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি নি, এতে আমার ক্ষতির বোঝা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, তিলার্ধ্ব লাভও হয় নি। আমি রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যসম্ভার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম, এ-কথা বলা যাবে না। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা যতো এবং যেভাবে পড়া উচিত ছিল ততো ও সেভাবে পড়ি নি। রবীন্দ্রনাথের গান শোনার ব্যাপারেও ছিলাম অমনোযোগী। এখন সেই ক্ষতিপূরণ করতে যথাসাধ্য যত্নশীল হয়েছি। অথচ আমার সময় বড় কম। কোনো কোনো মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে ঝামেলাও বাড়তে থাকে। তবে এমন কিছু কাজ করতে হয় যা আদৌ সাহিত্যচর্চার অনুকূল নয়। এখন প্রায়শই মনে হয় এই লেখা কিংবা অমুক বইটি আগে কেন পড়ি নি। এমনতো নয় যে এই বই আমার কাছে ছিল না অথবা একটু উদ্যমী হলে যোগাড় করতে পারতাম না। মনের গহন-বিহারি কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে নিজেকে প্রশ্ন করি, এই গান আগে কেন শোনো কি মন?

আজও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের। আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা একটি কি দুটি চলনসই বই লিখেই

মনে করেন, বঙ্গ সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করা গেল। আমরা ভুলে যাই রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের বিরাট, নিরন্তর সাধনার কথা। একবার ভেবেও দেখি না, মর্মের ভেতর কী অসীম অতৃপ্তি নিয়ে প্রায় প্রতিদিন লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। যখন লেখনী তাঁকে জব্দ করেছে—সেরকম ঘটনা কমই ঘটেছে—তখন তিনি এঁকেছেন ছবি, করেছেন অন্য কোনো তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। মাঝে-মাঝে সবিস্ময়ে ভাবি, এতো লেখা তিনি লিখলেন কী করে? এতো সময় পেলেন কোথায়? লেখা ছাড়া অন্য কাজও তো তাঁকে করতে হয়েছে প্রচুর। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের মতো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন, সমবায় গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন সেকালে, পল্লী উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন; চিন্তা করেই ক্ষান্ত হন নি, কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থাও করেছেন। আজকাল আমরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কথা শুনি, আমাদের দেশেও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গঠনের কথাও ভেবেছিলেন। তাঁর বিপুল রচনাসম্ভারের দিকে তাকালে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটি মুহূর্তও বাজে খরচ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ভাবতে পারতেন, 'এবার সাঙ্গ হলো আমার লেখার কাজ।' কিন্তু, সেরকম কোনো ভাবনাকে তিনি আমল দেন নি। লিখে গেছেন সারাজীবন, মৃত্যুশয্যাতেও—অশক্ত তাঁর হাত, প্রায় নিঃশেষিত প্রাণশক্তি—উচ্চারণ করেছেন 'সম্মুখে শান্তির পারাবার'-এর মতো ধ্রুবপদ। বৃত্তাবদ্ধ হন নি কখনও, নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন আমৃত্যু—গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষ কাব্যগ্রন্থ অবধি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা এক হলেও, সেসব বই বিচিত্রধর্মী। এখানে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই, "আমরা বারেবারে বিস্মিত হই যখন দেখি তাঁর অধিকৃত ভূমি কী বিস্তীর্ণ, কতো ভিন্ন ভিন্ন সুরে ও স্বরে তিনি কথা বলতে পারেন, কী রকম দ্রুত পরিবর্তনশীল তাঁর ভাব ও ভঙ্গি। সহজেই আবিষ্কার করি ভিন্ন ভিন্ন ধরন, কবিতার বিষয়ে অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ধারণা। ...গ্যেটের মতো, রবীন্দ্রনাথও একজন নন, একশ' জন মানুষ আর তাঁর কাব্যে যিনি ধরা দেন তিনিও একজন নন, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন কবির সমাহার। কবিতার কাছে যা আমাদের ন্যূনতম প্রত্যাশা, শুধু সেটুকু মেটাতে তিনি আপত্তি করেন না; আবার তাঁর কবিতা আমাদের জন্য যা করতে পারে তার বেশি কোনো কবিতারই সাধ্য নেই। এবং দুই চরমের মধ্যবর্তী অনেকগুলো স্তরও তাঁর রচনায় প্রাপনীয়।" যেমন তিনি রচনা করেছেন *দুই বিঘা জমি* আর *পুরাতন ভৃত্য*-এর মতো ছন্দোবদ্ধ কাহিনী, তেমনি সৃষ্টি করেছেন *স্বপ্ন*, *দুঃসময়* এবং বলাকার মতো অতলস্পর্শী কবিতা। যিনি *বর্ষশেষ* লিখছেন তিনিই আবার শেষ জীবনে লিখেছেন নিরাভরণ কবিতা, যখন তাঁর গান ছেড়েছে সকল অলঙ্কার।

অনেক তরুণ কবি মনে করেন, অনুমান করি, অপ্রচলিত, কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করলে উৎকৃষ্ট আধুনিক কবিতার জন্ম হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ আমাদের অভিধানের পাতা ওল্টাতে বাধ্য করেন। চোখ, হাত, আলো, আঁধার, রৌদ্র, মেঘ, ছায়া, নদী ইত্যাদি চেনা শব্দ দিয়ে অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন কবিতা ও গানে। অচেনাকে চিনিয়ে এবং চেনাকে অচেনার রহস্যে আবৃত করে রবীন্দ্রনাথ পাঠককে পৌঁছিয়ে দেন কাব্যের

অমরাবতীতে, যেখানে প্রাসাদ এবং কুটিরের মর্যাদা সমান, যেখানে আকবর বাদশাহ এবং হরিপদ কেরানির সমান প্রবেশাধিকার রয়েছে। তাই, রবীন্দ্র কাব্যপাঠে অবহেলা, আশঙ্কা করা হয়, তরুণ কবিদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন নি; কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনাকে অশ্রদ্ধা করেছেন। গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ রবীন্দ্র রচনাবলী। রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ রাজের জুলুমবাজির প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে যেমন তাঁর প্রতিবাদী চেতনার নির্ভুল স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে বিক্ষুব্ধ, বেদনার্ত ঋষির মতো উচ্চারণ করেছেন সভ্যতার সঙ্কটের কথা, কিন্তু হতাশার অন্ধকার ছড়ান নি। তিনি বলেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। আশা করবো, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়দীপ্ত মনুষ্যত্ববোধ এই ইতর সময়ে আমাদের দাঁড়াতে সাহায্য করবে। পরাক্রমশালীর ক্ষমতালিপ্সা, অন্ধকারাচ্ছন্ন, মানবতাবিরোধী শক্তির আস্ফালনের বিরুদ্ধে। তাঁর নান্দনিক অবদান যেমন আমাদের সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করবে, সাহায্য করবে জীবনশিল্পী হয়ে উঠতে, তেমনি তাঁর শুভবাদী চেতনা আমাদের পরিচালিত করবে সত্য ও কল্যাণের পথে। প্রগতির পথেও তিনি সকল পান্থজনের সখা। এভাবেই তিনি চিরপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন আমাদের কাছে। রবীন্দ্রমানসে আমাদের বসবাস সুফলপ্রসূ না হয়ে পারে না, এই বিশ্বাস তরুণ কবিকর্মীদেরও হোক। তবে রবীন্দ্রনাথের বেসামাল স্তাবকবৃন্দ্য যে বিগ্রহটি নির্মাণ করেছেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে। আমাদের তৈরি করতে হবে নতুন পথ। আমাদের অভিযানে তিনি কেনো বৈরী শক্তি নন, বরং সহায়ক শক্তি।

## অসামান্য মানুষ : অরুণ মিত্র

আমরা যার কবিতা ভালোবাসি, কবিতাচর্চা করি তাদের কাছে একজন কবির মৃত্যু এক ধরনের শূন্যতা উপস্থিত হয় প্রবলভাবে। কবি অরুণ মিত্র তাঁর বহু অনুরক্ত ভক্তকে শোকার্ত করে, সেই শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে চোখ মুছেছেন চিরতরে। তিনি নেই, প্রকৃতির নানা রূপ দেখে আনন্দিত, আলোড়িত হওয়ার জন্য, মানুষের প্রাণচঞ্চল মেলা দেখে মুগ্ধ হওয়ার জন্য তিনি আর জীবিত নেই রৌদ্র জ্যোৎস্না ছায়াময় পৃথিবীতে—এই নির্মম সত্য মেনে নিতে কিছুতেই প্রস্তুত করতে পারছি না নিজেকে। তাঁর স্নেহধন্য আমি কী করে স্বীকার করে নেবো এই জীবনপ্রেমী, বাংলা কাব্যে অন্যতম প্রধান পুরুষের অনুপস্থিতি? তিনি আর কোনোদিন তরতাজা, তাৎপর্যময় কবিতা লিখবেন না—এ কথা ভাবলেও বেদনার্ত হয়ে পড়ি। আশি পেরিয়েও যিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন অবিরত কাব্যগ্রন্থের পর কাব্যগ্রন্থ, যিনি নব্বই পেরিয়েও কবিতার অম্লান কুসুম ঝরিয়ে দিয়েছেন অকাতরে, যিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ছিলেন সৃষ্টিমুখর, তাঁর শারীরিক লুপ্তি কি সহনীয় হতে পারে কবিতার সৎ পাঠকদের কাছে? পারে না। তবু তাঁর তিরোধানের বেদনা আমাদের সইতে হবে, নতুন করে মনোযোগী হতে হবে কবি অরুণ মিত্রের অরুণাভ কাব্যফসলের প্রতি।

কবে প্রথম পড়ি অরুণ মিত্রের কবিতা? সেতো আজকের কথা নয়। অনেক বছর আগে আবু মীয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* সঙ্কলনগ্রন্থে। সেই সঙ্কলনগ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সেই গ্রন্থ সারস্বত সমাজ এবং কবিতা পাঠকদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। কাব্যসঙ্কলনটিতে অরুণ মিত্রের দুটি কবিতা ছিল। কবিতা দুটির শিরোনাম ছিল, যতোদূর মনে পড়ে, *প্রাচীরপত্রে পড়েনি ইস্তাহার?* এবং *কসাকের ডাক।* প্রথম কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি—

প্রাচীরপত্রে পড়েনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো?

পঙ্‌ক্তি তিনটি ছন্দের দোলা এবং হল্‌কায় ও ঝল্‌সাবে শব্দ দুটির হলো ঝল্‌-এর মিলন চিত্তকে আন্দোলিত করেছিল বলে এতোকাল পরেও বিস্মৃত হই নি। অরুণ মিত্রের বলার কথাগুলো ভালো লেগেছিল সেকালে। তাঁর *প্রান্তরেখা* বইটি আমি কোনোদিন পড়ি নি। তবে বেশ পরে তাঁর অনেকগুলো কবিতার বই আমি পড়েছি, পড়ে উঁচুদরের কবিতার স্বাদ পেয়েছি। কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম সুশৃঙ্খলভাবে লিখতে পারবো না, এলোমেলোভাবে বলতে হবে, কিছু নাম বাদও পড়তে পারে, কারণ অনেক বই-ই এখন আমার কাছে নেই। এই মুহূর্তে বলতে পারি *মঞ্চের বাইরে মাটিতে; শুধু রাতের শব্দ*

*নয়; উৎসের দিকে; প্রথম পলি, শেষ পাথর; বুলার রাগমালা; এই অমৃত এই গরল, খুঁজতে খুজতে এত দূর; খরাউর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি; অন্ধকার যতোক্ষণ জেগে থাকে;* ক'মাস আগে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে উচ্ছন্ন সময়ের সুখদুঃখ ঘিরে। সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় কবি অরুণ মিত্রের 'কবিতার ফোয়ারা দেখে মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয় যে, বড় জাতের কবিদের বয়স কখনও ছুঁতে পারে না।' এই উক্তি ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছিল অরুণ মিত্রের বয়স যখন সাতাত্তর। এমনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ এবং প্রগতিশীল, সাম্যবাদে বিশ্বাসে সমর্পিত, জীবনবাদী কবি।

সাতাত্তর বছর বয়সেও তাঁর মেধা এবং হাতের সংযোগ 'কবিতার ফোয়ারা' ছিল মুখর, নব্বই পেরিয়েও অরুণ মিত্র অবিরাম সৃষ্টি করে গেছেন কবিতা। বয়স তাঁর মনের তারুণ্য এবং লেখনীর দীপ্তি হরণ করতে পারে নি। তাই ভাবতে প্রলুব্ধ হচ্ছি এখনও হয়তো কবির দেরাজে-রাখা খাতায় রয়ে গেছে অনেক কবিতা, যেগুলো এখনও রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়। কে জানে!

আমি শুধু অরুণ মিত্রের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি, বলি নি তাঁর লেখা একমাত্র উপন্যাসের কথা। বলি নি অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের নাম। সেসব বই উপেক্ষিত হতে পারে না কোনো মমনশীল পাঠকের কাছে। অনেক গভীর কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ফরাসি কবিতার হৃদয়গ্রাহী উৎকৃষ্ট অনুবাদ পেয়েছি তাঁর প্রতিভার কল্যাণে। ফরাসি কবিতার অনুবাদ গ্রন্থটির নাম *অন্যস্বর।* আমার বিবেচনায়, ফরাসি কবিতার গুণগ্রাহী প্রত্যেক কবি এবং পাঠকের অবশ্যপাঠ্য এই বই।

আমরা জানি, ফরাসি লেখক ভিক্টর ইয়োগর একটি উপন্যাস পড়ার পর তিনি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ফরাসি শেখার অদম্য আগ্রহ তাঁকে সেই ভাষার প্রেমিকে রূপান্তরিত করে। ফরাসি কবি এবং লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলি মূল ভাষায় পাঠের আনন্দ তাঁর জন্য অশেষ উপকারী প্রমাণিত হয়। স্কলারশিপ পেয়ে তিনি ফ্রান্সে যান ফরাসি ভাষা ভালোভাবে শেখার জন্য, সেখানকার সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার উদ্দেশ্যে। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে পি এইচ ডি অর্জন করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসির অধ্যাপক হন। অবশ্য কর্মজীবন তিনি শুরু করেছিলেন একজন সাংবাদিক হিসেবে। প্রথমে *আনন্দবাজার* পত্রিকা এবং পরে *অরণি* পত্রিকা তাঁর কর্মস্থল হয়। কিন্তু এই দুই পত্রিকার কোনেটিতেই তাঁর চাকরি তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আসলে কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তিকে চাকরির দাঁড়িপাল্লায় মাপা সমীচীন নয়।

অরুণ মিত্র একজন অসামান্য গুণী এবং সত্যিকাবের ভালো মানুষ, ছিলেন, যাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে হয়। তাঁর স্নেহ লাভ করার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তিনি স্নেহার্দ্র হৃদয়ে আমাকে তাঁর কয়েকটি বই উপহার দিয়েছেন, যেগুলো আমি পড়ে উপকৃত হয়েছি, আমার সংগ্রহে সযত্নে রেখে ধন্য হয়েছি।

একটি বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গেছি, ফরাসি কাব্যের সঙ্গে অরুণ মিত্রের অন্তরঙ্গতার ফলে তাঁর নিজের কবিতার রূপ এবং চরিত্র বদলে গিয়েছিল অনেকখানি।

এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা কবিতায় শুধু নতুন ধরনই নয়, যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা এবং সমৃদ্ধি। অরুণ মিত্রের এই অবদান কবিতাপ্রেমীরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন বহুকাল।

এই সামান্য নিবন্ধ রচনার কালে মনে হচ্ছে এই তো তিনি আমার ছোট ঘরে বসে কথা বলছেন, মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কী চমৎকার আবৃত্তি করছেন নিজের কবিতা, হেঁটে চলেছেন কলকাতার পথে, তার কন্যার ফ্ল্যাটে একটি নির্জন ঘরে কোনো ফরাসি কাব্যসঙ্কলন নিবিষ্টচিত্তে, তরুণ কবিদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন ড্রইংরুমে, মুখে সেই অপরূপ স্নিগ্ধ হাসির অরুণাভা। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছি কবির দিকে আর তিনি বলছেন, 'আমি আছি, আমি থাকবো।'

## কামরুল হাসান : তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য

কামরুল হাসানকে দেখার অনেক আগেই তাঁর নাম শুনেছিলাম। তিনি ছবি আঁকেন, মেতে থাকেন ব্রতচারীতে, শিশু-কিশোরদের মন কাড়েন মুকুল ফৌজের কর্ণধার হিসেবে। তিনি মস্ত ব্যায়ামবীরও একজন। তাঁর গলায় মেডেল-টেডেল নাকি ঝুলেছে ব্যায়ামের দৌলতে। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম মানুষটির কথা। ছেলেবেলা থেকেই ফৌজি ব্যাপারে আমার তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না, যদিও আব্বা কলকাতা থেকে পুতুল-সৈনিক এনে দিয়েছিলেন একটি কি দুটি। মুকুল ফৌজ নামটি কখনো কখনো আমাকে চঞ্চল করলেও, এতো চাঞ্চল্য আমার মধ্যে কখনো সঞ্চারিত হয় নি যে আমি সেই প্রতিষ্ঠানটির সদস্য হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবো। এমনকি মুকুলের মহফিলও কখনো তেমন টানে নি আমাকে। আর যেহেতু আমি বরাবরই একটু অলস প্রকৃতির এবং দেহের চাইতে মনোজগতের প্রতি বেশি উৎসুক, তাই শরীরচর্চা আমার কাছে ছিল বিড়ম্বনার নামান্তর। এই ধারণার খেসারত অবশ্য আমাকে এখন পদে পদে দিতেহচ্ছে। একজন শিল্পী—তিনি কবিই হন কিংবা চিত্রকই হন—পেশি ফুলিয়ে, সাধারণ্যে স্বাস্থ্যাঢ্য শরীরের বাহার দেখিয়ে ব্যায়ামবীর হবেন, ভাবলেই আমার মন কেমন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। তাই চিত্রকর কামরুল হাসান এবং ব্যায়ামবীর কামরুল হাসান— এই দু'জনকে আমি কখনোও সহজ মনে মেলাতে পারতাম না। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এমন একসময় ছিল যখন কামরুলের পেশিপ্রকট ফটোগ্রাফ দেখতাম পত্রপত্রিকায়, তখন তাঁর ছবিও তেমন ভালো লাগতো না আর। কামরুল হাসানের ব্যায়ামবীরের খেতাব এক রোগাপটকা সদ্য যুবককে তাঁর ছবি উপভোগের ব্যাপারে প্রতিহত করতো। আজ বুঝি, কী অযৌক্তিক ও অপরিণত সেই *মনোভঙ্গি। সুখের বিষয়, আমার এই মনোভঙ্গি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।*

সত্যি কথা বলতে কি, চিত্রকলার সমঝদার হিসেবে আমি কল্কে পাবো না কোনো আসরে। তা নিয়ে আক্ষেপ করি না; কারণ, চিত্রকলা বুঝি, এমন দাবি আর দশজনের কাছে তো দূরস্থান, নিজের কাছেও করি নি কস্মিনকালেও। অনেক আগেই উপলব্ধি করেছি, চিত্রকলা বিষয়ক একটি কি দুটি বই পড়ে কিংবা কিছু খুচরো খবুরে কাগজে নিবন্ধ পড়ে চিত্রকলার সমঝদার হওয়া যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে, শোনার মতো কান থাকলে যেমন পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কিংবা রাজ্যেশ্বর মিত্রের গ্রন্থ পাঠ না করেও ধ্রুপদী সঙ্গীতের রস উপভোগ করা সম্ভব তেমনি সম্ভব চিত্রকলার ব্যাকরণ এবং তত্ত্বের কূটকচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েও চিত্রকলা উপভোগ করা। চিত্রকলার ইতিহাস, রঙের অলৌকিক ব্যাকরণ, নানা তথ্য ও তত্ত্ব, শিল্পীদের স্টুডিওর খবর ইত্যাদি জানা থাকলে চিত্র-উপভোগ যে আরো বেশি অর্থবহ ও গভীর হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই। যা হোক, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কামরুল হাসানের ছবি বুঝি আর

না-ই বুঝি, তাঁর চিত্রকলা আমাকে মুগ্ধ করে, সমৃদ্ধ করে প্রকৃত সমঝদারের ভালো-লাগা আর আমার মতো আদ্‌না ছবি দেখিয়ে-এর ভালো লাগার মধ্যে স্তর ও মাত্রার তারতম্য থাকতে বাধ্য, তবে আমার এই ভালো-লাগা, অন্তত আমার কাছে, কিছু কম নয়। কামরুল হাসানের *তিন কন্যা* ছবিটি, যা বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ নিসর্গ ও নারীর রূপময় প্রকাশ, প্রায় জীবনানন্দীয় জগতের উদ্ভাসন, টেকনিকের চমৎকারিত্ব, অনবদ্য বর্ণ-বিভাজন ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে যদি কোনো সাধারণ দর্শকের অন্তরে পথ কেটে নেয়, তাহলে তাকে উপেক্ষা করবে কে?

আমরা অনেকেই ছেলেবেলায় স্লেটে হাত রেখে হস্তচ্ছাপ আঁকা মক্‌শো করেছি, কামরুল হাসানও করেছেন। কিন্তু আমরা কেউ কামরুল হাসান হতে পারি নি। কী করে চিত্রকর হলেন কামরুল হাসান? এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা জবরদস্ত মওলানা; ছবি আঁকা তো বটেই রেডিওতে কান পাতাও ছিল হারাম। কিন্তু নিয়তির এমনই প্রখর কৌতুকবোধ যে, শিল্পী হিসেবে কামরুল হাসানের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর আরবি এমে হাসিল-করা জনকের কাছেই। তিনি একদিন খেলাচ্ছলে পুত্রের ছোট হাতটি কাগজে রেখে কী করে হাতের ছাপ আঁকতে হয় সেই টেকনিকের তালিম দিয়ে ফেললেন এক কৌতূহলী শিশুকে এবং এভাবেই শিশু কামরুল হাসান রঙ ও রেখার মোহন খেলায় মেতে উঠলেন। প্রৌঢ় মওলানা নিজে না জেনে আত্মজনের সামনে উন্মোচন করলেন এক করুণ রঙিন পথ, তার কপালে এঁকে দিলেন অমরত্বের জয়টিকা।

সেই যে বালক-বয়সে হাতে তুলি তুলে নিলেন কামরুল হাসান সেই তুলি আজও ছাড়েন নি তিনি; কিংবা বলা যায় তুলি তাঁকে ত্যাগ করে যায় নি ক্ষণকালের জন্য। তিনি নিজেকে শিল্পী হিসেবে তৈরি করেছেন প্রতিটি মুহূর্তে, অসাধারণ ধৈর্য ও শ্রম দিয়ে সর্বক্ষণ প্রস্তুত রখেছেন ক্ষেত্র, যাতে কখনো ব্যর্থ না হয় ফসলের মরশুম। নানা কাজে, কোনো কোনো কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জাতীয় জীবনের পটভূমিতে, তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে; কিন্তু তাঁর আসল কাজ ছবি আঁকাকে তিনি কোনোদিনই অবহেলা করেন নি। ক্রমাগত এঁকে গেছেন প্রায় প্রতিদিন, আজও তাঁর তুলি ও রঙ নিয়ে বসা চাই রোজ। কেননা তিনি জানেন, শিল্পকলাকে অর্পণ করতে হয় নিজের আয়ুষ্কাল। ক্ষণিকের উপেক্ষাও সহ্য করেন না পটের বিবি। তার প্রতি অমনোযোগী হলে শুধু রঙের বাটিই শুকিয়ে যায় নাই, শিল্পীর মনেও চড়া পড়ে, শিল্পরসের ধারা পথ হারায় রুক্ষ বালিতে। কামরুল হাসান তাঁর বিখ্যাত খেরো খাতার একটি পাতায় ১৯৭৮ সালে লিখেছেন — "আমার ছবি আঁকার প্রবল ইচ্ছাই আমার অভিসারিকা। অভিসার মানেই তো বিশেষ প্রসাধন এবং বিশেষ প্রসাধন মানেই শিল্প এবং শিল্প মানেই চিত্র... ।" এই ছবি আঁকার প্রবল ইচ্ছাই তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নেয় সংখ্যাহীন বিভিন্ন মাপের স্কেচ, বেশুমার প্যাস্টেল, জলরঙের ছবি আর তৈল চিত্র। ক্লান্তি তাঁকে কাবু করতে পারে না, কোনো ব্যক্তিগত অভাব কিংবা ক্ষোভ তাঁকে সরিয়ে আনতে পারে না শিল্পসাধনার পথ থেকে। দেশের দুর্গতি ও দশের দুর্দশা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করে, কখনো-কখনো স্তম্ভিতও করে কিন্তু স্তব্ধ করে না কখনো। প্রগতিশীল ও কল্যাণমুখী রাজনীতির বিপর্যয়ে তিনি মর্মাহত হন, কিন্তু প্রেরণা-রহিত থাকেন না, বরং তিনি তখন অধিক ঝলসে ওঠেন শিল্পীর

ভূমিকায়। এটা হতে পেরেছে তাঁর অসামান্য সংবেদনশীলতা ও তারুণ্যের জন্য। শারীরিক অর্থে তাঁর ঈর্ষণীয় স্বাস্থ্য সত্ত্বেও কামরুল হাসানকে তরুণ বলে চিহ্নিত করা যাবে না; কিন্তু মানসিকভাবে তারুণ্যে তিনি তরুণদেরও হার মানান। এখানে বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি, পাবলো পিকাসোর সঙ্গে তাঁর কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। জীবনের বাটি দশটি প্রবল ব্যগ্র আঙুলে ধরে রাখতে চান কামরুল হাসান, পিকাসোর মতোই জীবনের প্রতিটি প্রহর ভরিয়ে রাখতে চান নিজস্ব শিল্পসৃষ্টিতে। পিকাসো যেমন নানা বাতিল, তুচ্ছ বস্তুকে অসামান্য শিল্পে রূপান্তরিত করতেন, অবনীন্দ্রনাথ যেমন খড়কুটো, ছোট ছোট শুকনো ডাল দিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর কাটুম-কুটুম-এর জগৎ, কামরুল হাসনের তুলির স্পর্শেও তেমনি শিল্পসুষমা পেয়ে যায় ফেলে-দেয়া খালি সিগারেটের প্যাকেট কিংবা এক টুকরো কাগজ।

এই শিল্পী মানুষটির কাছে গেলে সত্যিকারের একজন বাঙালির উজ্জ্বল উপস্থিতি টের পাই। হ্যাঁ, কামরুল হাসান মনে-প্রাণে বাঙালি। শুধু বাঙালির ঘরে জন্মালেই কেউ কিছু খাঁটি বাঙালি হয়ে যায় না। প্রকৃত বাঙালিত্ব অর্জন করে নিতে হয়, যেমন নিয়েছেন চিত্রকর কামরুল হাসান। এ-ব্যাপারে তিনি দীক্ষা লাভ করেন তাঁর গুরু ব্রতচারীব্রতী, লোকজ শিল্পসংগ্রহকারী শ্রী গুরুসদয় দত্তের কাছে। বিখ্যাত পণ্ডিত ও কলারসিক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর মতে বৈচিত্র্যের দিক থেকে গুরসদয় দত্তের লোকশিল্পের সংগ্রহটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই সংগ্রহশালা দেখে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ লোকশিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্যের পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর ভূমিকা কেবল এতেই সীমিত নয়, শাহেদ সোহরাওয়ার্দী জানাচ্ছেন, 'এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের শিক্ষিতজনদের দৃষ্টিগোচরে আনা ছাড়াও তিনি, যে-বাঙালি শিল্পধারা, যা প্রাথমিক সাফল্যের পর কল্পনাহীনতা ও একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে, তাতে শক্ত নাড়া দেয়ার জন্যও আমাদের ধন্যবাদার্হ।' এমন একজন গুরুর কাছে কামরুল হাসান শুধু ব্রতচারী নৃত্যই শেখেন নি, প্রকৃত বাঙালিত্বের পাঠও নিয়েছিলেন এবং তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই তিনি লোকজ শিল্প ও পটুয়াদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

লোকজ শিল্পের সঙ্গে কামরুল হাসানের ঘনিষ্ঠতা তাঁর শিল্পকর্মের পক্ষে উপকারী হয়েছে, এ-কথা যে-কোনো শিল্পসমালোচক স্বীকার করবেন। আর এ-কথা হয়তো খোদ কামরুল হাসানও কবুল করবেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন শিল্পী যামিনী রায়। অবশ্য কামরুল হাসান দাবি করেন, যামিনী রায়ের যেখানে শেষ, সেখানেই তাঁর শুরু। সত্য, যদি তিনি যামিনী রায় ও পটুয়াদের মাছিমারা অনুসরণ করতেন তাহলে আজ আর এই নিবন্ধ রচনার প্রয়োজন হতো না। তিনি একজন পরিণামহীন, অত্যন্ত গৌণ কারুকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর চৈতন্যজাগর অন্বেষা ও অক্লান্ত সাধনায় জগদ্বিখ্যাত যামিনী রায় ও অখ্যাত পটুয়াদের কাজ আত্মীকরণের মাধ্যমে কিউবিস্ট শিল্পরীতির মিশেল দিয়ে একটি নিজস্ব অঙ্কনরীতি উদ্ভাবন করেছেন। কিউবিস্ট শিল্পরীতির কথাটি বলে ফেলে একটু থমকে বসতে হলো আমাকে। কামরুল হাসানের চিত্রের কৌণিকতা কি তিনি শখের হাঁড়ি থেকে নেন নি?

বিস্ময়কর তাঁর সৃজনশীলতা; শেষ পর্যন্ত তাঁর চিত্রকর্মে সবকিছু ছাপিয়ে জেগে থাকেন সময়হীনতায় ধ্যানী এক শিল্পী, কামরুল হাসান যাঁর নাম। তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও অজস্রতা, সংশয়াতীতভাবে তাঁকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের শিরোপা দিয়েছে। না, আমি জয়নুল আবেদিনের কথা বিস্মৃত হই নি। জয়নুল আবেদিন নিঃসন্দেহে অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী, প্রায় বেনজির তাঁর ব্রাশের কাজ। তবু বলবো, তাঁর মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা ছিলতা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বিকশিত হতে পারে নি। তিনি মহত্ত্বের চূড়া স্পর্শ করার আগেই লোকান্তরিত হয়েছেন। মহত্ত্বের চূড়া স্পর্শ করেছেন বৈচিত্র্যবিলাসী, সর্বদা অন্বেষাপ্রবণ কামরুল হাসান। কেউ কেউ কণ্ঠস্বরে অভিযোগ খেলিয়ে বলতে পারেন, কামরুল হাসান পুনরাবৃত্তির জালে আটকা পড়েছেন, আত্মানুকরণের আভাস দেখা যাচ্ছে তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি সচেতন শিল্পী; হয়তো তাই ইতোমধ্যেই তিনি বাঁক ঘোরার চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন, উপস্থিত ফর্ম ভেঙে অন্য ফর্ম খুঁজছেন, আয়ত্তে আনতে উদ্যমশীল হচ্ছেন ভিন্ন সিদ্ধি। আমরা কি এই মহৎ শিল্পীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছি? বরং তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে কিছু বিবেকরহিত লোকের কাছে। তাঁর বাসগৃহে হামলা চালানো হয়েছে, ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তাঁর শিল্পিত ক্যানভাস। কিন্তু জেদি এই শিল্পী সেই আহত ক্যানভাসকেই শিল্পের শুশ্রূষায় স্মরণীয় করে রাখলেন। এবং আমার বিশ্বাস, সেই মুহূর্তে কামরুল হাসানের ঠোঁটে ঝিকিয়ে উঠেছিল সেই বিখ্যাত হাসি, যে হাসিতে আছে শিশুর নিষ্কলুষতা, প্রাজ্ঞের ক্ষমাশীলতা ও শিল্পীর একাগ্রতা। শুধু সেই হাসি দেখার জন্যই তাঁর কাছে বারবার যেতে ইচ্ছে হয়। যদি কেউ কখনো তাঁর বাসস্থানে, শিল্পালয়ে যান, তাহলে তিনি, আশা করি, তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। তাঁর চিত্রমালা, স্কেচবুকসমুদয় এবং খেরো খাতাগুলো দেখতে পাওয়া পুণ্য সঞ্চয়েরই সামিল। আমি বারবার যেতে চাই সেই তীর্থস্থানে। দুঃখের বিষয় সবসময় যাওয়া হয়ে ওঠে না। অনেক তুচ্ছতার আগাছায় ভরে ওঠে আমাদের জীবন-উদ্যান। বুঝি তাই প্রকৃত ফুলের ফুটে-ওঠা এতো কম।

## 'কংকাল'-এর কবির স্মৃতির উদ্দেশে

কংকাল-এর কবি আশরাফ আলী খান সম্পর্কে দু'তিনবার উল্লেখ করেছি। আমি তাঁর লেখা পড়তে উদ্‌গ্রীব ছিলাম। বহু বছর আগে তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি, মাত্র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, আমার চোখে পড়েছিল। তা ছাড়া জানতে পেরেছিলাম যে, এই ক্ষীণায়ু কবি, মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অভাবের তাড়নায়, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর আত্মহনন তাঁকে আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। তাঁর কবিতার বই পড়ার অভিলাষে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সফল হই নি। বোধহয় ঠিক জায়গায় সন্ধান করি নি। কিছুদিন আগে আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে খুলনার একজন সাহিত্যানুরাগী চিকিৎসক, যিনি নিজেও লেখালেখি করেন, আমার ঠিকানায় *কংকাল* কাব্যগ্রন্থের একটি কপি পাঠিয়ে দেন।

এর পরপরই বাংলা একাডেমির শামসুজ্জামান খান আমাকে আশরাফ আলী খান বিষয়ে একটি বই উপহার দেন। বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত। লিখেছেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। এই বইয়ে আশরাফ আলী খানের জীবনকথা এবং কিছু রচনা-নিদর্শন আছে। বইটি পড়ে *কংকাল*-এর কবি সম্পর্কে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই সামান্য খবরটুকুও ছিল আমার অজানা। প্রাক্তন যশোর অর্থাৎ বর্তমান ফরিদপুর জোর আলফাডাঙ্গার পানাইল গ্রামে ১৯০১ সালে আশরাফ আলী খান জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হয়। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন তেজী, কর্মচঞ্চল পুরুষ হয়ে উঠবেন তাব প্রমাণ তিনি গ্রাম্য পাঠশালাতেই দিয়েছিলেন পণ্ডিত মশাইদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে। পাঠশালার ছাত্র হিসেবেই বালক আশরাফ অন্য ছাত্রদের নিয়ে সমাজসেবার কাজে লেগে যান। এটা সামান্য ব্যাপার নয়। আমৃত্যু তিনি সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করতে কেনোদিন পিছপা হন নি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এ ক্লাসে দাখিল হন। তখন খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। আশরাফ আলী খান জড়িয়ে পড়েন সেই আন্দোলনে। আন্দোলনের খরস্রোত তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল বিদ্যাপীঠ থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় ছেদ পড়ল সেখানেই।

আন্দোলনে ভাটা পড়ার ফলে আশরাফ আলী খানকে পা রাখতে হলো চাকরি ক্ষেত্রে। ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কেরানির চাকরি জুটে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে; কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকেন নি। সাংবাদিক এবং লেখক হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন *বেদুইন* পত্রিকায় ১৯২৭ সালে। সরকারি চাকরি করে পত্রিকা চালানো সম্ভব নয় মনে করে তিনি ইনকাম ট্যাক্স অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দেন। নিশ্চিত উপার্জনের এলাকা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে আলিঙ্গান করলেন অনিশ্চয়তাকে। *বেদুইন* বন্ধ

হয়ে গেল। আশরাফ আলী খান *দৈনিক সোলতান-এ* কর্মরত হলেন। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে আত্মগোপন করলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন তবে যাওয়ার আগে *দৈনিক সোলতান-এ পলাতকের পত্র* নামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। তিনি কি তখনকার মুসলমান লেখকদের ঝগড়া-ঝাঁটিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কলকাতা শহর থেকে দূরে সরে যান? হতে পারে। তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে এটা খুবই সম্ভব? কোনোরকম ক্ষুদ্রতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আকস্মিকতা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি কোনোদিন বিয়ে করবেন, একথা তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা ভাবতে পারেন নি। কারণ যখনই কেউ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তা খারিজ করে দিয়েছেন। বহু বিত্তবান পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও তিনি কোনো আমল দেন নি। আর তিনিই হঠাৎ একদিন তিন সন্তানের জননী, এক বিধবা আত্মীয়াকে শাদি করে বসলেন। সেই বিধবা সন্তানদের নিয়ে ভুখা থাকতেন প্রায়শ। বিধবা আত্মীয়াকে অনাহার এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁকে নিজের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বরণ করে নেন। কিছুদিন ভালোই চললো; কিন্তু আশরাফ আলী খান নিজের এবং পরিবারের অভাব হরণ করতে ব্যর্থ হন। তাঁর দুঃখ-কষ্ট ক্রমশ বাড়তে থাকে, শুরু হয় অনাহারের পালা। তারপর একদিন ১৯৩৯ সালে ইট-পাথরের পাষাণ-হৃদয় কলকাতা শহরে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন *কংকাল*-এর কবি। জীবন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে ঠেলে দিলো কলকাতার গোবরা গোরস্তানে।

খ্যাতিমান সাংবাদিক মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, 'কবি আশরাফ আলী ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কলকাতার মুসলিম সাহিত্যিক মহল বিস্ময়ে ও ক্ষোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কবি আশরাফ আলী ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। নিজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা অপরকে জানাতে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। কয়েকদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর তিনি আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার পূর্বে তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সাথেই দেখা করেন। কিন্তু কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেন নি তাঁর সঙ্কল্পের কথা। *আজাদ* অফিসে গিয়ে তিনি আমার সাথে দেখা করেছিলেন এবং নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। আমি তখন কল্পনাও করতে পারি নি যে তিনি কয়েকদিনের অনাহারী। আমি তাঁকে এক কাপ চা খাইয়েছিলাম মাত্র। বিদায় নেয়ার সময় তিনি হঠাৎ একবার বলেছিলেন; 'বহু দোষ-ত্রুটি হয়েছে, মাফ করবেন।' আমি অবশ্য বেশ একটুখানি বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যে একেবারে শেষ বিদায় নিচ্ছেন এটা ধারণা করতে পারি নি। পরদিন কাগজে তাঁর আত্মহত্যার সংবাদ জেনে ক্ষোভে-দুঃখে একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। কেন তিনি তাঁর অনাহারের কথা জানালেন না, আমিই-বা কেন তাঁকে মাত্র এক কাপ চা খাওয়ালাম, এই শ্রেণীর নানা চিন্তায় আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন এই চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারি নি।

'আশরাফ আলী শুধু সুকবি ছিলেন না, তেজস্বী ব্যক্তিত্বশালী পুরুষও ছিলেন। সাহিত্য, সমাজ ও দেশ নিয়ে তাঁর চিন্তার ছিল বেশ কিছু অভিনবত্ব। তাঁর অকালপ্রয়াণে শুধু সাহিত্যের নয়, দেশেরও ক্ষতি হয়েছে।'

ভাবতে অবাক লাগে, একজন মানুষ কয়েকদিনের অনাহারী, অথচ তাঁর পরিচিতদের কেউই তা জানতে পারেন নি। মৃত্যুর আগে অনেকের সঙ্গেই তিনি দেখা করেছিলেন। অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখলে কি টের পাওয়া যায় না? না কি চারপাশের লোকজন নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত থাকেন সর্বক্ষণ যে কয়েকদিনের অনাহারীর মুখ দেখে শনাক্ত করার বোধ পর্যন্ত খুইয়ে বসেন। হায় অনুভূতিহীন মানুষ, হায় হৃদয়হীন সমাজ।

এবার আশরাফ আলী খানের *কংকাল* আদ্যোপান্ত পড়লাম প্রথমবারের মতো। কবুল করছি, আমার তেমন ভালো লাগেনি। অনেক আগে তাঁর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, সেই মুগ্ধতাবোধে ফিরিয়ে আনতে পারে নি *কংকাল*। হয়তো এটা আমারই সীমাবদ্ধতা, হয়তো ইতোমধ্যে আমার কাব্যরুচি অনেকখানি পাল্টে গেছে বলেই *কংকাল* নান্দনিকভাবে আমাকে তৃপ্ত করতে ব্যর্থ হলো। তবে সেই সময়কার নজরুলী কাব্য পরিমণ্ডলের কথা বিবেচনা করলে, আশরাফ আলী খানের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে বই কি। *কংকাল*-এর কবির ছন্দোবোধে এবং সমাজসচেতনতা প্রশংসনীয়। ইকবালের *শেকোয়া* কাব্যের বাংলায় অনুবাদ সর্বপ্রথম করেছিলেন আশরাফ আলী খান। সমঝদারদের মতে, তাঁর অনুবাদই এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ। এই প্রজন্মের পাঠকদের অনেকেই আশরাফ আলী খানের নাম শোনেন নি বললে, আশা করি, ভুল বলা হবে না। আমি তরুণ পাঠকদের জন্য *কংকাল* থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি—

> নাহি এ জগতে গরীবের ঠাঁই, ধনীই রহিবে বিশ্বে
> বিধাতা সে যে গো ধনীর গোলাম—চাহে না কাঙাল নিঃস্বে।
> শাস্ত্র-মজুর মোল্লা-পুরুত নীতিবাগীশের দল,
> 'আত্মহত্যা মহাপাপ' বলি করিস যে কোলাহল,
> আমার বেলায় শাস্ত্রে তোদের বিধান কি আছে দ্যাখ,
> নতুবা আগুনে পুড়ায়ে করিব টিকি ও দাড়িতে এক!

অথবা,

> কহিলাম দুঃখে—'মোল্লা সাহেব, বেশ তো কহিলে খাশা,
> খোদা কি তোমার বাবুই পাখি যে দাড়িতে বাঁধিবে বাসা?'
> *** *** ***
> বিনা অপরাধে মসজিদ হোতে লভিয়া নির্ব্বাসন
> আমারি মতন শত নিপীড়িত কাঁদিতেছে অনুখন;
> মসজিদে নাই আল্লা —সেখানে বোসেছে মোল্লারাজ,
> বিশ্বাসী দলে কাফের করাই মোল্লা-মিঞার কাজ;
> 'ভক্তের মন খোদার আসন'—সে কথা ভুলিয়া গিয়া,
> আল্লারে ওরা বাঁধিয়া রাখিবে দাড়ি ও পাগড়ি দিয়া!

কিংবা

> পাদরী হাঁকিল—'নিকালো নেটিভ', আমি কহিলাম—'যাই,
> আমি কোন্ ছা'র? তব গির্জায় স্রষ্টারি নাই ঠাঁই।

পশ্চাতে ফেলি গির্জা-প্যাগোডা মসজিদ-মন্দির,
এতদিনে আমি মুক্তি-পথের সন্ধানী মুসাফির।

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিমালা থেকে আশরাফ আলী খানের কবি-মানসের একটি স্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি যে একজন অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ব্যক্তি ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনা করেছেন ঠিকই, তা বলে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করেন নি কখনো। এই উদারচিত্ত কবি হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধখৃষ্টানের মধ্যে প্রভেদ খোঁজা থেকে বিরত রেখেছেন নিজেকে। প্রকৃত মানবসত্তাকেই বড় করে দেখেছেন। মোল্লারা তাঁকে সহজ মনে গ্রহণ করে নি, তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলেছে ওরা, যেমন এক সময় কাজী নজরুল ইসলামকে কাফের আখ্যা দেয়া হয়েছে। নজরুল ইসলামের সঙ্গে আশরাফ আলী খানের মিল খুঁজে পাই বিষয় নির্বাচনে, কখনো-কখনো শব্দচয়নে, যদিও কবিতা *কংকাল*-এর কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই আমরা।

সেকালে কাজী নজরুল ইসলাম এবং আশরাফ আলী খানকে যে অপবাদ ও গঞ্জনা সইতে হয়েছে অনুরূপ নালিশ একালেও কোনো কোনো লেখকের বিরুদ্ধে ওঠে বেশ জোরালোভাবে। দুঃখের বিষয় এতোকাল পরেও আমাদের সমাজ আগেকার মতোই প্রতিক্রিয়াশীল এবং পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। প্রগতির বিরুদ্ধে মুখ খুঁচিয়ে রয়েছে মোল্লাতন্ত্র। কবে এই হতভাগ্য সমাজে মুক্তচিন্তার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে, জানি না। যাঁরা মুক্তচিন্তা প্রসারের জন্য ভূমিকা রেখেছেন অতীতে এবং বর্তমানে যাঁরা কাজ করে চলেছেন, সেই সাহসী কবি-সাহিত্যিকদের আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আশরাফ আলী খানকে, তাঁর প্রচুর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি এখনো প্রাসঙ্গিক মনে করি। কাব্যসৌন্দর্যের জন্য নয়, বিষয় গৌরবহেতু। বিশেষ করে তাঁর বিপ্লবী চেতনার কারণে।

## শওকত ভাই, ভালোই আপনি এখন নেই!

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যতোদিন জীবিত থাকেন, কর্মক্ষম থাকেন ততোদিন সমাজ তার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় অনেক কিছু আদায় করে নেয়। অধিকাংশ সময় সেটা উৎপীড়নের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিটি ভেতরে-ভেতরে বেদনার্ত, বিষণ্নবোধ করলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখেন, অনেকের ডাকেই সাড়া দেন। সেই ডাকে আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা থাকে বলেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি প্রসন্নচিত্তেই অধিকাংশ সময় বহুজনের বহু অনুরোধ, আবদার রক্ষা করেন। দাবি মিটিয়ে দেন অনেকের। কখনও কখনও অসুবিধা এবং নিজের অসুস্থতাকেও আমল দেন না। মানুষ তাকে চায়, সেই চাওয়াকে তিনি উপেক্ষা অথবা অসম্মান করবেন কী করে? অনেক সময় অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করে, নিজের ক্ষতি করেও সাড়া দেন মানুষের ডাকে। সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি হন কোনো লেখক অথবা শিল্পী তাহলে তার প্রধান কাজ হলো লেখা এবং আঁকা। যে- কোনো সৃজনশীল কাল হলো ধ্যানের মতো। এজন্য চাই অখণ্ড সময়, একাগ্রতা। এই সময়ের ওপর যদি নানা ধরনের সভা-সমিতির হাত পড়ে তাহলে তার আসল কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যাহোক, এই বিশিষ্ট সৃজনশীল ব্যক্তিটি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন দু'তিন দিন হয়তো কোনো কোনো সংগঠন খবরের কাগজে শোকবার্তা ছাপতে দেন, হয়তো একটি কি দুটি শোকসভাও অনুষ্ঠিত হয়। তারপর নীরবতা, বিস্মৃতির পালা। মৃত ব্যক্তির পরিবারের কী হলো, কী অবস্থায় তারা আছে, এই খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না কেউ। হায়, অসংখ্য সভা-সমিতি, হায়, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ; হায়, উদ্দীপক সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমান পৃথিবীর রৌদ্রছায়া আর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এক বছর আগে। পরম পরিতাপের বিষয় এরই মধ্যে তাঁর মতো বরেণ্য লেখক, প্রগতিশীল, জনদরদী ব্যক্তি বিস্মৃতপ্রায়। রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। আমরা নিজেরাই-বা কী করছি তাঁর জন্য। মাঝে মাঝে আমরা দু'চারজন তাঁর কথা ভাবি, আমাদের শওকত ভাইয়ের কথা বলি। আমাদের মনে ঝিকিয়ে ওঠে সেই শক্তিশালী কথাশিল্পীর কোনো কোনো বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি, পরিহাসময় বাক্য। মনে পড়ে তাঁর স্নেহপ্রবণ ব্যবহার, আমাদের অসুবিধায় তাঁর উদ্বেগের প্রকাশ। কী করে ভুলি এসব কথা। লেখক হিসেবে তিনি অসামান্য তো ছিলেনই, তাঁর মতো আন্তরিক, স্নেহশীল মানুষও আমাদের এই পশ্চাৎপদ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, মৌলবাদপীড়িত সমাজে বিরল। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই 'শওকত ওসমান স্মৃতি পরিষদ'-এর কর্মকর্তাদের। তারা শওকত ভাইয়ের স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এই কৃপণ, অকৃতজ্ঞ সমাজের গ্লানি কিছুটা

হলেও মুছে দিতে চেষ্টা করেছেন। শওকত ওসমান শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির জন্য। তাঁর রচনাসম্ভারই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে।

আজও কোনো কোনো ভোরবেলা টেলিফোনের আওয়াজে চমকে উঠি। রিসিভার তুলে কান পেতে থাকি একটি স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরের জন্য। মনে হয়, নিশ্চয়ই শওকত ভাইয়ের টেলিফোন। নইলে এই সাত সকালে কে-ই-বা আমাকে স্মরণ করবে। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যাই যে তিনি নেই। মনে পড়ে, প্রায় প্রতিদিন ভোরবেলা টেলিফোনে আমার কুশল জানতে চাইতেন। অনেকক্ষণ ধরে নানা কথা বলতেন। সাহিত্যের কথা, দেশের কথা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার কথা, একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের কথা, নষ্ট, ভ্রষ্ট, রাজনীতিবিদদের কথা, কিছুসংখ্যক তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িকতা কলুষিত, মৌলবাদপ্রীতির কথা। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে উঠতো। ঘৃণা ও ধিক্কার ঝরে পড়তো তাঁর কথা থেকে।

শওকত ওসমান, আমরা সবাই জানি, এ দেশের প্রথম সারির কথাশিল্পীদের একজন। তিনি *জননী*, *ক্রীতদাসের হাসি* এবং *পতঙ্গ পিঞ্জর* প্রভৃতি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন আমাদের। শুধু উপন্যাস, নাটক এবং ছোটগল্পই তিনি লেখেন নি, তাঁর অকৃপণ লেখনী রচনা করেছে শিল্প সাহিত্য বিষয়ক উজ্জ্বল প্রবন্ধাবলি, ব্যঙ্গ ও কৌতুকনিপুণ গদ্য এবং পদ্য। তিনি শুধু বড় মাপের লেখকই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি ঔদার্য এবং হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো লেখককে সবার অজ্ঞাতসারে সাহায্য করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন ভালো লেখার জন্য। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেকে ছোট লেখক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেছেন সাহিত্যপত্রে। আমি যখন চাকরিহীনতায় দিন কাটিয়েছি তিনি মাঝে মাঝে জানতে চেয়েছেন আমার টাকার প্রয়োজন আছে কি না। তিনি নিজে বিত্তবান ছিলেন না, তবে হৃদয়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন খুবই ধনী। আমি সবিনয়ে তাঁকে বলেছি, 'শওকত ভাই, প্রয়োজন হলে আমি নিজেই আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।' তিনি অসুস্থ শরীরে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমাকে অক্তাভিও পাজের একটি বই উপহার দেন। এই ঘটনার উল্লেখ করলাম এজন্য যে, তিনি একজন অনুজপ্রতিম লেখকের প্রতি কতোটা মনোযোগী এবং স্নেহশীল ছিলেন। মনে পড়ে, তিনি যখন সি এম এইচের একটি কেবিনে মৃত্যুশয্যায়, অচেতন। লেখক এবং সম্পাদক মীজানুর রহমান শওকত ওসমানের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁকে দেখতে এসেছি, এই সংবাদ তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে জানালেন। আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে, একটু ঘুরে আমাদের দিকে তাকালেন ক্ষণিকের জন্য, তারপর তাঁর দুটি উৎসুক চোখ বুজে গেল। জানি না, তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না। তাঁর সেই চোখ মেলে চাওয়া আজও ভেসে ওঠে স্মৃতিতে।

শওকত ওসমান আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে আমাদের চেতনায়, স্মৃতিতে, ভাবনায় তিনি সবসময় থাকবেন। এই যে আমাদের দেশে উগ্র মৌলবাদের দাপট তাতে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হতো। আমার ওপর মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হামলা, কাজী আরফে আহমেদের হত্যাকাণ্ড, যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে ট্রাজেডির

জন্ম হলো, এসব খবর শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হতেন তা সহজেই অনুমান করতে পারি। মুক্তিযোদ্ধা শওকত ওসমানকে যদি দেখতে হতো একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীরা মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতাকেই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অপপ্রয়াসে তিনি কী করতেন, কল্পনা করাও মুশকিল। শওকত ভাই, আপনার প্রাণপ্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশের আজকাল এরকমই হাল। ভালোই এসব আপনাকে দেখতে হয়নি।

## একজন মহীয়সী নারীর প্রতিকৃতি

গত ২০ জুন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সুফিয়া কামালের ৮৩ তম জন্মদিন একটি সুন্দর সমাবেশে উদ্‌যাপিত হলো। জাহানারা ইমাম, পান্না কায়সার, লাকী ইনাম, খালেদা এদিব চৌধুরী, শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, শমী কায়সারসহ অনেকে ফুলের স্তবক উপহার দেন সুফিয়া কামালকে। যদিও দেশের সর্বত্র এই মহীয়সী নারীর জন্মদিন পালিত হয় নি সেদিন, তবু আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ তাঁকে নিবেদন করেছে তাদের শুভেচ্ছা। কারণ, সকলের হৃদয়ে পাতা আছে তাঁর আসন।

সেদিন অন্যতম বক্তা অধ্যাপিকা ফয়জুন্নেসা সুফিয়া কামাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন বেগম রোকেয়াকে। আসলে এ দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁদের যে-কোনো একজনের কথা বলার সময় তিনি, বেগম রোকেয়া, অনিবার্যভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। তাঁর অবদানের কথা নারী সমাজ ভুলবেন কী করে? শুধু নারীদের কাছেই নয়, পুরুষদের কাছেও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একটি নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যেকালে তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রগৃত হিসেবে তৎপর হয়েছিলেন সেকালে মুসলিম সমাজের নারীরা এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে বসবাস করছিলেন। তারা ছিলেন অবরোধবাসিনী! পর্দাপ্রথার অন্তরালে এক অন্ধকার জগতে। প্রকৃত প্রস্তাবে, তখন গোটা মুসলিম সমাজই ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়ামি-ঠাসা, শোচনীয় রকম পশ্চাৎপদ। এই অন্ধকারে, বাতিল ধ্যানধারণার প্রতাপের মধ্যে আলো একেবারে ছিল না, একথা বলা যাবে না। অল্পসংখ্যক অগ্রসর মনের অধিকারী ব্যক্তি তখন সমাজে অবশ্যই ছিলেন। তাঁহাদের ভূমিকার জন্যই আমাদের সমাজ কিছুটা এগিয়ে গেছে, যদিও তাঁদের কাউকে কাউকে গঞ্জনা সইতে হয়েছে, উৎপীড়িত হতে হয়েছে কূপমণ্ডুকদের হাতে। বেগম রোকেয়া সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিদের একজন। তিনি সমাজপতিদের চোখ-রাঙানি এবং বাচালতাকে অগ্রাহ্য করে অবরোধবাসের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন আলোয়, খোলা হাওয়ায়। শুধু নিজেই এলেন না, অন্য মহিলাদেরও আহ্বান জানালেন মুক্তির পথে।

বেগম রোকেয়ার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। গোড়ার দিকে অবশ্য অভিজাত পরিবারের মেয়ে সুফিয়া কামালকে অবরোধবাসিনী হয়েই থাকতে হয়েছিল। এমনকি স্কুলে পাঠানো হয় নি। বাড়িতে উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল, উর্দুতেই কথা বলতেন সবাই। সুফিয়া কামাল নিজের চেষ্টায় বাংলা ভাষা শেখেন, আকৃষ্ট হন বাংলা সাহিত্যের প্রতি। এক সময় শুরু হলো তাঁর কাব্যচর্চা। তাঁকে উৎসাহ যোগালেন তাঁর অকালমৃত স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন। কাজী নজরুল ইসলাম সুফিয়া কামালের কবিতা পড়েন তাঁর মামা কাজী ফজলে রাব্বীর অনুরোধে। নজরুলের ভালো লাগে তাঁর

কবিতা এবং উদ্যোগী হয়ে তিনি কয়েকটি কবিতা মোহাম্মদ কাসেম সম্পাদিত *অভিযান* পত্রিকায় ছাপতে দেন। কাজী নজরুল ইসলাম চিঠি লিখে সুফিয়া এন. হোসেন অর্থাৎ আমাদের সুফিয়া কামালকে *সওগাত* পত্রিকায় কবিতা পাঠাতে বললেন। *সওগাত*-এ সুফিয়া এন. হোসেনের কবিতা ছাপা হওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে অনেক সাহিত্যিক সেকালে *সওগাত*-এ লেখা ছাপা হলে লেখক সহজেই অনেকের নজরে পড়তেন। বিশেষ করে লেখক যদি মহিলা হন, তাহলে তো কথাই নেই। যে সমাজে পুরুষ লেখকদের সংখ্যা কম, সেখানে *সওগাত*-এর মতো পত্রিকায় একজন মহিলার লেখা ছাপা হওয়ার পর যে পাঠক মহলে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হবে তা খুবই স্বাভাবিক।

যা হোক, সুফিয়া এন. হোসেন সর্বপ্রথম কলকাতায় *সওগাত* অফিসে যান বোরকা পরে। উদ্দেশ্য কবিতা ছাপানোর জন্য সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে ধন্যবাদ জানানো। নজরুল, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এবং সর্বোপরি সৈয়দ নেহাল হোসেনের উৎসাহ এবং সহযোগিতার ফলে তাঁর কাব্যচর্চা চললো অব্যাহত গতিতে, আত্মপ্রকাশ করলো সুফিয়া এন-হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া*, তখন বইটি দেখে যিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন, সেই নেহাল হোসেন আর জীবিত নেই। *সাঁঝের মায়ার* ভূমিকা লেখেন, আর কেউ নন, বাংলা কাব্যের নতুন বাঁক-ঘোরানো খোদ তুমুল নজরুল ইসলাম। সেই ভূমিকার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি—

ঘেরা-টোপ-ঢাকা পিঞ্জরের বুলবুলকে তিনিই (নেহাল হোসেন) মুক্তি দিয়েছিলেন, বুঝি এরই অপেক্ষা তিনি করছিলেন। বৃদ্ধ বুলবুলের কণ্ঠ যখন অবগুণ্ঠনের বাধা অতিক্রম ক'রে দিগদিগন্তে ধ্বনিত হল, তখন মুক্তিদাতারও মুক্তিক্ষণ এল। কিন্তু সেই বিদায় : *সাঁঝের মায়া* শাশ্বত হয়ে রইল। তার অবেলায় বিদায়-নেওয়া বন্ধুকে : প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বুলবুলের কণ্ঠে যে সকরুণ সুর অনুরণিত হয়ে উঠল : তার তুলনা যে কোন সাহিত্যে বিরল। বেদনার এই ঘন বর্ষণ না হলে বুঝি গানের পাখী এ গান গাইত না, বনের চোখে যুঁই ফুলের অশ্রু ঝরত না।

*সাঁঝের মায়ার* কবিতাগুলো সাঁঝের মায়ার মতোই যেমন বিষাদ-ঘন, তেমনি রঙিন : গোধূলির রঙের মতো রঙিন। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা নয়, শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যা। প্রতিভার পূর্ণ-চন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনা-পুঞ্জিত অন্ধকারের, বিষাদের প্রয়োজন আছে। নিশীথ-চম্পার পেয়ালায় চাঁদিনীর শিরাজী এবার বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয়, *সাঁঝের মায়াই* তার অনুপম নিদর্শন।

এ ভাষা সমালোচকের নয়, এ ভাষা একজন উদারচিত্ত, কাব্যভোক্তার, আবেগ-ধনী কবিপুরুষের। নজরুল সমালোচক ছিলেনও না। তবে *সাঁঝের মায়ার* প্রধান সুরটি চিহ্নিত করেছিলেন নির্ভুলভাবে, সুফিয়া এন. হোসেনের কবিত্বশক্তির পরিচয় তুলে ধরেছিলেন কাব্যিক ভাষায়।

প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর সুফিয়া এন. হোসেনের বিয়ে হয় কামালউদ্দিন খানের সঙ্গে। সুফিয়া এন. হোসেন হলেন সুফিয়া কামাল। কবির সৌভাগ্য যে, দ্বিতীয় স্বামীও ছিলেন উদার, সহৃদয় এবং সাহিত্যানুরাগী। স্ত্রীর কাব্যচর্চা যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে কামালউদ্দিন খানের সতর্ক নজর ছিল। তিনি সুফিয়া কামালের প্রতিভা বিকাশের জন্য

সৈয়দ নেহাল হোসেনের মতোই ছিলেন যত্নবান। সুফিয়া কামাল দু'জনেরই প্রতি মুক্ত কণ্ঠে ঋণ স্বীকার করেছেন, বারবার স্মরণ করেছেন তাঁদের সহযোগিতার কথা।

একথা ঠিক, সুফিয়া কামাল যদি ঘরের নিভৃত কোণে বসে সাহিত্যচর্চা করেই তৃপ্ত থাকতেন, তাহলে তিনি একজন কবি হিসেবে কিছু সুখ্যাতি অর্জন করতেন সত্য; কিন্তু তাঁর আজকের এই নন্দিত ভাবমূর্তি সৃষ্টি হতো না। বেগম রোকেয়ার পথ ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে, নিজেকে নিয়োজিত করলেন নারীমুক্তি আন্দোলনে। শুধু তাই নয়, তিনি এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন আজ অবধি। তিনি অনেকের জন্যই গভীর প্রেরণার উৎস। আজ যে আমাদের সমাজে বহু নারী অধিকারসচেতন, নারী মুক্তি আন্দোলনের নিবেদিত-চিত্ত কর্মী হয়ে উঠেছেন তার পেছনে বেগম রোকেয়া এবং বেগম সুফিয়া কামালের অবদান অনেকখানি। সুফিয়া কামালের বহু পরবর্তী একজন, পান্না কায়সার, তাঁর বিষয়ে নিজের আবেগ প্রকাশ করেছেন এভাবে, "সুফিয়া খালাম্মার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আমরা আমাদের মুখের ভাষাকে, প্রাণের রুদ্ধ আবেগকে খুঁজে পেয়েছি। তিনি যেন জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদেরই জন্য। তাই তাকে দেখি স্রোতের মতো অশান্ত। তিনি আলো হাতে নিয়ে চলেছেন, কোনো ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই তাতে। তিনি একটি যুগের ইতিহাসকে ধারণ করে আছেন। ইতিহাস যেমন করে কথা বলে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের, তেমনি তিনি মা-বোনদের কাছে জাগরণের প্রতীক। বেগম সুফিয়া কামাল বাংলার নারীসমাজের মধ্যে যেভাবে প্রত্যয়কে দৃঢ় করতে, চিন্তাকে অবারিত করতে এগিয়ে এসেছেন তাতে আমি একথা জোর দিয়ে বলবো, আমরা মহিলাসমাজ অনেক জটিতা ও সংশয় থেকে মুক্তি পেয়েছি। তাঁর বিশ্ববোধ ও আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণা বিকাশোন্মুখ বাংলার মহিলাজগতের কাছে একটা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। তাঁর সমগ্র জীবনধারার পেছনে রয়েছে গভীরতর বেদনা, ব্যাপকতর জীবনবোধ, উন্মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি, বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং অনুপম বিশ্বাস। জীবনবাদী ও মানববাদী মানুষ বেগম সুফিয়া কামাল নিজেই একটি যুগ, একটি ইতিহাস।'

সুফিয়া কামাল নিজে না জেনে পরবর্তীদের অগ্রসর চিন্তাধারাকে সঞ্জীবিত করেছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহসের সীমা, যে সাহস সমাজবদলের জন্য অপরিহার্য। আজ যে এই পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে রাজিয়া খানা, জাহানারা ইমাম, রাবেয়া খাতুন, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন, পান্না কায়সার, পূরবী বসু এবং তসলিমা নাসরিনের মতো সাহিত্যিক পেয়েছি, সেজন্য আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে বেগম রাকেয়া এবং বেগম সুফিয়া কামালকে। আমি সুফিয়া কামাল-পরবর্তী লেখিকাদের ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা বিস্মৃত হই নি। চিন্তার দিক থেকেও এঁদের কেউ কেউ, আমি বলবো, সুফিয়া কামালের চেয়ে বেশি বেশি অগ্রসর এবং মুক্ত, এ সত্ত্বেও এঁদের উত্তমর্ণ বেগম সুফিয়া কামাল। রাজিয়া খান, পান্না কায়সার, পূরবী বসু এবং তসলিমা নাসরিন নিঃসন্দেহে সাহসী সাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি প্রবল ধাক্কা দিয়েছেন সমাজকে; তাঁর মতো সাড়া জাগানো সাহিত্যিক আমাদের সমাজে খুব বেশি আসে নি।

যা হোক, বাংলাদেশ, মহিলা পরিষদ আয়োজিত ২০ জুনের অনুষ্ঠানে ড. সেলিম জাহাঙ্গীর বেগম সুফিয়া কামালকে তাঁর ৮৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি বই উপহার দেন। বইটির নাম *সুফিয়া কামাল।* এই বই তৈরি করতে লেখক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর প্রচুর শ্রম স্বীকার করেছেন। সুফিয়া কামাল সম্পর্কে বিশদ জানতে যারা আগ্রহী তাদের অবশ্যই এই বই পড়া দরকার। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কবি, সত্য ও ন্যায়ের পথে অকুতোভয় যোদ্ধা সুফিয়া কামাল বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই বইয়ের সঙ্কলিত রচনাগুলোও মূল্যবান দলিল বলে মনে করি। সুফিয়া কামাল নিজে ড. সেলিম জাহাঙ্গীরকে বইটি লেখার জন্য শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমরাও লেখককে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে যারা বেগম সুফিয়া কামাল সম্পর্কে গবেষণা করবেন তাদের পক্ষে এই বই একটি উপকারী, সহায়ক গ্রন্থ হবে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বেগম সুফিয়া কামাল বলেছেন যে, তাঁর এই বেঁচে থাকা লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের কাছে। অন্যের পথ রোধ করে আছেন বলে তিনি বিব্রত বোধ করছেন। তাই, তিনি আর বাঁচতে চান না! আমরা যারা তাঁকে ভালোবাসি, তাঁর প্রতিবাদী, প্রগতিশীল ভূমিকার কদর করি, তারা তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে বিনীতভাবে দ্বিমত পোষণ করি।

## একজন অসামান্য কবির প্রতিকৃতি

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে বেশি দূরে ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নাজিরাবাজারের এঁদো গলিতে কয়েকটি ছোট ছোট পুরনো দালানে ঢাকা কলেজ চান খাঁর পুল এলাকার প্রায় গা ঘেঁসেই বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের পেছন দিকে দীর্ঘ রেললাইন। কোনো কোনো ক্লাস রুম থেকে কানে ভেসে আসতো ট্রেনের আসা-যাওয়ার ধ্বনি। ফুলবেড়িয়া রেল স্টেশনও তেমন দূরে ছিল না। সেকালে আমরা যারা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম তাদের আসর জমতো তিন জায়গায়— মধুদার চায়ের স্টল, আমতলা এবং বেলতলায়। তবে বেশির ভাগ সময় আমরা চা, সিঙাড়া, ডিমপোচ সহযোগে মধুদার দোকানের টিনের ছাদের তলায় দিব্যি আড্ডা দিতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একটা টেবিলে আড্ডা জমিয়ে তুলতেন শামসুর রহমান, যাকে আমরা সবাই ডক্টর জনসন হিসেবেও জানতাম। তিনি আমাদের সিনিয়র ছিলেন। বাকপটু এই মানুষটির জানাশোনার ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। প্রায়শই আমরা হাজির হতাম তাঁর টেবিলে। হাসান হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আবেদ হোসেন (বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা প্রতিভাদীপ্ত, অকাল প্রয়াত নেতা আবুল হোসেনের পুত্র),আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আমি এবং আরো কেউ কেউ।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর একটি কবিতা শুরু করেছেন এভাবে, 'মধুদা'র চায়ের দোকানে উঁচু-নিচু-মসৃণ অজস্র কণ্ঠস্বর। চায়ের বাটি-পিরিচ-চামচের কলরবে তর্কের ধোঁয়াটে কুয়াশা। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব। অথবা আগুন রঙ শাড়ি পরে যে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে তাকে নিয়ে মাতামাতি। সহসা আশ্চর্য নীরবতা।'

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হই উনিশশ' সাতচল্লিশ সালের শেষের দিকে আর আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সেই একই বিভাগে ভর্তি হন ১৯৫০ সালের শেষের দিকে। দেদীপ্যমান ছাত্র ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ইউনিভার্সিটির প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। তাঁকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করতেন আমার প্রিয় বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান। কখনও কখনও হাসান ওবায়দুল্লাহকে প্রতিযোগিতামূলক তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করতেন। এতে অবশ্য ওবায়দুল্লাহর নিজের কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র ম্লান হতো না।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শুধু একজন কৃতী ছাত্রই ছিলেন না, নানা ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বি এ (অনার্স), এম এ পরীক্ষায় জ্বলজ্বল ফল পেয়ে যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনপ্রশাসন এবং উন্নয়ন অর্থনীতির ডিপ্লোমা হাসিল করেছেন। তিনি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ফেলো। সেকালে পাকিস্তান আমলে অগণিত কুমারীর

কাঙ্ক্ষিত বর ছিলেন প্রত্যেক অবিবাহিত সিএসপি অফিসার। এই কাঙ্ক্ষিত কুমারদের অন্যতম হতে পেরেছিলেন আমাদের প্রিয় বন্ধু আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। যাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তাকেই পেয়েছেন।

তবে, আমার সামান্য বিবেচনায়, তিনি এ দেশের মানুষের কাছে সবসময় শ্রদ্ধেয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবেন একজন অসামান্য কবি বলেই। ভাববেন না তা বলে আমি তাঁর অন্যান্য সাফল্যকে খাটো করে দেখছি। আমরা জানি, তিনি জাতীয় সরকারের প্রশাসক, সচিব, রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রী ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার আন্তর্জাতিক সহকারী মহাপরিচালক ছিলেন, এই তথ্যও আমার অজানা নয়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের চেয়ারম্যান। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কতো প্রশাসক, কতো চেয়ারম্যান, কতো মন্ত্রী, কতো রাজা আসে, কতো রাজা যায়। কারা তাদের হিসেব রাখে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবি অমর হয়ে থাকেন ভক্ত পাঠকদের মনে, জনস্মৃতিতে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহও একজন কবি হিসেবেই অধিক খ্যাত, থাকবেনও তাই। বাংলাদেশের সচেতন সকল ব্যক্তির মনেই উজ্জ্বল হয়ে আছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সঙ্কলনের কথা। সাড়া জাগানো সেই সঙ্কলনের অন্তত দুটি কবিতা অম্লান হয়ে থাকবে, যতোদিন ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি জেগে থাকবে বাঙালিদের চেতনায়। হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'মাগো, ওরা বলে' শীর্ষক দুটি কবিতা। এই প্রসঙ্গে মাহবুব আলম চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতেই হবে। কারণ, তার 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' আমাদের ভাষা আন্দোলন বিষয়ে রচিত প্রথম কবিতা। তবে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গীতিকবিতাটি রচনা করেছেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। অবিস্মরণীয় এই গান। চিরকাল এই গান গাইবে গৌড়জন। তাদের শিরায় শিরায় ঝঙ্কৃত হবে এই গীতিকবিতার কথা ও সুর—'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি?' মনে পড়ে এই গীতিকবিতায় প্রথম সুর সংযোজন করেছিলেন বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার আবদুল লতিফ এবং পরে একাত্তরের শহীদ এবং খ্যাতিমান সঙ্গীত শিল্পী আলতাফ মাহমুদ। আলতাফ মাহমুদের সুরটিই স্থায়িত্ব পেয়ে যায়।

যা হোক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'মাগো, ওরা বলে' কবিতার প্রথম দুটি স্তবক উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না—

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা, তুই কবে আসবি?
কবে ছুটি?"
চিঠিটা তার পকেটে ছিল

ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

'মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা,
তাই কি হয়?
তাই তো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্যে
কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরবো।

... ... ...

কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝরে পড়েছে ডাঁটা,
পুঁই লতাটা নেতানো,
"খোকা এলি?"
ঝাপ্‌সা চোখে মা তাকায়
উঠানে উঠানে
যেখানে খোকার শব
শকুনীরা ব্যবচ্ছেদ করে।

'মাগো, ওরা বলে' কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাত নরী হার*-এর, বলা যেতে পারে, শেষ কবিতা। কেননা, কবিতাটির পরে ছাপা হয়েছে কয়েকটি বিদেশি কবিতার অনুবাদ। অনুবাদগুলো মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের সে আমলের তরুণ কবির লেখনীর দীপ্তি অনূদিত কবিতাবলিতেও সুস্পষ্ট। হাসান হাফিজুর রহমান আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার অত্যন্ত অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। *সাত নরী হার*-এর অধিকাংশ কবিতা গ্রামীণ ছড়ারআদলে রচিত 'আধুনিক কবিতা। একটি নতুন স্বাদ কবি এনেছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে যা অনেকের চিত্ত জয় করেছিল সেকালে। এই ক'দিন আগেও আবার বইটি পড়ে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। অস্বীকার করবো না, আগের চেয়েও বেশি ভালো লেগেছে এখন। কোনো নস্টালজিয়ার কারণেই কি? না, ভালো কবিতার গুণের জন্যই। প্রায় প্রতিটি কবিতাই উদ্ধৃতিযোগ্য। আমি শুধু 'মেয়েটা' উদ্ধৃত করছি—

মেয়েটার বর মরেছে আর বছর
মেয়েটার ঘর পুড়েছে তার খবর
এ গাঁয়ের জানে সবাই পাঁচজনে
মেয়েটার মা মরেছে সেই সনে।
মেয়েটা কাঁদতো শুধু হাসতো না।
মেয়েটার নাম তোমাদের বলবো না।
মেয়েটার বলতে আছে এক ছেলে
হামা দ্যায় চলতে গেলে যায় হেলে,
একদিন থামলো তা ও তাই শুনে
কেঁদেছে পাড়ার লোক পাঁচজনে ঃ
মেয়েটা হাসলো শুধু কাঁদলো না
মেয়েটার নাম তোমাদের বলবো না।

*সাত নরী হার* নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রকাশ করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান প্রগতিশীল কবি এবং কাব্য সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান। কোনো মুনাফার জন্য নয়, সমকালীন এক তরুণ কবি ও তার কবিতার প্রতি ভালোবাসার তাগিদে। তিনি যে তাঁর ভালোবাসা অপাত্রে অর্পণ করেন নি তার নির্ভুল প্রমাণ ওবায়দুল্লাহ দাখিল করেছেন।

এ বছরের জানুয়ারি মাসে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর *কবিতাসমগ্র* প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের কাব্যক্ষেত্রে এটি এক আনন্দপ্রদ বিশিষ্ট ঘটনা বলে মনে করি। এই কাব্যসঙ্কলনে *সাত নরী হার তো* আছেই, আরো আছে *কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, বৃষ্টি ও সাহসী পুরষের জন্য প্রার্থনা, আমার সকল কথা* এবং *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*—সবসুদ্ধ সাতটি কাব্যগ্রন্থ।

*আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* এবং *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনার মতো* অসামান্য কবিতা আমাদেরে কাব্যক্ষেত্রে বিরল। কবিতা দুটি দীর্ঘ। কিন্তু স্তোত্রপ্রতিম *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* পড়লে স্তম্ভিত হতে হয় ওবায়দুল্লাহর কবিত্বশক্তি লক্ষ্য করে। তিনি যদি আর কোনো কবিতা নাও লেখেন, তবু তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন একজন শক্তিশালী কবি হিসেবে। কি করে কাব্যানুরাগী পাঠক ভুলবেন এই পঙ্‌ক্তিমালা—

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তিনি স্বপ্নের মতো সত্য ভাষণের কথা বলতেন
সুপ্রাচীন সঙ্গীতের আশ্চর্য ব্যাপ্তির কথা বলতেন
শস্যের নক্ষত্রে আলোকিত প্রান্তরের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
যখন কবিকে হত্যা করা হল
তখন আমরা নদী এবং সমুদ্রের মোহনার মত

সৌভ্রাত্রে সম্মিলিত হলাম।
প্রজ্বলিত সূর্যের মত অগ্নিগর্ভ হলাম।
ক্ষিপ্রগতি বিদ্যুতের মত
ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করলাম।
এবং হিংস্র ঘাতক নতজানু হ'য়ে
কবিতার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো।

মনে পড়ে, আশির দশকে, যখন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন সচিব ছিলেন, 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'র কবির বাসায় একটি আড্ডা জমতো। সেই আড্ডা মশগুল হতো জবরদস্ত সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। সেই আড্ডায় আমার মতো দু'একজন গোবেচারা কবিরও ঠাঁই হতো। আরো পরে কবিদের আসরই মুখ্য হয়ে ওঠে, যার ফলে *পদাবলী* নামে একটি কাব্য সংগঠনের জন্ম হয়। *পদাবলীর* অনুষ্ঠান কাব্যপ্রেমীদের নজর কাড়ে। *পদাবলী* আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং আরো কোনো কোনো কবিকে পুরস্কৃত করে ধন্য হয়। এই সময়েই সম্ভবত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তার সাড়া জাগানো কবিতাবলি রচনা করেন।

আগেই বলেছি, তিনি যদি কবিতা আর নাও লেখেন, তবু তিনি কাব্যপ্রেমীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে যিনি জাত কবি, তিনি কবিতা না লিখে পারেন না। সাময়িক বিরতি ঘটতে পারে, বিরতির কাল দশ-বারো বছরও হতে পারে। তবে নিষ্প্রাণ লেখনী আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। আমরা সহিষ্ণু প্রতিক্ষায় রইলাম কবির নতুন কাব্যগ্রন্থের জন্য।

৬.৯.৯৯.

## একজন বিস্মৃতপ্রায় লেখকের কথা

বিস্মৃতিপ্রায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে বললে ভুল হবে না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও আমরা খুব সহজে ভুলে বসে থাকি। এই বিস্মরণে আমরা এতটুকু বিচলিত বোধ করি না, লজ্জিত হই না। অথচ কখনও কখনও খুব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমরা রীতিমতো মেতে উঠি। এখানে আমাদের সাহিত্য জগতের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের দশকে একজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি ষাটের দশকে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন, মন জয় করেছিলেন অনেক রুচিশীল পাঠকের। সত্তরের দশকে তিনি সাহিত্য ও জীবন থেকে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা তাঁকে ভুলে যাই আমি কথাশিল্পী হুমায়ুন কাদিরের কথা বলছি।

সবাই তাঁর কথা ভুলে গেছেন, একথা বলা যাবে না। কেউ কেউ আজও তাঁদের অন্তরের গভীরে সঞ্চয় করে রেখেছেন হুমায়ুন কাদিরের স্মৃতি। তাঁর গল্প, উপন্যাস এখনও জ্বলজ্বলে হয়ে আছে তাঁদের স্মৃতিতে। আমি হুমায়ুন কাদিরের এজন প্রকৃত বন্ধুর কথা জানি, যিনি নিজেও একজন সুলেখক এবং কৃতী অনুবাদক, যাঁর কাছে আমি বারবার হুমায়ুন কাদিরের কথা শুনি, তাঁর রচনাবলি সংরক্ষণের কথা শুনি, অভিমানী বন্ধুর গল্প, উপন্যাস পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করি তাঁর কথাবার্তায়। নিজের সম্পর্কে নিশ্চুপ এই অন্তরালপ্রিয় মানুষটি প্রয়াত, বিস্মৃতপ্রায় বন্ধু-সাহিত্যিক বিষয়ে সর্বদা সবাক। তাঁর ব্যাকুলতা আমাকে মুগ্ধ করে এবং চতুর্দিকের ভণ্ডামি, নষ্টামি, মাধুর্যের দস্তানায় মোড়া ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ নগ্ন হয়ে ফুটে ওঠে। মুখ ভরে ওঠে তেতো স্বাদে। হুমায়ুন কাদির একদিক থেকে সৌভাগ্যবান যে, তার আবু শাহরিয়ারের মতো অকৃত্রিম স্বজন এখনও বেঁচে আছেন, যিনি নিজের লেখার চেয়ে অকালমৃত বন্ধুর রচনাবলির অনেক বেশি কদর করেন, সেসব রচনা পুনর্প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এখনও। তাঁর শারীরিক কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি অক্লান্ত, অনলস এ ব্যাপারে।

আবু শাহরিয়ার, মনে পড়ে, নিজে উদ্যোগী হয়ে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থমালার জন্য হুমায়ুন কাদির বিষয়ে একটি তথ্যনির্ভর ভালো বই লিখেছেন। এই বই প্রকাশের জন্য তাঁকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, বারবার তাগিদ দিতে হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে। আবু শাহরিয়ারের অক্লান্ত জেদ এবং নিষ্ঠার ফলেই বইটি প্রকাশিত হয়েছে হুমায়ুন কাদিরের মৃত্যুর ১৭ বছর পরে। ভাবতে অবাক লাগে, একজন ভালো লেখকের মৃত্যুর পর এতো বছর লেগে গেল তাঁর জীবনীমূলক বই প্রকাশিত হতে। ভাগ্যিস, হুমায়ুন কাদিরের আবু শাহরিয়ারের মতো সত্যিকারের গুণমুগ্ধ, সুবেদী বান্ধব ছিলেন। নইলে হয়তো বাংলা একোডেমীর জীবনী গ্রন্থমালা থেকে আমাদের এই

স্বল্পায়ুপ্রিয় লেখকটি নির্বাসিত থেকে যেতেন। অথচ কতো গৌণ লোক চটজলদি সেই গ্রন্থমালায় স্থান পেয়ে গেছেন। মনে রাখতে হবে, শুধু প্রয়াত লেখকরাই জীবনী গ্রন্থমালাভুক্ত হন।

হুমায়ন কাদিরের পিতা এসএনকিউ জুফিকার আলী একজন লেখক এবং শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি। একটি রুচিশীল পরিবেশ ছিল তাঁর বাড়িতে। এমন এক পিতার স্নেহ এবং যত্নে মানুষ হয়েছেন হুমায়ুন কাদির। শৈশব থেকেই সঙ্গীত এবং কবিতার প্রতি হুমায়ুন অনুরক্ত ছিলেন। কবিতা লেখার নিপুণ হাত এবং গানের চমৎকার গলা ছিল তাঁর। হারমোনিয়াম বাজিয়ে মুগ্ধবেশে নিজের ঘরে গান গাইতেন। কিন্তু তাঁর গানের সুর শুধু স্বগৃহে সীমাবদ্ধ ছিল না। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হুমায়ুন কাদিরের কণ্ঠসুর কলাপ মেলতো শ্রোতাদের প্রাণে গানের বর্ণিল আভা ছড়িয়ে। তার কোনো কোনো কবিতা পত্রিকায় মুদ্রিতও হয়েছিল। তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। কবিতাটির নাম *আমার জীবন যেন।* অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে আবিষ্কৃত এই কবিতা তাঁর মৃত্যুর পর *দৈনিক ইত্তেফাক-এ* প্রকাশিত হয়—

আমার জীবন যেন এক শূন্যতার আদিম প্রকাশ,
গোপন নিভৃতে বেঁচে থাকি মরমিয়া কথকের মত,
কী যে দেব আর দেব না যে, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
সন্ধ্যার মলিন আঁধারে আমি যেন হয়েছি নিহত।

ওই তো দূরের নদী, কেবলি হৃদয় জুড়ে তার
শূন্য হাহাকার, একদিন উদ্দাম উচ্ছল তার গহন
মুগ্ধ এক রাজন্যের বক্ষ ছিঁড়ে এনেছে জোয়ার।
এখন সে গাননেই, শূন্য শয্যা কেন কে তা জানে।

উদ্ধৃত পঙ্ক্তিমালা পড়লে মন হু-হু করে ওঠে শীতার্ত হাওয়ার স্পর্শে, হৃদয় হয়ে যায় 'শূন্যতার আদিম আকাশ।' সাহিত্য সাধনার প্রাথমিক পর্বে কিছু কবিতা রচনা করলেও, কবিত্বশক্তির প্রমাণ দাখিল করা সত্ত্বেও হুমায়ুন কাদির কবিতাকে ছুটি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে নিজের সাধনাকে নিয়োজিত করেন কথাসাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যচর্চার সুন্দর, চিত্তাকর্ষক প্রসূন *নির্জন মেঘ, কোথায় পাব তারে-র* মতো উপন্যাস; *একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প, আদিম অরণ্যে একরাত্রি, শীলার জন্য সাধ* প্রভৃতি ছোট গল্প সঙ্কলন। এসব গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর অনুরক্ত ভক্ত পাঠকের অভাব ছিল না। হুমায়ুন কাদিরের কথাসাহিত্যের প্রচুর প্রশংসা করেছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো প্রতিভাবান সাহিত্যসমালোচক। শওকত আলীর মতো কথাশিল্পীও কদর করতেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "বাস্তবতা, রোমান্টিকতা, মনস্তত্ত্ব—এই সবেরই পাড় ঘেঁষে চলে তাঁর গল্প; কোনো একটি লক্ষণ তীব্র হয়ে ওঠে না, এই সমস্তের সম্মিলনেই তাঁর গল্পের চরিত্র তৈরি হয়। এই অতীব্র লক্ষণপুঞ্জেরই সমবায়ে তাঁর গল্প।

"...তাঁর *নির্জন মেঘ* উপন্যাসও নিম্নমধ্যবিত্ত এক স্কুল শিক্ষিকার কাহিনী, চেনা জীবনের চেনা কাহিনী, সেখানেও বাস্তবতার সঙ্গে মিশে আছে হালকা রোমান্টিকতা, উপন্যাসের নামেও তাঁর অনেক গল্পের নামকরণেও এই রোমান্টিকতার স্পর্শ। তাঁর ভাষা ও রোমান্টিকতার স্পর্শ লাগা এবং সচল, গতিবান।"

হুমায়ুন কাদিরের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি মাঝে মাঝে পুরনো ঢাকায় আমাদের ৩০ আশেক লেনের বাসায় আসতেন। আমাদের দু'জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা যে খুব জমতো, বলা যাবে না। কারণ, আমরা দু'জনই স্বল্পভাষী। সেকালে আমি এখনকার চেয়ে আরও বেশি স্বল্পবাক ছিলাম। তবে উত্তম শ্রোতা হিসেবে আমার পুরস্কার লাভের যোগ্যতা ছিল নিঃসন্দেহে। তিনি যে সময়ে আসতেন আমার কাছে, তখন অনুমান করি, তাঁর ভেতরে এক ধরনের গাঢ় ছায়া পড়েছিল, চলছিল তুমুল ভাঙচুর। তাঁর কথায় অভিমান ছিল, বেদনার রেখাবলি ছিল, হাহাকার ছিল। মনে হতো তিনি কোথাও কারও সঙ্গে খাপও খাওয়াতে পারছিলেন না। আমি কৌতূহল প্রকাশ না করে তাঁর অল্প-স্বল্প কথা মন দিয়ে শুনতাম। হুমায়ুন কাদিরের কথার আড়ালে অন্য কথার সন্ধান পেতাম। কী যেন স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাইতেন, কিন্তু বলতে পারতেন না। তিনি কি তাঁর মনের কোনো গভীর অসুখের কথা বলতে চাইতেন? হতাশা কি ফণা তুলতো প্রাণের গভীরে? বিতৃষ্ণা কি তাঁকে জব্দ করছিল বারবার? নিজের স্ত্রী সম্পর্কে একদিন সামান্য কিছু বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। তাঁর সুন্দর মুখে অন্তর্গত যন্ত্রণার অন্ধকার দাগ পড়েছিল। আমার সঙ্গে আশেক লেনে শেষ দেখা হওয়ার কিছুকাল পরেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাই।

হুমায়ুন কাদিরের কথা মনে পড়লে আজও মনে কেমন ছায়া পড়ে। আর ক'জন মনে রেখেছে তাঁকে? আবু শাহরিয়ারের মতো অন্য কেউ কি নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন মানুষ হুমায়ুন কাদিরকে? লেখক হুমায়ুন কাদির কে? কে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করে বিস্মৃতপ্রায় অকালমৃত ধূসর সেই লেখককে? আবু শাহরিয়ারের এক প্রবল ইচ্ছা, হুমায়ুন কাদিরের রচনাবলি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হোক। আমি আবু শাহরিয়ারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে বলছি, বাংলা একাডেমী থেকে যতো শিগগির সম্ভব সেই রচনাবলি প্রকাশিত হোক। এই অবহেলা হুমায়ুন কাদিরের প্রাপ্য নয়। এই রচনাবলির সম্পাদনার ভার আবু শাহরিয়ারকে দিলে ভালো হয়।

৬.৯.৯৯

## সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর কবিতা

সে এক সময় ছিল আমার পঞ্চাশের দশকের উষালগ্নে; তখন তরতাজা তরুণ আমি, শাহরিকে পথের ধুলো উড়িয়ে স্যান্ডেলে ভরদুপুরে, বিকেলে আড্ডা দিয়ে ঘরে ফিরি প্রায় মধ্যরাতে। সারাক্ষণ কবিতা আওড়াই, কখনও সশব্দে, কখনও মনে মনে। বাবার কড়া নজর এড়িয়ে পা টিপে ঘরে ঢুকি, মা জেগে থাকে বাউণ্ডুলে ছেলের খাবার আগলে। রাতে উনুন জ্বেলে ভাত-তরকারি গরম করে দেন সযত্নে, যাতে ছেলেকে ঠাণ্ডা খাদ্য প্রেরণ করতে না হয় জঠরে। কাদের কবিতা আওড়াতাম? জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বন্ধুদেব বসুর কবিতা। বিষ্ণু দে-র একটি কবিতার 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে' পঙ্‌ক্তিটি যে দিনে কতোবার আবৃত্তি করতাম তার কোনও লেখাজোখা নেই। আসলে এই পঙ্‌ক্তির রচয়িতা যে রবীন্দ্রনাথ তা কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করেছিলাম। তবে বিষ্ণু দে-র মারফত এই পঙ্‌ক্তিটির সৌন্দর্য উপভোগ করেছি প্রচুর, এ-কথা অস্বীকার করি কী করে?

কবুল করতে দ্বিধা নেই, জীবনানন্দ দাশেই সর্বাধিক নিমগ্ন ছিলাম, যদিও তিরিশের অন্যান্য প্রধান কবির আকর্ষণী শক্তিও কম ছিল না। আমার তারুণ্যের প্রত্যুষে পাকিস্তানি দামামা বেশ জোরেশোরে বেজে চলেছিল পূর্ব বাংলায়। কিন্তু এর পাশাপাশি বেশ কিছুসংখ্যাক তরুণ মার্ক্‌স্‌বাদের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আমরা যারা তখন তরুণ কবি তারা বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছি মার্ক্‌স্‌বাদী কবিদের প্রতি। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা হয়ে উঠলো আমাদের নিত্যসঙ্গী। কারো কারো কাছে সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার পক্ষপাত অবশ্য বরাবরই ছিল সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তুমুল সাড়া পড়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু কস্মিনকালেও মার্ক্‌স্‌-অনুরাগী হিসেবে খ্যাত ছিলেন না; কিন্তু তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কবিতা' পত্রিকায় 'পদাতিক' সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ আলোচনা লেখেন। সেই আলোচনায় ছিল অকৃপণ প্রশংসা, যা কোনো তরুণ কবির পক্ষে সহজলভ্য নয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলোতে লক্ষণীয় ছিল। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতোই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলে মনে করি।"

*পদাতিক*-এর কবির কাব্যকলার তারিফ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁকে ছন্দেও ওস্তাদ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আজ বাংলা কাব্যক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে উজ্জ্বল স্থান তা শুধু ছন্দে তাঁর দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য গড়ে ওঠে নি, এর পেছনে তাঁর কবিতার কনটেন্টেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আমি পাঠকদের *পদাতিক*-এর *মে-দিনের* কবিতা, প্রস্তাব : *১৯৪০'*, *বধূ*, *নির্বাচনিক*, *দলভুক্ত*, *পদাতিক*, *অতঃপর কবিতাগুলো স্মরণ করতে বলি।*

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি এবং একজন একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তিনি সমর্পিত ছিলেন সাম্যবাদে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বহু মিটিং, মিছিল করেছেন, জেল খেটেছেন। এইসব কিছুই করেছেন জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে। তখন তিনি ভেবেছিলেন কবিতা লেখা বাদ দিয়ে শুধু পার্টিরই কাজ করবেন। ফলে বেশ কিছুকাল তাঁর কবিতা রচনায় যতি পড়েছিল। আমাদের মনে পড়ে যায় গ্যোয়েটের একটি উক্তি। তার মতে, কোনো কবি রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠলে তিনি আর কবি থাকতে পারেন না। কারণ, তাকে তার মুক্ত মনটিকে বিসর্জন দিতে হয়, তার মত হয়ে পড়ে পক্ষপাতদুষ্ট, অনেকটা একচক্ষু হরিণের মতো। তিনি মাথায় গোঁড়ামির টুপি চাপিয়ে অন্ধ ঘৃণা এবং তীব্র বিরাগের বশীভূত হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে, রাজনীতিবিদ কবিকে গ্রাস করে ফেলে। গ্যোয়েটের উক্তিকে উড়িয়ে দেয়া মুশকিল।

তবে আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের কবি তাদের এমন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এমন কিছু দৈশিক এবং বৈশ্বিক শোষণ ও পীড়নের শিকার হতে হয় যে কোনো বিবেকী কবি কিংবা শিল্পীর সেসব সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। তখন হয়তো কণ্ঠস্বরকে বজ্রের প্রতিযোগী করে তুলতে হয়, ফলে চিৎকার যতোটা প্রবল হয়, সুর ততোটা ধ্বনিত হয় না। তাই, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ছেড়ে রাজনৈতিক কাজে ডুবে থাকার ব্যাকুলতা 'আমি বুঝতে পারি। একই কারণে তাঁকে অমলেন্দু বসু কথিত ক্যানেস্তারা-পেটানো' কিছু পদ্য। কিন্তু সেসব পদ্যের কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে কবিতার ঝলক দুর্লক্ষ্য নয়।

আগেই বলেছি, কিছুকাল সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবির কলমটিকে পার্টি অফিসের দেরাজে তালাবন্দি করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের এবং বাংলা কবিতার পরম সৌভাগ্য এই করুণ পরিস্থিতি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তিনি *যত দূরেই যাই* নামে সাড়া-জাগানো কাব্যগ্রন্থ নিয়ে কাব্যক্ষেত্রে ফিরে এলেন সগৌরবে। এই বই খুলেই যখন পড়ি—

> তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
> এক নদীর সঙ্গে দেখা।
> পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
> পরনে
> উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
> নীল ঘাগরা।—

তখন আমাদের বুঝতে একটু দেরি হয় না যে দু'মুখো নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক নতুন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই বইতেই আছে *পাথরের ফুল*, *ফিরে ফিরে*, *ঘোড়ার চাল*, *বাবুদের মত*, *মেজাজ* এবং *মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ*-এর মতো উৎকৃষ্ট কবিতা। এখানে ভাষণদানকারী কোনো পদ্যকারকে নয় আমরা পেয়ে যাই এমন একজন নিবিষ্টচিত্ত কবিকে, যিনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন আর আমরা শুনছি আড়াল থেকে। *বাবুদের মত* কবিতায় একটি আশ্চর্য-সুন্দর চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন তিনি—

গরাদের এপারে দেখো—<br>
কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাকে<br>
এক টুকরো রোদ<br>
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে<br>
হাঁটু মুড়ে<br>
যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে।

অক্লান্ত রাজনৈতিক কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায় এভাবে প্রত্যাবর্তন করলেন প্রকৃত কবিতার দেশে। এই ফিরে আসার সম্ভাবনা, যা কবিতার পাঠকদের পক্ষে তৃপ্তিকর, কবির চরিত্রেই নিহিত ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—"সকলের সঙ্গে থেকেও এক জায়গায় আমি নির্জন, নিঃসঙ্গ।" রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে প্রচুর সময় কাটিয়ে, মিছিলে স্লোগান হেঁকে, রাজপথে হেঁটে হেঁটে বহু দিন কেটেছে তাঁর; তিনি অবশ্য বলেছেন ঘর থেকে না বেরুলে তাঁর কবিতা আসে না,—তবু দলের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়াই তাঁকে কবিতা লিখিয়েছে, এটা স্বীকার করতে হবে। পরবর্তীকালে তিনি পার্টির কাজকর্ম থেকে, যতোদূর জানি, কিছুটা সরিয়ে এনেছিলেন নিজেকে। হয়তো ভেবেছেন সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড। তা বলে একজন শিল্পীর দায়িত্ব এবং অঙ্গীকার থেকে নিজেকে কখনও বিযুক্ত করেন নি। দেশ এবং মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা অটুট রয়েছে আজও।

*পদাতিক*-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দ এবং কথ্য-ছন্দের নিপুণ ব্যবহার করে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দ্বারা উন্মোচন করেছিলেন, এ-কথা আমরা ভুলি নি। *যতো দূরেই যাই* এবং এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে তিনি লৌকিক ভাষা আর বাংলা ইডিয়মের এমন সাবলীল রূপদক্ষ ব্যবহার করেছেন যা গৌড়জন মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছেন। সুভাষ তাঁর অনুজ কবিদের নতুন পথ দেখিয়েছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কাব্যিক সাহসের সীমা। এই কাজটি সাধারণত বড় মাপের একজন কবিই করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর *আমার কাজ* কবিতায় লিখেছেন—

আমি চাই কথাগুলোকে<br>
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।<br>
আমি চাই যেন চোখ ফোটে<br>
প্রত্যেকটি ছায়ার।<br>
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি—
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

সুভাষ চান আর না-ই চান, তাঁর শত আপত্তি সত্ত্বেও আমরা তাঁকে একজন কবিই বলবো। রসাস্বাদনের জন্য বারবার তাঁর কবিতার কাছেই যাবো। তাঁর অন্যান্য পরিচয়, যা তুচ্ছ না, আমরা অপেক্ষাকৃত গৌণ মনে করি। একজন বিবেকী, প্রধান কবি হিসেবে তিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন। বাংলাদেশে আমরা যারা তাঁর অনুরক্ত ভক্ত পাঠক তারা একটি ব্যাপারে তাঁর প্রতি ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। না, কোনো দুর্বল লেখার জন্য নয়। তাহলে বিষয়টি খুলেই বলি। আমাদের দেশের এক স্বৈরাচারী শাসকের আমন্ত্রণে সুভাষ ঢাকায় একটি সীমাবদ্ধ কবিসম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। আমরা তো সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে স্বৈরাচার, সামরিক দুঃশাসন, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা উচ্চারিত এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বলে জেনে এসেছি সবসময়। তিনি কী করে একজন ডিক্টেটর, মৌলবাদীদের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলেন? সেবার আমরা মর্মাহত হয়েছিলাম সুভাষের আচরণে। তবে একে প্রতিভার সাময়িক বিভ্রম ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি এবং আমাদের প্রিয় কবির জন্য আজও ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার দীপ অনির্বাণ রেখেছি।

# একজন কৃতী, অথচ অবহেলিত কথাশিল্পী

অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম, জীবনের সকাল, দুপুর পেরিয়ে এখন আমি পড়ন্ত বিকেলে। গোধূলিতে পৌঁছেও মনে হচ্ছে, তুরঙ্গ গতিতে চলে গেল বছরগুলো। এই তো সেদিন ছিলাম স্কুলগামী বালক আর আজ প্রৌঢ়ত্বের অপরাহ্ণের নিস্তেজ রোদ পোহাচ্ছি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কলেজ জীবনের কথা। পড়তাম ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে, আজ যা ঢাকা কলেজ নামে পরিচিত। এই কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে পুরনো হাইকোর্টের পাশ দিয়ে কখনো কখনো হেঁটে যাওয়ার সময় আশা-স্পন্দিত বুকে ভাবতাম, এই প্রাসাদের ভেতর একদিন প্রবেশ করবো, ক্লাস করবো, মন দিয়ে শুনবো অধ্যাপকদের বক্তৃতা। কারণ, আগে পুরনো হাইকোর্টই ছিল ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ; কিন্তু বিধি বাম। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম বটে; কিন্তু সেই প্রাসাদে প্রবেশাধিকার পেলাম না। কারণ ইতোমধ্যে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রমনা থেকে সিদ্দিক বাজারে স্থানান্তরিত। প্রাসাদ থেকে কুটিরে। প্রশস্ত সড়ক থেকে এঁদো গলিতে। কয়েকটি আলাদা আলাদা খুব ছোট বাড়ি নিয়ে কলেজ। মন খারাপ করে দেয়া পরিবেশ। দ্বিতীয়ত বিশ্বযুদ্ধের প্রতি আমার বিরূপতার এটিও একটি কারণ। কেননা, সেই মহাসমরের বিষময় ফলেই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের স্থানান্তর ঘটে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের চেয়ে সৈনিকদের দাবি বেশি। তাই সেই অট্টালিকায় ঠাঁই হলো সেনাদের, যাদের ছাড়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে না!

সিদ্দিক বাজারের ছোট বাড়িগুলো যতো পুরনো এবং অস্বাস্থ্যকরই হোক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ছিলেন খুবই ভালো, কেউ কেউ বেশ নামজাদা। *হারামণি* খ্যাত মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ভালো পড়াতেন না, তবে তাঁর বাউল-বাউল চেহারা ভালো লাগতো। প্রায়শ তাঁর ক্লাস ফাঁকি দিতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই নি। ভালো লাগতো এ. কে. এম. আহসানের এবং আবু রুশ্‌দ্ মতিনউদ্দীনের পড়ানো। তাঁদের ক্লাস কোনোদিন ফাঁকি দিই নি। আবু রুশ্‌দ্ আমাদের *শেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অফ ভেনিস* পড়াতেন। এ. কে. এম. আহসান এবং আবু রুশ্‌দ্ দু'জনই ছিলেন সুদর্শন এবং রুচিবান। এ.কে.এম. আহসান, যিনি পরবর্তীকালে অধ্যাপনা ছেড়ে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন, অধিকতর সপ্রতিভ ছিলেন। তবে আবু রুশ্‌দের ছিল বাড়তি আকর্ষণ, তিনি ছিলেন একজন সুলেখক।

তখনো আমার সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি হয় নি। সাহিত্যের বইও বেশি পড়ি নি। যে তিনজন মুসলমান লেখকের উপন্যাস সেকালে প্রথম পড়ি—তাঁদের অন্যতম আবু রুশ্‌দ্। সর্বপ্রথম পড়ি মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু।* ছেলেবেলায় আমি বিষাদ সিন্ধু নিজে পড়ি এবং আমার নানিকে পড়ে শোনাই। আজ মনে পড়লে হাসি পায় যে, একদা

আমার ছেলেবেলায় *বিষাদ সিন্ধুকে* আমি ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচনা করতাম, আমার নানি তো করতেনই। *বিষাদ সিন্ধু* আমার পড়া প্রথম উপন্যাস। এর পরে পড়ি কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ এবং তারপরই হাতে আসে আবু রুশ্‌দের উপন্যাস *এলোমেলো*। *এলোমেলো*, যতদূর মনে পড়ে, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলি। খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম আবু রুশ্‌দের প্রথম উপন্যাস পড়ে। কী বিষয়বস্তু, কী ভাষারীতি কোনো কিছুতেই *এলোমেলো*, *বিষাদ সিন্ধু* কিংবা *আবদুল্লাহর* সমগোত্রীয় নয়। *এলোমেলোর* কাহিনী আজ আর আমার মনে নেই। এখন সেই উপন্যাস পড়লে কেমন লাগবে, জানি না। সে বই এখন আর লভ্য নয়। মনে পড়ে, উপন্যাসের নায়কের নাম ছিল সাজ্জাদ। মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের ইংরেজি শিক্ষিত, রুচিবান এক যুবকের কাহিনী। সাজ্জাদকে অনুমান করি, লেখক অনেকটা নিজের আদলে গড়েছেন। মুসলমান লেখকদের কেউ কেউ যে আধুনিক সাহিত্যের পথে সদ্য পা বাড়িয়েছেন, *এলোমেলোতে* তার স্পষ্ট স্বাক্ষর ছিল। সেই উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেকালে বেশ কিছু শহুরে মুসলিম পরিবারে উদাসীন উর্দুচর্চার রেওয়াজ ছিল। আবু রুশ্‌দ্‌ বিশ্বস্ততা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে উর্দু জবানের কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর সেই ভাষারীতি এখনো অটুট আছে। তাঁর এই ভাষা ব্যবহারে কোনো জোরজবরদস্তির পরিচয় নেই। যেসব শব্দ আমরা অনেকে হরহামেশা কথাবার্তায় এস্তেমাল করি, অথচ সাহিত্যে প্রকাশ করতে অনাগ্রহী, আবু রুশ্‌দ্‌ সেসব লফ্‌জ্‌ অসঙ্কোচে এবং অনায়াসে ব্যবহার করেন। আমার তো খুবই ভালো লাগে এরকম শব্দ প্রয়োগে। এতে ভাষার পরিসর এবং জলুস বাড়ে বলে আমার ধারণা। বিদেশি যেকোনো ভাষা থেকে কিছু শব্দের প্রমিত আহরণ বাংলা ভাষাকে অধিকতর সজীব এবং সমৃদ্ধ করতে পারে। একথা তো আমরা ভালো করেই জানি, আমাদের কথাবার্তা এবং সাহিত্যে প্রচলিত বহু শব্দকে বাংলা বলে মানি আসলে যেগুলো অতিথি শব্দ।

যেদিন প্রথম অধ্যাপক আবু রুশ্‌দ্‌কে ক্লাসরুমে দেখি, সেদিন আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। তিনি কী বলছিলেন তাঁর বিশিষ্ট উচ্চারণে তার কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না, শুধু 'পোর্শিয়া' নামটি মাঝে মাঝে ভেসে আসছি কানে। না, ক্লাসরুমে কোনো কোলাহল ছিল না। সব ছাত্রই ছিল মনোযোগী। সম্ভবত শুধু আমি ভাবছিলাম *এলোমেলো* উপন্যাসের কথা, নায়ক সাজ্জাদের কথা। ইনিই তো লিখেছেন সেই উপন্যাস, যা আমি উপভোগ করেছিলাম কোনো শারদীয় দুপুরে। বিশ্বাসই হচ্ছিল না, সেই উপন্যাসের রচয়িতা আমার সামনে বসে আছেন; পড়াচ্ছেন আমাদের। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন তখন আমাদের কলেজে প্রায়শই ধর্মঘট হতো, তাই ক্লাসও হতো কম! ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে অন্তত আমার কোনো ঘনিষ্ঠতা হয় নি। হয়তো সেকালে আবু রুশ্‌দ্‌ আমাকে চিনতেনই না। কারণ, তখনো আমি লিখতে শুরু করি নি।

চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী এবং আমার শিক্ষক আবু রুশ্‌দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক বছর। মূলত বন্ধু রশীদ করীমের সৌজন্যে তাঁর অগ্রজ আবু রুশ্‌দে-র সাহচর্য এবং স্নেহলাভ করেছি। চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান লেখক শওকত ওসমান এবং সেই একই দশকের অন্যতম প্রধান কবি আবু রুশ্‌দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই, কখনো রশীদ করীমের বাসায়, কখনো আবুল

হোসেনের বাসায় আবু রুশ্‌দ্‌কে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি সশ্রদ্ধ মনে। সেসব গরোয়া আড্ডায় শওকত ওসমানও কখনো-সখনো থাকতেন। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি কখনো আমার প্রতি বিরূপ হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং তিনি আমার সঙ্গে সবসময় খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। এখনো তাঁর সেই হৃদয়ের উষ্ণতা শীতল হয় নি। তিনি মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ণ থাকেন; কিন্তু যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে তিনি হাসিমুখে কথা বলেছেন, কখনো-সখনো টেলিফোনে আমার খোঁজখবরও নেন। তাঁর সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক মতামত সবসময় আমার ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। খাপ খেতেই হবে, এমন কোনো কথাও নেই। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মধ্যে কোনো ভড়ং কিংবা ভণ্ডামি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তিনি যা বিশ্বাস করেন তা বলতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত;এরকম দেখি নি। তাঁর সততা তর্কাতীত। তিনি নিঃসন্দেহে একজন আধুনিক মানুষ, কিন্তু তাঁর শ্বশুর প্রয়াত লেখক আবু হাসানাতের মতো, আমার বিবেচনায়, অমন মুক্তিমতি নন। *যৌন বিজ্ঞান*-এর বিখ্যাত লেখক আবুল হাসনাতের সঙ্গে যথেষ্ট দেখাশোনা হয় নি বলে এখন আক্ষেপ করি। কারণ, তাঁর মতো মুক্তবুদ্ধির মানুষ বাংলাদেশে বিরল।

আমি বরাবরই আবু রুশ্‌দের ছোটগল্পের অনুরক্ত ভক্ত পাঠক। তাঁর লেখা *শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী* একটি অসামান্য গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থভুক্ত প্রায় প্রতিটি গল্প উঁচুমানের। সচ্ছল-মধ্যবিত্ত, তেমন সচ্ছল-নয় মধ্যবিত্ত সমাজের বাসিন্দাদের জীবনযাপন, তার চেয়েও বেশি তাদের মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, গল্প বলায় যে নান্দনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা কট্টর সমালোচকেরও তারিফ পাবে। অনেক বছর আগে এই গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যতোদূর জানি, *শাড়ী, বাড়ী, গাড়ীর* তিনটি সংস্করণ ছাপা হয়েছে। শুনি, এখনকার বাজারে ছোটগল্পের তেমন কদর নেই। তবু এই দুঃসহ অনাদরের মধ্যে ছোটগল্পের বইয়ের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া কম নয়। আবু রুশ্‌দ্‌ তাঁর নির্বাচিত গল্পগ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প সঙ্কলিত হয়েছে। এই গল্পগুলোর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলো ছাড়া আমার বিশেষ পক্ষপাত *বখশিস* গল্পটির প্রতি। এটি *শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী, দাহন, হারজিৎ, মালাকাল মওত ও আম্মাজান, জিন্নত মহলের আপাজান, ছেদ, হাড়, দুয়ে একে তিন, যোগ-বিয়োগ, মেঘাবৃত চাঁদ* এবং *পলাশ গাছে সাপ* যে-কোনো সঙ্কলনের মর্যাদার সঙ্গে ঠাঁই পেতে পারে। তাই যখন তাঁর নির্বাচিত গল্প-এ *শাড়ী, বাড়ী, গাড়ীর* ছয়টি ছোটগল্প সঙ্কলিত হতে দেখলাম, তখন বিস্মিত হই নি।

আবু রুশ্‌দ্‌ অনুবাদের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ, লালন শাহ এবং কয়েকজন আধুনিক বাঙালি কবির কবিতা তিনি ইংরেজি ভাষায় তর্জমা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এবং লালনের গান তিনি অনুবাদ করেছেন নিষ্ঠা এবং দরদ দিয়ে। সুখপাঠ্য হয়েছে তাঁর অনুবাদ। ইংরেজি ভাষার ওপর তাঁর দখলের কথা অনেকেই জানেন। তাঁর ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবারে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আগেও ছিল, এখনো আছে। তাই তিনি বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ইংরেজি জাননেঅলাদের মধ্যে অন্যতম বিবেচিত হবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কোনো কোনো বিদেশি কবির কবিতাও তিনি বাংলায় অনুবাদ

করেছেন। তাঁকে জানতে হলে তাঁর *আত্মকথা* পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্যপাঠ্য। আমার এই লেখা আবু রুশ্‌দের মূল্যায়নের কোনো প্রয়াস নয়। সেই যোগ্যতাও আমার নেই। আমার মনে হয়েছে, তিনি এদেশের একজন কৃতী লেখক হওয়া সত্ত্বেও অবহেলিত। আমার লেখা পড়ে যদি কেনো পাঠক আবু রুশ্‌দের রচনাবলি পড়তে উদ্বুদ্ধ হন, তা হলে জানবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

# বাংলাদেশের আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মোৎসব

আমি এখানে আমাদের প্রধান কথাশিল্পী রশীদ করীমের কোনো প্রতিকৃতি রচনার চেষ্টা করবো না, শুধু একটি রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টাশীল হবো। এই রেখাচিত্র, কবুল করছি, সম্পূর্ণ নয়। অসম্পূর্ণতার অপবাদ একে মনে নিতে হবে। আমি যে আত্মস্মৃতি লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিছুকাল আগে, কিছু অংশ লিখেও ফেলেছি, তা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তাকে তুলে ধরে হাঁটানোর ইচ্ছা আপাতত স্তিমিত। যদি কোনোদিন আমার জীবনকথা শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারি, তাহলে এর বেশ কিছু পাতা জুড়ে থাকবে রশীদ করীমের কথা। এই লেখায় থাকবে তাঁর বিষয়ে মোটা দাগের কিছু কথা।

রশীদ করীমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। যদিও প্রথম দর্শনে তাঁকে ভালো লেগেছিল, তবু তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দু'তিন বছরের প্রয়োজন হয়। আমাদের বন্ধুত্বের দৃঢ় বুনিয়াদে গড়ে ওঠে আস্তে আস্তে। তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনেক আত্মীয়ের চেয়েও তাঁর সখ্য আমার কাছে ঢের বেশি মূল্যবান। কারণ, তিনি আমার পরম বন্ধু, আমার আত্মার আত্মীয়। তাঁকে প্রথম দেখি অগ্রজ কবি আবুল হোসেনের ফ্ল্যাটে। অনেক বছর আগেকার কথা। তখন তিনি জ্বলজ্বলে কান্তিমান, সপ্রতিভ, বনেদি স্বভাবের মানুষ। আজো সুদর্শন তিনি, কিন্তু প্রাক্তন কান্তি ঈষৎ লুপ্ত। কিন্তু তাঁর স্বভাবের আভিজাত্য, কথা বলার সুন্দর ভঙ্গি, শুদ্ধ উচ্চারণ, রুচির তীক্ষ্ণতা এখনো পুরোপুরি বহাল আছে। কী করে যে আমাদের সম্পর্ক এমন গভীর হয়ে উঠলো আমি বলতে পারবো না।

আবুল হোসেনের সঙ্গে একটি স্থায়ী সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার, কিন্তু যাকে বলে বন্ধুত্ব, ইয়ারি সম্পর্ক, তা আমাদের মধ্যে গরহাজির। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, তিনিও আমার প্রতি স্নেহশীল। হয়তো বয়সের ব্যবধান আমাদের সম্পর্কের মাঝখানে এক ধরনের বেড়া তৈরি করেছে, যা ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি নি। রশীদ করীমও আমার সমবয়সী নন, তবে তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা আমাকে সহজেই তাঁর অনেক কাছে নিয়ে যায়। তিনি হয়ে ওঠেন আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন, আজ সম্ভবত প্রিয়তম বান্ধব। আমি আমার অন্য বন্ধুদের আহত করতে চাই না; তাঁদের কাছে আমি ঋণী, সংখ্যায় অল্প তাঁরা, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্বে কোনো ন্যূনতা অথবা কৃত্রিমতা নেই। তবে কারো কারো সম্পর্কে আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে, কারো কারো প্রতি আকর্ষণ হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। আপদেবিপদে তাঁরা পাশে এসে দাঁড়ান, উদ্বিগ্ন এবং উৎকণ্ঠিত বোধ করেন, রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন বন্ধুর অসুবিধা এবং অকল্যাণের কথা ভেবে। রশীদ করীম তেমন একজন বন্ধু। আমি তাঁকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। কখনো কখনো কৃতজ্ঞতায় চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, বাক্ রুদ্ধ হয়ে আসে।

তিনি গত ১৪ আগস্ট ঊনসত্তর বছর বয়সে পা রেখেছেন। এই উপলক্ষে তাঁর অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে সেদিন সংবর্ধিত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, অনেক আগেই এ ধরনের আয়োজন করা উচিত ছিল। অবশ্যই উচিত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের মধ্যে উদ্যোগী মানুষের বড় অভাব। তাই সদিচ্ছা থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেন না সহজে। ফলে কাজটি করা হয় না এবং আমাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। তবু যে রশীদ করীমের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হলো বড় আকারে, পারিবারিক গন্ডির বাইরে, এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আনন্দপ্রদ এবং তৃপ্তিকর। তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখক এবং বুদ্ধিজীবীরা। আরো অনেকে আসতে পারেন নি ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য। আমন্ত্রণপত্র ঠিকমতো বিলি করা হয় নি বলে রশীদ করীমের অনেক অনুরাগী এই পরিচ্ছন্ন, রুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকেছেন। যদি আমন্ত্রণপত্র সবার কাছে পৌঁছতো, আমার বিশ্বাস, জাদুঘর মিলনায়তনে অতিথিদের অনেকের জন্যই আসন বরাদ্দ করা যেতো না।

রশীদ করীম সংবর্ধনা পরিষদ এই জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য স্যুভেনির প্রকাশ করেছে। এতে বেশ কয়েকজন প্রবীণ এবং নবীন লেখক আমাদের প্রিয় কথাশিল্পী বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। আবুল হোসেন লিখেছেন, "সাফল্যের দুর্গম পথের নকশাটা তার চোখের সম্মুখে খুলে গেল। চূড়ায় উঠতেও দেরী হলো না। সেই মুহূর্তে নীচে থেকে তাকে অতো উঁচুতে অনেকেই ঠিকমতো ঠাহর করতে পারেন নি। যাদের চোখ ভালো তারা ঠিকই দেখেছিলেন। এখন যে সবাই দেখছেন, তা যদি আমাদের মায়োপিয়া সেরে ওঠার লক্ষণ হয়, তাহলে অন্যেরা আশ্বস্ত হবেন।" ডক্টর খান সারওয়ার মুরশিদের পুরো লেখাটাই উদ্ধৃতিযোগ্য। আমি শুধু প্রথম বাক্যটি উদ্ধৃত করছি, "জীবনের একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক, মানুষ সম্পর্কের বিচিত্রতা এবং রহস্যের কৌতূহলী সূক্ষ্ম অভিসারক ও বিশ্লেষক, সমাজমানসের আশ্চর্য নির্ভুল আবহাওয়াবিদ, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি পারঙ্গম, নিপুণ রূপস্রষ্টা রশীদ করীম আমাদের উপন্যাসের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।" ডক্টর মুরশীদ রশীদ করীমের গদ্যশৈলীর প্রসঙ্গে মুসলিম আশরাফি জবানের আমেজের কথা বলেছেন। এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রশীদ করীমের অন্যতম বন্ধু জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতে, "তাঁর মধ্যে দেখেছি দুর্লভ সততা ও সত্য-সন্ধিৎসা, দেখেছি একজন খাঁটি মানুষ, একজন ব্যক্তি যাঁর মধ্যে বাঙালিত্ব ও বিশ্ব-নাগরিকত্ব এক সঙ্গে মিলেছে, একজন সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যভোক্তা যাঁর মনের পরিমণ্ডলে সর্বক্ষণ বয়ে চলেছে সাহিত্যের সুবাতাস, যাঁর সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটালে সেই সুবাতাসের স্বাস্থ্যকর স্পর্শ পাওয়া যায়।"

রশীদ করীমের পরবর্তী প্রজন্মের শক্তিশালী লেখক হাসনাত আবদুল হাই বলেন, "সৃজনশীল সাহিত্যের উজ্জ্বল মেধা এবং পরিশীলিত মননশীলতার নিপুণ ব্যবহারে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রচারবিমুখ এই লেখক সমালোচকের সপ্রশংস দৃষ্টি যেমন আকর্ষণ করেছেন, একইভাবে শ্রদ্ধেয় এবং সমাদৃত হয়েছেন পাঠকের কাছে।" পঞ্চাশের দশকের সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের কোনো লেখা এই স্যুভেনিরে নেই, তিনি নিজেও

সংবর্ধনা সভায় ছিলেন অনুপস্থিত। তবে দু'এক মাস আগে তিনি তাঁর *হৃৎকলমের* টানে শীর্ষক বিখ্যাত কলামে রশীদ করীম বিষয়ে সপ্রশংস আলোচনা করেন। পান্না কায়সার আক্ষেপের সুরে বলেন, "ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অমায়িক। রসিক। বাকপটু ও বন্ধুবৎসল। এমন একজন ব্যক্তির সাহচর্যে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়, মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর সাহচর্য আরো আগে পেলে আরো বেশি উপকৃত হতাম।" তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য খুবই আন্তরিক। তিনি লিখেছেন, "মানুষ তো অনেক দেখেছি জীবনে, এত হৃদয়বান মানুষ কমই দেখেছি। আমার সঙ্গেও দেখা হল, নক্ষত্রের নাগাল পাওয়া গেল, আর তখনই তিনি অসুস্থ হলেন। তাঁর হঠাৎ অসুস্থতা আমাকে এত বেশি চূর্ণ করেছিল যে চোখের সামনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মৃত্যু দেখেও আমি এত বেদনা অনুভব করি নি।"

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের কোনো বক্তব্য স্যুভেনিরে লভ্য নয়। তবে অনুষ্ঠানে তিনি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি পূর্বসূরির প্রতি একজন উত্তরসূরির উচ্চারিত সশ্রদ্ধ প্রশংসা-বাক্য। তিনি বলেন, রশীদ করীম জনপ্রিয় লেখক নন, জনপ্রিয় হওয়ার প্রয়োজনও নেই তাঁর। তিনি লেখকদের লেখক। ইমদাদুল হক মিলন রশীদ করীমকে সতীনাথ ভাদুড়ী এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের সমগোত্রীয় এবং সমতুল্য লেখক বলে মনে করেন।

অনুষ্ঠানে রশীদ করীমের শরিকে— হায়াৎ অর্থাৎ স্ত্রী সালিমা, যিনি 'ফুল' বলে অধিক পরিচিতা, উপস্থিত ছিলেন। তিনি উৎসুক, হয়তো কিছুটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন স্বামীর দিকে। তিনি নিবিড় মনোযোগে শুনছিলেন বক্তাদের কথা। লেখকের স্ত্রী হওয়া বড় সুখের কথা নয়। অনেক ঝুট-ঝামেলা পোয়াতে হয় তাকে। বেগম সালিমা করীম বহু বছর ধরে স্বামীকে আগলে রেখেছেন প্রীতিবন্ধনে। যাতে তার সাহিত্যেক স্বামীর এতোটুকু কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখেন সর্বক্ষণ। আমার বন্ধু রশীদ করীম সবসময় শরীফ মেজাজে থাকেন না, কখনো কখনো বেশ খিটখিটে ও তিরিক্ষি হয়ে ওঠে তাঁর মেজাজ। সেই মেজাজের তীব্র আঁচ লাগে সালিমা করীমের মনে। তিনি প্রায় মুখ বুজে সহ্য করেন এসব, কারণ তিনি ভালো করেই জানেন, দু'মিনিটের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে স্বামীর গরম মেজাজ। আর জীবনসঙ্গী যে তাঁকে আদরযত্নে রেখে পরোক্ষভাবে আমাদের সাহিত্যেরও, বলা যেতে পারে, সেবা করে চলেছেন। অক্ষুণ্ণ থাক তাঁদের প্রণয়বন্ধন।

রশীদ করীমের প্রিয় প্রসঙ্গসমূহের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র সাহিত্য এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ অসামান্য এবং গভীর। তিনি বারবার ফিরে যান গীতবিতানের কাছে। কতো সকাল-সন্ধ্যা তাঁর কেটেছে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে। আমি বেশ কিছু সঙ্গীতময় সকাল-সন্ধ্যা যাপন করেছি তাঁর ঘরে। কখনো-কখনো তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের, তাঁর ভালো-লাগা সঞ্চারিত করেছেন আমার মধ্যে। অসুস্থতার দরুন তিনি এখন পড়তে প্রায় অক্ষম, তবু এরই মধ্যে, দৃষ্টিশক্তির ঈষৎ বিপর্যয়ের ভেতরেও একটু-আধটু রবীন্দ্রনাথের লেখাই পড়েছেন নতুন করে।

রশীদ করীম একজন বিদগ্ধ সমলোচক হিসেবেও প্রথম সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, তাঁর সমকালীন লেখকদের সম্পর্কেও তিনি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যাঁকে তিনি শক্তিমান লেখক বলে বিবেচনা করেছেন, তিনি বয়সে যতো তরুণই হোন, তাঁকেই তুলে ধরেছেন পাঠক সমাজে। সৈয়দ শামসুল হক যখন আজকের মতো খ্যাতিমান ছিলেন না, তখন পাকিস্তান জমানায় রশীদ করীম তাঁর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায়। প্রতিভাবান কথাশিল্পী মাহমুদুল হক বিষয়ে প্রথম লিখিত আলোচনাটিও রশীদ করীমের। নতুন লেখকদের সাহিত্যিক গুণাবলি শনাক্ত করার ক্ষমতা তাঁর অসামান্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। পড়বেন প্রাচীন গ্রিক নাট্যকারদের রচনাবলি, শেক্‌সপিয়ারের নাটক এবং কবিতা, সর্বোপরি রবীন্দ্র রচনাবলি। আমার মতো অভাজনের নগণ্য রচনাও তাঁর দৃষ্টির দাক্ষিণ্য লাভ করবে। ইতোমধ্যে গত ১৪ আগস্ট যে বাংলাদেশের আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মোৎসব পালিত হলো, এটা আমাদের জন্য গৌরবের ব্যাপার। এরকম একটি বাক্য লেখার লোভ সামলাতে পারলাম না বলে, আশা করি, কেউ কিছু মনে করবেন না। আসুন, আমরা সবাই রশীদ করীমের সম্মানে আমাদের টুপি খুলে নিই।

## 'সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া'

ভোরবেলা ঘুমভাঙা চোখে যখন ঘরের ভেতর এবং বাইরে তাকাই, একটা আশ্চর্য ভালো-লাগার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র সত্তায়। 'আঃ, বেঁচে আছি। আজো চোখের আলোয় দেখতে পেলাম এই সুন্দর পৃথিবীকে।' বেঁচে থাকার আনন্দ হৃদয়জুড়ে নেচে ওঠে ময়ূরের মতো। যদি চোখ না খুলতে পারতাম, যদি থেমে যেতো আমার হৃদস্পন্দন, তাহলে কী হতো? আমার চোখ থেকে অপসৃত হতো সুন্দর, চেতনা লুপ্ত হতো, মুছে যেতো আমার স্মৃতিসমুদয়। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যেতো আমার অস্তিত্ব। আমি 'না' হয়ে যেতাম। তাই, ভোরবেলা জেগে উঠে আমার মন খুশিতে ভরে যায়। কেউ আমাকে 'সুপ্রভাত' বলবে অথবা 'গুড মর্নিং' বেজে উঠবে কারো কণ্ঠস্বরে, এই প্রতীক্ষায় থাকি। অপেক্ষা করতে ভালো লাগে।

ক'দিন আগেকার কথা। ভোরবেলা বেজে উঠলো টেলিফোন। রিসিভার ধরার সঙ্গে সঙ্গেই ওপার থেকে ভেসে আসে, 'সুপ্রভাত।' মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি চমৎকার। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রাক্তন ছাত্রী। তার শরীর ও মন দুটোই সুন্দর। শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য কোনো কৃতিত্ব তার প্রাপ্য নয়, তবে মানসিক ঐশ্বর্যের দাবিদার তিনি সহজেই হতে পারেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তার অকৃত্রিম। বিশেষ করে কবিতার প্রতি তার পক্ষপাত আমাকে। এই সংস্কৃতিমনস্ক, রুচিশীলা নারী নিজের জীবনকেই একটি শিল্পে পরিণত করেছেন। যা হোক, সেদিন কুশল বিনিময়ের পর তিনি টেলিফোনে জানালেন, আজ সকালবেলা আপনার একজন প্রিয় কবির কবিতা পড়ে ভালো লাগলো। সংবাদ-এ ছাপা হয়েছে। কবিতার *সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া।* খুব ভালো লেগেছে আমার। আরো তিনটি কবিতা আছে মহাদেব সাহার। সেগুলো খারাপ বলছি না, তবে এটিই আমার বেশি ভালো লেগেছে। এ বলে তিনি পুরো কবিতাই আবৃত্তি করে শোনালেন—

> সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া,
> হৃদয়ের তর্জমা নিষিদ্ধ মননের সম্মুখে প্রাচীর,
> বিবেক নিয়ত বন্দী, প্রেমের বিরুদ্ধে পরোয়ানা;
> এখানে এখন পাখি আর প্রজাপতি ধরে ধরে
> কারাগারে রাখে—
> সবাই লাঞ্ছিত করে স্বর্ণচাঁপাকে;
> সুপেয় নদীর জলে ঢেলে দেয় বিষ, আকাশকে
> করে উপহাস

আলোর বিরুদ্ধাচারী আঁধারের করে স্তুতি,
বসন্তের বার্তা শুনে জারি করে পূর্বাহ্ণে কারফিউ;
মানবিক উৎসমুখে ফেলে যেতো শিলা ও পাথর—
কবিতাকে বন্দী করে, সৌন্দর্যকে
পরায় শৃঙ্খল।

কবিতার পাঠিকা এবং আবৃত্তিশিল্পী তার ভালো-লাগা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। মহাদেব সাহার এই কবিতা শুনলাম, পরে নিজে পড়লামও। যিনি প্রথম এই কবিতার খবর জানালেন তার কাব্যরুচির প্রতি আমি আস্থাশীল। তিনি ভালো কবিতা ঠিকই শনাক্ত করেন। *সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া* কবিতায় কবি বাংলাদেশের বর্তমানে মৌলবাদকবলিত পরিস্থিতির রূপায়ণ করেছেন সুপ্রযুক্ত প্রতীকে, শিল্পিত ভাষায়। একজন মানবতাবাদী, সৃজনশীল মানুষের মনোবেদনাকে বাঙময় করে তুলেছেন মহাদেব।

মহাদেব সাহা কবিতা লিখতে শুরু করেন বালক বয়সে। তখনকার সেসব কবিতা প্রকাশিত হয় *মুকুলের মহফিল* এবং *কচি-কাঁচার-আসর*-এ। সেই কবিতাবলি সম্পর্কে স্বভাব-লাজুক মহাদেব নিশ্চুপ থাকতে পছন্দ করেন। আমরাও সেই প্রত্নরচনাসমূহ বিষয়ে তেমন উৎসাহী নই। ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি যখন কবি হয়ে উঠলেন তখন থেকেই এই কবি আমাকে তাঁর প্রতি মনোযোগী করে তোলেন। আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ এবং মহাদেব সাহা, বলা যেতে পারে, প্রায় একই সঙ্গে আমাদের কাব্যক্ষেত্রে। এই তিনজনের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণই সবচেয়ে জনপ্রিয়। নির্মলেন্দু গুণের মতো এতো জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশের কাব্যভুবনে কোনো দশকেই আসেন নি। তাঁর জনপ্রিয়তা আজো অটুট। মহাদেব সাহা আমাদের উৎকৃষ্ট কবিদের অন্যতম। এই নিভৃতচারী, অভিমানী কবি কখনো হৈ-চৈ করেন না, নীলকণ্ঠ, প্রগতিশীল চেতনা নিয়ে অবিরত কবিতা লিখে চলেছেন।

কিছুকাল থেকে শুনে আসছি, কবিতার বই তেমন বিক্রি হয় না আর, এমনকি সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণের কাব্যগ্রন্থের কাটতিও নাকি অনেক কমে গেছে। কবিতার জনপ্রিয়তায় ভাটা এসেছে, শোনা যায়। কিন্তু মহাদেব সাহা কবিতার জনপ্রিয়তা অনেকাংশে ফিরিয়ে এনেছেন। এবারের বইমেলায় তাঁর দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বই দুটির নাম *কোথায় যাই, কার কাছে যাই* এবং *যদুবংশ ধ্বংসের আগে*। উভয় কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বই মেলাতেই ফুরিয়েছে। এ জন্যই উপরোক্ত মন্তব্য করতে প্রলুব্ধ হয়েছি।

মহাদেব সাহার প্রথম কবিতার বই *এই গৃহ এই সন্ন্যাস* প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে। তারপর অনেক পথ পাড়ি দিয়েছেন মহাদেব সাহা। কবি হিসেবে তাঁর উত্থান হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। তিনি এখন বহুলপঠিত, নন্দিত কবি। তাঁর শব্দচয়ন, চিত্রকল্প নির্মাণ সহজেই পাঠক-পাঠিকাদের আকর্ষণ করে। খুবই আবেদনময় তাঁর কবিতা। মহাদেব তার *কোথায় যাই, কার কাছে যাই* কাব্যগ্রন্থে *কবির হৃদয় কাঁদে* শীর্ষক একটি কবিতায় বলেছেন, 'কবি কাউকেই কঠিন দণ্ড দিতে পারে না কখনো/সইতে পারে না সবচেয়ে শত্রুরও দুঃখ/, কবির হৃদয় কাঁদে, সকলের দুঃখে কাঁদে/যার শাস্তি চেয়ে সে হয় কঠিন বিপদগ্রস্ত/এমনকি একদিন সেই অপরাধীর দুঃখেও/তার বুক ভেসে

যায়।' এই পঙ্‌ক্তিমালা যার কলম থেকে নিঃসৃত হয় তিনি যে মানবিকতাবোধে কতোটা উদ্দীপ্ত, কতো উদারচিত্ত তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তার হৃদয় কাঁদে সকলের জন্য। নিজের অসহায়তা, আপনজনের নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদির জন্য তার দুঃখবোধ আছে, দুঃখবোধ আছে সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের তুমুল আস্ফালনের জন্য, মানুষের মনুষ্যত্বহীনতার জন্য। বস্তুত তিনি অনেকের জন্য দুঃখ পান। আসলে প্রকৃত শিল্পীই সকল মানুষের হয়ে দুঃখ পান। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর ভারতে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ ঘটে, বাংলাদেশে মন্দির ভাঙা এবং লুটপাটের যে ধুম লেগে যায় তাতে প্রতিটি বিবেকবান, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির মতো মহাদেব সাহাও অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি কয়েকটি মর্মস্পর্শী কবিতা লেখেন। সেসব কবিতা রসোত্তীর্ণও বটে। তবে কখনো কখনো তাঁর কবিতা বড়ো বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক হতে অনুরোধ জানাই। মহাদেব সাহা যেমন দেশের পরিস্থিতি, স্বকালের সঙ্কট বিষয়ে যেমন দক্ষতার সঙ্গে লেখেন, তেমনি নৈপুণ্যের সঙ্গে রচনা করেন প্রেমের কবিতা। তাঁর ছোট একটি প্রেমের কবিতা উদ্ধৃত করি—

> কিছুই চাই না, দয়াময়ী, এইটুকু
> ভিক্ষা শুধু দাও,
> তোমার অতল জলে আমাকে ডোবাও।

*তুমি একবার ছোঁয়ালে আঙুল* আরেকটি চিত্তাকর্ষক প্রেমের কবিতা। *যদি তুমি* শীর্ষক চার পঙ্‌ক্তির কবিতাটি পড়লে আন্দোলিত হবে যে-কোনো প্রেমিকের মন। *যদুবংশ ধ্বংসের আগে* কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় লিখেছেন, 'আমি কিছুই পারি নি, ঠেকাতে পারি নি, এই অশুভ ভাঙন,/এই ধ্বংস, সর্বনাশ—/আমার চোখের সামনে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো/মানুষ, পৃথিবী/আমি তার পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারি নি।' মহাদেব কিছুই পারেন নি, এ কথা মানতে আমি নারাজ। অনেক কিছুই করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু এই ইতর সময়ে একজন সৎ, ভালো মানুষ হতে পেরেছেন আর আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন অনেকগুলো উৎকৃষ্ট কবিতা। সেসব কবিতা লেখার সময় তাঁর মর্মমূল হয়তো ছিঁড়ে গেছে, হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বারবার। পাঠক-পাঠিকারা কি কবির মনোকষ্ট নিয়ে মাথা ঘামান। তারা মনের মতো কবিতা পড়তে পেলেই তৃপ্ত, তৃপ্ত। ক্ষীণায়ু, কিটসের চিরায়ু কবিতা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু প্রিয়তমা প্যানি ব্রাউনের জন্য তিনি কতো মনোকষ্টে ছিলেন, সে কথা একবার কি ভেবে দেখি কবিতা পাঠের সময়? হয়তো কারো কারো মনে পড়ে যায় সে কথা। এই পর্যন্তই।

## ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে

কিছুদিন আগে ঝালকাঠিতে কবিতা চক্র আয়োজিত কবিতা উৎসব এবং সিকান্দার কবীরের গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। এই উৎসবে ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত ছিলাম আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ এবং আমি। অনুষ্ঠান-কর্তারা আমার জীবনসঙ্গিনী জোহরা বেগমকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঝালকাঠিতে এই প্রথমবারের মতো গেলাম। সুগন্ধা নদীর তীরে অবস্থিত এই ছোট, স্নিগ্ধ শহরটির একটি আলাদা শ্রী আছে। সবচেয়ে ভালো লাগলো ধানসিঁড়ি নদী দেখে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ধানসিঁড়ি নদীর উল্লেখ পাই। এই নদী দেখার খুব শখ ছিল আমার। এই নদী নিয়ে কত কল্পনা করেছি, কখনো-কখনো মনে হয়েছে, হয়তো এ নামের কোনো নদী নেই কোথাও, জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছেন এমন সুন্দর একটি নাম। তাঁর মনোভূমিই ধানসিঁড়ি নদীর উৎস। কল্পনার নদীটিকে বাস্তবে দেখতে পেয়ে কী-যে ভালো লাগলো। ধানসিঁড়ি নদীর দুই তীরে চোখ-জুড়ানো সারি সারি বাবলা গাছ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে লাগানো হয়েছে। স্পিড বোটে বসে আকাশের দিকে তাকালাম, যদি একটি কি দুটি শঙ্খচিল দেখা যায়। দেখতে পেলাম না। ধানসিঁড়ি নদীটির ওপর শঙ্খচিল আজো কি কেঁদে কেঁদে ওড়ে? জানি না।

ঝালকাঠির নৈসর্গিক শোভা নজর কেড়েছে বটে, তবে মনে কেড়েছেন সেখানকার কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সংস্কৃতিকর্মীরা। তাঁরা আমাদের কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, আমরা অভিভূত হয়েছি তাঁদের আন্তরিকতায়, উদার আতিথেয়তায়। ঝালকাঠিতে একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান। সেখানে বিধুভূষণ চক্রবর্তীর মতো সমঝদার লেখক আছেন, আবুল হোসেন মিলুর মতো কবি ও গীতিকার আছেন, আছেন সংস্কৃতিমনস্ক আবৃত্তিকার সুভাষ দাশ। তরুণ আবৃত্তিকার শহীদ মল্লিকের কথা মনে পড়ে। যখন র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে চড়া রোদে হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তখন তরুণ আমার জন্য একটি রিকশা ঠিক করলেন। রিকশাঅলাকে চালাতে না দিয়ে তিনি নিজে সারা পথ রিকশা চালিয়ে নিয়ে গেলেন। এই ঘটনা সহজে ভুলতে পারবো না। মনে পড়ছে সাংবাদিক মানিক রায়, বিপ্লব সাহা এবং বেশ কয়েকজন উঠতি কবির কথা। মণি আখতার *সংখ্যালঘু* নামে একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা শুনিয়েছিলেন কবিতাপাঠের আসরে। তার এক ভীতসন্ত্রস্ত বান্ধবীর ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনা কবিতার বিষয়বস্তু। তরুণ কবি মানিক মল্লিকের বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ এবং হাসি বারবার মনে পড়ে। মনে পড়ে অপর্ণা, হালদার ভগ্নিদ্বয়, উত্তম ঘোষ, সঙ্গীতা, উত্তম দে-র কথা। জবা নামের এক মেয়ের কণ্ঠে শুনেছিলাম পুরনো দিনের বহু স্মৃতি-জাগানিয়া এক গান। দু'জন মেয়ের নাম ভালো লেগেছিল। তাদের নাম সম্ভবত বুমা এবং কণা। মনে পড়ছে না সেই স্নিগ্ধা

তরুণীর নাম, যার কণ্ঠে লতিয়ে উঠেছিল *ময়মনসিংহ গীতিকার* লৌকিক গান। ক্যামেরা হাতে সপ্রতিভ, কর্মচঞ্চল তরুণ খলিল এসে দাঁড়ান স্মৃতিপটে। উত্তম ঘোষ শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছেন। সুকণ্ঠ গায়ক এবং আবৃত্তিক। সম্প্রতি কবি লায়লা কবীরের একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে কবি সিকানদার কবীর ঝালকাঠির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণপুরুষ। তিনি বেশ কিছুকাল ধরে কবিতা লিখছেন। ইতোমধ্যে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ আমরা পেয়েছি। প্রথম প্রকাশিত হয় *নষ্ট লেখা নষ্ট বেলা*, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম *ষাঁড়ের গর্দানে যাবে মালা* এবং সর্বশেষ কবিতার বইয়ের নাম *ছুঁয়ে যাই শোকের পাথর। ছুঁয়ে যাই শোকের পাথর*—এরই প্রকাশনা উৎসব ছিল ঝালকাঠিতে। সিকানদার কবীরের এই কবিতার বই নিয়ে খুব ভালো বক্তৃতা করলেন নির্মলেন্দু গুণ, বিধুভূষণ চক্রবর্তী এবং সুভাষ দাশ। মনোমুগ্ধকর ছিল নির্মলেন্দু গুণের আলোচনা। তাঁর এরকম আলোচনা আগে কখনো শুনি নি। তিনি আমাদের প্রথম সারির কবিদের একজন, নিজের কবিতা ভালো আবৃত্তি করেন, আড্ডা জমাতে দক্ষ। কিন্তু নির্মল যে এতো সুন্দর আলোচনা করতে পারেন, আমার ধারণা ছিল না। আসাদ চৌধুরী গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে শরিক হন নি। কবিতা উৎসবের প্রথম দিনই তাঁকে ঢাকা রওনা হতে হয়। অবশ্য তিনি কবিতাপাঠের আসরে এবং একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সুন্দর আবৃত্তি করলেন তিনি, তাঁর বক্তৃতাও চিত্তাকর্ষক হয়।

যাহোক, সিকানদার কবীরের গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে বিধুভূষণ চক্রবর্তী কবির বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে কবিতা বিষয়ে কিছু মূল্যবান কথা বলেন। মনে হলো, তিনি বেশ পড়াশোনা করেন। কবিতা বোঝার এবং কবিতা সম্পর্কে নিজের উপলব্ধির কথা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করার ক্ষমতা তাঁর আছে। সুভাষ দাশ, যাঁর শহীদ পিতার বিষয়ে সিকানদার কবীর একটি মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন, বক্তৃতা করে শ্রোতাদের মাতিয়ে দিতে পারেন। তাঁর ভরাট গলায় কবিতার আবৃত্তি শুনতেও খুব ভালো লাগে। সম্ভবত সিকানদার কবীরের *ছুঁয়ে যাই শোকের পাথর*-এর সবচেয়ে ভালো কবিতা *একাত্তরের একজন শহীদকে নিয়ে।* এই কবিতা যাঁকে নিয়ে, তিনি সুভাষ দাশেরই পিতা। কবিতাটি সুভাষকে উৎসর্গ করেছেন সিকানদার কবীর। সেই কবিতা শুরু হয়েছে এভাবে—

> কথাটি হাসির ছিলো না—
> অথচ তুমি কী করে যে হাসতে হাসতে বললে,
> আমিও একাত্তরে আমার পিতাকে হারিয়েছি
> একুশ বছর পব আমাকে কী পুরস্কার দেবে দাও।
> তুমি তো জানো, আসলে যথার্থ কোনো পুরস্কার নেই যা দিয়ে
> জীবনের কোনো বিনিময় হয়
> তবুও সেই মুহূর্তে আমি যদি তোমাকে সিরিয়াসলি বলতে পারতাম,
> বন্ধু, এই নাও বাংলাদেশ,
> তাহলে আমার দুঃখ ছিলো না।
> কিন্তু বিশ্বাস করো একটি জীবনের বিনিময়ে আমি তোমার হাতে

যা কিছু তুলে দোব—তা যদি পরিপূর্ণ না হয়
তবে তা তুলে দিয়ে অমন একটি মৃত্যুর সাথে
উপহাস করার স্পর্ধা আমার নেই—

সিকানদার কবীর একাধারে ভালো মানুষ এবং ভালো কবি। তিনি জানেন, এক নীরন্ধ্র তমসায় তাঁর বসবাস। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, "এখন ভালোবাসায় বিষাদের ছায়া ফেলে তারার তিমির/বিশ্বাসের মোহনায় সারাক্ষণ ওঁত পাতে হাঙর-কুমীর।/এখন আস্থার দিগন্তে ভেসে বেড়ায় ঈষাণের কালো মেঘ/মানস সরোবরে নিরন্তর ঢেউ তোলে কুৎসিত আবেগ।/এখন সভ্যতার শরীর খুবলে কায় বীভৎস আঁধার/প্রগতি মনন ও মেধা যেন দায়বদ্ধ নিরেট গাধার।" দেশ ও কালের পরিস্থিতি তাঁকে উদ্বিগ্ন করে, বেদনার্ত করে। ফলে তাঁর কবিতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, কখনো কখনো কবিকণ্ঠ উঁচু পর্দায় বেজে চলে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কবিদের এই ভূমিকা পালন করতেই যদি তিনি দায়বদ্ধ থাকেন দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি। কেউ কেউ কবির এই ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন শিল্পের দোহাই পেড়ে, নান্দনিকতার প্রশ্ন তুলে। কবিতা শিল্পরহিত হোক, নান্দনিকতাবিবর্জিত হোক, তা আমি চাই না। দেশের কথা, মানুষের কথা বললে শিল্প উবে যাবে, এ ধরনের উক্তিতেও আমার সায় নেই। শিল্পের দাবি মিটিয়ে, জীবনের দাবি মিটিয়েই একটি কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এটা মনে রাখবে না বলেই তাদের কবিতা রসোত্তীর্ণ হয় না। সুখের বিষয়, সিকানদার কবীর এ-কথা স্মরণে রাখেন, তবে কখনো-কখনো তাঁর কবিতার কোনো কোনা অংশ শুধু চিৎকার হয়ে ওঠে, যা কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর। কখনো কখনো তিনি অতিকথনের দরুন অকবিতার ফাঁদে পড়েন। যখন তিনি সতর্ক থাকেন তখন তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়ে যাই খাঁচা নামে একটি মিতবাক, সংহত কবিতা—

এই আছে—এই নেই
এই
নিয়ে
বাঁচা।
সুখের শিকল দিয়ে
গড়ে
তবু
খাঁচা।

সিকানদার কবীর শুধু প্রতিবাদী কবিতাই লেখেন না। প্রেমের কবিতাও তিনি লেখেন এবং লেখেন এমন দক্ষতার সঙ্গে যে তারিফ করতে হয়। সে সিরিজের তিনটি কবিতাই সুন্দর। হৃদয়ানুভূতিকে তিনি সংযত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আবেগ খাঁটি বলেই কবিতা তিনটি আমাদের মনে দাগ কাটে। প্রেমিক কবির উচ্চারণ হয়ে ওঠে আমাদেরও উচ্চারণ। *ছুঁয়ে যায় শোখেটর পাথর* গ্রন্থে আমরা যে কবিচিত্তের পরিচয় পাই, তার আরো উন্মীলন এবং সৃজনশীলতা আমাদের কাম্য। সিকানদার কবীরকে অধিকতর ছন্দোসচেতন হতে অনুরোধ জানাই।

## তাঁদের অবদানের অসম্মান যেন না করি

আমার মনের ভেতর এখন ধু-ধু মরুভূমি, এক ধরনের জাঁহাবাজ শূন্যতা মোড়লি করছে। যে টেবিলে ঝুঁকে প্রায়শই লিখি কিংবা বই পড়ি, সেই টেবিলটিকে কেমন বেগানা লাগছে। টেবিলে বইয়ের স্তূপ, চায়ের শূন্য মগ, টেলিফোন সেট, একটি অলস কম, কয়েকটি চিঠির খাম, অথচ মনে হচ্ছে কিছুই নেই। কেন এমন মনে হচ্ছে? মানুষের মন খুব বেশি খারাপ হলে কি এমন হয়? আমার মন ভালো নেই। একটা একান্ত ব্যক্তিগত কারণে আমার মন ভালো নেই। এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার কাছে আমি আমার বর্তমান মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারি। বস্তুত তা অবর্ণনীয়। বলতে চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবো।

এই মুহূর্তে চারদিকের সবকিছুকেই বড় অবাস্তব মনে হচ্ছে। বারবার মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি—'সমাজ সংসার মিছে সব,/মিছে এই কলরব।' আমাকে কি বৈরাগ্য দখল করে ফেলেছে? জানি না। আমি তো কখনও বৈরাগ্য সাধনায় মগ্ন হই নি। এতোকাল আমি পৃথিবীর রূপরসগন্ধ পুরোপুরি উপভোগ করতে চেয়েছি, মানুষকে ভালোবেসেছি, সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের ধ্যান করেছি, মগ্ন থেকেছি শিল্প সৃষ্টিতে। সংসার ত্যাগ করে বনবাদাড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর সাধকে মনে ঠাঁই দিই নি।

আমি জানি, এই যে নিজের মনখারাপের বার্তা রটিয়ে দিচ্ছি কাগজের পাতায় তা অনেকের কাছেই অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ঠেকবে। দেশের মানুষের নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে, সেসব সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খবরের কাগজের পাঠক-পাঠিকারা পত্রিকা খুললেই নানা ধরনের খারাপ খবরের খোঁজ পাবেন। বিশ্বজোড়া কতো মন-খারাপ-করা খবর। কোথাও ভূমিকম্প, কোথাও বন্যা, কোথাও বিমান দুর্ঘটনা, কোথাও আবার বোমারু বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি। এসব খবর পড়ে আর যাই হোক পুলকিত হওয়ার কথা নয়। এই ধরনের সংবাদের পাশাপাশি আমার মনখারাপের খবর এমনই তুচ্ছ যে, নীরবতাই শোভনীয়।

তবে এ কথাও ঠিক, আমার মন তো আর খামোকাই খারাপ হয় নি, যদিও অনেকের মন এমনি-এমনি খারাপ হয়ে যায়। এই অকারণ মন খারাপের কথা মহামতি শেক্‌সপিয়রও তাঁর একটি নাটকের শুরুতেই বলেছেন। 'ভেনিসের বণিক' নামের নাটকের মুখ্য চরিত্র অ্যান্টোনিও বলছেন, 'আই নো নট হোয়াট আই এম সো স্যাড।' অ্যান্টোনিও অবশ্য মনে বিষণ্ণতার কথা বলেছেন। তবে বিষণ্ণতা মন খারাপেরই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী অথবা যমজ ভাই। অ্যান্টোনিও জানতেন না সে কেন বিষণ্ণ। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি কেন আমার মনখারাপ। নানা কারণেই বর্তমানে আমার মনখারাপ। আমি বিষণ্ণ, যদিও

কখনও কখনও বিষণ্ণতার কারণ খুঁজে পাই না। আগেই বলেছি, আমার মনখারাপ মানে বিষণ্ণতার একটি অপ্রকাশ্যযোগ্য কারণ রয়েছে।

এই কারণ আমি শুধু শামসুর রাহমানকেই বলতে পারি, আর কাউকে নয়। সে কথা থাক। নানা কাজে যুক্ত থেকে মনে একটা ফুরফুরে ভাব জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টাশীল হওয়ার ব্যাপারটি আমাকে পীড়িত করে, মনে এক ধরনের অবসাদের সৃষ্টি হয়। আমি কি কাজী নজরুল ইসলামের মতো 'জাহান্নামে বসে পুষ্পের হাসি' হাসবো? নিজেকে নজরুল ভেবে বসার বেয়াদবি করতে পারবো না। কিন্তু আমারও চরম কষ্টের মধ্যেও কখনও কখনও হাসি পায়। সেই হাসি পুষ্পের হাসি হয় কি না তা দর্শকদেরই বিবেচনার মুখাপেক্ষী।

আজকাল রাতের বেশির ভাগ সময় নির্ঘুম কাটে। যেটুকু ঘুমোই, হিজিবিজি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে নয়, জাগ্রত অবস্থাতেই প্রায়শই একটি ধাবমান, ধারালো কুড়াল নাচতে থাকে দৃষ্টিপথে। এক হিংস্র তরুণ ধেয়ে আসছে আমার দিকে। মূর্তিমান এক বিভীষিকা দেখে আমি পাথরের মতো স্থির, বাকশক্তিরহিত।

বারবার এই দৃশ্য ফিরে আসে আমার স্মৃতিতে। দৈবক্রমে হন্তারকের হাতিয়ার আমার বুক চিরে ফেলে নি, মাথা ঘাড় থেকে আলগা হয়ে ছিটকে পড়ে নি ফ্লোরে। গত ১৮ জানুয়ারি আমার জীবনের শেষ দিন হতে পারতো। পরে জানা গেল, যে তিনজন তরুণ আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছিল তারা 'হারকাতুল জেহাদ' নামের এক উগ্র মৌলবাদী দলের সদস্য।

কেউ কেউ এ রকমও মন্তব্য করেছেন বলে শুনেছি, 'শামসুর রাহমান তো মরে নি, তাহলে এটা মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্র হয় কীভাবে? 'যেন আমাকে মরে প্রমাণ করতে হবে যে সত্যি সত্যি আমাকে মারার জন্য এসেছিল ওরা। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্পের শেষ লাইনটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' আমার কোনো কোনো শুভানুধ্যায়ীর (?) সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমাকে ঘাতকের হাতে খুন হয়ে প্রমাণ করা উচিত ছিল যে হত্যার প্রচেষ্টাটি ছিল সত্য। কোনো কোনো চিহ্নিত পত্রিকা তো এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটিকে তুচ্ছ করে তোলার জন্য কতো অপচেষ্টাই না করেছে।

এই সবকিছুর পর যদি বলি আমি বিষণ্ণ, আমার মন ভালো নেই, তাহলে কি আপনারা বিরক্ত অথবা অপ্রসন্ন হবেন আমার প্রতি! যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আশা করি, আমি আবার পুরোপুরি প্রফুল্ল হয়ে উঠবো, সরে যাবে মন-খারাপের মেঘ, বিষণ্ণতা আমার প্রহরগুলোকে কালো করে রাখবে না অধিকাংশ সময়। লেখার টেবিলকে বেগানা মনে হবে না আর।

এই লাইনটি লেখার সঙ্গে আমার মায়ের মুখ, প্রিয়জনদের মুখ ভেসে উঠলো স্মৃতির রঙিন পথে। মনে হলো আম্মা অনেক দূর থেকে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন আমার ঘরে, স্নেহার্দ্র হাত রাখলেন আমার মাথায়। যেন তিনি খুব আস্তে কোমল কণ্ঠস্বরে বললেন, 'আমি জানি, তুমি কোনো অন্যায় করো নি, সাহস হারিও না, আদর্শচ্যুত হয়ো না কখনও।

আমার দোয়া তোমার চিরসঙ্গী।' জানি না স্বপ্ন দেখছিলাম কি না। আমি কি ভুল শুনেছি তাঁর কণ্ঠস্বর? তাঁর সফেদ অনুপস্থিতি কেন যেন আমার কাছে উপস্থিতির অধিক মনে হলো সেই মুহূর্তে। জীবদ্দশায় তিনি যে আলো সঞ্চারিত করেছেন আমার চেতনায়, সেই আলো ধর্মীয় উন্মাদনা, সন্ত্রাস, জাহেলিয়াত এবং হতাশার অন্ধকারে আমাকে পথ দেখাবে। তাছাড়া বিভিন্ন কালের মহাপুরুষদের আলোকিত অবদানের কিছু না কিছু সঞ্চয় তো রয়েছেই আমার মানসে। তাঁদের অবদানের অসম্মান কোনো দিন যেন না করি।

৮.২.৯৯

# স্মৃতিচারণ



## স্মৃতির শহর

আমি রাজপুত্তুর নই, তাই আমার ডানাঅলা ঘোড়া পক্ষিরাজ নেই। পক্ষিরাজ নেই, কিন্তু আছে ঘুরে বেড়ানোর শখ। ধুলোওড়া পথ, ছায়ামাখা পথ, লোক-গিজগিজ পথ, সুনসান পথ—সবরকম পথ ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে আমার। ভালো লাগে পথে যেতে-যেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে নানা জিনিস, খুঁটিনাটি অনেক কিছু। এই ধরো, গাছগাছালি, পাখপাখালি, নোড়ানুড়ি, কাটকুটরো, কত্তকিছু দেখি চোখ মেলে। কখনো চলতে চলতে, কখনো দাঁড়িয়ে খানিক। লোকজন, বাড়িঘর—তাও দেখি। যখন কোনো পুরোনো বাড়ি চোখে পড়ে, মন কেমন উদাস হয়ে যায়। এমন বাড়ি, যার সারা শরীরে সবুজ রঙের শ্যাওলা, এখানে-ওখানে বুনো গাছের উঁকিঝুঁকি দরজা খোলা, অথচ ভেতরে ঢুকতে ভয় করে, গা শিরশির করে ওঠে! ঐ গা ছমছম করা বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবি, কারা থাকত এখানে? ভালো করে দেখি, দরজায় বাঘের মুখে ঘাষ কিংবা হরিণের মুখে গোস্ত আছে কি না। না, ওরকম কিছু নেই দরজায়। পা বাড়ালেই অন্দরমহলে চলে যাওয়া যায়। আমি কিন্তু ভেতরে যাইনি। বাইয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করি, "বাড়িতে কেউ আছেন?" প্রশ্নের জবাব আসে না, তবে একটি কি দুটি চামচিকে ওড়াউড়ি করে জানান দেয় যে,ওরা এ-বাড়ির বাসিন্দা। আমি সেই সবুজ রঙের শ্যাওলা-ঢাকা, ছায়া-ছায়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাই অন্য কোথাও। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে; কিছুটা ভয় পেয়ে, ভয় পাওয়ার আনন্দে কিছুটা।

পায়ে ধুলো জমে, আলো কমে আসে আকাশের, গাছের ঘন ডালে, খালে-বিলে, উড়ন্ত চিলের নরম ডানায়, কাঁকর-বিছানো পথে। আলো কমে আসে। সূর্য নিবুনিবু। কাঁকর-বিছানো পথে হাঁটি, কোনোমতে পা টেনে টেনে। ভাবি, সেই পুরোনো বাড়িটার কথা। কারা থাকত বাড়িটায়? কী তাদের নাম ছিল? ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে ছিল কোনোদিন সেখানে? ওরা কি হাফপ্যান্ট, শার্ট, ফ্রক পরে খেলা করত বারান্দায়, ওঠোনে, বাড়ির পেছনের বাগানে? নিশ্চয়ই ওদের সুন্দর সুন্দর, ভারি মিষ্টি নাম ছিল সব। ইষ্টিকুটুমেরা সেই নামে ডাকত ওদের। ভাবি তাদের কথা যাদের আমি কোনোদিন দেখিনি।

এবার তোমাদের আরেকটা পুরোনো বাড়ির কথা বলব। অনেক অনেকদিন আগের কথা। তখন আমাদের সেই চমৎকার দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন আলেকজান্ডার। জানই তো মস্ত বড় বীর ছিলেন তিনি। সারা দুনিয়া জয় করতে বেরিয়েছিলেন তিনি নিজের দেশ ছেড়ে। তাঁর অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল—সেই সৈন্যদলে ছিল পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার। পদাতিক বলে ওদের, যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে ঢাল তরোয়াল, বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করে। আর ঘোড়সওয়াররা ঘোড়ার পিঠে চড়ে অস্ত্র চালায়। আলেকজান্ডারের সেপাইরা যুদ্ধের

ব্যাপারে ছিল খুব ওস্তাদ। ওদের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠত না কেউ। পেরে উঠত না বলেই আলেকজান্ডার দেশের পর দেশ জয় করতে পেরেছিলেন। আলেকজান্ডারের সেপাইরা যুদ্ধ করতে করতে চলে এল থিবস্ নগরে। নগরটা ওরা দখল ক'রে ফেলল, আর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল ভাঙাচোরার কাজ। জয়ের খুশিতে বেহুঁশ হয়ে সেপাইরা এটা ভাঙে, ওটা তছনছ করে; কোথাও-বা লাগায় দাউদাউ আগুন। ছোট্ট খেলনার মতো একটা বাড়ি। ওটাও ভাঙতে গেল তারা। কিন্তু বাধা দিলেন আলেকজান্ডার নিজেই, "ও বাড়িতে হাত দিয়ো না তোমরা!" হুকুম করলেন তিনি। তাই শাবল আর গাঁইতির মার খেতে হল না সেই ছোট্ট খেলানার মতো বাড়িটাকে।

তোমরা হয়তো এ ভেবে অবাক হচ্ছ, এও কিছু ভাঙাচোরার পর বীর আলেকজান্ডার ঐ ছোট্ট বাড়িটা ভাঙতে মানা করলেন কেন। আলেকজান্ডার জানতেন, ঐ ছোট্ট বাড়িটায় থাকতেন কবি পিন্ডার। নামজাদা কবি। ঐ বাড়িতে বসে আপনমনে কত্ত কবিতা লিখেছেন তিনি, ঘুঙুরের মতো বাজিয়েছেন শব্দকে। এসব কথা জানতেন আলেকজান্ডার। পিন্ডারের মতো কবির বাড়ি কি কোদাল মেরে ভেঙে ফেলা যায়? বাড়িটা সামান্য হলে কী হবে, যিনি বাড়িটাতে থাকতেন তিনি তো আর সামান্য কেউ ছিলেন না! মস্ত বড় কবি ছিলেন তিনি, দশজনের চেয়ে আলাদা একজন, যাকে বলে অসাধারণ। তাই আলেকজান্ডার ঐ ছোট্ট বাড়িটাকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইতিহাসের খাতিরেই মানুষ অনেক যত্ন করে রাখে পুরোনো, নড়বড়ে বাড়ি, অনেক আগেকার টাকাকড়ি, মূর্তি, নানা জিনিসপত্তর। পুরোনো কালের একটা হাঁড়ির টুকরো পেলেও মানুষ সেটা জমিয়ে রাখে জাদুঘরে। এসব পুরোনো জিনিসপত্তরে জড়িয়ে থাকে অনেক দিনের অনেক কথা। যদি সেসব মূর্তি, ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি আত্মকথা শোনাতে পারত তা হলে তোমরা অনেক মজাদার গল্প শুনে খুশি হতে পারতে। কিন্তু ওরা কথা বলতে পারে না তোমাদের মতো। তাই অষ্টপ্রহর চুপ করে থাকে। মানুষ ওদের কথা শুনতে চায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, অথচ ওরা মুখ খোলে না! তবু মানুষ নাছোড়াবন্দা,ওরা কথা না বললে কী হবে, যাঁরা ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, পড়েন ইয়া মোটা মোটা বই, যাঁদের চোখ আছে দেখার মতো, ওঁরা কিন্তু সেসব পুরোনো কালের জিনিসগুলো দেখে জেনে নেন অনেক কথা। তারপর বই লিখে আর-সবাইকে জানিয়ে দেন মজার মজার কথা সব। পুরোনো কালের দরদালান, মূর্তি, ঘটিবাটি ইত্যাদি দেখতে ভারি ভালো লাগে আমার। তোমাদের লাগে না? লাগে নিশ্চয়ই। যারা দ্যাখেনি, তারা জাদুঘরে এলেই দেখতে পাবে সব।

আগেই বলেছি, গোড়াতেই, চলতি পথে অনেক কিছুর ওপর চোখ বুলোনো আমার কাছে খুব খুশির ব্যাপার। যেন একটা উৎসব। তাই রাস্তার এক পাশে দাঁড়ানো গাছটাকে মনে হয় পরি, এক্ষুনি যেন ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যাবে মেঘের রাজ্যে; বাঁশের পুলটাকে ধনুকের মতো লাগে, কেমন টানটান;আলোর ঝাঁটার মতো মনে হয় পানির ফোয়ারা। দিঘির পদ্মগুলোতে, পথ চলতে দেখি, কতগুলো ফুলো-ফুলো, তুলতুলে গালঅলা ছেলেমেয়ে বসে আছে, মুখজাগা, গলা-ডোবা, ভালো লাগে এতসব কিছু যে লিস্টি তৈরি করলে কর্ণফুলি কাগজের কারখানায় হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে।

যাকগে, একদিন হল কি, কেউ-নেই-রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেছি, শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে। ততক্ষণে সন্ধ্যা এসে পড়েছে মাথায় অন্ধকারের টোপর পরে। ধুলো-ভরা পা-জোড়া প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল আর কি! আমার তো আর ডানাঅলা ঘোড়া পক্ষিরাজ নেই যে, তুলো-তুলো ফুলো মেঘে-মেঘে উড়ে বেড়াব, সফর করব আকাশ থেকে আকাশে! খানিক জিরিয়ে নেয়ার জন্যে গাছতলায় গেলাম। গাছতলায় ডানাঅলা ঘোড়া বাঁধার ঝামেলা নেই। সটান শুয়ে পড়লাম মাটিতে। অন্ধকার আম্মার মতো আদর করলেন আমাকে, আমার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে যেন ঘুম পাড়ালেন। আকাশে কিছু তারা, রূপোলি চকোলেটের মতো ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, রাংতা-মোড়া। কিংবা জোড়া জোড়া দুষ্টুমি-ভরা চোখ। ঘাসের বিছানায় বেশ আরাম, কোত্থেকে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। চোখ বন্ধ কার শুয়ে রইলাম ঘাসে, আশেপাশে আর কেউ নেই কোনো শব্দ নেই। কোনো-শব্দ-নেই জায়গাটার যেন মস্ত মুখ আছে, গুহার মতো দেখতে অবিকল। সেই মুখের ভিতর আমি শুয়ে আছি। কাছাকাছি যদি কেউ থাকত তবে সে জিজ্ঞেস করত অবাক হয়ে, "এই অবেলায় কেউ এমন সুনসান জায়গায় শুয়ে থাকে এভাবে?"

হঠাৎ কিছু শব্দ ভেসে এল কানে। শুনলাম, গানের মতো সুরেলা কিছু কথা দু'জনের। দুটো সুর। আলাদা আলাদা। কিন্তু দুটো মিলিয়ে ঝিলমিলিয়ে-ওঠা কয়েকটি কথা। আমি কান পেতে শুনলাম। মানুষের মুখের ভাষার মতো অনেকটা, কিন্তু মানুষের ভাষা নয়। পাখিরও নয়। তা হলে কার ভাষা? মানুষের ভাষা আর পাখির কাকলি একটা পাত্রে একত্রে নিয়ে নড়াচড়া করলে যে অন্য একটি ভাষার জন্ম হবে—ঠিক সেই ভাষার কথা বলছে দু'জন। আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের কথাবার্তা। ওপরে, গাছের ডালে চোখ পড়তেই দেখি দুটো পাখি। দেখেই চিনতে পারলাম। ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামি। ব্যাঙ্গামি বলল, "ব্যাঙ্গামা একটা গল্প বলো-না!" ব্যাঙ্গামা শুরু করল তার গল্প, সুরেলা গলায়, আস্তে-আস্তে, রূপকথার আশ্চর্য আলোজ্বলা গাছতলায়, "একদা এক রাজ্যে রাজা ছিল, আর ছিল তার দুই রানি, দুয়োরানি, সুয়োরানি। হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া। আর ছিল সেপাই সান্ত্রি, পাইক বরকন্দাজ"—এটুকু বলেই যেন ব্যাঙ্গামা হাঁপিয়ে উঠল। ওর মুখে অন্য কোনো কথা ফুটল না।

কিছুক্ষণ থেমে সে বলল, "দুত্তোর, সেই একই গল্প বলতে মোটেই ভালো লাগছে না আমার। সেই রাজরাজড়ার কাহিনি কত শোনাব আর? গল্প বলার চেয়ে শুনতেই ভালো লাগবে বেশি। আচ্ছা ব্যাঙ্গামি, আজ তুমিই একটা গল্প বলো, প্রাণ ভরে শুনি।"

ব্যাঙ্গামি বলল, "না গো না, আমি গল্প শোনাতে পারব না। আমি গল্পটল্প জানিনে। তুমি যা শোনাও তা-ই শুনি। নিজের বলা গল্প তো আর তুমি শুনবে না।"

ব্যাঙ্গামার মন বেজার, মুখটা কেমন কালো কালো লাগল। আমার কেমন মায়া হল। আমি বললাম, গাছতলা থেকে, "ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামি, আমার গল্প শুনবে তোমরা।"

'কী তোমার পরিচয়?'—ভেসে আসে ব্যাঙ্গামার গলার আওয়াজ।

"ছড়া কাটি, কবিতা বানাই।" বললাম হেসে হেসে।

"আর?"

"ভালোবাসি আমার শহরকে, যেখানে আমি জন্মেছি।"

"সেই শহরের গল্প শোনাতে পারবে তুমি।"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"তোমার গল্প শুনতে রাজি আছি আমরা।"

"তবে বলি শোনো—।"

## ॥ দুই ॥

শহরের নাম ঢাকা। এ-শহরে একটা সরু গলিতে যখন অমি প্রথম চোখ খুলেছিলাম তখন ঢাকা ছিল কেমন ফাঁকা ফাঁকা। এত দরদালান ছিল না, বাস ছিল না, মোটর ছিল না, এমনকি রিকশাও ছিল না, রাস্তায় রাস্তায় ছিল না সারি সারি পিঁপড়ের মতো মানুষের ভিড়। ছিল ছোটো ছোটো পথ, একটি কি দুটি বড়ো রাস্তা ছিল। ছিল অনেকগুলো গলি, সেসব চুলের ফিতের মতো গলির ভেতর ছিল জনমনিষ্যির বসতি। পাড়ায় পাড়ায় ঘাস-বিচালির গন্ধ-ছড়ানো আস্তাবল ছিল, আর ছিল ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানের চাবুক ঝিকিয়ে উঠত হাওয়ায়, রোদ্দুরে। কাছে-দূরে মজাদার শব্দ করে ঘোড়া ছুটত দিগ্বিদিক—খট্ খট্ খট্ আর গাড়োয়ান লাগাম নেড়ে বলত—হট্ হট্ হট্।

গাড়োয়ানের চাবুক ঝিকিয়ে উঠত .......

আমি যে-পাড়ায় জন্মেছি তার নাম ছিল খুব সুন্দর। মাহুতটুলি। অনেক অনেক আগে হয়তো শুধু মাহুতদের বসবাস ছিল পাড়াটায়, সেই রাজা-বাদশাদের আমলে। মাহুতটুলিতে কিন্তু আমি কোনো হাতিশালা দেখিনি, হাতি দেখিনি, হাতির হাওদা দেখিনি, দেখিনি মাহুত—সেই যারা হাতি চালায়। মাহুতটুলির যে-গলিতে থাকতাম সেখানে ছিল না সোনার গাছ, যে-গাছে ফলে থোকাথোকা হীরের ফল। ছিল না সোনার দাঁড়ে-বাঁধা হীরামন তোতা। টলটলে ফোয়ারা ছিল না কোনো, যার রুপোলি পানির ছিটায় পাথর হয়ে যাবে টুকটুকে রাজপুত্তুর। সেই সোনার ছেলে সব যারা ঘর ছেড়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আশ্চর্য ফুলের খোঁজে। মাহুতটুলির গলিতে পালঙ্ক ছিল না, সোনা-রুপোর কাঠি ছিল না, ছিল না ঘিয়ের প্রদীপ। কিন্তু ছিল একটা বাতি, গলির শেষ সীমায় দাঁড়ানো। রোজ সন্ধ্যেবেলা কাঁধে মই ঝুলিয়ে আসত বাতিঅলা। তার গলায় মাদুলি, মাথায় কিস্তিটুপি, কাত করে পরা। গায়ে তালিমারা ফতুয়া। খালি পা, হাঁটত হনহনিয়ে। আমি রোজ অপেক্ষা করতাম, কখনও সূর্যিমামা পশ্চিম আকাশ থেকে তাঁর রঙিন গালিচাটা গুটিয়ে নেবেন, কখন ছায়া নামবে গলিতে। কারণ, সূর্যের আলো ফুরুলেই বাতিঅলা আসবে আলো জ্বালানোর খেলা খেলতে। গলির শেষ সীমার বাতিটায় আলোর ফুল ধরবে, নরম তুলতুলে আলোর ফুল। বাতিঅলা মই বেয়ে উঠবে, ফতুয়ার পকেট থেকে কী-একটা বের করবে, তারপর গলিতে আলোর কলি, যেন কোনো যাদুকর সন্ধ্যের বোঁটায় ঝুলিয়ে দিয়েছে আলোর ফুল, আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে। তখন ইচ্ছে হয় বাতিঅলাকে ডেকে বলি :

বাতিঅলা করছ তুমি
কী যে মজার কাজ
পরিয়ে দিয়ে সাঁঝের গায়ে
আলো-জরির সাজ।

কিন্তু শখ করে মনে-মনে বানানো কথাগুলো জানানো হত না তাকে। শুধু দেখতাম ওকে, দূর থেকে জানালার শিকের ফাঁক থেকে, দেখতাম আলোর ফুল। চোখ জ্বলজ্বলে। কোনোদিন ওর কাছে যাইনি। ভয় হত যদি আত্‌কা আমার মুখ থেকে এমন কোনো বোকা বোকা কথা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে যা শুনে বাতিঅলার মেজাজ বিগড়ে যাবে, আড়ি দেবে সে আমার সঙ্গে, আর কোনোদিন আমাদের বাড়ি-ঘেষে-দাঁড়ানো বাতিটায় আলো জ্বালবে না সন্ধ্যেবেলায়। সে হয়তো রাগ করে আসবেই না আর আমাদের গলিতে। আর সে না এলে ছোট্ট গলিটা মুখ কালো করে রাখবে সারা সন্ধ্যেবেলা, রাতে হাসি ফুটবে না ওর ঠোঁটে। তাই চুপচাপই থাকতাম, শুধু দেখতাম চেয়ে চেয়ে। গলি বেয়ে ছায়া নামত, অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে আসত, দেখতাম; কিছু বলতাম না মুখ ফুটে। আলো ফুটত বাতিঅলার হাতের ছোঁওয়ার, আলো ফুটবে সে খানিক মাথা নোওয়াত মই থেকে নামার আগে, একবার দেখে নিত কাচের ভেতরকার আলোর পদ্মটাকে। কখনো মনে হত, বাতিঅলা একেবারে মিশে গেছে বাতিটার গায়ে, শুধু শূন্য মই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। এই খেলা কতদিন যে দেখেছি একা একা, জানালার সরু সরু শিকে গাল লাগিয়ে তার আর কোনো লেখাজোখা নেই।

আলো জ্বালানোর খেলা সাঙ্গ করে বাতিঅলা যেত চলে কাঁধে মই ঝুলিয়ে, শরীর দুলিয়ে—যেন মিলিয়ে যেত হাওয়ায়। গলায় মাদুলি, মাথায় কিস্তিটুপি, কাত করে পরা। তারপর ছেলে ঘুমোত, পাড়া জুড়োত। বিছানায় গা এলিয়ে দিলে কোনোদিন চট করেই হাজির হতেন ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি। আমার নানির বাটাভরা পানের দিকে নজর না দিয়ে, পিঁড়ি ডিঙিয়ে, পালঙ্ক ছেড়ে নিরিবিলি ওঁরা এসে বসতেন আমার চোখের পাতায়। একজোড়া চোখে ওঁদের ছায়ারঙের আঁচল লুটিয়ে পড়লে টুপ ক'রে ডুব দিতাম ঘুমের নিঝুম সরোবরে। কোনো কোনো দিন আবার ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দেখা মিলত না অনেক রাত অব্দি। নানা ধরনের শব্দ হত—খুট খুট, ঠক ঠক, মক মক, টিক টিক, ঝিক ঝিক, আরও কত শব্দ, বিদঘুটে, কুটকুটে সব শব্দ আর আমি খামোকা জব্দ হতাম বিছানায় শুয়ে-শুয়ে।

একসময় চেনা আওয়াজ বাজত হাওয়ায়, রাতের বুকে। আওয়াজটা উঠে আসত গলির কৌটা থেকে, যেন প্রাণ-ভোমরার শব্দ। পথ-হাঁটার শব্দ শুনতে পেতাম, শুনতে পারতাম শব্দগুলোকে এক এক করে। জুতো-পায়ে কেউ গলি পেরুচ্ছে। জুতোর শব্দে অন্ধকারের কালো কালো কিছু মিহি রেশমি সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, আমি শুনতে পেতাম। কান পেতে, বালিশে মাথা রেখে। আলীজান ব্যাপারি পাম্পশু-পায়ে গলি পেরুচ্ছেন, চলেছেন নিজের বাড়ির দিকে। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতেন আলীজান ব্যাপারি। কোনো এক রাতে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠে নানির কাছে এসে, বুকে ঘেঁষে জানতে চেয়েছিলাম

শব্দটা কীসের। নানি আমার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, আলীজান ব্যাপারির জুতোর শব্দ ওটা। একসময় আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেত তাঁর জুতোর শব্দ, গলি পেরুনো শেষ। আলীজান ব্যাপারির সাবান আর তামাকের দোকান ছিল মস্ত। দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরতেন তিনি অনেক রাতে। তাঁকে কোনোদিন পাজামা পরতে দেখিনি, কিংবা চোগা-চাপকান। কান-ঢাকা পাগড়িও পরতেন না তিনি। পরতেন লুঙ্গি, কখনো একরঙা, সাদাসিধে, কখনো ডোরাকাটা, আর পরতেন পাঞ্জাবি। সবসময় মাথায় গোল একটা টুপি থাকত কাপড়ের। পায়ে পাম্পশু। সারা মহল্লার কান খাড়া হ'ত তাঁর পাম্পশুর শব্দে। মহল্লার সর্দার ছিলেন তিনি, জবরদস্ত মানুষ। তাঁর এক ডাকে সবাই হত হাজির, না হলে যেন জবাই ক'রে ফেলবেন তিনি, এমনি তাদের হাবভাব। বলতে হয়, দাপট ছিল আলীজান ব্যাপারির, তবে তাঁর জুলুমের কথা কিছু শুনিনি। করলেও সেসব বোঝার বয়েস হয়নি তখন।

আলীজান ব্যাপারির দাপটে এক ঘাটে বাঘে-মোষে জল খেত কিনা জানি না, তবে আমাদের বাড়ির পেছনেই ছিল একটা তালাও, কচুরিপানায় ভরতি। ঢাকার লোক পুকুরকে বলে তালাও। আমি কোনোদিন সেই পুকুরে নামিনি। মুরুব্বিদের বারণ ছিল। তাই পা বাড়াতে পারিনি তালাওয়ের দিকে। পাঁচকড়ি মিঞার বাড়ির পাশেই ছিল সেই তালাও। লোকে পুকুরটার নাম দিয়েছিল ভগতের গাড়া। এই নামকরণের পেছনে কোনো ইতিহাস আছে কি না জানি না। পাঁচকড়ি মিঞা ছিলেন বড়োসড় লম্বা-চওড়া মানুষ। গালভরা গোঁফদাড়ি, তপসে মাছের মতো। যেন স্যান্টা ক্লজ তিনি। স্যান্টা ক্লজকে জান তো? সেই যে ভালোমানুষ বুড়ো—যিনি বড়োদিনের উৎসবে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েকে আদর করে হাসির রঙে রাঙিয়ে এনে দেন অনেক উপহার। পাঁচকড়ি মিঞা আমাকে কোনো উপহার দেননি কখনো। তবু ওঁকে খুব ভালো লাগত আমার। তিনি যখন হাত নেড়ে-নেড়ে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কথা বলতেন কিংবা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন পুকুরটার সামনে,—আমি অবাক হয়ে দেখতাম তাঁকে। আমার নানার সঙ্গে ভাব ছিল তাঁর। তিনি প্রায় রোজই আসতেন নানার কাছে, গল্পসল্প করতে। বড়ো গল্পে ছিলেন ভদ্রলোক। পাঁচকড়ি মিঞা এলে নানাও খুব খুশি হতেন, দেখেছি। তিনি এলেই হুঁকোটা বাড়িয়ে দিতেন নানা, পাঁচকড়ি মিঞা গুড়গুড় ক'রে হুঁকো টানতেন আর খুলে দিতেন গল্পের ফোয়ারার মুখ। সত্যি বলতে কি, পাঁচকড়ি মিঞার চেহারা শাহি শাহি মনে হত আমার কাছে, কিন্তু তাঁর একটা পা ছিল বিচ্ছিরি, বিকট ফোলা-ফোলা। অর্থাৎ পাঁচকড়ি মিঞার পায়ে ছিল গোদ। খোদ তিনি সজাগ ছিলেন তাঁর সেই খুঁত সম্পর্কে, বুঝি তাই বারবার চেয়ে দেখতেন নিজের পায়ের দরকারি অংশটুকু। নিজের পায়ের মাংসের এই বাড়াবাড়ি তিনি হয়তো মেনে নিতে পারেননি কোনোদিন।

আমাদের বাড়ির পাশে যে-দালানটা ছিল সেখানে থাকতেন এক দেশি সাহেব। ফরসা, বেঁটেখাটো মানুষ, বেশ চটপটে। ফুল ভালোবাসতেন বলে সুন্দর বাগান করেছিলেন। নানা ফুল ফুটত তাঁর বাগানে। নিজের গোঁফটার মতোই ছেঁটেছুঁটে রাখতেন বাগানের গাছপালা। নিজে দু'বেলা পানি ঢালতেন চারাগুলোর শিকড়ে, আর আপনমনে বিড় বিড় করে কীসব বলতেন। একদিন ঢুকে পড়েছিলাম টমি সাহেবের দালানে। কেমন ছায়া-ছায়া,

চুপচাপ বাড়ি। মনে হত এ-বাড়িতে যার থাকে, তারা যেন তুলো দিয়ে তৈরি কয়েকটি আজগুবি পুতুল। নড়েচড়ে, কথা বলে, কিন্তু আমাদের চেনাজানা কেউ নয়। বুঝি তাই ভয় হত টমি সাহেবের বাড়ির ফটক পেরুতে, ঢুকতে সেই আদ্যিকালের দালানে। টমি সাহেবের কাছে ভিড়তেও ভারি ভয় হত আমার। দূরে দূরে থাকতাম। শুধু একদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলাম তাঁর দালানের ভেতর। তারপর আর কোনোদিন যাইনি। টমি সাহেবের দালান পাহারা দিত তিনটে ভীষণ-দেখতে কুকুর। চোখে পড়লেই প্রাণ যেত উড়ে। ঘুরে দেখার সাহস হত না আর। সেদিনের পর আর কোনোদিন যে টমি সাহেবের দালানমুখো হইনি, সেজন্যে সেই তিনটি ডাকাতপানা কুকুরই অনেকখানি দায়ী।

টমি সাহেবের দালানে একবারের বেশি যাইনি, কিন্তু আমাদের বাড়ির পাশের আরেকটা বাড়িতে গিয়েছি অনেকবার। দরদালান নয়, নড়বড়ে কোঠাবাড়ি। খাপাচির বেড়া, পুরোনো টিনের ছাদ। ছোটোখাটো উঠোন। আধখানা উঠোন জুড়ে শব্রিআমের গাছ। সবুজ সবুজ খসখসে পাতা। পাতায়-পাতায় ফল ঠাসা। ডাঁশা-ডাঁশা। দেখলেই জিভে পানি আসে। বাতাসের ঝাঁকুনিতে পাতায় কাঁপুনি, ডালের ফাঁকে সোনার জলের মতো আলো গড়িয়ে পড়ে। ফলগুলো চকচক করে আলোয়। ভালোয় ভালোয় একটি কি দুটি হাতে এলেই খুশি। দুটো কুলের গাছও সেখানে। উঠোন আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা শব্রিআমের গাছঅলা বাড়িটার মালিক ছিল এক বুড়ি। থুত্থুরে নয় মোটে, কিন্তু বুড়ি বটে। লোকে তাকে ডাকত তেলওয়ালি বুড়ি বলে। একসময় তেল বেচত সে। তেল বেচেই দিন কাটত বুড়ির। একদিন কী খেয়াল হল বুড়ির, তেলের কারবার বন্ধ করে পিঠে বেচতে শুরু করল হঠাৎ। খুব সকালে, যখন সবেমাত্র অন্ধকার পালাই-পালাই করছে, মোরগ বাগ দিচ্ছে, গাছে-গাছে কিচিরমিচির করছে কুটুমপাখি, তখন উনুনে আগুন দিত বুড়ি। একটু পরেই ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করত উনুনে চাপানো হাঁড়ি। তৈরি হত চিতুয়া পিঠে, তোমরা যাকে বলে চিতাই। কতদিন হাতমুখ না ধুয়েই হাজির হতাম তেলওয়ালি বুড়ির বাড়িতে একটি কি দুটি পয়সা নিয়ে। চিতাই পিঠে কিনব, তারপর বাড়িতে ফিরে এসে মজা করে খাব বাসি শিমের তরকারি দিয়ে, মধু মিশিয়ে কোনোদিন। রাত কাবার হলেই ছোটো তেলওয়ালি বুড়ির বাড়িতে, বুড়ির হাঁড়িতে রাখো চোখ। মস্ত তারার মতো এক-একটা পিঠে ফুটে উঠত খোলায়। চালের গোলায় ঘুটুনি দিয়ে নাড়া দিত বুড়ি, চেয়ে দেখতাম; ছোট্ট খুরচুনি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খোলা থেকে পিঠে তুলত, চেয়ে দেখতাম; একটি পিঠের ওপর আরেকটা পিঠে চাপিয়ে তুলে দিত চেয়ে দেখতাম। পিঠে হাতে এলেই দাম চুকিয়েই দে দৌড়। বুড়ির কাছে শুধু পিঠেই পেতাম না, উপরি পাওনা ছিল কিছু। পিঠে তৈরি করতে করতে গল্প বলত সে। শাহজাদা-শাহজাদির গল্প। বলত সেই গল্প, যে-গল্পে ঝাঁক-ঝাঁক পক্ষিরাজ ঘোড়া এসে নষ্ট করে যেত রাজার খেতের সোনালি ফসল। পিঠে তৈরি হতে দেরি হলে তেলওয়ালি বুড়ি গল্প দিয়ে ভুলিয়ে রাখত আমাদের। যেমনি ভালো গল্প বলতে পারত তেমনি ভালো রান্না করতে পারত সে। বিশেষ করে গরুর কলজি রান্নার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার। আব্বার জন্যে মাঝে-মাঝে গরুর কলজি রেঁধে নিয়ে আসত বুড়ি।

আব্বা একদিন খুব তারিফ করেছিলেন তার রান্নার, তাই সে সুযোগ পেলেই আব্বার জন্যে এটা-ওটা রেঁধে নিয়ে আসত। আমরাও ভাগ পেতাম একটু-আধটু। সত্যি বলছি, সেই কলজির স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

তেলওয়ালি বুড়ি শুধু পিঠেই বানত না, ঝুড়ি ভরে কুল শুকোত উঠোনে, টিনের ছাদে। শুকনো কুলের চমৎকার আচার তৈরি করে বেচত। আমি কখনো-সখনো ঝুড়ি থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে পাচার করতাম কিছু কুল। কোনো-কোনোদিন বুড়ির চোখে ধরা পড়ত আমার আনাড়ি হাতের চুরি, নকল রাগে বুড়ি গর্জে উঠত, তেড়ে আসত হাত নেড়ে। ওর মাথার শনের মতো চুল ফুঁসে উঠত, নামের ঘুলঘুলি উঠত ফুলে, আমি কুল নিয়ে চম্পট।

কুলের কথা শুনে ব্যাঙ্গমির জিভে পানি এসে থাকবে হয়তো। বুঝি তাই সে আমার কাহিনির মাঝখানে ফোড়ন দিয়ে বলে উঠল, "তুমি তো আচ্ছা শয়তান ছেলে ছিলে বাপু! গরিব বুড়ির কুল নিয়ে পালাতে। বুড়ির গাছের কুলগুলো খুব ভালো ছিল বুঝি, খুব মিষ্টি?"

"না, তেমন মিষ্টি ছিল না বুড়ির কুল, বেশ টক টকই ছিল। কিন্তু ঝুড়ি থেকে কুল নিয়ে চোঁচা দৌড় দিতে ভালো লাগত। তা ছাড়া আমার দুষ্টুমিতে বুড়ি বিরক্ত হত না। কতদিন নিজেই মুঠোমুঠো কুল তুলে দিয়েছে আমার হাতে। কিন্তু এভাবে কুল পেতে মোটেই ভালো লাগত না আমার। লুকিয়ে-চুকিয়ে কুল নিয়ে হুট করে পালাতে পারলেই খুশি হতাম বেশি। আর শোনো, বুড়ি কিন্তু পাখিদের ভালোবাসত খুব। রোজ দুপুরে খেতে বসার আগে সে করত কি, দু'মুঠো তরকারি-মাখানো ভাত দরজার ওপরের দিকে ঝুলে-থাকা টিনে ছিটিয়ে দিত—যাতে পাখি এসে খেতে পারে। বেশির ভাগ খাবার কাকের পেটেই যেত; কারণ, কাকের জ্বালায় অন্য কোনো ভালোমানুষ পাখি সে-তল্লাটে ভিড়তে পারত না। তোমরা বুড়ির বাড়িতে গেলে সে ভারি খুশি হত কিন্তু, দু'মুঠোয় ভাত বেশি দিত সেদিন।" —ব্যাঙ্গমিকে বললাম গাছতলায় শুয়ে-শুয়ে। হিরের মতো জ্যোৎস্না-জ্বলা চোখ তুলে ব্যাঙ্গমি ব্যাঙ্গমাকে বলে, "শুনলে তো তেলওয়ালা বুড়ির কথা? ওরকম একটা বুড়ির দেখা মিললে মন্দ হয় না, কী বলো? দু'বেলা আহার জুটে যেত সহজে।" ব্যাঙ্গমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দেয়, "আজ আর সেই বুড়ি নেই, তার কুলের ঝুড়িও নেই। লোকে এখন নিজেই খেতে পায় না, পশুপাখিকে খাওয়াবে কী?"

মনে হল, ব্যাঙ্গামার কথা শুনে ব্যাঙ্গামির মন-খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ব্যাঙ্গামির মুখে আলো ঝলসে ওঠে, 'ভাগ্যিস আমাদের খুদ-কুড়ো কিংবা ভাত-তরকারি খেতে হয় না।"

"যাকগে, এবার তোমার শহরের গল্প বলো, শুনি"—ব্যাঙ্গামা সুরেলা কণ্ঠে অনুরোধ করে আমাকে। গল্প বলার জন্যে গাছতলায় নড়েচড়ে উঠি আমি। হঠাৎ হাওয়া ফুঁড়ে একটা শব্দ হল। ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামি কান খাড়া করে। আমিও।

## ॥ তিন ॥

শব্দটা শুনে আমি চমকে উঠেছি, ব্যাঙ্গমা লক্ষ করল। কোথাও জনমনিষ্যির সাড়া নেই। গাছতলায় আমি একা। গাছের ডালে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিল। পা'টা টেনে বসলাম। কী করব ঠিক করতে পারছিলাম না। আমাকে উসখুস করতে দেখে ব্যাঙ্গমা বলে, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওটা পাখির পাখা ঝাপটানির শব্দ।" ভয় পেয়েছি এটা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি জানুক তা আমি চাইনে। জেনে ফেললে ভয়ানক জব্দ হব। ভাববে, আমি বড্ড ভীতু। আর যা-ই হোক, একজোড়া পাখির কাছে আমি ভীতু বনতে নারাজ। তাই একটু বাড়তি বাহাদুরি দেখিয়ে গাছে মাথা ঠেকিয়ে বললাম, "মোটেও ভয় পাইনি আমি।"

"বেশ বেশ, এবার তোমার গল্প শুরু করো।" ব্যাঙ্গমা বলে।

তোমরা তেপান্তরের মাঠ দেখেছ, সেই যেখানে রাজপুত্তুরের ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো ওড়ে, আর সোনালি ধুলো পশ্চিম আকাশের রাঙা আলো আর ভাঙা-ভাঙা মেঘে মিশে যায়। তাই তোমাদের তেপান্তরের মাঠের কথা বলব না। হয়তো আরও অনেক মাঠ তোমরা দেখেছ উড়ে যেতে-যেতে। ওসব মাঠের কথাও বলব না। তবে যে-মাঠটার কথা বলব, সেখানে হয়তো তোমরা যাওনি কোনোদিন। মাঠটা তেমন বড়ো নয়, কিন্তু টিয়েপাখির ডানার মতো সবুজ ছিল তার ঘাস। বেশ সমান-সমান করে কাটা। ইচ্ছে হলে জুতোগুলো খুলে খালি পা'টা ঘসে নাও খানিক, তারপর হাঁটা শুরু করে দাও। মাঠের সঙ্গেই একটা ইশকুল। ইশকুলের মালী যত্ন করে ঘাস কাটে মাঠের, তাই এত ঝকঝকে তকতকে—দেখলেই চোখ জুড়োয়। এই মাঠে আমরা ছুটে বেড়াতাম, আমরা ক'জন ছোটো ছোটো ছেলে। কখনো ফুটবল, কখনো গোল্লাছুট, কখনো আবার এমনিতেই ছোটাছুটি।

কিন্তু সেই ইশকুলের ছাত্র ছিলাম না আমি। আমি পড়াশুনো করেছি অন্য একটি ইশকুলে। সে-ইশকুল ছিল অন্য পাড়ায়, আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে। যে-ইশকুলে আমি পড়তাম না অথচ যার লাগোয়া মাঠে ছোটাছুটি করতাম সেটা ছিল আমাদের মহল্লার খুব কাছে। দু'মিনিটের রাস্তা মাহুতটুলি আর আরমানিটোলার মাঝামাঝি একটা জায়গায় ছিল লাল ইটওয়ালা সেই ইশকুল। সেখানে বই নিয়ে আসা-যাওয়া না করলে কী হবে, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগত ইশকুলবাড়িটাকে। অতল পাতালের কোনো বাড়ি দেখিনি। নানির মুখে যেসব গল্প শুনতাম রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেসব গল্পের কোনো-কোনোটায় পাতালের বাড়িঘরের কথা থাকত। যখন কখনো-সখনো পাতালের দরদালানের কথা ভাবতাম, তখন কেন জানি সেই লাল ইটওয়ালা ইশকুলবাড়িটা নিজের ঠাঁই করে নিত সেগুলোর ভিড়ে। হয়তো চুপ করে ব'সে আছি ছাদের ওপর, দেখছি মেঘের খেলা কিংবা ঘুড়ির মেলা। মেঘ কিন্তু ভারি মজার খেলা জুড়ে দিত আকাশের নীল মস্ত উঠোনে। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় না, অথচ খেলা দেখে যাও ঘন্টার পর ঘন্টা। মনটা নেচে উঠবে খুশিতে। ভালো করে চেয়ে দ্যাখো, ঐ ঘুসি পাকিয়ে আসছে

ইয়া বিরাট এক দৈত্য। তারপর হঠাৎ বিরাট দৈত্যটা কোথায় যায় মিলিয়ে, তার জায়গায় হাজির হয় কেশর-দোলানো এক সাদা ঘোড়া, তার পিঠে পাগড়ি-পরা, কোমরে তলোয়ার-ঝোলানো সওয়ার একজন। ঘোড়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পাগড়িটা মুহূর্তে হয়ে যায় কোনো মোগল বাদশার মুখ। বাদশার মুখ বদলে গিয়ে হয় ফুল, ফুল তাজমহল, ঝলমলে মস্ত মুক্তো, মুক্তোর সরোবর, সরোবর পাহাড়, পাহাড় ডাঁই ডাঁই সাদা হাড়, হাড় সেই ইশকুলবাড়ি। রং বদলায় এবার। ধোঁয়াটে সাদা রং ইশকুলবাড়িটার। অথচ সে-ইশকুলে পড়িনি আমি কোনোদিন। কিন্তু প্রায় রোজই যেতাম সেখানে, রোজ বিকেলে, লাল ইটের শোভার লোভে, মাঠের লোভে।

কোনো-কোনোদিন সকালেও যেতাম। ইশকুলটার পেছনে ছিল কিছু শিউলি ফুলের গাছ। সকালে এসে দেখতাম, ফুলে ছেয়ে গেছে শিউলিতলা। মিষ্টি একটা গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিতালি করছে সারাক্ষণ। গাছগুলোর কাছেধারেই বসতাম। কখনো বা কুড়িয়ে নিতাম কিছু ফুল বাড়ি নিয়ে যাব বলে। শিউলিতলায় একই যেতাম আমি। আমাদের বাড়ির অন্য কোনো ছেলেপেলে আমার সঙ্গে আসত না। কিন্তু আমার অচেনা কিছু ফুটফুটে ছেলেমেয়ে আসত সেখানে ফুল কুড়োতে। কারও কারও হাতে থাকত সাজি। অনেক ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেত ওরা। একদিন ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সাজি ভরে এত ফুল নিয়ে ওরা করে কী? একটি ছেলে জবাব দিল, ঠাকুরের পুজোর জন্যে ফুলের দরকার হয়। শুধুই কি শিউলি? হরেক রকমের ফুল দিতে হয় ঠাকুরকে। তাই ওরা ফুল কুড়োতে আসে রোজ।

কোনো ঠাকুরকে ফুল দেবার দরকার ছিল না আমার। তবু আমি ফুল কুড়োতাম মুঠো ভরে, শার্টের কোঁচড় ভরে। সে-ফুলের কিছু চাপা পড়ত বইয়ের পাতায়, খাতায় আর কিছু লুট করে নিত ছোটো ভাইবোনের দলে। কেউ-কেউ মালা গাঁথত শিউলি দিয়ে। আমার ফুলের সাজি ছিল না বলে কখনো কখনো মন-খারাপ হয়ে যেত। বাড়িতে কারুর কাছে সাজির বায়না ধরার সাহস পর্যন্ত হত না। তা ছাড়া চোখে দেখলেও ঐ জিনিসটার নাম যে সাজি তা আমার জানা ছিল না তখন। দেখে এত্ত ভালো লাগত যে ইচ্ছে হ'ত হাতে তুলে নিই। কিন্তু অচেনা ছেলেমেয়ের কাছে তো আর ঝট্ করে কোনো জিনিস চেয়ে বসা যায় না! তাই ছেলেবেলায় ফুলের সাজি আমার হাতে আসেনি কখনো। ফুলের সাজি থাক বা না-থাক, সোনালি জলের মতো টলটলে আলো-ভরা সকালবেলায় শিউলিতলায় ঘুরে বেড়ানোর খুশিটুকু তো ছিল। এইগুলির মাত্রা একটু বেশি ছিল বলেই হয়তো সাজি না থাকার দুঃখ তলিয়ে যেত কোথায়।

যে-লাল ইটওয়ালা ইশকুলটার কথা বলছি তার পাশেই একটা মসজিদ। খুব সুন্দর, অনেক দূর থেকে এসে দেখার মতো। বিকেলে, সন্ধ্যায়, কি জ্যোৎস্নারাতে যখনই দ্যাখো-না কেন ভালো তোমার লাগবেই। মসজিদটার সারা গায়ে একরাশ তারা ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এর নাম সিতারা মসজিদ। কিন্তু অনেক অনেক আগে এর নাম ছিল আলাদা। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মসজিদটা বানিয়েছিলেন মির্জা গোলাম পীর। তাই অনেককাল ধরে একে মির্জা গোলাম পীরের মসজিদ ব'লেই চিনত সবাই। তখন মসজিদটা অন্যরকম

ছিল। এত জ্বলজ্বলে ছিল না, ছিল না তারায়-তারায় ছাওয়া। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আলীজান ব্যাপারি পুরোনো মসজিদটাকে নতুন ক'রে তুলেছিলেন। ঢের টাকাকড়ি খরচ ক'রে জাপানি তার বিলাতি নকশা-করা চিনেমাটির টালি আনিয়েছিলেন তিনি মসজিদের জন্যে। মনের মতো করে তারায়-তারায় সাজিয়ে তুললেন মসজিদ। দেখতে দেখতে মসজিদের ভেতরে-বাইরে ফুটে উঠল চোখ-জুড়ানো শোভা। কোন আলীজান ব্যাপারি? সেই যে অনেক রাতে পামশুর খট খট শব্দ করে মাহুতটুলির গলি পেরুতেন তিনি? সাবান আর তামাকের মস্ত দোকান ছিল যাঁর? হ্যাঁ, সেই আলীজান ব্যাপারির হাতেই আঠারো শতকের পুরোনো মসজিদ পেল নতুন রূপ। আর সে কী রূপ! কতদিন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি ওর গম্বুজের দিকে। সূয্যিমামা অন্ধকার গুহায় লুকোনোর আগে তাঁর শেষ হাসিটুকু যখন ঝরিয়ে দিতেন সিতারা মসজিদের গম্বুজে, তখন মনে হত গম্বুজগুলো যেন মস্ত পাখি, সোনালি নদীতে নেয়ে উঠেছে, এক্ষুনি পাখা মেলে উড়তে শুরু করবে আবার। কখনো-কখনো আবার একঝাঁক কবুতর এসে বসত মসজিদের গম্বুজে। সাদা, কালো, খয়েরি, ধূসর — কত রং-এর পায়রা। গম্বুজে-গম্বুজে ছড়ানো, গোধুলির জবাফুলের মতো আলো, কবুতরের ঝলসানি, মসজিদের তারা-এই সবকিছু কেমন ঘোর লাগিয়ে দিত চোখে, অবাক হয়ে দেখতাম, কবুতরগুলো গলা ফুলিয়ে, মাথা দুলিয়ে চলাফেরা করছে গম্বুজ থেকে গম্বুজে। কখনো একসঙ্গে জড়ো হচ্ছে, কখনো আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। কখনো মনে হয়, ওরা যেন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, আবার কখনো মনে হয়, একজন দরবেশ মসজিদের গম্বুজে ছিটিয়ে দিচ্ছেন রুপোলি পানি আর সেই পানির ফোঁটা থেকে জন্ম নিচ্ছে নানা কবুতর।

লাল ইটওয়ালা ইশকুলের মাঠে খেলতে খেলতে যখন হয়রান হয়ে পড়তাম তখন যেতাম সিতারা মসজিদে। মসজিদের চৌবাচ্চার ঠান্ডা পানি দিয়ে হাত-পা ধোয়াটা ছিল অছিলা মাত্র। আসলে মসজিদের চৌবাচ্চা আমাকে কাছে টানত। কারণ, চৌবাচ্চায় খেলা করত অনেকগুলো রঙিন মাছ। কতদিন চৌবাচ্চার পানিতে হাত ডুবিয়ে রেখেছি, যদি কোনো ফাঁকে রঙিন মাছ ধরে ফেলতে পারি, এই আশায়। কিন্তু মাছগুলো কী করে যেন আমার মতলব বুঝে ফেলত। তাই আমার হাতের কাছেই ঘেঁষত না ওরা। দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াত।

রোজার দিনে সন্ধ্যার সময় বেশ মজা হত। তখন যারা মসজিদে থাকত তারা পেত ইফতারি। মুড়ি, ফুলুরি, দোভাজা, ছোলা, বেগনি ইত্যাদি মিশিয়ে দেয়া হয় সবাইকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েও ইফতারি পেত। আমার ভারি লোভ হত মসজিদের ইফতারি খেতে। ছেলেমেয়েরা আজানা হওয়ার আগে থেকেই হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিত কে কার আগে নেবে, এ নিয়ে রীতিমতো একটা হুলস্থুল বেঁধে যেত। ইচ্ছে হত, আমিও ছুটে যাই, জুটে যাই ওদের দলে। মুসল্লিরা সামনে ইফতারি সাজিয়ে বসে রয়েছে মসজিদের বারান্দায়, কান খাড়া রেখেছেন আজানের জন্যে। হাজার লোভ হলেও, জিভে পানি এলেও, ইফতারির জন্যে হাত পাতা সম্ভব ছিল না আমার। কেমন বাধো-বাধো ঠেকত। তাই আধো আলো, আধো অন্ধকার মনে খালিহাতেই বাড়ি ফিরতাম। বাড়িতে ইফতারির

সরঞ্জামের অভাব ছিল না, কিন্তু চোখ পড়ে থাকত সিতারা মসজিদের বারান্দায়। শুধু মনে হত, ঐ মুড়ি, ফুলুরি, দোভাজা, ছোলা আর বেগনি-মেশানো খাবারটা যেন রূপকথার দেশ থেকে এসেছে, আমাদের রোজকার দেখা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের জিনিস।

হঠাৎ ফোড়ন কাটে ব্যাঙ্গমা, "মসজিদের ভেতর যেতে না তুমি?"

যাব না কেন? যেতাম নতুন কাপড় পরে আব্বার সঙ্গে ইদের নামাজ পড়তে। সে কি আজকের কথা? সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে পড়ত খোদার দরবারে, সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে সিজদা দিত মসজিদের ঠান্ডা মেঝেতে। চমৎকার ঠান্ডা! নাক, কপাল, হাতের তালু আর পায়ের পাতা সেই ঠান্ডার আদর খেত বেশ কিছুক্ষণ। সুরা মুখস্থ করানো হয়েছিল আমাকে। বেশ কয়েকটা সুরা জানা ছিল আমার। নামাজ পড়ার নিয়ম-কানুনও একেবার অজানা ছিল না। কিন্তু সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, সিতারা মসজিদের ভেতরে ঢুকে সুরা ভুলে যেতাম বিলকুল। আমার চোখ দুটো ঘুরে বেড়াত মসজিদের দেয়ালে, খিলানে। দেয়ালে-দেয়ালে গোলাপফুল। চিনেমাটির টালির ওপরে নকশা-আঁকা ফুল। দেয়ালে শুধু ফুলই ছিল না, সুন্দর লতাপাতাও ছিল। সবই নকশা। কিন্তু জনমনিষ্যির নকশা ছিল না, এমনকি পাখপাখালিরও নয়। ইদের দিন ছাড়াও কোনো কোনো শুক্রবার আব্বা আমাকে নিয়ে যেতেন সিতারা মসজিদে। নামাজ শেষ হয়ে গেলেও আব্বা বেশ কিছুক্ষণ বসতেন মসজিদের ভেতর। দোয়া-দরুদ পড়তেন নীরবে। আমি বসে থাকতাম তাঁর পাশে। চেয়ে চেয়ে দেখতাম ফুল, লতাপাতা, আর মাথার ওপরে ঝুলে-থাকা বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন। কী যে ভালো লাগত আমার এলোপাথাড়ি চেয়ে দেখতে মসজিদের দেয়ালে-দেয়ালে ফুল, লতাপাতা, বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন—চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করত না। আব্বার মৃদু ডাকে মনে পড়ত, এবার যেতে হবে। তাই একসময় ফুরুত সেতারা মসজিদের ঠান্ডা-ঠান্ডা মেঝেতে বসে আমার সেই দেখা-দেখা খেলা। ঝাঁঝাঁ দুপুরবেলা আব্বার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রওনা হতাম বাড়ির দিকে। দেখতাম, ঐ কিছুদূরে পামশু জুতোর খট খট শব্দ ক'রে হেঁটে চলেছেন বেঁটেখাটো আলীজান ব্যাপারি, সাত-তাড়াতাড়ি। পরনে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, ঝাঁঝাঁ রোদে ওঁর মাথার সাদা টুপিটাকে মনে হত সিতারা মসজিদেরই একটা মস্ত তারার মতো।

## ॥ চার ॥

বুকটা দুরদুর করছিল। তখন বেলা দুপুর, অথচ চারদিকে কেমন অন্ধকার। একটা ভেজা কালো শাল মেলে দিয়েছে কেউ। হুড়মুড় করে ছুটে গেল ওরা। কয়েকটি ছোটো ছেলে। যেন উড়ে গেল কয়েকটি রঙিন বেলুন। আমি উঠছি নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। সঙ্গে অভিভাবক। হাঁটছি তাঁর হাত ধরে। ভালো করে সবকিছু চেয়ে দেখব তার জো নেই। পড়ো-পড়ো কাঠের সিঁড়িটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম সেই মুহূর্তে। একটু বেশি হুঁশিয়ার হয়েই পা ফেলছিলাম আস্তে-আস্তে। সারাক্ষণ ভয় হচ্ছিল, যদি কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে পড়ে হঠাৎ। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কাঠের সিঁড়ি বেশ ঠাটের সাথেই দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়।

সিঁড়ি পেরিয়ে ঘর। ঠান্ডা ঠান্ডা। মনে হল, কুলফির ভেতর সেঁধিয়ে গেছি। দু'একটা স্বর ভেসে এল কানে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। দেয়ালে মস্ত একটা তেলছবি। সাহেবি পোশাক পরা গোঁফঅলা এক ভদ্রলোক। বইভরা ছোট্ট একটা টেবিলে হাত রেখে দাঁড়ানো। অভিভাবক তেলছবিটা দেখিয়ে বললেন, "ইনি মিস্টার পোগোজ। এঁর নামেই ইশকুলের নাম।"

কেরানিবাবু আমার নাম লিখলেন খাতায়। লেখার আগে আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। পরখ করলেন হয়তো। এর ফাঁকে একবার দৃষ্টিটাকে ছুটিয়ে দিলাম পাশের ঘরে, যেখান থেকে ভেসে আসছিল দু'একটা স্বর। কোনোটা বাজখাঁই, কোনোটা ধিমে শান্ত। দেখলাম কয়েকজন বসে আছেন চেয়ারে। কারও মাথায় কালো চুল, কারও সাদা-কালো, কারও-বা একদম সাদা। কারও মাথায় আবার ধুধু মাঠের মতো মস্ত টাক। ওঁদের সামনে একটা বড়ো টেবিল। টেবিলের ওপর কিছু ঝানু বেতও চোখে পড়ল। তক্ষুনি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ততক্ষণে খাতায় নাম উঠে গেছে আমার। ভরতি হলাম দ্বিতীয় শ্রেণিতে। অবশ্য এর আগে ক্লাসে দাখিল হওয়ার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি আমার পেটে আছে কি না তার প্রমাণ দিতে হয়েছে পরীক্ষার খাতা লিখে। কাকের ছা বকের ছা কী-যে লিখেছিলাম সেদিন, আজ তার বিন্দুবিসর্গটুকু মনে নেই আর।

প্রথম দিনে ক্লাসে ঢুকেই ভড়কে গিয়েছিলাম মনে পড়ে। অভিভাবকটি আমাকে ক্লাসের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েই খালাস। আমি হাঁটিহাঁটি পা-পা এগিয়ে গেলাম ক্লাসের ভেতর। আমাদের খাঁচার পাখিটা একদিন খাঁচা ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু পালাবে কোথায়? অনেকদিন খাঁচার ভেতর থেকে থেকে ওড়াটাই ভুলে বসেছিল সে। তাই কেমন বেকুবের ঢঙে হাঁটতে চেষ্টা করল বারান্দায়। আর ওড়ার আগেই আবার ধরা পড়ে গেল, আবার ওকে পোরা হল খাঁচার ভেতর। আমাকে নিশ্চয়ই তখন আমাদের সেই পাখিটার মতো মনে হচ্ছিল। ক্লাসের ভেতর পা রাখতেই দেখলাম একটি ছেলে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে। আরেকজন বসে আছে মাটিতে হাঁটু মুড়ে মাস্টার মশায়ের টেবিলের সামনে। মাস্টার মশায়ের চোখে চশমা, হাতে বেত। বেত দেখে মনে হল ওটা ঢের তেল শোষণ করেছে অনেক দিন ধ'রে আর অনেক ছেলের গায়ের চামড়ার সঙ্গেই নিত্যি নিত্যি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে ওর। কোথায় বসতে হবে, মাস্টারমশায় বেত উঁচিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন আমাকে। আমি সুবোধ বালকের মতো সেই জায়গায় বসে পড়লাম। আমার ওপর অনেকগুলো চঞ্চল চোখ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল একসঙ্গে। ওদের চাউনি দেখে মনে হল, এইমাত্র চিড়িয়াখানার বেড়াতে এসেছে ওরা, কেমন একটু রাগই হল আমার। দৃষ্টির ঝাঁক এড়িয়ে আমি দেয়ালে ঝোলানো কালো বোর্ডটার দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। চকখড়ির লেখাগুলোসুদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, মনে হল। মুহূর্তে বোর্ডটার লেখাগুলো আমার নানার মুখ হয়ে গেল। নানার চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, এমনকি সাদা দাড়িতেও হাসির ঝিলিক। নানার সেই পাখির মতো সুরে বলছে, "কী ভায়া, মজা টের পাচ্ছ তো এখন।" কতগুলো দুষ্টু চঞ্চল চোখ, ঘরের দেয়াল, দেয়ালে ঝোলানো কালো বোর্ড, চকখড়ির লেখা—এই সবকিছুই যেন আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে একটা বিদঘুটে ফাঁদ পেতে বসেছে।

আস্তে-আস্তে ভয় গেল কেটে আর অচেনা হয়ে উঠল চেনা। কালো বোর্ডটার সাদা লেখাগুলো নানার দুষ্টুমিভরা মুখ হয়ে ওঠে না আর। আবু তাহের, সূর্যকিশোর, আশরাফ, বিমল, সুবিমল, নীহার, শিশির, অনিল, নিরঞ্জন, সুজা—এরা সবাই বন্ধু হল আমার। নামগুলো যেন মানিকের আলো দিয়ে গড়া। আজ ওরা শুধু কয়েকটা নাম। কিন্তু অনেকদিন আগে,যখন আমি পোগোজ ইশকুলের নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উঠতাম, নামতাম দিনে কয়েকবার, যখন রোদ্দুরে-মাখা মাঠটায় গোল্লাছুট খেলতাম সবার সঙ্গে কিংবা বারান্দায় বসে পা দোলাতাম আপনমনে, শুনতাম হিন্দুস্থানি দারোয়ানের ঢং-ঢং-ঢং ঘন্টাধ্বনি, তখন একদিন ওদের না দেখলে মন-খারাপ হয়ে যেত আমার।

তাহের ও আমি ঝগড়া করতাম প্রায়ই। কত কিল-ঘুসি-চড় বয়ে গেছে আমাদের ওপর! ঝগড়া হত ঠিকই, কিন্তু গলাগলি করতেও দেরি হত না আমাদের। দুটো শব্রিআম কিনলে একটা সে আমাকে দিত, অন্যটা খেত নিজে। একটা সন্দেশ কিনলে—হায়রে, দুটো সন্দেশ কেনার মতো পয়সা পেতাম না তখন—আধখানা তাহেরকে দিতাম আর নিজে খেতাম বাকি আধটা। মাঝে-মাঝে সূর্যকিশোরও ভাগ পেত। ব্লেড খাওয়ার অভ্যেস ছিল সূর্যকিশোরের। আস্ত ধারালো ব্লেড চিবিয়ে খেয়ে ফেলত সে। অবাক হয়ে দেখতাম। আমাকে অবাক হতে দেখে জাদুকরের মতো হাসত সূর্যকিশোর।

সূর্যকিশোর থাকত আরমানিটোলায়। আরমানিয়ানদের অনেক পুরোনো একটা গির্জা আছে সেখানে। আরমানিটোলায় কতদিন গেছি সূর্যকিশোরদের বাসায়। আজও সেই বাড়িটার ধার-ঘেঁষে পথ হাঁটি কখনো-সখনো। সেই জানালা এখনও আছে, সেই পুরোনো দরজা। যদি কড়া নাড়ি, যদি নাম ধরে ডাকি, সূর্যকিশোর কি আগের মতো সাড়া দেবে আবার? ছুটে আসবে সে? ছুটে আসবে সেই ব্লেড-চিবিয়ে-খাওয়া ছেলেটা যার ঠোঁটে সবসময় লেগে থাকত একটুকরো হাসি? আজ আর কড়া নেড়ে, নাম ধরে ডেকে লাভ নেই। সূর্যকিশোর সাড়া দেবে না। সে এখানে নেই, আরমনিটোলায় নেই। তাই সেই জানালার দিকে তাকিয়ে নিমগাছটার একরাশ পাতার ঝিলিমিলি দেখে নিরিবিলি হেঁটে যাই মাথা নীচু করে। মনে হয় পিছু পিছু কে যেন আসছে। সূর্যকিশোর নয়তো? কিংবা তাহের? না আমার মনেরই ভুল।

আরমানিটোলার মাঠ পেরিয়ে বাবুর বাজারের পুল পেরিয়ে ইসলামপুরের রকমারি দোকান ঘেঁষে কখনো পটুয়াটুলির পথ মাড়িয়ে কখনো-বা শাঁখারিবাজারের ভেতর দিয়ে পোগোজ ইশকুলে আসা-যাওয়া করতাম রোজ। শাঁখারিবাজারে ঢুকলেই একটা গন্ধ এসে জড়িয়ে ধরত আমাকে। শাঁখের গুঁড়োর গন্ধ। দেখতাম শাঁখারিরা শাঁখের ওপর করাত চালাচ্ছে দু'বেলা। সমস্ত গলিটা রূপকথার ভ্রমর হয়ে উঠত করাতের গুঞ্জনে। দিনের পর দিন ঐ সরু গলির ভেতর তৈরি হত শাঁখের রকমারি সুন্দর সুন্দর সব জিনিস। ভাবতাম ছোটো একটা গলিতে এত লোক থাকে কী করে, এত সুন্দর কাজই-বা শেখাল কে ওদের? সরু নরুনের মতো যন্তর দিয়ে শাঁখের গায়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা তো মজার খেলা। বছরের পর বছর ধরে এই ভারি মজার খেলাটা খেলে আসছে শাঁখারিরা। আজ যে-শাঁখারি শাঁখের কারুকাজময় চুড়ি বানাচ্ছে সে ওর বাবার কাছে শিখেছিল এই বিদ্যে।

তার বাবা আবার শিখেছিল ওর বাবার কাছে। এমনিধারা হাতে-হাতে চলে এসেছে এই চমৎকার শাঁখের কাজ। আজ ঢাকা শহরের অনেক কিছু বদলে গেছে, কিন্তু শাঁখারিবাজার সেই আগে যেমন ছিল এখনও রয়ে গেছে ঠিক তেমনি। সেই সারি সারি পুরোনো বাড়ি, ছোটো ছোটো নিচু নিচু ঘর। সেই অন্ধকার। সেই শাঁখ, সেই করাত। সেই শাঁখের গুঁড়ো, সেই গন্ধ।

বাবুর বাজারের পুল পেরিয়ে ক'পা হাঁটলেই আমপট্টি। আমপট্টিতে ফলের দোকান। অনেক দূরের পেশোয়ারি ফল সাজানো থরেথরে। আর সাজানো রয়েছে নানা ধরনের আম। ফলের দোকানগুলোর উলটোদিকে ছিল আরেকটা দোকান। ফলের নয়। ছবি বাঁধানো হত সেখানে। দোকানের ভেতর-বাইরে সবখানেই নানা রঙিন ছবির ভিড়। মুনি-ঋষি, মহাপুরুষ, লাল-নীল পরি সবাই আছে দোকান আলো করে। ইশকুল থেকে ফেরার পথে দাঁড়াতাম সেই দোকানের সামনে। কত্ত ছবি আর কী রঙের বাহার! যেন রঙের মেলা ব'সে গেছে।

একটা ছবি খুব টানত আমাকে। ভরাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম ঐ ছবির দিকে। আরও অনেক ছবি ছিল সত্যি, কিন্তু ওগুলো আমার চোখে লাগেনি। যে-ছবিটি মন কেড়েছিল ওটা ছিল একটা ঘোড়ার ছবি। ঘোড়ার গায়ে একঝাঁক তির। ওর সমস্ত গা বেয়ে মোরগফুলের মতো লাল রক্ত ঝরছে। রক্তাক্ত ঘোড়াকে দেখে আমার মন হয়ে যেত ঝাঁঝাঁ। মনে হত আমি অনেক দূরের একা নিঝুম মাঠে চলে গেছি—সেখানে পাখির গান নেই, একরত্তি ঘাস নেই, খড়কুটো নেই, নেই এক ফোঁটা পানি। ইচ্ছে হত ঐ তির-বেঁধা কাচবন্দি ঘোড়াটাকে নিয়ে যাই বগলদাবা করে, তারপর টানিয়ে দিই আমার ঘরের দেয়ালে। কিন্তু ওটা কেনার মতো পয়সা পাব কোথায়? তবু একদিন সাহস করে দোকানদারকে ঘোড়াটার দাম জিজ্ঞেস করলাম। দোকানদার জানিয়ে দিল যে, চার আনা পয়সা পেলে সে দুলদুলটা আমাকে দিয়ে দেবে। ওরে বাব্বঃ, চার আনা! দাম শুনে আমি ভড়কে গেলাম—দুলদুলের পিঠ নীচের দিকে, পাগুলো ওপরে, দোকানদার আবছা।

অত্ত পয়সা তো আমার নেই। মাত্তর একটা পয়সা আছে। আম্মা দিয়েছিলেন টিফিন খাওয়ার জন্যে। দুলদুলের দিকে, মানে ঐ তির-খাওয়া ঘোড়াটার দিকে জ্বলজ্বলে-চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলাম।

ঠিক করলাম টিফিন না খেয়ে পয়সা জমিয়ে একদিন দুলদুলকে নিয়ে আসব আমার ঘরে। নানির মুখে কারবালার কথা শুনে-শুনে ইমান হোসেনের সেই আশ্চর্য ঘোড়াটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তাই ওটা আমার চাই-ই। তবে একনাগাড়ে ষোলো দিন টিফিন না খেয়ে থাকতে হবে! কিছুই দমাতে পারল না আমাকে—শব্রিআম, সন্দেশ ইত্যাদির লোভ সামলে তিন দিনে তিনটে পয়সা জমালাম। কিন্তু চতুর্থ দিনে ইশকুলের গেটের সামনে ঝাঁকাভরতি সবুজ সবুজ, হলুদ শব্রিআম দেখে মন গেল টলে। জিভের ডগায় পানি, ঢোক গিলে পকেট থেকে বের করলাম পয়সা। হাতে এল ডাঁশা-ডাঁশা খাসা শব্রিআম। থামলাম না মুহূর্তের জন্যে, দাঁত বসিয়ে দিলাম শব্রিআমের চকচকে শরীরে। এমনি ক'রে শব্রিআম কেনা আর না-কেনার ফাঁক দিয়ে সোনার পানির মতো

গড়িয়ে গেল অনেকগুলি দিন। চার আনা পয়সাও হয় না আর দুলদুলকেও আনা হয় না বাড়িতে। কিন্তু ইশকুল থেকে ফেরার পথে রোজই ওর সঙ্গে দেখা করে আসি। দোকানের সেই কাচবন্দি ঘোড়াটা আমার স্বপ্নের তেপান্তর মাঠে রেশমের ঝালরের মতো কেশর দুলিয়ে রঙিন চাদর ঝুলিয়ে দৌড়ে বেড়াত মাঝে-মাঝে। তখন ঐ নিষ্ঠুর কালো কালো তিরগুলো বদলে যেত সাদা নরম পালকে।

অনেক কষ্টের পর একদিন আমার খাজাঞ্চিখানায় জমে উঠল ষোলো-ষোলোটা পয়সা। হাতের মুঠোয় পয়সাগুলো নিয়ে হাজির হলাম সেই দোকানে। দোকানদারের হাতে পয়সা গুঁজে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল ছেড়ে নেমে এল তিরবেঁধা, রক্তাক্ত দুলদুল। দুলদুলকে নিয়ে চোঁচা চম্পট। একদৌড়ে পৌঁছে গেলাম বাড়ি। দেয়ালে ছোট্ট একটা পেরেক গেঁথে দুলদুলকে টানিয়ে দিলাম সেখানে। প্রথম ক'দিন দিব্যি মেতে রইলাম দুলদুলকে নিয়ে—একে দেখাই, ওকে দেখাই আর দিনরাত শুধুই দুলদুলের গল্প করি সবার কাছে। কিন্তু আস্তে -আস্তে একদিন আমার উৎসাহ ধিমে হয়ে এল। দুলদুল দেয়ালেই রইল, অথচ ঘনঘন আর চোখ পড়ে না ওর ওপর। একদিন দেখি কি, এরই মধ্যে ধুলোর সর জমে উঠেছে দুলদুলের গায়ে। তাড়াতাড়ি ধুলো পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। বুঝি তাড়াহুড়োর জন্যেই হঠাৎ তিরবেঁধা, রক্তাক্ত ঘোড়াটা আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে। কাচ ভেঙে চুরমার।

দুলদুলের এই হালের জন্যে মনে যতটা কষ্ট পাব ভেবেছিলাম ততটা কষ্ট হয়নি আমার। এজন্যে নিজের ওপরই রাগ হল খুব। যেখানে কাচবন্দি দুলদুলকে টানিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে বিচ্ছিরি একটা শূন্যতা ঝুলে রইল। মনে হল, ড্রইং খাতায় একটা ছবি এঁকেছিলাম অনেক কষ্ট করে, কিন্তু এইমাত্তর মুছে ফেলেছি রবার দিয়ে ঘষে ঘষে।

## ॥ পাঁচ ॥

"এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা।" যেন কোনো জাদুকরের মুখের বুলি। শুনলেই চোখে কুয়াশা জমে, কানে শিশিরের বোল বাজে মিহি সুরে, ফুরফুরে সুরে—টুপ্ টাপ্ টুপ্ টাপ্! ইচ্ছে হয় চুপচাপ ব'সে থাকি অনেকক্ষণ এক জায়গায়, একটু না ন'ড়েচড়ে। ব'সে থেকে সেই জাদুকরের মুখের বুলি আওড়াতে ভারি ইচ্ছে করে মানিকের রঙে রাঙা কোনো কবিতার লাইনের মতো। অন্য সব খেলা ছেড়ে এই "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা" শব্দের খেলায় ডুবে থাকতাম কতদিন। মহর্‌রমের সময় যখন দেখতাম, কিছু ছেলেপেলে সাদা পাজামার ওপর টিয়েপাখির ডানার রঙের মতো সবুজ লুঙ্গি আর সবুজ কুর্তা প'রে, কবজিতে ঝলমলে তারের কাঁকন বেঁধে হাতে নিশান নিয়ে ভেস্তা সেজে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন কী-যে ভালো লাগত আমার। শুধু ছোটোরাই নয়, বড়রাও ভেস্তা সাজে মহর্‌রমের সময়। মিছিলে-মিছিলে ভেস্তারা আওয়াজ তোলে "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা।"

মহর্‌রমের কথা উঠলেই মনে পড়ে, ইমাম হোসেন ফোরাত নদীর তীরে কারবালার ধুধু মাঠে প্রাণ হারিয়েছিলেন শত্তুরের হাতে। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেই প্রাণ হারিয়েছিলেন কারবালায়। সখিনার হাতের মেহেদির রং আর কাসেমের রক্তের রং এক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ফোরাত নদীর তীরে তাঁবু ফেলেছিলেন তাঁরা, কিন্তু তেষ্টা মেটানোর জন্যে এক ফোঁটা পানিও পাননি কেউ। বুক-ভরা তেষ্টা নিয়ে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিলেন অনেকে। কেউ কেউ বন্দি হলেন শেষে। এসব কথা 'বিষাদ সিন্ধু' বইয়ে প্রথম পড়ি। মীর মশাররফ হোসেনের লেখা বই।

মনে পড়ে, একবার সেই মস্ত বইটা আগাগোড়া পড়ে শোনাই আমার নানিকে! নানিও বইয়ের সব জায়গা ভালো বুঝতে পারতেন না। আমাকে সহজ করে বুঝিয়ে বলতে হত জায়গায় জায়গায়, থেমে থেমে। আমিও বুঝতে পারতাম না কিছু অংশ। সবগুলো শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। কেন আস্ত লাইন কেমন গোলমেলে ধোঁয়াটে ঠেকত সেজন্যে। অনেকগুলো শব্দ আবার ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতেও কষ্ট হত পষ্ট। তবু হোঁচট খাব না, নানির কাছে কিছুতেই নাকাল হব না, এমন একটা পণ করেছিলাম মনে-মনে। মুখে যা আসত তা-ই গড়গড় করে পড়ে যেতাম—নানি তো আর বুঝতে পারবেন না আমার কেরদানি! নানিকে সহজ করে বুঝিয়ে বলার সময় মীর মোশারফ হোসেনের কাহিনিতে যে আমারও কিছু কথা মিশে যেত না, এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম, এতক্ষণ ধরে আমার বকবকানি নানি শোনেন কী করে? খারাপ লাগে না তাঁর? হয়তো ধর্মের কাহিনি শুনছেন বলেই আমার বিষাদ সিন্ধু পড়া তাঁর ভালো লাগত। আমার পড়ার ভঙ্গি তিনি অপছন্দ করতেন বলেও মনে হয় না। কারণ আমার পড়ার তারিফ শুনেছি নানির মুখে।

যাহোক, মহর্‌রমের সময় হোসেনি দালানে যেতাম আমরা সব ছেলেমেয়ের দল। আমাদের সঙ্গে থাকতেন একজন মুরুব্বি। চান খাঁর পুল অর্থাৎ নাজিমুদ্দীন রোডের কাছাকাছি জায়গাতেই হোসেনি দালান। একটা পুকুরের উত্তর পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অনেকদিনের পুরোনো দালান। ইমামবাড়া। এমনিতে হোসেনি দালান সুনসানই থাকে, কিন্তু মহর্‌রমে লোক-গিজগিজ করে সেখানে। রাতদিন লেগে থাকে লোকজনের আনাগোনা। রীতিমতো বড় মেলা বসে যায় হোসেনি দালানে। কত খেলনা, রংবেরঙের পুতুল, টিনের বাঁশি, মাটির নৌকা, কাঠের ঘোড়া, আরও কত কি! সন্ধ্যাবেলায় দামাল সূর্য তার খেলা শেষ করে যখন উধাও হয় অন্ধকারের রাজ্যে, তখন অনেক অনেক মোমবাতি জ্বলে ওঠে। আলোর অলংকার প'রে রাতে হোসেনি দালানের রাঙা আলো দেখে মন খুশিতে নেচে ওঠে দোকানে সাজিয়ে রাখা স্প্রিং-দেয়া রঙিন পুতুলের মতো। ক্লাসে মাস্টারমশায়ের বকুনি খেয়েছিলাম, পেন্সিলের শিস ভেঙে দিয়েছিল সূর্যকিশোর, হঠাৎ ঘুসি মেরেছিল আবু তাহের, অরুণের হাতের লেখার মতো সুন্দর নয় আমার হাতের লেখা—তখন এইসব দুঃখ মন থেকে মুছে যেত একেবারে।

হোসেনি দালানের পুকুটার সামনে দাঁড়াল কেমন গা-ছমছম করত। পুকুরের পানি দেখতে ভালো ছিল না তেমন। কেমন মরা, সবুজ সবুজ। ছ্যাঁতলা-পড়া। মনে হত, পানি

থেকে আজগুবি একটা জানোয়ার ঝপ করে উঠে এসে খপ করে ধরে ফেলবে আমাকে। ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠত, ভীষণ তেষ্টা পেত তখন। ভয়ের কারণও ছিল। পুকুরটার একটা বদনাম আছে। প্রতি বছর হোসেনি দালানের পুকুর 'ভোগ' নেয়ায় বলে আগেই শুনেছিলাম। কেউ-না-কেউ প্রতি বছর ডুবে মরত ঐ পুকুরে। শুনেছি, রাতদুপুরে ইয়া বড়ো বড়ো 'ডেগ' অর্থাৎ তামার মস্ত হাঁড়ি ভেসে ওঠে হোসেনি দালানের পুকুরের মরা সবুজ-সবুজ পানির ওপর। কাহন কাহন সোনা আর মুক্তো-মানিক নাকি ভরা সেসব ডেগের ভেতর। কে কবে সেই ডেগগুলো দেখেছে কিংবা দেখলেও কেন ডেগ থেকে কাহন কাহন সোনার এক দানা সোনাও তুলে নেয়নি, এসব কথা কেউ জানতে চাইলে তার ঠিক জবাব পাওয়া মুশকিল। এ ব্যাপারে সবার মুখেই যেন খিল। কেউ বলে, অমুকের নানা দেখেছে, কেউ বা বলে তার দাদার দাদা দেখেছে। আর সোনার কথা যদি বলি, গায়েবি মালে হাত লাগাবে এমন সাধ্যি কার? নির্বংশ হয়ে যাবে না সে? সাতপুরুষের ভিটে খাঁখাঁ করবে, সোনার চাঁদ ছেলের বদলে ঘুঘু বেড়াবে সেখানে।

নানা গল্পের জন্যেই হোক, কিংবা এমনি কোনো কারণেই হোক, আমি কিন্তু সত্যি ভয় পেতাম পুকুরটাকে। মরা সবুজ-সবুজ পানি সত্ত্বেও ওকে কেমন জ্যান্ত মনে হত। তাই বেশিক্ষণ দাঁড়াতাম না সেই পুকুরের ধারে। চলে যেতাম দালানের ভেতর। কে তৈরি করেছিলেন এই হোসেনি দালান? কেউ বলেন নবাব নসরৎ জঙ্গ, আবার কেউবা বলেন, মীর মুরাদ। শোনা যায়, মুরাদ স্বপ্নে ইমাম হোসেনকে দেখেছিলেন। দেখেছিলাম ইমাম হোসেন একটা তাজিয়াখানা বানাচ্ছেন। তাজিয়াখানা মানে শোকের বাড়ি। এই স্বপ্ন ভাবিয়ে তুলল মীর মুরাদকে। তারপর মীর মুরাদ একদিন ঠিক করলেন যে একটা দালান বানাবেন তিনি। দেখতে-দেখতে গড়ে উঠল দালান, শোকের বাড়ি। মীর মুরাদ বাড়িটার নাম রাখলেন হোসেনি দালান। মহররমে প্রতি বছর হোসেনি দালানকে আলো দিয়ে সাজানো ও গরিবদের খাওয়ানোর জন্যে যে টাকাপয়সা খরচ হত তা মীর মুরাদই দিতেন।

দালানের ভিতরটা বেশ রহস্যময় মনে হত। যেন মায়াপুরীর এমন একটা অংশ, যেখানে সবকিছুই কেমন আঁধার-জড়ানো, দীর্ঘশ্বাস-ছাড়ানো। দালানের নীচে কয়েকটা কুঠুরি। ওগুলোতে কবর রয়েছে কয়েকটা। হোসেনি দালানের বাইরে আলোর ঝিলিক, ঝলমলে মেলার গুঞ্জন, কিন্তু ভেতরে হুহু মাতম। কে যেন গুমরে কাঁদছে। দালানের দেয়াল ফুঁড়ে প্রতিটি ইটের ফাঁক থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসছে গুমরে-ওঠা কান্না। সেই কান্না আর মর্শিয়ায় সুর এক হয়ে আমার বুকে বইয়ে দিত ঠান্ডা, ভেজা হাওয়া। কোনোকিছুরই মানে খুঁজে পেতাম না, কিন্তু বড্ড কান্না পেত। কেন জানি মনে হত, পাষাণপুরীর সেই ঘুম-যাওয়া রাজকন্যা কোনোদিনই জাগবে না। শিয়রে বারবার সোনার কাঠি ছোঁওয়ালেও সে জাগবে না আর। চিরকালের জন্যে সেই রাজকন্যা ঘুমের দেশে চলে গেছে। যারা ঐ নীচের ছায়া, ছায়া, ঠাণ্ডা কুঠুরিতে ঘুমিয়ে রয়েছে ওরা তো কোনোদিন চোখ খুলবে না। যারা কুঠুরিতে কবরতলায় ঘুমিয়ে আছে ওদের আমি কখনো দেখিনি। ওদের চিনি না আমি। তবু কেন আমার বুক ঠান্ডা, ভেজা হাহাকার? তবু কেন আমার

কান্না পায় অমন ক'রে? হোসেনি দালানের দেয়ালগুলোতে কী এমন আছে যা একটা ছোটো ছেলেকেও কাতর ক'রে ফেলে এভাবে?

কিন্তু কী মজা, ছায়া-ছায়া মাতম-মাখা দালানের বাইরে এলেই ঠান্ডা ভেজা হাওয়া নেই বুকের কুঠুরিতে, আর নেই কান্না-পাওয়া। আছে ঝলমলে আলো, মোমবাতির টলটলে আলো। আলো গ'লে পড়ছে সবখানে। মানিক-রং আলো আছে হোসেনি দালানের গায়ে। আর আছে মেলা। মেলার ভিড়। লোকজন। ছেলেমেয়ে। আমরা। আরও অনেকে আমাদের মতো। সবার মুখে খুশির ঝলক। চোখের পলক পড়তে চায় না খেলনার বাহার দেখে। আহা রে, আরও যদি কিছু পযসা থাকত তা হলে ঐ পাগড়ি-পরা রাজাটাকে কেনা যেত। হাতের মুঠোয় পাওয়া যেত বূপকথার রাজাকে। ভারি মজা হত, তাই না? না, টিনের কুলো কিনে দিলে হবে না, পাগড়ি-পরা রাজা ছাড়া আর কিছু চাই না।

আর মেলা বসত কারবালায়, মানে শহর থেকে দূরে, আজিমপুরে। সেখানেও লোকজনের ভিড়। মানুষ—ছোটো, বড়ো, মাঝারি। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে সবাই। মেয়েরা মিছিল দেখত, ভিড় দেখত, তাজিয়া দেখত, ঘোড়াগাড়ির বন্ধ খিড়কির ফাঁক দিয়ে। ঘোড়ার গাড়ির বাইরে ওদের আসতে মানা। এখানেও রকমারি খেলনা আর খাবার জিনিস। নিমকি, মুরখি, মুড়কি, গোলাব লেউড়ি, নাড়ু, আরও কত কী! চড়া রোদের দুপুরে কারবালা তেতে উঠত ভয়ানক, যেন রুটি-সেঁকার গরম তাওয়া। একটু হাওয়া, একটু ছায়ার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। খেলনা আর রংবেরঙের খাবার জিনিস দেখে আমরা যারা ছোট তারা রোদের সুচের খোঁচা খেয়েও ভুলে থাকতাম। তবে মাঝে-মাঝে তেস্টায় বুক ফেটে যেত। রক্ষে, ভেস্তোরা মাটির খুরিতে পানি দিত খেতে। কারবালায় মেলা বসত আশুরা অর্থাৎ মঞ্জিলের দিন। মহর্‌রমের দশম দিনকেই বলে আশুরা। কারবালার একটা দৃশ্য কিছুতেই ভুলতে পারিনি না আজও। মিছিলে কিছু লোক বুক চাপড়াচ্ছে তো চাপড়াচ্ছেই, অনেকে আবার ছুরি দিয়ে বুক ঠুকছে—টাটকা রক্ত বেরুচ্ছে ওদের বুকে থেকে। দরদরে ঘাম আর রক্ত একাকার। এটা আমার ভালো লাগত না কিছুতেই। ও-কাজে সায় ছিল না আমার। কিন্তু আমি চাইলে না-চাইলে কী এসে যায়, যাদের কাজ তারা করবেই।

আর ভুলতে পারি না তাজিয়া ডোবানোর সেই দৃশ্য। মিছিলের লোকজন "ইয়া হোসেন, ইয়া হোসেন" বলছে না "হায় হোসেন, হায় হোসেন" বলছে তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না। মনে হত, ওরা "হায় হোসেন, হায় হোসেন"'ই বলছে। ইমাম হাসান-হোসেনের নকল কবরকেই বলে তাজিয়া। কাগজ দিয়ে তৈরি। আমার কিন্তু এগুলোকে আসল করব বলেই মনে হত তখন। তাই পানিতে তাজিয়া ডুবতে দেখে মন-খারাপ হয়ে যেত আমার। হোসেনি দালানের সেই দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা কান্নার হুহু সুর বেজে উঠত কারবালায়। আকাশে তখন সূর্য শুধু যাই-যাই করছে।

মহ্‌রমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগত চকে। মাঝরাতের মিছিল। নানির সঙ্গে যেতাম চকের বাজারের একটা বাড়িতে রাত্তিরে মিছিল দেখব ব'লে। নানি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ঝিমুতাম।

কখন ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি তাদের রূপালি সোনালি পাখা দুলিয়ে সবচেয়ে মিষ্টি এক সুরে গান গাইতে গাইতে হাজির হতেন চকের সেই বাড়িটার আঁধার-ভরা বারান্দায়, টের পেতাম না। ঘুম ভাঙত নানির ঝাঁকুনিতে "কী রে মিছিল দেখবি না?" চোখ কচলাতে কচলাতে বলতাম, "কই মিছিলি?" নানির জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে হত না। ততক্ষণে মিছিলের শব্দ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে আমার কানের ভেতর। একটু পরেই চোখের সামনে ঝলমলে মিছিল। আলম বরদার, আশা বরদার, কালো কাপড়ে ঢাকা বিবিকা ডোলা, — একে একে সবকিছু চোখের সামনে। আমার চোখ লুট করতে শুরু করে সিল্কের নিশান, লাঠির ঠোকাঠুকি, তলোয়ারের ঝলসানি, আগুনের চরকি। ফাঁকে-ফাঁকে শোনা যায় ভেস্তাদের "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে — স্তা।"

চোখ জুড়িয়ে যেত লাঠি ঘোরানোর কায়দা দেখে, আগুনের চরকির খেলা দেখে। মনে হত, যদি আমিও ফুরফুরে বাতাসে দুলে-ওঠা ঐ সুন্দর সিল্কের রঙিন নিশান নিয়ে ভেস্তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে পারতাম! লোভে নতুন পয়সার মতো চকচকিয়ে উঠত আমার চোখ দুটো। ঐ তো চলেছে কাগজের কবর। আর চলেছে দুলদুল ঘোড়া। দেখি, ওর তীর-বেঁধা গায়ে, একটা চাদর, চাদরে নকল রক্তের ছোপ। আর দেখি সিল্কের রঙিন নিশানের ঝাঁক। ঝিলমিল, ঝিলমিল। নীল, লাল, সবুজ, হলদে — হরেকরকম। দেখি ভেস্তার দল। পরনে টিয়ের ডানার রঙের মতো সবুজ লুঙ্গি, সবুজ কুর্তা। খালি পা। হাতে রুপালি তারের কাঁকনের মতো কী যেন একটা। দূর থেকে মনে হয়, তারা জ্বলছে ওদের কবজিতে। আর শুনি ভেস্তার দল বলছে ঃ "এক নারা, দো নারা, বোলা বোলো ভে — স্তা।"

## ॥ ছয় ॥

বেড়ালের মতো পা ফেলে আসত সন্ধেগুলো। ফুলো ফুলো তুলোর মত নরম পা, তাই শব্দ হত না একটুকুও। কে যেন মস্ত চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলত চারদিকের সোনালি জলের মতো রোদ্দুর। রোদ্দুর হারিয়ে গেলেই অন্ধকার। পথঘাট আবছা। বাড়িগুলোর গা-জুড়ে কালির পোঁচ। অলিগলি কালো, রাস্তা কালো, আরমানিটোলার গির্জে কালো, সদরঘাটের কামান কালো, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়ানো আহসান মঞ্জিলের গম্বুজ কালো। একটু পরেই ফুটকির মতো আলো ফুটে ওঠে নানান জায়গায়। ঘরে আলো, দোকানপাটে আলো, রাস্তাঘাটে আলো, মজসিদে আলো, মন্দিরে আলো, গির্জেয় আলো। বস্তিতে আলো, আহসান মঞ্জিলে আলো। আদম্ শফি ওস্তাগারের খোলার ঘরে আলো, লাটসাহেবের ইমারতে আলো, — এমনি অনেক জায়গায় আলোর ঝিকিমিকি। কোথাও হারিকেন, কুপি, কোথাওবা বিজলিবাতি।

সন্ধে হলেই রোজ একটা শব্দ ভেসে আসত — কখনো দূর থেকে, কখনো – বা অনেক কাছ থেকে। ঘন্টার শব্দ। ঢং ঢং ঢং। বেজে চলত একটানা। মনে হত এই সন্ধ্যা-দোলানো আওয়াজ থামবে না কোনোদিন। সেই ঘন্টার শব্দ কান পেতে শুনতাম অনেকক্ষণ। টেবিলের ওপর বই প'ড়ে থাকত খোলা। রবার্ট ব্রুস মাকড়সার জালের

দিকে তাকিয়ে কী ভাবছেন — সেদিকে আমার খেয়াল নেই মোটেই। আমার মন-কান সবই তখন সেই ঘন্টার শব্দের দিকে উধাও। বড় ভালো লাগত সেই ঘন্টার শব্দ শুনতে। ঘন্টার শব্দ শুনে মনে হত, এইমাত্র রানির কোল আলো করে জন্মেছে ডালিমকুমার। তাই বেজে চলেছে ঘন্টা, খুশি রটাচ্ছে চারদিকে। আসলে কিন্তু কোনো রাজবাড়ির থেকে সই ঘন্টার শব্দ আসত না, আসত মন্দির থেকে। যেদিন প্রথম পড়েছিলাম, "মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজল ঢং ঢং," সেদিন নতুন ক'রে ঘন্টার শব্দের স্বাদ পেয়েছিলাম আমি; সারাদিন মনটা দুলে দুলে উঠেছিল খুশির দোলায়। সত্যি বলতে কি, সবসময় ঘন্টার আওয়াজ শুনে মন নেচে উঠত না আমার; কখনো-কখনো মন-খারাপ হয়ে যেত। কেমন উদাস লাগ সন্ধেবেলাকে, যেন সে ঘুঁটেকুড়ানি দুয়োরানি। মনের দুঃখে বসে কাঁদছে বিজন বনে। আর সেই দুয়োরানির সন্ধেবেলার দুঃখের বোঝা কেউ যেন আমার মনে উঠোনে জড়ো করত। ইচ্ছে হত, তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে তেপান্তরের মাঠে, জনমনিষ্যি-নেই বনে। কিন্তু যাব কী করে? আমরা যে পক্ষিরাজ ঘোড়া নেই। ডানাঅলা ঘোড়া তো দূরের কথা, এমনি সাদাসিধে ঘোড়াও নেই একটা। আমাদের মহল্লায় যে-আস্তাবলটা আছে, সেখানে অবশ্য তিন চারটে ঘোড়া আছে। ওরা ভারি রোগা, ওদের পিঠে দগদগে ঘা। রাগী কোচোয়ানের গড়গড়ে রাগের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে সারা গায়ে ওরা, তিন-চারটে ভালোমানুষ-ঘোড়া। দেখলেই কেমন মায়া হত। চাবুক খেয়ে-খেয়ে বেচারিদের দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। গাড়োয়ান একটু আধটু মলমও তো লাগালে পারে ঘোড়াগুলোর ঘায়ে। রাজ্যের মাছি উড়ে এসে জুড়ে বসে ঘায়ের ওপর। ঘোড়া গলা ঝাঁকায়, পা নাচায়, লেজ নাড়ায়, তারপর আবার ঝিমোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়োয়ানের কাছে চাইলে সে তো আর একটা ঘোড়া আমাকে দিয়ে দেবে না , তাছাড়া এমন রোগা ঘোড়া নিয়ে কি তেপান্তরের মাঠে পৌঁছুনো যায় কোনোদিন?

তাই আর যাওয়া হয় না কোথাও। যাওয়া যখন হলই না তখন খুব ক'ষে পড়ো রবার্ট ব্রুস আর মাকড়সার গল্প আর দুলে দুলে মুখস্থ করো—

"বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কৈ?"

কাজলা দিদিকে কখনো দেখিনি। কাজলা দিদি আমার কেউ নয়। তবু সেই কখনো-না-দেখা দিদিটির কথা ভেবে মন হুহু করে উঠত। মনে হত, কাজলা দিদি কোন অজানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো বৃষ্টিতে ভিজছেন তো ভিজছেনই। চিরকাল বর্ষার ভিজবেন তিনি। কেউ তাঁকে ঘরে ডেকে আনবে না। অথচ কত সুন্দর সুন্দর শোলোক বলতে পারতেন কাজলা দিদি! তাঁর কাছ থেকে কখনো কোনো শোলোক শুনতে পাইনি ব'লে আফসোস হত আমার, খুব কষ্ট পেতাম মনে-মনে। ভাবতাম, যদি হঠাৎ একদিন, যখন চাঁদির গোল থালার মতো চাঁদ উঠবে, যখন হাওয়ার ঝাঁকানিতে গাছের পাতাগুলো শিরশিরিয়ে উঠবে, গলির মোড়ে আস্তাবলে ঘোড়াগুলো ঝিমোবে, কাজলা দিদি এসে দাঁড়ান আমার বিছানার পাশে, তখন কেমন মজা হবে? সারারাত জেগে-জেগে আশ্চর্য সব শোলোক শুনব কাজলা দিদির মুখে।

কিন্তু কাজলা দিদি আসেননি কোনোদিন। আসেননি আমার পড়ার ঘরে, বিছানার পাশে, টেবিলের কাছে, বারান্দায়, ছাদে, গলির মোড়ে, ইশকুলের মাঠে—আসেননি কোথাও। বাঁশবাগানে গেলে কি দেখা পেতাম তাঁর? বাঁশবাগানেও গিয়েছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আসেননি কাজলা দিদি। সাঁঝে কাজলা দিদি আসেন না, আসে ঘন্টার শব্দ। মন্দির থেকে ভেসে-আসা কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ। কোনো মন্দিরে যাইনি ছেলেবেলায়, তবে রমনার কালীবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করেছি অনেকদিন। খেলতে যেতাম রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমরা তিন-চার জন বালক। কখনো টারজন-টারজন খেলতাম, কখনো চোর-পুলিশ আর কখনো গোল্লাছুট। ফুটবল খেলাও চলত কখনো-সখনো। রমনা কালীবাড়ির খুব পুরোনো একটা নাম আছে। কৃপাসিদ্ধি আখড়া। শোনা যায় সাড়ে চারশো বছর আগে গোপালগিরি নামে একজন লোক এসেছিলেন বদ্রিনারায়ণ থেকে, তিনিই এই আখড়ার পত্তন করেছিলেন। এখন যে-মন্দিরটা রয়েছে সেটি তৈরি করেন হবুচরণ গিরি, প্রায় আড়াইশো বছর আগে। রমনার কালীবাড়ির আশেপাশে ঘুরতাম, দৌড়ে বেড়াতাম, কিন্তু কখনো মন্দিরের ভেতরে পা রাখিনি। কেমন ভয় হ'ত, রীতিমতো গা-ছমছম করত আমার। দু'একজন মুরুব্বি মন্দির সম্পর্কে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আমার মনে। সেই ভয় অনেকদিন পর্যন্ত কাটেনি।

ছেলেবেলায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরেও যাইনি, শুধু দূর থেকে দেখেছি। কেউ-কেউ বলেন, ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম থেকেই ঢাকা নামের জন্ম। ঢাকেশ্বরী মন্দির রাজা মানসিংহ বানিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। কারও কারও মতে, আসল মন্দিরটি রাজা মানসিংহ বানাননি, তিনি নতুন করে বানিয়েছিলেন পুরোনো এক মন্দিরকে। ঢাকেশ্বরী মন্দির ঠিক কখন তৈরি হয়েছিল তা কারুর জানা নেই। তবে মন্দিরের ধরনধারণ দেখে এটি সতেরো শতকের তৈরি ব'লে আন্দাজ করা হয়।

ছেলেবেলায় কখনো মন্দিরের ভেতরে যাইনি সত্য, কিন্তু পুজো দেখেছি। আর দেখেছি জন্মাষ্টমীর মিছিল্ আর সে কী মিছিল! রাস্তা-উপচে-পড়া লোকজন। দোকান, বাড়িঘর, রাস্তা—সবখানেই হৈহৈ, লোক,—বারান্দায়, ছাদে, সবখানে। লোক, লোক আর লোক—ছেলে-বুড়ো সব্বাই মিছিল দেখতে চায়। তাঁতিবাজারে ধুম, শাঁখারিবাজারে ধুম, নবাবপুরে, ইসলামপুরে, গেন্ডারিয়ায়, গোয়ালপাড়ায়, ওয়ারিতে—সব জায়গাতেই মহাধুম। শ্রীকৃষ্ণ, সেই যিনি বাঁশি বাজিয়ে মুগ্ধ করতেন সবাইকে—তাঁর জন্ম উপলক্ষেই বেরুত জন্মাষ্টমীর মিছিল। মস্ত হাতি, ইয়া বড়ো বড়ো রথ। রথে দেবদেবীর মূর্তি। বানানো জন্তু-জানোয়ারেরও কমতি নেই। কোথাও রাক্ষস-খোক্ষস, কোথাও ডানাঅলা পরি। সুন্দর, বিরাট সব পুতুল। দেখে চোখ জুড়োয়। নানা মূর্তিকে দিয়ে বলানো হচ্ছে নানা গল্প-কাহিনি। রং মেখে, সং সেজে অনেকে লোক হাসাচ্ছে। অনেক বিখ্যাত লোকের পার্ট করছে নানাজন নানা ধরনের পোশাক প'রে, দাঁড়িগোঁফ লাগিয়ে। অতশত বুঝতাম না তখন, কিন্তু চোখ ভ'রে দেখতাম রঙিন পরি আর রকমারি জন্তু জানোয়ারগুলোকে। আর বড়ো লোভ হত কৃষ্ণের বাঁশিটার ওপর। কত কৃষ্ণ কত বাঁশি—অথচ একটিও পাওয়ার জো নেই।

একদিন বিকেলবেলায় একটা খাতায় জলছবি তুলছিলাম। মাত্র কয়েকটা ছবি তোলা হয়েছে, এমন সময় ডাক পড়ল আমার বাইরে থেকে। বেরিয়ে দেখি, সূর্যকিশোর হাসছে মিটিমিটি। ওর হাসি দেখে সবগুলো জলছবি তুলতে না পারার বিরক্তিটা ঝ'রে গেল মন থেকে। রীতিমতো খুশি হয়ে উঠলাম।

"কী রে যাবি না?"—সূর্যকিশোর জিজ্ঞেস করল।

"কোথায়?"—পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

"ইশকুলে।"

"কেন?"

"চল, সরস্বতী পুজো দেখবি চল।"

"ভয় করে" — আমি বললাম আমতা-আমতা করে।

"ভয় কীসের? সরস্বতী ডাহনি নাকি যে তোকে গপ করে গিলে ফেলবে?" — সূর্যকিশোরের চোখেমুখে দুষ্টুমিভরা হাসির ঝিকিমিকি।

"না, আমি যাব না। তুই যা।"

"তোকে যেতেই হবে। চল, খুব মজা হবে।"—সূর্যকিশোর আমাকে লোভী করে তোলে। তাই যেতেই হল।

ইশকুলে উৎসব। অনেক ছেলের জটলা। মাস্টারমশাইরা সবাই এসেছেন। আসেননি শুধু মৌলবি সাহেব, যিনি আরবি ফারসি পড়ান ওপরের ক্লাসে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সূর্যকিশোর আমার পাশেই থাকল সারাক্ষণ। সরস্বতীকে দেখে ভয় পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু বেশ ভালোই লাগল সরস্বতী দেবীকে।

খুব শান্ত আর সুন্দরী। রাঙা পায়ের নীচে পদ্ম আর সাদা একটা হাঁস। হাতে বীণা।

"ইনি-ই আমাদের সব্বাইকে বিদ্যা দেন" —সূর্যকিশোর বলল আমার কানে কানে। ওর কথায় কান না দিয়ে আমি দেখছিলাম সরস্বতীর সাদা হাঁসদুটোকে। দুধ সাদা ধবধবে ডানা আর লাল টুকটুকে ঠোঁট। সরস্বতীর হাঁস দেখে মনে পড়ল আমার নিজের হাঁসের কথা। আমার আর আমার ছোটো ভাই দুজনেরই দুটো হাঁস ছিল। আম্মা বাজার থেকে আনিয়েছিলেন। সেদিনই হাঁস দুটোকে জবাই করা হ'ত। কিন্তু আমরা বায়না ধরলাম হাঁস দুটোকে খেলার সাথী হিসেবে পাওয়ার জন্যে। আম্মা আমাদের দু'ভাইয়ের কথা রাখলেন, তাই জবাই করা হল না ওদের। আমরা মেতে উঠলাম হাঁস দুটোকে নিয়ে। বেশ কেটে যাচ্ছিল হাঁস-হাঁস খেলা খেলে। হাঁসকে নাওয়ানো, খাওয়ানো—এ সবকিছুরই ভার নিয়েছিলাম আমরা। যখন হাঁস দুটো তৈ তৈ শব্দ করে পেরিয়ে যেত উঠোন, পালকে রোদ মেখে, ছায়া মেখে, তখন কী-যে ভালো লাগত আমার। কখনো-কখনো আমার হাঁসটাকে কোলে নিয়ে আদর করতাম।

একদিন ইশকুল থেকে এসে খেতে বসলাম। বাসনে ভাত নিয়ে তরকারির জন্য হাত বাড়ালাম ছোট্ট পেয়ালাটার দিকে। তরকারির বাটিতে লালচে শুরুয়া আর কয়েক টুকরো গোশ্ত। সুন্দর একটা ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। রান্না বেশ ভালোই হয়েছে মনে হল। ভাত আর শুরুয়া ভালো করে মেখে নিয়ে মুখে তুলতে যাব, এমন সময় ছোটো ভাইটা এসে হাজির। ওর কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে কেমন ভড়কে গেলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"হাঁস দুটোকে জবাই করে ফেলেছে" — ও প্রায় কেঁদে ফেলল। আমি মুখে লোকমা তুলতে পারলাম না। রান্না করা হাঁসের গোশ্‌তের দিকে তাকিয়ে আমার বমি এল। না খেয়েই উঠে পড়লাম। আমার সাদা আপন হাঁসটার কথা ভেবে ভীষণ কান্না পেল। আম্মা কত বললেন খাওয়ার জন্যে, কিন্তু সেদিনই কিছুই খেতে পারিনি। শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাদা পালক লাল ঠোঁট। কী করে মুখে তুলব ওর পালক-খসানো, চামড়া-ছাড়ানো মশলা-মেশানো গোশ্‌ত?

সরস্বতীর সাদা হাঁস যেন উড়ে এল আমার কোলে ওর সাদা ডানা মেলে। আমি আদর করলাম, ও ঠোঁট ঘষল আমার হাতে। না, সরস্বতীকে ফেরত দেব না ওর হাঁস, আমি বাড়ি নিয়ে যাব। হাঁস আমাকে নিয়ে চলেছে, ওর ধবধবে পিঠের ওপর বসিয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে ওপর দিয়ে, ঢাকা শহরের অনেক ওপর দিয়ে। সরস্বতীর হাঁস জাদুর গালিচা হয়ে গেছে যেন। জাদুর গালিচা শূন্যে, আমি শূন্যে। হঠাৎ সূর্যকিশোরের ধাক্কায় আকাশের ওপর থেকে ফেরত এলাম নীচে, ইশকুলের মাটিতে। "কীরে, স্বপ্ন দেখছিস নাকি?" সূর্যকিশোরের কথাগুলো আঁচড় কাটল কানের কপাটে। আমি কোনো জবাব দিইনি। মনে হ'ল, দুটো সাদা হাঁস বাতাসে ডানা মেলে আশ্চর্য উড়ে চলেছে তারাভরা আকাশে।

## ॥ সাত ॥

দূর থেকে দেখেই ভালো লেগে গেল ওঁকে। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, ভাঙা গলা আর সেই গালভরা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ওঁর গাল দেখে মনে হয়, এমন একফালি জমিন যাতে এইমাত্তর ঘাস গজিয়েছে থোকা-থোকা। ঝুঁকে বসে কী যেন একটা আঁকছেন, কাচের ওপর। আমি বাইরে থেকে দেখছি অনেক কষ্ট করে। ভেতরে ঢোকার সাহস নেই। যদি কেউ ধমকে দেয়, যদি ঐ ঝুঁকে বসে-থাকা মানুষটি তাঁর আঁকা ছেড়ে গর্জে ওঠেন আমাকে দেখে। তাই বাইরে থাকাই ভালো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলে তো কেউ আর কিছু বলতে পারবে না। আমি দেখছি, তিনি আঁকছেন তো আঁকছেনই। কোনোদিকে খেয়াল নেই তাঁর। শুধু মাঝে-মাঝে সামনে-রাখা ছোট্ট একটা গেলাশ থেকে খেয়ে নিচ্ছেন এক-আধ চুমুক চা।

বাবুর বাজারের একটা দোকান। ফলের নয়, ফুলের নয়, পুতুলেরও নয়। ছোটোখাটো দোকান। দোকান-ভরা শুধু কাচ আর কাচ। আর সেই কাচে নানা ধরনের ছবি; নানা লেখা। যিনি রং দিয়ে ওসব লেখা লিখেছেন তাঁর হাতের লেখা নিশ্চয়ই মুক্তোর মতো কিংবা রূপকথার দেশের সবচেয়ে সুন্দর পাখির ছোট্ট ছোট্ট ডিমের মতো সুন্দর। আহ্‌, আমার হাতের লেখা যদি অমন সুন্দর হ'ত! অমন করে খাতা ভ'রে হাতের লেখা লিখতে পারলে আমাদের ক্লাসের পণ্ডিতমশাই ভারি খুশি হতেন, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আর কী মজার-মজার কথাই লিখেছে সব--"দিন যায় কথা থাকে/সময় যায় ফাঁকে ফাঁকে।" অন্যটিতে লেখা, "সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়/অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।" ভিন্ন একটা কাচ ধ'রে রেখেছে এ-কটি কথা : "পরিশ্রমে আনে ধন পুণ্যে

আসে সুখ/আলস্যে আনে দরিদ্রতা, পাপে আনে দুখ।" ব্যবসাদারি কাঠখোট্টা কিছু কথাও আছে—"আজ নগদ, কাল বাকি/বাকির নাম ফাঁকি।" আর আছে আরবি হরফে আঁকা রসুল নামের নৌকায় আল্লাহ নামের সওয়ারি।

আমি সেই কাচের পদ্য আর ছবিগুলো নিয়ে মশগুল এমন সময় আমার কানে ভেসে এল একটা স্বর, বেশ গাঢ়, গমগমে, থমথমে। তিনি আমাকে ডাকলেন, সেই যিনি ঝুঁকে বসে আঁকছেন ছবি, কাচের ওপর। হাত নেড়ে বলছেন ভেতরে আসার জন্যে। রীতিমতো ভড়কে গেলাম। বকবে-টকবে না তো? এতক্ষণ ধ'রে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখে হয়তো রাগ করছেন তিনি। যদি কান মলে দেন কিংবা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেন গালে! আর একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গেল তাঁর হাতের দিকে, যে-হাতে তখন ছবি আঁকার তুলিটা আনাগোনা করছে কাচের ওপর। পাঞ্জার সাইজটা নেহাত মন্দ নয়; অন্তত আমাকে কাবু করার পক্ষে যথেষ্ট। আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি বসতে বললেন আমাকে, তাঁর পাশে। আমার মনের ভয় একটু একটু করে পাখা গুটোতে শুরু করল। বসতে যখন বলেছেন, তখন কিল চড় খেতে হবে না হয়তো।

"তোমার নাম কী খোকা?"—রঙে তুলি ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করেন তিনি। আমতা আমতা করে নিজের নামটা উচ্চারণ করলাম কোনোমতে। নিজের নাম বলতে এমনিতেই খু-উ-ব ভালো লাগে আমার। কিন্তু তখন কিছুতেই শব্দ বেরুতে চাইছিল না আমার গলা থেকে।

"কোথায় থাক?"

"মাহুতটুলিতে।"

"ইশকুলে পড়?"—এবার ছবি থেকে মুখ তুলে আমার হাতের বইখাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"জি হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাসে পড়?"

"ক্লাস সেভেন-এ।"

"শাবাশ!"—তাঁর বড়ো বড়ো চোখ দুটো হরিণের মতো নেচে উঠল খুশিতে।

"চা খাবে একটু?"—তাঁর কথায় আদর ঝরছে যেন মধুর ফোঁটা হয়ে।

"জি না।" আমি জবাব দিলাম। এবার কষ্ট হল না কথা বলতে। আমার জবাব শুনে ছোট্ট গেলাশটার সবগুলো চা তিনি খেয়ে ফেললেন এক চুমুকে।

কাচের ওপর ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে-খুঁটিনাটি কিছু কথা। টুকরো খবর। আমি চোখ বের করে দেখছিলাম তাঁর ছবি আঁকা। ভুবুর মতো একটা নৌকা, রেখার মতো নদীর পাড়, ফুটকির মতো পাড়াগাঁ আর গোল তামার পয়সার মতো সূর্য। দেখে চোখ জুড়োয়। চোখ কুড়োয় গেলাশের পানির মতো ছলকে-ছলকে-ওঠা খুশি। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের কথা, যেখানে সবসময় যাওয়া হয় না; কখনো-সখনো যাই। মনে পড়ে, মেথিকান্দা স্টেশন, মেঘনা নদী, আর ভীষণ পাগলি মেঘনা নদীতে ভেসে-চলা নৌকা। নদীর তিরঘেষা পলাশতলির কাজলা কিনারেরও কথাও মনে পড়ে, আর মনে পড়ে আলুঘাটার কথা। আলুঘাটায় নামলেই পাড়াতলি। আমাদের গ্রাম। মনে

পড়ে, নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে আব্বা, কোনখানে নৌকো ভেড়াতে হবে, মাঝিদের বুঝিয়ে বলছেন, আম্মাকে সাহায্য করছেন নৌকা থেকে ডাঙায় নামতে। আমাদেরও নামাচ্ছেন একে একে। পাড়াতলির মাটিতে পা রাখলেই আব্বা হয়ে যেতেন আলাদা এক মানুষ। আব্বার খুশি-ভরা মুখ দেখে ভারি ভালো লাগত আমার।

পাড়াতলি, আমাদের ছোট্ট সুন্দর গ্রাম। বাঁশবন। গাছ থেকে ভেসে-আসা মন-কেমন-করা ঘুঘুর ডাক। মাঝির হাঁক। দুপুরে পুকুরে ডুব। বিকেলে আমতলায়, জামতলায়, বিকেলে মাঠের শাঁইশাঁই হাওয়ায়, বিকেলে খই দই নিয়ে ঘরের দাওয়ায়, বিকেলে সর্ষেখেতের ধারে, বিকেলে হলদে আলোয় আলের ওপর দে-ছুট। বাজারে বাতাসা। খুব ক'রে খাও একচোট। রাতে খাওয়া সেরে ঘুমোনো। ঘুমোনোর আগে অনেকক্ষণ ধরে ভয় পাওয়া। তখন চোখের সামনে বাঁশবন, ঝোপঝাড়, থমথমে বাদুড়মুখো অন্ধকার। আলতা বাদুড়, চালতা বাদুড়, কাল বাদুড়ের বে'। বাদুড়ের ছড়া মনে পড়তেই ভয়ের ভেতরও ফিক ক'রে হেসে ওঠা, তারপর ডাইনির চুল। আবার ভয় পাওয়া। জানালা-পেরুনো হঠাৎ-হাওয়া। মশার বনবন। পাড়া নিঝুম। ঝিঁঝির ঘুঙুরে একটানা মিষ্টি ঝনঝন বোল। তারপর ঘুম। ঘুমের সমুদ্দুর।

"কী ভাবছ?"—প্রশ্নের ধাক্কায় চমকে উঠলাম। তারপর সামনে গিয়ে, একটা ঢোক গিলে বললাম, "না, কিছুই ভাবছি না। আপনার আঁকা ছবি দেখছি। নৌকাটি খু-উ-ব ভালো লাগছে আমার।"

"এবার দ্যাখো নৌকার ওপর একটি মাঝি"—এ বলে সেই ছবি-আঁকিয়ে নৌকোর ওপর একরত্তি চমৎকার একজন মাঝিকে বসিয়ে দিলেন। আমি তাজ্জব। কী আজব এই আঁকা-আঁকা খেলা! এই একটু আগেও কোথাও কিছু ছিল না. একটানে হয়ে গেল অনেক কিছু। এই খেলা সারাবেলা খেললেও যেন একটুও বিরক্তি ধরবে না।

তিনচার দিন যাওয়া-আসার পর বেশ ভাব হয়ে গেল নঈম মিঞার সঙ্গে, মানে কাচের ওপর তুলি বুলিয়ে আপনমনে যিনি ছবি আঁকেন চা খাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর সঙ্গে। তিনি ছবি আঁকতেন একটার পর একটা আর আমি বসে বসে দেখতাম তার লম্বা-লম্বা আঙুলগুলোর নাচ। এক মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে গাছপালা, পাখপাখালি, মেঘমেঘালি, মাঝির লগি, ছলছলে পানির ঢেউ, আমার নানির রুপোলি পানের ডিবের মতো চাঁদ, গাঁদাফুলের মতো বেলা-ডুবুডুবু সূর্য, আরও কত্ত কী! আমাকে তাক করে দেয়ার জন্যই যেন বড্ড তাড়াতাড়ি তুলি চালাতেন তিনি। ওসব ছবি দেখার ফাঁকে-ফাঁকে মনে একটা ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিত, "আমিও যদি নঈম মিঞার মতো এই দোকানটায় বসে বসে আপনমনে অমন সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।"

একদিন সাহস ক'রে বলেই ফেললাম কথাটা। বলার আগে অবিশ্যি, সাত-পাঁচ ভাবলাম অনেকক্ষণ। একরাশ গোলাপি রঙের মতো লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল আমার চোখেমুখে। কিন্তু তবু আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "আমাকে ছবি আঁকা শেখাবেন?"

"তুমি ছবি আঁকা শিখবে?"—আমার দিকে তাঁর বড়ো একজোড়া চোখ মেলে দিলেন নঈম মিঞা।

"জি।"

"কী করবে ছবি আঁকা শিখে?"

"এই আপনার মতো ছবি আঁকব দোকানে ব'সে ব'সে।"

"হুম", নঈম মিঞা তাঁর কাঁচাপাকা লম্বা লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে একটা আবছা শব্দ করলেন।

"আমি এই কাচের ওপর একটা নৌকা বানাব?"—অনুমতি চাইলাম নঈম মিঞার কাছে। আমার দিকে না তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে আমার নৌকো বানানোয় তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আমি তো হাতে বেহশ্‌ত পেয়ে গেলাম। চট করে একটা তুলি রঙে ডুবিয়ে নিয়ে পোঁচ লাগালাম কাচের ওপর। দেখতে দেখতে একটা নৌকো হয়ে গেল। সেই নৌকায় পালও খাটিয়ে দিলাম একটা। নেহাত মন্দ হল না। হাওয়ায় ফুলে উঠেছে সাদা পাল। আমার বোন মেহেরের ফোলা গালের মতো অনেকটা। কিন্তু নঈম মিঞার মুখে কেমন ভার-ভার দেখাল তখন—যেন মেঘ-ঢাকা আকাশ। এখুনি ঝড় উঠবে।

সেদিন খুশি-ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, সারা রাস্তা প্রায় লাফাতে লাফাতে। পরের দিন আগের চেয়ে অনেক আগেই হাজির হলাম বাবুর বাজারের সেই ছোট্ট কাচের দোকানে। কিন্তু সেদিন নঈম মিঞা বড্ড বেশি চুপচাপ। আমাকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একঠায়। নট নড়নচড়ন। আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নঈম মিঞা বললেন, "ইশকুল নেই তোমার?"

"আমি ইশকুলে যাব না।"

"কেন?"

"এমনিতেই। অনেকক্ষণ ছবি আঁকব।"

"ভালো ছেলেরা ইশকুল কামাই করে না।"—নঈম মিঞা বললেন।

"আমি ছবি আঁকব।"

"তুমি কাল থেকে আর এসো না এখানে।"

"কেন?"

"তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে, এখানে এই বাজে দোকানে বসে বসে কাচের ওপর নৌকা বানানো তোমার কাজ নয়।"—চায়ের ছোট্ট গেলাশটা হাতে চেপে ধ'রে বললেন নঈম মিয়া, আমার প্রিয় ছবি-আঁকিয়ে। তাঁর গলায় আওয়াজে ব্যথা বেজে উঠল। যেন কেউ তাঁকে খুব জোরে আঘাত দিয়েছে, তাঁর ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠছে, নিশুতরাতের পায়রার শব্দের মতো। তাঁর লম্বা লম্বা কাঁচাপাকা চুল-ভরা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে কাচের ওপর। হাত নড়ছে না। কাচে ছবি নেই। সব সাদা। থানকাপড়ের মতো। আমার ভারি কান্না পেল তখন। কিছু না বলে আমি নেমে এলাম রাস্তায়। পেছনে রইল পড়ে বাবুর বাজারের সেই কাচের দোকান, যেখানে ঝুঁকে বসে আপনমনে নৌকো বানান, নদীনালা, গাছপালা বানান, বানান মেঘমেঘালি, পাখপাখালি, বানান নঈম মিঞা, আমার প্রিয় ছবি-আঁকিয়ে।

আর কোনোদিন যাইনি সেই দোকানে। তবে ইশকুলের যাওয়ার পথে কখনো-সখনো দেখতাম, নঈম মিঞা ঝুঁকে বসে ছবি আঁকছেন কাচের ওপর। তখন কেমন রোগা-রোগা লাগত তাঁকে। ভাঙা গালে কাঁচাপাকা, খোঁচ-খোঁচা দাড়ি, যেন শ্যাওলা-পড়া দেয়াল। একটা কাশির আওয়াজও ভেসে আসত মাঝে-মাঝে। অসুখ করেছে নাকি নঈম মিঞার? ভাবতাম, একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু ধমক খাওয়ার ভয়ে পা বাড়াতাম না আর। বাবুর বাজারের সেই ফলের নয়, ফুলের নয়, পুতুলেরও নয়, শুধু কাচের দোকানে আর যাইনি। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি সেই ছোট্ট ঘরটাকে আর সেই ঘরের শিল্পী আমার প্রিয় ছবি-আঁকিয়ে নঈম মিঞাকে। সত্যি, আজও তাঁকে একরত্তি ভুলিনি।

আর ভুলিনি সেই ভিস্তিকে, যে রোজ মশক ভরে দু'বেলা পানি দিয়ে যেত আমাদের বাড়িতে। তখন ঢাকায় পাড়ায়-পাড়ায় বাড়িতে-বাড়িতে কল ছিল না পানির। তাই অনেক বাড়িতে ছিল ভিস্তির আনাগোনা। কালো মোষের পেটের মতো ফোলা-ফোলা মশক পিঠে বয়ে আনত ভিস্তি। তারপর মশকের মুখ খুলে পানি ঢেলে দিত মাটি কিংবা পেতলের কলসের ভেতর।

যে-ভিস্তিটা আমাদের বাড়িতে পানি দিত ওর নাম কিন্তু আমার মনে নেই। মনে আছে ওর থ্যাবড়া নাক, মাথার কিস্তিটুপি, মিশমিশে কালো চাপদাড়ি আর কোমরে জড়ানো পানি-ভেজা গামছার কথা। মশকের কথা তো মনে আছেই। মনে পড়ে, ভিস্তিটার হাতে বেরিয়ে থাকত সরু নদীর মতো শিরা। আমাদের সেই ভিস্তি গল্পে ছিল খুব। অল্প সময়ের জন্যে আসত সে, কিন্তু গালগল্পে মাতিয়ে রাখত বাড়ির চাকর-বাকরদের। সেই গল্পের ভাগ আমরাও পেতাম একটু আধটু। আসত সে ভরা, ফোলাফোলা মশক পিঠে বয়ে, ফিরে যেত মস্ত চুপসে-যাওয়া, হাওয়া-নেই বেলুনের মতো মশকটা কাঁধে ঝুলিয়ে। মশকটাকে ওর শরীর থেকে আলাদা কিছু বলে ভাবতে পারতাম না। মনে হত, ওটা বুঝি ওর শরীরেই গজিয়ে উঠেছে।

একদিন পানির কল এল আমাদের মাহুতটুলির বাড়িতে। আর সেইসঙ্গে বিদায় নিল ভিস্তি। যেদিন শুনলাম পিঠে মশক বয়ে ভিস্তি আর আসবে না আমাদের বাড়িতে, সেদিন ভারি মন-খারাপ হয়ে গেল আমার। পানির কল তো আর মজার মজার গল্প শোনাতে পারবে না! সেদিন বারবার মনে পড়ছিল ভিস্তির কথা। ভিস্তি চলে যাওয়ার দিন মনে হল আমার কোনো আপনজন যেন চিরদিনের মতো চলে গেছে আমাদের এই চেনা দুনিয়া ছেড়ে। সেই ভিস্তির নাম মনে নেই, কোথায় সে থাকত তাও জানি না, তবে মনে আছে ওর মুখ, আর জানি কোনোদিন সেই হাসিখুশি মুখের ছবি মুছে যাবে না আমার মন থেকে, যেমন যাবে না নঈম মিঞার মুখের ছবি আর তাঁর নিজের আঁকা ছবি--সেই গাছগাছালি, পাখপাখালি আর মেঘমেঘালি, সেই পালতোলা নৌকো, দূর থেকে দেখতে-পাওয়া চর আর চরের খয়েরি রঙের খড়ে-ছাওয়া কাজল কুঁড়েঘর।

## ॥ আট ॥

সেই ছেলেবেলা থেকেই পথ হাঁটতে আমার ভালো লাগে। আলোজ্বলা পথ, ছায়ার ঘোমটা-ঢাকা পথ, সুনসান পথ, ফেরিঅলার গলার আওয়াজে চমকে-ওঠা পথ—

সবরকমের পথ বেয়ে হেঁটে যেতে ভালোবাসি আমি। মাহুতটুলি থেকে বেশি দূরে যেতে দেয়া হত না আমাদের। এমনিতেই ঘরের বাইরে বেরুনো মানা ছিল। খুব বায়না ধরলে কাছেধারে যাওয়ার অনুমতি পেতাম কখনো-সখনো। তাই ঘরের বাইরে পা বাড়ানোটাই ছিল খুশির ব্যাপার। রাস্তায় হাঁটো, চোখ ভরে দ্যাখো চারদিকের নানা জিনিসপত্তর। একবার দেখে সাধ না মিটলে দশবার দ্যাখো, কেউ বারণ করবে না। বারণ করার কোনো কারণও তো নেই।

মাহুতটুলির রাস্তা, সাতরওজা আর আরমানিটোলার পথ, নয়াবাজার, বাবুর বাজার, ইসলামপুর, চকবাজার, নবাবপুর, পাটুয়াটুলি, তাঁতিবাজার—কত্ত পথ, কত্ত সুন্দর সুন্দর রাস্তা, কত্ত অলিগলি। কার না ভালো লাগে এসব পথে হেঁটে বেড়াতে? সাতরওজার সেই কেমন-গন্ধ-ভরা রাস্তায় কতবার হেঁটেছি, কখনো কারণে, কখনে বা অকারণে। অকারণেই বেশি। বাকরখানি রুটির একটা দোকান ছিল সাতরওজার কাছে। চমৎকার রুটি বানানো হত সেই দোকানটায়। মাঝে-মাঝে, সকালবেলায় হাজির হতাম সেখানে, রুটি কেনার জন্যে। এক পয়সায় একটি। রুটি হাতে এলেই দে ছুট। বাসায় গিয়ে পেট পুরে খাও। আহ্ কী মজাই-না লাগত বাকরখানি রুটি খেতে! মাঝে-মাঝে আব্বা ফরমায়েশ দিয়ে পনিরি রুটি বানাতেন আমাদের জন্যে। বাকরখানির গা জুড়ে সাজানো থাকত পনিরের কুচি। মনে হত বাদামি আকাশভরা তারা। দেখেই চোখ জুড়োয়। দেখার সুখ ফুরোয় না কিছুতেই।

সাতরওজার সেই রাস্তার ধারে ছিল একটা আস্তাবল। কতকগুলো আধমরা, হাড়জিরজিরে ঘোড়া ছিল সেই খড়ভরা আস্তাবলের বাসিন্দা। ঘোড়াগুলোর পাশেই খড়ের গাদায় শুয়ে থাকত একটা লোক। সেই লোকটার শরীর ঘোড়াগুলোর চেয়ে ভালো ছিল, বলা যায় না। লোকটা কখনো-সখনো ঘোড়াগুলোর গা রগড়ে দিত। কোনো-কোনোদিন দেখতাম, ঘোড়ার খুরে লোহার নাল লাগানো হচ্ছে ঠুকঠাক শব্দ করে। ঘোড়াগুলোর চুল ছাঁটারও বন্দোবস্ত ছিল, মনে পড়ে। এই নাল ঠোকা ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে মোটেই সুবিধেজনক ঠেকত না। মনে হত, ঘোড়াগুলোর ওপর জুলুম করা হচ্ছে। অথচ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যখন হৈচৈ খুশিতে ঘুরে বেড়াতাম নানা জায়গায় ময়মুরুব্বির সঙ্গে, তখন হাড়জিরজিরে, বেদম চাবুক-খাওয়া ঘোড়াগুলোর কষ্টের কথা একটুকুও মনে থাকত না আমার।

সাতরওজার রাস্তার ধারে ছিল অনেক কিছু। আস্তাবল, বাকরখানি রুটির দোকান, দরজির দোকান, মাজার, মুদির দোকান। আর ছিল একটি বিস্কুটের দোকান। সেই দোকানটার ধার-ঘেঁষে হাঁটলে কেমন টক গন্ধ লাগত নাকে। ঠিক টক নয়, টক-মিষ্টি গন্ধ বলা যেতে পারে। পথচলার সময় দেখতাম, দু'জন লোক বিস্কুট তৈরি করছে। ওদের বেশ গুণীজন ব'লে মনে হ'ত আমার। ময়দা দিয়ে কী সুন্দর সুন্দর বিস্কুটই না তৈরি করছে ওরা! আহা আমিও যদি রাশি রাশি বিস্কুট বানাতে পারতাম ওদের মতো!

সত্যি বলতে কি, বিস্কুট বানাতে না পারার দুঃখে আমার মন ভীষণ ভারী হয়ে উঠত—ভিস্তির সেই পানিভরা কালো মশকের মতো। না, আমি কোনো কাজেরই নয়।

আবু তাহেবের মতো অঙ্ক কষতে পারি না, সূর্যকিশোরের মতো ব্লেড চিবিয়ে খেতে পারি না, ঘুসি মারতে পারি না তারার মতো, ঐ সহিসটার মতো ঘোড়ার গা রগড়ে দিতে পারি না, বিস্কুট বানাতে পারি না—কিছুই পারি না আমি। বিস্কুটের দোকানের কারিগররা হয়তো ভাবত, আমি ছ্যাঁচ্চড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি বিস্কুটের লোভে। লোভী বালক ভেবে আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাত, অন্তত আমার তা-ই মনে হত তখন। সেই বিস্কুট খাওয়ার জন্যে খুব একটা লোভ হত, এমন নয়। লোভে জিভের ডগায় পানি আসত না। তবে আমার চোখের কোটরে একজোড়া চোখ নেই আর, ওদের জায়গা দখল করেছে দুটো জ্বলজ্বলে তারা। অবিশ্যি বিস্কুট খাওয়ার লোভে নয়, বিস্কুট বানানো দেখার লোভে। ঐ দোকানের বিস্কুটগুলোর চেয়ে অনেক ভালো বিস্কুট আব্বা কিনে আনতেন হরহামেশা। দু'জন লোক তাল তাল ময়দা দিয়ে রাশি রাশি বিস্কুট বানাচ্ছে, এইটে দেখতে বড্ড ভালো লাগত আমার।

আর ভালো লাগত মাহুতটুলির রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো একটা লোককে। আপনমনে সে বিড়বিড় করত সারাদিন। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিত ছেঁড়া কাগজ, পাথরের নুড়ি, এমনি সব কুটুম-কাটম। ওর গায়ে ছিল হাজার তালিমারা একটা জামা। রংবেরঙের কাপড়ের টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে যেন জামাটা বিশেষ করে বানানো হয়েছে ওরই জন্যে। ওকে দেখলেই মনে হত, কী যেন একটা হন্যে হয়ে খুঁজছে সে সবসময়। ওর চাল নেই, চুলো নেই। মাথা-ভরা একরাশ জট-পাকানো চুল আছে, আর সেই চুলে আছে রাজ্যির ধুলো। ওর হাতে একটা বাঁশি আর মাথায় লম্বা টুপি দিয়ে দিলেই ওকে যে হ্যামেলিন শহরের সেই বাঁশিঅলার মতো মনে হত, তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। রাস্তাই ছিল ওর বাড়ি। রোদবৃষ্টি, জ্যোৎস্না-অন্ধকার, ধুলো-হাওয়ায় মেশা পথ চলাতেই তার খুশি। আমাদের মাহুতটুলির পথের একটা অংশ বলেই মনে হত ওকে। ও না থাকলে সমস্ত রাস্তাই ফাঁকা। রাজা না থাকলে যেমন সিংহাসন ফাঁকা, ঠিক তেমনি।

একদিন সেই হাজার তালিমারা জামার মালিক, পথের রাজা কোথায় উধাও হয়ে গেলেন কাউকে কিছু না বলে। বলবেনই-বা কী করে? কোনো লোকের সঙ্গেই তো কথাবার্তা বলতেন না। কিন্তু কথা বলতেন রোদ্দুরের সাথে, হাওয়ার সাথে, আকাশে ভেসে-বেড়ানো মস্ত পাখির পালকের মতো মেঘের সাথে। তিনি কোনদিকে গেলেন, কোন দেশে গেলেন, কত কাছে গেলেন কিংবা কত দূরে গেলেন, কেউ জানল না। আমিও জানতে পারিনি।

ওর খবর কারুর কাছে নেব, তারও জো নেই। সেই বিড়বিড়-করে-বেড়ানো লোকটার খোঁজ নিতে বাধোবাধো ঠেকত। লোকে কী ভাববে, এই ভয়ে ওর কথা কাউকে জিজ্ঞেস না করে চোখ বুলোতাম রাস্তার চারদিকে—এ-কোণে ও-কোণে। কিন্তু সেই ধুলোমাখা মাথা নেই, হাজার তালিমারা জামা নেই, সেই হ্যামেলিনের বাঁশিঅলা হতে পারত লোকটা নেই কোথাও। একদিন সব বাধা ঠেলে-ঠুলে মুদি দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ হাজার তালিমারা যার গায়ের জামা সে কোথায় গেছে বলতে পারেন?"

মুদি আমার দিকে তাকাল, বাঁকা চোখে, রাগী চোখে। "কী দরকার অর লগে, হুনি।" মুদির প্রশ্নটা যেন ঠোকর মারল আমাকে। আমি আমতা-আমতা করতে লাগলাম, ঠিক যেমন নামতা ভুলে যাওয়ার সময় করতাম। মুদি আবার ঠোকরাল আমাকে, মানে ওর কথা দিয়ে : "অই পাগলা তো আমাগো কাছে আর ঠিকানা রাইখা যায় নাই যে তুমারে কইয়া দিমু।" বুঝলাম, মুদি সাহেব চটেছেন খুব। তাই মুদির দোকান থেকে সরে দাঁড়ালাম। এরপর মুদিকে দেখেছি অনেকবার, দু'একটা সওদাও কিনেছি, কিন্তু যার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম ওর কাছে তাকে কোনোদিন দেখিনি আর।

কোনো কোনো দিন ঘুরতে ঘুরতে চলে যেতাম চকবাজারে। চকবাজারের খুব কাছাকাছি ছোট কাটরা ও বড় কাটরা। চকবাজারে গেলেই চোখে পড়ে বড় মসজিদ, অনেক দিনের পুরোনো। চকের বিরাট মসজিদটা তৈরি করেন শায়েস্তা খাঁ। শোনা যায় তিনি এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসতেন। চকবাজারে রকমারি দোকান। বুটি, কাবাব, কাপড়চোপড়, টুপি, সুর্মা, আতর, ময়দার মেঠাই—যা চাও তাই পাবে। ছোটো কাটরায় বিবি চম্পার কবর। কে এই বিবি চম্পা? ভারী সুন্দর নাম। ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো যেন সেই নামে। কেউ বলেন, বিবি চম্পা ছিলেন শায়েস্তা খাঁয়ের মেয়ে; কেউ বলেন, তিনি শায়েস্তা খাঁর বাঁদী।

ছোটো কাটরা পেরিয়ে বড়ো কাটরা। ঘিঞ্জি এলাকা। ঠেলাগাড়ির ঠেলাঠেলি, লোকজনের ভিড়, অনেক গলার আওয়াজ। ভাবতে অবাক লাগে, এখানে একসময় সেপাই-সান্ত্রির কুচকাওয়াজ হত। সেই কবেকার মোগল যুগের লোকজন সব চলাফেরা করত এসব জায়গায়। নিশ্চয়ই ওরা নানা গালগল্প করত চকবাজারে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত ছোটো কাটরায়, বড়ো কাটরায়। বড়ো কাটরায় ভাঙাচোরা দালান দেখে মনে হয়, ইতিহাসের কত ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ১০৫৫) বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটা মস্ত সরাইখানা তৈরি করেন সম্রাট শাজাহানের ছেলে শাহ সুজা। শাহ সুজার হুকুমে মীর-ই-ইমারত আবুল কাসেমের হাতে বড়ো কাটরা তৈরির কাজ শেষ হয়। এই আলিশান দালানে শাহ সুজার বসবাস করার কথা ছিল। কিন্তু দালালের কাজ শেষ হওয়ার পর সেখানে মন বসল না তাঁর। শাহ সুজার মহল হওয়ার কথা ছিল যার, শেষ পর্যন্ত তা হল মুসাফিরদের আস্তানা। একদা খুবই সুন্দর ছিল। এই বড়ো কাটরার দরদালান। বড়ো কাটরার ফটক দেখলে এতদিন পরে এখনও সে সব দরদালানের রূপ কিছুটা আন্দাজ করা চলে।

এক সময় বড়ো কাটরার তোরণে ফারসি ভাষায় লেখা একটা পাথরের ফলক ছিল, এখন তার কোনো চিহ্ন নেই। ফলকের লিপিটা লিখেছিলেন শাদুদ্দিন মুহম্মদ সিরাজি। ফলকে লেখা ছিল :

"সুলতান শাহ সুজা সবসময় দান-খয়রাতে মশগুল থাকিতেন। তাই খোদার করুণা লাভের আশায় আবুল কাসেম তুব্বা হোসায়নি সৌভাগ্যসূচক এই দালানটি নির্মাণ করিলেন। ইহার সঙ্গে ২২টি দোকানঘর যুক্ত হইল—যাহাতে এইগুলির আয়ে ইহার মেরামতকার্য চলতে পারে এবং ইহাতে মুসাফিরদের বিনামূল্যে থাকিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই বিধি কখনো বাতিল করা যাইবে না। বাতিল করিলে অপরাধী শেষ বিচার

দিনে শাস্তি লাভ করবে। শাদুদ্দিন মুহম্মদ সিরাজি কর্তৃক এই ফলকটি লিখিত হইল।" বড়ো কাটরার আগেকার সেই জৌলুশ আর নেই। এখন সেখানে ঘোড়সওয়ারদের আনাগোনা। শাদি আওয়াজ নেই, নেই সৈন্যসামন্তের কুচকাওয়াজ। সময় খাবলা মেরে মেরে বড়ো কাটরার দরদালান থেকে খসিয়ে নিয়েছে তার রূপ অনেকখানি। এখন সেখানে ঠেলাগাড়ির ভিড়, কুলির ভিড়। কেউ সওদা বেচছে, কেউ কিনছে। দরাদরি, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, চেল্লাচেল্লি—সবকিছুই চলছে সেখানে। বহু বছরের ধুলো, বহু বছরের রোদবৃষ্টি, বহু বছরের জ্যোৎস্না আর অন্ধকারের দাগ লেগে রয়েছে বড়ো কাটরার গায়ে। ধুলো বলছে, 'শোনো, বড়ো কাটরার কিস্‌সা শোনাই তোমাদের।' শ্যাওলা বলছে, 'শোনো বলি, আমার কথা।' পুরোনো ইটের ফাঁকে- ফাঁকে লুকিয়ে-থাকা, শুকিয়ে-যাওয়া জ্যোৎস্নাও তার কাহিনি শোনাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু, কে শুনবে ওদের কথা? কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো কেউ দাঁড়ায় বড়ো কাটরার ফটকের সামনে, চোখ বুলোয় আগাছাভরা ভাঙাচোরা দেয়ালে। তারপর চ'লে যায়, এই যেমন আমি ছেলেবেলায় চ'লে আসতাম পুরোনো বড়ো কাটরার পুরোনো রূপ দু'চোখ ভরে লুট করে।

॥ নয় ॥

এখনও কোনো কোনো দিন মনে হয়, ঐ তিনি বসে রয়েছেন সেখানে। কোনো হৈচৈ নেই, কোনো হাঁকডাক নেই। তিনি বসে আছেন চেয়ারে হেলান দিয়ে, হুঁকোর নল ঠোঁটের কোণে হেলানো। এদিকে বেলাও এলানো। বিকেলকে মনে হচ্ছে একটা হলদে পাখির মতো, যে-পাখি ডানা ঝেড়ে ঝেড়ে শুধু হলুদ রং ছড়াচ্ছে চারদিকে। তিনি ব'সে আছেন সেই ঝরে-পড়া রঙের ভেতরে। তিনি, মুন্সী আফতাবউদ্দিন আহমদ। আমার নানা। তিনি বসে আছেন বিকেলবেলা, চেয়ারে হেলান দিয়ে। তাঁর হাতে খবরের কাগজ নেই, বইও নেই। এমনিতেই বসে আছেন তিনি। কোনো সাড়া নেই, নেই কোনো তাড়া। মাঝে-মাঝে শুধু হুঁকোর হালকা শব্দ হচ্ছে গুড়গুড়। এই তো কিছুক্ষণ আগে টাইপরাইটারে একটা কাগজ চাপিয়ে কী যেন টাইপ করছিলেন। ইয়া বড়ো টাইপরাইটার। কালো তার গায়ের রং। নানা যখন তাঁর আঙুল চালিয়ে দিতেন হরফ-আকা বোতামগুলোর ওপর কেমন মজাদার শব্দ হ'ত—টক্, টক্, টক্। টাইপরাইটারটাকে খুব ভালোবাসতেন আমার নানা। কাউকে ছুঁতে দিতেন না, নিজের হাতে ধুলো ঝাড়তেন একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে। কখনো-কখনো দেখতাম, বন্ধ টাইপরাইটারের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আপনমনে। যেন আমাদের কারুর গায়ে হাত বুলোচ্ছেন তিনি।

আজও কোনো দিন মনে হয়, তিনি বসে আছেন সেখানে। আমাদের মাহুতটুলির বাসায় উঠোনে একটা খেজুরগাছ ছিল। নানা সেই গাছের কাছেই চেয়ার পেতে বসতেন রোজ বিকেলে। আমাদের উঠোনে সেই খেজুরগাছ অষ্টপ্রহর থাকত এক পায়ে দাঁড়িয়ে। না, মাছ খাওয়ার আগে বকমামার মতো নয়, দরবেশের মতো মনে হ'ত তাকে। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া পাতা, যেন মস্ত ছাতা। খেজুরগাছটা কারুর কাছে মাথা নোয়াতে শেখেনি। সোজা শিরদাঁড়ার গাছ কিনা, তাই।

সকালের দিকে একটা লোক আসত মাটির ঘড়া আর কাচি নিয়ে। ঘড়া-ভরা খেজুরের রস নামিয়ে আনত আমাদের উঠোনের সেই গাছ থেকে। লোকটা যখন গাছ বেয়ে উঠত, আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম ওর দিকে। মনে হত যেন কোনো বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে। পায়ে পাতার বেড়ি, কোমরে ধারালো কাচি। চোখ ভরে দেখতাম ওর ওঠা-নামা। খেজুরের রস পছন্দ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমার একজোড়া চোখ পড়ে থাকত ওর মাথার পাগড়ি আর কোমরে ঝোলানো ঝকঝকে কাচির ওপর। যদি একবার হাতে নিতে পারতাম সেই ধারালো কাচিটা, কত ভালোই-না লাগত আমার! তখন মনে হত, 'গাছি' হওয়ার মতো সুখ আব নেই।

গাছি চলে গেলে আমি দুটো গামছা নিয়ে একটা মাথায় বাঁধতাম পাগড়ির মতো, আরেকটাকে বানাতাম খাটো ধুতি। তারপর নানির চোখকে ফাঁকি দিয়ে রান্নাঘর থেকে তরকারি কাটার ছুরিটা এনে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতাম কোমরে। এবার গাছে ওঠার পালা। প্রাণপণ চেস্টা করতাম গাছে ওঠার জন্যে। এক চুলও এগোতে পারতাম না। শুধু খেজুরর গাছের কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম নীচে, চোখ দুটো ওপরের দিকে—যেখানে ঘড়ার ভেতর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে খেজুরের রস। আমি তো আর সত্যিকারের গাছি নই যে তরতর করে উঠে যাব গাছের চুড়োয়, নিয়ে আসব রসভরা ঘড়া! গাছ বেয়ে উঠতে পারতাম না বলে প্রায় কান্না পেত আমার। নানি আমাকে ঐ বেশে দেখে লুটিয়ে পড়তেন হেসে। বাড়ির সবাইকে ডেকে বলতেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, আবার গাছি এসেছে আমাদের বাড়িতে।" আমি তো দে দৌড়, একছুটে একবারে বৈঠকখানায়।

আজও ভুলতে পারিনি সেই এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঝাঁকড়া পাতাঅলা খেজুরগাছের কথা। নানি বলতেন, খেজুরগাছটা নাকি আমার সমান বয়সি। তাই কেমন যেন লাগত সেই খেজুরগাছের দিকে তাকালে—ভাবতাম, আমাদের দুজনের একই বয়স, অথচ কত আলাদা আমরা। কিন্তু আলাদা হলে কী হবে, ওর সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। যেন সে আবু তাহের কিংবা সূর্যকিশোর। তবে সে ওদের মতো কথা বলতে পারে না, দৌড়ুতে পারে না, মাঝে-মাঝে গোল্লাছুট কিংবা চোর-পুলিস খেলতে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে অস্টপ্রহর, মাঝে-মাঝে ঝাঁকায় মাথা ইশকুলের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো। যেন ওর মাথায় কত রাজ্যির বুদ্ধি।

আজও দেখি, খেজুরগাছের খুব কাছে চেয়ার পেতে বসে আমার নানা। ওঁরা দু'জনে—খেজুরগাছ ও মুন্সী আফতাবউদ্দীন আহমদ, বারবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান আমার ছেলেবেলায়। আজ ওঁরা কেউ নেই, কিন্তু তবু আমি ওঁদের দু'জনকেই দেখি একসঙ্গে। আর দেখি আমরা ক'জন ছেলেমেয়ে জটলা পাকাচ্ছি সেই খেজুরগাছের নীচে। এইমাত্র কার যেন একটা দাঁত পড়েছে, আমরা সেই দাঁত নিয়ে হৈ-হুল্লোড় লাগিয়ে দিয়েছি গাছতলায়। "ইঁদুর, ইঁদুর তোমার দাঁতটা দাও, তার বদলে এই আমারটা নাও' বলেই ছোটো ইঁদুরের গর্তের খোঁজে। একটা ভাঙা বিচ্ছিরি দাঁতের বদলে নতুন, চকচকে একটা দাঁত পাওয়ার আশায় খুশিতে আমরা সবাই দিশেহারা। ইঁদুরের গর্তে পুরোনো দাঁত ছুড়ে

ফেলার পরও যখন তার বদলে ইঁদুর নতুন দাঁত দিল না তখন সবারই মন-খারাপ। আবার খেজুর গাছের নীচে জটলা। কেউ বলে, "একটু পরে ইঁদুর নিশ্চয়ই দাঁত নিয়ে যাবে।" কেউ আবার ইঁদুরের ওপর ভীষণ খাপ্পা। তাই ওর মুখ থেকে বেরোয়, "আমাদের বাড়ির ইঁদুরগুলো পাজির একশেষ। দেখে নিয়ো, কখনো নতুন দাঁত নিয়ে আসবে না।" যার মাড়ি এখন ফাঁকা-ফাঁকা, তার মুখ শ্রাবণ মাসের আকাশের মতো, স্লেটের মতোও বলা চলে। কেমন ফোলা-ফোলা, কালো-কালো, ভার-ভার।

আজও মনে হয়, সেই খেজুর গাছ মাথা নেড়ে নেড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "কী খবর? ভালো আছ তো?" এর কী জবাব দেব, ভেবে পাই না। শুধু চেয়ে থাকি। হঠাৎ কাদের গলার আওয়াজ বেজে ওঠে, শুনতে পাই। ভারি চেনা-চেনা লাগছে তো! আরে, ওরা যে ভিকটোরিয়া পার্কের সেই গাছগুলো যারা সুন্দর ছায়া বিছিয়ে দিত দুপুরে, বিকেলে। ওরাও আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "কী খবর? ভালো আছ তো? মনে পড়ে আমাদের কথা?" কী করে ভুলব তোমাদের? সেই কবে আদর করে ছায়া মেখে দিয়েছ আমার গায়ে, সেকথা ভুলব কেমন ক'রে? কতদিন তোমাদের কাছে গেছি, পা ছড়িয়ে বসেছি ভিকটোরিয়া পার্কের পুরু সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের ওপর। সেখানে বাদামের খোসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিংবা এমনিতেই চুপ ক'রে ব'সে কাটিয়ে দিয়েছি ঘন্টার পর ঘন্টা। ব'সে ব'সে দেখছি গাছের পাতার ঝিলিমিলি, মানুষের নড়াচড়া। কোথায় ছিল সেই ভিকটোরিয়া পার্ক। সদরঘাটের কাছেই। সদরঘাট পেরিয়ে, কিছু দোকানপাট ছাড়িয়ে গেলেই চোখে পড়ত সেই দেখতে প্রায় ডিমের মতো পার্কটি। গাছগাছালি-ভরা লোহার রেলিং-ঘেরা। ভিকটোরিয়া পার্কে যাওয়ার পথেই ছিল ছিমছাম একটা বইয়ের দোকান। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স। নানা রঙের সুন্দর সুন্দর ছবি ভরতি বার্ষিক 'শিশুসাথী' পাওয়া যেত সেখানে। আরও কত বইপত্তর পাওয়া যেত, কে তার হিসেবে রাখত তখন!

সেই কবেকার পুরোনো এক বাড়ি। নাম তার আন্টাগড়। আর্মেনিয়ানদের ক্লাব ছিল ওটা। সেই এলাকায় তখন অনেক আর্মেনিয়ান ঘর বেঁধেছিল। পরে ইংরেজরা আর্মেনিয়ানদের কাছ থেকে সেই বাড়িটা কিনে নেয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পুরোনো আন্টাগড়ের ওপরই গড়ে ওঠে পার্ক। ইংরেজরা সাধ করে তাদের দেশের রানির নামে নতুন নাম রাখেন পুরোনো আন্টাগড়ের। তাই আন্টাগড় হল ভিকটোরিয়া পার্ক। কেউ বলে ভিকটোরিয়া পার্ক, কেউ আবার আন্টাগড়ের ময়দান।

আর এই আন্টাগড়ের ময়দানের গাছের ডালে লটকিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় আমাদের দেশের অনেক বীর সিপাহিকে। তাঁর মাথা তুলেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। চির-উন্নত যাঁদের শির তাঁরা তো আর ইংরেজ শাসকদের চোখের মণি হ'তে পারেন না। তাই তাঁদের ঝুলতে হ'ল আন্টাগড়ের ময়দানের গাছের ডালে। সেটা কোন সাল? ১৯৫৭ সাল, সিপাহি বিপ্লবের কাল। গাছের ডালে লটকিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হ'ল আমাদের দেশের বীরদের—আন্টাগড়ের ময়দান তার সাক্ষী। ভিকটোরিয়া পার্ক তার সাক্ষী।

## ॥ দশ ॥

কেমন উদাস-উদাস লাগে। সেখানে পা রাখলেই মাটি যেন কেঁদে ওঠে, ঘাস ফ্যালে দীর্ঘশ্বাস। বাতাস কান্নায় কেমন ভেজা-ভেজা। তখন আকাশটাকেও মনে হয় খুব দুখি। মনে হয়, ঐ আকাশ কোনো বন্দিনী শাহজাদির ডাগর, নীল চোখ—যে-চোখ ব্যথায় ছলছল করছে, যেন এক্ষুনি টলটলে জল গড়িয়ে পড়বে। সেখানকার মাটিতে কান্না, ঘাসে কান্না, বাতাসে কান্না, আকাশে কান্না। জড়ানো ছড়ানো। বিরাট ফটক, সুন্দর দেয়াল, মসজিদ, কবরের ওপর চোখ-জুড়ানো মকবরা। কতকালের পুরোনো, কিন্তু এখনও বেশ ঝকঝকে। মস্ত বড়ো পুকুরও রয়েছে একটা। পুকুরের ধার-ঘেঁষে জেগে রয়েছে ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের মতো ইটের ভাঙা-ভাঙা দেয়াল। কিন্তু এতকিছু থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, সেখানে কিছু নেই। খাঁখাঁ, ফাঁকা-ফাঁকা সবকিছু। একদিন অনেক কিছু ছিল। লোকলশকর, হাতি-ঘোড়া, শাহজাদা-শাহজাদি, বাংলার সুবাদার। তাঁর শান-শওকত। তাঁর হাঁকডাক। কতকিছুই তো ছিল সেদিন। আজ তার কিছুই নেই বাকি। সব ফাঁকি। কোন জাদুর মায়ায় সব গেছে উড়ে ফুরফুরে হাওয়ায়। সত্যি কেউ উড়িয়ে নিয়ে গেছে সব। সময় তো মস্ত জাদুকর। এক নিমেষে, এক ফুঁয়ে সে সবকিছু নিয়ে যায় উড়িয়ে। তাই বাংলার সেই সুবেদার নেই, শাহজাদা-শাহজাদি নেই, সুবেদারের লোকলশকর নেই, হাতিশালে হাতি নেই, ঘোড়াশালে নেই ঘোড়া।

আজ আর সেকালের বাংলার সেই সুবেদার নেই, কিন্তু রয়ে গেছে কেল্লা। লালবাগের কেল্লা। সেকালে লোকলশকর নেই, সেপাই-সান্ত্রী নেই; কিন্তু লালবাগের কেল্লার ভেতরেই আছে একালের পুলিশ। আছে পুলিশের ফাঁড়ি। প্রথম সেদিন লালবাগের কেল্লার ভেতর পা রাখলাম, চোখ দিয়ে চাখলাম বিরটা ফটক, সুন্দর মকবরা, দুপুর-মেশা পুকুর আর লম্বা দেয়াল, নানা খেয়াল এসে ঘিরে ধরেছিল আমাকে। এক হাম্মামখানায় পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসতেন সেকালের সুন্দরীরা। হয়তো পানি ছিটিয়ে দিতে এ ওর গায়ে। পানিতে সরু, রাঙা আঙুল দিয়ে কী নকশা ফুটিয়ে তুলতেন ওঁরা আপনমনে? তাঁদের মনে কি কোনো দুঃখ ছিল? প্রথম যেদিন লালবাগের কেল্লার ভিতর পা রেখেছিলাম সেদিন এরকম নানা কথা ভিড় জমিয়েছিল মনে। কেউ যেন আমার কানে মন্ত্র পড়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে কেল্লার ভেতর আর আমি সেই মন্ত্রের মায়ায় ঘুরছি সেখানে।

কে বানিয়েছিলেন এই লালবাগের কেল্লা? ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে এব গোড়াপত্তন করেছিলেন শাহাজাদা মোহাম্মদ আজম। তখন তিনি ছিলেন বাংলার সুবেদার। কেল্লার কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে চলে যেতে হল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ডাকে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তখন লড়াই বেধেছে মারাঠাদের। তাই ডাক পড়ল শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের। শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের পর বাংলার সুবেদার হলেন নবাব শায়েস্তা খান। সেকালের ঢাকার কাহিনি নবাব শায়েস্তা খানের কথা বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না, লালবাগের কেল্লার কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন শায়েস্তা খান, কাজ শুরু হয়েছিল। কাজ চলছে পুরোদমে, এমন সময় হঠাৎ একদিন মারা গেলেন শায়েস্তা খানের

মেয়ে বিবি পরি; ইরান দুখ্‌ত—বিবি পরির আরেক নাম, শায়েস্তা খান খুব ভালোবাসতেন বিবি পরিকে। দেখতে কেমন ছিলেন বিবি পরি? ডানাকাটা পরির মতো হুবহু? নাকি পাষাণপুরীর সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো যার শিয়রে জ্বলজ্বল করে সোনার কাঠি, রুপার কাঠি। বিবি পরিও আজ্‌ ঘুমন্ত। সুন্দর মকবরার নিচে ঘুমিয়ে আছে তিনি। কোনো রাজকুমারই সোনার কাঠির ছোঁয়ার ঘুম ভাঙাতে পারবে না তাঁর। তাই তাঁর আর জাগা হবে না কোনোদিন।

রূপবতী, গুণবতী—দুইই ছিলেন বিবি পরি। বাংলার সুবেদারের বিশাল বুক উজাড় করে তিনি একদিন চলে গেলেন মৃত্যুর আঁধারপুরীতে। জখমের সঙ্গে পরিচয় কম ছিল না শায়েস্তা খানের? কারণ বহুবার লড়তে হয়েছে তাঁকে। যুদ্ধের ময়দানে ভরা-দুপুরের রোদ্দুরের মতো কতবার ঝলসে উঠেছে তাঁর তলোয়ার। অনেককে জখম করেছেন, নিজেও জখমি হয়েছেন। সে-জখমের জ্বালা ভোলা যায়, কিন্তু কী করে তিনি ভুলবেন এই জখমের কষ্ট? মেয়ের মৃত্যুতে ভারি শোক পেলেন শায়েস্তা খান। কারিগরদের বারণ করে দেয়া হল যাতে তারা আর কেল্লার কাজে হাত না দেয়। লালবাগের কেল্লা বানানোর কাজ অলক্ষুণে মনে হল বাংলার সুবেদারের কাছে। তার বদলে বড়ো যত্ন করে বানান হল এক মকবরা, বিবি পরির কবরের ওপর। মকবরা তৈরির জন্যে উত্তর ভারত থেকে আনানো হল নানা মালমশলা। চুনার থেকে এল বেলেপাথর আর জয়পুর থেকে শ্বেত মর্মর।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সেই কবেকার লালবাগের কেল্লা। তার আগের জেল্লা নেই, তবু যেন কী একটা আছে যা মনকে টানে খুব। ঢাকাই মসলিনের মতো মিহি একটা উড়নি কে যেন বিছিয়ে দেয় মনের ওপর, কেউ যেন রূপকথায় ফোয়ারায় মতো সুরে শোনায় ঘুমপাড়ানিয়া গান। চোখ বুজে আসে। ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে পড়ি ঐ পুকুরের বাঁধানের ছাদঅলা শান্ত, নিঝুম ঘাটে। পুরোনো কালের পুরোনো ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া এসে ছুঁয়ে যাবে আমাকে, আমি ঘুমিয়ে পড়ব, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব। দেখব, ঐ চলেছেন বাংলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান। এক গভীর চিন্তার ছায়া তাঁর মুখে। আর ঐ তো তাঁর সহেলিদের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিবি পরি। বিকেলবেলার হাওয়া এসে চমৎকার খেলা জুড়ে দিয়েছে তাঁর রেশমি চুলের সঙ্গে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসবে তেজি ঘোড়ার আওয়াজ। মোগল আমলের ঘোড়ার আওয়াজ ভেসে না এলেও কানে আসে ঢাকার হাল আমলের ঘোড়ার গাড়ির ঝকর ঝকর শব্দ। রাস্তায় ঘোড়ার খুরের ঠক ঠক শব্দ, চাবুকের সপাং-সপাং আওয়াজ। ধুলো উড়ছে।

ধুলো উড়েছিল সেদিনও, যেদিন ঢাকা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন বাংলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান। সেদিন তাঁর শরীর বয়সের ভার, চোখে মুখে নানা স্মৃতির উঁকিঝুঁকি। তাঁর চোখ দুটো হয়তো নিমেষের জন্যে ছলছল করে উঠেছিল সেদিন, যেদিন চিরতরে ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছিলেন। ঢাকা শহরের সবাই ছুটে এসেছিল শায়েস্তা খানকে বিদায় দেবার জন্যে। লোকের ভিড়ে পথ গমগমে, শহরের পশ্চিম-ফটকের কাছে এসে থামলেন নবাব শায়েস্তা খান। শহরবাসীরাও থামল সেখানে। শায়েস্তা খানের শাসন আমলে বাংলাদেশ

ছিল সত্যিকারের সোনার বাংলা। সোনার ফসল উপচে পড়ত সারা দেশে। গোলায়-গোলায় ধান, গাছে-গাছে ফল, পুকুরে-দিঘিতে মাছ। অনেক, অজস্র। সুদিন তখন বাংলাদেশের সবসময়ের সাথি। ঢাকা শহরেও তখন সুদিনের ঝিলিমিলি। বারো মাসে তেরো পার্বণ। ধন্য রাজ্য, পুণ্য দেশ। চালডালের অভাব নেই। এক টাকায় আট মণ চাল যায় কেনা, মণপ্রতি দু'আনা দাম চালের। যত পারো পেট পুরে খাও। অন্ন, পায়েস, পিঠে—যা ইচ্ছে খাও, খাওয়াও। ঘরে অতিথি এলে বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই। হাঁড়িভরা ভাত। পাতভরা তরকারি, মাছ, তখন ঢাকা শহরের দোরে-দোরে হাতি বাঁধা।

সেই সুদিনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যেই বাংলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান তৈরি করেছিলেন ঢাকার পশ্চিম-ফটক। ঢাকা ছেয়ে যাওয়ার সময় এই ফটকের সামনে এসে থামলেন তিনি। ভালো করে দেখলেন ফটকটাকে, তারপর কী মনে হল তাঁর, বললেন, তাঁর যাওয়ার পর এই পশ্চিম-ফটক যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। তাঁর আদেশেই ফটকের গায়ে লেখা হয়, "ভবিষ্যতে যদি কোনো শাসনকর্তা বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের মতো শস্যের দাম কমাতে পারেন তবেই তিনি এই ফটকটি খুলতে পারবেন।" এই নির্দেশ রেখে পশ্চিম ফটকের ভেতর দিয়েই ঢাকা থেকে বেরিয়ে গেলেন বাংলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান।

দিনের পরদিন যায়, পশ্চিম-ফটক আর খেলা হল না! কার সাধ্যি খোলে সেই ফটক? আগে শস্যের দাম কমাও, এমন ব্যবস্থা করো যাতে লোকজন টাকায় আট মণ চাল কিনতে পারবে, তারপর খোলো পশ্চিম-ফটক। শস্যের দাম না কমিয়ে ফটক খুলতে গেলে সর্বনাশ হবে, অভিশপ্ত হবে তুমি। শস্যের দামও কমে না, ফটকও খোলে না। অনেক অনেক দিন পর নবাব সরফরাজ খানের শাসন আমলে আবার শস্যের দাম কমল। তাঁর দেওয়ান যশোবন্ত রায় ঘটা করে খোলালেন সেই কবেকার বন্ধ-করা পশ্চিম-ফটক। আবার এক টাকায় আট মণ চাল, নইলে ফটক খোলাই হত না কোনোদিন।

## ॥ এগারো ॥

টাকায় আট মণ না হলেও পাঁচ টাকায় এক মণ চাল আমরাও খেয়েছি। ভালো সরু চাল। রেশমের কুচ্ছিৎ, কাঁকরময় চাল নয়। সেই চাল সেদ্ধ করলে জুঁইফুলের মতো ভাতে ভরে উঠত হাঁড়ি। মোটা হয় মোটে, বিচ্ছিরি গন্ধও নেই তাতে। আস্তে-আস্তে বেড়ে চলল চালের দাম আমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। একদিন ঠেকল এসে আশি টাকা মণে। গুনে পুরো আশিটা টাকা দাও দোকানির হাতে তারপর পাবে এক মণ চাল। চাল সরস কি নীরস তা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। বাজারেরও যে একটা রং আছে এবং সে-রং কালো তা সেবারই জানতে পারলাম প্রথম। লোকের মুখে-মুখে কালোবাজারের জিকির আর মাথায়-মাথায় দু'মুঠো চাল জুটোবার ফিকির। আশি টাকা মণ দামে চাল কিনে খাওয়ার মতো সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ক'জন? তাই অনেকের উনুনে চড়ে না হাঁড়ি। অনেকে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে থাকে, দু'বেলা যারা খেতে পায় তাদের সংখ্যা কত কম যে দু'হাতের আঙুলেই গুনে শেষ করা যায়। ধনীদের কথা

বাদ দেয়া যাক; কী সুদিন, কী দুর্দিন- সব দিনেই ওদের দস্তরখানে থরেথরে বিচিত্র সব খাবার সাজানো। চোখ-ঝলসানো রং, জিভে জল-জাগানো ঘ্রাণ। দুমুঠো চাল জোটানোর জন্যে ওদের ছুটতে হয় না দোকানে-দোকানে। কাঁড়িকাঁড়ি টাকা, আর তাল তাল সোনা জমানোর ফিকিরেই তাঁরা ঘোরেন। ঘোরেন, মানে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে যান এক দালান থেকে আরেক দালানে। কত শলা, কত পরামর্শ, কত মাথা-নাড়ানাড়ি, কত ফিসফিসানি, ব্যাংকের খাতায় কত খসখসে সই, কত লাঞ্চ কত ডিনার। সবকিছুই বেশুমার। তাই চালের দাম আট টাকা মণ হলেও কী, আশি টাকা হলেও কী—এতে তাদের কিছু এসে যায় না। যাদের এসে যায় তারা উপোস করে, না খেয়ে মরে। তাদের শরীর নিয়ে টানাটানি করে শেয়াল-কুকুর।

মানুষের শরীর নিয়ে টানাটানি করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল উনিশশো তেতাল্লিশের শেয়াল-কুকুরের পাল। আর শকুনের দল। ওদের নখ আর ঠোঁটে কেমন মানুষ-মানুষ গন্ধ ভুরভুর করত তখন। উনিশশো তেতাল্লিশ সাল। হাড়গোড়া বেরিয়ে-পড়া বছর। কঙ্কাল-বছর। বাংলাদেশের উপোসি মুখের দিকে তাকানো যায় না আর। মুখ তো নয়, যেন মড়ার খুলি! গায়ের তাল তাল মাংস খুবলে খাচ্ছে পশুর পাল।

ওরা কারা চলাফেরা করছে ঢাকার পথে-পথে? কোত্থেকে এসেছে তারা? ওরা কি মানুষ? হয়তো মানুষ ছিল একদিন, আজ মানুষ বলে চেনা মুশকিল। ওরা তো চলন্ত কঙ্কাল একেক জন। কী খুঁজছে ওরা? একমুঠো ভাত? হাভাতে আর হাভাতিদের আজ ভাত দেবে কে? সবার পাতই আজ খালি মাঠের মতো খাঁ-খাঁ করছে। পুরুষেরা সারাদিন ঘুরেও একমুঠো চাল জুটোতে পারে না, মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে না কাপড় নেই বলে। ডাস্টবিনের ফেলে-দেয়া ঝুটো-কাঁটা নিয়ে মানুষ আর কুকুরে কাড়াকাড়ি। পথের ধারে মরা মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে শিশু। ভাত পেল না, রুটি পেল না, ফ্যান খেল, গাছের পাতা খেল। তবু গেল না প্রাণ বাঁচানো। আজও কানে বাজে, 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও।' সারা ঢাকা শহর যেন মুহূর্তে চিৎকার করে উঠেছিল 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' বলে।

শিউরে উঠেছিলাম। শিউরে উঠেছিলাম আমি, আমরা। আব্বা কেমন চুপচাপ। আম্মার মুখে হাসি নেই আগের মতো। বেশ টের পাই, আব্বার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে। কিছুতেই কুলোতে চায় না! অভাব তার মস্ত হ্যাঁ-করা মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে। অনটন যেন পেয়ে বসেছে আমাদের। একবেলা ভাত খাই, আরেক বেলা আটার রুটি। আটার রুটি খেতে এটুকুও ভালো লাগে না। তবু খেতে হয়। একদিন আব্বা আমাকে পাঠালেন মুদির দোকান থেকে ধারে সওদা আনার জন্যে। গেলাম, কিন্তু একটু পরেই ফিরে আসতে হল মুদির দাঁত-খিঁচুনি ও মুখ-খিঁচুনি দেখে। আগের মাসের বাকি শোধ না করলে সওদা দেবে না সে। সত্যি বলতে কি, সেদিন ভীষণ অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। আব্বাকে মুদির ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল পানিতে। আব্বা যেন পাথরের মূর্তি। কিছুই বললেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন ওপরের দিকে। যেন মেঘের আনাগোনা দেখছেন আকাশে।

শিউরে উঠতে হয়েছে, অনেকবারেই শিউরে উঠতে হয়েছে উনিশশো তেতাল্লিশে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাত্তিরে। আজও সেই রাতের কথা ভুলতে পারিনি। রাত বেশি হয়নি তখন, বৈঠকখানায় খেতে বসেছি। পাতে আটার রুটি আর আলুভাজা। মুখে এক টুকরো রুটি পুরতে যাব এমন সময় শিউরে উঠলাম। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। জানালায় একজোড়া চোখ আর কী দৃষ্টি সেই চোখে। রাজ্যির ক্ষুধা এসে যেন জড়ো হয়েছে সেই একজোড়া চোখের ভেতরে। মুখে একরত্তি মাংসের চিহ্ন নেই, হাড় আর চামড়া একাকার হয়ে গেছে। জানালার ওপর থেকে একটা গোঙানি ভেসে এল। এতবার সেই গোঙানি শুনেছি যে তার অর্থ বুঝতে একটুকুও কষ্ট হল না আমার। তারপর কী ঘটল কিছুই মনে করতে পারলাম না। দেখলাম, আমার বাসন খালি; রুটি কিংবা আলুভাজা কিছুই নেই, জানালার ওপারেও নেই সেই একজোড়া চোখ। না, কেউ কেড়ে নেয়নি আমার খাবার ; ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ ছিল। আবার গেলাম আম্মার কাছে। আমাকে রুটি চাইতে দেখে খুশিই হলেন তিনি। হয়তো ভাবলেন, তাঁর ছেলে আটার রুটির ভক্ত হয়ে পড়ছে দিনদিন। মা জানলেন না সেই সন্ধ্যায় একজোড়া চোখ, একটা গোঙানি আর দুটো রুটির ইতিহাস। আটার রুটি দেখলেই আমার সেই ভুতুড়ে সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে যায়। আমার সামনে ভেসে ওঠে একজোড়া চোখ, যে-চোখে জ্বলে উঠেছিল সারা বাংলাদেশের ক্ষুধা।

উনিশশো একচল্লিশে লড়াই বাধল ইউরোপে আর সেজন্যে খেসারত দিতে হল সারা পৃথিবীকে। আমাদের বাংলাদেশকেও। বেজেছে দামামা, বাঁধবে আমামা। কিন্তু আমামা লুটোয় ধুলোয়। মাছির মতো মরে মানুষ। কেউ বন্দুকের গুলিতে, কেউ কামানের গোলায়, কেউ বোমার ঘায়ে। ইউরোপে ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর, সেই শব্দে কেঁপে ওঠে সুদূর বাংলাদেশের কত ঘর। ট্যাঙ্ক চলছে তো চলছেই, বোমা পড়ছে তো পড়ছেই। হাজার হাজার ঘর ভাঙছে, বাড়ি ভাঙছে। পুল ভাঙছে, ইস্কুল ভাঙছে। দরদালান সব ভাঙছে। গির্জে, হাসপাতাল—তাও ধসে যাচ্ছে তাসের বাড়ির মতো। সারা ইউরোপে ঘরহারাদের ভিড়। হিটলারের দাপটে পথ খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। টিকে থাকাই দায়। মানুষ মারার কলের অভাব নেই। যেদিকে যাও মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে, বোমায় মরনি, যাও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যাও গ্যাস চেম্বারে। সেখান থেকে রেহাই পাবে না কিছুতেই। কত লোক মরল তার কোনো লেখাজোখা নেই।

লোকের মুখে লড়াই ছাড়া কথা নেই। খেতে লড়াই, বসতে লড়াই, শুতে লড়াই, লড়াই আর লড়াই। খবরের কাগজে বড়োবড়ো হেডিং। কটা জাহাজ ডুবল, কটা শহর পুড়ল, কটা বোমারু বিমান পড়ল, কত সৈন্য মরল, তারই হিসেব কাগজের পাতা জুড়ে। লোকের মুখে-মুখে ঘুরেফিরে আসে কয়েকটি নাম। জার্মানি, জাপান, ইতালি, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা। স্টালিন, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনি। হিটলারের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সারা পৃথিবী। জার্মানির অনেক জ্ঞানীগুণীকেও স্বদেশ ছেড়ে আসতে হল। কারণ হিটলারের তাঁবেদারি করতে পারেননি। জার্মানির রাস্তায়-রাস্তায় পোড়ানো

হল তাঁদের বইপত্তর। কিন্তু সেই সঙ্গে পুড়তে হল গোটা জার্মানিকেও। শেষ পর্যন্ত হিটলারের দর্প গেল গুঁড়িয়ে। যুদ্ধে জার্মানির চরম পরাজয় ঘটল। সেই সর্বনাশা যুদ্ধ অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে হিটলারকেও গিলে ফেলল। জাপানকে দমানোর জন্যে আমেরিকা অ্যাটমবোমা ফেলল হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে। সেখানে উঠল আরেক হাহাকার। অ্যাটমবোমার ভয়ানক রূপ দেখে শিউরে উঠল গোটা মানবজাতি। কী মারাত্মক এই অস্ত্র! তবে কি মানবজাতির দিন ঘনিয়ে এল পৃথিবীতে? প্রশ্ন জাগল অনেকের মনে। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মনেও সেই একই প্রশ্ন। মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি। বুঝেসুঝে না চললে পৃথিবীতে মানুষের চিহ্নটুকু থাকবে না—রাসেল খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন সবাইকে। কিন্তু কেউ কি কান দেবে তাঁর কথায়?

## ॥ বারো ॥

যে-দুর্ভিক্ষ নিজের চোখে দেখেছি তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হল একদিন। তখন আমি ম্যাট্রিক পড়ি। টেস্ট পরীক্ষা। ইংরেজি প্রশ্নপত্রে তিন-চারটে বিষয়ের উল্লেখ করে বলা হল তার মধ্যে যে-কোনো একটি বিষয় বেছে নিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্যে। একটি বিষয় ছিল দুর্ভিক্ষ। আমি দুর্ভিক্ষকেই বেছে নিলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অকালের নানা ছবি— টুকরো-টুকরো, ছোঁড়া-ছেঁড়া। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। বুক দুরুদুরু করছিল। আমার বুকের ভেতর বড়ো একটা ঘড়ি যেন খুব জোরে বেজে চলেছে। টিক, টিক, টিক। সময়ও জোরে ছুটে যাচ্ছে তেজি ঘোড়ার মতো কোন দূর তেপান্তরে। বুক দুরুদুরু আমার। তখনও খাতায় লেখা শুরু করতে পারিনি। প্রথমেই প্রবন্ধটা লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। তাই বাকি সব প্রশ্নের উত্তর লিখে প্রবন্ধটি শুরু করলাম সবশেষে। আবার চোখের সামনে ছবির মিছিল। আকালের ছবি। আকালের কঙ্কাল। ভুখা মানুষের মুখ। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা গোঙানি। দুটো চোখ আমার সামনে জেগে উঠল। চোখ দুটো কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে আমার ডেস্কের ওপর। সেই দুটো চোখে ক্ষুধার ভয়ানক নোটিস। সে-নোটিসের ভাষা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

একবার ভাবলাম, না থাক, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে কাজ নেই। অন্য একটি বিষয় বেছে নিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ লিখতে হল দুর্ভিক্ষেরই ওপর। মনে হল, দুর্ভিক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ না লিখলে ঐ দুটো চোখ আমাকে ডেস্ক ছেড়ে কিছুতেই যাবে না। প্রথম বাক্যটি রচনা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলাম। কিন্তু প্রথম বাক্যের হার্ডল পেরুনোর পর কলম তরতর করে এগিয়ে গেল।

ইংরেজি, বাংলা আর অঙ্ক পরীক্ষা দেয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ভীষণ জ্বর। বাকি পরীক্ষা আর দেয়া হল না। টেস্ট পরীক্ষা। মাত্তর তিনটে বিষয় পরীক্ষা দিয়েছি। অ্যালাউড হব তো? পরীক্ষার ফল বেরুনোর দিনে গেলাম ইস্কুলে। মন-খারাপ। শরীর খারাপ। বুক দুরুদুরু। কী জানে কী হয়! একসময় হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে ডাক পড়ল। আমি ভয়ে জড়োসড়ো। চেয়ারে বসে আছেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাদের

হেডমাস্টার। রাশভারী মানুষ। চোখে চশমা, গায়ে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি। তাঁর হাতে একটা খাতা। খাতাটা নেড়েচেড়ে তিনি বললেন, "দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে-প্রবন্ধটা লিখেছ সেটি খুব ভালো হয়েছে।"

খুশিতে আমি আতশবাজি হয়ে গেলাম। তা হলে নিশ্চয়ই অ্যালাউড। হলও তাই। ইংরেজি ও বাংলার ভালো নম্বর পেলাম। অঙ্কে তেমন সুবিধে হল না। তবু অ্যালাউড। ইচ্ছে হল, এক দৌড়ে ইস্কুলের মাঠের এপার থেকে ওপারে ছুটে যাই। দারোয়ানের ঝোপের মতো গোঁফকেও আর বিচ্ছিরি মনে হল না সেদিন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল খুশির ঢেউয়ের ছলাৎছলাৎ মাতামাতি। সবকিছু মাত করে ফেলার ভাবটা একসময় ঝিমিয়ে এল। আবার মন-খারাপ। কেমন উদাস-উদাস। আমার বুক পোগোজ ইস্কুলের মাঠ। আমার বুক ক্লাস টেন-এর শূন্য ঘর। আর কোনোদিন এসে বসব না এই ঘরে। আর কোনোদিন গোল্লাছুট কিংবা চোর-পুলিশ খেলব না পোগোজ ইস্কুলের মাঠে। সূর্যকিশোর, আবু তাহের, বিমল, সুবিমল, নীহার, নিরঞ্জন, আশরাফ, শাজাহান, সুজা—এদের সঙ্গে যদি আর দেখা না হয় কোনোদিন?

ইংরেজি পরীক্ষায় ভালো করেছিলাম বলে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন চিন্তাহরণবাবু। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সোম। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। চুপচাপ, নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করতেন চিন্তাহরণ বাবু। ইংরেজি ব্যাকরণ এমন চিৎকার করে পড়াতেন যে ব্যাকরণ শিখতে আমাদের চোখের পানি ফেলতে হত না। ভারি মজা পেতাম। কটমট, খটখট কিছুই মনে হত না ব্যাকরণকে। 'ব্যাকরণ মানি না', একথা বলছে ইচ্ছে করত না, যখন চিন্তাহরণবাবু হাতে তুলে নিতেন নেসফিল্ডের গ্রামার। আমার সৌভাগ্য, চিন্তাহরণবাবুর প্রচুর স্নেহ পেয়েছিলাম আমি। ক্লাসের ছেলেরা আমাকে চিন্তাহরণবাবুর 'জামাই' বলে খ্যাপাত। ক্লাসে তিনি আমার খোলাখুলি প্রশংসা করতেন বলেই আমার ঐ উপাধি জুটেছিল। শিক্ষকদের ঘরের এক কোণে একটা বাক্স ছিল, তার ওপরই বসতেন চিন্তাহরণবাবু। একা। অন্যান্য শিক্ষক গল্পগুজব করতেন, হাসি-তামাশা করতেন চেয়ারে ঠেস দিয়ে। কিন্তু চিন্তাহরণবাবু ঐ বাক্সটার ওপর বসে বসেই সময় কাটিয়ে দিতেন। কোনোদিন হাতে বই, চশমা-আঁটা চোখ দুটো বইয়ের পাতা লাইন থেকে লাইনে ঘুরে-বেড়ানো। কোনোদিন, কিছু না-করা, পা-দোলানো বাক্সের ওপর এমনি বসে থাকা, সামনের দিকে দৃষ্টি ছড়ানো। কোনো-কোনোদিন টিফিনের সময় যেতাম সেই কাঠের বাক্সটার কাছে, মানে চিন্তাহরণবাবুর কাছে। তিনি খুশি হতেন। অনেক কথা বলতেন। বলতেন পড়াশুনো করার জন্যে, ভালো হয়ে চলার জন্যে। বলতেন, মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো। একদিন বললেন, "শুধু লায়েক হলে চলবে না, লিয়াকত হাসিল করা চাই। সবাই লায়েক হয়, কিন্তু লিয়াকত হাসিল করতে পারে গুটিক'জন মানুষ।" আমি চুপ করে রইলাম। চিন্তাহরণবাবু বুঝলেন যে আমি তাঁর কথা কিছুই বুঝিনি। লিয়াকত কথার মানেই জানি তা, তাই বোঝা মুশকিল বইকী! তিনি লায়েক ও লিয়াকতের মনে বেশ সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, বয়স সবারই বাড়ে, কিন্তু নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারে খুব কম লোকই। ভারি ভালো লাগত চিন্তাহরণবাবুর কথা শুনতে। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে শুনতাম অনেকক্ষণ। ঘন্টা বেজে উঠলে বলতেন, "এবার ক্লাস করো গে যাও"। চিন্তাহরণবাবুর কথা যেন গ্রীষ্মকালের ঝাঁঝাঁ দুপুরে ঠান্ডা শরবত। মন-জুড়োনো, প্রাণ-জুড়োনো। সেসব কথার কোনোদিন পুরোনো হওয়ায় কিংবা ফুরোনোর নাম নেই। আজও হঠাৎ মনে পড়ে, "শুধু লায়েক হলে চলবে না, লিয়াকত হাসিল করা চাই।"

ইস্কুলে আরও একটি প্রবন্ধ লিখে প্রশংসা পেয়েছিলাম। ক্লাস নাইন-এর অ্যানুয়্যাল পরীক্ষায় বাংলায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বিষয় ছিল "এক টুকরো কয়লার আত্মকাহিনী"। নিজেকে এক টুকরো কয়লা কল্পনা করে বেশ মজা পেয়েছিলাম সেদিন। ক্লাস নাইন-এ আমাদের বাংলা পড়াতেন শ্রীবিনয়কুমার গাঙ্গুলি। বাংলা সেকেন্ড পেপারে আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল দু'জন, কিন্তু প্রবন্ধে আমার নম্বর উঠেছিল সবচেয়ে বেশি। বিনয়বাবু প্রবন্ধটির কথা ক্লাসের সবাইকে বললেন। প্রবন্ধটি পড়ে শোনালেন সবাইকে।

বিনয়াবাবু বড়ো বেশি পান খেতেন। তাঁর মুখে অষ্টপ্রহর পান থাকত, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। অত বেশি পান চিবোনোর জন্যে কি না জানি না, বিনয়বাবুর কথাবার্তা ছিল ভারী রসালো। যদিও চুলে তাঁর পাক ধরেছিল, প্রাণে পাক ধরেনি মোটেই। সবসময় হাসিখুশি। তিনি হাত তুলতেন না কারুর ওপর, বকাবকিও করতেন না। তবে কালেভদ্রে রেগে উঠলে এমন একটি কি দুটি কথা বলতেন আস্তে-আস্তে যে, তখন নিজেদের মস্ত অপরাধী মনে হত আমাদের। তাঁর ক্লাসে দুষ্টুমি করার উপায় ছিল না। বেতের ভয়ে নয়। তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে পড়াতে পারতেন বলেই আমরা কখনো অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেতাম না। মাঝে-মাঝে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প শোনাতেন তিনি। মন-কেড়ে-নেয়া সব গল্প।

বিনয়বাবুর হাতে একদিন একটা রংচঙে বই দেখলাম। বার্ষিক 'শিশুসাথী'। 'শিশুসাথী' হাতে নেয়ার জন্যে রীতিমতো লোভী হয়ে উঠলাম। ওটা বিনয়বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নেব কি নেব না, এই ভাবনাতেই কেটে গেল অনেকক্ষণ। চাওয়া আর হল না শেষ পর্যন্ত। বিনয়বাবু জানতেও পারলেন না, তাঁর এক ছাত্র ঐ রঙিন মলাটঅলা বইটা পাওয়ার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। জানলে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ছাত্রের ইচ্ছা পূরণ করতেন। হঠাৎ কোথাকার এক লজ্জা এসে আমার মুখে খিল এঁটে দিল। টেবিলের ওপর বার্ষিক 'শিশুসাথী'। আমি শুধু চোখ দিয়ে চাখলাম।

একদিন সত্যি সত্যি হাতে এল বার্ষিক 'শিশুসাথী'। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্সে গিয়েছিলাম একটা পাঠ্যপুস্তক কেনার জন্যে। হঠাৎ চোখ পড়ল রংচঙে একটা বইয়ের দিকে, দেখেই মনে হল, চিনি। কলজে লাফিয়ে উঠল, যেমন একটা মাছ লাফিয়ে ওঠে রোদ্দুর-লাগা জল টুসটুস দিঘিতে। চেনার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল কেনা। পাঠ্যবই আর সেদিন কেনা হল না। বার্ষিক শিশুসাথীকে সঙ্গী করেই ফিরে এলাম বাড়িতে। কাপড়-চোপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়া, কাগজের মোড়ক খুলে শুয়ে-শুয়ে 'শিশুসাথী' পড়া। কী কী পড়েছিলাম সেই শিশুসাথীতে আজ তা কিছুই মনে নেই। শুধু মনে পড়ে একটা ঘোড়ার গল্প। তা-ও বেশ বেশি ধোঁয়াটে। আর মনে পড়ে সেই ঘোড়া আর এক ঘোড়সওয়ারের ছবি।

শ্রীবিনয়কুমার গাঙ্গুলি ছিলেন 'শিশুসাথীর' নিয়মিত লেখক। তা ছাড়া তিনি 'শিশুসাথীর' সাম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর লেখা গল্পগুলোতে পড়ত ইতিহাসের ছায়া। ছোটোদের মনের মতো করে গল্প বানাতেন তিনি। বিনয়বাবু ছিলেন আমার দেখা লেখক দ্বিতীয়, আমার দেখা প্রথম লেখকের কথা পরে বলছি। কিন্তু আমার মনে তাঁর স্মৃতি লেখকের চেয়ে শিক্ষক হিসেবেই বেশি ঝলমলে। সত্যি কথা বলতে কি, লেখকদের মহিমা বোঝার বয়স তখনও আমার হয়নি। তখন হয়তো মাথায় এত বুদ্ধিই গজায়নি যা দিয়ে বোঝা যায় লেখকদের মাহাত্ম্য।

আমার দেখা প্রথম লেখক জনাব আদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। তাঁকে যখন দেখেছি তখন আমি খুবই ছোটো। আমাদের বৈঠকখানায় প্রায় রোজই দেখা যেত আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নকে। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। খুব বেশি শুকনো মনে হত তাঁকে। মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল। দু'ভাগ করে আঁচড়ানো। পরতেন সাদা প্যান্ট, কালো রঙের কোট আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। কষে হুঁকো টানতেন দেখেছি আমাদের বৈঠকখানায়, আব্বার সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের বাড়িতে একটা পুরোনো ফটোগ্রাফ আছে। ফটোগ্রাফটিতে সেই কবে থেকে বসে রয়েছেন তিনজন। আব্বা, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন ও আরও একজন। আব্বার মুখে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুটির কথা প্রায়ই শোনা যেত। দিলদরিয়া মানুষ। চালচুলোর ঠিকঠিকানা নেই। সাহিত্যের সমুদ্দুরে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছেন। জীবন টিকিয়ে রাখার জন্যে যে-রসদটুকু দরকার তা শুধুই ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সেই আপনমনে ভেসে চলেছেন তো চলেছেনই।

বাবুর বাজারের পুলের সামনেই ছিল তাঁর আস্তানা। একটা ছোটোখাটো প্রেস করেছিলেন। কী নাম ছিল প্রেসটার? কিছুতেই মনে পড়ছে না। ওখানেই পায়রার খোপের মতো একটা ঘরে ঝুঁকে ঝুঁকে লিখতেন কিংবা হুঁকোর ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে হাওয়ায়-হাওয়ায়। একদিন যাচ্ছিলাম সেই প্রেসের ধার-ঘেঁষে। দেখেই হাত নেড়ে ডাকলেন। বসতে বললেন। হুঁকো টানার ফাঁকে-ফাঁকে বললেন কিছু কথা। সেসব কথা আজ বড়ো আবছা, কেমন মেঘলা-মেঘলা। তখন খুবই ছোটো ছিলাম। বহুকাল পর সলিমুল্লা মুসলিম হলের ম্যাগাজিনে তাঁর একটি কি দুটি লেখা পড়েছিলাম। ভাষার ওপর তাঁর বেশ দখল ছিল, বোঝা যায়। তাঁর একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছিল। গুণী ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নেই। কাজী নজরুল ইসলাম 'কাব্যে আমপারা' ও 'রুবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম'-এর ভূমিকায় আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, তিনি এ দুটো বই তর্জমা করার সময় অনেক সাহায্য পেয়েছেন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের কাছে।

আমার জন্মের কয়েক বছর আগে ঢাকায় শুরু হয় বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন। মুসলমান সমাজের কয়েকজন সাহসী তরুণের উদ্যোগেই এই আন্দোলন শুরু হতে পেরেছিল। তাঁর হলেন আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনওয়ারুল কাদির, কবি আবদুল কাদির ও ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। আবুল হোসেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ক্যান্সার রোগ হওয়ায় অকালে মারা যান তিনি। যখন তাঁর বয়স মাত্র ৪২

বছর। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এই সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে 'শিখা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল। মাত্র পাঁচ-ছটি সংখ্যা বেরুনোর পরই 'শিখা'র আলো নিভে গেল। পত্রিকাটি নানা কারণে আর চালানো সম্ভব হল না। মুসলমান সমাজের অন্ধকার দূর করার জন্যেই 'শিখা'র জন্ম হয়েছিল। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতারা মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছিলেন সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্যে। তাঁরা যাদের মনের চড়ায় বুদ্ধির মুক্তির ঢেউ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন ওরাই খেপে উঠল। নানারকম ফন্দিফিকির আঁটল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার জন্যে। যারা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করল তাদের বুদ্ধি কিংবা যুক্তির জোর ছিল না। কিন্তু গায়ের জোর ছিল ষোলো আনাই। তাই ওরা সেদিন হাত তুলেছিল সাহিত্যসমাজের কোনো কোনো সদস্যের গায়ে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কি না জানি না, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের কারও কারও সঙ্গে। কবি সমালোচক আবদুল কাদিরের সঙ্গে তার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। শুনেছি আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন 'শিখা'র একটি কি দুটি সংখ্যা সম্পাদনার ব্যাপারে সাহয্য করেছিলেন সম্পাদককে। মোটকথা, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন সাহিত্যচর্চাকেই জীবনে পরম সত্য বলে জেনেছিলেন। একটি উর্দু উপন্যাসের তর্জমা করেছিলেন তিনি। উপন্যাসটির নাম ছিল 'খুন না আঁসু'। তিনি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন 'রক্ত না অশ্রু'। ভাগ্যের কী পরিহাস, সত্যি সত্যি একদিন রক্ত উঠল তাঁর গলায়। রক্ত থুথুর সঙ্গে, রক্ত কফের সঙ্গে, কখনো কখনো শুধু রক্ত। পিকদান ঘনঘন টইটম্বুর হয়ে উঠত বুক-চেরা কলজে-ছেঁড়া রক্তে। তারপর একদিন সব শেষ। যক্ষ্মা রোগে অকালে মারা গেলেন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। সেই হাসিখুশি, দিলদরিয়া, আড্ডাপ্রিয়, সাহিত্যপিয়াসী মানুষটির চিহ্ন পর্যন্ত রইল না আর দুনিয়ায়।

আব্বা ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুটির মৃত্যুতে। কোনোদিনই তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের দুঃখ-কষ্টের পেরেক-বাঁধা জীবনস্মৃতি। বুঝি তাই তিনি যেদিন তিনি প্রথম কবিতা লেখার খবর শুনলেন সেদিন তাঁর মুখ হয়ে উঠেছিল শ্রাবণের আকাশ—কালো মেঘে ঢাকা। সেই মেঘ কোনোদিন কেটেছিল বলে মনে পড়ে না। আর কেউ না বুঝুক, অন্তত আমি বুঝতে পারতাম আমার সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে কেন ভালো চোখে দেখতে পারেননি তিনি। এজন্যেই আমার মনে এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ জাগেনি কোনোদিন।

## ॥ তেরো ॥

ঢাকা শহরের বুকে কেউ মস্ত এক ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। শহরের কলেজ থেকে রক্ত পড়ছে, রক্ত ঝরছে বৃষ্টির ফোঁটার মতো। এই বৃষ্টির ফোঁটার মতো রক্ত-ঝরে-পড়া একবার থামে আবার শুরু হয়। ভয়, একটা দারুণ ভয় কামড়ে ধরে সারাক্ষণ। ঘুরেফিরে শুধু সেই একই খবর। খুনখারাবির খবর। ধুতি পরে হেঁটে যাচ্ছে কেউ, দাও বসিয়ে ছোরা, বের

করে ফ্যালো নাড়িভুঁড়ি। কেউ পাজামা কিংবা লুঙ্গি পরে যাচ্ছে, আর রক্ষে নেই—মারো ছোরা, জন্মের মতো মিটিয়ে দাও হেঁটে যাওয়ার সাধ।

সারা ঢাকা শহরের বুকেই ভীষণ কালো, দৈত্য-দানোর দাঁতের মতোই ধারালো মস্ত ছোরা বসানো। সূর্য ওঠে অথচ কিছুতেই মনে হয় না যে সূর্য উঠছে। দিনকে রাত বলে মনে হয়, এত অন্ধকার! ভয় সব সময়েরই সাথী। ইশকুলে যাওয়া হয় না। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই। মন-খারাপ। চারদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর। প্রায় সবার কান হয়ে উঠেছে ডাস্টবিন—রাশি রাশি নোংরা খবরের জন্যে খাইখাই করছে সবসময়। মুসলমান শুনতে চায়, বেশকিছু হিন্দু সাফ হল কিনা, হিন্দু শুনতে চায়, বেশকিছু মুসলমান ম'ল কি না। মৃতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে সে কী প্রতিযোগিতা! ধুতি আর পাজামার সে কী লড়াই! ধুতি আর পাজামা লড়াই করে মরছে, বসে বসে মজা দেখছে কোট-প্যান্ট। হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গার পেছনে যে ব্রিটিশের হাতসাফাই ছিল তা কেউ-কেউ টের পেলেও ওতে ফায়দা হয়নি। বন্ধ হয়নি হিন্দু-মুসলমানের একরঙা রক্তের স্রোত।

একসময় কমে আসত লুটতরাজ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার দাপট। আবার সবকিছু ঠিকঠাক। ধুতির পাড়ায় পাজামা হাঁটছে, পাজামার পাড়ায় ধুতি। দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার পর যখন আবার হাইস্কুলে যেতাম, তখন দু'একদিন কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকত। সহজ হতে পারতাম না। বড়দের মনের কালিমা ছোটোদের মনেও ছড়িয়ে পড়ত বলে বাধত খিটিমিটি, বাধত ঝগড়া। নেড়ে আর মালাউনের ঠোকাঠুকিতে কথাবার্তা জমত না। জমত না খেলাধুলো। কিন্তু দু'একদিন যেতে-না-যেতেই আবার গলাগলি, আবার খেলা, আবার বিকেলবেলা ঘুরে বেড়ানো পল্টনের মাঠে, সদরঘাটে। আবার পল্টনের মাঠে ফুটবল খেলা দেখা, ঝালমুড়ি চিবোনো; আবার সদরঘাটে হেঁটে বেড়ানো, মস্ত কামানের গায়ে হাত বুলানো। সদরঘাটে হাওয়া, খোলা হাওয়া। হাওয়ার দোলায় বুড়িগঙ্গা নদীর শিউরে-ওঠা। মাঝির বৈঠা চালানো দেখার খুশি নিয়ে বসা আহসান মঞ্জিলের দিকে পিঠ দিয়ে। বুড়িগঙ্গা বয়ে চলেছে একটানা। বুড়িগঙ্গার ওপর নৌকা। বুড়িগঙ্গার ওপর গ্রিনবোট মানে বজরা। খোলা হাওয়ার পালতোলা নৌকা চলেছে হাঁসের মতো পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো দাঁড়-বওয়া মাঝির পেশি ওঠে ঝিকিয়ে বিকেলের রোদ লেগে। বয়ে চলে বুড়িগঙ্গার পানি। টলটলে জল। মাঝে-মাঝে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পাড়ে। বুড়িগঙ্গার পানি জানে কত কাহিনি! সুখে ঝলমলানো. দুঃখে ছলছলানো। কত শাহী বজরা কত রণতরী ভিড়েছে বুড়িগঙ্গার তীরে। কত বিচিত্র মুখের মেলা সেখানে! কারও মুখ শরতের আকাশের মতো কারও-বা শ্রাবণের আকাশের মতো, কালো মেঘের বুনট-দেয়া। সেসব মুখ নেয়ে উঠছে রোদে, জ্যোৎস্নায়। এই বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়েই আলিবর্দি খাঁর কন্যা ঘসেটি বেগমকে নিয়ে যাওয়া হল জিঞ্জিরা-প্রাসাদে। নির্বাসনে দুঃখের দিন কাটাতে শুরু করলেন ঘসেটি বেগম। বুড়িগঙ্গার টলমলে পানির দিকে চেয়ে কি সেদিন ছলছলিয়ে ওঠেনি ঘসেটি বেগমের চোখের পানি? বুড়িগঙ্গার পানিতে চোখের পানি ঝরিয়ে ঘসেটি বেগমের ছোটো বোন আমিনা বেগমও একদিন এলেন জিঞ্জিরা-প্রাসাদে বন্দিনী হয়ে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্রবধূ। অল্প বয়সেই বিধবা। বুকে তাঁর সাত রাজার ধনের চেয়েও দামি ধন এক সন্তান। তাঁদের

দুঃখের দিন আর কাটে না। মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই মিলল বটে, কিন্তু চোখে খুশির ঝিলিক নেই, ঠোঁটে হাসির ঝিকিমিকি নেই, বুকের ভেতর নেই সুখের ঝলক। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজনদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। তাঁদের দুঃখ দেখে বুড়িগঙ্গার পানিও বুঝি একটু বেশি ছলছলিয়ে ওঠে।

একদিন তাঁদের জিঞ্জিরার প্রাসাদও ছাড়তে হল। মীরজাফরের ছেলে মীরন। তাঁর নিষ্ঠুরতার সীমা নেই। মীরনের অত্যাচারে সবাই তটস্থ। কখন কার প্রাণ যায় এই ভয় সবার মনে। কারণ, সামান্য দোষেই মাথা পড়ে কাটা! মেয়েদের সুন্দর মেঘবরণ চুলভরা মাথাও বাদ পড়ে না। এই নিষ্ঠুর মীরনের হুকুমেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজনদের ডুবিয়ে মারা হল বুড়িগঙ্গার বুকে। ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে বলা হল যে, তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মিথ্যার ফাঁদে পা দিলেন তাঁরা।

১৭৬০ সাল। গোধূলিবেলায় আকাশ যেন টকটকে খুনি রঙের বানারসি শাড়ি পরেছে। সেই রং এসে মিশেছে বুড়িগঙ্গার পানিতে। জিঞ্জিরার ঘাটে বাঁধা একটি নৌকো। দেখতে দেখতে আকাশ তার শাড়ি পালটে ফেলল। টকটকে খুনি-রং বদলে গেল কালো রঙে। দুঃখের রং শোকের রং। বুড়িগঙ্গার চোখ কাঁপে বুক ছলছলায় বুক চিরে বেরোয় দীর্ঘশ্বাস। হুহু হাওয়ায় দুলে ওঠে নৌকো। সেই নৌকোয় এসে উঠলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজন। নৌকো চলল ঘাট ছেড়ে। নৌকো চলল বুড়িগঙ্গার সন্ধ্যা-মাখানো পানি কেটে কেটে। আকাশ কালো, নৌকো কালো, বুড়িগঙ্গার পানি কালো। আর কালো আমিনা বেগমের বিধবা পুত্রবধূর করুণ দুটি চোখ। একসময় নৌকো বেসামাল হয়ে ওঠে। যাত্রীদের বুক ঝড়ের মুখেপড়া নৌকো। বাঁচতে চাওয়ার ব্যাকুলতা-মেশানো কান্না জাগে বুড়িগঙ্গার বুকে। সে কী কান্না! বুড়িগঙ্গা যেখানে মিলেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে সেখানে ডুবল সেই নৌকা। নৌকো যাতে ডোবে তার ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবে করা হয়েছিল আগে থেকেই। নৌকোর তলায় ফুটো করে সেই ফুটোগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছিল খিল দিয়ে। ধলেশ্বরীর কাছে এসে সেসব খিল খুলে ফেলায় নৌকার ভরাডুবি হল।

আহসান মঞ্জিলের দিকে পিঠ দিয়ে কতদিন দেখেছি বুড়িগঙ্গাকে। আহসান মঞ্জিলকেও তো কম দেখিনি। বাইরে থেকে দেখেছি, ভেতর থেকেও। দেখেছি তার মিয়া আর বিবিদের। আহসান মঞ্জিল মানেই নবাববাড়ি। তার শান-শওকতই আলাদা। এক সময় আহসান মঞ্জিল ছিল ফরাসিদের একটা ফ্যাক্টরি। ১৮৩৮ সালে খাজা আলীমুল্লা এটি কিনে নেন। কিন্তু তখনও এটি প্রাসাদ হয়নি। প্রাসাদটি তৈরি করেন নবাব স্যার আবদুল গনি ১৮৭২ সালে। ছেলের নাম অনুসারে তিনি প্রাসাদটির নাম রাখেন আহসান মঞ্জিল। নবাব স্যার আহসানউল্লাহ বাহাদুর নবাব আবদুল গনির ছেলে। ১৮৮৮ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর আহসান মঞ্জিলকে আবার নতুন করে গড়া হয়। এই আহসান মঞ্জিলেই মুসলিম লিগের ধারণা লতিয়ে ওঠে একদিন।

ছেলেবেলায় দুবার গিয়েছিলাম আহসান মঞ্জিলে, মানে প্রাসাদের ভেতর। এমনিতে কিন্তু আহসান মঞ্জিলের এলাকা বেশ বড়ো। অনেক বাড়ি, একটা পুকুর, কিছু অলিগলি—

এই সবকিছুই আহসান মঞ্জিলের আওতায় পড়ে। প্রাসাদের ভেতর যেদিন প্রথম পা রাখলাম সেদিন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলাম। তখন অবশ্য আগের জাঁকজমক অতটা আর নেই। তবু একটা বালকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো ঝকমকানি তখনও ছিল প্রচুর। দেয়ালে দেয়ালে চিত্র, ফটোগ্রাফ। বিরাট হলঘরে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। মাথা থেকে নিয়ে পায়ের তলা পর্যন্ত বর্মে ঢাকা যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে ক'জন। দেখেই ভড়কে গেলাম। কিন্তু শুনে ভরসা পেলাম যে বর্মের ভেতর যোদ্ধা-টোদ্ধা কিছুই নেই। চোখ জুড়িয়ে গেল চমৎকার নকশাদার সাজ-টেবিল দেখে। আর চোখ বড় বড় করে দেখলাম কত জন্তুর মাথা আর কঙ্কাল। পুরোনো কাল যেন মস্ত এক ডালা তুলে ধরেছে আমার সামনে—আমার শুধু চেয়ে দেখা, আমার শুধু অবাক হওয়ার পালা।

আরেকবার এই প্রাসাদে গিয়েছিলাম আমার বড়ো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে। দোতলায় বসেছিলাম ফরাসের ওপর। আর আমার বড়ো ভাই নওশা সেজে বসেছিলেন নবাবি আসনে। তখন তাঁকে নবাব-নবাবই মনে হচ্ছিল। প্রাসাদের ভেতর আর যাইনি কোনোদিন, কিন্তু গিয়েছি আহসান মঞ্জিলের অন্যান্য বাড়িতে অনেকবার। দেখেছি কত পানদান, শুনেছি খানদানি বোলচাল। মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার। কোনো কোনো মিয়াকে মনে হত রাজপুত্তুরের মতো আর কোনো কোনো বিবি ছিলেন হুবহু ডানাকাটা পরি। আর এমনি সুন্দরী ছিলেন তো অনেকেই। নবাববাড়িতে অষ্টপ্রহর ধুমধাড়াক্কা লেগেই থাকত। আজ বিয়ে, কাল জন্মদিন, পরশু নাক-ফোঁড়ন, তরশু কান-ছেদন—এসব নিয়েই মেতে থাকতেন মিয়া-বিবিরা। বিড়ে বিড়ে পান, কাশ্মীরি চা আর কাক্‌চা বিস্কুট না হলে আসরই জমে না। তার সঙ্গে থাকা চাই ঢোল আর মেরাসিনের গান। এ বৈঠকই যেন নবাববাড়ির প্রাণ। এ ছাড়া, সবকিছু কেমন ছাড়া-ছাড়া, ফিকে-ফিকে মনে হত মিয়াবিবিদের কাছে। আছে, আজও সেই ঢোলের আওয়াজ আর মেরাসিনদের গানের রেশ লেগে আছে আমার কানে। এখনও হঠাৎ কোনো মিয়ার মাথা-দুলনি কোনো বিবির হাসির ফেয়ারা কিংবা ঝুঁকে সালাম করার ভঙ্গি ঝলসে ওঠে আমার মনে।

## ॥ চোদ্দো ॥

ছোরার ছায়ায় বড়ো হয়েছি। কত অসহায় মানুষের ঘর পুড়তে দেখেছি, দেখেছি ভীষণ ভয়-পাওয়া মানুষের মুখ। খুনির চিৎকারে কতবার ভেঙে গেছে আমাদের রাতের ঘুম। সেই পুরোনো ধুতি-পাজামার লড়াই, খুনোখুনি। খুন করার নেশায় পশু হয়ে গিয়েছিল কতকগুলো মানুষ। সারাদেশ আফ্রিকার কালো জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। একসময় লুঠতরাজ আর খুনোখুনি ভয়ানক বেড়ে গেল। দাঙ্গা—শুধু দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমান কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে রাজি নয়। মুসলমানকে তাড়াতে চায় হিন্দু আর হিন্দুকে মুসলমান। এ এক দারুণ ঘৃণা। এক অদ্ভুত বিদ্বেষ। কেউ কারও ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চায় না।

একদিন শুনতে পেলাম, দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের হাত-পা থেকে খসে গেছে ইংরেজের দু'শো বছরের শেকল। এখন আমাদের দেশ আমাদেরই। পেছনে অত্যাচার আর উৎপীড়নের অনেক স্বাক্ষর রেখে ইংরেজ নিল বিদায়। যাওয়ার আগে ভারতবর্ষকে

দু'ভাগ করে এক ভাগ দিল হিন্দুদের আর এক ভাগ মুসলমানদের। সে দু'ভাগেরই নাম ভারত আর পাকিস্তান। কত লোকের ঘর ভাঙল, মন ভাঙল। সাতপুরুষের ভিটে, নিকোনো উঠোন, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা ফসলের মাঠ ছাড়তে হল অনেককে। ভারতের মুসলমানেরা এল পাকিস্তানে, পাকিস্তানের হিন্দুরা চলল ভারতে। ঘর নেই, ঠিকানা নেই, আছে শুধু যাওয়া। তবু অনেক অনেক মুসলমান থেকে গেল ভারতে, অনেক হিন্দু পাকিস্তানে। সবার পক্ষে সম্ভব হল না পূর্ব পুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসা।

ঢাকার পথে দেখা গেল মোহাজেরদের ভিড়। ঘরহারা মানুষদের চোখেমুখে একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্যে সে কী আকুলতা! পথে ঘাটে উদ্বাস্তু। ঘর নেই, ফুলবাড়িয়া স্টেশনের খালি ওয়াগন আছে। ওখানেই মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজল ওরা অনেকে। ঘরহারা মানুষের দল রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নতুন ঘরের স্বপ্ন দ্যাখে। আর বারবার ওদের চোখে শুধু ভেসে ওঠে পেছনে-ফেলে-আসা অনেক টুকরো-টুকরো ছবি।

ততদিনে আমি বেশ বড়োসড় হয়ে গেছি। কলেজে পড়ি। আমি আছি ঢাকা শহরে। আবু তাহের আছে, আশরাফ আছে, পিনু আছে, শাহজাহান আছে। কিন্তু নেই সূর্যকিশোর, সুবিমল, বিমল, নীহার, শিশির। সুজা আছে, আছে নিরঞ্জন। আমার চেনা অনেকেই নেই। বারবার ওদের কথা মনে পড়ে। ইশকুল ছুটি হলে সূর্যকিশোরের সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম মনে পড়ে। তরুণের হাতের লেখা সুন্দর ছিল, মনে পড়ে। শিশির খুঁড়িয়ে চলত, মনে পড়ে। মনে পড়ে আরও অনেক কিছু। সবই ছেঁড়া-ছেঁড়া যা আর কোনোদিনই জোড়া লাগবে না। মনে হুহু হাওয়া বয়। পুরোনো দিনগুলোর দিকে হাত বাড়াই, যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সেই দিনগুলো শুধু ছবি দেখায়, দেয় না কিছুই। নাকি ঐ ছবিগুলোই এক মস্ত পাওয়া।

১৯৪৭ সালের চোদ্দো আগস্টে আমরা স্বাধীন হলাম। 'আমরা স্বাধীন হলাম'—কথাটা লিখতে কিন্তু আমার একটুও সময় লাগেনি, কষ্টও হয়নি বিন্দুমাত্র। সাদা কাগজে কলম ধরার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়ে গেল চট করে। অথচ এই স্বাধীনতার জন্যে আমাদের অনেক অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে অনেককে। বহু শহিদের রক্তের সরোবরে ফুটে উঠেছে স্বাধীনতার রক্তপদ্ম। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যাঁরাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদেরই ঠেলে দেয়া হয়েছে কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতে, ফাঁসির মঞ্চে। ফাঁসির কথা উঠলেই আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় শোনা সেই গান, যে-গান শুনে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে বাংলাদেশের অগণিত মানুষ। আজও কান্নায় চোখ ছলছলিয়ে ওঠে সেই গানের রেশ ভেসে এলো :

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি,
দেখবে জগৎবাসী।
শনিবার দিন দশটার পরে
হাইকোর্টেতে লোক না ধরে

অভিরামের দ্বীপান্তর মা,

ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

কলের বোমা তৈরি করে

বসাইলাম মা লাইনের ধার

লাট ম'ল না বিফল হ'ল,

মরল ভারতবাসী।

দশ মাস দশ দিন পরে

জন্ম নেব তোমার ঘরে

চিনতে যদি না পার মা

দেখবে গলায় ফাঁসি।

হাসিমুখেই গলায় ফাঁসি পরেছিলেন কিশোর ক্ষুদিরাম বসু। ইংরেজ রাজকর্মচারী কিংসফোর্ডকে বোমা মারার কথা। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের হাত থেকে ছুটল বোমা, কিন্তু বোমা পড়ল ভুল জায়গায়। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। ধরা পড়ার আগেই তিনি পিস্তল দিয়ে নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করে দিলেন। ক্ষুদিরামের বিচার হল। আর এর পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হল—কিশোর ক্ষুদিরামকে যেতে হল ফাঁসির মঞ্চে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ, যেদিন ব্যারাকপুরে সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক ছুঁড়েছিলেন লেফটেন্যান্ট বাগকে তাক করে। গুলি লেফটেন্যান্ট বাগের গায়ে না লেগে লাগল তার ঘোড়ার গায়ে।

শেষ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট বাগ মারা গেলেন মঙ্গল পাণ্ডের রাগী তলোয়ারের কোপে। এর বদলে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসিতে ঝুলতে হল। মঙ্গল পাণ্ডে শহিদ হলেন। আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রথম শহিদ; কিন্তু তার আগে আমাদের স্মরণ করতে হবে ১৭৬৪ সালের একটি ঘটনা। বেঙ্গল আর্মির সিপাইরা গোরা সিপাইদের সমান বেতন দাবি করলেন। কিন্তু সাহেবরা এই ভীষণ বেয়াদবি সহ্য করবেন কেন? তাই বেঙ্গল আর্মির ২৪ জন বীর সিপাইকে বন্দি করে কামানের মুখে উড়িয়ে দেয়া হ'ল।

সেদিনের সেই কামানের ধোঁয়া বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু ২৪ জন বীর সিপাইয়ের মনের ধোঁয়া কখনো বিলীন হয়নি। সেই ধোঁয়া রয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে। সেই ধোঁয়া জমে উঠেছিল আজিজুল্লাহ খাঁর মনে, মঙ্গল পাণ্ডের মনে, বিদ্রোহী মৌলবি আহমদ শাহের মনে। এঁদের সবার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আরও অনেকের কথা।

আর মনে রাখতে হবে ঢাকার কালা-ধলার লড়াইয়ের কথা। দেশের অন্যান্য এলাকায় যখন সিপাই বিপ্লবের পড়েছে ভাটা তখন ঢাকার লালবাগে জাগল এক নতুন জোয়ার। ঢাকার কালা সিপাইরা ধলাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ দানা বাঁধার আগেই ব্রিটিশের খয়ের খাঁ খাজা নবাব আবদুল গনি কমিশনারকে সিপাইদের

প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিলেন। কী করে সিপাইদের শায়েস্তা করা যায় এ-সম্পর্কে ইংরেজদের দু'একটা দামি শলা দিতেও কসুর করলেন না তিনি। বিভিন্ন জায়গায় সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হল। কিন্তু লালবাগের সিপাইরা জান দেবেন তবু হাতিয়ার দেবেন না। লালবাগ ঘিরে ফেলা হল। যুদ্ধ চলল দু'দলের মধ্যে। লড়তে লড়তে প্রাণ হারালেন চল্লিশ জন বীর সিপাই। জখমি হলেন অনেকে। যাঁরা বন্দি হলেন তাঁদের ফাঁসিতে লটকানো হল আন্টাগড়ের ময়দানে। একদিকে ইংরেজ প্রভুদের চোখে খাজা আবদুল গনির কদর বেড়ে গেল। খাজা আবদুল গনি বললেন নবাব। ঢাকার নবাবরা কিছু-কিছু ভালো কাজ করেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁদের সেসব কাজের আলো কি কোনোদিন ঢাকতে পারবে নবাব আবদুল গনির সেই কুকীর্তির কালিমাকে?

ঢাকার খাস বাসিন্দাদের অনেকেই 'কুট্টি' বলে উপহাস করে, কেমন যেন ঘৃণার চোখে দেখে। তারা লেখাপড়া শেখেনি, মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এর কারণ কি কেউ খতিয়ে দেখেছেন কোনোদিন? ঢাকার নবাবরা কি দায়ী নন ওদের এই অবস্থার জন্যে? দিনের পর দিন ঢাকার নবাবরা পোষণ করেছেন ওদের; কিন্তু শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেননি ওদের জীবনে। হয়তো ভয় পেয়েছেন এ ভেবে : শিক্ষা পেলে যদি বিগড়ে যায় ওরা, যদি মানতে না চায় তাঁদের নবাবি।

## ॥ পনেরো ॥

কোনোদিন ভুলব না উনিশশো পঁয়তাল্লিশের সেই বিকেলের কথা। ঘুম-ভাঙা চোখে দেখলাম একফালি রোদ এসে পড়েছে আমার ঘরে। যেন রূপকথার দেশ থেকে এসেছে এই রোদ, এত মধুর, এত রূপসি। সারা মন গুনগুনিয়ে উঠল রোদের সোনালি তারের সাড়া পেয়ে। রোদ থেকে চোখ সরে আসতেই দেখলাম, বিছানায় পড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। দ্বিতীয় খণ্ড। কুড়িয়ে নিলাম। ক্লাস নাইন-টেন-এ আমাদের পড়ানো হয়েছে 'গল্পগুচ্ছ'র দ্বিতীয় খণ্ড। অনেক গল্পই পড়া। চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখলাম, শুধু চোখ বুলিয়ে যাওয়ার জো নেই। ডুবে যেতে হল গল্পগুচ্ছের ভেতর। পুরোনো, প্রায়-ছেঁড়া বই একেবারে নতুন হয়ে দেখা দিল আমার কাছে। ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, বিনয়বাবু পড়িয়েছেন সুন্দরভাবে, তবু এত ভালো লাগেনি এর আগে। আমি যেন স্বর্গের এমন এক বাগানে পৌঁছে গেলাম, যার প্রতিটি গাছ সুন্দর, প্রতিটি ফুল অনন্য।

'গল্পগুচ্ছ' আমার পড়ার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিল। মন বলে উঠল, "আরও বই চাই, রবীন্দ্রনাথের বই চাই, চাই আরও অনেক বই।" তাই বইয়ের খোঁজে আমার যাত্রা হল শুরু। একদিন পাটুয়াটুলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পাটুয়াটুলির শেষ সীমায় এসে চোখে ঝলসে উঠল একটা নাম —রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও রিডিংরুম। একটুও দেরি না করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম তাড়াতাড়ি। লাইব্রেরি-ঘরে পা রাখতেই বই বই গন্ধে মন ভরে উঠল। বুড়ো এক ভদ্রলোক লাইব্রেরিয়ান। নাম শ্রীগগনচন্দ্র আচার্য। সেদিনই লাইব্রেরির সদস্য হয়ে গেলাম। কত বই! যেদিকেই তাকাই, বই আর বই। নতুন আর

পুরোনো। আলমারিতে থরে থরে সাজানো। মন-কেড়ে-নেয়া রবীন্দ্র রচনাবলি। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' আর 'বসুমতীর' সেট। দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের বইয়ে নানা আলমারি ভরা। যত পার পড়ো। রিডিংরুমে বসে পড়ো, বাড়িতে নিয়ে পড়ো। প্রথম যেদিন 'রামমোহন রায়' লাইব্রেরির বই হাতে নিয়ে বাড়ি এলাম, সেদিন রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের মজা পেয়েছিলাম। আমার শরীর-মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল একদিন। তারপর কতবার বই নিয়েছি গগনবাবুর হাত থেকে। গগনবাবু বহুকাল লাইব্রেরিয়ান পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৩ সালে একরাতে পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান তিনি।

১৮৭৩ সালে পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের গ্যালারিতে একটা ছোটো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সবার জন্যে প্রয়োজন ছিল রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলি। এই প্রয়োজনের খাতিরেই লাইব্রেরির সূচনা। ১৮৮১ সালে জনসাধারণও ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিটি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। ১৯০৯ সালে সমাজের গ্যালারি থেকে লাইব্রেরিটি সরিয়ে আনা হল নতুন একটি ঘরে। এ-ঘর তৈরি হয় ১৯৮০ সালে। ঘর তৈরির জন্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার রত্নমণি গুপ্ত দেন পাঁচ হাজার টাকা। ঢাকার নবাববাড়ি থেকে বেশকিছু টাকা পাওয়া যায়। আর টাকা দিয়েছিলেন জমিদার বৃপলাল দাস। আরও নানা জায়গা থেকে পাওয়া যায় কিছু টাকা। লাইব্রেরির নাম রাখা হল 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও রিডিংরুম'। গোড়ার দিকে লাইব্রেরিতে প্রায় পাঁচ হাজার বই ছিল, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজে। রামমোহন রায় লাইব্রেরিতেও এসেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কিছু বই উপহার দিয়েছিলেন লাইব্রেরিতে। একসময় রামমোহন রায় লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসতেন 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোহাতার হোসেন, রায়সাহেব সত্যেন্দ্র ভদ্র, ডক্টর হেরম্বকুমার মৈত্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড: মদনমোহন ঘোষ ও কবি অজিত দত্ত।

ঢাকার আরেকটি পুরোনো গ্রন্থাগার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ঢাকায় আসার ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই ১৮৮০ সালে ২৫ শে মে নর্থব্রুক হল ও ১৮৮২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি এই হলে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গড়ে তোলা হয় লাইব্রেরিটি। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় পাঁচ হাজার টাকা, ত্রিপুরার মহারাজা এক হাজার টাকা, বালিয়াটির বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় এক হাজার টাকা, মহারানি স্বর্ণময়ী সাতশো টাকা দেন। এ ছাড়া আরও অনেকে টাকা দিয়েছিলেন নর্থব্রুক হল লাইব্রেরির জন্য। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ঢাকার বিবরণ' বইয়ে লিখেছেন, "ঢাকার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি।" বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার কিন্তু 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি" সম্পর্কে একেবারেই নীরব। অথচ রামমোহন রায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে। তা হলে কি ব্রাহ্মদের লাইব্রেরি বলেই 'ঢাকার বিবরণ'-এ লেখক এ-সম্পর্কে নীরব থেকে

গেছেন? 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি'র কাছে আমি ঋণী। এই লাইব্রেরি আমার পক্ষে হয়ে উঠেছিল এক রত্নদ্বীপ। আমি ঘুরে বেড়িয়েছি সেই দ্বীপের আনাচে-কানাচে। এই ঘুরে বেড়ানোর আনন্দেই বেশি করে ভালোবেসেছি আমার বাংলা ভাষাকে, ভালোবেসেছি সাহিত্যকে। নিজে কোনোদিন লিখব, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমি আমার বোনকে হারাই। দু'বছরের ছোট্ট মেয়ে নেহার। তখনও কথা বলতে শেখেনি। টুক টুক করে তাকাত, কোলে আসার জন্যে মেলে দিত দু'হাত। কোলে নিলেই খুশি। বড়ো ভালো লাগত ওকে। একদিন ইশকুল থেকে এসে দেখি সে নেই। নেহারের চঞ্চল দুটো চোখ একবারে নিথর হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। বড়ো ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন। নেহারের মৃত্যুর দু'-তিনদিন পর কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। কলম সাদা কাগজের বুকে ঝরিয়ে দিল আমার বোন-হারানোর ব্যথা। সেই গদ্যরচনাটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্ন মুকুল' কবিতার প্রভাব। লেখাটি শেষ হওয়ার পর কেমন একটা মুক্তি পেলাম। যেন নেহারকে কথা দিয়েছিলাম, এ-লেখা আমি লিখবই। তাই কথা রাখতে পেরে আমার মন বনের পাখির মতোই মুক্ত হল আবার।

আমি সত্যি সত্যি লেখা শুরু করি অনেক পরে। তবে বরাবরই বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের প্রতি একটা গভীর ভালোবাসা বোধ করেছি। মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা।

অনেক কথাই বলা হল। অনেক কথাই শোনানো হল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমিকে। আমার কথা ফুরোলে চেয়ে দেখি, দৃষ্টির সামনে গাছ নেই, গাছের ডালে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি নেই। সব খালি, সব ফাঁকা। তবে এতক্ষণ কাদের শোনালাম ঢাকা শহরের পাঁচালি? এ কি নিজের মনের সঙ্গে কথা বলা? হয়তো তা-ই। আর এই তো আবার আমি ঢাকা শহরের মুখোমুখি, যে-শহর আমার শহর, আমার স্মৃতির শহর।

# চিঠিপত্র



॥ ১ ॥

কায়সুল হক-কে

ইউনিভার্সেল প্রেস
৩০, আসেক লেন
ঢাকা-১
২৭-১২-৫২

প্রিয়বরেষু,

পৃথিবী একটা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো রোদ পোহাচ্ছে, আমার দরজার পেছনে রয়েছে যে বেল গাছ, তার মগডালে বসে আছে একটা ধূসর পাখি, সে অত্যন্ত একঘেঁয়ে সুরে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, আর বারবার এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে পৃথিবীতে কবিতার মৃত্যু নেই। হ্যাঁ মনে যখন এ রকম একটা অনুভূতি জলের আঁকাবাঁকা নির্জন সুরের মতো গান হয়ে কথা বলছে তখনই প্রায় আমার অজান্তেই তোমাকে লেখার জন্যে ঝর্ণা কলমটা দুআঙুলের ফাঁকে আস্তে আস্তে এঁটে নিলুম। ক-থাটায় তুমি হয়তো কবিত্বের ঘ্রাণ খুঁজে পাবে। কিন্তু এ-যে একেবারে সত্য —নগ্ন বাস্তব—এতে অন্ততঃ আমি কোনো সন্দেশ প্রকাশ করবো না। আর যখন কিনা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার মতো মন্তব্য আমাদের পূর্বপুরুষের ঝুলিতে রয়ে গেছে অর্থাৎ কখনো সখনো Facts are stranger than fiction.

যাকগে, অনেকদিন ধরে তোমার খবর কিংবা চিঠি কিছুই না পেয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। আগে তো রীতিমতো চিঠি লিখতে তুমি। তবে এরি মধ্যেই কি বলার সবকিছু ফুরিয়ে গেলো, নাকি পরিচিতির গাঢ়তা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হলো। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিনে। কথাগুলোতে অভিমানের মতো কিছু শোনালো কি? হয়তো এতে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান রয়ে গেছে, তুমি কিছু মনে করো না। তোমার অসুখের খবর আমার কাছে কি রকম মনে হয়েছে তা হয়তো তুমি কিছুটা আঁচ করতে পারবে। শরীরের দিকে নজর না রাখলে কিছুই করতে পারবে না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। পড়াশুনা করছো তো রীতিমতো?

কবিতায় আমার 'রূপালী স্নান' কবিতাটি পাঠিয়েছিলুম। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু উত্তরে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন আমাকে, চিঠিটা হুবহু তুলে দিচ্ছি তোমাদেব জন্যে :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'রূপালী স্নান' পেয়ে খুশি হয়েছি, কবিতাটি ভালো লাগল আমার। পৌষ সংখ্যা ছাপা শুরু হয়ে গেছে—জানি না এখন তার জায়গা হবে কিনা—যাইহোক, আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাতে সম্ভব হলে এ সংখ্যাতেই যায়। য়ুনোস্কোর একটি কর্মসূত্রে জড়িয়ে পড়ে তিনমাসের জন্যে দিল্লিতে এসেছি, এরপর তিনমাস কাটাতে হবে মহীশূরে। আশা করি তোমাদের কুশল। আমার স্নেহ সম্ভাষণ গ্রহণ করো।

বুদ্ধদেব বসু

চিঠিটা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, বুঝতেই পারছো। কেননা কবিতা দিয়ে বুদ্ধদেবকে খুশি করানোটা খুব চারটিখানি কথা নয়। তুমি আজকাল একেবারেই লিখছো না জেনে খুবই দুঃখিত হয়েছি, লেখার জন্য প্রচুর সাধনা করতে হয়, তা তো জানোই। এ বয়সে এতো কম লিখলে চলবে কি?

পূর্বাশার খবর কিছু বলতে পারো? সঞ্জয় বাবুকে আমার কথা জানিও। তিনি যেন চিঠি লেখেন আমাকে। আমি ভালোই আছি, জাগতিক অর্থে ভালো নেই। পূর্বাশা কি রীতিমতো বেরুচ্ছে? খুব শীগগীরই উত্তর দিও। প্রতীক্ষা করছি।

ইতি

তোমার স্নেহের শামসুর রাহমান

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** আমার কবিতার বই বের করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। নাম দিলাম : 'রূপালী স্নান'। নামটা কেমন লাগলো তোমার জানাবে নিশ্চয়।

॥ ২ ॥

ইউনিভার্সেল প্রেস
৩০, আসেক লেন
ঢাকা-১
আশ্বিন, ১৩৬০

প্রিয়বরেষু,

আকাশভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না; চাঁদের নরম রূপালী জল। চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। বারান্দায় গিয়ে কিংবা ধবধবে বিছানায় শুয়ে, এমন রাতে আশ্চর্য ফুলের গন্ধ সত্তায় মাখিয়ে নিতে ভালো লাগে। কিন্তু আমার জীবনে ফুল ভয়াবহভাবে অনুপস্থিত। কালেভদ্রে দু'একটি ফুল চোখে পড়ে। আমাদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটা (লক্ষ করেছো নিশ্চয়) একটা বাগান হলে কি ভালো হতো না? হয়নি। অত্যন্ত সচেতন ভাবেই হয়নি। হয়নি এ জন্যে যে, বাড়ির কেউ ফুলকে কোনোদিনই অপরিহার্য কিছু বলে ভাবেনি। ভাবতে চেষ্টা করেনি। তাই আজকের এমন একটা রাত ফুলহীনতায় কাটাতে হচ্ছে। ফুলের প্রতি আমার এ পক্ষপাতকে (মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছি) অনেকেই হয়তো ভালো চোখে দেখবেন না। তাঁরা বলবেন, তাঁদের মন্তব্যগুলো প্রায়ই খুব চকচকে ঝকঝকে; বলবেন নাকটাকে বেশ কিছু উঁচিয়ে; না, লোকটা দেখছি বড্ড সেকেলে। রীতিমতো রোমান্টিক। আশ্চর্য, রোমান্টিক কথাটাকে এঁরা আজকাল দিব্যি গালি হিসেবেই চালিয়ে দিতে পারছেন। যেন রোমান্টিক কথাটা কালো জামের মতোই অত্যন্ত সস্তা কোনো বস্তু। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওরা আমাকে আখ্যা দেবন, রোমান্টিক, প্রতিক্রিয়াশীল। বলে বলে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত যেন ওদের স্বস্তি নেই। ওদের যুক্তিগুলো এত খেলো এবং খবুরে কাগুজে যে রীতিমতো হাসি পায় আমার।

রাত্রিকে ভালোবাসি। কেননা, রাত্রি রহস্যঘন, নীল ফুলের মতো আশ্চর্য নরম। রাত্রির স্পর্শে আমার মন জানালা খুলে দেয় অন্ধকারের, জ্যোৎস্নার সৌরভ নেয়ার জন্যে, আবরণ খুলে নগ্ন হয়ে উঠে আমার মন দেবশিশুর মতো। দিনের প্রখরতায় চোখ আমার ঝলসে যায়, রক্তজবার মতো অসহ্য লাল হয়ে পড়ে আমার মন, অতটা তীব্র ধূসবতা আমার ভালো লাগে না। তাই, রাত্রির কাছে আমি সহজ হয়ে আসি, কেমন যেন প্রসন্ন আত্মীয় মনে হয় রাত্রি। রাত্রির শরীর আদিম অন্ধকারের মতো বলেই হয়তো আমার এত ভালো লাগে ওর স্পর্শ, রীতিমতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি নিয়ে আমি রাত্রিকে ভালোবাসি। আমার আর রাত্রির মধ্যে সম্বন্ধের সূক্ষ্মতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে অমাবস্যার মখমলের মতো পুরু, নরম অন্ধকারে। দিনের মলিনতায় ক্লিন্ন হয়ে যখন আমি রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রে স্নান করি তখন নিঃসন্দেহে আমি পবিত্র, উর্বশীর শুভ্র মদির বুকের মতো পবিত্র। তখন আমার চোখে ঝরে পড়ে সুদূর কোনো স্বর্গের শিশির।

যাক্ নিজের ভালো-লাগা নিয়ে এত বেশি বিলাসিতা হয়তো একটু অশোভন তাই এখন জিজ্ঞেস করবো, তুমি কেমন আছো। পরীক্ষা কবে ইত্যাদি ধরনের খুঁটিনাটি প্রশ্ন।

তোমার চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছো যে আমি কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছি উত্তরোত্তর। কথাটা ভেবে দেখার মতো। অনেকের মুখেই এ অভিযোগ শুনতে হচ্ছে আজকাল। আমার স্তব্ধতাকে (সাময়িক) অনেকেই অনাত্মীয় মনে করে দুঃখিত হচ্ছেন মনে-মনে আর সে সঙ্গে আমাকেও দুঃখ দিচ্ছেন, আহত হচ্ছে আমার অনুভূতি। চুপ করে থাকাটা, দেখতে পাচ্ছি, সহজভাবে কেউ নিতে পারছেন না। যদি প্রশ্ন করো আমার এ স্তব্ধতার উৎস কোথায় তাহলে আমি নিজেও বোধ করি সদুত্তর দিতে পারবো না। শেকসপীয়র-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটিকে একটু বদলিয়ে বলতে পারি শুধু — **In sooth I know not why I am so silent** : হ্যাঁ, কারণটা আমার কাছেই অজ্ঞাত, আমার জীবনে অশুভ কিছু ছায়া ফেলছে বলেই হয়তো এই ভূমিকা। জানিনে শেষ দৃশ্যের পরিণতি কি? এখন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

আমার কবিতা নিয়ে একটি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে কবিতা চেয়ে পাঠিয়েছো, বর্তমানে আমার পক্ষে সেগুলো খুঁজে পেয়ে পাঠানো সম্ভব হবে না বলে মনে হচ্ছে। তোমার কাছে যা আছে তা দিয়েই আশা করছি, কাজ চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। কে আলোচনা করবেন জানালে খুশি হবো। সংকলনের জন্যে কবিতা খুব শীগগীরই দিতে হবে কি? সঠিক জানালে বুঝতে পারবো। সওগাতে হাসান আর কাজ করছে না, তাই 'সওগাত' তোমাকে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। 'শতাভিশা'র সমালোচনা যে সংখ্যায় বেরিয়েছিলো সে সংখ্যাটি হাতে এলেই তোমাকে পাঠাতে চেষ্টা করবো। কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যা আমি পেয়েছি। কোনো কবিতাই আমার ভালো লাগল না। রীতিমতো বিরক্তিকর মনে হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার অবস্থা যদি এই দাঁড়ায় তা হলে বলতেই হয়, আজ কবিতার বড়ো দুর্দিন। তবু আমি বিশ্বাসী, জানি, একদিন বাংলা কবিতা আবার মুক্তি খুঁজে পাবে। প্রবালদ্বীপ তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ কোনো শুভ্রভোরে জেগে উঠবে

নতুন চর—কবিতার ঐতিহ্যে সংযোজিত হবে নতুন অর্কেস্ট্রা। জানি আমাদের জীবনে আমরা সেই শুভ্রভোর দেখে যেতে পারবো কিনা। আশা রাখা ভালো।

এখন আমরা ক্রমেই কার্তিকের সীমায় এগিয়ে যাচ্ছি এ উক্তিটিকে কোনো প্রতীক মনে করো না। আমি সাধারণ ঋতু দলের কথাই বলছি। হঠাৎ একদিন অনুভব করবো (গায়ে শাল জড়িয়ে) আঃ! শীত এলো, কুয়াশা জড়ানো সেই অঘ্রাণ বিকেল। এই তো এসে গেলো। হ্যাঁ, তারই আভাস আজকের আকাশে —হাওয়ায়। এর সঙ্গে মঙ্গলের মতোই ঝরছে আশ্বিনের রোদ, মিষ্টি মিষ্টি সোনালি হলুদ। আবার নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে মানুষের ঘরে, ঝকঝকে আকাশে পায়রা আর চিলের ওড়াউড়ি, জানালা খুলে যাচ্ছে কোনো কুমারীর হাতের ছোঁয়ায়, আবার কোনো প্রেমিক তার প্রিয়াকে বলছে কানে কানে : ভালবাসি।

শামসুর রাহমান

॥ ৩ ॥

আবুল হোসেন-কে

ইউনিভার্সেল প্রেস
৩০, আসেক লেন
ঢাকা-১
৭-১২-৬৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া প্রয়োজন। অনেক আগেই আপনাকে একটি নয়, দুটি নয়, অনেকগুলো চিঠি লেখা উচিত ছিল। কিন্তু চিরকেলে আলসেমির জন্যে বরাবরই আমি কর্তব্যে অবহেলা করে এসেছি। আমার এই অভদ্রজনোচিত আচরণের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমার প্রতি আপনার স্নেহ অশেষ, এই ভরসায় সব রকম অপরাধ করেও নিজেকে অতটা অপরাধী মনে হয় না। আশা করি, আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। এ চিঠির উত্তর পেলেই মনে করবো যে আপনি আমার প্রতি বিরূপ নন।

ব্যাঙ্কক থেকে দেশে ফিরে এসে নানা ডামাডোলে কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো মন। নিজেকে কোনোমতে গোছানো গেলো না আর সবসময় একটা উদ্বেগ, একটা অস্থিরতা আমাকে ঘিরে থাকে—কোনো কিছু করতে ইচ্ছে হয় না, কোথাও যেতে মন চায় না। সেই যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার লিখেছিলেন 'বাঁচা—কেবল বাঁচা। মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে পশুর মতো বাঁচা'—আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। যাকগে, এসব মন খারাপ করে দেয়া কথা দিয়ে আপনার মন বিষিয়ে তুলতে চাইনে।

এখন একটা কাজের কথা বলি। আমরা আবার 'কবিকণ্ঠ' প্রকাশের উদ্যোগ করেছি। 'কবিকণ্ঠ' আপনার কবিতা থেকে বঞ্চিত থাকবে, এ ভাবনা আমার কাছে অসহ্য। তাই যদি

মেহেরবানী করে শীগগীর কয়েকটি কবিতা আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন, তাহলে খুব ভালো হয়। মনে পড়ছে, ব্যাঙ্ককে আপনি আমাকে একটি কবিতা পড়ে শুনিয়ে ছিলেন। নাম 'ব্যাঙ্ককে বৃষ্টি'। ঐ কবিতাটির সঙ্গে আরও দুতিনটি কবিতা পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই কবিতা জমে গেছে আপনার খাতায়। কবিতাগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া দরকার। কবিতা সম্পর্কে কোনো আলোচনা পাঠানো কি সম্ভব হবে।

আপনি হয়তো জানেন না যে, সৈয়দ আলী আহসান সাহেব এ মাসেই বাংলা একাডেমি ছেড়ে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছেন। ঢাকায় বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। আপনার নামও উঠেছে। এ ব্যাপারে আপনার কানে কিছু এসেছে কি? আপনি এলে তো খুবই ভালো হয়। অন্তত আমরা যারা আপনার একান্ত অনুরাগী তাদের পক্ষে এইটে অত্যন্ত সুখকর। আরেকটি কথা শীগগীরই আমার তৃতীয় কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। চট্টগ্রামের বইঘর প্রকাশ করছে। বইয়ের নাম রেখেছি 'বিধ্বস্ত নীলিমা'। নামটি আপনার পছন্দ হলো কিনা জানালে খুশি হবো।

গত কয়েক মাস ধরে শরীরের উপর ধকল যাচ্ছে। আপনি, আশা করি, সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ভাবী কেমন আছেন? ওঁকে আমার আদাব বলবেন। বাচ্চারা কেমন? আর মঞ্জু? আপনাদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। আপনি হয়তো বলবেন, মনেই যদি পড়ে তবে চিঠি লিখতে এ অনিচ্ছা কেন? নীরবতা মানেই নিস্পৃহতা নয়। আপনার চিঠি ও কবিতাবলির প্রতীক্ষায় আছি।

ইতি আপনার<br>
শামসুর রাহমান

॥ ৪ ॥

১০-২-'৮০

হে সুন্দরীতমা, হে সর্বস্ব আমার

গত রাত থেকে মন ভীষণ খারাপ। কিছুই ভালো লাগছে না। এমনকি আমার নিত্যসঙ্গী বই নিয়েও সময় কাটতে চাইছে না; আমার চারদিকে অজস্র বই, কিন্তু ওরা এখন আমার স্পর্শরহিত। একটা অভিমান আমাকে দখল করে রেখেছে সারাক্ষণ, আমার শরীরের দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে মরছে ক্ষুধিত পাষাণের কান্না। তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কিসের অভিমান? কেন এই অভিমান? এর কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই, তাই কোনো নালিশও নেই, শুধু এক বেদনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্লান্ত করে চলেছে আমাকে। এক দারুণ অস্থিরতা পেয়ে বসেছে আমাকে।

কাল সন্ধ্যেবেলা একটা সন্দুর ঘণ্টা উপহার পেয়েছিলাম সৌভাগ্যের কাছ থেকে। আমি বসেছিলাম ঘরে, চুপচাপ, তোমারই প্রতীক্ষায়। অনেকক্ষণ ধরে তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। আমার বারবার মনে পড়ছিলো বাহাদুর শাহ জাফরের সেই আশ্চর্য বেদনার্ত, ব্যাকুল দুটি পংক্তি—বিধাতার কাছ থেকে চারদিন পরমায়ু চেয়ে এনেছিলাম; দু'দিন

কেটে গেলো আকাঙ্ক্ষায় আর দু'দিন অপেক্ষায়। যখন পংক্তিদুটো ক্রমাগত হানা দিচ্ছিলো আমার স্মৃতিলোকে, ঠিক তক্ষুনি তুমি এলে সম্রাজ্ঞীর মতো এক রহস্যময় সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য নিয়ে। তোমাকে দেখে আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিলো, গান গেয়ে উঠেছিলো আমার সমস্ত রক্তকণিকা; আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে দেখলাম তোমাকে আর সেই মুহূর্তে নিজেকে মনে হলো সৌভাগ্যবান। এক ঘণ্টার জন্যে তোমাকে চেয়েছিলাম কাছে, ভিড়াক্রান্ত সেই ফ্ল্যাটে; আমি দু'চোখ ভরে পান করেছিলাম তোমার সৌন্দর্য। তৃষ্ণার্ত আমি আঁজলা ভরে তুলে নিচ্ছিলাম এক ঝরনাধরা। অসহ্য সুন্দর তোমার দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না আর সেই মুহূর্তে মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের উক্তি—'অতল হ্রদের মতো তোমার দুই চোখ, যেখানে আমি ডুবে যেতে চাই।' তুমি কি তোমার চোখের গভীরে দেখেছিলে আমার নিমজ্জন? তুমি কি শুনতে পেরেছিলে আমার রক্তের গান? যখন তোমার মদির চুম্বনে সমাচ্ছন্ন আমি, তোমার আলিঙ্গানে ত্রিকালবিস্মৃত, তখন তুমি কি অনুভব করেছিলে আমার আত্মার প্রার্থনা?

ক্ষণিকের জন্যে আমরা ভুলে থাকতে পেরেছিলাম এই পৃথিবীর কুশ্রীতা, নিষ্ঠুরতা ও সংকীর্ণতাকে। ভুলে থাকতে পেরেছিলাম যে, আমাদের দু'জনের মাথার ওপর ক্রমাগত ঝুলছে এক সামাজিক খড়্গ। আমাদের মধুর চুম্বনে মুছে গিয়েছিলো সমাজসংস্কার, লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো চতুর্দিকের হৈ-হল্লা, হরতালের দুপুরের তাণ্ডব, আমাদের সত্তা থেকে ঝরে পড়েছিলো অনেকগুলো বছর, আমরা সম্পূর্ণ নতুন হয়ে গিয়েছিলাম এক যাদুবলে। তোমার মধ্যে যে ভালোবাসা রক্ত গোলাপের মতো উন্মীলিত হচ্ছে তার ঘ্রাণে আমি ফিরে পেয়েছি দ্বিতীয় যৌবন। তোমার স্পর্শের বিদ্যুতে বিদ্যুতে উদ্ভাসিত আমার সত্তার আকাশ।

এক ঘন্টা ধরে যে-সুর লতিয়ে উঠেছিলো আমাদের ঘিরে সেই ঘরে, তা কেটে গেলো হঠাৎ, যখন তোমাকে যেতে হলো ড্রইংরুমে। একটা আশ্চর্য স্বপ্ন গুড়িয়ে গেলো নিমেষে। আমি অসহায়ের মতো চেয়ে রইলাম তোমার চলে যাওয়ার দিকে। আমি বাক্‌শক্তি রহিত মানুষের মতো বসে রইলাম। তখন আমার বুকের ভেতর বজ্রের আগুনে পুড়ে-যাওয়া পাখির নীড়। কেউ জানলো না, কী গভীর বেদনা আমি নিজের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম তখন। তুমি বলতে পারো, আমি বাড়াবাড়ি করছি। হয়তো; তুমি যখন চলে যাও, তখন আমার বুকের ভেতর এক সীমাহীন শূন্যতা গুমরে ওঠে, নিজেকে আহত ঈগলের মতো মনে হয় তখন, ভীষণ একলা আর নিরুপায়। বিশেষ করে কাল সন্ধ্যায় যখন তুমি চলে গেলে, তখন কী যে হলো আমার, মনে হলো কবরের দীর্ঘ ঘাস আমাকে গ্রাস করতে আসছে, আমার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছিলো মাটি। আমি তোমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম, 'না, যেও না'।

সব সময় মনে পড়ছে তোমাকে, আমার স্বপ্নে-জাগরণে সারাক্ষণ জেগে থাকে তোমার মুখ। আমি সেই তোমাকে ভাবি, যে-তুমি সকাল বেলা খুশি মনে শিউলি ফুল কুড়িয়ে

বেড়াতে, তোমার রূপে নিসর্গ হয়ে উঠতো আরো বেশি সুন্দর আর মধুর। দু'মাস হলো তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়—যদিও এর আগে তোমাকে আমি দেখেছি, তোমার সৌন্দর্য পান করেছি দূর থেকে, কথাও বলেছি দু'বার কিন্তু আমার মনে হয় আমি তোমাকে বহু যুগযুগান্ত ধরে চিনি। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের দু'জনের দেখা হয়েছে এই পৃথিবীর কোথাও। একজন উর্দু কবি বলেছেন, আমি হয়তো আগেও তোমাকে কোথাও দেখে থাকবো। আগন্তুক তুমি, তবু কেন জানি না তোমাকে পর লাগছেনা, খুব আপন মনে হচ্ছে। মনের মিষ্টি ভুলের মতো নিজস্ব মনে হচ্ছে তোমাকে। হায়, এই ফুলের মতো চেহারা, এই ঘন চুলের রাশি। তোমাকে আমার নিজের কবিতার চেয়েও অনেক সুন্দর লাগছে। তোমাকে দেখে কোনো এক রাতের কথা মনে পড়ে যায়। তোমার রূপের শীতলতায় আমার বুক জুড়িয়ে গিয়েছিলো। বৃষ্টিভরা রাত তোমার সান্নিধ্যের উষ্ণতায় উচ্ছ্বল হয়েছিলো। আমার চোখের উপর নিষ্পলক যে-চোখ তাকিয়ে থাকতো, তুমি আমার সেই স্বপ্নেরই পরিতো? আগেকার মতো এবার আবার হারিয়ে যাবে না তো? চিরস্থায়ী আনন্দের মূর্তি হয়ে এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে তো?

জানি না, কেন এমন অনুভূতির জন্ম হয় আমার মনে। বিশ্বাস করো যুগ যুগ ধরে যেন আমি তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম; তোমাকে পাওয়ার মধ্যেই যেন এক তৃষ্ণা আমাকে কাতর করে চলেছিলো বছরের পর বছর। প্রথম সেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, সেই অনেক বছর আগে, তখনই আমার মধ্যে জেগে উঠেছিলো সেই অপরূপ তৃষ্ণা—যাকে নিজের কাছে স্বীকার করে নেয়ার মতো সাহসও সেদিন আমি সঞ্চয় করতে পারিনি। বুঝি তাই তোমাকে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, অনেকটা আমার নিজেরই অজান্তে, আমার অবচেতনলোকে গুপ্তধনের মতো। যখনই তোমাকে দেখেছি, চমকে উঠেছি আমি—তুমি যে আমার বহু যুগের ওপারে দাঁড়িয়ে আছো, আমার চিরচেনা! তাই রবীন্দ্রনাথের একটি গান আমার মধ্যে তরঙ্গিত হয় বারংবার —

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে —
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমার চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানি না সে কাহারে চায়,
তেমনি কবে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

আমি যখন বলি, কী সুন্দর তুমি, তখন তুমি অবিশ্বাসী দৃষ্টি হানো আমার প্রতি; তুমি হয়তো মনে করো, আমি মিথ্যে বলছি। তুমি রূপসী, একথা তা নিজেই জানো; তবে কেন আমার কথার আন্তরিকতাকে আমল দিতে চাও না। আরেকজন উর্দু কবির কিছু পংক্তি তোমাকে শোনাই, মন দিয়ে শোনো —আমি চাঁদকে প্রশ্ন করলাম, বলোতো আকাশে

বা পৃথিবীতে আমার প্রিয়ার মতো চাঁদ আছে কি? চাঁদ জবাব দিলো, চাঁদনির কসম খেয়ে বলতে পারি—নেই, নেই, নেই। যে রূপ তুমি পেয়েছো মনে হচ্ছে খোদার সব রূপলাবণ্যের ঝোলা বুঝি চুরি হয়ে গিয়েছে। মীরের রচিত গজল বলবো তোমাকে? না কি বলবো ওরম খৈয়ামের কোনো রুবাই? কবিদের আমি প্রশ্ন করলাম, আমার দয়িতার মতো কবিতা আছে কোথাও? কবিদের কাছ থেকে জবাব এলো, কবিতার শপথ, নেই, নেই, নেই। তোমার চলার ছন্দ যেন ঢেউয়ের উচ্ছলতা, তোমার চোখ যেন সুরাবিপনির রানীর মদির নয়ন, তোমার ঠোঁট গোলাপের পাপড়ি আর তোমার চুল দেখে মনে হয় এ যেন চুল না, শত শত রহস্যময় রাত্রির কাহিনি। বাগানকে প্রশ্ন করলাম, আমার প্রিয়তমার মতো মনোমুগ্ধকর ফুল আছে কি কোথাও? বাগান বললো, প্রতিটি কলির কসম খেয়ে বলতে পারি—নেই, নেই, নেই।

না, তোমার মতো কেউ নেই কোথাও। তুমি তুলনাহীন; আমার চোখে তুমি সুন্দরীতমা, আমার উজ্জ্বল উদ্ধার। আমাকে অমৃতের স্বাদ দিয়েছো তুমি। ... কী-যে ভালো লাগে আস্তে আস্তে তোমার নাম উচ্চারণ করতে। তোমার নাম গান হয়ে বাজে আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, তোমার নাম শিউলি ফুলের মতো ঝরে আমার মনের মাটিতে, জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে পড়ে আমার মনের দিগন্তে। তুমি আমাকে ভালোবাসো, তুমি আমার—একথা ভাবতে পেরে আমি সুখী, উদ্বেলিত সর্বক্ষণ। তোমাকে ভালোবেসে যে সম্পদ আমি পেয়েছি তা কখনো পাননি কোনো রাজাধিরাজ। তোমার ভালোবাসার জন্য আমি হেলায় উপেক্ষা করতে পারি যে-কোনো পার্থিব ঐশ্বর্য। তুমি থাকো আমার পাশে, গানে গানে মুখর করে দাও আমার অস্তিত্ব, আমার জীবনের প্রতিটি দিনরাত্রি হোক তুমিময়। কথা দাও, তুমি আমার কাছ থেকে কখনো দূরে সরে যাবে না। যখন তুমি বলো, তুমি এ দেশ ছেড়ে অন্যদেশে চলে যাবে, তখন আমার সমগ্র সত্তা কেঁপে ওঠে ভয়ে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তুমিহীন এই শহরে আমি বাঁচবো কী নিয়ে? তুমিহীন ঢাকা আমার কাছে ধু ধু মরুভূমি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। তোমার উষ্ণ সান্নিধ্য ছাড়া আমি উজ্জীবিত হবো কী করে?

অন্য কিছুতেই তোমার বিকল্প নেই। অমি হাত বাড়ালেই যেন তোমার স্পর্শ পাই, মুখ বাড়ালেই যেন পাই তোমার নিশ্বাসের সুগন্ধ, ওষ্ঠ এগিয়ে দিলেই যেন পাই তোমার মধুর চুম্বন, কান পাতলেই যেন শুনতে পাই তোমার পদধ্বনি, দুপুর-উদাস করা তোমার গান।

শীগগীরই আমার চিঠির উত্তর চাই। ভালোবাসা। অনেক অনেক চুমো।

তোমার কবি

# সাক্ষাৎকার



## এসো, হাতে হাত রাখি পূর্বপুরুষের মৃত্তিকায়

**গৌতম :** বাংলাদেশে বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে বুদ্ধিজীবীরা কী ভূমিকা পালন করছেন?

**শামসুর :** যাঁরাই অন্যরকম চিন্তা করেন, প্রগতির কথা বলেন মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য তাঁরাই, আমার উপরে তো আক্রমণ হয়েইছে। ডঃ আমেদ শরীফের উপর আক্রমণ হয়েছে, কবীর চৌধুরীর উপরে আক্রমণ হয়েছে। সিলেট শহরে আমাকে যেতেই দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় প্রথম, একজন কবির বিরুদ্ধে হরতাল হয়েছে সারাদিন ব্যাপী। সকাল সন্ধে হরতাল হয়েছে, যাতে আমি সিলেট যেতে না পারি, কিছু বলতে না পারি। রংপুরে আমার একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন ওখানকার তরুণরা। মৌলবাদীরা এটাও বানচাল করার চেস্টা করেছে। মৌলবাদীদের অভিসন্ধিকে রংপুরের তরুণরা বাস্তবে পরিণত হতে দেয়নি। অসাধারণ সাহসের সঙ্গে তারা মৌলবাদীদের প্রতিহত করেছে। এমন কি রংপুরে আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন মৌলবাদীরা আক্রমণ করেছে, মঞ্চে আসার চেস্টা করেছে। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে আয়োজক তরুণেরা মৌলবাদীদের হটিয়ে দিয়েছে। এতে দুই দলই জখম হয়েছে। কিন্তু মৌলবাদীরা অনেক চেস্টা করেও অনুষ্ঠান পণ্ড করতে পারেনি। আমার যেখানেই যাওয়ার কথা হয়, সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা হয়, মৌলবাদীরা সেখানেই গোলমাল করেছে। আমাকে 'মুর্তাজ' বলেছে। ডঃ আমেদ শরীফকেও আগে বলছে, কবীর চৌধুরীকেও মুর্তাজ বলেছে, আমেদ শরীফের বাসায় বোমা ফেলেছে।

**গৌতম :** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লিগ আর জামাত যে একযোগে আন্দোলন করেছে, এতে কি জামাতকে একটা আলাদা রকমের সামাজিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি?

**শামসুর :** আমি মনে করি এতে জামাতকে একধরনের সামাজিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে, আমরা পছন্দ করি আর না করি জামাত একটা শক্তি। আমি অবশ্য নিজে ব্যক্তিগতভাবে জামাতকে কোনওরকম লেজিটিমেসি দেওয়া পছন্দ করি না। আমার মতো আরও অনেকেই এটা মনে করেন। তবে এইভাবে জামাতকে আইসোলেটিভ করে শেখ হাসিনা যথেস্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছেন বলে অনেক বুদ্ধিজীবী বিশ্বাস করলেও আমি তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করি না, ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক।

**গৌতম :** মুক্তবুদ্ধির চিন্তা যাঁরা করেন, তাঁদের প্রতি খালেদা সরকার কী ধরনের মনোভাব পোষণ করেন? তাঁদের প্রতি সরকারের আচরণ কী রকম?

**শামসুর :** মুক্তবুদ্ধির চিন্তা যাঁরা করেন, এই সকার তাঁদের পছন্দ করে না। মুক্তবুদ্ধির

মানুষদের প্রতি এই সরকারের আচরণ বিমাতাসুলভ। দেশবরেণ্য কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ আমেদ শরীফ, ডঃ আনিসুজ্জামান, কবীর চৌধুরী প্রমুখ মানুষের প্রতি এই সরকার বিন্দুমাত্র সৌজন্যবোধেরও পরিচয় দেন না। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের মতো মানুষকে দেশদ্রোহী অপরাদ মাথায় নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে হল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে কোনও মুক্তিমতি ব্যক্তি কিংবা লেখকের জীবন আর নিরাপদ নয়। বাংলাদেশ মৌলবাদী দেশ নয়, অথচ মৌলবাদীদের দাপট এখানে বেড়েই চলেছে। জনসাধারণ মৌলবাদীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জনসাধারণ এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করবেই। কোনো কোনো জায়গায় ইতিমধ্যেই জনগণ ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই ঐক্য আরও মজবুত হোক। প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। হয়তো তারও কোনো অভাব হবে না। আমার এই আশাবাদের সদুত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারে।

**গৌতম** : মৌলবাদীদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বি এন পির সম্পর্ক কীরকম?

**শামসুর** : বি এন পির সঙ্গে মৌলবাদীদের সম্পর্ক আগে যতটা ভালো ছিল এই মুহূর্তে তা নেই, তবে ভবিষ্যতে আবার বি এন পির সঙ্গে মৌলবাদীদের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে কি না জানি না কারণ, রাজনীতিতে তো আর শেষ কথা বলে কিছু নেই। তবে মৌলবাদীদের সম্পর্কে আমি বলি,

তোমরা যারা পরের খেয়ে
নিজের ঘরের জৌলুস বাড়াও,
তোমরা যারা কখনো গা থেকে ঝরাওনি
শ্রমের স্বেদ, তোমরা যারা নারীদের অষ্টপ্রহর
দম আটকানো চার দেয়ালের ঘেরে
বন্দি রাখার বিধান দাও,
যাতে রোদ্র জ্যোৎস্না চুমো খেতে না পারে
ওদের শরীরে, তোমরা যারা কাউকে
ভাত কাপড় দিতে পারো না, তারাই
অন্যের রুজিতে নিষেধাজ্ঞা সেঁটে দাও

তোমরা যখন হেঁটে যাও, তোমাদের পায়ের নিচে ডুকরে
ওঠে মাটি,
তোমরা যখন কথা বলো ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে
মোড়লদের সঙ্গে, সতেজ লতাগুল্মের মুখ শুকিয়ে যায়,
বুক কাঁপে শস্যখেতের,
তোমরা যারা একটি সুন্দর বাক্যও উচ্চারণ
করতে পারো না, তুলির আঁচড়ে
ফোটাতে পারো না প্রকৃতির রূপ,
তোমরাই ফতোয়া দাও আলো ঝলোমলো

কবিতার বিরুদ্ধে, চিত্রের বিরুদ্ধে।

যারা, গলিত অন্ধ সমাজকে বদলে ফেলার কাজে
মগজ খাটায়, হাত লাগায়, তারা তোমাদের পথের কাঁটা,
যাদের সত্তায় শস্যরাজির হাসি ছড়ানো,
তোমাদের ফতোয়া ফুঁসে ওঠে তাদের বিরুদ্ধে,

পারলে তোমরা একঘরে করতে
গোলাপ, চামেলী আর কৃষ্ণচূড়াকে,
পারলে তোমরা পাহাড় চূড়া, নদীর ঢেউ
পাখির বাসা, জোনাকি আর
দুটি হৃদয়ের মিলনের রঙিন সাঁকোর বিরুদ্ধে
লটকে দিতে হিসহিসে ফতোয়া।

আসলে বি এন পি সরকারের আশকারা এবং উদার প্রশ্রয় পেয়ে মৌলবাদীরা আজ যা ইচ্ছা করছে, যা ইচ্ছা বলছে। '৯৪ সালের ২৯ জুলাই ঢাকার মানিক মিঁয়া অ্যাভিনিউতে মৌলবাদীদের সমাবেশে বায়তুল মোকাররমের খতিব ওয়াবদুল হক বলেছিলেন, কিছু সংখ্যক শিক্ষিত গদ্দার '৭১ এ পাকিস্তান ভেঙেছে। অর্থাৎ শিক্ষিত গদ্দাররাই বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে পাকিস্তানপন্থী ওয়াবদুল হকেরা আরাম আয়েসে বসবাস করছেন এবং সমাজে অন্ধকার ছড়াচ্ছেন। ওই সমাবেশে চরমোনাইয়ের পীর-ও একইরকম বক্তৃতা করেছিলেন। বায়তুল মোকাররমের খতিব যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে দেশদ্রোহিতার সামিল। সরকারের উচিত ছিল এ জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা। কিন্তু সরকার তা করেনি। অর্থাৎ সরকারের সবাই নিজেদের গদ্দার হিসাবে মেনে নিয়েছেন এবার চরমোনাই-এর পীর কথিত জারজের ধৃষ্টতাপূর্ণ অপবাদও মাথা পেতে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। খতিব ও পীরের বিরুদ্ধে কয়েকজন দেশপ্রেমিক দৃঢ়চেতা ব্যক্তি মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলা দায়ের করার পর ওয়াবদুল হক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, তিনি সমাবেশে সে ধরনের কোনও কথা বলেননি। মামলা দায়ের করার পর খতিব সাহেবের হুঁশ হয়েছে।

'৯২ সালে গণ আন্দোলনের সময় নিরাপত্তা দিতে খালেদা জিয়ার সরকার জামাতের আমির, কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আশ্রয় দেয়। এই সময়ে 'আদম সৃষ্টির হকিকত' নামে গোলাম আযম একটি বই লেখেন। সেই বইতে বলা হয়েছে, সুরা আলবাকারার প্রথম চারটি রুকু গোটা কোরানের শুরুতেই দেওয়া খুব জরুরি ছিল। তিনি বলেছেন, কোরানের সুরাগুলো যে ক্রমানুসারে নাজিল হয়েছে, সে ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। কুখ্যাত গোলাম আযমের এই উক্তিতে কি পবিত্র কোরান সংশোধনের কথাই বলা হচ্ছে না? মুসলিম জগতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস হল, পবিত্র কোরান কখনও সংশোধন করা যায় না। কুখ্যাত গোলাম আযম কেবলমাত্র বাংলাদেশেরই নয়; বিশ্বের সকল মুসলমানের ধর্মানুভূতিতে ঘা দিয়েছেন। এখন মৌলবাদীদের ইসলামি জোশ কোথায়

গেল? বায়তুল মোকাররমের খাতব ওয়াবদুল হক সাহেব এখন খামোশ কেন? কেন রা কাড়ছেন না তিনি? ইসলামি সংগ্রাম পরিষদের হোতারা চুপচাপ কেন? কেন তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেন না গোলাম আযমের ফাঁসির দাবিতে? কেন বের করেননি বিক্ষোভ মিছিল? কেন ইসলামের রক্ষকেরা করলেন না গোলাম আযমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ? পবিত্র কোরান শরিফ সম্পর্কে সংশোধনীর কথা যদি কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম বলেন, তাহলে বুঝি পবিত্র কোরান শরিফের অবমাননা হয় না? ইসলামের হেপাজতকারীগণ কী বলেন?

**গৌতম :** বাংলাদেশের মানুষের অর্জিত অধিকার হল একুশ। এই অর্জিত অধিকার রক্ষার্থে আজও বাংলাদেশের মানুষ কতটা সজাগ, মাতৃভাষার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অবস্থান বিষয়ে আপনি কী ভাবেন?

**শামসুর :** আমরা আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার জন্যে লড়েছি। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে আমাদের তরুণেরা প্রাণ দিয়েছেন। এই ত্যাগ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা করেননি। বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেখানকার বাঙালিরা উল্লেখযোগ্য কোনও সংগ্রাম করেননি। সাহিত্যিকরা লিখছেন, এই পর্যন্তই। কিন্তু আমরা যে সংগ্রাম করেছি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি তা করেননি। আমাদের কাছে একুশের তাৎপর্য অন্যরকম। আমাদের সংগ্রামের একটা উত্তরাধিকার আছে। এবং এই উত্তরাধিকার অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই সংগ্রামের বিস্তারও আছে। কারণ, আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, আমাদের যে গণআন্দোলন হয়েছে সে সবেরই ভিত্তিভূমি হল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। যাকে আমরা অমর একুশে বলে রোপণ করেছি আমাদের চৈতন্যে, আমাদের সত্তায়। এটার সঙ্গে এখনকার বাঙালির কাজের কোনও তুলনা চলে না। তাই পশ্চিম বাংলার বাঙালির মাতৃভাষা সম্পর্কে অমনোযোগ আমাকে পীড়িত করলেও এ নিয়ে আমার কী করার থাকতে পারে? অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো কিছু মানুষ বাংলা ভাষার জন্যে কাজ করছেন। তাঁর উদ্যোগ সম্পর্কে আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু একুশ সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের মানুষের বিষয়। পাকিস্তান আমলে আমরা কেবলমাত্র মাতৃভাষার জন্যেই নয়, রবীন্দ্রনাথের জন্যেও সংগ্রাম করেছি। রবীন্দ্রনাথই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র কবি যাঁর জন্যে পথসভা হয়েছে। আমরা পথসভা করেছি, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চাকুরির ঝুঁকি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছি, আইয়ুব খাঁর মার্শাল ল'র মধ্যে। তাই একুশে পশ্চিমবঙ্গ কী করল না করল তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। একুশ আমার কাছে হল,

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়
মমতা নামের শ্রুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলি শৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদন মোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক, তুমি আর আমি?
অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতায় লীন,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম কলি সবই ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সঙ্কেতে।

**গৌতম :** বাংলাদেশের নাটকের ক্ষেত্রে একুশের উত্তরাধিকার একটা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখের কথা এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক— সেই ধারাটা কি বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় আজও আছে?

**শামসুর :** একুশ নিয়েই যে কেবল নাটক হচ্ছে তা নয়। তবে আমাদের নাটকে একুশের উত্তরাধিকার আছে এবং সেই ধারা এখন যথেষ্ট বেগমান। যদিও তোমাদের ওখানকার মতোই আমাদের এখানেও বিদেশী নাটক অবলম্বনে বাংলা নাটক তৈরি করার প্রবণতা একটু বেশি প্রকট। আজকাল বোধহয় আমাদের নাটকের উপর বিদেশী নাটকের ছায়া একটু বেশিই পড়ছে। সংখ্যায় খুব সামান্য হলেও মৌলিক নাটক কিন্তু আজও বাংলাদেশে সৃষ্টি হচ্ছে। এই দিক থেকে দুই বাংলার নাটকের চিত্রটা প্রায় একই বলতে পার। বিভিন্ন বিদেশী নাটকও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশে অভিনীত হচ্ছে। এই জিনিসটা কিন্তু খারাপ নয়। তবে আমার মনে হয়, মৌলিক নাটক রচনা তো করতেই হবে। কিন্তু কখনও কখনও একটা ভাল অনুবাদ মৌলিক রচনাকে এগিয়ে দেয়। যেমন, বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের অনুবাদ যখন বের হল, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে দুই বাংলার কবিদের উপরেই তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এই অনুবাদ কবিতার শব্দচয়ন এবং প্রকাশভঙ্গীতে অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিল। ভাল অনুবাদ অনেক সময় সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

**গৌতম :** মিডিয়ার প্রকোপে বাঙালি সংস্কৃতি কি সামগ্রিকভাবে একটা সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

**শামসুর :** যদি শেকড়ের দিকে আমার নজর থাকে, টান থাকে, তা হলে কোনও কিছুই আমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমার অন্তরে বাঙালি সংস্কৃতি যদি সত্যিই থাকে, বাঙালি সংস্কৃতির জন্যে আমার যদি মমতা থাকে তাহলে শত বিপদ আমি কাটিয়ে উঠব। শেকড়ের যেমন টান, শেকড়কে ধরেই গাছ বিকশিত হয়, গাছে ফুল, ফল হয়। আমার মধ্যে যদি বিকশিত হওয়ার উদ্যম, প্রেরণা এবং সঞ্চয় থাকে তাহলে কোনও কিছুই আমাকে নষ্ট করতে পারবে না।

**গৌতম :** আপনাদের এখানে সেই কাজটা কি হচ্ছে?

**শামসুর :** কিছু কিছু হচ্ছে, যেমন, আমাদের একুশের অনুষ্ঠান, পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান— এগুলো সব মানুষের মধ্যেই প্রভাব ফেলছে। কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়াতে লালন সাঁইর যে মেলা হয় সেগুলো বাঙালি সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। মানুষ আরও সচেতন হচ্ছে। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এসবে কাজ হচ্ছে অনেকটাই। আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। বাংলা অকাদেমিও কাজ করেছে। তরুণদের মধ্যেও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ, উদযোগ লক্ষ করা যায়। তবে কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতি নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না। মানুষের মনের সব জানালা খুলে রাখা দরকার। পাশ্চাত্যের সবই খারাপ তা তো নয়। পাশ্চাত্যের যা ভালো তা আমরা গ্রহণ করব, যা বর্জনীয় তা বর্জন করব। সব সময় আমাদের মধ্যে এই

আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমরা কিছু দিতে পারি। যেমন, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বাঙালিদের নন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মানুষের। পাশ্চাত্যের প্রায় সকলেই তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কালিদাস থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন গ্যেটে। ফার্সি কবি হাফিজ থেকেও প্রেরণা পেয়েছিলেন গ্যেটে।

**গৌতম :** চিরদিন স্বাধীনতাকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে আপনার দুটো বিখ্যাত কবিতা। এ দুটি কবিতা রচনার ইতিহাসটা একটু বলুন।

**শামসুর :** তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর তবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিলা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম,
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর,
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা– মাতার লাশের ওপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুত্থুরে এক বুড়ো
উদাস হাওয়ায় বসে আছেন— তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লা বাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরে।

স্বাধীনতা তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহ্‌রাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে
সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

’৭১ এর মার্চের শেষের দিকে আমার মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে চলে যাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে। মেঘনা নদীর পাড়ে সেই বাড়ি। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন আমার মনে হল কিছু লিখতে হবে। তখন ঠিক লেখার মতো মানসিক অবস্থাও ছিল না। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি, খাতা কলমও কিছু সঙ্গে নেই। আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কাগজ-পেন্সিল চেয়ে নিয়ে এই কবিতাটি লেখার কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে লিখলাম।

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলে বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা শোভিত স্লোগান মুখর ঝাঁঝালো মিছিল,
স্বাধীনতা তুমি

ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি,
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারে খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ,
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন,
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রং।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার,
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা,
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

**গৌতম :** সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?

**শামসুর :** আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। নেই মানে, জোরালোভাবে নেই। সাধারণ মানুষ অনেকটাই অসাম্প্রদায়িক। কিছু মতলববাজ,

তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই আছে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পটা তারাই ছড়ায়। রাজনীতির লোক না হয়েও মানুষ এই বিষবাষ্প ছড়াতে পারে। অনেক লোক যাদের মনে হয় অসাম্প্রদায়িক, একটু খোঁচা দিলেই পলেস্তরাটা খসে যায় এবং সাম্প্রদায়িকতা দাঁত, নখ বের করে বেরিয়ে আসে। আমার পিতা-মাতা দুজনেই ধার্মিক, আমার আব্বা মারা গেছেন। উনি ধার্মিক মানুষ ছিলেন। নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন। বাবার একজন হিন্দু ম্যানেজার ছিলেন। সময়টা ঠিক আমার মনে নেই, তবে আমি তখন সদ্য যৌবনে পা দিচ্ছি, সেই ম্যানেজার ভদ্রলোক এক মাস আমাদের বাসায় ছিলেন। সে সময়ে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। আব্বা আমাদের বলেছিলেন, উনি যে আমাদের এখানে আছেন তা তোমরা ছাড়া আর যদি কেউ জানেন, তাহলে ধরে নিতে হবে তোমাদের কাছ থেকেই জেনেছে। তা হলে তোমাদের আমি বাড়ি থেকে বের করে দেব। ঢুকতে পারবে না আমার বাড়িতে। যেবার গান্ধীজী নোয়াখালিতে গেছিলেন, সেইবার আমাদের গ্রামে খুব দাঙ্গা হয়। আব্বা তখন গ্রামেই ছিলেন। গ্রামের কৈবর্তদের তিনি একা একটি বন্দুক নিয়ে দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই চেতনাটাই জরুরি। আমার মাও ধার্মিক, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। আমি এভাবেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে শিখেছি, এই জিনিসটা আমি মনে করি, এখনও অনেক পরিবারের মধ্যেই আছে। কিছু মতলববাজ লোক, তারা আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে এবং আমাদের দেশে একটা ঘোঁট পাকায় সম্পত্তি দখলের জন্যে। লুট করে টাকা পয়সা পাওয়ার জন্যে, জমি দখল করার জন্যে, বাড়ি দখল করার জন্যে তারা এইসব কাজ করে। আমি লক্ষ করেছি, বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুদের একটা নীরব প্রস্থান চলছে। এটা অনেকেই খেয়াল করছেন না, কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তার কারণ হল নিরাপত্তাহীনতা। '৭৫-এ বঙ্গাবন্ধুর মৃত্যুর পরেই এটা হয়েছে। বঙ্গাবন্ধুর জীবিতাবস্থায় এ জিনিস কখনওই ছিলনা। বিশেষ করে এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করার পরে দেশত্যাগের ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। এই প্রবণতা এখনও কমছে না।

**গৌতম :** আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

**শামসুর :** তুমি আলোচনা শেষ করতে চাইলেও আমি একটা কবিতা বলে শেষ করব এবং কবিতাটির বিশেষ অর্থ বোঝার ভার পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

*সুজাতা।।* কতকাল অন্ধকার আমাদের শাসাবে, গৌতম?
বলো, আর কতকাল? কেবলি হোঁচট খাই, ভয়
পাই প্রতি পদক্ষেপে, দুরন্ত বইলে হাওয়া, ভাবি
এই বুঝি এলো তেড়ে মস্তানের দল, পথ খুঁজি,
চৌকাঠে কপাল ঠেকে, পায়ে কালো পাথরের ওপর।
পক্ষাঘাতগ্রস্ত যেন আমি, পারি না কোথাও ছুটে
যেতে, এই অন্ধকার এত বিষ লুকিয়ে রেখেছে
নিজের থলিতে, আগে কখনো জানিনি, ভয় যাপি

সর্বক্ষণ, হবে কি সম্ভ্রম লুট? হবে কি বিলীন
লহমায় সিঁথির সিঁদুর চিহ্ন? গৌতম, আমায়
বলে দাও। ওই শোন, 'গৃহস্থের ঘোর অমঙ্গল'
শব্দ ছুঁড়ে উড়ে যায় ছন্নছাড়া পেঁচা।
*গৌতম*।। বিচলিত
হয়ো না সুজাতা অন্ধকার অধিপতি নয়, কিন্তু
আলো আমাদের অস্তিত্বের দিকে ঝুঁকে আছে আজও
গাঢ় চুম্বকের মতো, আছে সম্প্রীতির চন্দ্রাতপ।
*সুজাতা*।। না, গৌতম, আশঙ্কার ভূত প্রেত কী ভীষণ নাচে,
বাঘ-ভাল্লুকের ভয় নেই, বিষাক্ত সাপের চেয়ে
ঢের বেশি বিষধর মানুষ এখন। আমাদের
বসত বাড়িকে ওরা বানিয়েছে চিতা, স্বপ্নগুলো
ভস্ম হয়ে ধূলায় মিশেছে, অসহায় মানবতা
কাঁটার মুকুট পরে নুয়ে থাকে ক্রুশ কাঁধে নিয়ে,
অনেক হৃদয় আজ লাঞ্ছিত গোলাপ দিগ্বিদিক।

*গৌতম* ।। থাক থাক সুজাতা, আগুনে ঘর পুড়ে গেছে, যাক,
আত্মাকে পুড়িয়ে খাক করে দেবে এমন আগুন
নেই কোনো উন্মত্ত মশালে। বর্বরের হুঙ্কারের
মধ্যে জেগে থাকে কিছু মানুষের দীপ্ত বাণী, থাকে
তাদের গভীর চালচিত্র, যারা কখনো ধর্মের
অন্তরালে অধর্মের বাঘনখ সযত্নে পোষে না,
যারা ধ্যানে ও মননে মনুষ্যত্বকেই করে ধ্রুবতারা
চিরকাল, সুজাতা তোমার দুটি রাঙা পদতলে
চুমু খায় পুণ্য দূর্বাদল, তোমার আঁচল
ধরে রাখে চারা গাছ, মুখ ছোয় জবা। পুনরায়
নতুন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসো ঘর বাঁধি দুজনায়।
ঘাতক শানাক তার ছুরি, মাথা নত করবো না,
শেখাবে বাঁচার মন্ত্র চিরদিনকার সূর্যোদয়,
এসো, হাতে হাত রাখি পূর্ব-পুরুষের মৃত্তিকায়।

*সুজাতা*।। এসো, হাতে হাত রাখি পূর্ব পুরুষের মৃত্তিকায়, ভাঙাচোরা স্বপ্ন সমূহকে ভালোবেসে জড়ো করি।